বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

৮ম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ ১৩৪১—পৌষ ১৩৪১

সম্পাদক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল্

পরিচালক

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র এম্-এ, ডি-লিট্

কলিকাতা

২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

বার্ষিক মূল্য—৬॥০

বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

৮ম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ ১৩৪১—পৌষ ১৩৪১

সম্পাদক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল্

পরিচালক

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র এম্-এ, ডি-লিট্

কলিকাতা

২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

বার্ষিক মূল্য—৬॥০

বিষয়-সূচী

(শ্রাবণ ১৩৪১—পৌষ ১৩৪১)

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণপৃষ্ঠ)



হাটের দিন

শিল্পী — শ্রী [illegible] বসু

বিচিত্রা

অষ্টম বর্ষ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৪১ | ১ম সংখ্যা

প্রত্যর্পণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির রচনা তব মন্দিরে
জ্বালে ছন্দের ধূপ।
সে মায়া-বাষ্পে আকার লভিল
তোমার ভাবের রূপ।
লভিলে হে নারী তনুর অতীত তনু,
পরশ-এড়ানো সে যেন ইন্দ্রধনু,
নানা রশ্মিতে রাঙা ;
পেলে রসধারা অমর বাণীর
অমৃত পাত্র-ভাঙা ॥

কামনা তোমায় ব'হে নিয়ে যায়
কামনার পরপারে।
সুদূরে তোমার আসন রচিয়া
ফাঁকি দেয় আপনারে।
ধ্যান প্রতিমারে স্বপ্নরেখায় আঁকে,
অপরূপ অবগুণ্ঠনে তারে ঢাকে,
অজানা করিয়া তোলে।
আবরণ তার ঘুচাতে না চায়
স্বপ্ন ভাঙিবে ব'লে ॥

ঐ যে মূরতি হয়েছে ভূষিত
মুগ্ধ মনের দানে,
অনেক প্রাণের নিঃশ্বাসতাপে
ভ'রে যে উঠিল প্রাণে,
এর মাঝে এল কিসের শক্তি সে যে,
দাঁড়াল সমুখে হোম-হুতাশন-তেজে,
পেল সে পরশমণি।
নয়নে তাহার জাগিল কেমনে
জাদু মন্ত্রের ধ্বনি ॥

যে দান পেয়েছ তার বেশি দান
ফিরে দিলে সে কবিরে,
গোপনে জাগালে সুরের বেদনা
বাজে বীণা যে গভীরে।
প্রিয় হাত হতে পরো পুষ্পের হার,
দয়িতের গলে করো তুমি আরবার
দানের মাল্যদান।
নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে
করিয়া মূল্যবান ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপ্রদাস

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[২১]

অনেকদিনের পরে বিপ্রদাস নীচের আফিস ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে টেবিলের পরে কাগজ-পত্রের স্তূপ—কতদিনের কত কাজ বাকি। দেহ ক্লান্ত কিন্তু দ্বিজুর ভরসায় ফেলিয়া রাখাও আর চলে না। একটা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা টানিয়া লইয়া সে পাতা উল্টাইতেছিল, বাহিরে মোটরের বাঁশী কানে গেল এবং অনতিবিলম্বে পূবের খোলা দরজা দিয়া বন্দনা প্রবেশ করিল। আজ একা নয়, সঙ্গে একটি অপরিচিত যুবক। পরণে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে ফুলকাটা কট্‌কি চটি এবং কাঁধ হইতে তির্য্যক্ ভঙ্গীতে জড়ানো মোটা শাদা চাদর। বয়স ত্রিশের নীচে, দেহের গঠন আর একটু দীর্ঘচ্ছন্দের হইলে অনায়াসে সুপুরুষ বলা চলিত। বিপ্রদাস অভ্যর্থনা করিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যে মশাই, ইনিই মিষ্টার চাউড্রি—বার এ্যাট-ল। কিন্তু এখানে অশোকবাবু বলে ডাকলেও অফেন্স নিতে পারবেন না এই সর্ত্তে আলাপ করিয়ে দিতে রাজি হয়ে সঙ্গে এনেচি। আলাপ হবে কিন্তু, তার আগে আপন কর্ত্তব্যটা সেরে নিই,—এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, পায়ের ধুলোটা কিন্তু এঁর সুমুখে নিতে পারলুম না পাছে মনে ক'রে বসেন ওঁদের সমাজের আমি কলঙ্ক। কিন্তু তাই বলে যেন অভিমান ভরে আপনিও ভেবে নেবেন না নতুন কায়দাটা আমার মাসির কাছে শেখা। তাঁর পরে আপনার প্রসন্নতার বহরটা আমার পরিমাপ করা কিনা।

বিপ্রদাস কহিল, তোমার মাসিমার কাছে এই ভাবেই আমার গুণগান করো নাকি? নবাগত যুবকটির প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, বন্দনার মুখে আপনার কথা এত বেশি শুনেচি যে অসুস্থ না থাকলে আমি নিজেই যেতুম আলাপ করতে। দেখেই মনে হলো চেহারাটা পর্য্যন্ত চেনা যেন কতবার দেখেচি। ভালোই হলো অযথা বিলম্ব না করে উনি নিজেই সঙ্গে ক'রে আনলেন।

ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে কি-একটা বলিতে চাহিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বন্দনা শাসনের ভঙ্গীতে তর্জ্জনী তুলিয়া কহিল, মুখুয্যে মশাই, অত্যুক্তি অতিশয়োক্তিকে ছাড়িয়ে প্রায় মিথ্যের কোঠায় এলো,—এবার থামুন নইলে হাঙ্গামা করবো।

—ইহার অর্থ?

—ইহার অর্থ এই হয় যে আমাদের অতি-সাধারণদের মতো সত্যি-মিথ্যে যা' খুশি বানিয়ে বলা আপনারও চলে। আপনি মোটেই অসাধারণ ব্যক্তি নয়,—ঠিক আমাদের মতোই সাধারণ মনুষ্য।

বিপ্রদাস কহিল, না। সকলকে জিজ্ঞেসা করো তারা একবাক্যে সাক্ষ্য দেবে তোমার অনুমান অশ্রদ্ধেয়, অগ্রাহ্য!

বন্দনা বলিল, এবার তাদের কাছেই আপনাকে নিয়ে গিয়ে বাইরের ঐ সিংহ-চর্ম্মটি দু' হাতে ছিঁড়ে ফেলে দেবো। তখন আসল মূর্ত্তিটি তারা দেখতে পাবে,—তাদের ভয় ভাঙবে। আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বলবে তুমি রাজ-রাণী হও।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, আশীর্ব্বাদে আপত্তি নেই, এমন-কি নিজে করতেও প্রস্তুত, কিন্তু আশীর্ব্বাদ ত তোমরা চাও না, বলো কু-সংস্কার, বলো ও-শুধু কথার কথা!

বন্দনা পুনরায় আঙুল তুলিয়া বলিল, ফের খোঁচা দেবার চেষ্টা? কে বলেছে গুরুজনের আশীর্ব্বাদ আমরা চাইনে,—কে বলেছে কু-সংস্কার? এবার কিন্তু সত্যিই রাগ হচ্চে মুখুয্যে মশাই।

বিপ্রদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যিই রাগ হচ্চে নাকি? তবে থাক এ-সব গোলমেলে কথা। কিন্তু হঠাৎ সকালবেলাতেই আবির্ভাব কেন? কোন কাজ আছে না কি?

বন্দনা কহিল, অনেক। প্রথম আপনার কৈফিয়ৎ নেওয়া। কেন আমার বিনা হুকুমে নীচে নেমে কাজ সুরু করেছেন?

—করিনি করার সংকল্প করেছিলুম মাত্র। এই রইলো—বলিয়া সেই মোটা খাতাটা বিপ্রদাস দূরে ঠেলিয়া দিল।

বন্দনা প্রসন্ন মুখে কহিল, কৈফিয়ৎ satisfactory : অবাধ্যতা মার্জ্জনা করা গেল। ভবিষ্যতে এমনি অনুগত থাকলেই আমার কাজ চলে যাবে। এবার শুনুন মন দিয়ে। ততক্ষণ এর সঙ্গে বসে গল্প করুন—মুখুয্যেদের ঐশ্বর্য্যের বিবরণ, প্রজা শাসনের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী—যা খুশী। আমি ওপরে যাচ্চি অনুদিকে নিয়ে সমস্ত গুছিয়ে নিতে। কাল সকালের ট্রেণে আমরা বলরামপুর যাত্রা করবো, দিনে দিনে যাবো ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকবে না। মিষ্টার চাউড্রির ইচ্ছে সঙ্গে যান,—বড় ঘরের বড় রকমের যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপ দীয়তাং ভুজ্যতাং ঘটা-পটা কখনো চোখে দেখেন নি,—আর কোথা থেকেই বা দেখবেন—

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নিজে নিশ্চয়ই অনেক দেখেচো—

বন্দনা কহিল, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভদ্ররুচি বিগর্হিত। উনি দেখেননি এই কথাই হচ্ছিলো। তা শুনুন। ওঁকে অনুমতি দিয়েছি সঙ্গে যাবার তাতে এত খুশি হয়েছেন যে তারপরে আমাকে সঙ্গে করে বোম্বাই পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে সম্মত হয়েছেন।

বিপ্রদাস মুখ অতিশয় গম্ভীর করিয়া কহিল, বলো কি? এতখানি ত্যাগ স্বীকার আমাদের সমাজে মেলে না এ শুধু তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। শুনে বিস্ময় লাগচে।

বন্দনা বলিল, লাগবার কথাই যে। জপ-তপও আছে, ষোল আনা হিংসেও আছে। এই বলিয়া সে চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল বিপ্রদাস তাহাকে ডাকিয়া কহিল, এ

যেন কথামালার সেই কুকুরের ভূষি আগলানোর গল্প। খাবেও না আর ষাঁড়ের দল এসে যে মনের সাধে চিবোবে তাও দেবে না। মানুষ বাঁচে কি কোরে বলোত?

বন্দনা দ্বার প্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম রোষে ভ্রূকুঞ্চিত করিল, বলিল, ঠিক আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ,—কিচ্ছু তফাৎ নেই। লোকগুলো কেবল মিথ্যে ভয় করে মরে।

—তুমি গিয়ে এবার তাদের ভয় ভেঙ্গে দিয়ে এসো।

—তাই তো যাচ্চি। এবং ভূষির সঙ্গে একজনের উপমা দেবার দুর্ব্বুদ্ধিরও শোধ নিয়ে আসবো—এই বলিয়া বন্দনা দীপ্ত কটাক্ষে পুনরায় তড়িৎ বৃষ্টি করিয়া দ্রুত পদে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিপ্রদাস কহিল, মিষ্টার—

অশোক সবিনয়ে বাধা দিল,—না না, চলবে না। ওটাকে বাদ দিতে বাধবে না বলেই ধুতি-চাদর এবং চটি জুতো পরে এসেচি বিপ্রদাস বাবু। উনিও ভরসা দিয়েছিলেন যে—

বিপ্রদাস মনে মনে খুশি হইয়া বলিল, ভালোই হলো অশোক বাবু সম্বোধনটা সহজ দাঁড়ালো। পাড়া-গাঁয়ের মানুষ মনেও থাকে না অভ্যাসও নেই, এবার স্বচ্ছন্দে আলাপ জমাতে পারবো। শুনলুম আমাদের পল্লীগ্রামের বাড়ীতে যেতে চেয়েছেন, সত্যিই যদি যান ত কৃতার্থ হবো। আমাদের সংসারের কর্ত্রী আমার মা, তাঁর পক্ষ থেকে আপনাকে আমি সসম্মানে আমন্ত্রণ করচি।

বিপ্রদাসের বিনয় বচনে অশোক পুলকিত চিত্তে বলিল, নিশ্চয় যাবো,—নিশ্চয় যাবো। কত দরিদ্র অনাথ আতুর আসবে নিমন্ত্রণ রাখতে, কত অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত হবেন বিদায় গ্রহণ করতে—আনন্দোৎসবে কত খাওয়া-দাওয়া, কত আসা-যাওয়া, কত বিচিত্র আয়োজন—

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, সমস্ত বাড়ানো কথা অশোকবাবু, বন্দনা শুধু রহস্য করেছে।

—রহস্য করে তার লাভ কি বিপ্রদাস বাবু?

—একটা লাভ আমাদের অপ্রতিভ করা। বলরামপুরের মুখুয্যেদের ওপর সে মনে মনে চটা। দ্বিতীয় লাভ আপনাকে সে কোন ছলে বোম্বায়ে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

অশোক বলিল, প্রয়োজন হলে বোম্বাই পর্য্যন্ত আমাকে সঙ্গে যেতে হবে এ কথা আছে, কিন্তু মুখুয্যেদের পরে সে চটা, আপনাদের সে লজ্জিত করতে চায় এমন হতেই পারে না বিপ্রদাস বাবু। কালও বলরামপুরে যাবার স্থির ছিলনা কিন্তু আপনাদের কথা নিয়েই ওর মাসির সঙ্গে হয়ে গেল ঝগড়া। মাসি বললেন বিপ্রদাসের মা সর্ব্ব-সাধারণের হিতার্থে যদি জলাশয় খনন করিয়ে থাকেন ত তার প্রশংসা করি, কিন্তু ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করার কোন অর্থ নেই,—ওটা কুসংস্কার। কুসংস্কারে যোগ দেওয়া আমি অন্যায় মনে করি। বন্দনা বললেন ওঁরা বড় লোক, বড়লোকের কাজে-কর্ম্মে ঘটা তা হয়েই থাকে মাসিমা। তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? আমার পিসিমা বললেন বড়লোকের অপব্যয়ে আশ্চর্য্যের কিছু নেই আমি জানি, কিন্তু ও-তো কেবল ও-ই নয় ও-টা কুসংস্কার। তোমার যাওয়াতেই আমার আপত্তি। বন্দনা

বললেন, আমি কিন্তু কুসংস্কার মনে করিনে মাসিমা। বরঞ্চ, এই মনে করি যে, যা' জানিনে, জানার কখনো চেষ্টা করিনি তাকে সরাসরি বিচার করতে যাওয়াই কুসংস্কার। ওর জবাব শুনে পিসিমা রাগে জ্বলে গেলেন, জিজ্ঞেসা করলেন তোমার বাবার অনুমতি নিয়েছো?

বন্দনা উত্তর দিলেন, বাবা বারণ করবেন না আমি জানি। দিদির স্বামী অসুস্থ, তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে আমার ওপর।

"ভার দিলে কে শুনি? তিনি নিজেই বোধ হয়?" প্রশ্ন শুনে বন্দনা যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন; আমার মনে হলো তাঁর মাথায় দ্রুত রক্ত চড়ে যাচ্ছে, এবার হঠাৎ কি-একটা বলে ফেলবেন, কিন্তু, সে-সব কিছুই করলেন না শুধু আস্তে আস্তে বললেন, যে যা খুশি জিজ্ঞেসা করলেই যে আমাকে জবাব দিতে হবে ছেলেবেলা থেকে এ-শিক্ষা আমার হয় নি মাসিমা। পরশু সকালে মুখুয্যে মশাইকে নিয়ে আমি বলরামপুরে যাবো এর বেশি তোমাকে বলতে পারবো না।

পিসিমা রাগ করে উঠে গেলেন, আমি বললুম, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন? আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ-সব আচার অনুষ্ঠান চোখে দেখি। বন্দনা বললেন কিন্তু সে-সব যে কুসংস্কার অশোকবাবু। চোখে দেখলেও যে আপনাদের জাত যায়। বললুম, যদি আপনার না যায় ত আমারও যাবে না। আর যদি যায় ত দুজনের এক সঙ্গেই জাত যাক আমার কোন ক্ষতি নেই।

বন্দনা বললেন, আপনি ত বিশ্বাস করেন না, সে-সব চোখে দেখলে যে মনে মনে হাসবেন।

বললুম, আপনিই কি বিশ্বাস করেন নাকি? তিনি বললেন, না করিনে, কিন্তু মুখুয্যে মশাই করেন। আমি কেবল আশা করি তাঁর বিশ্বাসই যেন এক দিন আমারও সত্যি বিশ্বাস হয়ে ওঠে। বিপ্রদাস বাবু, আপনাকে বন্দনা মনে মনে পূজো করে, এত ভক্তি সে জগতে কাউকে করে না।

খবরটা অজানা নয়, নূতনও নয়, তথাপি অপরের মুখে শুনিয়া তাহার নিজের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে প্রশ্ন করিল, আপনাদের যে বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল সে কি স্থির হয়ে গেছে? বন্দনা কি সম্মতি দিয়েছেন?

—না। কিন্তু অসম্মতিও জানাননি।

—এটা আশার কথা অশোক বাবু। চুপ করে থাকাটা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মতির চিহ্ন।

অশোক সকৃতজ্ঞ চক্ষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, না-ও হতে পারে বিপ্রদাসবাবু, অন্ততঃ, নিজে আমি এখনো তাই মনে করি। একটু থামিয়া কহিল, মুস্কিল হয়েছে এই যে আমি গরিব কিন্তু বন্দনা ধনবতী। ধনে আমার লোভ নেই তা নয়, কিন্তু পিসিমার মতো ঐটেই আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। এ কথা বোঝাবো কি ক'রে যে পিসিমার সঙ্গে আমি চক্রান্ত করিনি।

এই লোকটির প্রতি মনে মনে বিপ্রদাসের একটা অবহেলার ভাব ছিল, তাহার বাক্যের সরলতায় সেই ভাবটা একটু কমিল। সদয় কণ্ঠে কহিল, পিসির ষড়যন্ত্রে আপনি যে যোগ দেননি সত্যি হলে একথা বন্দনা একদিন বুঝবেই, তখন প্রসন্ন হতেও তার বিলম্ব হবে না, ধনের পরিমাণ নিয়েও তখন বাধা ঘটবে না।

অশোক উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ-কি আপনি নিশ্চয় জানেন বিপ্রদাস বাবু?

ইহার জবাব দিতে গিয়া বিপ্রদাস দ্বিধায় পড়িল, একটু ভাবিয়া বলিল, ওর যতটুকু জানি তাইতো মনে হয় অশোকবাবু।

অশোক কহিল, আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, ওঁর নিজের প্রসন্নতার চেয়েও আমার ঢের বেশি প্রয়োজন আপনার প্রসন্নতায়। সে যেদিন পাবো আমার না-পাবার কিছু থাকবে না।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, আমার প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে ও স্বামী নির্ব্বাচন করবে এমন অদ্ভুত ইঙ্গিত অপনাকে দিলে কে—বন্দনা নিজে? যদি দিয়ে থাকে ত নিছক পরিহাস করেছে এই কথাই কেবল বলতে পারি অশোক বাবু।

—না পরিহাস নয়, এ সত্য।

—কে বল্‌লে?

অশোক এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিল, এ-সব মুখ দিয়ে বলার বস্তু নয় বিপ্রদাসবাবু। সেদিন মাসিমার সঙ্গে ঝগড়া করে বন্দনা আমার ঘরে এসে ঢুকলেন—এমন কখনো করেন না—একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসে বললেন, আমাকে বোম্বায়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে অশোকবাবু। বল্‌লুম, যখনি হুকুম করবেন তখনি প্রস্তুত। বললেন, যাচ্চি বলরামপুরে সময় হলে তার পরে জানাবো। বললুম, তাই জানাবেন, কিন্তু মাসিকে অমন চটিয়ে দিলেন কেন? তাঁদের ঐ-সব পূজো-পাঠ, হোম-জপ, ঠাকুর দেব্‌তা সত্যিইত আর বিশ্বাস করেন না, তবু বলেলন বিশ্বাস করতে পেলে বেঁচে যাই। কেন বললেন ও-কথা? বন্দনা বললেন, মিথ্যে বলিনি অশোকবাবু, ওঁদের মতো সত্য বিশ্বাসে ঐ সব যদি কখনো গ্রহণ করতে পারি আমি ধন্য হয়ে যাই। মুখুয্যে মশায়ের অসুখে সেবা করেছিলুম তাঁর কাছে একদিন বিশ্বাসের বর চেয়ে নেবো। তারপরে সুরু হলো আপনার কথা। এত শ্রদ্ধা যে কেউ কাউকে করে, কারো শুভ কামনায় কেউ যে এমন অনুক্ষণ মগ্ন থাকতে পারে এর আগে কখনো কল্পনাও করিনি বিপ্রদাসবাবু। কথায় কথায় তিনি একদিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন। তখন আপনি অসুস্থ, আপনার পূজো আহ্নিকের আয়োজন তিনিই করেন। সেদিন বেলা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আসতে কি একটা পায়ে ঠেক্‌লো, যতই নিজেকে বোঝাতে চাইলেন ও কিছু নয় ওতে পূজার ব্যাঘাত হবে না, ততই কিন্তু মন অবুঝ হয়ে উঠতে লাগলো পাছে কোথা দিয়েও আপনার কাজে ত্রুটি স্পর্শ করে। তাই আবার স্নান করে এসে সমস্ত আয়োজন তাঁকে নূতন ক'রে করতে হলো। আপনি কিন্তু সেদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, বন্দনা সকালে যদি তোমার ঘুম না ভাঙে ত অন্নদাদিদিকে দিও পূজোর সাজ করতে। মনে পড়ে বিপ্রদাসবাবু?

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, পড়ে।

অশোক বলিতে লাগিল, এম্‌নি কত দিনের কত ছোট খাটো বিষয় গল্প করে বলতে বলতে সেদিন রাত্রি অনেক হয়ে গেলো, শেষে বললেন, মাসি তাঁদের কুসংস্কারের খোঁটা দিলেন,—আমি নিজেও একদিন দিয়েছি অশোকবাবু—কিন্তু আজ কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বুঝতে আমার গোল বাধে।

খাওয়ার বিচার ত কোন দিন করিনি, আজন্মের বিশ্বাস এতে দোষ নেই, কিন্তু এখন যেন বাধা ঠেকে। বুদ্ধি দিয়ে লজ্জা পাই, লোকের কাছে লুকোতে চাই, কিন্তু যখনই মনে হয় এ সব উনি ভালোবাসেন না তখনি মন যেন ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে।

শুনিতে শুনিতে বিপ্রদাসের মুখ পাংশু হইয়া আসিল, জোর করিয়া হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, বন্দনা বুঝি এখন খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার আরম্ভ করেছে? কিন্তু সে দিন যে এসে দম্ভ করে বলে গেল মাসির বাড়ীতে গিয়ে ও আপন সমাজ, আপন সহজ বুদ্ধি ফিরে পেয়েছে, মুখুয্যেদের বাড়ীর সহস্র প্রকারের কৃত্রিমতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে গেছে!

অশোক সবিস্ময়ে কি একটা বলিতে গেল কিন্তু বিঘ্ন ঘটিল। পর্দ্দা সরাইয়া বন্দনা প্রবেশ করিয়া বলিল, মুখুয্যে মশাই সমস্ত গুছিয়ে রেখে এলুম। কাল সকাল সাড়ে ন'টার গাড়ী। পুজো টুজো বাজে কাজগুলো ওর মধ্যে সেরে রাখবেন। এত বিড়ম্বনাও ভগবান আপনার কপালে লিখেছিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তাই হবে বোধহয়।

—বোধহয় নয় নিশ্চয়। ভাবি এগুলো কেউ আপনার ঘুচোতে পারতো। তা শুনুন। কালকের সকালের খাবার ব্যবস্থাও করে গেলুম,—আমি নিজে এসে খাওয়াবো, তারপরে কাপড়-চোপড় পরাবো, তারপরে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যাবো। রোগা মানুষ কিনা—তাই। চলুন অশোকবাবু, এবার আমরা যাই। পায়ের ধুলো কিন্তু আর নেবোনা মুখুয্যে মশাই,—ওটা কুসংস্কার। ভদ্র সমাজে অচল। এই বলিয়া সে হাসিয়া হাত দুটা মাথায় ঠেকাইয়া বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র



শ্রীচৈতন্য-চরিত্রে সঙ্গীত ও কাব্যরসানুভূতি

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করিলে তাহাতে বিচিত্র ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে কিংবা প্রবলের অন্যায় উৎপীড়নে কখনও দেখা যায় তাঁহাদের হৃদয় "বজ্রাদপি" কঠোর, আবার কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, আর্ত্তের কাতরতা বা দুঃখীর বেদনার গভীর স্পর্শে তাঁহাদের বিগলিত হৃদয় হইতে করুণার প্রস্রবণ উৎসারিত। শ্রীচৈতন্য-চরিত্রেও আমরা এইরূপ বিভিন্ন ভাবের বিচিত্র স্ফুরণ দেখিতে পাই। কখনও দেখি নিমাই পণ্ডিতের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার প্রখর দীপ্তি সহ্য করিতে না পারিয়া পণ্ডিতগণ সভয়ে দূরে পলায়ন করিতেছেন, আবার কখনও দেখি তিনি শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব-গণকে প্রণাম ও নমস্কার করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। একদিকে প্রকৃতি-সম্ভাষণ করিবার অপরাধের জন্য তিনি ছোট হরিদাসের প্রতি নির্ম্মম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছেন, আবার অন্যদিকে দেখি তাঁহার অতুলনীয় প্রেম দৈন্যকে আশ্রয় করিয়া উদ্ধত অভিমানের শিলা-স্তম্ভকে বিগলিত করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সংস্কারের ভারবেগে প্রবাহিত জীবনের ধারাকে চির কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র যেন অপরূপ ভাব-কুসুমে গ্রথিত মালা। তাহার অপূর্ব্ব বিকাশ ও সুরভি যুগে যুগে ভক্তি ও ভাবুকগণের হৃদয়ে আনন্দ ও পুলকের প্রবাহ আনিয়া দেয়। সেই বিচিত্র ভাব-সমাবেশের অবকাশে একটি বৈশিষ্ট্য অতি উজ্জ্বলভাবে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে,—তাহা তাঁহার কাব্য ও সঙ্গীতানুরাগ। তাঁহার এই কাব্য-প্রতিভা সূত্রের ন্যায় সমুদয় ভাব-বিন্যাসকে যেন গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। সন্ন্যাসাশ্রমে প্রকৃতি-সম্ভাষণ তো দূরের কথা, তদ্দর্শনও নিষিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া তদাশ্রমোচিত যাবতীয় নিয়ম যথারীতি পালন করিয়াছেন। এ বিষয়ে যাহাতে তাঁহার কোনও প্রকার ত্রুটী-বিচ্যুত না ঘটে সেজন্য তিনি অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদরকে বিশেষ করিয়া সাবধান হইতে বলিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায় তাঁহার কাব্যে-গড়া-প্রাণ কখন কখনও অনুভূতির তীব্র আবেগে সন্ন্যাসের সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া রসানুসন্ধানে ছুটিয়াছে। প্রভু একদিন জলেশ্বর-টোটায় যাইতেছেন, এমন সময়ে মনোহর সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিলেন, গুর্জ্জরী রাগিণীতে গীত-গোবিন্দের সুললিত পদ গীত হইতেছে। প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া গীত-ধ্বনি অনুসরণ করিয়া ছুটিলেন। তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান নাই। পথে সিজের কাঁটা ফুটিয়া তাঁহার অঙ্গ রক্তাক্ত হইল, তাঁহার ব্যথা-বোধ নাই। ভক্ত-প্রধান গোবিন্দ সঙ্গে ছিলেন, তিনিও প্রভুর পিছনে পিছনে ছুটিয়াছেন। জগন্নাথ-মন্দিরের গায়িকা নারীগণ যেখানে গান করিতেছিলেন প্রভু যখন তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এমন সময় গোবিন্দ প্রভুকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি? যাঁহারা গান গাহিতেছেন তাঁহারা যে স্ত্রীলোক।" স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া প্রভুর বাহ্য-জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

'প্রভু কহে "গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।"'

* * * * *

একটা নিমিত্তমাত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া যে উচ্ছ্বসিত ভাবের প্রবাহ নিবিড় রসাস্বাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়াছিল কোনও আচার বা নিয়মের কঠোরতা তাহাতে

বাধা প্রদান করিতে পারে নাই। যিনি সর্ব্ব সুখ-রস-প্রস্রবণ তাঁহারই অমিয় রস-ধারা সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত প্রবাহের ভিতর দিয়া তিনি বিভোর হইয়া পান করিতেছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের কঠোর বিধান তাঁহাকে সেই অপার্থিব রসানুভূতির আনন্দ-বিহ্বলতা হইতে বাহ্য জগতে ফিরাইয়া আনিল।

শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। শ্রীবাস-অঙ্গনে তিনি ভক্তগণের সহিত সুরলয় সংযোগে নাম সংকীর্ত্তন করিয়া প্রহরের পর প্রহর, নিশির পর নিশি যাপন করিয়াছেন। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন,—

"কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥"

তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাধন-পদ্ধতিকে সরস করিতে না পারিলে তাহা লোকের হৃদয়-গ্রাহী হইবে না। তাই তিনি স্বয়ং নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া লোককে অপূর্ব্ব সাধন-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎকালীন বিদ্যা-বিলাসী-পণ্ডিত-সমাজ তাঁহার মাধুর্য্য-পূরিত সাধন-পদ্ধতি সমর্থন করেন নাই, বরং তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহারা কাজির সমীপে অভিযোগ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা মর্ম্ম-মূলে একবার বাসা বাঁধে তাহাকে উৎপাটিত করা সহজ নহে। অনাড়ম্বর সুর-লয়-সম্বলিত হরিনাম কীর্ত্তন সঙ্গীত-রসের ভিতর দিয়া লোকের মর্ম্ম-স্থলে প্রবেশ করিল;—তাহারা আকৃষ্ট হইল। সেই আকর্ষণের ফল আজও আমরা চারিদিকে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। এখনও বাঙ্গলার আকাশে বাতাসে কীর্ত্তনের সুর ছাইয়া আছে। কীর্ত্তনের সুর কর্ণে প্রবেশ করিলে এখনও মাঠের কৃষক তাহার কাজ ভুলিয়া যায়, তাহার অন্তস্থলে কোন্ এক সুদূরের পিপাসা জাগিয়া উঠে; গৃহ-কর্ম্ম-নিরতা ললনার মন ক্ষণকালের জন্য উদাসীন হইয়া কোন্ এক বিচিত্র রসানুসন্ধানের উদ্দেশে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, ভোগ-সুখ-পরায়ণ ব্যক্তির ভোগের দুষ্পূরণীয় পিপাসা অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও শান্তি লাভ করে। প্রেমের প্রস্রবণ হইতে একদিন কীর্ত্তন গানের উদ্ভব হইয়াছে, সুতরাং তাহার অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে চিরকাল মানবের অন্তর রস-সিক্ত করিবে তাহাতে সন্দেহ কি?

নীলাচলে শেষ দ্বাদশ বৎসর শ্রীচৈতন্যদেবের তীব্র বিরহ-অবস্থা। নিরন্তর সেই বিরহ-স্ফূর্ত্তির ভাব ভাষায় প্রকাশ হয় না। তাঁহার বিরহ-ভাব সেই দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়,—যেদিন ব্রজেশ্বরী রাধা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মহা যোগিনীর ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, যেদিন কৃষ্ণ-হারা হইয়া তিনি নিখিল জগৎ শূন্যময় দেখিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধার ন্যায় শ্রীচৈতন্যেরও শেষ দ্বাদশ বৎসর নিরন্তর বিরহ-উন্মাদে কাটিয়াছে। রাত্রিতে নিদ্রা নাই, নয়নে অবিরাম অশ্রুর উৎস। গম্ভীরার ভিতরে তাঁহার অন্তরঙ্গ স্বরূপ ও রামানন্দ রায়ের নিকট কাতর হইয়া তিনি অন্তরের বিলাপ জানাইতেছেন,—

"কাঁহা করো কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন॥
কাহারে কহিব কথা কেবা জানে দুঃখ।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥"

একজন ব্যক্তিই তাঁহার ধ্যান ও ধারণার বিষয় ছিল,—তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন; একটী নদীকেই তিনি চিনিতেন তাহা যমুনা; একটি পর্ব্বতের কথাই তিনি জানিতেন—তাহা গোবর্দ্ধন। নিখিল জগতের যাহা কিছু সবই তাঁহার কাছে কৃষ্ণময়, যেখানে যত দেব-বিগ্রহ আছে সকলই শ্রীগোবিন্দের। তাই তিনি বলিতেছেন,—

"যত শুনি শ্রবণে—সকলই কৃষ্ণ নাম।
সকল ভুবন দেখোঁ—গোবিন্দের ধাম॥"

তাই বর্ষার নব-নীরদ-পুঞ্জ দেখিয়া শ্যামের অঙ্গ-কান্তি তাঁহার মনে পড়িত, চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত সমুদ্রের শুভ্র লহরী-লীলা দেখিয়া যমুনা-ভ্রমে তিনি তাহাতে নিপতিত হইতেন, দূরে চটক-পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ভাবিয়া তাহার দিকে আত্মহারা হইয়া তিনি ছুটিয়া চলিতেন। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় ও প্রাণ মন একান্ত হইয়া যেন সেই আনন্দ-ময়ের সন্ধানে ছুটিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের সেই বিরহ-স্ফূর্ত্তি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব

কবিগণকে এক নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভাব-রাশি বৈষ্ণব-কবিগণের অমর লেখনীর তুলিকায় ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া এক অভিনব সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কবে কোন্ অতীত যুগে যে লীলা সংঘটিত হইয়াছে এখনও যেন তাহার জীবন্ত প্রভাব কাব্যের প্রতি ছত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে রস-মধুর করিয়া রাখিয়াছে। যে লীলা এক কালে প্রকট হইয়াছিল তাহার অভিনব রস আমরা এখন এই সকল সাহিত্যের ভিতর দিয়া আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার পর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আদেশে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং হরিদাসের কুটীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই বৎসর প্রভু রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন করিবার সময়ে "কাব্য-প্রকাশ" হইতে উদ্ধৃত একটী শ্লোক পাঠ করেন,—

"যঃ কৌমার হরঃ স এব হি বরস্তা
এব চৈত্রক্ষপাস্তে চোন্মীলিত—
মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
বা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত—
ব্যাপার লীলাবিধৌ রেবা রোধসি
বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

শ্লোকটীর অর্থ এই—"হে সখি, যিনি আমার কৌমার কাল হরণ করিয়াছেন, অধুনা তিনি আমার বর। সেই সকল চৈত্রমাসীয় যামিনী, সেই সমস্ত প্রস্ফুটিত মালতী সৌরভ, সেই সমস্ত বিকসিত কদম্ব-কানন-সম্বন্ধীয় সমীর এবং সেই আমিও আছি, তথাপি রেবা তীরস্থ অশোক-মূলে আমাদের যে প্রথম বিহার ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে যে সুখ হইয়াছিল, এখন আর তাহা পাইতেছি না। তাহার জন্য মন সমুৎকণ্ঠিত।"

শ্লোকটী আদি-রসাত্মক, এবং প্রেমাস্পদকে সম্বোধন করিয়া প্রেমিকা এইরূপ বলিতেছেন। প্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে রথারূঢ় তাঁহার পরম প্রেমাস্পদকে লক্ষ্য করিয়া শ্লোক-নিহিত নিগূঢ় রস আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার প্রধান অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর ব্যতীত তাঁহার অন্তরের ভাব আর কেহই বুঝিতেছেন না। কিন্তু অশেষ ভাগ্য বলে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং অনুরূপ ভাবের একটী শ্লোক রচনা করিলেন,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি
কুরুক্ষেত্র মিলিত স্তথাহং
সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম সুখং
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

ভাবার্থ—হে সখি, কুরুক্ষেত্রে সেই শ্রীহরি মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই শ্রীমতী রাধিকাই আছি, উভয়ের সহবাস সুখও বটে, তথাপি কাননাভ্যন্তরে খেলিত মুরলীর পঞ্চম স্বর বিশিষ্ট সেই কালিন্দী সৈকত কাননের দিকে আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

শ্রীরূপ একটি তাল-পত্রে শ্লোকটী লিখিলেন এবং সমুদ্রে স্নান করিতে যাইবার পূর্ব্বে তাহা চালে গুঁজিয়া রাখিলেন। শ্রীরূপ স্নান করিতে চলিয়া গেলে প্রভু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া দৈবক্রমে যেমন চালের দিকে তাকাইলেন অমনি তাল-পত্রটী তাঁহার চোখে পড়িল। তিনি চাল হইতে সেটী বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। শ্লোক পড়িয়া প্রভু পুলকিত হইলেন। শ্রীরূপ ঠিক সেই সময়ে স্নান হইতে ফিরিয়া প্রভুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। প্রভু শ্রীরূপকে সস্নেহে চপেটাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার অন্তরের ভাব কিরূপে জানিলে?" শ্রীরূপ বলিলেন, "তুমিই কৃপা করিয়া আমাকে জানাইয়াছ।"

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক যে সকল অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে বিদগ্ধ মাধব নাটক ও ললিত মাধব নাটক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীলাচলে হরিদাসের কুটীরে অবস্থান করিবার সময় শ্রীরূপ একদিন বিদগ্ধ মাধব নাটক রচনায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময়ে প্রভু হঠাৎ

সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস ও শ্রীরূপ উভয়ে সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া প্রভু আসনে উপবেশন করিলেন। "কি পুঁথি লিখিতেছ?"—এই কথা শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রভু পুঁথির একখানি পত্র লইয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং শ্রীরূপের হস্তাঙ্কিত মুক্তার ন্যায় অক্ষরশ্রেণী দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। পত্রে একটী শ্লোক লিখিত আছে দেখিয়া প্রভু তাহা পড়িতে লাগিলেন, এবং পাঠ করিবামাত্র প্রেমে আবিষ্ট হইলেন।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে, কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী
ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং, নো জানে জনিতা
কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

শ্লোকার্থ :—কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় যে কি পরিমিত অমৃত দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা অবগত নহি। এই অমৃতময় শব্দ যৎকালে জিহ্বায় নৃত্য করে, তখন রসনা-শ্রেণী প্রাপ্তির অভিলাষ হয়; শ্রবণ-বিবরে অঙ্কুরিত হইলে অর্ব্বুদ সংখ্য কর্ণলাভের স্পৃহা জন্মে এবং মনোরূপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপারই এতৎ সকাশে পরাভূত হইয়া পড়ে।

কোনও উৎকৃষ্ট বস্তু কিংবা বিষয় উপভোগ করিবার সময়ে প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে, এবং তাহাদিগকেও সেই-রস আস্বাদন করাইবার জন্য মন উৎসুক হয়। সাধুমুখে ও শাস্ত্র-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-নামের মহিমা শুনা যায় বটে, কিন্তু উক্ত অপূর্ব্ব শ্লোকনিহিত ভাব প্রভুর এত মধুর লাগিয়াছে যে তিনি তাহা ভক্তগণকে আস্বাদন করাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সার্ব্বভৌম, স্বরূপ, রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীরূপের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীরূপকে সেই শ্লোক পড়িতে আদেশ করিলেন। শ্লোক শুনিয়া ভক্তবৃন্দ সকলে আনন্দে-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

'সবে বলে "নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর॥"'

রায় তখন শ্রীরূপের কবিত্ব-শক্তির অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "প্রভুর শক্তি-সঞ্চার ভিন্ন জীবে এরূপ কবিত্ব-শক্তির বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়।" শ্রীরূপ যে প্রভুর প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা প্রভুর উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি।

প্রভু কহে "আমা সনে ইহার মিলন।
ইঁহার গুণে আমার তুষ্ট হৈল মন॥
মধুর প্রসঙ্গে ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥"

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিত প্রভুর কাব্য-রসাস্বাদন-লীলা-বিষয়ক প্রসঙ্গগুলিকেই একমাত্র ঘটনা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। শ্রীচৈতন্য দেবের সমগ্র জীবনই ভাব-ময়, এবং এই ভাবের ভিতর দিয়াই তাঁহার প্রকট লীলার সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি। তাঁহার বিচিত্র ভাব-রাশি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও অতলস্পর্শ। সুতরাং ঘটনার সমাবেশে যে যে স্থলে এই সকল ভাব বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহারই কিয়দংশ আমরা আস্বাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীচৈতন্যদেব শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণাদি দ্বারা ভক্তগণকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা যে সকল পরমতত্ত্ব বোধগম্য হয় না স্বীয় কৃপাবলে তাহা ভক্তগণকে অনুভব করাইয়াছেন। তিনি ভক্তগণকে বুঝাইয়াছেন, কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু ও সকলের ভর্ত্তা; তিনিই একমাত্র পুরুষ, আর সব প্রকৃতি। কিন্তু পরম বৈরাগী গুরুরূপী শ্রীচৈতন্যের এই সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া কখন কখনও আমরা দেখিতে পাই কবি ও প্রেমিক রূপী আর এক শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। নদীতে বান ডাকিলে নদীর দু-কূল প্লাবিত হইয়া যেমন সকল চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, এবং শুধু জলরাশি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না,—তেমনি কখন কখনও আমরা দেখিতে পাই নিবিড় রসানুভূতির এক প্রবল উচ্ছ্বাস সকল তত্ত্ব ও জ্ঞানকে তলাইয়া দিয়া তাঁহার অন্তরাত্মাকে পরম প্রিয়তমের

সন্নিধানে লইয়া চলিয়াছে। মাত্র প্রেম ও রস ছাড়া শ্রীচৈতন্যের ভিতরে সেই অবস্থায় আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। মনে হয় শ্রীচৈতন্যদেব প্রেম ও রসে গড়া যেন এক অপরূপ মূর্ত্তি।

যে কয়েকজন প্রধান অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত বিরহ-উন্মাদের সময় প্রভু কালাতিপাত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই দুই অন্তরঙ্গ ভক্তের সাহচর্য্যে প্রভুর বিরহ-ভাব সঙ্গীত ও কাব্যের ভিতর দিয়া আরও মধুরভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে কি ভাবে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"এই মত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে॥
সেই দুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥"

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে যাইতে হঠাৎ একটী পুষ্পোদ্যান দেখিতে পাইলেন। পুষ্পোদ্যান দেখিয়া তাঁহার বৃন্দাবন ভ্রম হইল, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাসলীলার স্মৃতি তাঁর অন্তরে স্ফুরিত হইল। তিনি রাসলীলার শ্লোক পড়িয়া ভাবাবেশে সখী ভাবে প্রতি তরুলতার নিকটে কৃষ্ণান্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য। তাঁহার অন্তরাত্মা পরম প্রেমাস্পদকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। প্রতি তরুলতাকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া প্রভু যমুনার দিকে অগ্রসর হইলেন,—

"এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে, তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে॥
কোটি-মন্মথ-মোহন মুরলী-বদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগৎ-নেত্র-মন॥"

সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এমন সময়ে স্বরূপাদি ভক্তগণ সেখানে মিলিত হইয়া তাঁহার চেতনা সঞ্চার করিলেন। প্রভু সংজ্ঞা লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

'প্রভু কহে "কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় একস্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে॥"'

অধীর হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য প্রভু স্বরূপকে একটী গান গাহিতে বলিলেন। স্বরূপ তখন মধুরকণ্ঠে প্রভুকে গীত-গোবিন্দের পদ শুনাইতে লাগিলেন,—

"রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং।
স্মরতি মনোমম কৃত পরিহাসং॥"

যিনি বৃন্দাবন-পুলিনে মহারাসোৎসব কালে নানারূপ রস-কৌতুক ও পরিহাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অদ্য আমার চিত্ত সেই হরিকে স্মরণ করিতেছে।

গীত শুনিয়া প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং অষ্টসাত্ত্বিক ভাব-সমূহ তাঁহার অঙ্গে প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রভুর শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই,—প্রভু আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বহুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। তখন রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর শ্রম বুঝিতে পারিয়া শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

প্রাণপ্রিয় বন্ধু বা স্বজন যখন হৃদয় আঁধার করিয়া কোনও দূরদেশে চলিয়া যায় তখন ব্যাকুল হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চায় না। তখন অবিরাম অশ্রুর প্রবাহে স্মৃতির তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগেনা। বিরহ-অনলের তীব্রদাহ কালক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসে বটে কিন্তু অন্তরের তুষানল একেবারে নির্ব্বাপিত হয় না, ধীরে ধীরে জ্বলিতে থাকে। সে অনল একেবারে ভস্মীভূত করেনা বটে, কিন্তু তাহাতে বিলক্ষণ জ্বালা বিদ্যমান থাকে। অতীতের কতকথা তখন সামান্য কোন সূত্র ধরিয়া স্মৃতিকে আলোড়িত করে। সাগরাভিমুখী নদী-প্রবাহের ন্যায় অন্তরাত্মা বাঞ্ছিতের মিলনাকাঙ্ক্ষায় কেবল ঘুরিয়ে বেড়ায়। প্রিয়তমের চিহ্নিত কোনো বস্তু তখন নয়ন-গোচর হইলে অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায়

তাহা বিরহ-সন্তাপকে অধিকতর প্রবল করিয়া তুলে। শ্রীচৈতন্যের বিরহাকুল প্রাণ প্রেমাস্পদের মিলন-আকাঙ্ক্ষায় অধীর আগ্রহে সেইরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বর্ষা-বিধৌত কদম্ব-কোরকের মনোহর শোভা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ নব-অনুরাগে রঞ্জিয়া উঠিত; দিগন্তে নব-বর্ষার শ্যাম-মেঘ মালা এবং তাহার শীর্ষদেশে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার কৃষ্ণের রূপ মনে পড়িত। তিনি বিভোর নয়নে সেই দৃশ্য—সৌন্দর্য্য পান করিতেন। অশ্রুধারে নয়ন-যুগল প্লাবিত, তিনি প্রসারিত হস্তে মেঘের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখা দিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে মিনতি জানাইতেন। কুসুমিত উদ্যান-শোভা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনের কুঞ্জ তাঁহার মনে পড়িত, নদীর কুলুকুলু প্রবাহের মধ্যে তিনি যমুনার কল্লোল-গান শুনিতে পাইতেন। পত্র-শ্যাম তমাল-তরুর নিবিড় শোভা সন্দর্শনে যখনই তাঁহার কৃষ্ণ-স্মৃতি মনে উদিত হইত, তখনই প্রেম-পূরিত শ্লোক ও কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তমাল-তরুকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিবার জন্য তিনি ছুটিয়া চলিতেন।

মহাপ্রভুর এই বিরহ-লীলা নিগূঢ় সাধনতত্ত্বেরই অভিব্যক্তি, এবং যুগে যুগে তাহা ভক্তসাধকগণের ভাব-সাধনার সহায়। ইহার অপূর্ব্ব স্ফুরণ পরিণতি লাভ করিয়াছে সঙ্গীত ও কাব্য-রসের ভিতর দিয়া। যিনি বিশ্বের আদি কবি, যাঁহার অতুল সৌন্দর্য্যের আভাষ এই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি তাঁহাকে জানিবার অধিকারী যাঁহারা তাঁহাদের ভিতর দিয়াই এই অপূর্ব্ব কবিত্বের স্ফুরণ হওয়া সম্ভব। তাঁহাদের দৃষ্টি ও প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনে যে মধুর কাব্য ও সঙ্গীত তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে তাহা শুধু সেই মধুরতম আদি কবির প্রতি অর্ঘ্য-নিবেদন।

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রম-সংশোধন

গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের—"Bird of Fire" শীর্ষক ইংরেজি কবিতার তৃতীয় ষ্ট্যানজার চতুর্থ লাইনটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে না থাকায় ছাপা হয় নি। সেই লাইনটি এই—A ruby of flame-petaled love in the silver-gold altar-vase of moon-edged night and rising day.

বিঃ সঃ

পদ্মিনী

শ্রীআশীষ গুপ্ত

প্রারম্ভেই একটা কথা বলিয়া রাখি, আমার দেহ অতিরিক্ত রকমের সুস্থ সবল, মন ততোধিক,—এবং আমি যে বিজ্ঞান কলেজের ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ছাত্র অতএব কবিকল্পনাতে ও দিবাস্বপ্নে একান্ত অনভ্যস্ত এই কাহিনী পাঠ করিবার পূর্ব্বে সে অপবাদটা জানিয়া রাখাও অত্যাবশ্যক। কিন্তু তবুও সুস্থ শরীর বাহাল, তবিয়ত, পূর্ণজ্ঞান এবং জাগ্রত বুদ্ধির প্রতিকূল চতুঃসীমায় বাস করিয়া এই কলিকাতা সহরের বুকের 'পরে বসিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে এমন ঘটনাও ঘটে!

সেই যে ভবানীপুরে রসারোডের উপর গলির মোড়ের বাড়ী তাহার পানে একবার চাহিলে আর চোখ ফিরাইবার জো নাই। রাস্তার দিকের জানালা দরজা সমস্তই উন্মুক্ত, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি কখনই তাহাদের বন্ধ দেখি নাই। বাহিরের সদর দরজার ভিতর দিয়া অন্দরমহলের দ্বার চোখে পড়ে,—ভিতরে সুপ্রশস্ত উঠান, উঠানের কোলে বারান্দা, বারান্দা বেষ্টন করিয়া সারি সারি ঘর। প্রতি গৃহের বারান্দার দিকের দ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু অন্য সব জানালা বন্ধ বলিয়া ভিতরটা গভীর অন্ধকার। এদৃশ্য আমি নিত্য দেখিয়াছি,—কিন্তু কখনও একটি মানুষের ছায়া অবধি চোখে পড়ে নাই।

প্রথম দর্শনেই বাড়ীটার প্রতি এক অদ্ভুত ধরণের আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। ছাদের আলিসার কোণে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্যে শ্যাওলা জমিয়াছে। গোলাপী রঙের প্রাচীনতার মাঝে বর্ণহীনতার প্রলেপ দেখা যাইতেছে জানালার সবুজ রঙ ধুইয়া গিয়া কাঠের আঁশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথায় যে অসামান্যতা তাহা ভাবিয়া পাইলাম না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুর্নিবার কৌতূহল জাগ্রত হইয়া রহিল,—ওই পথ অতিক্রম করিবার সময় এই গৃহের প্রতি বারেক দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া যাওয়া আসার আর উপায় রহিল না।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আমার যেন একটা আতঙ্ক জন্মিয়া গেল! প্রত্যহ দেখি গৃহদ্বার একইভাবে উন্মুক্ত, উঠানের ঘরগুলির দরজাও তাই, তাহারই মধ্য হইতে বন্ধ গবাক্ষ প্রকোষ্ঠের অন্ধকার যেন ভ্রূকুটি করিতে থাকে। মনে হয়, বাহিরের এই মুক্ত রূপেই ইহার সমাপ্তি নয়,—ইহাতে ভুলিলে ওই গভীর অন্ধকারের ঘূর্ণাবর্ত্তে ডুবিয়া মরিতে হইবে,—এমনই করিয়া লোক ঠকানোই যেন ওই বাড়ীটার ব্যবসা!

সেইদিন হইতে আমার নিকট এই গৃহের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে।

কলেজে যাওয়া আসা এবং অন্যান্য কারণে কখনও গাড়ীতে কখনও পদব্রজে এই গৃহের সম্মুখ দিয়া দিনের মধ্যে একাধিকবার যাতায়াত করিতে হয়। ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হই, কি এমন রহস্য ইহার অন্তরালে লুক্কায়িত আছে, কি ইহার গোপন ইতিহাস, লোকলোচনের দুর্নিরীক্ষ্য কি এমন এই গৃহের কাহিনী যে ইহার সম্বন্ধে আমার শঙ্কা ব্যাকুলতার সীমা নাই! কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশই এমন জটিল হইয়া উঠিতেছে যে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একরকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় অথচ না থাকে কৌতূহলের শেষ না রহে সন্ত্রাসের পরিসীমা।

চিত্তের এই দ্বিধাগ্রস্ত দোলায়মান অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিল।

জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যার রাত্রি। মধ্যাহ্নে অনুভব করিয়াছিলাম কলিকাতা সহরের উত্তপ্ত কটাহে ভগবান যেন আমাদিগকে সযত্নে সিদ্ধ করিতেছেন,—সন্ধ্যার আকাশেরও

থমথমে চেহারা, মেঘ নাই, বাতাস নাই,—চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতিতে একটা দুঃসহ গুমট!

সন্ধ্যার পর ছাদের 'পরে একটা শীতল পাটি বিছাইয়া অন্ধকার গগনতলের দিকে চাহিয়া আছি, ষোল নম্বর বাড়ীর কথা মনে পড়িতেছে। আজ দ্বিপ্রহরে কলেজে বসিয়া স্থির করিয়াছি কাল সকালে ছাত্রপড়ানো চাকুরীর অজুহাতে ষোল নম্বরের গৃহস্বামীর সহিত আলাপ করিয়া ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া তুলিব। মনে হইতেছে গৃহ যখন বটে তখন যেমনই হউক একজন গৃহস্বামী তাহার থাকিবেই,—আজিকার রাত্রি ত প্রভাত হউক তাহার পর কাল প্রত্যুষে তাহার সহিত আমার বোঝাপড়া।

কিন্তু কেন এমন হইল! আমি সবল, স্বাস্থ্যবান বিজ্ঞানের ছাত্র, চুলচেরা প্রমাণ ব্যতিরেকে নিজের চোখ কানকেও বিশ্বাস করি না,—অঙ্ক কসিয়া হিসাব-নিকাশ করিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকেও ভ্রম ত্রুটির জগৎ হইতে সত্য সিদ্ধান্তে উত্থিত করার চেষ্টা করি,—সেই আমার 'পরে একি স্নায়ুর আক্রমণ!—কিন্তু কাল সকালে ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া তবে আমার শান্তি।

তবুও কেবলই মনে হয়, রহস্যটা কি। কারণ সত্য সত্যই ইহাকে স্নায়ুর অত্যাচার এবং অলীক কল্পনা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না, দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি না। চন্দ্রহীন নভঃতলে নক্ষত্রগুলা তন্দ্রালু আলস্যে নিষ্প্রভ হইয়া রহিয়াছে। সেইদিকে চাহিয়া আমি আমার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি।

অকস্মাৎ শীতল পাটির 'পরে উঠিয়া বসিলাম,—সংশয় মাত্র রহিল না যে এইবার সুস্পষ্টভাবে সকল গোপন কথা বুঝিতে পারিতেছি!—ওই যে ষোল নম্বর ভবনের কাহিনী তাহা অত্যন্ত কুৎসিত কাহিনী,—সেই অপরিচ্ছন্নতা কেবল মাত্র ওই বংশের রক্ত যাহাদের দেহে প্রবাহিত তাহাদেরই সহ্য হইবার কথা,—সেইজন্যই ইহাদের তিন তিনটা বধূ ভিন্ন সংসার হইতে আসিয়া পর পর আত্মহত্যা করিয়া আত্মরক্ষা করিল, এ বস্তু অন্য ঘরের মেয়ের সহিল না। একজন মরিল বিষ খাইয়া, একজন মরিল গলায় দড়ি দিয়া, একজন মরিল জলে ডুবিয়া। মনে হইল, আমাদের ছাদের সিঁড়ির দরজার নিকট আসিয়া সেই তিন বধূ যেন কঠিনমুখে বলিতেছে, আমরা বাঁচিয়াছি!

সম্মুখপানে চাহিয়া আমি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলাম। ষোল নম্বর ভবনে যে নরকের একটি উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা সহসা স্বচ্ছ হইয়া গেল। কত পাপ, কত অনাচার যে ওই গৃহের অধিবাসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার আর যেন ইয়ত্তা নাই,—সারা সহরের লোকের নিশ্বাস যেন ওই বাড়ীটার উপর দিয়া বহিয়া গেছে। মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত অনুভব করিতে লাগিলাম, আধুনিক কায়দায়, অসরল ভঙ্গীতে তাহাদের সমর্থন করিতে পারি, তাহাদের কৃত কর্ম্মকে শিল্পকার্য্যে অথবা সৃষ্টিকার্য্যে রূপান্তরিত করিতে পারি এমন উপায়টি অবধি তাহারা রাখে নাই। চাহিয়া দেখি, তিন বধূ তখনও সোপানপ্রান্তে দাঁড়াইয়া—মধ্যবর্ত্তিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সকল কথা জান্‌তে চাও?"

জোরের সহিত বলিলাম, "না, সে সংবাদ জেনেও আমার কিছু কর্‌বার নেই—"

আহ্লাদীর আহ্লাদী নামটি আমারই দেওয়া, সোহাগ করিয়া রাখি নাই, সুতীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিয়াছিলাম এ নাম ছাড়া তাহাকে মানায় না, এ যেন তাহার পক্ষে অনিবার্য্য! তাহার আদর্শ পিতামাতা কন্যারত্নের নামকরণ করিয়াছিলেন পদ্মিনী। ষোল নম্বরের নরককুণ্ডের মধ্যে আহ্লাদীই অপেক্ষাকৃত পুণ্যাত্মা লোক, অর্থাৎ মাংসাশী হইলেও সে এখন পর্য্যন্ত হাড় বাদ দিয়া চলে। আহ্লাদীর গায়ের রঙ ফরসা এবং শরীরের গঠন কিঞ্চিৎ পুষ্ট কিন্তু যেমন কুৎসিত তাহার চালচলন, তেমনই অমার্জ্জনীয় তাহার চেহারা।

আহ্লাদী ফোঁপাইতে লাগিল, বেশীক্ষণ ধরিয়া স্নান করার জন্য চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই কোণে কয়েক ফোঁটা জল চকচক করিতেছে,—মনে হয় যেন আমাদের শশী চাকরটা কলতলা হইতে টোম্যাটো ধুইয়া লইয়া আসিল! এই তরুণী নারীর জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার ভাণ্ডারে এত সৌন্দর্য্যও সঞ্চিত ছিল। একটা কথা, আহ্লাদী যে নারী তাহাতে সংশয় নাই এবং সে যে তরুণী সে বিষয়েও

সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদী-সম্মত এবং এই দুইটা দুর্লভ গুণ সম্বন্ধে আহ্লাদী অতি সচেতন। তাঁহার এই সচেতন বুদ্ধির মাধুর্য্য আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছি। কারণ আহ্লাদী আমার প্রেমে পড়িয়াছে! ব্যাপারটা এমন কিছু নূতন নয়,—আমার নিজের কথা বলি নাই, আহ্লাদীর দিক হইতে বলিতেছি! প্রেমিকতার তৃতীয় শ্রেণীর উন্মত্ততায় আমি অংশ গ্রহণ করিতে পারি একথা অতবড় ধূর্ত্ত বংশের কন্যা হইয়াও আহ্লাদী যে কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাই আমি ভাবি,—অন্য যে কোনও লোকের তুলনায় আহ্লাদী বহুগুণে ওস্তাদ হইলেও সে যে তাহাদের আপন কুলের কলঙ্কস্বরূপ তাহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই! —কিন্তু এই প্রেমের ব্যাপারটা আমার পক্ষে অভিনব এবং চমকপ্রদ হইলেও যে-আহ্লাদী বিশ্বমানবকে প্রেম নিবেদন করিয়া বেড়ায়, তাহার দিক হইতে এমনই বা কি! মোটের উপর আহ্লাদীর মলিনতার অপেক্ষাও তাহার স্থূলতায় যেন শঙ্কিত হইয়া উঠিতে হয়!

কিন্তু মাঝখানের কথাগুলার পূর্ব্বে সে ফোঁপাইতেছিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁপানোতে মুখচোখের কাঁচা রং ধুইয়া মুছিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে, চোখের কাজল গণ্ডদেশে পৌঁছিয়াছে, মুখের রং পাঁচমিশেলী হইয়া উঠিয়াছে। তা হউক, ঘর যখন পুড়িতেছে তখন জুতার সন্ধান করা নবাবী আমলে পোষাইত, একালে তাহা অচল। প্রেমপাগলিনী আহ্লাদী তাহার টয়লেট অগ্রাহ্য করিয়া ফোঁপাইতে লাগিল, বাঘের থাবার ন্যায় তাহার কোমল করপল্লবে আমার দুই হাত ধারণ করিয়া বলিল, "আমায় তুমি ত্যাগ কোরো না—"

অত্যন্ত ভড়্‌কিয়া গিয়া বলিলাম, "নেঃ ব্‌বাবা—"

কথাটা সাধু বাংলা নয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিখি নাই, কিন্তু জীবনের এই সকল অনুপ্রাণিত মুহূর্ত্তে কোন মানুষের মুখ হইতে শুদ্ধ ভাষা বাহির হইয়াছে বলিয়াও আমার জানা নাই,—অতএব বিশ্ববিদ্যালয় যদি ও জিনিষ আমাদের না শিখাইয়া থাকে ত সে দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের, আমার নয়।

সে হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল, তাহার নাকের শ্লেষ্মা আমার হাতের 'পরে উদ্যত হইয়াছে এমনই সময়ে এক বিরাট হাঁচি!—চমকিয়া উঠিলাম, আহ্লাদীর কি সকলই অদ্ভুত!

কান্না থামাইয়া সে আমাকে চিমটি কাটিল, এবার আমার মুখ দিয়া যে শব্দ বাহির হইল তাহা প্রকৃতই দুঃখের! —আহ্লাদী কহিল, "তোমার রোগবালাই সব তুলে নিলাম"

নিজেই সংবাদ দিল, "কাল থেকে একটু সর্দ্দির মতন হ'য়েছে—"

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের সুযোগ পাইয়া সহসা উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম, তাহার স্বাস্থ্যের জন্য আমার আর দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না, কহিলাম, "সর্দ্দি হ'য়েছে ত এই অবেলায় স্নান করে' এলে কেন?"

আহ্লাদীর নাকের শ্লেষ্মা আবার আমার ভীতি উৎপাদন করিল, হাঁউমাউ করিয়া কাঁদিয়া সে কহিল, 'বেঁচে আর কি হ'বে?—তোমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আমি আর এ জীবন রাখ্‌ব না—"

শুনিয়া খুব যে চিন্তিত হইলাম তাহা নহে,—কেবল মনে হইল, আমি বাঁচিয়া থাকিতে কি সে শুভদিন আসিবে!

সে কহিল, "তুমি কিছুতেই আমাকে ত্যাগ করতে পারবে না—"

বুকের ভিতরটা আমার কাঁপিতে লাগিল, ভাবিলাম গ্রহণ করিলামই বা কবে?

—চাহিয়া দেখি, প্রভাত হইয়া গেছে! মেঘ্‌লা দিনের সকাল, সূর্য্যের আলো দেখা যায় না, বাহিরে টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বুকের কাঁপন কিন্তু তখনও আমার থামে নাই,—স্বপ্নে-দেখা আহ্লাদী যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই হাত মুঠা করিয়া আমাকে শাসাইতে লাগিল।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে ষোল নম্বর গৃহের ভয়াবহ মলিনতা আহ্লাদীর কৃপায় প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আমার কাছে এই 'বার্লেস্ক্‌' কোনও ট্র্যাজেডির চেয়ে কম মর্ম্মান্তিক নহে,—এবং পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যাকালে এই গৃহ সম্বন্ধে যে সকল কথা আমার নিকট অতিশয় সহজ হইয়া গেছে তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, ওই উন্মুক্ত দ্বারের

প্রহসন দিয়া যাহারা গৃহ প্রবেশ করে অন্ধকার গৃহের কুৎসিত ট্রাজেডিতে ঘটে তাহাদের পরিসমাপ্তি। অতএব রাত্রিবেলা যে সহসা-দৃষ্টা আহ্লাদী আমার প্রতি এমন করিয়া দরদ জানাইয়া গেল, তাহার কথা স্মরণ করিয়া আমি মনে মনে কাঁটা হইয়া রহিলাম,—স্বপ্নালোকের সেই কুৎসিত নারী যে বিড়ালের থাবার কাজ করিতেছে এই আশঙ্কায় আমার মনে আর শান্তি রহিল না!

কলেজে যাওয়ার সময় বাড়ীটার দিকে চাহিয়া আজ যেন আবার তাহার নূতন মূর্ত্তি দেখিলাম,—সে মূর্ত্তি নিরতিশয় লজ্জার, দুঃসহ বেদনার,—সমস্ত সহরের লোকের যেন ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নাই,—এই গৃহের লোক গুলাকে যেন সকলে মিলিয়া 'লিঞ্চ্' করিবে। ভাবিলাম, কেমন করিয়া ইহারা বাঁচিয়া আছে,—কেমন করিয়া ইহারা দিন কাটায়, কেমন করিয়াই বা ইহাদের চোখে ঘুম আসে! কিন্তু বেশীক্ষণ ওই গৃহের দিকে তাকাইয়া থাকিতে সাহস হয় না,—রক্ত-মাংসের আহ্লাদী যদি ভাগ্য-বিড়ম্বনায় সত্যই আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে যে নিমেষ মধ্যে আমি পাষাণে রূপান্তরিত হইয়া যাইব ইহা যেন অবধারিত। অতএব এতদিনের মধ্যে আজই সর্ব্বপ্রথম ভিন্নদিকে চাহিবার চেষ্টা করি, এবং গাড়ী পথ অতিক্রম করিতে থাকে।

অধ্যাপক কহিলেন, "জগদীশ, তোমার জন্ম একটা ভালো চাকুরী জুটিয়েছি,—এ্যাডভাইজিং কেমিষ্টের কাজ, বিকেলবেলা গিয়ে ঘণ্টা তিনেক দেখাশোনা করলেই হ'বে, শ' দেড়েক টাকা মাইনে,—রাজী আছ ত?"

বলিলাম, "এক্ষুণি স্যার্,—বাবার পেন্‌শানের উপর আর কতকাল বোঝা হ'য়ে থাকৃব?—কিন্তু চাকরীটা কোথায়?"

"আমারই এক পরিচিত লোক অবশ্য পরিচয় অত্যন্তই অল্প,—একটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কন্‌সার্ণ গোছের কর্‌বার মতলবে আছি,—টাকাওয়ালা মানুষ,—একজন ভালো ষ্টুডেন্ট্ চায়, ওর জন্ম কেমিষ্টদের পরামর্শদাতা হিসেবে,—আমায় বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে গিয়েছে,—তোমাকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তার আর দরকার নেই, কাল এসো আমার বাড়ী,—নিজেই নিয়ে যাব'খন, একটু জোরও হবে তাতে। আমায় ভালো করে' বুঝিয়ে দিয়ে গেছে বাড়ীটা কোথায়, কিচ্ছু অসুবিধে হ'বে না।"

—পরদিন সকালবেলা অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার গাড়ীতে গলির পর গলি অতিক্রম করিয়া যখন বাড়ীটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার হৃৎস্পন্দন থামিয়া গেছে! ষোল নম্বর গৃহের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া অধ্যাপক ডাকিলেন, "এস জগদীশ—" বলিয়া উন্মুক্ত দ্বারপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমি পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় সেই রাস্তার 'পরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই গৃহের সকল কাহিনী মনে পড়িল, সর্ব্ব গ্লানি, সকল কদর্য্যতার কথা,—সোপানপ্রান্তবর্ত্তিনী বধূ তিনটি চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের পিছনে আসিয়াছে আহ্লাদী!

আমার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতে থাকে, থাকিয়া থাকিয়া পায়ের নখ হইতে কেশাগ্র অবধি একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় শিহরিয়া ওঠে। মনে হয় বারেক যদি ওই গৃহে প্রবেশ করি তাহা হইলে সৌভাগ্যক্রমে যদি আর কিছু না-ও ঘটে তাহা হইলেও আহ্লাদী আমায় পুরাপুরি গিলিয়া খাইবে!—উল্লসিত হইয়া উঠিবার মত সম্ভাবনা বোধ করি ইহা নহে।

অধ্যাপকের গাড়ীর ড্রাইভার আমার দিকে বিস্মিতনেত্রে একদৃষ্টে চাহিয়া কি যে ভাবে সে-ই জানে। কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গী ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে, লোকটার চোখে মুখে নির্লজ্জ কৌতুহলের চিহ্ন। একবার মাত্র সেই দিকে তাকাইয়া মানুষ যেমন করিয়া আত্মহত্যা করিবার জন্ম সহসা আগুনে ঝাঁপ দিয়া বসে, ঠিক তেমনই করিয়া ওই অভিশপ্ত গৃহের উন্মুক্ত দ্বারপথে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় ছুটিয়া প্রবেশ করিলাম।

শ্রীআশীষ গুপ্ত

সমস্ত কাজের অবসরে—

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

সমস্ত কাজের অবসরে—
একান্তে নিরালা প্রান্তে এই ছোট ঘরে
তোমায় আমায় দেখা,—বন্ধন বিহীন
ব্যবধান স'রে যায় ;—অনন্ত অসীম
বিস্তৃতা বিপুলা ধরা—তারি' এক কোণে
আসন পাতিয়া রাখি,—সেটুকুর সনে
আর কারো যোগ নাই।
অন্যপ্রান্তে তার
ধরণীর সুখ দুঃখ ক্ষুব্ধ হাহাকার
তরঙ্গিত হয়ে ওঠে ;—সে কাঁপন শুধু
বাহিরে মর্ম্মরি' ফেরে—লাগে নাকো বঁধু
অন্তরের পদ্মদলে। একা সে মন্দিরে
আমি শুধু পূজারিণী ; ওই—ঘুরে ফিরে
সংসারের শতঝঞ্ঝা নিস্ফল আক্রোশে
নিয়ত খুঁজিয়া মরে—একান্ত নিঃশেষে
লুপ্ত করি দিতে চায়—নিতে চায় হরি'
সমস্ত দিবস মোর—সমস্ত শর্ব্বরী
আপনার মুষ্টি তলে!

তাই ভয়ে ভয়ে—
পলাইয়া আসি এই গোপন নিলয়ে
জগতের আঁখি আড়ে ; হেথায় বাতাস
আনে খোলা বাতায়নে মুক্তির নিঃশ্বাস
আনে স্বস্তি নির্ভরতা, যেন মনে হয়—
'আজো আছি বেঁচে আছি, হইনিকো লয়
সংসারের চক্রতলে।' হেথা বাতায়নে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকি—মৃদুল স্বপনে
কাঁপে বায়ু—কাঁপে পাতা ; ওই দূরে গাছে
সবুজের বুকে বুকে স্বপ্ন রচিয়াছে
বিচিত্র রক্তিম ফুল ; সমুখে আমার
বিসর্পিত পথরেখা—শেষ প্রান্ত তার
কে জানে থেমেছে কোথা!

সেথায় কি তব—
ত্রিদিব বাঞ্ছিত পুরী—নিত্য অভিনব
সৌন্দর্য্যের রাজধানী ? সে কি বসন্তের
বিচিত্র উদয়াচল,—সেই কি অস্তের
শান্তিময় স্নিগ্ধ নীড় ?
প্রশ্ন জাগে মনে,—
থেকে থেকে স্বপ্ন টুটে—কিসের গুঞ্জনে
চমকি ফিরিয়া চাই ;—কার পদধ্বনি
কাণে কাণে দিয়ে যায় নূপুর রণণি
আশার সে পূর্ব্বাভাস !

মরি—মরি—মরি
এ তোমারি ফুল গন্ধি রঙিন উত্তরী
ছুঁয়ে গেল এলো চুলে ; আর ভুল নয়—
এসেছ এসেছ তুমি তারি পরিচয়
সর্ব্বাঙ্গে ভরিয়া গেল !
মোর রাত্রি দিন
এই অনুভূতি করে মধুর রঙিন্
জীবনে বৈচিত্র্য আনে—সংসার ভোলায়
আশার আশ্বাসে নিত্য ব্যথারে রঙায় !

কল্পনা দেবী



পরশমণি

শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত, এম্-এস্-সি

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এমন একটি যুগের সহিত পরিচিত হই, যে যুগে জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতগণ জ্ঞানে, বিচারে এবং বুদ্ধিতে সম্যক্ উন্নত হইয়াও একটা মিথ্যা হেঁয়ালির রহস্যজালে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই রহস্যময় যুগ কবে কোন্ দেশে কি কারণে প্রারব্ধ হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে প্রতি দেশেই এই যুগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথা বিচার করিলে দেখা যায় যে ভাবের আদান-প্রদানই অধুনাতন জ্ঞান চর্চ্চার পরম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই যুগে, (যাহার সন তারিখ দিয়া ইতিহাস মিলাইবার পথ রুদ্ধ,) পরম পণ্ডিতগণও অপরাপর পণ্ডিত হইতে নিজের শ্রমলব্ধ জ্ঞান গোপন করিয়া বিশিষ্টতা বা শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী ছিলেন। আজকাল ভাবের আদান-প্রদানই জ্ঞানবিকাশের শ্রেষ্ঠ নিয়ামক ; কিন্তু প্রাচীন যুগে ইহাই ছিল শ্রেষ্ঠ পরিপন্থী। ফলে, জ্ঞানচর্চ্চার মূলে যে সব হিংস্র অনুষ্ঠান, যে সকল লোমহর্ষণ ষড়যন্ত্র ও যে সকল নিষ্ঠুর নরহত্যার অভিনব লীলা চলিতেছিল, রসায়নের ইতিহাসে তাহা বাস্তবিকই ভয়ানক।

সভ্যতা যেমন একই সময়ে সকল দেশে আত্মবিকাশ করে নাই, সেই রহস্যময় জ্ঞান-চর্চ্চার যুগেরও একই সময়ে সকল দেশে আবির্ভাব হয় নাই। ইউরোপীয় রসায়নে ইহার নাম Alchemical Era এবং ইহারই ভারতীয় নাম তান্ত্রিক যুগ। Alchemy ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বা তন্ত্র একই জিনিষ বা বিদ্যা কিনা, ইহাতে মতভেদ থাকিতে পারে ; তবে এই দুইটীরই লক্ষ এক,—এই হিসাবে এই দুইটীকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে।

কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য রসায়ন, এই দুইটীরই জাতচক্র যদি মিলাইয়া দেখা যায় এবং দুটীরই শৈশবের ইতিহাস একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে অতি পুরাকালে এই রসায়নী বিদ্যা বনচারী ঋষি ও সঙ্গত্যাগী ধর্ম্মযাজকদের একটা গোপন বিদ্যা ছিল। কি উদ্দেশ্যে বা কি প্রচেষ্টায় তাহারা এই বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তাহা একবাক্যে আজকাল বিদ্বজ্জন স্বীকার করিয়া থাকেন যে সেই উদ্দেশ্য বা চেষ্টা ছিল সুধু অমৃতের বা Elixir of life-এর সন্ধান। ভারতীয় সেই সব ঋষিগণকে তান্ত্রিক এবং ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকগণকে Apothecary বলা হইত। সেই পরম ভেষজের সন্ধান কখনও মিলিয়াছিল কিনা, জানা যায় না, কারণ সেই সব তন্ত্র গ্রন্থ লুপ্ত বলিয়াই অনেকে মনে করিয়া থাকেন এবং যাহাও বা পাওয়া যায়, তাহা হইতেও নাকি কোনও রূপ সার সংগ্রহ করা যায় না। তবে এই একটী সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় যে, সেই পরম ভেষজের সন্ধান না পাইলেও তৎকালীন পণ্ডিতেরা এমন কিছুরও একটা সন্ধান পাইয়াছিলেন যাহা মানুষকে অমৃতত্বে না নিতে পারিলেও মৃত্যুর অকাল অবিচার হইতে রক্ষা করিয়া চিরযৌবন সুখ সহ মানুষকে বহুবর্ষ পৃথিবীতে বিচরণ করিবার সুযোগ দান করে। সেই মহদ্দ্রব্য আজ লুপ্ত। সন্দিগ্ধ আধুনিকদের মতে ইহা কল্পনা বা নিছক গাঁজাখুরি। সে যাহাই হোউক্, আজকাল যাঁহারা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা হয়ত এই কল্পনাকে উপহাস করিতে চাহিবেন না। তান্ত্রিকদের সেই পরমৌষধির সমসাময়িক আর একটী মহদ্দ্রব্যের গুণগান আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ইহাও তন্ত্র বা মন্ত্রবাদীদের কল্পনা-প্রসূত কিনা ইহা লইয়া বহু বিচার হইয়াছে এবং এখনও

চলিতেছে। এতদ্ প্রবন্ধে সেই পরম পদার্থটীর গুণগান করিব। এই পদার্থের নাম পরশমণি বা Philosopher's stone। এই মহাপদার্থের নাম হইতেই সেই সুদূর রহস্যময় যুগের নাম তান্ত্রিক যুগ বা Alchemical Era। এই স্থলে নিতান্ত প্রাসঙ্গিক না হইলেও বলা প্রয়োজন যে ভারতীয় তান্ত্রিক যুগ ইউরোপীয় Alchemical Era হইতে বহু সুপ্রাচীন এবং বস্তুতঃ ইউরোপীয়েরা এই তান্ত্রিক মত আরবদের মধ্যস্থতায় গ্রীক্‌দের নিকট হইতে ধার করে এবং আরবেরা যে ভারতীয় তান্ত্রিক হইতে সেই সব তন্ত্র মত সংগ্রহ করিয়াছিল, রসায়ন ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ইহা হইতে সম্পূর্ণ প্রতীত হইবে যে ভারতীয় তন্ত্র ও ইউরোপীয় Alchemy একই বিজ্ঞান,—নিতান্ত নিকট অধস্তন জ্ঞাতি। বাস্তবিক পক্ষে আল্‌কেমিয় প্রথা ও তন্ত্রানুশীলন যে একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন করা যায়।

Alchemy সম্বন্ধে জনৈক ইউরোপীয় লেখক লিখিয়াছেন —'Alchemy appears to have been a medieval system of philosophy and it sought to demonstrate the validity of its doctrines concerning the cosmos by transmuting the baser metals into gold.' এই উক্তি হইতে সহজে প্রতিপন্ন হয় যে ভারতীয় তন্ত্র Alchemy হইতে কতক বিভিন্ন। কারণ তন্ত্রশাস্ত্রে অন্যূন ১৫৬টী বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত, তন্মধ্যে 'বস্তুবিচার'টিকেই Alchemy সদৃশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু ভারতীয় তন্ত্রের প্রতিপাদ্য অনেক বিষয়ই নিছক কথার আড়ম্বর নয়,—ইহার মধ্যে বহু সত্য আছে, যাহা আধুনিক রাসায়নিক প্রণালী দ্বারাও প্রমাণ করা যায়। কিন্তু Alchemy সম্বন্ধে ইহা খাটেনা, সেই জন্যই ইউরোপীয় প্রাচীনগণের নৈরাশ্যপূর্ণ উক্তি যথা :—'There were many deceivers, but no true philosophers.' ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে N. Lemery লিখিয়া গিয়াছেন :—'They professed an art, the beginning of which was deceit, the progress of which was falsehood and the end beggary. ভারতীয় কোনও তান্ত্রিক লেখক্‌কেই কোন ভারতীয় charlatan বা imposter বলিয়া অপবাদ দিতে সাহসী হন নাই বা হইবেন না। অতএব তন্ত্র যে Alchemy হইতে শ্রেষ্ঠ ইহা সহজেই অনুমিত হয়।

কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সবদেশেই পৌরাণিক দার্শনিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে জড়পদার্থ পঞ্চভৌতিক—পাঁচটী ভূত বা 'ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোমঃ' ইত্যাদি করিয়া পাঁচটী different element দ্বারা জড়-পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই উক্তি অকাট্য কিনা, ইহার বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন; তবে আধুনিক মতবাদ এই যে জড়পদার্থ একই Element এর বিচিত্র বিবর্ত্তন দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাকে বলে Unitary theory of matter। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাচীন তান্ত্রিকেরা কি এই মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া ধাতুর অবস্থান্তরাপত্তি বা Transmutation of metals এই মতবাদের প্রচার করিয়াছিলেন? বিশেষজ্ঞদের মতের উপর নির্ভর করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, 'The idea did not originate from the philosophical views of the ancients on the unity of matter, but rather from the attempts of goldsmiths to make fraudulent substitutes for the precious metals.' অধুনা পরশমণির অস্তিত্ব বিদ্বজ্জনমাত্রেই অস্বীকার করেন এবং কখনও যে ইহা ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণাভাব আছে। কিন্তু পরশমণির কল্পনা প্রাচীনদের মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে বস্তুজগত ছাড়াইয়া ইহা মানুষের মনোজগতেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে। পরশমণি নামক মহামণির সংস্কার প্রভাব প্রাচীন গ্রাম্যকবিদের পাঁচালীতে দৃষ্ট হয় এবং অধুনাতন এক গ্রাম্য বাউলের মুখের একটি ছড়া এই :—

"সে হয়েছে মানুষরতন সব থুয়ে যার কিছু নাই।
পরশমণি, সরসধনি, প্রেমসাগরে খেল্‌ছে লাই॥"

যাহা হউক, পরশমণি বলিয়া যে কোন বাস্তব পদার্থ ছিল না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। তাই

পরশমণির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কবির এই উক্তিটুকুই যথেষ্ট—'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর'।

এখন নিকৃষ্ট ধাতুকে উৎকৃষ্ট ধাতুতে রূপান্তরিত করা—এই ধারণা প্রাচীনদের মনে কি ভাবে আসিল, ইহার আলোচনা করা যাক্। খনিজ সীসক ধাতুর সহিত স্বর্ণ বা রৌপ্য আংশিক ভাবে বিদ্যমান থাকে। যখন খনিজ সীসক ধাতুকে গলাইয়া বা অন্য কোনও রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সীসক ধাতুতে পরিণত করা যায়, তখন সীসকের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্য বা স্বর্ণের টুক্‌রা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনগণ এই তথ্যটুকু অর্থাৎ খনিজ সীসক ধাতুতে (Lead ores) যে রৌপ্য ও স্বর্ণ সংমিশ্রণ থাকিতে পারে ইহা জানিতেন না, তাই তাহারা মনে করিয়াছিলেন, ধাতব সীসকেরই একটী অংশ বুঝি সেই প্রক্রিয়ার ফলে রৌপ্য বা স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, লোহার বাসনকে তাম্রখনিতে কিছুদিন রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে লোহার বাসনটীর উপরে তামার ছাউনি বা আবরণ পড়িয়াছে। প্রাচীনগণ এই Electro deposition বা ধাতু পদার্থের বৈদ্যুতিক ন্যাস সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, তাই তাহারা মনে করিতেন যে লোহার বাসনটী বুঝি খনিতে রাখায় তাম্রপাত্রে পরিণত হইয়া গেল। এই রূপান্তর প্রাপ্তি দর্শন করিয়াই প্রাচীনগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে বোধ হয় বিশেষ কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে নিকৃষ্ট ধাতুকে উৎকৃষ্ট ধাতুতে রূপান্তরিত করা যায়। ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হইল,—জপ, মন্ত্র, হোম ইত্যাদির সাহায্যে সেই তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধি লাভের চেষ্টা হইল। সেই দুঃসাধ্য তান্ত্রিক সাধনার ফল কি হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ তন্ত্রশাস্ত্র হইতে উদ্ধার করা যায়। ইহা অবলম্বন করিয়া কিছুদিন আগে প্রবাসীতে 'সুবর্ণ' শীর্ষক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে শ্রীজগবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। যে সমস্ত দুরূহ তান্ত্রিক সাধনার উল্লেখ ঐ সব তন্ত্র সংহিতায় আছে, তাহা পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। তবে তাহাতে প্রাচীনেরা কি পরিমাণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানের মাপকাঠীতে এবং বর্ত্তমান ঋষিদের আয়ত্তাধীন প্রচেষ্টার তৌলদণ্ডে তাহার গুরুত্ব যে খুব বেশী নয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

যদি পৌরাণিকগণের প্রতি সুবিচার করিতে হয়, তবে তাঁহাদের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণ বিচার ক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয়। দেবাদিদেব মহাদেব কিম্বা ঋষি দত্তাত্রেয়, এই দুই মহাপুরুষ যদি বাস্তবিকই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক রাসায়নিক হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের উক্তি হইতে দেখা যায় যে তাঁহারা তাম্র, লৌহ, পারদ এই কয়টী ধাতুকেই তন্ত্র, মন্ত্রাদির সাহায্যে সুবর্ণে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধুনাতন বিজ্ঞানের ধ্রুবজ্যোতি যাঁহাদের চক্ষে পতিত হইয়াছে, তাঁহারা বাস্তবিকই বিস্মিত হইবেন যে পৌরাণিক রাসায়নিকগণ কোন্ বিদ্যাবলে তাম্র, লৌহ ও পারদকে সুবর্ণে রূপান্তরযোগ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং অন্যান্য ধাতুগুলিকে কেন অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। নিশ্চয়ই তাঁহারা তাম্র, লৌহ কিম্বা পারদকে কোন না কোন অংশে সুবর্ণের সমধর্ম্মী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। মৌলিক পদার্থের শ্রেণী বিভাগ বা periodic law of elements এবং আনবিক্ গঠন বা Atomic structure এর সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতিক্রমে দেখিবেন যে উক্ত শ্রেণী বিভাগে তাম্র, পারদ, রৌপ্য ও সুবর্ণ একই শ্রেণীভুক্ত ও বহু অংশে সমধর্ম্মী। তাম্র প্রদীপ-শিখায় পুড়াইলে লোহিতশিখা বিকীরণ করে,—স্বর্ণের শিখা হরিদ্রাভ হয়। প্রাচীনেরা লোহিতকে হরিদ্রা বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রক্রিয়া জানিতেন, সেই জন্যই তাম্র স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। অধুনাতন বর্ণচ্ছত্র দ্বারা ধাতু বিশ্লেষণ (Spectrum Analysis) কার্য্যের সহিত ইহার সুসামঞ্জস্য অনুভব করিলে আমরা তান্ত্রিক প্রথাকে একেবারে হেয় চক্ষে দেখিতে পারি না।

আজ পর্য্যন্ত যে সকল ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইউরেনিয়াম নামক ধাতুই সবচেয়ে ওজনে ভারী। ইহার আর একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে ইহা স্বতঃই রশ্মি বিকীরণ-পূর্ব্বক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়প্রাপ্তির কয়েকটী বিভিন্ন স্তর আছে ও এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে একটী নির্দ্দিষ্ট

সময়ের প্রয়োজন হয় এবং সেই সেই বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধাতুর সৃষ্টি হয়। রেডিয়াম ও থোরিয়াম্ নামক দুইটী মহদ্ধাতুরও সেই রকম স্বতঃ ক্ষয় হয় এবং ফলে অন্যান্য ধাতুর সৃষ্টি হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ইউরেনিয়াম ধাতু নিম্নোক্ত প্রকারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিকৃষ্টতর নিম্নতর ধাতুর সৃষ্টি করে।

ইউরেনিয়াম —— ইউরেনিয়াম (ক, খ) — ইউরেনিয়াম ২ ------ আয়োনিয়াম ——— রেডিয়াম——— ——রেডিয়াম (ক—খ,——গ——ঘ——ঙ——চ) —— রেডিয়াম ছ

রেডিয়াম ধাতু নিজেও সেই প্রকার স্বতঃ ক্ষয়ের ফলে রেডিয়াম ছ তে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে রেডিয়াম ছ আর সীসক ধাতু একই পদার্থ ও সমধর্ম্মী,—কেবল মাত্র খনিজ সীসক ধাতু ও ইউরেনিয়াম বা রেডিয়ামের নিকৃষ্টতম নিম্নতম জাতি সীসক ধাতুর গুরুত্বের একটু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। উল্লিখিত ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি চিহ্নিত ধাতু সকলেরও সমধর্ম্মী অন্যান্য ধাতু প্রাকৃতিক জগতে বিদ্যমান আছে এবং পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সম্পূর্ণই প্রতীত হয় যে ধাতুর অবস্থান্তর বা রূপান্তর সংঘটন প্রকৃতির গর্ভে স্বভাবতঃই হইতেছে এবং কি উপায়ে বা কি প্রক্রিয়ায় ইহার সংঘটন হইতেছে, ইহা মানুষ শত চেষ্টায়ও আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই এবং কখনও জানিবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মানুষ অনাগত কাল পর্য্যন্ত সেই পরশমণির আশায় প্রাণপাত করিবে, কিন্তু শত লক্ষ প্রাণের বিনিময়েও সেই মহামণি মানবের করায়ত্ত হইবে কিনা কে জানে।

কিছুদিন পূর্ব্বেও ধাতুর অবস্থান্তরাপত্তি বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় সংঘটিত হইয়াছে, এইরূপ দুঃসাহসিক উক্তি শুনিয়াছি। নিম্নে সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ক্যামারণ ও ব্যায়সে নামক ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদ্বয় তাম্রকে লিথিয়াম ও সোডিয়াম ধাতুতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন,—কুরী ও গ্লেডিস্ নামা বৈজ্ঞানিকদ্বয় ইহার অসত্যতা প্রমাণ করেন, তাঁহারা বলেন, যে পাত্রে এই ক্রিয়া সংঘটিত হয়, সোডিয়াম উহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। র‍্যামসে সাহেবের অনুরূপ আবিষ্কার যথা—রেডিয়াম রশ্মি হইতে নিয়ন (Neon) নামক গ্যাসের উৎপত্তি, রাদারফোর্ড ও বয়েড অস্বীকার করেন,—তাঁহারা যন্ত্র মধ্যস্থ বায়ু হইতে Neon এর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। রেডিয়াম রশ্মি দ্বারা থোরিয়াম ও জারকোনিয়াম (Thorium and Zirconium) দ্রব হইতে র‍্যামসে সাহেব অঙ্গারক গ্যাসের সৃষ্টি করেন, ইহাও রাদারফোর্ড কর্ত্তৃক অস্বীকৃত হয়—যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত Lubricant হইতেই ইহার উদ্ভব বলিয়া ইনি অনুমান করেন। ১৯১৩ সালে র‍্যামসে হাইড্রোজেনকে Neonএ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন, Curie ও Patterson বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের দরবারে ইহার অসত্যতাও প্রমাণিত হয়। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে ধাতু হইতে ধাত্বান্তর প্রাপ্তি মানুষের সাধ্যায়ত্ত কর্ম্ম নহে। ইহার কল কৌশল প্রকৃতি নিজের হাতেই রাখিয়াছেন। সেই জন্যই Francis Bacon লিখিয়াছেন—Nature to be conquered must be obeyed.

পরিশেষে জিজ্ঞাস্য এই যে, পরশমণির দুরাশায় মানুষ যে যুগযুগান্ত ধরিয়া এই পণ্ডশ্রম করিয়া আসিয়াছে, ইহাতে মানবজাতির কিছু লাভ হইল কি? একজন বৈজ্ঞানিক এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, এই যুগান্তর ব্যাপী সাধনার ফলে আমরা যে জানিতে পারিয়াছি যে মৌলিক পদার্থ (Elements) সকল একই আদি পদার্থ হইতে উদ্ভূত এবং তাহাদের একের অন্যের সহিত একটী গূঢ় সম্বন্ধ আছে—ইহাই যথেষ্ট। The spiritual part of Alchemy lives, though Alchemy is dead.

শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত

ভারতের শিল্প ও শিল্পী

শ্রীসুধাংশু চৌধুরী (লণ্ডন)

ভারতবর্ষের সুকুমার শিল্পের পুষ্টি লাভ করার এক কারণ হ'চ্ছে সমাজের উপর ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব। কিন্তু এদেশের কল্পনা-প্রিয় শিল্পীরা কেবল যে ধর্ম্ম নিয়েই মেতে থাক্‌ত' তা নয় তাদের মনের গভীর যোগাযোগ ছিল প্রকৃতির সঙ্গে। সকল দেশেরই শিল্পের মূলতত্ত্ব হ'চ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের রহস্যকে প্রকাশ করা, হুবহু নকল করার চেষ্টা কোন দেশে কোন কালে উচ্চাঙ্গের শিল্প ব'লে স্বীকৃত হয়নি। ভারতের রূপ-রসিকরা শিল্পের সেই মহৎ আদর্শ চিরকাল আঁকড়ে ছিল কারণ শিল্পই ছিল তাদের প্রাণ, নিজেদের অন্তরের ক্ষুধা মিটাবার জন্যই তারা ক'রত সৃষ্টি, লোকসমাজের বাহবা কিংবা তাদের খেলো চাহিদা মিটাবার দিকে তাদের লক্ষ্য ছিল না।

প্রতীচ্যের শিল্পীরা ছিল মুখ্যতঃ বস্তুতন্ত্রবাদী, ফলে তাদের উপর বৈজ্ঞানিক প্রভাব বিশেষ ভাবেই বিস্তার করে। সেজন্য কল্পনা সেখানে হ'য়েছিল আড়ষ্ট, মাছিমারা কেরাণীর মতই তারা সারা জীবন নিখুঁত ভাবে প্রকৃতির বাহ্যিক রূপের নকল করেছে—বাস্তব জগতের ঊর্দ্ধে তাদের মন উঠবার চেষ্টা করেনি। কি ক'রে রঞ্জন, পরিপ্রেক্ষা, আলোছায়া প্রভৃতি শিল্পের বৈজ্ঞানিক দিক নিখুঁত ভাবে তাদের কাজের ভিতর ফোটাতে পারবে এই ছিল তাদের চেষ্টা, সেই জন্য আদর্শ ও ভাব থেকে তারা স্বভাবতঃ পড়্‌ত' পেছিয়ে।

ভারতের শিল্পীরা মন দিয়েছিল অন্য দিকে, তার প্রমাণ—তারা দেবতাকে প্রকাশ ক'রেছিল তাদের ধ্যান ও অনুভূতি দিয়ে, মানুষকে নকল ক'রে কোনদিন তারা ভগবানের রূপ দেয়নি; বুদ্ধের মূর্ত্তি, মঞ্জুশ্রী, সুন্দরের মূর্ত্তি, নটরাজ প্রভৃতি মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে সাধারণ লোক ও দেবতার তফাৎ বুঝাতে চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু গ্রীক বা রোমান যুগের মিনার্ভা, ডায়ানা, জুপিটারের মূর্ত্তির ভিতর ও-দেশের শিল্পীরা সেই দেবত্ব দিতে পারেনি, সেখানে রক্তমাংসের গন্ধ আছে, সাধারণ মানব মানবীর সঙ্গে তাদের কোনই প্রভেদ নাই। কিন্তু বুদ্ধের মূর্ত্তির দিকে চাইলে যে কোন লোক ব'লতে পারবে যে, উহা মহামানবের প্রতিমূর্ত্তি। ধ্যানী বুদ্ধের গাম্ভীর্য্য, বিরাটত্ব ও অতিমানবত্বের চিহ্ন শিল্পীর কারিগরী দিয়ে প্রকাশ ক'রতে হয়নি, শিল্পী তার ধ্যান ধারণার প্রতিমূর্ত্তি সহজ ও অনাড়ম্বর ভাবে ধরতে চেষ্টা ক'রেছে প্রাণের সমস্ত অনুভূতি ও বিশ্বাস দিয়ে, তার আদর্শ হ'চ্ছে তার মনে, বাস্তব জগতের আবিলতাময় আবহাওয়ার কোন সৃষ্টির সঙ্গে তার মিল নাই, তার অন্তরের মণিকোঠায় যে সুন্দরকে সে পূজা করে তারই ছবি ফুটিয়ে তোলে।

সৌন্দর্য্য কখনও কোন বিশেষ জায়গায় আবদ্ধ থাকতে পারে না বা সৌন্দর্য্য ব'লে বিশেষ জিনিষ নেই আমাদের দেশের শিল্পের ধারণা এই ছিল। সৌন্দর্য্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক, তার বিস্তার অসীম, সেইজন্য যাদের কেবল আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আছে তারা সেই অপরূপ রূপের দর্শন পায়। আমাদের দেশের শিল্পীরা ছিল সাধক, তারা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে রহস্যময়ী প্রকৃতির প্রতিমার রূপের সেবা ক'রেছিল। সেই সেবা ও সাধনার উপলব্ধি আজও অজন্তা, ইলোরা, কোনারক, মাদুরা, নালান্দা, বোধগয়া প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে।

আধুনিক যুগে শিল্প হচ্ছে বিলাসের বস্তু, কিন্তু প্রাচীন ভারতে শিল্প ছিল ধর্ম্মের ভিত্তি, সামাজিক জীবনের একটী অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। সেজন্য দৈনন্দিন জীবনের উপর শিল্পের প্রভাব ছিল অত্যন্ত নিবিড়। বাড়ীর দরজায় আলপনা, ছেঁড়া কাঁথার উপর সূচি শিল্প, সিঁদুর-চুপড়ী

বরণ ডালা, বিনা সূতার মালা গাঁথা প্রভৃতি বহু ছোট খাট জিনিষের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশের লোকের সৌন্দর্য্যবোধের প্রগাঢ়তা সহজেই বোঝা যায়।

ভারতের শিল্প ছিল ব্যঞ্জক, ভারতের শিল্পীরা কোন দিনই মনের ভাব নট-নটীর ভাবের অভিব্যক্তির মত প্রকাশ করবার চেষ্টা করেনি। সহজ সরল রেখায় তারা তাদের প্রেরণার ছবি, শিশুর সরল মনের ভাবের প্রকাশ করেছে, সেখানে তাদের ভাবের গভীরতার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। শিল্প-নৈপুণ্যেও তারা কোন ক্রমেই হেয় ছিল না, তাদের শক্তি ছিল অসীম কিন্তু খুব সংযত ভাবেই তারা তাদের নিপুণতা ব্যক্ত করেছে, কোন রকম শক্তির অপব্যবহার না ক'রে।

কোনারকের সূর্য্যমন্দির, গোপুরম, আবু পর্ব্বতে জৈন মন্দির, খাজুরাহে বিষ্ণুর দেউল, সাঁচীর স্তূপ, ভারুত অমরাবতীর স্থাপত্য, সারনাথের বৌদ্ধমঠ তাদের শ্রেষ্ঠ রচনার ও নিপুণতার অপূর্ব্ব নিদর্শন। প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, পার্সিপলিস গ্রীক, রোমান প্রভৃতি বৃহৎ সভ্য দেশের শিল্পের দানের পাশে ভারতের দান কারুর চাইতে বড় না হ'লেও, একটুও ছোট নয়।

পশ্চিমের সভ্যতার চশমা পরে ভারতের অন্তরকে বোঝা যেমন শক্ত তেমনি ভারতীয় শিল্পের মূল সূত্রকে উপলব্ধি করা আরও অসম্ভব। প্রাচ্যের শিল্পকলার প্রাণতন্ত্রী অতি সূক্ষ্ম, বস্তুতন্ত্রবাদীদের বৈজ্ঞানিক ঠুলি লাগান চোখে তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে না, তাদের অনুসন্ধিৎসু মন সব সময় সব জিনিষের মানে কারণ জানতে চায়, অনুভূতি দিয়ে অনুভব ক'রতে তারা নারাজ।

আজকালকার দিনের অনেক সমালোচক ভারত শিল্পের অঙ্কন প্রণালীকে ভুল প্রমাদপূর্ণ বলে থাকেন। তাঁদের প্রথম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারতের ছবি ও মূর্ত্তির লম্বা লম্বা হাত পা এবং পরিপ্রেক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। ইউরোপীয় অঙ্কন প্রণালীর মত দ্রষ্টব্য বস্তুকে হুবহু নকল তারা করত না ব'লে যে তাদের নকল করবার শক্তি ছিল না, এটা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার ক'রবে না। আমার মনে হয় আমাদের দেশের শিল্পীরা চর্ম্ম চক্ষে সাধারণত যতটুকু দেখতে পেত তার চাইতে অনেক দূরে যেতে চাইত, তাদের কাছে বাহ্যিক আবরণের মূল্য চিরকাল খুব কমই ছিল, তারা চাইত অন্তরের ছবিকে মূর্ত্ত ক'রতে, যা কৌশল বা নিপুণতার জালে ধরা পড়ে না।

মধ্যযুগে ইটালিয়ান কলাশিল্প যখন উন্নতির উচ্চ সোপানে, তখন বাস্তবতার প্রভাব শিল্পীদের মনে খুবই কম ছিল। ডোনা টেলো, বটি-চেলি, ফ্রা আঞ্জেলিকো প্রভৃতি ইউরোপের নবজাগরণ (Renaissance) যুগের বিখ্যাত অমর শিল্পীদের কাজের ভিতর কল্পলোকের ও ভাবের ঐকান্তিক খেলা বেশী দেখা যায়। প্রাচ্যের শিল্পীদের মত কলা-কৌশল ও নিপুণতাও তাদের কাছে গৌণ উদ্দেশ্য ছিল, অন্তরের ভাব ফুটিয়ে তোলাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। কৌশলের দিক থেকে তারা অপটু থাকতে পারে বটে কিন্তু তাদের কাজের ভিতর সেজন্য মর্ম্মস্পর্শী ভাবের অভাব ঘটত না। সাধনার উপলব্ধি একমাত্র সাধকই সহজে প্রকাশ ক'রতে পারে, তার জন্য তার ভড়ঙের দরকার করে না, কিন্তু যাদের সিদ্ধি হয়নি বা ধ্যানের বস্তুর উপলব্ধি হয়নি, তারাই অবান্তর উপকরণ দিয়ে অনভিজ্ঞ সমাজকে মুগ্ধ করে।

আমাদের দেশে প্রতিকৃতি শিল্প নেই বলে অনেকে আক্ষেপ করেন। তাই সেদিক দিয়ে অনেকে আমাদের অক্ষমতা প্রমাণ ক'রতে চান। কেন যে শিল্পের ওই বিশেষ দিক পুষ্টিলাভ করেনি, মাথা ঘামিয়ে চেষ্টা ক'রলে কারণ খুঁজে বার ক'রতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

প্রাচীন কালে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জাতির ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকতে চাইত, নিজের তৈলচিত্র বা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে নয়। তারা সৃষ্টি ক'রত পূজারীর জন্য দেউল, আর্ত্তের জন্য অতিথিশালা, জ্ঞান-পিপাসুর জন্য মঠ, তৃষিতের জন্য দীঘি ও পুষ্করিণী। এতেই স্পষ্ট দেখা যায় প্রতিকৃতি অঙ্কন করার চাহিদা তখন ছিল না, সেজন্য শিল্পীরা বিশেষ কোন উৎসাহ দেখায় নি। তথাপি তারা বিশেষ চরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধ হস্ত ছিল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ বহু জায়গায় পাওয়া যায়। অজন্তার চিত্রে মাতাল নাগরিকদের হুল্লোড় ও মত্ততা, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সেনার আর্ত্তনাদ, দীন ভিখারীর মুখে

নৈরাশ্য ও অভাবের করুণ ছাপ বিশেষ দরদ দিয়েই তারা ফুটিয়ে গেছে।

যে ভারতবাসীরা আদিম যুগ থেকে শিবের আরাধনা ক'রছে, তুষারধবলিত হিমাদ্রির প্রতীক ক'রে, ব্রহ্মাকে অগ্নির প্রতীক ব'লে, বায়ু বরুণকে যারা ক'রল পূজা, তাদের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপাসনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা কি ধৃষ্টতা নয়?

যে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজও কেদারনাথ, বদরিনাথ, পশুপতিনাথ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করবার জন্য আকুল, বন্ধুর পথের কষ্ট বিঘ্ন যারা যুগ যুগান্তর ধ'রে তুচ্ছ ক'রে এসেছে কেবল লীলাময়ী প্রকৃতির অন্তরের রহস্য উপভোগ করবার জন্য, তাদের শিল্পীদের সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির গভীর যোগাযোগ ছিল না বলা আমার মতে একান্ত মূঢ়তার পরিচায়ক।

ভারতের শিল্প ও ধর্ম্মের দানের সাক্ষ্য নবদ্বীপ, শ্যাম, কম্বোজ, বালি, চীন, জাপানে আজও বেঁচে র'য়েছে, যে সভ্যতাকে আমরা বৃহত্তর ভারতের বলে থাকি। আমাদের শিল্পের বুনিয়াদ যদি পাকা না হ'ত, দেশ দেশান্তরের ইতিহাসের পাতায় আজ পর্য্যন্ত তা হ'লে তাহা শ্রদ্ধার জের টেনে চল্‌তে পারত না।

সুধাংশু চৌধুরী

বাদল সাঁঝে আঁধার নেমে আসে

শ্রীবিমলজ্যোতি সেনগুপ্ত

বাদল সাঁঝে আঁধার নেমে আসে,
গাছের মাথায় দিনের শেষের
আব্‌ছা আলো হাসে;
কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায় চূড়ায়
বাদল-বারি মুক্তা ছড়ায়,
সবুজ ধানের ওড়্‌না উড়ায়
পূব্‌-হাওয়া নিঃশ্বাসে,
বাদল সাঁঝে আঁধার নেমে আসে।

ওই দূরেতে আব্‌ছা গাছের সারি—
ওই খানেতে বাদল নামে
দিগন্ত মাঠ ছাড়ি'।
তাল তেঁতুলের মাথায় মাথায়
দেব্‌দারুদের পাতায় পাতায়
খেজুর বনে ঘুঙুর বাজায়—
বাজায় বাদল বারি;
বাদল নামে দিগন্ত মাঠ ছাড়ি'।

বাতাস মাতে হাস্নুহানার ঝাড়ে;
বাতাস মাতে দূরের গাঁয়ে
নদীর পর-পারে।
ঝাপ্‌সা সবুজ গাছের শিরে
চরণ ফেলে আস্তে ধীরে
সাঁঝের আঁধার আস্‌ল ঘিরে
শ্যাম বনানীর ধারে;
আঁধার নামে নদীর পরপারে।

আঁধার নামে সারা ভুবন জুড়ে'!
আঁধার নামে নদীর জলে
অনেক দূরে দূরে!
গাঙ্‌মাঝিদের ক্লান্ত মুখে
আঁধার নামে শান্ত সুখে,
শ্রান্ত নদীর অধীর বুকে
ঢেউয়ের সুরে সুরে,
আঁধার নামে সারা ভুবন জুড়ে।

সাগর দোলায় ঢেউ

শ্রীনবগোপাল দাস, আই-সি-এস

*

* *

শীলার ডায়েরী হ'তে :

মঙ্গলবার, দুপুরবেলা। কাল রাতের শেষভাগেই আমরা পূব-দেশের সীমানা ছেড়ে চলে এসেছি। কর্ণেল গ্রীণ ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এসে আমায় প্রশ্ন করছেন, দেশের হাওয়া আমার কেমন লাগছে।···তাঁর মনটা ভয়ানকভাবে উৎফুল্ল, বহুদিন পরে দেশে ফিরে আস্‌ছেন ব'লে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস্ করছিলুম, কর্ণেল, তুমি ত' দেশে ফিরে যাচ্ছ···সেখানে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার কে আছে ?

হেসে কর্ণেল বল্‌লেন, অভ্যর্থনা করবার কি আবার লোকের দরকার হবে না কি ? দেশের আকাশ-বাতাস, আলো-আঁধার সবই যে আমার প্রত্যুদ্‌গমন করতে উৎসুক হয়ে উঠ্‌বে!

বল্‌লুম, মান্‌ছি ; তবু প্রশ্ন করছি, কর্ণেল···তোমার আত্মীয় কি কেউ কর্ণেল ?

একটুখানি চিন্তা করে কর্ণেল বল্‌লেন, আছে—আমার দিদির এক নাত্‌নী আছে, বয়স বোধ হয় তোমারই মত হ'বে।···সে যদি আমার অভ্যর্থনা করতে এসে আমার এই থুব্‌ড়ো গালে গোটা দুই উষ্ণ চুমো খায় তাহ'লে আমি তার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ব একেবারে···

কর্ণেলের রসিকতা সবসময় লেগেই আছে। দোষ আছে তাঁর যথেষ্ট, কিন্তু এই স্বচ্ছ হাসিখুসী ব্যবহারের জন্য আমি তাঁর সব দোষ ভুলে যাই।...আমার নিজের দেশের পরিচিত পুরুষদের যদি কারোর সঙ্গ আমি কামনা করি তাহ'লে সে এই কর্ণেল গ্রীণ-এর।

কর্ণেল আজ ভোরবেলা আমাকে প্রথম প্রশ্নটি করলেন কালকের দিনটি সম্বন্ধে। বল্‌লেন, কাল একা একা কেমন লাগ্‌ল, মিস্ রজার্স ?

আমি বল্‌লুম, বেরিয়েছিলুম একা কর্ণেল, কিন্তু পথে হঠাৎ সাথী জুটে গেল!

—কে সেই ভাগ্যবান্ পুরুষটি ?

—তুমি তাকে চেন, কর্ণেল—যাকে নিয়ে দু'দিন আগে তোমরা সভা আর মিটিং বসিয়েছিলে এখানে···

আহতস্বরে কর্ণেল বল্‌লেন, আমাকে তুমি এর মধ্যে টেনে এনোনা, মিস্ রজার্স। তুমি জানো এর মধ্যে আমার কোনই সংশ্রব ছিল না!···একবারটি মাত্র তোমার বন্ধুদের একজনের সাথে আমি এবিষয় নিয়ে আলাপ করেছিলুম, তাদের সাথে পরিচয় করবার জন্যে, তাদের মধ্যে যথার্থ মানুষটিকে দেখ্‌বার জন্যে।···মুগ্ধ এবং প্রীত হয়ে আমি ফিরে এসেছি!

আমি সান্ত্বনাভরা স্বরে বল্‌লুম, তুমি ব্যথিত হয়োনা, কর্ণেল, তোমাকে কি আমার জান্‌তে বাকি আছে ?··· আমি ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে কখ্‌খনোই কিছু বলিনি,' যা' কিছু বলেছি তা' আমাদের এই অসাড় দম্ভতাপূর্ণ সভ্যতার খোলসটার প্রতি···

সত্যি, নিজের দেশের সাগরের মধ্যে এসে পড়েছি ব'লে আমার মনে একটুও আনন্দ হচ্ছে না, কিন্তু! বরং একটা অজানিত আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে।... দেশের এই আবাহন, এত' আবাহন নয়···এযে অন্য একটা বিদায়ের সূচনা!

কায়রো থেকে পোর্ট সেড্ পর্য্যন্ত সারাটা পথ মোহিত একটিও কথা বলেনি'। সেকেণ্ডক্লাশের যে কামরাটিতে আমরা উঠেছিলুম সেখানে আর কেউই ছিলনা...আমার জাহাজের সব বন্ধুরাই ফার্ষ্টক্লাশে যাচ্ছিলেন।···শুধু গাড়ীর

শব্দ হচ্ছিল, আর তার চাকাগুলো পিষে পিষে চল্‌ছিল লোহার লাইনের উপর দিয়ে।···জ্যোৎস্নাধৌত রাত্রিতে মরুভূমির ছবি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল—শাদা বালুর উপর যেন আলোর ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছিল···আর অদূরে সুয়েজখালের স্তব্ধশীতল রেখা মরুরূপসীর শাড়ীর রূপালী একটা পাড়ের মত দেখাচ্ছিল।

মোহিত চুপ করে সীটের কুশনে হেলান দিয়ে বসেছিল, আমি ছিলুম ওরই পাশে। সারাদিন ঘোরার শ্রান্তিতে আমার শরীর অবশ হয়ে আস্‌ছিল, তাই আমি আমার শিথিল মাথাটি ওর কাঁধের উপর রেখেছিলুম। মোহিত তবু একটুও সাড়া দেয়নি'···সে যেমন স্তব্ধভাবে বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল তেমন ক'রেই তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ আমি সেভাবে ছিলুম জানিনা, তবে ক্লান্তিতে আমার চোখ যে মুদে আস্‌ছিল সেটা সত্যি।···সেই তন্দ্রা-স্বপ্ন থেকে আমি মুহূর্ত্তের জন্য জেগে উঠেছিলুম কার স্নেহ-অঙ্গুলীস্পর্শে···ক্ষণিকের জন্য চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছিলুম, মোহিত আমার মাথাটি স্নেহভরে চেপে ধরে আমার আধাসোনালী চুলগুলো নিয়ে খেলা করছে।...সুখের নিবিড় আবেশে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—সে ঘুম যখন ভাঙ্‌ল তখন গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হয়ে আস্‌ছে, পোর্ট সেড্‌ ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্‌বার উপক্রম করেছে।

ক্ষণিকের জন্য আমার মনে দুঃখ হয়েছিল এমন সোনার সুযোগটুকু এম্‌নিধারা ঘুমে কাটিয়ে দিলুম বলে। তারপরই ভাব্‌লুম, দুঃখ করা আমার শোভা পায় না—যেটুকু পেয়েছি তার জন্যেই নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।···এও যদি আমার অদৃষ্টে না জুট্‌ত তাহ'লে অভিযোগ কর্‌বার সুযোগটুকুও পেতুম কি?

ষ্টীমারে উঠে ডেকের উপর যখন রাত্রির মত বিদায় নিলুম তখনও সে কিছু বল্‌লে না, শুধু আমার ডান হাতটি দু' হাতে একবার চেপে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌লে। তারপর তার ক্যাবিনের দিকে চলে গেল।

সারারাত আমার ঘুম হয়নি কাল। জাহাজ যখন ধীরে ধীরে আবার সাগরের বুকে পড়্‌বার জন্যে নড়্‌তে আরম্ভ করেছে তখনও আমি অন্ধকার ক্যাবিনের জানালা দিয়ে স্তব্ধ অতল জলের দিকে তাকিয়ে আছি।···মিস্‌ হিল অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁর সাথে আমার শেষবারের মত বোঝাপড়া হয়ে গেছে, তিনি শুধু ডাঙ্গায় পা' দেবার অপেক্ষায় আছেন যে কখন এরোপ্লেনেরও সাথে পাল্লা দিয়ে লণ্ডনে পৌঁছে বাবার কাছে আমার স্বেচ্ছাচারিতা, অবাধ্যতা এবং অসভ্যতার কাহিনী বল্‌বেন!

ধীরে ধীরে পোর্ট সেডের আলোগুলো মিলিয়ে গেল—আমরা যে শুধু পথিক তা' তীব্রভাবে মনে করিয়ে দিলে আরেকবার! নির্জ্জন নিঃসঙ্গতার একখানি ভেলায় ভেসে যেন চলেছি, তীরে দেখ্‌তে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, আশে পাশে শুন্‌তে পাচ্ছি জনতার কোলাহল, ক্ষণে ক্ষণে মাটির শুশ্রূষাও পাচ্ছি, কিন্তু কোনখানেই নিবিড়ভাবে বস্‌বার সুযোগ পেলুম না।

নির্জ্জন নিঃসঙ্গ ভেলায়ও সাথী জুটেছিল, তার সাথে পরিচয় হয়েছিল সমুদ্রেরই কল্লোলের সাথে, এরই দোলায় ঢেউয়ের মাঝখানে। এ বাঁধন শীগ্‌গীরই যাবে ছিঁড়ে—সমুদ্রের দোলানি থাম্‌বে না, তার বুকের উপর ঢেউএর খেলাও কম্‌বে না···কিন্তু তারই সুরে বাঁধা একটি পরিচয়, একটি সাথীত্ব বুদ্‌বুদের মত যাবে মিশে!

কাল নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে সারারাত যখন ছাই-পাঁশ সব ভাব্‌ছিলুম তখন একবার মনে হয়েছিল মোহিতও আমারই মত নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে বিছানায় বসে আছে কিনা! আমার মনে যে সব সুরের বাঁশী বেজে উঠ্‌ছে ওর মনে কি তা' একটুও সাড়া দিচ্ছে না?...কে জানে?

বুধবার, সকালবেলা। কাল বিকাল অবধি যখন মোহিত এল না তখন আমি ভাব্‌লুম আমাকেই খোঁজ নিতে হ'বে। একটুখানি আশঙ্কায় মনটাও কেঁপে উঠ্‌ল, কায়রোতে রোদে রোদে তেতে পুড়ে অসুখ হয় নি' ত?

সেকেণ্ড ক্লাস ডেকে যোশীর সাথে দেখা। বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস্‌ করতেই বল্‌লে, সে নীচে ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের কোয়ার্টারে গিয়েছে।

ডেক্‌প্যাসেঞ্জার বলে এক শ্রেণীর যাত্রী আছে জান্‌তুম,

তাদের আস্তানা দেখবার সুযোগ আমার কখনও হয়নি। আজ কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

যোশী আমাকে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে বললে, সে বড্ড নোংরা জায়গা, মিস্ রজার্স...ফার্ষ্ট ক্লাস লাউঞ্জ্-এর পর সেখানে তোমার গা বমি বমি করবে!

—কিন্তু মোহিত ত সেখানে গিয়েছে?

—আমাদের কথা আলাদা, মিস্ রজার্স...আমরা সব কিছু দারিদ্র্য, মলিনতা এবং জীর্ণতায় অভ্যস্ত। তোমাদের সে শিক্ষা হয় নি', তুমি কষ্ট পাবে।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যোশী এবং মোহিত এরা দু'জনে অবসর পেলেই আমাকে আমার জন্ম, জীবন-প্রণালী এবং আভিজাত্য নিয়ে খোঁচা দেয়। অবশ্য মোহিত আমাকে আজকাল এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না, তার মনের তীব্রতা যেন অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে আমার সংসর্গে।

আমি বেশ কড়াসুরেই জবাব দিলুম, আমার কী শিক্ষা হয়েছে না হয়েছে সে নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাবনা, যোশী, কিন্তু তোমার এটা মনে থাকা উচিত যে যুগে যুগে আমার দেশের দু'একটি ছেলেমেয়েও পৃথিবীর নানা প্রান্তে সব চেয়ে বড়ো রকমের দুঃখ, দারিদ্র্য এবং মলিনতা বরণ করে নিয়েছে!

সত্যের সাথে বিবাদ চলে না। যোশী লজ্জিত মুখে মাথা হেঁট করলে। আমি বললুম, আমার পথটি দেখিয়ে দেবে কি?

যোশী আমার সাথে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে এল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই—শুধু নীলকুর্ত্তি-পরা জন কয়েক Florentine খালাসী কাজ করছে—এদিক্ ওদিকে দু'একটা কম্বল এবং ময়লা বিছানা আধগুটানো ভাবে প'ড়ে রয়েছে। পূর্ব্বদেশ থেকে আসার পর অবধি এসব জিনিষের তাৎপর্য্য বুঝ্তে আমার দেরী হয় না...বুঝ্লুম এই হচ্ছে ডেক্প্যাসেঞ্জারদের আশ্রয়-ভূমি।

খানিকটা খুঁজে মোহিতের দেখা পেলুম ডেকটার সম্মুখ ভাগে। সে এবং কায়রো-ষ্টেশনে-দেখা আর একটি ভারতীয় ভদ্রলোক পাশাপাশি দুটো লোহার থামের উপর বসে গল্প করছে।

বোধ হয় তারা আমার সম্বন্ধেই গল্প করছিল, কারণ দেখলুম আমার পায়ের শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকিয়ে তারা দু'জনেই ভয়ানকভাবে চমকে উঠ্ল...আর মোহিতের মুখে লজ্জার একটা রক্তিমাভ ছোপ কে যেন বসিয়ে দিলে।

আমি বললুম, তোমার খোঁজে কোথায় চলে এসেছি মোহিত দেখ...

মোহিত কী যেন বল্তে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে অপর ভদ্রলোকটি বললেন, অপরাধ খানিকটা আমারই...আমিই বাবুজীকে আট্কে রেখে দিয়েছি অনেকটা স্বার্থপরতার বশে...

বুঝ্লুম না, জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলুম।

ভদ্রলোকটি বললেন, দেখ্ছেন ত কেমন একাটি এখানে থাকতে হয়, তাই মোহিতের সঙ্গটুকু একেবারে একচেটে করে নিয়েছি!

বললুম, আমি আপনাদের গল্পে বাধা দিতে আসিনি,' আপনারা গল্প করুন না, আমি একটু খানি দেখ্ছি জাহাজটা ঘুরে ঘুরে...

ব'লে আমি ডেকের এদিকে সরে এলুম। মনে ভয়ানক অভিমান হ'ল, মোহিত আমাকে দেখে একটুখানিও সরে এলনা, আমায় একটু সম্ভাষণও করলনা সে।...কিন্তু পরে বুঝ্তে পেরেছিলুম এই সম্ভাষণ-না-করাটাই হচ্ছে আমাদের সম্বন্ধের মাধুর্য্য, এই অপূর্ণতাটুকুই হচ্ছে পূর্ণতার প্রতীক...

এদিক্ ওদিক খানিকক্ষণ পায়চারী করে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় মোহিত ছুটে এল, বললে, তুমি নিশ্চয় এখনই চলে যাচ্ছ না?

আমি অভিমান-ভরা সুরে বললুম, চুপ করে ত আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

অনুতপ্ত হয়ে আমার হাতটি ধরে মোহিত বললে, রাগ করো না...তোমার সাথে অনেক কিছু গল্প করবার আছে...

একটি স্পর্শ আমার সব অভিমান-ব্যথা ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। ফিক্ করে হেসে বললুম, তোমার উপর কি রাগ করতে পারি মোহিত? সে যে নিজের উপরই রাগ করা হবে!

সে আমার হাতটি ধরে সিঁড়ির কাছ থেকে টেনে নিয়ে বস্‌লে, এদিকে এস…

মন্ত্র-মুগ্ধার মত আমি তার অনুসরণ কর্‌লুম। ডেক্‌-প্যাসেঞ্জারদের আশ্রম…আলোর স্তিমিত আভা অন্ধকারের সাথে মিশে স্থানটাকে যেন রহস্যময় ক'রে তুল্‌ছিল। মোহিত বল্‌লে, এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল…

আমি চুপ করে রইলুম, এর পর কী বল্‌বে তারই প্রতীক্ষায়।

মোহিত বল্‌তে লাগ্‌লে, ওঁর নাম হচ্ছে কৃপালানি, সিন্ধ্‌ থেকে আস্‌ছেন…এই ডেকেরই একজন যাত্রী।…ভারী চমৎকার লোক—ওঁর সাথে পরিচয় হয়েছে মাত্র দু'দিন হ'ল, এরই মধ্যে ওঁর মাঝে মস্ত বড় একটি বন্ধুর প্রাণ খুঁজে পেয়েছি…

বল্‌লুম ওঁর চোখ দুটিতে আমি সেটা বুঝ্‌তে পেরেছি…

—আমি ওঁকে আমার কাহিনী বলছিলুম আর আসন্ন বিদায়ের দিনটির কথা আলোচনা কর্‌ছিলুম…

আমি আহতভাবে বল্‌লুম, সে কথা এখন আলোচনা করে কী হবে মোহিত? সে এখন থাক্‌…

মোহিত আর কিছু বল্‌লে না, স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অস্ফুটস্বরে বল্‌লে, একটি শিক্ষা আমার লাভ হয়েছে তোমার সাথে পরিচয়ে, শীলা…সেটা না বলে পার্‌ছি না…

—বলো…

—সহজ মানুষের সত্যটি অজ্ঞতা এবং সামাজিক বিভিন্নতার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে থাকে, তাই মানুষ মানুষকে অনেক সময় ভুল বোঝে, শীলা…

আমি অবাক্‌ হয়ে প্রশ্ন কর্‌লুম, এর তাৎপর্য্য…

মোহিত প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল, তারপর বললে, না, বল্‌ছিলুম এই যে তোমাকে আগে কী ভয়ানক ভাবে ভুল ভেবেছিলুম!

মোহিতের কথায় আমার সমস্ত হৃদয় মথিত ক'রে উঠ্‌ল একটা চাপাকান্নার হাসি। আমাদের সম্বন্ধটিকে সে দেখেছে শুধু বৈজ্ঞানিকের চোখে, এক অভিজ্ঞতার সোপান এই ধারণা নিয়ে।…মুখ্যভাবে আমার কাছে যা' অন্তর-নিংড়ানো বেদনা, সেটা ওর কাছে শুধু একটা ভুল-ভাঙানো বাণী; আমার কাছে যা' অনুভূতির কঙ্কণ, ওর কাছে তা' অভিজ্ঞতার সাঁজোয়া…

আমি কোন ক্রমে অশ্রুরোধ কর্‌তে কর্‌তে উপরে চলে এলুম। ওর কাছে থেকে ভালো ভাবে বিদায় নেবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত আমার হ'ল না।

কাল রাত্রিতেও আমার ঘুম হয়নি'।

বুধবার, রাত দুপুর। আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে মোহিতের মনটিকে সাধারণ তুলাদণ্ডে মাপ্‌তে গেলে ওর প্রতি ভয়ানক একটা অবিচার করা হ'বে। কাল ওকে দেখ্‌ছিলুম নিতান্ত সঙ্কীর্ণ একটা পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে… ওর মনের বিপুলতা এবং অনুভূতির অজস্র চঞ্চল ছায়া-লোকপাত আমার পর্য্যবেক্ষণের গণ্ডীর মধ্যেই আসেনি'।

মানুষকে ভালো ভাবে বুঝ্‌তে হ'লে নিজেকে তার অনুবেদনার সাথে নিবিড় ভাবে মিশিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করা দরকার। প্রাণের যোগ যতক্ষণ না হচ্ছে কল্পনা-শক্তির সাথে, ততক্ষণ একটা মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত কখনই হ'তে পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নিথরভাবে বসে ছিলুম আমার ডেক্‌চেয়ারটির উপর, কালকের রাত্রিটির কথা মনে হয়ে আমার সব অশ্রু জমাট হয়ে বুকের উপর চেপে বসেছিল, এমন সময় মোহিত এসে মৃদুস্বরে বল্‌লে, তোমার সাথে একটা কথা আছে, শুনে যাও…

আমি অবাক্‌ হয়ে গেলুম—আবার হলো কী?

মোহিতের পেছনে পেছনে আমি সোজা চলে গেলুম স্পোর্ট্‌স্‌ ডেকে। তখন আমার সিসিলীর সম্মুখীন হচ্ছি… দূরে পাহাড়ের উপর দু'একটা আলো স্তব্ধ নিশীথের প্রহরী স্বরূপ জেগে আছে।

কোন প্রকার ভূমিকা না করেই মোহিত আমাকে প্রশ্ন করে বস্‌ল, তুমি আমাকে ভালোবাস, শীলা?

এ কী প্রশ্ন!…এর জবাব কি কখনও দেওয়া যায়?

আমার নীরবতায় অস্থির এবং চঞ্চল হয়ে মোহিত বল্‌লে, আজ চুপ করে থাক্‌লে তোমার চলবে না শীলা…

আমি তোমার ঠোঁট দুটির মাঝ থেকে একটা উত্তর চাই।

আমি অস্ফুটস্বরে বললুম, তোমার কী মনে হয়, মোহিত?

আমার প্রশ্ন শেষ করতে পারলুম না। আমার মুখের উপর এসে পড়ল মোহিতের স্নেহ-উচ্ছ্বাস-ভরা উষ্ণ নিঃশ্বাস; আমার ঠোঁট দুটির উপর এল ওর ঠোঁটদুটির প্রেমনিবেদন··· আমাকে সে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলে।

কতক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়েছিলুম জানি না··সে যেন একটা স্বপ্নময় যুগ। আমার চক্ষুদুটি বন্ধ করে আমি তৃষিত মরুভূমির মত তার চুম্বন এবং আদর উপভোগ করছিলুম। দিগন্তে ফুটে উঠেছিল সিসিলীর লাইট-হাউসের আলো—মনের সব বন্ধন গিয়েছিল টুটে, ফুলের মঞ্জরীতে যেন ভরে উঠছিল সব গাছ।···আমার সমস্ত হৃদয় মথিত করে জেগে উঠছিল শুধু একটি প্রার্থনা: ওগো রূপদক্ষ, এ শুভ সুযোগ হারিয়ো না···অন্ধকারে আবরণ গিয়েছে খুলে, অবসাদ গিয়েছে দূরে··তোমার তুলিতে আমাদের মনের আনন্দের গান ফুটিয়ে তোলো···

নীচে সাগরজলের উচ্ছ্বাস আমি শুনতে পাচ্ছিলুম। ঢেউগুলো বোধ হয় জাহাজের গায়ে এসে লাগছিলো আর থেকে থেকে আমাদের জাহাজটি কেঁপে উঠছিল।

মোহিত ধীরে ধীরে আমাকে মুক্তি দিয়ে বললে, এই কটা দিনের স্মৃতি আমি কথখনও ভুলতে পারব না শীলা···

আমি বললুম ভুলবে কেন?···তোমার সাথে এই ত আমার শেষ দেখা নয়।

একটুখানি মলিন হাসি হেসে বললে, না···কিন্তু শেষের দিনত ঘনিয়ে আসছে···

প্রতিবাদ করতে পারতুম, বলতে পারতুম, এ যে আরম্ভ গো! এরই উপর তুমি যবনিকা কেন টেনে দিচ্ছ?··· তুমি আর আমি যাচ্ছি একই দেশে, সেখানে আমাদের দেখা-শোনার অবসরের অভাব হবে কেন?

কিন্তু কী-জানি-কেন মুখের মধ্য দিয়ে সে ভাষা আর বেরুল না। অশরীরী অদৃশ্য এক শক্তি যেন আমার কানে কানে বললে, এ যে সাগর দোলায় ঢেউ···সাগরের বাইরে এ সম্বিৎ হারিয়ে ফেলবে, মাটির কোলাহলের মধ্যে এ কোথায় মিশিয়ে যাবে! ঢেউ আছাড় খাবে সৈকত ভূমিতে···ফুটে উঠবে শুধু ফেণা হয়ে, আর মিশিয়ে যাবে তার সিক্ত গায়ে···

মোহিত বললে, তুমি কাল আমায় ঠিক বুঝতে পারনি', শীলা···

ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না, মোহিতের স্পর্শ আজ আমার কাছে সবই স্বচ্ছ, সরল করে দিয়েছিল। তবু আমি ওর কথায় কোন বাধা দিলুম না।

বলতে লাগল, ভুল-ভাঙাব কথা যে কাল বলেছিলুম সেটাই আমার বলবার সবটুকু ছিল না।···আমার মনের পরিণতির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম— সেই বিস্ময়েরই একটুখানি কণা তোমাকে দিতে যাচ্ছিলুম...

আমি দু'হাতে তার মুখটি চেপে ধরে বললুম, বুঝেছি, আর বলতে হ'বে না···

সে আস্তে আস্তে আমার হাতদুটি সরিয়ে নিয়ে তার হাতদুটির মধ্যে রাখলে, বললে, জানো, সময় সময় আমার কী মনে হয়?

—কী?

—যে তুমি যাদু জানো!··কতবার আমি তোমার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছি, তোমার সাথে বেশী মেশামেশি করা উচিত নয় সে কথা মনকে বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু কী এক দুর্ব্বার আকর্ষণে আবার ফিরে এসেছি!

আমি একটুখানি তৃপ্তিভরা হাসি হাসলুম। এযে আমার প্রতি ওর সম্ভ্রম নিবেদন! মেয়ের মন এ শুনলে আনন্দে ফুলে উঠবে বৈ কি!

সে বললে, তাই ভয় হয়, এ যাদুর মায়া যদি না কাটে তাহ'লে কী উপায় হবে!

আমি হেসে বললুম, ভয় নেই, তুমি যখন এখনই এ যাদুর মায়া কাটবার কথা ভাবছ তখন কাটতে আর দেরী হবে না!

আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলুম সেখানে বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েকেরও বেশী হবে। কত কী অর্থহীন কথা যে

আমরা বললুম—তার না ছিল রীতি, না ছিল সঙ্গতি!... সৃষ্টির আদি কাল থেকেই বোধ হয় এম্‌নি হয়ে আস্‌ছে!

সাগর প্রবাহের প্রবাহিনীর কলধ্বনি রক্তের তালে তালে বাজ্‌ছিল। আমি যেন হয়ে গিয়েছিলুম শিশু—যা' কিছু সাধারণ যা' কিছু নগণ্য সবই দেখ্‌ছিলুম প্রবল ক'রে,···আমার ঔৎসুক্য হয়ে উঠেছিল অক্লান্ত, আনন্দ হয়ে উঠেছিল গভীর এবং অপূর্ণ···

মোহিতের চিঠি— বুধবার রাত দুপুরে লেখা :

"ভাই শোভনলাল,

তোমাকে শেষ চিঠি লিখেছি আরব আর মিশরের মরুভূমির মাঝখানে বসে। এবার মরুভূমি ছাড়িয়ে ঠাণ্ডার দেশের দিকে চল্‌ছি, যদিও কাল সকালবেলা ভিসুভিয়স্‌এর সাথে সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা আছে!...আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তবে নাকি জাহাজ থেকেই ওর মুখে ধোঁয়ার রেখা দেখা যাবে!

সে যাক্‌···তোমাকে একটি নতুন খবর দিচ্ছি·· যে বাঁশীর সুরের কথা তোমাকে ঈজিপ্ট থেকে লিখেছিলুম তার স্পর্শ অবশেষে মিলেছে—খুবই অজানিতা ভাবে, মিশরের মরুভূমির মাঝে। তারপর আজ তার সাথে আমার সুরটি মেলানোও হয়ে গেছে, সাগর-ঢেউএর নৃত্যদোদুল ছন্দের সাথে মিশে গেছে বেশ!

তখনকার অনুভূতিটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের, ভাই!... এর আগে তোমাকে লিখেছিলুম অস্পষ্ট আঘাতের কথা, এখন লিখ্‌ছি পূর্ণ রিক্ততার বাণী। এ রিক্ততার শূণ্যতা নেই, আছে অসামান্য গভীরতা আর অতলস্পর্শী স্তব্ধতা।

তুমি নিশ্চয়ই ভয়ানকভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছ। অ্যাফ্রিকার জঙ্গল আর অ্যামেরিকার কন্দর ছেড়ে তোমার মনটি নিশ্চয় আমার চিঠির পেছনে লুকানো অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়েছে!...ভাব্‌ছ এসব কবিত্ব-মেশানো কথার মানে কী?

মানে অবশ্য খুবই সোজা—আমি প্রেমে পড়েছি!

আমি কিন্তু কল্পনার চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি এইটুকু পড়েই তোমার মুখ হ'য়ে উঠ্‌ছে ভ্রূকুটি-কুটিল, তুমি আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে হতাশ হয়ে পড়েছ!...আমার ভয়ানক আনন্দ হচ্ছে কিন্তু তোমার অবস্থাটি কল্পনা করে... কাছে যদি এখন তোমায় পেতুম!

সে যাক্‌—এখন আমার প্রিয়ার একটুখানি পরিচয় দেই, কী বল?

প্রিয়ার বয়স হবে উনিশ···কুড়ি পার হ'লে বুড়ী হবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার কাছে তিনি থাকবেন চির-যৌবনা উর্বশী। তাঁর সাহচর্য্যে আমার অন্তর রাগে-অনুরাগে বিচিত্র হয়ে ঠিক্‌রে পড়ে···প্রভাতে-সন্ধ্যায় দিক্‌-দিগন্তে গান বেজে ওঠে···সৃষ্টির লীলা তরঙ্গের সাথে আমার অন্তর দুল্‌তে থাকে।

তুমি নৃতত্ত্বের পুরোহিত, তাই প্রিয়ার জাতীয়তার পরিচয় তোমায় দেব না। শুধু তাঁর বাইরের দুএকটি অঙ্গ এবং অঙ্গাণুর বর্ণনা করব, যদি তুমি সেই ছবি থেকে আমার প্রিয়াকে চিনে নিতে পার তাহ'লে তোমায় বল্‌ব বাহাদুর···

প্রথমেই চোখ দুটির কথা বলি···স্তব্ধ-চঞ্চল নীল··· সাগর আর আকাশের রংএর সাথে মিশে আছে যেন··· অন্তর্গূঢ় রহস্যে ভরা আমার মানসী।

আর একটি জিনিষ আমার চোখে পড়েছে প্রথমেই, সেটি হচ্ছে একটি কালো তিল।···সত্যিকারের রাঙা-ঠোঁট দেখেছ কখনো?···আমার প্রিয়ার ঠোঁট সহজ-রক্তিম-রাগে রাঙা...বিলিতি কবি হ'লে বল্‌তুম, চেরীফলের মত। গালের আপেলের রং আর তারই উপর ঠোঁটের বাঁ-পাশে ছোট্ট একটি তিল, যেন সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য মথিত করে একটুখানি এসেন্স···

চুলের বর্ণনা চাও?···আধা-সোনালী···শাড়ীর ঘোম্‌টাতে যদি এর আব্রু হয় তাহ'লে বোধ হয় এর স্রোতে ছন্দের নাচ বয়ে চলে!

আরো লিখ্‌তে হবে কি?

এখন ইতিহাসের একটুখানি ছোঁয়াচ্‌ তোমায় দেই। ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ যে হয়েছে সাগরের দোলা থেকে সে তুমি এর মধ্যে নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছে।···কেমন

করে সুরু হ'লো সেটা প্রশ্ন করো না, কারণ সুরের মধ্যে না ছিল আকস্মিকতা, না ছিল অসাধারণতা! সচরাচর যেমনি ভাবে পরিচয় হয়ে থাকে আমাদের পরিচয়ও সেই ভাবেই হয়েছে!

কিন্তু খুব সহজে আমরা ধরা দিই নি'। লুকোচুরী খেলা হয়েছে যথেষ্ট এবং তার অস্বাভাবিকতার কথা মনে হ'লে এখন আমার নিজেরই হাসি পায়!...অভিমান এবং বেদনা আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে অনেকবার, কিন্তু আজ সন্ধ্যার আঁধারে আমাদের সন্ধি হয়ে গেছে।

তুমি প্রশ্ন করবে, সে ত বুঝলুম, তখন হবে কী?—কী যে হবে সে আমিও জানি না। আর দুদিনের মধ্যেই সাগরের কাছ থেকে বিদায় নিতে হ'বে আমাদের এত দিনকার সহচর, সাথী এবং সাক্ষী থাকবে প'ড়ে ··আমরা চলে যাব কে কোথায়! মনের স্পন্দন দোলার বিরামের সাথে সাথে থামবে কি না জানি না; যদি থামে তবে ভাবনা নেই—কিন্তু যদি না থামে?

একটা কথা তোমায় না বলে থাকতে পারছি না, শোভন···তুমি আমায় ছেলে মানুষ ভেবো না যেন!... দু'জোড়া ঠোঁটে যখন স্নেহের আলাপ সুরু হয় এবং তার সমাপ্তি হয় নিবিড় স্পর্শে, তখন শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে ওঠে প্রাণমাতানো গান! সে গানের মূর্চ্ছনা যে কতখানি পাগল-করা তা' আমি চিঠিতে তোমায় বোঝাতে পারব না—তবে এটুকু বলতে পারি যে তখন নিত্য কালের আলোও হয়ে যায় আচ্ছন্ন আর বিশ্বের সকল বাণী সরে যায় দূরে!

এই যে চিঠি লিখছি এখন রাত ক'টা বেজেছে জানো?—রাত একটা! চোখের পাতায় ঘুম একটুও নেই—আমার শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহ যেন অস্বাভাবিক রকম দ্রুতগতিতে বইছে!

আমার চিঠি পড়ে তুমি কী মন্তব্য প্রকাশ করবে জানি না, তবে খানিকটা আঁচ করে নিচ্ছি। বলবে, আমার চিঠিটা হয়েছে একটা আলোর ঝিকিমিকি, এর কোন্ খানে রূপক কোন্ খানে সাদা কথা বুঝবার যো নেই···। কিন্তু এই আলো-ছায়ার মাঝখান দিয়ে যদি আমার চেনা মুখখানা বার করে নিতে তোমার কোন কষ্ট পেতে না হয় তাহ'লেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

একটা প্রস্তাব করব তোমায়?···তুমিও কেন চলে এস না! তুমি যে সেই কোন্ স্কলারশিপের জন্যে চেষ্টা করবে বলেছিলে তার কী হ'ল?···ভাই শোভন, আমি জোর্ করে বলছি, তোমার ষ্টাডির বদ্ধ হাওয়া থেকে যদি তুমি এক বারটি বেরিয়ে পড়তে—সাগরের বুকে পাড়ি দেবার জন্যে, তাহ'লে দেখতে এর ঢেউএর ফাঁকে ফাঁকে কত রামধনুর খেলা...আর তার বাণী আকাশ বাতাসের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে কত রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে ওঠে!

অবশ্যি আমার বলা বৃথা; তুমি হচ্ছ অদ্বিতীয় Cynic, তুমি বলবে, সাগরের বুকে শুধু রামধনুর খেলাই মেলে না, টাইফুনের ভীষণ নৃত্যের উৎসও সেখানে।···সাগরের বাণীর মধ্যে তুমি দেখবে ধ্বংসের লীলা ··বিক্ষিপ্ত কোলাহল ·· সম্বরণহীণ উচ্ছ্বাস···

তবু তোমায় বলছি, একবারটি তোমার অনাদিকালের স্ত্রী-বিসর্জ্জন দিয়ে পা বাড়িয়ে দাও···।

—তোমার মোহিত।"

*

* *

মোহিত শেষ রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল তার ক্যাবিনের ভিতর। হঠাৎ তার ঘুম ভাঙল চিদম্বরম্এর কলরবে। আলস্য-ভরা চোখ দুটি একবার খুলতেই পোর্টহোল দিয়ে তার মুখের উপর এক ঝলক আলো এসে পড়ল···একটু বিরক্ত হয়ে চোখ আবার বন্ধ করে সে জড়িত-কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কী হয়েছে মিঃ চিদম্বরম্? এরকম চেঁচামেচি কেন?

সোৎসাহে চিদম্বরম্ জবাব দিলে, ভিসুভিয়স দেখা যাচ্ছে, মিঃ সেন···

ভিসুভিয়স!···মোহিত তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। উপরের বার্থ থেকে কোনক্রমে নেবে চোখে একটু জল দিয়ে সে উদ্ধশ্বাসে বেরিয়ে পড়ল ক্যাবিন থেকে।

ভিসুভিয়স দেখতে তার যতটা না আগ্রহ তার চেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল তার শীলার সাথে ভোরবেলাটিতে দেখা করবার।···আগের দিন সন্ধ্যায় সে শীলার কাছে প্রতিশ্রুতি

করেছিল যে ভোরবেলাতে ভিসুভিয়সের ছবি যখন ফুটে উঠ্‌বে তখন সে শীলার কাছে থাকবে।

তড়্‌ তড়্‌ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে সে ফার্ষ্টক্লাস স্পোর্টশ্‌ ডেকে উঠে চলে গেল। সেখানে এক পাল ছেলে মেয়ে জড় হয়ে চেঁচামেচি করছিল। মোহিত খুঁজছিল শীলাকে, তার দৃষ্টি সারা ডেকময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

শীলাকে কিন্তু কোথাও দেখা গেল না। যে ছেলে-মেয়ের দল তাদের আনন্দ কলরবে ডেকটাকে মাতিয়ে তুল্‌ছিল তাদের একটিকে মোহিত বেশ ভালোভাবেই জান্‌ত—তাকে দেখেছিল শীলার সাথে অনেক সময়ই সে।…ইচ্ছা হল তাকে প্রশ্ন করে, শীলা কোথায়?…কিন্তু কী যেন এক লজ্জায় সে চুপ করে রইল।

ভিসুভিয়স দেখা যাচ্ছিল ধূসর একটা রেখার মত…তার শিখরটা মনে হচ্ছিল যেন কালো একটা মেঘের ঢেউ।… মোহিত কিন্তু ভিসুভিয়স্‌ দেখে খুব উৎসাহিত বোধ কর্‌ছিল না, তার মন ছিল একটি ছন্দ-ভরা সুরের প্রতীক্ষায়…

সুরের সাথে সাক্ষাৎ অবশেষে হ'ল। লজ্জারুণ মুখে শীলা এসে মৃদু হেসে বললে, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, মোহিত, তাই দেরী হয়ে গেল…

—আমি যে তোমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি এখানে!

—সত্যি?

—সত্যি না ত' কি মিথ্যে বল্‌ছি?…এই যে ধূম-জ্যোতিঃতে গড়া পাহাড়ের রূপ-সৃষ্টি এও আমার কাছে নিতান্ত সাধারণ মনে হচ্ছিল তুমি আসছ না দেখে।

শীলা মোহিতের বাহুতে মৃদু তর্জ্জনীর আঘাত করে বললে, শেষ ক'দিনে তোমার মুখের ফোয়ারা ছুটে গেছে যে!

হেসে বললে, দীপ্‌ নিভ্‌বার আগে দপ্‌ করে জলে ওঠে শেষবারটির মত…কল্লোল শেষ হবার আগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় পূর্ণমাত্রায়…

শীলা একটুখানি অন্যমনস্কভাবে বললে, সত্যি কি মোহিত আমাদের বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে আসছে?… আমি কিন্তু কিছুতেই সেটা কল্পনার মধ্যে আন্‌তে পারছিনা।

—কিন্তু যা' সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী তাকে জোর করে এড়িয়ে ত কোন লাভ নেই।

শীলা একটুখানি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললে।

মোহিত তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, কিন্তু সে নিয়ে এখনই মন খারাপ করে দরকার কী, শীলা? যা হ'বার তা হবে—তাই নিয়ে এখনকার ভিসুভিয়স দেখাটা মাটি ক'রো না।

শীলা সচেতন হয়ে বললে, সত্যি, আমার বড্ড অন্যায় হয়ে যাচ্ছে, মোহিত। তোমার আজকের সকালবেলাটায় আমি বিষাদের ছায়া এনে দিলুম।

মোহিত যেন শীলার কথা শুন্‌তেই পায়নি' এম্‌নিভাবে বললে, বাস্তবিক…দূরথেকে ভিসুভিয়স্‌এর এমন শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি দেখে কে মনে করবে যে এরই প্রতাপে দু'হাজার বছর আগে রোমান্‌ সভ্যতার কতকগুলো বিশিষ্ট আত্ম-প্রকাশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল!…এর রুদ্র লেলিহান শিখার আবাহন কেউ শুন্‌তে পায়নি' আকস্মিকতার প্রচণ্ডতায় সবাই হয়ে গিয়েছিল জড়, প্রবুদ্ধ…

শীলা বললে, নাম্‌বে'—গিয়ে একবারটি দেখে আসবে?

—নাঃ, আজ মাটির স্পর্শের কথাটি মনে হ'লে শিউরে উঠ্‌ছি। মনে হচ্ছে এই ত' আমাদের বিচ্ছেদের বিমান… সাগরদোলা আমাদের এনে দিয়েছিল নিবিড় ক'রে, এই মাটি এনে দেবে বিনাশের দুর্দ্দম বন্যা।…মাটিকে আমি আর ভালবাসতে পারবনা, শীলা।

শীলা বললে, তাইত' বল্‌ছি মোহিত, শেষ কটা ঘণ্টা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ ক'রে নেই। পরিচয় ত শেষ হয় না কখনও, নব নব বিস্ময়ে নতুন অজানার ভেতর দিয়ে নিজে-দের জান্‌বার চেষ্টা করি।…আসবে?

মোহিত হেসে বললে, অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে বিদায়ের মুহূর্ত্ত যখন আস্‌বে তখন তার আগেকার গভীর অনুভূতির আনন্দ আমাদের মনটিকে করে রাখ্‌বে আচ্ছন্ন, মোহগ্রস্ত—শেষ কথাটি বল্‌বার নিষ্ঠুরতাও যেন আমাদের চৈতন্যের দুয়ারে স্পষ্টভাবে ঘা' দিতে না পারে।

ঠিক হ'ল যে তারা দু'জনে নেপ্‌লস্‌এ নাম্‌বে। মোহিত শীলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃপালানির সাথে দেখা করতে গেল।

কৃপালানি সেকেণ্ডক্লাস ডেকে এসে যোশীর সাথে গল্প করছিলেন। মোহিত তাকে সম্ভাষণ করে বল্‌লে, আপনারা কি নেপ্‌ল্‌স্‌ দেখ্‌তে নাম্‌বেন, কৃপালানিজী?

কৃপালানি বল্‌লেন ভাব্‌ছি···আপনি যাচ্ছেন কি?

—হ্যাঁ, আজি যাবো···মিস্‌ রজার্স এর সাথে এই মাত্র সেটা ঠিক ক'রে এলুম।

কৃপালানি একটু মুচ্‌কে হেসে বল্‌লেন, তাহ'লে আমাকে খুঁজ্‌ছেন কেন বাবুজী?···গাইড্‌ভাবে?

মোহিত একটু লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, না···আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি···

কৃপালানি বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, বিদায়? সে কী বাবুজী?···

মোহিতের নিজের অসতর্কতায় প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল। সে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে একটুখানি কৌতুকের সুরে বল্‌লে, বলাত যায় না, কৃপালানীজী! ভিসুভিয়স্‌ দেখতে গিয়ে যদি তার দগ্ধ-গলিত আগুনের মধ্যে পড়ে যাই তাহ'লে বিদায় নেবার অবসর আর নাও হতে পারে!

যোশী এতক্ষণ চুপকরে শুন্‌ছিল, সে বল্‌লে, তোমার দূরদর্শিতার বাহাদুরী আছে, মোহিত।···খবরটা পেলে কোথায়, জাহাজে Siesmographএ?

মোহিত বল্‌লে, জাহাজে নয় মনে···

কথার ধারাটা যেন চল্‌ছিল একটা হাসিমেশানো বিদায়-পালার মত। কৃপালানি একটু ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, তোমাকে আমার বডড ভয় হয়, বাবুজী··কখন কী ক'রে বস!

মোহিত হেসে বল্‌লে, সত্যি!

—ঠাট্টার কথা নয়, বাবুজী...তুমি হচ্ছ ভয়ানকভাবে ভাবুক। তোমার মন ত ফটোগ্রাফের প্লেটের মত নয়, তাতে অদৃশ্য চিত্রকরের তুলির অনেক রংও এসে পড়ে। ভয়ের কথা এই যে এই রংগুলো আমাদের মত সাধারণ লোকের পরিধির মধ্যে আসে না।

মোহিত আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে, তুমি ভেবো না, কৃপালানিজী! আমার মন তুমি যেমনটি বল্‌ছ তেমনটি যদি সত্যি সত্যি হয়ে থাকে তাহ'লে আমি অক্ষত শরীর নিয়ে ফিরে আস্‌ব।

ব'লে মোহিত তার ক্যাবিনের দিকে চলে গেল। কৃপালানী একটুখানি ঘাড় নেড়ে যোশীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, বাবুজী, এই জাহাজে তোমার বন্ধুটি আর ফিরবে না। পুরাণো ঘাটে পুরাণো মালমসলার মাঝখান থেকে সে কিছু দিনের জন্যে রেহাই চায়, তার মনটাকে ভাল করে পরখ ক'রে দেখবার জন্যে।

ক্যাবিনে গিয়ে মোহিত তার জিনিষ-পত্তর গুলো সব গুছিয়ে রাখলে। চিদম্বরম্‌ ছিল না, তাই সে নির্ব্বিবাদে এবং নিরুপদ্রবে তার কাজকর্ম্ম সেরে গুটিকয়েক জিনিষ নিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশ ড্রইং-রুমে হাজির হ'ল।

শীলা সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মোহিত হেসে তাকে বল্‌লে, নেপল্‌স্‌এর ভবঘুরে গায়কদের mandoline বাজানো শুনেছি খুবই নাকি সুন্দর... গোধূলির আঁধারের সাথে তার ছায়া ঘুরে ঘুরে মরে, আলোর কিরণ রেখায় তা' ভাস্বর হয়ে ওঠে···

নেপল্‌স্‌ এ নেমে মোহিত বললে, আজ আর কোথাও ঘুরব না শীলা···ভিসুভিয়স্‌এর সামনে যাবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই!

শীলা বিস্মিত সুরে প্রশ্ন করলে, কেন?

—দূর থেকে যা' দেখেছি তার গভীরতা নষ্ট হয়ে যাবে ওর সামনে গেলে। ওর ধ্বংস-লীলার কথা মনে হবে বারবার, ওর পেছনে যে সব-ছড়িয়ে-যাওয়া একটা অনুপম রহস্য আছে সেটার দ্বার যাবে খুলে।...সে আমি চাইনে, শীলা···

—কেন মোহিত?

—কেন, জানি না। আজ শুধু স্তব্ধভাবে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত নিবিড় করে অনুভব করে নিতে চাই...বাইরের কোন প্রকার বাতাসকে আমার মানস-সরোবরে একটুও ঢেউ তুলতে দেব না আমি।

—তাহ'লে কোথায় যাবে?

—যেদিকে দু'চোখ যায়···

কথাটা বলা খুবই সহজ, কিন্তু বাস্তবের নগ্নতায় তার

মাধুর্য্য অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যায়। শীলা কিন্তু কোনই প্রতিবাদ করলে না—সে স্থিরই করে এসেছিল আজ সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেবে মোহিতের কাছে...আত্ম-বিসর্জ্জনের যে সুখ তা' সে গভীর ভাবে উপভোগ করে নিবে নেপ্‌ল্‌স্‌এ—মোহিতের সাহচর্য্যে।

পথ-ঘাট মোহিত কিছুই চিনে না। দল ছাড়া এই দুটি তরুণ-তরুণী কী-করবে ঠিক করতে না পেরে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সমুদ্রের ধারে বিশাল promenade-এর পাশ দিয়ে। দূরে জাহাজের ছবি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

শীলা বললে, আমরা যে সহর ছেড়ে চলে আসছি মোহিত!

মোহিত জবাব দিলে, সহরের মাঝেই যে থাকতে হবে তার কি কোন মানে আছে।

শীলা চুপ করে রইল।

মোহিত তখনও promenade ধরে হাঁটছে। শীলা একটু ক্লান্তি বোধ করছিল, সে আস্তে আস্তে মোহিতের বাঁ-বাহুর মধ্যে নিজের ডান হাতটি গলিয়ে দিলে।

এতক্ষণ মোহিতের যেন কোন খেয়ালই ছিল না, শীলার হাতের স্পর্শে সে একটুখানি সচকিত হয়ে বললে, তোমার ক্লান্তি বোধ হচ্ছে শীলা?

শীলা ঘাড় নাড়লে।

মোহিত বললে, আমার বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে, শীলা··· আর একটুখানি চলো, কোলাহল থেকে আরও দূরে চলে যাই, তারপর বসব কোথাও।

একটু পরে শীলা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে, আমাদের ষ্টিমার ছাড়বে তিনটায় সেটা ভুলে যাওনি ত?

হেসে মোহিত উত্তর দিলে, ভুলতে চাইলেও ষ্টিমার কি তা ভুলতে দিবে? তার বাঁশী বেজে উঠবে দৈত্যের হুঙ্কারের মত···জানাবে, ওগো, এসো, আমার বিশাল ছায়ার মধ্যে আবার আশ্রয় নাও··

খানিকটা দূর গিয়ে মোহিত দাঁড়ালে···সমুদ্রের নীল রেখা সেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকার হয়ে দিগন্তে মিশে গেছে···ঢেউ-এর উদ্দাম উচ্ছ্বাস সেখানে নেই বললেই চলে, মাঝে মাঝে দুই একটা স্রোত মাটিতে এসে লাগছে, যেন লুব্ধ প্রেমিক এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রেয়সীকে লুকানো চুমু খাচ্ছে, আবার লজ্জারুণ মুখে সরে যাচ্ছে...

শীলা বললে, ভারী সুন্দর এখানকার জলটা না মোহিত?

মোহিত বললে, আমার কী মনে হচ্ছে জানো।

—কী?

—জীবন-পথের আশেপাশে সুধায় ভরা কত ফল পাতার আড়ালে ঢাকা থাকে, আমাদের চোখ নেই বলে আমরা তা এড়িয়ে যাই, উপবাসী ক্ষুধা নিয়ে ঘুরে বেড়াই অনিশ্চিতের পেছনে। তার ফল হয় এই যে শ্রান্তি এবং অবসাদে আমাদের মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

—এখনও কি তুমি অনিশ্চিতের পেছনে ঘুরছ?

—না···কিন্তু সেই ব্যর্থ ঘোরাটির কথা বিশেষ করে মনে হচ্ছে আজ, যেহেতু অজান্তে সহসা সুধার রস আমার মিলেছে।

শীলা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

মোহিত তার বাঁ-বাহুতে আবদ্ধ শীলার ডান হাতটি নিজের হাতের দুটি মুঠোর মধ্যে নিয়ে ঠোঁটের কাছে এনে তাতে ছোট্ট একটি চুম্বন করে বললে, দেশ থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন কি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম এম্‌নি অকস্মাৎ সাগর দোলার ঢেউএর সাথে সাথে আমার মনের ছন্দঃ প্রকাশিত হয়ে উঠবে সজীব একটি মূর্ত্তিতে, যে আমার স্বপ্ন-প্রিয়ার সাক্ষাৎ মিলবে পৃথিবীর মাটির বাইরে?

শীলা অসহ্য পুলকে-ব্যথায় চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু, মোহিত, মাটির সাথে যার সম্বন্ধ নেই তা'ত বুদ্‌বুদের মত সাগরের বুকেই মিশে যাবে! ঢেউত কখনও স্থির নয় সে যে চিরচঞ্চল!

গভীর ভাবে খানিকক্ষণ চিন্তা করে মোহিত হঠাৎ বললে, শীলা, আজ আমার মাথার ঠিক নেই···কত কথাই যে মনে আসছে কী বলব! যদি অন্যায় কিছু ক'রে বা বলে বসি তাহ'লে আমার ক্ষমা করো!

এ আবার কী কথা?—গভীর বিস্ময়ে শীলা মোহিতের দিকে তাকালে। মোহিত তার ভীতত্রস্ত চাউনী দেখে

আশ্বাসের সুরে তাকে বললে, ভয় পাবার কিছু নেই···আমার খেয়ালগুলো শুধু তুমি আজকের দিনটির মত মাপ ক'রে নিয়ো।

খুব ধীরস্বরে শীলা বললে, কিন্তু তুমি আজ এত অস্থির হ'য়ে উঠ্ছ কেন?

—অস্থির হয়ে উঠ্ছি কি?

—কেন, তুমি নিজে কি সেটা বুঝ্তে পার্ছ না, মোহিত?

—হবে!···বলে মোহিত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। শীলা বললে, অমন ক'রে গম্ভীর হয়ে থেকোনা এখন।··· এই না তুমি বল্‌ছিলে আজকের সময়টুকুর প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ভরে দিবে নিবিড় আনন্দের ছটায়?...আর এখ্‌খুনি তোমার মুখ হয়ে আস্ছে বর্ষার থম্‌থমে আকাশের মত!

মোহিত জবাব দিলে, সত্যি শীলা, আমার এমন গম্ভীর হয়ে থাকাটা উচিত হচ্ছে না!...ব'লে সে শীলাকে দু'বাহুতে জড়িয়ে ধরে তার রক্ত অধরে চুমু খেলে···তারপর হেসে বললে, এবার আর নালিশ কর্‌বে না ত?

শীলা কিন্তু সন্তুষ্ট হ'ল না, বললে, কিন্তু তোমার সব ভাবভঙ্গীর মাঝে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য কর্‌ছি আজ।

এর কোন জবাব মোহিত দিতে পার্‌লে না। কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বললে, চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আমার মোটেই ভালো লাগ্‌ছে না, শীলা...এসো, ছায়ায় কোথাও বসি।

সমুদ্রের ধারেই পাহাড় উঠে গেছে আকাশের দিকে, স্তরে স্তরে। অঙ্গে তার সবুজ ঘাসের আঁচল···সোজা ঢালু পাহাড় নয়, তার মধ্যেও যেন ঢেউ খেল্‌ছে, সাগরের ঢেউএর সাথে পাল্লা দিয়ে। পাহাড়ে উঠে ছায়া সুশীতল একটি কোণ খুঁজে মোহিত বললে, এখানে বসা যাক্ এখন...

শীলা বস্‌ল। মোহিত আর কোন কথাটি না বলে তার কোলের উপর মাথাটি রেখে সটান শুয়ে পড়্‌ল।

শীলা প্রথমে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছু না বলে গভীর স্নেহ ভরে মোহিতের মাথার কালো চুলগুলো নিয়ে খেলা কর্‌তে কর্‌তে বললে, তুমি কিন্তু ভয়ানক খেয়ালী হয়ে উঠ্ছ আজ, মোহিত!

মোহিত তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে জবাব দিলে, হুঁ···

—হুঁ নয়, সত্যি···

মোহিত প্রশ্ন কর্‌লে, তুমি আমার খেয়ালীপনা ভালোবাস না, শীলা?

তার কথায় অভিমানের সুর। শীলা মোহিতের চুলগুলোর মধ্যে দ্রুতবেগে অঙ্গুলী চালনা করে বললে, ভালোবাসি বৈ কি...তোমার খেয়াল যে এ···

মোহিত চুপ করে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। খানিক পরে প্রশ্ন কর্‌লে, তোমাদের দেশে আকাশ বোধ হয় এমন নীল নয়, নয় কি শীলা?

শীলা বললে, না···শাদা কুয়াসা আর কালো ধোঁয়াই যে আকাশকে ছেয়ে রাখে সেখানে। সোনার আলো সেখানে যদি কখনও দেখা যায় তাহ'লে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে সকলের প্রাণে।

মোহিত প্রশ্ন করলে, তোমার দেশে পৌঁছে তুমি সবই ভুলে যাবে শীলা, নয় কি?

একটুখানি ইতস্ততঃ ক'রে নত হয়ে মোহিতের কপালের উপর চুলের কাছটায় একটি চুমু খেয়ে শীলা বললে, ভুল্‌তে পারতুম, মোহিত, যদি এর সাথে গভীর অনুবেদনার যোগ না থাক্‌ত।...তুমি একটা জিনিষ ভুলে যেয়োনা যে আমরা হচ্ছি মেয়ে, আমাদের অনুভূতির তন্ত্রীতে যদি একবারটি আঘাত লাগে তবে তার মূর্চ্ছনা সমস্ত চৈতন্যকে দেয় আচ্ছন্ন ক'রে···সে কি কখনও ভোলা যায়, মোহিত?

—কিন্তু দেশের মাটীতে পা' দিতেই ত সবাই তোমাকে ছেঁকে ধর্‌বেন চারিদিক থেকে।···তখন কি আর সাগর দোলায় ঢেউখানির কথা তোমার মনে থাকবে শীলা?

গভীর ভাবে শীলা জবাব দিলে, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, মোহিত, সমুদ্র অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ হয়েই আছে—শুধু উপরে উপরে ঢেউ উঠ্‌ছে, জোয়ার-ভাঁটা চল্‌ছে।···সমুদ্রের আসলরূপ দেখ্‌তে পাবে অভ্যন্তরে, যেখানে আছে এক রহস্যময় জগৎ···বাইরে ত' শুধু ফেনিল উচ্ছ্বাস মাত্র!

মোহিত শান্তভাবে শীলার কথাগুলি মনের মধ্যে গ্রহণ

কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। খানিক পরে বল্‌লে, আমার কিন্তু ভয় হয়, শীলা···

বিস্মিত হয়ে শীলা প্রশ্ন করলে, ভয়? কেন গো?

—ভয় হয় এই ভেবে যে সমুদ্রের অন্তরের রহস্য বড় গভীর, অতলস্পর্শী। তোমার ভালোবাসা যদি সেরকম না হয়ে তার উপরকার ঢেউএর মত চঞ্চল এবং ক্ষণিক হ'ত তাহ'লে বোধ হয় ভালো হ'ত···

গভীর বিস্ময়ে শীলা বললে, এ কী বলছ তুমি, মোহিত?

—একটুখানি কেমন ঠেক্‌ছে, না?···আসল কথাটি হচ্ছে এই যে তোমার ভালোবাসার গভীরতা আমায় করে দিচ্ছে ত্রস্ত। আমার মন তাই বলছে উভয়ের মুক্তির জন্যে যত শীগ্‌গির বিদায়ের মুহূর্ত্ত চলে আসে ততই বোধ হয় হবে ভালো!

—কিন্তু তোমার অনুবেদনাও যদি আমারই মত গভীর হয়ে থাকে তাহ'লে বিচ্ছেদে ত সান্ত্বনা মিলবে না, মোহিত...

—মানি, কিন্তু এক্ষেত্রে বিচ্ছেদ ছাড়া উপায় কী শীলা?···যা' অবশ্যম্ভাবী তাকে উপেক্ষা করে ত কোন লাভ নেই! তাই বলছি, জোর করেও মনকে বিশ্বাস করাতে হ'বে যে এ সাগরদোলায় ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয়!···সাগর-অন্তঃপুরের নিস্তব্ধতার কথা ইচ্ছা করেই যাব ভুলে!

—পারবে?

—না পার্‌লেও চেষ্টা করতে হবে, শীলা!···এবং সেই জন্যেই বিদায়টাকে করে তুলতে হবে অকস্মাৎ, যাতে চিন্তা করবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত মন না পায়···ভাববার অবসর পেলেই মন যাবে ঢেউএর নীচেকার রহস্য আবিষ্কারের লোভে।

শীলা কিছু বল্‌লে না। মোহিতের মনের দ্বন্দ্ব সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি কর্‌ছিল···বুঝতে তার কোনই কষ্ট হচ্ছিল না, কারণ তার মনের মধ্যেও যে সেই একই ছন্দে গাঁথা বিক্ষোভের প্রবাহিণী চলছিল। সে ধীরে ধীরে মোহিতের কপালটির উপর তার ডান হাতটি রাখলে।

মোহিত এই স্নেহস্পর্শ উপভোগ কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে, যদি আমাদের এমনি বিচিত্রভাবে দেখা না হ'ত তাহ'লে কোন ক্ষতি হত কি?

শীলা বল্‌লে, না···অনুভূতি না থাক্‌লে অভাবের কথা যে উঠ্‌তেই পারেনা!

খানিকক্ষণ নীরব থেকে মোহিত বল্‌লে, জানো, এক একবার ব্রাউনিংএর মত আমার বলতে ইচ্ছা হয়, এই যে বেদনাপূর্ণ আনন্দের ছোঁয়াচটুকু পেয়েছি এই বা কম কি? এর দামও ত' নগণ্য নয়!···কিন্তু নিজের জীবনের ছন্দের সাথে ব্রাউনিংএর ফিলসফি মিলাতে গিয়ে দেখি, ব্রাউনিংএর মত দৃঢ়তা এবং বিশ্বাস আমার নেই!

সান্ত্বনামিশ্রিত ভাষায় শীলা বল্‌লে, সে অভাব শুধু তোমার একা নয়, মোহিত···বিশ্বজোড়া লোকের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

অনেকক্ষণ মোহিত চুপ করে শীলার কোলে মাথা রেখে শুয়ে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে শীলার মাথাটি নিজের বুকের উপর চেপে ধরে বল্‌লে, কেন যে তোমায় ভালোবেসেছি, শীলা, আমি নিজেই বুঝতে পারছিনা···আমার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ছিল তোমাকে ভালোলাগার বিরুদ্ধে, কিন্তু মনের খেলা এমনই বিচিত্র যে সে কোন বাঁধা আইন-কানুন মেনে চলেনা—সে চলে তার নিজের খুসীতে···খেয়াল মত···

দুপুর পড়ে আস্‌ছিল তখন। মোহিত মৃদুস্বরে বললে, খিদে পেয়েছে, শীলা, না?

শীলা একটুখানি হাস্‌লে।

মোহিত বল্‌লে, কিন্তু আজ তোমায় উপোসী থাক্‌তে হ'বে শীলা···এখান থেকে আমি এখন নড়্‌ছিনা—আর এ জায়গায় বসে খাবার ত মিলবে না!

শীলা শুধু বল্‌লে, দরকার নেই কিছু···

মোহিত বল্‌লে, আচ্ছা, শীলা, যদি তোমার সাথে আর দেখা না হয় তাহ'লে তুমি আমার সম্বন্ধে যা' তা' ভাব্‌বে কি?

অবাক হয়ে শীলা বললে, তোমার মনের মধ্যে দুরন্ত একটা খেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, মোহিত, আমার কাছে তুমি লুকোবার চেষ্টা ক'রো না!

ম্লানহাসি হেসে মোহিত বললে, খেয়াল কিছুই নেই, শীলা···যা' মনে আসছে তাই শুধু বলছি···

মোহিতের বুকে মুখ লুকিয়ে শীলা প্রশ্ন করলে, আমায় তুমি বলোনা কী প্ল্যান্ তোমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে এখন···

তেমনি হেসে মোহিত জবাব দিলে, প্লান থাকলে ত বল্‌ব, শীলা !···মনটা হয়ে উঠেছে ভবঘুরে, বাঁধন মানছে না, নিয়ম শুনছেনা, তাই মুখের ভাষার মধ্য দিয়ে যা-খুসী-তাই বলাচ্ছে !

ঘড়িতে দুটো যখন বাজ্‌ল তখন শীলা বললে, এবার ত উঠতে হ'বে মোহিত··জাহাজ ছাড়বে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।

মোহিত তার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, হাঁ, এবার তোমায় ষ্টীমারে পৌছিয়ে দিতে হ'বে···

উঠ্‌ল। সাগরপার ধরে আবার তারা হাঁটা সুরু করলে, নেপল্‌স্‌এর জনকোলাহলের অভিমুখে। পথে তারা শুনলে জাহাজের প্রথম বাঁশী বাজ্‌ল।

মোহিত বললে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে, শীলা, জাহাজে পা' দেবার সাথে সাথেই চলা সুরু হবে কিন্তু···

—Miss করব না ত ?

—না···ঠিক সময়ে আমরা গিয়ে পৌছিব।

জাহাজের কাছে যখন তারা গিয়ে পৌছ্‌ল তখন সিঁড়ি তুলে নেবার মাত্র মিনিট দশেক বাকী। শীলা আর মোহিত তাড়াতাড়ি উপরে উঠে চলে গেল।

যোশী আর কৃপালানি ফার্ষ্টক্লাশ ডেকের সামনেই দাঁড়িয়েছিল—এই যাত্রী-দুটির আগমন প্রতীক্ষায়। তাদের আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যোশী বললে, আমাদের যা' ভাবনা হয়েছিল, মিস্ রজার্স···ভাব্‌লুম আজ মোহিতের পাল্লায় পড়ে বুঝি ভিসুভিয়সের আগুনের চারদিকে বুঝি ঘুরেবেড়াতে আরম্ভ করেছ আলেয়ার মত !

শীলা বল্‌লে, আমরা ত ভিসুভিয়স্ দেখ্‌তে যাইনি', যোশী। আমরা ওইদিক দিয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিলুম অনেক দূর—পাহাড়ের মধ্যে···

মোহিত এমন সময় "এই এখ্‌খুনি আস্‌ছি" ব'লে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কৃপালানি বল্‌লেন, বাবুজী—মিঃ সেন—কোনরকম পাগ্‌লামি করেননি' ত ?

রাঙা হয়ে শীলা জবাব দিলে, না...তবে আজ তাঁর মনটা খুবই চঞ্চল ব'লে মনে হচ্ছিল।

কথা বল্‌তে বল্‌তে তারা রেলিং থেকে সরে এসে দাঁড়ালে।

জাহাজের শেষ বাঁশী বাজ্‌বার সাথে সাথে সিঁড়ি উঠিয়ে নেওয়া হ'ল। ভিসুভিয়স্ এবং পম্পিয়াই দেখে প্রত্যাগত যাত্রীরা এখানে ওখানে জটলা করে খুব গভীর তর্ক এবং আলোচনা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। একটি সুন্দরী তরুণীকে ঘিরে কয়েকটি যুবক ভীষণ উৎসাহের সহিত রোম্যান্ যুগের চিত্রকলা সম্বন্ধে মত-প্রকাশ কর্‌ছিল এবং রোম্যান্ যুগের মেয়েদের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের চেয়ে তাদের সম্মুখের প্রতিমাটির বিচারবুদ্ধি অনেক বেশী তা' নানাভাবে ভঙ্গীতে বল্‌ছিল।

শীলা ভাব্‌ছিল মোহিত কোথায় গেল।...হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল তীরের দিকে। নেপ্‌ল্‌স্ বন্দরের জেটির উপর দাঁড়িয়ে মোহিত; মুখে প্রসন্ন একটি হাসি, শীলার দিকে তাকিয়ে রুমাল নাড়্‌ছে।

যোশী, কৃপালানি এবং শীলা যখন মোহিতের খেয়াল নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত তখন মোহিত সবার অজ্ঞাতে সরে পড়েছিল, এবং জাহাজ না-ছাড়া-পর্য্যন্ত সে জেটির ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, যাতে তাকে কেউ দেখ্‌তে না পায়।

শীলা অস্ফুট চীৎকার ক'রে যোশী আর কৃপালানির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্‌লে, দেখ, দেখ, মোহিত যে পড়ে রইল !

কৃপালানি আর যোশী দেখ্‌লে তারা তাকাতেই মোহিত দুটি হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে তাদের নমস্কার করলে। তারপর শীলার দিকে তাকিয়ে আবার রুমাল নাড়্‌লে।

একটি মুহূর্ত্তের জন্য শীলা কী যেন ভাব্‌লে। যোশী এবং কৃপালানির দিকে একবারটি তাকালে, তারপর নিজের রুমাল নিয়ে ঠোঁটে একবার স্পর্শ করে নাড়্‌লে।...তার সমস্ত অন্তর মথিত করে উঠ্‌ল একটা চাপাকান্নার সুর—তার

কানের কাছে বেজে উঠ্‌ল মোহিতের শেষ কথা ক'টি, মনটা হয়ে উঠেছে ভবঘুরে, বাঁধন মান্‌ছেনা, নিয়ম শুন্‌ছেনা, তাই মুখের ভাষার মধ্য দিয়ে যা-খুসী-তাই বলাচ্ছে…

মনে মনে সে বল্‌লে, তুমি তোমার মনকে শান্ত করবার পথ খুঁজে নিয়েছ, প্রার্থনা করি তুমি সফল হও।…যৌবনের প্রারম্ভে আমার মত তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে তোমার জীবন, শিক্ষা, দীক্ষা বিসর্জ্জন দেবার বিরুদ্ধে যে তুমি যুঝ্‌ছ তার জন্যে তোমাকে আমার মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতিজ্ঞাপন কর্‌ছি।

কৃপালানি আস্তে আস্তে শীলাকে প্রশ্ন কর্‌লেন,-আপনি কিছুই জান্‌তেন না এ প্ল্যানের কথা?

শীলা কোনক্রমে অশ্রুরোধ ক'রে ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

কৃপালানি একটু অবাক্ হয়ে গেল।

জাহাজ তখন ধীরে ধীরে বন্দর ছাড়িয়ে উন্মুক্ত সাগরে এসে পড়্‌ছে। দূরে নেপ্‌লস্-এর জেটির ছবি তখনও দেখা যাচ্ছিল—মোহিতের প্রস্তরসম মূর্ত্তি তখনও দৃষ্টির বহির্ভূত হয়নি', তার হাতের রুমাল তখনও নড়্‌ছিল। রুমালের প্রত্যেকটি স্পন্দনের সাথে যেন মোহিতের গভীর অনুবেদনা ঝরে পড়্‌ছিল…যেন সে বল্‌ছিল, সমুদ্র অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ এবং গম্ভীর হয়ে আছে এবং থাক্‌বেও, কিন্তু বাইরে তার ফেনিল উচ্ছ্বাস সে দৃঢ়ভাবে গোপন ক'রে রাখ্‌বে, কারণ সে পূর্ণতালাভ করেছে, অনুভূতির চরমসীমায় তার অন্তর যে পৌঁচেছে!

উন্মুক্ত সাগরের মধ্যে জাহাজ এসে পড়্‌তেই আবার সেই আগের মত দোলানির সুরু হল। আরম্ভ হ'ল ঢেউএর সেই নিষ্ঠুর খেলা, যা' অনাদিকাল থেকে চল্‌ছে…এবং যা' অনাদিকাল ধরে মানুষের মন নিয়ে যা-খুসী-তাই কর্‌ছে!

শীলা ধীরে ধীরে রেলিং থেকে সরে দাঁড়াল। তার মুখ নীরব অশ্রুতে সজল।

(সমাপ্ত)

শ্রীনবগোপাল দাস

বিদ্যালয়-সমাজ

শ্রীঅনাথনাথ বসু

(Corporation Teachers Training Collegeএ প্রদত্ত বক্তৃতা)

আজ আপনাদের একটি নূতন সমাজের কথা শুনাইব। আবহমানকাল হইতে আমাদের দেশে বিচিত্র জাতি ও ধর্ম্মের কল্যাণে নানা বিচিত্র সমাজের উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহাদের কথা আপনারা অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু আমি যে সমাজের কথা বলিব সে সমাজ বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার কারণ এই নহে যে ইহা আত্মগোপন করিয়া আছে; আমার আলোচ্য এই সমাজ গুপ্তসমিতি নহে বরং ইহা এতই সুপরিচিত ও সুব্যক্ত যে ইহাকে আমরা লক্ষ্যই করি না, ইহার সমাজরূপ আমাদের চোখে পড়ে না।

আমরা সকলেই শিক্ষাব্রতী, বিদ্যালয় লইয়া আমাদের কারবার। সুতরাং যেমন সাধারণ ব্যবসায়ে মাঝে মাঝে Stock অর্থাৎ সঞ্চিত পণ্যের হিসাব-নিকাশ করিলে ব্যবসায়ের প্রকৃত রূপটি চোখে পড়ে এবং কাজ বোঝা যায়, তেমনি আমাদের কারবারেরও হিসাব-নিকাশ করিলে আমাদের কাজ করা সহজতর হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের স্বরূপ, তাহার আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আলোচনা করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না। অবশ্য এরূপ আলোচনায় ইতিহাস বা অঙ্ক বা অন্য কোন অধ্যাপনীয় বিষয় কেমন করিয়া ভাল করিয়া পড়ান যাইতে পারে তাহার কোন ইঙ্গিত মিলিবে না। এ কথাটী পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখা ভাল তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোনরূপ অনুতাপের কারণ ঘটিবে না। আমার আলোচনা মূলতঃ শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে, শিক্ষার ফিলজফি লইয়া।

আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন "ফিলজফি" লইয়া আলোচনার লাভ কি? যিনি কর্ম্মী তিনি বলিবেন কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে "ফিলজফি" লইয়া মাথা ঘামাইতে পারি এমন অবসর কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতেছি। আমি জানি 'ফিলজফি' কথাটাই অনেকের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু সে ভয়ের কোন কারণ নাই; আমি যদি বলি আমাদের সকলেরই একটা না একটা ফিলজফি আছে এবং আমরা সকলেই ছোট বড় ফিলজফার, দার্শনিক, তাহা হইলে অনেকেই হয়ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু কথাটা একান্তই সত্য সুতরাং বিস্ময় অকারণ।

একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় জীবনে চলিবার, জীবনকে দেখিবার সকলেরই একটা না একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে; সকল কর্ম্মে ও চিন্তায় সেই ভঙ্গীর প্রভাব আছে। জীবনকে দেখিবার সেই বিশেষ রীতিকে, জীবনপথে চলিবার সেই বিশিষ্ট গতিচ্ছন্দকেই আমি 'ফিলজফি' আখ্যা দিয়াছি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা সুসংহত ও সহজ লক্ষ্য নহে। তাহা ছাড়া অনেক স্থলেই একই জীবনে একাধিক ভঙ্গী, একাধিক গতিচ্ছন্দ চোখে পড়ে। আমাদের জীবনের যত কিছু দুঃখ তাহার মূল ঐখানেই। "সূত্রে মণিগণা ইব" যে ফিলজফি আমাদের জীবনের সকল কর্ম্ম ও চিন্তা একসূত্রে বিধৃত করিয়া রাখিবে তাহা না থাকায়, আমাদের জীবনে একটিমাত্র ফিলজফি কার্য্যকরী না হওয়ায় জীবনটায় জট পাকাইয়া যায়। আমরা এক ভাবি আর করি; এক পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ আর একটা পথ ধরিয়া বসি। সুতরাং জীবনযাত্রা ব্যাহত, ছন্দোহীন হইয়া পড়ে।

এত গেল সাধারণ জীবন সম্বন্ধে, এখন তাহা লইয়া আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু যেমন জীবনকে

সফল করিয়া তুলিতে হইলে জীবন সম্বন্ধে একটা ফিলজফি, থাকা প্রয়োজন তেমনি শিক্ষাদান ব্যাপারকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষার একটা ফিলজফি থাকা একান্তই প্রয়োজন।

আমার মনে হয় আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ সব চেয়ে প্রয়োজন হইয়াছে একটা সুসংহত, সুসংবদ্ধ ফিলজফি। শিক্ষার সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূলে রহিয়াছে এরূপ একটী ফিলজফির অভাব। তাহার জন্যই আজ যে শিক্ষা দিতেছে সে জানে না কেন সে শিক্ষা দেয়, যে শিক্ষা পাইতেছে সে বোঝে না যে কেন সে শিক্ষা লাভ করে। ফিলজফির বিশেষ কাজ জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ, হিসাব-নিকাশ, কেন বাঁচি, কেমন করিয়া বাঁচি এ সকল প্রশ্নের উত্তর ফিলজফি দেয় বা তাহার দেওয়া উচিত। তেমনি শিক্ষার ফিলজফির উদ্দেশ্য শিক্ষাবিষয়ে এরূপ প্রশ্নের সুসংবদ্ধ উত্তর দান। কেন পড়াইব, কি পড়াইব, কেমন ভাবে পড়াইব এসকল প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার ফিলজফিই দিতে পারে। যদি সে ফিলজফির অভাব হয়, যদি আমাদের মনে শিক্ষা ব্যাপারের সমগ্র রূপটি না থাকে তাহা হইলেই পদে পদে বাধা আসে। কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া সম্ভব হয় না। তখন নিজের মন হইতে প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া পরের উপর উত্তরের জন্য বরাত দিই। সত্য বলিতে হইলে আমাদের মধ্যে অনেককেই স্বীকার করিতে হয় যে অমুক বিষয়টী যে পড়াই তাহার একমাত্র যুক্তিযুক্ত কারণ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"; প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার অর্থকরী বিদ্যার যুক্তি চলে না। কিন্তু এমন করিয়া ত' কর্ত্তব্য শেষ হয় না; পরের কাছে জবাবদিহী না-ই করিতে হইল কিন্তু নিজের কাছে এ জবাবদিহী চলে না। ফলে মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া ওঠে, সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা অর্থহীন, বোঝা হইয়া দাঁড়ায়; আনন্দ চলিয়া যায়। অবশ্য সুদীর্ঘদিনের অভ্যাসে মন পঙ্গু হইয়া যায়, যে গোপন প্রশ্ন একদিন মনের কোণে অলক্ষ্যে খোঁচা দিত অভ্যাসের দ্বারা তাহা জীর্ণ হইয়া যায়; তখন "সুখের চেয়ে স্বস্তি" ভাল এই নীতি পালন করিয়া অভ্যস্ত পথে সহজভাবে চলি। কিন্তু নিজের প্রতিও শিক্ষার্থীদের প্রতি কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়।

শিক্ষকদের মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় artist (শিল্পী) ও technician (কারিগর); একদল যাঁহারা শিক্ষা ব্যাপারটাকে আর্টরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর একদল যাঁহারা তাহাকে একটা বিশেষ techniqueএর অন্তর্গত করিয়াছেন। Artist ও technicianএর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। Technicianকে ঠিক শিল্পী বলা চলে না। তিনি শুধু শিল্পসাধনাকে বাহিরের বস্তুতে পরিণত করিয়া, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার বাহ্য কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার মধ্যে অন্তরের কোন প্রেরণা নাই; তাহার মধ্যে মূলতঃ অনুচিকীর্ষাই রহিয়াছে; তাঁহার কাজকে সৃষ্টি বলা চলে না। তাহার পিছনে কোন ফিলজফি নাই। কিন্তু যিনি আর্টিষ্ট তাঁহার প্রেরণা ভিতরের, তিনি যাহা করেন তাহা ভাল হউক্ মন্দ হউক সেটা সৃষ্টি-ব্যাপার। সে সৃষ্টির মধ্যে স্বাধীনতা আছে, আনন্দ আছে, পুরাতনের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নূতন কিছু করিবার প্রয়াস আছে। তাঁহার সৃষ্টির মূলে জীবনের একটি বিশেষ ফিলজফি আছে।

কারিগরের কাজ সহজ, শিল্পী হইতে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট। সুতরাং অনেকে কারিগরী করাটাইকে সুবিধা মনে করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ কারিগর অনেক পাওয়া যাইবে। বোধ করি আমাদের মধ্যে অনেকেই সেই দলে পড়িব। কিন্তু কারিগরী করিলে বেতনটা সহজে যদিও মেলে কিন্তু আত্মপ্রসাদ, সৃজনরসাস্বাদন পাওয়া যায় না, মনের খোরাক জোটে না।

আজকাল শিক্ষকদের শিক্ষায় method of teaching অর্থাৎ অধ্যাপনা-প্রণালীর উপর জোর দেওয়া হইতেছে। এ যেন কেমন করিয়া হাতিয়ার চালাইতে হয় তাহারই শিক্ষা। সে শিক্ষার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি কিন্তু তাহার চেয়েও প্রয়োজন হাতিয়ারের তত্ত্বানুসন্ধান করা; কাজের ফিলজফি খুঁজিয়া পাওয়া। হাতিয়ারও ভাল করিয়া আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে হইলে তাহার তত্ত্ব জানিতে হয়। সে তত্ত্ব না জানিলে অসুবিধা এই হয় যে পারিপার্শ্বিক

অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটিলে সাধারণের বাহিরে একটু কিছু হইলে হাতিয়ার অচল হইয়া পড়ে। অবস্থার ইতরবিশেষে যন্ত্রচালনারও ইতর বিশেষ ঘটে; যে অন্ধভাবে যন্ত্রকেই চিনিয়াছে সে কেমন করিয়া নিপুণভাবে সে পার্থক্য বিচার করিতে পারিবে? তাহার জন্য প্রয়োজন যন্ত্র-তত্ত্বজ্ঞান।

Method শিক্ষা করা শিক্ষকতার ক্ষেত্রে কারিগরি করা। সেই কারিগরীর পিছনে তত্ত্ববোধ থাকা চাই, শিক্ষার ফিলজফি চাই। কেমন করিয়া কাজটা করিব তাহা জানিবার পূর্ব্বে, অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গেই, জানা চাই কেন কাজ করিব, কি উদ্দেশ্যে করিব। এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাইলেই তখন কেমন করিয়া কাজটি সুসম্পন্ন করিব সে প্রশ্ন উঠিবে।

শিক্ষা ব্যাপারটাকে দুইদিক দিয়া দেখা চলে। এক, ব্যক্তির দৃষ্টি লইয়া; দুই, সমাজের দিক দিয়া। শিক্ষাতাত্ত্বিক-গণকেও এইভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে; একদল, যাঁহারা শিক্ষাকে ব্যক্তিগত ব্যাপার রূপে ধরিয়া লইয়া সেই ভাবে বিচার করেন; আর একদল, যাঁহারা তাহাকে সামাজিক ব্যাপাররূপে ধরিয়া লইয়া আলোচনা করেন। যাঁহারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী তাহারা বলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন। আবার যাঁহারা সমাজকে বড় করিয়া দেখিয়া বলেন, সমাজের সুচিরসঞ্চিত আধ্যাত্মিক সম্পদে অধিকার দান করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য; কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর-বিরোধী সত্তা নহে; সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীকেও স্বীকার করিতে হয় যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সমাজ-নিরপেক্ষ নহে; এবং সমাজ-বাদীকেও স্বীকার করিতে হয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষাপ্রণালী গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। এক নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছাড়া আর সকলেই বোধ করি একথা অল্পবিস্তরভাবে স্বীকার করেন। সম্প্রতি আর একদল চরম সমাজবাদী বা রাষ্ট্রবাদী দেখা দিয়াছেন; তাঁহাদের মতে ব্যক্তির রাষ্ট্রাতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নাই। আমাদের দেশে এখনও সে মত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই সুতরাং সে মতের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদটা কিছু আলোচনা করিতে চাহি, কারণ আমাদের জাতীয় জীবনে সেই মতবাদের প্রভাব নানা ভাবে রহিয়াছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব বেশীদিনকার নহে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ইহার যে রূপ আমরা দেখিতেছি তাহার জন্ম য়ুরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে। ঐতিহাসিক হয়ত এই জন্মকাহিনী আরো পুরাতন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতির অন্যতম প্রধান তত্ত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি। ডারইউন যখন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়া যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest) ও জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence) এই দুই নীতি ঘোষণা করিলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতির জন্ম হইল তখন। ধীরে ধীরে সেই নীতি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নহে সমাজবিজ্ঞানেও আপন প্রভাব বিস্তার করিল। নানা কারণে তখনকার য়ুরোপের অর্থনৈতিক আবহাওয়াও ছিল এই নীতির অনুকূল। তাহা ছাড়া এই সময়েই গণতন্ত্রবাদ প্রবল হইয়া দেখা দেয়। একদিক দিয়া গণতন্ত্রবাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতির বিরোধ রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি য়ুরোপের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতিও য়ুরোপ হইতে আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া যে শাসক-সম্প্রদায়ের স্পর্শে এই দুই নীতি আমাদের জাতীয়জীবনে আত্মপ্রকাশ করে তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নীতির পরিপোষণা করিতেন। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি সহজেই এদেশে সমাদর লাভ করিয়াছিল। আমরা আজকাল যে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক আবহাওয়ায় বাস করিতেছি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি বলবান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইহার কি ফল হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার কি ফল হইয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

আপনারা সকলেই শিক্ষার তিরস্কার ও পুরস্কারের ব্যবস্থার

সহিত পরিচিত আছেন; যে ছাত্র ভাল তাহাকে আমরা পুরস্কার দিই, যে ভাল নহে তাহাকে তিরস্কার করি। এই ভাবে শিক্ষায় আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছি। ইহা খুবই স্বাভাবিক; বাহিরের সমাজ যখন সেই নীতি অনুসরণ করিতেছে তখন শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহার প্রভাব আসিয়া পৌছাইবে তাহাতে বিচিত্র কি? আমি অবশ্য বাছাই-এর অপক্ষপাতী নহি সংসারই ত বাছাই করিয়া লয়; জীবনে যোগ্যতমের উদ্বর্তন কিছু পরিমাণে হয়ই; কিন্তু সেই উদ্বর্ত্তনের ফলে যদি অপেক্ষাকৃত অযোগ্যের সমূহ ক্ষতি হয় তাহা হইলেই সমাজদেহ সেই নীতির দ্বারা কণ্টকিত হইয়া ওঠে।

চারিদিকে পুরস্কারবিতরণী সভার ঘটা দেখিয়া মনে হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি একান্ত উগ্রভাবেই শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৃত্তিপরীক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার দেখিলে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। পুরস্কার দিবার সময় আমরা ভাবিয়া দেখি না যে এই ভাবে বহুতমের যে ক্ষতি করিতেছি তাহা পূরণ করিবার কোন আয়োজনই আমরা করি না। যে ভাগ্যবান পুরস্কার লাভ করেন তাহাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে গিয়া আমরা সুব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন ধিক্কারের দ্বারা অন্য বহু ছাত্রের প্রতি অবিচার করি। যে ক্ষুদ্র শক্তি অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল আমাদের অযত্নে ও অবহেলায় তাহা আপনার উপর বিশ্বাস হারাইয়া অকালেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। অথচ এরূপ অল্পশক্তি লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে তাহারাই ত' সমাজের সংখ্যা-বহুল। যে শক্তিমান্ তাহার শক্তি কর্ম্মে নিয়োজিত করা যত বড় সমস্যা তাহার চেয়েও বড় সমস্যা সংখ্যাবহুল অল্পশক্তি জনসাধারণের সেই অল্প পরিমাণ শক্তি কি ভাবে কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া সফল করিয়া তুলিতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি অস্বীকার করি না প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি কিছু ফল দেয় কিন্তু সেটা যখন অসংযত উগ্র হইয়া দেখা দেয়, তখন সমাজের অকল্যাণ ঘটে। যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যনীতির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা, তাহার পরিণতিও তাহাই। এককালে ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে, ব্যক্তি ও সমাজকে আমরা পরস্পর-বিরোধী সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং য়ুরোপের আদর্শে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেই সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। পাশ্চাত্য জীবনে তাহার উগ্রপ্রকাশের ফলে আমরা সেখানকার সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির যে রূপ দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় কথাটা ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। আমেরিকায় Social planning বলিয়া একটি কথা আজকাল শোনা যাইতেছে; তাহার অর্থ করা যাইতে পারে সমাজ গঠন। সে দেশের মনীষীগণ বলিতেছেন একটা হিসাব করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া সমাজকে নূতন করিয়া পত্তন করিতে হইবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মিথ্যা দাবী দ্বারা মুগ্ধ হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারাকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না।

ইহা ত গেল এক পক্ষের কথা; অপর পক্ষের কথাও শোনা যাউক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলিবেন সংহত সমাজের ব্যক্তির প্রতি অবিচারের কথা ভুলিলে চলিবে না। অনেক সময়েই সামাজিক বিধিবিধান ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই মতের মধ্যে কিছু পরিমাণ সত্য যে আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেখানে সামাজিক বিধান ঐশী অধিকারের দাবী করিয়া বসে সেইখানেই দুঃখের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে ইহার উদাহরণ না দিলেও চলিবে।

মোটের উপর আমরা দুইটী চরমপন্থার কোনটিই স্বীকার না করিয়া মধ্যপথ গ্রহণ করিব। আমরা বলিব ব্যক্তির প্রতিও আমাদের কর্ত্তব্য আছে সমাজের প্রতিও আমাদের কর্ত্তব্য আছে এবং এই উভয় কর্ত্তব্যের মধ্যে কোনটাকেই ফেলা যায় না।

আমার মনে হয় প্রাচীন ভারতে ব্যষ্টির ও সমষ্টির এই আপাত-প্রতীয়মান বিরোধ সমাধানের একটা চেষ্টা হইয়াছিল চতুরাশ্রম পরিকল্পনায়। সকলেই জানেন আপনার প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অধিকার ও যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য প্রথম আশ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরবর্ত্তী আশ্রম পুরাপুরি সামাজিক কর্ত্তব্য পূর্ণ করিবার জন্য বীত হইত। তাহার পর ধীরে ধীরে ব্যক্তি আপনার

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের কর্ম্মে আপনাকে নিয়োজিত করিত। শেষ আশ্রমে যতীধর্ম্মী ব্যক্তি সমাজের বাহিরে গিয়া পড়িত; সমাজের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য তখন শেষ হইয়া গিয়াছে তখন তাহার চেষ্টা আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান।

আমার মনে হয় না ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র কোথাও এত সুন্দর ভাবে ব্যক্তির ও সমাজের মিলন বিধানের আয়োজন করা হইয়াছিল।

চতুরাশ্রমের কথা আমরা আজ ভুলিয়াছি; যে সমাজে তাহা প্রচলিত ছিল সে সমাজ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, সে যুগ, সে কাল চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার কথা লইয়া দুঃখ করিলে চলে না।

তবে যেমন করিয়াই হোক্ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে মিলনসাধন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আজ যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। একদিকে জীর্ণ বিধ্বস্ত-প্রায় প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পড়িতে আপনার অধিকার আঁকড়াইয়া রহিয়াছে; সকলেই তাহার শাসন অস্বীকার করিতেছে কিন্তু তবুও বনিয়াদি ঘরের রিক্তবিত্ত বৃদ্ধের মত সমাজ তাহার প্রাচীন গৌরব ভুলিতে না পারিয়া আহত অভিমানে বৃথা আস্ফালন করিতেছে এবং শাসন জারি করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর একদিকে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার চলিতেছে, সেখানে কোন সংযম নাই, কোন শৃঙ্খলা নাই, বহুর প্রতি কর্ত্তব্য স্বীকার ও পালন করিবার চেষ্টা নাই।

একথা বোধকরি আজ কেহই অস্বীকার করিবেন না যে এখন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে সকল চেয়ে বড় সমস্যা ভাবী সমাজ গঠন। সে সমাজ কিরূপ হইবে, তাহাতে প্রাচীনের কতখানি থাকিবে, নূতন কি কি আনিতে হইবে সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সে সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে যে সে সমাজ সকলের সহযোগিতায় বহুর কল্যাণে সার্থক হইবে; বহুকে বঞ্চিত করিয়া একের কল্যাণ সাধন সে সমাজের আদর্শ হইবে না। সে সমাজে ব্যষ্টির ও সমষ্টির মিলন সাধিত হইবে। ভাবী ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে আমার এই মতের সঙ্গে আশা করি কাহারও মতদ্বৈধ হইবে না।

যদি জাতীয় জীবনের এই আদর্শ স্বীকার করি তাহা হইলে সেই সঙ্গেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে আমাদের শিক্ষার আদর্শও এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে। শিক্ষার আদর্শকে সমাজ গঠনের আদর্শের পরিপোষক করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার ফলে শিক্ষাপ্রণালীর কি রূপান্তর ঘটিবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শিক্ষা ব্যাপারে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে কি ভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করি।

যে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিল তাহার অবস্থা আলোচনা করিলে সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ ভাল করিয়া বোঝা যায়। বিদ্যালাভ করিলে উপার্জ্জনক্ষম হওয়া যায় এ কথাটার বিচার এ ক্ষেত্রে না করিলেও চলিবে। যে বিদ্যালাভ করিয়াছে শিক্ষা সমাপনান্তে সে কোন কোন্ অধিকার লাভ করিল সেটাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমেই চোখে পড়ে অধীতবিদ্য ব্যক্তি সমাজে তাহার স্থান লাভ করে; এতদিন একহিসাবে সে কিছু পরিমাণে সমাজের বাহিরে ছিল, বিদ্যা লাভ করিয়া সে যেন নূতন করিয়া সমাজে প্রবেশ অধিকার পাইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ও তাহারই ভিতর দিয়া সমগ্র মানব-সমাজের সকল সম্পদের অধিকার লাভ করিল। পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া চলিতে শিখিল; সামাজিক কর্ত্তব্য পূর্ণ করিবার যোগ্যতা ও দায়িত্ব লাভ করিল। তাহারই সঙ্গে সে শিখিল কেমন করিয়া তাহার নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করিতে হয়; তাহার নিজের যে বিশেষত্ব আছে কেমন করিয়া তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়।

আমি অবশ্য আদর্শ শিক্ষাপ্রণালীর কথা ভাবিয়াই বলিতেছি। দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহার দ্বারা হয়ত ইহার মধ্যে কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা আমার আলোচনার বিষয় নহে।

ক্ষুদ্র শিশু যে ভাবে শিক্ষা আরম্ভ করে তাহার মধ্যেও আমরা সমাজের ও ব্যক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই। যে আবহাওয়ার মধ্যে সে জন্মলাভ করিয়াছে তাহারই সহিত বোঝাপড়া করা, তাহার সঙ্গে নিজেকে

খাপ খাওয়াইয়া লওয়াই তাহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহার শিক্ষা। কথা বলা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সকল চেষ্টার মধ্যে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়। আপনার যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহার পরিধি বিস্তার করাই যেন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। সেই ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ছাড়াইয়া যেদিন সে বাহিরের জগতের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পাইল সেইদিনই তাহার নবজীবনে দীক্ষা হইল।

শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া; সমাজকে বাদ দিয়া শিক্ষা চলে না। এসম্বন্ধে আমি প্রসিদ্ধ শিক্ষাতাত্ত্বিক John Deweyর মত উদ্ধৃত করিতে চাই। তিনি বলিতেছেন—

"All education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race. This process begins unconsciously almost at birth, and is continually shaping the individual's powers, saturating his consciousness, forming his habits, training his ideas, and arousing his feelings and emotions. Through this unconscious education the individual gradually comes to share in the intellectual and moral resources which humanity has succeeded in getting together. He becomes an inheritor of the funded capital of civilisation."

ইহার সারমর্ম্ম এই যে ব্যক্তির সামাজিক বোধে দীক্ষার সঙ্গেই শিক্ষার পত্তন হয়। শৈশবে অলক্ষ্যে এই দীক্ষার ক্রিয়া চলে, ক্রমে সেই ক্রিয়া যখন সুলক্ষ্য ও সুসংবদ্ধ ভাবে হয় তখনই সাধারণতঃ আমরা শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝি তাহা আরম্ভ হয়। ডিউই বলিতেছেন, বাল্যে সামাজিক বোধের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে অলক্ষ্যে শিশুর শক্তি গঠিত হয়, তাহার অভ্যাস নিরূপিত হয়, তাহার মন বিকশিত হইয়া ওঠে, মতামত গড়িয়া ওঠে, মনের ভাব, অনুভূতি ও বেদনাগুলির গতি নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ভাবেই ধীরে ধীরে শিশু মানবসমাজের আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকার লাভ করে।

আমাদের দেশে শিক্ষা ও দীক্ষা এই দুইটি শব্দ প্রায়ই একত্রে ব্যবহৃত হয়। ইহার কারণ রহিয়াছে; শিক্ষা ও দিক্ষার সম্পর্ক অতি নিকট। দীক্ষার পূর্ব্বে রহিয়াছে শিক্ষা ও শিক্ষার অন্তে রহিয়াছে দীক্ষা। এককথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনে দীক্ষাদান; শিক্ষা না থাকিলে দীক্ষা হইতে পারে না।

এই দীক্ষা একদিকে যেমন ব্যক্তিগত হিসাবে পূর্ণতর জীবনে দীক্ষা আর একদিকে তেমনি সামাজিক জীবনে পূর্ণতর সার্থকতা লাভের দীক্ষা।

আমার এই কথা হইতে বোঝা যাইবে যে আমি ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরিপন্থী শিক্ষার পক্ষপাতী নহে। কারণ, শিক্ষার যেমন একটা সামাজিক দিক আছে তেমনি ব্যক্তিগত দিকও আছে; তাহার মূল্য কম নহে। শিক্ষার আরম্ভ ত' ব্যক্তিকে, তাহার দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলিকে লইয়া। এক হিসাবে সামাজিক অবস্থা সেই বৃত্তিগুলির বিকাশের সহায়ক মাত্র। তাহাকে শিশু বৃত্তিগুলির ও বুদ্ধির শান পাথর বলাও চলে; তাহার স্পর্শে আসিয়া সেগুলি তীক্ষ্ণ, কার্য্যক্ষম হইয়া ওঠে। তবে যেমন মাটিতে ক্ষুর শান দেওয়া চলে না তেমনি সামাজিক পারিপার্শ্বিক ব্যতীত শিক্ষা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না।

ব্যক্তিত্বের বিকাশের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ আমাদের দিতে হইবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে কোনমতে খর্ব্ব করিলে চলিবে না। কি ভাবে শিশু তাহার নিজের গতিতে নিজের ছন্দে জীবনে চলিতে পারে সেই শিক্ষা দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। তাহার জন্যে সকল প্রকার আয়োজন আমাদের করিতে হইবে। একথা ভুলিলে চলিবে না যে যে-ভাবী সমাজ আমরা গঠন করিতে চাইতেছি তাহার প্রত্যেক লোকটিকেই স্বাধীন চিন্তাশীল, স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। যে চিরদিন পরের কথা শুনিয়া চলিতে অভ্যস্ত সে স্বাধীনতা রক্ষণ করিতে পারে না। ভাবী সমাজের একটি কাল্পনিক আদর্শ মনে রাখিয়া তাহারই ছাঁচে সকলকে গড়িয়া তোলা অন্যায়, অসম্ভব। কে জানে সে সমাজ-

ঠিক কি রূপ ধারণ করিবে। বহতা নদীর মত সমাজ চিরদিনই গতি পরিবর্ত্তন করিয়া চলে। ইহাও প্রাণের লক্ষণ। মানুষের সব চেয়ে কঠিন কাজ এই পরিবর্ত্তনের সহিত তাল রাখিয়া চলা। এই চলার জন্ম প্রয়োজন,—জাগ্রত, বলিষ্ঠ, চলিষ্ণু মন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি। বাহিরের বিধিনিষেধের দ্বারা যে মানুষ নিয়ত প্রতিপদে শাসিত হইতেছে তাহার পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা অসম্ভব। ভুল করিতে করিতেই মানুষ শেখে, ভুল করিতে যে মানুষ ভয় পায়, বুঝিতে হইবে তাহার মনে জড়তা আসিয়াছে। মনের সেই জড়তা ও ক্ষুদ্রতা দূর করিতে হইলে ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে দিতে হইবে। কি করিয়া বলিব যে আজ বিশ বৎসর পরে সমাজে বাস করিতে হইলে কোন গুণগুলির প্রয়োজন সুতরাং আজ হইতে তাহাদেরই অনুশীলন করিতে হইবে। সেদিন একটা বিশেষ অবস্থায় কোন বিশেষ ভাবে চলিতে হইবে তাহার বিচার আমি আজ কি করিয়া করিতে পারি। সে বিচার করিবে যে শিশু তাহাকে আজ আমি বড় জোর স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইতে পারি। আজকার সমাজের প্রশ্নগুলি সমাধান করিতে শিখাইয়া, আজকার সমাজের সহিত বোঝাপড়া করিতে শিখাইয়া ভাবী সমাজের সহিত বোঝাপড়ার ভার তাহারই উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সুতরাং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দাবী ও সমাজের দাবী এই উভয় দাবী মিটাইয়াই আমাদের শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে করিতেই শিক্ষার আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে Dewey বলিয়াছেন—

"The only true education comes through the stimulation of the child's powers by the demand of the social situation in which he finds himself, Through these demands he is stimulated to act as a member of a unity to emerge from his original narrowness of action and feeling, and to conceive of himself from the standpoint of the welfare of the group to which he belongs."

একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়িলে শিশুর সহজাত শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। Dewey'র মতে প্রকৃত শিক্ষা অন্য কোন ভাবে হয় না।

সুইস মনস্তাত্ত্বিক (Jean Piaget) শিশুমনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন শিশু আমিত্বের যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করাই তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান অনুকূল সামাজিক আবেষ্টনের সৃষ্টি।

আমাদের দেশেও কথা আছে "কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে।" নিজের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিব বাস্তবিকই আবেষ্টনের সহিত বোঝাপড়া করিয়া যে শিক্ষালাভ হয় অন্য কোন উপায়ে সে শিক্ষা পাওয়া যায় না।

সুতরাং শিক্ষার জন্য সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হইতেছে অনুকূল আবেষ্টনের সৃষ্টি; যে আবেষ্টনের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে শিশুচিত্তের সমস্ত সুপ্ত শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে, তাহার মন শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। ইহার জন্য বিদ্যালয়-সমাজ সৃষ্টি করিতে হইবে। বিদ্যালয়কে আশ্রয় করিয়া যে সমাজ আমরা সৃষ্টি করিব তাহারই আবহাওয়ায়, তাহার সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইবে।

বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার আর একটি কারণ আমাদের উদ্দেশ্য ভারতের ভাবী সমাজ পত্তন। সে ভাবী সমাজের অধিকার লাভ করিবার শিক্ষা আরম্ভ হইবে ক্ষুদ্রতর বিদ্যালয়-সমাজের অধিকার লাভ করিয়া। সেই ক্ষুদ্রতর বিদ্যালয় সমাজে চলিতে চলিতেই শিশু একদিন বৃহত্তর সমাজে চলিতে শিখিবে। যে সামাজিকতা-বোধ জাগ্রত করিতে পারিলে ভারতের সেই ভাবী সমাজ সকলের সহযোগিতায় বহুর কল্যাণে সার্থক হইয়া উঠিবে সেই সামাজিকতা-বোধের প্রথম জাগরণ ও পরীক্ষা আরম্ভ হইবে বিদ্যালয়-সমাজে।

কিন্তু বিদ্যালয়ে সমাজ সৃষ্টি করিবার কোন্ আয়োজন আমরা করিয়াছি? আজ বিদ্যালয় বলিতে, একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম (Syllabus) এবং সেই পাঠ্যক্রম পালন করিবার জন্য কতকগুলি ছাত্রছাত্রী ও কয়েকজন শিক্ষক ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। বোধ করি একথার মধ্যেবিশেষ অত্যুক্তি নাই। বিদ্যালয়ের কোন জীবন নাই—আধ্যাত্মিক সত্তা নাই। পুঁথির উপর আজিকার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

আমি যে দেশে প্রচলিত প্রবচনের কথা বলিয়াছি তাহাতে ত পড়িয়া শেখার কথার উল্লেখ নাই। কিন্তু আমরা আজ জোর দিয়াছি সেই পড়ারই উপর। বিদ্যাকেই আমরা বড় করিয়া দেখিয়াছি।

কিন্তু বিদ্যা ত সাধ্য নহে, সাধন মাত্র। বিদ্যাদ্বারা জীবন সার্থক করিতে পারা যায় তাই বিদ্যার প্রয়োজন নতুবা নিছক বিদ্যা কোন কাজেই আসে না। বিদ্যাকে সমাজ ও জীবন হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে বিদ্যা ও জীবনের মধ্যে একটি সুগভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। বিদ্যা ব্যর্থ হইয়া যায়। বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগেই বিদ্যার সার্থকতা।

প্রাচীন ভারতের বিদ্যালয়গুলি "আচার্য্যকুল" নামে পরিচিত হইত ও শিক্ষকগণ "আচার্য্য" নামে অভিহিত হইতেন। এই দুইটি শব্দের মধ্যে শিক্ষাতত্ত্বের দুইটি গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং সেই শব্দ দুইটি বিশ্লেষণ করা যাউক।

প্রথমে "আচার্য্য" কথাটা লই। শিক্ষক আচার্য্য, যিনি আচার শিক্ষা দেন, যিনি শিষ্যকে সত্য আচারে দীক্ষিত করেন। ইহার মধ্যে কোথাও "বিদ্যা" শব্দের উল্লেখ নাই। তবে কি মনে করিব সেখানে কোনরূপ বিদ্যাচর্চ্চা হইত না? সে ধারণা মোটেই সত্য নহে। উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে শিষ্যের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির তালিকা পাওয়া যায়। তাহা পড়িলে মনে হয় সেখানে যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। কিন্তু আচার্য্যগণ জীবনে বিদ্যার স্থান বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই "আচার" অর্থাৎ জীবনে চলিবার ছন্দকে বড় করিয়া দেখিয়া বিদ্যাকে গৌণ করিয়াছিলেন। "আচার" কথাটা অধুনা-প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে ধরিলে চলিবে না। ইহার মূলগত অর্থ "চলা" অর্থাৎ গতিচ্ছন্দ।

বিদ্যার চেয়ে জীবন যে বড় সেই জন্যই তাঁহারা জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। বিদ্যা ত' উপলক্ষ্য, আচারই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের লক্ষ্য আচারকে সংহত, সংস্কৃত ও সুন্দর করিয়া তুলিতে সাহায্য করা।

যেখানে আচারকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান করা হয় সেটাকে বিদ্যালয় না বলিয়া আচার্য্যকুল বলিতে হয়।

"আচার্য্যকুল" শব্দের আর একটি গভীর তাৎপর্য্য রহিয়াছে; কুল বলিতে ক্ষুদ্র গোষ্ঠি বা সমাজ বোঝায়। প্রাচীন ভারতের আচার্য্যগণ জানিতেন সমাজে বাস করিয়াই সমাজ বাস করিতে শিক্ষালাভ করা যায়। আচার্য্যকুলকে তাঁহারা তাই ক্ষুদ্র অথচ সম্পূর্ণাঙ্গ সমাজে পরিণত করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের তপোবনের যে চিত্র আমরা পুরাতন গ্রন্থগুলিতে পাই তাহা হইতে মনে হয় তপোবনস্থ সমাজ সম্পূর্ণাঙ্গ ছিল। সেখানে আচার্য্যগণ সপরিবারে বাস করিতেন; শিষ্যগণ সেখানে আসিয়া আচার্য্যের পরিবারে যোগ দিত এবং পারিবারিক ও সামাজিক সকল কর্ত্তব্যের অধিকার লাভ করিত। তাহারা গাভীর পরিচর্য্যা করিত, কৃষিকার্য্যে গুরুর সহায়তা করিত আবার শাস্ত্রাধ্যয়ন করিত।

তপোবনের এই যে ছবি আমরা পাই তাহা সম্পূর্ণাঙ্গ একটি সমাজের ছবি।

আজ আমরা তপোবন রচনা করিতে পারিব না; কিন্তু সেখানে শিক্ষার আদর্শ প্রচলিত ছিল সে আদর্শ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

আপনারা মনে করিবেন না আমি বিদ্যালাভকে ছোট করিতেছি। আমার মতে বিদ্যালাভকে শিক্ষা প্রণালীতে তাহার ন্যায্য স্থান দিতে হইবে। একথা আজ বলা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে যে বিদ্যাদান শিক্ষায়তনগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। বরং সেটা অন্য একটা কিছুর by-product অর্থাৎ গৌণফল স্বরূপ মনে করিলে বিদ্যাদান ও লাভ ব্যাপারটি সহজতর হয় এবং লব্ধবিদ্যা জীবনে কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারে। আমার মতে আচার অর্থাৎ জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

অর্থাৎ বিদ্যালয়গুলির একটি আধ্যাত্মিক সত্তা সৃষ্টি করিতে হইবে।

যদি এমন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় যেখানে ছেলেমেয়েরা আপনা হইতেই জীবনে চলিবার ছন্দ আয়ত্ত করিতে পারিবে, আচার গঠন করিয়া তুলিতে পারিবে, নিজেকে সংযত ও শাসন করিতে শিখিবে, এবং সে শেখার মধ্যে আনন্দ লাভ করিবে, যেখানে পরস্পরের সহযোগিতায় ভাবী সমাজের নাগরিকতার অধিকার অর্জ্জন করিতে শিখিবে তবেই বিদ্যা ও জীবনের সমন্বয় ঘটিবে, জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও চিন্তার মিলন সাধিত হইবে। জীবনের প্রকৃত দীক্ষা মিলিবে।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় অনুকূল সামাজিক আবেষ্টনের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে। পুঁথির নকল আবেষ্টনের মধ্যে সে শিক্ষা হইতে পারে না।

ইহার জন্ত প্রয়োজন অনুকূল আবেষ্টনের অর্থাৎ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র সমাজের। তাহাকেই আমি বিদ্যালয়-সমাজ আখ্যা দিয়াছি।

এইখানে Deweyর আর একটি মত উদ্ধৃত করিয়া দিই।

"The school is primarily a social institution. Education being a social process, the school is simply that form of community life in which all those agencies are concentrated that will be most effective in bringing the child to share in the inherited resources of the race, and to use his own powers for social ends."

অর্থাৎ শিক্ষাদান মূলতঃ সামাজিক প্রক্রিয়া এবং বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

শিশুকে তাহার অধিকার দান করিবার জন্ত ও সমাজের সেবায় তাহার নিয়োজিত করিবার জন্ত যে অনুষ্ঠানগুলি সকল চেয়ে কার্য্যকরী বিদ্যালয়ে তাহাদেরই সমাবেশ করিয়া ক্ষুদ্র সমাজ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এই সঙ্গে তিনি বলিতেছেন Education is a process of living and not a preparation for future living. অর্থাৎ শিক্ষালাভ জীবন-যাত্রার বিশেষ একটি প্রণালী মাত্র; ভাবী জীবনের জন্ত তৈয়ারি হওয়াকে শিক্ষালাভ বলা চলে না।

তাঁহার এই উক্তিটির একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন; অনেকে মনে করেন ভাবীকালের জন্ত তৈয়ারি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এক হিসাবে ইহা সত্য। কিন্তু যদি বলা যায় আজ ডাঙ্গায় বসিয়া হাত পা ছুঁড়িতে শিখিব তাহার কারণ এই শিক্ষার দ্বারা একদিন জলে সাঁতার কাটিতে পারিব তাহা হইলে কি ঠিক হয়? যে আজ জীবনধারণ করিতে শিখিল না সে ভবিষ্যতে কেমন করিয়া জীবনের-পথে চলিতে পারিবে? ভাবীকালের প্রয়োজন সাধনের জন্ত সাঁতার কাটিতে শিখিতে হইলে আজই জলে নামা প্রয়োজন। তেমনি করিয়া ভাবীকালে সমাজে বাস করিতে শিখিতে হইলে আজই সমাজে প্রবেশ করিতে হইবে।

শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের উপযোগী সেই সমাজকেই আমি বিদ্যালয়-সমাজ নামে অভিহিত করিয়াছি। সেখানে দীক্ষা লাভ করিয়াই শিশু ভাবী বৃহত্তর সমাজে দীক্ষা লাভ করিবে। বিদ্যালয়-সমাজ বাহিরের বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতর, সংস্কৃত সংস্করণ। সংস্কৃত কারণ বাহিরে পরিণত বয়স্কের সমাজে যে সকল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে সেগুলির সবটাই অপরিণত-চিত্ত শিশুর বিকাশের পক্ষে কল্যাণকর হয়। সুতরাং তাহার সমাজ পূর্ণভাবে বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছায়া নহে। তবে দুই সমাজের মধ্যে নাড়ির যোগ আছে। যে যোগ বিচ্ছিন্ন করিলে বিদ্যালয়-সমাজ প্রাণহীন হইয়া পড়িবে।

বিদ্যালয়-সমাজ সম্পূর্ণাঙ্গ; বিদ্যাচর্চ্চা সেখানে অন্ত বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্যতম। সেখানে উৎসব আছে, আনন্দের আয়োজন আছে, কর্ত্তব্যে দীক্ষা আছে, সৃষ্টি করিবার শিক্ষা আছে। জীর্ণ পুঁথির জীর্ণতর পত্রগুলি পরিপাক করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে।

সেই বিদ্যালয়-সমাজের নাগরিকতার অধিকার লাভ করিয়া শিশু জীবনকে অখণ্ড ভাবে দেখিতে ও বিকশিত করিতে শেখে। এবং শিক্ষার সাহায্যেই ভবিষ্যতে একদিন বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করিয়া সহজেই আপনার স্থান করিয়া লইতে পারে।

আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে আমরা কি সেই সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছি?

শ্রীঅনাথনাথ বসু

অশরীরী

শ্রীসুবোধ বসু

প্রথম দৃশ্য

একটা জীর্ণ অর্দ্ধভগ্ন ঘরের ওপর হইতে যবনিকা উঠিয়া গেল। দেওয়াল কালো হইয়া উঠিয়াছে, অধিকাংশ স্থানে আস্তর উঠিয়া প্রায় গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। চার কোণায় ঝুল ও মাকড়সার বাসা প্রায়ান্ধকারের মধ্যেও সম্পূর্ণ চোখ এড়াইতে পারে না।

একধারে অতি পুরাতন প্যাটার্ণের একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে তার দ্বারাই ঘরটা আংশিক আলোকিত। একটা তক্তপোষ পড়িয়া আছে,—তাতে একটা ছেঁড়া মাদুর দেখা যায়।

পট ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে একটা শঙ্খের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই ধুনাচি হাতে একজন বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক প্রবেশ করিলেন।

দেওয়ালে লক্ষ্মীর পট টাঙ্গানো ছিল, ঘরে ধুঁয়া দিয়া সেইখানে আসিয়া ধুনাচিটা নামাইয়া সে গলায় আঁচল দিয়া অনেকক্ষণ প্রণাম করিল। এমন সময় বাহির হইতে মোটা গলায় 'ওগো শুনচো গো' বলিয়া আহ্বান শোনা গেল। গিন্নী তাড়াতাড়ি প্রণাম সাঙ্গ করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট ভুঁড়িটিকে অনুসরণ করিয়া কর্ত্তা প্রবেশ করিলেন।

বেঁটে মোটা দেখিতে মানুষটী, এক গাল দাড়ি কামানো হয় নাই: এক জোড়া বড় গোঁপ চোখে পড়ে। হাত কাটা আধময়লা একটি পাঞ্জাবি গায়। কাপড় প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি, পায়ে বিবর্ণ তালিসংযুক্ত জুতা, এবং হাতে এই চেহারার সাথে অত্যন্ত বেমানান এক বেড়াইবার লাঠি।

কর্ত্তা

[প্রবেশ করিতে করিতে] দেখো, এই বাড়িতে চিনি গুড় সাবধান করে যেন রাখা হয়। দেখ্‌তেই পাচ্ছ তো একটু পুরাতন বাড়ি, পিপ্‌ড়ের দৌরাত্ম্য একটু বেশি হবে,—বুঝ্‌লে কি না। গুড়ের হাঁড়ি শিকের থেকে নীচে রেখেচ, কি আর মেই: আর গর্ত্ত ফাটল আছে, ব্যাটারা চেটেই অন্তর্দ্ধান হবে,—টিপে যে একটুকুনও বের করে রাখ্‌বে, সে—উপায় পর্য্যন্ত নেই। সাধে বলি—

গিন্নী

তা তো বুঝ্‌লুম। কিন্তু এ কী বাড়ীতে নিয়ে এসেছ শুনি? একটু জোরে হাঁট্‌লে পরে দেয়াল ভেঙে আসে, জানালায় উই ধরেচে, মেজে শ্যাওলা,—এ কি বাড়ি বদ্‌লালুম না কবরে এলুম।

কর্ত্তা

[হাসিয়া] হা হা হা গিন্নী, হাসালে, একদম হাসিয়ে মারলে। কথা শোন একবার, বাড়ি কিনা কবর হলো। কিন্তু [লণ্ঠনটা উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে আবিষ্কার করিয়া] বলি, ওটা কি মশাল জ্বেলেচ, ও যে একদম দাউ দাউ করে জ্বলচে। না হয়, এনেছিই আজ এক বোতল কেরোসিন, তাই বলে এমনটা অপচয় করা কি—[যাইয়া লণ্ঠন প্রায় নীবু নীবু করিয়া দিলেন]

গিন্নী

যাই হোক্ বাপু, এ-বাড়িতে আমি থাকচি না,—আলো নেই, হাওয়া নেই, দুয়ার ভেঙে পড়েছে, কড়ি-কাঠ যে কোন সময় মাথা ভেঙে পড়তে পারে, চার দিকে জঙ্গল আর গাছ, এর চেয়ে কুঁড়ে ঘরে গিয়া থাকাও ঢের ভালো।

কর্ত্তা

হাসালে, হা হা হা, একদম হাসিয়ে দমবন্ধ করার জোগাড় করেচ। তা এ-বাড়ির একটু আধটু অসুবিধে আছে বৈকি,—তাছাড়া মাঝে মাঝে সাপকোপও নাকি দেখা যাবে,—দেখা যায় তো গেল, বয়ে গেল। কিন্তু দেখ্‌তে হবে, তে-তলা একটা বাড়ি কি রকম সস্তায় পাওয়া গেল। কিছু না হোক্, লোকের কাছে মান-মান্তি আছে, যা তা বাড়িতে বাস করতে পারিনে। অথচ একটু ভালো বাড়ি

হ'লে ব্যাটারা কশাইয়ের মত দাম হেঁকে বসবে। সেটা কি ন্যায়ের কথা হলো।

গিন্নী

তা এত বড় বাড়ি দিয়েই বা আমাদের কি হবে। গণ্তি তে তিনটী মাত্র মানুষ—এক তলার অর্দ্ধেকই আমাদের লাগ্বে না, তো দোতলা আর তে-তলা। সেই ভোরবেলা এসেছি, এর মধ্যে একবার উপরে উঠেও দেখলুম না।

কর্ত্তা

বলেইচি গিন্নী, মানমান্তি বজায় রাখ্তে হলে বাড়িটা একটু জঁাদ্রেল রকম করতে হয়,—নইলে লোকে অ-কথা কু-কথা বলে। অথচ টাকা গুণ্তে কি সে-সব লক্ষ্মীছাড়ারা আস্বে,—দেবার বেলায় কানাকড়িটা পর্য্যন্ত আমাকেই ঢাল্তে হবে। অথচ—[থামিয়া একটু চিন্তা করিয়া] দেখ গিন্নী, উপর তলায় না হয় আমরা নাই গেলুম।

গিন্নী

ওপরে ঠাকুরঘর শুধু থাকবে,—শোবার জন্যই নীচেই ব্যবস্থা করবো, নইলে উপর-নীচ করা আমার দেহে সইবে না।

কর্ত্তা

ওটাও না হয় নীচেই রাখলে।

গিন্নী

না না সে ওপরেই ভালো হবে,—নিরিবিলিতেই ঠাকুর দেবতার নাম করা ভাল। কোনো হৈ-চৈ হবে না, কোনো ঝিঝি নেই—

কর্ত্তা

[বাধা দিয়া] কিন্তু দেখ, ওপরে না গেলেই যে ভাল হয়, তোমার গিয়ে,—হাা,—উপরে যাওয়াটা, অর্থাৎ কিনা, নাই বা গেলে ওপরে বাপু...

গিন্নী

[একটু উদ্বিগ্ন ভাবে] কেন বলোতো

কর্ত্তা

[থতমত খাইয়া] না না, সে কিছু নয়,—অমনি আর কি। নানা জনে নানা কথা বল্বে, সব শালার কথাই কি বিশ্বেস করতে হবে, না বিশ্বাস করলে পারা যায়। গপ্প, একদম গেঁজা!

গিন্নী

[শঙ্কিত হইয়া] ব্যাপার কি বলো তো,—এর মধ্যে আবার বলাবলি আসে কি। বলি, একি অসুখে বাড়ি না কি?

কর্ত্তা

ও-সব বাজে কথায় কান দিয়ে লাভ কি গিন্নী। দেখ্তে হবে কেমন সস্তায় রাজপ্রাসাদের মত এক বাড়ি পেয়েছি। পঁচিশ টাকা গিন্নী, তার এক আধ্লা বেশি নয়। অনেক খোঁজ খাজ করে তবে—

গিন্নী

লোকে কি বলে তাই বল,—তোমার কথার মারপ্যাচ আমি শুনতে চাইনে।

কর্ত্তা

একদম যাচ্ছে তাই কথা। ওসব কি বিশ্বাস করতে আছে। শুনলে শুধু শুধু ভয় পাবে, আর কিছু লাভ হবে না,—গাঁজা বুঝলে কিনা গিন্নী, একদম গাঁজা!

গিন্নী

চলো, শীগগির চলো।

কর্ত্তা

বাড়িটার, বুঝলে কিনা গিন্নী, এই তোমার যাকে বলে, একটু বদনাম আছে।

গিন্নী

বদ্নাম? কিসের বদ্নাম গো। চোর ডাকাত আছে নাকি আশে পাশে?

কর্ত্তা

আরে না না, সে-সব ভয় করতে হবে না গিন্নী,—হা হা হা, হাষালে গিন্নী, হাসিয়ে মারলে। চোরও নয়,

কর্ত্তা

হাসালে গিন্নী, হা হা। আরে তা নয়। মেয়েটার আবার তরকারীতে বেশি করে তেল দেবার অভ্যেস আছে। একটু দেখে শুনে দিতে বলো। সরষের তেলের তো খরচ আছে, না অমনি আসে?

গিন্নী

মেয়েকে নিয়ে আজকেই আমি এ-বাড়ি ছাড়ব। কবর, এ যে একদম কবর!

কর্ত্তা

কিন্তু এ কথাটা ভেবে দেখ গিন্নী, টাকা আর কার জন্য জমাচ্চি, তোমাদের জন্যই তো। কিছু টাকা যদি সঞ্চয় না করতে পারি, তো মেয়েটার বিয়ে দিই কি করে বলোতো? যত কশাই জুটেচে,—মেয়ে নিয়ে খালাস দে না,—না তার এ-চাই ও-চাই গয়না চাই, আসবাব চাই, পণ চাই,—বুঝলে গিন্নী, যাকে বলে একদম লক্ষীছাড়া কাণ্ড! অথচ যদি না জমাই, তবে কোত্থেকে সে সব আসে শুনি?

গিন্নী

এদ্দিন যা জমালে তার কি হলো। তা দিয়ে যে এক গণ্ডা মেয়ের বিয়ে দেয়া যায়,—তোমার তো মোটে একটা।

কর্ত্তা

জমিয়েছি? হাসালে গিন্নী, হা হা। সে নগণ্যকে তুমি জমান বলো। চল্লিশ হাজারের কাণাকড়িটী বেশি নয়। আর জীবন বীমা কুড়ি হাজার,—আর তুমি অনায়াসে বল্লে কি না জমিয়েছি। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে বলে প্রাণধরে এ টাকাতে আমি হাত দিতে পারব না। তবে এইবার মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে হবে···

গিন্নী

এখন থেকে তুমি সুরু করবে? আশ্চর্য্য করলে। মেয়েকে যে আর ঘরে রাখা যায় না। বলি, মেয়ের দিকে তাকিয়ে কি দেখেচ?

কর্ত্তা

তা দেখতে একটু বাড়ন্ত বটে, বয়েস আর কি। [প্রায় স্বগত] কিন্তু শালারা কি বয়েস দেখ্‌বে দেখ্‌বে কতটা বেড়েছে। [গিন্নীকে] হ্যা, দেখো গিন্নী, মেয়েটা বড় হৈ হৈ করে বেড়ে উঠ্‌চে। এইবার থেকে এক কাজ করো তো,—রাতের খাওয়া ওর বন্ধ করে দাও। বাড়াকে বাড়াও বন্ধ হবে, কিছু জমবে ও।

গিন্নী

বাঃ বেশ উপযুক্ত কথা হ'লো। এইবার থেকে মেয়েটাকে উপোস করিয়ে শেষ করে দিই, বিয়ে দিতে তোমার আর টাকা খরচা হবে না।

কর্ত্তা

কি যে বলো, গিন্নী। আমি কি তাই বল্লুম? একবেলা করে না খেলে কি আর লোকে মরে, একটু বাড় কমে শুধু। [একটু থামিয়া] তবে এই পর্য্যন্তই রইল,—আমাকে আবার আহ্নিকটা সারতে হবে। [আশ্বাস দিয়া] বুঝলে কিনা গিন্নী, ভূতটুত একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়,—তবে একটু হুঁসিয়ার থেকো, দেখো যেন ফাটল-টাটলের থেকে সাপ-কোপ বেরিয়ে কামড়ে না দেয়।

গিন্নী

[হতাশ ভাবে] খুব আশ্বস্ত হলুম।

কর্ত্তা

[গমনোদ্যত হইয়া] আহ্নিকটা সেরে আসি। তুমি একটু রান্নাঘরে মিনির কাছে গিয়ে দাঁড়াও,—ভয়ও করবে না, তাছাড়া, দেখো রান্নাতে তেল-টেল যেন একটু হিসেব করে দেয়া হয়। [চলিয়া যাইতে লাগিল]

গিন্নী

এই আলোটা নিয়ে যাও, পাশের সব ঘর যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

কর্ত্তা

কোনো দরকার নেই,—সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। অন্ধকারে চলাফেরা করতে আমার মোটেই অসুবিধে হয় না। তার

চেয়ে যাবার সময় আলোটা নিবিয়ে যেয়ো,—শুধু শুধু কেরোসিন পোড়ে কেন?

[প্রস্থান]

[গিন্নী ভীত শঙ্কিত ভাবে চারিদিক চাহিয়া আলোটা নিবাইতে অগ্রসর হইলেন। এমন সময় একটা চীৎকার শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মেয়ে মিনি পড়ি-মরি করিয়া ছুটিয়া আসিল। গিন্নী প্রথমটা চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন।]

মিনি

[ছুটিয়া আসিয়া স-চীৎকারে] ও মাগো, গেলুম গো [মাকে আসিয়া একদম জড়াইয়া ধরিল]

গিন্নী

[স-ত্রাসে] কি কি, ব্যাপার কি? ওরে, হ'লো কি তোর?

মিনি

ভূত ভূত, একদম ভূত! ওরে বাবারে বাবা, জানালার কাছে এসে নাকী সুরে বল্লে, কী রাঁধ্‌চিস?

গিন্নী

[আশ্বাস দিয়া] দূর্, ও কিছু নয়, ছায়া দেখে ভয় পেয়েছিস মিনি।

মিনি

হ্যাঁ, ছায়া বৈ কি। ছায়া বুঝি আমি আর চিনিনে মা। ছায়া বুঝি কথা বলে,—তুমি শুনেচ কোনদিন। কী বিষম কালো দেখতে! ওরে বাবাঃ, আমি আর যাচ্ছিনে রান্না ঘরে। মাছ ভাজা বসিয়েছিলুম,—এতক্ষণে ছাই হয়ে গেছে।

গিন্নী

যাক্ গে। কী বাড়িতে আমাদের নিয়ে এসেছে, বল্‌তো, তোর বাবা। এমন পোড়ো বাড়িতে ভূত পেত্নী থাক্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি।

মিনি

[সঙ্কিত ভাবে] শুনচো মা, শুনচো, কারা সব নাকী সুরে গান করচে [নাকী সুরে গান শুনা গেল] বাপ্ রে, এ কোন রাজ্যে এলুম। মরণ-বাঁচন করে যখন তোমার কাছে ছুটে আস্‌চি, পেছন থেকে খিল্‌খিল্ করে হাস্‌তে লাগল।

গিন্নী

কি জানি, মিনি, তোর বাবা আমাদের বাড়ীতে না এনে শ্মশানে নিয়ে এল কেন।

মিনি

[শুনিয়া সা-তঙ্কে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া] শুন্‌চো, শুন্‌চো, তুমি, শব্দ যে ক্রমেই এগিয়ে আসচে! কী ব্যাপার মা? বাবা ফিরে আসেনি? [মা ঘাড় নাড়িলেন] তবে পালাও না, চলে এসো না বাবার কাছে। চীৎকার করে ডাক্‌বো নাকি?

গিন্নী

[সভয়ে] মিনি, জেনে শুনে তোর বাবা আমাদের ভূতের বাড়ী নিয়ে এসেচে—পয়সা বাঁচাবার জন্য।

মিনি

বলো কি! বাবাকে নিয়ে যে আর পারা গেল না। দিন দিন কী যে হচ্চে,—একেবারে মরার ফন্দি করেছে যে, [নাকীসুর নিকটতর হইল] ওমা, এ যে এসে পড়েছে, ওগো এসো, পালিয়ে এসো।

[গিন্নী লণ্ঠনটা তুলিয়া লইলেন। তারপর ভীত ভাবে একবার পিছন দিকে তাকাইয়া মা ও মেয়ে প্রায় ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই অন্ধকার ঘরে তখন দুই ভূতের প্রবেশ। দুইটা বড় কালো ছায়ার মত। লাফাইতে লাফাইতে তারা উপস্থিত হইল। একটা ক্ষীণ আলোকে তাদের অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রবেশ করিয়াই তারা দুইটা বিড়াল ঝগড়া করিবার পূর্ব্বে যেমন অদ্ভুত শব্দ করে তেমনি করিতে সুরু করিল,—এবং শীঘ্রই বিড়ালের লড়াইয়ের মত তাদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হইল,—ক্যাঁচ ফুঃ, গর্‌র্, হোঃ ইত্যাদি।

তারপর ঝগড়া করিতে করিতেই তাহারা প্রস্থান করিল।

একটু পরে পিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া মিনির প্রবেশ। সঙ্গে গিন্নী।]

কর্ত্তা

আঃ ছাড়্, হাত ছাড় না। কি ভীতু মেয়েরে বাপু!

মিনি

ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না। এক্ষুনি এখান থেকে তুমি চল, আর একটুও দেরী করতে পারবে না।

কর্ত্তা

এই দেখ, পাগলীর কথা শোন। এত খরচপত্তর করে জিনিষপত্তর আনানো হলো; গাড়ি-ভাড়া, মুটে খরচ এন্তার। এখন বললেই কি আর চট করে চলে যাওয়া যায়,—এসব ক্ষতি পূরণ করে কে।

মিনি

কিন্তু এ যে ভূতের বাড়ি। সারা বাড়িময় তারা যে নেচে বেড়াতে সুরু করেচে।

গিন্নী

কি সর্ব্বনেশে কাণ্ড আরম্ভ হয়েছে বলোতো।

কর্ত্তা

ঐ দেখো, মেয়ের জ্বালায় পারিনা, আবার এ-দিকে মাও সুরু করেছেন,—তবেই হয়েচে আর কি। কিন্তু আমার স্পষ্ট কথা বাপু,—এমন সস্তার বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও নড়চি না! ভূত আছে তো আছে,—একেবারে গা ঘেষাঘেষি হয় তো 'রাম' নাম উচ্চারণ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। তার জন্য—

মিনি

[নাকী সুরের সঙ্গীত শুনিয়া সভয়ে] ঐ শোন।

কর্ত্তা

[শুনিয়া] তাতে আর এমন কি হয়েছে। নাকী সুর শুনেই ভয় পাচ্ছিস্ তো,—মনে করে নে যেন কলের গান শুন্‌ছিস্। এতে ক্ষেতিটা কি আমি বুঝতে— [এমন সময় আর একটা চীৎকার শোনা গেল] কে, রামদীন ব্যাটা চ্যাঁচাচ্ছে না? ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে ব্যাটা বাড়ীর শান্তি ভঙ্গ করচে,—দেখাচ্ছি মজা [প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় ভয়-বিবর্ণ মুখে চীৎকার করিয়া রামদীনের প্রবেশ]

রামদীন

ওরে বাপরে বাপ, রাম রাম রাম। জান্ নিয়ে বহুৎ বেঁচে এয়েচি···

মিনি

কি রে, রামদীন কী?

রামদীন

[কাঁপিতে কাঁপিতে] আরে খোকী মায়ী, একদম জিন। ওরে, বাপরে বাপ্ ঈয়া হাত ঈয়া জবান্ [দেখাইয়া] এত্‌না বড়া মুখ। ওরে বাপ্‌রে বাপ্, একদম ভূতরে বাপ্

কর্ত্তা

[রাগিয়া] ভূত! তোকে বলেচে ব্যাটা নেশাখোর!— ব্যাটার টিকি টান্‌তে দালানের মধ্যে ভূত এসেচে। গেঁজাখোর নচ্ছার জানি কোথাকার! যা যা কাজ কর্‌গে,— মাইনে নেবেন পাঁচ টাকা করে অথচ—

রামদীন

হাম ইধার আউর নাহি রহেঙ্গা বাবু। আগারি জান্, পিছারি খানা।

কর্ত্তা

হ্যা, পিছারি খানা। খানা না হ'লে, তোমাকেও ওদের দলে গিয়ে যে মিশ্‌তে হবে সেটা খেয়াল আছে?

রামদীন

বাবু, হাম আভি যাতা,—আউর এক মিনিট নাহি রহেঙ্গা [প্রস্থানোদ্যত]

গিন্নী

ওরে থাম রামদীন। আমাদের একলা ফেলে তুই চলে যাবি। আমরাও ত এ-বাড়ী ছাড়ব, আমাদের সঙ্গেই যাস্,—বুঝলি!

রামদীন

আরে আপ্ বাঁচেগা তো বাপ্‌কা নাম হোগা

[প্রস্থানোদ্যত]

কর্ত্তা

যা যা বেটা, ভাগ্। তোর মত কি সবাই কাপুরুষ। সস্তা দেখে বাড়ি পাওয়া গেছে, একটু অসুবিধেতেই সেখান থেকে পালাতে হবে।

[এমন সময় আবার সানুনাসিক চীৎকার শোনা গেল। রামদীন একবার চমকাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইল]

গেলো ত যাক্। তিনজন তো মোটে মানুষ, চাকরের কিই বা ঠেকা। তোমাদের প্ররোচনায় অপব্যয় করছিলাম বৈ তো নয়। পয়সা বেঁচে গেল। এ-পাড়ার ব্যাটারা যা ভীরু, আর কাউকে ইচ্ছে করলেও পাওয়া যাবে না। তিনজনের কাজ তোমরাই করে নিতে পারবে, কি বলো গিন্নী?

গিন্নী

আমার আর বলাবলি কি; তোমার যা ইচ্ছে তাই তো হবে, তবে আর আমাকে জিজ্ঞেস করে অপমান করা কেন?

কর্ত্তা

ঐ দেখ, সব তাতেই অভিমান করবে। কিন্তু অন্যায়টা কি হয়েছে তুই বলতো মিনি? সস্তায় বাড়ি পেলে একটু অসুবিধে সহ্য যায়ই,—কেমন কিনা? [মেয়েদের নীরব দেখিয়া] চল এবার খাওয়া দাওয়া সারা যাক্ গিয়ে। মিছিমিছি কেরোসিন পোড়ান কিছু নয়। নাও, চলো, আর দাঁড়িয়ে থেকোনা।'

[কর্ত্তার সঙ্গে দুইটী ভীত নারীর প্রস্থান। একটা নাকী সুর শুনিয়া তারা কর্ত্তাকে জড়াইয়া ধরিয়া চলিল।

তখন সেই অন্ধকার ঘরে আবার সেই দুইটা ভূতের প্রবেশ। আগেকার মতই তারা অলৌকিক শব্দ করিল, এবং বিড়ালের লড়াইয়ের মত কলহ ও শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

অন্ধকার রঙ্গমঞ্চের উপর যবনিকা পড়িল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দোতালার একটা জীর্ণ কোঠা। আসবাব পত্রের মধ্যে দুইটা ভাঙা চেয়ার, একটা খুব বড় আলমারী, দেওয়ালে দুইটা হরিণের শিঙ। ঘরের জানলা দরজা সব বন্ধ আছে।

দুপুর বেলা, তবুও ঘরটা প্রায় অন্ধকার।

এমন সময় একটা নাকী সুরের চীৎকার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি সুরে তার একটা প্রত্যুত্তর আসিল। শব্দ করিতে করিতে দুই দিক হইতে দুই ভূতের প্রবেশ। ভূশণ্ডী কালো দুইটীকে দেখিতে।

ঘরে প্রবেশ করিয়া তারা নিজেদের উপর হইতে কালো ঢাকনা খুলিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে দুইটা সাধারণ মানুষ আত্মপ্রকাশ করিল,—একটা প্রৌঢ়, একজন যুবা।

তারা হাসিতে লাগিল]

প্রৌঢ়

এত সাজ কাজ করলুম, কত রূপ ধারণ করা হ'লো, কিন্তু দেখ্‌চো তো, কিছুতেই কিছু নয়। গণ্ডার সাজলুম, দাঁতালো ভূত সাজলুম, ব্রহ্মদত্যি সাজলুম,—মেয়ে দুটো ভয়ে অস্থির, অথচ কিপ্টে ব্যাটার নড়ার নামটুকুও নেই,—কেমন কাণ্ডখানা হ'লো দেখতো শম্ভু!

শম্ভু

[হতাশ হইয়া] আর বলেন কেন,—কিপ্টে তো ঢের দেখেছি, এমন মরিয়া তো আর চোখে পড়েনি। ভূতকে পর্য্যন্ত ভয় করেনা,—এমন হ'লে আর কি ক'রে পারা যায়।

প্রৌঢ়

নাক টিপে চীৎকার করে করে, এই সাত সাতটা দিনে, নাকের দফারফা করে দিলুম, কিন্তু কোথায় কি। যতই আমরা মেহন্নতের এক শেষ হচ্ছি, ব্যাটা ততই স্ত্রী কন্যাকে আরো অভয় দিচ্ছে।

শম্ভু

ভদ্রলোক আমাদেরই পাড়ায় এক সময় বাস করিতেন। ভোরবেলা নাম নিলে হাঁড়ি ফাটতো শুনেছি, কিন্তু

ভূতকেও ভয় পাবেনা, এমন তো ভাবতে পারিনি। কাজকর্ম্মে বেজায় অসুবিধে ঘটাচ্চে, নড়ার নামও নাই। কিন্তু কি ভাবচি জানেন, ভদ্রলোকের ঢের নাকি নগদ টাকা আছে, কিছু যদি আমাকে দিয়ে দেয়, তবে আর এসব অন্যায় বে-আইনী কাজের মধ্যে না ঢুকেই চলে...

প্রৌঢ়

অন্যায় ? কাকে তুমি অন্যায় বলচো হে, ছোকরা। নোট জাল অন্যায়। যাকে শিষ্য করতে যাচ্চি সে-ও যদি পুলিশের বাড়া হয়ে দাঁড়ায় তবে যাই কোথায় ? কি হে, তোমার মতলব কি ?

শম্ভু

শিখব,—এই রকম একটা লাভের ব্যবসা সুবিধে পেলে কে আর না শেখে।

প্রৌঢ়

মনে থাকে যেন। বি-এস্ সি পাশ করে চাকরীর জন্ত ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই একটা লাভজনক ব্যবসায় টেনে নিলুম। নিমকহারামী করবে, তবে এখানে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।

শম্ভু

[শিহরিয়া উঠিয়া তারপর] আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে ওস্তাদ মেনে নিইচি, কোনমতেই আর পথ-ভ্রষ্ট হবো না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, ওই ভদ্রলোককে নিয়ে,—একটু নিরিবিলিতে কাজ করতে দেবেনা।

প্রৌঢ়

[ঠাণ্ডা হইয়া] সেইটেই তো একটা মহাসমস্যা শম্ভু। আর কিছু নয়, শুধু মশালের মধ্যে ধুনা ছিটিয়ে, একটু নাকী সুরে কাওয়ালী ভেজে, এ-বাড়িটাকে সমস্ত পাড়ার কাছে আতঙ্কের বস্তু করে তুললাম, অথচ কোথা থেকে একটা ভুইফোঁড় এসে জুটল, বহুরূপী বিছে উজাড় করে ফেল্লুম, একটুও তার হুঁস নেই।

শম্ভু

আপনার কথামত মিনিকে তো বিস্তর ভয় দেখালুম—অথচ,—

ওস্তাদ

মিনি ? মিনি কে ?

শম্ভু

ওর মেয়ে। আমাদের পাড়ায়ই থাকৃত কিনা,—নামটা বেশ মনে আছে। কিন্তু ওকে ভয় দেখালে আর কি হবে,—বাপ কিছুতেই যাবে না। মিছিমিছি মেয়েটাকে এখন আর ভয় দেখাতে মায়া হয়। কেমন সুন্দর দেখতে মেয়েটী দেখেছেন তো,—অথচ কেপ্টা পয়সা ব্যয় হবে বলে মেয়ের বিয়েই দেবেনা : মেয়েটা—

ওস্তাদ

যাক্ যাক্ মেয়ের সম্বন্ধে ভাববার দরকার নেই। বাপটাই হাঙ্গামা বাঁধাল।

শম্ভু

কিন্তু বলুন তো, মিনি নামটা সত্যি ভালো নয় ? একদম চমৎকার !

ওস্তাদ

দেখো, ও-সব ব্যবসার মধ্যে আসে না। অবান্তর কথা আমি পছন্দ করিনে। কথা হচ্চে, ওদের যেমন করেই হোক তাড়াতে হবে।

শম্ভু

যদি থাকেই বা, এমন তো আর বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নেই। ওরা ত ওপরে কক্ষনো আসে না, নীচে না হয় রইলই বা, তাতে আমাদের—

ওস্তাদ

তোমার মুণ্ডু ! ওহে, বাপু, এ-ব্যবসা অত সোজা নয়। একটু মাথা ঘামাতে হয়। এরা থাকলেই লোকজনের আসা যাওয়া হবে। কয়দিন পরেই ভয় আর থাকবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও এমন একটা সব রকমের সুবিধের যায়গা ছাড়তে হবে। [শম্ভুকে] দেখো, কারুর মেয়ে টেয়ের দিকে নজর দিয়ো না। তার মানেই ব্যবসা পণ্ড, এবং হাতে শেকল।

শম্ভু

বুঝ্‌তে পারছি,—ওদের যেমন করেই হোক তাড়াতে হবে।

ওস্তাদ

ঠিক। [থামিয়া] দেখ, আমাকে এখনই সহরে বেরুতে হবে। কিছু কাগজ টাগজ, ছাঁচ গড়বার জন্য কিছু লোহা, জল-ছাপ তুলবার নতুন কিছু যন্ত্রপাতি ক্যামেরা, এসব সংগ্রহ করে আন্‌তে হবে। আসতে হয়তো দেরি হ'তে পারে,—আজ এমন কি নাও ফিরতে পারি। বেশ সাবধান হ'য়ে থেকো, হাবার মতন আবার ধরা পড়ে যেয়ো না।

শম্ভু

আজ্ঞে, সে ভাবনা করতে হবেনা। এক্ষুনি আমি তেতলার অন্ধকোঠায় গিয়ে লুকোবো। কেউটে ভূতের সাজের রিহার্সালটা দিয়ে দেখি,—ভয় পাওয়াবার মতন হয় কি না।

ওস্তাদ

তবে আমি চল্লুম।

[কালো আবরণ গায়ে পরিয়া প্রস্থান করিল]
পাশের দুয়ার দিয়া অকস্মাৎ মিনি আসিয়া ঢুকিল। শম্ভু চমকিয়া কালো আবরণ গায়ে দিবার প্রচেষ্টা করিল, কিন্তু তখন দেরি হইয়া গেছে।

মিনি

আপনি কে? কী চান্ আমাদের বাড়িতে?

শম্ভু

আমি ভূত।

মিনি

কেমন ভূত, আমি তা জানি। এই বুঝি আপনার বাড়ি থেকে সন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া।

শম্ভু

তুমি আমাকে চেন না কি?

মিনি

[ব্যঙ্গ করিয়া] জীবিত কালে আপনাকে একটু একটু চিন্‌তুম বৈ কি? বাড়ির কাছাকাছিই ছিলেন কি না। তখন আপনার নাম ছিল, শম্ভু। এখন কি?

শম্ভু

ভূত।

মিনি

জিজ্ঞেস করতে পারি, এখানে ভূত সেজে কী করচেন?

শম্ভু

তপস্যা। দেখ, তপস্যা করতে একটু নির্জ্জন যায়গার দরকার হয় কিনা, তাই এইটাকেই পছন্দ করলুম। লোকালয়ের আবিলা এসে যাতে তপস্যায় ব্যাঘাত না জন্মায়, তার জন্য একটু আগুন টাগুন দেখাতে হয়, নাকী সুরও বের করতে হয়।

মিনি

তপস্যা করে এর মধ্যে কতখানা জাল নোট তৈরি করা হয়েচে?

শম্ভু

কোথায় দাঁড়িয়েছিলে তুমি? আড়িপাতা একটা অন্যায় কাজ, তা তুমি জান?

মিনি

ন্যায় কাজের মধ্যে নোটজাল করাই যে প্রথম তা আমি জান্‌তুম না। [একটু দম লইয়া] ছিঃ আপনি না ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার এই কাজ। কোথাথেকে এই

জালিয়াতের সঙ্গে আপনি জুটলেন? আপনার মা আপনার জন্য কেমন করে কেঁদে দিন কাটাচ্চে আপনি জানেন না,—আমি জানি। [শম্ভু অধোবদন] তবে? [প্রশ্নের জন্য মিনি অপেক্ষা করিল]

শম্ভু

[দুই সেকেণ্ড পরে] আমিও জানি, মিনি। কতটা হতাশ হয়ে যে আমি এ পথে পা বাড়িয়েছি তুমি তা জানো না। আমার বাড়ির দারিদ্র্য আমার বুকে কাঁটা ফুটিয়েছে, ক্ষুধার জালায় আমি ছটফট করেচি, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমায় খাবার জোগাড় করে দিতে পারেনি। মানুষ যে-মুহূর্ত্তে বিবেক হারিয়ে ফেলে, সেই মুহূর্ত্তে আমি অন্যায় প্রবঞ্চনার পথে পা বাড়িয়েছি।

মিনি

[ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া] বদ্‌লান,—এবার বদ্‌লিয়ে ফেলুন জীবনটাকে। এখনো সময় আছে।

শম্ভু

তুমি কিন্তু একথা কাউকেও বলে দিয়োনা মিনি।

মিনি

প্রতিজ্ঞা করুন এ-পথ ছেড়ে দেবেন।

শম্ভু

দেব [একটুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল]

মিনি

ভূতবাবু?

শম্ভু

বলো।

মিনি

ভূত থাক্‌তে থাক্‌তে আর একটা কাজ আপনাকে সারতে হবে। আমার বাবার একটু বেশি [দ্বিধা করিয়া] কেপ্‌ণনী রোগ আছে, জানেন তো। সেই দোষটাকে একটু শুধ্‌রে দিতে হবে।

শম্ভু

কেমন করে? ভূতের তো চিকিৎসা শাস্ত্র জানা নেই।

মিনি

[ঈষৎ হাসিয়া] এ-সব অসুখের একটু ভৌতিক চিকিৎসাই দরকার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—কেমন করে কি করতে হবে, আমি বলে দেব'খন।

শম্ভু

বেশ। কিন্তু আমি যা করেছি, এরজন্য তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে তো মিনি?

মিনি

আমার ক্ষমা করায় আর না করায়, আপনার কি এসে গেল। তবে আমি নিশ্চয়ই—[এমন সময় প্রায় ঘরের কাছে গিন্নীর গলা শোনা গেল। 'মিনি কোথায় গেলি মা।' শম্ভু চট্ করিয়া কালো পোষাক পরিয়া লইল, এবং পরক্ষণে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীর প্রবেশ]

গিন্নী

[কাতর ভাবে] মিনি, কোথায় গেলি মা। [আবিষ্কার করিয়া] তুই, এখানে? এইমাত্র ভূতটা ঘর থেকে চট্ করে বেরিয়ে গেল না? ওরে, তোকে কি আট্‌কে রেখেছিল,—সারারাত্তির খুঁজে আমি হয়রাণ। [সাতঙ্কে] কি মিনি, কথা বলছিস্ না যে,—বেঁচে আছিস্ তো?

মিনি

[হাসিয়া উঠিয়া] একদম বেঁচে আছি মা, কোনও ভয় নাই তোমার। আর তোমার ভূতকে ভয় করতে হবে না,—এ সত্যিকারের ভূত নয়। এ আমাদের ও-পাড়ার শম্ভু দা।

গিন্নী

কে শম্ভু রে? মিত্তির বাড়ির,—শশি মিত্তিরের ছেলে? সে যে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছল। জলপানি পাওয়া ছেলে গরীব মা বাপকে ছেড়ে—

মিনি

হ্যাঁ, সন্ন্যেসী না, আরো কিছু। ভূত সেজে এখানে বাস করচে, কি সব করচে, আর ভয় দেখিয়ে লোককে বাড়ির ত্রি-সীমানায় আস্‌তে দিচ্ছিল না।

গিন্নী

বলিস্ কি রে, বিশ্বেস হয়না যে। এমন জলপানি পাওয়া সুন্দর দেখ্‌তে ছেলে সন্ন্যেসী হ'লে দুঃখ রাখার যে আর ঠাঁই হয় না।

মিনি

না চমৎকার ছেলে, সন্ন্যেসীর চেয়ে ঢের ভালো কাজ করছিল সে।

গিন্নী

ডাক না তাকে একবার, তাকে দেখি। ডেকে জিজ্ঞেস পত্তর করি। ভূত সাজবার তার কি প্রয়োজন হ'লো কে জানে!

মিনি

কিন্তু মা, ওকে দিয়ে বাবার কেপ্‌টামোটা একটু কমিয়ে নেবার মতলব করেচি। দাঁড়াও,—একে একে তোমাকে সব বল্‌বো। বেশ একটা সুবিধে হয়েছে কিন্তু। দাঁড়াও, তার আগে শম্ভুদাকে তোমার কাছে ডেকে দিচ্চি। [দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া] শম্ভু দা, ও—শম্ভুদা। মা তোমাকে ডাক্‌চেন, শুনে যাও তো। লজ্জা করে আর লাভ নেই, আমি সব বলে দিয়েছি।

[মিনি অপেক্ষা করিল। ধীরে যবনিকা পতন।]

তৃতীয় দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যের সেই ঘর। তবে ঘরের চেহারা একটু ফিরিয়াছে,—বিছানাটা একটু ভাল হইয়াছে। দেয়ালে দু-একটা ছবি আবির্ভূত হইয়াছে।

সময়, সন্ধ্যা-প্রায়।

একটা মাদুরের উপর বসিয়া গিন্নী মিনির চুল-বাধা প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছেন।

গিন্নী

[চুল ঠিক করিয়া দিতে দিতে] তোর শম্ভুদাকে খাবার দিয়ে এসেছিলি তো?

মিনি

এসেচি, এসেচি, কতবার আর বলব বলোতো। তবে ভূতের মুখে মানুষের খাওয়া তেমন রোচেনা বোধ হয়। এবার থেকে ভূতের উপযুক্ত খাবার তৈরি করে দিও,—দিয়ে আসব।

গিন্নী

ঐ ষণ্ডাগোছের লোকটাও ওর কাছে আছে নাকি: ওটা একটা সত্যিকারের আস্ত ভূতের মতন।

মিনি

ও এক হপ্তার জন্য বাইরে গেছে,—এর মধ্যে আর ফিরবে না। ভূত দেখেই ভয় পাওয়া যায়, কিন্তু জ্যান্ত মানুষকে দেখলেও যে আঁতকিয়ে উঠ্‌তে হয়, এই প্রথম জানলুম।

[চুল বাধা সমাপ্ত হইল]

এমন সময় বাহির হইতে কর্ত্তার গলা শুনিতে পাওয়া গেল। 'বলি শুনচো, শুনচো, ও মিনির মা'। বলিতে বলিতে কর্ত্তা প্রবেশ করিলেন।

কর্ত্তা

নাও, নিয়ে এসেচি, দু দোটই নিয়ে এসেচি। আধখানা চাকরের কাজ নয়,—তা একখানাই হোক্, না দু-দুটা। কী যে মুস্কিলে পড়েছি—

গিন্নী

তা না আনলেই হ'তো,—এত ঠেকাটা কিসের

কর্ত্তা

তোমার কি গিন্নী, তুমি তো ফস্ করে বলে বসলে, ঠেকাটা কিসের। এদিকে রাত দুপুরে এসে, আমাকে শাসিয়ে যাবে, ভুঁড়ি কাটাবার ভয় দেখাবে, ঘাড় মট্‌কে রক্ত খেতে চাইবে, ইয়া ইয়া মুলোর মত দাঁত বের করে ভেঙ্‌চি দিয়ে যাবে,—তার কি?

গিন্নী

হ্যাঁ, ও-সব করেন না, যত নাই কথা।

কর্ত্তা

তুমি তার বুঝ্‌বে কি গিন্নী। মুখের উপর সেই বিদ্‌ঘুটে মুখটা এনে যদি একদিন শুধু তোমায় 'ফ্যাচ্‌' করে যেত তবেই টেরটা পেতে। আমি বলেই না হয়, সয়ে টয়ে থাকি,—বেশি জিনিষ পত্তর আনতে হুকুম করলে, কিম্বা বেশি টাকা খরচা করতে বল্‌লে কাকুতি মিনতি করে কিছুটা কম করিয়ে নিই।

গিন্নী

কিসের খরচা করার হুকুম গো?

কর্ত্তা

আরে, এ যে কদিন ধরে রাজ্যের পয়সার মাছ আনচি, সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে ফলমূল কিনে নিয়ে আসচি, তোমাদের জন্য তাঁতের মিহি শাড়ি কিনে টাকা জলে ফেলচি, এই সব আর কি জন্য। বলি, সাধ ক'রে কি লোকে টাকা পোড়ায়। [থামিয়া] দুপুর রাত্তির হ'লেই এসে উপস্থিত হবেন। দূর থেকে হাত লম্বা করে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে আমার কাঁচা ঘুমটা ভেঙে—বুঝলে কিনা গিন্নী, মুখ-ভেঙ্‌চি দিয়ে শাসাতে থাক্‌বে,—বাঁড়ির জন্য এটা আনিস, ওটা আনিস। একবার কাণ্ডটা দেখতো গিন্নী,—ব্যবহারটা একবার দেখ।

গিন্নী

ওরা হয়তো, কেউ নিজের আত্মাকে কষ্ট দেবে, তা দেখতে পারেনা। তাই তোমাকে জিনিষ কিনিয়ে কাটিয়ে খাওয়াচ্চে।

কর্ত্তা

খাওয়াচ্ছে তো রাজা করচে,—পয়সাটা দিচ্চে কে শুনি? পয়সা খরচা করে আত্মার সুখ? আত্মাটা যে একেবারে জলে খাক্‌ হয়ে গেল। অথচ—বুঝলি মিনি,—যা একখানা মুখের ভেঙ্‌চি, আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। কথা অবহেলা করি, আর এদিকে একদিন পট্‌ করে ঘাড়টা মট্‌কে দিক্‌।

মিনি

না বাবা, সে—ভালো নয়। আগে প্রাণ, তারপরতো টাকা। ঠাকুর দেবতাকে যেমন, তেমনি ভূতপ্রেতকেও মেনে চলা বুদ্ধিমানের কাজ।

কর্ত্তা

কিন্তু এদিকে যে ফতুর হ'য়ে গেলাম, সেটার খোঁজ করে কে? [গিন্নীকে] এইবার আর ওই শালার বাড়ি না বদ্‌লালে চল্‌ছে না গিন্নী। তার মানে—বুঝ্‌লে কিনা—

গিন্নী

না না, সে—উচিত হবে না; এমন সস্তায় তে-তলা বাড়ি কোথায় আর পাওয়া যাবে বলোতো?

কর্ত্তা

নইলে আর এদ্দিন ছিলুম কেন,—সে-কথা কি আমাকে শেখাতে হবে। তবে রোজ রাত্তিরে যদি এমনতর সুনিদ্রের ব্যাঘাত হয়, ভূতপ্রেত এসে মুখ খিঁচিয়ে শাসাতে থাকে, থাবা উঁচিয়ে ভয় দেখায়, তবে আর শান্তি থাকে কোথায়।

গিন্নী

কিন্তু ভাড়া কি রকম সস্তা, সেটা দেখ্‌তে হবে তো…

কর্ত্তা

কোথায় সস্তা হলো,—সে—কথা কি আর আমি না হিসেব করেই বলচি। ভূত ব্যাটার কথামত যেমন সব জিনিষ-পত্র আনতে হচ্চে,—তাতে বুঝেচ,—গড়পড়তা তোমার বেশিই পড়্‌চে গিয়ে। এই যে দুটো 'চাকর আনতে হলো, আমার পিণ্ডি দেবার জন্যে—

মিনি

ছিঃ, কী যে বলো বাবা—

কর্ত্তা

বলি কি সাধে বলি,—কি প্রয়োজন ছিল চাকরের। অথচ জুলুম দেখোনা একবার,—শাসিয়ে গেছেন, দু-দুটো লোক আনতে হবে, রান্নার জন্য একটা, অন্য কাজের জন্য আলাদা আরেকটা—যেন আমি দিল্লীর বাদশা হ'য়ে গেছি। পরশু বলে গিছ্‌ল, কাল গরিমসী করে,—বুঝলে কিনা গিন্নী;—আর আনা হয়নি। তাইতে রাত্তিরে ঘাড় মটকাবার ভয় দেখিয়ে গেল।

মিনি

কি রকম মুখটা বাবা ?

কর্ত্তা

বীভৎস। চোখ মিটিমিটি করে দেখি,—তাইতেই দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়,—ভালো করে চেয়ে কি দেখবার জো আছে। চোখ বুজেই হাঁ না করে ব্যাটার জুলুমে রাজী হয়ে যাই,—চোখ বুজেই একটু কাকুতি টাকুতি করি। [থামিয়া] কী রকম অন্যায়টা দেখতো,—ওদের আমরা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। ওপরের দুটো তালাতো একদম ছেড়ে দিইচি। অথচ দেখতো, কী রকম আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করচে,—ওঁটা কিঁনে এঁনো, সেঁটা আঁনা চাঁই, আঁজ নিঁজের জঁন্য ভাঁলো জাঁমা নাঁ কিঁনলে ঘাঁড় মঁট্‌কাবো !

মিনি

সত্যি, এমন লক্ষীছাড়া হয় ভূতগুলো !

কর্ত্তা

যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। ভূতের সঙ্গে এক সাথে বাস করা,—বুঝলে কিনা গিন্নী,—মানুষের পোষায় না। ওদের আচার ব্যবহারই আলাদা রকমের। কী রকম জুলুমটা বেড়ে চলেছে, শোনো, গিন্নি—কাল রাত্তিরে এসে বলে, মেঁয়েকে শীঁগ্‌গির কঁরে বিঁয়ে দেঁ। দেখতো কাণ্ড। আমার মেয়েকে [এই সময় মিনি প্রস্থান করিল] আমি এখন বিয়ে দিই, কি পরে বিয়ে দিই, বিয়ে দিই কি একেবারে না-ই দিই, তাতে তুই,—ভূত,—তোর কি ?

গিন্নী

কথাটা একদম অন্যায্য বলেনি,—মেয়েটাকে আর কতকাল আইবুড় রাখ্‌বে ?

কর্ত্তা

তুমি তো ভূতের সঙ্গেই সায় দিলে, অথচ আমি পাত্র পাই কোথায়। শালারা তো এক ঝুড়ি টাকা চেয়ে বস্‌বে 'খন—

গিন্নী

ওগো, বলি শম্ভুর কথা তোমার মনে আছে,—ঐ যে শশি মিত্তিরের ছেলে ? জলপানি পেয়েছিল

কর্ত্তা

হাঁা, তার কি ?

গিন্নী

তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে ?

কর্ত্তা

হুাঃ, হা-ঘরে বাপ-মা, পয়সা দেখেনি কোনও দিন, জলপানি পাওয়া ছেলের দোহাই দিয়ে ছিনে জোঁকের মত টেনে ধর্‌বে। ও—সবের মধ্যে আমি নেই। শম্ভুটম্ভু বাদ দাও। ও সুবিধের ছেলে নয়।

গিন্নী

না গো, সে—আজ কালকার ছেলে, একটী পয়সাও নেবে না।

কর্ত্তা

[সহর্ষে] নেবেনা ? পয়সা চায় না ? তবে—বুঝলে কিনা গিন্নী,—তোমার ইচ্ছে—মত করতে পার। আমার খুব বেশি রকম মত আছে। বেশ সুবিধে মতন ছেলে পাওয়া গেছে,—দেখো, যেন আবার ফস্‌কে না যায়।

গিন্নী

সে আমি করবো খন।

কর্ত্তা

খরচান্ত হ'য়ে গেলাম,—মেয়ের বিয়ে তো নাহক কম করে চল্লিশ পঞ্চাশটা টাকা খরচ হ'য়ে যাবে। আর দু-দুটো চাকর রাখতে হলো—মাস মাস দশবারোটা টাকা মাইনে ন দেবায় ন ব্রাহ্মণায় গেল। দেখ্‌বে চলো গিন্নী, কি রকম ষণ্ডাগোছের দুই ব্যাটা,—ভাত যা সাবাড় করবে। তবে রক্ষে ভূতটুতের কথা কিছু শোনে নেই। চল, চল, ওদের বাইরে দাঁড় করিয়ে এসেচি,—ভূতে যদি ভেঙ্‌চি দিয়ে যায়, তবেই ব্যাটারা পালাবে।

[দুজনের প্রস্থান]

অন্য দুয়ার দিয়া কালো ঢাকনাটা উঠাইতে উঠাইতে শম্ভুর প্রবেশ। তারপরেই মিনি উপস্থিত হইল।

মিনি

তুমি কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি করছ, শম্ভুদা ?

শম্ভু

কেমন ?

মিনি

আমার বাবাকে তুমি খোঁচা দেবার কে। বুড়ো মানুষ,—অন্ধকারে যদি মাথায় লাগিয়ে দিতে...

শম্ভু

চোখ বুজে কি দিয়েছিলুম,—দেখে শুনেই দিয়েচি,—কোথায় লাগলে ব্যথা পেতে পারে আমার কি আর জ্ঞান নেই না কি ?

মিনি

আচ্ছা, তাই যেন হ'লো, কিন্তু আমাকে বিয়ে দেওয়াবার কথা তোমাকে কে বলতে বলেছিল। সেটা বুঝি নিজের বুদ্ধি খরচ করে বলা হয়েচে ?

শম্ভু

দেখতো, কেমন চমৎকার মাথা খাটিয়ে বলে দিলুম।

মিনি

হয়েছে, হয়েছে। অত দয়া করতে হবে না।

শম্ভু

বলো কি ? উচিত কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না ? তোমার এখন বিয়ে হওয়া দরকার,—বুঝলে, আমার ক্রমশঃই মনে হচ্চে, তোমার এইবার বিয়ে হওয়া দরকার !

মিনি

দেখ, ভাল হবে না, শম্ভুদা। দরকার হলে, তোমারই।

শম্ভু

হ্যাঁ, আমারও। তোমারও। তোমার সাথে আমার।

মিনি

ভূত কোথাকার ! [বিরক্তির অভিনয় করিল] আমি চল্লুম। কী অসভ্যরে বাবা !

[প্রস্থানোদ্যত]

শম্ভু

শোন না মিনি। তুমি ভূতের পেত্নী হবে ?

[জিব—ভেঙ্‌চাইয়া মিনির প্রস্থান]

[ডাকিয়া] ওগো পেত্নী গো [গিন্নীর প্রবেশ। শম্ভু জিব কাটিল] মাসিমা !

গিন্নী

এই যে শম্ভু !

শম্ভু

মাসিমা, আমি মিনিকে বিয়ে করবো। [গিন্নী একটু অবাক্ হলেন। একটু অপেক্ষা করিয়া শম্ভু আবার বলিল] বলুন, মাসিমা আমার সঙ্গে কি আপনারা বিয়ে দেবেন ?

গিন্নী

কিন্তু তোমার বাপ মার মত—

শম্ভু

হবেই।

গিন্নী

কিন্তু মিনির বাবা কি রকম হিসেবী জানতো। পয়সা কড়ি হয়তো কিছুই—

শম্ভু

[শেষ করিতে না দিয়া] তার দরকার নেই। একটু মাত্র দরকার নেই। নিজের উপার্জ্জনের পয়সা ছাড়া, আর কোনও পয়সার ওপর আমার আর লোভ নেই।

গিন্নী

[ভাবিয়া] কিন্তু শুধু তোমার কথাই তো নয়, তোমার মা বাবা আছেন, তাদের কথা ভাবতে হবে, আর শুধু তাও নয়, আমার মেয়ের বিয়েতে যদি আমি উপযুক্ত রকম যৌতুক না দিই, তবে লোকেই বা কি বল্‌বে, আর আমিই বা কি বলে নিজেকে বোঝাব। সে যে আমার পক্ষে কত বড় দুঃখের কথা হবে তুমি তা বোঝ না ?

শম্ভু

ওঃ

গিন্নী

শুধু এক উপায় আছে।

শম্ভু

কি ?

গিন্নী

যেমন করে অনেকটা ওঁকে শোধ্‌রান গেছে, তেমনি করে এটাও হয়তো সংগ্রহ হ'তে পারে। ভূতের ভয় যে একেবারে নেই, তা নয়।

শম্ভু

[লজ্জিত ভাবে] ছিঃ, কী কাণ্ড করতে হচ্ছে বলুন,— শুধু মিনি না ছোড়বান্দা বলে। কিন্তু নিজের জন্য এমন করে যৌতুক সংগ্রহ করতে আমার লজ্জা—

গিন্নী

কিছু নয়, কিছু নয়, লজ্জার কিছু নয়। উনি ঐ ধরণেরই মানুষ,—প্রাণধরে কাউকে পয়সা কড়ি দিতে পারেন না, এমন কি নিজের মেয়েকেও নয়। ওঁর কাছে একটু কৌশল করা কিছু দোষের হবেনা।

শম্ভু

কিন্তু টাকা কি করে আদায় করি, টাকা তো আর সঙ্গে থাকেনা। টাকা এনে দিতে বল্‌লে বাড়ি ছেড়ে পালাবেন,—আর ফিরবেন না।

গিন্নী

সঙ্গেও থাকে বৈকি,-- তুমি কি সব কথা জান! ব্যাঙ্ক ফেল পড়তে পারে ভয়ে, স্থানে স্থানে ওঁর কত গর্ত্ত ঠিক আছে,—বেশির ভাগ টাকাই তাতে গোপন করা। শত বল্‌লেও শুনবেন না। তাছাড়া হাজার চারেক টাকা সব সময়ই ওঁর কোমরে বাঁধা থাকে,—সব সময়, দিন রাত্তির, চব্বিশ ঘণ্টা। বাদ বাকী যা আছে, তা কুড়ি পঁচিশটা ব্যাঙ্কের মধ্যে ছড়ান, যাতে ফেল পড়লেও এক সঙ্গে বেশি টাকা মারা না যায়।

শম্ভু

ওঃ, তাই নাকি ?

গিন্নী

আরো কত কাণ্ড আছে, মিনির বাবার। তা, থাক্‌, আজ রাত্রে তুমি অন্তত হাজার তিনেক আদায় করে নিয়ে এসো।

শম্ভু

কী একটা হাসির ব্যাপার হচ্ছে বলুন তো। আমত একটা ঠক্‌ হ'য়ে উঠেচি। [শুনিয়া] ঐ বুঝি, উনি আস্‌ছেন। আমি এই বেলা চম্পট দিই।

[প্রস্থান]

অন্য দুয়ার দিয়া কর্ত্তা প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা

[বলিতে বলিতে প্রবেশ] বুঝলে গিন্নী, দু-দুটো ব্যাটা চাকর জুটেচে। সর্ব্বস্ব খেয়ে ফেলবে। ডালের সাপ ভাতের মাড় মিশাতে বলে দিয়ো দিকিনি।

[যবনিকা পড়িল]

চতুর্থ দৃশ্য

গভীর রাত্রি। পট উঠিলে দেখা গেল অন্ধকারে একটা তক্তপোষে কে একজন ঘুমাইতেছে। দেওয়ালে ভূত তাড়াইবার জন্য একটা নামাবলী টাঙ্গানো আছে। ঘরের একটা জানালাও খোলা নাই। একটা অতি ক্ষীণালোকে শুধুমাত্র তক্তপোষটা যা হোক কিছু দেখা যায়।

প্যাঁচার চীৎকার শোনা গেল।

একটা সানুনাসিক সুর শোনা গেল, তারপর সেই অন্ধকার ঘরে বিকট এক সাজ করিয়া ভূতের প্রবেশ।

ঘরে ঢুকিয়া ভূত তিন চারবার তক্তপোস প্রদক্ষিণ করিল, কি অদ্ভুত ভীতিকর সব অলৌকিক শব্দ করিল। গাল টিপিয়া 'ক্রম্' 'ক্রম্' আওয়াজ বাহির করিল।

দেওয়াল হইতে টিকটিকি পাড়িয়া মুখে পুরিবার অভিনয় করিয়া সে দরজার কাছে—তক্তপোষ হইতে দূরে,—যাইয়া দাঁড়াইল।

ভূত নাকী সুরে কথা বলিবে।

ভূত

[নাকী সুরে] চিঁ হি হি হি, হো হো হো হো হো, বুম্ বুম্, বুম্। [একটু চুপ]

ভূত

[নাকী সুরে] ঘুনুচ্ছিস্ বুঝি? [একটু অপেক্ষা করিয়া] মুখ্খু মানব, রাতে ঘুমুস! জাগ জাগ! বুম, বুবুম্ বুম!

ভূত

পঙ্ পঙ্ ব্রুম্ ভুঃ হি হি হি হা হা। [নাকী সুরে] অসময়ে ঘুমুচ্ছিস্ কেনরে,—দুপুর রাত্তিরে ঘুমুস্, আল্সে কোথাকার! [তবুও ঘুমন্ত কর্ত্তার সাড়া নাই] থঃ ক্ষঃ, ভুম্ [খুব লম্বা একটা লাঠি দিয়া কর্ত্তার ভুঁড়িতে এক খোঁচা দিল।] ওঠ, ওঠ বলচি…

[কর্ত্তা 'ভুঁড়িতে কে খোঁচাচ্ছে রে?' বলিয়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু ভূতের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া নিমেষ মধ্যে শুইয়া চক্ষু বুজিয়া নাক ডাকাইতে সুরু করিল]

কর্ত্তা

[শুইয়া চক্ষু বুজিয়া] আমি জেগে নেই, ঘুমিয়ে পড়েচি আবার। আমার ভুঁড়ির খোঁচা আমি টের পাইনি। [জোরে নাক ডাকাইতে লাগিল]

ভূত

[নাকী সুরে]

দাঁড়া তবে মজা দেখাচ্চি! আহা, কতদিন যে মনিষ্যির ঘাড় মটকাইনি,—তাজা রক্ত সুস্বাদু, বড় সুস্বাদু!

কর্ত্তা

[নিজে নিজেই] বলে কিরে! অ্যাঁ, মতলবটা যে ভালো নয়। [জোরে] আমি ঘুমুইনি, আমি জেগেই আছি দেবতা [ভয়ে তার গলা কাঁপিতেছে]

ভূত

[সানুনাসিক] আমি দেবতা নই,—ও—নচ্ছারদের নাম করিসনে আমার কাছে। আমি ভূত। বুম্ বুকুম্, বুবুবুম, ক্ষঃ, ফোঁস্ হা হা হি হি হি।

কর্ত্তা

[চোখ বুজিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া শুইয়া] আবার কেন হুজুর,—কথামত চাকর তো এনে হাজির করেচি,—এইবারটী দুর্ব্বলকে ক্ষেমা দিন!

ভূত

বড় ক্ষিধে পেয়েচে,—মানুষের মুণ্ডুটা আবার কোথায় রাখলুম; এই যে পেয়েছি [একটা নর-কঙ্কাল বাহির করিয়া আনিল]

কর্ত্তা

[উঁকি দিয়া একটু দেখিয়া] সেরে-ছে রে!

ভূত

শোন্!

কর্ত্তা

[চক্ষু বুজিয়াই] আজ্ঞে করুন!

ভূত

চাঁদা চাই…বুম্, ব্রুম, ববম্…চাঁদা চাই!

কর্ত্তা

চাঁদা? কিসের চাঁদা হুজুর?

ভূত

হা হা হা হা হি হি হি হি। অমাবস্যার দিন আমাদের মহোৎসব হবে,...চাঁদা চাই, টাকা দে, টাকা [নরমুণ্ডে কামড় দেবার অভিনয় করিল]

কর্ত্তা

[সাতঙ্কে] টাকা? হুজুর আমি টাকা পাব কোথায়? কপর্দ্দক আমার নেই,—দিন আনি দিন খাই—

ভূত

চালাকি হবেনা। আহা, কত দিন যে মনিষ্যির ঘাড় মটকাইনি,—তাজা রক্ত সুস্বাদু, বড় সুস্বাদু, হা হা হা। টাকা চাই, শীগগির দে···

কর্ত্তা

হুজুর, আমি বুড়ো, মানুষ! আমি গিয়ে, আপনার টাকা পাব কোথায়?

ভূত

[বিকট অট্টহাসি করিয়া উঠিল] দিবিনে, তবে, লক্ষীছাড়া দিবিনে। [দাঁত কড়মড় করিয়া] হা হা হা হা হি হি হি হি, সুস্বাদু, বড় সুস্বাদু···

কর্ত্তা

দোহাই হুজুর, আমায় প্রাণে মারবেন না। এই বল্লুম, দেবো, দেবো টাকা, বুকের রক্ত জল করেই দেব। বেশ, দেব বল্লুম, কালই এনে দেব।

ভূত

ববম্, ফোঁঃ, ভূত ভুতুম! আজ, আজই চাই। কাল্‌কের নাম করে পালিয়ে যেতে চাস্—ঘাড় মটকাবো তো,—তাজা রক্ত, হা হা হা হা হা—

কর্ত্তা

কিন্তু হুজুর, এখন আমি কোথায় পাই?

ভূত

কোমরের টাকার থলিটা বের করে দে [দেওয়াল হইতে টিকটিকি ধরিয়া মুখে পুরিবার অভিনয়]

কর্ত্তা

[প্রায় স্বগত] সেরেছে,—তাও টের পেয়েছে। ওরে বাবা, এযে সত্যি, ভূতের অজানা কিছু নাই [জোরে] হুজুর আমি গরীব মানুষ,—আমি চারগণ্ডা পয়সার বেশি দিতে পারব না কিন্তু,—তিনদিন আমার বাজার খরচা বন্ধ রাখতে হবে···

ভূত

[নরমুণ্ডটা নীচে ফেলিয়া তাহা দিয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়া] হা হা হি। সব চাই, সব—

কর্ত্তা

[বিশ্বাস না করিয়া] মানে?

ভূত

থলিটা আমার হাতে দে,—দেরি করিসনি, দে দে, বের করে দে,—চিহি হি হি ক্রম্ ক্রম্—

কর্ত্তা

সর্ব্বনাশ, এ বলে কি? থলেতে যে তিনতিন হাজার টাকা! অ্যাঁ,—কি কাণ্ড। এর চাইতে আমার মরা ভাল,—নাঃ,—প্রাণধরে এ-টাকা আমি দিতে পারব না। ভূত বাবু,—মার, একদম মেরে ফেল, ঘাড় মটকাও, দেহে প্রাণ থাক্‌তে এ-টাকা আমি ছাড়তে পারব না···

ভূত

হা হা হা হা হা খাবো খাবো খাবো হা হা হা হা হা

[ভূতের মুখ দিয়া অকস্মাৎ আগুন বাহির হইতে লাগিল]

[দেখিয়া কর্ত্তার দম বন্ধ হইয়া আসিবার জোগাড়]

কর্ত্তা

ওরে বাবা, যাই কোথা। এত বল্লুম, একটু যে দয়া হ'লো না। শেষে দেখি পৈত্রিক প্রাণটায় ঠাণ্ডা ক'রে দেবে! [কোমর হইতে থলি খুলিয়া] নেও, নেও, নিয়ে যাও, সর্ব্বস্ব নিয়ে যাও। ওরে, কী কুক্ষণে এই ভূতের সঙ্গে বাস করতে এসেছিলাম,—আমার সর্ব্বনাশ করে ছেড়ে দিলে—

ভূতের মুখ হইতে তখন তেমনি আগুন বাহির হইতেছে]

প্রাণে মেরো না হুজুর ,নেও নেও, নিয়ে যাও, এক নয়, দুই নয়, একশো নয়, দুশো নয়, তিনতিন হাজার টাকা, ওরে আমি পাগল হয়ে যাব।

[ভূত এমন সময় ভীষণ হুঙ্কার করিয়া উঠিল]

নেও, নেও, আমার কলজে ছিঁড়ে নিয়ে যাও

[বাঁ হাতে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে ছুঁড়িয়া দিল]

ভূত আসিয়া সেই উঠাইয়া লইল। বাঁ হাতে মড়ার মাথাটা নাড়াইয়া সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

কর্ত্তা

[লাফাইয়া উঠিয়া] মরি তো মরি, একবার ঝাপ্‌টে ধরি।

ভূতকে যাইয়া জাপ্‌টাইয়া ধরিল। কর্ত্তা বলিতে লাগিল,—এতগুলি টাকা গেলে আমার জীবন থেকেই আর কোন্ লাভ। ভূত প্রাণপণে তাকে ছাড়াইতে চায়। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর ভূত ছাড়া পাইয়া চো—চো চম্পট দিল।

কর্ত্তা

[আর্ত্তনাদ করিয়া] গেল, নিয়ে গেল, সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল। [চীৎকার করিয়া] গিন্নী, ও গিন্নী, ওঠ, ছুটে এসো। ভূতে আমাকে সাবাড় করে গেল।...

[ছুটিয়া গিন্নী ও মিনির প্রবেশ]

গিন্নী

কি কি কি হয়েছে,—অমন করে চেঁচাচ্ছ কেন?

ঐ

চেঁচাচ্ছি, সাধে চেঁচাচ্ছি,—সর্ব্বস্ব অপহরণ করল। গলায় পা দিয়ে কাণাকড়িটি পর্য্যন্ত নিয়ে গেল। ওরে আমাকে পথে বসিয়ে গেল রে, ওরে আমার—

গিন্নী

কি নিল, কে নিল, কিছু বলচ না যে—কেবলই চেঁচিয়ে মরচ

কর্ত্তা

গিন্নী, তোমার কথা আগে শুনিনি, অন্যায় করেচি, ঘোরতর অপরাধ করেচি। নইলে ভূতের সঙ্গে মানুষের থাকা কি কোনদিনই উচিত। বলবো কি গিন্নী, ব্যাটা ঘাড় মটকাবার ভয় দেখিয়ে, আমার তিন তিন হাজার টাকা লুঠ করে নিয়ে গেল। আমি আর ভাল নেই,—ক্রমেই পাগল হ'য়ে যাচ্ছি,—মগজ্ আমার জট্ পাকিয়ে যাচ্ছে,—ওগো, আমি পথে বস্‌লাম গো!

গিন্নী

বলেছিলাম, এই ভূতুড়ে বাড়ীতে থেকে কাজ নেই,—কি সর্ব্বনাশের কথা গো! সত্যি সত্যি যদি ঘাড়টাড়ের ওপর অত্যাচার করত তবেই—

কর্ত্তা

আরে দুত্তোর ঘাড়ের ওপর অত্যাচার! আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেল,—তো ঘাড় থাকা আর না থাকা। ওরে মা, আমি কি করি, আমি যাই কোথা। পুলিশে যাব, তারও জোগাড় নেই,—ভূত ধরতে আর কোন্ পুলিশ আস্‌বে। [সহসা থামিয়া] চল গিন্নী যাবো, যাবো। লক্ষ্মীছাড়াদের ঘাঁটিতেই গিয়ে হানা দেবো,—মিনি তুই লণ্ঠন ধর, গিন্নী তুমি আঁশ বটি নিয়ে এসো,—

[প্রভাতের আলো দেখা দিল]

ঐ যে ভোর হয়ে এসেচে,—চল গিন্নী, শীগ্‌গির চলো আর দেরি নয়,—অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে ধরা যাক্ গিয়ে।

[কর্ত্তা ও গিন্নীর প্রস্থান]

এমন সময় অন্য দুয়ার দিয়ে শম্ভু প্রবেশ করিল

মিনি

কী তোমরা আরম্ভ করেছ বলোতো,—বুড়ো লোকটাকে মেরে ফেল্‌বে না কি?

শম্ভু

আর নয়,—এইবার সমাপ্ত মিনি। আমার ভূত-লীলা এইবার সম্বরণ করবো।

মিনি

শুনে আশ্বস্ত হলুম...

শম্ভু

তোমার জন্যই তো,—অর্থাৎ মানে, বুঝলে কিনা,—তোমার জন্যই ওটা করতে হ'লো।

মিনি

আমার জন্য ?

শম্ভু

হাঁ গো। তোমাকে বিয়ে দিতে টাকা লাগ্‌বে যে!

মিনি

যথেষ্ট ধন্যবাদ, আমার জন্য মাথা-ব্যথা করবার তোমার কোন দরকার ছিলনা।

শম্ভু

মিনি ?

মিনি

কি।

শম্ভু

আমাকে পছন্দ হয় ?

মিনি

ভূত কোথাকার !

শম্ভু

ও-সব চালাকি চল্‌বে না। এত হাঙ্গামা করলুম,—এখন করতেই হবে।

মিনি

[দরজার দিক অগ্রসর হইয়া] কী অসভ্য রে! আমি কখ্‌খনো আর তোমার সঙ্গে কথা বলবনা। চল্লুম আমি!

শম্ভু

রাগলে তোমায় চমৎকার দেখায় মিনি।

মিনি

[রাগের অভিনয় করিয়া] ভূত! [দরজার কাছে আগাইয়া গেছে]

শম্ভু

[হাসিয়া] পেত্নী!

[কিল দেখাইয়া মিনি তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। শম্ভু আগাইয়া গিয়াছিল। এমন সময় বাহিরে কর্ত্তার গলা শোনা গেল। 'লক্ষ্মীছাড়ারা মহোচ্ছব করবেন,—যাকে বলে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।' শুনিয়া শম্ভু ত্রস্ত-ভাবে চম্পট দিল। ও-দিক দিয়া আঁশবটি উদ্যত করিয়া কর্ত্তার প্রবেশ]

কর্ত্তা

[রঙ্গমঞ্চের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে] ভূত তো ভূত, ভূতের বাপ আমার টাকা নিয়ে হজম করতে পারবে না। কোথায় যাবে বাপু, পেট টিপে, টাকা বের করব আমি। প্রাণ যায় যাক্‌, কিন্তু টাকা,—ও-সব হচ্চে না···আমি তোমার নাক কাট্‌ব, কান কাট্‌ব, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব।

যবনিকা

শ্রীসুবোধ বসু

জেনারেল ক্ল্যদ মার্টিন

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পি আর এস

সাধারণ ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণ হইতে অনেক বিষয়ে ক্ল্যদ মার্টিনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তিনি প্রথম যুগের একজন বিখ্যাত ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। প্রথমজীবনে স্বদেশের সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেও তিনি পরে সমরু ও মাদেকের মত ইংরাজ কোম্পানীর কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মত তিনি প্রথম সুযোগেই অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে পলায়ন করেন নাই। একবার বশ্যতা স্বীকার করিবার পর শপথ ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করা হেয়তম বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া তিনি মনে করিতেন। মার্টিনের অবশিষ্ট জীবন ইংরাজের কর্ম্মে অতিবাহিত হয়। কালক্রমে তিনি কোম্পানীর সেনাবিভাগে 'মেজর-জেনারেল' পদে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে ইংরাজ সেনাবিভাগে বিদেশী সৈনিকের অপ্রতুল ছিলনা, কিন্তু খুব অল্পলোকের অদৃষ্টে এ সৌভাগ্যলাভ ঘটিয়াছিল।* মার্টিন নিজ জাতীয়ত্ব কখন বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি মনে প্রাণে বরাবর ফরাসীই ছিলেন। ইংরাজ নাগরিকত্ব গ্রহণ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে অনেকবার অনুরোধ করিলেও তিনি সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। নিজের উইলে তিনি স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছিলেন যে তিনি ক্যাথলিক খৃষ্ট-ধর্ম্মবিশ্বাসী ফরাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই ভাবেই মরিতে চাহেন; ইহা ভিন্ন অপর কিছু তাঁহার কাম্য নাই।

সুবিপুল অর্থ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেও সহকর্ম্মীগণের মত মার্টিন পরিণত বয়সে তাহা লইয়া বিশ্রামসুখ উপভোগের জন্য স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই। সঞ্চিত অর্থরাশির অধিকাংশ তিনি বিভিন্ন সৎকার্য্যে, প্রধানতঃ খৃষ্টান বালক-বালিকাগণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনোদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—মার্টিনের দেহান্তের আজ শতাধিকবর্ষ পরেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-নিকেতন-সমূহ, রুগ্ন, আর্ত্তের জন্য তাঁহার দানভাণ্ডারগুলি তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ জগতে বিঘোষিত করিতেছে। ভাগ্যান্বেষীদিগের মধ্যে অনেকে হয়ত মার্টিন অপেক্ষা অধিক অর্থার্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু আজ কে-ই বা তাহাদের চিনে?

ফ্রান্সদেশের লিয়ঁনগরে ফ্ল্যারীমার্টিনের পিপানির্ম্মাণের কারখানা ছিল। কেহ কেহ তাঁহাকে রেশম ব্যবসায়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে কথা কিন্তু সত্য নহে। ক্ল্যদ ফ্ল্যারীর দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। মাত্র নয়মাস বয়ক্রমকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং তাহার অনতিকাল পরেই ফ্ল্যারী পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। ক্ল্যদের বিমাতা জিয়ানমেরি মার্টিনেট তিনটী পুত্র ও দুইটি কন্যার জননী হইয়াছিলেন। অনুমান ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ফ্ল্যারীর মৃত্যু হইয়াছিল।

বাল্যকালে ক্ল্যদ স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার গণিত ও বিজ্ঞানে সবিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। উত্তরকালে এই দুই বিদ্যাই তাঁহার যথেষ্ট প্রয়োজনে লাগিয়াছিল। তখন ভারতবর্ষে ফরাসীদের খুব প্রভাব। ডুপ্লের চেষ্টায় ফরাসী নামে একটা শ্রদ্ধাভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে তখন ইংরাজ ও ফরাসীতে দ্বিতীয় কর্ণাটিক সমর (১৭৫১—৫৪) নামে

---

* ইংরাজদিগের Regiment of de Meuron নামক সুইজরলণ্ড-দেশীয় একদল ভৃতিভুক সৈন্য ছিল। উহাদের অধিনায়ক কাউণ্ট চার্লস ডানিয়েল এবং কাউণ্ট পীয়ের ফ্রেডারিক ডি মিউরণ নামক ভ্রাতৃদ্বয় উভয়েই ঐ পদলাভ করিয়াছিলেন। Martin নামটীর প্রকৃত ফরাসী উচ্চারণ মার্ত্যাঁ হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধ মধ্যে উক্ত নামের ইংরাজী উচ্চারণ প্রদত্ত হইল।

পরিচিত বিষম যুদ্ধ চলিতেছিল। হায়দ্রাবাদ ও আর্কট-দরবারে ডুপ্লের ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে এই যুদ্ধের উদ্ভব সে কথা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রে অবগত আছেন। যুদ্ধ-নিরত সৈনিকগণের হস্তে আশাতীত অর্থাগম হইতেছিল। এই সকল কাহিনী শ্রবণ-গোচর হওয়াতে ফ্রান্সদেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলকার মনে ভারতবর্ষের নামে এক মাদকতার সৃষ্টি হইয়াছিল। দেখিয়া শুনিয়া ক্ল্যদ এবং তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লুইয়ের প্রাচ্যদেশে ভাগ্য-পরীক্ষায় যাইতে বাসনা জন্মিল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া উভয়ে একদিন গোপনে ভারতবর্ষে গমনোদ্যত এক রেজিমেণ্টে নাম লিখাইল। এ সংবাদে জিয়ান মেরী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহার ভর্ৎসনা, অনুরোধ উপরোধে লুইয়ের আর যাওয়া হইল না। ক্ল্যদ কিন্তু কাহারও বারণ মানিলেন না। ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৫১ সালে তাঁহার রেজিমেণ্ট L'orient বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া পর বৎসর মার্চ্চ মাসে যথাকালে পন্দিচেরীতে আসিয়া উপনীত হইল।

এদেশে উভয় কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ সমরে মাতিলেও আশ্চর্য্যের বিষয় দ্বিতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধকালে ইউরোপে উভয় জাতির মধ্যে শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু শীঘ্রই আবার বিখ্যাত সপ্তবর্ষব্যাপী সমর। (Seven Years War; 1756—1763) বাধিলে ইংরাজ ও ফরাসীরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বলপরীক্ষায় লিপ্ত হইল। ভারতবর্ষে সংঘটিত যুদ্ধ তৃতীয় কর্ণাটিক সমর নামে অভিহিত। মার্টিন, মাদেক জঁাভিল, হুগেল, রাসেল, গার্দ্দে, আলেনপ্রমুখ উত্তরকালে সুপ্রসিদ্ধ ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণ প্রথমজীবনে ফরাসী সেনাদলে থাকাকালে লিপ্ত ছিলেন। উঁহাদের কাহিনীপ্রসঙ্গে ঐ সকল যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ প্রায়ই করিতে হইবে। সেজন্য এখানে কর্ণাটিকের সমরত্রয় সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কি ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য করায়ত্ত-প্রায় ভারতবর্ষের আধিপত্য ফরাসীগণ হারাইল, কিরূপে ইংরাজরা প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট লব্ধ বিত্তার বলে তাহাদের নির্জ্জিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাও জানা আবশ্যক।

মোগলশক্তির পতনজনিত বিশৃঙ্খলার সুযোগে এদেশে নিজেদের প্রাধান্য বদ্ধমূল করার পরিকল্পনা সুবিখ্যাত ফরাসী মনীষি ডুপ্লের আবিষ্কৃত। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে War of the Austrian Succession উপলক্ষ্যে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে উঁহাদের বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হইলেন। পর বৎসর ইংরাজ এডমিরাল বস্কাওয়েন নৌবহর লইয়া বঙ্গোপসাগরে দেখা দিলে ডুপ্লে প্রমাদ গণিয়া কর্ণাটিক প্রদেশের নবাব আনওয়ার উদ্দীনের শরণ লইলেন। মান্দ্রাজ ও পন্দিচেরী উভয় নগরই তাঁহার রাজ্যমধ্যে অবস্থিত ছিল। নবাব ইংরাজদিগকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতে নিষেধ করিলে বস্কাওয়েন নিজ রণপোতমালা লইয়া ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুকাল পরে মরিশস দ্বীপের শাসনকর্ত্তা এডমিরাল লাবোর্দ্দোনে ফরাসী নৌবহরসহ করমণ্ডল উপকূলে আসিয়া দেখা দিলেন। তখন ডুপ্লের আর নবাবের নিরপেক্ষতার কথা স্মরণ রহিল না। লাবোর্দ্দোনে শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ মাহিবন্দরের উদ্ধারসাধন করিলেন এবং ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ লর্ড পেটনকে পরাজিত করিয়া মান্দ্রাজ অবরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তাহকাল অবরোধের পর ইংরাজরা তিনমাস পরে তাঁহারা ৪৪ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিলে মান্দ্রাজ ফিরিয়া পাইবেন এবম্বিধ সর্ত্তে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ডুপ্লে কিন্তু এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি লাবোর্দ্দোনেকে জানাইলেন যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত এডমিরালের ইংরাজদিগকে ঐ প্রকার সর্ত্ত দিবার ক্ষমতা নাই। ইহাতে লাবোর্দ্দোনের ক্রোধের অবধি রহিল না। নিজের কথায় কোন মূল্য থাকে না দেখিয়া তিনি আপনাকে অবমানিত বিবেচনা করিলেন এবং ডুপ্লেকে জানাইলেন যে রাজকীয় নৌবহরের অধ্যক্ষরূপে তিনি গভর্ণরের অধস্তন কর্ম্মচারী নহেন, ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিবার অধিকার তাঁহার আছে। ইংরাজদিগের পরম সৌভাগ্য-বশতঃ ইঁহারা দুইজনে এই সময় আত্মকলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। নতুবা তাঁহাদের রক্ষা পাইবার আর কোন আশা ছিল না।

এদিকে ফরাসীরা তাঁহার নিষেধ না মানিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করায় আনওয়ারউদ্দীন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

এ সংবাদে ডুপ্লে তাঁহাকে জানাইলেন যে লাবোর্দোনের নিকট হইতে মান্দ্রাজ পাইতে যাহা কিছু বিলম্ব; উহা পাইবামাত্র তিনি নবাবকে তাহা সমর্পণ করিবেন এবং ঐজন্যই ফরাসীরা ইংরাজদিগের নিকট হইতে মান্দ্রাজ অধিকার করিয়াছে। অতঃপর ডুপ্লে লাবোর্দোনের নিকট হইতে মান্দ্রাজ লাভে সচেষ্ট হইলেন এবং স্বদেশে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে অর্থ-বিনিময়ে মান্দ্রাজ ইংরাজদের প্রত্যর্পণ করিলে ফরাসীদের ঘোর স্বার্থহানি হইবে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ডুপ্লের করে মান্দ্রাজ প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়া লাবোর্দোনে অতঃপর নিজ নৌবহর লইয়া মরিশসদ্বীপে ফিরিয়া গেলেন। *

মান্দ্রাজ হাতে পাইয়াও ডুপ্লে নবাবকে তাহা দিলেন না। তিনি তথাকার ইংরাজদিগকে বন্দীদশায় পন্দিচেরী প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদের যাবতীয় সম্পত্তি রাজকোষজাত করিয়া লইলেন। আনওয়ারউদ্দীন মান্দ্রাজ অধিকার করিবার জন্য নিজ পুত্র মহফুজ খাঁর নেতৃত্বে দশসহস্র সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় শিক্ষিত সিপাহী সেনা লইয়া Paradis এবং Espresmenil নামক ফরাসী সেনানায়কদ্বয় মৈলাপুর বা সান্ থোমের যুদ্ধে উহাদের বিতাড়িত করিলেন। এই ঘটনায় সমগ্র দেশে চাঞ্চল্যের স্রোত বহিল,—পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতির উৎকর্ষ সম্বন্ধে লোকের চক্ষু ফুটিল,—ফরাসীদের নামে সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাভীতির সঞ্চার হইল। অতঃপর ডুপ্লে ফোর্ট সেণ্টডেভিড অধিকারে সচেষ্ট হইলেন। মান্দ্রাজের পতনের পর ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। ইতোমধ্যে তাঁহার চক্রান্তে নবাব ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ফরাসীদের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। সম্মিলিত সেনাদল একযোগে দুর্গ আক্রমণ করিল। কিন্তু ইংরাজগণ অসমসাহসে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মেজর লরেন্স ও বস্কাওয়েন ইংলণ্ড হইতে সাহায্যকারী সৈন্যদলও রণপোতমালা লইয়া উপনীত হইলেন। তখন আর জয়াশা নাই দেখিয়া শত্রুপক্ষ পশ্চাৎপদ হইল। অপ্রকৃতিস্থমতি নবাব পুনরায় পক্ষ পরিবর্ত্তন করিলেন। এবার ইংরাজদিগের পালা, তাঁহারা মহোৎসাহে পন্দিচেরী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু জলে স্থলে দুইমাসকাল নগর অবরোধ করিয়াও তাঁহারা উহা অধিকার করিতে পারিলেন না, বরং তাঁহাদের সেনানায়ক লরেন্স শত্রু করে ধৃত হইলেন। ডুপ্লে মহোৎসাহে চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে ইংরাজরা পরাজিত হইয়াছে। ইহার কিছুকাল পরে ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইবার সংবাদ (আ-লা-শাপেলের সন্ধি—অক্টোবর ১৭৪৮) এদেশে আসিয়া পৌছিলে যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল। ইংরাজরা মান্দ্রাজ ফিরিয়া পাইলেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের ডুপ্লের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও মান্দ্রাজ প্রত্যর্পণ করা নিতান্ত অনুচিত হইয়াছিল।

চিরশত্রু এই দুই জাতি কিন্তু দীর্ঘকাল এদেশে শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারিল না। অচিরেই আবার তাহারা যুদ্ধে মাতিল। আনওয়ারউদ্দীন নিজ সুবিধামত পক্ষ পরিবর্ত্তন করায় ডুপ্লে তাঁহার প্রতি জাত-ক্রোধ হইয়াছিলেন। দেশীয় নৃপতিবৃন্দের আত্মকলহে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজ মনোনীত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে সমগ্র দেশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এ বিদ্যাটী ডুপ্লেরই আবিষ্কৃত। চাঁদ সাহেব নামক পূর্ব্বতন এক আর্কটের নবাবের জামাতা ফরাসীদের নিকট আনওয়ারউদ্দীনের বিরুদ্ধে সাহায্যকামী হইলে ডুপ্লে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বৃদ্ধ নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ তৎকালে তাঁহার সন্নিকটে ছিলেন।

*সেখানে আসিয়া লাবোর্দোনে দেখিলেন ইতোমধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীর চেষ্টায় তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন এবং নূতন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তখন রাজদরবারে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি এক ওলন্দাজ পোতারোহণে ইউরোপ যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ইংরাজ হস্তে ধৃত হইয়া ইংলণ্ডে নীত হইবার পর তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিবার অঙ্গীকার করিয়া স্বদেশ গমন করিলেন। মরিশসদ্বীপের শাসনকর্ত্তা অবস্থার কুশাসনের অভিযোগে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। তিন বৎসর পরে তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল এবং বিচারের ফলে তিনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলেও বাস্তিলের কঠোরতায় এবং মনঃকষ্টে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং মুক্তিলাভের স্বল্পকাল পরেই তিনি মানবলীলা-সংবরণ করিলেন।

রাজকোষ হস্তগত করিয়া তিনি নিজেকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আসফ ঝার জ্যেষ্ঠপুত্র গাজিউদ্দীন হাইদর দিল্লী দরবারে উজীর ছিলেন। তিনি মোগল দরবার ছাড়িয়া নিজামপদের প্রার্থী হইলেন না। কিন্তু মৃত নিজামের এক প্রিয় দৌহিত্র মজঃফরজঙ্গ মাতুলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। চাঁদসাহেব ও ডুপ্লে তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিলেন। আম্বুরের যুদ্ধে (২৩।৭।১৭৪৯) আনওয়ারউদ্দীন পরাজিত ও নিহত এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহফুজ খাঁ শত্রুকরে বন্দী হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আলি কোনমতে ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। চাঁদসাহেবকে ও মজঃফরজঙ্গকে ডুপ্লে কালবিলম্ব ব্যতিরিকে ঐ স্থান অধিকার করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা তঞ্জোর যাত্রা করিলেন, উদ্দেশ্য উক্ত হিন্দুরাজ্য হইতে নিজেদের অর্থাভাব বিদূরিত করা। তঞ্জোরাধিপতি প্রতাপসিংহের উহাঁদের বাধা দিবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি নগদ বার লক্ষ টাকা এবং ৫৮ লক্ষ টাকার হুণ্ডি প্রদান করিয়া অব্যাহতি পাইলেন। ইতোমধ্যে নাসিরজঙ্গ কর্ণাটিক প্রদেশের রাজধানী আর্কট অধিকারে যাত্রা করিয়াছিলেন। এ সংবাদে চাঁদসাহেবের, মজঃফরজঙ্গের এবং একটি ফরাসী সেনাদল তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। ডুপ্লের সহিত মনোমালিন্য থাকায় ফরাসী সেনানায়ক ও সৈনিকগণ কর্ত্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করায় নাসিরজঙ্গের পক্ষে আর্কট অধিকার সম্ভব হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



ঝড় ও একটি পাখী

শ্রীবিমল মিত্র

যদি কখনও এমন হয়: ইচ্ছামতীর তীরে ডিঙার ভিতর শুইয়া মাঝরাত্রে যদি তোমাদের হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যায়—আকাশ ভরা অন্ধকার—নিস্তরঙ্গ নদীর জল যদি আচম্‌কা কুল্ কুল্ শব্দ করিয়া ওঠে, ছোট বাতায়নে অদূরের বাঁশঝাড় আর ধানক্ষেতের বাতাস আসিয়া সব ওলট্ পালট্ করিয়া দেয়—স্মৃতি, বিস্মৃতি, লাভ, ক্ষতি সব যদি সেই বাতাসে একাকার হইয়া যায়—নরম বালিশের ওপর দুটি চোখের পাতা অকারণে ভারি হইয়া ওঠে···আর সেই নিশীথ রাত্রে—নির্নিরীক্ষ অন্ধকারে দূরে—অনেক দূরে বাঁশঝাড়ের ছোট একটি ফাঁক দিয়া একটি তারা উঁকি মারিতে থাকে—উঁকি মারিয়া দুষ্টু মেয়ের মত হাত নাড়িয়া 'আয়' 'আয়' বলিয়া ডাকে, অথবা মাথার উপর একটি পাখী কুক্ কুক্ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে গিয়া দিগন্ত সীমায় মিলাইয়া যায়—তখন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মনে করিও:—ও আর কিছু নয়; ওই তারাটি, ওই পাখিটি—ওই দিগন্ত জোড়া অন্ধকার,—এই আকাশ বাতাস—ওই প্রত্যক্ষ বাস্তবতার পিছনে একটি পরম রহস্য লুকাইয়া রহিয়াছে—বহুদিন পূর্ব্বের ভুলিয়া যাওয়া রহস্য—একটি ঝড়ের রাত্রি আর একটি পাখীর রহস্য······

মাইল দু'তিনের মধ্যে লোকের বসতি নাই; মেঠো পথ দিয়া জমিদারের পাল্কী চলিয়াছে; ছ'জন বেহারার হুঙ্কার হাওয়ায় কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে; গাছপালা বন জঙ্গল সব ভীষণ শব্দ করিয়া দুলিতেছে।···

ফাঁক দিয়া নিখিলেশ বাহিরে চাহিয়া দেখিল: আকাশে বৃষ্টির বিরাম নাই।

মাঠ ঘাট কাদায় কাদা—বেহারাদের পা আর চলেনা; কাঁদিন ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছে, ধানক্ষেতে এতখানি করিয়া জল জমিয়াছে—বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে—সময় বুঝিয়াই দুর্য্যোগ নাবিয়াছে।

মাঠের পর মাঠ—এদিকটা ঢালু বেশি;—জলও এদিকে জমিয়াছে অধিক। কোন রকমে ঠেলিতে ঠেলিতে বেহারারা চলিয়াছে; চাকর তাহারা—হাঁ হুঁ করিবার ক্ষমতা নাই চলিয়াছে তো চলিয়াছেই!

এমনি করিয়া তিন ক্রোশ পথ চলিয়া তবে ইচ্ছামতী নদীর খেয়াঘাট; সেইখান হইতে খেয়াপার হইয়া আবার একমাইল পথ, তারপর শিবনিবাস ইষ্টিশান। শিবনিবাসে গাড়ী ছাড়িবে রাত্রি দশটায়, সেই ট্রেন সহরে পৌঁছিবে কাল সকাল বেলা। রাত্রিটা কাটিবে ট্রেনে; সারা রাত ট্রেনের দোলায় নিখিলেশের ঘুমটা মন্দ হইবে না। ট্রেনের দোলায় নিখিলেশের ঘুম হয় ভালো। কিন্তু—তাহার মনে হইল—গাড়ী যদি খালি থাকে তবেই তো···

একবার ট্রেনের কামরায় নিখিলেশের সহযাত্রী ছিল একটি বাঙালী দম্পতি; মেয়েটির বয়স বেশি—কিন্তু রাত্রে তাহা ধরা যায় নাই; সারারাত্রি সেই অন্ধকার কামরার ভিতর মেয়েটির সান্নিধ্য এতটা ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল, যে নিখিলেশ কিছুতেই ঘুমাইতে পারে নাই।···মেয়েটির ঘুম বড় তরল, ঘুমের মধ্যে বার বার কী যেন কথা বলিতেছিল—চমকিয়া উঠিতেছিল—এপাশ ওপাশ করিতেছিল; নিখিলেশ সারারাত্রি অস্পষ্ট অন্ধকারে জাগিয়া কেবল তাহাই দেখিয়াছে—

ভোরবেলা নিখিলেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; সকাল বেলার ঘুম, গাড়ী একটু দুলিয়া উঠিতেই ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া নিখিলেশ দেখে, আলো হইয়া চারদিক বেশ ফর্সা হইয়া গিয়াছে, পাশের বার্থে মেয়েটি তখন জাগিয়া উঠিয়াছে, জাগিয়া উঠিয়া অলসভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে···দেখিয়াই

নিখিলেশের যেন কেমন বীতস্পৃহা আসিয়া গিয়াছিল। রাত্রে যাহাকে সে অপরূপ সুন্দরী দেখিয়াছে—দিনের বেলার আলোকে তাহার রূপের দৈন্য ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

তারপর সেদিন যতক্ষণ মেয়েটি গাড়ীতে ছিল, নিখিলেশ একবারও তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই।

কাছাকাছি কোথায় যেন একটা বাজ পড়িল। ভীষণ শব্দে গাছের পাতাগুলি এক সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল: বৃষ্টি যেন আরো জোরে পড়িতেছে। কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে! পথের দু'পাশে খাদকাটা—তাহারই ভিতর ব্যাং ডাকিতেছে; অবিশ্রাম ঝম্‌ঝম্ শব্দ; কানে তালা ধরিয়া যায়।

এই বৃষ্টিতে সব চেয়ে নিখিলেশের ভাল লাগে: সামনে বসিয়া গল্প করিবে লাবণ্য। গান নয়—খেলা কিছু নয়—কেবল গল্প; লাবণ্যর ঘরে বসিয়া গল্প করিতে নিখিলেশের এত ভাল লাগে!

লাবণ্য বলে—এত মদ খেতে কে শেখালে তোমায়?

নিখিলেশ কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিত। মদ খাওয়া আবার শিখিতে হয় না কি!

মদ খাওয়া তাহাদের বংশগত অভ্যাস—বংশানুক্রমিক প্রথা; সাতপুরুষ হইতে তাহাই চলিয়া আসিতেছে; ঠাকুর্দ্দা মদ খাইতে খাইতে লক্ষ টাকার নোট কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন, বাবা মদ খাইয়া মা'কে সত্য সত্য হত্যা করিয়াছিল।

সকলের চূড়ান্ত করিয়াছে নিখিলেশ!

তাই নিখিলেশ বুদ্ধি করিয়া ভাল ছেলের মত শেষ পর্য্যন্ত বিবাহই করে নাই। কিন্তু মদ তা বলিয়া তো আর সত্য সত্যই ছাড়া যায়না। মদ যে তাহাদের বংশানুক্রমিক নেশা।

কাল সকালেই নিখিলেশ লাবণ্যর কাছে পৌঁছিতে পারিবে। এই যে মাঝে মাঝে তাগাদার জন্য তাহাকে জমিদারীতে আসিতে হয় এ নিখিলেশের ভাল লাগেনা। নায়েব তেমন সুযোগ্য নয়—নহিলে কোন জমিদার বছরের মধ্যে দু'তিন বার করিয়া দেশে আসে? বছরের পর বছর টাকা আসিবে আর সহরে বসিয়া জমিদার আমোদ স্ফূর্ত্তি করিবে, এই তো সচরাচর রীতি, ঠাকুর্দ্দার আমল হইতে তাহাদের বংশে এই রীতিই চলিয়া আসিয়াছে এতদিন। কষ্ট করিয়া যদি নিজেকে তাগাদা দিয়াই টাকা আদায় হয় তো জমিদারীতে সুখ কোথায়? নিখিলেশের পরিবার নাই—আত্মীয় নাই—স্বজন নাই—তাহার ভাবনা কী? বয়স তাহার হইয়াছে—বিবাহ করিলে এতদিনে ছেলে-মেয়েতে ঘর ভরিয়া যাইত—কিন্তু সে ঝঞ্ঝাট যখন তাহার নাই, তখন কাহার তোয়াক্কা সে রাখে!

লাবণ্যর ঘরে বিছানার সামনে মস্ত বড় আয়নাতে নিখিলেশের চেহারাটা রোজই নজরে পড়ে। দশ বছর আগেও নজরে পড়িত এখনও পড়ে; কিন্তু এখন নজরের তফাৎ হইয়াছে অনেকটা। কপালের ওপর নিখিলেশের তিনটি স্পষ্ট তীক্ষ্ণ ভাঁজ পড়িয়াছে, মাংস একটু করিয়া ঝুলিয়া আসিতেছে, রোজই ধরা পড়ে: বয়স বাড়িতেছে! বয়স বাড়িতেছে! কিন্তু তাহাতে আক্ষেপ করিবার কী আছে?

প্রথমে আসিয়াছিল ললিতা, ললিতার পর আসিয়াছিল কামিনী—কামিনী গেল, আসিল মালতী, তারপর আসিয়াছিল সুলতা—তারপর কত মেয়ে মানুষ তাহার জীবনে আসিল গেল—চাঁপা, উমা, সরযূ—বন্যার মত—সকলকে আজ আর তাহার মনেও পড়ে না; শেষ ঠেকিয়াছে এই লাবণ্যতে।

মেয়েমানুষ নিখিলেশের কাছে পুরাণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু মোহ যায় নাই। আজও পথচারিণী দেখিলে নিখিলেশ তাহার ঘোমটার ভিতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পাঠাইয়া দেয়। পূর্ব্ব-পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা তাহার রক্তে শিকড় গাড়িয়াছে, স্বেচ্ছাচারিতা তাহাদের বংশগত অভ্যাস, মদ তাহাদের জন্মগত নেশা—মেয়েমানুষ-প্রীতি তাহাদের মজ্জাগত প্রবৃত্তি।

বৃষ্টির তেজ বাড়িয়াছে; নিখিলেশের একবার শুধু মনে হইল: আজ পথে বাহির না হইলে ভাল হইত। কিন্তু, কী যে নেশা, লাবণ্য কাছে না থাকিলে তাহার যেন দিন কাটিতে চায়না।

আকাশের গায়ে চক্‌মক্ করিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে; রাস্তার উপর বড় বড় গাছ আড় হইয়া পড়িয়া

আছে। হঠাৎ পাল্কীটা যেন এককাৎ হইয়া ভীষণ দুলিয়া উঠিল। দুলিয়া উঠিতেই কোনের দিকের দু'টি বোতল কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল।

নিখিলেশ রীতিমত চমকিয়া উঠিয়াছে।...

ভিতর হইতে নিখিলেশ বলিল—গোবিন্দ—

হাত জোড় করিয়া গোবিন্দ দরজার ফাঁকে আসিয়া দাঁড়াইল।

—পাল্কী এমন নড়ে কেন রে?

গোবিন্দ বিনীত স্বরে জানাইল—বিশে বেহারা পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

গলার স্বর কিছুমাত্র না নাবাইয়া নিখিলেশ বলিল—পা ভেঙে যায়নি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভেঙেছে—বসে' পড়েছে—

গোবিন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; নিখিলেশ তাড়া দিয়া বলিল—পা ভেঙেছে তো কৃতার্থ করেছে আমায়, ওসব শুনছিনে, রাত দশটায় গাড়ী আমার পাওয়া চাই—বুঝলি—বুঝলি তো?

গোবিন্দ ঘাড় নাড়িয়া বুঝিয়াছে বলিয়া চলিয়া গেল।

যে-কেহ পা-ই ভাঙুক, আর মরিয়াই যাক্—ঠাকুর্দ্দার আমল হইতে তাহাদের বংশের কেহ সে-সব কথায় কান পাতে নাই। পূর্ব্ব পুরুষের আমল হইতে তাহারা স্বেচ্ছাচারী; বনিয়াদী বংশ তাহাদের—মদ তাহাদের নেশা, মেয়েমানুষ তাহাদের ক্রীতদাসী—নিখিলেশ তাহাদেরই বংশধর—সুতরাং দশটার ট্রেন তাহার পাওয়া চাই-ই—পাওয়া-ই চাই।

উপরে গাছের ডাল পালায় আকাশ ঢাকা; নীচে অন্ধকার দিয়া পাল্কী চলিতেছে, এই বৃষ্টির মধ্যে নিখিলেশের আর একদিনের কথা মনে পড়িল:

নিখিলেশ তখন ছোট সেদিনও এমনি উপর্ঝরণ বৃষ্টি;... ইচ্ছামতীর পাড় ভাঙিয়া নৌকা চলাচল বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে; পথ ঘাট ধ্বসিয়া গিয়াছে—কয়দিন ধরিয়া এই অবস্থা; যাহাদের ঘর বাড়ী অক্ষত অবস্থায় আছে তাহারা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে; ধানক্ষেত ভাসিয়া গিয়াছে শস্য নষ্ট হইয়াছে, বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছু কাজ নাই; আর যাহাদের ঘর-বাড়ী ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহারা দাঁড়াইয়াছে গাছতলায়;—ঠিক এমনি দুর্য্যোগের কয়েকদিন আগে বাবার সঙ্গে তাহারা দেশে আসিয়াছে...হঠাৎ হুলস্থুল কাণ্ড!...

ওই দুর্য্যোগের মধ্যে সারা বাড়ীতে যেন কী সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। চাকরবাকর সকলেরই মুখ যেন গম্ভীর—একখানি কালো জলভরা মেঘ যেন সারা আকাশটি এখনি গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু বিপদ আর কিছু নয়—মদ ফুরাইয়া গিয়াছে। বিপদ বলিয়া বিপদ—সেরা বিপদ; এমন বিপদের তুলনা হয়না। যাতায়াতের পথ বন্ধ নানা অসুবিধার দরুণ সময়মত মদ আনাইতে পারা যায় নাই। কিন্তু তা' বলিয়া এমন অপরাধের ক্ষমা নাই, তাহাদের বংশে কেহ কখনও কাহাকে ক্ষমা করে নাই—বনিয়াদি বংশ তাহাদের—তাহারা জন্মগত স্বেচ্ছাচারী—ক্ষমা কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা তাহারা জানে না।

শেষ পর্য্যন্ত সত্য সত্যই সে অপরাধের ক্ষমা হয় নাই। নিখিলেশের আজো মনে আছে সেই দিনের পর হইতে বুড়া সরকারকে আর দেখা যায় নাই। পরে শুনিয়াছিল কালি সর্দ্দারের খাঁড়ার ঘায়ে তাহার ধড় হইতে মুণ্ড পৃথক হইয়া গিয়াছিল!

সে সব অনেকদিনের কথা। সেই বংশের ছেলে নিখিলেশ, রক্ত দেখিয়া তাহারা ভয় পায় না, ঝড় বৃষ্টি দেখিয়া তাহারা পিছায় না, তাহারা যাহা করিবে ভাবে তাহাই করে—তাহারা জাত-স্বেচ্ছাচারী।

পাল্কী সমান তালে চলিতেছে। মাঠ-বন-বাদাড়। নিখিলেশ ফাঁক দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। দূরের গাছপালা কিছু আর দেখা যায় না। রাত গভীর হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তার দু'পাশের খাদের জলে প্রবল স্রোত। এক একবার বাতাসের ঝাপ্‌টা আসে, গাছপালা সব দুলাইয়া দিয়া যায়; সোঁ সোঁ শব্দে কান ঝালাপালা হইয়া আসে। পৃথিবী যেন মৃত্যুর সহিত শক্তি-পরীক্ষা চালাইয়াছে। মেঘে মেঘে ভীষণ শব্দ—বিদ্যুৎ চমকিবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্কীর ভিতরটা আলো হইয়া উঠিতেছে।

খেয়াঘাটে নৌকা থাকিতে বলা হইয়াছে।···নৌকা থাকিবে বৈকি! নিশ্চয়ই থাকিবে। জমিদারের কথা অমান্য করিবার শাস্তির কথা এ অঞ্চলে সবাই জানে। খেয়া নৌকা নিশ্চয়ই থাকিবে—থাকিবে নিশ্চয়ই—সেজন্য বিশেষ ভাবনা তাহার নাই। নিমাই মাঝি নিখিলেশের বাবাকে চিনিত—এখন তাহাকেও চেনে; মাথা হারাইবার ইচ্ছা যদি না থাকে, তাহা হইলে বুড়া এতক্ষণ নৌকা লইয়া ঘাটেই বসিয়া আছে—এবং যতক্ষণ না নিখিলেশ ঘাটে গিয়া পৌঁছায় ততক্ষণ বসিয়া থাকিবে, নিখিলেশ বাজি রাখিয়া বলিতে পারে—সন্ধ্যা হইতেই সে ঘাটে বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে; বৃদ্ধ বয়সে বসিয়া বসিয়া ভেজা অবশ্য কষ্টকর—তা' হোক,—কাহাকেও কষ্ট দিতে তাহাদের বংশে কেহ কখনও পেছপাও হয় নাই, জমিদার হইয়া জন্মিয়াছে পরকে তাহারা কষ্ট দিবে—পরে তাহাদের জন্য কষ্ট করিবে; তাহারা আজন্ম স্বেচ্ছাচারী পরের কষ্ট লইয়া তাহাদের মাথা ঘামানোর অভ্যাস নাই!

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিয়াছে···

নদীর ধার ধার দিয়া রাস্তা; এদিকের পাড় ভাঙিতে সুরু হইয়াছে; প্রবল বেগে জলের স্রোত বহিতেছে মনে হইল; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছপালা লইয়া ভীষণ শব্দে পাড়ের মাটি ধ্বসিয়া পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নীচের মাটি ভূমিকম্পের মত থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে; জায়গায় জায়গায় পথ পর্য্যন্ত ভাঙিয়াছে;···এই অন্ধকারে যদি আর একবার বেহারাদের পা পিছলাইয়া যায়—তবে হয়ত একেবারে অতল সমাধি!

অতল সমাধি! কথাটা ভাবিতেই নিখিলেশের কেমন যেন অপরিসীম আনন্দ হইল। জলের তলায় মানুষ যখন ডুবিয়া যায়, তখন কেমন লাগে কে জানে! নিখিলেশের হঠাৎ একটা উদ্ভট খেয়াল হইল: আচ্ছা, যদি একটা লোককে যন্ত্রি জোর করিয়া জলে ডুবাইয়া রাখা যায়—লোকটা যতক্ষণ হাত পা ছুড়িবে, চীৎকার করিতে চেষ্টা করিবে, ততক্ষণ তাহাকে ডুবাইয়া রাখিয়া তারপর মুমূর্ষু হইবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তুলিয়া আনিয়া বাঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেই ঠিক জানা যাইবে অতল সমাধি কাহাকে বলে! মৃত্যুর পূর্ব্বে কেমন করিয়া হৃদযন্ত্র ক্রমশঃ স্থির হইতে স্থিরতর হইয়া আসে—কেমন করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা—বায়ুহীন বিপুল বারিরাশি তিলে তিলে মৃত্যু আনিয়া দেয়—সমস্ত খুঁটিনাটি।

অবশ্য এখনি এ খেয়াল নিখিলেশ চরিতার্থ করিবে না; কিন্তু ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে; পারে তো! করিতে পারে এই মুহূর্ত্তে, এই দণ্ডে; একজনকে নয়—দু'জনকে নয়—যতজন বেহারা আছে ততজনকে!—সকলকে! তাহারা জাত-স্বেচ্ছাচারী! · বহু পূর্ব্ব-পুরুষের আমল হইতে তাহারা অত্যাচারী—শুধু একটিবার মাত্র হুকুমের অপেক্ষা—নিখিলেশ মনে মনে পৈশাচিক হাসি হাসিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে ঘাট আসিয়া গেল। প্রচণ্ড শব্দ করিয়া পাড় ভাঙিতেছে; নদীর জল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

বেহারারা পাল্কী নাবাইয়া মাঝিকে ডাকিতে গেল।

কিন্তু এমন বিস্ময়ের কথা কেহ কখনও শোনে নাই!···মাঝি নাই—খেয়া নৌকাও নাই। ভয়ে বেহারাদের দেহ কাট হইয়া গেল।

কথাটা শুনিয়া নিখিলেশের স্বেচ্ছাচারী রক্ত গরম হইয়া উঠিল। বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয়ে নৌকাটিকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া ঘরে গিয়া শুইয়াছে—আরাম করিয়া ঘুমাইতেছে—! আচ্ছা, আরাম কেমন করিয়া করিতে হয় নিখিলেশ দেখাইবে।

আজ যাওয়া না-হয় না-ই হইল। আজ রাত্রিটা এখানে কোথাও থাকিয়া কাল সকালে নিমাইকে টাট্‌কা টাট্‌কা শাস্তি না দিলে আর চলিতেছে না! দেশে না আসাতে লোকের স্পর্দ্ধা অসীমে উঠিয়াছে।···এর একটা বিহিত করিতেই হইবে। নিখিলেশ দাঁতে দাঁত চাপিল।

বৃষ্টি আরো জোরে পড়িতে সুরু করিয়াছে। পাড় ভাঙিবার শব্দে কান পাতা দায়; রাত্রি খুব গভীর হইয়াছে। স্পর্শসহ অন্ধকার। দুর্নিবার দুর্য্যোগ পৃথিবীকে বিবশ করিয়া দিয়াছে; এই মানুষ-পরিত্যক্ত নির্জ্জন ভূমিতে কয়েকজন বেহারা কেবল সঙ্গী; আর কেহ নাই--আর কেহ নাই কোথাও। সারা পৃথিবীর মধ্যে পরম প্রবলপ্রতাপান্বিত

জমিদার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী প্রলয়লীলার কেন্দ্রস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে...মাথার উপর বজ্রবর্ষী তমাচ্ছন্ন আকাশ—পায়ের তলায় প্রকম্পমান ভূমিতল!

নিখিলেশের মনে হইল: এক হুকুমে সকলকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। আকাশ, ঝড়, বৃষ্টি, বুঝুক যাহাকে জব্দ করিতে এত চেষ্টা তাহাদের—সে আর কেহ নয়—স্বেচ্ছাচারী জমিদার যাহার পিতামহ মদ খাইয়া লক্ষ টাকার নোট ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—যাহার পিতা নিজের স্ত্রীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই—যাহাদের বংশে ভয় বলিয়া কেহ কিছু জানে না—মেয়েমানুষ যাহাদের ক্রীতদাসী—বংশ-পরম্পরায় যাহার স্বেচ্ছাচারী—

খেয়াঘাটের কাছাকাছি নিমাইয়ের ছোট ঘরখানি রহিয়াছে; ছেলেমেয়ে তাহার কাছাকাছি কোন এক গ্রামে থাকে; শুধু দিনের বেলা রোদ বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই ঘরটির সৃষ্টি... ; বেহারারা কুটীরের কাছে পাল্কী লইয়া গেল।

আস্তে আস্তে নিখিলেশ দরজা ঠেলিল—কাঠের ভাঙা দরজা—হুড়কোর বন্দোবস্ত নাই—একটু ঠেলিতেই দরজা খুলিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর আলো নাই; তবু অস্পষ্ট দেখা যায় একখানি বিছানা পাতা; ওপানে একটি মানুষ বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারে; নিখিলেশ এখানেই রাত্রিটা থাকিতে পারিবে; তারপর সকালে উঠিয়া নিখিলেশ যা' করিবে—তা' কাল সকলেই দেখিবে—সকলের সামনেই সে দেখাইবে!

নিখিলেশ জামা খুলিতে লাগিল।

শুইবার আগে নিখিলেশকে আর একবার কথা বলিতে হইল:

—ও গোবিন্দ, পাল্কীর ভেতর বোতল দু'টো আছে দিয়ে যা'—আর দেখ্, তোরা যেখানে হোক রাতটা কাটিয়ে দিগে, রাত্তিরে আমি এখানেই থাকবো, কাল ঘুম ভাঙবার আগে আবার আসিস্—যা' এখন—

বাঁশের মাচার উপর পাতলা বিছানা। নিখিলেশের পূর্ব্বপুরুষের কেহ যাহা করে নাই নিখিলেশ আজ তাহাই করিল। ঘুম আসিতে দেরি হইবার কথা নয়, কিন্তু তবু দেরি হইতে লাগিল। অন্ধকার আকাশের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া থাকা; পিঠে বিছানা যেন ফুটিতেছে···

বাহিরে বিপুল গর্জ্জন; এক একবার প্রচণ্ড শব্দ হইতেছে, আর ঘর বিছানা মাটি সব কাঁপিয়া উঠিতেছে। তা' কাঁপুক—নিখিলেশ ভাবিতেছে নিমাইএর কথা! স্পর্দ্ধার একটা সীমানা রাখিয়া লোকে চলে! যাহাই হোক্—বৃষ্টির প্রকোপ হইতে যে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সে পলাইয়া গিয়াছে আজ, কাল তাহা সে কোথায় রাখিবে নিখিলেশ শুধু দু'চোখ দিয়া তাহাই দেখিবে। শুধু দেখিবে নয়; গ্রামে-দেশে জমিদারীতে যত লোক সকলকেই দেখাইবে।

আজ রাত্রিটা শুধু কোনও রকমে কাটিলে হয়!

অন্ধকার—অন্ধকার—স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অন্ধকার! অন্ধকারের নীরব অট্টহাসি নিখিলেশকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। অন্ধকার প্রেতমূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এত অন্ধকার নিখিলেশ জীবনে আর দেখে নাই!

বাহিরে তেমনি গর্জ্জন—পৃথিবী কাঁপিতেছে—আকাশ দুলিতেছে; নিখিলেশের মনে হইল—তা' হোক্, তবু ওইখানে প্রাণ আছে! শুধু ভাঙিয়া চলা—শুধু ধ্বংস করা—নির্জ্জীবতা নয়, জড়তা নয়, প্রাণ ভরিয়া কেবল মৃত্যু-ক্ষুধা পরিতৃপ্তি করা; এই অন্ধকার আবহাওয়ার মধ্যে যেন নিখিলেশের শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে।

আকাশ যেখানে উন্মুক্ত, বিধাতা যেখানে দিশাহীন, জীবন যেখানে সহস্রায়ু—মৃত্যুর আত্মীয়তা যেখানে নিবিড় নিখিলেশ সেখানে গিয়া তৃণখণ্ডটি হইয়াও বাঁচিতে চায়।—যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত্ত নূতন—প্রতিটি জিনিষ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব—প্রতিটি ঘটনা অভূতপূর্ব্ব!

আজ হঠাৎ কী হইল কে বলিবে—তাহার মনে হইতেছে: এই অন্ধকার—এই ঘর, এই দেহ, এই সব কিছু অত্যন্ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে—অত্যন্ত পুরাতন! এত পুরাতন যে তাহা লইয়া তাহার জীবনধারণ চলে না। প্রতি মুহূর্ত্তের নিশ্বাস-গ্রহণে এই বাতাস বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে—প্রতি দিবসের পথ চলায় এই মাটি পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছে—প্রতি মানবের পাপে এই পৃথিবী কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে! বর্ত্তমানে জীবনে অনিশ্চয়তা নাই, দৈনন্দিন জীবন-যাপনে

রহস্য-স্পর্শ নাই--সহস্রের প্রাত্যহিকতায় মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা নাই; কেবল বিধিবদ্ধ প্রণালীতে দেহ ভাসাইয়া চলা—শুধু নিয়মাধীন অভ্যাস মত নিশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ! ··

অন্ধকারের ভিতর কাহারা তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঘোমটা তুলিতেই দেখা গেল রূপসী নারীর দল—পরিচিত নারী-মুখের শ্রেণী!

প্রথমেই ললিতা, ললিতার পর কামিনী, আসিল মালতী, তারপর সুলতা—তারপর বন্যার মত আসিল উমা চাঁপা সরযূর দল—সকলকে নিখিলেশ ভাল করিয়া চিনিতেও পারিল না—শেষকালে আসিল লাবণ্য!···

নিখিলেশ দুই চোখ বন্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—চলিয়া যাও তোমরা—তোমাদের চাইনা আমি—তোমরা সব পুরাতন—তোমরা পুরাতন, আমরা পুরাতন—পৃথিবী পুরাতন, আকাশ, বাতাস সব পুরাতন—আমরা নূতন করিয়া বাঁচিতে চাই—আমরা নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিব—

তাহারা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

হঠাৎ নিখিলেশের একটা জিনিষের কথা মনে পড়িল। এতক্ষণ ভুলিয়াই গিয়াছিল বোতল দুটি পাশেই ছিল--তাহাদেরই একটা তুলিয়া লইয়া নিখিলেশ নিজের মুখের উপর উপুড় করিয়া দিল; তারপর চাদর দিয়া আগাগোড়া শরীর ঢাকা দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

নিবিড় শান্তি নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ—এবার যতই অন্ধকার আসুক—আর ভয় নাই! এবার সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিবে সে ঘুম ভাঙিবে একেবারে কাল সকালে।

রাত্রি তখন কত ঠিক নাই—

ধীরে ধীরে গোধূলির অস্পষ্ট আবির্ভাবের মত নিখিলেশ জাগিয়া উঠিল। তাহার হাত নড়িল না, পা নড়িল না—চোখের দুটি পাতা কেবল যেন অস্পষ্ট সন্দেহে একটু দুলিয়া উঠিল মাত্র। দুলিয়া উঠিতেই নিখিলেশের মনে হইল: কে যেন তাহার ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। অন্য সময় হইলে হয়ত সে চীৎকার করিয়া উঠিত—কিন্তু নেশার ঘোর তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই! মিটমিট চোখ তুলিয়া সে শুধু অন্ধকারে ছায়ামূর্ত্তিটিকে দেখিতে লাগিল।

কিন্তু বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!

নিখিলেশ বুঝিতে পারিয়াছে: যে ঘরে ঢুকিয়াছে, সে পুরুষ নয়। শুধু তাহাই নয়—ঘরে ঢুকিয়াই মেয়েটি একান্ত নিঃসঙ্কোচে তাহার বিছানার কাছে আসিয়াছে—

এবার নিখিলেশ সত্য সত্যই মেয়েটির সান্নিধ্যের তাপ সারাদেহে অনুভব করিল। মেয়েটি নিখিলেশের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিতে লাগিল—বাবা—ও বাবা—

গাছে উঠিয়া একটি ডাল ধরিয়া নাড়া দিলে যেমন সব কয়টি ফল ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া যায়, নিখিলেশের মনে হইল: মেয়েটির ডাকে যেন তাহার অস্থি, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা যাহা কিছু দেহের পদার্থ সব যেন এক সঙ্গে শিথিল হইয়া গেছে; সমস্ত অবশ; মৃত, জড়বৎ একখানি দেহ লইয়া নিখিলেশ সেইখানে, সেই মাচার উপর চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

মেয়েটি আবার ডাকিল—ও বাবা ওঠ—শুনছো· ঘরে চল—

মেয়েটির দৈহিক সম্পূর্ণতা নিখিলেশের দৃষ্টিকে লজ্জা দিতে লাগিল। এত কাছাকাছি—এত আত্মীয়তা—ভিজা কাপড়ের গন্ধ আসিতেছে—

স্পর্শাতুর দুটিবাহু দিয়া নিখিলেশ উহাকে এখনি, এই মুহূর্ত্তে কলঙ্কিত করিয়া দিতে পারে—নিষ্পেষিত করিয়া দিতে পারে—পারে তো?—যেমন করিয়াছে আরো কত অসংখ্য বার—

মেয়েটি এবার তাহাকে স্পর্শ করিয়া ঠেলিতেছে; কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—ও বাবা ওঠ—এই দেখ আমি শৈলী, ওঠ—শুনছো—ও বাবা—ঘরে চল না—

মেয়েটির বয়স হইয়াছে; এত বয়স হইয়াছে যে এ বয়সে এই রাত্রে অন্য পুরুষের সঙ্গে একঘরে কাটাইলে বদনাম কিনিতে হয়। হাত নাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কাচের চুড়িগুলি বাজিতেছে; তা' বাজুক, কিন্তু এমন একটি অভাবনীয় ঘটনা নিখিলেশ সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল।···এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না; মেয়েটিকে সে

জন্মে দেখে নাই—আজন্ম অপরিচিতা—শৈলী তাহার নাম—এই দুর্য্যোগের রাত্রে পাশের কোন গ্রাম হইতে ভিজিতে ভিজিতে তাহার বাবাকে ঘরে লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

যুবতী মেয়েটি···অন্ধকার নির্জ্জন ঘর···গ্রামের প্রান্ত সীমা···একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে কেবল সে আর, তাহারই একান্ত কাছে ওই যুবতী মেয়েটি। যুবতী মেয়েটি তাহাকে স্পর্শ করিয়া আছে; নিটোল দু'টি হাতের নিকট স্পর্শ; এত নিকট স্পর্শ যে মাদকতা আসাই স্বাভাবিক অন্ততঃ অন্য সময় হইলে তাহাই হইত—কিন্তু আজন্ম স্বেচ্ছাচারী নিখিলেশের আজ এ কী হইল···তাহার অন্তরের অশান্ত কামনাটি আজ ওই বহিঃপ্রকৃতির অশ্রান্ত গর্জ্জন—নদীর উন্মাদ কলকল্লোল, অন্ধকারের বীভৎস বিরূপতায় অপরূপভাবে ভাষান্তরিত না হইয়া, একান্ত বাধ্য শিশুটির মত ধমক খাইয়াই কখন যেন কোথায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; দুর্দ্ধর্ষ সাপ যেন মন্ত্রে অবশ হইয়া মাথা নিচু করিয়া পড়িয়া আছে।

নিখিলেশ দুইবাহু দিয়া এখনি সমস্ত ব্যবধান ঘুচাইতে পারে···কিন্তু কি জানি কেন তাহার আবার মনে হইতেছে—এ-পৃথিবীর সবটাই যেন এখনও পুরাতন হইয়া যায় নাই এখনো কিছু বাকী আছে; এখনও অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে; এখনও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব জিনিষের অস্তিত্ব আছে; প্রতি মানুষের নিশ্বাস গ্রহণে বাতাস এখনও সব বিষাক্ত হয় নাই, প্রতি দিবসের পথ-চলায় সমস্ত মাটি এখনও পঙ্কিল হয় নাই; প্রতি মানবের পাপে এখনও সমস্ত পৃথিবী কলঙ্কিত হয় নাই; এই বর্ত্তমান জীবনেই অনিশ্চয়তা আছে, দৈনন্দিন জীবন-যাপনে রহস্য আছে, সহস্রের প্রাত্যহিকতায় মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা আছে; কেবল বিধিবদ্ধ প্রণালীতে দেহ ভাসাইয়া চলা নয়···শুধু নিয়মাধীন অভ্যাসমত নিশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ নয়···

অত কাছে পাইয়াও নিখিলেশ কিছুই করিল না। শুধু চুপ করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন বন্ধ হইয়াছে; নিখিলেশ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে এ তাহার কী হইল! সারাদেশ জয় করিয়া আসিয়া যেন নিজের দেশে আসিয়াই পরাজয়! তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল···পরাজয় নয়—এ তাহার পরম লাভ। মানুষকে আজ নিখিলেশ শ্রদ্ধা করিতে পারে—নারী আজ তাহার কাছে পূজা পাইতে পারে; কোথাকার কে একটী মেয়ে আসিয়া তাহাকে এমন কী দিয়া বশীভূত করিল?···ললিতা কামিনী মালতীর দল তাহাকে যাহা দিতে পারে নাই—এ মেয়েটি কেমন করিয়া এমন অনায়াসে তাহা এক নিমেষে তাহাকে দিয়া ফেলিয়াছে; মেয়েটির কথাগুলি ভারি মিষ্টি; নিখিলেশ কান পাতিয়া আবার শুনিল—ও বাবা ঘরে চল—ওঠ—পাড় ভাঙ্‌ছে শুনতে পাচ্ছ না?···

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইতেছে—এতদিন যেন সে মৃত্যুর গহ্বরে সমাহিত ছিল। এখন আবার সে বাঁচিয়া উঠিতেছে; পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া সে আবার বাঁচিয়া উঠিতেছে; বাঁচিয়া উঠিয়া যাহা কিছু সে দেখিতেছে শুনিতেছে সব নূতন। প্রথম জন্মগ্রহণের মত নূতন! সমস্ত অত্যন্ত নূতন! এই নূতন পদে আজ যে তাহাকে অধিষ্ঠিত করিল তাহাকে অপমান করিবার স্পর্দ্ধা নিখিলেশের নাই! ···বিগত-চেতন এক প্রাণীকে যে প্রাণ দিয়াছে, সে অবধ্য!

কিন্তু তবু নিখিলেশ ভাবিয়া পাইল না—এক পরম প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীর আজ এ কী অনপনেয় কলঙ্ক!···অভাবনীয় অবনতি! শেষ বংশধর হইয়া আজ সে চির-প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মুখের উপর নিজের হাতে সে কী পঙ্কিল কালিমা লেপন করিতেছে! লজ্জায় নিখিলেশ মুখ লাল করিয়া ফেলিল—

কিন্তু লজ্জাই হোক আর যাহাই হোক—নিখিলেশ উহাকে অপমান করিতে পারিবে না! সে-ও যে সন্তানের পিতা হইতে পারে—সে-ও যে পিতৃত্ব হইতে নিজেকে এতদিন বঞ্চিত করিয়া কেবল নিজেকে ঠকাইয়াছে—এই পরম সত্য যে তাহাকে প্রথম জানাইয়াছে সে ওই মেয়েটি—ওই যুবতী মেয়েটি!

নিখিলেশের বড় ইচ্ছা হইল: মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মত করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়—আদর করিয়া দু'টি কথা বলে! আজ নিখিলেশের মেয়ে থাকিলে সে-ও ঠিক অত বড়টি হইত—ওমনি করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে আসিত—তখন আর নিখিলেশ এমন



চিন্তা-বিলাস

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির

করিয়া চোরের মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতনা—ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া মেয়ের সঙ্গে ঘরে গিয়া শুইত—তিরস্কার করিয়া বলিত—দূর পাগলী মেয়ে, এই অন্ধকারে বৃষ্টিতে বুঝি ঘর থেকে বেরোতে আছে—একরত্তি ভয় নেই তোর?

মেয়েটি এখনও জানিতে পারে নাই যাহাকে সে ঠেলিতেছে সে তাহার বাবা নয়—সে তাহাদেরই গ্রামের স্বেচ্ছাচারী জমিদার। যদি জানিতেই পারে তাহা হইলে এখনি হয়ত ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে! নিখিলেশ যদি হাজার সান্ত্বনা দেয়—হাজার স্নেহ করিয়া কথা বলে—হাজার তাহাকে আপন মেয়ের মত আদর করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়—তবু মেয়েটি হয়ত তাহাকে আর 'বাবা' বলিয়া ডাকিবে না। তাহার চেয়ে এই ভাল মেয়েটি প্রাণ ভরিয়া ডাকুক—আর সে চুপ করিয়া তাহাই শুনিবে; নিতান্ত অনিশ্চিত একটি ঘটনায় যাহা সে লাভ করিয়াছে, নেহাৎ হেলা করিয়া তাহা সে হারাইবে না।

বাহিরে তখনও সমানতালে গর্জ্জন চলিতেছে; অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুইয়া নিখিলেশ ভুলিয়াই গিয়াছে যে, ধ্বংস-লীলার কেন্দ্রে বসিয়া সে মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতেছে! মাটি কাঁপিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের জিনিষপত্র কট্ কট্ ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া নড়িয়া উঠিতেছে—তা' দুলুক—নড়ুক—পৃথিবীতে প্রলয় হইয়া যাক্, নিখিলেশের অন্তরে আজ যে দ্বন্দ্ব, যে সমস্যা তাহা তুলনাহীন!

নিখিলেশের মনে হইতেছে: বহুযুগ পূর্ব্বে সে যেন গল্পের নায়কের মত একদিন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; সে কী ঘুম—কত দিন, মাস, বৎসর আসিয়াছে, গিয়াছে; ঝড় বৃষ্টি দুর্ভিক্ষ, বন্যা, আসিল চলিয়া গেল, মহা ঘুম তাহার তবু ভাঙে নাই—যুগের পর যুগ—অন্তহীন দীর্ঘ নিশ্চেতনা তাহাকে অসাড় করিয়া রাখিয়াছিল; আলোহীন গুহার ভিতর কীটাণুকীট জীবাণুদল তাহাকে ঘেরিয়া অহর্নিশ বীভৎস উৎসব জুড়িয়া দিয়াছিল; তারপর বহুযুগ ধরিয়া মানুষের দল আসিয়া পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিয়া—পঙ্কিল করিয়া দিয়া চলিয়া গেল;—শেষে একদিন প্রভাত হইল—নূতনতম পৃথিবীর প্রথম সূর্য্যোদয়—প্রথম জাগরণের পূর্ব্বে কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে—ও বাবা—বাবা—ওঠো—ওঠো—

অত্যন্ত নূতন—অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর!

নিখিলেশের চেতনা আসিতে দেরি নাই আর—নূতন জন্ম—নূতন সৃষ্টি—নূতন পৃথিবী, নিখিলেশ আজ আবার নূতন করিয়া দিগ্বিজয় যাত্রা সুরু করিবে। মানুষ তাহাদের দাসত্ব করিবে না—মানুষ হইবে বন্ধু—নারী তাহাদের ক্রীতদাসী নয়—নারী হইবে দেবী। এত বড় স্বেচ্ছাচারীকে যে-নারী মনুষ্যত্ব শিখাইয়াছে সে অসামান্যা। সন্ধ্যার অন্ধকারের পায়ের তলায় সূর্য্যাস্তের শেষ প্রণামটির মত নিখিলেশ মেয়েটির কাছে মাথা নত করিতেছে···

আজ নিখিলেশের একটি প্রখর সত্য মনে পড়িতেছে: তাহারও এতদিনে একটি সংসার হইতে পারিত—পরমা রূপসী একটি গৃহিণী! ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে সে গড়িয়া তুলিত স্বর্গ; সুপরিমিত সাধ তাহাদের—মনে তাহাদের পূর্ণিমার চাঁদের কল্পনা—চোখে নীল সমুদ্রের স্বপ্ন; প্রাণে অশেষ-চলার উৎসাহ; এমন একটি সংসার রচিবার অধিকার তাহার ছিল···

সকাল বেলার তাজা ফুলের মত একটি ছেলে···ফোগ্লা দাঁত বাহির করিয়া কত কী অবোধ্য কথা বলে, কোলে তুলিয়া চুমু খাইলে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে··· ঝাঁকড়া-চুল একটি মেয়ে, টানাটানা বাঁকা চোখ, সে-চোখের চাহনিতে চপল ঊর্ম্মির রহস্য—এতটুকু বকিলে বা রাগ দেখাইলে অভিমান করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া সে কী কান্নার ঘটা, কাঁদিলেই চোখ দিয়া মুক্তা ঝরিয়া পড়ে; এমন একটি সংসার গড়িবার অধিকার তাহার ছিল! সে অধিকার আজ আর তাহার নাই—আজ তাহার বয়স বাড়িয়াছে!

বয়স যে বাড়িয়াছে তাহার প্রমাণ সে লাবণ্যর ঘরে আয়নাতে কতবারই তো পাইয়াছে! তাহারও একটি ছেলে হইত—একটি মেয়ে হইত তাহারও—তাহারও সংসার গড়িবার অধিকার ছিল—ছিল তো? ভাবিতে ভাবিতে কখন অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া তাহার টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়াছে—

মেয়েটি এবার বিছানার পাশ হইতে সরিয়া যাইতেছে; নিখিলেশের আশঙ্কা হইল—হয়ত ঘর ছাড়িয়া এইবার চলিয়া যাইবে। সরিয়া গিয়া মেয়েটি দরজা খুলিল; খুলিতেই জলো হাওয়া, ঝড়ের ঝাপ্‌টা আসিয়া মেয়েটির শাড়ী চুল বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল—কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র—কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; মেয়েটির অস্পষ্ট মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়াছে···ঘরের বাতাস সেই বেদনায় যেন নিখিলেশের হইয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিখিলেশের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন শিথিল অবশ হইয়া গিয়াছে; তাহার মনে হইল: সে এখন ইচ্ছা করিলেই উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, মাত্র জিহ্বা এবং ওষ্ঠের সঞ্চালনেই সে কথা বলিতে পারিবে না! হয়ত মেয়েটি এখনও বেশি দূরে চলিয়া যায় নাই—এখনো দৌড়িয়া গেলে ধরিয়া আনা যায়;··ধরিয়া আনিয়া নিখিলেশ তাহার সমস্ত বিগত বৎসরের কাহিনী শুনাইবে—তাহার স্বেচ্ছাচারিতার কথা—তাহার অপমৃত্যুর কথা—সমস্ত সমস্ত—কিছু বাদ দিবেনা সে...নূতন করিয়া আবার সে জন্মগ্রহণ করিবে···

কিন্তু কিছুই হইল না—নিখিলেশ না পারিল উঠিতে—না পারিল তাহাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে; জীবনে আর কখনও হয়ত মেয়েটির সঙ্গে তাহার দেখা হইবে না; ·· এই শেষ···কিন্তু যে-পথ দিয়া ও চলিয়া গেল—সে পথে তাহার আবির্ভাবের অম্লান পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনার আকস্মিকতা তাহার জীবনে অক্ষয় হইয়া বাঁচিয়া রহিল।

অনেকদিন আগের একটি ঘটনা নিখিলেশের মনে পড়িল:

নিখিলেশ তখন খুব ছোট; একদিন এমনি এক ঝড়ের ভিতর কেমন করিয়া হয়ত ভয় পাইয়া একটা বিচিত্র রঙিন্ পাখী তাহাদেরই একটা ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়াছিল।

রঙিন্ পাখী...লাল বুক, পাখা সবুজ রঙের, নিখিলেশ বায়না ধরিয়াছিল: পাখীটি তাহার চাই!

জমিদারের একমাত্র ছেলে, যাহা সে চাহিয়াছে তাহাই পাইয়াছে। নানা চেষ্টা হইল পাখী ধরিবার, কিন্তু আকাশ-বিহারী পাখী কেমন করিয়া কোন অদৃশ্য ফাঁক দিয়া উড়িয়া গেল—সে-পাখী তাহাদের খাজনা দেয় না—সে স্বাধীন, সূর্য্যের আলোর মত স্বাধীন—সে কাহারও হুকুম মানিয়া চলে না।···

তারপর নিখিলেশের সে কি কান্না—পাখীটি তাহার চাই-ই! সে-পাখীটি আর পাওয়া গেল না বটে—কিন্তু ঠিক সেই রকম দেখিয়া একটি পাখী কিনিয়া আনা হইল।

নূতন দাঁড়—নূতন পাখী—পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু নিখিলেশের আবদার তবু থামে নাই! ঝড়ের দিনের সেই—কেবল সেই উড়িয়া-আসা পাখীটিই তাহার চাই।

তারপর একদিন রাগ করিয়া নিখিলেশ কেনা পাখীটির পায়ের শিকল খুলিয়া দিল—পাখীটি উড়িয়া গিয়া নিকটের একটা বাড়ির চালে গিয়া বসিল—তারপর ভাল করিয়া চারিদিক নজর করিয়া লইয়া উড়িতে উড়িতে দিগন্ত-সীমানায় লীন হইয়া গেল; ঝড়ের দিনের সেই—কেবল সেই উড়িয়া-আসা নির্দ্দিষ্ট পাখীটিই তাহার চাই।

আজও নিখিলেশের মনে হইল—এখন আর কেহ আসিলে তাহার চলিবে না; ললিতা নয়, কামিনী নয়, মালতী নয়, কেহ নয়; কেবল ওই মেয়েটিই তাহার চাই, 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া যে তাহাকে ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া এই এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিখিলেশের চোখে ঘুম নাই; আজ রাত্রের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত যেন তাহার চোখের সম্মুখে ঊর্দ্ধে সঙ্গীন খাড়া করিয়া চলিয়া যাইতেছে প্রত্যেকটি স্পষ্ট—প্রত্যেকটি পৃথক।... এমন করিয়া সে আর কখনও উৎকণ্ঠিত চিত্তে মুহূর্ত্ত যাপন করে নাই—দিন-যাপনের চেয়ে মুহূর্ত্ত যাপন যেন আজ তাহার কাছে দীর্ঘতর বলিয়া মনে হইতেছে! এক দীর্ঘমুহূর্ত্ত জীবনে সচরাচর আসে না। সারা রাত্রির মধ্যে নিখিলেশের চোখে ঘুম আসিবে না; তাহার ঘুম, তাহার শান্তি তাহার সব কিছু মেয়েটির সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে!···

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল···

হঠাৎ একবার কিসের শব্দ হইল। দরজা ঠেলিয়া কে আবার যেন ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। নিখিলেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল—এবার সেই মেয়েটি আবার আসিয়াছে—সেই মেয়েটিই, এবার আর অন্ধকারে নয়, আঁচলের আড়ালে আনিয়াছে প্রদীপ।

প্রদীপের আলোয় নিখিলেশ স্পষ্ট দেখিল মেয়েটির মুখ—বৃষ্টিতে ভেজা একখানি মুখ—অন্ধকারে যেমন মুখের সে কল্পনা করিয়াছিল, ঠিক তেমনটি—কোনও তফাৎ নাই!

মেয়েটি বিছানার কাছে আসিতেছে···

আসিতেছে···

আসিয়া পড়িল...

সত্য সত্যই আর শুইয়া থাকা চলেনা; এখনি ধরা পড়িতে হইবে।

মেয়েটি নিকটে আসিতেই নিখিলেশ গায়ের চাদর খুলিয়া এক পলকে মেয়েটির সামনে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে···ওধারে

একটি মেয়ে আর, এধারে নিখিলেশ—মাঝখানে অল্পায়ু স্তিমিত একটি মাটির প্রদীপ···

অন্ধকার আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে একটি মাত্র শুকতারা···

এক সঙ্গে যেন পৃথিবীর সমস্ত কলরব স্তব্ধ হইয়া গেল—একটি অনুচ্চারিত সঙ্কেতে যেন আকাশের সব কয়টি তারা দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল; একটি অদৃশ্য ইঙ্গিতে যেন মুহূর্ত্তগুলি সব অচল হইয়া স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া গিয়াছে!

পলকে কী যে হইয়া গেল, হয়ত মেয়েটি ভয় পাইয়াছে—থর থর করিয়া দেহ কাঁপিয়া উঠিয়াছে—পা কাঁপিয়াছে—বুক কাঁপিয়াছে—হাত কাঁপিয়াছে—কাঁপিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি নীরব অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া প্রদীপটি হাত হইতে তাহার পড়িয়া গেল;—পড়িয়া গিয়া শিখাটি বার কয়েক দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তারপর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নিভিয়া গেল।

কিন্তু নিখিলেশ ভাবিতেছে প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে ভালই হইয়াছে! ও নিভিয়া যাক্—অন্ধকারে এত স্পষ্ট করিয়া আর সে নিজেকে কখনও দেখে নাই! এত স্পষ্ট—নিস্তরঙ্গ দীঘীর জলে যেন তা'র প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে!

পৃথিবীর কাছে যদি এতদিন কিছু সে করিয়া থাকে—তবে সে করিয়াছে কেবল অপরাধ! জীবনকে স্নেহ করে নাই—মানুষকে ভালবাসে নাই—অন্তরাত্মাকে তৃপ্তি দেয় নাই—বাতাসে ফুঁ দিয়া কেবল সাবানের ফানুষ তৈরি করিয়া উড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়াছে! মুহূর্ত্ত, দিন, মাস, বৎসর সব যেন তাহার অপব্যয়—জীবনটাই তাহার একটি বিরাট অমিতব্যয়িতা! অপরিমিত খেয়াল-খেলায় তাহার গত-জীবন শুধু সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটি দীর্ঘতম দিনের পূর্ণচ্ছেদ! আজ আবার সে নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল; নূতন তাহার দৃষ্টি ফুটিয়াছে···নূতন করিয়া হাঁটিতে শিখিবে···নূতন করিয়া কথা ফুটিবে···

মাঝখানে প্রদীপটি নিভিয়া গিয়াছে; ওধারে বিগত-বুদ্ধি মেয়েটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া···আর এপাশে পাষাণ মুর্ত্তির মত পলকহারা চোখে নিখিলেশ ভাবিতেছে—প্রদীপ নিভিয়া গেছে—নিভুক না—নিভুক না—

ঠিক এই সময় অত্যন্ত কাছাকাছি একটা প্রচণ্ড শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরের মাটি চলমান বাষ্পযানের মত দুলিয়া উঠিয়াছে, ঘরের স্থির জড় জিনিষগুলি স্থানান্তরিত হইয়া গেল—আসন্ন বিপদের ইঙ্গিতে নিখিলেশ দুইবাহু বাড়াইয়া মেয়েটিকে ধরিতে গেল, কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গেল। মাটি আরো জোরে দুলিয়াছে—সেই দোলায়মান মাটি হঠাৎ ঘর-বাড়ী সমস্ত লইয়া নদীর গর্ভে গিয়া পড়িল—আর সঙ্গে সঙ্গে পড়িল নিখিলেশ—আর পড়িল একটি মেয়ে!···

তারপরে বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে; ইচ্ছামতীর এখন সে তেজ নাই। লাজুক ভীরু বালিকার মত লজ্জা-মন্থর তাহার গতি-প্রবাহ! পাশেই একটা মস্ত রেলের পুল উঠিয়াছে; লোকে এখন খেয়াঘাটটিকে 'পুলের ঘাট' বলে; এখন তাহার চারিদিকে শান্ত-সমাহিত নিবিড় প্রশান্তি। এখন আর সে ঘাট খেয়া নৌকায় পার হইতে হয়না। পুলের একপাশে রেলিং দেওয়া একটি পায়ে-চলা পথ রেল কোম্পানী গড়িয়া দিয়াছে! তবু এখনও নদীপথে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করে; জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এ অঞ্চলের আম কাঁঠাল নৌকা করিয়া সহরে চালান্ যায়; পাটের বড় বড় বোট্ দাঁড় ফেলিয়া চলে, লগি ঠেলিয়া ডোঙা যায়, গুণ্ টানিতে টানিতে কতদূর দেশ দেশান্তরের বেপারীদের নৌকা যায়—

যদি কখনও ও অঞ্চলের কেহ ওই পথ দিয়া যায়—আর যদি এমন হয়—ডিঙার ভিতর শুইয়া মাঝ রাত্রে তাহাদের ঘুম ভাঙিয়া যায়—আকাশভরা অন্ধকার—নিস্তরঙ্গ নদীর জলে আচম্কা কুল কুল শব্দ করিয়া ওঠে—ছোট বাতায়নে অদূরের বাঁশঝাড় আর ধানক্ষেতের বাতাস আসিয়া সব ওলট্ পালোট্ করিয়া দেয়—স্মৃতি, বিস্মৃতি, লাভ, ক্ষতি, সব যদি তাহাদের একাকার হইয়া যায়—নরম বালিশের ওপর দুটি চোখের পাতা অকারণে ভারি হইয়া ওঠে—আর সেই নিশীথ রাত্রে নির্নিরীক্ষ অন্ধকারে দূরে—অনেক দূরে বাঁশঝাড়ের ছোট একটি ফাঁক দিয়া একটি ছোট তারা উঁকি মারিতে থাকে—উঁকি মারিয়া দুষ্টু মেয়ের মত 'আয়' 'আয়' বলিয়া তাহাদের ডাকে—অথবা তাহাদের মাথার উপর দিয়া যদি একটি অদৃশ্য অশরীরী পাখী কুক্ কুক্ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে দিগন্ত সীমায় মিলাইয়া যায়, তখন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, তাহারা মনে করে: ও আর কিছু নয়—ওই তারাটি, ওই পাখীটি, ওই অন্ধকার—ওই আর্দ্র বাতাস, ওই প্রত্যক্ষ বাস্তবতার পিছনে একটি পরম রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে···বহুদিন আগের ভুলিয়া যাওয়া রহস্য... এক ঝড়ের রাত্রি ও একটি পাখীর রহস্য···

সমাপ্ত

শ্রীবিমল মিত্র

মানুষ ও পশু

শ্রীসুশীলকুমার দেব

বাঙ্‌লা ভাষায় পশু, জন্তু বা জানোয়ার কোনো শব্দই রেস্‌পেক্টেব্‌ল্‌ নয়। "পশু কোথাকার!"—এ হলো গালাগাল। "জানোয়ার" যখন বলি তখন কোনো জীবকে সম্মান করি না। রাক্ষস এবং বানরেরা রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যেমন তাদের কীর্ত্তিকলাপের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—যদিও কোনো কোনো ঐতিহাসিকের কাছে নেহাৎ অন্ত্যজ মানুষ (!) বলেই তারা গ্রাহ্য শুধু, এর বেশী নয়—তেমনি "জন্তু" শব্দটা যদিও ব্যাপকার্থে সৃষ্ট জীব মাত্রেরই নাম হিসেবে কখন্‌-সখন্‌ ধরে নেওয়া যায় এবং সংস্কৃত ভাষায় মানুষ অর্থেও মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তবু সঙ্কীর্ণ অর্থে অর্থাৎ পশু-অর্থে শব্দটির সম্মান-হানি ঘট্‌বেই। এর কারণ বোধ করি এই যে, সংস্কার-প্রভাবিত ভারতীয় চিত্তে পশু কুলের প্রতি সম্মান-নিবেদনের পক্ষে কোনো শাস্ত্র-বচন নেই।

এখানে একটা আপত্তি তোলার অবকাশ আছে। আপত্তিকারী বোল্‌বেন—কেন, আমরা কি গোরুকে তেত্রিশ কোন দেব-দেবীর আধার-ভূমি বলে পূজো করি না?—সম্মান তো ছাই। আমরা কি অশ্বমেধ হেন সুবৃহৎ যজ্ঞে ঘোড়ার অসাধারণ সেবা-পূজো করিনি এককালে? আমরা কি পূজো-পার্ব্বণে ছাগ-মেষ-মহিষ পারাবতাদি পশুর বলির ব্যবস্থা করে তাদের আধ্যাত্মিক মুক্তির বিধান করিনি?···

···থামো, থামো পণ্ডিত! বিলক্ষণ হয়েছে। পূজো করেছো, একশোবার হাজার বার করেছো। কে বলে যে করোনি? তবে কি জানো?—সম্মান করোনি। দেবতাকে যেমন পূজো দিয়ে-দিয়ে তাঁকে আমাদের সমস্ত আধিভৌতিক সহজ কার্য্যকলাপ থেকে ডিস্‌মিস্‌ করেছো, বেচারা দেবতা শেষে ঠাকুরঘরে মন্দিরের কোণে আশ্রয় পেয়েছে, এও তেমনি। স্বর্গের দেবতাকে হাতের কাছে পাওনি এই যা রক্ষা; তা না হলে পূজোর-চোটে দেবতা-মেধ যজ্ঞ কর্‌তে তোমরা মহা-দেবতার পূজো চালাতে।

সত্যি নয় কি? ধর গৃহ-পালিত পশুর কথা। এই বাঙালীর গোরু: ঘাস-খড়-খইল খেতে দিতে পারো—ভালো; না পারো ক্ষতি নেই। কিন্তু দু'বেলা ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে গোরুর মঙ্গলারতি ও সন্ধ্যারতিটি কর্‌তে যেন ভুল না হয়। ফল কি হয়েছে?—ভারতের গোরু পৃথিবীর মধ্যে গোরুর দলে হীনতম দীনতম।

টোয়েন্‌টিয়েথ্‌ সেঞ্চুরীতে ধূপ ধুনোর বদলে বুদ্ধির পূজো চালাও। গোরুর পূজো করা হবে তখনই যখন গোরুর ভালো প্রজনন কর্‌তে শিখ্‌ব। সৌজাত্য বিদ্যা গো-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর্‌লে গো-মাতার সত্যিকার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে। তখন হবে আসল পূজো। না-না, পূজো নয়—সম্মান। 'পূজো' শব্দটি সেকেলে, তার সঙ্গে ঐ ধূপ-দীপ প্রভৃতি অনেকানেক কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। সুতরাং মডার্ণ্‌ শব্দ ব্যবহার করো—সম্মান।

একটি দৃষ্টান্ত নাও—কুকুর। সংস্কৃত প্রবচনে আছে: শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্‌—মানে, রাজা করে দিলেও কুকুর কুকুর, যেই সেই। অখাদ্যটি খাবেই। সত্যিই তো বাঙ্‌লা দেশে ক'টা বাঙালী কুকুর অখাদ্য না খায়?

আচ্ছা, বাঙালী কুকুর কোন্‌ জাতি, কি গোত্র তার? কোন্‌ বাঙালী না উত্তর দেবেন—কুকুরের আবার জাতি গোত্র! এই তো সম্মানের নমুনা।

অথচ কুকুরের ইতিহাস মস্ত ইতিহাস। ভারতবর্ষ থেকেই একদিন কুকুর য়ুরোপে চালান হয়ে কুকুর বংশে এক নতুন বংশের সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষের নেকড়ে বাঘের বংশে একদা শেয়ালের সঙ্গে সংমিশ্রণে কুকুরের জন্ম হয়। তারপর সেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগে ভারতীয় যাযাবরেরা সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদের তীরে গিয়ে বসবাস সুরু কর্‌লে—সঙ্গে তাদের এই কুকুর। য়ুরোপীয় নেকড়ের বংশজ কুকুরের সঙ্গে হলো এই ভারতীয় কুকুরের মিশ্রণ। এর ফলে কতো নতুন কুকুর গোত্রের সৃষ্টি হয়েছে। 'সৃষ্টি হয়েছে' বল্লে ইতিবৃত্তে ভ্রান্তি ঘটে। সৃষ্টি করা হয়েছে—ইচ্ছা করে সখ করে, বিদ্যা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে। এই প্রজনিত গোত্রদের মধ্যে এক নেকড়ে গোত্র-ভুক্ত যে-সব বিভিন্ন-জাতি কুকুরেরা আছে তাদের মধ্যে কোথায় বা এস্‌কিমো কুকুর আর কোথায় বা আমাদের ভারতীয় তথা বঙ্গীয় হতচ্ছাড়া গৃহহীন স্বামিহীন কুকুরেরা। এস্‌কিমো কুকুর রাইট্‌ রয়েল্‌ ষ্টাইল-এ বরফের ওপর দিয়ে শ্লেজ-গাড়ী টেনে

নিয়ে যাচ্ছে। গলাবদ্ধ পেটিতে ঘণ্টা বাঁধা—শব্দ হচ্ছে টুং-টাং-টুং। আর সম-গোত্রীয় বঙ্গীয় কুকুরটী জিভ্ বের করে অনাহারে অর্দ্ধাহারে অস্থানে-কুস্থানে খ্যাক্ খ্যাক্ করে বেড়াচ্ছেন: সাধে তার নাম হয়েছে "দেশী কুত্তা"! জগতের কুকুর-জাতির মধ্যে এরা অচ্ছুৎ—পরীয়া।

ভারতবর্ষের কাছেই তো জাপান। কুকুর কতোখানি সম্মানের আসনে উঠেছে সেখানে। জাপানী স্পেনিয়েল্—ছোট ছোট কুকুর, কোনো কাজেই লাগেনা। ব্লাড্-হাউণ্ডের মতো মানুষ-চোর শীকার করেনা বটে কিন্তু দেখ্‌তে ভারি চমৎকার—মানুষের সখের ও ভব্যতার একটি বিশেষ উপকরণ: জাপানী মেয়ে-মানুষের হাতের ছাতাগুলো যেমন কাজে লাগেনা কিন্তু নয়নাভিরাম, তেম্‌নি। এই স্পেনিয়েল্ জাপানীদের সু-প্রজননের দ্বারা বেড়ে উঠেছে।

সুজাত কুকুর ও সুজাতা কুক্কুরী যে য়ুরোপে ও আমেরিকায় পথে পথে অখাদ্য খেয়ে বেড়ায় না, সেটা হচ্ছে তাদের কাউন্টি কাউন্সিল্ মিউনিসিপালিটি বা কর্পোরেশনের আইনের জোরে। কুকুর পথে পথে খামোখা বেড়িয়ে বেড়াবার জন্যে নয়। তাও যদি আমাদের "দেশী কুত্তা" বৈরাগী হয়ে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে শেষাশেষি ঝোড়-জঙ্গলে পাহাড়-পর্ব্বতে গিয়ে আশ্রয় নিত! তাহলে অন্ততআমরা তলোয়ার-বন্দুক-হীন আইন-উদাসী বাঙালীরা দুর্গন্ধ, ছোঁয়াচে রোগ, কুদৃশ্য প্রভৃতির দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেয়ে যেতুম।

কুকুর হচ্ছে রীতিমতো পালিত জন্তু। যেমন ঘরে তেমন বাইরেও—মোটরকারে ট্রেনে জাহাজে পয়দল ভ্রমণে কুকুর তার স্বামি-স্বামিনীর আদুরে সঙ্গী। বিদেশী কুকুরেরা আজ এরোপ্লেন্ অবধি চড়ে বেড়াচ্ছে; আর তাদের ভারতীয় দোসর অসভ্যের মতো কান মুষড়ে লেজ গুটিয়ে খালি খ্যাক্ খ্যাক্ কর্‌ছে। আমাদের কুকুরদের এমনি কপাল যে, এই ঘৃণ্য জীবনের ওপর আবার মাথায় পড়ে তাদের মেথরের মুগুর, মরীয়া হয়ে আসে তাদের জন্যে যতো ভীষণ মড়ক। তবু যদি দু'একজন বাঙালী-টুর্গেনিভ্ এদের মৌন বেদনাকে সাহিত্যে ব্যক্ত করে "নির্ব্বাক্ জীব"-দের প্রতি কর্ত্তব্যের ঋণ কিছুমাত্রও পরিশোধ কর্‌তেন!

তবু যাহোক্, ঘোড়ার অদৃষ্ট ভালো। যুদ্ধ-বিগ্রহে কুচ্-কাওয়াজ করে ঘোড়া 'বড়োমানুষ' হয়ে গেছে। বিলুপ্ত ভারতীয় যুদ্ধ-প্রথার চতুরঙ্গ সেনার মধ্যে অশ্ব সর্ব্বাগ্রগণ্য না হলেও প্রধান। প্রতাপসিংহের চৈতক ইতিহাসের বাহন বিশেষ। পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ঘোড়ায় করে নিয়ে পালিয়েছিলেন। অশ্বমেধের ঘোড়ার পিছু-পিছু খিদমদগারী করে অর্জ্জুন প্রাচীন কামরূপের নাগা-কন্যা উলুপীর ভার্য্যাত্বে বীতস্পৃহ হয়ে শেষে মণিপুরী সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার পাণি-পীড়ন করলেন।

নব-প্রস্তর যুগে বন্য ঘোড়া প্রথম গৃহপালিত হলো। ঘোড়ার মাংস ও দুধ খাওয়ার রেওয়াজ তখন। (গত জার্ম্মান্ যুদ্ধে ঘোড়ার মাংসটা মধুর অভাবে গুড়ের মতন বেশ চলে গেছে।) তারপর ঘোড়া হলো ভারবাহী পশু—গর্দ্দভের সামিল। তারো পরে দেখা যায়, রথে তার যোজনা হলো। পুরাকালের মিশরে আসীবিয়ায় গ্রীসে রোমে এবং অস্মদ্দেশে অশ্ব হলেন রথাশ্ব। শকুন্তলা কাব্যই হতনা যদি দুষ্মন্তরাজা—পদ্মবনে ঐরাবতবৎ—কণ্ব মুনির তপোবনে অশ্ব-রথে গিয়ে উপস্থিত না হতেন।

ঘোড়ার মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ আরবী ঘোড়া—একেবারে বিশ্ব-বিশ্রুত। অথচ এই আরবী ঘোড়ার পূর্ব্ব-পুরুষেরা ছিল প্লিওসিন্ যুগের ভারতবর্ষের আবাসিক। আমাদের দেশী ঘোড়ার এখন দুর্দ্দিন হলোই বা!

ইংরেজেরা ঘোড়াকে তার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি শিখিয়ে দিলেন—রেস্-এর দৌড়। এই দৌড়ের জন্যে ঘোড়ার বংশোন্নতির দরকার হয়ে পড়্‌ল। কারণ উন্নত ঘোড়ায় রেস্ খেলা হয় উত্তম। তাই প্রথম জেম্‌স-এর রাজত্বকাল থেকে রাণীএন্-এর সময় অবধি আরবী বার্‌বী তুর্কী প্রভৃতি অভিজাত-বংশীয় ঘোড়া ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে ব্রিটেনীয় ঘোড়ার সঙ্গে তাদের রক্ত-সম্বন্ধ পাতিয়ে দেওয়া হলো। ফলে ঘোড়ার হলো বংশ-সমৃদ্ধি। সঙ্গে সঙ্গে যেমন লর্ড্ ডার্বি একদিকে রেসের সূত্রপাত করলেন, তেম্‌নি দেখ্‌তে দেখ্‌তে "আইরীস্ সুইপ্‌ষ্টেক্" "কেলকাটা সুইপ্‌ষ্টেক্" প্রভৃতি রেসের দৌড় ও দৌড়ের ওপর বাজি রাখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানাদেশে চল্‌তি হয়ে গেল। ১৯০২ ইংরেজীতে ডার্বি রেসে প্রথম স্থান দখল করে টম্ অয়াল্‌ডস্ যখন তার নিজের ঘোড়া "এপ্রিল্ দি ফিফ্‌থ্"-এর কেরামতি প্রতিপন্ন করলেন তখন তাঁর গৌরব কতো! তিনি নিজেই বল্লেন যে, ইংলণ্ডের "সুখীতম ব্যক্তি" তিনি। বারট্রাণ্ড্ রাসেল্ তাঁর Conquest of Happiness নামক ইদানীন্তন লিখিত পুস্তকে সুখ-বিজয়ের যে-যে পথ উল্লেখ করেছেন তাতে ঘোড়-দৌড়ের নাম করেননি—এ বড়ো আশ্চর্য্য কথা। যাক্, ঘোড়ার প্রতিপালক হিসাবে ও বহু রেসে নিজের ঘোড়াদের বাহাদুরী দেখিয়ে আগাখাঁ মহোদয় ইংলণ্ডে প্রভূত অর্থ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন।

অতঃপর মেষের কথা। পালিত পশুদের মধ্যে মেষের কদর অধুনা ভারতে তেমন না হলেও এককালে যে সাতিশয় ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। হিন্দু-স্থানের আর্য্যরা যখন পশ্চিমে সিন্ধু-শৌবীর থেকে আরম্ভ করে পূর্ব্বে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) পর্য্যন্ত বসতি স্থাপন করেননি, অর্থাৎ বসবাসের সঙ্গে-সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তে চাষ-আবাদ করার আগে থেকে যখন তারা যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন করে মেষাদি পশু নিয়ে ঘুরে

বেড়াতেন, তখন উক্ত পশু তাদের একটি প্রধান আশ্রয় ছিল।

কিন্তু এশিয়া থেকেই মেষ প্রথম য়ুরোপে গেছে কিনা সে-বিষয়ে এখন নিশ্চিতরূপে কিছু বলা শক্ত। তবে য়ুরোপে এবং ভারতে যে মেষের চাষ একই উদ্দেশ্যে হয়নি তা তো সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। য়ুরোপে মেষের চাষ উলের জন্যে, আমাদের বোধ করি বলির দ্বারা আত্ম-তুষ্টি ও দেব-তুষ্টির জন্যে।

য়ুরোপে মেষ শব্দ উচ্চারণ করতেই বাইবেলের উল্লেখ মতো কেউ যীশুখৃষ্টের উপদেশ স্মরণ করে শান্তিপ্রিয় হবার কথা ভাবে না। প্রথমেই মনে পড়ে যায় 'উল'। এই উলের ব্যবসা করে য়ুরোপে ফ্লেমিশেরা মধ্যযুগে সেরা বণিক বলে বিখ্যাত হয়েছিল। উলের ব্যবসায়ীর টাকার ওপর নির্ভর করে কোনো-কোনো মধ্যযুগের ইংরেজ নরপতি বৈদেশিক যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করতে পেরেছিলেন। শীত-প্রধান দেশে উলের চাষ বেশী হবে তাতে আশ্চর্য্য কি? য়ুরোপে মহিলাদের fur coat অত্যন্ত আদরের জিনিষ এবং নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী। এই fur-এর মধ্যে Astrakhan নামীয় যেটি আছে তার খুব দাম। তাই ফ্যাসন্‌-রাজ্যের নায়িকা-মহলে এর চাহিদা ও কাট্‌তি দেদার। এই furটি কিন্তু য়ুরোপীয় মেষ জোগাতে অক্ষম। এ হচ্ছে বোখারা ও পারশ্যদেশীয় মেষের গাত্রাবরণী থেকে প্রস্তুত। পারশ্যের বস্ত্র-শিল্পী অন্য প্রয়োজনে এই একই জিনিষ কাজে লাগালেন মহার্ঘ সুদৃশ্য কার্পেট তৈরী করতে। কার্পেট ঘরের দেয়ালে ঘরের মেঝেয় সাজিয়ে ঘরকে সুচারু করে তুল্‌লেন। এতে যেন মেষের নবজন্ম ঘটে গেল। পাশ্চাত্য দেশে যাকে নিয়ে চলে ব্যবসা প্রতীচ্যে তাকে নিয়েই শিল্প কলার প্রকর্ষ। সভ্যতার বিস্তারে মেষের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে রইল।

আমরা ভারতীয়রা পাঞ্জাব ও হিমালয় অঞ্চলে মেষ-যুদ্ধ অদ্যাবধি বজায় রেখেছি—স্পেনে যেমন আজও ষণ্ড-যুদ্ধ প্রচলিত আছে। দুটো মেষ পরস্পরের মাথায় এম্‌নি জোরে বেপরোয়া মর্জ্জি নিয়ে গুঁতোগুঁতি করতে পারে যে বল্‌তে ইচ্ছে হয়: 'মেষবৎ দুর্ব্বল', 'মেষ হেন শান্ত' ইত্যাদি কথাগুলি মনুষ্য-ভাষা থেকে স্রেফ্‌ বিসর্জ্জন দিয়ে ভাষার মিথ্যাবাদিতা অবিলম্বে ঘুচিয়ে দেওয়া উচিত।

তিব্বতে কোনো পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে শ্রাদ্ধোপলক্ষে মেষের মধ্যস্থতায় মৃত ব্যক্তির আত্মার আবির্ভাব কল্পনা করে "ডুডুং" নামে যে ধর্ম্ম-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মেষকে মদ্যাদি নানা পানীয় ও আহার্য্য খাইয়ে স্বর্গত আত্মার শোকে কাঁদাকাটি করা একটি প্রথা। যে মেষ বিগত জনের সঙ্গে নবাগত জনের আত্মীয়তার যোগাযোগ বিধান করতে সমর্থ সে তো আমাদের প্রিয়—সে তো আমাদের আত্মীয়।

তারপর, মেষের লোম থেকে ভারতবর্ষ যা করতে পারেনি ছাগলেরলোম থেকে সেইটি পুরোপুরি পুষিয়ে নিয়েছে। কাশ্মিরী ছাগল একেবারে ডঙ্কামারা। কাশ্মিরী শাল বলে যে বস্তুটি বয়ন-শিল্পে বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে তা ছাগলের গায়ের অধঃলোম (Under fur) থেকে তৈরী। এই শাল বিদেশে রপ্তানি করে কত লোক লক্ষপতি কোটিপতি হয়েছে; আবার কত রাণী-মহারাণী রাজা-রাজড়া এই শাল গায়ে দিয়ে প্রসাধনে একেবারে বাউণ্ডারী হিট্‌ দিয়েছেন ভেবে আনন্দ-রসে টইটুম্বুর হয়েছেন—তার সংখ্যা কে রাখে!

ছাগল ধরাধামে এম্‌নিতরো কীর্ত্তি রাখ্‌বে বৈকি। বিম্বিসার রাজার বলি-প্রাঙ্গণে যেদিন স্বয়ং বুদ্ধদেব ছাগ-শিশুর প্রাণ-বিনিময়ে নিজের অমূল্য জীবন যূপকাষ্ঠে বিসর্জ্জন দিতে অগ্রগামী হয়েছিলেন সেদিনই বোঝা গেছে ছাগল যে-কে-সে জীব নয়। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। তার কীর্ত্তি-কাহিনীর জন্যে 'পরশুরাম' আধুনিক কালে তাকে "লম্বকর্ণ" উপাধি দিয়ে বিভূষিত করেছেন। উপাধির অপেক্ষা না রেখেই কিন্তু ছাগল আজ সুপ্রসিদ্ধ। তৃতীয় রাউণ্ড্‌ টেব্‌ল্‌ কন্‌ফারেন্স্‌ উপলক্ষে ইংলণ্ডে থাকার সময় যে ছাগী মহাত্মা গান্ধীর দুধ জোগাত—মহাত্মাজীর সঙ্গে একদিন সাক্ষাতের অবকাশে সে ছায়া-চিত্রের ফিল্মে অবলীলাক্রমে তার স্থান করে নিয়েছে। ফিল্মের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন।

কিন্তু হাতীর মতো কীর্ত্তি বুঝি ছাগলেরও নেই। 'হস্তি-মূর্খ' কথাটা শব্দের অপপ্রয়োগ। হাতীর গুণপনা আলোচনা করলে কথাটা যে নিতান্ত থেলো এই ধারণাই মনে প্রবল হতে থাকে। এককালে এদেশে যুদ্ধে জয় মানেই ছিল হাতীর সাহায্যে কিস্তি মাৎ করা। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে যদি বর্ণ-বিভাগ করতে হয় তাহলে বোলব হাতী ক্ষত্রিয়—যোদ্ধা। আগেকার যুদ্ধ-কৌশলও এখন নেই, হাতীর সম্মানও লোপ পেতে বসেছে। তে হি নো দিবসা গতাঃ। আশ্চর্য্য হতে হয়, হাতী অন্যান্য অনেক শীর্ণকায় বন্যপশুর চাইতে অধিক দ্রুতগামী। গহন বনে তার বাস, নিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ তার পেশা। মানুষ যে হাতীকে পোষ মানিয়েছে সে বড়ো সোজা কথা নয়। কথায় বলে 'হাতী পোষা!' পোষ মানানো যদিও সোজা কিন্তু হাতী বর্ম্মার জঙ্গল থেকে ধরে আনা অতীব কঠিন। 'হাতী-খেদা' করা বিস্তর বিপৎসঙ্কুল। কিন্তু বিপৎ যেখানে নেই বীরত্ব সেখানে প্রকট হতে পারে না। তাইতো

পশুশালায় হাতীকে বন্দী করে ক্ষত্রিয় রাজা গর্ব্বিত হন; হাতীকে তাঁর সিংহাসনের বাহন করে রাজা স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

অধুনা যে মাড়োয়ারী বাঙালীর ইকনমিক্‌স্‌কে একচেটে করে রেখেছে—জাপানী সওদাগররাও নেক্-টু-নেক্ প্রতিযোগিতা করে যাকে বঙ্গীয় বণিক-রাষ্ট্র থেকে গদিচ্যুত করতে পারছে না, সেই মাড়োয়ারীর টাকার সিন্দুকের অধিপতি হচ্ছেন গজানন। এই লক্ষ্মীমন্ত দেবতাটি মাড়োয়ারীর চোখে শুধু সম্পদের প্রতীক নন, সৌন্দর্য্যেরও প্রতীক বটেন—গৃহস্থের চোখে দুগ্ধবতী গাভী যেমন সুন্দর, বুভুক্ষুর কাছে যেমন পাকা বোম্বাই আম অতীব নয়ন মনোমুগ্ধকর।

তবে, কিবা ব্যবসায়ী কিবা শিল্পী সকলের চোখেই সুন্দর গজ-দন্ত। 'গজ-দন্ত-পীত' কথাটা নেহাৎ কবিত্বপূর্ণ। এ হেন রঙ্ যে রমণীর ললনা-কুলে তিনি রত্ন-বিশেষা—রূপদক্ষেরা এরকমই বলে থাকেন। রত্ন-রাজির মধ্যে আবার গজ-মোতি। গজ-মোতির অবস্থান হাতির মস্তিষ্কেই হোক্ অথবা হাতীর দাঁতের গোড়াতেই হোক্ সর্ব্বত্রই এ-রত্ন মূল্যবান্—মহামূল্যবান্।

রূপদক্ষেরা বল্‌বেন, গৃহপালিত পশু পক্ষীর মধ্যে বিচার করলে কপোত-কপোতী এবং হংস-হংসীর মতো নয়নানন্দকর জীব আর নেই। এদেরকে নানাবিধ অলঙ্কারে সাজিয়ে চিত্রকরেরা প্রসাধন-সুখ লাভ করেন। (অবশ্য পশুদের মধ্যে দরবারী হাতীও যে মণ্ডন-শিল্পের আশ্রয় স্বরূপ সেটাও মনে রাখা কর্ত্তব্য।) কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্—যাদের আকৃতি মধুর তাদের কীই না ভূষণ হয়ে থাকে! কপোত-দম্পতি সুখে নীড় রচনা করে গার্হস্থ্য জীবনের দৃষ্টান্ত যেমনটি দেখায় তেমনটি নাকি দুর্ল্লভ। এরা প্রেমের আদর্শ—য়ুরোপে যেমন ডাভ্ পাখী, আমাদের পুরাতন সাহিত্যে যেমন চখা ও চখী। তবে এরা যে শুধু দুর্ব্বল সৌন্দর্য্য ও কোমল ভাব-বিলাসের প্রতীক তা নয়। গত মহাযুদ্ধে কপোত-ব্যূহ সংবাদ-বহের কায়দা-কানুন অভ্যাস করে চাই-কি বেতার-বার্ত্তার কাজ কুলিয়ে দিয়েছে। সাহসিকা দূতী হওয়ার জন্যে হংসীরও অনুরূপ অল্প-বিস্তর সুখ্যাতি আছে—নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে রাজহংসীর দৌত্য।

শুধু তাই নয়। পশু-প্রশস্তি যথাযথ করে গেছেন বৈজ্ঞানিক ডারুইন্। যেদিন তিনি তাঁর Descent of Man ও Origin of Species প্রকাশ করেন সেদিন আলোচিত সমগ্র জীব-বিদ্যার সম্মিলিত জ্ঞান একাগ্র হয়ে মানব-সমাজে প্রচার করলে যে, পশু ও মানুষ পূর্ব্ব ও উত্তর পুরুষ হিসেবে পৌর্ব্বাপর্য্য সম্পর্কে আত্মীয়। ফলে, মানবের আত্মা মনুর বংশধরত্বের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভ করে সহসা হনু-রাজত্বের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করলে—সমগ্র পশুত্বের মধ্যে মানবাত্মা আপনাকে বিরাটরূপে অনুভব করে দ্বিজত্বে উপনীত হলো।

লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার এখানে একটা উল্লেখ করা যেতে পারে।

অনেক পশু নিয়ে পরীক্ষা করার ফলে ডারুইন অবশেষে তাঁর একদা অতি-প্রিয় "হ্যাম্‌লেট্" নাটকের উপভোগেও বিরক্ত হয়ে পড়লেন বলে কথিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে মাইকেলেঞ্জেলো পশুকুলের মুখচ্ছবি পরীক্ষা করে করে এতোখানি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন যে, মানুষের মুখ আঁক্‌বার সময় তিনি প্রথম অনুরূপ একটি পশুমুখ এঁকে তারপর সেই পশু-মুখের স্কেচ্ থেকে আসল মানুষের মুখটি ব্যক্ত করতে লাগলেন! তাঁর মত ছিল: মানুষের মুখগুলিকে বিশেষ বিশেষ পশু-মুখের ব্যঞ্জনাস্বরূপ মেনে নেওয়া উচিত। মানুষমুখ আঁক্‌বার আগে তিনি একবার এটা-ওটা-সেটা নানাধরণের পশুমুখের কোন্‌টার সঙ্গে সেটি তুলনীয় তাই দেখে নিতেন। ডারুইন্ তাঁর পশু-মানসিকতাকে জীব-বিদ্যার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারের হেতু করে তুল্লেন; আর এঞ্জেলো তাঁর পশুমানসিকতাকে কলা-সরস্বতীর চিত্ত বিনোদনে বিনিয়োগ করে জীব-বিজ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিলেন। যাক্ সে কথা। মূল কথা হচ্ছে, একই পশুমানসিকতা ডারুইন্‌কে বৈজ্ঞানিক এবং এঞ্জেলোকে চিত্রকর ও ভাস্কর রূপে জগতে পরিচয় করিয়ে দিলে।

পশুর অবদান অপরিসীম। যেমন জীব-বিদ্যার ক্ষেত্রে তেমনি দেহতত্ত্বে: মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে হাত-পা-নাক-চোখ-কান-ফুস্‌ফুস-উদর প্রভৃতি দেহের সর্ব্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম্মণ্যতার যে কার্য্য-কারণ সম্পর্ক রয়েছে তা প্রতিপন্ন করতে ডাক্তার গল্ ব্যাঙ্ প্রভৃতি নানা জন্তুর 'পরে অস্ত্রোপচার করলেন—তবেই Phrenology নামে দেহ-বিজ্ঞানের একটী প্রধান শাখা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। ফরাসী দেশে তথা য়ুরোপে monkey gland মানুষের শরীরে নিবিষ্ট করে জীবন দশ-পনেরো কুড়ি বছর বাড়িয়ে দেওয়া সহজ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। এতে বানরের যে জীবনী শক্তির হ্রাস হচ্ছে তা নয়, জীবনহানিও ঘটছে। কত ভেক্, কত শশক, কত ইঁদুর, কত বানর, যে বৈজ্ঞানিক সত্যাবিষ্কারের হেতু হয়ে অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেছে, করছে ও করবে তার সংখ্যা নির্দ্দেশ অসম্ভব।

মনোবিজ্ঞানে মনোবিৎ প্রমাণ করলেন: পশুরা কেবল যে সহজাত জ্ঞানের অধীন সে কথা মিথ্যা, মানুষের ন্যায় যুগপৎ বুদ্ধিও তাদের সচল। থর্ণডাইক্, লয়েড্ মরগান্

প্রভৃতি জীবতত্ত্বজ্ঞ ও ম্যাক্‌ডুগাল্ প্রভৃতি মনোবিৎ-বৃন্দ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে অগণিত পশুর পরীক্ষণ ও গবেষণা দ্বারাই তাঁদের মন্তব্য স্থির করেছেন। আমেরিক ডক্টর অয়াটসন্ ইঁদুরের ব্যবহার পরিবীক্ষণপূর্ব্বক এই তত্ত্বে পৌঁচেছেন যে, আমরা যাকে "মন" বলে আখ্যা দিয়েছি, সেটা নাকি নিতান্তই ভুঁয়ো—তার কোনো অস্তিত্বই নেই। এত বড়ো একটা তথ্য বেচারা ইঁদুর কিছুই জান্‌তে পারলে না।

বিজ্ঞানের ন্যায় কাব্যেও জীব-জন্তু উপেক্ষিত নয়। বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানে ও রবীন্দ্র নাথের 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' প্রবন্ধে বর্ষালু মানব-চিত্তের ব্যাকুলতার কাঁপুনিকে দাদুরীর ডাক চিরকালের জন্যে সরব সরস করে রেখেছে। এ কী কম! ধর্ম্মশাস্ত্রেও পশু-কুলের সম্মান অব্যাহত। প্রাচীন গ্রীসিয় ও হিন্দু অসংখ্য দেব-দেবীর বাহনরূপে নানা পশু-শ্রেণী য়ুরোপে ও এশিয়ায় যথোচিত সম্মাননা লাভের অধিকারী বলে গণ্য। এও কিছু কম নয়। তারপর নৃ-বিৎ হাউইটের মতে ৪০০ "টোটেম" নামের মধ্যে প্রায় ৩৬০টী নামই পাওয়া যায় পশুর। অনুন্নত অর্দ্ধ-সভ্য বা অসভ্য জাতিদের মধ্যে অসংখ্য মানব-গোষ্ঠী নানা পশুর সঙ্গে অভিন্নাত্মক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করছে। এই পশু-কেন্দ্রিক গোষ্ঠী-বিভাগ ও ধর্ম্ম-চর্চ্চা সভ্যতার নিম্নতম স্তরের নৃ-রাজ্যে অবাধে তাঁদের অধিপত্য বিস্তার করে আছে।

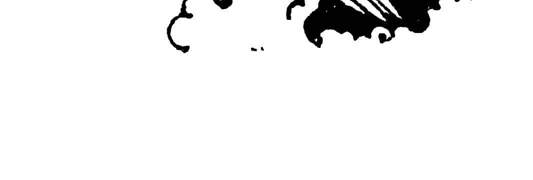
সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে পশু-জাতি সবিশেষ উন্নত হয়েছে কি ধ্বংসের পথে অবনতির পথে চলেছে তার সঠিক পরিমাপ করার সময় হয়ত এখনো সুদূর ভবিষ্যতেই থেকে গেছে। কিন্তু পশুর সংশ্রবে মানুষ যে ক্রমেই বিজ্ঞানের রাজ্যে সত্যকে, জীবন-যাত্রার পথে শুভকে ও শিল্পকলার সাধনায় সুন্দরকে প্রতিদিন তিল তিল করে অঙ্গীকার ও অধিকার করে আসছে, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের চতুর্দ্দিকে বেড়েই চলেছে।

সেই দিন—যেদিন আমরা পশু ছিলুম, ক্রম-বিকাশের মই-এ চড়ে মনুষ্যত্বের উচ্চ ভূমিতে যেদিন পা বাড়াইনি, সেদিন গেছে বড়ো দুর্য্যোগ। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমরা জীবন-সংগ্রামে একে অন্যের প্রতি হিংস্র আচরণ করেছি। হিংসাই ছিল রীতি। তারপর একদিন সহস্র সহস্র পশু যোনি ভ্রমণ করে বোধিসত্ত্ব গৌতম মানব-দেহে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উপলব্ধি করে দেখ্‌লেন: মানুষ ও মানুষে এবং মানুষেতর জীবে কল্যাণের যোগ-সূত্র স্থাপিত হতে পারে: সে সূত্র শান্তি ও মৈত্রী, মুদিতা ও করুণার প্রেম-সূত্র। আত্মরক্ষা যদি পশু-প্রকৃতির first principle হয়, তবে মানব প্রকৃতির first principle আত্মত্যাগ—আত্মপরতার পরিবর্ত্তে পরার্থপরতা। আত্মপরতায় যদি ক্ষুদ্রতা পরার্থ-পরতায় তবে মহত্ত্ব; হিংসায় ঈর্ষা অহিংসায় প্রেম।

এমনকি পশু জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শান্তি মৈত্রী সুখ আত্মত্যাগ বহুধা চিহ্নিত হয়ে আছে দেখে কবি হুইটম্যান্ পাশবতার জয়গান করে বলেছেন:—

I think I could turn and live with animals, they are so
placid and self contained,
I stand and look at them long and long.
They do not sweat and whine about their condition,
They do not lie awake in the dark and weep for their sins,
They do not make me sick discussing their duty to God,
Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania
of owning things.
Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands
of years ago,
Not one is respectable or unhappy over the whole earth.

সুশীলকুমার দেব



একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টসের ভবিষ্যৎ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গত ১৫ই আগষ্ট ১৯৩৩ সালে কলিকাতার Indian Museum গৃহে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে "একাডেমি অফ্ ফাইন্ আর্ট্স্" প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটির বয়ঃক্রম এক বৎসর পূর্ণ হ'তে চল্‌ল। গোত্র হিসাবে এ প্রতিষ্ঠানটি স্বল্পজীবী গুল্মশ্রেণীর নয়, এর গোত্র দীর্ঘায়ুষ্মান বনস্পতির,—নানা শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে সুদূর-বিস্তৃত ভবিষ্যতে এর প্রসারের সম্ভাবনা। লণ্ডনের 'রয়াল একাডেমি অফ্ আর্ট্স্' জন্মলাভ করে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে; ১৬৬ বৎসর পরে আজও পূর্ণবেগে তার যৌবন কাল চলেছে, এবং এ যৌবনকাল যে আরও বহু বহু ১৬৬ বৎসর অতিক্রম করে যাবে না তার কোনো আশঙ্কা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। লণ্ডনের 'রয়াল একাডেমি' এবং কলিকাতার 'একাডেমি অফ ফাইন্ আর্ট্স্' একই গোত্রের বস্তু। সুতরাং জন্মদিবসের মাত্র এক বৎসরের মধ্যে 'একাডেমি অফ ফাইন্ আর্ট্সের' ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো প্রকার সুনিশ্চিত মন্তব্য প্রকাশ করতে যাওয়া নিরাপদ হবে না। কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যেই এর ক্রিয়াশীলতার একটি দৃষ্টান্ত এমন বিস্ময়কররূপে এবং বৃহদায়তনে প্রকাশ পেয়েছে যে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকাও উচিত নয়। যে কয়টি কর্ত্তব্য সাধনের অভিপ্রায় নিয়ে একাডেমি গঠিত হয়েছে তার একটি হচ্ছে প্রতিবৎসরে কলিকাতায় একটি করে ললিত-কলার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করা। প্রতিষ্ঠাপনের মাত্র চার মাস পরে একাডেমি তাঁদের প্রদর্শনী-অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যটি পালন করেন। এই যৎপরোনাস্তি অল্প সময়ের উদ্যোগে যে প্রদর্শনীটি গ'ড়ে উঠেছিল, তার রূপ এবং আয়তন দেখে সকলের মনে বিস্ময় আনন্দকে পরাভূত করেছিল।



নটীর পূজা
শ্রীনন্দলাল বসু

ফটো সোসাইটি
কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

কিন্তু এমন কোনো কোনো ব্যক্তি, যাঁরা তাঁদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, প্রসার এবং বিলয় পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ লাভ করেছেন, তাঁদের মনে বৃহৎ ব্যাপারের এই বিরাট সূত্রপাত দেখে বিস্ময় এবং আনন্দের সহিত একটু উদ্বেগও যে দেখা দেয় নি, তা নয়। উদ্বেগ আর কিছুর জন্য নয়, উদ্বোধনের উদ্দীপনার একটা সঙ্গত অংশ নিত্যদিনের

সাধারণ কর্ত্তব্য-পালনের মধ্যে থাকবে কি-না, তাই ভেবে। পার্ব্বত্য নদীতে আষাঢ় মাসের বৃষ্টির দিনে যে ঢল নামে তার জলোচ্ছ্বাস দেখে নদীর জল-সম্পদ বিবেচনা করলে চল্‌বে না। বৈশাখ মাসের শীর্ণ নদীর রিক্ততায় কাজ চল্‌বে কি-না সে কথাও ভাবতে হবে।

আরম্ভের সমারোহ যে সর্ব্বত্র নিরর্থক এবং অনিষ্টকর এমন কথা বলি নে, কিন্তু বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া বলে যে একটি আপ্ত বাক্য বহুদিন থেকে প্রচলিত আছে সেই কথা বলবারই চেষ্টা করছি। পরিচালকের শক্তি এবং অধ্যবসায়ের যে অংশটি নিত্য এবং ধ্রুব,—অর্থাৎ যেটুকু শক্তি এবং অধ্যবসায় সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান থাকবে, তার দ্বারা যদি পরিচালনা সম্ভবপর হয় তবেই ভালো, নচেৎ জমার চেয়ে খরচ বেশী হলে হিসাবের ক্ষেত্রে যে বিভ্রাট উপস্থিত হয় তাই হবে।

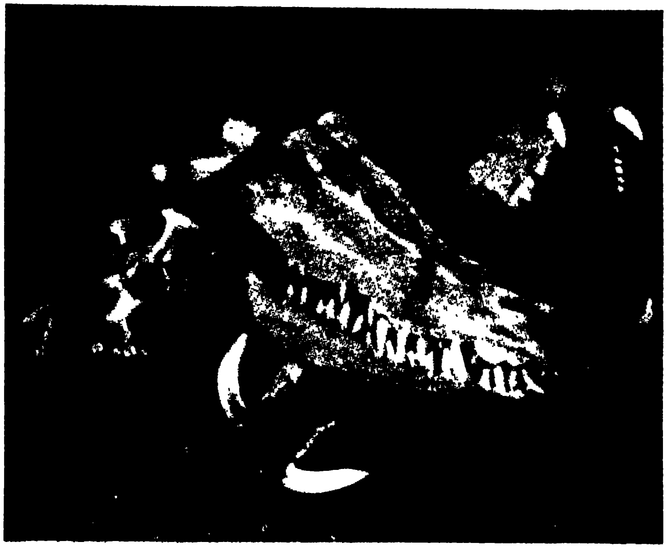


প্রদর্শনী কক্ষের একটি কোণ
একেবারে দক্ষিণ দিকে Sir Edward Burne Jones-এর Music ছবিটি দেখা যাচ্ছে

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু সে দুশ্চিন্তার কারণ নেই বলেই মনে হয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, জমার দিকে শক্তি একটুও অপচিত হয় নি, উপচিতই হয়েছে। একাডেমির সম্পাদক সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসুর সহিত মৌখিক আলোচনায় বোঝা গেল যে, আগামী ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময়ে একাডেমির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীর জন্য তাঁরা সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত ত হচ্ছেনই, উপরোক্ত একাডেমির অন্যান্য মুখ্য উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্যগুলি যাতে অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা যায় তদ্বিষয়েও তাঁদের এবং আগ্রহের অভাব নেই।

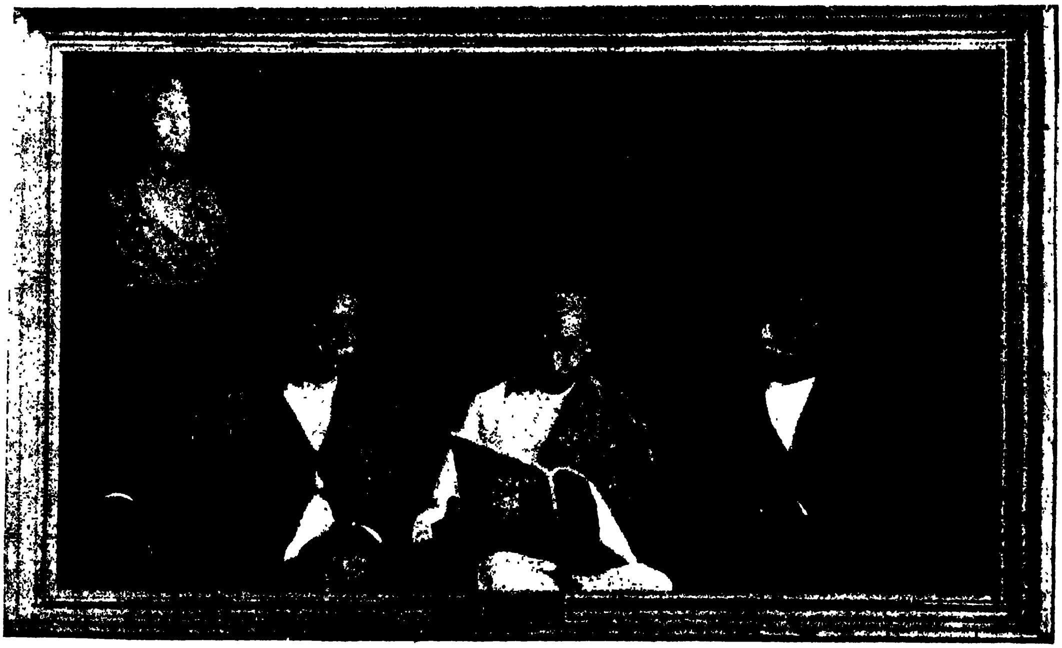
একাডেমি ও একাডেমির প্রথম ক্রিয়াশীলতা—গত ডিসেম্বর মাসের ললিতকলা প্রদর্শনীর বিষয়ে যাঁরা একটু খোঁজ-খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, একাডেমির গঠন ব্যাপারে বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাদুর স্যর জন অ্যাণ্ডারসন হ'তে আরম্ভ ক'রে ভারতবর্ষের বহু রাজা মহারাজা, জমিদার, ধনী, শিল্পী, শিল্পরসিক ব্যক্তির সহানুভূতি এবং সহায়তার অভাব না থাক্‌লেও একাডেমির সভাপতি মহারাজা বাহাদুর স্যর্ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল বসুর অপরিসীম পরিশ্রম উৎসাহ অর্থব্যয় ব্যতিরেকে এমন একটি বৃহৎ ব্যাপার গ'ড়ে তোলা কখনই সম্ভবপর হ'ত না।

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের অন্তর্গত সমস্ত শিল্প-গোষ্ঠীগুলিকে এক চন্দ্রাতপের তলে মিলিত ক'রে একটি নিখিলভারত শিল্প পরিষদ গঠিত করবার কল্পনা একটি বৃহৎ কল্পনা, এবং সেই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করবার সাহসকে দুঃসাহস বললেও বোধহয় নিতান্ত অসঙ্গত উক্তি করা হবেনা। মহারাজ বাহাদুরের ঐকান্তিক সহানুভূতি এবং বদান্যতা এবং শ্রীযুক্ত অতুল বসুর সমুদার গঠন-প্রতিভা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা এ বিষয়ে মণিকাঞ্চনের যোগের মত কার্য্যকরী হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ ক'রে পরস্পর-বিরোধী শিল্পসঙ্ঘ ও শিল্পগোষ্ঠী গুলিকে সম্বোধন ক'রে শ্রীযুক্ত অতুল বসুকে বলতে হয়েছিল, "এস, এস, তোমরা সকলে আমাদের সার্ব্বজনীন



The One Imused
শ্রীঅতুল বসু

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র



আমরা ত্রয়ী (We are three)
শ্রীঅতুল বসু

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র
মহারাজা বাহাদুর স্যর্ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের
সদয় অনুমতি ক্রমে

চন্দ্রাতপের তলে। এখানে ভেদ নেই বিরোধ নেই, দ্বন্দ্ব নেই কলহ নেই। এখানে সকলেরই সমান আসন, সকলেরই সমান আদর।" অতুল বসুর আন্তরিকতা এবং সহৃদয়তা সকলকে স্পর্শ করেছিল, এবং তাঁর ভদ্রতার প্রতি আস্থাবান হ'য়ে সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে'ছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বৈরিতার সর্প যে একেবারে ফণা তোলেনি তা নয়, কিন্তু শেষ পর্যান্ত দংশন করতে সক্ষম হয়নি।

Royal Academy ইংলণ্ডের যেরূপ গৌরবের বস্তু, আমাদের Academy of Fine Arts-কে দাঁড় করাতে পারলে এ-ও ভারতবর্ষের সেইরূপ গৌরবের সামগ্রী হবে। কিন্তু এই সদ্যোজাত প্রতিষ্ঠান-শিশুটি অন্নবস্ত্রের দৈন্যে যাতে পঙ্গু না হ'য়ে যায় তার জন্য গভর্মেণ্ট হ'তে আরম্ভ ক'রে দেশের রাজা মহারাজা এবং সর্ব্বসাধারণের একান্ত সহানুভূতি এবং আনুকূল্যের প্রয়োজন। সকল প্রকার বাৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থের একটি পাকা ব্যবস্থা না থাকলে এরূপ একটি ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অসম্ভব। মহারাজা বাহাদুর এবং অতুলবাবুর প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি চিরকাল চল্‌বে এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়। ইংলণ্ডের রয়াল অ্যাকাডেমির বিষয়ে Sir Joshua Reynolds যে কার্য্য করেছিলেন, ভারত শিল্প পরিষদের বিষয়ে এঁরা দুজন ঠিক সেই কার্য্যই করেছেন। এঁদের দ্বারা পরিষদটি প্রসূত হয়েছে, কিন্তু পরিষদকে পালিত করবার কর্ত্তব্য শুধু এঁদের নয়। একটি মাত্র ব্যক্তি একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান প্রসব করতে পারেন, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকত্ব এবং লালন-পালনের ভার সমষ্টির উপর ন্যস্ত না হ'লে বিপদ। একাডেমির Executive Committee, Working Committee প্রভৃতি অবশ্য গঠিত হয়েছে, কিন্তু পরিচালনার জন্য উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা না থাকলে কমিটির দ্বারা কোনো কার্য্য সম্পন্ন হ'তে পারেনা। সুতরাং এ পর্য্যন্ত যদি না হ'য়ে থাকে তা হ'লে অবিলম্বে একাডেমির একটি যথোপযুক্ত অর্থভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া উচিত। এ অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করতে হবে (১) Government Grant (২) Corporation Grant (৩) দেশের রাজা মহারাজাদের নিকট হ'তে এককালীন প্রাপ্ত চাঁদায় গঠিত



অলঙ্কার
শ্রীললিতমোহন সেন

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র



গঙ্গাস্নানের পর
শ্রীসতীশ সিংহ

ফটো সোসাইটি কর্তৃক ছায়াচিত্র
পাতিয়ালা মহারাজাধিরাজের সদয়
অনুমতিক্রমে

(১) প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিল্পধারা নির্ব্বিশেষে যে সকল বিভিন্ন কলাসঙ্ঘ বর্ত্তমান আছে সে-গুলিকে একটি বিশ্বশিল্পচেতনা-উদ্বুদ্ধ সার্ব্বজনীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিলিত করা।

(২) প্রতিবৎসর একটি সাম্বৎসরিক শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারা পুরস্কার বিতরণাদির সাহায্যে শিল্পীগণের মধ্যে শিল্প-প্রেরণা বর্দ্ধিত করা। সে হিসাবে গত প্রদর্শনী বিশেষ ভাবে সফলতা লাভ করেছিল। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও প্রদর্শনীতে দেশের রাজামহারাজাগণ কর্ত্তৃক এত অধিক সংখ্যক পুরস্কার প্রদত্ত হয় নি।

(৩) দরিদ্র নিরালম্ব শিল্পীগণকে সাহায্য করা।

Reserve Fund (৪) দেশের ধনীব্যক্তিদের নিকট হ'তে প্রাপ্ত বার্ষিক চাঁদা প্রভৃতির দ্বারা। এ অর্থ-ভাণ্ডারের আয় এরূপ হওয়া উচিত যদ্দারা একাডেমির বার্ষিক ব্যয়ের বজেট্ অনায়াসে নির্ব্বাহ হ'তে পারে। আমরা সঠিক জানিনা একাডেমির অর্থভাণ্ডারের ব্যবস্থা উপযুক্ত-ভাবে হয়েচে কি-না। আশা করি কমিটি সে বিষয়ে উদাসীন নেই।

প্রধানতঃ যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে একাডেমি স্থাপিত হয়েচে সে-গুলি সংক্ষেপে এইরূপ বলা যেতে পারে।



বিশ্রাম
শ্রীসতীশ সিংহ

ফটো সোসাইটি কর্তৃক
ছায়াচিত্র

(৪) সকল শ্রেণীর শিল্পীগণের জন্য একটি মিলনী (club) স্থাপিত করা।

(৫) সাধারণ এবং সর্ব্বতোভাবে শিল্প ও শিল্পীগণের মঙ্গল সাধন করা।

আমরা যতদূর অবগত আছি, উপরোক্ত কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে অন্ততঃ দ্বিতীয়টি একাডেমি পালন করতে আরম্ভ করেছেন, এবং আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিলাতে India Society of London-এর উদ্যোগে আধুনিক ভারতীয় শিল্প বিষয়ে যে প্রদর্শনী হবে তা'তে বাঙ্গলা এবং অন্যান্য প্রদেশের শিল্পীদের শিল্পসামগ্রী নির্ব্বাচিত এবং প্রেরণ ক'রে একাডেমির পঞ্চম সংখ্যক কর্ত্তব্যের পালন বিষয়েও সচেষ্ট হয়েছেন।



চারণ (The Ballad Singer)
ভি, এ, মোলি

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র
পাতিয়ালা মহারাজাধিরাজের সদয়
অনুমতিক্রমে

ইংলণ্ডের National Art Gallery (Tate Gallery) প্রভৃতির অনুকরণে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লীতে একটি ভারতীয় National Art Gallery প্রতিষ্ঠার চিন্তা দেশের শিল্পরসিক ব্যক্তিদের মনে কিছুদিন থেকে জেগেছে। এ চিন্তা এখনো অবশ্য বায়বীয় নভোমণ্ডলের রাজ্যেই বিচরণ করছে, জল-স্থলের সুনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে ঠিক অবতরণ করেনি। কিন্তু করা উচিত, এবং অচিরকালেরই মধ্যে কোনো দিন হয়ত করবে।

কোনো জাতির শিল্প সৃষ্টি যখন উৎকর্ষে এবং সংখ্যায় বেড়ে ওঠে, তখন সে-গুলির মধ্য থেকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নমুনাগুলিকে সংগ্রহ ক'রে সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য কলাভবনে স্থাপন এবং রক্ষণ না করলে জাতির স্বরূপকে খর্ব্ব করবার প্রত্যবায় হয়। সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি ললিতকলার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে জাতির মানসতা, চিন্তাভঙ্গী, পরিকর্ষ (culture) প্রভৃতি পরিব্যক্ত হয়। একজন বিদেশীর নিকট কোনো জাতির পরিচয় সে জাতির সাহিত্য এবং শিল্প। সুতরাং কলাভবন স্থাপনার দ্বারা শিল্প সামগ্রী সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে জাতীয় স্বরূপ খর্ব্ব করবার প্রত্যবায় হবে তাতে সন্দেহ কি? ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে কোনো জাতির মধ্যে যখনই এই সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি হয়েছে তখনই সেই জাতির প্রচেষ্টায় Art Gallery দেখা দিয়েছে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রচেষ্টা যাতে ধীরে ধীরে সুদীর্ঘকাল ধ'রে ধূমায়িত না হয়ে এক দিক থেকে একটা প্রেরণা লাভ ক'রে হঠাৎ খানিকটা জলে উঠ্‌তে পারে সে জন্য একাডেমি অফ্‌ ফাইন্‌ আর্ট্‌স্‌ একটা কৌশল অবলম্বন করতে উদ্যত হয়েচেন বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। ভবিষ্যতের কল্পিত দিল্লী কলাভবনের যে ইমারৎ প্রস্তুত হবে তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নক্সা যে শিল্পী অঙ্কিত করে দেবেন তাঁকে একাডেমি কর্ত্তৃক একটি সুবর্ণপদকযুক্ত অর্থ পুরস্কার প্রদত্ত হবে। এবং সেই নক্সাটি আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হবে।



পাকশালা
শ্রীঅজিতনাথ গুপ্ত



বিদায় ব্যথা
শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

এ কথা অবশ্য বলা বাহুল্য যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নক্সাটি একাডেমির বিবেচনায় উৎকর্ষ্যের যথোচিত স্তরে উপনীত হলে তবে গৃহীত এবং পুরস্কৃত হবে। ঈপ্সিত দিল্লী কলাভবনের অজ্ঞাত Building Committee এ নক্সাটি ইচ্ছামত গ্রহণ করতেও পারেন, না করতেও পারেন। তবে চাবুক দেখ্‌লে ঘোড়া ক্রয় করবার প্রবৃত্তিটা একটু তাড়না লাভ করতে পারে, একাডেমি মানব-মনের এই নিগূঢ় তত্ত্বটির সুযোগ গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েচেন। প্রতিযোগিতায় প্রবেশেচ্ছু শিল্পীগণ এ বিষয়ে সঠিক সংবাদাদির জন্য একাডেমির কার্য্যালয় মিউজিয়াম গৃহে আবেদন করতে পারেন।

আমরা বলি, এ সব কলা-কৌশলের অপেক্ষা না করে একটি National Art Gallery স্থাপনার জন্য অবিলম্বে লেগে পড়া যাক্‌। কার্য্যের সূত্রপাতই হচ্চে কার্য্যের অর্দ্ধেক শেষ করে ফেলা। অনিশ্চিত ভবিষ্যতে যেদিন সুযোগ বিরাট মূর্ত্তিতে দেখা দেবে, উদার আনুকূল্যে

রাজকোষ যেদিন উন্মুক্ত হবে, সেদিন একেবারে বৃহৎ আকারে একটি জাতীয় কলাভবন প্রতিষ্ঠিত করব।—দিল্লী যদি সেই সুবর্ণ দিবসের অপেক্ষায় থাকে ত থাক্, ইত্যবসরে বাঙলা দেশে আমরা একটি Bengal National Art Galleryর ভিত্তি স্থাপন করি। সে ভিত্তির উপর এক দিন যে-সৌধ শেষ হবে তার কল্পনা খুব বিরাট করেই করব, কিন্তু তার সূচনা ছোট করে করলে কোন ক্ষতি নেই।

ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে গতিই হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। Tate Galleryর বিপুল সংগ্রহ ছাড়া লণ্ডনের National Galleryর বর্ত্তমান সংগ্রহ প্রায় ১৭৫০টি ছবি। কিন্তু এ ছবিগুলির একটিও সামান্য ছবি নয়, প্রায় সবগুলিই চিত্রশিল্পের চরম নিদর্শনের বস্তু। নিম্নোদ্ধৃত লেখা থেকে National Galleryর চিত্র-সম্পদের মূল্য কতকটা অনুমান করা যাবে। "The Gallery is unexcelled in the uniformly high quality of its pictures, and the number of masterpieces it posseses. Nowhere outside Italy is the Italian School so admirably represented, nor outside Holland, the Dutch School; while the collections of Flemish, Spanish, German and French work, though small, are very choice. The group of English paintings is without an equal. Among the most famous paintings in the gallery are those by Duccio, Masaccio, Piero della Francesca (here represented by an unrivalled group), Leonardo da Vinci ("Madonna of the Rocks"), Michelangelo (notably "the Entombment"), Raphael (including the famous "Anisidei Madonna"), Correggio, Mantegna, Giovanni Bellini, Titian, Tintorretto, Jan Van Eyck ("John Arnolfini and His Wife"), Rubens, Rembrandt, De Hooch, Ruisdael, Velasquez,



তিব্বতীয় ভিক্ষুক
শ্রীসারদাচরণ উকিল

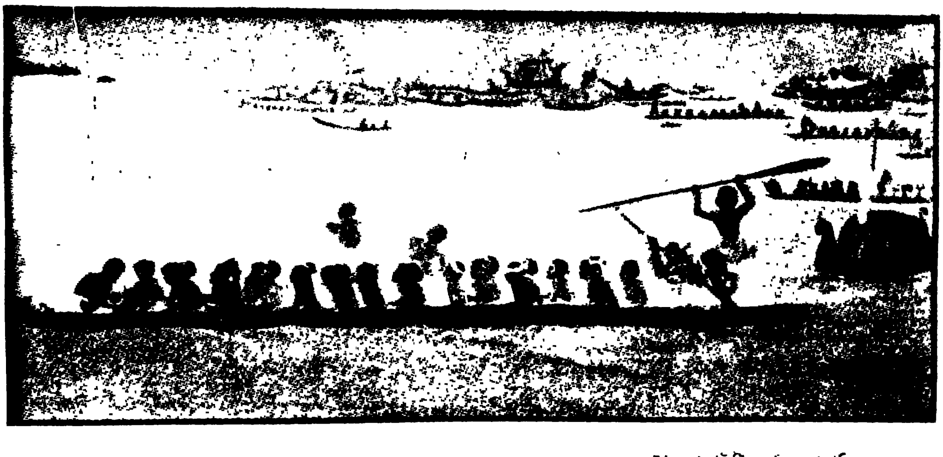
Holbein, Reynolds, Constable and Turner." এই হ'ল অতি-সমৃদ্ধ ন্যাশনাল গ্যালারির বর্তমান অবস্থা যা জগতের সমস্ত শিল্পরসপিপাসুগণের শ্রদ্ধা এবং আনন্দ সঞ্জাত করতে সমর্থ হয়েচে; কিন্তু ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জে, জে, অ্যাঙ্গারষ্টীনের চিত্র সংগ্রহ থেকে মাত্র ৩৮খানি চিত্র ক্রয় ক'রে এর সূত্রপাত হয়! এত বড় বিশাল বারিধির উৎস গোমুখীর এই শীর্ণ ধারায়।

অতএব, বাঙ্গলা দেশ দরিদ্রের দেশ, এ দেশে এত বড় বড় রাজামহারাজা নেই যাদের আনুকূল্যে কলাভবনের মত একটা ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা যেতে পারবে, এই সকল অলীক দুশ্চিন্তা মনে মনে পোষণ ক'রে পশ্চাদ্‌পদ হবার কোনো কারণ নেই। বাঙ্গলা দেশ আর কিছুর দেশ না হোক শিল্পকলার দেশ। এখানকার অধিবাসিগণের নিত্যকার জীবন-যাপনের সঙ্গে শিল্প ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে। দেবমন্দিরের গাত্র থেকে আরম্ভ করে নবজাত শিশুর কাঁথাটি পর্যন্ত কোনো জিনিসই শিল্প-সুষমার প্রলেপ থেকে এখানে বঞ্চিত নয়। তা ছাড়া, অন্য অনেক বিষয়ে সম্প্রতি নেতৃত্ব হারালেও শিল্প বিষয়ে বাঙ্গলা দেশ এখনো ভারতবর্ষের নেতৃত্ব অধিকার ক'রে আছে! ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গলার শিল্পী-সন্তানেরা এখনো অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত। সমুদ্র পারের বহু দূরবর্তী দেশ সমূহে ভারতবর্ষের Bengal School-এর শিল্প খ্যাতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করছে। সুতরাং অধিকারের দিক থেকে বিচার করলে বাঙ্গলা দেশের Na-



ঠাকুমার আদরে
শ্রীরাসবিহারী দত্ত

ফটো সোসাইটি কর্তৃক ছায়াচিত্র
শ্রীযুক্ত বি, সি, সেন, আই, সি, এস, মহাশয়ের সদয় অনুমতিক্রমে



বাচখেলা
শ্রীঅসিতকুমার রায়

ফটো সোসাইটি কর্তৃক ছায়াচিত্র

tional Galleryর দাবী ভারতবর্ষের আর অন্য কোনো প্রদেশেরই চেয়ে কম নয়। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের মত সুবৃহৎ দেশে একাধিক কলাভবন থাকাই উচিত। সুতরাং যথা সময়ে দিল্লীর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবার পক্ষেও কোনো বাধা নেই।

আমার মনে হয়, বাঙ্গলা দেশের বিদ্যোৎসাহী ললিত-কলানুরাগী জনপ্রিয় পৃষ্ঠপোষক মহারাজ বাহাদুর স্যর প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর যদি হাল ধ'রে বসেন, এবং প্রতিভান্বিত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অতুল বসু তাঁর জনকয়েক সহকর্ম্মী নিয়ে দাঁড়ে ব'সে যান, তা হ'লে সফলতার কূলে অবতীর্ণ হওয়া খুব কঠিন হবে না। তাঁরা অগ্রণী হ'লে দেশের ধনী এবং কর্ম্মী সম্প্রদায় নিশ্চয় তৎপর হবেন।



সরলতা (Innocence)
জি, এস, হলদঙ্কর

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র

বাঙ্গলার দৈন্য এবং অভাবের আজকাল পরিসীমা নেই। বাঙ্গলার উপর থেকে রাজানুগ্রহ অপসৃত হওয়ার পর বহু জিনিসই বাঙ্গলার বাহিরে চলে গিয়েছে,—কেবল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একেবারে অনড় বলে এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নিয়ে ট্যাগ্ অভ্ ওয়ারে আমরা উপস্থিত জিতে গিয়েছি তাই এ দুটি জিনিস এখনো বাঙ্গলায় অবস্থান করছে। দিল্লীর পুষ্টি সাধন করবার জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে। বাঙ্গলার কিন্তু কেউ নেই। বাঙ্গলার জ্ঞাতি-প্রদেশগুলি এখন বাঙ্গলার দুর্দ্দিনে বাঙ্গলার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, সুতরাং দিল্লীর পুষ্টি-সাধনের জন্য বাঙ্গলার অথবা বাঙ্গালী শিল্পীর তৎপর হবার এমন কোনো প্রয়োজন নেই।

কথাটা হয়ত শুন্‌তে খারাপ লাগ্‌ল। কিন্তু বস্তুতঃ কথাটা কেন খারাপ নয়, সে কথা প্রমাণ করতে হ'লে এমন অনেক কথা বলবার প্রয়োজন হবে যা শুন্‌তে আরো খারাপ লাগ্‌বে। প্রাদেশিকতা সঙ্কীর্ণ বস্তু, এবং বিশ্বজনীনতা উদার সামগ্রী, সেকথা মানি,—কিন্তু দেহধারণের এই সুকঠোর প্রতিযোগিতার বাজারে যে ব্যক্তি বিশ্বজনীনতা ক'রে বেড়ায় সে বুদ্ধিমান নয়। একথা উদ্ধতম লীগ্ অভ্ নেশন্স্ থেকে আরম্ভ ক'রে নিম্নতম গৃহ-পলিটিক্স্ পর্য্যন্ত সমস্ত সঙ্ঘযৌথ ব্যাপারে খাটে। লীগ অভ্ নেশন্সের যখন বৈঠক বসে তখন বোঝা যায় লীগ্ মানে আত্মরক্ষা; দেখা যায় বিভিন্ন নেশনগুলি নিজ নিজ বেদনায় হস্তার্পণ ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে ব'সে আছে; অর্থটা,—তোমার সুবিধায় ভাগ বসিয়ে আমার অসুবিধা দূর হোক। যে ভদ্র, যে ভালো মানুষ, বিশ্বজনীনতায় যার প্রাণ হিল্লোলিত, সে নিজ সম্পদের ভাগ অপরকে দিয়ে

আসে; যে তোখড়, চতুর সে অপরের বোঝা পিঠে ঝুলিয়ে নিজ গৃহে প্রবেশ করে। সুতরাং বিশ্বজনীনতা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এখন স্থগিত থাক্।

বাঙ্গলায় Art Gallery স্থাপনের পক্ষে হয়ত কেহ কেহ আপত্তি করতে পারেন যে, বাঙ্গলায় যখন কলিকাতা গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের সংলগ্ন একটি চিত্রসংগ্রহ এবং শান্তি-নিকেতনে বিশ্বভারতী কলা-ভবন রয়েছে তখন আবার একটি নূতন Art Gallery



আবর্জনার গাড়ি
শ্রীগোবৰ্দ্ধন আশ

ফটো সোসাইটি কর্তৃক
ছায়াচিত্র

না ক'রে ঐ দুটি শিল্পভবনেরই উন্নতিসাধন করা যেতে পারে। এ কথার বিস্তারিত উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করিনে, কারণ, ঐ দুটি কলাভবনই দুটি শিক্ষায়তনের সহিত সংলগ্ন, সুতরাং ঐ দুটি শিক্ষায়তনের ধারা এবং



হাটের দিন (Market Place)
শ্রীতারকনাথ বসু



সেণ্ট পল্‌স কেথিড্রাল—কলিকাতা
মিসেস্ কে, বিশপ

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র

উত্থান-পতনের সহিত আবদ্ধ। একটি স্বতন্ত্র সার্ব্বজনীন এবং সহজে সাধারণের অধিগম্য শিল্পাগারের অভাব ঐ দুটি শিল্পভবনের দ্বারা কখনই পূর্ণ হ'তে পারে না।

Academyর নাম সম্বন্ধে আমার সামান্য একটু বক্তব্য আছে। নামটি Academy of Fine Arts, Calcuttaর পরিবর্ত্তে Calcutta Academy of Fine Arts হ'লে ভাল হ'ত। তাহ'লে অচিরকালের মধ্যে নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে Calcutta Academyতে দাঁড়াত। এবং Calcutta Acamyde ব'লে অভিহিত হ'লে পৃথিবীর যে-কোনো স্থানের লোকই অবিলম্বে Academyর গোত্র পরিচয় বুঝ্তে পারত। Academy of Fine Arts বল্‌লে একাডেমিটি যে কলিকাতার সম্পদ তা ভারতবর্ষের বাইরের কোনো লোকই বিনা পরিচয়ে বুঝ্তে পারবে না।

একাডেমির প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্চে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিল্পধারা নির্ব্বিশেষে যত বিভিন্ন শিল্প-সংহতি আছে তন্মধ্যে কোনোটিকেই অস্বীকার না করা, এবং বাৎসরিক কলা-প্রদর্শনীতে সকল প্রকার শিল্পের প্রবেশ পথ অব্যাহত রাখা। এই কথাটাই হয়ত দৃঢ়ভাবে মহারাজ বাহাদুর স্যর প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে বলেছেন—"We want to break away from



নির্ব্বাক গীতি
শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

old stereotyped traditions and this is a task which the Academy has undertaken."

কিন্তু, to break away from old stereotyped traditions কথার অর্থ যদি এই হয় যে, বিভিন্ন শিল্প-সংহতির (schools) শিল্প-ধারার যে বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলির প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে একটি বিরাট অঙ্গনে সবগুলিকে মিলিত অর্থাৎ মিশ্রিত করা, তা হ'লে তর্ক উঠ্‌তে পারে। শিল্পবস্তুর বিষয়ে সর্ব্বধারাসমন্বয় ব্যাপারটা

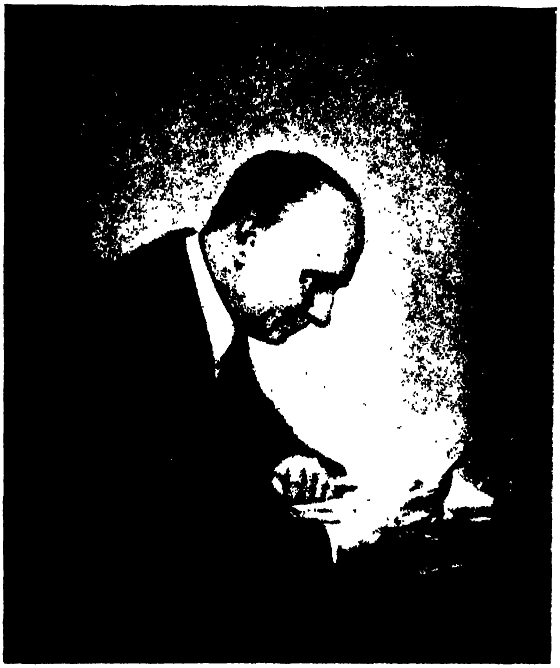


ছয়টি মুখমণ্ডল
শ্রীঅবনী সেন



বেদে
শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

পাতিয়ালা মহারাজাধিরাজের সদয় অনুমতিক্রমে



মিঃ পারসি ব্রাউন
শ্রীরসময় ভটাচার্য্য

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র
শ্রীযুক্ত পারসি ব্রাউনের সদয়
অনুমতিক্রমে

এবং টেকনিক্ মানেই আর্ট। একজন প্রতিভান্বিত শিল্পী নূতন নির্ম্মাণ-কৌশল উদ্ভাবন করে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রতিভার শিল্পীগণ সেই নির্ম্মাণ-কৌশলকে অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। এইরূপে ক্রমশঃ একটি নূতন শিল্প-সংহতির (school-এর) সৃষ্টি হয়। সুতরাং একটি শিল্প-সংহতির ধারাকে ভেঙ্গে দেওয়া মানে একটি বিশিষ্ট শিল্প-প্রণালীর বিলয় সাধন করা। কাজে কাজেই প্রচলিত সমস্ত শিল্প-সংহতির ধারা এবং পারম্পর্য্য নষ্ট ক'রে একটি মিশ্রিত ধারার সৃষ্টি করলে শিল্পজাত বস্তুর বৈচিত্র্য নষ্ট করা হবে। Western School-এর বটিচেলি অথবা রেমব্রাঁর চিত্রের শক্তি এবং গভীরতা আমাদের মনোহরণ করে, এবং Far Eastern School-এর কিওনাগা অথবা মাতাবির চিত্রের লঘু সূক্ষ্মতাও আমাদিগকে কম আনন্দ দেয় না। কিন্তু এই বহু-বিভিন্ন দুটি শিল্পধারাকে ভগ্ন ক'রে উভয়ের মিশ্রণে একটি নূতন শিল্পধারা সৃষ্টি করলে দুটি বিশিষ্ট শিল্প ধারাই হারাতে হবে এবং নূতন সৃষ্টি যেটি হবে সেটি হয়ত' হবে—'না রাম, না রহিম'।

মঙ্গলজনক নয়—কারণ বৈচিত্র্য শিল্প-বস্তুর প্রাণ। একই উপাদানে কিন্তু বিভিন্ন প্রস্তুত-প্রণালীতে গঠিত বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য আসে প্রস্তুত-প্রণালীর বিভিন্নতার জন্য। এই প্রস্তুত-প্রণালীই technique,



গর্দ্দভ
শ্রীঅবনী সেন

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র

কিন্তু তাই ব'লে এমন কথাও আমি বলিনে যে, দুটি বিভিন্ন শিল্প-ধারার মিশ্রণে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পবস্তুর সৃষ্টি হ'তে পারে না। পারে নিশ্চয়, কিন্তু সে মিশ্রণ রাসায়নিক compound হওয়া চাই,

mixture হ'লে চলবে না। তার মধ্যে মিলনের সুসমঞ্জসতা, সুতরাং শিল্পরসের আনন্দ, যেন থাকে। অর্থাৎ, সৃষ্টি যেন হয়। গত ডিসেম্বর মাসের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত যে ছবিগুলির প্রতিলিপি বর্ত্তমান প্রবন্ধে মুদ্রিত হ'ল সে ছবিগুলির সংক্ষিপ্ত জাতি-নির্ণয় ক'রে দেখলে আমার একথা সপ্রমাণ হবে।

১নং চিত্রখানি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের 'নটীর পূজা।' এ ছবিতে ভারতীয় পদ্ধতির সহিত Far Eastern Method (জাপান, চীন প্রভৃতি দেশের পদ্ধতি) মিশ্রিত আছে ব'লে মনে হয়। ৩নং ছবি শ্রীযুক্ত অতুল বসুর "The One I Missed" ইয়োরোপীয়ন ফ্রেঞ্চ পদ্ধতিতে অঙ্কিত। ৪নং চিত্রে (We Are Three) শ্রীযুক্ত অতুলবাবু Dutch এবং French যুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ৫নং চিত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনের "অলঙ্কার" আধুনিক ইয়োরোপীয়ান Matt Oil-painting School-এর দ্বারা প্রভাবিত। ৬নং চিত্র "স্নানের পর" শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহের ইয়োরোপীয়ান পদ্ধতির নমুনা। ৭নং "বিশ্রাম" চিত্রে



মুখমণ্ডল
শ্রীঅবনী সেন

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র

শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহ ইয়োরোপীয়ান ফ্রেঞ্চ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। শ্রীযুক্ত ভি, এ, মোলির ৮নং চিত্র "চারণ" ইতালীয় পদ্ধতির নিদর্শন। ৯নং চিত্র শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্তের "বিদায় ব্যথায়" ভারতীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে—কিন্তু বঙ্গদেশীয় পদ্ধতি নয়। ১০নং চিত্র শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্তর "পাকশালা" বঙ্গদেশীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত। ১১নং চিত্র শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিলের "তিব্বতীয় ভিক্ষুক" প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মিশ্র পদ্ধতি। ১২নং চিত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দত্তের "ঠাকুরমার আদরে" Dutch পদ্ধতিতে অঙ্কিত। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার রায়ের ১৩নং চিত্র "বাচখেলায়" জাপানীয় প্রভাব পরিস্ফুট। ১৪নং চিত্র শ্রীযুক্ত জি, এস, চলদঙ্করের "সরলতা" ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত। শ্রীযুক্ত গোবৰ্দ্ধন আশের ১৫নং চিত্র "স্ক্যাভেঞ্জার গাড়ি" সাধারণ ইয়োরোপীয় ভঙ্গীতে অঙ্কিত। ১৬নং চিত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ বসুর "হাটের দিন" ভারতীয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে অঙ্কিত। ১৭নং চিত্র মিসেস কে, বিশপের "কলিকাতা কেথিড্রালে" ইয়োরোপীয় পদ্ধতির সহিত জাপানীয় প্রভবা



মুখমণ্ডল
শ্রীগোবৰ্দ্ধন আশ

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র

মিশ্রিত। ১৮ নং চিত্র শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহের "বিনা কথার গান" ডচ্ এবং ইংলিশ্ স্কুলের নমুনা। শ্রীযুক্ত অবনী সেনের ১৯নং চিত্র "ছয়টি মুখমণ্ডল" ফ্রেঞ্চ এবং বৃটিশ্ পদ্ধতিতে অঙ্কিত। ২০নং চিত্র শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশের "বেদে" ভারতীয় এবং ফ্রেঞ্চ পদ্ধতির মিশ্রণ। ২১নং চিত্র শ্রীযুক্ত রসময় ভট্টাচার্য্যের "মিঃ পর্সি ব্রাউন্" বৃটিশ পদ্ধতির নিদর্শন। ২২নং চিত্র শ্রীযুক্ত অবনী সেনের "গৰ্দ্দভ" ইয়োরোপীয়ান্ পদ্ধতিতে অঙ্কিত। ২৩নং চিত্র শ্রীযুক্ত অবনী সেনের "বৃদ্ধের মুখমণ্ডল" বৃটিশ পদ্ধতির নিদর্শন। ২৪নং চিত্র শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশের "বৃদ্ধের মুখমণ্ডল" ফ্রেঞ্চ স্কুলের নিদর্শন।

সুতরাং উপরোক্ত তালিকা থেকে এবং গত প্রদর্শনীর চিত্র নির্ব্বাচনের পদ্ধতি থেকে এ কথা স্পষ্টই মনে হয় যে, "to break away from old stereotyped tradition" অর্থে মহারাজা বাহাদুর এই কথাই বল্‌তে চেয়েছিলেন যে, আমরা পুরাতন ঐতিহ্যের গোঁড়ামি ভেঙ্গে এসে সকল সংহতির শিল্পকলা বরণ করব।

নবজাত একাডেমির কথা সর্ব্বসাধারণের মনে নূতন ক'রে জাগিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে বর্ষ পূর্ণ হবার কিছু পূর্ব্বেই আমরা এ প্রবন্ধে গত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত করলাম। এবার এ সংখ্যায় প্রকাশিত "হাটের দিন" নামক রঙিন ছবিটিও গত প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। তা ছাড়া, গত ফাল্গুনের বিচিত্রায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহের রঙিন ছবি "কুটীর পুঞ্জ", গত চৈত্রে প্রকাশিত Capt. F. C. W. Fosebery কর্ত্তৃক অঙ্কিত রঙিন ছবি "Surrey Hills" ও গত বৈশাখে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্ত অঙ্কিত "পাকশালা"—একাডেমির প্রদর্শনী হ'তেই পাওয়া গিয়েছিল।

এই সমস্ত ছবিগুলি বিচিত্রায় প্রকাশিত করবার অনুমতি সংগ্রহ ক'রে দেবার জন্যে আমরা শ্রীযুক্ত অতুল বসু মহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



সহযোগী সম্পাদক ও তাঁহার সহকর্ম্মীবৃন্দ

দাঁড়াইয়া (বাম হইতে) (১) শ্রীযুক্ত অবনী সেন (২) শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশ (৩) শ্রীযুক্ত বিমল দে (৪) শ্রীযুক্ত জহর সেন (৫) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় (৬) শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত

বসিয়া (বাম হইতে)—(১) শ্রীযুক্ত এস, এন্, দে (২) শ্রীযুক্ত অতুল বসু (সহযোগী সম্পাদক) (৩) শ্রীযুক্ত অমিয় বসু



বর্ষা-মঙ্গল

বিরহ-বিলাস

আজি তুমি কাছে নাই। বুঝি তাই নবমেঘে নভতল মলিন মেদুর ;
দেয়া ডাকে রহি' রহি' ; কেয়াবনে বায়ুমুখে কাঁদি ফেরে কুসুম-কেশর ;
বিজুরী-চমকে ভাসে স্মরণের অন্তহীন কূলে—আরেক শাওন-স্মৃতি
মধুমিলনের। অতীত তিথি সে মোর, তবু তারে ঘিরি' মানস-মধুপ
ফিরে মাধুকরী করি'। আজো তো বাদল-বেলা, সে-শাওন বাজায় নূপুর;
মাটির সোঁদাল গন্ধ, মুহুমুহু দামিনী-ঝলক্, উন্মাদিনী সে-প্রকৃতি,—
সেই তো সকলি আছে ; তুমি শুধু কাছে নাই মোর। তোমার স্মৃতির ধূপ
জ্বলে মোর মানসগহনতলে,—আন্দোলিয়া তোলে বুকে অশ্রুর সায়র।

তবু এ মিনতি মোর,—আজি কাছে আসিয়ো না ; এ দুঃসহ বিরহ-উৎসবে
তোমারে চাহি না, প্রিয় ! আজিকার রিক্ততায় ব্যথাপাংশু অধীর অধরে
নামুক্ করুণ ক্লান্তি শ্রান্ত শ্রাবণের মত ; নিদ্রাহীন নয়নে ও নভে
অবিরাম ঘনাক্ কুহেলি-ঘোর ; আত্মা আর্ত্তনাদ করি' করুক কামনা
তব দেহপরশ মদির ;—তবু তুমি আসিয়ো না কাছে। এ ব্যথা-বাসরে
প্রিয় ! আজি মোর অশ্রুপূত বিরহ-বিলাস !—অভিনব প্রেম-উপাসনা !

শ্রীনীলিমা দাস

অভিমানিনী

বেলা কি আজ অমনি কেটে যাবে ?
আনত মুখে রইলে ও কি ভাবে ?
নয়ন কোল একটু যেন ফোলা,
খোঁপাটি কেন এলানো আধখোলা,
অধরে কই চোরা সে হাসিদোলা,
চাপা নিশাসে উরস কেন কাঁপে ?
নভনীলিমা মেদুর ঘনমেঘে,
পূবী অধিয়া, বাদল ঝরে বেগে।
তোমারো কেশে কোথায় পরিমল,
বেশে কোথায় নবনীরদ-ঢল,
কাজলে কেন আঁকোনি আঁখিতল,
বাণীর পূজা কই সে বীণারাবে ?
খনে খেলিছে কপালে কালোরেখা,
সমুখে ও কী, আধেক লিপিলেখা !
গৃহের দশা দেখো ভূতল ত্যেজে'
জলের ছাঁটে ভিজিয়া যায় মেঝে,
তোমারে আজি বুঝানো দায় সে-যে,
—বিফল হয়ে কী ফল তুমি পাবে ?

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

ভাঙন

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

কালো মুখের উপর বসন্তের দাগগুলি ঘোরালো ভাবে চ'খে পড়ে। দূর হইতে মনে হয়, কবে বুঝি অগ্নিদেবের ভর হইয়াছিল। কাশফুলের মত শাদা চুল,—ছোট করিয়া ছাঁটা। মাঝখানে ঈষৎ-দীর্ঘ একটা টিকি আছে। শুনা যায়, আশ্বিনের বড় ঝড়ে যেবার গাছপালা ঘর বাড়ী ভূমিসাৎ হয়,—সেইবার আমকুশি গ্রামে তাঁর আবির্ভাব! আসিয়াছিলেন,—গুটিকয়েক হোমিওপ্যাথি শিশি লইয়া ডাক্তারি করিতে। মাটিতে রস ছিল, আর গ্রামে ফেরার সুযোগ হয় নাই। ইদানীং বছর দশেক ব্যবসাটি ছাড়িয়া দিয়াছেন। বসিয়াই থাকেন, ডান পাটা বাতে মাঝে মাঝে কন্‌কন্ করিয়া উঠিলে লাঠি ধরিয়া বারান্দার উপর ধীরে ধীরে পা চালান। চ'খের দৃষ্টি প্রখর। বয়সের গুণে একবার ছানি পড়ে,—তোলার পর দিব্যদৃষ্টি পাইয়াছেন। ছেলেদের পুরস্কার-বিতরণী-সভায় ষোল পাতার সুদীর্ঘ রিপোর্টটি সকলের সম্মুখে ফর্ ফর্ করিয়া পড়িয়া যান। স্থান-কাল ভুলিয়া ছেলেরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসে—বয়স্কদের কর্ণমূল আরক্ত হয়। কিন্তু দোষটা অম্বুধরের নিজের নয়, দোষ তাঁর বার্দ্ধক্যের,—কিছুদিন আগে সবগুলি দাঁতই বৃদ্ধের নির্ম্মূল হইয়াছিল!

অম্বুধর সেক্রেটারি! ইস্কুলটি যাঁদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত,—তাঁদের কেউ আজ জীবিত নাই। মাইনর এখন উচ্চ-ইংরাজিতে পরিণত! খড়ের আট্‌চালার স্থানে পাকা ইমারত খাড়া হইয়াছে। সম্মুখের খোলা মাঠের একধারে অনেকটা জায়গা অন্ধকার করিয়া যে বুড়া তেঁতুল গাছটি দাঁড়াইয়াছিল, সেটা আর দেখা যায়না! ছেলেরা সকাল সন্ধ্যায় খেলা করে। অম্বুধর অটল,—যুবাবয়সে একদিন যে পদটি তিনি পাইয়াছিলেন,—বার্দ্ধক্যে সেটি প্রাণপণে আঁক্‌ড়িয়া আছেন।

গ্রামের বনেদি জমিদার রতনবাবুর এককালে প্রতাপ ছিল। এখন প্রতাপ নাই—মর্য্যাদা আছে। কিছুদিন আগে অম্বুধরের বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে তিনি কাহার কাছে নাকি কি বলিয়াছিলেন,—কথাটা চাপা থাকে নাই। অম্বুধর সরাসরি রতনবাবুর কক্ষে আসিয়া দেখা দিলেন। পুরা অর্দ্ধঘণ্টা উচ্ছ্বাসের পর স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—এই ক'টা দিন যা দেরী, তারপর যা'কে ইচ্ছে ক'রো রতন,—চ'খ খুলেও আর দেখ্‌তে আস্‌ব না। ভূষণ কিন্তু চিনেছিল বুড়োকে ·· শুনবে সে কথা?—বলিয়াই সুরু করিলেন,—তোমরা তখন হ'য়েচ কি হওনি, একবার কিড্‌নী সাহেব এলেন ইস্কুল দেখ্‌তে। হেডমাষ্টার কিড্‌নীকে সঙ্গে করে ক্লাশে ঢুক্‌লেন! বিকাশ ইংরাজী পড়াচ্ছিলেন। সাহেবকে দেখে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লেন না, যেমন পড়াচ্ছিলেন তেমনি নির্বিকার পড়াতে লাগ্‌লেন। সাহেব রাগে গর্ গর্ কর্‌তে কর্‌তে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এলেন। হেড্‌মাষ্টারকে বল্‌লেন, তোমার ইস্কুলের 'এড্' যাতে ওঠে, তাই আমি কর্‌চি। হেড্‌মাষ্টার নিরুপায়, বুঝাতে গেলেন, সাহেব কি আর তাই শুনেন। খচ্ খচ্ ক'রে 'ভিজিটার্‌স্ বুকে' এক পাতা লিখে ফেল্‌লেন। দেখ্‌লাম, ইস্কুলটা ত যায়; গুটি গুটি কাছে এসে বল্‌লাম,—ইস্কুল আমাদের উঠুক সা'ব দুঃখ নেই, একবার দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে যদি,···সাহেব আমার 'ড্রইং রুমে' দেখা দিলেন। ঘরে ছিল গাছ পাকা মর্ত্তমান,—এঁরা মোটা আর কাঁচা সোনার রঙ্। এক ছড়া টেবিলে এনে দিতেই সাহেবের চ'খ দুটি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। খেয়ে শুধুলেন,—এ কলা এখানকার, বল্‌লাম, হাঁ৷ সাব, আমার বাগানের, মর্জ্জি হ'লে,···আপনার বাসায় আমি···; সাহেব আমাকে ঠিকানা দিয়ে ফের ইস্কুলে এলেন! বইএর যে পাতাটা লিখেছিলেন,—সেটা ছিঁড়ে লিখ্‌লেন :—

The school is nicely managed. The teachers are active and painstaking and

have a keen eye on the boys. The secretary is a loving gentleman. He spares no pains to turn the school into an ideal one.

কি বল্‌ব, পরের বছর 'এড্' হ'ল দেড়শ'। বুড়ো না থাক্‌লে কি হ'ত একবার ভাব দেখি বাবাজি।—অম্বুধর হাসিতে লাগিলেন।

রতনবাবু অপ্রতিভ কণ্ঠে বলিলেন,—না না, আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ আছে, না থাক্‌তে পারে!

ঘটনাটা বছর দশেকের!

মেহেদি গাছের বেড়ার পাশ দিয়া রাস্তা। ছোট্ট বারান্দা হইতে ঘাড় তুলিলেই ইস্কুলটা চ'খে পড়ে। বেড়া না থাকিলে ইস্কুল আর বারান্দা এক! মাঝে হাত কয়েক ব্যবধান মাত্র!

পুরাণো ইজি চেয়ারটায় গা ঢালিয়া দিয়া অম্বুধর কুড়্ কুড়্ করিয়া গড়গড়া টানেন। বিকালের দিকে সমাগমটা একটু বেশি। প্রথমে আসেন, বিধুবাবু,—তা'র পর রোহিণী পাঠক—আরও দুজন ছোক্‌রা ডাক্তার। সকলের শেষে আসেন হেড্‌মাষ্টার ত্রিলোচন রায়। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া গাঢ় একটি নমস্কার দিয়া ত্রিলোচন বারান্দায় উঠিতেই অম্বুধর বলেন,—এস আজ যে এত দেরি তোমার?

—হ্যাঁ, একটু হ'য়ে গেল,—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে একটি সলজ্জ মৃদু হাসিয়া পাশের বেতের চেয়ারটায় তিনি টুপ্ করিয়া বসিয়া পড়েন।

রোহিণী পাঠক আর বিধুবাবু বসেন পাশাপাশি। ডানহাতের দুটি আঙুল দিয়া পাঠকের ঘাড়টা একটু টিপিয়া দিয়া বিধুবাবু ইঙ্গিত করেন,—দেখলে,

—হুঁ, রোজই ত দেখ্‌চি, এ ত আর,···কথাটা শেষ না হইতেই পাঠক মধ্যপথে থামিয়া যা'ন। হেড্‌মাষ্টার চ'খ ফিরাইয়া একদৃষ্টে তাঁহারই দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া আছেন!

ত্রিলোচনের সম্বন্ধে এই ইঙ্গিতটার একটা হেতু আছে! বছর তিনেক পূর্ব্বে এই লোকটির কোন পাত্তা ছিলনা। শুনা যায়, পশ্চিমের একটি ইস্কুলে তিনি হেড্‌মাষ্টারি করিতেন। ছেলেদের সঙ্গে কি একটা বিষয় লইয়া তাঁর গোলমাল হয়। ব্যাপারটা গুরুতর। অবস্থা বুঝিয়া ত্রিলোচন চাকরি ছাড়িয়া রাতারাতি গৃহে ফেরেন। বিধুবাবু রোহিণী পাঠক ও আরও দুই চারি জন ব্যাপারটা লইয়া দিনকয়েক জল্পনা করেন,—কিন্তু ফল হয় নাই...এক অম্বুধরের জন্যই তিনি এত বড় চাকরিটায় বাহাল হইয়া গেলেন।

গড়গড়ার নলে গোটাকয়েক টান দিয়া অম্বুধর খাড়া হইয়া বসিলেন। কানের কাছে কিছুক্ষণ হইতে একটি মশক গুঞ্জন করিতেছিল। অম্বুধর সজোরে একটি তালি দিয়া বলিলেন,—দেখেচ ব্যাটার গুন্‌গুণানি...

কিন্তু মশক-প্রবর নিহত হইল না! একটু উড়িয়া আসিয়া চক্রাকারে তাঁহার মাথার উপর কীর্ত্তন সুরু করিল। ত্রিলোচন সন্তর্পণে উঠিয়া আসিয়া একটি তালি দিলেন। আঘাত অমোঘ!

—রক্ত কি রকম খেয়েচে, দেখুন দেখি একবার,—হাতটা ত্রিলোচন সবারই দিকে ফিরাইলেন।

বিধুবাবুর গুম্ফের পাশে হাসি ফুটিল। রোহিণী পাঠক সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, একটু কাশিতে কাশিতে বলিলেন,—পাজিতে এবার উৎপাতটাও লিখেচে বেশি! ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আর কি...

বিধুবাবু গম্ভীর কণ্ঠে সাড়া দিলেন,—দেশ উজাড় হবে!

অম্বুধর হাসিয়া বলিলেন,—আশ্চর্য্য কিছু নয়, তবে সেবারের মত আর হবেনা বিধু।

সবাই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। অম্বুধর বলিলেন,—তোমরা তখন হ'য়েচ কি হওনি, আশ্বিনে ম্যালেরিয়া এল। ছেলেবুড়ো বাদ নেই। আমকুশিতে ডাক্তার তখন দু'জন,—আমি আর হরেকেষ্ট! হরেকেষ্টর হাত যশ ছিলনা,—কাজেই যত ডাক আমারই। সকালে একটু জল খেয়ে বেরিয়ে যেতাম! আর ফিরতাম দুটোয়,—পকেটে টাকা ধর্‌ত না। বাড়ি ফিরেও টেবিলের উপর দেখ্‌তাম—টাকার গোছা,...গোণার সময় নেই। সার সার রুগী, হা পিত্যেশ হ'য়ে বসে আছে। শিশিতে কুইনাইন দিয়ে কি কুল আছে, 'ফিল্‌টার ওয়াটারে' কাজ সার্‌তাম। দশ দিনের দিন রুগী সেরে উঠে বক্‌শিস্ দিয়ে যেত।

রোহিণী পাঠক বাধা দিলেন,—ওটা হাতের গুণ!

অম্বুধর গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—বল্‌চি কি তবে! তারপর একবার বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—ইস্কুলের পাকা বনিয়াদ হ'ল সেইবার কিনা! দু'শো টাকা দিয়েছিলাম পকেট থেকে, জান্‌ত ভূষণ!

ছোকরা ডাক্তার দু'জন পরস্পরের দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিলেন!

মজলিস্‌টা জমে ভাল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কমিটির এখনও কাহারও দেখা নাই। তিন কলিকা তামাক পোড়াইয়া অম্বুধর চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কয়েক দিন হইতে একজন নূতন শিক্ষকের নিয়োগ সম্বন্ধে কথা চলিতেছে,—কথাটার মীমাংসা হয় নাই! না হওয়ার কারণ, হেড্‌মাষ্টার ত্রিলোচনের ইহাতে ঘোর আপত্তি। তাঁহার মতে, ইস্কুলের ব্যয় বৃদ্ধি না করিয়া আয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। গতবৎসর পার্শ্ববর্ত্তী ডুগ্‌ডুগির নূতন ইস্কুলে তিনটি ছেলে 'ট্রান্সফার' লইয়াছে, আরও কয়েকজন লইবে বলিয়া গুজব। নূতন শিক্ষক পরে নিযুক্ত হইলেও ক্ষতি নাই।

অম্বুধর বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছেন,—হঠাৎ কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলেন।

—অন্ধকারে যে বসে আছ একা, ব্যথাটা আজ বেড়েচে বুঝি!

ব্যথাটা আর কিছুর নয়, বাতের! খবরটা গৃহিণী ন্যূনকল্পে দিনে তিনবার করিয়া জিজ্ঞাসা করেন।

অম্বুধর উত্তর দিলেন,—হুঁ একটু যেন,···

—জ্যাম্বকটা একটু মালিস কোরো খাওয়ার পর, এখন একবার ওঠ দিকি।

পিছন ফিরিয়া অম্বুধর দেখিলেন,—গৃহিণী একেবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—হাতে লণ্ঠনের আলো,··· চশমার পুরু দুখানি কাঁচ জল্‌ জল্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

—হ'ল কি বলত।

—আগে ওঠই না, বল্‌ছি পরে।

লাঠি হাতে অম্বুধর ঠুক্‌ ঠুক্‌ করিয়া গৃহিণীর সহিত একেবারে অন্দরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আলো-অন্ধকারে রকের উপর কে একজন দাঁড়াইয়া আছে, মনে হইল। কাছে একটু সরিয়া আসিতেই লোকটি গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—আজ্ঞে আমি নীলমণি!

—নীলু, কি মনে ক'রে?

আজ্ঞে,—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া নীলমণি অম্বুধর গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইল! গৃহিণী মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন,—বলিলেন—বুঝ্‌তে পারনি এখনও, অজয়ের জন্যে ধরেচে ক'দিন থেকে! আমি বলি, হাত ত ওঁর একার নয়, যে হ'য়ে যাবে, তবে একবার চেষ্টা চরিত্রি ক'রে···তুমি কি বল!

গৃহিণী এই অবধি বলিয়া অম্বুধরের মুখের দিকে তাকাইলেন। অম্বুধর নিশ্চুপ,—কথাটা যেন বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই!

—অজয় গো অজয়, নীলুর ছেলে। আরও একবার দরখাস্ত ক'রেছিল মাষ্টারির জন্যে, তখন ত খালি ছিলনা; তুমি বল্‌লে পরে দেখ্‌ব তার আর কি,···মনে নেই তোমার?—গৃহিণী একবার কটাক্ষ করিলেন।

অম্বুধর একটু একটু করিয়া ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিলেন। নীলমণি লোকটি পরিচিত। বহুদিন এই ইস্কুলে 'পিওনে'র কার্য্য করিয়া গত বার সে কাজ হইতে অবসর লইয়াছে। পরীক্ষার সময় প্রতিবার সে ছেলেদের সুবিধা করিয়া দিয়া তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু উপরি পাইত! কয়েক বার সে ধরাও পড়ে,—একমাত্র গৃহিণীর কৃপায় বেচারা রক্ষা পাইয়াছে।

অম্বুধর গম্ভীর কণ্ঠে শুধাইলেন,—চাকরি খালি আছে, কে বল্‌লে তোমাকে?

নীলমণি উত্তর দিল,—আজ্ঞে শুন্‌চি ক'দিন থেকে!···

গৃহিণী তাড়াতাড়ি আলোটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন,—না শুনেই বুঝি নীলমণি এসেচে তোমার কাছে; আর তুমি ত নিজেই আমাকে বল্‌লে কাল;—তারপর একটু থামিয়া বলিলেন,—আপত্তি আছে নাকি, আজকাল ত ওসব বিচার দেখিনে বাপু,···ভাল ছেলে, পরীক্ষায় বৃত্তি পেল, পড়্‌তে পার্‌লনা এই যা,...বছর তিনেক পাশ করেচে না নীলু!

—আজ্ঞে তাই,···ভুলুবাবু সেই বার,—নীলমণি কথাটা উচ্চারণ করিতে গিয়া থামিয়া গেল! গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল,—তিনি বসিয়া পড়িলেন।

—কি হ'ল মা,

—কিছু নয়!

কিন্তু নীলমণির বুঝিতে দেরি হইল না। তিন বৎসর পূর্ব্বে গৃহিণীর একমাত্র অঞ্চলের নিধি চলিয়া গেছেন। নামটা এ সময়ে মুখে আনিয়া নীলমণি ভাল করে নাই।

অম্বুধর বলিলেন,—আচ্ছা এখন এস নীলু।

গৃহিণী ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন,—আস্‌বে, কিন্তু চাকরিটা অজয়কে দেওয়া চাই। আহা আমার ভুলুর সঙ্গে ভাব কি কম ছিল, কাল একবার অজয়কে পাঠিয়ে দিও নীলমণি!

অম্বুধর কিছু উচ্চারণ করিলেন না। নীলমণি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল!

অপরাহ্ণে দিবানিদ্রা শেষ করিয়া অম্বুধর সেদিন বাগানে ঢুকিলেন। বাগানটা বৈঠকখানা হইতে একটু দূরে। চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া,—মধ্যে আম লিচু কাঁটাল গাছের সারি। দক্ষিণ দিকে দু'টি কাগ্‌জি নেবুর গাছে থোকা থোকা নেবু ধরিয়াছে। বছর কয়েক আগে অম্বুধরের একবার অরুচি হয়। চারা দুইটি কোথা হইতে কিনিয়া আনিয়া সযত্নে রোপণ করেন।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। শীতের সূর্য্যরশ্মি ইস্কুলের পীতাভ দেয়ালের উপর পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে। ছেলেদের কলরবটা এখান হইতে স্পষ্ট শোনা যায়। মধ্যে মধ্যে অম্বুধর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কি চাহিয়া দেখেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটি ছেলেকে তিনি বাগানের ভিতর দেখিয়াছিলেন,—ছেলেটি তাঁর চ'খের উপর দিয়া পট্ পট্ করিয়া গোটাকয়েক নেবু ছিঁড়িয়া লইয়া অদৃশ্য হইল। শক্ত সমর্থ হইলে অম্বুধর নিশ্চয়ই পিছন লইতেন,—কিন্তু নিরুপায়। একটু পরে ইস্কুলে আসিয়া স্বহস্তে প্রত্যেক ছেলের পকেট খুঁজিয়া ক্ষুণ্ণ মনে অম্বুধর গৃহে ফিরিলেন!

ইস্কুলের পশ্চিমের ঘরে ছোটদের ক্লাশ বসিয়াছে। অম্বুধর দেখিলেন, বোর্ডের উপর একটি চিত্র আঁকাইয়া অজয় ছেলেদের বিদ্যাদান করিতেছে। পৃথিবী গোলাকার,—সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের দিকে দৃক্‌পাত করিলে,—তাহা কিরূপে বুঝা যায়,—এই বিষয়টি অজয় বার বার করিয়া বুঝাইতেছে।

একটি শুক্‌না কাঁটাল পাতার উপর পা পড়িতেই মচ্ করিয়া শব্দ হইল। অম্বুধর চম্‌কিয়া উঠিলেন!

—কি কর্‌চেন ওখানে? অম্বুধর দেখিলেন হেড্‌মাষ্টার ত্রিলোচনবাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন!

—বাগানটা দেখ্‌তে এসেচি,···কটা বাজল তোমার ঘড়িতে?

ত্রিলোচন দাঁড়াইয়াছিলেন ইস্কুল ঘরের আঙিনায়। কাঁটাতারের বেড়ার দিকে আগাইতে আগাইতে হাতঘড়ি দেখিয়া বলিলেন,—আজ্ঞে চারটে দশ।

—বেলা গিয়েচে দেখ্‌চি, ছুটি হ'তে আর দশমিনিট, কি বল।

—হাঁ মিনিট দশেক, বাঃ, নেবুগাছ দুটো বেশ ধরেচে দেখ্‌চি—বলিয়া সপ্রশংস দৃষ্টিতে ত্রিলোচন গাছ দুটির পানে তাকাইয়া রহিলেন!

অম্বুধর একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন,—বর্ষায় দুটো কলম বাঁধ্‌ব ঠিক করেচি, কেমন হ'বে বল দিকি!

—খাসা হবে, বসিয়ে দেবেন দু জায়গায়, মাটি যা সারালো,···কিছু দেখ্‌তে হবেনা! হুঁ, আসুন ত একটু কাছে, আসুন তাড়াতাড়ি, শুন্‌তে পাচ্চেন—পাচ্চেন বোধ হয়!

অম্বুধর ত্রিলোচনের মুখের দিকে তাকাইলেন।

—আপনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বুঝেচেন,···খুব 'ক্লেভার' কিনা!

অম্বুধরের চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইল! বলিলেন,—অজয়ের কথা বল্‌চ,—জোরে জোরে পড়াচ্চে বুঝি!

ত্রিলোচন ভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—আপনি না থাক্‌লে কিন্তু গলার স্বর কেউ শুন্‌তে পেতনা! খাঁটি লোক আর কাকে বলে!

অম্বুধর বুঝিলেন অন্যরূপ! শিক্ষকরা যে এত যত্ন করিয়া পড়ান,—সে ত তাঁহারই জন্য। যোগ্যতা না থাকিলে, অজয়

মাষ্টার হয়ত তাঁর সাড়া পাইয়াও চেয়ারে বসিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইত! মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—অজয় ত অজয়, কৈলাস মুখুয্যের নাম শুনেচ ত,...সত্তর বছরের বুড়ো। আমাকে দেখে বুড়ো ঠক্ ঠকিয়ে কাঁপ্ত। একদিন হ'য়েচে কি, ঘাঁতি মেরে ক্লাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েচি, ঘুমে বুড়োর চ'খ দুটো এঁটে আস্চে! হঠাৎ দেখি বুড়ো তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বল্চে,···করচিস্ কিরে গণ্শা, খুব চালাকি শিখেচ বাবা,···ভাব্চ বুঝি, বুড়ো ঢুল্চে; কৈলাস মুখুয্যের চ'খে ধুলো দিতে এসেচ তুমি, ভালয় ভালয় একবার 'নীলডাউন' হও দেখি। 'নীলডাউন' কেউ হ'ল কিনা জানিনে, কৈলাসের গলা কিন্তু সপ্তমে উঠ্ল,···সে কি পড়ানো,···ঘরের ভিত অবধি কাঁপ্তে লাগ্ল;—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অম্বুধর হাসিতে লাগিলেন!

ত্রিলোচনও হাসিতে যোগ দিলেন,—কিন্তু আসল ব্যাপারটা আজ চাপা পড়িয়া গেল!

ত্রিলোচনের মাস্তুতো ভাইএর নাম কিশোরীশরণ! ছেলেটি ফিট্ফাট্···কেতাদুরস্ত! স্বগ্রামে 'ডিফেন্সপার্টি'তে যোগ দিয়া একবার একটি ছিঁচ্কে চোর ধরিয়া সরকার হইতে নাকি দশটাকা বক্শিস্ পায়! একদিন আসিয়া দাদার কাছে পরিচয় দিল,—আমি সব কাজ করতে পারি দাদা,...জুতো শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।···

ত্রিলোচন গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—তবে তোমার ভাব্না কি, আমার এখানে না থাক্লেও দিব্যি তোমার চ'লে যাবে!

কিশোরীশরণ নিরুত্তর, তাঁহার হইয়া যিনি কথা বলিলেন, – তিনি গৃহিণী কনকচাঁপা!

—ভাই কি তোমার একটা বই দুটো, বলি এত যে জমাচ্চ, দুমুটো জোটেনা ওর, হ্যাঁগা!

ত্রিলোচন আপত্তি করার সুযোগ দেখিলেন না,—কিশোরীশরণ টিকিয়া গেল!

মাস তিন-চার পর,—

দ্বিপ্রহরে অম্বুধর বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন,—টেবিলে জ্যাম্বাকের একটি কৌটা!

বাতের ব্যথাটা চড়িয়া উঠিলে অম্বুধর কৌটাটি আলমারি হইতে বাহির করেন! বসিয়া বসিয়া মালিস করিয়া কৌটাটি যথাস্থানে রাখিয়া দেন। আজ এখনও তুলিয়া রাখেন নাই!

—এস, তোমার কথাই ভাব্ছিলাম এতক্ষণ।

নিঃশব্দে ত্রিলোচন ঘরের ভিতর ঢুকিলেন! টেবিলের দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—আজ আবার কি?···

—হ্যাঁ, বেড়ে গেল হঠাৎ। সকালে ছিলাম ভালই, কিন্তু দুপুরে,...উ-হুঁ-হুঁ, আবার চিড়্ ধর্ল ত্রিলোচন, উহুঁহুঁ;—মুখটা বিকৃত করিয়া অম্বুধর ঘরের একদিক হইতে আর একদিকে আসিয়া থামিয়া গেলেন!

ক্ষিপ্রগতিতে ত্রিলোচন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—নড়্বেন না, চুপ ক'রে একটু দাঁড়ান দেখি;—বলিয়া টেবিলের জ্যাম্বাকের কৌটাটি খুলিয়া খানিকটা অম্বুধরের ডান পায়ের হাঁটুর উপর ঘষিতে লাগিলেন!

—আরাম পাচ্চেন,

—উহুঁ-হুঁ!

—এবার,

—উহুঁ-হুঁ!

ত্রিলোচন প্রাণপণে ডলিতে লাগিলেন!

পথের উপর তপ্ত বাতাস বহিতেছিল। একটা ঘূর্ণি হাওয়ার সঙ্গে কয়েকটা শুক্না পাতা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। অম্বুধর বলিলেন,—দোরটা বন্ধ ক'রে এসে ব'স দেখি।

ত্রিলোচন উঠিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিলেন,—তাঁর কপাল দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে!

—তা'রপর এদিকের খবর কি বলত?—অম্বুধর শুধাইলেন।

—আজ্ঞে কালপরশু আরও জনদশেক,···

—বল কি, অম্বুধরের ললাটের রেখাগুলি কুঞ্চিত হইল,—ট্রান্স্ফার নিচ্চে দশজন···বল কি ত্রিলোচন?

—আজ্ঞে দেখ্তেই পাবেন?

আমকুশির বহু পুরাতন ইস্কুলে ভাঙন ধরিয়াছে,—অম্বুধর একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন! কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—উপায় নেই ত্রিলোচন?

—আজ্ঞে দেখ্চি কই, তবে একটা কথা দিনকয়েক

আগে কানে এসেচে, যদি তাই হয়,…কথাটা বড় মুশ্‌কিলের কিন্তু……

—কি কথা ত্রিলোচন,—

কথাটা অতঃপর ত্রিলোচন যাহা ব্যক্ত করিলেন, সংক্ষেপে এই ;—

আমকুশির পুরাতন ইস্কুলে এতদিন যাঁহারা পড়িয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ধনীর ছেলে। সকলেই উচ্চবর্ণ। ধনে মানে কেহই তাঁহারা হীন নন। যাঁহারা তাঁদের শিক্ষকতা করিতেছেন, তাঁহারাও অভিজাত ও উচ্চবর্ণ। কিন্তু, আজ এই সনাতন-রীতির ব্যতিক্রম। অজয় মাষ্টার —হীনবর্ণজাত মৎস্যজীবির পুত্র,—বিশেষ তাঁহার পিতা একদিন এই ইস্কুলে একটি নিকৃষ্টতম চাকুরি করিয়া দিনাতিপাত করিয়াছে, এমতে—

—কথাটা কি সত্যি ত্রিলোচন?—অম্বুধর জিজ্ঞাসা করিলেন।

—ঠিক কিনা জেনে দেখুন, আমি ত নিজের কানে শুনেচি,—একটু হাসিয়া বলিলেন,—কেন বিশ্বাস হয় না আপনার ?

হয় না আবার, তবে অজয় আসার আগেও, গোটা-তিনেক সরেছিল কেমন না ?

ত্রিলোচন হাসিয়া বলিলেন,—তারা যে 'প্রমোশান্‌' পায়নি, মনে নেই আপনার ?

—ওঃ, হাঁ হাঁ প্রমোশান্‌ পায়নি বাছাধনরা—অম্বুধর নিরাপদের হাসি হাসিলেন। তা'রপর চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরের এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়া ত্রিলোচনের দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—ঠিক ধরেচ ত্রিলোচন, আমি ভাবি আরও কিছু হবে বা !

ত্রিলোচন একটি গভীর হাসি হাসিলেন !

সপ্তাহ কাটিল না ! দ্বিপ্রহরে অজয় একদিন বিবর্ণমুখে ইস্কুল হইতে ঘরে ফিরিল। প্রকাশ, ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য কমিটি আপাততঃ তাহাকে অবসর দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কিন্তু আসল ব্যাপারটি একদিন সত্যসত্যই প্রকাশ হইল। মাস-দুই পরে একটি নূতন ছোকরা ইস্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল, ছেলেটির নাম কিশোরীশরণ ! ইনি ত্রিলোচনের…

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

বাদল্‌ বেলা

নীল্‌ নীলিমা ধূসর শাড়ী জড়িয়ে করে জল্পনা,
বাদল নূপুর শিঞ্জনেতে জাগ্‌লো কবির কল্পনা।
এম্‌নি সে এক মেঘ্‌লা দিনে অমর কবি নির্জ্জনে
গেয়েছিলেন গান বিরহে বরষা-দেয়া-গর্জ্জনে।
কাঁদ্‌ছে মেয়ে বরষা-মেদুর্‌—বিরহিনীর কান্না সে,
আঁখির বারি হারিয়ে দেছে মুক্তা হীরা পান্নাকে।
শ্যামল্‌ ধরা তাথই তাথই নাচ্‌ছে যেন নর্ত্তকী,
কাঁপ্‌ছে লাজে বাদল্‌-ভেজা আঁখির চারুবর্ত্মকী ?
সব্‌ বিরহী কুর্চ্চি ফুলে পাঠায় বুঝি অর্চ্চনা,
মেঘ্‌দূতেরা প্রিয়ার দ্বারে করছে তারি বর্ণনা।
তুষার-গিরি-শিখর হ'তে সবুজ্‌ রঙা শষ্পতে
পাত্র ভ'রে আন্‌লো সুধা বর্ষা করুণ বাষ্পতে।
ইন্দ্র বুঝি পারিজাতের ঝরায় করি চূর্ণিত,
ধরায় তারা নাম্‌ছে হ'য়ে বিশ্বপথে ঘূর্ণিত ॥

শ্রীগোপালচন্দ্র বটব্যাল

পত্রদূতী

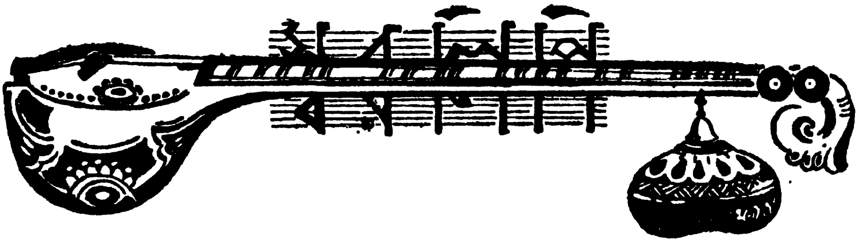
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

মেজ বৌদি' তোমার বল রাখ্‌লে কোথায়
সেই চিঠির তোড়া ;—
মিছে গম্ভীরতায় আর লাভ কি হবে
যদি নয়ন কোণে হাসি ফুটেই র'বে,
ঢেকে রাখ্‌তে যাওয়া
মানে লজ্জা পাওয়া,
বাজে ঠাট্টা ওসব বুঝি ক'রতে মানা,
আর লুকিয়ে কি কাজ বল, সব ত জানা,
মেজ দাদার চিঠি দেখে চিন্‌তে পারি
খামে হোক্ না মোড়া ;
মেজ বৌদি' তোমার বল রাখ্‌লে কোথায়
সেই চিঠির তোড়া।

রোজ ডাকের সময় এলে তাকাও কেন
ওই পথের পানে,
দূর বিদেশ থেকে কা'রো আস্‌লে চিঠি
চেয়ে 'পিয়ন্' পানে হয় উজ্জ্বল দিঠি,
নির্‌ নিমেষ আঁখি
দেয় কেবল ফাঁকি,
বেণু বনের মত বুকে কাঁপন জাগে,
শেষে দীর্ঘনিশাস চেপে রাখন্ লাগে
রোজ পত্র পেতে শুধু মিথ্যা আশা
সে ত সবাই জানে ;
তবে ডাকের সময় এলে তাকাও কেন
শুধু পথের পানে !

ভাবো তুমিই সজাগ আর আম্‌রা ঘুমাই
সবে চক্ষু বুজি,'
যেন কেবল তুমিই শুধু বুদ্ধিমতী
আর আম্‌রা সবাই মিলে মূর্খ অতি ;
দূর বিদেশ থেকে
দাদা পত্র লেখে,
তা'তে লজ্জা কিসের, অত ছল বা কেন,
ওমা আকাশ থেকে মেয়ে পড়্‌লো যেন,
খামে পত্র এলে বল দুষ্টু মেয়ে
খুসী হওনা বুঝি ?—
ভাবো তুমিই সজাগ আর আম্‌রা ঘুমাই
সবে চক্ষু বুজি' !

ভাই মনের খুসী শুধু বাহির দিয়েই
কভু যায় না ঢাকা,
আর লুকিয়ে কি লাভ, আয় বদল করি,
দেনা ঠাকুরজামাই কিযে লিখ্‌ল পড়ি,
দূর প্রবাস থেকে
প্রেম সুবাস মেখে
নিয়ে গোপন কথা, দিবা স্বপন যত
আসে প্রিয়ের চিঠি প্রিয়া-মনের মত,
ঠিক দুদিন পরেই চিঠি পাওনা যদি
ঠেকে জীবন ফাঁকা ;—
বিনা পত্রদূতী বল্ কেমন ক'রেই
যায় একলা থাকা।



মালগুঞ্জ—দাদ্‌রা

আসিও প্রিয় ছায়া-ঘন বাদলে।
কেতকী-রেণু নিও মেখে আঁচলে॥
বেদনা মম তারি বুকে—
রাখিয়া যাব স্মৃতি সুখে;
শুধায়ো তারে যত কথা বিরলে॥

তোমারি তরে আঁখি-বারি ঝরিবে,
মুকুর রচি' বন-পথে রহিবে।
আমারি ছবি সে-মুকুরে—
হেরিও আসি' বন-পুরে;
সে রবে আঁকা বেদনারি কাজলে॥

কথা ঃ—অজয় ভট্টাচার্য্য এম্, এ

সুর—হিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর

স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

II । । মগা । গা মা -া I মগা -জ্ঞরা -সরমা । জ্ঞা -া -জ্ঞরসা I
° ° আ সি ও ° প্রি ° ° ° ° ° ° য় ° ° °

I সা সরা -সজ্ঞা । -রসা ণধ্‌া ণ্‌া I সা গা -মা । মা -গপা -মগমা I
ছা য়া ° ° ° ° ° ঘ ন বা দ ° লে ° ° ° ° °

I -া -া গমা । -ধপা মগা মা I মজ্ঞরা -সরা -মপধা । জ্ঞা -া -জ্ঞরসা I
° ° আ ° ° ° সি ও প্রি ° ° ° ° ° ° ° য় ° ° °

I সা সরা -সজ্ঞা । -রসা ণধ্‌া ণ্‌া I সা গা -মা । মা -গপা -মগমা I
ছা য়া ° ° ° ° ° ঘ ন বা দ ° লে ° ° ° ° °

I । । গসা । গা মা -ধা I পধা -পণা -ণণধপা । মা -া -া I
° ° কে ত কী ° রে ° ° ° ° ° ° ° ণু ° °

I া া মধা । ধা ণধা -ণপা I পধা -পণা -ণণধপা । মা -া মা I
• • কে ত কী• •• রে• •• •••• গু • নি

I মমা -র্সা -ণা । -া ণা ণা I ধপা -ণা -ধপা । পগপমা গা -া I
ও• • • • মে ঘে আঁ• • •• চ•• লে •

I -গমা -পপমা -গমা । -গা -জ্ঞা -রসা I সা সরা -সজ্ঞা । -রসা ণধ্‌ ণ্‌ I
•• ••• •• • • •• ছা য়া• •• •• ঘ ন

I সা গা -মা । মা -গপা -মগমা II
বা দ • লে •• •••

II মা মা গমা । -ধণর্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা নর্সা । -র্গর্রা নর্সা -নর্সা I
বে দ না• ••• ম ম তা রি বু •• কে ••

I র্সনা -র্রর্সা -ণা । ণা ণা ণা I ণধা -র্সণা -ধা । -পা -া -া I
য়া• •• • থি য়া যা ব• •• • • • •

I পধণা -পধা -ণা । -র্রর্সা সধা র্সা I পণা -া -ধপা । -পধা -পণা -ধপা I
স্মৃ•• •• • •• তি সু খে • •• •• •• ••

I -মগমা -া { ধা । ধা ণধা -ণা I পধা -পণা -ধপা । মগমা -া (-া I
••• • শু ধা য়ো• • তা• •• •• রে• • •

I া া মগা । পমা পগা -া I পসগা -মধা -পণা । -ধপা গমা -া I
• • শু• ধা• য়ো • তা• •• •• •• রে •

I -র্সা -ণা)} মা । মমা -র্সা -ণা I -া ণা ণা I
• • য ও• • • • ক থা

I ধপা -ণা -ধপা । পগপমা গা -া I -গমা -পপমা -গমা । -গা -জ্ঞা -রসা I
বি• • •• র•• লে • •• ••• •• • • ••

I সা সরা -সজ্ঞা । -রসা ণধ্‌ ণ্‌ I সা গা -মা । মা -গপা -মগমা II
ছা য়া• •• •• ঘ ন বা দ • লে •• •••

II । । গা । সা রা সন্‌া I -সা ধ্‌া -ণ্‌া । সা গা -া I
• • তো মা রি ত • রে • আঁ খি •

I গা -সা গা । -মা পা গা I মা -া -া । -া -া -া I
বা • রি • ঝ রি বে • • • • •

I । । মা । ধা মা মধা I পধা -ণা -া । -া র্সা র্রা I
• • মু কু র র চি • • • ব ন

I র্সধা -া -ণধপা । মগমা -া পধা I পধা -া -ণধপা । মগমা -া -া I
প • • • • থে • • র • ছি • • • • বে • • •

I মা মা মমা । -ধণর্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা নর্সা । -র্গর্রা নর্সা -নর্সা I
আ মা রি • • • • ছ বি সে বু কু • • রে • •

I র্সনা -র্রর্সা -ণা । ণা ণা ণা I ণধা -র্সণা -ধা । -পা -া -া I
হে • • • • রি ও আ সি • • • • • • •

I পধণা -পধা -ণা । -র্রর্সা র্সধা র্সা I ধণা -া -ধপা । -পধা -পণা -ধপা I
ব • • • • • • • ন পু রে • • • • • • • • •

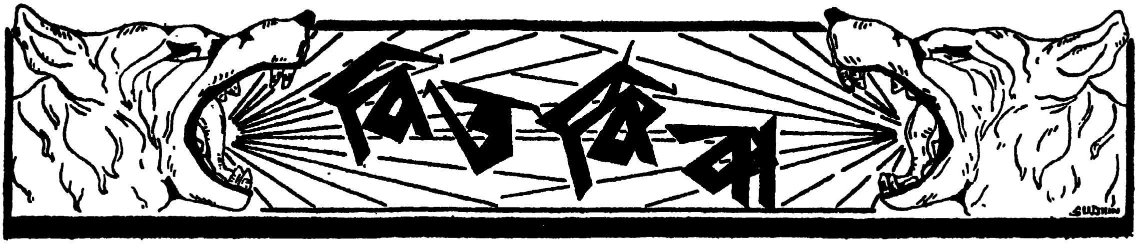
I -মগমা -া ধা । ধা ণধা -ণা I পধা -পণা -ধপা । মগমা -া -া I
• • • • সে র বে • • আঁ • • • • • কা • • •

I । । মগা । পমা পগা -া I গসগা -মধা -পণা । -ধপা গমা -া I
• • সে • র • বে • আঁ • • • • • • • কা •

I মর্সা -ণা মা । মমা -র্সা -ণা I -া ণা ণা I
• • বে দ • • • • না রি

I ধপা -ণা -ধপা । পগপমা গা -া I -গমা -পপমা -গমা । -গা -জ্ঞা -রসা I
কা • • • • জ • • লে • • • • • • • • • • • •

I সা সরা -সজ্ঞা । -রসা সধ্‌া ণ্‌া I সা গা -মা । মা -গপা -মগমা II II
ছা য়া • • • • • ঘ ন বা দ • লে • • • • •



১। ছন্দের গঠন সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম-এ

ঐ তোমার দৃষ্টিখানি যে মধুর বার্ত্তা আনি'
উঠত্ গো মোর বুকে বেজে,
তোমার ঐ হৃদয় জুড়ে যে প্রেম সদাই স্ফুরে,
হায় প্রিয়ে, আজকে কোথা সে যে ?
যে-জীবন একটু আগে আমার স্পর্শ মাগে
এখন সে কি মিথ্যা হ'য়ে গেল ?
যে বাহুর মাল্যখানি গলায় পরালে, রাণী,
এখন কেন তাও খুলে ফেল ?
বেদনায় হায়রে আজি হৃদয়ের তন্ত্রীরাজি
ক্ষণে ক্ষণে উঠ্ছে কেঁপে কেঁপে,
যেথা চাই দিকে দিকে দেখি শুধু হায় আজিকে
ব্যথায় যেন বিশ্ব যায় ছেপে।
তোমার আর আমার মাঝে সুগম্ভীর সুরে বাজে
বিদায়ের সকরুণ গীতি,
দু'দিনের তরেই বুঝি ব্যর্থতার সঙ্গে যুঝি'
যায় রে নিভে মানবের প্রীতি।

আবার তোমার ঐ দৃষ্টিখানি প্রিয়ে
রাখ মোর মুখে,
তোমার ঐ চিত্তখানি মোর চিত্তে দিয়ে
বুক রাখ বুকে।
তোমার ঐ চেতনাখানি নিত্য রাখ জেলে
স্নিগ্ধ অনিমিখ,
তোমার সে পরশসুধা দাও পুনঃ ঢেলে
পূর্ণ কর দিক্।

তথ্য হিসেবে এ উক্তিগুলো মিথ্যে। কাব্য হিসেবে এ রচনাটি মূল্যহীন। এ পংক্তিগুলো রচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছন্দের গঠন-তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা করা এবং ছন্দো-রসিকদের অভিমত জানা। উক্ত রচনাটিতে ছন্দোগত কোনো দোষ আছে কিনা এবং যদি থাকে তবে তাকে দোষ বলা যাবে কেন, বিচিত্রার পাঠকরা যদি এ প্রশ্নের আলোচনা করেন তা'হলে অনুগৃহীত হব।

২। "বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা, না বাংলা ?

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

"বাঙ্গালা" বানানের এই স্বেচ্ছাচারিতার যুগে 'বিচিত্রা'র একজন পাঠকের যে এ-সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়েছে তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হ'তে হয়। যে প্রশ্ন তিনি উত্থাপন ক'রেছেন নিতান্ত সহজভাবে অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করে তা'র জবাব দেওয়া সহজ হবেনা। আলোচনাটি ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) মূলক। অতএব এ সমস্ত ব্যাপারে যাঁরা গভীর ভাবে আলোচনা করে থাকেন তাঁদের বহুশ্রমলব্ধ বিচার ফল উপস্থাপিত ক'লে সাধারণের কাছে বিষয়টা নিতান্তই নীরস বলে মনে হবে। তবু যতদূর সম্ভব সহজ ক'রে প্রশ্নটার জবাব দেওয়া যাক্।

'বঙ্গ' দেশ সম্পর্কিত ভাষা ব'লে 'বঙ্গ' শব্দের সহিত

'আল' প্রত্যয় যুক্ত হ'য়েছে। তা' থেকে 'বঙ্গাল' শব্দের সৃষ্টি হ'ল। এই শব্দটাকে একটু জোর দিয়ে উচ্চারণ কর্‌বার জন্যে ইহার শেষে স্বার্থে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হ'য়ে শব্দটা দাঁড়াল, 'বঙ্গালা'। মধ্যযুগের মুসলমান-সাহিত্যে অর্থাৎ আরবী, পারসীতে এর এমনি বানান চল্‌তি ছিল। তারপর বাঙ্গালা উচ্চারণের ধ্বনি-সামঞ্জস্যের রীতি অনুসারে (Law of Assimilation) 'বঙ্গালা' শব্দটি 'বাঙ্গালা'য় পরিণত হ'ল! তা' থেকে সাধুভাষায় 'বাঙ্গালা'ই চলে আস্‌ছে! এবং সাধু এবং শুদ্ধ বাংলায় এর এই বানান আজও চলা উচিত। 'বাঙ্গালা' ভাষা, কিম্বা 'বাঙ্গালা' দেশ এ' দুয়ে কোন তফাৎ হবার কারণ নেই।

খাঁটি 'তদ্ভব' অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ যেমন স্থানকালভেদে উচ্চারণের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন কথ্য প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করে, 'বাঙ্গালা' শব্দটিও এর আদি উদ্ভব কাল থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ ক'রে আস্‌ছে। বানান সবগুলোই যে উচ্চারণমূলক তা' বলা যায় না। তা' হ'লে ব্যাপারটাকে একটু ক্ষমার চক্ষে দেখা যেত। কারণ আজকাল উচ্চারণমূলক বানানের দিকে লোকের একটা ঝোঁক পড়েছে। 'বাঙ্গালা'র পর এর আর যতগুলো বানান চল্‌তি আছে সবগুলোই মূল 'বাঙ্গালা'র পরবর্ত্তী ধ্বনিবিকৃতি মাত্র! (Necessary phonetic change) যেমন:—

'বাঙ্গলা' উচ্চারণ হয় 'বাঙ্‌গ্‌লা'। আদিস্বর দীর্ঘ থাকায় পরবর্ত্তী বর্ণের স্বর লোপ পেয়েছে এবং ধ্বনিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মের এতে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। তারপর,

'বাঙলা',—'ঙ' কিম্বা 'ঞ' অনুনাসিকের বাঙ্গালায় কোন স্বাধীন উচ্চারণ নেই। 'ঞ'র স্বাধীন মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিকারেরা তাকে বানানে ব্যবহার ক'রেচেন। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা বানান থেকে তা' লুপ্ত হ'য়ে গেছে। 'ঙ'র প্রাচীন বানানে বিশেষ স্থান না থাক্‌লেও আধুনিকতার আওতায় প'ড়ে তার নবজন্ম পরিগ্রহ হয়েছে! সেই জন্যই 'রঙ্‌মহল', 'রঙ্‌খেলা' ইত্যাদি! 'ঙ' কিম্বা 'ঞ'র উচ্চারণ তত্তৎবর্গের ব্যঞ্জনের যুক্ত-উচ্চারণ সাপেক্ষ। যথা, 'বাঙ্গালা'য় 'ব+আ+ঙ্‌+গ+ল+আ' এই স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণগুলো আছে। 'ক' বর্গের 'গ'র সঙ্গে কবর্গেরই অনুনাসিক 'ঙ' যুক্ত হ'য়েছে! অতএব 'বাঙলা' লিখে যদি 'গ' কেই লুপ্ত ক'রে দিই তা' হ'লে 'ঙ্‌' কে বাঁচিয়ে রাখার কোন যুক্তিই থাক্‌তে পারেনা। অতএব 'বাঙলা' বানানটি ভ্রমাত্মক।

এবার 'বাংগলা'র কথা বল্‌ব। অবশ্য এরকম বানান বাঙ্গালায় খুব সচরাচর চোখে পড়ে না। তবে এ' বানানটি 'বাঙ্গালা'র উচ্চারণগত রূপান্তর মাত্র। তারপর 'বাংলা' সম্বন্ধে বল্‌তে হয়। এ' বানানটি চলিত বাঙ্গালায় (Standard Colloquial) বিশেষ প্রচলিত। অনুস্বার অনুচ্চারণটি 'ঙ্গ' অর্থাৎ 'ঙ'+'গ'র উচ্চারণগত স্বাভাবিক রূপ-বিকৃতি। যেমন 'হংস', 'সিংহ'। এ সমস্ত অনুনাসিকের মধ্যে 'গ'র উচ্চারণ সংশ্রব আছে। অতএব চল্‌তি বাঙ্গালায় 'বাংলা' নিতান্ত ভ্রমাত্মক বলা যেতে পারেনা।

অতএব এই মীমাংসায় পৌছান গেল যে, সাধুভাষায় (Literary Dialect) 'বাঙ্গালা'ই একমাত্র ব্যবহার্য্য কিন্তু চল্‌তি বাঙ্গালায় (Standard Colloquial) 'বাংলা' লিখ্‌লেও ভুল হ'বে না। কিন্তু তাই ব'লে এছাড়া এর উপর অন্য কোন উপদ্রব সহ্য হবে না!

২ ক। বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা, না বাংলা?

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

আষাঢ়ের 'বিচিত্রায়' কথা উঠিয়াছে, 'বাঙ্গালা' 'বাঙ্গলা' 'বাঙলা' 'বাংলা' প্রভৃতির মধ্যে কোনটি শুদ্ধ?

আজকালকার সাময়িক পত্র সমূহে সচরাচর উপরোক্ত চারিটি শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে 'বাঙলা'র ব্যবহার একটু কম; 'বাংগলা' এই কথার ব্যবহার কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

সাধারণতঃ 'বাংলা' ব্যবহৃত হয় ভাষা বা সাহিত্য সম্পর্কে; এবং 'বাঙ্গালা' ও বাঙ্গলা দেশ ও জাতি সম্পর্কে;

অবশ্য বিপরীত ব্যবহারও দেখা যায়। আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রাতেই' দেখিতে পাই, 'নানাকথা' প্রসঙ্গে (পৃঃ ৮৪৩—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন) একই অনুচ্ছেদে বিভিন্ন পংক্তিতে কথাটিকে বিভিন্নরূপে বানান করা হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে শুদ্ধ হইতেছে 'বাঙ্গলা'। 'বাঙ্গালা' এই কথার মাঝের আকারটি একেবারে অতিরিক্ত। তারপর 'বাংলা' ও 'বাঙলা' এই শব্দ দুইটি সম্পূর্ণ ভুল। কেন না আসল ও মূলগত কথাটি হইতেছে 'বঙ্গ';—বং বা বঙ নহে। 'বঙ্গ' হইতেই 'বাঙ্গলা' এই শব্দের উৎপত্তি।

আজকালকার সাময়িক পত্রের লেখকগণই 'বাঙ্গলা'র এবম্বিধ রূপান্তর ঘটাইয়াছেন। এই ভাবে যদৃচ্ছা বানান লিখিয়া শব্দটিকে বিকৃত করার তাৎপর্য্য বা সার্থকতা কোথায়?

২য়। বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা, না বাংলা?

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা' শব্দের বানানের যে সমস্যা উথাপন করেছেন তার সমাধান একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

(১)

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্ন হচ্ছে শব্দটী বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা—না বাংলা?

শব্দগুলির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এগুলি একটী মূল শব্দ "বঙ্গ" হইতে উৎপন্ন এবং এই বঙ্গ শব্দের বানান সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ উঠিতে পারে না, কারণ শব্দটী অতি প্রাচীন। বেদ হইতে মহাভারত পর্য্যন্ত বঙ্গ শব্দটী বিশেষ সুপরিচিত। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় ক্ষত্রিয়রাজ বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটী ক্ষেত্রজ তনয় উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চ পুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও তাহাদের নামানুসারে এক একটী দেশ বিখ্যাত (মহাভারত আদি ১০৪।৫০) মহাভারতকার ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই শব্দটীর ইতিহাস মহাভারতের আরও পূর্ব্বে পাওয়া যায় কারণ ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) বঙ্গ শব্দের নাম পাই এবং ইহাতেই বঙ্গ শব্দ হইতে বঙ্গা শব্দের উল্লেখ আছে। ভাষ্যকারেরা এই বঙ্গ শব্দের অর্থ বঙ্গবাসিগণ বলিয়া স্থির করেন। টীকাকার সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ও তাঁহার ত্রয়ী টীকায় "বঙ্গা"—বঙ্গদেশীয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেশ ও ভাষা অর্থে বঙ্গ বা বঙ্গা শব্দের উত্তর আল প্রত্যয় করিয়া বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি।

আবুল ফজলকৃত আইন-ই-আকবরী নামক মুসলমান ইতিহাসে "বঙ্গাল" শব্দের একটী ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে প্রাচীনকালে এই জনপদ (বাঙ্গলাদেশ) বঙ্গ নামে উল্লিখিত হইত। বঙ্গের পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণ পর্ব্বতপদমূলস্থ নিম্নভূমিতে মৃত্তিকার বাঁধ বা আল দিতেন। বাঙ্গালার বহুস্থানে উক্ত রাজন্যবর্গের বিনির্ম্মিত ঐরূপ বহুশত আল বিদ্যমান দেখিয়া আলযুক্ত বঙ্গ অর্থে "বঙ্গাল" নামকরণ হইয়াছে। (বিশ্বকোষ ৩৮৮)

এই বঙ্গাল শব্দের উল্লেখ বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা—

১। বাঙ্গালা দেশ অর্থে খৃঃ ১১শ শতকে উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপিতে এই শব্দের "বঙ্গাল" নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

২। সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফিজের (১৩৫০ খৃঃ) কবিতায় 'বঙ্গাল' শব্দের দ্বারা বাঙ্গালার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক বঙ্গাল শব্দের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা এখন নিঃসন্দেহ হইতে পারি। এই বঙ্গাল শব্দে ফারসী প্রত্যয় অহ বা আ যোগে দেশের ফারসী নাম বঙ্গালাহ, বঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি (১৩৪৫ খৃঃ—ইবন বতুতা, বঙ্গালা বা বঙ্গালা রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর মধ্যযুগের বঙ্গভাষায় "বাঙ্গালা" রূপ প্রবর্ত্তিত হয়। এবং অধুনা এই বাঙ্গালা শব্দটী সাধুভাষায় চলতি হইয়াছে (ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়)

উপরিধৃত প্রমাণাদির বলে বঙ্গ শব্দ এবং তজ্জাত বাঙ্গালা শব্দ যে কত প্রাচীন, এবং ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া ইহা যে কতদূর শুদ্ধ তাহার পরিচয় আর বোধ করি আবশ্যক হইবে না, এবং ইহা হইতে আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ অর্থে "বাঙ্গালা" শব্দ সাধুভাষায় ব্যবহার করিতে পারি।

(২)

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে বাঙ্গলা শব্দের বানান লইয়া। ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে মধ্যযুগের বঙ্গভাষায় বাঙ্গালা শব্দ হইতে আধুনিক বাঙ্গ্‌লা ও বাঙ্‌লা শব্দের উৎপত্তি। বাঙ্গলা শব্দের আদ্যক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায় মধবর্ত্তী অক্ষরে স্বরাঘাত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ফলে অক্ষর নিহিত স্বরধ্বনি আকারের লোপ হইয়া বাঙ্গালা শব্দ হইতে বাঙ্গ্‌লা শব্দ দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু বিজয়রত্ন মহাশয় বলেন খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকেও বঙ্গ ও বাঙ্গালা এই দুই শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে বঙ্গদেশবাসী এক অতি সাহসসম্পন্ন বীর যুবক সুদূর আনাম রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল লাক-লম্ (Lucklom)। উক্ত লাকলম্ এবং তাঁহার অনুচরবর্গ ভারতবর্ষের যে প্রদেশের অধিবাসী তাহার নাম ছিল বঙ্‌লঙ্‌ (Bonglong) উক্ত বঙ্গলঙ্‌ শব্দ হইতে "বাঙ্গালা" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আনাম দেশীয় প্রাচীন ব্যাকরণাদিতে "লা" নামক একটী অনার্য্য ব্যবহৃত প্রত্যয় ছিল। বঙ্গগণ অর্থাৎ ঐ বঙ্গদেশীয়গণ নাগবংশীয় সুতরাং অনার্য্য ছিলেন তাই খুব সম্ভব ঐ বঙ্গ শব্দে 'লা' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বাঙ্গ্‌লা এবং পরে বাঙ্গালা শব্দ গঠিত হয়। সুতরাং কেবল বঙ্গ্‌ বা বঙ্গ শব্দ নহে বাঙ্গলা শব্দও অতি প্রাচীন এবং খৃষ্টপূর্ব্ব সাতশত শতকেও ঐ শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যাইতেছে। (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বসুমতী ১৩৪০)

(৩)

তৃতীয়তঃ বাঙলা শব্দের বানান লইয়া দেখা যায় "ঙ্গ" এর উচ্চারণ দুই প্রকার—১। ঙগ ২। গ; এবং ঙগ হইতে গ এর লোপে মাত্র ঙর অবস্থান হইয়া বাঙলা হইয়াছে। বাঙ্গলা > বাঙ্গ্‌লা > বাঙ্‌লা। বাঙ্গালা কেবল সাধুভাষায়, বাঙ্গ্‌লা সাধু ও চলতি ভাষায় এবং বাঙলা কেবল চলতি ভাষায় চলে। এই তিনটী বানান সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিতে পারে না। (Re :--সুনীতি চট্টো)

(৪)

চতুর্থতঃ "বাংগলা" শব্দের বানান আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই শব্দটী বঙ্গভাষার অন্তর্গত নহে। ইহা আমাদের বঙ্গালা শব্দের হিন্দিরূপ কাজেই ইহা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তারপর প্রশ্ন উঠিতেছে বাংলা শব্দ লইয়া। বাংলা শব্দটী শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবুর মতে অশুদ্ধ কারণ প্রাদেশিক দোষে পূর্ব্বোক্ত বাঙলা শব্দের ঙ স্থলে ং আসিয়া আমাদের বাঙলাকে বাংলায় দাঁড় করাইয়াছে। এস্থলে ইহাকে সাহিত্যের মধ্যে স্থান দেওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে।

(৫)

যাহা হউক "বঙ্গ" শব্দজাত এই কয়টী শব্দের উৎপত্তি এবং ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিয়া দেখা যায় যে বাঙগলা এবং বাংলা শব্দ দুইটী অনায়াসে বাদ দেওয়া চলে। তারপর বাঙ্গালা, বাঙ্গ্‌লা ও বাঙলা এই তিনটী শব্দের মধ্য হইতে আমাদের ব্যবহারের জন্য কোনটী গ্রহণ করা যাইতে পারে এইটাই হইতেছে এখন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে প্রথমতঃ শব্দটী এমন হওয়া চাই যে বঙ্গজাতি, ভাষা ও দেশ একই এই তিনটী বুঝাইতে উহা সক্ষম হয়। এই দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে বাঙ্গালা শব্দের স্থান সর্ব্ব উচ্চে কারণ বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি বলিতে উক্ত শব্দটীর ব্যবহার চলে তাছাড়া ইহা সাধুভাষার অনুমোদিত। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে এইটুকু বলা চলে যে ব্যবহারে ইহা একটু শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে এবং লিখন পক্ষেও বিশেষ জটিল বলিয়া মনে হয়। এই হিসাবে বাঙ্গ্‌লা শব্দ স্থান পাইতে পারে না; কারণ বাঙ্গালা জাতি বুঝাইতে "ঙ্গ" এ আকার আনিতে হয় এবং তাহাতে বাঙ্গালা শব্দ আসিয়া পড়ে। বাঙলা শব্দটী সর্ব্ব দিক দিয়া যুক্তিসঙ্গত। প্রথমতঃ ইহা ব্যাকরণশুদ্ধ অথচ শ্রুতিকটু নহে এবং লিখন ব্যাপারে তত জটিলতা আসেনা; তাছাড়া বাঙ্গালী জাতি অর্থে ব্যবহারে শব্দের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেনা। ডাঃ সুনীতিবাবু ত উহাকে চলতি ভাষায় চালাইয়া লইয়াছেন। আমার মনে হয় উহাকে সাধুভাষায় চালাইয়া লইলে বঙ্গজাতি, দেশ ও ভাষা শব্দের বানান-সমস্যা হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

৩। বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক

শ্রীজ্যোৎস্নাময় সরকার

গত কয়েক মাস ধরে বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক কি? এবং কি হওয়া দরকার তাই নিয়ে বিচিত্রা—'বিতর্কিকা' তে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন এবং সবাই নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। রাজবন্দীদের বিচিত্রা পড়বার অনুমতি আছে। আমরাও আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত articles গুলো পড়ে' আলোচনা করেছি, নিজেদের ভেতর।

গত চৈত্রের সংখ্যায় যে ৩ জন ভদ্রলোক 'বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাঁদের মন্তব্য সম্বন্ধেই আজ লিখব। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে আলোচনা করেছেন—সেটা আমরা চৈত্রের সংখ্যা হাতে পাবার বহুপূর্ব্বেই ভেবে রেখেছিলাম। তিনি যে দুই রকম পোষাকের কথা suggest করেছেন।

যথা—(১) উৎসবের বেশ—ধুতি (মালকোঁচা), পাঞ্জাবী এবং চাদর।

(২) পরিশ্রম-সাধ্য কাজের উপযোগী বেশ—আটহাত ধুতি এবং নিমা।

১ নং সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে ধুতি আমরা সুদূর অতীত থেকেই ব্যবহার করে আসছি—এটা আমাদের নিজস্ব পোষাক।

পাঞ্জাবী সম্বন্ধে আমার বলবার এই যে, মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে পাঞ্জাবীর প্রচলন ছিল না। এমন কি এক শতাব্দীর পূর্ব্বেও আমাদের দেশের লোক সাদা পাড় ধুতি, কাঁধে চাদর, গলায় পৈতা এবং পান চিবাইতে চিবাইতেই বোধ হয় সান্ধ্য ভ্রমণে কিংবা মজলিসে বাহির হ'তেন।

যাক্ মুসলমানদের কাছ থেকেই ধার করে হোক কিংবা যেখান থেকেই হোক যখন একবার চল্ হয়ে গেছে তখন এটা থাক। শ্রদ্ধেয় গাঙ্গুলি মহাশয় (শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) অনাবশ্যক বলে চাদর বাতিল করতে বলেছেন—আমার মতে চাদরকে বাতিল করলে চলবে না। এ বিষয়ে আমি শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মৌলিক মহাশয়ের সঙ্গে একমত। তিনি এ বিষয়ে চৈত্রের সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২নং সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে প্রত্যেক জাতিরই—বিশেষতঃ martial race দের war time এর জন্য এক রকম পোষাক ব্যবহার করেন এবং অন্য সময় নিজেদের জাতীয় পোষাক পরিধান করেন। যেমন ইংরাজরা খাঁকি হাফ্ পেন্ট, হাফ্ সার্ট, বুট, পট্টি ইত্যাদি war time এ ব্যবহার করেন। কারণ এ সমস্তগুলির combination এ প্রত্যেকের ভেতর একটা martial spirit জেগে ওঠে। এ সম্বন্ধে প্রত্যেক সুসভ্য দেশেই আলোচনা হচ্ছে। কেউ বলছে খাঁকি রং না হয়ে লাল রং হোক, কেউ বলছে কালো, সাদা ইত্যাদি। আমাদের দেশেও war time এর জন্য এক রকম পোষাক ছিল যদিও সেটা ধুতির ভিতরই সীমাবদ্ধ। এখনও আমাদের দেশের নমঃশূদ্র ইত্যাদি শ্রেণীর লাঠিয়ালেরা লাঠি খেলিবার সময় সেই রকম ভাবে কাপড় পরিয়া নেয়। সুতরাং শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ৮ হাত ধুতি এবং নিমার কোনও দরকার হয় না।

প্রত্যেক সভ্য জাতিই যেমন তাহাদের জাতীয় পোষাক পরে মনে আনন্দ পায় আমার ধারণা বাঙ্গালীও সেই রকম ধুতি, পাঞ্জাবী এবং চাঁদর ব্যবহার করে উৎসবে কি ভ্রমণে আনন্দ এবং তৃপ্তি পায়। সুতরাং এই পোষাক বাদ দিয়ে নূতন কিছু চালাতে গেলেই সেখানে গলদ আসবে এবং সেটা বেশীদিন স্থায়ী হবে না।

আর পরিশ্রম-সাধ্য কাজের উপযোগী এবং war time এর পোষাক যাহা ছিল এবং এখনও যাহা নমঃশূদ্র লাঠিয়ালদের ভেতর প্রচলিত আছে সেটাই থাক। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস মহাশয় তাঁহার 'ব্রতচারী' সঙ্ঘ নৃত্যের সময় যে ভাবে ধুতির ব্যবহার করেন সেটাও আমরা গ্রহণ করতে পারি। সর্ব্বশেষে শিরস্ত্রাণ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে শিরস্ত্রাণ কি স্বাস্থ্যের জন্য কি উৎসবের পোষাক হিসাবে কিছুতেই আমাদের আবশ্যক হয়না সুতরাং এ বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না।

৪। নামের পদবী

শ্রীমতী নির্ম্মাল্য রায়

মহিলাদের নামের পদবী ও সম্বোধনের রীতি নিয়ে এক সমস্যা উঠেছে। মীমাংসা হয়তো সহজে হ'বে না, তবুও এ নিয়ে বিতর্কিকাতে যে আলোচনা হচ্ছে তার থেকে একটা সুরাহা হ'তেও পারে। অন্ততঃ এ আলোচনায় লোকের মতামত জেনে তার থেকে একটা বেছে নিয়ে প্রয়োগ করলে সেটা সমাজে চলে যেতেও পারে। চামার, চণ্ডাল, মুচি, মেথরের বদলে আমরা যেমন সহজে হরিজন মেনে নিয়েছি এতেই প্রমাণ হয় যে অন্যান্য সম্বোধনে নূতন কিছু চালিয়ে নেওয়াও খুব অসম্ভব হবেনা। রবিবাবুর মত দেশ-পূজ্য কেউ এ বিষয়ে কিছু নির্দ্দেশ দিলে সেটা বোধ হয় অনেকেই মেনে নেবেন। তাঁর এবং শরৎবাবুর উপন্যাসে সবাই আগ্রহ করে পড়েন, তাঁরা যদি তাঁদের উপন্যাসে সম্বোধন নিয়ে কিছু চালাতে পারেন তবে হয়তো সেটা সমাজে চালিত হয়ে যাবে।

আষাঢ় সংখ্যার বিতর্কিকাতে শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ অপরিচিতাদের "মা" বলে সম্বোধন করবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এটা একটু অস্বাভাবিক ও অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেশের ছেলেরা এটা মেনেও নেবেন না। লেখক নিজেই আশঙ্কা করেছেন যে "আধুনিক যুবকেরা অপরিচিতাদের "মা" বলে সম্বোধন করতে রাজী হবেন, মনে হয়না।"

তাঁহার আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয় কিন্তু শুধু আধুনিক কেন কোন যুগের যুবকেরাই প্রায় সমবয়স্ক অথবা বয়সে কিছু ছোট মেয়েদের "মা" বলতে রাজী হন নাই, হ'বেনও না।

এ কথা অস্বীকার করা যায়না যে যুবকমাত্রেরই অপরিচিতা নারী দর্শনে মাতৃভাব মনে জেগে ওঠে না। সম্বোধনের রীতির জন্ম সম্পর্ক নিয়ে এতটা হস্তক্ষেপ করা ঠিক হ'বে না। লেখক বলেছেন "তাঁরা হয়তো বলবেন যেখানে মাতৃভাব মনে জাগে না সেখানে "মা" বলে ডাকা যেতে পারে কেমন করে? অপরিচিতা তরুণীর প্রতি আধুনিক যুবকের কি ভাব জাগতে পারে সে বিষয়ে আমি যখন কিছুই জানিনা তখন কি বলে সম্বোধন করলে যে তাঁদের মনোমত হ'বে তাও আমি বলতে অপারগ।"

"এখনও শাড়ীর আঁচল বা এলোখোঁপা দেখলে আমাদের মধ্যে অনেকেই একটু চঞ্চল হয়ে ওঠেন।... এখনও আমাদের ইচ্ছা হয় মেয়েদের সামনে এমন ব্যবহার করতে যাতে তাদের চোখে আমাদের ভাল লাগে।" লেখকের এ দুটী উক্তির মধ্যে সবিশেষ সামঞ্জস্য নেই। যাই হোক্‌ তাঁর উদ্দেশ্য যে সাধু সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই এবং তিনি যে মেয়েদের গভীর শ্রদ্ধাসূচক সম্বোধন করতে চান তাতে আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় "মা" সম্বোধন চলবে না। আমার ধারণা "মা"র চেয়ে বন্ধু ও ভগিনী সম্পর্কই মেয়েদের সঙ্গে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বন্ধু ও বোন অথবা ভগিনী বলে ডাকা একটু কেমন যেন ঠেকে। অর্থাৎ ডাকবার পক্ষে তেমন সহজ নয়। ইংরেজীতে বোনকে Sister ও হিন্দীতে বন্ধুকে দোস্ত বলে ডাকা যায়। এ কথা দুটো বেশ মিষ্টিও। বাংলাতে এ ধরণের কোন শব্দ চল করা যায় না? আরও একটা কথা আমার মনে হয় সেটা "শ্রীমতী"। শ্রীমতী বলে কি কাউকে ডাকা যায় না? মাতৃ সম্বোধনে শ্রদ্ধা আছে মানি কিন্তু এতেই কি অশ্রদ্ধার লেশমাত্র চিহ্ন আছে? কখনই নয়। শ্রদ্ধা আছে, উপরন্তু বেশ একটু শ্রীও আছে।

পরিচিতা, অল্পপরিচিতাদের Miss Sen, Mrs Bose ইত্যাদি ব্যবহার করা কি খুব দোষাবহ। হ'লই বা ইংরেজী এটাতো বেশ চলে যাচ্ছে। টেবল্‌, চেয়ার, ফাউণ্টেন পেন প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ যখন সবাই নির্ব্বিবাদে ব্যবহার করেছেন তখন এটার বেলায় এত দ্বিধা কেন? অবশ্য যদিও উপরোক্ত শব্দগুলো এখন বাংলা ভাষার মধ্যেই ঢুকে গেছে তবুও আমরা যদি এখন 'চেয়ার' না বলে কেদারা, ফাউণ্টেন পেন না বলে ঝরণা কলম বলি তবে সেটা চলিত হ'তে পারে কিন্তু যেখানে আমাদের নিজেদের ভাষায় সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না অথচ বিদেশী ভাষার কোন সুন্দর চলিত শব্দ আছে সেখানে সেটা ব্যবহার কর্ত্তে দোষ আছে কি! আমাদের দেশে আগের কালে অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ করবার রীতি ছিলনা কাজেই মাতৃভাষায় সম্বোধন খুঁজে পাওয়া শক্ত। কিন্তু আমার মতে তাঁদের নাম ধরে দেবী বলা যেতে পারে যেমন অমিতা দেবী, আশা দেবী। অথবা শ্রীমতী সেন ও শ্রীমতী মলিনাও বলা যায়। নাম ধরে দেবী বল্‌লেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হয়।

নামের পদবী নিয়ে সমস্যাই বড় শক্ত। এ বিষয়ে মীমাংসা বোধ হয় হবেনা। সুজাতা ঘোষ বিয়ের পর হলেন সুজাতা গুহ। তখন তাকে নিয়ে একটু গোলমাল তো হ'বেই। কিন্তু এ নিয়ে আর কি করা যায়? প্রথম থেকে বরাবর নামের পদবী উঠিয়ে যদি দেবী ব্যবহার করা হয় যথা প্রতিভা দেবী তাহ'লেও বড় গোলযোগ হবে। যেহেতু স্কুল কলেজে এক ক্লাসে ও পরিচিত মহলে বহু প্রতিভা থাকতে পারেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলতে আমরা এখন ঔপন্যাসিকা অনুরূপা দেবীকেই বুঝি কিন্তু তিনি যদি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকা না হ'তেন অথবা একাধিক উপন্যাস লেখিকা অনুরূপা দেবী থাকতেন তবে আমরা বিভ্রাটে পড়তাম। আর দেশের বেশীর ভাগ মেয়েই খ্যাতি বিহীন, নিতান্ত সাধারণ। তাদের যদি পদবী না থাকে তবে একই নামধারিণী মেয়েদের বিভিন্নতা আমরা কি দিয়ে বুঝব। সম্বোধন ও চিঠি লিখবার সময় দেবী ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু সাধারণ ভাবে অন্যত্র এটা ব্যবহার করলে আমাদের গোলযোগ হবেই। তখন নামের পদবী চাই-ই। আর সুনীতি ঘোষ বিয়ের পর সুনীতি রায় হবেন এও সত্য। জটিলতা যে তখন বাধবে তা-ও ধ্রুব কিন্তু এর কোন প্রতীকার বোধ হয় নেই। আর এ শুধু আমাদের দেশ নয় সব দেশেই, নর নারীর তুল্যাধিকার যে দেশে মেনে নেওয়া হয়েছে সেই পাশ্চাত্যেও Miss Walker বিয়ের পর তাঁর স্বামীর পদবী অনুসারে হ'বেন Mrs Jackson, আমাদের দেশে তো কথাই নেই।

৪ক। নামের পদবী

(ভ্রম সংশোধন)

গত আষাঢ়ের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'নামের পদবী' প্রবন্ধে ৮৩১ পৃষ্ঠায় "Anukana Mazumdar Nee Basu" স্থলে Anukana Mazumdar Miss Basu" ছাপা হয়েছে। এই ভ্রমপ্রমাদের জন্ম আমরা দুঃখিত।

বিঃ সঃ

"বুকের বীণা"র কবি

শ্রীঅবনীনাথ রায়

"বুকের বীণার" কবির নাম আজ বাংলা সাহিত্যে সকলেরই পরিচিত। সংখ্যায় এত অল্প কবিতা লিখে আর কোন লেখক বা লেখিকা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তার প্রধান কারণ হচ্চে এই যে তাঁর কবিতার মধ্যে এমন কিছু আকর্ষণ আছে যা পাঠক-মাত্রকেই কাছে টানে। তাঁর কবিতা পড়ে আমার ধারণা হয়েচে যে অপরাজিতা দেবীর কবিতার আকর্ষণ হচ্চে সাধারণ এবং স্বাভাবিক বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন এবং তার সহজ এবং অনাড়ম্বর ব্যাখ্যান। তাঁর কবিতা পড়তে সুরু করলে কবিতা পড়্‌চি ব'লে মনেই হয়না—মনে হয় যেন দু'টি লোকের কথাবার্ত্তা চলেচে তাই শুন্‌চি। ফলে পাঠকের মন বিন্দুমাত্রও শ্রান্তি অনুভব করেনা—এই প্রসাদগুণ সর্ব্বপ্রকারের মানুষের মনকে স্পর্শ করতে সমর্থ। হয়েচেও তাই—তাঁর কবিতা সর্ব্বজনপ্রিয় হয়েচে এবং "বুকের বীণা"র তৃতীয় সংস্করণ বেরুতে পেরেচে। আমরা জানি আমাদের বাংলা সাহিত্যে কবিতার বই কি রকম বিক্রি হয়—তার উপর ৫৩ পৃষ্ঠার কবিতার বইয়ের দেড় টাকা দাম এবং তারই তৃতীয় সংস্করণ হওয়া জনপ্রিয়তার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

সম্প্রতি তাঁর "আঙিনার ফুল" ব'লে আর একখানি বই প্রকাশিত হয়েচে। তার গোড়ায় লেখিকা একটু ভূমিকা দিয়ে বলেচেন :—

"রবির আলোয় চন্দ্র কিরণে
ফোটে কত শত রঙীন ফুল ;—
আমি আঁধারের, আমাকে খুঁজিয়া
রসিক জনেরা কোরোনা ভুল।"

এই সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। অনেকদিন থেকেই সাধারণ পাঠক পাঠিকার মনে একটা ধারণা ছিল যে অপরাজিতা দেবী ব'লে বাস্তবিক কোন লেখিকা নেই—ও-লেখাগুলি হচ্চে রাধারাণী দেবীরই লেখা—ছদ্ম নামে। কেননা অপরাজিতা দেবীর লেখাগুলি সাধারণত সম্পাদকেরা রাধারাণী দেবীর হাত থেকেই পেতেন। রাধারাণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিতেন, অপরাজিতা শিলংএ থাকেন। সরকারী কার্য্য উপলক্ষে গত বছর আমি একবার শিলং-এ যাই এবং তিন মাসের উপর সেখানে থাকি। মনে করেছিলুম রাধারাণী দেবীকে ধরে ফেলার এই এক সুবর্ণ সুযোগ—সুতরাং তাঁর কাছে অপরাজিতা দেবীর ঠিকানা চেয়ে পাঠাই। প্রত্যুত্তরে তিনি জানান যে ঠিকানা জানাতে অপরাজিতা দেবীর কঠিন নিষেধ আছে, তবে তিনি শিলংয়ের কোন্ অংশে থাকেন তার একটা সামান্য ইঙ্গিত তিনি আমাকে গোপনে জানান। শিলংএ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যাঁর নাম হচ্চে শিলংয়ের গেজেট অর্থাৎ, শিলংয়ের সকলের বাড়ীর খবরই তাঁর নখদর্পণে। আমি অপরাজিতা দেবীর নাম এবং যে পাড়ায় তিনি থাকেন তার নাম দিয়ে তাঁকে খুঁজে বার করতে এই গেজেটের শরণাপন্ন হলুম। বলা বাহুল্য তিনি কোন সাহায্যই করতে পারলেন না—অপরাজিতা দেবী ব'লে কোন কবি বা লেখিকা শিলংএ থাকেন এ খবরই তিনি জানেন না। অন্যান্য বন্ধু বান্ধবেরাও কোন হদিশ দিতে পারলেন না। তারপর যখন আমি শিলং ছেড়ে আসি তার একদিন আগে সার্ভেয়ার জেনারেলের আপিসের এক ভদ্রলোক খবর দিলেন যে তিনি অপরাজিতা দেবীকে চেনেন এবং সেদিনও আপিস যাওয়ার পথে তাঁকে তিনি দেখেচেন। দুঃখের বিষয় সময় ছিল না বলে এ উক্তির যাথার্থ্য আমি আর যাচাই করতে পারিনি কিন্তু ভূমিকার শেষের দু'টি লাইন যে একটুও অতিরঞ্জিত নয় এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি।

অপরাজিতা দেবীর বলার কথা এখনো ফুরোয়নি এই আমার বিশ্বাস—সেজন্য আশা করি তাঁর পরবর্ত্তী লেখায় বিষয়-বৈচিত্র্যের একটু লীলা দেখ্‌তে পাব।

বাঙ্গলা সাহিত্যে একশত ভালো বই

(আলোচনা)

১। অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্-এ

আষাঢ়ের 'বিচিত্রা'য় বাঙ্গলা সাহিত্যে একশত ভাল বইয়ের যে একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এইরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে কয়েকটি গোড়ার কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ নির্ব্বাচিত পুস্তকগুলি সাহিত্যগুণবিশিষ্ট হওয়া চাই। এখন, সাহিত্য কি সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে লেখকের নিজস্ব বিশিষ্ট অনুভূতি বা মনোভাব বর্জ্জিত প্রাণী-তত্ত্ব বা (দেশের, সমাজের বা সাহিত্যবিশেষের) ইতিহাস সাহিত্য-পদবাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং, পোকামাকড়, জীবজন্তু, রামায়ণের সমাজ, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, সম-সাময়িক ভারত, বঙ্গের মহিলা কবি প্রভৃতি 'পুস্তক সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। কাজেই, উক্ত তালিকায় এই সকল গ্রন্থের স্থান নাই। বইগুলি ভাল কি মন্দ সে প্রশ্নই এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন সাহিত্যেও যে ভাল বই আছে সে কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। শুধু কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস ব্যতীত প্রাগ্‌বৃটিশযুগের কি আর কোন কবিই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার উপযুক্ত নহেন? আমাদের বিরাট বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্য কি সমস্তই বাজে হইয়া গেল? চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচন দাস, কবি-কঙ্কণ, ভারতচন্দ্র—ইঁহারা আমাদের সাহিত্যে কি উল্লেখযোগ্য কিছুই দিয়া যান নাই? তবুও, যে মায়া বলে তাঁহারা এতদিন টিঁকিয়া আছেন সেই মায়া বলেই তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের আকাশে ধ্রুবতারা রূপে চিরকাল বিরাজ করিবেন। আর বোধ হয় অর্দ্ধশত বৎসর যাইতে না যাইতে তালিকায় উল্লিখিত অন্ততঃ অর্দ্ধশত পুস্তক কোন্ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তাহার কেহ খোঁজও রাখিবে না।

তৃতীয়তঃ, লেখক একদিকে যেমন প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন, তেমনই অতি আধুনিক লেখকদের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিতা দেখাইয়া তাঁহার অন্যায়ের মাত্রা বিশেষ ভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। কালের কষ্টিপাথরে যাঁহারা সোনা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা হইয়া গেলেন মেকী, আর যে সকল শিশু-সাহিত্যিকদের অনেকেই দু'দিন বাদে নিশ্চিহ্ন হইয়া মরিয়া যাইবে তাহাদের কপালে দেওয়া হইল অমরত্বের টীকা! অশ্লীলতার কথা আমি তুলিতেছি না। কারণ সাহিত্যের দোষ গুণ বিচারে তাহা আমি সম্পূর্ণ অবান্তর বলিয়া মনে করি। প্রাচীন কি আধুনিক কোন সাহিত্যই অশ্লীলতাবর্জ্জিত নহে। কিন্তু এই সকল তথাকথিত 'তরুণ' সাহিত্যিক শুধুই ফ্রয়েড্ ও হ্যাভেলক্ এলিসের প্যারডি করিয়াছেন, কি সত্যই অনবদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন মহাকাল তাহার বিচার করিবেন। সেজন্য এখনও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত উক্ত তালিকায় আরও কয়েকটি অমার্জ্জনীয় ত্রুটি আছে। কাব্যসাহিত্য হইতে যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কুমুদরঞ্জন মল্লিক নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বঙ্গভারতীর কাব্যভাণ্ডারে ইঁহাদের অবদান তুচ্ছ নহে, অন্ততঃ জসীম উদ্‌দীন বা বুদ্ধদেববাবুর চেয়ে কম নহে। কিন্তু ইহাপেক্ষা আরও বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গদ্য সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ (অমিয় নিমাই চরিত), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (বাল্মীকির জয়) অজিত চক্রবর্ত্তী, নলিনীকান্ত গুপ্ত (সাহিত্যিকা), দীনেন্দ্রকুমার রায় (পল্লীচিত্র)

এবং অতুলনীয় ছোট গল্প লেখক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্থান নাই। ইহাদের প্রত্যেকেই বঙ্গ সাহিত্যের এক একটি দিক আলোকিত করিয়াছেন। ইঁহাদের ছাঁটিয়া দিলে আমাদের গদ্য সাহিত্যের থাকে কি? যিনি আমাদের এই সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মর্য্যাদা বুঝিতে অক্ষম তাঁহার ভাল বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করার বৃথা প্রয়াস কেন? ব্যাপারটা সত্যই হাস্যকর হইয়া উঠে যখন দেখি তাঁহার অপরিসীম আত্মবিশ্বাস। তাঁহার সন্দেহ মাত্র নাই যে "এই তালিকা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ দোষ বর্জ্জিত ও ভ্রমলেশ-হীন।" দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহার নিজের দেওয়া এত বড় সার্টিফিকেট্ মানিয়া লইতে পারিলাম না।

২। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের "বাংলা-সাহিত্যে একশত ভালো বই"এর তালিকা যে বাংলাসাহিত্য-জগতে এক অভিনব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সে সমস্যা সমাধানের জন্য আষাঢ়ের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস আবার 'একশত ভালো বই'য়ের তালিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন,— "এই তালিকা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ দোষবর্জ্জিত ও ভ্রমলেশহীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

বাংলা ভাষায় অসংখ্য ভালো বই আছে। তা'র ভেতর থেকে বাছাই করে' একশত খানার নাম প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব। সেন মশাই এবং দাস মশাই দু'জনেই পক্ষপাতিত্ব করেছেন। সেন মশাইয়ের তরুণ সাহিত্যিকের প্রতি ঔদাসীন্য এবং দাস মশাইয়ের তরুণ-প্রীতি পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীযুক্ত দাস যদি একশত ভালো উপন্যাস, একশত ভালো কাব্য, একশত ভালো জীবনী ইত্যাদি পৃথক পৃথক বিষয়ের এক একটি পৃথক তালিকা রচনা করতেন, তা'হ'লে বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের ওপর এরূপ অবিচার করা হ'ত না তাঁর; আর সাধারণেরও যথেষ্ট উপকার সাধিত হ'ত তা'তে। আমরা বারান্তরে ঐরূপ তালিকা প্রকাশের বাসনা রাখি।

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ এবং গ্রন্থকারগণকে যে দাসমশাই তাঁর ভালো বইয়ের তালিকা থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন এটা খুব দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয়। তারপর আবার তাঁ'র তালিকায় কি মুসলমান গ্রন্থকারগণের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ?

অক্ষয়কুমার মৈত্র—সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম
অতুল গুপ্ত—শিক্ষা ও সভ্যতা, কাব্য-জিজ্ঞাসা
অবিনাশ দাস—পলাশবন
অরবিন্দ ঘোষ—কর্ম্মযোগী, গীতার ভূমিকা, ভারতের নবজন্ম
অশ্বিনীকুমার দত্ত—ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, প্রেম
আকরাম খাঁ—মোস্তাফা চরিত
ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস
উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উনপঞ্চাশী, নির্ব্বাসিতের আত্মকথা
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—মধ্যযুগে বাংলা
কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—রাজপুত কাহিনী, হিন্দু-সমাজ-বিজ্ঞান
কান্তিচন্দ্র ঘোষ—রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
কুমুদরঞ্জন মল্লিক—অজয়, উজানী
কুমুদিনী বসু—শিখের বলিদান
গণেশ মুখোপাধ্যায়—জীবনী সংগ্রহ
গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী
গোলাম মোস্তাফা—রক্তরাগ
গোকুল নাগ—পথিক
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর
চিত্তরঞ্জন দাশ—দেশের কথা, কাব্যের কথা
দীনেন্দ্রকুমার রায়—পল্লীচিত্র, পল্লী বৈচিত্র্য
দুর্গাচরণ রক্ষিত—ভারত প্রদক্ষিণ
দুর্গাদাস লাহিড়ী—পৃথিবীর ইতিহাস
নগেন্দ্রকুমার বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস
নগেন্দ্রনাথ সোম—মধু-স্মৃতি
নলিনীকান্ত গুপ্ত—শিক্ষা ও দীক্ষা, রূপ ও রস, সাহিত্যিকা, ভাবী-সমাজ, বাংলার প্রাণ

নলিনীকিশোর গুহ—বাংলায় বিপ্লব বাদ, ভারতের দাবী, পথ ও পাথেয়

নিখিলনাথ রায়—ইতিকথা, কবিকথা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—ভারত পরিচয়, ভারতের জাতীয় আন্দোলন

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী—বিজিতা, ব্রতচারিণী

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—মেঘদূত

বরকৎ উল্লাহ্—পারস্য প্রতিভা

বিশ্বপতি চৌধুরী—কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

বন্দে আলি মিয়া—ময়নামতীর চর

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস

মোজাম্মেল হক—শাহনামা

মানকুমারী বসু—শুভসাধনা, কাব্য কুসুমাঞ্জলি

মীর মশাফর হোসেন—বিষাদ-সিন্ধু

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—মরীচিকা, কাব্য পরিমিতি

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি—নাগকেশর, জাগরণী

যতীন্দ্রমোহন সিংহ—ধ্রুবতারা, উড়িষ্যার চিত্র

যদুনাথ সরকার—শিবাজী

রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আর্য্যকীর্তি

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র—থার্ড ক্লাশ

রামপ্রাণ গুপ্ত—প্রাচীন রাজমালা

রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য—বাঙ্গালীর বল

রাজনারায়ণ বসু—একাল সেকাল

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ—শঙ্কর ও রামানুজ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—জিজ্ঞাসা, চরিতকথা, জগৎকথা, বিচিত্র জগৎ, নানাকথা

ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়—ফোয়ারা, পাগলা ঝোরা, সাহারা, প্রেমের কথা

শরৎকুমার রায়—অশ্বিনীকুমার, বৌদ্ধভারত

শচীশ চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম জীবনী

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ

শিশিরকুমার ঘোষ—অমিয় নিমাই চরিত

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বৌদ্ধধর্ম্ম

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—বিবেকানন্দ চরিত

সুভাষচন্দ্র বসু—তরুণের স্বপ্ন, নূতনের সন্ধান

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—কীর্তিলতা

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—রামপ্রসাদ, কলিকাতা, একালের ও সেকালের

হরিহর শেঠ—পুরাতনী

হারাণচন্দ্র রক্ষিত—বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বেদান্ত পরিচয়, গীতায় ঈশ্বরবাদ

হেমেন্দ্রকুমার রায়—ঝড়ের যাত্রী, ওমর খৈয়াম

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—দেশবন্ধু স্মৃতি, গিরিশ প্রতিভা

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—প্রতাপাদিত্য, নরনারায়ণ

বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" এবং রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি পুস্তকগুলিও কি দাসমশায়ের অপরিচিত?



ওপারের ঢেউ—শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। পৃঃ ১৮০। দাম দুই টাকা।

পদ্মা—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ৫৫। দাম এক টাকা।

সুরা ও শোণিত—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ৫০। দাম এক টাকা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা জানেন গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যেন কবিতার বন্যা লাগিয়াছে। বাংলাদেশ পলি মাটীর দেশ, তাই প্রতি বৎসরেই এ দেশের কোন না কোন এক অংশ বিপুল বন্যায় বিধ্বস্ত হইতেছে। এ-হেন পলি মাটীর দেশের সাহিত্য যে কাব্য-বন্যায় বিধ্বস্ত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তবে আশা ও আনন্দের কথা এই যে মাঝে মাঝে ইহাদের মধ্যে দুই একখানা কাব্যগ্রন্থ সাহিত্যক্ষেত্রে বেশ একটা গভীর সুর লাগাইয়া যায়।

এই যে রাশি রাশি কাব্য-গ্রন্থ বাহির হইতেছে, কিন্তু ভালো কবিতার বই বাহির হয় কয়খানা? স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই তো কবিতা লিখিবার সাধ যায়, কিন্তু দেশে প্রকৃত সত্যিকারের কবি আছে কয়জন? কয়জনের লেখার মধ্যে সত্যিকারের প্রাণের স্পর্শ দেখিতে পাওয়া যায়? শেষ পর্য্যন্ত আর কয়জনেই বা নিখুঁত কাব্যরস পরিবেশন করিতে পারিবে? বিরুদ্ধ প্রতিকূল সমালোচনায় কিছু যায় আসে না? বিরুদ্ধ সমালোচকের দল যায় ক্ষয় হইয়া, সত্যিকারের কবিতা কিন্তু চিরদিন অমর অক্ষয় ও অপরিম্লান হইয়া থাকে। ব্লাকউড্-ম্যাগাজিন কোয়ারট্‌লি রিভিউ তো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণে একদিন কীট্‌সকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাইরণের অটুট্ বিশ্বাস বেচারী কীট্‌স্ তো সেইজন্যই অকালে প্রাণত্যাগ করিল। কিন্তু আজ তাঁহার Endymion পড়িয়া, Eve of St. Agnes পড়িয়া কে না মুগ্ধ হয়? তারপর ধরুন টেনিসনের কথা। তরুণ কবি যখন তাঁহার Lotus-Eaters, Œnone, Dream of Fair Women, প্রভৃতি অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতাগুলি পুস্তকাকারে বাহির করিলেন, তখন Blackwood Magazine তাঁহাকে কি ঠাট্টাই না করিয়াছিল। "Tennyson is an owl. All that he wants is to be shot, stuffed and stuck in a glass-case, to be made immortal in a museum." (Blackwood Magazine. Vol. XXXI.) অথচ সে-সব কবিতার কি music, কি sensuousness! কীট্‌স্ ও স্পেন্সারও সে-সব লেখার কাছে স্তিমিতাভ হইয়া যায়। তারপর ধরুন Swinburne এর কথা। তাঁহার 'Atalanta in Calydon' ও Poems and Ballads'এর মত কাব্যগ্রন্থ আর হইবে না। কিন্তু কি নিন্দাটাই না তাঁহাকে শুনিতে হইয়াছিল। এত গাল বোধ করি আর কোন কবিই খান নাই। সমালোচকের দল একবাক্যে তাঁহাকে "a threatening terror, an outcast, an abomination" বলিয়া গায়ের ঝাল মিটাইয়াছিল। Ruskin তাঁহার নাম দিয়াছিলেন "the demoniac youth", Whitman বলিতেন, "Isn't he the damnedest simulacrum?" Browning তাঁহার কবিতা পড়িয়া বলিতেন, "a fuzz and froth of words," Carlyle বলিতেন "the miaulings of a delirious cat." এমন কি যে টেনিসন কাহারও সাতেও থাকিতেন না, পাঁচেও

থাকিতেন না, তিনিও নিন্দা করিতে ছাড়িতেন না—"a reed blown by many winds." যে Thomas Hardyর "Tess of the d'Urbervilles" পড়িয়া আমরা মুগ্ধ অবাক হইয়া যাই, Tess এর দুঃখের কাহিনী পড়িতে পড়িতে বুক ফাটিয়া যায়, সেই Tessকেও একদিন সকলেই 'harlot' নামে অভিহিত করিয়াছিল। তাই বলিতেছি বিরুদ্ধ প্রতিকূল সমালোচনায় কিছু যায় আসে না।

আজকাল বাংলা কবিতা পড়িয়া এত দুঃখও হয়! ও-দেশের কবিতার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখি, আমরা কোথায়? কত বহু পশ্চাতেই না আমরা পড়িয়া আছি! আমাদের কবিতার বিষয়-বস্তু শুধু আকাশের মেঘ, বাগানের ফুল, আর নদীর তীরের বুড়ো বট গাছ, আর না হয় অত্যুগ্র উদগ্র উচ্ছ্বাস!

"ওপারের ঢেউ" বইখানির রচয়িতা হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ। ইহাতে আছে শুধু ইংরাজী কবিতার জোলো মিনমিনে অনুবাদ। তাও কবিতাগুলি এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Lahiri Select Poems ও Intermediate Poetical Selections হইতে গৃহীত। তাহার বাহিরে আর লেখকের দৃষ্টি যায় নাই। অর্থাৎ আমাদের সেই আবাল্য-পরিচিত Abou Ben Adhem, Cuckoo, Daffodils, The Hour of Prayer প্রভৃতি কবিতার বিশেষত্বহীন অনুবাদ। লেখকের প্রয়াস ও উদ্যম প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পড়িতে পড়িতে মনে হয় এ কি পদ্য না গদ্য? এক এক সময়ে মনে হয় যেন যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যপাঠ পড়িতেছি। বইএর মধ্যে এমন একটিও কবিতা দেখিলাম না যাহার প্রশংসা করা যায়। তবে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্র ও ছাত্রীদের অনুবাদ হিসাবে প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

তারপর ক্ষেত্রমোহন বাবুর "পদ্মা" বইখানি। নিতান্ত ছেলেমানুষী সব লেখা। নমুনা দিতেছি:—

"তরুণ বুকে বাসক-শয়ন পাতমু আবার দুলালি,
আয় নেচে আয়, তালে তালে ইমন্, খেয়াল, ভূপালি।"

ইহার মানে যে কি, তা একমাত্র দেবতারাই জানেন। "শেষ" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের "পূরবী'র "শেষ" কবিতার হুবহু নকল। এ-রকম করিয়া আর কয়দিন চলিবে?

তারপর পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের "সুরা ও শোণিত"। তিনখানি বইএর মধ্যে এই বইখানি যা একটু ভালো লাগিয়াছে। লেখকের কল্পনাশক্তি আছে যথেষ্ট, ভাষার উপর দখলও আছে জোরালো। তবে উচ্ছ্বাসগুলি অনেক জায়গায় নিতান্ত অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে।

"পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম" হীন মিথ্যা বাণী,
কাহারে বলিব আজ শ্রদ্ধায় আহ্বানি!
কারে দিব ভক্তি উপচার
মর্ম্ম-ছেঁড়া মহা তপস্যার।

শুধু কথা ও প্রলাপের সমারোহ। তবে চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে ইনি কবি হইতে পারিবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস।

হীরা জহরত—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্-এ প্রণীত। মূল্য বার আনা। প্রকাশক, বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা রচয়িতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের এই নূতন শিশুপাঠ্য বইটি এবার শারদীয়া পূজার বাজারে বালকবালিকাদের পক্ষে আকর্ষণের বস্তু হবে। কবিতা, কাহিনী এবং চিত্রের সমাবেশে কি ক'রে শিশু-চিত্ত জয় করতে হয় সে কৌশল জ্ঞানেন্দ্রবাবু আয়ত্ত করেছেন। এ বইখানিতেও তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানির প্রচ্ছদপট চিত্তাকর্ষক এবং ছাপা ঝরঝরে।

মেঘদূত—পণ্ডিত শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য অনূদিত। মূল্য তিন টাকা মাত্র। প্রকাশক—প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মেঘদূতের এ অনুবাদটি পাঠ ক'রে সত্যই তৃপ্ত হলাম। কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত লেখক অথবা অনুবাদকের নামের পূর্ব্বে পণ্ডিত কথাটি সংযুক্ত দেখলে মনের মধ্যে একটু ত্রাসের সঞ্চার হ'ত। মনে হত, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে শৃঙ্খলিত সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষা-কারাগার থেকে অর্থ বেচারীকে মুক্ত ক'রে মূর্ত্তি নির্দ্ধারণ সহজ হবে না। সে ত্রাস বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম এবং সম্পূর্ণভাবে মোচন করেন

পরলোকগত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। মহামহোপাধ্যায়ের ঝরঝরে প্রাঞ্জল লালিত্যময় বাঙ্গলা প'ড়ে পণ্ডিতের বাঙ্গলা যে সব সময়েই পণ্ডিতী বাঙ্গলা না হ'তে পারে তা দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। পণ্ডিত যামিনীকান্তের বাঙ্গলার মধ্যেও সেই গুণ বর্ত্তমান। ভাষা প্রাঞ্জল অর্থপূর্ণ। ফাঁড়া কিন্তু অতি অল্পর জন্যই কেটে গিয়েছে। পণ্ডিত মশায় আরম্ভ করেছিলেন এইভাবে—

ভর্ত্তা-শাপে বিগত-মহিমা কান্ত-ভুলা কোন যক্ষ
বর্ষ-ব্যাপী বিরহ ভুগিতে চিত্রকূটাশ্রমেতে
থাকে,—যাহার জনক-তনয়া গাহনে পুণ্য বারি।
স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুগণ যথা সর্ব্বদা শ্রান্তিহারী॥

কিন্তু সুখের বিষয়, মন্দাক্রান্তার এই "প্রেতমূর্ত্তি" নিরীক্ষণ ক'রে পণ্ডিতমশায় অবিলম্বে সজীব বাঙ্গলা ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার ফলে অনুবাদটি এই মনোমুগ্ধকর রূপ পরিগ্রহ করে—

আপন কর্ম্মে উদাসীন কোন যক্ষ প্রভুর শাপে
বরষের তরে মহিমা হারায়ে কান্তা-বিরহ-তাপে
আশ্রয় নিলা রামগিরি-শিরে, পুণ্য যাহার জল—
জানকীর স্নানে, স্নিগ্ধশীতল ছায়াপাদপের তল॥

যে ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ অক্ষরের লঘু গুরু ধ্বনি নেই, দীর্ঘ যেখানে তার দীর্ঘতা থেকে মুক্ত হয়ে হ্রস্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছে, সেখানে সংস্কৃতছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করলে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়। একমাত্র হাস্যরসাত্মক কাব্যেই তা সফল হ'তে পারে। যথা দ্বিজেন্দ্রলালের—

জানো না কি কদাচন মূঢ়
কর্ণবিমর্দ্দন মর্ম্ম কি গূঢ়।
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপরে করে নাক আদর চিহ্ন,
কিন্তু যদি তা অল্পে অল্পে
সাহেব টানে, হয় মধুর বিকল্পে॥

তৃতীয় ছত্রে "সেটা"র দীর্ঘ প্লুত উচ্চারণ যে-কোনো serious বাঙ্গলা কবিতায় এখনো বহুকাল পর্য্যন্ত অচল হয়ে থাকবে।

বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সুন্দর; এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সুদীর্ঘ মূল্যবান ভূমিকায়, এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিজয়বর্গীয়, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতির মনোহর চিত্রে সমৃদ্ধ। সুতরাং বইখানি রসজ্ঞ পাঠকের চিত্তহরণ করবে তা'তে সন্দেহ নেই।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

দেশের নূতন অবস্থা ও কর্ম্মীদল

সকল সময়ে অশান্তি ও বিক্ষোভের তীব্রতা ও প্রকৃতি সমান না থাকিলেও লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর হইতে কংগ্রেস কর্ত্তৃক আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশ অনেকটা একই প্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। ভারতবাসীদের রাষ্ট্রনীতিক আশা আকাঙ্ক্ষা এবং সরকারের মনোভাব ও নীতির মধ্যে বিরোধের ফলে যে সংঘর্ষের উদ্ভব হইয়াছিল, কংগ্রেসের বর্ত্তমান সংকল্পে তাহার অবসান ঘটিল। ইহাতে দেশে শান্তি এবং স্থিরতার অবস্থা কতকটা ফিরিয়া আসিলেও, সাধারণ ভাবে কংগ্রেসের সমর্থক সকল ব্যক্তিরই এবং বিশেষ করিয়া কর্ম্মীদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কিছুমাত্র না কমিয়া অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ, স্বাধীনতা অংশত বা পূর্ণত লাভ হয় নাই, দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা কিছুমাত্র দূরীভূত হয় নাই, বরং রাষ্ট্রিক অবস্থা শ্বেতপত্র ও সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ফলে জটিলতর হইয়াছে। সেদিন দেশের মধ্যে যে উন্মাদনা দেখা গিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে যে শুধুমাত্র সংঘর্ষের উত্তেজনা ছিল না, তাহা যে প্রকৃত দেশহিতৈষিণা হইতে, দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিবার ইচ্ছা হইতে, অগণিত দেশের লোকের সংখ্যাতীত দুঃখ দূর করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে, তাহাদিগকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অসম্মান, বঞ্চনা, শোষণ, মানসিক ও শারীরিক জড়ত্ব, সামাজিক চেতনার অভাব ও সংঘবদ্ধ জীবনের অক্ষমতা হইতে মুক্ত করিবার দুর্নিবার প্রেরণা হইতে এবং ভারতবর্ষকে বিশ্বসভায় গৌরবে এবং মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর, শান্ত, উত্তেজনাহীন কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহা প্রমাণ করিবার দিন আসিয়াছে। আইন-অমান্য-আন্দোলনে যত লোকে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই যে এই প্রকার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সম্ভব হইতে পারে না; সাময়িক উন্মাদনায় অনেকেই আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, যাঁহারা এই আন্দোলনে সমগ্রদেশের, দেশের কোনও অংশের, বিভাগের, জেলার, অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশের কিংবা কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, যাঁহারা অপরের কাছে ও নিজেদের অন্তরের কাছে, স্বদেশপ্রেমিক ও স্বদেশসেবক বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, বর্ত্তমান কর্ত্তব্যকে গ্রহণ করিবার বর্দ্ধিত দায়িত্ব তাঁহাদের উপর পড়িয়াছে। বর্দ্ধিত এইজন্য বলিলাম যে, বাহিরের উত্তেজনা না থাকায়, কর্ম্মীদিগকে প্রধানত নিজেদের অন্তরের মূলধনের উপরই নির্ভর করিতে হইবে; অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর ভাবে দীর্ঘকাল নীরস ও কষ্টসাধ্য কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; সংঘর্ষমূলক কর্ম্মে যত লোক পাওয়া যায়, ইহাতে কখনই ততলোক পাওয়া যাইবে না, এবং ইঁহাদের সকলের বোঝাই, বর্ত্তমানের কর্ম্মীমণ্ডলীকে বহন করিতে হইবে। কিন্তু, এই অসুবিধার সকলগুলি অপেক্ষাও গুরুতর সমস্যা বর্ত্তমানের কর্ম্মীদের সম্মুখে রহিয়াছে। এতদিন বিরোধ চলিয়াছিল সরকারের সহিত, কাজেই যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা

অধিকাংশ—দেশের লোকের নিকট হইতে শুধু সমর্থন নহে, শ্রদ্ধা, প্রশংসা এবং পূজা পাইয়াছিলেন; ত্যাগে, আত্মোৎসর্গে এবং বিপদবরণে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে এই সংগ্রাম, দেশেরই কোন কোন শ্রেণীর—এবং অনেক সময় কর্ম্মীদের নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে চালাইতে হইবে। ইহাতে লোকের বিরুদ্ধতা পাইবার, স্বার্থহানি ঘটিবার, পূর্ব্ব প্রশংসা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে এবং এই বাধা অতিক্রম করা সহজ হইবে না। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কর্ম্মীদের পক্ষেই এসকল কথা সত্য হইলেও, বাঙ্গালী কর্ম্মীদেরই আত্মপরীক্ষা করিবার, কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার, এবং কর্ত্তব্যানুসরণ সম্বন্ধে দৃঢ়সংকল্প হইবার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে অবশ্য স্বদেশ-প্রেমিকতা, কোনও মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হইবার ক্ষমতা, সাহসিকতা এবং ত্যাগের ও দুঃখ বরণের ক্ষমতা অন্য কোন প্রদেশের যুবকদের অপেক্ষা কম নহে।

কিন্তু, কোনও কষ্টসাধ্য অনাড়ম্বর কার্য্যে দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকিবার ক্ষমতা আমাদের অধিকাংশ লোকের নাই। এই অধ্যবসায়ের অভাব বাঙ্গালীদের পক্ষে জাতীয় দৈন্য বলা যাইতে পারে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা, চরিত্রের সাধুতা, সেবার ইচ্ছা প্রভৃতি বহু মহৎ গুণ এই একটি জিনিসের অভাবে বহুলোকের জীবনেই ব্যর্থ হইয়া যায়।

বর্ত্তমানে কর্ম্মীদিগকে যে প্রকার কার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে তাঁহাদের, অভ্যস্ত আবহাওয়া ও সঙ্গীদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া, আশু ফললাভের আশা বর্জ্জিত হইয়া এবং অজ্ঞ, অনুন্নত ও অপরিচ্ছন্ন লোক ও পল্লীর জলা-জঙ্গল, মশা-মাছি এবং নানাপ্রকার ব্যাধি ও দুঃখের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইবে। ইহাতে তাঁহাদের শক্তি ও দেশপ্রেমের প্রকৃত পরীক্ষা হইবে; এবং যে স্বদেশ এতদিন অনেকের পক্ষে কল্পনার অস্পষ্ট বস্তু ছিল, তাহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সাধনা হইবে।

বাঙ্গালী কর্ম্মীদের অতিরিক্ত অসুবিধার আরও একটি কারণ এই হইবে যে ইঁহারা প্রধানত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক হইবেন; অর্থাৎ ইঁহাদের অধিকাংশ জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার প্রভৃতি কোনও না কোনও ভূম্যধিকারী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইঁহাদের ও কৃষকদের মধ্যে স্বার্থের স্থায়ী বিরুদ্ধতা সৃষ্টি হইয়াছে।

তাহার ফলে একদিকে যেমন কর্ম্মীদের নিজেদের জাগতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনই যাহাদের মধ্যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। দেশের আর্থিক ব্যবস্থার ও দেশের বিভিন্নশ্রেণীর লোকের স্বার্থের এই আভ্যন্তরীণ বৈষম্যের হাত হইতে ইচ্ছা করিলেই কর্ম্মীরা মুক্তি পাইতে পারিবেন না।

এই সকল বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেই নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিলেই মাত্র বাঙ্গালী কর্ম্মীরা বাংলার সম্মানরক্ষা করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ব্যর্থ হইল কেন

নিরুপদ্রব প্রতিরোধের সাহায্যে স্বরাজ লাভের গত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; ইহা যে, আমাদের শাসকবৃন্দের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহা মহাত্মার নিজের উক্তি। শাসক-বৃন্দের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই বলিয়াই, ইহা তাঁহাদের নীতির অথবা আমাদের প্রতি তাঁহাদের মনোভাবের কোনও পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই; যদিও আমাদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা জাগ্রত করিয়া এবং আমাদের জাতীয় দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে মনের অসাড়তা নষ্ট করিয়া, ইহা আমাদের জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধতর ও সিদ্ধিকে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী করিয়াছে।

এই আন্দোলনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহাদের আন্তরিকতাহীনতাকে মহাত্মা এই বিফলতার জন্য দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু, অন্যদিক দিয়াও কোনো রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনের সহিত সমগ্র দেশের লোকের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলে, তাহার সাফল্য লাভ যে সম্ভব নহে, সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধী এই কথাটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার সমগ্র শক্তি হরিজন আন্দোলনে নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ এরূপ কথা মনে করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র হইতে তিনি

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছেন। কিন্তু, ইহাকে অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক প্রয়াস বলা যাইতে পারে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি দেখিয়া একথা মনে করা অন্যায় নহে যে, অন্যান্য কংগ্রেস নেতারাও কথাটাকে এই দিক দিয়া দেখিয়াছেন।

গত আন্দোলন দেশকে কি দিয়াছে

গত আন্দোলন দেশকে কি দিয়াছে, একথা অনেকের মনে উদিত হইতে পারে। দেশের বহুলোক যে নির্য্যাতন, দুঃখ এবং ক্ষতি সহ্য করিয়াছে, তাহার ফলে দেশের লাভ যে কতটা হইয়াছে, তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার থাকিলেও ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাভ এই হইয়াছে যে, এই আন্দোলনই আমাদিগকে ভালভাবে বুঝাইয়াছে যে, দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবিধান না হইলে, দেশের বহু কোটি লোক অনুন্নত ও অবজ্ঞাত থাকিলে, আমাদের রাষ্ট্রিক প্রগতি সম্ভব নহে। ইহার এই উত্তর পাওয়া যাইতে পারে যে, এই সহজ কথাটা অতিশয় সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা যাইত; ইহার জন্য আমাদের এতটা কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিবার প্রয়োজন ছিলনা। প্রয়োজন যে ছিল, তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এই যে, ইহার পূর্ব্বে একথাটা আমরা প্রকৃতপক্ষে এমন ভাবে বুঝিতে পারি নাই, অথবা বুঝিয়া থাকিলেও তাহাকে যথোচিত গুরুত্ব দিতে পারি নাই।

দেশের সর্ব্বশ্রেণীর উন্নয়নের ও তাহাদের সহিত সহযোগিতার কথা মুখে বলিলেও অথবা বুদ্ধি দিয়া বুঝিলেও আমাদের অনেকের মনে এইরূপ একটি অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, এই সকল লোককে বাদ দিয়াও শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকদের চেষ্টাতেই আমাদের অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে। বর্ত্তমান আন্দোলনই আমাদের অনেকের মন হইতে সে ধারণা দূর করিয়াছে।

তদ্ব্যতীত, এই আন্দোলন আমাদের মধ্যে যে উদ্যম ও কর্ম্মের প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে, নূতন কল্পনা ও নূতন সঙ্কল্পের যে সাহস আনিয়া দিয়াছে, ইহার মধ্য দিয়া আমরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়াই, অপরের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে আমাদের মনে ইহা যে সচেতনতা আনিয়া দিয়াছে, আমাদের বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবেনা।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি ও তরুণদল

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতিতে সম্ভবত তরুণ কংগ্রেসকর্ম্মীরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। চাঞ্চল্যপ্রিয়তা তরুণদের পক্ষে স্বাভাবিক। কংগ্রেসের মৃদু ও শান্ত কর্ম্মপদ্ধতি তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট ও খুশী করিতে পারিবে কিনা, সন্দেহ। পাঞ্জাব ইয়ং কংগ্রেসপার্টি, তাঁহাদের এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি দাবী করিয়াছেন এবং একটু উপহাসের সুরে বলিয়াছেন যে, আজ যদি কংগ্রেস অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কার্য্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে, আগামী কাল ইহা বিধবাবিবাহ প্রদান, অবরোধপ্রথা দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ নিবারণ এবং সমাজসংস্কারমূলক এইরূপ অন্যান্য কার্য্য গ্রহণ করিতে পারে।

কংগ্রেসের সমগ্র কর্ম্মতালিকার মধ্যে তাঁহারা একমাত্র কৃষক ও শ্রমিকদিগের সংগঠন কার্য্যটিই প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের মতে (এবং আরও অনেকের মতে) কংগ্রেস এতদিন মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর সহায়তায় কার্য্য চালাইতেছিলেন এবং জনসাধারণের সহযোগিতা পাইবার জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা করেন নাই।

পাঞ্জাবের তরুণ কংগ্রেস কর্ম্মীদের মতের অনুরূপ মত অন্যান্য স্থানের তরুণ কর্ম্মীরাও সম্ভবত পোষণ করিয়া থাকেন। আমাদের তরুণদলের রাষ্ট্রিক চিন্তা, ইউরোপের একটা বিশেষ রাষ্ট্রিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে এবং সেই কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিবার, তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার, তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টাকে আমাদের রাষ্ট্রিক প্রগতির পক্ষে তাঁহারা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন।

আমাদের কৃষক এবং শ্রমিকেরাই দেশের অধিকাংশ লোক, তাহাদিগের সহযোগিতা ব্যতীত দেশের মুক্তি কখনই

ম্ভব হইবে না। যদিও বা মুক্তিলাভ সম্ভব হয়, তাহা হইলেও, দেশের অধিকাংশ লোকের যাহাতে কোনও স্থান নাই, তাহা নিরর্থক হইবে।

কিন্তু, এই শ্রমিক এবং কৃষকদিগকে কি ভাবে সংঘবদ্ধ করা যাইবে। নানাকারণের সমবায়ে দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সম্প্রদায় ও দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে ইঁহাদের বাক্যে বা কার্য্যে জনসাধারণ সহসা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। এই সকল লোকের সেবার দ্বারা, নানা উপায়ে তাহাদের উন্নতির আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা, তাহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে। ইহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলিলেই ইহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবে না।

ইহা ব্যতীত কোনও রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে আদৌ সঙ্ঘবদ্ধ করা সম্ভব কিনা, তাহাও সন্দেহের বিষয়। যে দুঃখ, অপমান, অবিচার এবং বঞ্চনা মানুষের মনে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র অসন্তোষ জাগায়, তাহা দূর করিবার জন্য লোককে বদ্ধপরিকর করা যাইতে পারে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে দুঃখ, তাহা হইতেছে রাজনীতিক অধিকার না পাইবার, রাজনীতিক অধিকার না থাকার জন্য আর্থিক দুর্গতি ভোগ করিবার এবং আশানুরূপ ও উপযুক্ততানুরূপ মর্য্যাদা না পাইবার দুঃখ। কাজেই এই সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে দেশের রাষ্ট্রিক উন্নতির জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়া এবং সেজন্য চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক। রাজনীতিক অধিকার না থাকার জন্য যে আর্থিক দুঃখ, তাহা অবশ্য অন্য সকলকেও সমানই ভোগ করিতে হয়; কিন্তু, যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটে নাই, তাহাদের একথা বুঝিবার মত বুদ্ধির উন্মেষ হয় নাই যে তাহাদের দারিদ্র্যের মূলে দেশের পরাধীনতা রহিয়াছে। তাহাদের দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ কারণ তাহারা দেখিতে পায় জমিদার ও মহাজনের শোষণ। ইঁহারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। ইহাতে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর ইহারা বিশেষরূপে বিদ্বিষ্ট হইয়া আছে। ইহার পরই, মানুষের আত্মসম্মানের উপর আঘাত তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলে। হিন্দু সমাজের ভিতর জন্মগত উচ্চ নীচ জাতি ভেদ আমাদের আভিজাত্যের অত্যন্ত পীড়াদায়ক আস্ফালন, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় এই সকল লোককে আঘাত করিবার সহস্র প্রকার ব্যবস্থা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিকদের মনে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই, এই সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রথম যে জাগরণ আসিয়াছে, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকারে আসিয়াছে।

কৃষক ও শ্রমিকদের মনে রাষ্ট্রনীতিক চেতনা আনিতে হইলে, প্রথমে তাহাদের সর্ব্বপ্রধান দুঃখ দূর করিতে হইবে; অর্থাৎ তাহাদের দারিদ্র্যের দুঃখ, অসম্মানের দুঃখ, অস্পৃশ্যতার দুঃখ দূর করিতে হইবে। তাহাদের অনেক দুঃখের মূল যে রাজনৈতিক; একথা বুঝিবার জন্য কিছু পরিমাণ শিক্ষা তাহাদিগকে দিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি যাহারা তাহাদিগকে এতদিন নানাভাবে পীড়ন করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, তাহাদের কতকগুলি লোক নিজেদের স্বার্থের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য যে প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছুক হইয়াছে, দীর্ঘদিনব্যাপী অকপট সেবার দ্বারাই মাত্র তাহাদের মনে এ বিশ্বাস উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। তাহারা যখন বুঝিতে পারিবে যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও তাহাদের স্বার্থ অভিন্ন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের শোষক ও শোষিতের সম্বন্ধ নহে, দেশের কাহারও কাছে কোনও বঞ্চনা এবং অসম্মান নাই, আরও সম্মান ও পূর্ণতর অধিকার পাইতে হইলে, রাষ্ট্রিক প্রগতি অপরিহার্য্য, তখনই মাত্র তাহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে, দেশকে নিজের মনে করিতে পারে এবং তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে। ইহার জন্য যে দীর্ঘকাল-ব্যাপী চেষ্টার প্রয়োজন তাহা না করিয়া, যদি আমরা অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি, তাহা হইলে তাহার দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধ হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

এই উদ্দেশ্যে কাজ করিতে হইলে, কৃষক ও শ্রমিকদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশার কাজে কর্ম্মীদিগকে মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। তাহাদিগকে ঋণমুক্ত করিবার, তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল করিবার, স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার, সামাজিক মর্য্যাদা বাড়াইবার ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মতালিকানুসারে

কাজ করিতে পারিলে, এই কাজ অনেকটা অগ্রসর হইবে এবং জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিবার কথা তখনই মাত্র উঠিতে পারিবে। এই দিক দিয়া দেখিলে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতিকে সমাজ-সংস্কারমূলক দেখিতে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে পূর্ণমাত্রায় রাজনীতিমূলক বলা যাইতে পারে।

পাঞ্জাবের তরুণ কংগ্রেস দল

পাঞ্জাব ইয়ং কংগ্রেস পার্টির একটি বিবৃতির বিষয় অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। পাঞ্জাবের গণজীবনকে সর্ব্বপ্রকার কলুষ ও পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাতে নূতন প্রাণ সঞ্চারের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া এই দলটি গঠিত হইয়াছে।

সমাজে এবং ধর্ম্মে যে গোঁড়ামি, ধর্ম্মান্ধতা, এবং অসহিষ্ণুতা একাধিপত্য করিতেছে, আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনে যে লুব্ধতা, স্বার্থপরতা এবং অসততা প্রভুত্ব করিতেছে, সে সকল সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত এই দলটি, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে ক্ষান্ত হইবে না। অগ্রগতির পদক্ষেপ যাহাতে মৃদু হইয়া না যায়, জীবনী-শক্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এইজন্য ইঁহারা ৪০এর ঊর্দ্ধ বয়স্ক কাহাকেও এই দলে গ্রহণ করিবেন না।

ইঁহারা কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক দলাদলির মধ্যে যাইবেন না এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের স্বরূপ কি হইবে তাহা লইয়া মারামারি করিয়া শক্তিক্ষয় করিবেন না। ইঁহাদের রাষ্ট্রিক আদর্শ অবশ্য কংগ্রেসেরই অনুরূপ এবং ইঁহারা কংগ্রেসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আমাদের স্থানীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানগুলি আমরা যোগ্যতা ও সাধুতার সহিত চালাইতে পারিনা বলিয়া আমাদের যে অখ্যাতি আছে, তাহা দূর করিবার জন্যও ইঁহারা প্রাণপণ করিবেন।

বাংলাদেশেও সমাজে ও ধর্ম্মে গোঁড়ামি, ধর্ম্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতা আছে, এখানকার আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনও সর্ব্বপ্রকার অন্যায় হইতে মুক্ত নহে। স্থানীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানগুলিকেও যে আমরা অনিন্দনীয় যোগ্যতা অথবা সন্দেহাতীত সাধুতার সহিত চালাইতে পারিতেছি, এমন নহে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক মনোভাববিশিষ্ট যুবকেরা পাঞ্জাবের যুবকদের ন্যায় সংঘবদ্ধ হইয়া অনুরূপ আদর্শের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। তাঁহাদের এই প্রকার কার্য্যে দেশের মধ্যে যেমন নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হইবে তেমনই নিজেদের শক্তির অনুরূপ কর্ম্মক্ষেত্র পাইলে, যুবকদের কোনও হিংসাত্মক মতবাদ অথবা কোনও গুপ্ত কর্ম্মপন্থার প্রভাবাধীন হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

সর্ব্বোপরি, বাংলার রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক গণজীবনের সর্ব্বত্র, যে স্বার্থান্ধ এবং হীন দলাদলি বাঙ্গালীর লজ্জার কারণ এবং উন্নতির অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এমন একদল যুবকের সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন হইয়াছে, যাহারা সত্যকথা বলিবার, উচিত কাজ করিবার, প্রভুত্বের মোহ তুচ্ছ করিবার, কোনও লোকের অর্থ, প্রতিপত্তি, অথবা ক্ষমতার অন্যায় প্রভাব হইতে দূরে থাকিবার শক্তি রাখে এবং আমাদের গণজীবনকে বর্ত্তমানের দুর্গতি হইতে মুক্ত করিতে পারে।

যশোর মিউনিসিপালিটির মহিলা সদস্য

গত মার্চ্চে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভোটারগণের নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া শ্রীযুক্তা আমেনা খাতুন যশোর মিউনিসিপালিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কলিকাতার বাহিরে ইনিই সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচিত মিউনিসিপাল মহিলা সদস্য। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে যশোহর মিউনিসিপালিটির মনোনীত সদস্যদের মধ্যেও একজন মহিলা আছেন। আমাদের গণজীবনেও মহিলাদের করিবার মত কার্য্য এবং উপযুক্ত স্থান আছে। কিন্তু, অন্তঃপুরের বাহিরে সাধারণ ভাবে নারীদের গতিবিধি না থাকায় এখনও গণজীবনে তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; এই জন্য যাঁহারা প্রথমে এই কার্য্যে অগ্রণী হইতেছেন এবং যাঁহারা তাহাতে সহায়তা করিতেছেন, উভয়পক্ষই বিশেষ প্রশংসা এবং সম্মান পাইবার যোগ্য।

পূর্ণিয়ায় মহিলা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট

শ্রীযুক্তা সত্যবতী রায় (পরলোকগত গোকুলকৃষ্ণ রায়ের বিধবা পত্নী) পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্য দিয়া মেয়েরা দেশ সেবার কার্য্যে যথেষ্ট আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং উচ্চতম হইতে আরম্ভ করিয়া বড়, মাঝারি, ছোট সর্ব্বপ্রকার সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। শান্তির সময়ে গঠনমূলক কার্য্যে তাঁহাদের অংশ গ্রহণ এবং সম্মান প্রাপ্তি বিশেষ আনন্দের কথা। নাম দেখিয়া মনে হইল, শ্রীযুক্তা সত্যবতী রায় বাঙ্গালী। অনুমান সত্য হইলে, বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী মহিলার এই জনপ্রিয়তার প্রমাণে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

ইহাই তোমাদের মাতৃভূমি

অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান নেতা সার হেন্‌রি গিড্‌নি ব্যাঙ্গালোরের ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান বল্‌ড্‌উইন স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষের মাটীতেই তোমাদের বহুসংখ্যক পিতৃ-পুরুষের অস্থি সমাহিত আছে ; এখানেই তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এখানেই তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, অতএব ভারতবর্ষের জন্য তোমরা গৌরব অনুভব কর, ইহাই তোমাদের মাতৃভূমি।...যদি এখানে তোমরা তোমাদের উচিত প্রাপ্য চাও, তবে ভারতবর্ষকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিতে কখনও লজ্জিত হইও না।

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস অপেক্ষা, তাহার বর্ত্তমান ইতিহাস হইতেই অধিক শিখিতে হইবে ; ভারতবর্ষ তোমাদের নিকট হইতে যাহা প্রত্যাশা করে, সেদিকে তোমাদের মনোযোগ দিতে হইবে। **এই দেশের ভাষা শিখিয়াই মাত্র তোমরা এই দেশবাসীদের অন্তঃকরণের অধিকতর সন্নিকটে আসিতে পারিবে।**

অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানেরা তাঁহাদের পাশ্চাত্যের দিকটা সম্বন্ধে বড় বেশী সচেতন হওয়ায়, নিজেদের ভারতীয় জাতির অংশ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই অথবা ভারতবর্ষের গৌরবে গৌরব বোধ করিতে পারেন নাই। কিন্তু, কোনও জাতিই তাহার ভিন্নদেশীয় রক্তের গৌরবে, নিজেদের বাসভূমির প্রভাব ও স্বার্থকে অস্বীকার করিতে পারে না এবং প্রতিবেশীদের সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের স্বার্থও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না, অথবা গৌরব ও উন্নতির অধিকারী হইতে পারে না। এই ভাবে পৃথক থাকিবার চেষ্টা করিলে যে ক্ষতি হয়, তাহা শুধুমাত্র এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সমগ্র দেশের স্বার্থও ইহাতে নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের বহির্দেশিক প্রীতি, তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায় এবং ভারতবর্ষের পক্ষে সমস্যা ও ক্ষতির কারণ হইয়া রহিয়াছে।

অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বলিয়া, তাঁহাদের বহির্দেশিক প্রীতি দেশের পক্ষে এখনও ততটা সমস্যার কারণ হইয়া উঠিতে পারে নাই, যদিও ইহা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা লাভের পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় হইয়াছে।

মানুষে মানুষে মিলনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা হইতেছে, ভাষার বাধা। কোনও দেশে বাস করিয়া, সেই দেশের ভাষা গ্রহণ না করিলে, অন্ততঃ শিক্ষা না করিলে, দেশের লোকের সহিত কখনও পূর্ণ ঐক্য স্থাপিত হয় না, তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগের সহিতও সঠিক পরিচয় ঘটেনা। এদেশবাসী অন্যান্য লোকেদের নিজেদের অপেক্ষা ছোট মনে করেন বলিয়াই, তাহাদের ভাষা শিখিবার প্রয়োজনীয়তা ইঁহারা এতদিন উপলব্ধি করেন নাই।

ভাষার সীমানা সব দেশেই ভৌগোলিক ; একই দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষা এই দেশের বিশেষ সমস্যা।

দি ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেস্‌

গত জানুয়ারি মাসের ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশনে 'দি ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেস্‌' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার প্রস্তাব ধার্য্য হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের গঠন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত

ভারতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি যথেষ্ট তৎপরতা ও উপযুক্ত সতর্কতার সহিত কাজ চালাইতেছেন।

কিন্তু, ১লা এপ্রিল তারিখে বাঙ্গালোরে "জয়েন্ট কনফারেন্সেস্ অব সায়েন্টিফিক অরগ্যানিজেসন্স্ অব সাউথ ইণ্ডিয়া"র অধিবেশনে সার সি-ভি-রামন প্রমুখ কতিপয় বৈজ্ঞানিক পূর্ব্বোক্ত কমিটিকে আক্রমণ করেন। তাঁহাদের বক্তৃতার যে সারাংশ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে "কলিকাতা" ও কলিকাতার "বৈজ্ঞানিকগণে"র বিরুদ্ধে যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহাদের উষ্মার কারণ সম্ভবত পাছে কলিকাতা উক্ত একাডেমির কেন্দ্র হইয়া পড়ে—এই ভয়। রামন প্রমুখ ব্যক্তিগণের হীন আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়া, ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও ডাঃ আথারকর, (ইণ্ডিয়ান সায়েন্স একাডেমির সেক্রেটারিদ্বয়) যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতেই রামন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের এই আক্রমণের পিছনে যে মনোভাব ছিল, তাহা ভালভাবেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ডাঃ সাহা বলিয়াছেন, ডাঃ রামন ও উপরিউক্ত কমিটির সভ্য ছিলেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই নিজের প্রস্তাবসমূহ কমিটিতে উত্থাপিত করিতে পারিতেন এবং কমিটির কার্য্যাবলীও প্রভাবিত করিতে পারিতেন। পরিতাপের বিষয়, ডাঃ সাহা ও ডাঃ আথারকরের বিবৃতির পরও ডাঃ রামন দমেন নাই। "একাডেমি"র বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য সমান ভাবে চালাইতেছেন।

"রামন"-একাডেমি

ভারতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ ডাঃ রামনের এই মনোভাবের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও তিনি নিজেই 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স' নামে বাঙ্গালোরে গত জুন মাসে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। আমরা উহাকে "রামন একাডেমি" বলিব। 'রামন একাডেমি'র প্রথম সভায় বক্তৃতা করিবার সময় ডাঃ রামন, কেন যে স্বতন্ত্র একাডেমি স্থাপন করিলেন, তাহার কারণ প্রদর্শন ছলে, বাঙ্গালোর যে ভারতের কেন্দ্র তাহা সপ্রমাণ করিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন—যদিও একবৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ভারতের জ্ঞানকেন্দ্র বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। অবশ্য ডাঃ রামন ইঁহার উত্তরে বলিতে পারেন যে, একবৎসর পরে তাঁহার এবিষয়ক জ্ঞান যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। ডাঃ রামনের স্বতন্ত্র একাডেমি প্রতিষ্ঠার আর একটা কারণ, পূর্ব্বোক্ত একাডেমির কেন্দ্রস্থল কলিকাতা হইলে, 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'এর সহিত ইহার সংযোগ স্থাপিত হইবে। যে কলিকাতা ও এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রশংসা কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ রামন পঞ্চমুখে করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে ডাঃ রামনের এবম্প্রকার বিরাগ সঞ্চারের কারণ খুব অস্পষ্ট নহে।

প্রথমতঃ ডাঃ রামন যখন কলিকাতা ও এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রশংসা করেন, তখন তিনি নিজেই কলিকাতায় ছিলেন এবং নিজেকেই হয়ত কলিকাতাস্থ বর্ত্তমান ও ভবিষ্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক সভার কর্ণধার হইবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ রামন একাডেমি ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে এবং বাঙ্গালোরে ইহার কেন্দ্র স্থাপিত হইলে, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের সহিত ইহার সংযোগ স্থাপিত হইবে এবং যেহেতু তিনি ১৫ বৎসরের জন্য উক্ত ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টরের পদে আসীন, সেই হেতু একাডেমির সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডাঃ রামন যে সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া রামন একাডেমি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সকলের মনঃপূত হইতেছে না। সুতরাং অধিকাংশ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক তাঁহার একাডেমির সভ্যপদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

ডাঃ রামনের বাঙ্গালী প্রীতি

আধুনিক ভারতের মানসিক বিকাশে বাঙ্গালীদের অপ্রাদেশিক সেবা ও দান প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিলেও, বর্ত্তমান ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই বাঙ্গালী বহিষ্কার আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গেতর প্রদেশ সমূহে বাঙ্গালীরা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে

নিজেদের জন্য বিশেষ কোনও সুবিধা রাখার চেষ্টা করেন নাই। ভিন্নপ্রদেশের কথা বাদ দিলেও, বাঙ্গালীরা নিজ প্রদেশে প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায়, অর্থে ও পরিশ্রমে, জ্ঞান-লাভের সহায়তার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালীতে অবাঙ্গালীতে কোনও প্রভেদ রাখেন নাই। উপযুক্ত ভারতীয় মাত্রেই যাহাতে এ সকল প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত স্থান পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোনও দিনই ভাবেন নাই যে, এই সকল পবিত্র শিক্ষায়তনে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাদেশিকতার নীচতাই একদিন শিক্ষিত ভারতীয় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে।

নিজ প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া ডাঃ সরকারের সায়েন্স এসোসিয়েসনে যখন স্বভাবতই বাঙ্গালীর প্রাধান্য ছিল, এবং যখন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালীই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন, তখনও উপযুক্ত বোধে একজন অজ্ঞাতনামা মাদ্রাজী যুবককে এই সকল প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদ দিতে বাঙ্গালীরা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কিন্তু, এই মাদ্রাজী যুবক নিজপদের ও নিয়োগকর্ত্তাদের জন্য বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিতে দ্বিধা করেন নাই। শীঘ্রই এসোসিয়েসনের দ্বার বাঙ্গালীদের পক্ষে প্রায় রুদ্ধ হইল। মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে উপযুক্ত অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা আসিয়া এসোসিয়েসনে ভিড় করিলেন। যখন বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে রামনকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিবাদ সাধারণের পক্ষ হইতে হইতে লাগিল, তখন রামনের কোনও কোনও শিষ্য বলিতে চাহিয়াছিলেন, উপযুক্ত বাঙ্গালীর অভাবেই রামন বাঙ্গালীদের সুযোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু এ অভিযোগ যে সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী অধ্যাপকদের অধীনে এই আমলে বাঙ্গালী যুবকেরা যেরূপ কৃতিত্বের সহিত বিজ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন তাহার দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। রামনের প্রাদেশিকতার আর একটি পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন। কুণ্ঠাহীন চিত্তে তিনি বলিয়াছেন, তিনি মাহিনা পাইয়াছেন একস্থান হইতে এবং কার্য্য করিয়াছেন অন্য স্থানে। অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাসিক সাড়ে বারশত মুদ্রা গণিয়া লইয়া, নিজের শক্তি সামর্থ্যের সবটুকুই ব্যয় করিয়াছেন সায়েন্স এসোসিয়েসনে। আরও মজার কথা, সায়েন্স এসোসিয়েসনে গবেষণা করিবার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি লইয়া গিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ডাঃ রামন ইচ্ছা করিলে সহজেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের গবেষণাকার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। না করিবার সম্ভাবিত কারণের একটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্য করিলে, হয়ত এসোসিয়েসন তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইত। দ্বিতীয় কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চালাইলে, তাহার সুবিধা মাদ্রাজীদের অপেক্ষা বাঙ্গালীরাই অধিক পাইতেন। সুখের বিষয়, এসোসিয়েসনের গত সাধারণ সভায় কতিপয় ব্যক্তির চেষ্টায় এসোসিয়েসন হইতে ডাঃ রামনের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মাদ্রাজী কর্ত্তৃত্ব অপসারিত হইয়া, ভারতীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই এসোসিয়েসনে গবেষণা চালাইতে পাবেন, সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকিলে, সকলের সন্তোষের বিষয় হইবে।

ইহার পরও ডাঃ রামন অভিযোগ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরা তাঁহাকে দেখিতে পারেন না। সত্য হইলেও কি ইহা বিশেষ দোষের?

মহাত্মার প্রাণনাশের চেষ্টা

পুণায় মহাত্মার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল এবং অন্য নানাস্থানেও তাঁহার উপর ছোটখাট বলপ্রয়োগের চেষ্টা হইয়াছে। মহাত্মার উদ্দেশ্য যে অনেকটা সাফল্যের দিকে যাইতেছে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলন যে অনেকটা শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, ইহা তাহারই প্রমাণ। যাঁহারা অস্পৃশ্যতা দূরীভূত করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা ইহাতে উল্লসিত হইতে পারেন।

বাংলা ও আসামে বন্যা

পূর্ব্ববাংলা ও আসামের বহুবিস্তৃত অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হইয়াছে এবং তাহাতে এই সকল স্থানের সমস্ত শস্য নাশ, বহু পশুর প্রাণনাশ এবং সংখ্যাতীত লোকের সম্পত্তি নাশ ঘটিয়াছে। বহুলোক—শিশু, বালকবালিকা ও নারী মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছেন। আসামও বলিতে গেলে বাংলারই অংশ। বাঙ্গালীর সেবার শক্তির ও আত্মরক্ষার শক্তির পরীক্ষার এই নূতন আহ্বানে সাড়া দিতে, কষ্টসহিষ্ণু সেবাপরায়ণ যুবকেরা এবং সাহায্যক্ষম গৃহস্থেরা পশ্চাৎপদ হইবেন না বলিয়া আশা করি।

শ্রীসুশীলকুমার বসু



[মধুপর্ক নামে একটি নূতন বিভাগ আরম্ভ হ'ল। এ বিভাগটি মধুপর্কেরই মত পাঁচ রকম বস্তুর সংমিশ্রণে রচিত হবে। শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ এ বিভাগের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেছেন। মধুপর্কের নির্দ্দিষ্ট কোনও রূপ এঁরা এখনও নির্দ্ধারণ করেন নি। কারণ সজীব পদার্থের স্বধর্ম্ম এই যে তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, অতএব গোড়া থেকেই তাকে ধরাবাঁধা কাঠামোয় বেঁধে ফেলা মানেই তাকে ছোট করা। কেবল মাত্র সুনির্দ্দিষ্ট বস্তুকে সম্বল করে নয়, সকল দিক দিয়েই এঁরা মধুপর্ককে শ্রী দান করবেন। এঁদের যত্নে ও পরিশ্রমে বিভাগটি যে উত্তরোত্তর চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠ্‌বে সে বিষয়ে সংশয় নেই। বিঃ সঃ]

বিচিত্র মোটরকার

স্যার ডেনিস্ বার্ণি বিখ্যাত এরোপ্লেন R-100এর নির্ম্মাতা, পাশের ছবির অদ্ভুত মোটরখানি তাঁরই তৈরী। এর



মোটরকারের পিছনের এঞ্জিন খুলিয়া দেখান হইতেছে

গঠনপ্রণালী R-100এর ধরণের এবং সেইজন্যই বাতাসের বাধা অতিক্রম করা এর পক্ষে অনায়াসসাধ্য এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে অন্য গাড়ীর তুলনায় এর পেট্রোলের খরচও প্রায় অর্দ্ধেক। এই গাড়ীর অবয়বের গঠনকার্য্যে যে বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করা হ'য়েছে, তারই ফলে গতিবৃদ্ধির সময় গাড়ীর চাকা ভূমি স্পর্শ করে না বল্‌লেই একরকম চলে,—অর্থাৎ সেই অবস্থায় এর চাকার টায়ারের ঘর্ষণজনিত অপচয় নেই। গাড়ীর গতি যদি কখনও ঘণ্টায় ১৮০ মাইল হয়, তাহ'লে সেই অবস্থায় এ প্রকৃতই ভূপৃষ্ঠের মায়া কাটিয়ে খানিকটা উঁচু দিয়েই দৌড়ে চল্‌বে। এই বিচিত্র গাড়ীর আরও একটা লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় হচ্ছে এই যে এর এঞ্জিন বসানো আছে পিছনদিকে, সাম্‌নে নয়।

অতিকায় বৈদ্যুতিক বাতি

সাধারণতঃ পঞ্চাশটি বাড়ীতে যে পরিমাণ আলো জ্বলে, এই ৫০,০০০ ওয়াট আলো হ'তেও সেই পরিমাণ কিরণ বিনির্গত হয়। এর তিন পাউণ্ড ওজনের আঁশগুলোতে

মত তার আছে, তাতে ১২৫,৬৯৫টা পঁচিশ ওয়াট ম্যাজ্‌দা বাল্‌ব তৈরী হ'তে পারে। ঘরে আলো জ্বেলে আত্মহত্যা



৫০,০০০ ওয়াট্‌ বাতি

কর্‌বার জন্য এর সৃষ্টি নয়, এর ব্যবহার হচ্ছে সবাক চিত্র তোলায়।

পাঁচ বছরে দেড় হাজার মাইল

উত্তর আমেরিকার এস্কিমোদের অশন ও বসন যোগাড় হয় ক্যারিবু (caribou) নামধারী হরিণ থেকে। সনাতন কাল থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে কিন্তু সভ্য জাতির দৌলতে বন্দুক আর গুলি বারুদ পেয়ে এস্কিমোরা যে-ভাবে ক্যারিবু বংশ ধ্বংস করতে আরম্ভ করছে তাতে করে' আশঙ্কা হয় যে অনতিবিলম্বেই তারা একেবারে লোপ পাবে।

তখন এস্কিমোরা খাবে কি? এই চিন্তা ক্যানাডার রাজ-সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে। এস্কিমোদের বংশ খুব বিশাল নয়, সমস্ত পৃথিবীতে মোট এস্কিমোর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশী নয়। সুতরাং খাদ্যের অভাবে তারাও যাতে দেখতে দেখতে লুপ্ত না হয়ে যায় এজন্য ক্যানাডার গভর্ণমেণ্ট চেষ্টার ত্রুটি করবেন না।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর আমেরিকায় ক্যারিবু ছাড়া অন্য হরিণ ছিল না। সেই সময় কয়েকজন পণ্ডিত সাইবেরিয়া থেকে কয়েকটি বল্‌গা হরিণ বা Reindeer এনে এ্যালাস্কায় ছেড়ে দেন। তারপর থেকে ক্রমশঃ তাদের বংশবৃদ্ধি হয়ে এখন তারা সংখ্যায় অগণিত হয়ে উঠেছে।

ক্যানাডার রাজশক্তির বাসনা যে এ্যালাস্কা থেকে একদল বল্‌গা হরিণ উত্তর ক্যানাডায় এনে ছেড়ে দেবেন। ক্যারিবুর পরিবর্ত্তে এস্কিমোরা বল্‌গা হরিণের মাংস খাবে ও চর্ম্মাবরণে শরীর রক্ষা করবে।

লোমেন কর্পোরেশন নামে একটি কোম্পানী এ্যালাস্কা থেকে উত্তর ক্যানাডা—এই ১৫০০ মাইল পথে ৩০০০ বল্‌গা হরিণ তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার গ্রহণ করেছেন। তাঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন যে বছর দু'একের মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে কিন্তু প্রায় ৫ বছরেও তাঁদের ১৫০০ মাইল পথ চলা শেষ হল না।

উত্তর আমেরিকার তুষারাচ্ছন্ন গিরিবর্ত্মের মাঝখান দিয়ে তিন হাজার বুনো হরিণ তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। বল্‌গা হরিণ সহজে ঘরছাড়া হতে চায় না। সময়ে সময়ে যখন দল বেঁধে সব বাধা ভেঙ্গে তারা আবার এ্যালাস্কার দিকে দৌড় দেয় তখন লোমেন



ক্যানাডার পথে

কর্পোরেশনের লোকগুলি কি ভীষণ বিপদে পড়ে সহজেই অনুমেয়। এর উপর আবার প্রবল তুষারপাতে ও তুষার ঝটিকায় সময়ে সময়ে পথচলা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে হরিণেরা যতদূর পর্য্যন্ত এসেছিল, আজও তারা ঠিক সেইখানেই আছে। বাকী দু'শ মাইল পথ এতদিনেও তারা চলতে পারেনি। বসন্তের শেষভাগে হরিণীরা সন্তান প্রসব করে কাজেই শিশু হরিণগুলি দীর্ঘ পথ চলতে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

লোমেন কর্পোরেশনের লোকগুলিকে সকল সময়েই অতি সতর্ক থাকতে হয়। লোলজিহ্ব হিংস্র নেকড়ের পাল দিবারাত্র হরিণদের আক্রমণ করবার সুযোগ খোঁজে; খরস্রোতা তুষার নদীগুলির জলে পড়ে' সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়ে বহু হরিণ ভেসে যায়, প্রবল তুষারঝটিকায় শাবকগুলি চাপা পড়ে—এ সব বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করে লোমেন কর্পোরেশনের লোকেরা।

এই বছরেই বোধহয় এই দীর্ঘ পথ চলা শেষ হবে। এতদিন পর্য্যন্ত এই কাজের জন্য ক্যানাডার রাজসরকার ৬ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন এবং আরও কত যে খরচ হবে সে কথা এখন ঠিক করে বলা চলে না।

ট্রেণের বায়ু শীতল করা

কোন কোন বড় সহরে এ্যামেরিকার ব্যালটিমোর এ্যাণ্ড ওহিয়ো রেলরোড রাত্রিকালে তাদের ট্রেণের ভিতরকার বায়ু শীতল রাখ্‌বার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করে' থাকে।

—মোটরকারে কতকগুলো বরফ রাখা হয় এবং ওই মোটরকার সংলগ্ন একখানা বড় পাখার সাহায্যে বরফের উপর দিয়ে বাইরের বাতাস আকর্ষণ করে' ট্রেণের জানালা দিয়ে ঘুমোবার গাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়,—ট্রেণের ভিতরকার উত্তপ্ত বায়ু উপরের ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়।



ট্রেণের বায়ু মোটরের সাহায্যে শীতল করা হইতেছে

দুর্দ্দম প্রেম

নবীন প্রেমিক তাঁর প্রণয়িনীকে চিঠি লিখেছেন—"তুমি আমার নয়নের তারা, আমার হৃদয়ের কৌস্তুভ, আমার জীবন, যৌবন, সর্ব্বস্ব। তোমার জন্য আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, তুঙ্গগিরি লঙ্ঘন করতে পারি, তুষানলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি।"

"পুঃ—যদি বৃষ্টি না হয়, কাল তোমাদের বাড়ী যাবো।"

নকল চলবে না

নটী—ম্যানেজার বাবু, এবার থেকে থিয়েটারে খাবারের দৃশ্যে নকল খাবার দিলে চলবে না। আজকের তৃতীয় অঙ্কে সে কথাটা মনে রাখবেন।

ম্যানেজার বাবু—তা না হয় রাখবো। কিন্তু আজকের পঞ্চমাঙ্কে যে বিষপাত্রের ব্যবস্থা আছে তাতেও কি নকল চলবে না?

পাজী ছেলে নয়, মাষ্টার মশাই

একজন বিদ্যালয়-পরিদর্শক একদিন এক বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়ে পাশের একটি ক্লাশে অত্যন্ত গোলমাল হচ্ছে শুনে অতিশয় অসন্তুষ্ট হ'লেন। অবশেষে কোলাহল যখন উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌ল তখন তিনি আর সইতে না পেরে, সেই ক্লাশে প্রবেশ করে' যে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী বয়সের ছেলেটি সব চেয়ে বেশী গোলমাল করছিল, তার ঘাড় ধরে' হিড় হিড় করে' টেনে এনে প্রধান শিক্ষকের ঘরে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন, উত্তেজিত

ভাবে তাকে সম্বোধন করে' বল্‌লেন, "এখানে চুপ করে' বোসো, নড়েছ কি ঠ্যাং খোঁড়া করে' দিয়েছি,—আসুন তোমাদের হেড্‌ মাষ্টার ক্লাশ থেকে, তারপর করছি এর বিহিত—"

তিনি রুমালে মুখ মুছলেন।

দরজার সাম্‌নে ঝোলানো পর্দ্দা সরিয়ে ছোট্ট একটি মুণ্ডুর সামান্য একটুখানি অংশ দেখা গেল।

ইন্‌স্পেক্টর চীৎকার করে' উঠ্‌লেন, "কে রে?"

ছোট মুণ্ডুর মালিকের ভীত কণ্ঠ থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ এল "স্যার, আপনি আমাদের মাষ্টার মশাইকে ধরে' এনেছেন।

জবাব দিতে পার্‌তে

"বাবা, পিচের রাস্তা কি করে' করে বাবা? আচ্ছা বাবা, রেডিয়ো কি করে' ফিট করে বাবা?"

"দেখ খোকা, এই নিয়ে তুমি আজ আমাকে হাজারটা প্রশ্ন করেছ। আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও।—তোমার মতন বয়সে আমি যদি আমার বাবাকে এম্‌নিধারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম, তবে আমার বরাতে কি ঘটত?

"তাহ'লে তুমি আমার কথার অন্ততঃ দু'একটারও জবাব দিতে পার্‌তে!"

আপনিই পেলেন

পথের মাঝখান দিয়ে পুরোহিত ঠাকুর চলেছেন, টিকিতে ফুল বাঁধা আছে, হাতে আছে নৈবেদ্যের চালকলা। রাস্তার ধারে কয়েকটি ছোট ছেলে প্রচুর পরিমাণে চীৎকার করে কলহ করছে,—পুরোহিত বল্‌লেন, "কি হয়েছে, তোমরা ঝগড়া করছ কেন?"

সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলেটি বল্‌লে "এই কুকুরটার জন্য ঠাকুর মশাই।" আমরা ঠিক করেছি সবচেয়ে বড় মিথ্যেকথা যে বল্‌তে পার্‌বে, কুকুরটা তাকেই পুরস্কার দেওয়া হবে অথচ সবাই বলছে যে তার মিথ্যেকথা সবচেয়ে বড়—

পুরোহিত শিউরে উঠ্‌লেন, "ছিঃ, ছিঃ, মিথ্যেকথা বলা নিয়ে আবার পুরস্কার। তোমাদের মতন বয়সে মিথ্যে-কথা যে কাকে বলে আমি ত তাই জানতুম না—"

ক্ষুদ্র বাহিনীটি সমস্বরে বল্‌লে "ঠাকুর মশাই, শেষ অবধি কুকুরটা আপনিই পেলেন।"

অসহায় ভগবান

রবিবার দিনের সকাল,—খোকা আর তার বাবাতে কথা হচ্ছে।

"বাবা ভগবান সব করতে পারেন?"

"পারেন বৈকি।"

"মস্ত বড় পাহাড় তৈরী করতে পারেন?"

"নিশ্চয় পারেন।"

"আচ্ছা খুব বড়, ভীষণ বড় পাহাড়?"

"হ্যাঁ, ভগবান তাও তৈরী করতে পারেন।"

"আচ্ছা বাবা, ভগবান সে পাহাড় তুলতে পারেন?"

"খুব, খুব—"

"আচ্ছা, ভগবান এতবড় পাহাড় তৈরী করতে পারেন, যা তিনি নিজেই তুল্‌তে পারেন না?"

খোকার বাবার মুখ গম্ভীর হ'ল, ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বল্‌লেন, খোকা, আমার অফিসের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, এখন আমায় বিরক্ত কোরো না যাও।"

এরকম অবস্থায় খোকার বাবার অফিসের বেলা অবশ্য হ'তে পারে—কিন্তু আমাদের পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে কেউ কি অনুগ্রহ করে' সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে এই অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারেন না?

ভালো ত!



মানুষে ও পশুতে এরূপ কোলাকুলি সকলের পক্ষে নিরাপদ নয়

শ্রীআশীষ গুপ্ত

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

পাহাড়িয়া চিঠি

শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়া শ্রীমতী শৈলজা দেবী ও শ্রীমণিকা সেনগুপ্ত

কল্যাণীয়াসু

বুড়ীগঙ্গার পাড়················বাংলা দেশ !

ভাবছি বসে শৈলশিরে বাজ্‌ছে মনে গভীর ব্যথা,
তোমরা যে আজ গেছ ভুলেই গ্রাম্যগীতি কবির কথা,—
অনেক দিনই হয়নি দেখা, অঝোর-ঝরা বাদল রাতে
কি যে চিঠি লিখ্‌ব তোদের ভাব্‌ছি বসে সজল প্রাতে।
শিলং সহর নয়কো মন্দ ফুল বাগিচার ঝোপে ঝাড়ে
শ্যামল ছায়ার নেইকো অভাব সরল বনের উভয় ধারে,
ঘুমন্ত এই রাজ্যে বসি ভাব্‌ছি আমি কেউ কি জাগি
অনুরাগের গোপন মায়ায় ডাক্‌ছে মোরে দরশ মাগি',...
কাজল আঁখির সজল পরশ জাগিয়ে তোলে মেঘের পরে
কোন অজানার আকুল চাওয়া দেয় গো ব্যথা হর্ষ ভরে ;
আকাশ ভুবন উজল-করা দূর বনানীর শ্যামল শোভা
নিতুই নূতন রঙিন আভা ধ্যানীর চোখে দিব্য লোভা !
নিবিড় ছায়া, গহন মায়া ডাক্‌ছে মোরে অনামিকা
নিত্য মোরে জাগায় ঘুমে সবুজ স্বপন কর্‌ছে ফিকা,
কমলানেবুর দেশ যে বলে পাইনিকো হায় চিহ্নটি তার
ঘুরে ফিরে বনবাদাড়ে আনন্দ মোর অসীম অপার !
কুয়াশারি ওড়না মুখে দেখন-হাসি বাস্‌ছি ভালো
ঐ যে এলো মেঘের রাশি, ওই যে দূরে রোদের আলো !
নাম্‌ল গগন ভুবন ভরে' কোন্ বিরহীর অশ্রুসজল
হয়ত মোদের কিংবা কারো জীবনে আজ বইছে বাদল !
'একটু সবুর কোরতে হবে অন্ততঃ এই মাসেক খানিক
তারপরেতে ফিরবে ঘরে ঘরছাড়া ওই সোণার মাণিক !

শিলং সহর নয়কো নূতন বল্‌তে পারি কি আর আছে,
স্বপন দেশের স্বপন কথাই বল্‌ব কত তোদের কাছে।
মশামাছির নেইকো বালাই, নেইকো কাকের গল্পগাটি
বনে বনে চল্‌ছে নিতুই চড়ুই পাখীর মন্ত্রণাটি,
নাইকো "পাখার" ভনভনানি, ঘামাচি আর গাত্রজ্বালা
নাইকো আপদ বোল্‌তা ভ্রমর আরসুলা ব্যাঙ্‌, বংশীওলা !
অদ্ভুত হায় এই দেশেরি ছাগল পাঁঠার শুভ্র দেহ
বরফগলা ঝর্ণাজলে এদের বুঝি অমল গেহ,
পাহাড়ী সব জোয়ান মেয়ে খাট্‌ছে তারাই পেটের দায়ে
পুরুষ ঝিমায় মদ্যপানে নাচে ধিধিঙ্ আতস গায়ে,
"পুঞ্জি" হতে গুঞ্জরণে পুঞ্জে পুঞ্জে আস্‌ছে তারা
উৎরাই পথ চল্‌ছে সবে নাইকো ভয় পকেট মারা।
"মামা-মামীর-দেশ" যে বলে শুন্‌ছি কাণে দেখ্‌ছি বেশ,
মেয়েরা সব বেড়ায় ঘুরে সোণার পরীর স্বপন দেশ !
ব্যবসা করে হাটবাজারে গুরুগিরির অন্ত নাই
গৃহিণী ও সব্যসাচী, বিদ্যালয়ে নাই কামাই ;
চাপ্‌টা নাকে সুরমা চোখে চেয়েই থাকে অপ্‌সরী
পান খেয়ে আর গান গেয়ে যায় কোন অতীতের সুখ স্মরি,
আর কি লিখি ; এইখানে শেষ, কেমন "টিটু" জগন্নাথ,
গান লিখে আর গল্প শুনে কাট্‌ছে মোদের গভীর রাত,
নিদ্রা এসে পরশ দিয়ে ভোলায় আমার সকল ব্যথা'
নিতুই ভোরে শুন্‌ছি শুধুই সরল বনের মৌন কথা।

হেম



পরলোকগত কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

বিগত ৩রা জুলাই মঙ্গলবার রাত্রি দশটার সময় কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় কয়েকদিনের অসুখ ভোগ করার পর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৭০ বৎসর বয়স হয়েছিল। বাচস্পতি মহাশয়ের মৃত্যুতে শুধু আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রেরই সমূহ ক্ষতি হ'ল না, বঙ্গদেশের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁর সহায়তা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। এ ক্ষতি কত দীর্ঘকালের পর পূরণ হবে তা বলা অসম্ভব।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বাচস্পতি মহাশয়ের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং রোগনির্ণয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ইহার সহিত সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সুযোগ যুক্ত হওয়ায় তিনি ভারতবর্ষের বৈদ্যচিকিৎসকগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় বাচস্পতি মহাশয়ের অপরিমেয় পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের তিনি অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের তিনি একাধিকবার সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন এবং ১৩৪০ সালে কলিকাতায় নিখিল-বঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ মহাসভার নেতৃত্ব করেছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রচার এবং উন্নতিকল্পে তিনি অকাতরে তাঁর শক্তি এবং অর্থ নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ এবং তৎসংযুক্ত দাতব্য চিকিৎসালয় বহুকাল তাঁর কীর্ত্তিকে সকৃতজ্ঞ দেশবাসীর অন্তরে জাগরিত রাখ্‌বে। তিনি তাঁর উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ এই বৈদ্যশাস্ত্রপীঠকে দান করেন। শুধু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তাঁর দানশীলতা নিবদ্ধ ছিল না, পরন্তু বহু নিরন্ন দরিদ্র ব্যক্তিকে তিনি নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। বহু ছাত্র এবং শিষ্যকে আশ্রয় এবং বিদ্যাদান ক'রে জীবনের পথে প্রবর্ত্তিত ক'রে দিয়ে গেছেন।

বাচস্পতি মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় কলিকাতার একজন খ্যাতনামা কবিরাজ। আমরা আশা এবং প্রার্থনা করি তিনি অচিরে সর্ব্বোতভাবে তাঁর স্বনামধন্য পিতৃদেবের উচ্চ আসন অধিকার করতে সমর্থ হবেন। তাঁকে এবং বাচস্পতি মহাশয়ের শোকসন্তপ্তা কন্যাগণকে আমরা আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

জলধর-সম্বর্দ্ধনা

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে পরিচালক-সমিতি গঠিত হ'য়েছে তাঁদের অনুরোধক্রমে তৃতীয় অধিবেশনের বিবরণ 'বিচিত্রা'র পাঠকবর্গের গোচর করা গেল। স্থির হ'য়েছে যে—

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিংবা সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী,—এই তিনজনের একজন মূল সভার পৌরোহিত্য করবেন।

২। অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত ১১ই, ১২ই ও ১৩ই আগষ্ট এই তিন দিন উৎসব। প্রথমদিন অভিনন্দন ও মাঙ্গলিক, দ্বিতীয় দিন সাহিত্য-সম্মেলন, ও তৃতীয় দিন সঙ্গীতাদি।

৩। দেশবাসী কর্ত্তৃক এই প্রবীণ সাহিত্যিককে তাঁর পঞ্চসপ্ততিতম জন্মতিথিতে একটা "অর্থপূর্ণ থলি" উপহার দেওয়া হ'বে।

এই সম্বর্দ্ধনা যা'তে সাফল্য-মণ্ডিত হয় সেজন্য সহায়তা করবার জন্য আমরা দেশের সাহিত্যিকবৃন্দকে আহ্বান করি।

বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন

আমরা শুনে সুখী হ'লাম যে, যে-ক'টি মুষ্টিমেয় বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আছে, তাঁরা সকলে মিলে "বঙ্গীয় কল-ওয়ালা সমিতি" বা Bengal Mill-owners' Association নাম দিয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠিত করে তুলেছেন। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করে বাংলার বস্ত্রের বাজার সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর করায়ত্তে আনয়ন করা। এই সাধু সঙ্কল্প যদি কার্য্যে পরিণত করা যায়,—তবে একদিন বাংলাদেশ বস্ত্রসম্বন্ধে স্ব-সম্পূর্ণ হ'তে পারবে,—এবং তার ফলে কাপড়ের কলগুলিতে বহু বেকারের অন্নের সংস্থান হ'তে পারবে। বাংলাদেশে এমন একটি সমিতির প্রয়োজন ছিল,—এর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন কলের মালিকদের মধ্যে মৈত্রী ও সদ্ভাব স্থাপিত হ'তে পারবে,—অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থেকে দেশের বস্ত্রশিল্প রক্ষা পাবে,—এবং দেশের মধ্যে বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রচারের সহায়তা হ'বে। আমরা এই নূতন সমিতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

মধুচক্র বার্ষিকী

রাঁচির সহরতলী হিন্দুপল্লীতে "মধুচক্র" নামে একটি রবীন্দ্র-সাহিত্য-সেবা প্রতিষ্ঠান আছে,—সেখানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কেমন আলোচনা হয়,—তার একটু আভাস পাঠকবর্গকে দেওয়ার জন্য "মধুচক্রে"র তৃতীয় বার্ষিক উৎসবের একটি বিবরণ এইখানে প্রকাশ করা গেল।

"রাঁচির সহরতলী হিন্দুপল্লীতে স্থানীয় রবীন্দ্র-সাহিত্য-সেবা প্রতিষ্ঠান "মধুচক্রের" তৃতীয় বার্ষিক উৎসব গত ২৩শে বৈশাখ রবিবার শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী সময়োচিত প্রার্থনা করেন। তারপর মধুচক্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবনীশ্বর দাসগুপ্ত মহাশয় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিয়া এবং মধুচক্রের বিগত বর্ষের কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া একটি বক্তৃতা করেন।

মধুচক্রের সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী মহাশয় এই উপলক্ষে 'রবীন্দ্র কাব্যে অনন্তের অনুভূতি' শীর্ষক একটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের নানা কবিতা ও রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহাই দেখান হয় যে 'সীমার ভিতরেই অসীমের বীজ নিহিত এবং তাহাই একদিন সহজ সরলভাবে সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের সহিত মিলিত হয়; জীবনকে যখন আমরা বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে দেখি তখন আমরা ইহা ঠিক বুঝিতে পারি না; কিন্তু যখন অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে ইহার যোগসূত্র বুঝিতে পারি তখনই ইহা উপলব্ধি করিয়া জীবনকে ধন্য করিয়া তুলিতে পারা সম্ভব হয়।'

শ্রীযুক্ত প্রজারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে মোহিত করেন; তৎপরে উৎসব সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায় মহাশয় তাঁহার উচ্চচিন্তা গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণটি পাঠ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ইহা প্রতিপাদন করেন যে জগতে কবিই প্রকৃত সত্যদর্শী; বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে আনন্দ অনুস্যূত রহিয়াছে, সেই কল্যাণময় নির্ম্মল আনন্দের বিচিত্র রসানুভূতি হইতেই কাব্য ও সাহিত্যের সৃষ্টি; এই রসানুভূতি মানুষকে শ্রেয়ের পথে চলিতেই সাহায্য করে; যাহা ক্ষণস্থায়ী স্থূল বিলাস হইতে উদ্ভূত তাহা রসের বিকার মাত্র এবং পরিত্যাজ্য।

এই উৎসব উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, বিষয় ছিল 'রবীন্দ্র সাহিত্যে মানব প্রেম'। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধটি সভায় পঠিত হয়। শ্রীমান দেবপ্রসাদ সেন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন।"

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

আমরা শুনে সুখী হ'লাম যে গত ৩০শে এপ্রিল যে বৎসর শেষ হোলো,—সেই বৎসরে "হিন্দুস্থানে" নূতন জীবন বীমার কাজ হ'য়েছে দু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার। গত বৎসরে হ'য়েছিল,—দু'কোটি টাকার। ব্যবসা বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশি কাজ করা সহজ কথা নয়। আমরা "হিন্দুস্থানের" কর্ত্তৃপক্ষকে এর জন্য অভিনন্দিত করি।

কলিকাতার নূতন মেয়র

কলিকাতা কর্পোরেশনের গণ্ডগোল মেটাতে আমরা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছি। শেষ পর্য্যন্ত মেয়র নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন "হিন্দুস্থানের"ই অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার। তাঁকে আমরা আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। এত বড় প্রতিষ্ঠান "হিন্দুস্থান"ই তাঁর যোগ্যতার জীবন্ত সাক্ষী। এখানে তিনি পঁচিশ বছর আগে সামান্য কেরাণী হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন;—আজ তিনি তার কর্ণধার। কর্পোরেশনের কার্য্যাবলীও যে তাঁর দ্বারা সুদক্ষ-ভাবেই পরিচালিত হ'বে,—সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক বাঙালীর সম্মান

চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ও শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক "Chevalier de la légion d' honneur" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন জেনে আমরা পরম আনন্দিত হ'লাম। এই উপাধি ইংরাজ সরকারের নাইট্‌হুড (Knighthood) উপাধির অনুরূপ। ফরাসী সরকার এই উপাধি যোগ্যপাত্রেই অর্পণ করেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, ও শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়কে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

মোহামাডান স্পোর্টিং ক্লাব

এবার কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে—মোহামাডান্ স্পোর্টিং ক্লাব। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোনো ভারতীয় ক্লাব এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি,—এমন কি মোহনবাগানও নয়। খেলাধূলার জগতে মোহামাডান স্পোর্টিং ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আমরা তাঁদের আমাদের সাদর অভিবাদন জ্ঞাপন করি।

মাইকেল মৃত্যু-বার্ষিকী

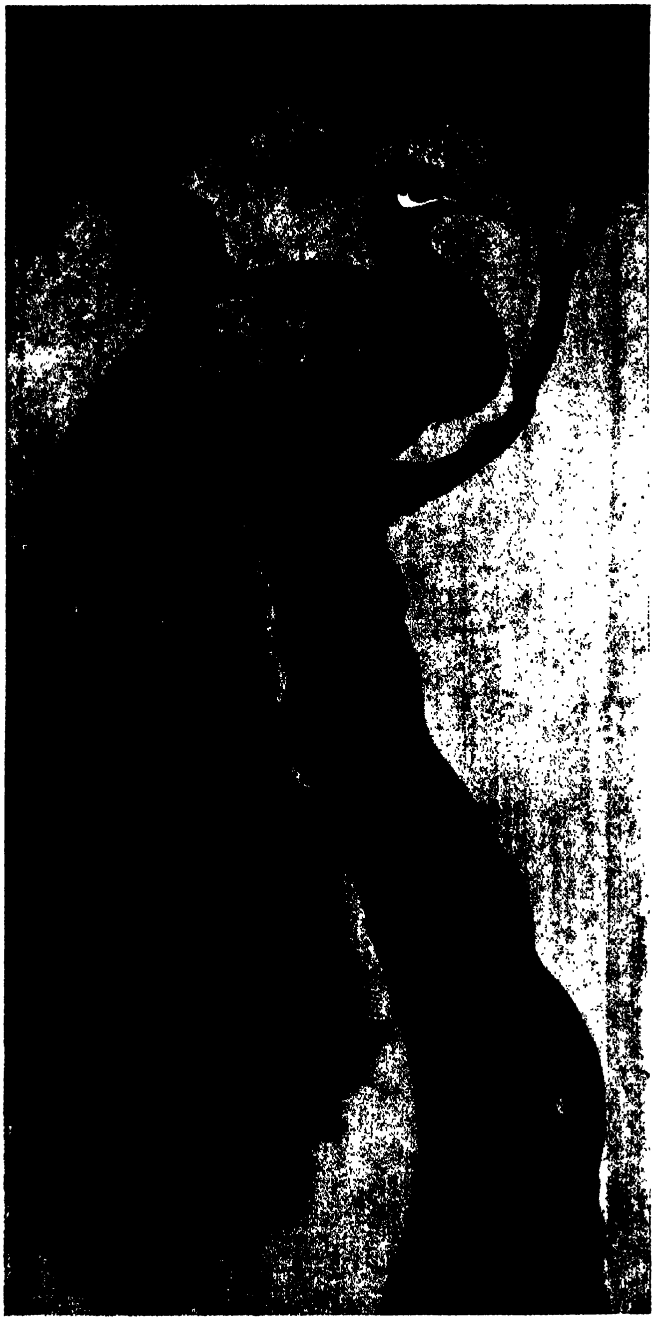
গত ২৯শে জুন প্রাতে খিদিরপুর মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর সভ্যগণ লোয়ার সারকুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হ'য়ে কবি ও কবিপত্নীর সমাধিস্তম্ভ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন ও বেলা আড়াইটের সময় কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে নিম্নলিখিতভাবে সঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান করেন।

(১) গান:—কুমারী ইন্দিরা, পুষ্পরাণী, জয়াবতী ও শ্রীশিবশঙ্কর দাস।

(২) আবৃত্তি:—শ্রীসুধীরকুমার বসু মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩) বক্তৃতা:—শ্রীশিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works
259 Upper Chitpore Road. and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.



বিচিত্রা

অষ্টম বর্ষ, ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৪১ | ২য় সংখ্যা

যাত্রাশেষে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজন রাতে যদি রে তোর
সাহস থাকে
দিনশেষের দোসর যে জন
মিল্‌বে তাকে।
ঘনায় যবে আঁধার ছেয়ে
অভয় মনে থাকিস্ চেয়ে
আস্‌বে দ্বারে আলোর দূতী
নীরব ডাকে॥

যখন ঘরে আসনখানি
শূন্য হবে
দূরের পথে পায়ের ধ্বনি
শুনবি তবে।
কাটল প্রহর যাদের আশায়
তারা যখন ফিরবে বাসায়
সাহানাগান বাজবে তখন
ভিড়ের ফাঁকে॥

অনেক চাওয়া ফিরলি চেয়ে
আশায় ভুলি,
আজ যদি তোর শূন্য হোলো
ভিক্ষা ঝুলি
চমক তবে লাগুক্ তোরে,
অধরা ধন দিক্ সে ভরে
গোপন বঁধু, দেখ্‌তে কভু
পাস নি যাকে॥

অভিসারের পথ বেড়ে যায়
চলিস্ যত,
পথের মাঝে মায়ার ছায়া
অনেক মতো।
বসবি যবে ক্লান্তিভরে
আঁচল পেতে ধূলার পরে
হঠাৎ পাশে আস্‌বে সে যে
পথের বাঁকে॥

এবার তবে করিস্ সারা
কাঙালপনা,
সমস্তদিন কাণাকড়ির
হিসাবগণা।
শান্ত হলে মিল্‌বে চাবি,
অন্তরেতে দেখতে পাবি
সবার শেষে তার পরে যে
অশেষ থাকে॥

দূর বাঁশিতে যে-সুর বাজে
তাহার সাথে
মিলিয়ে নিয়ে বাজাস্ বাঁশি
বিদায় রাতে।
সহজমনে যাত্রা শেষে
যাস্‌রে চলে সহজ হেসে,
দিস্‌নে ধরা অবসাদের
জটিল পাকে॥

শান্তিনিকেতন
২৪ শ্রাবণ
১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপ্রদাস

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাটীর কাছাকাছি আসিতেই দেখা গেল দ্বিজদাস প্রায় রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার করিয়াছে। সম্মুখের মাঠে সারি সারি চালা ঘর—কতক তৈরি হইয়াছে কতক হইতেছে—ইতিমধ্যেই আহূত ও অনাহূতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এখনো কত লোক যে আসিবে তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া কঠিন।

বিপ্রদাসকে দেখিয়া মা চমকিয়া গেলেন,—এ কি দেহ হয়েছে বাবা, একেবারে যে আধখানা হয়ে গেছিস্!

বিপ্রদাস পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, আর ভয় নেই মা, এবার সেরে উঠতে দেরি হবে না।

—কিন্তু কলকাতায় ফিরে যেতেও আর দেবো না তা' যত কাজই তোর থাক। এখন থেকে নিজের চোখে-চোখে রাখবো।

বিপ্রদাস হাসি-মুখে চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা তাঁহাকে প্রণাম করিলে দয়াময়ী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, এসো মা এসো—বেঁচে থাকো।

কিন্তু কণ্ঠস্বরে তাঁহার উৎসাহ ছিল না, বুঝা গেল এ শুধু সাধারণ শিষ্টাচার, তার বেশি নয়। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হয় নাই সে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে মা এইটুকুই জানিলেন। তিনি মৈত্রেয়ীর কথা পাড়িলেন। মেয়েটির গুণের সীমা নাই, দয়াময়ীর দুঃখ এই যে এক-মুখে তাহার ফর্দ্দ রচিয়া দাখিল করা সম্ভবপর নয়। বলিলেন, বাপ শেখায়নি এমন বিষয় নেই, মেয়েটা জানেনা এমন কাজ নেই। বৌমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্চে না,—তাই ও একাই সমস্ত ভার যেন মাথায় তুলে নিয়েছে। ভাগ্যে ওকে আনা হয়েছিল বিপিন নইলে কি যে হতো আমার ভাবলে ভয় করে।

বিপ্রদাস বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বলো কি মা!

দয়াময়ী কহিলেন, সত্যি বাবা। মেয়েটার কাজকর্ম্ম দেখে মনে হয় কর্ত্তা যে বোঝা আমার ঘাড়ে ফেলে রেখে চলে গেছেন তার আর ভাবনা নেই। বৌমা ওকে সঙ্গী পেলে সকল ভার স্বচ্ছন্দে বইতে

পারবেন কোথাও ত্রুটি ঘট্‌বে না। এ বছর ত আর হলো না, কিন্তু বেঁচে যদি থাকি আসচে বারে নিশ্চিন্ত মনে কৈলাস দর্শনে আমি যাবোই যাবো।

বিপ্রদাস নীরব হইয়া রহিল। দয়াময়ীর কথা হয় ত মিথ্যা নয়, মৈত্রেয়ী হয় ত এমনি প্রশংসার যোগ্য কিন্তু যশোগানেরও মাত্রা আছে, স্থান কাল আছে। তাঁহার লক্ষ্য যা-ই হোক, উপলক্ষ্যটাও কিন্তু চাপা রহিল না। একটা অকরুণ অসহিষ্ণু ক্ষুদ্রতা তাঁহার সুপরিচিত মর্য্যাদায় গিয়া যেন রূঢ় আঘাত করিল। হঠাৎ ছেলের মুখের পানে চাহিয়া দয়াময়ী নিজের এই ভুলটাই বুঝিতে পারিলেন কিন্তু তখনি কি করিয়া যে প্রতীকার করিবেন তাহাও খুঁজিয়া পাইলেন না। দ্বিজদাস কাজের ভীড়ে অন্যত্র আবদ্ধ ছিল খবর পাইয়া আসিয়া পৌঁছিল।

বিপ্রদাস কহিল, কি ভীষণ কাণ্ড করেছিস দ্বিজু, সামলাবি কি করে ?

দ্বিজদাস বলিল, ভার ত আপনি নিজে নেননি দাদা, দিয়েছেন আমার ওপর। আপনার ভয়টা কিসের ?

বন্দনা ইহার জবাব দিল, বলিল, ওঁর ভাব্‌না খরচের সব টাকাটা যদি প্রজাদের ঘাড়ে উসুল না হয় তো তবিলে হাত পড়বে। এতে ভয় হবে না দ্বিজুবাবু ?

সকলেই হাসিয়া উঠিল, এবং এই রহস্যটুকুর মধ্য দিয়া মায়ের মনোভারটা যেন কমিয়া গেল, স্মিতমুখে কৃত্রিম রুষ্টস্বরে বলিলেন, ওকে জ্বালাতন করতে তুমিও কি ঠিক তোমার বোনের মতোই হলে বন্দনা। ও আমার পরম ধার্ম্মিক ছেলে, সবাই মিলে ওকে মিথ্যে খোঁটা দিলে আমার সয় না।

বন্দনা কহিল, খোঁটা মিথ্যে হ'লে গায়ে লাগে না মা, তাতে রাগ করা উচিত নয়।

মা বলিলেন, রাগ ত ও করে না,—ও শুনে হাসে।

বন্দনা বলিল, তারও কারণ আছে মা। মুখুয্যে মশাই জানেন পেটে খেলে পিঠে সইতে হয়, রাগারাগি করা মূর্খতা। ঠিক না মুখুয্যে মশাই ?

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক বই কি। মূর্খের কথায় রাগারাগি করা নিষেধ, শাস্ত্রে তার অন্য ব্যবস্থা আছে।

বন্দনা কহিল, মেজদি কিন্তু আমার চেয়ে মুখ্যু মুখুয্যে মশাই। বোধ হয় আপনার শাস্ত্রের এই ব্যবস্থার জোরেই সবাই আপনাকে এত ভক্তি করে। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল। দ্বিজদাস হাসি চাপিতে অন্যত্র চাহিয়া রহিল এবং দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, বন্দনা মেয়েটা বড় দুষ্টু, ওর সঙ্গে কারো কথায় পারবার যো নেই।

একটু থামিয়া একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু দেখো মা, কর্ত্তাদের আমলে প্রজাদের ওপর এ-রকম যে একেবারেই হতোনা তা বলিনে; কিন্তু তোমাকেত বলেছি বিপিন আমার পরম ধার্ম্মিক ছেলে, যা অন্যায়, যা ওর যথার্থ প্রাপ্য নয় সে ও কিছুতে নিতে পারেনা। কিন্তু ভয় আমার দ্বিজুকে। ও পারে।

বিপ্রদাস প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ তোমার অন্যায় কথা মা। দ্বিজু করবে প্রজা পীড়ন! প্রজার পক্ষ নিয়ে ও আমাদের বিরুদ্ধেই একবার তাদের খাজনা দিতে নিষেধ করেছিল সে কথা কি তোমার মনে নেই ?

মা বলিলেন, মনে আছে বলেই ত বলচি। যে ন্যায্য-দেনা দিতে বারণ করে, অন্যায় আদায় সে-ই পারে বিপিন, অপরে পারেনা। দয়া-মায়া ওর আছে,—একটু বেশি পরিমাণেই আছে মানি,—কিন্তু তবু দেখতে পাবি একদিন, ওর হাতেই প্রজারা দুঃখ পাবে ঢের বেশি।

—না মা, পাবেনা তুমি দেখো।

দয়াময়ী কহিলেন, ভরসা কেবল তুই আছিস বলে। নইলে এমন কেউ চাই যে ওকে ঠিক পথে চালিয়ে যেতে পারবে। নইলে ও নিজেও একদিন ডুববে পরকেও ডোবাবে।

দ্বিজদাস এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল এবার কথা কহিল, বলিল, তোমার শেষের কথাটা ঠিক হলোনা মা। নিজে ডুব্‌বো সে হয় ত একদিন সত্যি হবে কিন্তু পরকে ডোবাবোনা এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

মা বলিলেন, এর এটাও সুখের নয় দ্বিজু, ওটাও আনন্দের নয়। আসলে তোকে চালাবার একজন লোক থাকা চাই।

দ্বিজদাস কহিল, এই কথাটাই স্পষ্ট করে বলো যে সকলের ভাব্‌না ঘুচুক। আমাকে চালাবার কেউ একজন দরকার। কিন্তু সে যোগাড় ত তুমি প্রায় ক'রে এনেছো মা।

মা বলিলেন, যদি সত্যিই করে এসে থাকি সে তোর ভাগ্যি বলে জানিস।

তর্ক-বিতর্কের মূল তাৎপর্য্যটা এবার সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল।

মা বলিতে লাগিলেন, এতবড় যে কাণ্ড ক'রে তুল্‌লি কারো কথা শুনলিনে, বল্‌লি দাদার হুকুম। কিন্তু দাদা কি বলেছিল অশ্বমেধ করতে? এখন সামলায় কে বল্‌তো? ভাগ্যে মৈত্রেয়ী এসেছিল সেই ত শুধু ভরসা।

দ্বিজদাস বলিল, কাজটা আগে হয়ে যাক্ মা, তারপরে যাকে খুসি সনন্দ দিও আমি আপত্তি করবোনা কিন্তু এখনি তার তাড়াতাড়ি কি!

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তখন সনন্দ সই করবে কে দ্বিজুবাবু, তৃতীয়-পক্ষ নয়তো?

দ্বিজদাস কহিল, না, তৃতীয় পক্ষর সাধ্য কি! আজও মহাপরাক্রান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ যে তেমনিই বিদ্যমান। বলিতে দুজনেই হাসিয়া ফেলিল।

বিপ্রদাস ও মা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন কিন্তু অর্থ বুঝিলেন না।

অন্নদা আসিয়া বলিল, বন্দনা দিদি, বড়বাবুর ওষুধগুলো যে কাল গুছিয়ে তুললে সেই কাগজের বাক্সটা ত দেখতে পাচ্চিনে,—হারালো নাতো?

—না, হারায়নি অনুদি, কলকাতার বাড়ীতেই রয়ে গেছে।

দয়াময়ী ভয় পাইয়া বলিলেন, উপায় কি হবে বন্দনা, এত বড় ভুল হয়ে গেল!

বন্দনা কহিল, ভুল হয়নি মা, আসবার সময়ে সেগুলো ইচ্ছে করেই ফেলে এলুম।

—ইচ্ছে করে ফেলে এলে? তার মানে?

বন্দনা বলিল, ভাবলুম, ওষুধ অনেক খেয়েছেন আর না। তখন মা কাছে ছিলেন না তাই ওষুধের দরকার হয়েছিল, এখন বিনা ওষুধেই সেরে উঠবেন একটুও দেরি হবে না।

কথাগুলি দয়াময়ীর অত্যন্ত ভালো লাগিল, তথাপি বলিলেন, কিন্তু ভালো করোনি মা। পাড়াগাঁ যায়গা, ডাক্তার বদ্যি তেমন মেলেনা, দরকার হলে—

অন্নদা বলিল, দরকার আর হবেনা মা। হলে উনি নিশ্চয় আনতেন কখনো ফেলে আসতেন না। বন্দনা দিদি ডাক্তার বদ্যির চেয়েও বেশি জানে।

দয়াময়ী প্রশংসমান চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিলেন, বন্দনা কহিল, অনুদির বাড়িয়ে বলা স্বভাব মা, নইলে সত্যিই আমি কিছু জানিনে। যা একটু শিখেচি সে শুধু মুখুয্যে মশায়ের সেবা করে।

অন্নদা বলিল, সে-যে কি সেবা মা সে শুধু আমি জানি। হঠাৎ একদিন কি বিপদেই পড়ে গেলুম। বাড়ীতে কেউ নেই, বাসুর অসুখের তার পেয়ে দ্বিজু চলে এসেছে এখানে, দত্তমশাই গেছেন ঢাকায়, বিপিনের হলো জ্বর। প্রথম দুটোদিন কোনমতে কাটলো কিন্তু তার পরের দিন জ্বর গেল ভয়ানক বেড়ে। ডাক্তার ডেকে পাঠালুম, সে ওষুধ দিলে কিন্তু ভয় দেখালে চতুর্গুণ। মুখ্যু মেয়েমানুষ, কি যে করি, তোমাদেরও খবর দিতে পারিনে, বিপিন করলে মানা,—আকুল হয়ে ছুটে গেলুম বন্দনার কাছে, ওঁর মাসির বাড়ীতে। কেঁদে বললুম দিদি, রাগ করে থেকোনা এসো। তোমার মুখুয্যে মশায়ের বড় অসুখ। বন্দনা দিদি যেমন ছিলেন তেমনি এসে আমার গাড়ীতে উঠ্‌লেন, মাসিকে বলবারও সময় পেলেন না। বাড়ী এসে বিপিনের ভার নিলেন। দিনে-রাত্রে একটি ঘণ্টাও সে ক'টাদিন উনি জিরোতে পাননি। কেবল ওষুধ খাওয়ানোই ত নয়, সকালে পূজোর সাজ থেকে আরম্ভ ক'রে রাত্তিরে মশারি ফেলে শুইয়ে আসা পর্য্যন্ত যা-কিছু সমস্ত। এখন বন্দনা দিদি যদি ওষুধ দিতে আর না চায় মা, অন্যথা করে কাজ নেই, ওতেই বিপিন সুস্থ হ'য়ে উঠবে।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠবো মা, তোমরা ওকে আর বাধা দিওনা, ওর সুবুদ্ধি হোক আমাকে ওষুধ গেলানো বন্ধ করুক। আমি কায়-মনে আশীর্ব্বাদ করবো বন্দনা রাজ-রাণী হোক্।

দয়াময়ী নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া যেন স্নেহ ও মমতা উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

ঝি আসিয়া কহিল, মা, বউদিদি বলচেন কলকাতা থেকে যে-সব জিনিস-পত্র এখন এলো কোন্ ঘরে তুল্‌বেন?

দয়াময়ী জবাব দিবার পূর্ব্বেই বন্দনা বলিল, মা, আমি আপনার ম্লেচ্ছ-মেয়ে বলে আপনার এতবড় কাজে কি কোন ভারই পাবোনা, কেবল চুপ করে ব'সে থাকবো? এমন কত জিনিস ত আছে যা আমি ছুঁলেও ছোঁয়া যায়না।

দয়াময়ী তাহার হাত ধরিয়া একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, আঁচল হইতে একটা চাবির গোছা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, চুপ করে তোমাকে বসে থাকতেই বা দেবো কেন মা? এই দিলুম তোমাকে আমার আপন ভাঁড়ারের চাবি যা বউ-মা ছাড়া আর কাউকে দিতে পারিনে। আজ থেকে এ ভার রইলো তোমার।

কি আছে মা এ ভাঁড়ারে?

এ চাবির গুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত, দ্বিজদাস কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আছে যা ছোঁয়া-ছুঁয়ির নাগালের বাইরে। আছে সোনা-রূপো টাকাকড়ি, চেলি গরদের জোড়। যা অতিবড় ধার্ম্মিক ব্যক্তিরও মাথায় তুলে নিতে আপত্তি হবেনা তুমি ছুঁলেও।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি করতে হবে মা আমাকে?

দয়াময়ী বলিলেন, অধ্যাপক বিদায়, অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মান রক্ষা, আত্মীয় স্বজনগণের পাথেয়র ব্যবস্থা,—আর ঐ সঙ্গে রাখবে এই ছেলেটাকে একটু কড়া শাসনে। এই বলিয়া তিনি দ্বিজদাসকে দেখাইয়া কহিলেন, আমি হিসেব বুঝিনে বলে ও ঠকিয়ে যে আমাকে কত টাকা নিয়ে অপব্যয় করচে তার ঠিকানা নেই মা। এইটি তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

দ্বিজদাস বলিল, দাদার সামনে এমন কথা তুমি বোলোনা মা। উনি ভাববেন সত্যিই বা। খরচের খাতায় রীতিমত ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্চে, মিলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে।

দয়াময়ী বলিলেন, মেলাবো কোন্‌টা? ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্চে মানি, কিন্তু অপব্যয়ের হিসেব কে লিখচে বল্‌তো? আমি সেই কথাই বন্দনাকে জানাচ্ছিলুম।

বন্দনা বলিল, জেনেই বা কি করবো মা? ওঁর টাকা উনি অপব্যয় করলে আমি আটকাবো কি করে?

দয়াময়ী কহিলেন, সে আমি জানিনে মা। তুমি ভার নিতে চেয়েছিলে আমি ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। কিন্তু একটা কথা বলি বন্দনা, তোমাকেও একদিন সংসার করতে হবে, তখন অপব্যয় বাঁচানোর দায় এসে যদি হাতে ঠেকে জানিনে বললেইত জবাব-দিহি হবেনা।

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া কহিল, শুনলেন ত মায়ের হুকুম।

দ্বিজদাস কহিল, শুনলুম বই কি। কিন্তু দাদা দিয়েছেন আমার ওপর খরচ করার ভার আর মা দিলেন তোমাকে খরচ না-করার ভার। সুতরাং খণ্ড-যুদ্ধ বাধবেই, তখন দোষ দিলে চলবে না।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে বলিল, দোষ দেবার দরকার হবেনা দ্বিজুবাবু, ঝগড়া আমাদের হবেনা। আপনার টাকা নিয়ে আপনার সঙ্গেই মক-ফাইট সুরু করবার ছেলেমানুষি আমার গেছে। বাঙ্‌লা দেশে এসে সে শিক্ষা আমার হয়েছে। ঝগড়ার আগে মায়ের দেওয়া ভার মার হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আমি সরে যাবো।

দয়াময়ী ঠিক না বুঝিলেও বুঝিলেন এ অভিমান স্বাভাবিক। ব্যথিতকণ্ঠে কহিলেন, ভার আমি ফিরে নেবোনা মা, তোমাকেই এ বইতে হবে। কিন্তু এখানে আর নয় ভেতরে চলো, তোমার কাজ তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিইগে। এই বলিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

সেদিন বন্দনা এ বাড়ীতে ঘণ্টা কয়েকমাত্র ছিল, কোথায় কি আছে দেখিবার সুযোগ পায় নাই, আজ দেখিল মহলের পরে মহলের যেন শেষ নাই। আশ্রিত আত্মীয়ের সংখ্যা কম নয়, বউ-ঝি নাতি-পুতি লইয়া প্রত্যেকের এক-একটি সংসার। ও দিকটায় আছে কাছারি বাড়ী ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যবস্থা কিন্তু এ অংশে আছে ঠাকুর বাড়ী, রান্না বাড়ী, দয়াময়ীর বিরাট গোশালা এবং উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত

বাগান ও পুষ্করিণী। দ্বিতলের পূবের ঘরগুলো দয়াময়ীর, তাহারই একটার সম্মুখে বন্দনাকে আনিয়া তিনি বলিলেন, মা, এই ঘরটি তোমার, এরই সব ভার রইলো তোমার ওপর।

ওধারের বারান্দায় বসিয়া সতী ও মৈত্রেয়ী কি কতকগুলা দ্রব্য মনঃসংযোগে পরীক্ষা করিতেছিল দয়াময়ীর কণ্ঠস্বরে মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং বন্দনাকে দেখিতে পাইয়া দুজনেই কাজ ফেলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে যে সত্যই আসিবে এ প্রত্যাশা কেহ করে নাই। দিদির পায়ের ধুলা লইয়া বন্দনা মৈত্রেয়ীকে নমস্কার করিল। মা বলিলেন আমার এই ম্লেচ্ছ মেয়েটিও কোন-একটা কাজের ভার চায় বৌমা, চুপ করে বসে থাকতে ও নারাজ। তোমাদের দিয়েছি নানা কাজ, ওকে দিলুম আমার এই ভাঁড়ারের চাবি।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, এ ভাঁড়ারে কি আছে মা?

আছে এমন সব জিনিস যা ম্লেচ্ছ-মেয়েতে ছুঁলেও ছোঁয়া যায় না। এই বলিয়া দয়াময়ী সকৌতুকে হাসিয়া বন্দনাকে দিয়া ঘর খুলাইয়া সকলে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেঝের উপর থরে থরে সাজানো রূপার বাসন,—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মর্য্যাদা দিতে হইবে। কলিকাতা হইতে ভাঙাইয়া টাকা সিকি প্রভৃতি আনানো হইয়াছে, থলিগুলা স্তূপাকার করিয়া একস্থানে রাখা; গরদ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র সকল বস্তাবন্দি হইয়া এখনো পড়িয়া, খুলিয়া দেখার অবসর ঘটে নাই,—এ সকল ব্যতীত দয়াময়ীর আলমারি সিন্দুকও এই ঘরে। হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিলেন, বন্দনা ওর মধ্যেই রয়েছে আমার যথা সর্ব্বস্ব, আর ওর পরেই দ্বিজুর আছে সবচেয়ে লোভ। ওইখানেই পাহারা দিতে হবে মা তোমাকে সবচেয়ে বেশি। আমার মতো তোমাকেও যেন ফাঁকি দিতে ও না পারে।

বন্দনার বিপন্ন মুখের পানে চাহিয়া সতী ভগিনীর হইয়া বলিল, এত বড় কাজের ভার দেওয়া কি ওকে চলবে মা? অনেক টাকা কড়ির ব্যাপার—তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দয়াময়ী বলিলেন, অনেক টাকা-কড়ির ব্যাপার বলেই ওর হাতে চাবি দিলুম বৌমা। নইলে দ্বিজু আমাকে দেউলে করে দেবে।

—কিন্তু ও যে বাইরে থেকে এসেছে মা?

সতীর এ কথাটাও শেষ হইল না, দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, বাইরে থেকে একদিন তুমিও এসেছিলে, আর তারও অনেক আগে এমনি বাইরে থেকেই আমাকেও আসতে হয়েছিল। ওটা আপত্তি নয় বৌমা। কিন্তু আর আমার সময় নেই আমি চললুম। এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বন্দনা বলিল, তোমাদের বাড়ীতে এসে এ-কি জালে জড়িয়ে পড়লুম মেজদি। আমি যে নিশ্বাস ফেলবার সময় পাবো না।

তাই তো মনে হচ্চে বলিয়া সতী শুধু একটু হাসিল।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সামাজিক তথ্য

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

বিগত কয়েক বৎসরের 'চণ্ডীদাস' চর্চ্চায় এটুকু স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ নামে একাধিক কবি বাঙ্গালায় ছিলেন, এবং যিনি বড়ু-চণ্ডীদাস তিনি তাঁহার তথা-কথিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' প্রাক্ চৈতন্য যুগে রচনা করিয়াছিলেন। বড়ু-চণ্ডীদাসের প্রকৃত নামটা কয়েকটি পদের ভনিতায় প্রকাশ পাইয়াছে,—অনন্ত। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের নাম কি? সে নাম প্রাপ্ত খণ্ডিত পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। যে কারণে গ্রন্থের সম্পাদক বসন্ত বাবু উহার 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' নাম দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি: "বহুদিন যাবৎ চণ্ডীদাস-বিরচিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম।... আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুঁথিই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দ্দেশ করা হইল।" (সম্পাদকীয় বক্তব্য, পৃঃ ১০)। বলা বাহুল্য, একাধিক চণ্ডীদাস জানিলে আর এ 'হেতু' তেমন টেঁকে না। ৺রমণী-মোহন মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস'এর ভূমিকায় (পৃঃ ২১, দ্বিতীয় সং) পাই, "উইলসন (Wilson) সাহেব কৃত 'উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস উভয়ে মিলিত হইয়া 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রণয়ন করেন········" ইত্যাদি। তাহা হইলে, যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অস্তিত্বের কথা শুনা যায়, তাহা একা কোনও 'চণ্ডীদাস' এর রচনা নয়। কিন্তু আবার, কোনও চণ্ডীদাসই কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, উইলসন সাহেব এমন কথা বলেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে 'বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাস' এর রচিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের উল্লেখ আছে (১) বাঙ্গালীবিদ্যাপতির (২) সহিত একত্র হইয়া কবিরাজ রামচন্দ্র দাসের ভ্রাতা গোবিন্দ দাস নামধারী প্রসিদ্ধ (বাঙ্গালী) পদ-কর্ত্তার কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করা অসম্ভব নয়। 'গোবিন্দদাস ও চণ্ডীদাসের' কৃষ্ণকীর্ত্তন, ইহাও প্রমাণ থাকিলে মানিতে কষ্ট হইত না, কারণ সেস্থলে 'চণ্ডীদাস' দাঁড়াইতেন 'দীন চণ্ডীদাস',—নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। কিন্তু অনন্ত-নামা বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'; ইহা স্বীকার করিতে মন চায়না, একান্ত প্রমাণাভাব। কে জানে, হয়ত প্রকৃত 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' একদিন বাহির হইতে পারে, হয়ত তখন দেখা যাইবে, উইলসন সাহেবের উক্তিই ঠিক। যদি সে দিন আসে, তবে যেমন বিভ্রাট তেমন লজ্জা। তৎপূর্ব্বে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের নাম সোজাসুজি 'কৃষ্ণমঙ্গলে' পরিণত হইলে, এ সকল আশঙ্কা থাকে না।

কিন্তু যতদিন পরিবর্ত্তন সাধিত না হয়, ততদিন 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' নাম চলিবেই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি ধরিয়া অনেক গবেষণা বাঙ্গালা মাসিক ও ত্রৈমাসিকের পৃষ্ঠা ভরিয়াছে। অসীম ধৈর্য্যশালী না হইলে সে সকল পড়িয়া উঠা দুষ্কর, কিন্তু লক্ষণ শুভ। মায়ের পদে অঞ্জলি। তথাপি দেখিতেছি, এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে এখনও বহু বিষয় অনালোচিত রহিয়া গিয়াছে। এমন না হইলে গ্রন্থখানিকে অপূর্ব্ব জ্ঞান করিতে বাধিত। বর্ত্তমানে যে বিষয়টা আলোচ্য, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনে সামাজিক তথ্য। কবির যুগের সামাজিক ইতিহাস জানিবার আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। এ কারণে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বও স্বীকার করিতে হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কথাবস্তুর অল্পাংশই পুরাণ হইতে গৃহীত, এবং অধিকাংশ ভাগ কবির স্বকপোলকল্পিত। কিছুটা হয়ত তাঁহার দেশে প্রচলিত রাধা কৃষ্ণের কাহিনী হইতে লব্ধ। যাহা হউক, কৃষ্ণলীলা গ্রন্থের উপজীব্য হইলেও, কবি অপৌরাণিক অংশে নিজের যুগের ও দেশের

(১) H. H. Wilson's 'Religious Sects of the Hindus,' Works, Vol., I. p. 169.

(২) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৯, পৃঃ [illegible]; [illegible] দ্রষ্টব্য।

সমাজ-চিত্রের কিছু কিছু আভাস দিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি অবশ্য কাব্যের খাতিরে স্থানে স্থানে অত্যুক্তি করিয়াছেন, স্থানে স্থানে অলীক ও কাল্পনিক কথার অবতারণা করিয়াছেন, অলোক্তিও করিয়াছেন। এ সকল বাদ দিয়াও, গ্রন্থে কবির সমাজের কতকগুলি ঠিকানা খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে অভিনবত্ব বড় বেশী নাই। থাকিতেও পারেনা। কারণ, কবির যুগ এমন কিছু অকস্মাৎ উড়িয়া আসে নাই। সে যুগে বাঙ্গালার সামাজিক জীবনের ধারা যেরূপ ছিল, তাহা অনেকটা তদবস্থায় পূর্ব্বেও ছিল, পরেও আমূল পরিবর্ত্তিত হয় নাই। পূর্ব্বের জ্ঞান যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের সমাজের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, বেশ-ভূষা ইত্যাদির সন্ধান প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে কিছু কিছু মিলে। তাহার সহিত তুলনায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সামাজিক তথ্যগুলি যেন অনেকটা জানা-জানা মনে হইবে। কিন্তু তাহাতে হানি হয় নাই।

সামাজিক জীবনের আদর্শ কি ছিল, তাহা কবি নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে বিপরীতার্থে প্রকাশ করিয়াছেন: "কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হৈআঁ দুঠ (দুষ্ট) মনে। প্রবল হৈআঁ সূদ্রে লংঘিব ব্রাহ্মণে॥ পুত্রে বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে। পুণ্য লংঘিব জনে হৈআঁ পাপ মনে॥ সেবকেঁ লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতি। আপনা মজায়িব ব্রত লখিংআঁ সতী॥ শরণ জনের লোকেঁ লংঘিব পরাণ। দাতাএঁ লংঘিব আপনেরি দিআঁ দান॥ সব বিপরীত হৈব রাধা তোহ্মার কাজে।" (পৃঃ ১৭৩)। সমাজ এই আদর্শ-চ্যুত হইলেও ফলে পৃথিবী অত্যধিক পাপভারাক্রান্ত হইলে, "ব্রহ্মা বেদ হরিবেক ইন্দ্র হরিব পাণী। সজন (সজ্জন) সমাজেঁ হরিব সত্যবাণী॥ কপিলা হরিব ক্ষীর সত বসুমতী। ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী॥" (পৃঃ ঐ)। অন্যত্র পাই, "যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী। পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী" (সিদ্ধি)॥ (পৃঃ ৩৬৯)। তাহা হইলে, কবির যুগের না হউক, কবির নিজের ধারণা; বিধি (ব্রহ্মা) বেদ রচনা করিয়াছেন, এবং তাহাতে পাপ-পুণ্যের ফলাফল নির্দ্ধারিত করা আছে। পাপী ব্যক্তি কোনও মহৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠাতা হইতে পারেনা, "আসুর মারিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীর ভার। পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার॥" (পৃঃ ঐ)। পাপ করিলে কি হয়? "হএ নরকের কাজ" (পৃঃ ৩৬৪)। আর "পুণ্য কইলেঁ স্বগ্ গ জাইএ" (পৃঃ ঐ)। সে স্বর্গ এমন স্থান যেখানে "নানা উপভোগ পাইএ" (পৃঃ ঐ)।

কৃষ্ণভক্তজনের অন্তিমে মুক্তি কিংবা সুরপুরে স্থিতি (পৃঃ ১২৩)। তাঁহাকে স্মরণ করিলেও পাপ বিমোচন হয়,— "যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে" (পৃঃ ১৯১)। দেশে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা প্রচলিত ছিল, শুভকার্য্য সম্পাদনের পূর্ব্বে তাঁহার বন্দনা করা হইত, "বন্দিআঁ সব দেবগণে, বড়ায়ি শ্রীরামচরণে" (পৃঃ ১৫)। মনস্কাম পূর্ণ হইবার আশায় নারী চণ্ডীরও পূজা করিত; বড়াই রাধাকে বলিতেছেন, "বড় যতন করিআঁ, চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ, তবেঁ ত্তার পাইবেঁ দরশনে" (পৃঃ ৩৪১)।

শুভকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শুভ তিথি, বার, ক্ষণ বিচার করার প্রথা ছিল (পৃঃ ১৫)। অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার বাঞ্ছায় লোকে গিয়া কুশক্ষেত্রে বিধিমত দান-ধ্যান করিত, পুষ্কর-তীর্থে স্নান করিত, কেদার-ক্ষেত্রে মহাদেবের শির স্পর্শ করিয়া অর্চ্চনা করিত, এবং বদরিকাশ্রমে ও বটেশ্বরে তপস্যা করিত (পৃঃ ২১৫)। সুতীর্থে স্নান ও তপ করিলেও —ঈপ্সিত ফললাভের আকাজ্ক্ষা করিত, বিশেষতঃ নারী পুরুষের প্রেমলাভে সমর্থ হয় এরূপ বিশ্বাস ছিল, "কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী। যা লঞা সুখঋিত ভুঁজয়ে মুরারী" (পৃঃ ৩৮৭); "কে না সুতীথে তপ কৈল ভাগ্যবতী। যে (বে?) নারী কাহ্নের সঙ্গে করে সুরতী" (পৃঃ ২১৫)।

ভৈরব-পত্তনে, অর্থাৎ কোনও শিবক্ষেত্রে গিয়া গড়াগড়ি করিয়া (পৃঃ ৭৬), বা বারাণসী গমন করিয়া (পৃঃ ২৮২) লোকে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিত। গলায় কলসী বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া ("গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসী বান্ধিআঁ" পৃঃ ৭৬), নিজের গায়ের মাংস কাটিয়া সাগর-সঙ্গমে মকর প্রভৃতিকে খাওয়াইয়া ("সাগর সঙ্গমে পিআঁ, গাএর মাঁস কাটিআঁ, আপনা মগর ভোজ দিআঁ" পৃঃ ৩৩৩), অথবা

বারাণসী, গোদাবরী, সাগর-সঙ্গম প্রভৃতি স্থানে গিয়া তনুত্যাগ করিয়া ("যাইবোঁ বারাণসী কিবা গোদাবরী, করিবোঁ তনু তেআগে, সাগর সঙ্গমে তনু তেআগিবোঁ" পৃঃ ২৮৯), তবে অঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইত। মনের দুঃখ অসহ বোধ হইলেও কখনও কখনও লোকে অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া ("আনল শরণ কিবা করিবোঁ" পৃঃ ২৮৯ ; কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ" পৃঃ ৩১৫ ; আনল কুণ্ড কিবা তনু তেআগিবোঁ" পৃঃ ৩১৮), বিষ খাইয়া ("কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাইআঁ মরিবোঁ" পৃঃ ৩১৮), গলায় পাথর বাঁধিয়া জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া (গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ" পৃঃ ৩১৫)—ইত্যাদি প্রকারে আত্মহত্যা করিত। অন্ততঃ, আত্মহত্যার এই সকল পন্থাগুলি লোকের সাধারণতঃ জানা ছিল।

সংসার-বিরক্ত নারী মস্তক মুণ্ডন করিয়া যোগিনী সাজিয়া দেশান্তরী হইয়া নানাস্থানে ও তীর্থে পরিভ্রমণ করিত ("মাথা মুণ্ডিআঁ, যোগিনী হআঁ, বেড়ায়িবোঁ নানাদেশে" পৃঃ ৩৫০ ; "মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর, যোগিনী রূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর" পৃঃ ৩৩৬ ; "যোগিনী রূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ পৃঃ ৩১৮)। পুরুষের পক্ষে দেখিতেছি, তাঁহারা ব্রহ্ম চিন্তা করিত, অথবা 'যোগ-ধেআন' করিত।

জন্মান্তর, কর্ম্মফল, অদৃষ্ট প্রভৃতিতে কবির যুগের বাঙ্গালীর প্রগাঢ় আস্থা ছিল, কারণ এসকল বিষয়ে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সাধারণের দেখিয়া ও শুনিয়া। কবি পুনঃপুনঃ "সব মোর করমের ফল" "পুরুব জনমে কৈল করমের ফলে" ইত্যাদি—উক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার লেখায় পাই, পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ-পুণ্যের বিচারে ইহকালের ভাগ্যলিপি প্রস্তুত হয়, এবং বিধাতা পুরুষ 'সাঠিহারে' অর্থাৎ জন্মের ষষ্ঠ রাত্রে (ষষ্ঠীপূজার রাত্রিতে) এই ভাগ্যলিপি প্রস্তুত করেন। জন্মান্তরে গুরু ও ব্রাহ্মণকে দুঃখ দিলে বিধাতা সাঠিহারে অনেক দুঃখ লিখিয়া দেন (অনন্ত জরমেঁ গুরু ব্রাহ্মণের দিলোঁ নানা দুঃখভারে। তে কারণে বিধি দুঃখ লেখিল সাঠিহারে" পৃঃ ৩০৯), এবং নারী খণ্ডব্রত করিলে (অঙ্গহীন ব্রত করিলে) ইহজন্মে তাহার মনের অবধি থাকেনা, কোনও মনোরথই পূর্ণ হয়না ("করলোঁ খণ্ডব্রত, তার জরমত, তেঁবা দুখিনী মোএঁ। ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ, না ছাড়ে নান্দের পোএ" পৃঃ ৩৮ ; কিবা পুরুব জরমে খণ্ডব্রত কইল আছো, তার ফলে কাহাঞিঁ হারায়িলোঁ", পৃঃ ৩৩৩ ; "পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল। তে কারণে মোর মনোরথ না পুরিল" পৃঃ ৩৯৪)।

মন্ত্রে-তন্ত্রেও লোকের গভীর বিশ্বাস দেখা যায়। সংজ্ঞাহীনা রাধিকাকে কৃষ্ণের 'ধেআন করিআঁ' ঝাড়িবার (পৃঃ ২৮৯) ও কৃষ্ণকে 'নিন্দা-(নিদ্রা) উলী' মন্ত্রে রাধার নিদ্রিত করিবার (পৃঃ ৩১০) প্রচেষ্টা ইহার জলন্ত প্রমাণ।

কবি নিজের যুগের যে সংস্কারগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিদিত হউক অবিদিত হউক, উল্লেখযোগ্য। সাপের মাথায় খঞ্জন দেখিলে দ্রষ্টা রাজপদ পায় (পৃঃ ৭১)। জলপূর্ণ ঘটে 'মঙ্গল' চিহ্ন দেখিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবার আশা থাকে (পৃঃ ৩০৭)। নাম রাখিবার সময় কেহ হাঁচি দিলে, বা টিকটিকির পতন হইলে (জিঠি), বা অন্য কোনও রূপ বাধা উপস্থিত হইলে, সে সন্তানের দুর্ভাগ্য ("কাহ্নিনী মাত্র মোর নাম থুইল রাধা। হাছি জিঠী কেহো তাত না দিল বিরোধা" পৃঃ ১৬)। যাত্রাকালে হাঁচি, জিঠি ও উঝট (চরণাগ্রে আঘাত) বিঘ্নাদির পূর্ব্বসূচনা ("কোণ আসুত খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ। হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ" পৃঃ ৩১৮)। নারীর বা সখিজনের শূন্যকলসী লইয়া অগ্রে গমন, বামের শৃগালের দক্ষিণে প্রস্থান, পথে শাকুন-শাস্ত্রে-অভিজ্ঞ-ব্যক্তি (সগুণী) দর্শন, হস্তে নরকপাল ধারণ করিয়া যোগিনীর ভিক্ষা প্রার্থনা, স্কন্ধে ভাণ্ড লইয়া তৈলকারের গমন, শুষ্ক ডালে উপবিষ্ট কাকের শব্দ—ইত্যাদিও অশুভ লক্ষণ। ভাদ্রমাসের (শুক্লা) চতুর্থী রাত্রিতে জলের মধ্যে হরিতালী চন্দ্র (নষ্টচন্দ্র) দেখিলে, পূর্ণ কলসীতে হাত ভরিলে, গুরুর আসনে গিয়া বসিলে, ভূমিতে জলের আখর কাটিলে ও খণ্ডবিচনীর (সন্দেশ-বিক্রয়কারিণীর) পা গায়ে লাগিলে মিথ্যা অপবাদ বা কলঙ্ক রটে (হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ। ভাদ্র মাসে।। হাথ ভরিলোঁ। কিবা পুরিণ কলসে।। ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ। জলে। কিবা মোকে বরুর আসায় তার ফলে" পৃঃ ২৮৫ ; "আদর

মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী। জল মাঝেঁ দেখিলেঁা মো কি নিশাপতী॥ পূর্ন কলসে কিবা ভরিলেঁা হাথে। তে কারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে॥……গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলেঁা। জলের আধর কিবা ভূমিত লেখিলেঁা॥ খণ্ড বিচনীর কিবা পাঅ তুলী লৈলেঁা গাএ। তে কারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ" পৃঃ ৩২১)।

সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে সংস্কার থাকে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অন্যান্য বহু পুস্তকে নানা সংস্কারের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণকীর্ত্তন-ধৃত কোনও কোনওগুলির সহিত এক, বা প্রায় এক। কিন্তু একত্র এতগুলি বিবিধ সংস্কারের সমাবেশ, বোধ করি, অন্য কোনও বাঙ্গালা গ্রন্থে দেখা যায়না, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও নয়।

সমাজে এক-ঘরে হইয়া থাকার ভয়টা খুবই ছিল। রাধিকার শাশুড়ী রাধিকাকে হাটে পাঠান না,—প্রতিবেশিনী —গোয়ালিনীগণ রুষ্ট হইয়া আসিয়া শাশুড়ীকে জানাইল, "আপণ আপণ বহু (বৌ) হাটক পাঠাইব। তোহ্মার ঘরত অন্নপাণি না খাইব"। মাত্র এই কথা কয়টি শুনিয়াই "ডরে আইহনের মাত্র। প্রণাম করিআঁ বুইল তা সভার পাত্র। কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর" পৃঃ ২০২।

নারীহত্যা করা সমাজে অতীব নিন্দনীয় ও গর্হিত ছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা পাপজনক বলিয়া গণ্য হইত; "শতেক ব্রহ্মবধ নহে যার তুল" (পৃঃ ২৮৪); "শতেক ব্রাহ্মণ আর মারিলেঁ গোকুল। যে পাপ সেহো নহে তিরী বধ তুল" (পৃঃ ২৮২)। স্ত্রী-হত্যার সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত নাকি অধঃপতিত হইল (পৃঃ ২৮৪); লোকে ঘৃণায় তাহাকে ছুঁইত না, "তিরীবধিআ কাহ্নাঞিঁ ল, কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহিঁ ছো, মোরে নাহিঁ ছো কাহ্নাঞি…" পৃঃ ২৮২। এমন কি, স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিলেও নাকি 'হৈব জাতী নাশ' (পৃঃ ২৯১)। স্ত্রীলোকগণ সময়ে সময়ে এই সকল সম্মান ও সুযোগের কিছু কিছু অসদ্ব্যবহার করিতে ছাড়িত না, স্ত্রীহত্যাজনিত পাপের ভয় দেখাইয়া তাহারা পুরুষকে নিজেদের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইতে বাধ্য করিত, "তিরী বধ দিবোঁ মোঞ তোহ্মাতে উপরে, ঝাঁপ দিআঁ যমুনার জলে" পৃঃ ৩৫২; "এহা জানী গদাধর, একবার দয়া কর, নহে তিরী বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে" পৃঃ ৩৬৮।

কবির যুগে বার বৎসরের কিশোরী 'নব-যুবতী,' (পৃঃ ৬০-৬১), অন্যত্র 'ভর-যুবতী', পৃঃ ১০৯। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের আধুনিক বা বঙ্গীয় সংস্করণেও রাধা বার বৎসরেই 'স্থির-যৌবনা' (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১২৬।৯; প্রকৃতি খণ্ড, ৩৫।৫৭—৫৮)। বড়ু-চণ্ডীদাস রাধিকার দেহের উচ্চতা মাপিয়াছেন আট হাত, "আহুঠ হাথ কলেবর তোর" পৃঃ ৫৫। সম্পাদক মহাশয় বলেন, "প্রচলিত প্রবাদ, দ্বাপর যুগে মানব-দেহের পরিমাণ ৭ হাত ছিল। 'হাথ' শব্দে পাণিতল (১০ অঙ্গুলি) ধরিলে রাধার দেহের উচ্চতা ৩॥০ হাতের কিছু কম হয়।" (ভাষাটীকা, পৃঃ ৪৮৮)। কিন্তু সন্দেহ গেলনা। একে কবির কৃষ্ণ দ্বাপরের নয়, কলির অবতার (পৃঃ ৩৫৭), তদুপরি 'ভর-যুবতী'র দেহ সাড়ে তিন হাতের কম করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই 'হাথ' অর্থ বিঘৎ বা বিতস্তি অনুমান করি। তাহা হইলে, সাড়ে তিন হাতের একটু বেশীই হয়।

কবি রাধিকার বিবিধ অঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দিয়াছেন। মাথায় সর্ব্বত্র 'মুকুট' পৃঃ ৩৮, ১৩৩, ১৬৪। গলায় অধিকাংশ স্থলেই 'সাতেসরী (সপ্তকণ্ঠী) হার', পৃঃ ২৮ ৩৮, ৭৩, ৮৮, ১২৪, ১৩৩, ১৩৪, ১৪৮, ১৫৫, ১৫৮ ২৬৩, কোথাও কোথাও 'গজমুতী হার', পৃঃ ৩৮১, ৯০; এক-স্থানে 'গুণিআ' (সুত-হার), পৃঃ ১৩৪; অপর এক-স্থানে 'উল পুষ্পের হার,' পৃঃ ৩৪১। রাধিকার কর্ণে 'কুণ্ডল', পৃঃ ৫৫, ৫৭, ৬০, ৬৮, ৭৮, ৯০, ১৩৪, ৩৪১; ইহা 'রতনে উজল', পৃঃ ৯০,; একস্থানে 'হিরাধর (হীরক-খচিত) কড়ী', পৃঃ ১১২। হস্তের অলঙ্কার যথা:—'আঙ্গদ ভুজযুগলে' পৃঃ ৩৮১; 'বাহুর বলয়া', পৃঃ ৬২, ৮৮, ১১২, ১৫৫, ১৬৩, ৩৯২; 'রতনে জড়িত দুই বাহু শঙ্খ', পৃঃ ২৮৭; 'হাতের বাহুটী', পৃঃ ১৩৪, ১৪৪; 'কনক কঙ্কণ', পৃঃ ১৩৪ অথবা 'রতন কঙ্কণ', পৃঃ ৩৮১; 'কেয়ূর', পৃঃ ১৩৭; এবং 'বলয়া', পৃঃ ২৩৭, ১৪২। একস্থানে পাই "কনক যূথিকা কাম্বা বাহু যুগলে", পৃঃ ৩০, কিন্তু ইহার অর্থ অনুধাবন করিতে পারিতেছি না। অপর এক স্থলে,

"বাহুতে কনক চুড়ী, মুকুতা রতনে জড়ী, রতন কঙ্কণ কর-মূলে" পৃঃ ৩৮১ ; ইহাতে—স্পষ্ট বুঝি, 'চুড়ি' তখন বাহুর বা উপর হস্তের অলঙ্কার ছিল। রাধিকার হস্তাঙ্গুলিতে 'আঙ্গুঠী', পৃঃ ১৩৪, নামান্তর 'মুদড়ী', পৃঃ ২৭৯। কটিতে 'কনক কিঙ্কিণী', পৃঃ ১৩৪, ২৯২, ৩৮১। চরণে 'কনক মল্ল তোর', পৃঃ ৩৮১, ও নূপুর', পৃঃ ৬২, ৬৯, ১৩৪, ১৪৪, ২৮৭, ২৯২ ; এবং পদাঙ্গুলিতে 'পাসলী', পৃঃ ১৩৪, ৩৮১।

অলঙ্কার ব্যতীতও রাধিকার প্রসাধন কবি অল্প-বিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। প্রায় সর্ব্বত্রই 'শিসতে (সিঁথাতে (সিন্দুর', কেবল একস্থানে ললাটে,—'সিন্দুর দুর ললাটে', পৃঃ ৬১। নতুবা ললাটে (কুঙ্কুম-চন্দনাদি দ্বারা রচিত) 'তিলক' পৃঃ ৪৩, ৬৮, ৮৮, ২৭৪। নয়নে কাজল, পৃঃ ১২, ৮৮, ৩৪৭। মুখে এক প্রকার মুখ-রঞ্জন, "কর্পূর কস্তুরী যোগে, আতর তাম্বুল রাগে, গন্ধরাংগে রচিল বদনে", পৃঃ ৩০৪। খোঁপা পুষ্পমাল্য বিভূষিত। সে মালা নানাফুলের, দোলঙ্গ, পৃঃ ৭৯, ২১৯ ; খদির, পৃঃ ১৬৩ ; লঙ্গ, পৃঃ ১৩১, ২১৯ ; মালতী, পৃঃ ১৩১, ২১৯ ; গুলাল, পৃঃ ২১৯ ; চাঁপা, পৃঃ ৮৭, ২৭১, ৩৮১ ; কানড়, পৃঃ ৮৮ ইত্যাদি। রাধিকার বসন হয় নেতের না হয় পাটের, তবে পাটের কাপড়ে নেতের (রেশমী) আঁচল ও দুই পাশ বা পাড় মাণিকে খচিত, এরূপ সাড়ীও কবির জানা ছিল (পৃঃ ২৮৭)। রাধা 'কাঙুলী' (কাঁচুলি) পরিয়াছেন, পৃঃ ২৮, ৩৫ ইত্যাদি ; সে কাঙুলী 'বিচিত্র'ও বটে, পৃঃ ৬১, কিন্তু—কবি কাঙুলির আর বিশদ বর্ণনা দেন নাই, অর্থাৎ এমন কথা বলেন নাই যে তাহাতে 'পূর্ব্বরাস' বা শৃঙ্গার-রসাত্মক চিত্র অঙ্কিত ছিল। এরূপ কাঁচুলি চৈতন্যও চৈতন্য-পরযুগের প্রবর্ত্তন। শুধু কাঁচুলি নয়, উড়নী, বস্ত্রাঞ্চল প্রভৃতিও এই বিশেষত্ব হইতে বাদ পড়ে নাই। ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্য হইতে এইরূপ কাঁচুলির মাহাত্ম্য কিছু কিছু ধরিয়া দেখি। রূপরাম নয়ানী-বারুইয়ের কাঁচুলি বর্ণনায় বলেন, "কাঁচুলির সমুখেতে (১) পূর্ব্বরাস লেখা······ কেহ বা আনন্দ করে কৃষ্ণে কোলে করি।" ঘনরাম দেবীর (চণ্ডীর) কাঁচুলি সম্বন্ধে বলেন, "হৈমকান্তি কৃষ্ণলীলা কাঁচলি লিখন······কুচগিরি বেষ্টিত লিখিত পূর্ব্বরাস······হরি-মহোৎসব হইল লিখন কাঁচলি" এবং ইহা নাকি "দেখিতে দেখিতে দেবীর বাড়ে বড় প্রেম।" (২) মাণিক গাঙ্গুলি প্রদত্ত রঞ্জাবতীর কাঁচুলির বিবরণ আরও বিষম"। (৩)

বীভৎস বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করার ফল সম্বন্ধে মাণিক গাঙ্গুলিও বলেন, "রঞ্জার রতিকে ইচ্ছা হইল তা দেখে। বসন্তাকে বলে শয্যা বিরচিতে ডেকে॥" বড়ু চণ্ডীদাসের কালে এরূপ অশ্লীল কাঁচুলি ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়না, কারণ থাকিলে তাঁহার ন্যায় কবি উহার অল্প-স্বল্প বিবরণ দিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

কৃষ্ণকে কবি রাধিকার প্রায় অনুরূপ অলঙ্কার দিয়াছেন। তাঁহার কর্ণে 'রতন কুণ্ডল', পৃঃ ৩৪৬, তাহা আবার হীরায় জড়িত, "হিরাঞ্চ জড়িত রতন কুণ্ডল", পৃঃ ২৬৯। হস্তে 'আঙ্গদ যুগল', 'রতন কঙ্কণ', 'কেয়ূর' পৃঃ ২৬৯, ও' বলয়া" পৃঃ ৩০২। এক স্থানে উল্লেখ মাত্র আছে, "বনমালা আভরণ তাহা তোক দিবোঁ", পৃঃ ৩২৪, কিন্তু কৃষ্ণের প্রসাধন বর্ণনায় কবি সর্ব্বত্র 'বনমালা' ভুলিয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার গলায় গজমতি হার, "গিএ শোভে গজমুতী" পৃঃ ৩৪৬। পায়ে নূপুর, "চরণে নূপুর রুণুঝুণু কাচে রাত্র" পৃঃ ৩৩৯, এবং উপরন্ত 'মগর খাড়ু' পৃঃ ৩০২, ৩৪৬, যাহা রাধিকারও দেখিতেছি না। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে এই 'মগর-খাড়ু'র অভাব নাই, নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের কটিতে কিঙ্কিণী, পৃঃ ২৪২, ২৬৯। তাঁহার 'ঘাঘর' যে তাহারও অর্থ কিঙ্কিণী। বন্দ্যঘটীয় জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্য-মঙ্গলে' চৈতন্যদেবের কটিতে কিঙ্কিণী দিয়াছেন। (৪) খুঁজিলে পুরুষের কিঙ্কিণীর দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যাইতে পারে। অতএব, কৃষ্ণকীর্ত্তন দেখিয়া, "সে কালে পুরুষেরাও যে কিঙ্কিণী পরিত, তাহা

(১) বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম খণ্ড, ১৯১৪, পৃঃ ৬৬৩

(২) বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২০৬ ২০৮

(৩) সাহিত্য পরিষৎ সং পৃঃ ৬৬

(৪) সাহিত্য পরিষৎ সং, পৃঃ ১৪, ৪১

বোধ হয় আর কোথাও পাওয়া যায় না" (১) এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণের 'মাথে ঘোড়াচুলা'। বিজয়-গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে'ও দেখি, "পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল"। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের মস্তকে খোঁপার বদলে জটা, পৃঃ ৩৪৬, এবং তাহাতেই কুসুমের মালা, পৃঃ ২৬৯, ২৯৫। তাঁহার দেহও 'চন্দনে চর্চ্চিত' পৃঃ ৩৪৬, ২৬৯,৩৩৯। তা ছাড়া, 'কাজলে উজল নয়ন যুগল' পৃঃ ২৬৯, এবং 'চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট', পৃঃ ২৬৯,৫। কেবল মাথায় মুকুট, সিঁথিতে সিন্দুর ও পায়ে পাসলীর অভাব।

কৃষ্ণের বসনও নাকি চিত্রে অঙ্কিত, "আতি চিত্র বসন পহ্নিআঁ" পৃঃ ২৯২। পুরুষের চিত্রিত বসনের উদাহরণ, বোধ করি, বিরল। কবি একস্থানে কৃষ্ণের বস্ত্রের পরিমাপ দিয়াছেন ষোল হাত, "হের ষোল হাথ মোর পাটোল" পৃঃ ২৪২। কবির হাত বিঘৎ, পূর্ব্বে দেখিয়াছি। নতুবা বিস্ময়ের কারণ ছিল বৈ কি।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে সোনা হীরা, মণি, মাণিক, মুক্তা, রত্ন, গজমতি প্রভৃতির উল্লেখ এত বেশী যে লোকের অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল না হইলে কবির পক্ষে উহা সম্ভব হইত না। এমন কি গোয়ালিনী রাধা দধি বিক্রয় করিতে যাইতেছেন যে, তাহাও সোনার চুপড়ী' ও 'রূপার ঘড়ী' (পৃঃ ১৪৩) লইয়া; খাট-পালঙ্ক অত বিরাট বস্তু, তাহাও সুবর্ণে মণ্ডিত (পৃঃ ৩০০) করার কথা আছে। হয় ত এ সকলের খানিকটা বা অনেকটা কবির কবিত্ব বা গ্রাম্যতার নিদর্শন, কিন্তু যেখানে দৈন্যও অনাটন, সে দেশের গ্রাম্য কবিরও হীরা গজমুক্তা প্রভৃতি কল্পনায় আসে না। কবি রাজ-সভায় থাকিলে অন্যরূপ ভাবা চলিত, কিন্তু তিনি ছিলেন কোনও গ্রামে বা নগরে এক বাসলী-মন্দিরের 'বড়ু'। এত হীরা মুক্তার ছড়াছড়ি পরবর্ত্তী সাহিত্যে মিলে না।

কবির যুগে বঙ্গ-ললনা অবলায় পরিণত হয় নাই, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে এ কথাটা অতি স্পষ্ট। প্রয়োজন বুঝিলে তাহারা পুরুষকে 'মাগুকিলে' কিলাইতে, বা ধরিয়া বাঁধিতে, কসুর করিত না। পথে ঘাটে আত্মরক্ষা করিতে তাহারা বিলক্ষণ জানিত ও পারিত। মুটে-মজুর ডাকিবার জন্য পুরুষের দরকার হইত না। তবে কিনা, কবির রাধার শিষ্টতা ও সংযমের অভাবও যথেষ্ট। জয়দেবের রাধা কত শান্ত, কত নরম, কেমন তাঁহার আত্মসংযম!

বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ দেখিয়া তৎকালীন পুরুষ-চরিত্র অনুমান করা কঠিন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ অধম কবির সৃষ্টি, এমন কথা নয়; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি কৃষ্ণ-চরিত্রের উত্তম দিক্‌গুলি দেখান নাই। তাঁহার কৃষ্ণে দেব-ভাবের সম্যক্ অভাব রহিয়াছে। কৃষ্ণ এক গ্রাম্য, দুঃশীল যুবক, পরের বালিকা-বধূর সহিত পথে-ঘাটে প্রেম করিয়া বেড়াইতেছেন। বুদ্ধিটা যেমন স্থূল, দুঃসাহসও তেমনই প্রবল। ভণ্ডামিও কম নয়। ক্রোধ হইলে তিনি প্রেমিকাকে বধ করিতে উদ্যত হন, আবার স্ত্রীলোকের তর্জ্জনে ভয়ে জড়সড় হইয়া উঠেন। মিথ্যা কহিতেও পটু। তাঁহার প্রণয় ভিক্ষার রীতিও অদ্ভুত; ঐশ্বর্য্য ও ভীতি প্রদর্শন ত আছেই, তা ছাড়া পড়ুন —"ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে। তা দেখিআঁ কাহাঞিঁ পাতিল নাটে॥ খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ। তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ॥ আর যত বাদ্যগণ আছের কাহাঞিঁ। পতি (প্রতি) দিনে নানা ছান্দে বাএ সেই ঠাই॥" পৃঃ ২৯৩। এ হেন মস্করামি দেখিয়া কোনও নারীই ভোলে না, কবিও বলেন, "তা দেখিআঁ না ভুলিলী আইহনের রাণী।" 'বংশীখণ্ডে' কবি কৃষ্ণকে এতদপেক্ষাও সং সাজাইয়াছেন। একটা তুচ্ছ বাঁশী অপহৃত হইলে কৃষ্ণ যে কাণ্ডটা করিলেন, যেরূপ কান্নাকাটি, হা-হুতাশ, খোঁজাখুজি,—শেষ পর্য্যন্ত উত্তম বসন-পরিধান ত্যাগ, শরীর দুর্ব্বল ইত্যাদি—এ সকল সং ব্যতীত আর কাহার কর্ম্ম হইতে পারে?

প্রেমিক প্রেমিকা ব্যতীত চুম্বন করিয়া ভালবাসা জানাইবার রীতি ছিল। বড়াই রাধিকাকে "অতি নেহেঁ (স্নেহে) করিআঁ চুম্বয়ে। ঘন ঘন কৈলে আলিঙ্গনে" পৃঃ ১৫, "চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে" পৃঃ ৮২। মুখ দাতে করিয়া বিনয় বা মিনতি প্রকাশ করা হইত, "দান্তে তৃণ করি কাহাঞিঁ" পৃঃ ২৩০; "দশনেতে এটা, একটা তৃণ করি বলোঁ মো তোমারে", পৃঃ ১৫৭। কৃষ্ণ জনম

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩, পৃঃ ...

এটা একটা কথার কথায় দাঁড়াইয়াছিল, সত্যকারের তৃণ কেহ মুখে দিত না। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা কি করিতেন? যাহাই করুন, রীতিটা ঐ সম্প্রদায়ের নিজস্ব নয়। মাটি ছুঁইয়া, দুই কানে হাত দিয়া, এবং শিরে হাত দিয়া শপথ জানাইবার পদ্ধতি ছিল, "ভূমি ছুঁইআঁ হাতে পরশিঁও দুই কানে, এ তোঁহো কাহাক্রি ভোত না বৈল গেআনে" পৃঃ ১০৩; "দুখ দিআঁ সত্য বলোঁ। শিরে দেওঁ হাথ", পৃঃ ৩৭০। শপথ করিবার সময়ে লোকে চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, বরুণ প্রভৃতিকে সাক্ষী রাখিত, "বাত বরুণ সুরুজে সাখি, এ বধ দিবোঁ তোক্ষারে এ", পৃঃ ১৫০; "চান্দ সুরুজ বাত বরুণা সাথী। যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী", পৃঃ ৩২২।

সাধারণ বেচা-কেনা, লেন-দেন কড়ির দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। কবি 'কার্ষাপণ' 'তঙ্কা' প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই। হাটে পণ্য বিক্রয়কারী বা কারিণীগণকে একটা শুল্ক (হাটদান) দিতে হইত। লোকের গমনাগমনের সুবিধার জন্য নদীতে, বর্ষাকালে বিশেষ করিয়া, খেয়া নৌকার বন্দোবস্ত থাকিত। বিক্রেতাগণকে খেয়াঘাটে (কুতাঘাটে) এই নৌকা ব্যবহারের জন্য, কোন কোন জিনিসের নিমিত্ত একটা শুল্ক দিতে হইত। এই যে সব শুল্ক, তাহাও কড়ির দ্বারা আদায় হইত। কবির কথায় মনে হয়, রাজ-কোষে অর্থাভাব না ঘটিলে, উহা অনেক সময় মোটেই আদায় করা হইত না। ঘাটে শুল্ক-সংগ্রাহকদিগকে রাজ-সকাশে গিয়া ঘাট ইজারা লইবার অনুমতি-পত্র লইতে হইত। এক একজন ব্যক্তি একাধিক বা অনেকগুলি ঘাট ইজারা লইতে পারিত। তাহাদের "মহাদানী" বলিত। তাহাদের নিকটে একটা 'পঞ্জি' থাকিত, বোধ হয়, সেটা রাজ-দরবার হইতে প্রদত্ত হইত। এই পঞ্জিতে শুল্কসংগ্রাহকের নাম, শুল্কযোগ্য বস্তুর (দান বথুর) বর্ণনা, ও কোন বস্তুর উপর কি পরিমাণ শুল্ক ধার্য্য হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা থাকিত। শুল্কসংগ্রাহকদিগের নিকটে একখণ্ড খড়ি থাকিত, তদ্দ্বারা তাহারা মাটিতে লেখা পাড়িয়া শুল্কের হিসাবটা করিয়া লইত। যাহারা এই লেখায় হিসাব বুঝিত, তাহাদের তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ দেওয়া হইত। এই সুযোগ সম্ভবতঃ অধিকার-গত। পথ-ঘাট তেমন নিরাপদ ছিল না, 'বাটোয়ার' প্রভৃতির ভয় ছিল। বলা বাহুল্য, তাহারা সুবিধা পাইলেই পথে-বিপথে লোকের নিকট জোর বা প্রবঞ্চনা করিয়া যাহা পাইত, তাহা আদায় করিয়া লইত।

কবি পুরুষের দুই প্রকার খেলার নাম করিয়াছেন, (১) গেণ্ডুআ (গেণ্ডু, কন্দুক, কাঠের বল), পৃঃ ৩০৪, ও (২) চাঁচরী, পৃঃ ৭৯। সম্পাদক মহাশয় চাঁচরীর অর্থ ধরিয়াছেন, "দোলপর্ব্বে অনুষ্ঠিত অগ্ন্যুৎসব"। কিন্তু "পএর মগড় খাড়ু মাথে ঘোড়াচুলে, চাঁচরী খেলাওঁ মোএ যমুনার কূলে", এই বর্ণনা হইতে মনে হয়না, ইহা কোনও সময়-বিশেষের উৎসব। ইহা বার-মেসে কোনও খেলা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র ব্যতীত, বেজ (বৈদ্য), আচারিজ (আচার্য্য বা ব্যবস্থাপক দৈবজ্ঞ), সগুনী (শাকুন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ), বণিজার (বণিক), ঝালিয়া (ঐন্দ্রজালিক), গরুড়ী (বিষ-বৈদ্য), বাদিয়া (সাপুড়ে), নাপিত, কুম্ভকার, তেলী, কাণ্ডারী (মাঝি) প্রভৃতি বৃত্তিগত জাতির উল্লেখ আছে। সাধারণ ভিখারীর এবং খাপড় বা নরকপাল হস্তে যোগিনীর ভিক্ষা করার কথাও আছে।

কবির যুগে মুসলমান রাজা অস্ত্র-আইন প্রবর্ত্তন করেন নাই, কাজেই কবি নির্ভয়ে তাঁহার কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্যে শর, ধনু, কামান, ত্রিশূল, কৃপাণ, টাঙ্গার, নালিক-যন্ত্র, ঢাল (আড়ন) প্রভৃতি অস্ত্রের উল্লেখ করিতে পারিয়াছেন।

কবি গণক দ্বারা রাধা-কৃষ্ণের নামকরণ করান নাই। বরঞ্চ রাধা বলেন, "কালিনী মাএ মোর নাম থুইল রাধা"। পরবর্ত্তী কালে গণক ঠাকুর এই কার্য্যটির ভার লইয়াছিলেন, অনেক সময় দেখা যায়। যথা, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে, "গণক আসিয়া নাম থুইল কালকেতু। গণকেরে দিল দান পরমায়ু হেতু॥" (১) ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত-প্রকাশে', "যথাকালে কুবের জ্যোতিষি আনাইলা। কমলাক্ষ নাম তান বাছিয়া রাখিলা॥"(২) মাণিক গাঙ্গুলির 'ধর্ম্মমঙ্গলে',

(১) অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সং, পৃঃ ১১৭

(২) প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৮

"গ্রহবিপ্রে ডেক্যা থুল লুহিচন্দ্র নাম।"(১) এমন কি, কৃত্তিবাসী রামায়ণেও, "চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক। তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুত্র মুখ॥ তিন দণ্ড বেলা হৈল গণকের মেলা। খড়িতে গণিয়া চাহে শুভক্ষণ বেলা॥"(২) ইত্যাদি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আরও দুই এক বিষয়ে তুলনীয়। বড়ু চণ্ডীদাস নারীকে (রাধাকে) অবগুণ্ঠন দেন নাই। তাঁহার কাব্যে রাধা ও অপরাপর নারীগণ দল বাঁধিয়া দিবালোকে রাজপথে হাসাহাসি করিয়া 'মঙ্গল' গান গাহিতে গাহিতে চলিতেছেন, "চিত্তের হরিষে সব গীত গাএ," পৃঃ ২০৮; "জারিউ হরষিত মণে গারিতে মঙ্গল", পৃঃ ১৪৪। এরূপ দৃষ্টান্ত অবশ্য পরযুগের সাহিত্যেও প্রচুর মিলে, কিন্তু সে যুগে সমাজে, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর ভিতরে, ঘোমটা বেশ আসিয়া পড়িয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কালেও দেশে ঘোমটা চলিত কিনা সন্দেহজনক। কৃত্তিবাস কিন্তু রাবণবধের পর সীতাকে চারিদিক আচ্ছাদিত চতুর্দোলে চড়াইয়া রাম-সম্ভাষণে নিয়াছেন, "রাম সম্ভাষণে সীতা চতুর্দোলে চড়ে···নেতের বসনে দোলা ল'য়েছেন বেড়ে।"(৩) বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকে নাসিকার কোনও অলঙ্কার দেন নাই, কৃত্তিবাস সীতাকে 'বেসর' দিয়াছেন "নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।"(৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে নাসায় গজমুক্তা, এবং সম্ভবতঃ নোলকেরও, উল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে ইরাণ দেশ হইতে এদেশে নাসিকার অলঙ্কার আরম্ভ হইয়াছে, এই মতবাদ(৫) পুরাণখানিকে ষোড়শ শতাব্দীতে টানিয়া আনিবার অন্যতম যুক্তি হইয়াছে(৬)। কিন্তু কৃত্তিবাস কিছুতেই পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে আসিতে পারেন না। কৃত্তিবাসের বয়স কত? মনে হইতেছে, বিক্রমপুর আদাবাড়ীতে দনুজ-মাধব দশরথ-দেবের তাম্রশাসন(৭) আবিষ্কৃত হইয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা অনেকটা সুসাধ্য করিয়াছে। কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীতে যে বেদানুজ মহারাজার পাত্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তিনি ছিলেন বঙ্গের (পূর্ব্ব-বঙ্গের) মহারাজা। তাম্রশাসনের দনুজ-মাধবও ঠিক সেই স্থানেরই অধীশ্বর। কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ একেবারে ভুয়া ও কৃত্রিম না হইলে, এই 'বেদানুজ' ও 'দনুজ-মাধবের' অভিন্নতায় আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ সন্দেহের কারণ দেখিতেছিনা। দনুজ-মাধব খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমানের হেতু আছে। নরসিংহ ওঝা হইতে কৃত্তিবাস চারিপুরুষ অধস্তন, এবং সাধারণ গণনায়, এক শতাব্দীতে চারি পুরুষ। তাহা হইলে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের সময়। অতএব উক্ত মতবাদের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইতেছে। যদি গণক দ্বারা নামকরণ, নাসিকার অলঙ্কার, আবরু প্রভৃতি দেখিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তবে তাঁহাকে কৃত্তিবাসের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিতে হয়। কিন্তু কৃত্তিবাস বঙ্গীয় আদি ভাষা-কবির যে আসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তথা হইতে তাঁহাকে স্থানচ্যুত করা যায় কি? ইহা অসমসাহসের কার্য্য ভাবিলে, উভয়কে প্রায় সমসাময়িক মানিতে হয়, এবং স্থানের ভিন্নতায় উভয়ের বিবরণের ভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়। আর যদি বড়ু চণ্ডীদাসকে কৃত্তিবাসের পরে অনুমান করার প্রয়োজন হয়, তবে সে-ক্ষেত্রেও সহজ উপায় আছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে ওগুলি প্রক্ষিপ্ত।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

(১) পৃঃ ২২
(২) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সং, ১৩৩৩, পৃঃ ৩৩
(৩) লঙ্কাকাণ্ড, ঐ, পৃঃ ৪৮১
(৪) ঐ, আদিকাণ্ড, পৃঃ ৯৭
(৫) প্রবাসী, ১৩৩৪, পৃঃ ৭১৩-৭১৮
(৬) ভারতবর্ষ, ১৩৩৭, পৃঃ ৯৭
(৭) ভারতবর্ষ, ১৩৩২, পৌষ পৃঃ ৭৮-৮১

ঘরহারা পরবাসী

জসীম উদ্দীন

ভেবেছিনু আমি আর কোনখানে বাঁধিবনা পুন ঘর,
আর কোনখানে খুঁজিতে যাবনা আর কোন অন্তর।
তোমাদের দেশে ছুদিন ঘুরিয়া চ'লে যাব পরবাসী,
সাথে নিয়ে যাব নিজহাতে গড়া আমার ব্যথার বাঁশী।
বাতাসে বাতাসে কুড়ায়ে ফিরিব অজানা ফুলের ঘ্রাণ,
ছায়ায় ছায়ায় আঁচল বিছায়ে শুনিব পাখীর গান।
নদী তীরে তীরে বালুর আখরে লিখিয়া বুকের ব্যথা,
পড়িয়া পড়িয়া মুছিয়া ফেলিব শেষ হতে সব কথা।
দূর বন-পথে গোধূলি নামিবে, ধূসর গগন পথে
সোনার বরণী দাঁড়াবে আসিয়া কনক মেঘের রথে।
চরণের তলে সাঁঝ-কমলিনী মেলিয়া গোপন দল,
উদাসী বাতাসে হেলাবে দোলাবে রঙিন নদীর জল।
আসিবে আঁধার বন-পথ বেয়ে, তাহারি আঁচল ছায়
ঝিল্লীর তানে ঘুম পাড়াইব মোর যত বেদনায়।
কে তোমরা ভাই, ডাক দিলে মোরে ঘর-হারা পরবাসী
কেন ভাই সম আপনার হয়ে কাছে এলে ভালবাসি।

তোমরা আজিও ফুলের জগতে ফিরিতেছ হেসে খেলে,
বুঝিতে শেখনি পরাণ সঁপিলে পরাণেরে নাহি মেলে।
তোমাদের চোখে আজো রাঙা আলো, আড়ালে অন্ধকার
চিরবিস্মৃত সীমাহীন রাত্রি, খোঁজ নাহি জান তার।
অনন্ত তৃষা কাঁদিছে পরাণে, শকতি নাহিক হায়,
বাহুর বাঁধন বড়ই শিথিল কারে নাহি ধরা যায়।
চঞ্চল বেদে চলিয়াছে পথে বাজায়ে বিষের বাঁশী,
বনের হরিণ কাঁদে পথে পথে ঘরহারা পরবাসী।

হেথায় শুধুই লবণ সাগর, নাহি তৃষ্ণার বারি,
তৃষিত মানুষ সমুখে হেরিছে মরীচিকা সারি সারি।
কোথায় তৃপ্তি, কোথা সান্ত্বনা, কোথায় মরূদ্যান!
চিরপথহারা কাঁদে বেদুইন, কাঁদে তার বুনো প্রাণ।
সাত সাগরের তৃষা আছে যার বিন্দুরে লইবার,
কৃপণ বিধাতা এ জগতে হায় ক্ষমতা দেয়নি তার।

অনেক ভুলিয়া অনেক শিখেছি তাই পুন ভুল ক'রে
ক্ষণিকের বাসা বাঁধিতে চাহিনি আর কারো খেলাঘরে।
তবু কেন মোরে ডাক দিলে ভাই, কাঁদে মোর ভিরু হিয়া!
হয়ত আবার ভুল ক'রে যাব মন দিয়া মন নিয়া।
হয়ত আবার ভুল করে ভাই, বলিয়া ফেলিব হায়
তোমাদের তরে আছে আছে ঠাঁই মোর অন্তর ছায়।
হায়রে মিথ্যা! ঠাঁই কোথা পাব এতটুকু অন্তর,
শিশির ফোটার ভার সহিবারে ভেঙে যায় যন্তর।
মহাকাল নটী চ'লেছে নাচিয়া গাঁথিয়া ভুলের মালা,
সন্ধ্যা আসিছে, উষসী আসিছে, ভরিয়া রঙের ডালা।
আজ যাহা দেখি কাল তাহা নাই, সময় স্রোতের ধারা
ঘটনার পর ঘটনা লইয়া ছুটিয়াছে গতি-হারা।
কোনখানে কারো চিহ্ন রহেনা, এই দুর্ব্বল মন
স্মৃতির শ্মশানে চিতা সাজাইয়া করিতেছে ক্রন্দন।

জসীম উদ্দীন



অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১০

বেলা তখন আটটা। স্নান এবং কিছু জলযোগ সমাপন করে সন্ধ্যা আমিনার ঘরে ব'সে ছিল। একদল কৌতূহলী বালক-বালিকা দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যুষের এই সহসা-আবির্ভূত অপরিচিত অতিথিটিকে নিবিষ্টভাবে পর্য্যবেক্ষণ করছিল। অতিথির নাম হামিদা এবং সে আমিনার বাপের বাড়ির দিক দিয়ে তার একজন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়া, সে-কথা সহজেই জানা গিয়েছিল; কিন্তু এ গৃহের সহিত তার কি সম্পর্ক, কি জন্যে এখানে সে এসেছে, কতদিন এখানে অবস্থান করবে, এই সব অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যের কিছুই জানা যাচ্ছিল না। এ জন্য তাদের মনে ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না, কিন্তু আমিনাকে জিজ্ঞাসা করলে সে ধমক দেয়, বলে, ও আমার বহিন্, সব দিন এখানে থাক্‌বে। যা, এখন পালা:!

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি ক'রে একটু আলাপ আরম্ভ করবে সন্ধ্যা মনে মনে তাই জল্পনা করছিল এমন সময় সেখানে আমিনা উপস্থিত হওয়ায় ছেলের দল দুদ্দাড় ক'রে স'রে পড়ল। আমিনা ঘরে প্রবেশ করল, এবং তার পিছনে পিছনে প্রবেশ করল তার দেবর নাসীর,—দীর্ঘ সুগঠিত দেহ কান্তিমান যুবক।

সহাস্যমুখে আমিনা বল্‌লে, "ভাই হামিদা, এটি আমার দেওর নাসীরউদ্দীন, যার কথা সেদিন তোমাকে বলছিলাম।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে উঠে একবার নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যুক্তকরে তাকে নমস্কার করল।

তাড়াতাড়ি সম্মুখে এগিয়ে এসে সন্ধ্যাকে প্রত্যভিবাদন ক'রে স্মিতমুখে নাসীর বল্‌লে, "আপনার মহৎ স্নেহেরবাণি যে, আমাদের বাড়ি পায়ের ধূলো দিয়েছেন। সত্যিই আমাদের এ সৌভাগ্যের কথা!"

মাস দুই পূর্ব্বে হ'লে একজন অপরিচিত যুবকের মুখ থেকে উচ্চারিত এই ভদ্রতার বাক্যের উত্তরে সন্ধ্যা হয়ত' একটি কথাও বল্‌তে পারত না, আরক্তমুখে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত; কিন্তু জীবনধারার নিদারুণ বিপর্য্যয়ের কাছে তালিম নিয়ে নিয়ে তার প্রকৃতিও অনেকটা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেছে; বল্‌লে, "সৌভাগ্যের কথা আমারই বল্‌তে হবে। আপনারা ত আমাকে আশ্রয় দান করেছেন!"

সন্ধ্যার কথা শুনে নাসীরের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল, অল্প একটু মাথা নেড়ে বল্‌লে, "আশ্রয়দানের কথা আমরা জানিনে, সে আপনার বন্ধু বল্‌তে পারেন, কিন্তু আপনি দয়া ক'রে আসায় সত্যিই আমরা খুসী হয়েচি।"

আমিনা হাসিমুখে বল্‌লে, "আশ্রয় পাওয়ার কথাটা একেবারে বাজে মেজ মিঞা। আচ্ছা, আশ্রয় পেয়ে সেই দিনই যদি আশ্রয় ভেঙে কলকাতায় পালাবার জন্যে কেউ ব্যস্ত হয়ে ওঠে ত' সে কি-রকম আশ্রয় পাওয়া তা তুমিই বিচার কর!"

নাসীর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে। "না, তাকে কিছুতেই আশ্রয় পাওয়া বলা যায় না।"

এক মুহূর্ত্তের জন্য নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু কলকাতায় যদি যেতে পাই ত' সে আপনাদের দয়াতেই যাব। কলকাতায় আশ্রয়ও ত' আপনাদেরই আশ্রয় হবে।"

শুনে আমিনা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "এ ঠিক কি রকম কথা হ'ল জানো হামিদা?—একটা খাঁচার পাখী যদি বলে, দয়া ক'রে যদি খাঁচার দোরটা খুলে দেন ত' দেশান্তরে উড়ে যাই,—দেশান্তরের আশ্রয় ত' আপনাদেরই আশ্রয় হবে!—অনেকটা সেই রকম!"

আমিনার উপমার যৌক্তিকতায় খুশী হয়ে নাসীর মৃদু

মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু আশঙ্কায় সন্ধ্যার মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল। শ্বশুর কিম্বা পিতৃগৃহের আশ্রয় অবিলম্বে ফিরে পাবার জন্য তার মনে এমন একটা দুর্ব্বার উত্তেজনা জেগে উঠেছে যে, তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট পরিহাসের মিথ্যা কথাও যেন সে বরদাস্ত করতে পারে না। মহবুবের গৃহে প্রথম দিকে যখন পরিত্রাণের বিশেষ কোনো সম্ভাবনা ছিল না; তখন উত্তেজনাও এতটা ছিল না; কিন্তু সম্ভাবনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের চাঞ্চল্য বহুগুণিত পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। দুস্তর সাগরের প্রায় সবটাই পেরিয়ে এসে এখন অতি অল্পের জন্য মন ধৈর্য্য মান্‌ছে না, মনে হচ্ছে তরী ভেড়বার পূর্ব্বেই তীরে লাফিয়ে পড়ি।

সন্ধ্যার মুখে চিন্তার কুজ্ঝটিকা লক্ষ্য ক'রে আমিনা তার মনের উদ্বেগ বুঝ্‌তে পারলে। বল্‌লে, "ভয় নেই তোমার হামিদা, খাঁচার দোর ত' খুলে দোবোই, তা' ছাড়া দেশান্তরে তোমার সত্যিকার আশ্রয়ে তোমাকে রেখে আস্‌ব। এখন একটু ধৈর্য্য ধ'রে মেজ মিঞার সঙ্গে গল্প-টল্প কর, আমি ততক্ষণে একটু-কিছু মুখে দিয়ে আসি।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "তুমি এখনো কিছু খাওনি ভাই আমিনা?—যাও, যাও, আর দেরি কোরো না।"

"এই এখনি এলুম,—বেশী দেরি হবে না।" ব'লে আমিনা লঘু ক্ষিপ্রপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমিনা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তাকে মধ্যস্থ ক'রে সন্ধ্যা এবং নাসীরের মধ্যে এক-আধটা কথাবার্ত্তা চল্‌ছিল, কিন্তু সে চ'লে যাওয়ার পর এই সদ্যপরিচিত দুটি তরুণ তরুণীর পক্ষে কথাবার্ত্তা চালানো কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। নবপরিচয়ের সঙ্কোচ কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তরল হ'য়ে ভেসে চ'লে যায়, নীরবতা তার পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে তাকে বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং একটা মামুলী কথোপকথনের সূত্রপাত ক'রে নাসীর এই অস্বস্তিকর মৌনের অবসান করবার চেষ্টা করলে। বল্‌লে, "কাল রাত্রে গরুর গাড়িতে আস্‌তে আপনার খুবই কষ্ট হয়ে থাক্‌বে।"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "মোটেই না, আমি খুবই আরামে এসেছিলাম। কষ্ট হয়েছিল আপনার দাদার; তিনি প্রায় সমস্ত রাতই গাড়ির পিছনে পিছনে হেঁটে এসেছিলেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে নাসীর হাস্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, "আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, এটুকু পথ হাঁটতে, বিশেষত রাত্রে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় হাঁটতে, আমাদের কোনো কষ্টই হয় না। গাড়ি-পাল্কী জেনানাদের জন্যেই ব্যবহার হয়। আমরা পুরুষেরা গাড়ির আগে পিছে ত' চলি-ই, আবার সময়ে সময়ে গাড়ির উপরে উঠে গরুর ল্যাজ্‌ মল্‌তে মল্‌তেও চলি।" ব'লে উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌ল। তারপর ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "আপনারা বড়মানুষ, জুড়ি গাড়ি মোটরকার চড়া অভ্যেস্‌,—গরুর গাড়ি চড়্‌তে নিশ্চয়ই আপনাদের কষ্ট হয়।"

শুনে সন্ধ্যা অবরুদ্ধ বেদনায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলে। হায় রে! কোথায় বা জুড়ি গাড়ি, আর কোথায়ই বা মোটরকার! সে-সব ত' একরকম ভুলেই গেছে। সম্পদে-সম্মানে নন্দিত তার পূর্ব্বেকার সহজ সুন্দর জীবন, সে ত এখন অতীতের স্মৃতি! যে কলুষিত গ্লানিকর অস্তিত্বের মধ্যে তার দেহ-মন পলে পলে গলিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, গরুর গাড়ি ক'রে তা থেকে দূরে পলায়ন, সে ত' একটা অচিন্তিত সৌভাগ্যের কথা! আমিনা যদি তার হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে বন-বাদাড় কাঁটা-কাঁকরের মধ্য দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসত তা হলেও দুঃখ ছিল না। মুখে তার কাতরতার ছায়া ঘনিয়ে এল; দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে বল্‌লে, "আমি বড়মানুষ নই,—অতি দুর্ভাগিনী!"

সন্ধ্যার কথা শুনে এবং আকৃতির আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখে নাসীর অবধানন-ভরে ব্যগ্র হ'য়ে উঠ্‌ল। গভীর ঔৎসুক্যের সহিত সে বল্‌ল, "কিন্তু আপনি বড়লোকের মেয়ে, বড়ঘরের বউ, এ কথা ত' আমি ভাবীর মুখে শুনেছি।"

"শুধু সেই কথাই শুনেছেন, না আরও কিছু শুনেছেন?"

"আর বিশেষ-কিছু শুনিনি, তবে আপনার বিষয়ে সব কথা আমাকে পরে বল্‌বেন বলেছেন।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "যখন সব কথা শুন্‌বেন তখন বুঝ্‌তে পারবেন আমি কখন পরিহাস করছিলামনা,—সত্যিই আমি আপনাদের আশ্রিত, আপনাদের শরণাগত।" একটু

চুপ ক'রে থেকে কন্ডকাটা যেন আপন মনে অন্যমনস্কভাবে বললে, "যে গোরুর গাড়ি ক'রে আমিনা আমাকে উদ্ধার ক'রে আনলে সে গোরুর গাড়ি ত' চিরদিনের জন্তে আমার পক্ষে পুষ্পকরথ হ'য়ে রইল।" কথাটা ব'লে ফেলে নাসীরের দিকে চেয়ে হাসতে গিয়ে অকস্মাৎ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে। ঠিক যেন সূর্য্যকিরণের মধ্যে শরৎকালের অতর্কিত লঘুমেঘের বর্ষণ-লীলা!

নিজের এই আকস্মিক বিচলতার অভিনয়ে অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে পুনরায় একবার নাসীরের দিকে চেয়ে দৃষ্টি নত করলে।

নাসীর দুঃখিত স্বরে বললে, "আমি বড়ই অন্যায় করেছি এ সব কথা তুলে। আমি আগে জানতাম না—"

নাসীরকে আর অধিক কথা বলবার অবসর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "আপনি তো কোনো কথাই তোলেন নি। এ কথা আপনিই ওঠে,—আমার জীবনে উপস্থিত এর চেয়ে বড় কোনো কথাই আর নেই,—সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়।"

কী সে এমন কথা যার চেয়ে এই সুন্দরী তরুণী নারীর উপস্থিত আর কোনো কথাই বড় নেই, তা শুনতে ইচ্ছে করে; কী সে এমন বিপদ যা থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে আমিনা এ বাড়ীতে নিয়ে আসার ফলে সামান্ত গোরুর গাড়ি পুষ্পক-রথ হ'য়ে রইল, তা জানবার আগ্রহও মনে কম নয়; কিন্তু যে প্রসঙ্গের অবতারণা মাত্রেই এক পশলা চোখের জলের বর্ষণ হ'য়ে যায় সে প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে সহৃদয়তায় বাধে। পিছনদিকের বাগানে বহুক্ষণ থেকে একটা কাঠ-ঠোকরা পাখী সমানে শব্দ ক'রে চলেছিল, সেই একটানা শব্দের মদিরতায় নিজের কল্পনাবৃত্তিকে নিমজ্জিত ক'রে নাসীর তার সম্মুখে উপবিষ্ট এই অপরূপ রূপসী নারীর রহস্যাবৃত জীবনের সুখদুঃখের সমস্যা অনুমানে প্রবৃত্ত হ'ল। কোথা থেকে সে এসেছে, কোথায় সে যাবে, কি তার অভিপ্রায়, কিছুই সে আমিনার কাছ থেকে জানতে পারেনি, শুধু এইটুকু মাত্র জেনেছে যে, সে তাদের গৃহে ক্ষণস্থায়ী অতিথি এবং জাতিতে হিন্দু। বিবাহিত কি অবিবাহিত, সে কথা জিজ্ঞাসা করবারও অবকাশ হয় নি। চোখে দেখে ঠাহর করবার কয়েকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাও ঠিক বোঝা যায় না। সীমন্তের প্রান্তভাগে রক্তাভ দাগটুকু সিঁদুরের, কি সিঁদুরের নয়, তাও যেন একটা রহস্য! এ যেন ঠিক রূপকথার অলৌকিক ব্যাপার! রূপকথার নায়িকার মতো সোনার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ এক-সময়ে আবির্ভূত হয়েচে, আবার রূপার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ কখন অদৃশ্য হবে! রূপকথা নয় ত কি? দবিপুরের মতো অজ পাড়াগাঁ জায়গায় তাদের বাড়িতে এমন একটি অভিজাত বংশের রূপসী মেয়ে, রূপকথার পরীর মতোই বিস্ময়ের বস্তু!

"নাসীর মিঞা!"

সহসা নিদ্রোত্থিতের মতো চকিত হ'য়ে নাসীর বললে, "জী আজ্ঞে!"

"আপনি ত' কলকাতায় পড়েন?"

"জী।"

"এখন আপনি এখানে রয়েচেন, কলেজ কি বন্ধ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের একটা পরব পড়েছে, সেই জন্ত কলেজ পাঁচ দিন বন্ধ।"

"কবে আপনি কলকাতায় ফিরবেন?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে নাসীর বললে, "দিন তিনেক পরে।"

নাসীরের কথা শুনে সন্ধ্যার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিলে; বললে, "আজ তবে আমাকে কে কলকাতায় নিয়ে যাবে? বোধ হয় আপনার দাদা?"

"তা'ত বলতে পারলাম না। আপনার যাওয়ার কোনো কথাই আমি শুনিনি।"

উৎকণ্ঠিত মুখে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আজ আমাকে কলকাতা যেতেই হবে। আপনি যদি দয়া ক'রে সে বিষয়ে ব্যবস্থা করবার জন্তে আপনার বাবাকে একটু অনুরোধ করেন!"

নাসীর বললে, "আপনি আদেশ করলে নিশ্চয়ই করব, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন হবে না, সে বিষয়ে আপনার সমস্ত ব্যবস্থা বৌদিদি, আমার ভাবী, করবেন। বাবার কাছে তাঁর কথার চেয়ে বেশি জোর আর কারো কথার নেই, আমারও নয় দাদারও নয়। কিন্তু আজই আপনার কলকাতায় যেতে হবে? দু-চার দিন পরে গেলে হয় না?

দিন তিনেক পরে আমিও ত' আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।"

মৃদু মৃদু মাথা নাড়তে নাড়তে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আজ আমাকে যেতেই হবে। সব কথা শুন্‌লে আপনি বুঝ্‌তে পারবেন যে, আজ আমার না গেলেই নয়।" একটু অপেক্ষা ক'রে নাসীরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, এখান থেকে রেল ষ্টেসন কত দূরে ?"

নাসীর বল্‌লে, "বেশি নয়, মাইল চারেক।"

"যেতে কতক্ষণ সময় লাগে ?"

"তাও বেশি নয়, ঘণ্টা দেড়েক।"

"ষ্টেশনের নাম কি ?"

"গালুডি।"

"গালুডি!" সন্ধ্যার মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। অবশেষে একটা পরিচিত জায়গার কাছাকাছি উপনীত হয়েচে তা হ'লে! বছর চারেক আগে মাসখানেকের জন্যে গালুডিতে সে তার মাসির বাড়ি বেড়াতে আসে। স্ত্রীর ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তার মেসোমশাই গালুডিতে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন।

নাসীর বল্‌লে, "গালুডি তা হ'লে আপনি জানেন ?"

"হ্যাঁ, জানি। পাশেই বোধ হয় জামসেদপুর ?"

"ঠিক পাশেই নয়, গোটা দুই ষ্টেশন পরে। জামসেদপুর গেছেন না কি কখনো ?"

"হ্যাঁ, গেছি।"

"আত্মীয় কেউ সেখানে আছেন ?"

গালুডিতে অবস্থানকালে লোহার কারখানা দেখ্‌বার জন্যে সন্ধ্যারা একবার জামসেদপুর গিয়েছিল। সেখানে তার মাসিমার বড় জামাই কারখানায় বড় চাকরী করেন। তিনিই আগ্রহ ক'রে সকলকে নিয়ে গিয়ে চার পাঁচ দিন নিজের গৃহে রেখেছিলেন। তাঁর কথা মনে ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ, আছেন। আমার মাসিমার জামাই সেখানে চাকরি করেন।" বিবাহের সময়ে পীরনগরে পরিচিত সুধারাণীর স্বামীও জামসেদপুরে চাকরী করে এ কথা সে শুনেছিল। কিন্তু সুধারাণীর স্বামীর নাম তার মনে পড়ল না; হয় ত কখনো শোনেইনি।

নাসীর বল্‌লে, "বোনের বাড়ির এত কাছাকাছি যখন এসেছেন তখন কলকাতা যাওয়ার আগে একবার জামসেদপুরে গিয়ে দেখাটা ক'রে এলে ভাল হোত না ? না গেলে, পরে শুন্‌লে তিনি হয় ত দুঃখ করতে পারেন।"

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হ'ল না, মহীউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে আমিনা সহাস্যমুখে ঘরে প্রবেশ ক'রে বল্‌লে, "বেশি দেরী হয়েচে কি সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "একটুও না, খুব শীগগির এসেছ।"

মহীউদ্দিন বল্‌লেন, "বোসো মা, বোসো। তুমিও ব'সে পড় বউ মা, এখন অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা করবার দরকার হবে।" তারপর নাসীরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লেন, "নাসীর, তুমি গিয়ে ইয়াসিনকে ডেকে নিয়ে এস,—পরামর্শের মধ্যে আমাদের সকলেরই থাকা দরকার।"

ইয়াসিন উপস্থিত হ'লে অবিলম্বে কথাটার আলোচনা আরম্ভ হ'য়ে গেল।

সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা পুত্রদের কাছে বিবৃত ক'রে মহীউদ্দিন সন্ধ্যাকে বল্‌লেন, "এ কথাতে কোনো ভুল নেই মা যে, যতশীঘ্র সম্ভব তোমার এখান থেকে চ'লে যাওয়া দরকার, তা'তে তোমার পক্ষেও মঙ্গল আমাদের পক্ষেও মঙ্গল। কিন্তু গোয়েন্দা-পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কলকাতায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া যে খুব সহজ হবে তা আমার মনে হয় না, কারণ কলকাতার দিকে, বিশেষত হাওড়া ষ্টেশনে, তারা ওৎপেতে ব'সে আছেই। এ কথা তারা খুবই জানে যে এ-সব ব্যাপারের বদমাইশেরা শেষ পর্য্যন্ত কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়; আর ধরা পড়বার ভয়ে টাট্‌কা-টাট্‌কি যায় না, দু-চার মাস পরেই গিয়ে থাকে। তোমাকে নিয়ে আমার ছেলেরা যদি ধরা পড়ে তা হ'লে বৌমার ভাইদের ধরা পড়তেও বিলম্ব হবে না—আর তা হ'লে তার চোট্‌টা শেষ পর্য্যন্ত বউমার ওপরই গিয়ে পড়বে তা বুঝ্‌তেই পারছ। শুনেছি বউমার খাতিরে তুমি তার ভাইদের এইটুকু ক্ষমা করেছ যে, তাদের আর অনিষ্ট কামনা করনা। এ কথা সত্যি কি মা ?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা তার সম্মতি জানালে; বল্‌লে, "সত্যি।"

মহীউদ্দিন বল্‌লেন, "ভালো কথা। ক্ষমার উপর কোনো শিকায়েৎ চলে না, বিশেষত যেখানে ক্ষমা একটা উপকারের প্রত্যুপকার। তা হ'লে কাছাকাছি কোনো জায়গায় যদি তোমার এমন কোনো আত্মীয় স্বজনের বাস থাকে যেখানে রাতারাতি তোমাকে রেখে আসা যেতে পারে তা হ'লে গফুর-মহবুবের সঙ্গে নেতুড়টা কেটে যায়। তারপর সেখান থেকে তুমি অনায়াসে কাউকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চ'লে যেতে পারো। এমন কেউ আছেন কি মা? তা যদি থাকেন ত' আজই তোমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।"

নাসীর উৎসুকনেত্রে সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে। সন্ধ্যাও একবার নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "আছেন। জামসেদপুরে আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, টাটা আয়রন্ ওয়ার্কসে চাকরি করেন।"

মহীউদ্দিন উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লেন, "আল্লা! তা হ'লে ত সুবিধেই হয়েচে! নাম কি মা, তাঁর?"

"প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

"ঠিকানা কি জানো?"

একটু মনে মনে চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "বোধ হয় নর্দার্ন্ টাউন্।"

"তা হ'লে বড় চাকরি করেন?"

"হ্যাঁ, বড় চাকরিই করেন।"

"সেখানে তোমার যেতে কোনো আপত্তি নেই ত মা? তা যদি না থাকে ত আজ রাত্রেই তোমাকে জামসেদপুরে পাঠিয়ে দিই। কলকাতা পৌছতে তা'তে তোমার একটা দিন বিলম্ব হয়ে যাবে। কিন্তু উপায় কি?"

সন্ধ্যা সকৃতজ্ঞনেত্রে মহীউদ্দিনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আমার পক্ষে আর কিছুই হ'তে পারে না। কি ব'লে আপনাকে যে আমি—" সে আর অধিক কিছুই বল্‌তে পারলে না, অশ্রুতে চক্ষু আচ্ছন্ন হয়ে এল, কণ্ঠস্বর গেল জড়িয়ে।

মহীউদ্দিন স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন, "কিছুই তোমাকে বল্‌তে হবে না মা, আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। অনেক কষ্ট পেয়েছ তুমি, এবার খোদা তোমার মঙ্গল করুন।"

তারপর কি ক'রে সন্ধ্যাকে জামসেদপুরে পাঠানো হবে তার আলোচনা হ'য়ে গেল। স্থির হ'ল বেলা আড়াইটার গাড়িতে ইয়াসিন্ জামসেদপুর গিয়ে প্রথমে সন্ধ্যার ভগ্নীপতির গৃহের সন্ধান ক'রে রাখবে, তারপর কাসেম নামে তাদের একজন পরিচিত এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির ট্যাক্সি নিয়ে রাত্রি চারটার সময়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে। রাত্রি তিনটার গাড়িতে গালুডি থেকে সন্ধ্যা ও নাসীর রওনা হ'য়ে জামসেদপুর পৌছলে ইয়াসিন সন্ধ্যাকে নামিয়ে নিয়ে প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে পৌছে দেবে। নাসীর সেই গাড়িতেই চক্রধরপুর চ'লে গিয়ে দিন দুই তিন তার এক মাসীর বাড়িতে অবস্থান করবে, এবং ইয়াসিন মধ্যাহ্নের গাড়িতে দবীপুর ফিরে আসবে।

মহীউদ্দিন আমিনাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, "তা'হলে বউমা, রাত বারোটার সময়ে তোমার বন্ধুকে নাসীরের সঙ্গে রওনা ক'রে দিয়ো। তার আগে যেটুকু সময় হাতে আছে গরিবের ঘরে যতটুকু সম্ভব তাঁর খাতির-যত্ন কর।" তারপর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "যে সর্ত্তে তোমার বন্ধুকে মুক্তি দিচ্ছ বউমা, সে সর্ত্ত কিন্তু তুমি ভুলে নিয়ো। খাঁচার দরোজা যখন খুলে দিচ্ছ তখন পাখীর পায়ে আর জিঞ্জির বেঁধে রেখোনা।"

সহাস্যমুখে মৃদুকণ্ঠে আমিনা বল্‌লে, "আপনার যখন হুকুম আব্বা, তখন তাই হবে।"

"হুকুম নয় বেটি, অনুরোধ।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মহীউদ্দিন বল্‌লেন, "খোদার কৃপায় সে প্রয়োজন যেন না হয়, কিন্তু যদিই হয়, তা হ'লে কিছুমাত্র সঙ্কোচ না ক'রে তুমি ফিরে এসো মা। যখনি তুমি আসবে তখনি বউমার এ বাড়ির দরোজা তোমার জন্যে খোলা পাবে—এ জেনে রেখো।"

শুনে সন্ধ্যার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল; বল্‌লে, "তা আমি জানি আব্বা!"

মহীউদ্দিন কম্পিতকণ্ঠে বল্‌লেন, "আরো একটা কথা ব'লে রাখি। বি-এ পাশ করলেই আমি নাসীরের সাদি দোবো। তোমার কাছে নেওতা যাবে, জামাইকে সঙ্গে নিয়ে আমার একটি মেয়ের মত তখন তোমাকে আসতে হবে।"

সন্ধ্যার গৌরবর্ণ মুখে লজ্জার একটা গোলাপী আভা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল; মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে, "নিশ্চয় আসব।"

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্যামাপ্রসাদ প্রশস্তি

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তরে-গূঢ় বন্দনা-গীতি
ছিল যা প্রকাশ-হীনা,
উদাত্ত সুরে জাগায় তাহারে
মিলিত প্রাণের বীণা।
মানুষেরা খোঁজে মনীষি-সঙ্গ,
উদয়-প্রভাতে তার
নন্দিত-মনে গুণ-গুঞ্জনে
নতশির সবাকার।
বসিয়াছ আজি যে রাজ-আসন
করিয়া অলঙ্কৃত
যুগে যুগে তাহা শ্রদ্ধার স্রক্-
চন্দনে মণ্ডিত।
সুরু হলো তব শুভ তপস্যা
হে বীর, শক্তিধর,
নব জীবনের বিজয়োৎসবে
হইলে অগ্রসর।
নিলে গুরু-ব্রত, যাহা জন-হিত,
যাহা চির-সুখকর,
তরুণ-গণের জ্ঞানের পরিধি
কর' গো বৃহত্তর।
যোগাও ক্ষুধিত-মনের অন্ন,
যেন সে জন্মগত
অধিকার-বোধে বঞ্চিত হ'য়ে
না থাকে বোবার মত।
ডাকিছে তোমারে কীর্ত্তির দূত,
কর্ম্মের রথ এসে
করে আহ্বান, উড়িছে নিশান
উষালোক-উন্মেষে।

কালের পুণ্য-পুঁথির পাতায়
উজ্জ্বল কর' নাম,
নবীন বয়সে, নব-পৌরুষে,
এস' মনো-অভিরাম;
এস নির্ম্মল দীপ্ত বিবেকে
গৌরব পদবীতে;
এস অনিন্দ্য-সুন্দর হ'য়ে
সহানুভূতির শ্রীতে।
সত্য-মন্ত্রে যাত্রা-পথের
বিঘ্ন কর' গো দূর,
আকাশে বাতাসে ভাসে উল্লাসে
স্বস্তি-বাচন-সুর।
শোন' জনতার আত্মার কথা
স্ফুরিত বারম্বার,
সমুদ্র যেন মূর্ত্তি ধরিয়া
গরজিছে অনিবার।
আদরে রচিত বরণের মালা
কণ্ঠে পরায়ে দিতে
যাচি অনুমতি, হে উদার-মতি,
কত আশা জাগে চিতে।
বঙ্গবাণীর মণি-মন্দির-
স্বপ্ন-দ্রষ্টা যিনি,
অর্জ্জিত যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ,
তাঁরই পদরেখা চিনি'
তাঁহারি মতন হও মহাজন,
পুরাও দেশের সাধ,—
প্রসন্ন তব ভাগ্য-দেবতা,
পেয়েছ আশীর্ব্বাদ।

জেনারেল ক্ল্যদ মার্টিন

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর-এস, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শীঘ্রই কিন্তু ডুপ্লের চক্রান্তে নাসিরজঙ্গের সেনাদল মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। তাঁহার সামন্ত নবাব ও আমীরগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ডুপ্লে একদল ফরাসী সৈন্য সহ আবার চাঁদসাহেবকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। বিখ্যাত ফরাসীসেনাপতি কাউণ্ট চার্লস জোসেফ দি বুসী মহম্মদ আলির সৈন্যদলের হস্ত হইতে গিঞ্জি বা জিঞ্জির সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। মসলিপত্তন বন্দরও ফরাসীরা হস্তগত করিল। ইহার অনতিকাল পরে নাসিরজঙ্গ যুদ্ধে পরাজিত এবং বিশ্বাসঘাতক কুর্ণুলের নবাব কর্ত্তৃক নিহত হইলেন (ডিসেম্বর ১৭৫০)। তখন সদ্যকারামুক্ত মজঃফরজঙ্গকে হায়দ্রাবাদে লইয়া গিয়া বুসী মহাসমারোহে মসনদে বসাইলেন। কৃতজ্ঞতার মূল্যস্বরূপ তিনি ফরাসী-দিগকে ২০ লক্ষ টাকা নগদ এবং মসলিপত্তন জনপদ প্রদান করিলেন। চাঁদসাহেবও তাঁহাদিগকে পন্দিচেরীর নিকটে ৮১ খানি গ্রাম দিয়াছিলেন। ডুপ্লের যশের আর সীমা রহিল না।

কিন্তু অনতিকালমধ্যেই মজঃফরজঙ্গ এক খণ্ডযুদ্ধে নিহত হইলেন (ফেব্রুয়ারী ১৭৫১)। তখন ডুপ্লে নিজাম-উল-মুলকের অন্যতম পুত্র সালাবৎজঙ্গকে নিজাম পদে বসাইলেন। ফরাসী সৈনিকগণের বেয়নেট সাহায্যে রক্ষিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়া তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহাদের আশ্রিত হইয়া রহিলেন। আর্কট, মাদুরা এবং ত্রিচিনপল্লী এই তিনটী প্রদেশ তিনি ডুপ্লেকে জীবদ্দশায় নিকর স্বত্বে এবং তাঁহার দেহান্তের পর ফরাসীসরকারকে সাহায্যের মূল্যস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। মহম্মদ আলির তখন নিতান্ত চরম অবস্থা; তাঁহার সবই গিয়াছিল,—তিনি ত্রিচিনপল্লীতে শত্রুসেনা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মিত্রগণের তাঁহাকে উদ্ধার করিবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িয়া তিনি শত্রুকরে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এমন সময়ে বিখ্যাত রবার্ট ক্লাইভের বুদ্ধিকৌশলে ও পরাক্রমে সকল দিক রক্ষা পাইল;—ডুপ্লের সকল প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়া গেল।

ক্লাইভ কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইলেন যে ত্রিচিনপল্লীতে সৈন্য পাঠাইয়া অবরোধকারীদের বিতাড়িত করা সম্ভব নহে। তিনি বলিলেন যে মহম্মদ আলিকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় হইল চাঁদসাহেবের রাজধানী আর্কট নগর অধিকার করা। রাজধানী অরক্ষিত রাখিয়া তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া ত্রিচিনপল্লী অবরোধে ব্যাপৃত আছেন, এই সুযোগে আর্কট অধিকার করিয়া বসিলে নিশ্চয়ই তাহার উদ্ধার জন্য চাঁদসাহেব সৈন্য পাঠাইবেন। তখন ত্রিচিনপল্লীতে অবরোধ-কারীদের সংখ্যা হ্রাস হইলে মহম্মদ আলির উপর চাপ কম পড়িবে। কর্ত্তৃপক্ষ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ঐ কার্য্যভার তাঁহাকেই প্রদান করিলেন। সামান্যমাত্র সেনা-সবলে ক্লাইভ চাঁদসাহেবের পুত্র রাজাসাহেবের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫০ দিন ধরিয়া মহা বীরত্বের সহিত আর্কট রক্ষা করিলেন। ইহাতে চারিদিকে ইংরাজদিগের যশ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎপূর্ব্বে সকলে ফরাসীদের যুদ্ধে অজেয় মনে করিত, কিন্তু আর্কটে এ বিশ্বাস শিথিল হইল। ইংরাজেরা ইতিপূর্ব্বে অর্থবিনিময়ে মুরারীরাও ঘোরপোড়ে নামক একজন মারাঠা সর্দারের সাহায্য ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা যুদ্ধ করিতে জানেনা এই

ধারণাতে তিনি এতদিন তাহাদের সাহায্যে আসিতে তৎপর হন নাই। এবার তিনি এবং মহিশুরী সেনাপতি নন্দিরাজ উভয়েই সসৈন্যে ত্রিচিনপল্লীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তঞ্জোরাধিপতি নিজ সেনাধ্যক্ষ মঙ্কোজী বা মাণিকজীর নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন। পদ্মকোটার তাণ্ডিমানও সদলবলে আসিয়া দেখা দিলেন। তখন ক্লাইভ আর্কট হইতে বাহির হইয়া কাবেরীপকের যুদ্ধে (২৮।২।১৭৫২) আবার ফরাসী ও তাহাদের মিত্রদিগকে পরাজিত করিলেন। ইহার পর যুদ্ধের স্রোত ফিরিল। ইংরাজরা মহম্মদ আলির উদ্ধারকল্পে অগ্রসর হইলেন। ঘোর যুদ্ধের পর ত্রিচিনপল্লী তাঁহাদের হস্তগত হইল। চাঁদসাহেব এবং ফরাসীসেনাপতি জ্যাক ফ্র‍াঁসোয়া ল শ্রীরঙ্গমের উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। অবস্থার ফেরে তাঁহারাই এবার আক্রান্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন। তাঁহাদের সাহায্য জন্য দুপ্লে d'Auteuil নামক যে সেনাপতিকে পাঠাইয়াছিলেন তিনি কর্ণেল ডালটনের নিকট উটাটুরে (৩।৫।১৭৫২) এবং ক্লাইভের হস্তে ভোলকোণ্ডার যুদ্ধে (২৯শে মে) পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন আর তাঁহাদের রক্ষা পাইবার কোন আশা রহিল না। ৩রা জুন তারিখে তাঁহারাও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। চাঁদসাহেবকে লইয়া মিত্রগণের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, সকলেই তাঁহাকে আয়ত্তে পাইতে চাহিয়াছিল। সকল সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় বলিয়া তখন মঙ্কোজী তাঁহার প্রাণবধ করিলেন। লরেন্স এবং ক্লাইভকেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়া অনেকে মনে করেন না। বস্তুতঃ তাঁহারা যে চাঁদসাহেবের অদৃষ্টে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। *

অতঃপর মহম্মদ আলিকে আর্কটে লইয়া গিয়া ইংরাজরা মহাসমারোহে নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা দেখিলেন যে দুপ্লের পরিবর্তে তাঁহাদের মিত্র মহম্মদ আলিই তাঁহাদের প্রকৃত শত্রু। ইতিপূর্বে মহীশুরী-দের সাহায্যলাভ কালে তিনি তাহাদের মূল্যস্বরূপ ত্রিচিনপল্লী প্রদেশ দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবার পর প্রতিশ্রুতিপালনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মহিশুরীরা অঙ্গীকৃত মূল্য দাবী করিলে তিনি স্পষ্টভাবেই ত্রিচিনপল্লী প্রদানে অস্বীকার করিলেন। ইংরাজরা উভয়পক্ষে মিটমাটের চেষ্টা করিলে তাহাতে নন্দিরাজের ক্রোধ-বৃদ্ধি হওয়া ভিন্ন আর কোন ফল হইল না। প্রতাপসিংহ, তাণ্ডিমান, মুরারীরাও সকলেই রণশ্রান্ত হইয়াছিলেন, নবাবের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা সকলে একে একে নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এত বিপদেও দুপ্লে হতাশ হন নাই। চাঁদসাহেবের পতনের পর তিনি নূতন একজন নবাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবোদ্যমে শত্রুদের বাধাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য দর্শনে তাঁহার উল্লাসের অবধি রহিল না। তাঁহার চেষ্টায় নবাব ও ইংরাজদের পূর্ব্বতন মিত্রগণ ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিল। আরও এক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহার দীর্ঘ বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কর্ণাটকে ইংরাজদের ক্রীড়া-পুতুল নামসর্ব্বস্ব নবাব হইলেও দাক্ষিণাত্যে ফরাসীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রহিল। বুসীর সেনাদলের সাহায্যে রক্ষিত সিংহাসনে বসিয়া নিজাম সালাবৎজঙ্গ সর্ব্বতোভাবে তাহাদের অনুগত হইয়া চলিতে থাকিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সৈন্যগণের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ বুসীকে উত্তর-সরকার প্রদেশ জায়গীর দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে উত্তরসরকার বা সংক্ষেপে শুধু সরকার বলিতে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমতটবর্ত্তী বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরপূর্ব্বাঞ্চল বুঝাইত। সরকারগুলি ছিল সংখ্যায় পাঁচটী,—চিকাকোল, রাজমহেন্দ্রি, এলোর, কোণ্ডপল্লী এবং গুণ্টুর।

ভারতবর্ষে তাঁহাদের কর্মচারীগণের যুদ্ধবিবাদ দর্শনে এবং বাণিজ্য ও অর্থনাশে ইউরোপে উভয় কোম্পানীর কর্তারা বিষম বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বারবার উহাদের বিবাদ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বাণিজ্য-ব্যাপারে

---

* প্রায় এই সময়ে গাজিউদ্দিন দীর্ঘকাল পরে পৈতৃক পদলাভে সচেষ্ট হইয়া পেশবার সহিত দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য দুপ্লেকে বিশেষ বিব্রত হইতে হয় নাই। আওরঙ্গাবাদে আসিয়া তিনি বিমাতা সালাবৎজননী-প্রদত্ত বিষাক্ত খাদ্য-ভোজনে গতায়ু হইলে মারাঠারা নিজামের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল।

মনোনিবেশ করিবার আদেশ দিতেছিলেন। ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ কিন্তু উক্ত আদেশের সঙ্গে তাঁহাদের কর্মচারী-বৃন্দকে প্রয়োজনমত সৈন্য এবং অর্থ যোগাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। পক্ষান্তরে ফরাসী কর্তৃপক্ষ দুপ্লের প্রতি বিষম অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এ দেশের আধিপত্য-লাভে কোন ইচ্ছা ছিল না। লণ্ডনে এক বৈঠকে উভয় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন যে উভয়েই নিজ নিজ যুদ্ধরত গভর্ণরকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিয়া নূতন ব্যক্তিকে সন্ধিস্থাপনোদ্দেশ্যে পাঠাইবেন। তদনুসারে ফরাসীরা চার্লস রবার্ট গদেহ নামক এক ব্যক্তিকে দুপ্লের পদে গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। আবশ্যক হইলে দুপ্লেকে ধৃত করিবার ক্ষমতাও ইঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং সে ক্ষমতা কতকটা অনাবশ্যক কঠোরতার সহিত ইনি ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঠিক যে সময় আবার সাফল্য-লাভের সম্ভাবনা দুপ্লের সম্মুখে দেখা দিয়াছিল সেই সময় গদেহ আসিয়া (২।৮।১৭৫৪) তাঁহার হস্ত হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। ইংরাজ কোম্পানী নূতন গভর্ণর পাঠাইলেন না। ফরাসী কর্তৃপক্ষ কোনমতে যুদ্ধাবসানের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহারা ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। ১১ই অক্টোবর তারিখে "সাময়িক কনভেনসন" অনুসারে উভয়পক্ষে সাময়িক ভাবে যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল। অনন্তর গদেহ ইংরাজ গভর্ণর সণ্ডার্সের সহিত সন্ধি সর্ত্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সমসাময়িক সকল ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে থাকায় এবং অপর পক্ষে এ দেশে একেবারে নবাগত ব্যক্তি থাকায় ইংরাজরা যে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। পর দিবস ১২ই অক্টোবর তারিখে দুপ্লে চির-জীবনের মত তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। ২৬শে ডিসেম্বর উভয়পক্ষে স্থায়ীভাবে সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক মুহূর্ত্তে দুপ্লের সকল কার্য্য ব্যর্থ হইয়া গেল। এত আয়াসে, এত পরিশ্রমে, বহু অর্থ ও লোকক্ষয় করিয়া ফরাসীরা যাহা কিছু লাভ করিয়াছিল সবই পরিত্যক্ত হইল। ইংরাজেরা যাহা চাহিতেছিল সবই পাইল। জেমস্ মিল সত্যই বলিয়াছেন যে শান্তিপ্রিয়তার জন্য অতি অল্পসংখ্যক জাতি এ ধরণের গুরুতর ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছে।* ফলতঃ এই সন্ধি ইংরাজদিগের পক্ষে পরম সুবিধার কারণ হইয়াছিল, যেহেতু চাঁদসাহেবের স্থান দখল করিবার মত ফরাসীদিগের পক্ষে কেহ রহিল না; কিন্তু নামসর্ব্বস্ব নবাব মহম্মদ আলিকে পাইয়া ইংরাজরা একাধারে একটি মুরুব্বি ও ক্রীড়াপুতুল হাতে পাইলেন এবং তাঁহার প্রজাপুঞ্জের উপর তাঁহার আধিপত্য-রক্ষার অজুহাতে তাঁহারা, যখনই পুনরায় তাহা ঘটুক না কেন, ফরাসীদের সহিত আসন্ন সমরের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ম্যালিসনের মতে দুপ্লেকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিবার পরিবর্ত্তে যদি ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এক রেজিমেণ্ট সৈন্য পাঠাইয়া দিতেন তবে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিবার প্রয়োজন হইত।

ফ্রান্সে ফিরিয়া গিয়া দুপ্লে সকলকার নিকট বিষম অসদ্ব্যবহার পাইয়াছিলেন। তিনি যেন ঘোর অর্থগৃধ্নু নিম্নশ্রেণীর এক ভাগ্যান্বেষী জীব, শুধু নিজের খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য যুদ্ধে মাতিয়াছিলেন কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে সেই ধরণের ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি যে ভারতবর্ষে ফরাসী-জাতির প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, নিজ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কিছু করেন নাই, সে কথা কেহ মনে রাখিল না। কোম্পানীর তহবিলে যথেষ্ট অর্থ না থাকায় তিনি নিজ ধনসম্পত্তি যাহা কিছু ছিল সবই অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন এবং প্রচুর অর্থ গভর্ণমেণ্টের নামে ঋণ-গ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ টাকা কোম্পানী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। রাজসরকারও এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন সাহায্য করিলেন না। ঘোর অভাব অনটনের মধ্যে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন-কর্তৃবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি স্বদেশপ্রাণ এই মনীষির মৃত্যু হইয়াছিল।

ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার প্রথম সর্ত্ত ছিল যে অতঃপর উভয় কোম্পানী ভারতবর্ষে

* "All these brilliant advantages were now cordially resigned by M. Godehu and it will certainly be allowed that few nations have ever made, to the love of peace, sacrifices relatively more important."

Mill—"History of Brit. India"; Bk. IV. Ch. II p. 144.

রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা অথবা এতদ্দেশীয় রাষ্ট্রগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন। সর্ত্তমত বাধ্য না হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বীগণের অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাভোগে অনিচ্ছুক ফরাসী কোম্পানী ইংরাজদিগের প্রতি নিজেদের শুভেচ্ছা দেখাইবার জন্য যুদ্ধকালে লব্ধ চারিটী জেলার আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে "সন্ধিপত্রের কালি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই" ইংরাজরা আবার সমরে মাতিলেন; তাহাও আবার করমণ্ডলতটে দেবীকোটা নামক ক্ষুদ্র একটি স্থানের লোভে।* তাঞ্জোররাজ প্রতাপসিংহ দীর্ঘকাল হইতে সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। অপরাপর সকলের মত ইংরাজরাও তাঁহাকে বরাবরই রাজা বলিয়া মানিয়া আসিতেছিলেন। তাহা সত্ত্বেও এই সময় সাহজী নামক জনৈক তাঞ্জোর-রাজবংশীয় ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হইবার অভিপ্রায়ে ইংরাজদিগকে যখন জানাইল যে তাহাকে সাহায্য করিলে মূল্য স্বরূপ দেবীকোটা প্রদেশ সে তাঁহাদের প্রদান করিবে তখন লাভের আশায় মান্দ্রাজ কর্ত্তৃপক্ষের আর উল্লাসের অবধি রহিল না। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাঞ্জোরে এক অভিযান পাঠাইলেন। ফরাসীরা সন্ধিপত্রের দোহাই মানিল, নিজেদের নজির দেখাইল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল।† ইংরাজদের তাঞ্জোর অধিকারের চেষ্টা কিন্তু সফল হয় নাই, তাঁহাদের সৈন্যদল ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইল। তখন সাহজীকে প্রতাপসিংহের দয়ার উপর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত আশু সন্ধি-স্থাপনে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের বিন্দুমাত্র বাধিল না। বিগত সমরের ব্যয় বাবদ মহম্মদ আলির নিকট হইতে ইংরাজদের অনেক অর্থ প্রাপ্য হইয়াছিল। তাহা পরিশোধ করিতে বলিলে নবাব জানাইলেন যে মাদুরা, তিনেভেলী ও ভেলোরের ফৌজদারগণের নিকট হইতে তাঁহার অনেক কালের রাজস্ব বাকী পড়িয়া আছে। ঐ টাকা সংগ্রহ কার্য্যে মিত্রগণ সাহায্য না করিলে তাঁহার পক্ষে তাঁহাদিগকে অর্থদান করা সম্ভব নহে। ইংরাজরা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মাদুরা ও ভেলোরে সৈন্য পাঠাইলেন। পরে সুবেদার ইউসুফ খাঁ প্রসঙ্গে সে বিবরণ দেওয়া হইবে। এখন বুসীর উত্তর-সরকারপ্রদেশে অভিযানের কথা বলা যাউক। ঐ জনপদ নিজাম তাঁহাকে সেনাদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ জায়গীর দিয়াছিলেন সে কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তথাকার অবাধ্য জমিদারগণ ইংরাজদিগের ষড়যন্ত্রে রাজস্ব প্রদান করা বন্ধ করিয়াছিল; সেজন্য উহাদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বুসী সসৈন্যে সরকার প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। ইংরাজদিগের মাদুরা ও ভেলোর অভিযান এবং বুসীর অভিযান যে এক ধরণের ব্যাপার নহে তাহা বিশেষ করিয়া প্রমাণ করা অনাবশ্যক।

বিজয়নগরাধিপতি গজপতি বিজয়রামরাজ ফরাসীদের মিত্র ছিলেন। ববিলির রাজার সহিত তাঁহার ঘোর শত্রুতা ছিল। বুসী উত্তর-সরকারে আগমন করিলে তিনি সসৈন্যে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। অনন্তর উভয়ের সেনাদল একযোগে ববিলিদুর্গ আক্রমণ করিল। রাজা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর আর কোন আশা নাই দেখিয়া দুর্গরক্ষীগণ প্রথমে নিজেদের স্ত্রী-পুত্রপরিজনবর্গকে সংহার করিল ও পরে সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুর সহিত ভীষণ সংঘর্ষের পর সকলে নিহত হইল; এক প্রাণীও শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিল না। তখন রক্তরঞ্জিত শূন্য দুর্গে ফরাসীসেনা প্রবেশ করিল। বুসীর ববিলি অধিকার তাৎকালীন ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা।* এই ঘটনার কয়েকদিন পরে ববিলিরাজের দুইজন বিশ্বস্ত অনুচর রাত্রিযোগে গোপনে নিজ শিবির মধ্যে ঘুমন্ত বিজয়রামের প্রাণসংহার করিল। তাঁহার পুত্র নবীন ভূপতি আনন্দ-

* "The English were the first to draw the sword, and from no higher inducement than the promise of a trifling settlement on the Coromandal coast." Mill's "History of British India," Bk. IV, Ch. II, p. 92.

† "The promise of booty dazzled them and they agreed. The French expostulated and appealed to the terms of the treaty and to their surrender of the four districts as a pledge of their desire of peace, but all in vain."

Torrens—"Our Empire in Asia." p. 21.

* ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ববিলির জমীদার কুমারী বীর পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশে এক স্মারকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে লিখিত আছে,—"The then Raja Ranga Rao, after fighting eight hours first put to death the women and children in the Fort and then fighting fell like another Leonidas with all his gallant bands."

রাজের নিকট কথাপ্রসঙ্গে বুসী একদিন বিজয়রামের প্রতি বিদ্রূপসূচক কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতৃনিন্দা শুনিয়া আনন্দরাজ বিষম ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন ফরাসীদিগের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহার সাধ্যের বাহিরে ছিল বলিয়া তিনি মনের ভাব মনে রাখিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর বুসী উড়িষ্যার প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র সরকারপ্রদেশ অধিকার করিয়া রাজস্বসংগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে ইউরোপে আবার ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। এবার ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট লালী নামক একজন সুনিপুণ যোদ্ধাকে ভারতবর্ষে তাঁহাদের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া বহু সৈন্যসহ পাঠাইয়াছিলেন। নৌবহরের অধিনায়ক হইয়া তাঁহার সহিত প্রেরিত হইলেন কাউণ্ট দি আশে নামক নিতান্ত ভীরু-প্রকৃতির একজন অযোগ্য এডমিরাল। এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে তাঁহাকে পাঠান কর্ত্তৃপক্ষের উচিত হয় নাই। লালী আসলে আইরিশ জাতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা সার জেরার্ড ও'লালী ষ্টুয়ার্ট বংশের পতনের পর জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া ফ্রান্সে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তথায় তিনি এক সম্ভ্রান্ত ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্র টমাস আর্থার লালী মাতামহ-বংশের সুপ্রচুর ধনসম্পত্তির এবং কাউণ্ট দি টলেণ্ডাল পদবীর অধিকারী হইয়াছিলেন।

লালী সাহসী, বীর, সুদক্ষ যোদ্ধা হইলেও এক মহাদোষে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। তিনি নিতান্ত দাম্ভিক ও সন্দিগ্ধপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল এদেশে সমাগত কর্ম্মচারীগণ সকলেই অসাধু ও অবৈধ উপায়ে অর্থার্জ্জনে তৎপর। অধস্তন ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির বড় অভাব ছিল; তিনি সকলকার সহিত অত্যন্ত কঠোর আচরণ করিতেন। শীঘ্রই তিনি সকলকার ঘোর অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অফিসর ও সৈনিকগণ অনেক সময় নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইত; জলে, স্থলে সৈনিকগণ স্বেচ্ছায় শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করিত। এ দেশের রীতিনীতি আচারপদ্ধতি সম্বন্ধে লালীর কোন জ্ঞান ছিল না। সে বিষয়ে দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের অধিবাসী দুপ্লের, তাঁহার তুলনায় অনেক বিষয়ে সুবিধা ছিল। দ্রাবিড় দেশের অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ লালীর অসহ্য বোধ হইত। এ সকল বিষয়ে দেশীয়গণের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া তিনি চলিতে পারিতেন না। ফলে ফরাসীরা ভারতবর্ষীয়গণের, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের, সহানুভূতি শীঘ্রই হারাইল।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে লালী পণ্ডিচেরীতে আসিয়া পহুঁছিলেন এবং কালবিলম্বব্যতিরেকে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় লালী সসৈন্যে এদেশে আসিতেছেন একথা দীর্ঘ অষ্টাদশ মাস পূর্ব্ব হইতে জানা থাকিলেও পণ্ডিচেরীর কর্ত্তৃপক্ষ এযাবৎ যুদ্ধের কোন আবশ্যকীয় আয়োজন করিয়া রাখেন নাই। লালী দেখিলেন রাজকোষে অর্থ নাই, সৈন্যদলের রসদ নাই, কামান ও মালপত্র বহনোপযোগী ভারবাহী পশু নাই। ইহাতেও লালী দমিলেন না; তিনি পণ্ডিচেরীর দেশীয় অধিবাসীদিগকে বেগার ধরিয়া কামান টানিতে বাধ্য করিলেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র, আদি-দ্রাবিড় ও মুসলমানের সহিত ঐ ধরণের হীন কর্ম্ম করিতে বা অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করিতে বাধ্য হওয়া যে কত বড় অপমানজনক ব্যাপার সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা ছিল না। যাহা হউক এইরূপে তিনি ইংরাজদিগের ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড অধিকার করিলেন। উক্ত দুর্গের পতনের পর ইংরাজেরা বুঝিলেন যে অতঃপর লালী মান্দ্রাজ অবরোধে প্রবৃত্ত হইবেন। লালীরও তাহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আবশ্যকমত অর্থাভাবে তাঁহাকে নিতান্ত বিব্রত হইতে হইয়াছিল। পণ্ডিচেরীর গভর্ণর তাঁহাকে স্পষ্টই জানাইলেন যে তাঁহাদের নিকট কিছুই নাই। লালী ফ্রান্স হইতে যে অর্থ আনিয়াছিলেন তাহা ইতোমধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এদেশে কোথাও হইতে অর্থলাভের সম্ভাবনা ছিল না। তাঞ্জোরাধিপতি প্রতাপসিংহ ইতিপূর্ব্বে চাঁদসাহেবকে ৫৮ লক্ষ টাকার যে হুণ্ডি দিয়েছিলেন তাহা ফরাসীদের নিকট ছিল। তদ্ভিন্ন ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড অধিকারকালে তথায় বন্দীভাবে রক্ষিত পূর্ব্বোক্ত সাহুজী লালীর হস্তে পড়িয়া ছিল। লালী প্রতাপসিংহকে জানাইলেন যে শীঘ্র তিনি হুণ্ডি পরিশোধ না করিলে তিনি তাঁহার স্থলে সাহুজীকে

সিংহাসনে বসাইবেন। কিন্তু প্রতাপসিংহ তাঁহার আদেশ পালনে কোন আগ্রহ দেখাইলেন না। তখন লালী সসৈন্যে তাঞ্জোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার তাঞ্জোর অধিকারের চেষ্টা সফল হইল না। অতঃপর লালী ইতস্ততঃ দুই একটি দুর্গ অধিকার, কোন কোন প্রদেশ হইতে রাজস্ব-সংগ্রহ, দুই একটি হিন্দু দেবমন্দির দখল, নিজ তহবিল হইতে অর্থদান ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে কিছু অর্থসংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া মাদ্রাজ অবরোধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসী সেনাদলে এই সময় অর্থ ও রসদের অভাবে সৈন্যগণ দীর্ঘকাল বেতন ও উপযুক্ত খাদ্য না পাইয়া বিষম অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের জন্য লালী সমরপরিষদের আহ্বান করিলে কোন কোন সেনানী স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, পন্দিচেরীতে অর্দ্ধাশনে শুখাইয়া মরা অপেক্ষা মাদ্রাজ অবরোধে শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলাগুলিতে প্রাণ দেওয়া অনেক ভাল। এই সকল নানা কারণে লালীর মাদ্রাজ অবরোধ করিতে ছয় মাসেরও অধিক বিলম্ব হইয়া গেল। সুতরাং ইংরাজরা আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা অন্যান্য অপর সকল স্থান হইতে নিজেদের সৈন্য অপসারিত করিয়া মাদ্রাজ মধ্যে আনয়ন করিলেন এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গও অবরোধ সহনোপযোগী করিয়া তুলিলেন। শুধু ত্রিচিনপল্লী ও চিঙ্গলপুটে এক একদল সৈন্য রাখা হইল। প্রথমোক্ত স্থানটী রক্ষা না করিলে সমগ্র দক্ষিণ প্রদেশ হস্তচ্যুত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। অবরোধকারী শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগ অকস্মাৎ আক্রমণ, তাহাদের রসদাদি লুণ্ঠন ও অধিকৃত জনপদ-মধ্যে অভিযানাদি দ্বারা তাহাদের বিব্রত রাখিবার জন্য দ্বিতীয় স্থানটীতে সৈন্য রাখা হইয়াছিল।

অতঃপর লালী মাদ্রাজ অভিযানের জন্য বুসীকে নিজাম রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যটী সমীচীন হয় নাই। বুসী জানাইলেন তিনি হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগ করিবামাত্র তথায় ফরাসী আধিপত্য চিরতরে বিনষ্ট হইবে। কিন্তু লালী কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বুসীর প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। আনন্দরাজ এই সুযোগে বুসীকৃত তাঁহার পিতৃনিগ্রহের প্রতিশোধ লইবেন স্থির করিলেন। পলাশীর যুদ্ধের ফলে তখন বঙ্গদেশের আধিপত্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল। আনন্দরাজ কলিকাতায় ক্লাইভের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে যথা কালে তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইলে তিনি উত্তর-সরকার হইতে ফরাসীদের বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইবেন (আগষ্ট ১৭৫৮)। বঙ্গদেশ হইতে ঐ প্রদেশে অভিযান পাঠাইলে মাদ্রাজ অবরোধোদ্যত লালী তাঁহার সেনাদলের কতকাংশ তথায় প্রেরণ করিতে বাধ্য হইবেন এবং তাহা হইলে অবরুদ্ধ ইংরাজগণের উপর চাপ কতকটা কম হইবে একথা বুঝিয়া ক্লাইভ তাঁহার কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে বিজয়নগরাধিপতির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত কর্ণেল ফোর্ডকে একদল সৈন্যসহ তাঁহার সাহায্যে পাঠাইয়া দিলেন। ইংরাজদের আগমনের পূর্ব্বেই আনন্দরাজ ফরাসীদের নিকট হইতে বিজাগাপত্তন অধিকার করিয়া-ছিলেন। ফোর্ড আসিয়া পৌঁছিলে তিনি উহা তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন (২০।১০।১৭৫৮)। বিজাগাপত্তন পূর্ব্বে ইংরাজদেরই ছিল, পূর্ব্ব বৎসর বুসী উহা দখল করিয়াছিলেন। অনন্তর উভয়ে রাজমহেন্দ্রি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উক্ত স্থান হইতে ৪০ মাইল দূরে কণ্ডোর নামক স্থানে ফরাসী সেনাপতি মার্কুইস দি কঁফ্লাঁ (Conflans) তাঁহাদের বাধা দিবার জন্য সুরক্ষিতভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। চারিদিন ধরিয়া উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া রহিল। পঞ্চমদিনে (৭।১২।১৭৫৮) তুমুল যুদ্ধের পর ফরাসীরা পরাজিত হইয়া মসলিপত্তন অভিমুখে পলায়ন করিল। যুদ্ধের পর আনন্দরাজের সহিত মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়ায় ফোর্ডের পলাতকগণের অনুসরণে বিলম্ব হইয়াছিল। ৩রা মার্চ্চ তারিখে তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া মসলিপত্তন অবরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় এই সময়েই লালীর মাদ্রাজ অধিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি নগর অধিকার করিলেও দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। ইংরাজরা মহাবীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা

করিতে লাগিলেন। নয় সপ্তাহ পরে এডমিরাল সার জর্জ্জ পোকক আসিয়া দেখা দিলেন। তখন আর জয়াশা নাই দেখিয়া লালী অবরোধ উঠাইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন (১৭।২।১৭৫৯)।

তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুনয়সত্ত্বেও বুসী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতে নিজাম ফরাসীদিগের প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কঁফ্লাঁ তাঁহাকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেও মিত্রগণের জন্ম ইংরাজদের সহিত সমরে লিপ্ত হইতে তাঁহার কোন ইচ্ছা বা সাহস ছিল না। যাহারা বিজয়লাভ করিবে তিনি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া সালাবৎজঙ্গ এ যাবৎ উদাসীন দর্শকবৎ নির্লিপ্ত ছিলেন। এমন সময় কঁফ্লাঁ তাহাকে জানাইলেন যে ফরাসী নৌবহর সৈন্ত লইয়া আসিতেছে। ইহাতে নিজামের কতকটা সাহস হইল। ইংরাজরা যে সময় মসলিপত্তন অবরোধ করেন প্রায় সেই সময়েই সালাবৎজঙ্গ অনুজ বসালৎ জঙ্গের সহিত ৩৫০০০ সৈন্ত লইয়া বেজওয়াড়া পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু কাউণ্ট আশে মসলিপত্তন সমীপে আসিয়া দেখা দিলেও বিপক্ষের রণপোতমালার আক্রমণাশঙ্কায় সৈন্ত নামাইতে সাহস না করিয়াই ফিরিয়া গেলেন। ইহাতে ভীত নিজাম অগ্রগমনে নিরস্ত হইলেন। কঁফ্লাঁর রক্ষার আর কোন আশা রহিল না, তিনি শত্রু-করে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন (৮।৪।১৭৫৯)। কণ্ডোর ও মসলিপত্তনের পরাজয় ফরাসীদের পক্ষে বিষম ক্ষতিকারক হইয়াছিল। ইংরাজদিগের উত্তরসরকারে প্রবেশ করার জন্ম লালীকে মান্দ্রাজ অবরোধে ব্যাপৃত নিজ বাহিনী হইতে সৈন্তদল বিচ্যুত করিয়া পাঠাইতে হইয়াছিল। মান্দ্রাজ রক্ষার তাহাই অন্ততম কারণ। মসলিপত্তনের পতনের ফলে উক্ত স্থানের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। আর সরকার প্রদেশ রক্ষা করিবার চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া ফরাসীরা তাহার উত্তরে অবস্থিত গঞ্জাম প্রভৃতি তাহাদের অধিকৃত স্থানসমূহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সালাবৎজঙ্গও এবার ফরাসীদের পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজাম আলি ইতিপূর্ব্বে ইংরাজদিগের প্ররোচনায় তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে রাজধানীতে বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন। ফরাসীদিগের নিকট হইতে আর সাহায্য প্রাপ্তির আশা ছিল না। নিজাম আলির বিদ্রোহদমন জন্ম সালাবৎজঙ্গ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। এই সন্ধির ফলে (১৪।৫।১৭৫৯) তিনি উত্তর-সরকার প্রদেশ ইনামস্বরূপে সনন্দ সহ ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন এবং ফরাসীদিগের সহিত ভবিষ্যতে কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি কিছুই, এমন কি আপদকালে সাহায্য প্রাপ্তির আভাস পর্য্যন্ত, তাঁহাদের নিকট হইতে পান নাই। হায়দ্রাবাদে ফিরিয়া আসিয়া সালাবৎজঙ্গ দেখিলেন যে অতঃপর বর্দ্ধিত-প্রভাব নিজাম আলিকে আর না মানিয়া উপায় নাই। বসালৎজঙ্গ এ যাবৎ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। অতঃপর নিজাম তাঁহাকে নিজ জায়গীর মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া উক্তপদ নিজাম আলিকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। শীঘ্রই সকল প্রকৃত ক্ষমতা নিজাম আলির হস্তগত হইল। দরবারে সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া এবং অদূর ভবিষ্যতে বুসীর সাহায্যচ্যুত আত্মরক্ষায় অসমর্থ সালাবৎজঙ্গকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং সুবেদার পদে আরোহণ করা নিজাম আলির পক্ষে কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য কার্য্য হইবে না বুঝিতে পারিয়া সময় থাকিতে বসালৎজঙ্গ ফরাসীদের সাহায্যে একটী স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনে যত্নবান হইলেন। গুণ্টুর এবং আদোনি প্রদেশ তাঁহার জায়গীর ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী কড়াপা জেলা ও উত্তরসরকার প্রদেশ অধিকারে তিনি সচেষ্ট হইলেন। বসালৎজঙ্গ কড়াপায় প্রবেশ করিলে বুসী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইহাতে নিজাম আলির বড় ভয় হইল। বুসী আবার সালাবৎজঙ্গের নিকট যদি ফিরিয়া আসেন তবে তাঁহার মনের আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে বুঝিয়া তিনি বসালৎজঙ্গকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন নিজ জায়গীরমধ্যে তিনি ফিরিয়া গেলে উহার আয়তন যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করা হইবে। বসালৎজঙ্গের আকাঙ্ক্ষা সফল হয় নাই। ইংরাজরা পণ্ডিচেরী আক্রমণে অগ্রসর হওয়ায় লালী বুসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরে উত্তর-সরকার ও কর্ণাটক প্রদেশে ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তথায় রাজ্যস্থাপন তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজাম আলি দক্ষিণ-কড়াপা প্রদেশ তাঁহাকে জীবদ্দশায় নিজ জায়গীরের সহিত ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। নিজাম আলির রাজ্যলাভের পর* হায়দ্রাবাদের ব্যাপারে বসালৎজঙ্গের আর কোন সংস্রব ছিল না। নিজ জায়গীরে একদল ফরাসী সেনা সাহায্যে অর্দ্ধ-স্বাধীনভাবে দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ উপভোগ করিয়া ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। আদোনি সহরে তাঁহার সমাধিসৌধ অবস্থিত আছে। তাঁহার কর্ম্মাধীন ফরাসীসৈনিকগণের কথা স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধে বলা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

* ১৮ই জুলাই ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে সালাবৎজঙ্গকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজাম আলি নিজে নিজাম পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামলা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

১

অনেক পেয়ে ভুলব তোমায়, তুমি নও তেমন
তোমার আছে একটি মায়া, আমারো এক মন।
খুঁজলে দেখো এই নিখিলে
দেখতে ভালো অনেক মিলে
না দেখিতেও পায় যারে মন, তুমি আমার সেই,
কেমন তুমি, কথা দিয়ে বলার কিছু নেই॥

২

কুহকী ঐ কালো আঁখি ভাবতে ভালো লাগে,—
আপন মনে মগ্ন সে কোন্ গভীর অনুরাগে।
কালো তোমায় বলে লোকে
—দেখুক তারা আমার চোখে,
কালো কেশের রাশে কেমন খোঁপাটি জমকালো,
আঁখির তারায় রাখলে তোমায় মানায় বুঝি ভালো॥

৩

বাহিরের ঐ কোমল কালো শ্যামল আবরণে
চাও কি অমল হিয়াখানি রাখ্‌তে সংগোপনে?
আড়াল ক'রে বুকের মণি
পারে কি গো রাখতে খনি,
বুঝি,—মনে গোপন আছে আভিজাতিক পণ,—
সবাই তোমায় দেখ্‌বে,—কেবল বুঝবে দু-একজন॥

৪

ঈষৎ বাঁকা ভাঁজ পড়েছে সমুখ মেখলায়
টুটিতে চায় তরুণ কটি চলিতে পায় পায়।
মনে মনে সন্দেহ নেই
রূপটি খোলে ঐ ধরণেই—
ললাট পারে প'ড়ে আছে একটি মোটা সীঁথি
সাজ কিছু নাই, আছে সাজের অপরূপ এক রীতি॥

৫

সবার চেয়ে কাছের তুমি সব চেয়ে রও দূরে,
দু-চোখ ভ'রে দেখ্‌তে যাব,—মুখখানি যায় ঘুরে'।
পথে পথে আস্‌তে যেতে
কান কি তুমি রাখো পেতে,
ঘন বনের ছায়ায় ঘেরা অতল কালো দীঘি,
(যেন) তীরে তারি মৌনে ফিরো চকিত মায়ামৃগী॥

৬

কবি হোলে ছন্দ গেঁথে নিতেম চলার ছাঁদে
নিতেম হাতের ডোলটি যখন আঁচল ফিরাও কাঁধে।
চিবুকটুকুর চিকণ রেখা
তুলির টানেই যায় যে লেখা,
বাণী আমার বিমুখ, নচেৎ সুর মিলায়ে সাথে
তোমার মুখের কথা নিতেম বীণার তারে বেঁধে॥

৭

বলব না তো ভেবেছিলেম,—হাসি রইল বাকি,
মনের থেকে বাইরে তারে কেমন ক'রে রাখি !
আধেক ঝলে দশন সারি
অধর কাঁপে সঙ্গে তারি,
চাপা পুলক উছ্‌লে খানিক পড়ে কপোল কূলে
আষাঢ় মেঘে চাঁদের খেলা দেখি সকল ভুলে ॥

৮

এমনি লাজে নম্রমুখী, লজ্জাবতী লতা,
মাঝে মাঝে কী ছল ছলো,' কইনি তো সেই কথা !
মুখের পানে চেয়ে সোজা
কেন হাসো যায় না বোঝা,
আমিও যে তোমায় খুঁজি, তাই কি তুমি জানো ?
সত্যি তুমি কী দুষ্টু গো,—মন দিয়ে মন টানো ॥

৯

অনেক কিছু দেয় অনেকে সব কি সবার তরে !
সকল সময় সকল কিছুই মনেও নাহি ধরে !
আমি যখন যেমনটি চাই
তোমায় তখন লাগে যে তাই,
সবার চেয়ে তোমারি দান একটি গুণে ভারী,
—তুমি আমায় যা দিয়েছ দেয়নি কোনো নারী।

১০

তাই তো ভাবি,—তুমি আমার আর-জনমের প্রিয়া,
এই যা এলে, এলে কেবল ছাপ টুকু তার নিয়া।
রূপের চেয়ে রসে বড়ো
সেই তুমি যে কেমনতরো
স্পষ্ট ক'রে আরো কি চাও পূর্ণ-পরিচয় ?—
হৃদয় দিয়ে দেখো' হৃদয়,—বুঝ্‌বে সমুদয় ॥

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর



অনুতাপে দহে

শ্রীমীনা দাশগুপ্ত

লোকে যখন অশ্রদ্ধা করিয়া বলে পাগল—তখন আমার স্মরণে জাগে এক পাগলের কথা,—কল্পনায় অবিশ্বাস্য—শ্রবণে অতিরঞ্জিত এমনি বেদনা-সুন্দর পাগল সে।

কার্য্যোপলক্ষে সে সময় আমরা যাইতে হইয়াছিল। পাটনা হইতে নিকটে অনতিক্ষুদ্র সহর। বেহার অঞ্চল যেরূপ হয় এদেশেও সেইরূপ, যেমন ধূলি তেম্নি বুলি—শান্ত শ্রী বাংলার সঙ্গে কণামাত্র মিল নাই। তবু শোণ নদীর প্রসাদাৎ জায়গাটী বেহারের অন্যান্য স্থান হইতে কিঞ্চিৎ সুজলা সুফলা।

এই তো দেশ, এখানে আমাদের বাসের জন্য যে বাড়ি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার পাশেই সুরম্য অট্টালিকাবাসী প্রাচীন ধনী পরিবারের মধ্যে এক পাগলের অবস্থিতি শুনিয়া অভয় পাওয়া সত্ত্বেও মনে হইল, এ যে সোনায় সোহাগা,—আত্মীয়স্বজন ছেড়ে কিনা পাগলের প্রতিবেশী। কিন্তু পাগল সত্যই নিরুপদ্রব, এমন কি আমরা তাহার অস্তিত্বও জানিতে পারিতাম না, যদি না গভীর নিশীথে কাহারো আকুল ক্রন্দনে স্বেদাক্ত কলেবরে জাগিয়া উঠিতাম। বুকফাটা সেই আর্ত্তনাদে সেই মুহূর্ত্তে শুধু এবাড়ি ছাড়িবার বাসনা মনে জাগিত। রাত্রিশেষে সে আকুল কণ্ঠ যখন আপনার হৃদয়ের ধনকে খুঁজিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মিলাইয়া আসিত, তখন কোন ফাঁকে নিদ্রা আবার চোখ জুড়িয়া বসিত; তার পর ফুলগন্ধসমাকুল প্রত্যুষের স্নিগ্ধ-মধুর বায়ুতে পাগলের সে ক্রন্দন একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মতই মনে পড়িত। ক্রমে সে কান্নায়ও অভ্যস্ত হইলাম; অবসর সময়ে পাগলের [illegible] ঘুরিয়াছি তখন। আর কি বা করা যায় [illegible] তো মোটে দেড়খানা। সিপা[illegible] জড়িত বিপন্ন ইংরেজদের আশ্রয়-স্থল বলিয়া বিখ্যাত আরা হাউস একদিন দেখা হইল। বিদ্রোহীদল পরিবেষ্টিত ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর বহু লোক এই সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রাণভয়ে দিনের পর দিন কাটাইয়াছে। জলাভাবে ক্লিষ্টতার চিহ্ন-স্বরূপ সঙ্গীন দিয়া খোঁড়া একটী কূপ তাহাদের ভয়াবহ যন্ত্রণার সাক্ষ্য দিতে বহুকাল জাগিয়াছিল, কিন্তু সর্পসঙ্কুল হওয়ায় পরে তাহা বন্ধ করা হয়।

ইহা ভিন্ন 'নক' বা শোণ নদীকে বাঁধ দিয়া যে স্থান হইতে নহর কাটিয়া সমস্ত সহরকে জলময় করা হইয়াছে, বাঁধ খোলা অবস্থায় যাহা ছোটখাটো জলপ্রপাত বলিয়া মনে হয় সেখানে বেড়াইতে যাইতাম কখনো। কিন্তু আমার সারাদিনের কৌতূহল জুড়িয়া জাগিত ঐ পাগল, রাত্রিতে যে এত অস্থির অশান্ত প্রভাতে তাহার সাড়াই পাওয়া যায় না—কাষ ফেলিয়া ছুটিয়া যাই বাতায়নে, তাহাকেই দেখিতে। পাগলের দেখা পাই বা না পাই প্রথমেই চোখে পড়ে প্রাচীরবিলম্বিত এক সুদর্শন কিশোরের নানা আকারের তৈলচিত্র। সে ছবি এতই স্পষ্ট মনে হয় চিত্রের মধ্য হইতে হাস্য-প্রতিভাত উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে আমার দিকেই চাহিয়া আছে। প্রশস্ত কক্ষ, রুদ্ধদ্বার হইলেও চারিদিকের বাতায়ন পথে দিনের আলোর অবাধগতি। সারাদিন তাই চোখে পড়ে এক ম্লান মূর্ত্তি চিত্রের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু সে ছায়া এতই চপল একটুক্ষণ দেখিতে না দেখিতে মুহূর্ত্তে অন্তত্র সরিয়া দাঁড়ায়, সারাদিনে তাহাকে স্থিরভাবে মাত্র একটিবার দেখিতে পাই,—সে বেলা আটটায়। রুদ্ধ গৃহের দ্বার তখন খোলে। শ্বেতশ্মশ্রুসমাচ্ছন্ন সৌম্যকান্তি এক বৃদ্ধ [illegible] কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়ান, প্রতি পদক্ষেপও [illegible]ত্যের পরিচায়ক, শুভ্র কেশে বেশে রূপ যেন আরো মহিমামণ্ডিত কিন্তু সমস্ত মিলিয়াও তাহার বিষাদ-গম্ভীর মুখের ম্লান ছায়া লুকাইতে পারেনা। অপরিবর্ত্তনীয়

মুখচ্ছবি লইয়া প্রত্যহ এই সময়ে তিনি স্বহস্তে পাগলের পরিচর্য্যা করিয়া যান। ভৃত্যেরা নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার লইয়া নীরবে কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় তখন। প্রসাধন শেষে পাগলীকে আহার করাইতে কি সস্নেহ চেষ্টা! আড়াল হইতে দেখিয়া মনে হয় এরূপ স্নেহ-সদয় স্বামী হইলে পাগল হইয়াও সুখ। কতকাল হইতে—হয়ত বা যুগাতীত হইতে চলিল—সেবাপরায়ণ স্বামীর ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই। পাগলীও ইহার হস্তে আপনাকে নিঃশব্দ নির্ভরে ছাড়িয়া দেয়। বিকৃত মস্তিষ্কে স্বামীকে চিনিতে পারে কি? কিম্বা প্রাণস্পর্শী স্নেহে পাগলেরও হৃদয় ছুঁইয়া যায়? শান্ত প্রভাত তাই পাগলের শান্তিতে কাটে—তারপর অপরাহ্ন হইতেই সে আবার অস্থির হইয়া ওঠে। রজনীর ভয়াবহ স্মৃতি বুঝি তখন হইতে তাহার মনে ছায়া বিস্তার করিতে থাকে। অনিবার্য্য সেই অশান্ত চঞ্চলতায় তখন কেহ আর তাহাকে দেখিতে আসে না। একমাত্র আমি সে সময় তাহার দর্শক! এইরূপে একদিন চোখের পরিচয় ঘটিয়া গেল পাগলীর সঙ্গে। সেদিন আমার তিন বছরের কন্যাসহ জানালায় দাঁড়াইয়াছিলাম ক্ষণ পরে দেখি পাগলীও আসিয়া তাহার বাতায়নে দাঁড়াইয়াছে। এত কাছে আর কখনো তাহাকে দেখি নাই। দুই বাড়ির মাঝখানে অল্পই ব্যবধান। পাগলের রূপ যে দেখিবার মত হয় সেদিন দেখিলাম। যৌবনের উচ্ছল রূপ-তরঙ্গ সে যদি বা পার হইয়া থাকে তবু কোন নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় চিত্রিত সুন্দর মূর্তি। বস্ত্রহীন অনাবৃত দেহ, না হইলে কে বলিত পাগল! তৈলসিক্ত কেশ পরিপাটি করিয়া টানিয়া বাঁধা—পাগলের রুক্ষচুলের পরিচয় তাহাতে নাই। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখাটি পর্য্যন্ত সযত্নে আঁকিতে ভুল হয় নাই। সম্ভ্রান্ত পরিবারের আদরিণী গৃহিণী—স্বামী তাহার নিদর্শন প্রসাধনেই রাখিতে চান। কেবল চোখের নীচের কালি মুছিয়া দিতেই বুঝি তাঁহার শক্তিতে কুলায় না—সে কালি এত নিবিড় করিয়া ঢালা যে কাজল বলিয়া ভুল করিবার আগেই মনে পড়ে নিদ্রাবিহীন নিশীথের পীড়াদায়ক অস্থিরতার পরিণাম। অপলক নেত্রে তাহাকে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ আমার মেয়ে হাসি হাসি মুখে বলিয়া, উঠিল "—মাইজী কাপড়া না পিন্হা!"—এতটুকু মেয়ে, মানুষের আচরণ সম্বন্ধে এ বয়সেই তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে; পাগলীর কটি-বিলম্বিত মোটা ঘাগরা তাহার নজরে পড়িতেছে না, জানালার উপরে তাহার অনাবৃত বক্ষদেশ দেখিয়া তার আপন ভাষায় (যে ভাষা সে ঝি চাকরের কাছে শিখিয়াছে) বলিল, মা কাপড় পরেন নাই। মেয়ের হাসি দেখিয়া আমিও হাসিয়াছিলাম (শুনিয়াছি পাগলীর পরিধেয় বস্ত্রের উপর যত আক্রোশ; সম্ভব হইলে অত মোটা ঘাগরা ছিঁড়িতে তাহার বিলম্ব হয় না) বোধহয় অমনি পাগল চকিতে সরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম

'যদি সরম লাগে চোখে চাহিব না—'

এক লাইন মাত্র, কিন্তু কি সুকণ্ঠ—অতীতের শিক্ষার্জিত পরিচয় সুমিষ্ট সুরের রেশ—শ্রবণে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগে।

ইহার পরে পাগলের মুখে আরো কত গান শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার আশায় উন্মুখ হইয়া ছুটিয়া গিয়াছি, অমনি গান থামিয়া গিয়াছে। মনে পড়ে একদিন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সন্ধ্যায় পাগলের মুখে—চাঁদ আজ তুই যাস্‌নিরে—শুনিয়া আমার চোখে জল আসিয়াছিল। এমন করুণ আবেগের গান পাগলের কণ্ঠে—আহা কেন যে পাগল রইল!

আবার অন্যের গানেও পাগল চঞ্চল হইয়া উঠিত; একদিন কাজী নজরুলের একটা গানেই বোধ হয় সুর-সংযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই পাগলীর কাতর অনুনয় শুনিলাম, "গাওনা সে গানটা সেই যে আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা।" মনে পড়িয়া গেল এমনি একদিন সন্ধ্যায় দীপ জ্বালিতে দেখিয়া পাগলী এইরূপ কাতর-কণ্ঠে দেশলাই চাহিয়াছিল। সে সময় আমার চাকর বলিয়াছিল, "মাইজী, ওর ছেলে কিনা আগুনে পুড়ে মারা গেছে তাই দেশলাই চাইছে।" সে দিনের কাতরতায় আজিও পাগলী জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আমার হঠাৎ যেন, মতিচ্ছন্ন হইল তখন, তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম—আর সেই মুহূর্ত্ত হইতে পাগলের কিছুক্ষণ উন্মত্ত দাপাদাপির পর সেদিন অপরাহ্নেই রাত্রির কান্না সুরু হইল। অজানিতে তাহার বেদনার স্থানে আঘাত করিয়াছি—অনুশোচনায় আজিও ক্লিষ্ট হইয়াছিলাম সেদিন।

পথগণের প্রতি সহানুভূতি কখন আকর্ষণে পরিণত হইয়াছিল। তাহার তুচ্ছতম সংবাদ জানিতেও উৎসুক হইতাম।

পশ্চিমের গরমে গৃহবাসী নরনারীকেও বৈশাখের দাবদগ্ধা ধরণীর ন্যায় সন্ধ্যার স্নিগ্ধ পরশের আশায় ঘর ছাড়িতে হয়। সেই অপরাহ্নে আমাদের প্রতিবেশী বৃদ্ধ তাঁর বাড়ির সম্মুখের উদ্যানে পায়চারী করিতে নামিয়া আসিতেন। যখন হাস্নুহানার দল আপনার সৌরভে পথচারী লোককে বিহ্বল করার আয়োজনে ফোটনোন্মুখ, গুচ্ছাবনত রক্তকরবীরঞ্জিত শাখা কৃষ্ণচূড়ার রক্ত রং-এ পরাজয় মানিয়া নুইয়া পড়িতে চায়—সেই সময়ে বৃদ্ধ বাহিরে আসিয়া খানেক থমকিয়া দাঁড়ান। হৃদয়-ভার বহনে ক্লান্ত মানুষ দিনান্তে একবার বুঝি নিজেকে মুক্তি দিতে ধরণীর স্নেহ-শ্যামল স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া ওঠে। বৃদ্ধের এই নিঃসঙ্গ ভ্রমণে সঙ্গী হইতে সাধ হইত। ক্রমে আলাপও হইয়া গেল। মাঝে মাঝে তখন স্বামির সহিত আমিও জুটিতাম সেখানে। সম্পর্ক পাতাইতেও আমার বিলম্ব হয় নাই। মার মুখে শোনা আমার দাদামহাশয়ের যে রূপ কল্পনায় আঁকিয়াছিলাম ইঁহাকে দেখিয়া আমার সে ছবি জাগ্রত হইয়াছিল তাই বলিয়াছিলাম, "আপনি আমার দাদু—কেমন হলেন ত?" বৃদ্ধ সহাস্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। তারপর দুরন্ত আবদারে কত যে তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছি কিন্তু অন্তর-নিহিত কুণ্ঠায় যে কথা জানিতে চাই তাহা কখনো জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। অবশেষে একদিন সুযোগ হইল, সেদিন তিনি স্ত্রীর অশান্ত-পনা বৃদ্ধির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিলেন আমি বলিলাম, "ওঁর মন খুব কোমল, না দাদু? নইলে পুত্রশোক ত কত লোকের—।"

দাদু বাধা দিয়া বলিলেন, "না না তুমি জানোনা—শোক সহ্য করা যায়—যদি অনুতাপের হৃদয়-ছেঁচা রক্ত তার সঙ্গে না মেশে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বলুন না দাদু আপনাদের ছেলে কি করে গেল।" বৃদ্ধ ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিলেন, "এস বসা যাক—তার পর সে দুঃখের কাহিনী তোমাদের শোনাই—তার ছবি তোমরা দেখেছ ত? কত আরাধনার পর সে এ বাড়িতে এল। যার কান্না আমার বাবা কাকা শেষ মুহূর্তেও করে গেছেন, আমার মাও যার আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন সে ঐ নীলমণি। ওর জন্মের পূর্ব্বে,—বংশ-লোপের অপরাধ শ্বশুরকুল ক্ষমা করবেন না—অবিশ্বাস্য ভাগ্যের প্রতি আশঙ্কায় আমার স্ত্রীর বহু রজনী বিনিদ্র কেটে যেত। সকলের কামনা পূর্ণ করে সে যখন এলো বাড়িতে তখন উৎসবের ঢেউ বইল। বহু দিন অপেক্ষিত ধনজন সার্থক হয়েছে এতদিনে, দুঃখী ভিখিরির জয়োল্লাসে এইরূপ মনে হোত।

মণি যখন বড় হয়ে উঠল তখন দেখা গেল সকলের কামনার ধন হয়েও সে যেন তার মায়েরই নিজস্ব রত্ন—তার সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ তাকে স্পর্শ করতেও অধিকারী নয়। এমন কি সে স্নেহাকুল আবেষ্টনীর মাঝে আমি পর্য্যন্ত ঠাঁই পেলাম না। দাসদাসীর সংখ্যা বাড়লেও ছেলেকে নিজের কোল ছাড়া করেননি কখনো। পাঁচ বছরের ছেলেকেও কোলে নিয়ে বেড়াতেন। তাঁর পিত্রালয় থেকে কে বলেছিল, অত বড় ছেলে বয়ে বেড়াস কেন?—একজন পিত্রালয় যাওয়া ছেড়ে দিলেন। আমার মা ও নাতির মুখ দেখেই স্বর্গে গিয়েছিলেন, সুতরাং আমার স্ত্রীর কাযে বাধা দিতে কেউ ছিলনা। তাঁর সেবা-নিপুণ হাত শুধু ছেলের কাযেই নিযুক্ত রইল, সুকণ্ঠও কেউ শুনত না, যদি না ঘুম-পাড়ানী গান গাইতে হত। এক কথায় তাঁর জগৎ শুধু পুত্রময় হয়ে উঠেছিল। ক্রমে এলো তার শিক্ষার কাল, সেখানেও কেউ হস্তার্পণ করল না। আমি রইলাম পূর্ব্ববৎ নির্লিপ্ত দর্শক।

মণি যখন তেরো বছরের হ'ল এই সময়ে তার মার মুখে কিসের কালো ছায়া পড়ল। সে মহল থেকে বিতাড়িত আমারও মাঝে মাঝে ডাক পড়তে লাগল আবার। লক্ষ্য করে দেখলাম আমার স্ত্রীর সদা হাস্যমুখ—ছেলের জন্মের পর থেকে যে প্রফুল্লতায় ভাটা পড়েনি সে মুখও বিমর্ষ হয়ে উঠেছে।

মণি তখন বাড়ির সমস্ত বিলিতি জিনিস বর্জনে বদ্ধ-পরিকর। বাড়ির লোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে; আমার স্ত্রী প্রথমে সহাস্যে সব ছেড়ে দিলেন—তারপর হঠাৎ কি কারণে বিদেশী বস্ত্রের আকর্ষণ তার কাছে দ্বিগুণ হয়ে গেল।

আমি কিন্তু বিনা আপত্তিতে আমার বিলিতি পোষাকগুলো দিয়ে তার আবদার পূর্ণ করতাম। তার পরিতৃপ্ত হাসিটুকুর বিনিময়ে পেতাম স্ত্রীর তিরস্কার। একদিন বল্লাম, 'কেন তুমি রাগ কর? বালকের খেয়াল বৈত নয়'।

কিন্তু ক্রমেই জানতে পেলাম মণির কাযগুলো বালকোচিত গণ্ডী ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মার সান্নিধ্য আর তার কাছে প্রিয় নয়—পাঠাভ্যাস বা খেলার সময় ছাড়াও সে কোথায় যে সময় কাটায়, বিস্মিত বেদনায় আমাকেও স্ত্রীর চিন্তায় ভাগ নিতে হল। মার বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ আর শীর্ণ দেহ দেখেও মণির কার্য্য-ধারার পরিবর্ত্তন হল না দেখে আমার আশঙ্কা নিঃসন্দেহে পরিণত হল—মণি কোথাও নিজেকে উৎসর্গ করেছে। বছর খানেক পড়ে সেবার আমাদের মণিকে নিয়ে দেশভ্রমণের সঙ্কল্পে সমস্ত আয়োজন স্থির; মণি বেঁকে বসল সে দেশভ্রমণে যাবে কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে। তার মার কাকুতি বিফল হ'ল—আমার তিরস্কারেও সে বিচলিত না হয়ে যাওয়ার জন্ত বারবার জেদ করতে লাগলো। অনেক তর্কের পর তাকে অনুমতি দিলাম এই সর্ত্তে—যে তার সঙ্গে একটি লোক নিতে হবে। সে রাজি হয়ে মার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাইলে। তিনি নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। মণি বিদায় নিয়ে যাবার পর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন, 'ওকে যেতে দিলে—ওগো ওকে ছেড়ে দিওনা—ওকে মানুষ কর তুমি—।'

মণি যে ফাঁকি দিতেও শিখেছে—টের পেলাম ঘণ্টা কয়েক পরে, আমাদের লোক যখন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেষনে গিয়ে ঘণ্টা দুই পরে ফিরে এল। মণির দেখা সে পায়নি। বন্ধুদের রেলপথে ভ্রমণের ইচ্ছা নেই সেজন্ত বাড়ি ফিরবার আদেশ দিয়ে মণি কোন অপরিচিত লোকের হাতে সংবাদ পাঠিয়েছে। আমার স্ত্রী দিন দিন অধিকতর বিষাদিনী হয়ে পড়েছিলেন। দিন দুই পরে তার কাছে যেতেই মনে হল, অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ মূর্ত্তি। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই মৃদু কণ্ঠে বল্লেন, 'খোকা এসেছিল, পেছনের বাগানের শেষ প্রান্তে যে বাঁশঝাড় তার মধ্যে মালি মণিকে তিনি দেখেছেন। কাছে এগিয়ে যেতে সে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।'

বিস্মিত হয়ে বল্লাম, 'তুমি ভুল দেখনিত? সারাদিন তার কথা ভাবছ, সেই মুখই চোখের ভ্রান্তিতে দেখেছ!'

আমার স্ত্রী অধীর কণ্ঠে প্রতিবাদ কল্লে'ন, 'না না, তাকে ভুল হয়নি আমার তা ছাড়া মালীও তাকে দেখেছে। সে কোথাও যায়নি, শুধু বাড়ি ছেড়ে গিয়েছে। মালী বলে সে আরো দেখেছে দাদা বাবু সন্ধ্যের অন্ধকারে বাগানের ঝোপের আড়ালে ঘুরে বেড়ায়—ভয়ে শুধু একথা জানায়নি আমাদের!'

আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম তবে কি বাড়ি থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে? শুধু মাকে দেখতে সে একটিবার অন্ধকারে লুকিয়ে বাগানে আসে। সে জানে ঐ নির্জ্জন তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন স্থান মার অধিকতর প্রিয়, সন্ধ্যা-বেলা তাঁর সেখানেই কাটে।

মণি ফিরে এলে একথা যখন বলা হ'ল তখন সে চিরদিনের সুমিষ্ট হাসিতেই সব কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু বার বার কে তাকে বিশ্বাস করে, বিশেষ সে সময় স্কুল থেকে তাড়া আসছিল মণির সম্বন্ধে সতর্ক হবার জন্ত—ঐটুকু ছেলেকে এঁটে উঠতে পারব না কে তা জানিত।

এ সময়ে আমাদের এক আত্মীয়—গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—বদলী হয়ে, এখানে আসেন। মণির কার্য্যকলাপ তাঁর অগোচর রইলো না। তিনি এজন্ত যখন আমাদের উপদেশ দিতে লাগলেন তখন আমার স্ত্রী যেন অকূলে কূল পেলেন। একদিন তাঁর সামনে মণিকে ডাকা হল। আমার আত্মীয় কত যে প্রশ্ন করলেন বা উপদেশ দিলেন মণি নিরুত্তর হাসি মুখে চিরভ্যস্ত ছলনায় স্থির হয়ে রইল। আমার স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বল্লেন, 'খোকা—এঁর কথা মন দিয়ে শোন, আর সব খুলে বল এঁকে—তুমি যে কি বিপদে জড়িয়ে যাচ্ছ বুঝতে পারছ না কি? তোমার পূর্ব্বপুরুষের বিশ্বস্ততার সম্মান যে তোমা হতেই যেতে বসেছে।' আমার আত্মীয় সস্নেহে তাকে বোঝাতে চাইলেন, অন্যায়ের পথে প্রার্থিত মেলে না—তাছাড়া সে যে তার মার নয়নের মণি—তার লাঞ্ছনায় মা যে মণিহারা হবে।

মণি তেমনি মৃদু হাসিতে অটল রইল। সে হাসির

আড়ালে এত আগুন চাপা ছিল সে দিনও মনে হয়নি। ওঃ—বজ্রগর্ভ মেঘ হাসির বিদ্যুৎ দিয়েই ভোলাতে চেয়েছিল।"

বৃদ্ধ ক্ষণকাল নীরব হইলেন। বোধ করি মণির সে মুখ মনোমধ্যে একবার দেখিয়া লইলেন। তার পর যেন আত্মস্থ হইয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন—"এর পর শেষ ঘটনা তোমাদের বলছি। আবার বছর ঘুরে এল, জৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরমে সেবার পশুপাখীও আপনার কোটর ছাড়তে চায় না। কিন্তু মণির কাযের বিরাম নেই, সেদিন বেলা বারোটায় রৌদ্র-তপ্ত শরীরে কোথায় ঘুরে বাড়ি এসে মণি মায়ের স্নেহ-শীতল কক্ষে আশ্রয় নিলে। তার মাও অভিমানে বিমুখ হয়ে উঠেছিলেন, বিনা প্রয়োজনে বাক্যালাপ করতেন না, কিন্তু সেদিন শ্রম-ক্লিষ্ট ছেলেকে ছুটে আসতে দেখে দূর-দেশ প্রত্যাগত ছেলেকে কাছে পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে বল্লেন,—'গরমের জন্ম মার ঘরে এলি নারে মণি?' মণি সেদিন আগের মত অনর্গল কথায় মাকে তুষ্ট করেছিল, কিন্তু তার মাঝে সে যখন হঠাৎ উঠতে চাইল তখন তার মা বাধা দিয়ে বল্লেন, 'এখুনি ছুটতে পাবিনা। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোস্ দেখিনি—কত দিন আমার হাতে খাস্‌নি।' মণি বল্লে, 'না মা যাচ্ছি না কাপড় জামাগুলো তোলা হয়নি।' তার মা বল্লেন, 'চাকরদের ডাক তোর কায করতে কি কেউ নেই রে?' মণি তার কিশোর ভৃত্যকে ডেকে কাপড়-চোপড় তুলতে আদেশ দিয়ে বল্লে,—'দেখিস যেন পকেট হাতাসনি টাকা পয়সা কিছু নেই।' ভৃত্য বেরিয়ে যেতেই মণির মা বল্লেন, 'খোকা তোর জন্ম সরবৎ আনছি,' বলেই বাইরে এসে চাকরকে দাদাবাবুর সরবতের জন্ম বাগান থেকে লেবু আনতে পাঠিয়ে নিজে ছেলের ঘরে ঢুকলেন। ইদানীং এই রকম করে মণির কাগজ-পত্রের সন্ধান চলতো। আমার আত্মীয়ের পরামর্শে এবং পরিবর্তে পুত্রের প্রাণ-রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমার স্ত্রী এই পথে চলেছিলেন।

বহুদিন পর সে দিন মার আদরে মণি আহারাদি করে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। সেই অবসরে তার গোপনীয় কাগজপত্র যে সব তার মা মণির অজ্ঞাতে সংগ্রহ করেছিলেন তা আমার আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে গেল। সেদিন আমাকে কোন কাযে স্থানান্তরে যেতে হয়েছিল।

অপরাহ্নে মণির গভীর ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখে শয্যায় জননী তার শিয়রে বসে। মণি মার সতর্ক পাহারা দেওয়া নিয়ে পরিহাস কর্ল্লে। তারপর খাবার খেতে খেতে বল্লে,—'বেশী করে দাও মা আর যদি ফিরে না আসি।' অসহ্য উদ্বেগে তার মা তাকে সেদিন যেতে বারণ করলেন। কিন্তু সে কথা অগ্রাহ্য করেই সে চলে গেল। তারপর ফিরে এলো আবার ক্ষণকাল পরেই।

সন্ধ্যার ম্লান আলো অন্ধকারে তখন সারা পৃথিবী অস্পষ্ট হয়েছিল। মণি ছুটে এসে নিজের জিনিসপত্র উল্টে টেনে ছড়িয়ে কি যে খুঁজতে লাগলো, তারপর সেই কিশোর ভৃত্য যে মণির সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও প্রিয় তাকে ডেকে নানা প্রশ্নে ব্যস্ত করে তুললো; শেষটায় মার কাছে এসে বল্লে, 'আমার কাগজ—মা তুমি নিয়েছো?' অপরাধীর কণ্ঠে একটি স্বর ফুটলো না বা চোখের জলে ছেলেকে আটকাতে পারলেন না; মার মুখের দিকে নির্নিমেষে একবার চেয়ে মণি যেমন এসেছিল তেমি ছুটে চলে গেল।

যখন বাড়ি ফিরলাম সন্ধ্যার দীপে তখন প্রতি কক্ষ আলোকিত হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর আমার স্ত্রীকে পেলাম মণির কক্ষদ্বারে—আলুলায়িত কুন্তলে বিস্রস্ত বসনে দেয়ালের গায়ে নির্ভর করে বসে আছেন। সন্ধ্যার পরিচ্ছন্ন বেশ আজ তাঁর অঙ্গে নেই। মুদ্রিত দুই চোখ থেকে অবিরল অশ্রু ঝরে পড়ছে। তাঁর মুখে যখন সারা-দিনের ঘটনা শুনলাম তখন আমাকেও কোন নিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত করে ফেলল। 'কেন তাকে যেতে দিলে?'—বলে আমার আত্মীয়ের কাছে ছুটে গেলাম। তিনি কিন্তু অভয় দিয়ে বল্লেন, 'আর ভয় নেই আজ সবাইকে ধরা পড়তে হবে। মণির কাগজের মধ্যে যে একটা জায়গার নক্সা ছিল তাতে করেই আজকের কার্যোদ্ধার। কিন্তু মণির কেশাগ্র কেউ ছোঁবে না এ আদেশ বিশেষ করে জানানো হয়েছে।'

আত্মীয়ের কথায় বাড়ি ফিরে এলাম, স্ত্রী তেমি পড়ে আছেন। আমি ফিরেও আমার সেই প্রাসাদোপম গৃহের মধ্যে বারবার ঘুরে এলাম রাত্রির অন্ধকারে সে যদি মার অঞ্চলে

ফিরে আসে,—কিন্তু মিথ্যা আশা, নিথর নিঃসাড় বাঁশঝাড়ও অকম্পিত পত্রে যেন তাহার আশার চেয়ে আছে। চারদিকে যত লোক পাঠানো হয়েছিল ক্রমে সবাই ফিরতে লাগ্‌লো,—কিন্তু একটি আশার বাণী কেউ শোনালে না।

পরদিন প্রভাতে আমাদের নীলমণি-হারা গৃহের শূন্যতা পূর্ণ করতে সহরের যত লোক আমাদের বাড়ীতে এসে জুটলো। তার মধ্যে পুলিশের অফিসারও ছিলেন। শোনা গেল কাল সন্ধ্যায় যে বিপ্লবীদলকে ধরা হয়েছে তার মধ্যে মণি নেই।

স্ত্রীকে একথা বলা হ'ল না তিনি সেই থেকে জলটুকুও স্পর্শ করেনি। রাত থেকে মূর্চ্ছাও সুরু হয়েছে! চেতনার মুহূর্ত্তে একটিমাত্র প্রশ্ন মুখে, 'খোকা এসেছে রে?'

উদ্বেগাকুল সুকঠিন প্রতীক্ষায় দিনযাপন। কখনো পায়ের শব্দে কখনো পথিকের কোলাহলে মণি এসেছে আশায় চকিত হয়ে উঠেছি! আবার সন্ধ্যা এল, নিঃশব্দ চরণে কেউ বাড়িতে ঢুকলো না—মন ক্রমে স্থির করে তার মঙ্গল প্রার্থনায় সে রাত্রি কাটালাম যদি আর ফিরে নাও আসে সে যেন বেঁচে থাকে—তার পায়ের তলায় যেন কুশাগ্রও না বেঁধে।

আবার তৃতীয় দিনের সন্ধ্যা, আমার স্ত্রী হঠাৎ যেন কিসের আশায় শয্যা ত্যাগ করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন একেবারে গেটের বাইরে—পথের গতি যেখানে মুক্ত। মনে হ'ল—কোন অজানার আভাসে তিনি উৎকর্ণ হয়ে উঠেছেন, কিন্তু অস্বাভাবিক স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন মুখ। আমিও কথা না বলে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম; বোধ করি মণি এখন আসবে মার মন তা বুঝতে পেরেছে—এমনি আশার গুঞ্জনে আমার বুকের স্পন্দন চঞ্চল হয়ে উঠলো, এমনি সময়ে একদল নিঃশব্দ জনতা আমাদের দিকে এগিয়ে এল! তারপর অতি নিকটে জনতা স্থির হয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল—হা সেই অন্ধকারেও—তারা কার নিস্পন্দ স্থির দেহ খাটিয়ায় বয়ে এনেছে! বাক্যহীন জ্ঞানহারা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম, আমার আত্মীয় স্ত্রীর কাছে নতজানু হয়ে বলছেন, 'বৌঠাকরুণ শান্ত হয়ে আপনার মণিকে কোলে তুলে নিন্! উঃ তাকে পেলাম—বড় বিলম্বে! এ অবস্থা তো অধমের কল্পনায়ও আসেনি। কতদূর জঙ্গলেই তারা নিয়েছিল! ওঃ আপনার মণিকে বাঁচাতে পারলাম না।' —হ্যাঁ খাটিয়ায় শুয়ে আমাদেরই দুলাল—কী ভীষণ নিশ্চল সে দেহ—আমাদের একমাত্র সন্তান তাই নিঃশব্দ নিরানন্দে বাড়ি এসেছে! আমি জড়ের মত চেয়ে রইলাম, কিন্তু সবিস্ময়ে শুনলাম আমার স্ত্রী বলে উঠলেন, এখানে নয়, 'এখানে নয়, আমার ঘরে নিয়ে চল!—'

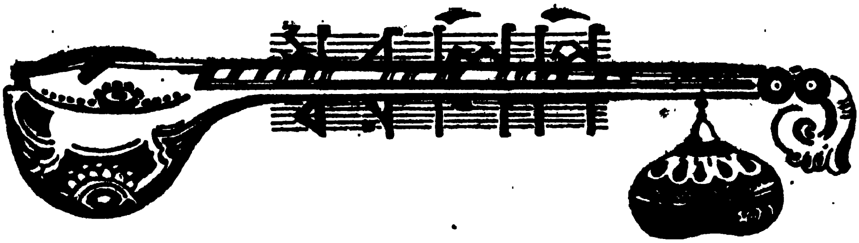
সেই শেষ রাত্রি—শেষ উৎকণ্ঠায় যাপন, প্রাণের মৃদু স্পন্দন তখনো ছিল। অচেতন সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ দেহ নিয়ে ডাক্তারদের প্রাণান্তকর চেষ্টা চল্‌ল। শরীরে আর স্পর্শ করার স্থান নেই—উপযুক্ত প্রতিশোধ তারা নিয়েছে বিশ্বাসঘাতকের প্রতি।

আমার স্ত্রী নত হয়ে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। রাত্রি শেষের দিকে একটু যেন জ্ঞান হ'ল। মাঝে মাঝে দু' একটি কথা সে উচ্চারণ করতে লাগ্‌ল! তার থেকে বোঝা গেল নিজের অপরাধ স্বীকার করে তুষানল প্রায়শ্চিত্তই সে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তার মাই কি এর মূল? তবু সে যেন মাকে একটিবার দেখ্‌তে পায়। এই রকম কাতর বাক্য স্ত্রী অবিচলিত হয়ে শুনলেন। কিন্তু ভোরের দিকে ডাক্তারেরা যখন ঘর ছেড়ে চলে গেলেন সেই মুহূর্ত্তে তিনি মণিকে 'বাবা আমার!' বলে নিজের কোলে তুলে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন!

তারপর আমার কাযের পালা—দগ্ধ শরীরের জ্বালা দূর করতে বাগানের যত ফুল দিয়ে নিজের হাতে ঢেকে দিলাম তাকে! আমার স্ত্রী কিন্তু সে সব চেয়ে দেখলেন না। তাঁর বহুক্ষণব্যাপী মূর্চ্ছার মধ্যে আমাদের নীলমণিকে চিরবিদায় দিতে হ'ল।"

বৃদ্ধ এইবার দু'হাতে নিজের চোখ চাপিয়া ধরিলেন। তাকে সান্ত্বনা দিতে একটি কথা বলাও আমাদের সম্ভবপর হইল না। তারপর কখন পাগলীর জ্ঞান হইল এবং সে কি লুপ্ত চৈতন্যের জাগরণ? এ প্রশ্ন অমীমাংসিত লইয়াই সেদিন বাড়ি ফিরিলাম।

শ্রীমীনা দাশগুপ্ত



প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফোটানোর খেলা!
ক্ষান্তকূজন শান্তবিজন সন্ধ্যা বেলা,
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি'—
"এসেছে কি?"
আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে কী উচ্ছ্বাসে
নাচের মাতন লাগলো শিরীষ ডালে,
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে!
প্রত্যহ সেই চঞ্চল প্রাণ শুধিয়েছিলো,—
শুনাও দেখি "আসেনি কি?"

আবার কখন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে কী আশ্বাসে
ডাল গুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণ শব্দে মেতে!
প্রত্যহ তার মর্ম্মর স্বর বল্‌বে আমায় কী বিশ্বাসে
"সেকি আসে?"
প্রশ্ন জানাই পুষ্প বিভোর ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে,
হায় গো আমার ভাগ্য রাতের তারা
নিমেষ গণন হয়নি কি মোর সারা?
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো।
"সেকি এলো?"

"মহুয়া"

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

II দ্‌া -া ণ্‌া । সা সা সা I রজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । রা জ্ঞা রজ্ঞা I সা সা জ্ঞা । জরা জ্ঞা -া I
প্রা ০ ঙ্গ ণে মো র শি রী ষ শা খা য় ফা গু ন মা সে ০

I জমা জ্ঞা -া । ঋা সা -ণ্‌া I {সা -দা দা । দা পা -া I পা র্সা র্সা । ণা দণা পমা I
কী উ ০ চ্ছা সে ০ ক্লা ন্ তি বি হী ন্ ফু ল্ ফো টা নো র

I মপা মা -া । -া -পা -দা I মপা -া মা । জ্ঞা জ্ঞা -জ্ঞা I রা -া জ্ঞা । রা জ্ঞা মা I
খে লা ০ ০ ০ ০ ক্ষা ন্ ত কূ জ ন্ শা ন্ ত বি জ ন্

| রজ্ঞা -া জ্ঞা । ঋা সা -া | (সা দা দা । দা পা পা | -া -া -া । -া সা সা) |
স ন্ ধ্যা বে লা • ক্লা ন্ তি বি হী • • • • • • ন্

| র্সা -া র্সা । র্ঋা র্সা ণা | ণা র্সা র্সণা । ণা ণা ণা | পা ণা ণা । দা দা পা |
এ • ত্য হ সে ই ফু ল্ ল শি রী ষ্ এ • র গু ধা র

| পা ণধা পমা । মপা মা -া | সা সা রা । জ্ঞা জ্ঞমা -া | -া -া -া । -া -মজ্ঞা -মজ্ঞমা |
আ মা র দে খি • এ সে • ছে কি • • • • • • •

| জ্ঞরা মজ্ঞা -রজ্ঞা । ঋা সা -া ||
এ সে • ছে কি •

|| দা -দা দা । ণা র্সা র্সা | দা দা দা । ণা র্সা র্সা | ণা র্সা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা -া |
আ র্ ব হ য়ে ই এ ম নি দি নে ই ফা গু ন মা সে •

| দা দা -া । ণা র্সা -া র্সজ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা র্রা র্জ্ঞা । র্রা র্জ্ঞা -া |
কী উ • ছা সে • না চে র মা ত ন্ লা গ্ ল শি রী ষ-

| র্রা র্জ্ঞর্মা -া । -া -া -া । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা | ণা -া র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা |
তা লে • • • • • ব র্ ণ পু রে র কো ন্ নূ পু রে র

| র্ঋা র্সা -া । -া -া -া | র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা র্সা |
তা • লে • • • • • • • • এ • তা • হ লে ই •

| র্সা র্ঋা র্সা । র্সা ণা -া | ণা র্সা -র্সা । ণা ণা দা | মপা পণদা পমা । মপা মা মা |
চ ন্ দ ন আ ন্ ও • খি • নে • ছি লো • • ও মা ও দে খি •

I সা সা -রা । জ্ঞা জ্ঞমা -া I -া -া -া । -া -মজ্ঞমা -মজ্ঞা I
আ সে • নি কি • • • • • •

I জ্ঞরা মজ্ঞা রজ্ঞা । ঋা সা -া II
আ সে • নি কি •

II পর্সা র্সা ণা । ণা ণা ণা I পা ণা ণা । দা দা পমা I মা মা মা । মপা মা -া I
আ বা র্ ক খ ন্ এ ম নি দি নে ই ফা গু ন মা সে •

I রা জ্ঞা -া । রা জ্ঞা -া I { সা জ্ঞা জ্ঞা । রা জ্ঞা জ্ঞা I রা রা জ্ঞা । রা জ্ঞা জ্ঞা I
কি আ • খা সে • ন্ গু লি তা র র ই বে শ্র ব ণ

I রা জ্ঞা -া । -মা -পা -দা I মপা পা মা । জ্ঞরা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞমা মা মা । জ্ঞা ঋা জ্ঞা I
পে তে • • • • অ ল খ জ নে র চ র ণ ধ্ব নি সে

[-া -া -া]

I ঋা সা -া । (-া ঋা ণ্‌া I সা জ্ঞা জ্ঞা । রা জ্ঞা -া I -া -া -া । -া -া সা I) }
যে তে • • • • তা ন্ গু লি তা • • • • • • র্

I পর্সা -র্সা র্সা । ঋা র্সা ণা I ণা -র্সা র্সা । র্ণা ণা পা I পা ণা ণা । দা দা দা I
শ্র • ত্য হ তা র্ ম র্ ম র ম র ব ন্ নে আ মা র

I পা ণদা পমা । মপা মা -া I সা সা রা । জ্ঞা মা -া I -া -া -া । -া -মজ্ঞমা -মজ্ঞা I
কি বি • খা সে • সে কি • আ সে • • • • • • •

I জ্ঞরা মজ্ঞা রজ্ঞা । ঋা সা -া I -া -া -া । -া -া -া II
সে কি • আ সে • • • • • • •

II দা দা দা । ণা র্সা র্সা I দা -দা দা । ণা র্সা -র্সা I ণা ণা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা -া I
এ ম্ ন আ না ই পূ ব্ প বি ভো র্ ফা গু ন্ মা সে ০

I দা দা -া । ণা র্সা -া I র্সা -া র্জ্ঞা । র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রা র্রা র্জ্ঞা । র্রা র্জ্ঞা র্রা I
কী আ ০ খা সে ০ হা য় গো আ মা র ভা ০ গ্য রা তে র

I র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞর্মা -া । -া -া -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা I ণা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্ঋা র্জ্ঞা I
তা রা ০ ০ ০ ০ নি বে ব্ গ ণ ন হ য় নি কি মো র

I র্ঋা র্সা -া । -া -া -া I র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা র্সা I র্সা -র্ঋা র্সা । ণা ণা ণা I
সা রা ০ ০ ০ ০ এ ০ ত্য হ ব র প্রা ০ ঙ্গ ণ ম য়

I পণা ণা ণা । দা দা -পা I পা ণদা পমা । মপা মা -া I সা সা রা । জ্ঞা জ্ঞা মা I
ব নে র বা তা স্ এ লো ০ মে লো ০ সে কি ০ এ লো ০

I -া -া -া । -া -মজ্ঞমা -মজ্ঞা I জ্ঞরা মজ্ঞা -রজ্ঞা । ঋা সা -া II II
০ ০ ০ ০ ০ ০ সে কি ০ এ লো ০



ক্রোড়াঙ্ক

শ্রীজ্যোতি সেন

সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরখানি একেবারে অন্ধকার। সেই রাশি রাশি ধোঁয়ার ভিতর বিনয়কে দেখাইতেছে ভূতের মত। চুলগুলি উস্ক খুস্ক, মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর চোখ দু'টি অবসাদগ্রস্ত। তার বাঁ হাতে একখানি চিঠি, ডান হাতে সিগারেট আর সমুখে একগাদা হাতে লেখা কাগজ। ফিল্মের জন্ম গল্পের 'সিনারিও' লেখা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখিয়া বিনয় চিঠি পড়িতেছিল, পড়িতে পড়িতে সিগারেটটি মুখে দিয়া খানিকটা ধোঁয়া টানিয়া শূন্যে ছাড়িয়া দিল।

বয়স তার বেশী নয়, মাত্র সাতাশ, এই বয়সেই তার চোখে মুখে জীবনের অভিজ্ঞতা দাগ কাটিয়া বসিয়াছে।

চিঠিখানি পড়িয়া বিনয় টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ঠোঁটের কোণে তার হাসি দেখা দিল।

চিঠি পাঠাইয়াছেন মাধুরীর বাবা মিস্টার দত্ত।

বিনয়ের সঙ্গে একদিন পথে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। বিনয়কে বার বার করিয়া তিনি তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু বিনয় যায় নাই। এবার চিঠিতে জানাইয়াছেন যে তাহায় নাকি না গেলেই চলিবে না।

শুধু অনুরোধই নয়, একেবারে পীড়াপীড়ি।

যাইবে কি যাইবে না বিনয় তাহাই ভাবিতে লাগিল।

অনেকদিন যাবত মাধুরীদের সঙ্গে বিনয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, যখন ছিল তখনকার কথা বিনয়ের মনে পড়িল। মাধুরীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী ছিল সে-ও। মনে প্রাণে সে তাহাকে ভালবাসিত।

প্রথম যৌবনের প্রেম গভীর হইয়াই দেখা দেয়। বিনয়ের সেই প্রেম প্রথম যৌবনের। মাধুরীকে সে দেবী বলিয়া কল্পনা করিত। মনে ভাবিত মাধুরীর মত মেয়ে বুঝি পৃথিবীতে আর নাই, মাধুরীকে না পাইলে তাহার জীবন নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

সেই স্বপ্ন একদিন ভাঙিল। কল্পনার দেবী কল্পলোকে মিলাইল। বিনয় বুঝিল মাধুরী তাহার মন লইয়া খেলা করিয়াছে। খেলা করাই তাহার অভ্যাস। তাহাকে ছাড়িয়া সে আবার অপরের সঙ্গে সেই খেলা সুরু করিয়াছে। রাগে ও দুঃখে বিনয় সরিয়া পড়িল, ধিক্কার জন্মিল তাহার ভালবাসার উপর।

প্রেমের অপমান বিনয় সহ্য করিতে পারে নাই। এজন্য আত্মনিগ্রহ করিয়াছে সে অনেক।

মন লইয়া খেলা! পরাজয় হইলেই সর্ব্বনাশ। খেলিতে যাহারা জানে এ খেলা সাজে তাহাদের। বিনয় জানিত না। ভালবাসার উপর তাহার ধিক্কার জন্মিল। জীবনটা অবশ্য নিষ্ফল হইল না।

চিঠি পড়িয়া বিনয় ভাবিতে লাগিল হঠাৎ তাহার প্রতি মাধুরী ও তাহার বাবার এত আগ্রহ দেখা দিল কি করিয়া? তবে কি তাহাদের মতি গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে?—ভাবিতে ভাবিতে বিনয় ভস্মাবশিষ্ট সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া কৌটা হইতে আরও একটা বাহির করিল এবং তাহাতে আগুন ধরাইয়া টানিতে টানিতে একরাশ ধোঁয়া ছড়াইয়া দিল।

মাধুরীকে বিনয় অনেক দিন দেখে নাই, দেখিবার ইচ্ছা তার হইতেছিল। মাধুরীর সেই সৌন্দর্য্য, লীলায়িত গতি ভঙ্গী সত্যই দেখিবার মত। অনেক ভাবিয়া অবশেষে যাওয়াই বিনয় স্থির করিল।

দাড়ি কামাইয়া ও বেশভূষায় ফিটফাট হইয়া বৈকালে সে বাহির হইল।

মাধুরীদের বাড়ী কাছে নয়, ওখান হইতে ট্যাক্সিতেও

লাগে প্রায় আধ ঘণ্টা। পথে নামিয়া বিনয় ট্যাক্সি লইল।

ট্যাক্সি প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে মাধুরীদের বাড়ীর কাছে গিয়া থামিল।

বিলাতি ধরণে তৈরী প্রকাণ্ড বাড়ী। এক সময় দেখিতে খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য আর নাই। কালের দাগ লাগিয়া শ্রীহীন হইয়াছে। বাড়ীর জানালায় দরজায় খাটো খাটো লেসের পর্দ্দা। দেয়ালের ম্লান রঙে পর্দ্দাগুলির রঙ মিশিয়া একাকার হইয়াছে।

বাড়ীতে ঢুকিয়া বিনয় বৈঠকখানা ঘরের দিকে গেল। মাধুরীর বাবা তখন পাশের বসিবার ঘরটিতে ছিলেন, বসিয়া বসিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিলেন। বিনয়কে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলেন—'এস এস'!

বিনয়কে সঙ্গে করিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিলেন।

ঘরখানি বিলাতি ড্রয়িংরুমের ভারতীয় সংস্করণ। এক কালে হয়তো জাঁকজমক ছিল, এখন ইহার অবস্থা শোচনীয়। বহু পুরাতন একখানি কার্পেটে ঢাকা মেঝের উপর বসিবার কতকগুলি জীর্ণ আসবাব—সোফা, কৌচ কুশন চেয়ার এই সব এবং কয়েকটি পিতলের টবে আধ-মরা গোটা কয়েক বিলাতি পাম। রঙ-হারা চিত্রিত দেয়ালের ভিতর ঐ হতশ্রী আসবাবগুলি সুদিনের স্মৃতিটিই যেন জিয়াইয়া রাখিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় দারিদ্র্যের সঙ্গে বিলাসী সভ্যতার সংগ্রাম চলিয়াছে।

মাধুরীর বাবা ও বিনয় দুইখানি কুশন চেয়ারে কাছাকাছি বসিল। মাধুরীর বাবা বলিলেন—'তোমার প্রতীক্ষায়ই ছিলাম।…বসে' বসে' আর ভাল লাগছিল না তাই এই নভেলখানা পড়ছিলাম। প্রেমের উপন্যাস পড়বার বয়েস আর আমার নেই, তবু পড়তে হয়। কিন্তু বেশ বই। প্রেমের উপন্যাস হলেও পড়তে অরুচি হয় না। প্রেম জিনিষটাকে অশ্রদ্ধা করবার উপায়ও তো নেই।'

বিনয় হাসিল। তার পর গম্ভীর হইয়া বলিল—'আপনার মতের পরিবর্ত্তন হ'য়েচে দেখচি।'

'পরিবর্ত্তন!…তা হবে।' বলিয়া তিনি মুখখানি কাঁচুমাচু করিলেন। সত্য কথাটা স্বীকার করিলেন যেন অনিচ্ছায়।

ভদ্রলোকটির নাম নীলকান্ত। বয়স পঞ্চাশ কি তারও বেশী। দীর্ঘ একহারা চেহারা। কিন্তু যেমন শক্ত তেমনি রুক্ষ। ভাঙাচোরা লম্বা মুখখানির ভিতর চোখ দুটি যেন জ্বল জ্বল করে।

নীলকান্তের পিতা ছিলেন উচ্চপদস্থ লোক। পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন বিস্তর। নীলকান্তকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তিনি পয়সা কড়ি অতিরিক্ত পরিমাণে খরচ করিয়া বিলাতে রাখিয়াছিলেন। লেখাপড়া তিনি করেনও নাই, করিলেও কিছু হইত কিনা সন্দেহ। নিজের রোজগার কাহাকে বলে আজ পর্য্যন্ত তিনি তাহা জানেন না। পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহারই অর্থে সাহেবী করিয়াছেন, এবং পিতার মৃত্যুর পরও তাঁহার অবশিষ্ট অর্থ নষ্ট করিয়াই ঠাটটি এতদিন কোন রকমে বজায় রাখিয়াছেন।

নীলকান্ত ডাকিলেন—'বয়!'

'হুজুর!'—বলিয়া একটি নেপালী ছোকরা আসিয়া হাজির হইল।

নীলকান্ত বলিলেন—'মিস্ বাবাকো বোলাও।'

নেপালী ছোকরাটি চলিয়া গেলে বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—'আমাকে ডেকেছেন কেন?'

তিনি হাসিয়া বলিলেন—'ব্যস্ত হ'য়ো না, বলব বলব। অনেক কথা আছে।'

—'বলুন না এখনই'

—'আগে চা-টা খাও। তার পর [illegible] হবে।'

বিনয় কহিল—'আমার সময় কিন্তু কম।'

নীলকান্ত বলিলেন—'তা' হোক্'।

বিনয় একটু মুস্কিলে পড়িল। কহিল—'কাজও একটু আছে।'

—'কাজ তোমার ঢের আছে তা' জানি। আজকাল সব সময়ই নাকি ব্যস্ত থাক। সে তো ভাল কথা।'

নীলকান্ত আরও কি যেন বলিতেছিলেন কিন্তু সহসা মাধুরীর কণ্ঠ শুনিয়া থামিলেন। মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল—'কেন ডাকছ বাবা?'

নীলকান্ত কহিলেন—'দেখ, কে এসেচেন।'

মাধুরী তাহার সেই চিরাভ্যস্ত মরালগতিতে কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। বিনয় দেখিল—মাধুরীর দেহে ভাঁটার টান পড়িয়াছে। সাজসজ্জা এবং প্রসাধনেও দেহের শ্রী চোখে লাগে না। লাবণ্যের অভাবে তাহার রূপ তেলহীন প্রদীপের মত নিষ্প্রভ হইয়াছে।

মাধুরীকে দেখিয়া বিনয়ের বুকে হঠাৎ ঝড় দেখা দিল কিন্তু বাহিরে তাহা গোপন করিবার জন্য জোর করিয়া একটু হাসি তাহার ওষ্ঠ প্রান্তে টানিয়া আনিল।

মাধুরী বিনয়ের পানে তাকাইয়া সলজ্জ ভাবে কহিল—'ও!—আপনি!'

বিনয়ের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

মাধুরীও আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলকান্ত উভয়ের অবস্থাটা বোধ করি বা বুঝিলেন। বলিলেন—'তোমরা বসে' গল্প কর। আমি আসচি।' এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

মাধুরী ও বিনয় অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়াই রহিল।

তারপর বিনয় নিজেকে সংযত করিয়া প্রথম কথা বলিল। কহিল—'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে কোনদিন ভাবিনি।'

মাধুরী ম্লান একটু হাসিয়া বলিল—'চিঠি পেয়ে বোধ করি আশ্চর্য্য হয়েচেন?'

—'হবার কথাই তো।'

—'চিঠি না পেলে কোনদিনও আর আসতেন না?'

'না'—বিনয় মাথা নাড়াইল।

—'আপনি অত্যন্ত কঠিন লোক'—বলিয়া মাধুরী হাসিল। তারপর বিনয়ের চোখে চোখ দু'টি রাখিয়া গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া সে পুনরায় কহিল—'আপনার সঙ্গে আমি সত্যি ঝগড়া করব।'

মাধুরীর আর ভঙ্গীতে সেই লালিত্য আর নাই, নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বিনয়ের চোখ দু'টী হতাশ হইল। মাধুরীর হাব ভাব তাহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

গম্ভীর হইয়া বিনয় কহিল—'কি হবে আর ঝগড়া করে'? আজ এসব একেবারেই বৃথা।'

কথাটার অর্থ মাধুরী স্পষ্ট বুঝিল না। তথাপি চোখ মুখের তেমনি ভঙ্গী করিয়াই মাধুরী কহিল—'আমিই না হয় ভুল করেছি, কিন্তু আপনি—'

বিনয় তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—'থাক্। আমি শুনতে চাইনে।…কে ভুল করেচে আর কার শুধ্‌রে নেওয়া উচিত সে আলোচনার প্রয়োজন কি?'

মাধুরী মনে মনে আহত হইয়া নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বেদনা-ক্লিষ্ট মুখের পানে তাকাইয়া বিনয়ের যেন মাধুরীর জন্য দুঃখ হইল। কহিল—'পুরোনো কথা চাপাই থাক মাধুরী, কি হবে আর বুঝাপড়া করে?'

—'শুধু একটা কথা।'

—'না।'

বিনয় একটু বাদে পুনরায় বলিল—'সবই তো চুকে গেছে, আবার কি!…না-হয় মনে কর কিছুই হয়নি।'

মাধুরী আর্দ্র কণ্ঠে কহিল—'কেমন করে' আমি তা' মনে করব?…অসম্ভব!' বলিতে বলিতে তাহার চোখ দু'টি সজল হইয়া উঠিল।

বিনয় অবাক হইয়া মাধুরীর মুখের পানে তাকাইল, যেন এ কান্নার অর্থ সে তাহার চোখে মুখে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে তাকাইতে পারিল না। মাধুরীর মুখে আকর্ষণের কিছু নাই। কি মুখ কি হইয়া গিয়াছে।

বিনয় প্রশ্ন করিল—'তোমার কি অনুতাপ হ'চ্চে?… কেন?'

মাধুরী জবাব দিতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিল।

বিনয় হাসিয়া বলিল—'তুমি আমাকে ভাবালে দেখচি।'

এই বলিয়া বিনয় একটা সিগারেট ধরাইল। মাধুরীকে আবার ভালবাসা যায় কি না তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

না,—অসম্ভব। মন হইতে যাহা মুছিয়া গিয়াছে তাহা ফিরাইয়া আনা যায় না। নূতন করিয়া ভালবাসিতে হইলে আবার নূতন আকর্ষণ চাই, একটা নূতন মোহ। কিন্তু মাধুরীকে দেখিয়া সেই মোহ জন্মে না।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া বিনয় প্রশ্ন করিল—'তোমার বক্তব্যটা কি পরিষ্কার ক'রে আমাকে বলতো।'

মাধুরী বলিতে পারিল না। বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—'কি ভাবচ মাধুরী?'

—'ভাবচি, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা।'

—'নিশ্চয় বিশ্বাস করব। বল।'

মাধুরী কহিল—'আমার দুর্ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত, শুধু এই কথাটাই আমার বলবার ছিল।'

—'আর কিছু নয়?'

মাধুরী জবাব দিল না।

বিনয় বলিল—'তোমার লজ্জিত হবার কিছু নেই মাধুরী। আমাকে ভাল না বেসে যাকে তোমার ভাল লেগেছিল তাকে ভালবেসেছিলে তাতে কিছুমাত্র তোমার অপরাধ হয়নি।'

—'ভুল করেছিলাম।'

—'হ'তে পারে। কিন্তু মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। ভুল কি আমি করিনি? তোমাকে চেয়ে আমিও তো ভুলই করেছিলাম। তা'র জন্য আমার কোন দুঃখ নেই।'

বিনয়ের কথাটা যত সরল ও সহজই হোক মাধুরী সহ্য করিতে পারিল না। মাধুরীর মুখখানা বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই যেন তাহার স্বচ্ছন্দ ভাবটা কোথায় অন্তর্হিত হইল।

মাধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। বলিল—'আপনার কাছে মুখ দেখাতে সত্যি আমার লজ্জা করে। আমার দুর্ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য।'

বিনয় গম্ভীর ভাবে মাধুরীকে আশ্বাস দিল। কহিল—'তোমার ব্যবহার যেমনই হোক সেটা তোমার বাপ মার ব্যবহার বলেই আমি জানি, তুমি ছিলে তাদের পুতুল মাত্র। তোমার কোন দোষ নেই।'

—'যথেষ্ট দোষ আমারও ছিল।'

—'ছিল হয়তো। আমি জানিনে। জানবার প্রয়োজনও আমার নেই।'

থামিয়া গিয়া বিনয় পুনরায় কহিল—'আমার মত লোক তোমাকে চেয়ে সত্যিই তো তোমার অপমান করেছিল, সেই অপমানে তুমি যদি দুর্ব্যবহার করেই থাক, অন্যায় করনি।'

—'থামুন থামুন। ওরকম করে আমাকে কথা শোনাবেন না।'

—'না, মাধুরী, কথা শোনাবার জন্যে বলছি না। সত্যি, তোমার ব্যবহার কিছু অন্যায় হয়নি। তোমাকে বিয়ে ক'রে আমি সুখী হতাম না, তুমিও কষ্ট পেতে। উভয়েরই জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠত।'

বিনয়ের কথা শুনিয়া মাধুরীর যে কি হইল সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ বসিয়া পড়িল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

ঠিক এমন সময় নীলকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নীলকান্ত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্নময় দৃষ্টিতে বিনয়ের পানে তাকাইলেন।

বিনয় বলিল—'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে।'

নীলকান্ত ডাকিলেন—'মাধুরী!'

মাধুরী সাড়া দিল না।

বিনয় কহিল—'আমি তা' হ'লে উঠি।'

নীলকান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'না না, ব'স।'

—'আমার এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে।'

—'তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল।'

বিনয় ঘড়ি দেখিয়া বলিল—'বলুন।'

নীলকান্ত বুঝিলেন বিনয় এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। বুঝিতে পারিয়া তিনি দমিয়া গেলেন। তাহার চোখে মুখে একটা মানসিক সংগ্রামের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি কহিলেন—'আর একদিন তা' হ'লে এস।'

বিনয় মাথা নাড়িয়া বলিল—'খামোকা আরো একটা দিন আমি নষ্ট কর্ত্তে চাইনে। আপনার কথা আমি বুঝেছি।··· না,—আর তা' হয়না। হ'তে পারেনা।' এই বলিয়া বিনয় উঠিয়া পড়িল।

যাইতে যাইতে বিনয় দুয়ারের কাছে গিয়া একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল মাধুরী সজল নেত্রে তাহারই পানে তাকাইয়া আছে। মাধুরীর চোখে জল দেখিয়া বিনয়ের কান্না পাইল।

সত্যই তো সে মাধুরীকে ভালবাসিয়াছিল।

বিনয়ের মনে পড়িল মাধুরী তাহার ভালবাসার মর্য্যাদা কিছুমাত্রও দেয় নাই। ঘৃণায় তাহার মন বিমুখ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তকাল আর দেরী না করিয়া সে মাধুরীদের বাড়ী হইতে পথে বাহির হইয়া ট্যাক্সিতে উঠিল।

ট্যাক্সিকে জোরে চালাইয়া দিয়া বিনয় সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইতে উড়াইতে সবেগে ফিরিয়া চলিল।

শ্রীজ্যোতি সেন

বর্ষার চিঠি

শ্রীপ্রতাপ সেন

প্রতিবারে আসে বরষা যেমন, এবারেও আসিয়াছে,
মেঘের অলক উড়িছে আকাশ ছেয়ে,
হাস্না-হেনার গন্ধে বাতাস চঞ্চল হয় পাছে,
শীকরে আর্দ্র করেছে শ্যামল মেয়ে।
সাঁওতালী-খোঁপা যুঁইফুলে মোড়া,তেমনি শোভিছে শিরে,
বিজলী-দশন চমকিছে বারবার ;
ধরণী-সখির শৈল-উরজ পিছল অশ্রু-নীরে
বিরহে কাতর মমতার পারাবার।
নিখিল বিশ্বে চলে কানাকানি, মেঘে মেঘে সংঘাত ;
সুদূর প্রিয়ার পরশ-মদির-দিঠি—
আকুল করেছে, বরষার বঁধু,—ব্যাকুল সজল রাত ;
প্রিয়ারে আমার পাঠানু ছোট্ট চিঠি !

হয়ত' শুইয়া তুমিও, সজনী, আছ অপলক চোখে,
হয়ত' পড়িছ আমার কবিতাখানি,
গত বরষায় আজিকার রাতে এমনি অধীর শোকে
লিখেছিনু যেই ছোট্ট কবিতা, রাণি।
হয়ত' পড়িছ বরষার কবি রবি-ঠাকুরের গান,
দাগ-দেওয়া সেই পুরাণ-বইয়ের পাতে,
তোমার মাথার সুরভি-মাখান আধ-ছেঁড়া বইখান,
যেখানা পড়েছি কতবার একসাথে।
প্রদীপের শিখা ম্লান হয়ে যেত, ঘুমায়ে পড়িতে কোলে
বিস্ময়ে মূক,—দেখিতাম মুখখানি ;
বুকের ওপর আল্‌গোছা বাস ঈষৎ সমীরে দোলে,
ধরিয়া রাখিতে নারিত আপনা টানি'।

আজিকার রাতে তুমি কাছে নাই, হয়ত' ঘুমায়ে আছ,
হয়ত' স্বপনে আমার কোলেই শুয়ে ;
কালো-কালো চোখে কুহক জড়ায়ে নতুন ছলনা আঁচ,
শিথিল-বসন কাঁদিছে লুটায়ে ভুঁয়ে !'



বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এম্‌-এ

মানব-চিত্তের বিভিন্ন অবস্থার রসযুক্ত সম্যক্‌ প্রকাশ লইয়াই সাহিত্যের কারবার। সাহিত্য কখনও বা অগ্রদূত হইয়া সমাজকে কল্যাণের পথে আহ্বান করে, আবার কখনও বা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমাজের প্রতি স্তরের প্রকৃত অবস্থা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখায়। এইরূপে সাহিত্যের ভিতর দিয়া একদিকে যেমন দেশের আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্‌ঘোষিত হয়, অন্যদিকে তেমনি দেশের চিত্তের প্রকৃত ইতিহাস রচিত ও রক্ষিত হয়।

বাঙালীর মনোভাবের বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি বাংলা-ভাষার ভিতরে অবশ্যই প্রতিফলিত হইয়াছে। গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিলে পণ্ডিতেরা বহু খুঁটি-নাটি তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু এখানে সাধারণ ভাবে মাত্র দুই একটি বিশেষত্বের কথাই আলোচনা করা যাইতেছে।

ইংরাজ অধিকারের সম-সাময়িক ও তৎপূর্ব্বকার বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীর উপাখ্যান এবং ঐতিহাসিক ঘটনামূলক রচনা ছাড়া আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ; থাকিলেও তাহা অতি সামান্য। কৃত্তিবাস-কাশীদাসের অমূল্য দান; এবং অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, ময়নামতীর গান, বেহুলা-সতী-সাবিত্রীর উপাখ্যান, অজামিলের হরিভক্তি, ধ্রুব-চরিত্র, সুরথ উদ্ধার, কংসবধ, বিষমঙ্গল প্রভৃতি পালাগান—এ সমস্তই বাঙালী হিন্দুর বিশিষ্ট ধর্ম্মীয় আবেষ্টনে পরিপুষ্ট। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির প্রেমের কবিতাও অনুভূতির নিবিড়তা ও ভাবের সূক্ষ্মতায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমাদর্শের অনুরূপ হওয়াতে ধর্মীয় সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। তৎকালীন বাঙালী হিন্দুর এই ধর্ম্ম-সর্ব্বস্বতা প্রকৃত ধর্ম্মপ্রবণতার লক্ষণ, না পরাধীন বীর্য্যহীন জাতির শেষ অবলম্বন ধর্ম্মকেই প্রবলভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার প্রচেষ্টা, তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রকৃত ধর্ম্মপ্রবণতার সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই; কিন্তু ধর্ম্ম ও অতীত-গৌরব-কাহিনী যখন অন্ধের যষ্টির মত লোকের একমাত্র সম্বল হয়, তখন তাহা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ পায়। সেই অসীম আগ্রহের মুখে বৈষ্ণব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব এবং পরস্পরের দেবদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রমাণ-প্রয়োগ দেখিতে পাই। প্রকৃত ধর্ম্মবোধ মানবপ্রীতির দৃঢ়-ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। পরাধীন জাতির পক্ষে প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া স্বাভাবিক কিনা (এমন কি, সম্ভব কিনা) তাহা সন্দেহের বিষয়। তথাপি তাহার অন্ধ-বিশ্বাস ও আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি পালন তুচ্ছ জিনিষ নয়—নিতান্ত প্রাণের জিনিষ বলিয়া উহাও মহামূল্য। বস্তুতঃ ভক্তি, বিশ্বাসপ্রবণতা, ও ভাবাতিশয্য আজিও অধিকাংশ বাঙালীর প্রধান বিশেষত্ব।

তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে মুসলমান চিত্তের কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনায় স্থানে স্থানে মুসলমানের অত্যাচার ও নিপীড়িত হিন্দুর অসহায় অবস্থার জ্বালাময় বর্ণনা দেখা যায়। অবশ্য বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে তাঁহাদের বিস্তর স্তুতিবাদও আছে, কিন্তু তাহার সহিত সমগ্র বাঙালীর চিত্তের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। মুসলমান রচয়িতাগণ যে কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বিশেষ করিয়া মুসলমান কৃষ্টির তেমন আভাস পাওয়া যায় না।

মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামী আদর্শ হইলেও, অল্প কয়েকজন খ্যাতনামা দার্শনিক, সাধক ও মুর্শিদা-সঙ্গীত রচয়িতা ছাড়া অন্য কোন মুসলমান যে হিন্দুর সহিত মানবতার প্রশস্ত ক্ষেত্রে মিলিত হইতে চাহিয়াছিলেন, বা তাহার আবশ্যকতা ও ঔচিত্য অনুভব করিয়াছিলেন,

সাহিত্য হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসল কথা, বাংলা-সাহিত্য-রূপ মিলনক্ষেত্রই সে সময় তেমন করিয়া প্রস্তুত হয় নাই। তখন মুসলমান উর্দ্দু ও পার্শী পড়িত, চাকুরী-প্রত্যাশী হিন্দুরাও তাহাই পড়িত। তাহা ছাড়া মুসলমানের আরবী ও হিন্দুর সংস্কৃত ধর্ম্মভাষা ও দেবভাষারূপে পঠিত হইত। যাহা হউক উর্দ্দু ও পার্শীর ভিতর দিয়াই হিন্দু মুসলমানে অনেকখানি সম্প্রীতি হইয়াছিল বলিয়া কল্পনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু কার্য্যতঃ পরস্পরের ভিতর বিদ্বেষের চিহ্নই অধিক পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে মুসলমান ভুলিতে পারে নাই যে তাহারা এদেশ জয় করিয়াছে, আর হিন্দুও ভুলিতে পারে নাই যে মুসলমান তাহাদিগকে বেদখল করিয়া এদেশ অধিকার করিয়াছে। মুসলমান হিন্দুর প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছে, আর হিন্দুও সুযোগ পাইলে তাহার প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই। এজন্য অধিকাংশ মুসলমানের নিকট সুলতান মাহমুদ, কালাপাহাড়, আওরঙ্গজেব, আমেদশাহ আব্দালী প্রভৃতিই আদর্শ নরপতি; আর হিন্দুর নিকট রাণাপ্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতিই আদর্শ বীর; পরবর্ত্তীযুগে জাতীয়তাবোধ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজসিংহ, সীতারাম এবং যাবতীয় মারাঠা ও শিখ বীর পূজার আসনে স্থান পাইয়াছেন। ভারতবাসীর জাতীয়তা-বোধ যতদিন ধর্ম্মসংস্কারের উর্দ্ধে না উঠিতেছে, ততদিন এরূপ সাহিত্য হিন্দুমুসলমানের মিলনের পথে সম্ভবতঃ বাধাই স্থাপন করিবে।

আর একটি কথা মনে হয়। আলোচ্য সময়ে বাংলা-ভাষার চর্চ্চা করা হিন্দুমুসলমান কেহই বিশেষ আবশ্যক বা গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন না। আর সে সময়ে যে অধিকাংশ বাঙালী হিন্দুমুসলমানের মাতৃভাষা সংস্কৃত উর্দ্দু কিম্বা পার্শী ছিল, তাহাও ধারণা করিবার কোন হেতু নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, তাঁহারা ভাষা সম্বন্ধে এক অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। বোধ হয় এইরূপ কৃত্রিম অবস্থায় থাকিতে হওয়াতেই মনে প্রাণে কোন মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মহা উৎসাহে কাজ করিয়া যাওয়া স্বাভাবিক ছিলনা। কাজে কাজেই পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের গৌরব এবং আপন আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকাই সাধারণ প্রথা ছিল। তখনকার লোকের জীবনে অভাব অল্প ছিল বলিয়া সমস্যাও অধিক ছিলনা। সাহিত্যের ভিতর আমরা নিশ্চিন্ত আরাম ও প্রচুর অবসরের ভিতর ধর্ম্ম, প্রেম ও অবাধ হাস্য-রসিকতার সন্ধান পাই।

ক্রমে ক্রমে মুসলমানের হস্ত হইতে শাসনভার ইংরেজের হস্তে আসিয়া পড়িল। পার্শী আর আদালতের ভাষা রহিল না। রাজানুগ্রহ লাভের নিমিত্ত ইংরাজী শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হইল। হিন্দু এই নূতন অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে গ্রহণ করিল; কিন্তু অপরিণামদর্শী মুসলমান অন্ধ অহঙ্কারের বশেই হউক, রাজনৈতিক ভেদনীতির জন্যই হউক, কিম্বা তাহাদের চরিত্রগত অপরিবর্ত্তনশীলতার জন্যই হউক, ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য ভাষা উপেক্ষা করিয়া রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া চাকুরী ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়িল, এবং অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময় মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন এবং ইংরাজ রাজপুরুষের বাংলাভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা, প্রধানতঃ এই দুই কারণে বাংলাভাষার চর্চ্চায় এক গৌরবজনক নবযুগের সূত্রপাত হইল। এই সময় বাংলাভাষা মুসলমানীভাষার প্রভাব হইতে যথাসম্ভব মুক্ত হইয়া অতিরিক্ত সংস্কৃত-ঘেঁষা হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ তৎকালীন হিন্দুদিগের মনে বাংলাভাষাকে যাবনিক ও প্রাকৃত প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া দেবভাষার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপন করিয়া ইহার আভিজাত্য সম্পাদন করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল। ও-দিকে উর্দ্দু-পার্শী-ভাষায় অনভিজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণের লোক-সাহিত্য হিসাবে আরবী-পার্শী ও উর্দ্দু শব্দ-বহুল পুঁথি সাহিত্যের প্রসার হইল। মনে হয়, এইরূপে বাংলাভাষা শৈশবেই দ্বিধা-বিভক্ত হওয়াতে হিন্দু-মুসলমান চিত্তে নূতন করিয়া আর এক ব্যবধানের সৃষ্টি হইল। পুঁথি সাহিত্যের বিষয় হল অতীতে মুসলমানের গৌরব ও হিন্দুর হীনতা, সমৃদ্ধি। ইহাতে অমুসলমানেরা কাফের ও নরকগামী

এবং মুসলমানের হস্তে নিত্য-লাঞ্ছিত। পক্ষান্তরে হিন্দুয়ানী বাংলাসাহিত্য প্রধানতঃ বর্ত্তমানের সমস্যা লইয়া রচিত হইতে লাগিল নানাবিধ সামাজিক সমস্যা ছাড়াও, ইহাতে নির্য্যাতন-কারীর প্রতি নির্য্যাতিতের স্বাভাবিক আক্রোশ প্রকাশ পায়। এজন্য মুসলমান বাদশাহদের অত্যাচার, কাজীর বিচার, মুসলমান জনসাধারণের নৈতিক হীনতা ও চরিত্রগত দোষ, এবং বাদশাহদের কু-শাসনে দেশে দস্যু তস্করের প্রাদুর্ভাব, ইত্যাদি বিষয়ে অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেখা যায়। ইহাতে কতক কতক সত্য থাকিলেও, কিয়দংশে ইহা যে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ স্থায়ী করিবার জন্য রাজনৈতিক কারণ হইতে উদ্ভূত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐতিহাসিক সত্য-বিকৃতিই এরূপ সন্দেহের প্রধান কারণ।

যাহা হউক, মোটের উপর দেখা যাইতেছে, এই সময় বাঙালী মুসলমান কেবল অতীতের দিকেই মুখ ফিরাইয়া রহিল; কিন্তু হিন্দু সামাজিক সমস্যাবহুল জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। সতীদাহ প্রথা, সমুদ্রযাত্রা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিশেষ করিয়া হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন ও আদালতের ভাষা করিবার জন্য যে সমস্ত বাঙালী উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও মুসলমানকে অনুপস্থিত দেখিতে পাই। এইরূপ হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চাঞ্চল্যকর জীবন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া ক্রমশঃ জাগ্রত ও শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল, আর আত্মবিস্মৃত মুসলমান তাহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে অনেকের জীবনে ও সাহিত্যে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গিয়াছিল সত্য; কিন্তু জনকয়েকের সাময়িক ক্ষতির তুলনায় সমগ্র সমাজের চাঞ্চল্যকর নব-অনুভূতি এবং নূতনতর জীবনাদর্শের প্রতি সবিস্ময় দৃষ্টিপাত অনেক অধিক মূল্যবান। কারণ, এই অন্ধ অনুবর্ত্তন বাহ্য ব্যাপার,—শীঘ্রই ইহার বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষযুক্ত সাহিত্য ও মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইয়া গেল; পক্ষান্তরে সনাতন প্রথা ও নৈতিক আদর্শের দিক হইতে নূতনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ, সনাতনকে প্রশ্ন করিয়া ও নূতনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রবৃত্তি এবং বর্ত্তমান প্রয়োজনের দাবী স্বীকার করিবার মত মনোবৃত্তির অনুশীলন স্থায়ীভাবে নবযুগের শুভ সূচনা করিল।

এই নবীন উল্লাসে যখন বাঙালীর সাহিত্য বেগবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আস্তে আস্তে মুসলমানের ঘুম ভাঙিতে সুরু করিল। সাহিত্যে অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অধঃপতন চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা হিন্দুর রচিত সাহিত্যে মুসলমানের যেরূপ দেখিতে পাইল, তাহাতে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ তাহারা বাংলা সাহিত্যে হিন্দুসভ্যতার সুস্পষ্ট ছাপ ও মুসলমান সভ্যতার স্পর্শ-লেশ-শূন্যতায় সহসা অভিভূত ও নৈরাশ্য পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে, বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন মুসলমান লেখক ইসলাম ও মুসলমানের গৌরব ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই সাহিত্যে ঝাঁঝ ছিল, হয়ত শতকরা নব্বইভাগ সত্যও ছিল, কিন্তু যে মুক্ত দৃষ্টি ও যুগোপযোগী আত্মপ্রত্যয় সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ, তাহার অভাবে এই সব রচনার অধিকাংশ তথ্যপূর্ণ হইলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া রহিল। এই সময় আর এক শ্রেণীর লেখক হিন্দু সাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্রের পাল্টা জওয়াব দিতে গিয়া মুসলমান নায়ক ও হিন্দুনায়িকা সম্বলিত নভেল লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, রুচি সৌষ্ঠবের অভাবেই হউক, বা সাহিত্যিক সৃষ্টি প্রতিভার অভাবেই হউক, সেগুলি হিন্দু সমাজে ত দূরের কথা, মুসলমান সমাজেও স্থায়ীভাবে আদর লাভ করিতে পারিল না। এখন পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজ এতদূর পিছাইয়া রহিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভাসম্পন্ন লোক আজও দেখিতে পাই। সামান্য প্রতিভার বিকাশেই প্রচুর বাহবা জুটিতেছে বলিয়া, আমার মনে হয়, সাহিত্যোচিত সাধনার বিঘ্ন ঘটিতেছে। নানা প্রকারের সমস্যায় আজ মুসলমান সমাজ জর্জ্জরিত। সাহিত্যের ভিতর দিয়া এইগুলি একরূপ গুছাইয়া লইয়া একটু অবসর পাইবার পরে অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় যে বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান কালচারের একটা বিশিষ্ট ছাপ পড়িয়া হিন্দু-মুসলমান আদর্শের সমাবেশে পূর্ণতর সাহিত্যের উদ্ভব হইবে।

এইবার হিন্দুয়ানী ও মুসলমানী সাহিত্যের পৃথক আলোচনার পরিবর্ত্তে সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যের কয়েকটি মোটামুটি ভাব ধারার কথা উল্লেখ করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব। (১) পূর্ব্বেকার বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমগ্র ভারতবর্ষের কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভাব ছিলনা; বর্ত্তমান সাহিত্যে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ও নিখিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভাব পরিস্ফুট দেখা যায়। (২) আগেকার সাহিত্য ঘটনা-বহুল ছিল, তাহা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই উপভোগ করিতে পারিত; এখনকার সাহিত্য চিন্তা-বহুল, তাহা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতের উপভোগ্য নহে। ইহাতে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি শিক্ষিত লেখকদিগের অবজ্ঞা ও সহানুভূতিশূন্যতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ সাহিত্যে মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তির সহিত সংস্রব থাকাই অধিক বাঞ্ছনীয়। (৩) পূর্ব্বে সাহিত্যের বিষয়বস্তু প্রায়ই রাজা মহারাজা কোটাল মন্ত্রী প্রভৃতির আখ্যান হইতেই গ্রহণ করা হইত; এখন সাধারণ লোকের পারিবারিক সুখ-দুঃখও সাহিত্যে স্থান পাইতেছে। কিন্তু অতি আধুনিকের কথা বাদ দিলে এই 'সাধারণ লোক' বলিতে সাধারণতঃ শিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্তই বুঝাইত। অতি আধুনিক যুগে কুলিমজুর ও বস্তিওয়ালাদের জীবন কাহিনীও সাহিত্যের বিষয় হইয়াছে। এটা অবশ্য ভাল লক্ষণ; কিন্তু যে সাহিত্যিক-সুলভ সহানুভূতির স্পর্শে সাহিত্যে সুরুচি-সম্মত রস-সঞ্চার হয় তাহার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। (৪) পূর্ব্বে আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করা হইত, এবং প্রায় প্রত্যেক রচনাই কোন বিশেষ নৈতিক আদর্শের পরিপোষক হইত; বর্ত্তমানে দোষগুণ-সমন্বিত মানুষ সৃষ্টি করা হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে পূর্ব্বকালের চেয়ে আধুনিক কালে মানবজনোচিত দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া তাহার বিচার একটু অকঠোর করা হইয়াছে। (৫) পূর্ব্বেকার সাহিত্য নিত্যবস্তুর সন্ধান করিত, বর্ত্তমান সাহিত্য ক্ষণিক-সত্যের মোহটাকেও অমূল্য বলিয়া স্বীকার করে। জীবনাদর্শের এইরূপ পরিণতির ফলে, পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় অনৈতিক বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন তাহার অনেকগুলিই লোকে আর ততটা দোষনীয় বলিয়া মনে করেনা। কাজে কাজেই পূর্ব্বে যে সমস্ত কাজ লোকে গোপনে করিলেও মনে মনে সঙ্কুচিত থাকিত, অতি-আধুনিক যুগে তাহা প্রকাশ্যে করিয়া বাহবা লইতে চায়। (৬) পূর্ব্বকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেখা যাইত; কিন্তু অতি আধুনিক সাহিত্যে এইরূপ পরিকল্পনার অভাব লক্ষিত হইতেছে। ইহার কারণ কি লেখকদের মানসিক অপরিপক্কতা, না স্পষ্টতার প্রতি তাঁহাদের অবজ্ঞা, না অস্পষ্টতার প্রতি শিশুসুলভ আকর্ষণ—একথার মীমাংসা করা বর্ত্তমানে সুকঠিন। আমার মনে হয় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এবং অনুপলব্ধ সত্যের নীরস আবৃত্তির ফলেই বিভিন্ন ভাবের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-রক্ষা হইতেছে না। বাঙালীর এখন জীবন-সমস্যা অতিশয় কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোন মীমাংসাই হইতেছে না, অথচ সাহিত্যে বাস্তবতার দোহাই দিয়া প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম মালের সরবরাহ হইতেছে। বস্তি সাহিত্য যে-দিন সাহিত্যিকদের গভীর অনুভূতি ও সহানুভূতি দ্বারা রসময় হইবে, সেইদিনই তাহা প্রকৃত সাহিত্য রূপে গণ্য হইতে পারিবে, তৎপূর্ব্বে নয়। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি যখন অতি-আধুনিক সাহিত্যের বর্ত্তমান দিশাহারা অবস্থা ঘুচিয়া গিয়া তাহা এক সুস্পষ্ট পরিণতি ও লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হইবে এবং আমাদের জীবনসমস্যা সমাধানের শক্তি যোগাইবে।

কাজী মোতাহার হোসেন

ব্যথার পূজা

শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস এম্‌-এ, বি-টি

শহরের বাইরে মাঠের মধ্যে সুন্দর একটি বাড়ী—ঠিক যেন ছবির মত। আশপাশে কাছাকাছি আর কোনও পাকা বাড়ী নেই। বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে জনবিরল একটি রাস্তা—তা'তে অবিশ্রাম লোক-চলাচলের বা গাড়ীমোটরের ঠেলাঠেলি নেই। তা'র ওপারে খোলা একটি মাঠ। বাড়ীটি বেশ অনেকখানি জমির উপরে তৈরী। চারিদিকে মেদির বেড়া। তা'র গায়ে গোছায় গোছায় থরে র'য়েছে ছোট্ট ছোট্ট বেগুনী রঙের সুন্দর ফুল ও সবুজ ও হলদে রঙের ছোট্ট ছোট্ট কাঁচা পাকা ফল। রাস্তার উপরেই একটি গেট। একটি থামে মার্বেল পাথরের ফলকের উপর ইংরেজিতে গৃহস্বামীর নাম লেখা, অপরটিতে লেখা বাড়ীটির নাম—'চিত্রা'। গেটের উপর দিয়ে লতিয়ে উঠেছে মঞ্জরিত একটি লতাগাছ—প্রস্ফুটিত পুষ্পসম্ভারে নিবিড়। বেড়ার ধারে ধারে কতগুলি ইউক্যালিপ্টাসের গাছ দাঁড়িয়ে র'য়েছে তা'দের দীর্ঘ ঋজু দেহ নিয়ে। তা'দের মাঝে মাঝে করবী ও শিউলিফুলের গাছ। গেটের দু'পাশে দু'টি গম্বুজাকৃতি ঝাউগাছ। বাড়ীর সামনে একখণ্ড বৃত্তাকার জমিতে দেশী-বিলিতী নানাজাতীয় ফুলের গাছ। তা'তে রঙ বেরঙের ফুল ফুটে নানা রঙের বিচিত্র সমাবেশ হ'য়েছে। গেট থেকে একটি সযত্ন-প্রস্তুত রাস্তা বেরিয়ে সেই চক্রাকার ভূমিখণ্ডকে বেষ্টন ক'রেছে। সিঁড়ির দু'পাশে ও বারান্দার টবে কয়েকটা রজনীগন্ধার গাছ ও নানারকম পাম, ফার্ণ ও পাতাবাহারজাতীয় গাছ। সমস্ত বাগানটিই যেন গৃহস্বামীর সুরুচির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

শরৎকাল। আশ্বিনের আরম্ভমাত্র। শীত এখনও পড়েনি। সকাল সন্ধ্যায় অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে আরম্ভ হ'য়েছে মাত্র। মেঘমুক্ত নীল আকাশে জলশূন্য সাদা মেঘগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে। আজ ভোরের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছে। বাগানের সদ্যবর্ষণস্নাত গাছ-পালাগুলি সকাল বেলাকার অনতিপ্রখর সূর্য্যের আলোতে ঝলমল্ ক'রছে। সমস্ত প্রকৃতিতে যেন শরতের সোনার আলোর একটি স্নিগ্ধ রঙীন আমেজ লেগেছে আজ। বেশ একটি মিষ্টি ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। বাইরের আলো ঘরের উন্মুক্ত জানালা দিয়ে ডাক্তার গাঙ্গুলীর শয্যার উপরে এসে পড়েছে। চোখে আলো লাগ্‌তেই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ালেন খোলা জানালার ধারে। সামনেই বাগান। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তা'রই খানিকটা। মালী তখন আপন মনে বাগানে ফুল তুলছে—ঘরের ফুলদানীগুলো সাজাবে ব'লে। আজ সকালে বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়াতে তা'র একটা কাজ কমে গিয়েছে—গাছে আজ আর তা'কে জল দিতে হ'বে না এবেলা। সে তাই ঠিক ক'রেছে বেশ সুন্দর ক'রে কয়েকটা ফুলের তোড়া তৈরী ক'রে তার 'সাহেবের' একবারে তাক লাগিয়ে দেবে। ডাক্তার গাঙ্গুলী অন্যমনস্ক হ'য়ে মালীর ফুলতোলা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। বেড়ার ধারে শিউলি গাছগুলির তলা একেবারে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে। সাদা আস্তরণের মাঝে মাঝে কে যেন হলদে রঙের ছিটে ফেলে দিয়েছে। গাছের পাতায় পাতায় টলটল্ ক'রছে মুক্তোর মত জলবিন্দুগুলি। তা'র উপর রোদ পড়াতে সেগুলো জ্বলজ্বল্ ক'রছে। অদূরে একটি পুষ্পিত স্থলপদ্ম গাছ বিকশিত-কুসুম-স্মিত-বদনে বালারুণকে যেন তা'র সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে। মৃদু মন্দ প্রভাত সমীরে তা'র শাখায় শাখায় শিহরণ জেগে উঠেছে—পাতায় পাতায় তা'র কাঁপন ধ'রেছে। গাছের উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে সুন্দর বাসন্তী রঙের একটি প্রজাপতি—মধুর লোভে আকুল হ'য়ে এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে ব'সছে। ডাক্তার গাঙ্গুলী আনমনা

হ'য়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেই জানালার ধারে—স্বপ্নাবিষ্টের মত। বাইরের প্রকৃতির এই অপরূপ বর্ণবিলাসচ্ছটা—তা'র দৃশ্য, গন্ধ, আলো—মনের মধ্যে তাঁর একটি মধুর স্বপ্নাবেশ জাগিয়ে তুল্‌ল। কাজের কথা যেন তিনি একবারে ভুলেই গেলেন। কানের মধ্যে যেন অনুরণিত হ'তে লাগ্‌ল অপূর্ব্ব মধুর একটি সুরের রেশ। "আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে"—এই অসমাপ্ত গানের পদটি থেকে থেকে তাঁর মনে আস্‌তে লাগ্‌ল। মালীর ফুল তোলা শেষ হ'য়ে গেল। সে একটা সাজি ভর্ত্তি ক'রে ফুল নিয়ে চল্‌ল বাড়ীর দিকে। পাশের ঘরে ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে আটটা বেজে গেল। ডাক্তার গাঙ্গুলী চম্‌কিয়ে ঘরের ভিতরে টিপয়ের উপরকার ছোট ঘড়িটির দিকে চাইলেন। অমনি তাঁর খেয়াল্ হ'ল যে বেলা হ'য়েছে—অনেক কাজ আছে আজ তাঁর। ইতিপূর্ব্বেই বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনি সকালবেলাকার চা-খাওয়াটা সেরে নিয়েছেন। তাই এখন একবারে স্নান প্রসাধন সেরে প্রাতরাশের জন্যে প্রস্তুত হ'তে গেলেন।

ডাক্তার গাঙ্গুলী অবিবাহিত। বাড়ীতে তাঁর অন্য আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। আজ ন' বছর ধ'রে তিনি একাই এই সুদূর প্রবাসে পশ্চিমের একটি শহরে বাস ক'রছেন। তিনি এখানকার স্থানীয় সরকারী কলেজের একজন উচ্চ বেতনভোগী অধ্যাপক—ফিজিক্সের সিনিয়ার প্রফেসার। বিলেত থেকে লণ্ডন 'ডি-এস্‌সি' হ'য়ে এসে এখানেই তিনি প্রথম কাজ নেন। সেই থেকে আজ অবধি এখানেই অধ্যাপনা ক'রছেন। বয়স এখন তাঁর চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুষ্ঠু দেহাবয়ব। রঙ গৌরবর্ণ—মুখের চেহারাও বেশ সুশ্রী। মোটের উপর তাঁকে সুপুরুষ বলা চলে। বিদ্যা, অর্থ, খ্যাতি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সম্মান—পৃথিবীতে মানুষ যা' কিছু কামনা করে—এগুলির কোনটা দিতেই বিধাতা তাঁকে কার্পণ্য করেন নি। এর মধ্যেই তাঁর পাণ্ডিত্যের ও অধ্যাপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দেশে বিদেশে। বিজ্ঞান যেন তাঁর নেশা। দিনের বেশীভাগ সময় [illegible] কাটে কলেজের ল্যাবরেটরীতে ও [illegible]। [illegible] ভুলে তাঁর স্নান আহারের কথাও মনে থাকে না। খানিকটা সময় তাঁর কাটে বাগানে। বাগানের প্রত্যেকটি গাছের সঙ্গেই যেন তাঁর গভীর স্নেহের সম্বন্ধ—প্রত্যেকটিকেই যেন তিনি চেনেন, প্রত্যেকটিরই ভাষা যেন তিনি বোঝেন। প্রতিদিন অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত তিনি পড়াশুনা করেন। সর্ব্বদাই যেন অবিরাম কাজের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে রেখেছেন। তাঁর সেই নিরবকাশ কর্ম্মময় জীবনের নিশ্ছিদ্র অখণ্ডতার মধ্যে কোথাও যেন এতটুকু ফাঁক্ রাখ্‌তে দেননি তিনি। কি ছাত্রমহলে কি বন্ধুমহলে যশ আর তাঁর ধরে না। সকলেই তাঁকে ভালোবাসে, তিনি যেন সকলেরই আপনার জন। বুদ্ধিদীপ্ত সৌম্য সুন্দর মুখখানিতে তাঁর এমন একটি সরল, নিরহঙ্কার, অমায়িক ভাব যে যেই তাঁর সংস্পর্শে আসে সেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে থাক্‌তে পারেনা। অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব। তিনি বড় একটা কাউকে শাসন করতেন না। অথচ তাঁর কাছে কেউ কোনও অন্যায় কর্‌তে বা কাজে কোনও রকম শৈথিল্য প্রকাশ কর্‌তে সাহস পেতনা। তিনি যেন অজাতশত্রু। সকলেই অনুভব কর্‌ত যে এই সদানন্দ প্রিয়দর্শন যুবকটির মধ্যে সত্যিকারের একটি মহৎ প্রাণ লুকিয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখে তাঁকে খুব সাহেবীভাবাপন্ন লোক ব'লে মনে হ'ত। অথচ তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে ও অকপট ব্যবহারে এমন একটি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাব ছিল যে সকলেই অবাধে নিঃসঙ্কোচে তাঁর সঙ্গে মিশ্‌তে পার্‌ত। তাঁর ভৃত্যেরা তাঁর শিশুসুলভ সরলতায় ও মধুর সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হ'ত। তারা সকলেই তাঁকে আপনার জনের মত ভালোবাস্‌ত। সাংসারিক সব বিষয়ে তাঁর এমন একটি অসহায় নির্ভরশীল ভাব ছিল যে ভৃত্যেরা তা'দের সাধ্যমত তাঁর সেবায়ত্নে কখনও কোনও ত্রুটি ক'র্‌ত না। এমন একটি মানুষ কেন যে [illegible] পর্য্যন্ত বিবাহ করেননি এ প্রশ্ন হয়ত' তাঁর পরিচিতদের মধ্যে অনেকেরই মনে জাগ্‌ত। যে দেশে ছেলেদের পড়াশুনা শেষ হ'তে না হ'তেই তা'র বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হ'তে থাকে সেই দেশে এই [illegible], [illegible] ধনবান্ স্বাস্থ্যবান্ যুবকটি কেন যে আজো [illegible] অবিবাহিত রয়েছেন লোকে ভেবেই পেতনা।

প্রথম প্রথম বন্ধুরা তাঁকে খুবই পীড়াপীড়ি ক'রতেন বিয়ে ক'রবার জন্যে। তাঁর বিয়ের অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধও এসেছিল। আগে আগে প্রায়ই তার নিমন্ত্রণ হ'ত কোন না কোন বাঙ্গালী বাড়ীর পার্টিতে। সেখানে বিবাহযোগ্যা অনেক সুন্দরী, সুগায়িকা, সুশিক্ষিতা তরুণীর সঙ্গে তাঁর আলাপও করিয়ে দেওয়া হ'ত। কিন্তু দেখা গেল বিবাহ সম্বন্ধে তিনি একেবারেই উদাসীন। বন্ধুরা ক্রমে বুঝলেন যে তাঁর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা টলবার নয়। তাঁরা শেষে অনুরোধ করা ছেড়ে দিলেন। বিবাহ সম্বন্ধে যে কোনও প্রচ্ছন্ন গভীর ব্যথা তাঁর অন্তরের নিভৃততলদেশে লুকিয়ে আছে তা'র সুস্পষ্ট আভাস পেয়েই হয়ত' বন্ধুরা শেষে এবিষয়ে একবারে নীরব হ'য়ে গিয়েছিলেন। কেউ বিয়ের কথা তুললেই ডাক্তার গাঙ্গুলী, এমন ক'রে হেসে উঠতেন যেন তিনি সেই হাসির আড়াল দিয়েই ঢাকতে চাচ্ছেন তাঁর ব্যথাহত অন্তরের গভীর বেদনার উদগত অশ্রুকে। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটিকে তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে স্নিগ্ধ পরিহাসচ্ছলে তিনি হেসে বলতেন—"আমার ত' বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে অনেকদিনই। জানেন না বুঝি? Science is my spouse—আর ক'বার বিয়ে ক'রব?" বন্ধুপত্নীরা সকলেই তাঁকে খুব স্নেহ ক'রতেন। এই আপন-ভোলা সদাশিব মানুষটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের মনে—বিশেষ ক'রে মেয়েদের মনে—অনেকখানি স্থান অধিকার ক'রে নিতেন। প্রায়ই কোন না কোন বন্ধুর বাড়ীতে তাঁর আহারের নিমন্ত্রণ থাকত। বন্ধুপত্নীদের সকলেরই তাঁর নিঃসঙ্গ একাকীত্বের জন্যে তাঁর প্রতি একটা আন্তরিক সমবেদনা ছিল। তাঁদের সকলেরই মনে হয়ত' সন্দেহ হ'ত যে তাঁর অতীত জীবনের সঙ্গে বোধ হয় কোনও একটি নিগূঢ় বেদনার ইতিহাস জড়িত আছে যা'র জন্যে তিনি আমরণ এই নিঃসঙ্গ কর্মময় জীবনের কঠিন বৈরাগ্যকেই স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছেন এবং তাঁর সেই সঙ্কল্পের নিরবচ্ছিন্ন দৃঢ়তা থেকে বিচ্যুতি ঘটবার কোন রকম সম্ভাবনাই নেই। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম প্রথম কিছু না জেনে তাঁকে বিয়ে দিয়ে চেষ্টা ক'রতে গিয়ে বড় অপ্রতিভও হ'য়ে গিয়েছেন। একদিন ডাক্তার গাঙ্গুলীর এক সহপাঠী ও কলেজের অন্যতম অধ্যাপক সমরেশ মিত্রের বাড়ীতে তাঁর সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। আহারের সময় খাওয়ার টেবিলে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছিল। ডাক্তার গাঙ্গুলী হেসে বললেন—"বাড়ীতে বাবুর্চ্চির রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি ধ'রে যায়। মাঝে মাঝে বৌদি'র এখানে এসে তবু বেশ মুখ বদলানো যায়। সমরেশ, তোমার কপাল ভাল হে; এমন একটি স্ত্রীরত্ন পেয়েছ যিনি রন্ধনে একবারে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী।" সমরেশের স্ত্রী সবিতা দেবী নিজের প্রশংসায় একটু লজ্জিত হ'য়ে পরিহাস ক'রে বললেন—"তা' আর আক্ষেপ থাকে কেন? আপনিও একটি দ্রৌপদী জোগাড় করুন না? তাহ'লে ত' আর বাবুর্চ্চির হাতের সুখাদ্য রান্না রোজ খেতে হয় না। এরকম সন্ন্যাসী হ'য়ে আর কতদিন জীবন কাটাবেন? এবারে 'ইতরে মিষ্টান্নাঃ' হ'ক। আমরা একটু ভোজটোজ খাই। বলেন ত' ক'নে দেখা সুরু করি আমরা। না, কোথাও ঠিকঠাক আছে? কে সে ভাগ্যবতী? সাগরপারের কোনও তরুণী সুন্দরী নাকি? 'শুভস্য শীঘ্রম্।' শুভ কাজে দেরী ক'রতে নেই। ক'রে ফেলুন 'শীগ্‌গির শীগ্‌গির।' ডাক্তার গাঙ্গুলীর মুখে ক্ষণেকের জন্যে ব্যথার একটি কালো ছায়া খেলে গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি নিজেকে সাম্‌লে নিলেন। অন্তরের ঘনবেদনার বাষ্পটিকে একটি স্বচ্ছ-হাসির ভারল্যে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা ক'রে তিনি হেসে উত্তর দিলেন—"সাগরপারের কোনও তরুণী সুন্দরীর আর এই 'কালা আদমী'কে পছন্দ হ'তে হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বৌদি। বিয়ের বয়স কি আর আমার আছে?......বাঃ, আপনার দইবড়াটি ত' খাসা হ'য়েছে। আপনি এ বিদ্যাটি কোথায় শিখলেন বৌদি? এমনি একটি অন্নপূর্ণার মত বৌদি পাওয়া কম নয়। আপনার এই পেটুক দেওরটির আপনি দিন দিন লোভ বাড়িয়ে দিচ্ছেন কিন্তু।" ব'লে ডাক্তার গাঙ্গুলী অকারণ 'হা' 'হা' ক'রে হেসে উঠলেন। তাঁর সেই হাসি যেন কান্নার চেয়েও করুণ। সবিতা বুঝলেন তিনি না জেনে অসাবধানে এই সদা-প্রফুল্ল মানুষটির অন্তরের গোপন ব্যথার স্থানে হাত দিয়ে ফেলেছেন। তারপর আর কোনও দিন তিনি এ প্রসঙ্গ তোলেন নি।

আজ সকালে ডাক্তার গাঙ্গুলী একবারে কলেজে যাবার পোষাক প'রে এসে ঢুক্‌লেন তাঁর পড়্‌বার ঘরে। তখনও প্রাতরাশের কিছু দেরী ছিল। ঘরটি চারিদিকে কাঁচের আলমারীতে সব মোটা মোটা বই সাজানো। শুধু বিজ্ঞানের বইই নয়, অন্যান্য অনেক বিষয়ের ও প্রাচীন ও আধুনিক বই রয়েছে। সমস্ত ঘরটিই যেন গৃহস্বামীর গভীর জ্ঞানানুরাগের পরিচয় দিচ্ছে। মাঝখানে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরে কয়েকটা বই, খানকতক ইংরেজি বাংলা মাসিক পত্রিকা ও কতগুলি লিখ্‌বার সরঞ্জাম। একটি 'পিনকুশানে' কতগুলি আলপিন বিঁধানো। একটি 'কলিংবেল' ও 'পেপার ওয়েট্'। টেবিলের একপাশে একটি কাগজপত্র রাখ্‌বার ট্রে। নীচে একটি 'ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট'। টেবিলের দু'পাশে দু'টি চেয়ার। ঘরের কোণে আরও দু'খানা চেয়ার। দরকার হ'লে এগুলি কখনও কখনও ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ঘরটিতে অন্য আসবাবের বাহুল্য নেই। ডাক্তার গাঙ্গুলী এসে টেবিলের সাম্‌নে একটি চেয়ারে বসে পড়্‌লেন। একখানা ইংরেজি মাসিক পত্রিকা নিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লেন। ঘড়ির দিকে একবার চাইলেন—দেখ্‌লেন ডাক আস্‌বার প্রায় সময় হ'য়ে এসেছে। আজ ছুটির দিন। কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে কলেজ বন্ধ। তাই আজ কলেজে না গেলেও চলে। কিন্তু ডাক্তার গাঙ্গুলীর ছুটির দিনেও ছুটি নেই। কিছুদিন ধ'রে একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিয়ে তিনি ভয়ানক ব্যস্ত। তাই আজ প্রাতরাশের পরেই তিনি কলেজের ল্যাবরেটরীতে গিয়ে কাজ ক'র্‌বেন ঠিক্ করেছেন। অন্যদিন তাঁকে অধ্যাপনার কাজেও ত' খানিকটা সময় দিতে হয়। কাজেই ছুটির দিনেই তাঁর গবেষণা কাজের সুবিধা হয় বেশী।...খানিকটা পড়ে বইখানা হাতে নিয়েই ডাক্তার গাঙ্গুলী কেমন যেন উন্মনা হ'য়ে জানালার দিকে তাকালেন। সবুজ পর্দার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশের একটুকরো দেখা যাচ্ছিল। ঐ সুদূর আকাশের অসীম শূন্যতার দিকে চেয়ে তাঁর মনটা আজ কেমন যেন উদাস হ'য়ে গেল। হঠাৎ কি একটা অজ্ঞাত ব্যথায় বুকের ভিতরটা তাঁর টন্‌টন্‌ ক'রে উঠ্‌ল। তাঁর নিঃসঙ্গ কর্ম্মব্যস্ত জীবনের গভীর শূন্যতা আজ তাঁর মনের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্যানুভূতি জাগিয়ে তুল্‌ল। তাঁর মনে হ'ল ঐ নীলাকাশের সীমাহীন উদাসীনতার সঙ্গে তাঁর আনন্দহীন সঙ্গীহীন জীবনের শূন্যতার কোন একটি নিগূঢ় যোগ আছে। তাঁর অশান্ত মনটা তাঁর প্রাণের মধ্যে একটি অবসাদের আবর্ত্ত সৃষ্টি ক'রে অসহায়-ভাবে তা'রই মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগ্‌ল। নিজের অজ্ঞাতেই একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি হাতের বইটার খোলা পাতার উপরে দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'র্‌লেন। স্বভাবতঃই তিনি খুব ধৈর্য্যশীল—অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির লোক তিনি। জীবনের চরম দুঃখের দিনে যখন অন্তরে তাঁর ব্যথার তুমুল ঝড় বয়েছে তখনও বাইরে তাঁর কোন চাঞ্চল্যই, কোন অস্থিরতাই দেখা যায়নি। তাঁর সেই সদা-প্রফুল্ল মুখের অম্লান, প্রসন্ন হাসির অন্তরালে তাঁর গভীর অন্তরে যে ব্যথার সমুদ্র লুকিয়ে থাক্‌ত সংসারে খুব কম লোকেই তার খবর জান্‌তে পেত। নিজের দুঃখকে জয় কর্‌বার জন্যে তাঁর সেই আপ্রাণ সাধনার ইতিহাস তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও জান্‌তেন না।...বাইরে বেয়ারার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—"ডাক, হুজুর"। ডাক্তার গাঙ্গুলী চম্‌কিয়ে উঠ্‌লেন—বল্‌লেন—"লে আও"। বেয়ারা ঘরে ঢুকে বিনীত সেলাম ক'রে কতগুলো চিঠি টেবিলের উপর রেখে গেল। হাতে নিয়ে চিঠিগুলি নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ ডাক্তার গাঙ্গুলীর চোখ পড়্‌ল মোটা একটা খামের উপরে। মেয়েলি হাতের লেখায় তাঁর নাম ও ঠিকানা লেখা। লেখাটি দেখেই তিনি চম্‌কিয়ে উঠ্‌লেন। সেটি তাঁর অতি পরিচিত বলে মনে হ'ল। 'না হ'তেই পারে না এ তা'র লেখা। সে আবার এতকাল পরে হঠাৎ কী প্রয়োজনে আমাকে চিঠি লিখ্‌তে যাবে?'—এই ভেবে ডাক্তার গাঙ্গুলী অধীর হস্তে খামটি ছিঁড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি নামটি দেখ্‌লেন। সত্যিই ত', তাঁর সন্দেহই ঠিক। এ লেখা কি ভুল কর্‌বার? একদিন যে এ লেখাটি বড় আদরের ছিল তাঁর! একবার মনে হ'ল চিঠিখানা না পড়েই ছিঁড়ে ফেলেন। আজ এই সুদীর্ঘ বারো বছর ধ'রে যাকে ভুলবার ঐকান্তিক সাধনা চলেছে তা'কেই আবার আজ কেন বৃথা স্মৃতি-পথে টেনে আনা?

তা'র আজ এতদিন পরে তাঁকে আবার কী বল্‌বারই বা থাক্‌তে পারে? সব বলাই ত' ফুরিয়ে গিয়েছে একদিনের ছোট্ট একটি 'না'র সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর সাধনার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন সেই চিঠিখানা পড়্‌বেন কি পড়্‌বেন না তিনি ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছিলেন না। খোলা চিঠিখানা হাতে নিয়েই তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। বহু পুরাণো স্মৃতি তাঁর আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল আজ। স্মৃতিপটে একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। স্মৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত সেই দিনগুলি জীবন্ত হ'য়ে উঠ্‌ল আজ এত বছর পরে—মনে হ'ল এসব যেন সেদিনকার ঘটনা। দিন চলে যায় একটির পর একটি—তা'রা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায়। বিগত দিনটি আর ফেরেনা। কিন্তু অতীতের বিশেষ বিশেষ দিনগুলি মানুষের স্মৃতির কোঠায় ঢুকে কালের বিস্মরণ থেকে নিজেদের বাঁচায়। স্মৃতি বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে অলক্ষ্য একটি যোগসূত্র বেঁধে দেয়।…আজকের এই পত্রলেখিকাও ত' তাঁর কাছে একটি স্মৃতিমাত্র। সেই স্মৃতির মাধুর্য্য যতখানি জ্বালাও ততখানি।…তবু চিঠিখানা না পড়ে ছিঁড়তে কিছুতেই তাঁর মন সরল না। সম্বন্ধ ত বহুদিনই তাঁদের ঘুচে গিয়েছে—নিজের হাতেই ঘুচিয়েছে 'সে'। এত বছরকার নীরবতার পরে তাঁকে আজ কী বল্‌তে চায় 'সে'? সমাজ আজ তাঁদের দু'জনের মধ্যে নিঃসম্পর্ক দূরত্বের এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে দিয়েছে। মনে পড়ে গেল তাঁর বারো বছর আগেকার একটি দিনের কথা—যেদিন তাঁর প্রথম যৌবনের স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ সুখের আশার স্বপ্নগুলি সব ধূলিসাৎ হ'য়ে গিয়েছিল। সেদিনটি আজও তাঁর হৃদয়ে অমলিন স্পষ্টতায় আঁকা রয়েছে। সেইদিন থেকেই সুরু হ'য়েছে তাঁর দুঃখের বিরুদ্ধে অন্তহীন অভিযান। সেদিন যেন জগতের সব আলো, সব আনন্দ, সব সুখই তাঁর কাছে নিষ্প্রভ, বেদনাময় হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিনও সেই দুর্ব্বিষহ দুঃখের চাপে তাঁর ব্যথাহত চিত্ত একেবারে দলিত, নিষ্পেষিত হ'য়ে যেতে পারেনি। সেদিনও সে তা'র নিজের মধ্যে থেকেই দুঃখ জয় ক'র্‌বার শক্তি অর্জ্জন করতে প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু আজও কি ভুল্‌তে পেরেছেন তিনি সেই ব্যথা? সময়ের সান্ত্বনার প্রলেপে আজ তা'র দাহ ততখানি না থাক্‌লেও তা'র গভীরতা ঠিক ততখানিই আছে। যত অন্তর থেকে মুছে ফেল্‌তে চেয়েছেন তা'কে ততই দৃঢ় হ'য়েছে তা'র মূল তাঁর অন্তরের মধ্যে।… আজ বুঝ্‌লেন যে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি এতদিন ধ'রে সেই ব্যথাকে লালন ক'রে এসেছেন অন্তরের অন্তঃস্থলে—অন্তঃসলিলা ফল্গু যেমন ক'রে তা'র বুকের মধ্যে জলের ধারাটি লুকিয়ে রাখে। চিঠিখানি পেয়ে আজ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যেন খুলে গেল এক নূতন দিকে। অশান্ত হৃদয় আজ যেন তাঁর আর বাধা মান্‌তে চায় না—এতদিনকার ধৈর্য্যের ও সংযমের বাঁধ ভেঙে আজ সে উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌তে চায়। মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লিয়ে নিয়ে ডাক্তার গাঙ্গুলী আবেগ কম্পিত হস্তে চিঠিখানা ধ'রে পড়্‌তে লাগ্‌লেন—

২

দার্জ্জিলিং
অক্‌ল্যাণ্ড রোড,
২৫শে ভাদ্র।

শ্রীচরণেষু

অমরদা', আজ সুদীর্ঘ বারো বছর পরে তোমায় এই চিঠি লিখ্‌ছি। জানিনা এ চিঠি লিখ্‌বার আমার আজ অধিকার আছে কিনা। অনেকদিন থেকেই ভাবছি তোমাকে চিঠি লিখ্‌বার কথা। কিন্তু মনে বার বার এই দ্বিধা উপস্থিত হ'য়েছে ব'লেই এতদিন সঙ্কল্প কাজে পরিণত হ'তে পারেনি। কত চিঠি লিখে শেষে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি—পোষ্ট করিনি। কত অসমাপ্ত চিঠি চোখের জলে ভিজে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ আমি মৃত্যু-পথ-যাত্রিণী। আমার এ চিঠি যখন তুমি পাবে তখন হয় ত' আমি আর ইহজগতে থাকব না। আমার জীবন-প্রদীপ নিভে আস্‌ছে ধীরে ধীরে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তাই আজ সব দ্বিধা সঙ্কোচ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই চিঠি তোমায় লিখ্‌তে বসেছি। আর হয়ত সময় পাব না। ক্রমশঃ বেশী দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছি।…মনের সঙ্গে আজ আমার একটা বোঝাপড়া ক'র্‌বার সময় এসেছে। আজ এই

বারো বছর ধ'রে মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলেছে অহরহ, শ্মশানের চিতার মত, জানিনা তা' মরণেও নিভ্‌বে কিনা। কিন্তু আজ যদি আমার সব কথা তোমায় ব'লে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষে ক'রে যেতে পারি হয়ত' কতকটা শান্তিতে মরতে পার্‌ব। এই আশাতেই মর্‌বার আগে তোমায় এই চিঠিখানা লিখে যাচ্ছি। আমি নিশ্চয়ই জানি আমার সব কথা শুন্‌লে আমায় তুমি ক্ষমা না ক'রে থাকতে পার্‌বে না—যত বড় অপরাধই তোমার কাছে ক'রে থাকি আমি। তোমার উপর আমার এই অচল অটুট বিশ্বাস আছে ব'লেই আমার পক্ষে এতকাল বেঁচে থাকা সম্ভব হ'য়েছিল, তোমাকে হারাণোর পরেও। মনে ক'রো না যে একটা নভেলিয়ানা ক'র্‌বার লোভে তোমায় এ চিঠিখানা লিখে গেলাম। আজ এই বারো বছর ধ'রে বুকের ভিতর এই আগুন নিয়ে জ্বলেছি তিলে তিলে পলে পলে। তোমার জীবনটাকেও নষ্ট ক'রেছি, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও পুড়িয়ে মেরেছি। একথা তুমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌বে কি আজ, অজয়দা, আমায় তুমি যতখানি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, চঞ্চলমতি মনে ক'রেছিলে আমি হয়ত' ততখানি নই? সেদিন আমার বাবা তোমার বাবার কথায় নিজেকে অপমানিত বোধ ক'রে আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিতে সঙ্কল্প ক'র্‌লেন সেদিনকার সেই নিদারুণ আঘাতের কথা আজও ভুল্‌তে পারিনি। আজও দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ে সেদিনটা।…ছোটবেলা থেকেই বালীগঞ্জে পাশাপাশি বাড়ীতে আমরা দু'টিতে প্রায় একসঙ্গেই মানুষ হ'য়েছিলাম। অতি শৈশবেই আমি মাতৃহীন হ'য়েছিলাম। কিন্তু মাসিমা'র (তোমার মা'র) নিবিড় স্নেহের মধ্যে থেকে মা'র অভাব প্রায় বুঝিই নি। তাঁর মধ্যেই যেন আমার হারাণো মাকে আবার ফিরে পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু আমার মত হতভাগিনীর কপালে যে সুখও সইল না বেশীদিন। মাসিমা যেদিন মারা যান সেদিনকার কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন আমার অন্তরেও তোমার চেয়ে কম ব্যথা লাগেনি বোধ হয়। সেদিন আমি দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হলাম। নিজের মা'কে ত' মনে পড়েনা—তাঁকে হারানোর ব্যথা বুঝ্‌বার বয়সও হয় নি তিনি যখন মারা যান। তারপর যেদিন আমার জীবনের সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল সে'দিনও মাসিমা'র স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিখানি মনে ক'রে বারবার চোখের জল ফেলেছি, লুকিয়ে লুকিয়ে। সেদিন শুধু বারবার এই কথাই মনে হ'চ্ছিল যে তিনি আজ বেঁচে থাক্‌লে হয়ত' শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা এতদূর গড়াত' না—তিনি হয় ত' এ বিবাদের মিলন-সেতু হ'তে পার্‌তেন। আজ তোমায় চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে কত কথাই না মনে আস্‌ছে! বারবার খেই হারিয়ে ফেল্‌ছি লেখার। কত অবান্তর কথাই লিখে ফেল্‌ছি হয়ত'।……তারপরে কবে যে আমাদের বাল্যের সখ্য কৈশোরের নবরসানুভূতির মধ্যে দিয়ে যৌবনের প্রেমে পরিণত হল বুঝ্‌তেই পারিনি। আমরা দু'জনে যেন পরস্পরের জন্যেই সৃষ্ট হ'য়েছিলাম। আমাদের সম্বন্ধটা সকলেই যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত ধ'রে নিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই তুমি ছিলে সব বিষয়ে আমার আদর্শ। তুমি আগে ছিলে আমার খেলার সাথী, পরে হ'লে আমার আরাধ্য দেবতা, আমার শিক্ষাগুরু। যে বছর আমি ম্যাট্রিক দিলাম তোমার সে কী উৎসাহ আমাকে পড়ানোর! বাবার ইচ্ছা ছিল আমি ম্যাট্রিক পাশ কর্‌লেই আমাদের বিয়ে হয়। তুমিও সে বছরে এম-এস্‌-সি পাশ ক'র্‌লে। ঠিক ছিল আমাদের বিয়ের পরেই তুমি বিলেত যাবে।…তারপর সামান্য একটু মনোমালিন্য নিয়ে আরম্ভ হ'ল তোমার বাবার সঙ্গে আমার বাবার ঝগড়া। খড়ের আগুন ক্রমে বাড়্‌তে বাড়্‌তে দাবানলে পরিণত হ'ল। তোমার বাবা রেগে বল্‌লেন তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার বাবার মত ইতর লোকের মেয়ের বিয়ে কখনই দেবেন না তিনি—তাঁর ছেলেকে "পাকড়াও" ক'র্‌বার জন্যে বাবা তাঁর নিজের মেয়েকে "লেলিয়ে" দিয়েছেন ইত্যাদি। শুনে বাবারও রাগ চড়ে গেল। তিনিও প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌লেন যে তাঁর মেয়েকে যদি চিরকুমারী থাক্‌তে হয় ত' তা'ও স্বীকার কিন্তু তাঁকে যিনি এমন ক'রে অপমান ক'রেছেন তাঁর ছেলের সঙ্গে কখনও তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় বেচারা উলুখড়ের প্রাণ গেল।" তাই হ'ল আর কি আমাদের দশা! তোমার সঙ্গে মেলামেশা করা বারণ হ'য়ে

গেল আমার। বাবার সেই কঠোর শাসনের নিগড় ভাঙতে পারি এমন সাহস বা সাধ্য আমার ছিলনা তখন। যদিও বুকটা ফেটে যেতে লাগল, তবু মুখ ফুটে কোনও কথা বল্‌তে পারলাম না বাবার কথার উপরে। আমার সেই নীরব দুঃখের খবর সেদিন জান্‌লেন শুধু আমার অন্তর্যামীই। আমাদের দেখাশুনাও প্রায় একরকম বন্ধ হ'য়ে গেল। তোমার বাবার দিক থেকেও হয়ত' তোমার উপরে ঐরকম কোনও আদেশ হ'য়ে থাক্‌বে।...মনে আছে যেদিন তুমি লজ্জানম্রভাবে বাবার কাছে এসে আমাকে বিবাহ ক'র্‌বার সলজ্জ প্রস্তাব জানিয়েছিলে। আমি পাশের ঘর থেকে সবই শুনেছিলাম সেদিন তোমাদের কথাবার্ত্তা। তুমি বল্‌লে—"অশোকার এখন বিয়ে দেবেন না আপনি। ও আরও ক'বছর পড়াশুনা করুক্। এই ক'টা বছর অপেক্ষা করুন্। আমি বিলেত থেকে পাশ ক'রে ফিরে আসি। চাক্‌রী পেলেই আমি বিয়ে ক'রব। তখন ত' আমি স্বাধীন হব। বাবার অমতে তখন কিছু আস্‌বে যাবে না। আর বাবাও অশোকাকে এককালে খুবই স্নেহ ক'র্‌তেন, ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছেন ত'। শেষ পর্য্যন্ত ছেলে-বউকে তিনি ফেল্‌তে পার্‌বেন না কখনই।" কিন্তু বাবার মন তখন একবারে বেঁকে বসেছে। আর কারও মনের দিকে তাকাবার তাঁর আর সময় ছিলনা। তিনি এ প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হ'লেন না। তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল রইল শেষ পর্য্যন্ত। তুমিও তেম্‌নি অভিমানী ছেলে! বারবার অনুরোধ ক'র্‌বার ছেলে নও তুমি—তা' নিজেকে যত দুঃখই পেতে হ'ক্ সেজন্যে। তারপরে আমাকে একদিন একা পেয়ে আমার নিজের মুখ থেকে তুমি শুন্‌তে চেয়েছিলে আমার মতটা। তখনও আমি বালিকামাত্র। নিজের মন ভাল ক'রে বুঝতে শিখিনি। মনে পড়ে গেল বাবার বেদনাতুর ম্লান মুখখানি—অপমানের কষাঘাতে ক্লিষ্ট। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। আমার মা যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স এমন কিছু বেশী ছিলনা। কিন্তু মাতৃহীন মেয়ের মুখ চেয়ে বাবা আর দ্বিতীয়বার বিয়ে ক'রবার কথা মনেও আনেননি। আমার বাবাই হ'লেন একাধারে আমার মা এবং বাবা। সেই একান্ত স্নেহশীল পিতার কাছে এতখানি অকৃতজ্ঞ হ'বার কথা আমি তাই সেদিন ভাব্‌তেই পার্‌লাম না—নিজের যত দুঃখই থাক্ কপালে। বালিকাসুলভ লজ্জায় বেশী কথা বলতেও পার্‌লাম না—তোমার ব্যাকুল প্রশ্নের জবাব দিলাম তাই ছোট্ট একটি 'না' ব'লে। আমায় তুমি সেদিন ভুল বুঝ্‌লে নিশ্চয়ই! আমিও সেদিন তোমাকে কোনও কথা বল্‌বার বোঝাবার মত ভাষা খুঁজে পেলাম না। তোমার সেদিনকার সর্ব্বস্বহারা বেদনাহত মুখটি আজ এখনও আমার চোখে ভাস্‌ছে। চোখের সাম্‌নে এখনও যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি সেই দৃশ্য, সেই ছবি। যাক্। সেদিন তোমাকে হারিয়ে আমার যে মনোভাব হ'য়েছিল তা' আর নাই বা বর্ণনা ক'র্‌লাম।...সেদিন বাবার দুঃখের কথাই মনে হ'য়েছিল—নিজের অন্তরের দিকে তাকাবার সময় পাইনি। একটা নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের গরিমা ও অভিমানও বোধ হয় সেদিন আমার মনের কোণে লুকিয়েছিল, নিজের অজান্তে। তাই নিজের জীবনকে অমন ক'রে বলি দেওয়াটা আমার কাছে তখন সহজসাধ্য ব'লে মনে হয়েছিল। তখনও বুঝিনি নিজের ক্ষতির পরিমাণটা। যত দিন যেতে লাগ্‌ল ব্যাপারটা ততই তলিয়ে বুঝ্‌তে লাগ্‌লাম। প্রাণের ভিতরটা অহরহ 'হু' 'হু' করতে থাক্‌ত। তারপর একদিন শুন্‌লাম তুমি বিলেত চলে যাচ্ছ। যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখাও হ'ল না। কি জানি কেন মনে হ'ল তোমার সঙ্গে এরপরে এজীবনে আর কখনও দেখাও হ'বে না। ঠিক হ'লও তাই।...বাবা ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে সেদিন আমার মনের দিকে তাকাবার অবসর পাননি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল ক্রমেই বোধ হয় তিনি তাঁর নিজের ভুল বুঝ্‌তে পার্‌ছিলেন। তাই বোধহয় আমাকে আরও নিবিড় স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে চাচ্ছিলেন তিনি। যতক্ষণ বাড়ীতে থাক্‌তেন আমাকে সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখ্‌তেন, নিজের স্নেহচ্ছায়ায়। তিনি যেন আমাকে নিয়ত তাঁ'র স্নেহের পক্ষপুটে ঢেকে রেখে আমার সব ব্যথা ভুলিয়ে দিতে চান। তাঁর সমস্ত হৃদয়-নিঙড়ানো সেই অজস্র স্নেহধারা তাঁর একমাত্র সন্তানের উপর ঢেলে দিয়েই বোধহয় তিনি নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে

আছিলেন। সন্তানের যে ক্ষতি তিনি অদৃষ্ট-দোষে ক'রে ফেলেছেন সেটা যেন কতকটা পূরণ ক'রতে চান নিজ অন্তরের স্নেহ-ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দিয়ে।···বাবা বোধ হয় ভেবেছিলেন যে সময়ে আমি সবই ভুলতে পারব। তোমার বিদেশ যাওয়ার পর থেকেই তিনি আমার জন্যে পাত্র খুঁজতে লাগলেন। একথা জানতে আমার আর বাকী রইল না। একদিন আমাকে বিয়ের কথা বলাতে আমি আর অশ্রু সংবরণ ক'রতে পারলাম না—কেঁদে বললাম—"বাবা, আমায় তুমি বিয়ে দিও না। বিয়ে আমি ক'রব না। লেখাপড়া ক'রছি—নিজের পেট নিজেই চালিয়ে নিতে পারব বেশ। আমার জন্যে তুমি ভেবোনা। আমি চলে গেলে তোমাকেই বা কে দেখবে? তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।" স্নেহময় পিতার স্নেহ-দৃষ্টির কাছে তাঁর একমাত্র সন্তানের গোপন ব্যথাটি সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল কিনা জানিনা। বাবা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন—পরে আস্তে আস্তে আমার পিঠে গভীর স্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—"সে কি হয় মা? আমি আমার নিজের সুখের জন্যে তোকে আমার কাছে রেখে দেব চিরদিন? বুড়ো হ'চ্ছি। আর ক'দিনই বা বাঁচব বল্? মরবার আগে তোকে আমি সংসারী দেখে যেতে চাই যে, মা। হাজার হ'ক, মেয়েমানুষের একটা আশ্রয় চাই ত'। তোর বড় ভাইটিও যদি আজ বেঁচে থাকত তাহ'লে আর তোর বিয়ে দিতে চাইতাম না। তোকে কার আশ্রয়ে রেখে আমি চোখ বুঁজব, মা? অন্ততঃ আমার মুখের দিকে চেয়েও তুই বিয়েতে মত দে। তোর একটা ভাল বিয়ে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। তোর মা আজ বেঁচে নেই, মা। তিনি থাকলে আমার ভাবনার খানিকটা অংশ তিনি নিতেন। এমন ক'রে সব দায়িত্বই আমার উপরে পড়ত না তাহ'লে আজ।" ব'লতে ব'লতে বাবার গলার স্বর ভারী হয়ে এল। বুঝলাম বাবার মত বদলাবার নয়। তিনি বোধ হয় ভাবলেন বিয়ের পরে আমি আস্তে আস্তে পূর্বস্মৃতি ভুলে যেতে পারব। এবারেও বাবার ইচ্ছা জয়ী হ'ল। যদিও বুক ভেঙে যেতে লাগল তবু বিয়ে ক'রতে রাজী হ'লাম বাবার মুখ চেয়ে। ভাবলাম বাবা যদি সুখী হন, নিশ্চিন্ত হন, তবে আমার এ'তে আপত্তি ক'রবার কী অধিকার আছে? আমার ইহজীবনের সমস্ত সুখের আশায় জলাঞ্জলি ত' দিয়েছি আগেই। প্রাণপণে নিজের মনটাকে বাঁধতে চেষ্টা ক'রতে লাগলাম। যথাসময়ে দিনক্ষণ দেখে শুভ লগ্নে বিয়ের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হ'য়ে গেল। কিন্তু সেদিনও সারাক্ষণ তোমার সেই শেষদিনের বেদনাক্লিষ্ট মুখটি মনে পড়েছে। নিজের অন্তরে বারবার বিবেকদংশন অনুভব ক'রছিলাম—কে যেন আমার অন্তরের মধ্যে বলছিল—"পিতার প্রতি কর্তব্য ক'রতে গিয়ে নিজের প্রতি ক'রছ ঘোর অবিচার, আর আর একজনের প্রতি ক'রছ নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা।" জানিনা আমার বিয়ের খবরটা সাগরপারে তোমার কাছে পৌঁছেছিল কিনা।...বিয়ের মন্ত্র কিছুই আমার কানে যায়নি। শুভদৃষ্টির সময় চোখ তুলতে পারলাম না কিছুতেই। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল, আমি পড়ে গেলাম এইটুকু মনে আছে। তারপর কি হ'ল, কতক্ষণ আমি সেভাবে ছিলাম কিছুই জানিনা। যখন জ্ঞান হ'ল দেখলাম বাবা ব্যস্ত হ'য়ে আমার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন আমার মুখে। কে যেন আমার মাথার কাছে ব'সে আস্তে আস্তে আমার মাথায় বাতাস ক'রছে।···আত্মীয় বন্ধু যারা বিয়েতে এসেছিল সকলেই বলল—"অশোকার আমাদের কপাল ভাল। এমন রাজপুত্তুরের মত বর পেল।" আমার কপাল ভাল কি মন্দ সে বিচারের ভার রইল নির্মম বিধাতার উপরে। অত দুঃখেও কথাটা শুনে আমার হাসি পেয়েছিল সেদিন।···তারপর চিরদিনের আবাস পিতৃগৃহ ছেড়ে গেলাম স্বামীগৃহে। আমার স্বামী রংপুরে ডাক্তারি করেন। বিয়ের পরে ক'দিন শ্বশুর বাড়ীতে থেকে পরে সেখানেই গেলাম। বিয়ের রাত্রেই সংকল্প ক'রেছিলাম যে স্বামীকে ভালবাসতে না পারলেও ভাল স্ত্রী হ'তে চেষ্টা ক'রব—তাঁকে সেবাযত্ন ক'রতে কোনদিনই ত্রুটি ক'রব না সাধ্যমত। জানিনা তাঁকে সুখী ক'রতে পেরেছি কিনা। তবে এটুকু বলতে পারি যে ইচ্ছা ক'রে তাঁর মনে দুঃখ দিতে চাইনি কখনও আমার জ্ঞানমতে। এ'ক' বছর ধ'রে আমাকে প্রাণপণ

কী অভিনয়টাই যে ক'রতে হ'য়েছে বলতে পারিনা। যাক্‌—আমার বিবাহিত জীবনের একটি সুদীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন কাহিনী লিখ্‌বার সময় বা ইচ্ছা আমার নেই। আমি সুখী কি অসুখী সে বিচার এর পরে ক'রো তুমি। তবে এটুকু বলতে পারি যে স্বামীর কাছ থেকে অযাচিত অপর্য্যাপ্ত ভালোবাসায় আমি বঞ্চিত হইনি। তাঁর সেই অকুন্ঠিত দানের আমি মোটেই যোগ্য নই—তা'র মর্য্যাদাও আমি রাখ্‌তে পারিনি। এটিই আমার জ্বালা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার স্বামী যদি দুশ্চরিত্র হ'তেন বা আমার প্রতি তিনি যদি উদাসীন হতেন তাহ'লে তাঁকে ভালবাসতে না পারার দুঃখ আমার বুকে এম্‌নি ক'রে বাজ্‌ত না—তাহ'লে হয়ত' আমি মনের মধ্যে দিনরাত এম্‌নি ক'রে আত্মগ্লানির বৃশ্চিকজ্বালা অনুভব কর্‌তাম না। জানিনা তিনি আমার মনের কথা জানেন কিনা। কিন্তু কোনদিনই কোন প্রশ্নই তিনি করেননি আমায়। তাঁর কাছে এজন্যেও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে শ্রদ্ধাভক্তির চেয়ে আরও বেশী কিছু চায় যা' আমি তাঁকে দিতে পারিনি। আমার বিয়ের পরে বাবাকে যখন আমি প্রণাম ক'রলাম তিনি আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন—"সাবিত্রী সমান হ'ও মা।" এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাণী বোধহয় তাঁর মুখ থেকে সেদিন বেরুল না আমার জন্যে। আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমাদের দেশের সতীনারীদের কথা। স্বামীকে "কায়েন মনসা বাচা" ভালোবাস্‌তে হবে, ভক্তি কর্‌তে হবে—এই আমাদের শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বোধহয় মানুষের মনের খবর রাখ্‌তেন না। যাক্‌।... বাবার স্নেহের অন্তর্দৃষ্টির কাছে ধরা প'ড়ে গিয়েছিল আমার মনের গোপন ব্যথা—যা'কে আমি প্রাণপণে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছি সর্ব্বদা। তাই তিনি বড়ই বিমর্ষ হ'য়ে গিয়েছিলেন আমার বিয়ের পর থেকেই। দেখা হ'লে আমায় কতদিন তিনি বলেছেন—"মা জেদের বশে আমার একমাত্র সন্তানের জীবনটা নষ্ট ক'রে দিয়ে যে মহাপাপ ক'রেছি তা'র জন্যে নিজেকে আমি কোনও দিনও ক্ষমা ক'রতে পারব না। সেদিন যদি অজয়ের প্রস্তাবে সম্মত হ'তাম। সেদিন শুধু আমার নিজের দিকটাই দেখেছি, তোর মুখের দিকে চাইনি, মা। যে ভুল ক'রে ফেলেছি, তা'র ত' আর কোনও প্রতীকার নেই। আমার পাপেরও তাই প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমাকে পারিস্‌ ত' মা ক্ষমা করিস্‌।" ক্রমশঃ বাবার শরীর ভেঙে যেতে লাগ্‌ল। আমার বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই বাবা মারা গেলেন।...আমার যে কথা তোমাকে বলতে চেয়েছি, জানিনা ঠিক ক'রে তা' গুছিয়ে বলতে পেরেছি কিনা। যা' বলতে পারিনি তা' ও তুমি বুঝে নিতে পারবে, আশা করি।

বিদায় বেলায় এই চিঠিখানি লিখে না জানি তোমার মনে আবার কতখানি দুঃখ দিলাম। সেজন্যেও আমায় তুমি ক্ষমা ক'রো। শুনেছি তুমি নাকি আজও অবিবাহিত। তোমার বাবার হাজার পীড়াপীড়িতেও তুমি নাকি বিয়ে ক'রতে রাজী হওনি। অজয়দা', এক এক সময় আমার মনে হয় যে তুমি যদি বিয়ে ক'রে সংসারী হ'তে তাহ'লে হয়ত' আমার মনের জ্বালা কিছু কম্‌ত। জ্বালা কম্‌ত কি বাড়্‌ত কে জানে?...তোমার খবর মাঝে মাঝে পেতাম রংপুরে থাক্‌তে তোমার খুড়তুতো বোন রেণুর কাছ থেকে। সে বোধহয় আমার মনের কথা জানে। তাই নিজে থেকেই সে মাঝে মাঝে তোমার দু' একটা খবর দিত। তোমার গবেষণার কথা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পড়ি। গর্ব্বে আনন্দে তখন আমার বুকটা ফুলে ওঠে। ভালোবাসার যদি কোনও অধিকার থেকে থাকে ত' তোমার সৌভাগ্যে আনন্দিত হ'বার অধিকার হয়ত' আজও আছে আমার। এ অধিকার কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পারবে না। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, কামনা করি, আমার ছেলে অশোকও যেন বড় হ'য়ে তোমার আদর্শে গড়ে ওঠে। আশীর্ব্বাদ ক'রো সে যেন তোমারই মত কৃতী, বিদ্বান্‌, চরিত্রবান্‌, খ্যাতিমান্‌ হয়। নিজের সন্তানের এই সুখটুকু দেখে যেতে পারলাম না এই যা দুঃখ রইল। বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, অজয়দা'। এ জীবনের বোঝা আর যেন বইতে পার্‌ছি না। বিধি একদিনে বোধহয় প্রসন্ন হ'য়েছেন আমার উপরে। আমার মরণের দিন ঘনিয়ে আস্‌ছে। আস্‌ছে

জন্মে যেন তোমায় পাই। এই কামনা নিয়েই আমি এ জন্মের মত পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। বিধাতা আমার প্রাণের এই একাগ্র প্রার্থনা শুনবেন নাকি? আসছে জন্মটাও কি ব্যর্থ হবে এমন ক'রে?...আর লিখ্‌তে পারছি না। আর লিখবারও বিশেষ কিছু নেই। ক'দিন ধ'রে তোমায় এই চিঠিখানি লিখ্‌ছি, একটু একটু ক'রে।

মরবার আগে আর একজনের কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে যেতে হ'বে। তিনি হচ্ছেন আমার স্বামী। তাঁর কাছে ও তোমার কাছে আমি সমান অপরাধী। তিনি এখন এখানে নেই। ক'মাস থেকে আমি এখানে রয়েছি চেঞ্জের জন্যে। আমার স্বামী মাঝে মাঝে এসে এখানে থাকেন। কাজের জন্যে তাঁকে রংপুরেই থাক্‌তে হয়। তাঁকে শীগ্‌গির আস্‌তে লিখে দিলাম।...অজয়দা', আমার এ ব্যথার নির্ম্মাল্য গ্রহণ ক'রে আজ আমায় জন্মের মত বিদায় দাও। ক্ষমা ক'রো এ অভাগিনীকে। তোমাকে সে যত দুঃখ দিয়েছে তা'র চেয়ে বেশী দুঃখ হয়ত' সে নিজেই পেয়েছে। প্রণাম নিও। ইতি

হতভাগিনী অশোকা

৩

চিঠি পড়া কখন যে শেষ হ'য়ে গিয়েছে, শিথিল হাত থেকে কখন যে সেখানা মাটিতে প'ড়ে গিয়েছে ডাক্তার গাঙ্গুলী টেরও পাননি। হঠাৎ স্বপ্নলোকের মধ্যে থেকে যেন শুনতে পেলেন বেয়ারার কথা—সে বল্‌ছে—"খানা ঠিক্ হায়, হুজুর"। শুনে তিনি চম্‌কিয়ে উঠলেন। মাটির উপরকার চিঠিখানার দিকে চোখ পড়ল তাঁর। সমস্ত বুকটা আলোড়িত করে বেরিয়ে এল একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস। নিজেই সেই নিঃশ্বাসের শব্দে যেন চম্‌কিয়ে উঠ্‌লেন। বিস্ময়-বিমূঢ় বেয়ারাটার মুখের দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে একবার তাকালেন—তারপর যেন যন্ত্রচালিতের মত বলে গেলেন—"আজ হাম হাজ্‌রি নেহি খায়েঙ্গে। মেরী তবিয়ৎ আচ্ছী নেহি হ্যায়। আজ হাম্ কলেজমে ভি নেহি যায়েঙ্গে। ড্রাইভারকো বোল্ দেনা।" ব'লেই মাটি থেকে চিঠিখানা তুলে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে চল্‌লেন নিজের শয়ন-কক্ষের দিকে। বেয়ারাটা অবাক হ'য়ে সেইদিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

উষা বিশ্বাস

স্বপ্ন ভাঙিও না

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

নিত্য হেরি দেবতারে সুঠাম সুন্দর,
মানবের সুখ দুঃখে নহে নির্ব্বিকার,
ব্যথায় ব্যথিত চিত্ত স্নেহেতে অর্জ্জর,
অতল অতল তাঁর কৃপা পারাবার।

প্রতি মানবের মাঝে পেয়েছি সন্ধান
আত্মার সৌন্দর্য্য দ্যুতি পবিত্র দর্শন,
জীবন সংগ্রাম নহে মিলনের গান
স্বার্থ-দ্বেষ হিংসা-লেশ শূন্য এ ভুবন।

হয়ত ভুলেছি ভুল, কতটুকু জানি!
কল্পনা ভুলায়েনা স্মৃতি কি যে কথা কহে,
ভাঙিও না বন্ধু প্রিয় মোর স্বপ্নখানি
এ জীবন স্বপ্ন চেয়ে দীর্ঘতর নহে।

শাশ্বতী বাণী

অধ্যাপক—শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী এম্-এ

আদিম মানব যুগ-শৈশবে
তুলে আধো আধো বাণী,—
কার সাড়া লাগি' কান খাড়া রাখি'
চেয়ে থাকে যোড়-পাণি।
গ্রহে গ্রহে ছুটে অপরূপ গান,—
ফেনিলোচ্ছ্বাসে ছলছল তান,—
গিরি ভাঙে গড়ে, উড়ে যায় চাঁদ,—
অবাক্ হৃদয় মানি'।
কত শ্বাপদের সঙ্গে যুদ্ধ,
প্রেমে কত কোলাকুলি,
কত নব ভাব,—গত কত যুগ।
বিকাশ লভিল বুলী
কাজে ও কথায় লাগিল দ্বন্দ্ব
যুগ-যৌবনে,—কত না ছন্দ।
কত না বিষাদ—কত আনন্দ
করিল সে হানাহানি।
কর্ণে তাহার ঝরিল তখন
কাহার হর্ষবাণী?
কত বিজ্ঞান—কত সাহিত্য—
কত না আবিষ্কার।
জল স্থল মরু আকাশ বাতাস
হয়ে গেল একাকার।
"ভয় নাই, ওরে, ভয় নাই, বীর।"—
ডাকে উত্তর দক্ষিণ মেরু।

গভীর বারিধি—হিমানী শৃঙ্গ—
দিল তারে হাতছানি।
কর্ণে তাহার ঝরিল তখন
কাহার সাহসবাণী?
অন্তিম নর জরদ্-যুগের
অন্তে দাঁড়াবে যবে,
প্রলয়ের রোল শুনি' চারিধারে
একাকী ব্যাকুল হবে।
খ'সে পড়ে তারা, ধ'সে পড়ে গিরি,
ফেটে যায় রবি,—নভো-বুক চিরি'
ছুটে লেলিহান বহ্নির স্রোত
প্রলয়ের মেঘ টানি'।
কর্ণে তখন ঝরিবে তাহার
কাহার অভয় বাণী?
তখন তাহার শেষ নিমেষের
একটি আর্ত্তরবে
রবে মানবের বাণীর প্রতিভূ
অসীমের উৎসবে।—
সেই বাণী বুঝি নূতন রূপে
বীজের আকারে গানে ও গল্পে
আবার নূতন লভিবে বিকাশ
কখন কেমনে জানি।
প্রণাম তোমায় শাশ্বতী বাণী
সৃষ্টি-কমল-রাণী।

অনুধাবন

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

(একাঙ্ক নাটিকা)

[গড়ের মাঠ। ফাল্গুন মাসের বিকাল প্রায় ছটা। পশ্চিম আকাশে বড় রাঙা রবির রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। দূর থেকে একজন যুবক একাগ্রমনে সূর্য্যাস্ত দেখছিল। মুখেচোখে তার শিল্পীর বিস্ময়। দেখলেই মনে হয়, একটা করুণ চিন্তার ছায়া পড়েছে অথচ চোখ দুটির মধ্যে আছে দৃঢ় সঙ্কল্পের জ্যোতি। সুপুরুষ কিন্তু তা' ধনীর ভোগপুষ্ট সৌন্দর্য্য নয়। সহসা চোখ ফেরাতেই কণী দেখতে পেল, স্মৃতি খুব কাছে এসে পড়েছে। আড়ালে পা ঢাকা দেবার আগেই স্মৃতি কথা বললে।]

স্মৃতি। এখানে কি খবর, হাওয়া খেতে নাকি?

কণী। গড়ের মাঠের মাঝখানে কোন ত' রসগোল্লার দোকান দেখচি না যে ধরে নেব, তুমি রসগোল্লা খেতে এখানে এসেচ?

স্মৃতি। তার মানে?

কণী। খুবই সহজ। একবার নারী-প্রগতির এক মহিলা-পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আচ্ছা, আপনারা ত' প্রগতি-প্রগতি বলে দেশটাকে খুব মাতিয়ে তুলেচেন, কিন্তু আপনারা চান কি? আজকালকার মেয়েদের জীবনে প্রধান কাম্য কি? তিনি একটু মুচকে হেসে জবাব দিয়েছিলেন, আজকালকার মেয়েরা রসগোল্লা খেতে খুব ভালবাসে। এই আমাদের জীবনের প্রধান কামনা। তাই, আমি ভাবলুম, তোমার মত অতি-আধুনিক মহিলা বুঝি রসগোল্লা খাবার ব্যগ্রতায় আজ ভুলে গড়ের মাঠে এসে পড়েচে।

স্মৃতি। (জোরে হেসে) ও, মনে পড়েচে, বাবাঃ, এত কথাও তোমার মনে থাকে। ও ত' আমি একদিন আমাদের ক্লাসের এক কবিকে বলেছিলুম। তার হয়ে খুব প্রতিশোধটা নিলে যাহোক।

কণী। প্রতিশোধ! তাই বটে। (চাপা, ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর মনে মনে বললে, আঃ, একটা মাত্র শব্দে এতটা উত্তেজনা প্রকাশ করা ভাল হয়নি। আজ নিজেকে চেপে রাখতেই হবে।)

স্মৃতি। (একটু থেমে) আচ্ছা কণ, তোমায় যেন আজ একটু বিমর্ষ দেখাচ্চে কেন?

কণী। বিমর্ষ? কই তার কোন ত' কারণ খুঁজে পাচ্ছিনা। বরং আমি বেশ ফূর্ত্তিতেই আছি মনে হচ্ছে। এমন ঝির-ঝিরে বাতাস আর পশ্চিম আকাশে রাঙা রবির করুণ মূর্ত্তি,—এর মাঝখানে বিমর্ষ?

স্মৃতি। কণ, তোমার মতন যারা ছবি আঁকে, সুন্দর দৃশ্যই কি কেবল তাদের চোখে পড়ে,—সুমিষ্ট ধ্বনি শোনবার কান কি তাদের থাকে না? কান পেতে একবার শোন দিকিন, দূরে গাছে গাছে পাখীরা কি মাতামাতি লাগিয়েচে। তাদের কাকলি কি মিষ্টি! আর তুমি অস্তগামী সূর্য্য নিয়েই গদ-গদ। আমি কিন্তু সূর্য্যের এই নিস্প্রভ, ম্লানমূর্ত্তির দিকে চাইতেও পারি না। মনে মমতা হয়। কত বড় পরাজয় বল দিকি, দুপুরে যার অত প্রচণ্ড তেজ, সন্ধ্যা এসে তাকেই কিনা এম্নি কাবু করে ফেলে!

কণী। আমি কিন্তু ভাবি ঠিক উলটো। অস্তগামী রবির ঐ মূর্ত্তি ত' ম্লান নয়। ও যেন আশা ও সঙ্কল্পে দৃঢ়। চেয়ে দেখ দিকি, অন্ধকারের নাগপাশ কেটে নূতন ঊষায় নতুন তেজে প্রকাশ হবার জন্যে কি প্রাণপণ সঙ্কল্প ওর মুখের রেখায় রেখায় রয়েচে। তাইত আমার এত ভাল লাগে। তুমি ত' ওর ও মূর্ত্তি দেখতে পাবে না। তোমার জীবনে কখন অস্তই এল না। গরীবের ছেলে, জীবনের সঙ্গে পদে পদে

হাতাহাতি করে আমায় বাঁচতে হয়েচে। কতবার কত ঝড় জীবনের সব কিছু ওলট্‌-পালট্‌ করে দিয়ে গেচে। কিন্তু তবু পরাজয় মানিনি। সেই দুর্য্যোগে প্রত্যেকবার কে আমায় বাঁচিয়েচে জান,—এই সূর্য্যাস্তের স্মৃতি। তুমি হাসচ, হাসো। কিন্তু একথা ঠিক, পরাজয় কখন মানব না জীবনে,—যত আঘাত, যত বাধাই আসুক না কেন। জানো, মানুষের জীবনে পরাজয়ের আঘাতই তার সম্পদ, তার গৌরব! (মুখ ফিরিয়ে নিলে।)

স্মৃতি। (স্বগতঃ, ওর চোখ ছল-ছল করে উঠল কেন, আশ্চর্য্য!) থাক, থাক, তোমার জীবন-তত্ত্ব। আমি হাসছিলুম অন্য কারণে। তবু ভাল আমার নামটা যে ভাবেই হোক একবার উচ্চারণ করেচ। আমি যতই করচি ফণ্‌-ফণ্‌, তুমি ততই এমন ভাবটা দেখাচ্ছিলে যেন আমার নামটা তোমার ভাদ্র-বৌয়ের,—মনে মনেও উচ্চারণ করতে নেই।

ফণী। তোমার নাম আবার কখন করলুম!

স্মৃতি। কেন, এইত বল্লে সূর্য্যাস্তের স্মৃতি।

ফণী। (খুব জোরে হেসে) ও হো-হো। একটা গল্প মনে পড়ল। একজন একবার—

স্মৃতি। (সহসা) ফণ্‌, চল, আমরা ঐ গাছটার আড়ালে বেঞ্চে বসিগে। এখানে বড় চোখের ভীড়। লোকগুলো কেমন করে চাইচে দেখ?

ফণী। (উত্তেজিত ভাবে) ঐ ত' তোমাদের দোষ। যতই কেননা, অতি-আধুনিকতার নতুন পোষাক পরো, তবু তার ভেতর থেকে আদ্যিকালের কুঁজো বুড়ি উঁকি মারবেই মারবে। কেন, লোকগুলো একটু চেয়েচে ত' তোমার ক্ষতি হয়েচে কি?

স্মৃতি। কি আমার অতি-আধুনিক পুরুষসিংহরে! আমাকে অবলা পেয়ে অত যে বড়াই দেখাচ্চো, একটা কাজ করতে বললে পারবে তুমি? অথচ তেমন কাজ অতি-আধুনিক পুরুষরা কেউই করতে দ্বিধা করেনা।

ফণী। অতি-আধুনিক পুরুষসিংহ বলতে তুমি কি বুঝচ জানিনা, কিন্তু একথা আমি বলতে পারি, কোন রকম সংস্কারের সঙ্কোচ আমার মনে নেই।

স্মৃতি। আচ্ছা, পরীক্ষা দাও।

ফণী। বল।

স্মৃতি। (একটু হেসে) এই আমি চোখ বুজলুম, এদের সকলের সামনে একটা চুমু খাও দিকিন।

ফণী। (অভিভাবকের সুরে) স্মৃতি!

স্মৃতি। (খুব জোরে হেসে) এই দেখো, জোর করে কেমন আমার নাম বলিয়ে নিলুম। পুরুষের শপথ নেওয়া আর শ্রাবণ মাসে রোদ্দুর ওঠা একই কথা।

[গাছের আড়ালে বেঞ্চে দুজনে বসল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। দূরে লোক চলাচল করচে। স্মৃতি ফণীর বাঁ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলে। তারপর কথা বললে।]

স্মৃতি। ফণ্‌, কতদিন পরে আবার দেখা হল বলত? সেই যেদিন তুমি তর্ক করতে করতে রাগ ক'রে চলে গেলে, সে প্রায় মাস দুই হয়ে গেল।

ফণী। রাগ ক'রে কি রকম? রাগ আমি একটুও করিনি। সেদিন শুধু সত্যি করে বুঝতে পেরেছিলুম, তোমার সঙ্গে আমার কোনখানেই মিল নেই,—না প্রকৃতির, না-বা রুচির অথচ—

স্মৃতি। অথচ, একদিন ভাবতে বাংলাদেশে আমার মতন অসাধারণ মেয়ে মেলে খুব কম।

ফণী। সে ভুল আমার সেদিন ভেঙে গেচে।

স্মৃতি। (জোরে হেসে ক্ষিপ্র-কণ্ঠে) তাই নাকি?—(একটু ভাববার ভাণ করে) আচ্ছা, এ দুমাসে তোমার জীবনে কি কোন পরিবর্ত্তন আসেনি?

ফণী। মোটেই না। বরং আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, একঘেয়ে, একঘেয়ে, মামুলি, বৈচিত্র্যহীন দিনের পর দিন নিয়ে।

স্মৃতি। এর মধ্যে কোন নতুন ঘটনা ঘটেনি? ভাল বা মন্দ কোন খবর কানে আসেনি?

ফণী। রোস, মনে করি। (ভাববার ভাণ করা।)

স্মৃতি। (স্বগতঃ, এবার কোথায় যাবে বাছাধন? স্বীকার করতেই হবে যে। কি দুষ্টু ছেলে বাবা। কথাটাকে কেবল এড়িয়ে যাচ্ছে।)

ফণী। হাঁ, একটা খবর তোমায় দিতে ভুলে গেছলুম। ধীরেনবাবু চিঠি লিখেচেন, কোথাকার রাণা নাকি আমার

"শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রথম দৃষ্টি" নামের ছবিখানা দশহাজার টাকায় কিনতে রাজি হয়েচেন। হ্যাঁ, আর্থিক দিক থেকে এ একটা সুখবর বটে, জানত' স্মৃতি, বেশ একটু টানাটানি করেই গত ক'বছর আমাকে দিন কাটাতে হচ্চে।

স্মৃতি। (স্বগতঃ, চুলোয় যাক অমন সুখবর। আচ্ছা, তুমি যদি নিজে সুরু না কর, অন্ততঃ জোর করে তোমায় সুরু করানর একটা আনন্দত' আছে। দেখি, কতক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে পার!) (একটু অন্যমনস্ক-ভাবে) আমার জীবনে কিন্তু এই দুমাসে একটা মস্তবড় দুর্ঘটনা ঘটে গেচে।

ফণী। (নিরাসক্তভাবে) তাই নাকি?

স্মৃতি। কি তা নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করচে?

ফণী। জানতে ইচ্ছে করা অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু বলতে যদি কিছু বাধা থাকে ত' না-হয় নাই বললে।

স্মৃতি। না, তেমন বাধা আর কি? (একটু দ্বিধার পর কৃত্রিম, অস্বাভাবিক কণ্ঠে) শোননি, আমার বিয়ের যে ঠিক হয়ে গেচে। (দুই ঠোঁটের মধ্যে এককালি হাসি)।

ফণী। (স্বগতঃ, কিছুতেই ছাড়ান নেই। কথাটা যতই এড়িয়ে যেতে চাচ্চি!) হ্যাঁ, কথাটা আভাসে শুনেছিলুম বটে। ব্যারিষ্টর গিরীনবাবুর সঙ্গে না? মনে করেছিলুম, কথাটা পাকাপাকি হয়ে গেলেই তোমাদের অভিনন্দন জানিয়ে আসব।

স্মৃতি। পাকাপাকি হয়ে গেলে কি রকম? আসছে ২৯শে ত' দিন ঠিক হয়ে গেচে। মাঝে কেবল আটদিন সময়।

ফণী। (সঙ্গে-সঙ্গেই কৃত্রিমকণ্ঠে) তাই নাকি? তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্চি, স্মৃতি দেবী। বাস্তবিক, আমার আজ খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমাকে যোগ্য আসন থেকে জীবনযুদ্ধ করতে দেখার মত শুভ খবর আমার পক্ষে আর কি হতে পারে?

স্মৃতি। আমার একটা গল্প মনে পড়ল ফণ্। এক বোষ্টমীকে গোখ্রো সাপে কামড়েছিল। সে যখন বিষের জ্বালায় মর-মর, তখন তার গোঁসাই এসে বললে, ভাবিসনি, একেবারে কাঠ-মল্লুক ঢুকেচে, তোর একটা সদ্‌গতি হয়ে গেল বাছা।

ফণী। (একটু ভাববার পর নরমের সুরে) আমায় মাপ কর স্মৃতি, আমি ভাবতে পারিনি যে তুমি এতে অসুখী।

স্মৃতি। (বিস্মিত হয়ে) কিসে ফণ?

ফণী। এই গিরীনবাবুর সঙ্গে বিয়েতে।

স্মৃতি। (জোরে হেসে) তাই নাকি? আমার অসুখী মনের গোপন খবর তুমি কোথা থেকে পেলে?

ফণী। কেন, তোমার গল্পে কি সেই ইঙ্গিতই নেই?

স্মৃতি। (স্বগতঃ, ওঃ, গল্পটা বড় অসাবধানে মুখ থেকে ঝরে পড়েচে ত'। এদিক থেকে আর একটা মানে হতে পারে বটে। কিন্তু এত সহজে হার মানবো,—তা'কি হয়!) (মুরব্বিয়ানার সুরে হেসে) ফণ্, তোমার আজকাল কি হয়েচে বলত? এত অন্যমনস্ক যে আমার গল্পটাও ভাল করে শোননি। গিরীনবাবুর মতন বিদ্বান, সুপুরুষ, পশারওলা ব্যারিষ্টর,—এরকম পাত্র বাংলাদেশে কটা মেলে যে তাকে পেয়ে হব অসুখী?

ফণী। (স্বগতঃ, গল্পটা সত্যিই ভাল করে শুনিনি নাকি?—একটু বিস্ময়ের সুরে) আমিত' তাই ভাবছিলুম, এও কি সম্ভব?

স্মৃতি। (একটু গম্ভীরভাবে) কিন্তু এ বিয়ে বোধ হয় হবেনা।

ফণী। তার মানে? এইত' তোমাদের আজকালকার মেয়েদের রোগ। হেঁয়ালি ছাড়া যেন কথা বলতেই জাননা।

স্মৃতি। স্পষ্ট ক'রে বললেও যে তোমরা বোঝ না ছাই।

ফণী। সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে শ্রোতার দোষ নেই, বক্তাই যত নষ্টের গোড়া।

স্মৃতি। আজকালকার পুরুষদের বিশেষত্ব হচ্ছে, নিজেদের দোষ কিছুতেই দেখতে না-পাওয়া।

ফণী। আর তোমাদের বিশেষত্ব হচ্ছে, নিজেদের দোষ দেখতে পেয়েও পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। (কৃত্রিম নিরাসক্তির সুরে) আচ্ছা, থাক ওকথা। যা বলতে যাচ্ছিলে একটু খুলেই বলনা।

স্মৃতি। খুলেই ত' বলতে চাই, কিন্তু শোনবার মত তোমার অবসর কোথা? (একটু থেমে) ফণ্, আজ আমি তোমার পরামর্শ চাই।

ফণী। যদি বলি নিছক অপহরণ ?

স্মৃতি। তাহলে বুঝব, অপহরণ নয় অভিনয়। কিন্তু আগে কথাটাই শোনত'। এ বিয়ে কিছুতেই হবেনা, বুঝেচ ?

ফণী। কেন, মনের মত সবই ত' পেয়েচ ?

স্মৃতি। সবই ত' পেয়েচি, তবু যে খুঁত রয়েচে।

ফণী। কি রকম ?

স্মৃতি। গিরীনবাবুর কাছে কি-কি পাওয়া যাবে, তাই আগে দেখা যাক। পয়লা নম্বর ধর অগাধ ঐশ্বর্য্য।

ফণী। বেশ। (স্বগতঃ, জীবনে ঐশ্বর্য্যের আসন সব চেয়ে কত বড় !)

স্মৃতি। দ্বিতীয় নম্বর রূপ।

ফণী। বেশ। (স্বগতঃ, রূপ চায় রূপ। নিজের অনন্যসাধারণ রূপের কথা স্মৃতি কি কখন ভুলতে পারে ?)

স্মৃতি। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে,—আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক, মনের মিলও আমাদের হয়েচে। কিন্তু—

ফণী। কিন্তু কি ?

স্মৃতি। সেদিন হঠাৎ আবিষ্কার করেচি, রুচির মিল মোটেই নেই। ভয় হয়, বিয়ের পর বনিবনা কিছুতেই হবে না। অথচ নিত্যকালের জন্যে দুজনে কেউ কারোকে আর ছাড়তে পারব না।

ফণী। রুচির মিল কিসে হলনা ?

স্মৃতি। তুমি বড্ড শুধ্‌নো শুধ্‌নো জেরা কচ্চ, ফণ্‌। ঠিক-ঠিক জবাব দেওয়া দুরূহ হয়ে উঠ্‌চে। ধর, রুচির মিল-প্রথমেই ধরা পড়ল বিয়ের রোমান্টিক ব্যাখ্যায়। জীবনে বিয়ের ব্যাপারটাকে গিরীনবাবু এত অসাধারণ করে রাঙিয়ে দেখেন যে ভয় হয়, বিয়ের দিন সাতেক পরে আমার রূপের মোহ যেদিন ওঁর ঘুচবে, সেদিন হয়ত ছেঁড়া কাপড়ের মতই ওর মন থেকে আমাকে ঝেড়ে ফেলে দেবেন। ফলে, গার্হস্থ্য-জীবনে খুঁটি-নাটি নিয়ে নিত্য হবে ঝগড়া আর বকা-বকাবকি। হিন্দু-বিয়ের আবার ডিভোর্স নেই !

ফণী। তোমার কথা মেনে নিতে পারলুম না, স্মৃতি।

স্মৃতি। জানি, ডিভোর্স কথাটাই যত গোল বাধিয়েচে। যাই বল, হিন্দু-বিয়ের মত অস্বাভাবিক, কৃত্রিম প্রথা আর নেই। মানুষের মন,—পরিবর্ত্তন আর বিচিত্রতাই তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একবার বিয়ে করলে ত' তার রক্ষে নেই। মনের সেই স্বাভাবিক ধর্ম্মকে চেপে মেরে কর একত্র বাস যতদিন না একজনের দেহ যায় পঞ্চভূতে মিশিয়ে। আশ্চর্য্য !

ফণী। তুমি আমায় অনেকবার ঠাট্টা করেচ, ভাবপ্রবণ ভাবুক বলে। কিন্তু, যাই বল, ডিভোর্স প্রথাটা হচ্চে, ও দেশের সভ্যতায় একটা মস্ত বড় পরাজয়ের গ্লানি। ডিভোর্স হাতে রেখে যখন মানুষ বিয়ে করে তার মানে কি এই নয় যে বিয়ের সময় পর্য্যন্ত তারা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি। এ বিয়ে না করলেই হয়।

স্মৃতি। সে কি ! বিয়ে না করলে সাধারণ মানুষের জীব-ধর্ম্ম মিটবে কেমন করে।

ফণী। সাধারণ মানুষের কথা সাধারণ মানুষরা ভাবুকগে যাক। তুমি কি এতদিন ধরে সাধারণ হবার সাধনা ক'রে এলে ?

স্মৃতি। কি রকম ?

ফণী। বিয়ের আগে যেখানে ভালবাসা জন্মাবার অবসর হলনা, তাকে বিয়ে বলিনা,—বলি, ব্যভিচার। কিন্তু, যেখানে সত্যিসত্যি দুই আত্মার হল মিতালি, সেখানে বিয়ের শুভ-লগ্নে দুজনে কি এই কথাই স্বীকার করে নিলে না যে নিত্যকালের জন্যে দুজনে পড়লুম বাঁধা। পরস্পরের জীবনকে পূর্ণতর করার জন্যে আজীবন করব সাধনা।

স্মৃতি। কিন্তু পরে যদি বনিবনা না হয় ?

ফণী। চিত্তে চিত্তে দ্বন্দ্ব ত' আছেই। খুঁটিনাটি নিয়ে মনোমালিন্য ত' হবেই। পরিবর্ত্তনশীল মানুষের মন নিয়ে অনেক কিছু কাঁটা ত' গজিয়ে উঠবেই। কিন্তু তাতে বিচ্ছেদ ঘটবে কেন ? বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যেই ত' জীবনের সত্যিকার আনন্দ। মুক্তির পথ বন্ধ করে পূর্ণবিশ্বাসে জীবনের অতল তলে যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলুম ত' বুকভরে ওর আনন্দ লুটে নেব কেমন করে ? যেখানে মুক্তির পথ খোলা, সেখানেই জাগে পদে-পদে সঙ্কোচ,—পদে-পদে হিসাব কোথায় আকাঙ্ক্ষা।

স্মৃতি। অদ্ভুত তোমার ব্যাখ্যা, ফণ। জীবনকে তুমি অত সিরিয়াস্‌ভাবে দেখ কেন বলত ?

ফণী। জীবনকে যারা চেনে, তারা সিরিয়াস্‌ভাবে না নিয়ে থাকতে পারেনা। তোমরা চিনতে পারনা, তাই এই শিথিলতা। আধুনিক মেয়েদের এইখানেই হয়েচে গলদ। পুরোতন দিনের মত তোমাদের দৃষ্টি আজো আছে সঙ্কীর্ণ,—ক্ষীণ, কিন্তু ওদেশের সাহিত্য আর বিজ্ঞানের বইগুলো এনে দিয়েচে সেই ক্ষীণ দৃষ্টির ওপর জীবনের তীব্র আলোর বন্যা। তার প্রখরতায় তোমাদের দৃষ্টি গেচে অন্ধ হয়ে। তাই তোমরা জীবনের সত্যিকার রূপ,—এর গুরুত্ব অনুভব করতে পারনা। মনে হয়, এ বুঝিবা শুধুই ফাঁকি, সারাজীবন বুঝি শুধু ন্যাকামি করেই যাবে কেটে।

স্মৃতি। আজকালকার মেয়েদের নিয়ে ত তুমি খুব সস্তায় যত পারচ সাধারণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করচ। কিন্তু জীবনে ক'জনের সঙ্গে মিশেচ শুনি ?

ফণী। Typeকে বোঝার জন্যে অনেক সময় এক জনের সঙ্গই পর্য্যাপ্ত।

স্মৃতি। সে ত' সম্ভব হয়, যখন দুজনের মধ্যে ঘটে গভীর ভালবাসা। আচ্ছা, সোজা করে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। কোন মেয়েকে সত্যি করে জীবনে কখন ভালবাসতে পেরেচ ?

ফণী। শুনে তোমার লাভ ?

স্মৃতি। কিছুই না, শুধু অলস ঔৎসুক্য।

ফণী। হুবহু মিলে যাচ্চে। শুধু অলস ঔৎসুক্য। জীবনের মুহূর্তগুলো কি এতই অকেজো,—এতই সস্তা ?

স্মৃতি। উত্তর দাও। কোন অসতর্ক মুহূর্তেও কি জীবনে কারোকে ভালবেসে ফেলনি ?

ফণী। আজকালকার মেয়েদের নিয়ে ত প্রেম করা চলেনা। চলে প্রণয়, চলে ন্যাকামি, চলে অভিনয়। তোমাদের অনুভূতি হয়ে গেচে এতই ফিকে,—এতই হাল্‌কা যে প্রেমের বিপুল সম্ভাবনার উপলব্ধি তোমরা কল্পনাও করতে পারনা।

স্মৃতি। আমরা মাটির মানুষ। আকাশ-কুসুমের ভুয়ো স্বপ্নে ভুলে থাকতে পারিনা বলেই তবু ঘর-সংসার পাততে পারি। আর বাংলাদেশের অতি-আধুনিক পুরুষ তোমরা, প্রেমের বিপুল সম্ভাবনার নেশায় এতই মশগুল যে জীবনে বিয়ে করার আর অবসরই পাওনা। বিয়ে করেননি কেন জিজ্ঞেস করলেই বল, এত কম আয়ে খাওয়াবো কি ? কিন্তু, একথা বোঝনা যে এদেশে শতকরা পঁচানব্বুইজনের আয় চিরকাল এম্নি ধারাই থাকবে।

ফণী। তুমি আমাকে ভুল বুঝেচ। আমার কথার গভীরতা তোমার বোধগম্য নয়। তাই করচ এই ভুল। যদি বলি, স্বপ্নই আমার সত্যিকার জীবন। তারপর একদিন আসবে এই অপূর্ণ জীবনকে পরিপূর্ণ করে সার্থকতার বিরাট আনন্দ। কিন্তু, তাই বলে এ জীবনে আমি নিরাশ হয়ে বসে নেই। এ জীবনেই যতটুকু পারি, ব্রহ্মাণ্ডের দিক-দিক থেকে লুটে নেব মধু। তাই, যা পেলুম না, তার আক্ষেপ আমাকে নিরাশ করতে পারেনা।

স্মৃতি। (খুব জোরে হেসে) কিন্তু এক্ষেত্রে আমার নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই যে। বিয়ে ত' আমার দিক থেকে ভাঙচে না,—ভাঙচে গিরীনবাবুর দিক থেকে।

ফণী। (সহসা উৎসুক ভাবে) কেন ?

স্মৃতি। তিনি আরো রূপসী গুণী মেয়ের মোহে আটকে পড়েচেন। (-গাম্ভীর্য্যের ভাণ) [কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। সূর্য্য ক্রমশঃ পশ্চিম দিগন্তে চলে পড়েচে। পৃথিবীর বুকের ওপর আব্‌ছায়া অন্ধকারের স্নেহাঞ্চল।]

ফণী। স্মৃতি !

স্মৃতি। কি ফণ্‌ ?

ফণী। (ধীরে ধীরে) জীবনে সত্যিই তাহলে আঘাত পেয়েচ ? আজ তোমার বড় দুর্দ্দিন।

স্মৃতি। তাইত' তোমার কাছে পরামর্শ করতে এসেচি ফণ্‌। কাল বিকালে দেখলুম, তুমি এখানে বেড়াতে এসেচ। একদৃষ্টে পশ্চিম দিকে কি যেন দেখছিলে। বাবা সঙ্গে ছিলেন, কাছে আসতে পারলুম না। আজ তাই ছল করে একাই চলে এসেচি।

ফণী। এখন কি করতে চাও ?

স্মৃতি। আশা ভেঙে গেলে যা মেয়েরা সকলেই করে। জীবনে বিতৃষ্ণা এসে পড়েচে। মনে করেচি, এবার

চাকরী নিয়ে মেয়ে-পড়ানোর কাজে লেগে যাব। ছোট্ট বোর্ডিং-এর সঙ্কীর্ণ আবহাওয়ায় নিজেকে একেবারে দেব লুপ্ত করে। জগতে আমি আছি আর আছে গভীর অবসাদ আমার সঙ্গী। হ্যাঁ, আজ সকালে একখানা চিঠি পেয়েচি, নারী-নিকেতনে আমার চাকরী মিলেচে।

[কিছুক্ষণ চুপচাপ।]

স্মৃতি। কি ভাবচো ফণ্‌?

ফণী। ভাবচি, এ হবেনা।

স্মৃতি। কি হবেনা?

ফণী। আঘাত যতই কেন না আসুক, জীবনের কাছে এত সহজে পরাজয় স্বীকার আমরা কিছুতেই করব না।— স্মৃতি পারবে?

স্মৃতি। কি ফণ্‌?

ফণী। (সহসা) কেন আমাদের ওপর ভগবানের এই অকারণ অত্যেচার! (কিছুক্ষণ ভেবে) কিন্তু হতাশ হলে চলবে না স্মৃতি। যাকে পেতে চাই, তাকে জয় করে নেব,—যত বাধাই আসুক না কেন? না, এম্নিভাবে মুহূর্ত্তের অবসাদে তোমার সারাজীবনকে বিসর্জ্জন দিতে পাবেনা, কখখনো নয়।

স্মৃতি। (অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে) তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়তে তাই করতে কি?

ফণী। নিশ্চয়ই! মনের জিনিষকে অধিকার করার চেষ্টাই ত সৃষ্টির গোড়ার কথা। আমি হলে তোমার মত অবসাদে ভেঙে না প'ড়ে জীবনের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতুম। ঈপ্সিতকে অধিকার করে তবে পেতুম বিশ্রাম।

স্মৃতি। (উত্তেজিত ভাবে) ভীরু, কাপুরুষ! তোমার মুখে একথা শোভা পায়না।

ফণী। (রাগতঃ ভাবে) কেন, জীবনে কোনদিন আমায় দেখেচ পরাজয়ের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে?

স্মৃতি। (বিদ্রূপের হাসি হেসে) মোটেই না। গিরীন বাবুর মতন সাধারণ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে হটে গিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটায়, তার মুখে একথা বাচালতা মাত্র।

ফণী। (সহসা উত্তেজিতভাবে) এই সন্ধ্যাবেলা নির্জ্জনে আগুন নিয়ে খেলা করা ভাল নয়, স্মৃতি। প্রলোভনের মায়ায় আমাকে আর উত্তেজিত করনা। মনে রেখ, মানুষের সংযমের আছে একটা সীমা। ও বুঝেচি, বিয়ে ভেঙে যাবার গল্প সবই তোমার তৈরি-করা মিথ্যা কথা। গিরীনবাবুকে আত্মসমর্পণ করার আগে আমার কামনার আগুনকে জাগিয়ে দিয়ে তুমি মানুষের মত আমাকে নিয়ে খেলা করতে চাও। সাফল্যের ভরপুর আনন্দে অন্ধ তুমি,—তাই আমার অন্তরের বেদনা আজ তোমার ক্রুর লীলাখেলার উপকরণ!

স্মৃতি। আত্মভোলা পুরুষের মনে কামনা জাগিয়ে দেওয়াইত' নারীর রমণীত্ব। সেই ত' তার ধর্ম্ম।

ফণী। (রাগে আত্মহারা হয়ে) ওঃ! তাই, এই নতুন নারীত্বের পূজারিণী তুমি, জীবনে চাও একাধিক পুরুষের সংসর্গ। তোমার লালসার ক্ষুধা কিছুতেই আর মেটেনা।

স্মৃতি। (দুহাতে মুখ ঢেকে) ছি-ছিঃ, তোমার মুখে এই কথা! (কেঁদে ফেললে) চারিদিকে এই লাঞ্ছনা আর ত' সহ্য হয়না। বাড়ীতে অত্যেচার, বাইরে এই লাঞ্ছনা,— যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর!

ফণী। (শান্তভাবে স্মৃতির হাতদুটো নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে) কিছু মনে করনা স্মৃতি, মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় আমি আত্মহারা হয়ে গেছলুম। যদি জানতে মাসখানেক ধরে আমার মনে কি ঝড় বইচে!

স্মৃতি। (ফণীর বুকে মুখ লুকিয়ে) আর যদি বুঝতে বিয়ে ঠিক হবার পর থেকে এই এক মাস কি ভাবে আমার কাটচে? মনোমত পাত্রের হাতে সঁপে দেবার জন্য অবাধ্য মেয়েকে শায়েস্তা করার কাজ বাপমাকে যে কত নিষ্ঠুর ক'রে তোলে,—তা যদি বুঝতে?

ফণী। (স্মৃতিকে বুকের ওপর চেপে ধরে) স্মৃতি, আমায় মাপ কর, আমি ভুল বুঝেছিলুম। কিন্তু আমাদের দুজনের যে কিছুতেই মিল নেই,—না রুচির, না-বা প্রকৃতির।

স্মৃতি। কতটুকুই বা আমরা পরস্পরকে জানতে পেরেচি? মানুষের প্রকৃতি কি এতই ফিকে? জীবন ভোর সেইত' হবে আমাদের সাধনা,—করব পরস্পরকে জানবার চেষ্টা। যেদিন পূর্ণভাবে জানতে পারব সেদিন সব অমিল যাবে লুপ্ত হয়ে।

[অতি-উৎসুক কে একজন পাশ দিয়ে হন-হন করে চলে গেল। কিন্তু সেদিকে এরা ভ্রূক্ষেপ করলে না। ফণীর চোখ দুটিতে অসীম আনন্দ। দুজনেই নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে—]

ফণী। স্মৃতি।

স্মৃতি। কি ফণ্‌?

ফণী। (মুখের কাছে স্মৃতির মুখ নিয়ে এসে) তোমার আশায় গিরীনবাবু হয়ত এখন তোমাদের বাড়ীতে অপেক্ষা করচেন। আর তুমি—

স্মৃতি। (বুকে শুয়ে শুয়ে) দুষ্টু! এই দুমাস ধরে যে চুপ করে বসে মজা দেখছিলে, ওরা যদি ধরে-বেঁধে গিরীনবাবুর হাতে আমায় সঁপে দিত! মাগো, সেকথা ভাবলেও যে—(স্মৃতির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।)

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

চীনের সাধনা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভারতের ন্যায় চীনও তাহার স্বর্ণযুগে ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে অদ্ভুত কৃতি সৃষ্টি করিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌরব ও উৎস পেরিক্লসের অধীনস্থ এথেন্সও চীনের মত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। চীনের ধর্ম্মও বিশ্বমনের অনুভূতিতে পর্য্যবসিত। চীনেরা এই বিশ্বাত্মাকে তাও বলে। এই তাও-ধর্ম্মই প্রাচীন চীনেরা সাধন করিত। ব্রাউনিংএর ভাষায় এই তাও-ধর্ম্মের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, নিখিল ভুবনে ভগবান ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত আছেন—কুঞ্জে কুঞ্জে ঈশ্বরের স্বর্গীয় জ্যোতি কিরণ দিতেছে। উপনিষদের ভাষায় "জগৎ ব্রহ্মময়; তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" চীন ও বৃহত্তর চীন বা জাপানের শিল্প ও সাহিত্য এই সাম্য ও অন্তর্দৃষ্টির ভাবে ভরপুর হইয়া অত্যুন্নত হইয়াছিল। সুতরাং প্রাচীন চীনের উজ্জ্বল সাধনার আলোচনায় আশা করি নব্য দেশগুলির বহু সমস্যার সমাধান সহজ হইবে।

আদিম কাল হইতে চীনের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল তাও। চীনের তাও ও ভারতের ব্রহ্ম প্রায় একার্থবাচক। জগৎ সৃষ্টির সময় এই বিশ্ব-তাও দুইভাগে বিভক্ত হইলেন: স্বর্গীয় তাও ও মর্ত্ত্য লোকের তাও। এই তাও-দর্শন চায় বহুত্বে একত্ব দৃষ্টি: এই বিভাগদ্বয় সুতরাং বাস্তব নহে কাল্পনিক ও বাহ্য। যদিও লাওজে এই তাও-ধর্ম্মের আচার্য্য ও প্রচারক ছিলেন তথাপি কন্‌ফুসিয়াসও এই প্রাচীন দর্শনের সদানুষ্ঠান করিতেন। কন্‌ফুসিয়াসের নীতি-দর্শন উত্তর চীনে এবং লাওজের আদর্শবাদ দক্ষিণ চীনে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই ঋষিযুগলের মতদ্বয় পরস্পর এত ঘনিষ্ঠভাবে প্রভাব বিস্তার ও বিজড়িত হইয়াছিল যে, উহা হইতে একটী নূতন প্রবাহের সৃষ্টি হইল। কোন মহৎ ব্যক্তির বিষয় বলিতে গেলে লোকে বলিত যে, তিনি কর্ম্মকালীন কন্‌ফুসিয়ান্ এবং বিশ্রাম সময়ে তাও-বাদী। তারপরে চীনে প্রবেশ করিলেন বুদ্ধদেব। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতি যখন হিমালয়ের উপর দিয়া চীনদেশ আলোকিত করিল তখন চীনাগণ ধ্যানের সময় বৌদ্ধ-পথানুবর্ত্তী হইয়া পড়িল। পরিশেষে তাও-ধর্ম্মের সারাংশ বৌদ্ধ-ধর্ম্মে মিলিত হইয়া এক অভিনবরূপ ধারণ করিল। এই নব ধর্ম্ম-সম্মিলনে কর্ম্মহীন বিশ্রামে ধ্যান ও সচ্চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্য সাধনার সমাবেশ হইল। অবসর আলস্যময় নহে সৃষ্টিমূলক। শারীরিক কর্ম্ম বন্ধ হইলে—মন-জগৎ বহির্জ্জগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করে তখনই অন্তর্জ্জগতের সৃষ্টিলীলার আরম্ভ হয়। লাওজে, কন্‌ফুসিয়াস ও বুদ্ধ এই তিন জন মহাপুরুষ চীন-জীবনের তিনজন শিক্ষক। চীন-জীবনে তাই তিক্ত, মিষ্ট ও লবণময় তিন প্রকার আস্বাদ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব অনুভব করিলেন জীবন দুঃখময়—তিনি এই দুঃখ হইতে শান্তির পথ আবিষ্কার করিলেন। কন্‌ফুসিয়াস্ বিশেষভাবে মানব-ব্যবহারের উন্নতি সাধনে তৎপর ছিলেন। মানুষ কিরূপে গৃহ, সমাজ, জাতির সহিত সংযোগ ও সাম্য রক্ষা করিতে পারে, এবং কিরূপে বর্ত্তমান সমাজ রাজনীতি ও ধর্ম্ম-নীতির সহায়ে অতীত ও সনাতন সমাজের সহিত সুর মিলাইয়া অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে—এই সমস্যা সমাধানে তিনি নিযুক্ত রহিলেন। আর লাওজে সাধন করিলেন ও শিক্ষা দিলেন কিরূপে মানুষের সহিত ঈশ্বরের, ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির, অণুর সহিত মহত্তের, সসীমের সহিত অসীমের মিলন সম্ভবপর।

পাশ্চাত্যের শিল্প ব্যক্তিত্ব ও বৈচিত্র্যের জনক প্রভৃতি

করিতে করিতে প্রাচ্যে উপস্থিত। পশ্চিমের এই শিল্পের জন্যই শিল্প এই মতবাদের মূলে আছে অহমিকা ও জড়-বাদের বীজ। পরিদৃশ্যমান জগৎ যদি বাস্তব না হয় তবে ইন্দ্রিয়-সুখ হইবে কিরূপে? তাই এই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎকে আঁকড়াইয়া থাকিতে পশ্চিমের আর্ট সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। চীনদেশে কিন্তু আবহমান কাল হইতে ইহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে। চীন সহজাত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝিয়াছিল যে, বহুত্বের—নানাত্বের পশ্চাতে একত্ব ও অদ্বৈত দর্শনেই সর্ব্ব শিল্পের জন্ম। পাশ্চাত্যে ধর্ম্ম ও শিল্পের আদর্শ ভীষণভাবে বিপথগামী। পার্থক্য ও বৈচিত্র্য, ব্যক্তিত্ব ও ব্যষ্টিত্ব ব্যতীত পশ্চিম ধর্ম্ম ও শিল্পের অন্য কোন রূপ দিতে পারে না। খ্রীষ্ট যে বলিলেন, প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়াই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা তাহা পাশ্চাত্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহাই ধর্ম্মের প্রকৃত মিশন। ধর্ম্মের হৃদয়-কন্দরেই ঐক্য ও সাম্যের প্রাণ নিহিত। সুতরাং একমাত্র ধর্ম্মই এই অমূল্য রত্নের সন্ধান দিতে পারে। কাজেই ধর্ম্মের সহিত যখন শিল্পের বিরোধ হয় বা শিল্প যখন ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার না করে তখনই শিল্প পথভ্রান্ত হয়। চীনে কিন্তু ধর্ম্ম ও শিল্প একাসনে অধিরূঢ় হইয়া চীনের সাধনায় এক অভূতপূর্ব্ব কৃষ্টির বিকাশ করিয়াছিল। চীনে শিল্প ও ধর্ম্ম সাধনার মধ্যে কোন অলঙ্ঘ্য প্রাচীর নাই। উভয়েই ভিক্ষুদের আলয় বিহারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাচীন চীনে শিল্প ছিল প্রয়োগমূলক ধর্ম্ম। (Applied Religion)

চীনদেশীয় শিল্পের জন্ম হয় *সৃষ্টিমূলক* স্বপ্নে। শিল্পী এই স্বর্গীয় স্বপ্নে আপনার অস্তিত্ব শিল্পের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরের যন্ত্র-স্বরূপ হন। লরেন্স বিনিয়ন (১) বলেন যে, জীবনের প্রত্যেক গতিতে ভগবানের সঙ্গীত-প্রকাশই চীন-শিল্পের উদ্দেশ্য। ওকাকুরা (২) বলেন যে, বস্তু-জগতের স্পন্দনের মধ্যে স্রষ্টার প্রাণ-স্পন্দন বিকাশ করাই চীন-শিল্পের সাধনা। চীনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী-কবি উ-তাও-শু এর তিরোভাব-গল্পে উহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। উ-তাও-শু রাজ-প্রাসাদের দেওয়ালে সম্রাটের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে একটি বিশাল চিত্র অঙ্কিত করিলেন। সম্রাট উহার সৌন্দর্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য দর্শনে অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। তখন উ-তাও-শু তাঁহার হস্ত-ধারণ করিলেন। চিত্রে একটি বৃহৎ গুহা দৃষ্টিগোচর হইল!! শিল্পী স্বষ্ট শিল্পের মধ্যে পদার্পণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন—তাঁহাকে আর ইহলোকে দেখা গেল না!!!

ইহার ভাবার্থ এই যে, শিল্পী ও শিল্প, স্রষ্টা ও সৃষ্টি পথিক ও পথ মূলতঃ এক ও অভিন্ন। ইহাই চীনের শিল্প-সাধনা। চীন-শিল্পের সাধনায় অন্তরের চক্ষু ও কর্ণ উন্মুক্ত হয় এবং শ্রবণ ও দর্শন-শক্তি সাম্য ও একত্ব দর্শনের যন্ত্ররূপে পরিণত হয়। তখন চক্ষুবান ও কর্ণবান মানুষের নিকট অন্তর্জগতের পরম পদার্থের যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর ও শ্রবণগোচর হয়। এল, আডাম্‌স্ বেক (৩) কোন ধ্যান-মগ্ন শিল্পীর মানস-চক্ষে একটি বৃক্ষের সূক্ষ্ম রূপ কিরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহার একটি অত্যাশ্চর্য্য বর্ণনা দিয়াছেন। "আমি বৃক্ষের বহিঃস্বরূপটি আর দেখিতে পাইলাম না। বৃক্ষের প্রতিবিম্ব মাত্র আমার আমার চক্ষুর সম্মুখে রহিল। সূর্য্য কিরণে যেমন কোন বস্তুর ছায়া পড়ে ইহা ঠিক তদ্রূপ। বৃক্ষের এই প্রতিবিম্ব জ্যোতির্ম্ময়। নির্ম্মল অথচ মধুর ও শীতল জ্যোতিঃ এই সূক্ষ্ম-রূপ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। ঐহিক বস্তুর ছায়ার ন্যায় উহা স্থির বা অন্ধকারময় নহে। জলমধ্যস্থ চারাগাছের সুনীল পাতার ন্যায় উহা নীলাভাযুক্ত। এই বৃক্ষের ঊর্দ্ধাংশ জলের ন্যায় সুশীতল জ্যোতির সহস্র রশ্মিদান করিতে লাগিল। এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সত্যই চর্ম্ম-চক্ষুর গোচর নহে। বাহিরের আলোক অন্ত-র্জ্যোতির আভাস মাত্র। সূক্ষ্ম ও স্থূল-আলোক মূলতঃ অভেদ। তবে যন্ত্র যতই সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ হয় ততই সেই যন্ত্রে বেশী আলোক প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর বৃক্ষরাজির সমষ্টি জীবন যেন আমার পরিজ্ঞাত হইল।" চীনের কবি ও শিল্পীগণ বস্তুনিচয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ লাভ করিয়া তদনুযায়ী চিন্তা ও কার্য্য করিতেন। তাঁহারা সঙ্কীর্ণ মানবীয় সম্বন্ধের ও ভেদের অতীত হইয়া বিশ্বের প্রাণ-তন্ত্রীতে সাম্যের সুমধুর সুর গাইতে জানিতেন। পাশ্চাত্য-শিল্প যেমন সমাজ

(nudism) বা লিঙ্গবোধ (sex) সাধনার পারদর্শী-চীন-শিল্প-ঠিক উক্ত বিষয়ে তদ্রূপ অনভিজ্ঞ। জীবনের সহিত জীবনের—ক্ষুদ্র জীবনের সহিত বিরাট জীবনের—যোগস্থাপনই চীনের প্রকৃত সাধনা। প্রাচীন চীন অনুভব করিয়াছিল জীবন-শিল্পই ধর্ম্ম।

জে, ডবলিউ, টি মাশনের (৪) মতে শুধু শিল্পে সাহিত্যে ও স্থাবর বস্তুতে নহে, জীব-জগতের সহিত ব্যবহার বা যোগাযোগেও চীনের শিল্প সাধনা প্রকাশিত। সুন্দরের সাধনাই চীনের জীবন-ধর্ম্ম। চীনদেশীয় ধর্ম্মানুযায়ী ঈশ্বর স্বীয় আকৃতি ও স্বভাবানুযায়ী মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং যে মানুষ স্বীয় আত্মার অন্তরে দেবত্ব দর্শন করে তিনি স্রষ্টার সৃষ্টি-লীলায় বা স্থিতি, ও সংহার কর্ম্মে সহযোগীরূপে চালিত হয়। চীন-ধর্ম্মের দুই অংশ প্রকৃতি-পূজা ও ঋষি-উপাসনা তাহার শিল্পে প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক্তার র‍্যাল্‌ক্‌ শোকমান (৫) বলেন প্রকৃত শিল্পীর বৈশিষ্ট্য এই: "কোন কিছুর মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ না করিয়া নিজের মধ্য দিয়া তিনি পরমার্থ বস্তুর প্রকাশ করিবেন। বিথোভেন অশ্রুত-সঙ্গীত শ্রবণে নিজেকে প্রকাশ না করিয়া এই শব্দহীন সঙ্গীত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।" চীন-শিল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ধর্ম্ম ও দর্শনের পরমার্থ-সত্যগুলি ফুটিয়ে তোলা। চীন ভাগবত-শিল্পের সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিল।

মানব ও প্রকৃতির স্বর্গীয় মিলনের প্রতীকরূপে চীনে শিল্পের উৎকর্ষ হয়। শিল্প ও ধর্ম্মের আদর্শই এই একত্ব। উভয়ের সাধনায় সাধক সত্য, শিব ও সুন্দরের সহিত একীভূত হয়। কবি কীটস্‌ যেমন বলিয়াছেন "আমি চক্ষুতেই বাস করি।" শিল্পী একটী 'দৃষ্টি'মাত্রে পরিণত হয়। চীনের একটী প্রবাদে আছে, যে মন জলের মতন সব কিছু গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের প্রতিবিম্ব প্রদান করে তাহাই প্রকৃত গ্রহণশীল মন। চীনের শিল্পে আধিভৌতিক এমন কিছু নাই যাহা তাহার ধর্ম্মে ছিলনা। চীনের এই সত্য ও সুন্দরের সাধক এবং অরণ্য ও পর্ব্বতবাসী শিল্পীগণের নিকট নদী ও পর্ব্বত, আকাশ ও সমুদ্র, উপবন ও উদ্যান স্বর্গের আকার ধারণ করিত কারণ এই সকলের মধ্যে তাহারা ঈশ্বরের সামীপ্য অনুভব করিত।

৮ম হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাং ও শাং রাজবংশের অভ্যুদয়ের সময় চীনের গৌরবময় যুগের চরমোন্নতি হইয়াছিল। সম্রাট তাই শাং বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের বিরোধের স্পর্শে আসিতেন না। তাহার রাজধানী নেষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টান্‌, মানিকেরিয়ান এবং মুসলমানদিগের নিকট সমানভাবে উন্মুক্ত ছিল। ৬৩৫ খ্রীঃ সিরিয়া দেশীয় সাধু ওলোপুন কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্ম তথায় প্রথম প্রচারিত হয়। সেই সময় তাহার যশ ও সম্পদে আকৃষ্ট হইয়া ভারত, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি নানা দেশ হইতে দৌত্য আসিতে লাগিল। ৬৪০ খ্রীঃ গ্রীক রাজদূত চীনের রাজদরবারে হাজির হয়। পারস্যের মুসলমান রাজশক্তির প্রথম খালিফগণ ওমর ও ওথমান, এবং কোরিয়া ও জাপান প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশসমূহ হইতেও রাজদূত উপস্থিত হইল। চীন দেশীয় অর্ণবপোত পারস্য উপসাগর অবধি যাতায়াত করিত এবং অন্যদিকে শত শত আরব বণিকগণ চীনের উপকূলে বসবাস আরম্ভ করিল।

ক্র্যানমার বিয়াং সাহেব বলেন (৬) শিল্প ও ধর্ম্মশীলতা ও শিল্পের অন্যান্য পারমার্থিক উৎস লইয়া চীন শতাব্দীর পর শতাব্দী উন্নত ছিল। চীনে দেশ ও সমাজ শাসন ও জীবন নির্ব্বাহের প্রধান গতি আধ্যাত্মিক আদর্শ কর্ত্তৃক নিয়মিত হইত। পশ্চিমে তাই চীন শব্দটীর অর্থ জনসাধারণের নিকট ছিল "উপকারিতা"—যে উপকারিতার পরিণতি হয়ে সৌন্দর্য্যে। কিন্তু চীনেরা উহা অন্যভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা বলে—"পৃথিবী স্বর্গের ডাকে সাড়া দিবার পূর্ব্বে স্বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসিবে। কারণ পৃথিবীই স্বর্গের পাদপীঠ।"

হুগ কশেট (৭) বলেন যে "সমস্ত উন্নত শিল্পের আবেদন কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের প্রতি পৃথকভাবে নহে—উহা সমগ্র হৃদয়কে পূর্ণভাবে উদ্বেলিত করিবে। প্রকৃতির বেদীতে সমষ্টির উপাসনাই শিল্পের ধর্ম্ম। চীনে জাতীয়ভাব হইতে শিল্প কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। যে জীবনধারা চীনে পরিপক্ক হইয়াছিল তাহাকে মানবীয় অভিজ্ঞতার

একটী পূর্ণ প্রস্ফুটিত কুসুম বলা যাইতে পারে।" রাজনীতিজ্ঞ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, ভিক্ষু সকলেই আধ্যাত্মিক রাজ্যের সমানাধিকার উপভোগ করিত। পরস্পরের ভিতর প্রেম, প্রীতি ও সহযোগের বন্ধন অতি দৃঢ় ছিল এবং একের মধ্যে একাধিকের কার্য্য সন্নিবিষ্ট থাকিত। প্রথমে কয়েকটী প্রধান শহরেই চীনের কৃষ্টি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—পরে সমস্ত চীন-জাতি উহা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ ও আয়ত্ত করে।

চীনে ধর্ম্মই ছিল শিক্ষা, শিল্প, ও রাজনীতির মূলভিত্তি। কারণ অন্য যে কোন ভাব অপেক্ষা ধর্ম্ম-ভাবই অধিকতর প্রশস্ত এবং জাতীয় কৃষ্টি যে সকল আকারে পুঞ্জীভূত হয় তন্মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠতম। সত্যের প্রতি সমগ্র জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের নামই ধর্ম্ম। কবিতা, চিত্রাঙ্কণ ও হস্তলিপি এই তিনটীই চীনে এক ক্যানভাসের উপর মিলিত হইত। বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ পর্ব্বতশিখরস্থ উদ্যান-বেষ্টিত মন্দিরের কক্ষে বাস করিয়া শিল্প সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। চীনে তাই ধর্ম্ম হইতে শিল্পকে পৃথক করা এক প্রকার অসম্ভব। জীবন ও সত্যের ত্রিবিধ অনুশীলন শিল্প, সঙ্গীত ও কবিতায় হইত। লরেন্স বিনিয়ন (১) বলেন যে, "শিল্প জীবনের একটী অনাবশ্যক বস্তু বা অংশ নহে। উহা বাস্তবেরও দ্বিতীয় সংস্করণ নহে। উহা আদর্শ-জীবনের এক প্রকার সাধনা। সাম্য যাহাই হউক না কেন উহা জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। জীবনের কৌশল বা প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বোধ হয় এই সাম্যে।" শিল্প সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম বা সৌন্দর্য্য-যোগ। ওকাকুরা (২) বলেন যে, "সৌন্দর্য্যের মোহিনী-স্পর্শে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলি উন্মুক্ত হয়। অন্তরের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়। মন মনের সহিত আলাপ করে। আমরা তখন অশ্রুতনাদ—অনাহতধ্বনি শ্রবণ করি। অদৃষ্টের দর্শন তখন লাভ হয়।"

চীন-শিল্পের আদর্শানুযায়ী প্রকৃতির সহিত মানব-সঙ্গীতের সুর-মিলন আবশ্যক। ভ্যান এলাষ্ট সাহেব (৮) বলেন, "৩৬৬ দিনে বৎসর হয় বলিয়া চীন দেশের বাদ্যযন্ত্রের দৈর্ঘ্য ৩·৬৬ ফুট। পঞ্চভূতের অনুযায়ী ৫টী তার আছে। যন্ত্রের ঊর্দ্ধাংশ নভোমণ্ডলের মত গোলাকার এবং নিম্নাংশ পৃথিবীর ন্যায় সমতল। ১২টী মাসের জন্য ১২টী ষ্টাড্ আছে। চীনের সঙ্গীত বিশ্ব-সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি মাত্র। মানব-মনকে বিশ্ব-সঙ্গীতের আস্বাদ দান করাই তাহার আদর্শ। পর্ব্বত শিখরে, অরণ্য-কান্তারে, আকাশে বাতাসে এই সঙ্গীত সদাই গীত হইতেছে—কিন্তু তাহা আমাদের শ্রবণের অজ্ঞাত।" চীনের সঙ্গীত ধর্ম্মাদর্শের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। চীনে শিল্পের সহিত সঙ্গীতের অদ্ভুত সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। হস্তলিপির মধ্য দিয়া শিল্প ও সাহিত্যের চির-সৌহার্দ্দ্য। চীনভাষার শব্দগুলিকে লিখিত অপেক্ষা চিত্রিত বলিয়াই বেশী মনে হয়। চীনভাষার অক্ষরগুলিকে ভাবের চিত্রিতরূপ বলিলেই ঠিক হয়। শব্দগুলি চিন্তার চিত্রমাত্র। চিত্র শব্দটীর মৌলিক অর্থও তাই।

চীনের কবিকুলও অরূপ সত্যের সাধক। ভারতীয় ঋষিগণের মত তাহারাও মনে করেন বিশ্ব-শক্তি বাক্য মনের অতীত। দিবারাত্রি যখন সন্ধ্যার স্থির মুহূর্ত্তে অনন্তের আভাস দিতে থাকে—সেই কালাতীত সান্ত ও অনন্তের সন্ধিক্ষণে চীন-কবি দাঁড়াইয়া চিন্তাকে ভাষার রূপদান করে। সেই দুর্লভ সময়ে মানব যখন শরীরের সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমে মিলাইতে চায় তখন সৎ ও অদ্বৈতের অনুভূতিতে দুঃখ ও দৈন্য, শোক ও পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে মন মুক্তিলাভ করে। বৈচিত্র্যের পশ্চাতে একত্বের দর্শন লাভই চীনের সাধনার সিদ্ধি। য়োনা নোগুচী (৯) বলেন, "চীন ও জাপানের শিল্প কল্পনা বা আড়ম্বরের তৃষ্ণা মিটাইতে চায় না। অসীম সৌন্দর্য্যের দান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য, অরূপের রূপ-দর্শনে এই পার্থিব-সৌন্দর্য্য তুচ্ছ মনে হয়। সেই সৌন্দর্য্যেই অসীম ও সসীমের আলিঙ্গন দৃষ্ট হয়। এই

See (1) The Flight of the Dragon by Lauence Binyon.
(2) The Ideals of the East by K. Okakura.
(3) The Story of Oriental Philosophy by L. Adams Beck.
(4) The Creative East by J. W. T. Mason.
(5) Morals of Tomorrow by Dr. Ralph Sochman.
(6) The Vision of Asia by Cranmar Byng.
(7) The Proving of Psyche by Hugh Fausset.

(8) Chinese Music by Van Aalast.
(9) Spirit of Japanese Art by Yone Noguchi.

শিল্পী-ঋষিদের নিকট বাস্তব-জগতের মাপকাটি নগণ্য হয়। তাদের শিল্পে সসীম অপেক্ষা অসীমের মহিমাই বেশী প্রকাশিত হইত। সীমার মাঝে অসীমকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল তাদের আদর্শ। লরেন্স বিনিয়নের ভাষায় তাঁহারা ভাগবত ইঙ্গিত কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু, লতাপাতার মধ্যে সর্ব্বত্র দর্শন করিতেন। কোন বস্তু বা বিষয়েই অর্থ বা রূপ গ্রহণ করিতে তাঁহারা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। সৃষ্টির সামান্য দ্রব্য বা ব্যাপারে তাঁহারা স্রষ্টার প্রকাশ বুঝিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। চীন-শিল্পের এই বিশ্বজনীনতার ভাব অতীব প্রশংসার্হ। অচেতন পদার্থও তাহাদের নিকট সচেতন প্রতীয়মান হইত। মৃত্তিকা বা ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও অলঙ্কারে অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তির প্রকাশ দ্বারা তাঁহারা শিল্পের সাধন করিতেন। শিল্প সাধনায় পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সর্ব্বগতি ও শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল।

এমিল হোভলাক্ (১০) বলেন "চীন-শিল্পীদের চক্ষে ভাবই সর্ব্বস্ব-রূপ নহে। রূপ এই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য ভাব-প্রকাশের যন্ত্রমাত্র। শিল্পই চীন-জীবনের শ্রেষ্ঠ কুসুম।" ফ্রাঙ্ক বেকার (১১) বলেন, "শিল্প-সৃষ্টি বিশ্ব-জীবনের প্রতীক মাত্র। শিল্পী ভাবরাজ্যে বাস করেন। রূপের দ্বারা মানবকে সেই ভাবরাজ্যের স্পর্শদানই তাহার কর্ত্তব্য। শিল্প স্বর্গ হইতে মরধামের জন্য অমৃত আনয়ন করিতে প্রয়াসী।" অনুপ্রেরণা বা ভাবাবেশ ব্যতীত শিল্প-সাধনা নীরস ও নিষ্ফল। যে শিল্পী ভাবরাজ্যে যত বেশী বাস করিতে পারেন তাহার সৃষ্টি তত সুন্দর তাহার সাধনা তত সিদ্ধিপ্রদ।"

লি পো ও টু ফু নামক চীনের শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় ছিলেন পরিব্রাজক। টুফু একাকারে শিল্পী ও কবি ছিলেন এবং পদব্রজে, অশ্বপৃষ্ঠে ও নৌকাযোগে নদীবক্ষে অধিকাংশ সময় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। গৃহ, পুত্র, পরিবার ও সংসারের খবর রাখিতে তিনি পারিতেন না। তিনি বলেন প্রকৃতির লীলা-নিকেতনেই আমি জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ওয়েলসের কেল্টিক কবিদের সহিত চীন-কবিদের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। জল-প্রপাতের গরিমা, অরণ্যের মহিমা, কুসুমের সৌন্দর্য্যে তাঁহারা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইতেন। তাঁহাদের নিকট মানুষ ও জন্তুর প্রভেদ ছিলনা। কবি যাহা গান করেন—তিনি তাহাই হইয়া যান। একজন উদীয়মান কবি লি-পোর নিকট আসিয়া অনুরোধ জানাইলেন, "মহাশয়, আমাকে শিক্ষা দিন আমি কিরূপে একজন আদর্শ কবি হইতে পারি।" লি-পো তদুত্তরে বলিলেন "প্রথমে কবিতার নিয়মাদি শিক্ষা কর—পরে রচনা কালে উহা হইতে স্বাধীন হইয়া লিখিতে আরম্ভ কর।" নিয়মাদি জানার পর নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারিলে কবি কৃতকার্য্য হন।"

চীন দেশের ন্যায় অন্য কোন দেশে চিত্র ও কবিতার মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয় নাই। চীন দেশের কবিতা চিত্রের মতই দেখিতে সুন্দর আর চিত্র যেন কবিতার আর এক রূপ। টুফুর কবিতাগুলি ছবির মত স্থির জলে প্রতিবিম্বিত নিস্পন্দ বৃক্ষশাখার মত। চীনের শিল্প প্রাণবায়ুর দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। শক্তি ও বুদ্ধি জীবনের এই দুই প্রধান পদার্থের উৎকর্ষ সাধনা করিতে উহা সুনিপুণ। উ-তাও-শু এবং ওয়াং উই চীন জাতির দুই প্রধান শিল্পী। ঈশ্বরের প্রেম ও জ্ঞান মানবের অন্তরে নিহিত—উহার বিকাশ সাধন চীন-শিল্পের সাধনা। চীন দেশের কবিতায় এমন সুন্দর চিত্র আছে—যখন মন বস্তু-জগতের সীমা ছাড়িয়া ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। মন ধীর স্থির ও শান্ত হইয়া অনন্তের মাঝে বিলীন হয়। অসীমের আহ্বানে অধীর হইয়া চীনদেশের এক কবি গাইয়াছেন, "সম্মুখের ফটক দিয়া আমি মঠে প্রবেশ করিলাম। মঠাধ্যক্ষ আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া আসন গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। ধ্যানমগ্ন ভিক্ষুর পার্শ্বে বসিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। আমি দুনিয়ার জ্বালা যন্ত্রণা সব ভুলিয়া গেলাম। সেই গভীর নীরবতায় অনুভব করিলাম আমি ও ভিক্ষু এক। সেই অনির্ব্বচনীয় সাম্যের আনন্দে আমি আমার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিলাম। শুধু আমরা—সেই নীরবতা স্পর্শে উদ্যানের ফুলগুলিও স্পন্দহীন হইল। তখন আমার হৃদয়-পদ্মে পরম সত্যের সূর্য্য উদিত হইল।"

কবি পু-চু-ই গাহিয়াছেন, "আমার হৃদয়ে কোন দুঃখের স্থান নাই। বিশ্বদেবকে আমি সদাই আমার মনোমন্দিরে দর্শন করি। এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমি দিন গুণিতেছি কবে আমি বিশ্বদেবের মধ্যে নিজেকে চিরতরে বিলাইয়া অমর হইব।"

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

(10) China by M. Emile Hovelaque.
(11) Myth, Nature and Individual by Frank Baker.

চব্বিশ ঘণ্টায়

শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়

১

ছোটকাল থেকেই বিনয়ের জীবন বিচিত্র ও বিবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে নানা আঁকাবাঁকা পথে গিয়েছিল। গরীবের ছেলে, অথচ দুরাশার অন্ত ছিলনা, এবং মনে ছিল দুর্জ্জয় আত্মবিশ্বাস এবং অসম সাহস। দুঃখকে সে কোনো দিনই ডরায়নি। কেননা, প্রতিদিন তার মনে এই অভিলাষ কেবলি জাগত, পৃথিবীকে সে একবার দেখে নেবে। শুধু ঘরের কোণে যে শান্ত পবিত্র জীবন, তার প্রতি এর ছিল নিদারুণ অবজ্ঞা, এবং সেই জন্যই আদর্শ বাঙালী ছেলেদের সঙ্গে মনের মিল তার কোনোদিনই ঘটেনি। বিনয় ছিল জীবনের উপাসক, যৌবনের পূজারী, এই জন্যই সারাটা জীবন ধ'রেই এর মনে জমেছিল, অনেক হতাশা, বিক্ষোভ ও অভিমান। মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়ে ষোলো বছরের বিনয় একদিন জীবনের সন্ধানে বেরিয়েছিল, কিন্তু দশবছরের বিপুল অভিজ্ঞতায় যদিও সে বিশ্বাস তার কোনোদিন টলেনি কিন্তু বিবিধ মানুষের অপরিসীম অধোগতি ও নীচতা বারবার দেখে দেখে এর চিন্তা ক্রমশঃই ভিন্ন হ'য়ে উঠছিল।

বিলেতে আসার জন্য এর দিনরাত উৎসাহের সীমা ছিলনা। কতদিন এই স্বপ্নে এর দিন কেটেছে তার ঠিক নেই। য়ুরোপের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ মিতালী হ'য়ে ছিল, পশ্চিমের সাহিত্য দর্শন ও চিত্রের মধ্য দিয়ে, কাজেই এদেশে এসে অবধি তার একদিনও ফুরসৎ ঘটেনি। পুঁথিগত জ্ঞানকে যাচাই করে নেওয়ার জন্য দিনরাত তার পরিশ্রমের অন্ত ছিলনা। যেখানে যা কিছু জানবার, বোঝবার ও দেখবার ছিল, বিলেতে এসে এক মাসের মধ্যে বিনয় বুভুক্ষের মত তা গ্রাস করেছে।

কিন্তু তার পরেই ঘটল এর জীবনের সত্যিকার বিপর্য্যয়। যাদের কথার উপর নির্ভর ক'রে যাদের উপর বিশ্বাস করে সে এই অনিশ্চিত জীবনের পথে বেরিয়েছিল, তারা একে একে বিনয়কে ত্যাগ করল। লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ছাড়া অন্য কোনো কাজও তার বিদেশে কোথাও জুটল না।

সেদিন সকাল বেলা উঠেই গৃহ-কর্ত্রী দরজায় ঠকঠক্ ক'রে শব্দ করলেন এবং কোনো উত্তর না পেলেও সশব্দে ঘরে ঢুকলেন। দুসপ্তাহের টাকা না পেয়ে মর্ম্মাহত এই ইংরেজ-মহিলা, সামান্য সৌজন্যটুকুও বিসর্জ্জন দিয়েছিল। বিনয়কে সুপ্রভাত বলে বাধিত করতেও সে ঘৃণা বোধ করছিল।

গৃহকর্ত্রী বললেন—"মিঃ ব্যানার্জ্জী, আজকেও যখন তোমার টাকা এলনা, তখন ঘরের চাবি আমাকে ফেরৎ দিয়ে যাবে। আজ থেকে তুমি আর বাড়ীতে ঢুকতে পাবে না। টাকা দিতে পারলে এসে জিনিষপত্র নিয়ে যেও।"

বিনয় আমতা আমতা করে বলে, "বুঝলেনা মিসেস ওয়ারেন, সাত হাজার মাইল দূরে আমাদের বাড়ী। টাকা আসতে ত—"

বুড়ী তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে, "ও সব আমি বুঝি না বাবু। পয়সা না নিয়ে তোমরা এ দেশে আসই বা কেন? আমরা যদি তোমার দেশে যেতুম, তা হলে কি পয়সা না নিয়ে যেতে পারতাম?"

বিনয়ের মুখে যে উত্তর আসছিল, সেটা চাপা দিয়েই সে বললে, "তা ত বটেই, তবে বুঝলে কি না—"

এবার এই ইংরেজ মহিলা সত্যিই বীরাঙ্গনা হয়ে উঠলেন

—"আমি ও সব ঢের বুঝি। আজ থেকে তুমি বাড়ীতে ঢুকতে পাবে না। এই শেষ কথা।"

অগত্যা বাধ্য হয়ে বিনয় ওভারকোটের পকেট থেকে চাবিটা বার ক'রে কম্পিত হস্তে বাড়ীওয়ালীকে সমর্পণ করল। এইবার মিসেস ওয়ারেন সৌজন্য প্রকাশে ত্রুটী করলেন না। তিনি বললেন, "ধন্যবাদ," এবং সদর্পে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

বেনয়ি তখনও রাত্রিবাস অঙ্গে। জানলার পর্দা সরিয়ে সে দেখল তখনও রাস্তায় বরফ পড়ছে। দূরে হ্যাম্পষ্ট্যাড হিথের মাঠ বরফে সাদা হয়ে গেছে। এই দারুণ দুর্দ্দিনে তার পকেটে একটা পেনীও নাই। বাইরের দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার চোখে জল এল। তার মনে হ'ল, বোধ হয় সে এখনই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে।

কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আগুনের কাছে এসে বসল। কয়লার অভাবে অনেকক্ষণ আগেই আগুন প্রায় নিভে গেছে। বার দুই খোঁচাখুঁচি করেও যখন আগুন আর জ্বলল না, তখন গাউনের পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছে বিনয় কাপড় পরতে লাগল।

২

রাস্তায় বেরিয়েই বিনয় টের পেল সে শীতে কাঁপছে। মাত্র দুজোড়া মোজা, তাও শতচ্ছিন্ন। বরফের উপর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে তার মনে হচ্ছিল এখনই সে বসে পড়বে। পা থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত শরীর তার দুলছে। যেমন শীত আর তেমনি ঝড়।

কিন্তু কী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এই বরফে ছাওয়া দেশের। সমস্ত বাড়ী ঘর, ছাদ, জানালা সাদা হয়ে গেছে। চিম্‌নীর ধোঁয়া কালিমাখানো বাড়ী ঘর দোর কার অঙ্গুলি স্পর্শে একরাত্তের মধ্যে শুভ্র হ'য়ে উঠেছে। কী নির্ম্মল দীপ্তি, কী স্বচ্ছ আভা!

চারদিকে ছেলে মেয়ে, বুড়ো বুড়ীর দল বরফের মধ্যে ছুটোছুটী করছে, এ ওর গায়ে বরফের ঢিল ছুড়ে মারছে। কী প্রচণ্ড দাপাদাপি।

তার মনে পড়ল, একদিন দার্জ্জিলিংয়ে কাঞ্চন-জঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে হিমালয়ের স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতা তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। এক অতলমুখী বেদনা তার চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। সে ভেবেছিল, এই নিঃসারতা, এই নির্ব্বিকারতার আহ্বান কতখানি সত্যি। মানুষকে ঊর্দ্ধে টেনে নেওয়ার যে নিঃশব্দ ইঙ্গিত, তার সার্থকতা কোথায়?

কিন্তু আজ তার মনে হল, এইখানে, এই শক্তি-অভিমানী জাতির দেশে প্রকৃতির আহ্বান অন্য রকমের। মানুষকে নিশ্চল নিষ্ক্রিয়তার দিকে প্রকৃতি টানেন না। প্রকৃতির আঙিনায় নব নব খেলার অভিনয়ে যোগ দেওয়ার জন্য এর ডাক। এই জন্যই, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে হৃদয়ের যোগ এত ঘনিষ্ঠ, এদেশে মানুষ ও প্রকৃতির মাঝখানে ব্যবধান অল্প, পরিচয় গভীরতর। প্রকৃতি এখানে বিশাল নয়, এখানে প্রকৃতির ক্ষেত্র দিগন্তবিস্তৃত ও সীমাহীন নয়। এ-যেন ইংলণ্ডের বৈঠকখানা, বাগানবাড়ীর ড্রয়িংরুম। এর সজ্জা, এর শোভা, এই জন্যই এত মার্জ্জিত, এত খানি সুললিত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন।

বিনয় এই সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে মাঠের দিকে চলেছে। এক এক সময়ে তার মনে হচ্ছিল, সে যেন স্বপ্নগ্রস্ত। তার সামনের সুমধুর সৌন্দর্য্য, এবং পেটের ক্ষুধা কোনটাই সত্য নয়। যেন দুটোই ফাঁকি। কেননা, এমন দিনে, এমন উৎসবের প্রভাতে তার পেটে আহার নাই, একথার কী কোনো অর্থ হয়? কেমন করে এও সম্ভবপর হল, যে এমনি আনন্দের উষায় সে আজ এই প্রথম চিন্তা নিয়ে জাগল, যে আজ সারাদিন খাবে কি? বিনয় একবার ভাবল, তার পেটের ক্ষুধাটা নিতান্তই অসত্য, এর সত্যিকার অস্তিত্ব আজকের দিনে অন্ততঃ অসম্ভব।

কিছুদূর যেতেই সে দেখল, রাস্তা দিয়ে একটা ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে আসছে দিলীপ ওরফে মিঃ রে। দিলীপকে সে দেশ থেকেই চিন্‌ত এবং ভাল করেই। এদেশে এসেও তাদের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। দিলীপ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "হ্যালো বিনু, কী লাভলি, আজকের সকালটা। চোখ জুড়িয়ে যায়। নয় কি? তোমার কী হলো কথা কইছনা যে?"

বিনয় বলল—"হা, সত্যিই ভারী চমৎকার লাগছে আজ ভোর থেকে। তার পর, কোথায় চলেছ?"

"এই খানিকটা ঘুরে আসি মাঠে। কাল রাত প্রায় তিনটের সময় একটা নাচ থেকে ফিরেছি। কাজেই শরীরটা এখনও ম্যাজ ম্যাজ করছে। তোমার খবর কি? এখনও ব্রোক্ নাকি? চলনা আজ টিভালিতে ছবি দেখে আসি, ক্রকেষ্টাইন। ভারী সুন্দর হয়েছে শুনলুম।"

"আমি ভাই পূর্ব্ববৎ। খাওয়ার পয়সা নাই, ছবি দেখব?"

"ভারী দুঃখিত বিনু তোমার জন্য। এমন দিনে হাতে পয়সা না থাকলে আমি হয় গুলি ক'রেই মরতুম।"

"ভাল কথা, দিলীপ, গোটা ছয়েক পেনী দিতে পার? আজকের আমার খাবার একটীও পয়সা নেই।"

"হা ভাই বুঝলে কিনা। আমারও ত খুব টানাটানি। তা ছাড়া ডরোথীকে বলেছি আজ রোমানোতে নিয়ে যাব। কাজেই বুঝলে কি না,—কি বলে তোমার—আজ প্রায় দু পাউণ্ডের ধাক্কা। কাজেই ভাই মাপ করো। মনে কিছু করো না যেন। তাহলে আসি, কি বল? গুড্ বাই।

দিলীপ হন্ হন্ করে আবার চলে গেল। বিনয় একবার তার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে আবার হাঁটতে সুরু করল।

৩

তখন বেলা দুটো। সকাল থেকে বিনয় শুধু হেঁটেছে, চোখের জলে, আর বৃষ্টিতে টাইটা ভিজে চপ্ চপ্ করছে। কোথায় যাবে, কি করবে কোনো কিছুরই তার ঠিক নেই। কতবার সতৃষ্ণ নয়নে হোটেল কাফের জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে চোখের জল ফেলেছে, আর ভেবেছে কী দারুণ অবনতি ঘটল তার। কোথায় প্রিয়তমার জন্ত, বসন্ত বায়ুর জন্ত সে হা-হুতোশ করবে, চোখের জলে বালিশ ভেজাবে, তা নয় এক টুকরো রুটীর জন্ত এক বাটি চায়ের জন্ত সে চোখের জল ফেলছে। এইত একটু দূরেই হ্যাম্পষ্টেড হীথ। ঐখানে ঐ মাঠের দিকে তাকিয়েই ত কীটস্ ইলোবেলা লিখেছিল, প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গান ত এই খান থেকেই কবির কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল। আর সে কি না, য়ুনিভার্সিটির সাহিত্যের ভাল ছেলেটি হয়েও, ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের মত কেবল খাবার দোকানের আশে পাশে ঘুরে বেড়াল। এই হ্যাম্পষ্টেড হীথ, সাহিত্যের ভেতর দিয়ে কত রকমে সে তাকে জেনেছে, কত শিল্পীর তুলিকা-পাতে, কত কবির বন্দনা-গানে এর সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত! অথচ, তার কাছে এর কোনোই মানে নাই। আজ সে শুধু চায় এক টুকরো রুটি আর এক বাটী চা। বিনয়ের মনে বারবার এই কথাই জাগছিল যে এত কবিতা, এত সঙ্গীত, পৃথিবীর এত সৌন্দর্য্য মানুষের বাহ্য প্রয়োজনের কাছে কি কিছুই নয়। আজকের এই নিদারুণ শীত, জিরো ডিগ্রির উত্তাপ, আর তার পকেটে একটিও পয়সা নেই। এই যে তিনটি ঘটনার সমাবেশ, এর কাছে কী আর সমস্তই তুচ্ছ? তার মনের ও প্রাণের আর সমস্ত দাবী, তার পেটের ক্ষুধার কাছে পরাভূত। এই যদি সত্য হয়, তবে মানুষ কেবল ক্ষুধার গানই গাহিল না কেন? সকলের উপরে সমাজ ও ব্যক্তি ক্ষুধার দেবতাকেই পূজা করল না কেন? যুগ যুগ ধরে এই বঞ্চনার কোথায় সার্থকতা ছিল, এই কথাই তার মনে বার বার পীড়া দিচ্ছিল।

কতদিন ত সে শুনেছে, তর্ক করেছে, যে মানুষ কেবল পেটের তাগিদে বেঁচে থাকতেই পৃথিবীতে আসে নাই। মানুষের জীবনে আরও বৃহত্তর মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। কেবল বেঁচে থাকাটাই সব নয়।

কিন্তু বেঁচে থাকাটাই যদি এত নিদারুণ হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে এর উপরের কথাটা সে ভাববে কি ক'রে?

কিন্তু তবুও ভাবতেই হ'বে। কেননা, তার শিক্ষা-দীক্ষা আছে উন্নত রুচি আছে কাজেই আর সবাইকার মত নিজেকে পথের কাদায় টেনে আন্‌বে কি ক'রে? বিনয় তাই ভাবত, এবং এমন ক'রে কোনোদিনই ভাবেনি, যে একটা দিন পেটে আহার না পড়লে মানুষ যখন পাগল হ'য়ে ওঠে তখন এ-সব শিক্ষার প্রয়োজন কি?

পথ চল্‌তে চল্‌তে একবার তার মনে হ'ল পাশের পরিচিত কাফের ঐ পরিচারিকা মেয়েটী তার দিকে তাকিয়ে হাসল না কি? ছোট্ট একটা ইটালীয়ান্ দোকান।

পাড়ার যত নিকর্মার দল সন্ধ্যার পর এক বাটী চা সামনে রেখে আড্ডা দেয় আর ঐ সুন্দরী ইটালীয়ান্ মেয়েটাকে জ্বালাতন করে। কিন্তু যাই হোক্ এই দোকানের হ্যাম-স্যাণ্ডউইচ কিন্তু পরম উপাদেয়।

বিনয় কাঁচের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবে, আহা রে, যদি কেউ হঠাৎ খপ্ ক'রে একখানা স্যাণ্ডউইচ ওর মুখে ফেলে দায়। অথবা রোজিনা বুঝতে পারে, আজ দুইদিন ধ'রে আমি কিছু খাইনি; এবং তাই যেই আমি দোকানে ঢুকব অমনি টুপ্ ক'রে আমার ওভার-কোটের পকেটে তিন-চার-পাঁচ খানা স্যাণ্ডউইচের বাণ্ডিল ফেলে দেবে। আর আমি যেন ভুল করে দোকানে ঢুকেছি অথবা এমন একটা দামী জিনিষের ফরমায়েস দেব, যা হ্যাম্পষ্টেডের ত্রিসীমানায়ও পাওয়া যায় না, এবং তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়ে হীথের ঐ বেঞ্চিটায় ব'সে বেশ ক'রে, ভাল ক'রে এবং আরাম ক'রে টপাটপ্ গিলব। হায় রে, যীশুখৃষ্টের আমলে ত কতই তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছিল। গান্ধীজীর আমলে কি এই সামান্য একটা ঘটনাও ঘটতে পারে না।

আচ্ছা ঢুকেই দেখা যাক্ না। বিনয় যেন মরিয়া হ'য়েই, এবং এখনই একটা মিরাক্ল্ ঘটবে, এরকম বিশ্বাস ক'রে দোকানে ঢুকে পড়ল। রোজিনা প্রসন্ন-মুখে এগিয়ে এসে বল্ল, "কী চাই, তোমার আজ হঠাৎ অসময়ে! কী সুন্দর বরফ পড়েছে দেখেছ?"

"হ্যাঁ, দেখছি বই কি? তোমাদের দোকানে নিশ্চয়ই এখন স্যাণ্ডউইচ্ পাওয়া যায় না?"

"কেন যাবে না! আমরা ত সারাদিনই তৈরী রাখি। কয়খানা দেব?" এই ব'লেই রোজিনা, এগিয়ে গিয়ে একটা প্লেটে স্যাণ্ডউইচ্ সাজাতে লাগল।

বিনয় ত অপ্রস্তুত! কোথায় পাবে সে স্যাণ্ডউইচের দাম! তাড়াতাড়ি এ-পকেট ও-পকেট মিনিটখানেক হাতড়ে বল্ল—"দেখ, রোজিনা, আমি ত ভেবেছিলুম তোমাদের এখানে স্যাণ্ডউইচ্ পাব না। তাই—বুঝলে কিনা,—পয়সা নিয়ে আসিনি। কাজেই আমাকে মাপ করো।" রোজিনা বললে—"তাতে আর কি হয়েছে। পরে দিয়ে যেও, তাহ'লেই হবে।"

বিনয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। সত্যিই তা হ'লে ঐ স্যাণ্ডউইচ্‌গুলো তার? তার মনে হ'ল রোজিনা যেন কাউণ্টারের ওপারে ম্যাডোনার মতই মমতাময়ী দেবী।

রোজিনা গুণ্‌তে গুণ্‌তে বল্ল, "ছ'খানা দিই।"

বিনয় নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছিল। অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে উদাসীনভাবে বলল—"ছ'খানা? আচ্ছা তাই দেও।"

পকেটে স্যাণ্ডউইচ্ পুরে আনন্দের চোটে রোজিনাকে সে ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেল। রাস্তায় বেড়িয়ে তার মনে হ'ল, পায়ের নীচে পৃথিবী যেন আনন্দে টলমল্ করছে। তিন দিন পরে, আজ সে ছয়খানা স্যাণ্ডউইচের মালিক! এ সৌভাগ্য সে কোথায় রাখবে? জোরে জোরে পা ফেলে বিনয় এবার বুক ফুলিয়ে হাঁটতে লাগল।

৪

চারটে বেজে গেছে। ইতিমধ্যে আকাশ একটুখানি ফর্সা হয়েছে এবং হীথের চারপাশে বরফ গলে গলে ঘাসের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। বিনয় প্রায় দুই ঘণ্টা ধ'রে একটা বেঞ্চিতেই ব'সে আছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে নানা রকমে এবং বিবিধ ভঙ্গীতে সে স্যাণ্ডউইচগুলো ব'সে ব'সে চিবিয়েছে। এখন তার হাতের সামনে কোনো কাজ নেই। ভস্মীভূত স্যাণ্ডউইচ্‌গুলোর স্মৃতিই তার মনে বার বার ক'রে জাগছে। তার ক্ষুধা আবার প্রচণ্ড হ'য়ে উঠ্‌ছে।

এখন সে কি করবে? সামনে সমস্ত রাত, এবং বান্ধব-শূন্য লণ্ডনে সে কপর্দকহীন। কোথায় যাবে সে, কি করবার আছে তার?

এরকম বিপদে মানুষে নাকি ভগবানের কথা ভাবে? সেও কি ভগবান্‌কে ডাকবে? কোন্ ভগবান্‌কে ডাকলে এই মিসেস্ ওয়ারেনের পাষাণ হৃদয় গলবে? কেষ্ট-ঠাকুর ত এই ম্লেচ্ছ-মহিলাকে বশ করতে আসবেন না? আর যীশুখৃষ্ট, সেইবা এই কালা আদমীর প্রার্থনা শুনবে কেন?

বিনয় ভাবতে সুরু করল,—আচ্ছা যীশুখৃষ্টের গায়ের রং ত ইংরেজগুলোর মত টকটকে লাল ছিল না। তা হ'লেও, এত বর্ণ-বিদ্বেষ সত্ত্বেও এরা যীশু খৃষ্টের ভজনা করে কি

ক'রে? য়িহুদীদের গায়ের রং ত প্রায় আমাদেরই মত। তা সত্ত্বেও যীশুখৃষ্ট এত পূজা, এত নৈবেদ্য পায় কি ক'রে?

ঐত একটা গির্জ্জার চূড়ো হ্রদের ওপারে দেখা যাচ্ছে। ঐখানে গিয়ে ধর্ণা দিলে কী মিসেস্ ওয়ারেনের মনে অনুতাপ আসবে? এবং অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে আমাকে একটা পাকা ডিনার খাইয়ে দেবে? সুপ্, গরুর ডালনা, মিষ্টি আর কাফি! খাবার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে বিনয়ের চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। মনে হয় তার চিন্তার সমাপ্তি ঘটেছে, এই খাদ্য-সমুদ্রে। ঐখানেই তার পার্থিব অস্তিত্বের নির্ব্বাণ।

এই রকম ভাবেই অনেকক্ষণ কেটে গেছে। এমন সময় বিনয় বুঝতে পারল, একটা লোক বারবার তার বেঞ্চের পাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে এবং মনে হ'ল সেও যেন ঐখানে বসতেই উৎসুক। বিনয় তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাক্‌ল এবং বসতে বল্‌ল।

লোকটী অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বল্‌ল, "ধন্যবাদ।"

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ্‌চাপ্। কথা জোগায় না দে'খে বিনয় আস্তে আস্তে বলল—"কী সুন্দর বরফ পড়েছে!"

লোকটী এবার যেন সজাগ হ'য়ে উঠল এবং বল্‌ল, "হ্যাঁ, ভারী চমৎকারই বটে। তোমাদের দেশে ত তোমরা বরফ পড়তে কোনোদিন দেখ না। নয় কি?"

বিনয় বলে—"হ্যাঁ, ভারতবর্ষের যে সমস্ত জায়গায় বরফ পড়ে সেখানে আমি কোনোদিন যাইনি।"

লোকটী আগ্রহের সহিত আবার জিজ্ঞেস করে—"আমাদের দেশ তোমার কেমন লাগে?"

বিনয় বলে—"সেকথা শুনলে তুমি কি খুশী হবে?"

লোকটী মাথা নেড়ে বল্‌তে থাকে—"নিশ্চয়ই, তুমি কি ভাবছ আমাদের দেশের নিন্দা করলে আমি খুবই দুঃখ পাব? এদেশের জলমাটীর উপর আমার দরদ এত বেশী নয় যে অন্য কারো সমালোচনা অসহ্য হবে।"

বিনয় বল্‌ল—"তা না হ'লেও, জানো ত প্রত্যেক মানুষেরই স্বজাতির প্রতি একটা নিবিড় রক্তের টান আছে, যাতে করে নিজের অজ্ঞাতসারে সে নিজের দেশ ও জাতির প্রতি পক্ষপাতী হ'য়ে ওঠে।"

লোকটী উত্তরে বলে—"তা হ'তে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা কি আজকের দিনে সত্য নয় যে পৃথিবীতে আজ এমন একদল লোক জন্মাচ্ছে যারা কেবল নিজেদের দেশের কথাই ভাবে না, নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে সকল জাতি এবং সকল মানুষের কথাও ভাবে।"

বিনয় বল্‌ল—"তার সংখ্যা কত কম জানি ব'লেই ত প্রতি পদে সাবধান হ'তে হয়।"

লোকটী উত্তরে বল্‌ল—"তার সংখ্যাই ত আমাদের কালে সব চাইতে বেশী। যারা খেতে পায় না, যাদের শোবার যায়গা নেই, তাদের আবার দেশ কি, তাদের আবার জাতি কোথায়? তোমার মুখ দেখেই ত বুঝতে পারছি, তোমার খাবার জোটে না, বোধ হয় মাথা গুঁজবার ঠাঁইও নেই এবং আমারও যখন সেই অবস্থা তখন তোমাতে আমাতে তফাৎটা কোথায়? তোমার গায়ের চামড়া কটা ব'লেই কি তুমি আমার চাইতে আলাদা? আমি ত শুধু এই বুঝি যে পৃথিবীতে মাত্র দুটো জাতি আছে, যারা খেতে পায় ও যারা পায় না। তুমি আর আমি ত সগোত্র।"

বিনয় কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌ল—"দেখ যদিও মোটামুটি অথবা তার চাইতেও বেশী ক'রে তোমার কথাটা সত্যি তা হলেও ঠিক এমন সরলভাবে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমি সেই জন্য এই সহজ বিশ্লেষণটা সব সময় মেনে নিইনি।"

লোকটী হাসতে হাসতে বল্‌ল—"আমি তোমার মনের গতিবিধি খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু তাই বুঝলে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যত বৈষম্য যত পার্থক্য আছে সব সরল হ'য়ে এইখানে এসে ঠেকবে, তা তুমি দেখে নিও। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে, আমার পকেটে আজ কিছু পয়সা আছে। সেগুলো যেন আমায় কামড়াচ্ছে। চল দুজনে মিলে কিছু গিলে আসা যাক।"

বিনয় অবাক হ'য়ে গেল! সারাদিনে তার একটার পরে আর একটা সৌভাগ্য! আরো একবার খাওয়ার নিমন্ত্রণ। এ-সৌভাগ্য সে কোথায় রাখবে? তবুও তার সম্ভ্রান্ত-মর্য্যাদাবোধ তাকে পীড়িত করতে লাগ্‌ল। মুখে

খানিকটা বিড়ম্বনার ভাব দেখিয়ে বল্‌ল—"এর আর কি দরকার? বুঝলে কিনা, আমি ত রাতে আবার বাড়ীতে গিয়ে খাবই। থাক্‌না ওসব হাঙ্গামে। ধন্যবাদ তোমাকে।" লোকটী উৎসাহের সঙ্গে উঠে পড়ল এবং বলতে লাগল—"আরে, রেখে দাও. তোমার বুর্জোয়া-সংস্কার। চল ঐখানকার 'পাবে' বসে কিছু খেয়ে আর টেনে নি।"

এই কথা ব'লেই বিনয়কে প্রতিবাদের অবসর না দিয়েই টেনে তুল্‌ল। বিনয় অগত্যা তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে একটা টেবিলের সামনে মুখোমুখি হ'য়ে বস্‌ল।

৫

ইংলণ্ডে গরীবদের বৈঠকখানা এই পাবলিক্ হাউস্-গুলো। যাদের ঘরে আগুন রাখবার পয়সা নাই, যাদের কোনো ক্লাবে চাঁদা দেবার সামর্থ্য নাই, তারাই সারাদিনের খাটুনির পর এক গেলাস বিয়ার কিংবা এক গেলাস 'লাগার' নিয়ে তামাক খেয়ে কয়েক ঘণ্টা এখানে কাটিয়ে দেয় এবং পাড়া-পড়শীর সঙ্গে একটা ছুটো ইতর ইয়ারকি ক'রে মেজাজ হালকা করে।

এহেন স্থানে বিনয় যে অসোয়াস্তি বোধ করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও ভোজনের এই অযাচিত নিমন্ত্রণ তারপক্ষে উপেক্ষা করা নিতান্তই কঠিন ছিল। তাছাড়া অনাহুত বন্ধুটীর আন্তরিকতা তাকে মুগ্ধ ক'রেছিল। ছেলেটীর বয়স বেশী নয়, কিন্তু সারা দেহে দারিদ্র্যের ছাপ। মুখের হাসিও যেন বিদ্রূপের মত দেখায়। ভাল করে তাকিয়ে দেখ্‌লে বোঝা যায় এই হতভাগ্য জীবনে কোনো দিন এতটুকু আরাম বা আদরের সুযোগ পায়নি। এবং জীবন যেন কেবলি বিপীড়ন আর অভাবের সমষ্টি।

কিন্তু তবুও এর পৌরুষ মরে যায় নি। ছু গেলাস মদ খাওয়ার পরে জর্জ্জের বাহুতে যেন অসুরের শক্তি এসেছে, এবং মনের দরজা যেন অকস্মাৎ সকল দিক দিয়ে খুলে গেছে। কথায় এর কী ঝাঁঝ, কী নিষ্ঠুর তেজ। কী পৈশাচিক ঘৃণা এর সকল মানুষ আর সমাজের উপর।

বিনয় স্তব্ধ হ'য়ে কেবল জর্জ্জের কথা শোনে। মদ খাওয়া তার অভ্যাস ছিল না। কাজেই দুচুমুকার পরে দুই গেলাস বিয়ারই তাকে যেন আধমরা ক'রে ফেলেছিল। ভাল ক'রে সব কথা বোঝবার শক্তিও তার লোপ পেয়েছে। সে মাঝে মাঝে ছুএকটা হুঁ হাঁ ক'রে ঝিম্ হ'য়ে বসে থাকে।

জর্জ্জ অনর্গল বলে যায় কেমন ক'রে একদল মানুষ সমাজের মাথার উপর বসে অনর্জ্জিত অর্থে দিনের পর দিন ভোগের প্রাসাদ তৈরী করছে আর হাজার হাজার লোক তাদের দেহের রক্তে এই ঐশ্বর্য্যের উপাদান যোগাচ্ছে। নির্ম্মম সমাজ-যন্ত্র হাজার হাজার মানুষের আর্ত্তনাদকে উপেক্ষা করে কেবল জন কয়েকের আরাম ও বিলাসের জন্য কলের চাকার মত ঘুরছে। কোথায় কে বাঁচল কোথায় কার জীবন না বাড়তেই শেষ হয়ে গেল সে-সব দেখবার ফুরসৎ তার কোথায়?

ক্রমশঃ রাত বাড়ছিল। দোকান বন্ধ হওয়ার ঘণ্টা বাজল। বিনয় অগত্যা জর্জ্জের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার রাস্তায় হাটতে সুরু করল। এখন সে কোথায় যাবে? এই শীতের রাতে আজ মাথা গুঁজবার স্থানটুকুও তার নাই। মনে পড়ল একদিন এমনি শীতের রাতে কলকাতার রাস্তায় সে শুয়ে কাটিয়েছিল। তখন তার মনে ছিল অন্তহীন দুরাশা, জীবন ছিল রঙীন্ স্বপ্নে মস্‌গুল্। সামনের দিকে তাকিয়ে সে সেইজন্যই সমস্ত দুঃখকে অনায়াসে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু সেদিনের সঙ্গে আজকের কী অসামান্য তফাৎ! আজকে যে তার সমুখে আঁকড়িয়ে ধরার কোনো সম্বলই নাই, তার সমস্ত আশার গ্রন্থি যে ছিন্ন হ'য়ে গেছে, এই নির্ম্মম সত্যটাকে সে আপনার কাছ থেকে লুকোবে কি ক'রে এই কথাই সে ভেবে পাচ্ছিল না। দুঃখকে সে কোনদিনই ডরায় নি, কিন্তু নিরর্থক কষ্ট-ভোগের মধ্যে ত কোনো গৌরব নাই একথা যে যেমন ভালো ক'রে জানে এমন আর কয়জনে জেনেছে।

হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হ'লো তার সমস্ত চিন্তার শক্তি যেন এক মুহূর্ত্তে অবশ হ'য়ে গেছে এবং যেন জীবনের সমস্ত আনন্দ অকস্মাৎ কেমন ক'রে তার চোখের সামনে লোপ পেয়ে গেল। শুধু তার মনে পড়ল কাইজারলিঙের এই রকম অনুভূতির কথা,—যখন দিনের পর দিন ভাবত-



বুদ্ধ

('ফ্রেসো' পদ্ধতিতে অঙ্কিত)

শিল্পী—৺প্রকৃতি দেবী

মহাসাগরের উপরে জাহাজে কাটিয়ে কাইজারলিঙের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিস্মরণ ঘটেছিল। বিনয়ের এই মুহূর্ত্তে কেবল মনে হচ্ছিল, বিনয় নামে কোনো মানুষের পার্থিব অস্তিত্বটা নিতান্ত বাজে কথা। রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে চলা ফুটবলের মত তার অবশ অপার্থিব চেতনাই কেবল সত্যি। আর সত্যি,—ছেঁড়া মোজার ভেতর দিয়ে ঢোকা কন্‌কনে শীত।

খানিকটা টল্‌তে টল্‌তেই, সে পথ চলছিল এবং আশে পাশের মানুষগুলোকে গ্যাস্‌পোষ্টের আলোতে যেন নিতান্তই আবছায়ার মত দেখাচ্ছিল। বিনয়ের চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীর যে মূর্ত্তি জেগে উঠছিল তাকে মনোরম বলা চলেনা, কেননা পৃথিবীকে সুন্দর ভাববার যে বোধ-শক্তি, সুন্দর ক'রে দেখবার যে চেতনা, তা দিনের পরে দিন জীবনের সঙ্গে লড়াই ক'রে তার লোপ পেয়েছিল। বিনয়ের এ পৃথিবীর নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য তাকে দিনের পর দিন সমস্ত জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কাজেই খুব কন্‌কনে শীতের রাতে গ্যাসের আলোতে রাস্তা আর বাড়ী যে অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে জেগে ওঠে তা দেখবার মত দৃষ্টি আজ আর তার কোথায়?

নিজের জীবনকে হাজার বার ধিক্কার দিয়েছে, কিন্তু তবুও এই সামান্য দেহটার জন্য তার কী মায়া? একটী লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগাতেই বিনয় চমকিয়ে উঠ্‌ল, এবং সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে বল্‌ল, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

যে লোকটাকে সে ধাক্কা দিয়েছিল সে ইতিমধ্যে থেমে দাঁড়িয়েছে এবং বিনয়ের দুঃখিত বলার ভঙ্গী দেখে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠেছে।

বিনয় এবার সত্যই অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠল, কেন না এত রাতে একটী মেয়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় লজ্জা পাওয়াটাকে সে সুশোভন মনে করতে পারে নি। বিনয় এগিয়ে গিয়ে টুপিটা নামিয়ে গলায় যথেষ্ট সৌজন্যের সুর নামিয়ে বল্‌ল—"আমায় মাপ করুন, আমি দেখ্‌তে না পেয়েই আপনার গায়ে ধাক্কা দিয়েছি।"

মেয়েটী বিনয়ের এই কথায় উত্তরেও কোনো জবাব না দিয়ে কেবল একদৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু আগে তার মুখে যে পরিহাসের হাসি জেগেছিল, তা উড়ে গেছে। চোখে মুখে যেন অপরিসীম অনুকম্পা।

বিনয় তার কথায় কোনো জবাব না পেয়ে, "আচ্ছা, গুড্‌ নাইট্‌, মাপ করুন," বলে যেই পিছন ফিরেছে, অমনি মেয়েটী তার কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌ল—"তুমি কি একলা বাড়ী যেতে পারবে? জান, তুমি মাতাল হয়েছ। তোমার পা কাঁপছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

বিনয় অকস্মাৎ এই আচরণে হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। সে খানিকটা জড়িতকণ্ঠেই বল্‌ল—"আমি ত বাড়ী যাচ্ছি না, কাজেই আপনি ভাববেন না। আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

মেয়েটী এতক্ষণ ধরে কেবল বিনয়ের চোখের দিকেই চেয়েছিল। বিনয়ের কথায় উত্তরে যেন একটু চমকে উঠ্‌ল এবং তারপরে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বল্‌ল—"এত রাতে বাড়ী যাবেনা, তাহ'লে কোথায় যাবে শুনি? লণ্ডনের রাস্তায় রাত একটার পরে এমন কোনো মাধুর্য্য নাই, যার জন্য এত রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে?"

বিনয় স্পষ্ট বুঝতে পার্‌ল, কণ্ঠে শাসনের সুর। সে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কে এই মেয়েটী হঠাৎ রাত দুপুরে তাকে ধমকাতে এল। একে কোনদিনও সে জেনেছে বলে তার মনে পড়ল না, তবুও এর কণ্ঠে যে পরিচয়ের আভাষ, যে স্নেহের প্রকাশ তাতো কৃত্রিম বলে মনে হয় না।

সে একটু রসিকতা করার ভাণ ক'রে বল্‌ল—"কোথায় আর যাব? যদি জাহান্নমে যাবার সুযোগ ঘটে তাহ'লে একবার চেষ্টা ক'রে দেখব আর কি?"

মেয়েটী একটু শক্ত হ'য়ে বল্‌ল—"তাত জানি বাছা, জাহান্নমে যাওয়ার নাম ক'রে তোমরা পুরুষেরা, শেষ পর্য্যন্ত মদের ভাঁটিতেই ত যাও। ঐত তোমাদের দৌড়! কিন্তু ওসব ন্যাকামি ছেড়ে দিয়ে আমায় বল্‌বে কি,—তোমার বাড়ী কোথায়। তাহ'লে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসতুম।"

বিনয় হঠাৎ বলে ফেল্‌ল—"কোথায় আর যাব? আজ রাতে আমার যাওয়ার কোনো ঠাঁই নাই।"

এই বলে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটী আবার জিজ্ঞেস করল—"তার মানে ?"

বিনয় কোনো রকমে এর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্ত একটু রূঢ় স্বরেই বল্‌ল—"তার মানে দিয়ে তোমার দরকার কি বাছা ? আসল কথা হচ্ছে আমার থাকার জায়গা নেই। এইবার তুমি বাড়ী যাও।"

মেয়েটী এই রূঢ়তা যেন গায়ে নিল না। আবার বল্‌ল—"ঠাঁই নাই বল্‌লেই ত চলে না। রাতে এক জায়গায় মাথা গুজতে ত হবে। না এই রকমের রাতে রাস্তায় কাটাবে ভেবেছ ?"

বিনয় ক্রমশঃ অত্যন্ত উত্যক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। রাস্তার একটা মেয়ে তার উপর সর্দারি করবে এটা যেন কিছুতেই সে গায়ে নিতে পারছিল না। তবুও যতখানি পারে নিজের বিরক্তি গোপন ক'রে সে বল্‌ল—"যদি দরকার হয় তা হ'লে কাটাব বই কি। কিন্তু তোমার এত মাথা ব্যথা কেন জান্‌তে পারি কি ?"

মেয়েটী একথার কোনো জবাব দিল না। কিছুক্ষণ বিনয়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি যেন ভাব্‌ল। তার-পর অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এসে বিনয়ের বাহুতে নিজের বাহুবেষ্টন ক'রে অত্যন্ত আদরের সুরে বল্‌ল—"লক্ষ্মীটী, আমার বাড়ীতে চল। রাস্তায় এত রাতে একা ঘুরে বেড়ালে এখুনি পুলিশে তাড়া করবে বুঝেছ কি ?"

বিনয় যেন মহা ফাঁপরে পড়ল। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটী মেয়ে রাস্তা থেকে তাকে বাড়ী যেতে ডাক্‌ছে এ-রহস্য বুঝ্‌বে সে কেমন ক'রে ? খানিকটা হতভম্বের মতই ওর কথামত ওর সঙ্গে সঙ্গে বিনয় চুপ ক'রে হাটিতে লাগ্‌ল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল—"একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ছেলের সঙ্গে এত রাতে হাটিতে তোমার ভয় লাগছে না ?"

মেয়েটী এ-কথায় হেসে ফেল্‌ল। বল্‌ল—"ভয় ? কিসের ভয় তোমাকে ? আমি কি নিজেকে রক্ষা করতে পারিনে না কি ?"

বিনয় বল্‌ল—"তা পারতে পার। কিন্তু আমি ত একটা ডাকাত কিংবা বদমায়েসও হ'তে পারি।"

মেয়েটী এবার খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ফেল্‌ল এবং বল্‌ল—"ওরে বাপরে ? তুমি হবে ডাকাত। তা'হলেই হয়েছিল আর কি ?"

বিনয়ের মুখের ও চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে বল্‌ল—"কী ডাকাতের নমুনা !"

বিনয় ক্রমশঃই যেন বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। কী ঘটছে কিছুই সে ঠাহর ক'রে উঠ্‌তে পারছিল না। একে মদের নেশায় তার মাথা ঘুরছে, তার ওপর এই অসাধারণ রহস্যময় মেয়েটী। কি করবে এবং কি বল্‌বে কিছুই সে ভেবে পাচ্ছিল না। তাই সে খানিকটা অবজ্ঞার সুরে বল্‌ল—"ডাকাত না হ'তে পারি তবুও পুরুষ মানুষ ত ?"

ইতিমধ্যে তাদের একটা রাস্তা পার হওয়ার দরকার হ'ল। কাজেই রাস্তার ওপারে না যাওয়া পর্য্যন্ত কোনো কথাই হ'ল না। রাস্তার ওপারে গিয়ে মেয়েটী একটী বাড়ীর সামনে থাম্‌ল, এবং অত্যন্ত মিনতির সুরে বল্‌ল—"খুব আস্তে, বুঝেছ ?"

বিনয় কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল। মেয়েটী তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বন্ধ ক'রে দিল। বিনয় অগত্যা আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে লাগল এবং মেয়েটী যখন চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুক্‌ল, তখন আস্তে আস্তে সেও ঢুকে পড়ল।

দরজার সামনে প্যাসেজে খুব পুরু কার্পেট ছিল না। কাজেই দুএকবার জুতোর চাপে মেজেতে শব্দ হ'তেই মেয়েটী সঙ্কিতভাবে বিনয়ের দিকে অন্ধকারে তাকাল। বিনয় লজ্জিত হ'য়ে আরও সাবধানে অন্ধকারে পা ফেলে ওর পিছনে চল্‌তে লাগ্‌ল। এক তলাতেই মেয়েটীর ঘর। অল্পক্ষণেই ঘরে পৌছানো গেল। ঘরের ভেতরে ঢুকেই মেয়েটী সুইচ্ টিপে দিল এবং বিনয়কে ঘরে ঢুকিয়েই তাড়াতাড়ি দরজায় চাবি বন্ধ ক'রে দিল।

নিজের ওভারকোট ও বিনয়ের ওভারকোট খুলে মেয়েটী তাড়াতাড়ি আগুন করতে লেগে গেল। বিনয় এক কোণে একটা সোফায় ব'সে মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করতে লাগ্‌ল।

ইতিমধ্যে কয়লা ধরিয়ে মেয়েটী হাতমুখ ধুয়ে বিনয়ের পেছনে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছে। সারাদিন হেঁটে পরিশ্রান্ত হওয়ায় বিনয় সোফায় বসে চোখ বুজে পড়েছিল। কাজেই

ও কখন এসে ওর পেছনে দাঁড়িয়েছে কিছুই টের পায়নি।

মেয়েটী বিনয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আস্তে আস্তে বল্‌ল—"কী, ডাকাতি করবে না?"

বিনয় এবার যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠেছে। সে তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল—"তুমি ত ইতিমধ্যেই আমাকে লুট ক'রে নিয়েছ। কিন্তু যাই হোক্ তোমার এত সমস্ত দয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার পরিচয়টাও তোমাকে দিয়ে দিই। আমার নাম বিনয় ব্যানার্জ্জি এ-নাম মনে রাখিতে তোমার পক্ষে সহজ হবে না। তোমার নাম?"

"আমার—এভিলিন্ কুক্। তোমাদের নাম আমার কাছে খুব হেঁয়ালীর মত শোনায় না। তোমাদের দেশের অনেক লোককেই আমি এক কালে চিন্‌তুম।"

বিনয় আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ল্—"ভারতবর্ষের অনেক লোককে চিন্‌তে তুমি?"

"হ্যাঁ, মায়ের কাছে শুনেছিলুম, তাঁর প্রথম জীবনে ভালবাসার আলো জ্বালিয়েছিল তোমাদেরই কোনো দেশী লোক, এবং সারাজীবন তাঁর কুমারী-জীবনের লজ্জাকে যদিও সে ঘৃণা ক'রেছে, তবুও আমাকে যিনি জন্ম দিয়েছিলেন, আজিও বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁর প্রতি মায়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অন্ত নাই। আজিও দেখেছি, তাঁর স্বামীর অগোচরে আমার বাপের ছবির দিকে তাকিয়ে তিনি চোখের জল ফেলেছেন।"

বলতে বলতে এভিলিনের চোখও যেন সজল হ'য়ে উঠ্‌ছিল, বিনয় মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, এভিলিন সেদিকে কোনো নজর না দিয়েই ব'লে যেতে লাগ্‌ল—"আমারও যে কতবার ইচ্ছে হয়েছে তাঁকে একবার দেখি। কিন্তু সাত হাজার মাইল দূরে নিদারুণ গরমের দেশে যাবার কথা ভাব্‌লে এক এক সময় ভয় হয়। তাই মন থেকে ঐ ইচ্ছাকে বার বার দূর ক'রে দিই।"

এই কথা বলেই এভিলিন চুপ করল। মনে হ'ল তার সমস্ত অনাদৃত বাল্য ও যৌবনের জন্য তার মনে যে ক্ষোভ জমে উঠেছিল, তাই অকস্মাৎ যেন এক সঙ্গে মনের দুয়ারে ভীড় ক'রে তার চিন্তাকে সুদূরাভিমুখী ক'রে দিয়েছে। বিনয়ের চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে খেলা করতে করতে সে যেন ক্রমশঃই চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছিল। তারপর হঠাৎ বিনয়ের অস্তিত্বের কথা তার মনে পড়াতেই ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌ল—"আমি কী হাইড্‌স্ বকে যাচ্ছি। তোমার জন্য কাফি করার কথা এতক্ষণ মনেই পড়েনি। তুমি এখানে চুপ্‌টী ক'রে আগুনের কাছে বসে থাক। আমি পাঁচ মিনিটে কাফি নিয়ে এসে হাজির হব।"

বিনয় যেমন ভাবে ছিল তেমনি চুপ ক'রে সোফায় পড়ে রইল। এইমাত্র যে কাহিনী সে শুন্‌ল তার মর্ম্মান্তিক পরিচয় তখনও তার মনকে উত্তেজিত ক'রে রেখেছিল। সে কেবলই ভাব্‌ছিল, জীবন-যুদ্ধে অপরাজিত এই নিঃসঙ্গ মেয়েটীর কথা, তার অসীম দুঃসাহস ও অপরিসীম তেজের কথা। যেই দুর্ভাগ্য নিয়ে সে এই পৃথিবীতে এসেছিল, সেই অপমানের লজ্জাকে সে কেমন ক'রে দিনের পর দিনে আপন বিক্রমে পরাভূত করেছে সেই কথা ভেবে তার নিজের দুঃখের তীব্রতা যেন অতিশয় মৃদু বলে মনে হ'ল, এবং এই তরুণীর জীবনকে সে সম্পূর্ণ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ্‌তে আরম্ভ করেছে ভেবে মনে মনে আনন্দ বোধ করল।

এভিলিন্ দুই বাটী কাফি নিয়ে সোফায় এসে বিনয়ের পাশে বস্‌ল। তারপর কাফিতে চিনি দিয়ে নিজের বাটীতে একটা চুমুক দিয়ে অত্যন্ত উল্লাসের সঙ্গে বল্‌ল—"রাস্তায় ঘোরার চাইতে আগুনের ধারে ব'সে কাফি খাওয়াটা খারাপ নাকি?"

বিনয় সচেতন হ'য়ে এভিলিনকে ধন্যবাদ দিয়ে বল্‌ল—"হ্যাঁ, তোমার মত মমতাময়ী কোনো মেয়ে যদি রাস্তায় থেকে আজ আমায় কুড়িয়ে নিয়ে না আস্‌ত তাহ'লে ভালমন্দ বিচারই বা করতুম কী ক'রে?"

এভিলিন্ বিনয়ের পিঠ চাপড়িয়ে উৎসাহের সঙ্গে বল্‌ল—"এত শিগ্‌গির মুসড়িয়ে যেয়োনা বাপু! জীবনটা আর গোলাপ ফুলের বিছানা নয়, তবে আর সুখ কিসের? সব ভাবনা দূরে রেখে কাফিটা ঠাণ্ডা হবার আগে খেয়ে ফেলত দেখি, লক্ষ্মী ছেলের মত। ভুলে যাও যে তোমার থাকবার ঠাঁই নাই। আমার কুটীরে আজকের রাতে তুমি একজন সম্মানিত অতিথি। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার সফলতার জন্য এই কাফি পান করলুম।

এই বলে এভেলিন্ নিজের বাটীতে দীর্ঘ একটা চুমুক দিল। বিনয়ও তার পেয়ালাটা মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে এভিলিনের বাটী ছুঁইয়ে এক ঢোক খেয়ে ফেল্‌ল। তারপর আস্তে আস্তে এভিলিনের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্‌ল—"আজকে সকালে যখন পকেটে একটিও পয়সা নাই এই চিন্তা নিয়ে জেগেছিলাম, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, ভগবান্ আমার জন্য এ রকম আশীর্ব্বাদও কোনোখানে সঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন।"

এভেলিন্ যেন অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে উঠ্‌ল এবং বল্‌ল—"এসব চাটুবাক্য শোনার আমার এখন অবসর নাই।

কাল ভোরে নটায় অফিসে হাজিরা দিতে হবে। কাজেই ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। তুমি গিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত বিছানায় ঢুকে পড়, আমি সোফায় একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ছি।"

বিনয় অকস্মাৎ সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ল এবং দৃঢ়তার সুরে বল্‌ল—"তা কিছুতেই হবেনা। তোমাকে সোফায় শুতে দিয়ে আমি আরামে বিছানায় ঘুমোব এ কিছুতেই হবে না। আমি কাপড়চোপড় ছাড়বনা এবং এখানেই ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি চট্‌করে কাপড় ছেড়ে বিছানায় ঢুকে পড়।"

অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর এভিলিন্ রাজী হ'য়ে আলো নিভিয়ে দিল এবং বিছানার ভিতর থেকে বিনয়কে শুভরাত্রি জানিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

* * * *

তখন ভোর হ'য়ে আসছে যদিও শীতের প্রভাতে আলোর ক্ষীণ রেখাও কোথাও জাগে নি। বিনয় আগুনের কাছে সোফায় পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। সারাদিনের দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তির পর সর্ব্বাঙ্গে তার ঘুম এসেছে। এভিলিন্ কতক্ষণ থেকে সোফার উপর ঝুঁকে তার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে জানতেও পারে নি, এবং তার ঘুমন্ত চোখে ও ললাটে কত স্নেহভরে অজস্র চুমো দিয়েছিল তাও সে জান্‌তে পারেনি।

চোখ মেলে যখন চায়ের বাটী হাতে এভিলিন্‌কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখ্‌ল তখনও তার বিস্ময় কাটে নাই। গত রাতের সমস্ত ঘটনা স্মরণ ক'রে ধড়্‌ফড়্ ক'রে উঠেই এভিলিন্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বেরুবার জন্য তৈরী হ'তে লাগ্‌ল।

এভিলিন্ দরজার কাছ পর্য্যন্ত এসে করমর্দ্দন ক'রে আস্তে আস্তে বল্‌ল—"এভিলিন্‌কে ভুলে যাবে না ত? এই খামের মধ্যে আমার কার্ড আছে। পকেটে পুরে নাও।"

বিনয় খামটা পকেটে পুরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। এভিলিন্ দরজার আড়াল থেকেও হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

(৬)

বাড়ীর দরজার সাম্‌নে এসে আশঙ্কায় বিনয় অনেকক্ষণ ধরে দরজার কড়া নাড়তে সাহস পায় নি। অনেকক্ষণ দ্বিধার পরে বেল্ টিপে দেওয়া মাত্রেই মিসেস্ ওয়ারেন ছুটে এসে দরজা খুলে দিল এবং অত্যন্ত সসব্যস্ত হ'য়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বিনয়কে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। কেন সে রাতে আসেনি? এই শীতের রাতে কোথায় ছিল ইত্যাদি।

বিনয় অকস্মাৎ মিসেস্ ওয়ারেনের ভাববিপর্য্যয়ের কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল এবং অনুভব করল সত্যিই এই ইংরেজ মহিলার হৃদয় তার কষ্টে দ্রবীভূত হয়েছে, এবং লক্ষ্য করল যে মিসেস্ ওয়ারেনের চোখ ছলছল করছে।

ইতিমধ্যে মিসেস্ ওয়ারেনের বিধবা ছোট বোন্ এসে হাজির হয়েছে। সে দিদিকে শীগ্‌গির বিনয়ের জন্য প্রাতরাশ তৈরী করতে পাঠিয়ে দিয়ে ধমকানির সুরে বল্‌তে লাগ্‌ল—"একটা আশী বছরের বুড়ীর রাগের ভয়ে তুমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেলে? তুমি না যুবক, তোমার সম্মুখে না সমস্ত জীবনটা এখনও বাকী? আর তুমি কিনা, কবরে পা বাড়িয়ে রয়েছে, এ রকম এক বুড়ীর ধমকে বাড়ী থেকে ভয়ে উধাও হ'লে? যৌবনের প্রতি কি তোমার এতটুকু মর্য্যাদা-বোধও নাই?

বিনয় বিস্মিত হ'য়ে ভাব্‌তে লাগল, সত্যিই ত তার যৌবনের যে কানাকড়িও দাম আছে একথা ত আজকের এই মুহূর্ত্তের আগে তার একটিবারও মনে পড়ে নাই। আর সত্যিই কী মানুষের যৌবন একটা স্বতন্ত্র জিনিষ? য়ুরোপে এসেই বারবার একথা সে সর্ব্বত্র শুনেছে, যৌবনের সম্মান কর। সমাজকে, রাষ্ট্রকে? ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে যৌবনের মূল্য অধিকতর। বিনয় ভাব্‌ছিল, কী জানি একথা সত্য কিনা?

আচ্ছন্নের মত অন্যমনস্কভাবে ঘরে ঢুকেই দেখ্‌ল টেবিলের উপর তার নামে ব্যাঙ্ক থেকে এক চিঠি এসেছে। গত কাল দেশ থেকে কে একজন তাকে কিছু টাকা পাঠিয়েছে।

আনন্দের আতিশয্যে অভিভূতের মত সে সোফায় বসে পড়ল এবং গত রাতের কথা মনে পড়াতেই এভিলিনের দেওয়া খাম খানা সে পকেট থেকে বার ক'রে খুল্‌ল। খামের ভিতরে কোন কার্ড ছিল না, ছিল শুধু দশ শিলিংএর একখানা নোট আর এই কটি কথা—

I have loved you for a night and the memory of that night will bring for ever bliss to my life. So, Good-bye.—Evelyn.

অনেকক্ষণ অবাক হ'য়ে বিনয় চিঠি ও দশ শিলিংএর নোটখানার দিকে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল। সে শুধু ভাব্‌ছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মানুষের জীবনে কত কিছুই না ঘট্‌তে পারে?

শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়

আলোচনা

১। জগতের সর্ব্ববৃহৎ লাইব্রেরী ও বৃটিশ মিউজিয়ম

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর বি-এ

গত আষাঢ় মাসের বিচিত্রায় 'নব যুগের সাধনা' প্রবন্ধে, ৭৭১ পৃষ্ঠায় কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় লিখিয়াছেন —'British Museum জগতের মধ্যে, সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী ; তাহারই পুস্তকসংখ্যা ৪০ লক্ষ মাত্র।'

বর্ত্তমান বর্ষের (১৯৩৪) Hindusthan Year Bookএ জগতের বড়ো বড়ো লাইব্রেরীগুলির একটী তালিকা আছে, তাহাতে দেখা যায় British Museumএর স্থান তৃতীয়। লেখক মহাশয় মুদ্রিত পুস্তকের কথাই বলিতেছেন, সুতরাং অন্যদিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও, এই হিসাবে উহা তৃতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

নীচে একটা তালিকা দিলাম—

1. Public Library, Leningrad,—About 4, 832, 948 books, 331,000 Pamphlets.

2. Bibliotheque Nationile, Paris,—About 4,000,000 printed books; 20,000 books in Chinese, 125,000 Mss., 205,000 coins and medals and about 3,000,000 prints.

3. British Museum, London,—Probably about 3,200,000 printed books, 53,650 Mss., 85,000 Charters and Rolls, 18,000 seals and casts of seals, 2850 Papyri, 120,000 Oriental printed books and 16,400 Oriental Mss.

Hindusthan Year Book—1934.
P. 23.

Year Bookএর হিসাবে British Museum এর মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ৩৩ লক্ষের কিছু বেশী এবং রায় মহাশয়ের হিসাবে ৪০ লক্ষ।

রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের উপাদান কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন জানিনা এবং Hindusthan Year Bookএর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার উপাদান কোথা হইতে লইয়াছেন তাহাও জানান নাই। তবে আমার মনে হয়, আপনার পত্রিকায় যখন ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, তখন বিচিত্রার পৃষ্ঠাতেই আলোচনা হইয়া স্থির হওয়া উচিত—

১। জগতের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ লাইব্রেরী কোনটী?

২। British Museumএর পুস্তক সংখ্যা কত?

২। বাঙ্গলা সাহিত্যে একশত ভালো বই

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গুহ বি-এল্

গত মাসের "বিচিত্রা"র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়ের "বাংলা সাহিত্যে একশত ভালো বই"এর তালিকাটি দেখিলাম। শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের তালিকায় "অনেক ভালো বহির নাম তিনি বাদ দিয়াছেন" সন্দেহ নাই। এরূপ বাদ দেওয়া বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের পক্ষে আদৌ অগৌরবের কথা নহে এবং ১০০ খানি পুস্তকের মধ্যে যে তালিকা পর্য্যবসিত তাহাতে বহু ভাল পুস্তক বাদ না পড়িয়াই পারেনা। কিন্তু দাস মহাশয়ের তালিকাটিকে

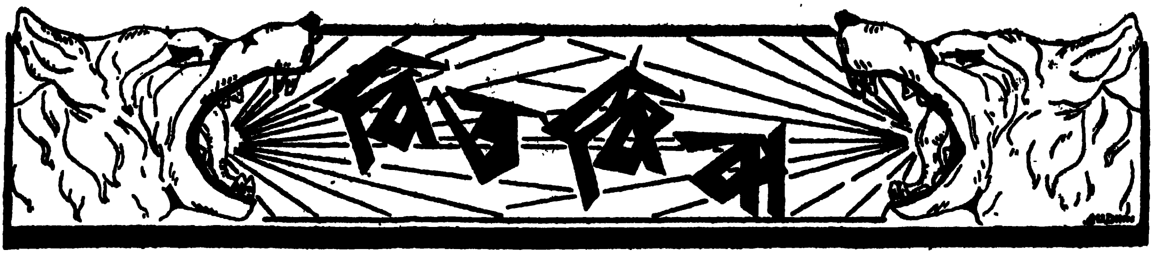
যদিও তিনি স্বয়ং "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ দোষবর্জ্জিত ও ভ্রম-লেশহীন" বলিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই, তথাপি আমরা এই দাবিটি নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে পারিতেছি না এবং মনে হয় তাঁহার "লাইব্রেরীতে অনেক বাংলা, ইংরেজী, এমন কি ফরাসী ভাষায় অনেক অনেক ভালো পুস্তকই" থাকা সত্ত্বেও তিনি "যে সব অক্লান্তকর্ম্মী সাহিত্যসেবী বহুবৎসর ধরিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বহুদিক্ দিয়া নানা উপকরণ ও আনুষঙ্গিক মালমশ্লা সংগ্রহ করিয়া যে সব অমূল্য রত্নরাজি বাংলাভাষায় দান করিয়াছেন তাঁহাদের কোন সন্ধানই তিনি লন নাই।" আমিও "শুধু একখানি গ্রন্থের নাম করিব", যে "বইখানিকে দেখিলে মনে হয় বাংলাসাহিত্যের একটী অমর অক্ষয় অবদান" ইত্যাদি। ডক্টর শশাঙ্কমোহন সেনের "বাণীমন্দির" খানি (যাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) এরূপ একখানি পুস্তক নহে কি? ইহার সমকক্ষ একখানি পুস্তক বাংলাভাষায় আছে কি? তা ছাড়া, শশাঙ্কমোহনের "সাবিত্রী", "স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে" এবং "শৈলসঙ্গীত"এর ন্যায় কয়খানি পুস্তকই বা বাংলাভাষায় আছে? আমার জানিতে কৌতূহল হয় যে শ্রীযুত দাস মহাশয় এই সমস্ত পুস্তকের এবং শশাঙ্কমোহনের "বঙ্গবাণী"র সহিত পরিচিত থাকিয়াও ইহাদের একখানিরও "কোন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা আছে বা ভবিষ্যতে থাকিতে পারে" না বিবেচনা করতঃ উহাদিগের কোনখানিকে তাঁহার তালিকায় স্থান দেন নাই কিনা, এমন কি সেন মহাশয়ের তালিকায় অন্তর্গত ,,স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে" নামক কাব্যখানিকেও "লক্ষ্যের মধ্যে আনেন নাই" এবং "কোন আমলই দেন নাই" কিনা! তাঁহার ন্যায় নানা গ্রন্থের লাইব্রেরীর মালিক বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে শশাঙ্কমোহনের পুস্তক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা কল্পনা না করাই সঙ্গত, বিশেষতঃ যখন সেন মহাশয়ের তালিকার অন্তর্ভুক্ত "স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে"র ন্যায় কাব্যখানি দাস মহাশয়ের তালিকায় স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে কোথাও স্থান পায় নাই, তখন অনুমান করা অন্যায় নহে যে তাঁহার তুলনায় বিচারের ফলেই ঐ পুস্তকখানি অবজ্ঞাত নরকে স্থান পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। শশাঙ্কের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বোধ হয় সকলের ভাল লাগে না, বিশেষতঃ যাহারা কালধর্ম্মপ্রভাবে সাহিত্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি নিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন। তাহাদের কাহারও কাহারও আবছায়া এবং অন্ধকারই প্রিয়তর হইতে পারে। দাস মহাশয়ের সাহিত্য-সহানুভূতি সে দিকে কি না নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না, যদিও তিনি "বড় বেশী আধুনিক, বড় বেশী দুঃসাহসী, হয়তো বড় বেশী অশ্লীল" লেখকদের অনুকূলে "অনেক কথাই" লিখিয়াছেন এবং গলিত শব আশ্রয় করিয়া সাধনার পক্ষপাতী সাহিত্য-তান্ত্রিকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

আরও একাধিক পুস্তক সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উল্লিখিত ইন্দিরা-দেবীর "স্পর্শমণি"ও দেখিতেছি দাস মহাশয়ের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই, যদিও একাধিক অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট (যাহারা নিজেদের মত "ভ্রমলেশশূন্য" মনে করিবেন না এরূপ ব্যক্তিদের মতে) পুস্তক তাঁহার তালিকায় স্থান পাইয়াছে।

পত্র সুদীর্ঘ হইয়া গেল, আর বাড়াইব না। আমার ন্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রহ্মদেশ-প্রবাসী নগণ্য ব্যক্তির উপর "কোন পুস্তকবিশেষের বিজ্ঞাপন" দেওয়ার অভিসন্ধি আরোপিত হইতে পারে কিনা জানিনা। আর সম্ভবতঃ আমার ন্যায় সাহিত্য-রাজ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির লিখা কিছু "বিচিত্রা"য় প্রকাশিত হইবার যোগ্যই বিবেচিত হইবে না।*

---

* আশঙ্কা অমূলক। বিঃ সঃ



১। বাঙ্গালী বিধবার বৈশিষ্ট্য

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম্‌-এ

বাংলার হিন্দু বিধবার পোষাক সধবা ও কুমারীর পোষাক হ'তে বিভিন্ন। তা'তে বিধবার বৈধব্যের প্রতি বিশেষভাবে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আভরণহীন, বর্ণহীন এবং সাধারণতঃ অন্তর্বাস (underwear)-হীন বিধবার পোষাক তার হতভাগাটাকেই সমাজে ঘোষণা করে। হয়ত এ পোষাকের মূলে ছিল বিধবার ব্রতী সাজ্‌বার ব্যক্তিগত বা সামাজিক ইচ্ছা। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিধবা সাধারণতঃ সধবার মতই পোষাক ও আভরণ পরে থাকে, শুধু কপালে সিঁদুর দেয়না। (মহারাষ্ট্রে যে বিধবা শিরঃমুণ্ডন করে সেই শুধু ভিন্ন পোষাক পরে)। বিধবার সিঁদুর না থাকাটাও কেহ কেহ বিসদৃশ মনে করছে; মহারাষ্ট্রে কেহ কেহ বিধবাকেও সিঁদুর পরাবার জন্য আন্দোলন কর্চ্ছে। বাঙ্গালীর চক্ষে কি বিধবার শ্রীহীনতা বিসদৃশ ও নিষ্ঠুর বলে ঠেকে না? বাঙ্গালীর অন্তঃকরণ কোমল বলেই লোকে জানে; এ করুণ দৃশ্যটা তার প্রাণে আঘাত করে না? যদি করে তবে সে কেন তা' সৃষ্টি কর্চ্ছে?

বাঙ্গালী বিধবার আহার ও সধবা-কুমারীর আহার হ'তে বিভিন্ন। সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর বিধবারাই নিরামিষাশী। অনেকেরই ধারণা নিরামিষ আহার বিধবার জন্য মুনি ঋষিরা নির্দ্দিষ্ট করে গেছেন, কারণ তা' ব্রহ্মচর্য্য পালনের সহায়তা করে। এ কথাটাতে কতদূর সত্য আছে তার বিচার করা দরকার। ভারতে জৈন, লিঙ্গায়ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক আমিষ স্পর্শও করেনা। সে কারণে তারা আমিষাশী সম্প্রদায়ের লোকের চেয়ে অধিক সংযমী বা চরিত্রবান্, একথা তারা নিজে বা অন্য কেউ বলতে পারবে না, সরকারী অপরাধ-বিষয়ক বিবরণেও সে যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না।

বাংলার বাইরে সধবা বিধবার আহারের পার্থক্য নেই। বাংলায় তা' রাখবার বিশেষ দরকার আছে কি?

২। ছন্দের গঠন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ

সম্প্রতি 'বিচিত্রা'র 'বিতর্কিকা'য় ছন্দের গঠন-তত্ত্ব নিয়ে যে জিজ্ঞাসার অবতারণা করা হ'য়েছে তার সম্বন্ধে সহজ ভাবে কোন জবাব দেওয়া সম্ভব হবেনা এজন্যে যে যা "কাব্য হিসেবে" "মূল্যহীন" এবং "তথ্য হিসেবে"ও তথৈব চ অর্থাৎ যা' সোজা কথায় কবিতাই নয় তা'র স্থির কোন ছন্দরূপও থাকতে পারেনা। যাকে কবিতা বলেই স্বীকার করিনে তা'র আর ছন্দই কি আর তার বিচারই বা কি করে সম্ভব? নীচের যুক্তিগুলোই আমার এই উক্তির সাপক্ষে দাঁড় করাচ্ছি।

যে কবিতাটিকে আশ্রয় ক'রে ছন্দের গঠনতত্ত্ব আলোচিত

হ'বার জন্ত নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে তা' কোন নির্দ্দিষ্ট ছন্দে লেখা কবিতা হয়নি। কবিতার এক পংক্তি পড়লেই তার ছন্দ-সুর আপ্‌না থেকেই কানে বেজে উঠে; তখনই চট্‌ ক'রে বুঝ্‌তে পারি কবিতাটি অক্ষর-বৃত্ত, স্বরবৃত্ত কি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত। আলোচ্য কবিতাটি'র কোন অংশ অক্ষর-বৃত্ত, কোন অংশ স্বরবৃত্ত ও কোন অংশ আবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা; শুধু তাই নয় কোন অংশ আবার নিছক গদ্য পদবাচ্য। একে একে সবই উদ্ধৃত ক'রে দেখাচ্ছি।

কবিতাটিকে যে ভাবে সাজিয়ে লেখা হ'য়েছে অর্থাৎ এর বাহ্যরূপ দেখে একে অক্ষর-বৃত্ত দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ বলে ভুল হ'বে। এবং এই ভুলের বশবর্ত্তী হয়ে এটিকে অক্ষরবৃত্তানুরূপ আবৃত্তি করতে আরম্ভ ক'রে,

"ঐ তোমার দৃষ্টিখানি যে মধুর বার্ত্তা আনি'
উঠ্‌ত গো মোর বুকে বেজে,"

এই পর্য্যন্ত পড়েই তার পরবর্ত্তী ছত্রাংশেই

"তোমার ঐ হৃদয় জুড়ে—"

পর্য্যন্ত এসেই অক্ষরবৃত্তের আবৃত্তিসুরের পরিবর্ত্তন করতে হবে কারণ এই ছত্রাংশে আট অক্ষরের স্থলে নয় অক্ষর হওয়ায় অর্থাৎ একটি অক্ষর বেশী থাকায় অক্ষর-বৃত্তের গুরুতর ব্যতিক্রম হ'য়ে গেল।

এবার আবৃত্তি-সুরের একটু মোড় ঘুরিয়ে দেখা যাক্‌ ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়। এখন দেখা যাক্‌ কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত কিনা? ছন্দের এ রীতি অনুসারে কবিতাটির প্রথম দু'টি পংক্তিকে এ ভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে; যেমন,

| ||||||| (১০ মাত্রা)
ঐ (অই) তোমার দৃষ্টিখানি

| |||||| | | (৯ মাত্রা)
যে মধুর বার্ত্তা আনি

|| | | ||||| || (১০ মাত্রা)
উঠ্‌ত গো মোর বুকে বেজে,

|||| |||| || (১০ মাত্রা)
তোমার ঐ হৃদয় জুড়ে

| || ||| | | (৮ মাত্রা)
যে প্রেম সদাই স্ফুরে

|||| ||| || | | (১১ মাত্রা)
হায় প্রিয়ে, আজকে কোথা সে যে

তা' হ'লে উপরের দু'পংক্তির মাত্রা নির্দ্দেশ থেকে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, এক পংক্তির মাত্রা সংখ্যা হচ্ছে, ১০+৯+১০ ও অপর পংক্তির ১০+৮+১১। অতএব এ থেকেই স্পষ্ট দেখা গেল যে আলোচ্য কবিতাটি মাত্রাবৃত্তের শুদ্ধি রক্ষা ক'রে চলেনি' অর্থাৎ এ মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরও কবিতা নয়। তবে দেখা যাক্‌ স্বরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ নিয়মগুলো এর উপর প্রযুজ্য হয় কি না!

স্বরবৃত্ত ছন্দের রীতি অনুসারে চরণের প্রত্যেক স্বরান্ত-ব্যঞ্জন কি স্বর অর্থাৎ উচ্চারণ বা ধ্বনি-স্থানগুলো কতকগুলো নিয়মিত ছেদে বিভক্ত হ'য়ে থাকে যেমন,

| ||| | ||| || | | | |
"সাম্‌নেকে তুই | ভয় করেছিস্‌ | পেছন্‌ তোরে | ঘিরবে ॥"

এখানে চারটি ধ্বনিস্থানের পর পর নিয়মিত ছেদ পড়ে গেছে সেজন্ত এটিকে স্বরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত বলা হবে। কিন্তু আলোচ্য কবিতাটি এমন ছেদ ও ধ্বনি-রীতির শাসন মেনে চলেছে কি না দেখা যা'ক্‌:

| || |||| || |||||||| ||
ঐ তোমার দৃষ্টিখানি || যে মধুর বার্ত্তা আনি ||

| | | | | | |?|
উঠ্‌ত গো মোর বুকে বেজে,

| | ||| || | | || ||
তোমার ঐ হৃদয় জুড়ে যে প্রেম সদাই স্ফুরে

| ||| | | | | |
হায় প্রিয়ে আজ্‌কে কোথা সে যে?

উপরের ধ্বনিস্থান-নির্দ্দেশ থেকে এই দেখা গেল যে এর প্রথম পংক্তিটুকুর মধ্যে স্বরবৃত্তের নিয়মানুযায়ী নিয়মিত ধ্বনিস্থানের পর পদচ্ছেদ ঘট্‌লেও দ্বিতীয় পংক্তিতে এ নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটেছে। এমন কি এর প্রথম পংক্তিতে যে পর্য্যন্ত গলদ র'য়েছে তা উপরের নির্দ্দেশ-চিহ্নগুলো দেখ্‌লেই জানা যাবে। কারণ প্রথম পংক্তির ধ্বনিস্থান সাতের পর দু'বার ছেদ পড়্‌লেও তৃতীয়বার সপ্তম ধ্বনিস্থানের পর আর ছেদ পড়্‌ল না। ছেদ পড়্‌ল গিয়ে একেবারে শেষে; আটের পর। অতএব স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে আলোচ্য কবিতাটি স্বরবৃত্ত ছন্দেরও অন্তর্গত নহে! আধুনিক বাংলা আলঙ্কারিকদের মতে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের

পরও আর একরকম ছন্দ নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে। তাকে বলা হয়, অসম ছন্দ। এর বিশেষ গুণ এই হ'ল যে পদান্তে মিল থাকলেও এর পদ মধ্যে যতির কোন নির্দ্দিষ্ট হিসেব-বিচার নেই। এ স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত দুই-ই হ'তে পারে, যেমন,

অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি,—
খড়্গ ধর প্রেমিক আমার,
কর গো বিচার।......(অক্ষর বৃত্ত)

কিম্বা,

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবে মাত্র এগারো মাস হবে,
গুজব গেল শোনা
এই বাড়ীতে ঘটক করে আনাগোনা।...(স্বরবৃত্ত)

এখন আলোচ্য কবিতাটি এ ছন্দের অন্তর্গত কিনা তা' দেখা যাক্। কবিতাটির মধ্যে অল্পবিস্তর ছন্দপতন দোষ থাকলেও এটি পড়লেই বোঝা যাবে যে এতে পদভাগে মিলের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, 'খানি' 'আনি'; 'জুড়ে' 'ফুরে'; 'আগে' 'মাগে' ইত্যাদি। পদান্তে মিল থাকলেও অসম ছন্দের কবিতায় পদভাগে মিল থাকতে পারে না কারণ এর যতি অনিয়ম-বিন্যস্ত ব'লে সুনির্দ্দিষ্ট পদভাগ এর নেই; অতএব তাতে মিলের কোন প্রশ্নই উঠেনা। সেজন্য আলোচ্য কবিতাটি অসমছন্দের মধ্যে গিয়েও পড়ল না।

এখন দেখা গেল যে, যে কবিতাটিকে আশ্রয় ক'রে "ছন্দের গঠন-তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা করা" তাকে কোন নির্ভুল ছন্দের পদবীর মধ্যে টেনে নেওয়া গেলনা। তা' হ'লে বুঝতে হবে যে কবিতাটি কোন বিশেষ ছন্দেরই অশুদ্ধ সংস্করণ। এখন এর অশুদ্ধিগুলো দেখিয়ে দিলেই কবিতাটির ছন্দ দোষ যে কত মারাত্মক তা' সহজেই চোখে পড়বে।

কবিতাটির প্রথমভাগ মূলতঃ অক্ষরবৃত্তের দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের মধ্যে নিয়ে ফেলা যায়; অবশ্য যেখানে যেখানে ভুল রয়েছে সেই সেই জায়গায় দীর্ঘত্রিপদীর নিয়মানুসারে পদ ভাগে ৮+৮+১০ ক'রে অক্ষর বিন্যাস ক'রে নিলেই কবিতাটির নির্ভুল হয়।

আলোচ্য কবিতাটির দ্বিতীয় ভাগ স্বতন্ত্র ছন্দের অন্তর্গত। যেমন,

"আবার তোমার ঐ দৃষ্টিখানি প্রিয়ে
রাখ মোর মুখে,
তোমার ঐ চিত্তখানি মোর চিত্ত দিয়ে
বুক রাখ বুকে!"

এই ছন্দটি অক্ষরবৃত্ত পয়ারের স্বজাতি। পয়ার যদি পদ চার হয় তা' হ'লে এর এক এক কলি পদ বেশি আছে ব'লে একে ষট্‌পদী বলা চলে। তবে একটু গোলমাল বাঁধছে দুই পদেরই দু'টি যুগ্ম-স্বরকে (Dipthong) নিয়ে। এদের যদি ভেঙে লিখি অর্থাৎ 'ঐ' কে 'অই' ক'রে লিখি তা'হ'লে চোখের ক্ষতি-পূরণ হয়ত হ'ল কিন্তু তাতে কানের কাছে চোখের চুরি ধরা পড়ল। আর ছন্দ ত কানেরই, চোখের ত নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অক্ষর-বৃত্ত ছন্দে যুগ্ম-স্বরের স্থান কি? এ নিয়ে এই 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠেই মসীযুদ্ধ কম হয়নি। কিন্তু আমি স্পষ্টতঃই যা বুঝতে পারি তা' এই যে যুগ্ম-ব্যঞ্জনের যদি অক্ষরবৃত্তে এক অক্ষরের ওজন হ'ল তা'হলে যুগ্ম-স্বরের মধ্যে দায়ে পড়ে দুই অক্ষরের হিসেব করা চলবে কেন? ওকেও এক অক্ষর হিসেবেই ধরতে হবে। এই নিয়ম অনুসারে উদ্ধৃত পদ্যাংশটুকু নির্ভুল অক্ষরবৃত্ত নহে। এতে ৮+৬+৬ এরকম পদভাগ ও অক্ষরবিন্যাস থাকলে ওকে অক্ষরবৃত্ত 'ষট্‌পদী' বলতে পারি। আলোচ্য কবিতার এই শেষভাগে অক্ষরবৃত্তের নিয়মানুযায়ী দু'এক স্থলে দু'একটি অক্ষরের কম্-বেশ ক'রে একে নির্ভুল অক্ষরবৃত্ত ষট্‌পদীতে দাঁড় করান যায়।

অতএব এসব আলোচনা ক'রে দেখা গেল যে যে কবিতা 'কাব্যহিসেবে' 'মূল্যহীন' এবং 'তথ্য হিসেবে'ও তাই, ছন্দ হিসেবেও সে একটা বড় আমল পেলনা।

৩। নামের পদবী

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

মেয়েদের নামের পদবী নিয়ে যথেষ্ট গোলমাল হয় সত্য। আজ যে মিস্ স্মৃতিরেখা দাস কাল সে মিসেস্ স্মৃতিরেখা বোস হ'য়ে যেতে পারেন এবং বিবাহের পর স্মৃতিরেখা বোস এই নাম জেনে সেই স্মৃতিরেখা দাস কিনা তা' ঠাহর করা শক্ত হ'য়ে পড়ে সত্য। কিন্তু পদবীর বদলের জন্য যে গোলমালের সৃষ্টি হয় তা' সমাধান করার আগে নামের জন্য যে সমস্যার আবির্ভাব হয় তার একটা নিষ্পত্তির চেষ্টা করা ভাল; কারণ পদবীর বদলের জন্য গোলমাল হয় দু'জন নারীরই ভিতর, কিন্তু নামের জন্য গোলমাল বাধে নারী ও পুরুষের ভিতর।

আজকাল মেয়েদের নামের গোড়ায় 'শ্রীমতী' লেখার রীতি ত প্রায় উঠেই গেছে। পুরুষ ও নারী উভয়েরই নামের পূর্ব্বে কেবল 'শ্রী'ই শ্রীদান করে। মাসিক পত্রিকায় যাঁরা প্রবন্ধ বা কবিতা লেখেন তাঁরা কেবল লেখেন শ্রী'অমুক'—তিনি পুরুষই হ'ন আর নারীই হ'ন। যিনি লিখেছেন তিনি লেখক কি লেখিকা তা' পাঠকের কাছে মাঝে মাঝে বুঝে ওঠা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। স্ত্রীলোকদের স্ত্রীবাচক নাম এবং পুরুষদের পুংবাচক নাম যদি হ'ত তা'হ'লে এই বিষয়ে কোন গোলমালই থাকত না—নামের আগে 'শ্রী'ই থাকুক বা 'শ্রীমতী'ই থাকুক। নামের মধ্যভাগ একেবারে উঠে যাওয়ায় পাঠক লেখকের লেখা পড়ছেন, না লেখিকার লেখা পড়ছেন তা' নির্ণয় করতে একেবারে অসহায় বোধ করেন। যেমন যদি লেখা থাকে—শ্রীজ্যোৎস্না মিত্র। এই নামটী যাঁর তিনি পুরুষ কি নারী তা' নির্দ্ধারণ করা এক রকম অসম্ভব। কিন্তু যদি নামের মধ্যভাগের উল্লেখ থাকে তা' হ'লে এই গোলমালের আর সম্ভাবনা ঘটেনা। শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার মিত্র বা শ্রীজ্যোৎস্নারাণী মিত্র —কোনটী কার হওয়া উচিত তা' স্পষ্টই বোঝা যায়। দু'জনেরই নামের আগে 'শ্রী' থাকলেও কোন অসুবিধা হয় না। এই রকম প্রতিভা দাসগুপ্ত—এই নামও যথেষ্ট গোলমালের সৃষ্টি করতে পারে; যেহেতু স্ত্রীবাচক প্রতিভা নামও অনেক পুরুষের দেখা যায়। শ্রীরমা বসু বলতে আমরা উভয় রূপই কল্পনা করতে পারি—যতক্ষণ না আমরা পুরো নাম জানতে পাই। রমাপদ বসু কিংবা রমারাণী বসু —কোনটা ঠিক জানলেই আর আমাদের এ বিপদে পড়তে হয়না। যে ক্লাসে ছেলে মেয়ে একসঙ্গে পড়ে সেখানে যদি প্রোফেসার বলেন বিমলা ব্যানার্জ্জিকে বাইরে ডাকছে ছেলেদের চোখ পড়ে মেয়েদের উপর, কিন্তু যখন তাদেরই মধ্যে থেকে গোঁফদাড়ি নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে ওঠে তখন হাসির রোল উঠতে দেরী হয়না এবং বিমলাকেও যথেষ্ট অপ্রতিভ হ'তে হয়। মেয়েদেরও ঠিক এই একই অবস্থায় পড়তে হ'তে পারে। মনীষা, বকুল, সঙ্ঘমিত্রা, কমলা, বীণা প্রভৃতি নাম এখন নারীদেরই একচেটে এবং নিত্যানন্দ, বিমান, রজত, মুরারী প্রভৃতি নামের উপর পুরুষেরই অধিকার বেশী; কিন্তু কালের গতি যে রকম তা'তে কোন নামেই কোন লিঙ্গের একচেটে অধিকার থাকবে না। কাজেই নামের সমস্যার সমাধান সবচেয়ে ভাল ভাবে হয় যদি নারীদের সকলেই নামের গোড়ায় 'শ্রীমতী' লেখেন।

এইবার পদবী বদলের কথা। পদবী বদল হবার বালাই পুরুষের নেই। অবিবাহিত অবস্থায় যে সন্তোষ বসু বিবাহিত অবস্থায়ও সে সন্তোষ বসু। বিবাহের পর স্ত্রীর পদবী অনুসারে পদবী বদল করার মত দুর্ভাগ্য পুরুষের হয়নি। বিবাহের পর মেয়েদের পদবী বদলে যাওয়ায় অসুবিধা হয় বটে—কিন্তু তাও দূর করা সম্ভব। শ্রাবণ সংখ্যায় বিতর্কিকাতে শ্রীমতী নির্ম্মাল্য রায় বলেছেন যে নারীদের পক্ষে নামের পদবী উঠিয়ে দিয়ে 'দেবী' ব্যবহার করলেও বড় গোলযোগ হবে 'যেহেতু স্কুল কলেজে এক ক্লাসে ও পরিচিত মহলে' একই নামযুক্তা বহু নারী থাকতে পারে। একথা সত্য। তিনি এর প্রতীকারের কোন উপায় দেখেননি। 'এ শুধু আমাদের দেশে নয় সব দেশেই, নর-নারীর তুল্য অধিকার যেখানে মেনে নেওয়া হয়েছে সেই পাশ্চাত্যেও Miss Walker বিয়ের পর তাঁর স্বামীর পদবী

অনুসারে হবেন Mrs. Jackson; আমাদের দেশে ত কথাই নেই'—এই বলে তিনি তাঁর অপারদর্শ্যের যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের লোকেরা খ্যাতনামা নারীদের বিবাহের পরও পদবী বিষয়ে গোলোযোগ কিরূপে বিদূরিত হ'তে পারে তার পন্থাও দেখিয়েছেন। Miss Amy Jhonsonএর নাম বিশ্ববিশ্রুত হ'য়ে গেল—তারপর তাঁর যখন বিবাহ হ'য়ে গেল তখন তাঁর নাম হ'ল Mrs. Mollison। এখন Mrs. Mollison বললে তিনিই যে পূর্ব্বেকার Amy Jhonson তা' কারুর বুঝতে দেরী হয় না। যখন প্রথম বিবাহ হ'ল তখন তাঁর নাম Mrs. Mollison ব'লে পাশে 'পূর্ব্বেকার Amy Jhonson'—লেখায় সে গোলমাল এড়ান গেছে। কিছুদিন এইরূপ লেখার পর সকলে জানলেন Mrs. Mollisonই Miss Amy Jhonson। এখন Mrs. Mollison লিখলেই সকলে Amyকেই বোঝেন। গায়িকা রেণুকা সেনগুপ্তা এখন রেণুকা দাস। তাঁর পদবী বদলে যাওয়ায় তাঁকে কোনই অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। উক্ত উপায়েই এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয়েছে। যাঁরা এক পদবীতে লোকের কাছে বিদিতা, পদবী বদলের পর তাঁদের এই পন্থা অবলম্বন করতে হবে—আর যাঁরা সাধারণের কাছে অবিদিতা তাঁদের ত এ বালাই একেবারেই নেই।

অপরিচিতা নারীকে কিরূপে সম্বোধন করা উচিত সে বিষয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের "মা" ব'লে সম্বোধন যুক্তিসঙ্গত নয়—তার কারণ শ্রীমতী নির্ম্মাল্য দেবীই দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি তাঁর সঙ্গে প্রায় সব বিষয়েই একমত—কেবল এক বিষয় ছাড়া। তিনি বলেছেন বোন ব'লে ডাকা 'একটু কেমন যেন ঠেকে—ডাকবার পক্ষে তেমন সহজ নয়।' কিন্তু সমবয়সী বা বয়সে কিছু ছোট মেয়েদের সঙ্গে অন্য কোন রকম সম্বন্ধ না থাকলে সবচেয়ে যোগ্য সম্বন্ধ ভ্রাতা ও ভগিনী। যখন সব জাতিই ভগিনী হিসাবে সম্বোধন করে তখন আমাদের বোন বললে কেনই বা মিষ্টি শোনাবে না। আমাদের দেশে এরূপ সম্বোধনের প্রচলন নেই ব'লেই প্রথমটা একটু কেমন কেমন লাগবে, কিন্তু প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এর মিষ্টত্বও বাড়বে আশা করা যায়। অবশ্য কিরূপ সম্বোধন পেলে নারীজাতি খুসী হবেন তা' শ্রীমতী নির্ম্মাল্য দেবী আমার চেয়ে বেশী বুঝবেন।

৪। বানান-সমস্যা

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিভিন্ন লেখকের লেখা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার যাঁদের কারণ ঘটে তাঁরা জানেন বাঙলা ভাষার বানান নিয়ে, বিশেষতঃ কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদের বানান নিয়ে, ক্রমশঃ একটা দুরূহ সমস্যা গ'ড়ে উঠেছে। একই শব্দ বিভিন্ন লেখকে বিভিন্ন বানান দিয়ে ব্যবহার করছেন, শুধু সেই কথাই বলছিনে; একই লেখক অনেক সময়ে তাঁর এক লেখারই মধ্যে একই শব্দের একাধিক বানান ব্যবহার করছেন তাও দেখা যায়। এর দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, কোনো কোনো শব্দের বানানের অদ্বিতীয় রূপ কি হবে তা এখনো আমরা একান্তভাবে স্থির করে উঠতে পারিনি।

পরীক্ষার জন্য তথাকথিত সাধু ভাষার একটি বাক্য নেওয়া যাক। ধরুন, "কাঁচের ফানুস কেমন করিয়া করে আমি তাহা জানি না।" সাধু ভাষার এই বাক্যটি কথ্য ভাষায় এতগুলি বিভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে—

(১) কাঁচের ফানুস কেমন **ক্'রে** করে তা আমি জানিনে।

(২) কাঁচের ফানুস কেমন **ক'রে** করে তা আমি জানিনে।

(৩) কাঁচের ফানুস কেমন **করে'** করে তা আমি জানিনে।

(৪) কাঁচের ফানুস কেমন **করে** করে তা আমি জানিনে।

(৫) কাঁচের ফানুস কেমন **কর্যে** করে তা আমি জানিনে।

১ম উদাহরণের 'কোরে' বানানটির উদ্ভব আমাদের শব্দ উচ্চারণ করবার ধ্বনি-নিষ্ঠা থেকে। কোনো একটি শব্দ উচ্চারণ করবার সময়ে যে-যে ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতি যে-যে স্বরবর্ণ প্রয়োগ করি লেখবার সময়েও সেই-সেই ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতি সেই-সেই স্বরবর্ণ প্রয়োগ করব, এই হ'ল ধ্বনি-নিষ্ঠা। যখন বলি **কোরে** (koray) তখন লিখ্‌বও **কোরে**। এই ধ্বনি-নিষ্ঠা আমরা সর্ব্বত্র রাখ্‌তে পেরেছি কি-না এবং রাখা উচিত কি-না সে কথা পরে কখনো বিবেচনা করা যাবে, উপস্থিত আমরা অপর রূপগুলির মধ্যে কি মূল ইঙ্গিত আছে তা পরীক্ষা ক'রে দেখি।

২য় উদাহরণের **ক'রে** শব্দের মধ্যবর্ত্তী ইলেক্ চিহ্ন (') 'ক'-কে অকারান্ত উচ্চারণ করবার নিষেধ-নির্দ্দেশ। সুতরাং কোনো ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জন বর্ণের অব্যবহিত পরে ইলেক্ চিহ্ন থাক্‌লে আমরা সেই ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণকে ওকারান্ত ক'রে নেব। যথা,—ক'রে দিয়ো, ব'সে আছি। ম'রে গেছে ইত্যাদি। কিন্তু তাই ব'লে **এখনি করো**, অথবা **কালকে কোরো** বাক্য দুটিকে **এখনি কর'** বা **কালকে ক'র'** রূপে লেখবার প্রথা নেই।

৩য় উদাহরণে **করে'** শব্দের অন্তে ইলেক এই কথা ব্যক্ত করছে যে **করে**-র পর ইলেক থাকার জন্য **করে**-র সাধারণ উচ্চারণ না হয়ে বিকৃত উচ্চারণ হবে, সুতরাং **কোরে** উচ্চারণ হবে। অনেকের মতে **করে**-র ইলেক চিহ্নটি **করিয়া** শব্দের লুপ্ত 'য়া'র প্রেত দেহ।

৪র্থ উদাহরণে দুটি পাশাপাশি **করের** মধ্যে বানানগত কোনো প্রভেদ নেই, যদিও তাদের মধ্যে উচ্চারণের প্রভেদ বর্ত্তমান। এ ক্ষেত্রে অর্থ বুঝে উচ্চারণ করতে হবে।

৫ম উদাহরণের **করো** রূপটি অধুনা প্রায় অবলুপ্ত, কিন্তু বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেও ক্রিয়াপদের এ রূপটি দেখেছি ব'লে মনে পড়ে।

উপরে পাঁচটি উদাহরণে **করে** শব্দর যে পাঁচটি বিভিন্ন রূপ দিলাম সে শ্রেণীর ক্রিয়াপদ ছাড়া ক্রিয়াপদের অন্যান্য রূপেও বানান বিভ্রাটের অন্ত নেই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি। বেরোচ্চে, বেরুচ্চে; এসেচে, এয়েছে; পেলাম, পেলুম, পেলেম; ক'রতাম, কোরতাম, কোর্ত্তাম, কোর্ত্তুম; বল্‌ল, বল্‌লো, বল্‌লে, বোল্‌লো; খেলো, খেলে; দেখ, দেখ্‌, ত্যাখ, ত্যাখো; ইত্যাদি। এর আর অন্ত নেই।

ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্যান্য পদেও নানা রূপে বানান-সমস্যা দেখা দিয়েছে। যথা,—সন্ধ্যা, সন্ধ্যে; নিন্দা, নিন্দে; বৈকাল, বিকাল, বিকেল; বয়স, বয়েস; উত্তর, উত্তুর; ইত্যাদি।

এই বানান-বিভ্রাটের মূলে একটি প্রশ্ন রয়েছে,—সেটি হচ্চে—যা বলি তাই লিখ্‌ব, না যা লিখি তাই বল্‌ব; না যা লিখি তা সময়ে সময়ে বল্‌ব না, অর্থাৎ যা বলি তা সময়ে সময়ে লিখ্‌ব না।

যা বলি সব সময়ে যদি ঠিক তাই লিখ্‌তে হয় তা হ'লে 'উত্তুরে'র অত্যাচারে 'উত্তর' বেচারীকে উত্তুর-মেরুর মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়, এবং 'দক্ষিণ' বেচারীকে খুঁজে বার করতে হয় ছদ্মবেশী 'দোক্‌খিন্‌' এর বর্ণবন্ধনের ভিতর থেকে। বানানের স্বরূপ প্রধানতঃ phonetic হবে একথা মানি। কিন্তু phonetismকে বেশি প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্য্যন্ত গোত্তীর বোনের বুক্‌খের ওপোর বোসে পোক্‌খী ডানা নাড়্‌তে থাক্‌বে, সে কথাও ভুললে চল্‌বে না। একই শব্দের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন উচ্চারণ হ'য়ে থাকে, এমন-কি একই প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উচ্চারণ হ'য়ে থাকে। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের phoneticismকে পূর্ব্ববঙ্গ ষোল-আনা স্বীকার ক'রে নেবে কেন? শব্দের দুটি আশ্রয় আছে, বানান এবং উচ্চারণ; তার মধ্যে কোনোটিকে যদি নিত্যমূর্ত্তি দিতে হয় ত' বানানকেই দেওয়া চলে, উচ্চারণকে নয়।

এ বিষয়টি বিতর্কিকার মধ্যে অবতারণা করবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে। আমরা অবগত হয়েচি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে নির্দ্দেশিত বানান-বিভ্রাটগুলির অনুরূপ বানান-সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ একটি বানান নির্দ্ধারণ সমিতি গঠিত ক'রে অবিলম্বে এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করতে উদ্যত হয়েচেন। তাঁদের এই অতি প্রয়োজনীয় এবং শ্লাঘনীয় কার্য্যে যদি বিচিত্রার পক্ষ থেকে কিছু সাহায্য দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে আমরা বিচিত্রার পাঠকগণকে এই বিষয়ের আলোচনায় যোগদানে আহ্বান করছি।

কয়েন্সিডেন্স

শ্রীহিতেশ চক্রবর্ত্তী

ভূমিকম্প জনিত নানারকম কাজে চম্পারণ্য জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। ১৩,০০০ লোককে ৭৫০০০৲ দিয়ে গত একমাস কাটালাম ফাটা বাড়ীতে, খড়ের ঘরে, ভাঙ্গা বাড়ীর বারান্দায় বা তাঁবুতে।

এমনি করে দুদিন পূর্ব্বে বারাচাকিয়া গ্রামে ছিলাম। চিনি কলের বাবুদের অনুগ্রহে তাঁদের একটী কোয়ার্টার পেয়েছিলাম বাসের জন্ত। Factoryতে ভেঁপু বাজে ভোর পাঁচটায়, চিনি কলের বাবুরা বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন; এক ঘণ্টার মধ্যে তৈয়ারী হ'য়ে চিনি কলে যান; কুলিরা দলে দলে ছোটে। ছ'টার সময় আর একটী ভেঁপু বাজে, কাজ আরম্ভ হয়। মধ্যে বারটার সময় ঘণ্টা দুয়েকের জন্ত খাওয়ার ছুটি। দূর গাঁয়ের কুলিরা ছাতু ইত্যাদি খেয়ে কাটিয়ে দেয়, তারপর দেড়টা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত খেটে মনের আনন্দে বাড়ী ফেরে। পরম সন্তুষ্টের দল বাবুরা কল ফেরৎ ফুটবল খেলেন; সন্ধ্যায় বাজে আড্ডায় তাসটাস্ খেলে সময় কাটিয়ে ন'টা বাজতে না বাজতে শয্যা গ্রহণ করেন। এঁদের কোয়ার্টারগুলি ছোট ছোট ব্যারাকের মত খোলার বাড়ী। ঋতু উপভোগ করার এমন যায়গা আর নেই। বর্ষাকালে ঘরে দু' ইঞ্চি জল দাঁড়ায়—অতএব ঘরে থেকেও বর্ষা-জলের দৃশ্ত এঁরা পান। গ্রীষ্মকালে নীচু খোলার চালের মধ্যে দিয়ে সূর্য্যের প্রখরতা অনুভব করেন; ঘরে জানালায় বালাই না থাকায় ও মেজেগুলি স্যাঁৎস্যাতে ব'লে শীতকালে ঠাণ্ডার অভাব হয় না। পরে হাওয়ার সাথে ড্রেনের গন্ধ ভেসে এসে ঘর আমোদিত করে। তারই মধ্যে চিনি কলের বাবুরা জীবনের মিষ্টত্বে মাতোয়ারা থাকেন। এমনি ক'রে দিন কাটে।

ওদিকে ক্যান্টিনীর অপর পার্শ্বে ইন্দ্রপুরী। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বারান্দা-সমন্বিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঠাণ্ডা বাঙ্গলো। বিজলি বাতি, পাখা, Refrigerator, Poly Pony, তাদের trainer, motor car; ফলফুলে পরিপূর্ণ, অগণ্য ভৃত্যবর্গে মুখরিত সে এক অপর রাজ্য।

যাক্ সে সব কথা। সমস্ত দিন টাকা বেঁটে অবুঝ লোকেদের সঙ্গে তাদের অকারণ চাহিদার বিরুদ্ধে সমস্তক্ষণ তর্ক করার পর সন্ধ্যায় বাসায় (চিনিকল বাবুদের কোয়ার্টারে) ফিরলাম। কিছু কাজ না থাকায় পাশের কোয়ার্টার বাবুর নিকট একটি নভেল, মাসিক পত্র, এমন কি পুরাণো খবরের কাগজ বা যে কোনও পাঠ্য চেয়ে পাঠালাম। এমন অসহায় অবস্থায় অনেকদিন সুদূর ডাক বাঙ্গলায় শেষ পর্য্যন্ত জুতো-মোড়া খবরের কাগজ খুলে পড়তে হয়েছে। অনেক খোঁজার পর পাশের কোয়ার্টার বাবুর কাছ থেকে পেলাম একখানি চার বৎসরের পুরাণো Grand Magazine। চিনি কলের বাবুর কাছ থেকে এ হেন বস্তু পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করলাম। কয়েকটি গল্প পড়ার পর ৫৫৪ পৃষ্ঠায় Purple & Fine Lines গল্পটি পড়লাম; মন্দ লাগল না।

তারপর দিন, অর্থাৎ পরশু, মতিহারী ফিরলাম। ফিরে মাসিক পত্রিকাগুলির খোঁজ ক'রে প্রথমে পেলাম—আষাঢ়ের বিচিত্রা। আনন্দ হল—মনটায় আষাঢ়ে ভাবের হয়ত একটু সমাবেশ হবে। কয়েক পাতা পড়ার পর শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয়ের শ্রীরস্তু পড়লাম।

পরশু দিন এই গল্পটি (চার বৎসরের পুরানো Grand Magazine—January 1930) ইংরাজিতে পড়ে আজ এই গল্পটি যে আবার বাঙ্গলায় পড়ব এ আশা করিনি। ভাবলাম একেই বলে Coincidence। বাঙ্গলায়ও গল্পটি মন্দ উৎরোয়নি—তবে Grand Magazine বা author May Edington-এর কোনও উল্লেখ দেখলাম না। দুই লেখকের চার বৎসরের আগে পিছে মনোভাবের আশ্চর্য্য ঐক্য বলতে হবে।

শরৎ-প্রশস্তি

শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য

তোমার লাগিয়া, হে প্রেম-পূজারী, মনের নিভৃত কোণে
রচিয়া রেখেছি সোনার আসনখানি,
তোমারে বেঁধেছি, হে পরমপ্রিয়, সুচির আলিঙ্গনে,
তোমার বাণীতে পেয়েছি আপন বাণী।

সারা বাংলার চিত্ত-বিজয়ী, কুশলী শিল্পী নব,
বুকে আমাদের জাগায়েছো ভালোবাসা,
অমৃত-নিঝর রচনে তোমার আনন্দ অভিনব,
মানব মনের বেদনারে দিলে ভাষা।

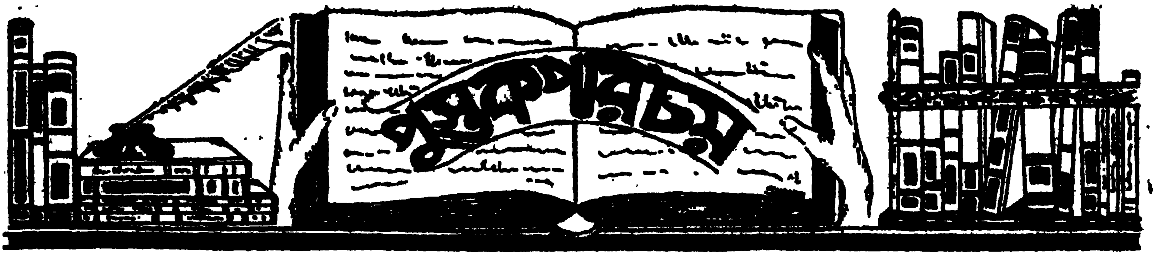
ছোট হ'য়ে যারা ছিলো সুগোপন রুদ্ধ আঁধার গেহে,
আপনারে যারা দেখেনি কখনো চাহি',
তুমি তাহাদেরে বাহির দুয়ারে টানিয়া এনেছো স্নেহে,
আলোকের স্রোতে ওঠে তারা অবগাহি'।

ভাগ্যের ফেরে আজীবন কাল ছিলো যে পঙ্কলীনা,
এককণা প্রেম পায়নি কাহারো কাছে,
তারি বেদনায় উঠেছে বাজিয়া তোমার বুকের বীণা,
পঙ্কে দেখেছো পঙ্কজ কোথা আছে।

চন্দ্রে সে আছে কলঙ্ক ঠিক, তথাপি মিথ্যা নহে
আলো আছে সেই চন্দ্রেরই বুকে জাগি',
কলঙ্ক-দোষে আলো হবে মিছে—কে এমন কথা কহে?
আমরা যে সব ভিখারী আলোরই লাগি'!

এ সত্য তুমি দেখিয়াছ, আর বুঝিয়াছ প্রাণে প্রাণে,
সকল সত্য লভেছো এমনি ক'রে,
সত্য দ্রষ্টা কবিরে তো তাই হৃদয় আপন জানে,
লেখায় তোমার তাই ওঠে মন ভ'রে।

প্রেম মন্ত্রের নব উদগাতা, সত্যের উপাসক,
শিবে সুন্দরে মূর্ত্ত হে মহীয়ান্,
ওগো বাংলার গল্পের গুরু, নবীনের প্রচারক,
উল্লাসে আজি গাহি তব জয়গান।



"অমিতার প্রেম"—শ্রীমতী আশালতা দেবী প্রণীত। ৬১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ডি, এম, লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

আশালতা দেবীর নাম আজকাল বাংলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকাদের নিকট সুপরিচিত। যে কয়জন মহিলা লেখিকা বাংলাভাষার সেবা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি ছোট গল্প, প্রবন্ধ এবং উপন্যাস সবই লিখিতে পারেন।

বক্ষ্যমান উপন্যাসখানি একটি যুবক এবং যুবতীর প্রেমের রোমান্স লইয়া লিখিত। নায়ক অমিয় এবং নায়িকা অমিতা—অমিয়র বোন চারুর মধ্যস্থতায় উভয়ের আলাপ পরিচয়। অমিতা লেখাপড়া, গান, বাজনা প্রভৃতি accomplishments-এ অগ্রগণ্যা কিন্তু হ্যাব্‌লা নয়—deep ধরণের মেয়ে। তাহার বৌদি বীণার উৎপাতে তাহার মন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে—ফলে সে অস্বাভাবিক রূপে অমিয়র উপর বিরূপ হইয়া উঠে। অমিয়ও কেম্ব্রিজে পড়িবার জন্য বিলাত চলিয়া যায়। বলা বাহুল্য এ অবস্থা উভয়ের পক্ষেই অস্বাভাবিক। অতএব অমিয় course শেষ করিবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসে। ইতিমধ্যে অমিয়র অনুপস্থিতিতে অমিতাও নিজেকে চিনিতে পারে এবং তারপর একদিন উভয়ের মন বোঝাবুঝির শেষ হয়। অমিতার বাবা ভবানীবাবু জোর করিয়া কিছু করেন নাই—তিনি জানিতেন Nature একদিন উভয়কেই পরস্পরের একান্ত সন্নিকটে আনিয়া দিবে।

মানসী—শ্রীমতী আশালতা দেবী প্রণীত। পি, সি, সরকার এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৬৬ পৃষ্ঠা মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা।

এখানি সম্ভবতঃ আশালতা দেবীর দ্বিতীয় উপন্যাস—প্রথমখানি "অমিতার প্রেম"।

গল্পের মধ্যে যেটি বিশেষ ক'রে চোখে পড়লো সেটি হচ্চে লেখিকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা এক নিরুপমা দেবীর 'দিদি' ব্যতীত অন্য কোন মহিলা লেখিকার লেখার মধ্যে এই নিপুণতা দেখেছি ব'লে মনে পড়চে না।

সুরমা এবং সোমনাথ তাদের বাপমায়ের অমতে বিয়ে করলে। সোমনাথকে বাধ্য হ'য়ে চাকরি নিতে হ'ল এবং সুরমাকে সংসারের অধিকাংশ কাজ করতে হ'ল। কিন্তু এই স্বল্পাবকাশের নিবিড়তায় তাদের প্রেম হ'য়ে উঠ্‌লো ঘনিষ্ঠ। সোমনাথের বাপের মৃত্যুর পর তারা আবার দেশে ফিরে এলো কিন্তু সুরমা এবার টেনিস খেলা, বায়স্কোপ দেখা প্রভৃতি নিয়ে এত মেতে উঠ্‌লো যে সোমনাথের সঙ্গে তার যোগসূত্র ক্রমশঃ ছিঁড়ে যেতে লাগ্‌লো। অবশেষে সোমনাথ যখন কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করলে তখন তাদের হ'ল প্রকৃত মিলন।

লেখিকার ভাষা সাবলীল, স্বচ্ছন্দ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিদ্যোতক। কোটেশানের বাহুল্য দেখে মনে হয় তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করেচেন।

সুরমার বাবা দেবকুমারবাবু সম্বন্ধে (১৮।১৯ পৃষ্ঠা) লেখিকা যে পুরাণো গল্প দিয়েচেন সেটুকুই বইখানির খেলো অংশ—না দিলেই ভাল হ'ত।

ছাপা, বাঁধাই ভাল। ৩৪ পৃষ্ঠায় ১৪ লাইনে "মঞ্জুরিত" স্থানে "মঞ্জরিত" এবং ৪৮ পৃষ্ঠায় ৪র্থ লাইনে "সৌজন্যতা" স্থানে "সৌজন্য হ'বে।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

অন্তরের আলো (গল্পের বই?)—শ্রীলালমোহন দে, মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

সাহিত্যাচার্য্যগণ "সাহিত্য হাটে প্রবেশযোগ্য বলিয়া ছাড়পত্র" দিয়া আমাদের কর্ত্তব্যতায় লঘু করিয়া দিয়াছেন।

উপরন্তু "প্রথম রচনায় অসম্পূর্ণতা থাকিলেও রস-সৃষ্টির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় যে-ইঙ্গিত ও নিদর্শন রহিয়াছে, তাহাই এই রচনাগুলিকে পাঠক সমাজে পরিচিত করাইয়া দিবার জন্ত আমাকে (শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দেকে) সাহসী করিয়াছে।" কিন্তু, উপরোধে ঢেঁকি গিলিবার বালাই আমাদের না থাকায়, আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, বর্ণনা-ভঙ্গীর দোষে, অযথা রস-সৃষ্টির (রসিকতা করিবার) প্রয়াসে, এবং এই রস-সৃষ্টিরই ব্যর্থ আশায় 'রচনা'গুলি রক্ষিত হওয়ায় অধিকাংশ রচনাগুলিই অপাঠ্য হইয়াছে। "পানিনির পরাজয়" ও "জহুরের দুঃখ" ভিন্ন অন্ত রচনাগুলি না ছাপিলেই ভাল ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্য-কাহিনী—

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। মূল্য ৸০, প্রকাশক—নিখিলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী এম, বি, ২০নং সুরি লেন, কলিকাতা।

ভারতীয়েরা যে সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন সে সকল স্থানের আর্থিক পরিপুষ্টি সাধনে স্থানীয় ভারতীয়দিগের পরিশ্রম ও সততা যথেষ্ট সহায়তা করিলেও ঔপনিবেশিক ভারতীয়েরা এখন স্থানীয় অধিবাসিগণের ও অন্ত ঔপনিবেশিকগণের হস্তে অশেষ প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন। ভারতীয়দিগের প্রতি এই অত্যাচার দক্ষিণ আফ্রিকায় চরমে উপনীত হইয়াছে—নাগরিকদিগের প্রাথমিক অধিকার সমূহের সামান্যতম অংশ হইতেও ভারতীয়েরা সেখানে বঞ্চিত। এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে ১৯২৫ সালে ভারতীয় গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে দৌত্য অভিপ্রায়ে এক ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। এই ডেপুটেশনের সদস্যরূপে লেখকের দৌত্য কাহিনী লইয়াই পুস্তকখানি লিখিত।

সাধারণ ভ্রমণ কাহিনীর কায়দায় লিখিত হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের প্রতি নির্য্যাতন ও বিসদৃশ ব্যবহারের চিত্র পুস্তকখানিতে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের গভীর স্বদেশ প্রেমের নিদর্শনও সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। ভাষা স্বচ্ছ ও গতিশীল। ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

শ্রী-হীন কৃষ্ণ—শ্রীতড়িৎকুমার বসু প্রণীত।

১৬৯, রসারোড, বুকষ্টল হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫২+৮৫। মূল্য, কাপড়ে বাঁধাই, দেড় টাকা, ও মেকী মরোক্কো বাঁধাই, দুই টাকা।

'শ্রী-হীন কৃষ্ণ' বাংলার প্রথম 'সিচুয়েসন' নাটক। আমাদের কলিকাতার অতি-আধুনিক সাধারণ জীবন লইয়া এই নাটকখানি লিখিত। ইহার বিষয়বস্তু, 'টেক্‌নিক্' বা গঠনপ্রণালী ও dialogue অতি আধুনিক—এত বেশী যে পড়িতে পড়িতে মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া ওঠে। লেখক যদিও ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে এখানি সম্পূর্ণ অভিনয়-উপযোগী নাটক, তথাপি মনে হয় ইহার stage-success নিতান্তই সন্দেহজনক। বলিলে রূঢ় শুনাইবে, কিন্তু ইহার ভাষা মাঝে মাঝে অত্যন্ত নোংরা ও কথাবার্ত্তা নিতান্ত খেলো হইয়া উঠিয়াছে। লেখক যেখানেই humourএর সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তিনি বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; যাহা হইয়াছে তাহা humour ত নয়ই, উপরন্তু witও নয়, এমন কি হাস্যরসও নয়—তা একান্ত নোংরা রঙ্গরস। লেখককে আমরা জানি, বাংলা ছায়াচিত্র জগতে তাঁহার নাম সুপরিচিত, তাঁহার নিকট হইতে এরকম লেখা আমরা আশা করিনি। দুই একটি নমুনা দিতেছি;—"নভেল পড়ে' যেমন আমার 'সোনা-চুঁড়ি' নর্ত্তকী নাম ধারণ করলে, ইন্‌টেলিজেন্‌সিয়ার হাতে পড়ে' তেমনি কামের নাম হল প্রেম, আর কামের ইন্ধন যোগাবার পন্থা হ'ল বিবাহ প্রথা", অথবা, "ভায়রা-ভাই আমার ত সাক্ষাৎ যুবতী-কন্ট্রোলার, হয় আমার একটা হিল্লে করুক, না-হয় স্বরাজ পাবার পথটা বাত্‌লে দিক্", কিম্বা,

"বৌদি, মাইরি, কি বলিব আর,
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে
তুমি থেকো ব্যাচিলার (Bachelor)"

তারপর ইহার চরিত্রগুলিও সব অদ্ভুত। পুরুষগুলি আধুনিক কলেজের ছাত্র—রোগা, ছিপছিপে, চোখে চশমা, বাহারে চুলের বাবু। তরল উপন্যাস ও কবিতার পাতায় তাহাদের চোখ, হাতের পেন্সিল ঠোঁটের সঙ্গে সোহাগ করিতে ব্যস্ত। আর মেয়েগুলিও তদ্রূপ—আহ্লাদের পরশে বিভোলা,

মাথায় এলো খোঁপা, পায়ে জরীর নাগরা। হাতে এমেলের চুড়ি। আধুনিক অভিসার অর্থাৎ flirting এর জন্য সদাই প্রস্তুত।

বইখানি পড়িয়া আমরা মোটেই খুসী হইতে পারিলাম না।

গলার কাঁটা—অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। পৃষ্ঠা ১৬৪। দাম এক টাকা দশ আনা।

এখানি সাধারণ উপন্যাস নহে। ইহার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব আছে। লেখকের উদ্যম ভালো, প্রয়াস প্রশংসনীয়। রোমাঁ রোলাঁ যেমন 'জাঁ ক্রিস্তফ্', গল্স্ওয়ার্দি যেমন 'ফর্সাইথ সাগা,' রেমণ্ট যেমন 'পেজাণ্ট্স্', ও অন্যান্য বিদেশীয় লেখকেরা যেমন সুদীর্ঘ মহা-উপন্যাস লিখিয়াছেন, তেমনি নরেনবাবুও "নর-নারায়ণ" নামে সপ্তকাণ্ড একটি মহা-উপন্যাস লিখিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। "গলার কাঁটা" বইখানি সেই মহা-উপন্যাসের দ্বিতীয় কাণ্ড। এই পুস্তকে লেখক নাগরিক চিত্র ত্যাগ করিয়া যে গ্রাম্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পল্লীগ্রামের ভাব, ভাষা, আচার, ব্যবহারও প্রচুরভাবে তিনি বইএর মধ্যে ঢুকাইয়াছেন। গল্পাংশও বেশ হৃদয়গ্রাহী; লেখকের pathos ফুটাইবার ক্ষমতাটুকুও বেশ। এক একটি গ্রাম্য চিত্র, ও ঘরসংসারের সুখদুঃখের কথা ভারী চমৎকার। আমরা আশা করি রেমণ্টের 'The Peasants' এর মত একখানি বই বাংলাভাষায় তিনি দান করিবেন। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

যার যেথা দেশ—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০ টাকা।

এ বইখানি উপন্যাস। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিচিত্রায় "সত্যাসত্য" নামে যে সুদীর্ঘ উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল আজই প্রথম [illegible] খানিকটা অংশ "যার যেথা দেশ"। অর্থাৎ, "যার যেথা দেশ" "সত্যাসত্য" উপন্যাসের প্রথম সর্গ।

কুমারী-কুলবালা রূপসী মেয়ে যখন চোখের উপর দিয়ে দিনে বর্ষে বর্ষে ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে তখন তার রূপের প্রতিদিনকার খণ্ড খণ্ড প্রকাশ দেখে ভাল যে লাগে না, তা নয়; কিন্তু সহসা যখন একদিন তাকে হয় ত কোনো বিবাহ-সভায় বধূবেশে দেখি, তখন তার ষোল বৎসরের পূর্ণীভূত দেহ মনের অখণ্ড সুষমার অপূর্ব্বতায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাই। তখন বুঝ্তে পারি পুষ্পপল্লবে সমৃদ্ধ ফুল-গাছের শোভা পুষ্পের শোভাও নয়, পল্লবের শোভাও নয়, এমন কি উভয়ের যোগফলের যে যুক্ত শোভা তাও নয়, তারও বহু-অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য। সম্পূর্ণ পুস্তকরূপে একত্র-গ্রথিত "যার যেথা দেশ" বইখানি পড়তে পড়তেও সেই কথাই মনে হ'ল। মনে হ'ল এতে বিচিত্রার মধ্যে মাসে মাসে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে যা দেখেছি এর নূতন পরিচ্ছদে এ একেবারে তা' থেকে সম্পূর্ণ নূতন। এর সমগ্র মূর্ত্তির অখণ্ড লাবণ্যে মুগ্ধ হ'লাম।

কতকগুলি ফুলকে মালার আকারে সাজিয়ে [illegible] মালা হয় না—সেই ফুলগুলির মধ্য দিয়ে যখন একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র সঞ্চারিত হ'য়ে সবগুলিকে সংযুক্ত করে তখন হয় মালা। উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ভিতর দিয়েও সেইরূপ একটি অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র সঞ্চারিত হ'লে তবে হয় উপন্যাস। উপন্যাসের এই যোগসূত্রের মধ্যেই উপন্যাসের সমস্ত কৌতূহল, সমস্ত বিস্ময়ের অবস্থিতি। 'যার যেথা দেশে' সেই যোগসূত্রটি আছে। এই বিলিতি [illegible] আর দেশী মালতীফুলের মালাটি রসিকজনের [illegible] করেছে।

'যার যেথা দেশের' কলাকৌশল (technique) সম্পূর্ণ অভিনব। এ বইখানি পড়তে পড়তে [illegible] ঠিক করা যায় না যে, এর পাত্রপাত্রী [illegible] বিভিন্ন [illegible]; বাদল, সুধী, [illegible], উজ্জয়িনী, মিসেস্ উইল্স্,—না সোশালিজ্ম্, ন্যাশনালিজ্ম্, বৈষ্ণবতা, লেবর, ষ্টেট্। সুতরাং এ উপন্যাসটি পাঠকের চিত্তে শুধু গল্পের মোহই বিস্তার করে না, চিন্তার খোরাকও জোগায়। মনে হয় এ বইখানি বাঙলা ভাষায় একটি [illegible] রইল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্যামাদাস স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত বি-এ



৺কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

বাচস্পতি ছিলেনা তো, তুমি ছিলে শান্ত বনস্পতি,
প্রচ্ছায় শীতল-তল, শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের গতি।
এ বাক্‌সর্ব্বস্বদেশে, তুমি ছিলে মৌন মহীরুহ,
নিরন্নের স্নেহ-নীড়, নিরুপায় বিপন্নের ব্যূহ।

ব্যাধি হ'তে ছিলে তুমি আধিচিকিৎসায় সুনিপুণতর
হে ভিষক শিরোমণি, তোমার দুয়ারে তাই হোতো জড়ো
আতুরের চেয়ে নিত্য অনাথের ভিড়।
আজি এ নিবিড়,
আষাঢ় মেঘের মাঝে ডুবে গেলে সুপ্রসন্ন-জ্যোতি
হে ওষধিপতি।

ভারত ভেষজে তুমি এনেছিলে নূতন জীবন,
তুমি বিলায়েছ আলো যেইখানে যত অকিঞ্চন,
দীনছাত্র, পতিহীনা, অতিদুঃস্থা, ক্ষীণ, অসহায়,
দীপহীন কুটীরেতে ব'সেছিল শূন্য নিরাশায়,
সেই ঘরে ঘরে।
আজি তব তরে,
শোকাকুল দুঃখী দেশ তাই কেঁদে মরে।

অন্ধের ভেঙেছে নড়ি, পঙ্গু কর খোয়াছে নয়ন,
শেষের ভরসা-হারা হোলো আজ রোগীর জীবন।
এ বিপুল ব্যথাতুরা পৃথিবীর ভার
হা বাসুকী, তুমি বিনা কে বহিবে আর?
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি ছিলে আরো মহীয়ান,
হে দেব, আদর্শে তব দীপ্ত হোক-বাঙালীর প্রাণ।

পরলোকে প্রকৃতি দেবী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, "বিচিত্রার" পাঠক-পাঠিকা এবং বাংলার সুধী-সমাজের নিকট সুপরিচিতা যশস্বিনী প্রতিভান্বিতা শিল্পী শ্রীযুক্তা প্রকৃতি দেবী গত ২রা জুন শনিবার দুরারোগ্য মেনিন্জাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়া মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতা, তাঁহার শ্বশ্রূ সর্ব্বজন পরিচিত দার্শনিক পণ্ডিত ও এটর্ণী শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার স্বামী সলিসিটর শ্রীযুক্ত মহীমোহন চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার এক মাত্র কন্যা শ্রীমতী সুরুচি-দেবী, বি, এ ও দুই পুত্র এবং আরও বহু আত্মীয় পরিজন এবং অনুরাগী দেশবাসী বিশেষরূপে মর্ম্মাহত হইয়াছেন।



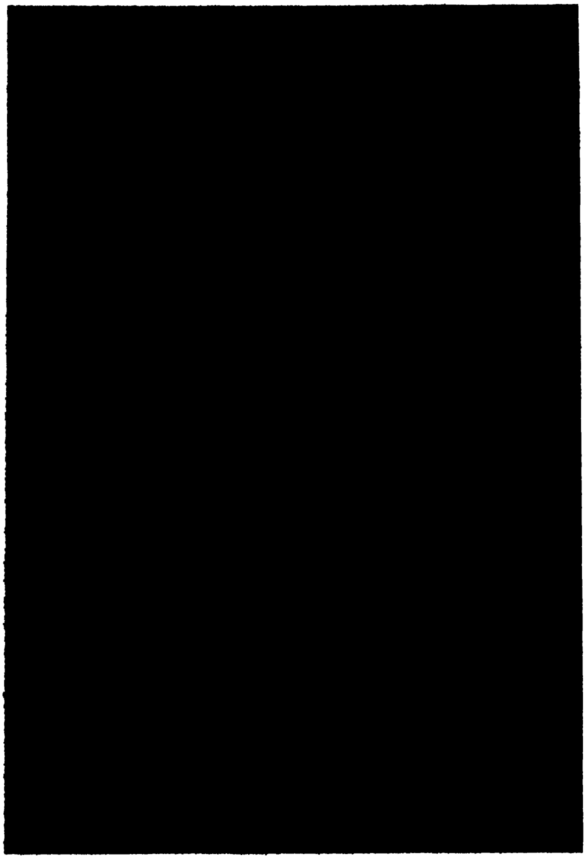
প্রকৃতি দেবী

প্রকৃতি দেবী ছিলেন কলাকুশলা শিল্পী এবং আজীবন চিত্রসুন্দরের পূজারী। তাঁর চিত্রাঙ্কন প্রণালী প্রধানতঃ ভারতীয় এবং প্রাচ্য চিত্র-কলা পদ্ধতি অবলম্বনে অনুসৃত হইত। শিল্প-কলার ক্ষেত্রে তাই তিনি অবনীন্দ্র ঠাকুর প্রমুখাৎ প্রাচ্য-শিল্প-সাধকগণের অনুবর্ত্তিনী থাকিয়া তাঁহার অনন্তসাধারণ প্রতিভার দ্বারা ভারতবর্ষের জাতীয় শিল্পের উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। শুধু মাত্র চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভা নিয়োজিত ছিলনা। কারু-কলার আরও বহু ও বিভিন্নমুখী পথে তাঁহার প্রতিভার প্রদীপ্ত পরিচয় তাঁহাকে কলা-রসজ্ঞ সুধী-সমাজের অন্তরে অমর করিয়া রাখিবে।

ওয়াটার কলার চিত্র রচনায় তাঁহার পরিকল্পনা ও দক্ষতা অতি অল্পকাল মধ্যেই শিল্পী সমাজে বিশেষ সমাদর পাইয়াছিল। নিদর্শন-চিত্র Design-Painting বা অলঙ্করণ চিত্র রচনায় তাঁহার শক্তি ছিল সত্যই অনন্যসাধারণ। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহার শিল্প-প্রতিভা বর্ত্তমান যুগের যে-কোন দেশের যে-কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সমতুল্য ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের গিরিগাত্র পরিশোভিত অলঙ্করণ-চিত্রাবলীর অমবদ্য রূপ-শ্রী যেন নবতর কলেবর ধারণ করিয়া অতীন্দ্রিয়লোকের অপরিকল্পনীয় রূপচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার অলঙ্করণ-চিত্রের রূপ ও রেখায় মূর্ত্তি পরিগ্রহণ

করিয়াছিল। ভারতীয় শোভন-শিল্প অথবা অলঙ্করণ শিল্পের অঙ্গীভূত তাঁহার "চিত্রণ" নামক শিল্প-গ্রন্থের প্রত্যেকটি চিত্র হইতে আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ১৩৩৭ সনের কার্ত্তিক মাসের "বিচিত্রায়" উক্ত গ্রন্থের সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিত হইয়াছিল এবং তৎকালে রসিক সমাজ কর্ত্তৃক দেশে ও বিদেশে গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

আমাদের বেশভূষ, গৃহসজ্জা, আসবাব পত্র প্রভৃতির গঠন সৌষ্ঠবে যাহাতে ভারতবর্ষের নিজস্ব এবং মার্জ্জিত রুচি অবলম্বনে পরিকল্পিত রূপ-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয় সেই দিকে তাঁহার গভীর আগ্রহ প্রকাশ পাইত। তাঁহার এই আগ্রহের সাফল্য কল্পে তিনি বহুশত নিদর্শন-চিত্র (Oriental designs) আঁকিয়াছিলেন এবং ঐ সকল নক্সা-চিত্রের কয়েকগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া তিনি আর একখানি অভিনব শিল্প-পুস্তিকা প্রণয়নে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার বাসনা চিরতরে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। "বিচিত্রায়" একাধিকবার তাঁহার অঙ্কিত ছবি এবং অলঙ্করণচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।



পুরুষ ও প্রকৃতি

প্রকৃতি দেবী অঙ্কিত 'পুরুষ ও প্রকৃতি' নামক ছবিখানি প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি-শিল্পী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর পাল মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে। তাহা হইতে প্রতিলিপি লইয়া উপরের ছবিটি প্রস্তুত।

১৯২৯ সনে তদানীন্তন লাট-মহিষী মাননীয়া লেডী জ্যাকসন কর্ত্তৃক উদ্বোধিত সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শিল্পকলা প্রদর্শনীতে এবং পর বৎসর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ছাত্র-ছাত্রী সমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত চারু-কলা প্রদর্শনীতে বৌদ্ধ জীবন অবলম্বনে এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত তাঁহার কয়েকখানি Water colour ছবি, জেসো চিত্র এবং রেশমের উপর অঙ্কিত চিত্র ভারতীয় চারু-শিল্পের বর্ণবৈচিত্র্যে এবং delicate expression এ বহু নরনারীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। গত তিন বৎসর যাবৎ উক্ত প্রদর্শনী-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর উনি শিল্প-নির্ব্বাচন-সমিতির অন্যতমা বিচার-কর্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছিলেন। বঙ্গ-দেশের বাহিরেও যথা দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ নগরীর কারু-শিল্প প্রদর্শনীতেও, তাঁহার হাতের ছবি ও কারু-কলার সমাদর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে কেবল চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিলনা। বঙ্গীয় ও ভারতবর্ষীয় পল্লী-শিল্পের অঙ্গীভূত বহুবিধ গৃহস্থালী শিল্পকলায় বিচিত্র সুন্দর পথে তার গতি ছিল অপ্রতিহত। পল্লী-শিল্পানুরাগী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস মহাশয়ের চেষ্টা ও অনুরোধে প্রকৃতি দেবীর কয়েকখানি ছবি, পল্লী শিল্পানুভূত তাঁহার হাতের সূচীকার্য্য, পাখার কাজ, জেসো-চিত্র, রীতির কাজ, বাটিকের কাজ, চামড়ার উপর অলঙ্কার-শিল্প,

কাঁথা-খোলাই, আচার, মোরব্বা প্রভৃতির নিদর্শন সুদূর লণ্ডনের একটি প্রদর্শনীতে প্রেরিত ও প্রশংসিত হইয়াছে। বাংলার মহিলাদের পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয়।

তিনি নিজে ছিলেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আর সুন্দরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। সুন্দরের সৃষ্টি-সাধনেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। প্রাত্যহিক সংসার পরিচালনার অবসর সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া তিনি সারা-জীবন আত্মভোলা হইয়া কলালক্ষ্মীর আরাধনা করিয়া আসিয়াছিলেন। এতখানি কলানুরাগ এবং অনিন্দ্যসুন্দর রূপদক্ষতা অতি অল্প মহিলার মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়।

উচ্চাঙ্গের নাটকাভিনয় প্রযোজনায় তাঁহার অপরূপ নৈপুণ্য ছিল। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির ছাত্রীদের সহযোগিতায় এবং "বঙ্গলক্ষ্মীর" শ্রদ্ধেয়া সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর পরিকল্পনায় অনুষ্ঠিত যথাক্রমে "ওমর খৈয়াম," "বেহুলা" এবং "শ্রীনিবাসের ভিটা" নামক নাটিকাত্রয়ের মূক-অভিনয়ের প্রযোজনার মধ্যে এবং উক্ত অভিনয় সম্পর্কিত নৃত্যকলায় সুকুমার কলার আর কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রকৃতি দেবীর রসসৃষ্টির ঐন্দ্রজালিক প্রতিভা অনবদ্য মাধুর্য্যে প্রতিভাত হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি অজন্তার গুহা-চিত্র অবলম্বনে Fresco Painting বা প্রাচীর-চিত্র এবং Eggtempera পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন অনুশীলন করিতেছিলেন।

তিনি একজন প্রতিভামণ্ডিতা শিল্পী (artist) ছিলেন বলিলেই এই মহিয়সী রমণীর সবখানি পরিচয় দেওয়া হয়না। তিনি ছিলেন নারীত্বের আদর্শ প্রতীক আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ জননী। ৺মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি কনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। ১৯০৭ অব্দের ১৬ই জুন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সর্ব্বজন-বরেণ্য মনীষী ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের দৌহিত্র এবং শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এটর্ণী শ্রীযুক্ত কবীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তিনি বিবাহ সংস্কারে আবদ্ধ হন। সুতরাং পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল উভয় পক্ষ থেকেই তিনি ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্তা। কিন্তু অভিজাত বংশের অনেকের মধ্যে জীবনের উক্ত আদর্শ বা ভাবধারার প্রতি যে বিমুখতা দেখা যায় তাঁহার মধ্যে তাহা ছিলনা। তিনি আভিজাত ছিলেন আপনার বংশগত মর্য্যাদা রক্ষায়। আপনার প্রতিভা ও বিত্তার জগতে অন্তরের বিপুল ঐশ্বর্য্যের আভিজাত্যে তিনি ছিলেন ঐশ্বর্য্যশালিনী।

সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্বসমাজের নরনারীর প্রতি তিনি অকৃত্রিম সহানুভূতি পোষণ করিতেন এবং তাঁহার স্বদেশের ভগ্নীগণের মধ্যে যাহাতে দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় নির্ম্মল সৌন্দর্য্য-বোধ, জাতীয় শিল্পকলার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের মধ্যে পরম ঔদার্য্য-বোধ জাগরিত হয় তাহা দেখিবার জন্ত তিনি সর্ব্বদা উন্মুখ থাকিতেন। আপনার সুবৃহৎ সংসারের গুরুদায়িত্বের প্রতি অবহেলা না করিয়া এবং যতখানি সম্ভব বহির্জগতের প্রচার ও কল-কোলাহল হইতে নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া তিনি বহুবিধ নারী-মঙ্গল-বিধায়িনী কাজের মধ্যে আপনার সেবা-পরায়ণ হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। নারী সমাজের মঙ্গল সাধনায় তাঁহার দুর্নিবার আগ্রহ ছিল। "সরোজ-নলিনী নারী-মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের" মূল সমিতির সভ্যারূপে ও তাহার অন্তর্ভুক্ত "রাজবালা নারী-মঙ্গল সমিতি" এবং "নারী কল্যাণ সমিতির" সম্পাদিকা রূপে তিনি নারী-জাগরণ কার্য্যের সহিত আপনার ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করেন। "পুরী বিধবা আশ্রম", লেডী অবলা বসু মহোদয়ার পরি-চালনায় প্রতিষ্ঠিত "নারী শিক্ষা সমিতি," "বিত্তাসাগর বাণীভবন" প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্টা ছিলেন।

লোক সমাজকে পুষ্ট করে নারীর কল্যাণ স্পর্শ সংসারকে লক্ষ্মীমন্ত করে নারীর শুভ সহযোগ এই সত্যটি অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ উপলব্ধি করিয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান কালে বহুযুগ সঞ্চিত পরাধীনতা এবং কুসংস্কারের পরিণামে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকের মধ্যেই উপরোক্ত সত্যের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গলক্ষ্মীর বরকন্যা প্রকৃতি দেবীর জীবনের সর্ব্ব দিকে কিন্তু উপরোক্ত সত্যের সার্থকতা অপূর্ব্ব ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতার পরশ দিয়া তিনি তাঁহার সংসারকে

শান্তি-সুধে রূপায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের মহান অনুপ্রেরণার দ্বারা তিনি বহু লোককে সত্য ও সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য্যরাজির দ্বারা তিনি তাঁহার স্বদেশের শিল্প ও ললিত-কলাকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে প্রদীপ্ত নারীত্বের দীপ্তিময়ী এবং শান্তমধুর ব্যঞ্জনা বাংলার নারী-সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তাঁহার জীবন-নাট্যের আকস্মিক ও অতর্কিত অবসানে বাংলার একটি অর্দ্ধ-উন্মেষিত প্রতিভা অকালেই স্তিমিত হইল। বাংলার পরম সৌভাগ্যক্রমে বাঙালীর অন্তঃপুরে এঁর মত একজন সর্ব্বগুণ-সমান্বিতা আদর্শ কুললক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাংলারই একান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে নারী-জাগরণের জাহ্নেন্দ্রক্ষণে তাঁহার ইহ-জীবনের সাধনা পূর্ণতার পথে পৌছুতে না পৌছুতে অমৃতলোকের আহ্বানে তাঁহাকে অকালে ইহসংসার ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার মৃত্যুতে শিল্প-জগতের বিশেষ করিয়া পল্লী-শিল্পের যে ক্ষতি সাধিত হইল তাহা অচিরে পূরণ করা সম্ভব নহে। নারী-জাগরণের পথে এবং আমাদের জাতীয় শিল্প-কলার আরাধনায় এই মহিমান্বিতা মহিলার জীবনের সুন্দর ও মহান আদর্শ অনুসৃত হইলে তাঁহার অমর আত্মার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শিত হইবে। আমরা তাঁহার আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করি।

বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত রঙিন ছবি 'কলাপী' ও একবর্ণ ছবি 'বুদ্ধ' প্রকৃতি দেবীর শিল্প-সৃষ্টির দুটি সুন্দর নিদর্শন। 'কলাপী' ছবিটি রেশমী বস্ত্রের উপর এবং 'বুদ্ধ' ছবিটি 'জেসো'-পদ্ধতিতে অঙ্কিত। রেশমের উপর রঙ দিয়ে ছবি আঁকা কঠিন কার্য্য, কিন্তু 'কলাপী' ছবিতে প্রকৃতি দেবী সে বিষয়ে অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। এই প্রবন্ধের তলদেশের চিত্রটি প্রকৃতি দেবীর অঙ্কিত 'অলঙ্করণ চিত্রে'র একটি উৎকৃষ্ট নমুনা।

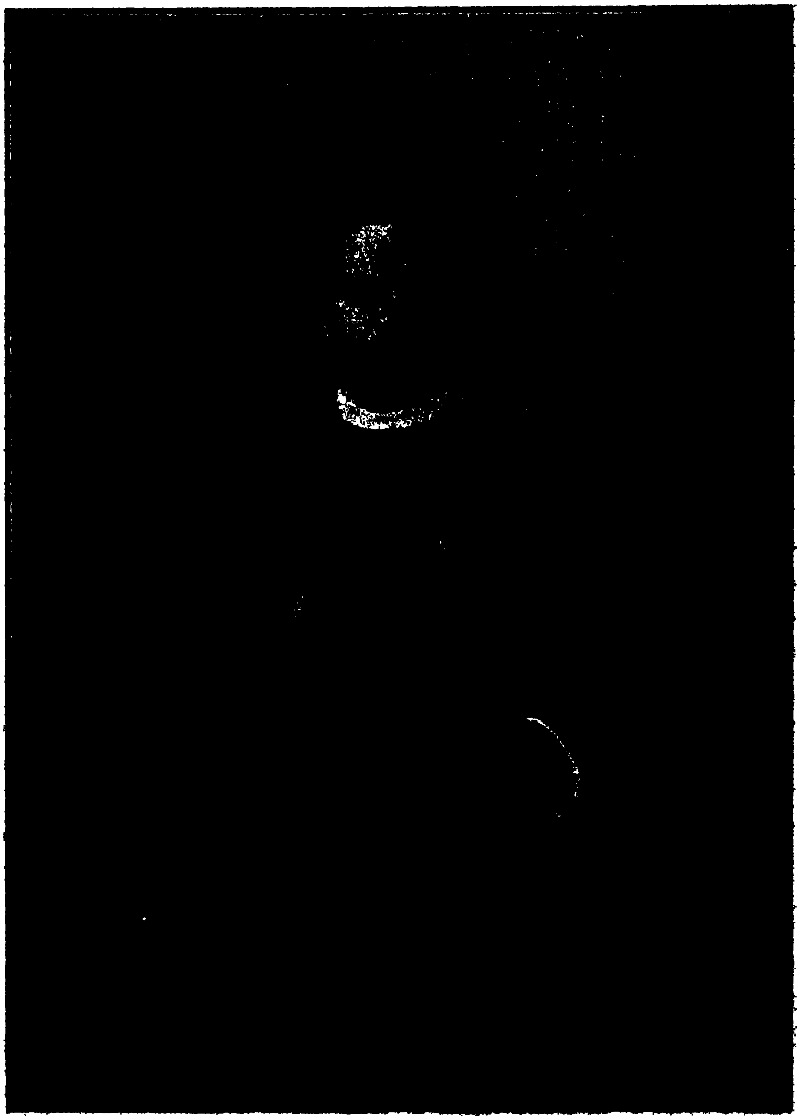
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী



সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর-সরস্বতী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ, ডি-লিট্‌

কোনও প্রকারের গান কি বাজনা আমি কখনও শিখি নাই, সঙ্গীতের কিছুই জানিনা। সঙ্গীত-সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু সঙ্গীতনায়ক, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা-ভাব নিবেদন করিবার অবসর পাইয়া আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। জীবনে যতগুলি শ্রেষ্ঠ বস্তু পাইয়াছি, যে বস্তুগুলির জন্য পরমেশ্বরের নিকট আমি কৃতজ্ঞ, তন্মধ্যে ধ্রুপদের ন্যায় উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত হইতে আনন্দ অথবা আনন্দের আভাস প্রাপ্ত হইবার সামর্থ্য অন্যতম। আমার মাতুলালয়, হাওড়া শিবপুর গ্রাম সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। মামার বাড়ীতে ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতের আলোচনার জন্য প্রায়ই বন্ধুগোষ্ঠী আহূত হইত। বাল্যকালে এইরূপ বন্ধু গোষ্ঠীর এক কোণে বসিয়া ধ্রুপদ, খ্যাল শুনিবার সৌভাগ্য আমার পক্ষে খুবই ঘটিয়াছিল। শিশুকালের অন্যতম স্মৃতি স্বরূপ একদিনের ঘটনা আমার মানস পটে এখনও উজ্জ্বল হইয়া আছে—এক বর্ষার দিনে, মামার বাড়ীর বৈঠকখানায় শিবপুরের বিখ্যাত গায়ক নিকুঞ্জ দত্তের ('কানা নিকুনে'র) কণ্ঠে গীত একটী গান একবার শুনিয়াছিলাম—এই গানটী মনের উপর বিশেষ



সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহ বিস্তার করিয়াছিল; গানটীর সুর, তাল আদির কথা কখনও ভাবিবার চেষ্টা করি নাই, কিন্তু পাখোয়াজের স্নিগ্ধ-গম্ভীর ধ্বনির সহিত ইহার সুরের ধীরোদাত্ত গতি এবং ইহার বাণীর হিন্দী শব্দের মোহ এখনও ৩০।৩২ বৎসর পরেও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই—এই বাণীর ঝঙ্কার এখনও যেন মাঝে মাঝে কানে বাজে—"ঘোরে ঘোরে বরসত বাদরবা"। পরবর্ত্তীকালে নানা প্রকারের সঙ্গীত শুনিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। কিন্তু ধ্রুপদের সবল উদার মহিমময় সৌন্দর্য্য আমাকে যতটা আকৃষ্ট করিয়াছে, আর কোনও প্রকারের সঙ্গীতে ততটা করিতে পারে নাই। ধ্রুপদ সঙ্গীত ও সঙ্গে সঙ্গে পাখোয়াজের গুরু ও ললিত সঙ্গত শুনিয়া বড় বড় জিনিষের কথাই মনে আসে—হিমালয়ের বিরাট ভাব, সাগরের বিশালত্ব, গ্রীক দোরীয় রীতির স্থাপত্য, গথিক গির্জ্জার অভ্যন্তর, মহাবলীপুর, এলুরা ধারাপুরীর ভাস্কর্য্য রাজপুত চিত্রকলা; সঙ্গীত ও বাদ্য মধ্যে ধ্রুপদের অনুরূপ প্রভাব মাত্র রোমান কাথলিক মন্দিরে পূজার সময়ের জর্ম্মান বাদ্য তথা কিছু কিছু জার্ম্মান সঙ্গতে শিল্পীদের রচিত ঐক্যতান যন্ত্রসঙ্গীত হইতেই পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধ্রুপদ সঙ্গীতের অদ্বিতীয় নায়ক। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি এখন পথভ্রষ্ট। হাল্কা ও চুটকি জিনিষের প্রাবল্য আসিয়া গভীর অনুভূতি সাপেক্ষ উচ্চ অঙ্গের বস্তুর প্রতি আমাদের আকর্ষণ কমাইয়া দিয়াছে। সুতরাং "কালোয়াতী গান" বলিয়া সাধারণ্যে ধ্রুপদের প্রতি একটা উপেক্ষা ও বিরাগ দেখা দিয়াছে। ধ্রুপদ সম্বন্ধে এই উপেক্ষার ভাব এই সঙ্গীতের প্রধান কেন্দ্র উত্তর ভারতবর্ষে হিন্দুস্থানেও খুব দেখা যাইতেছে। কেবল মহারাষ্ট্রে ও বঙ্গদেশে সঙ্গীত রসজ্ঞিকদের মধ্যে ধ্রুপদের যা কথঞ্চিৎ আদর দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ধ্রুপদী। বহুবার মুগ্ধ হইয়া ইঁহার গান শুনিয়াছি ইঁহার ন্যায় গুণী জগতে দুর্লভ। বাঙ্গলা দেশে বিষ্ণুপুরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সর্ব্ববিধ সংস্কৃতি ও চর্চ্চার যে একটী কেন্দ্র ঐশ্বর্য্যের [illegible] [illegible] আকারে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই কেন্দ্রে [illegible] [illegible] সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত শিল্পও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ [illegible]। বিষ্ণুপুর [illegible] [illegible] শিল্প-[illegible] [illegible] হইয়া দাঁড়ায়; বিষ্ণুপুরের প্রাচীন মন্দিরাবলী এবং বিষ্ণুপুরের পট্ট-বস্ত্র, শঙ্খ ও ধাতু-শিল্প, বিষ্ণুপুরের অতীত শিল্প-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অন্য বিষয়ে বিষ্ণুপুরের গৌরব অস্তমিত হইলেও, শিল্প ও সঙ্গীতে তাহা কথঞ্চিৎ সংরক্ষিত আছে। বিশেষতঃ সঙ্গীত বিষয়ে বিষ্ণুপুর এখন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান স্থান। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিষ্ণুপুরে সঙ্গতের চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের আশ্রয়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত তানসেনের বংশজাত বাহাদুর আলী খাঁ বা বাহাদুর সেন ও তাঁহার সহযোগিগণ বিষ্ণুপুরের প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতের ধারাকে আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিতে সহায়তা করেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সঙ্গীতের ধারা এখনও বিষ্ণুপুরে তথা বঙ্গদেশেও প্রবাহিত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবুর পিতা বাঙ্গলার সঙ্গীতগুরু স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাহাদুর সেনের শিষ্য পরম্পরার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এবং তিনি এই শিষ্য-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম কৃতিব্যক্তি ছিলেন।

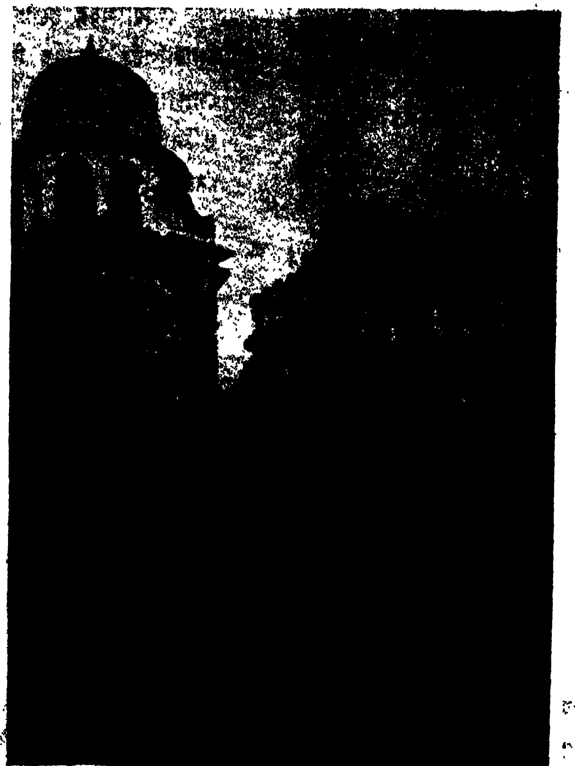
সঙ্গীতের প্রাচীন ধারা এই ভাবে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবুর পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই ধারা এখন গোপেশ্বরবাবুর এবং তাঁহার ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, পুত্র, শিষ্য ও অনুশিষ্যদের সাধনায় আরও শক্তিলাভ করিয়া বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সঙ্গীত রসিক জনগণের চিত্তকে সরস করিতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির একটী প্রধান অঙ্গ হইতেছে সঙ্গীত; নিজ পরিবারের সহিত শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবু এই অঙ্গকে জীবিত ও প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই নিমিত্ত দেশাত্মবোধযুক্ত ও নিজ জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল প্রত্যেক ভারতবাসীর ইঁহাদের সম্বন্ধে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এই কৃতজ্ঞতা যে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেশের সর্ব্বত্র শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবুর প্রতি সমাদর হইতে বুঝা যায়। শ্রীভগবৎ সমীপে এই আন্তরিক প্রার্থনা করি শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পরিজনে ও সশিষ্যানুশিষ্যে তাঁহার জীবনের ব্রত অনুপালন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিতে থাকুন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোয়ালিয়র দুর্গ

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির

গোয়ালিয়র দুর্গে প্রথম যেদিন আসিয়াছিলাম সেদিন মনে হইয়াছিল যেন আপন ঘর বাড়ি ছাড়িয়া অনেক দূরে অন্য এক রাজ্যে আসিলাম। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম মাথায় করিয়া ষ্টেশন হইতে 'টঙ্গা' লইয়া দুর্গের গেটে যখন আসিয়া পৌঁছাইলাম তখন খাট' ভাঙিয়া উপরে যাইবার স্পৃহা এতটুকুও না থাকিলেও সূর্য্যের প্রখর তাপে গেটে বসিয়া থাকাও যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। অগত্যা উপরে যাওয়াই স্থির করিলাম। উপরে যাইতে দেখা যায় পাথরের গায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জৈন মূর্ত্তিগুলি সূর্য্যের প্রচণ্ড প্রতাপকে অগ্রাহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে নির্জ্জন পথে।



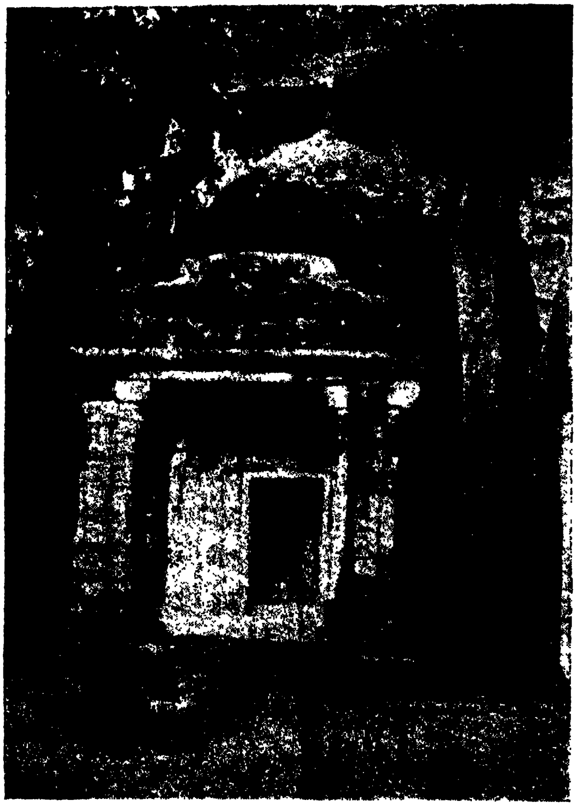
[illegible]

উপরে আসিয়া পৌঁছাইলাম [illegible] অবস্থায় [illegible] মন্দির, পুরাতন বাঁধানো পুকুর ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে, পাহারাওয়ালার নিকট খোঁজ লইয়া যখন আপন বাসা-স্থানে পৌঁছাইলাম তখন সন্ধ্যা, [illegible] এই দুর্গের উপর বন্দী হইয়া কতদিন [illegible] হইবে।

গোয়ালিয়র দুর্গে যখন প্রথম আসিয়াছিলাম তখন গোয়ালিয়র দুর্গের ইতিহাস ভালো জানা ছিলনা। দুর্গের প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিয়া মনে [illegible] করিয়াছিল। [illegible] পুরাতন মন্দিরগুলি, [illegible] ঘাট, মানসিংহের প্রাসাদ সব যেন অনেকদিনের চেনা মনে হয়। যুগ যুগ ধরিয়া কত যে ব্যাপার এই দুর্গের ভিতর ঘটিয়াছে, সে কথা মাঝে মাঝে সত্যিই ভুলিয়া যাই।

কবে এই দুর্গের গোড়াপত্তন হইয়াছিল তার খবর কে রাখে!

সূর্য্যসেন, এক রাজপুত কুমার, হয়তো এই গোয়ালিয়র দুর্গের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। গোয়ালিপা নামে এক সন্ন্যাসী হয়তো এই পাহাড়ে ছিলেন তপস্যা সাধনে—যুবক আসিয়াছিলেন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট। সন্ন্যাসী তাঁহাকে এই পাহাড়েরই এক ঝরণার এক ফোঁটা জল দিয়া তাঁহার রোগ মুক্ত করিয়া দিলেন। বোধহয় ইহা হইতেই হইল গোয়ালিয়র দুর্গের গোড়াপত্তন।



চতুর্ভুজ মন্দির

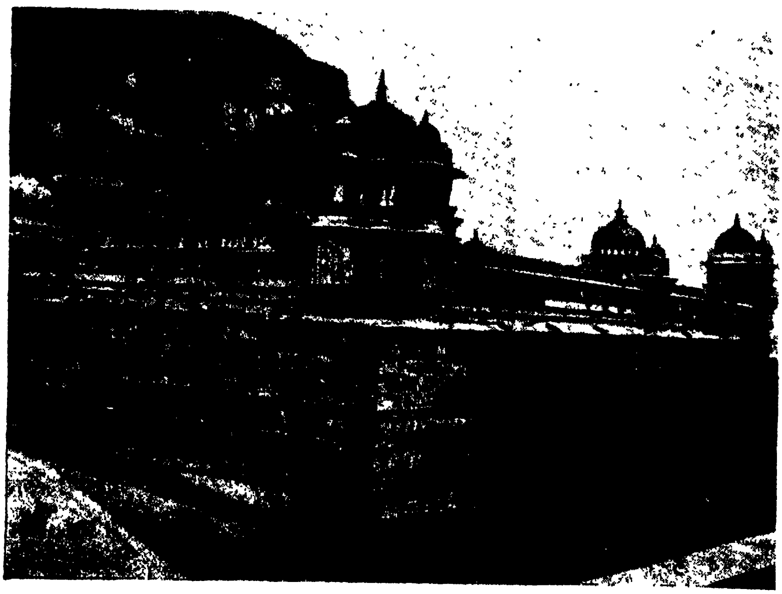
দেখিয়া, মন্দিরের গায়ে সুদক্ষ শিল্পীর সুনিপুণ হস্তের মূর্ত্তির উপরও মানুষের হিংসা প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর আঘাত—দেখিয়া মনটা ব্যথায় ভরিয়া উঠে।

গোয়ালিয়র দুর্গটি ৩০০ফিট উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। লম্বায় ১¾ মাইল এবং দৈর্ঘে ৬০০হইতে ২৮০০ ফিট। দুর্গের প্রাচীর ৩০।৩৫ ফিট উচ্চ। গোয়ালিয়র দুর্গটি যে প্রাকৃতিক দৃশ্যে উত্তর ভারতে অতুলনীয় এ বিষয় সন্দেহ নাই।

গোয়ালিয়র দুর্গের গেট দুইটি। একটি পুরাতন গোয়ালিয়র সহরের দিকে। আরেকটি অন্যদিকে। গোয়ালিয়র সহরের দিকের গেট হইতে উপরে উঠিবার রাস্তাটি অত্যন্ত চড়াই। গাড়ী কিংবা মোটর এ রাস্তায় উপরে উঠিতে পারে না, নিয়মও নাই। হাতী কিংবা ঘোড়ায় কিংবা পদব্রজে উপরে ওঠা সম্ভব। অন্য গেটটি হইতে যে রাস্তা উপরে গিয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত চড়াই কম এবং এই রাস্তায় মোটরে উপরে যাওয়া সম্ভব। এই গেটটির নাম উরভাই দরজা।

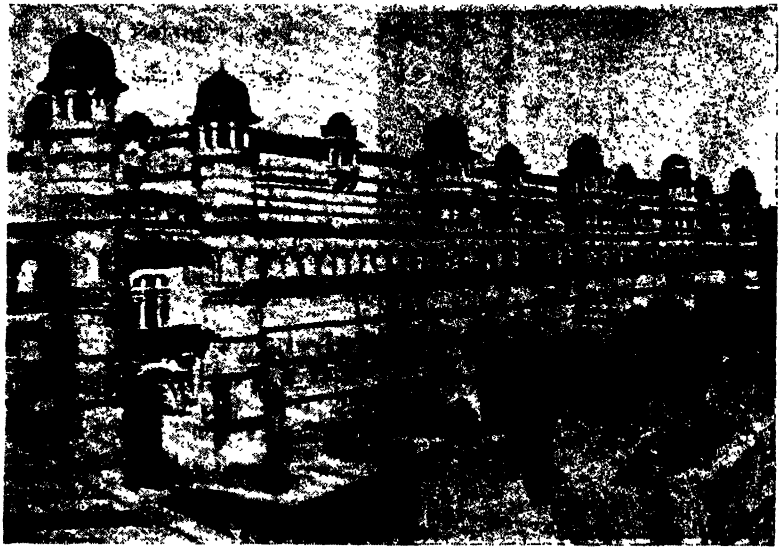
তাহার পর যুগ যুগ কাটিয়া গিয়াছে। কত নরনারী মরিয়াছে এই গোয়ালিয়র দুর্গে, কত রাজপুতবীর প্রাণ দিয়াছেন গোয়ালিয়র দুর্গের জন্য। মুসলমান আসিয়াছে গোয়ালিয়র দুর্গ জয় করিতে—রাজপুতবীরেরা প্রাণ দিয়াছেন যুদ্ধে, দুর্গের ভিতর রাজপুত নারীগণ 'জহর-ব্রত' সমাধা করিয়াছেন। এই সকল করুণ কাহিনী ইতিহাসে যে না পাওয়া যায় তাহা নয়।

এখন গোয়ালিয়র দুর্গে আসিলে অতীতের ধ্বংসাবশেষ



গুজরী মহল

গোয়ালিয়র গেট দিয়া উপরে উঠিবার পথে দ্বিতীয় গেটের নাম হিন্দোলা বা "বাদল মহল গেট"। এই স্থানে পূর্ব্বকালে একটি দোল্‌না থাকায় এই গেটটির নাম 'হিন্দোলা' বলা হয়। এই সুন্দর গেটটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।



মানমন্দির বা রাজা মানসিংহের প্রাসাদ

গুজরী মহল—পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহ তাঁহার প্রধানা রাণী 'মৃগনয়না'র জন্য এই প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করেন। প্রাসাদটি দুর্গের উঠিবার মুখেই অবস্থিত। রাণী 'মৃগনয়না' জাতিতে গুজরী হওয়ায় প্রাসাদটির নাম গুজরী মহল বলা হয়। পাথরের দোতালা প্রাসাদটি ২৩২ ফিট × ১৯৭ ফিট। বাহিরের সাদাসিধা এবং গম্ভীর ভাব উপরের গোমুজগুলি এবং বারান্দায় কারুশিল্পে অধিক সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। গুজরী মহলের ভিতর প্রকাণ্ড অঙ্গন, চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট ঘর। দরজা, জানালা, এবং ঘরের ভিতর ব্র্যাকেট ইত্যাদিতে খোদাই কাজের অভাব নাই। আঙ্গিনার ঠিক মাঝখানে কতগুলি ঘর আছে—সেই পথে মাটির নীচের ঘরে যাওয়া যায়। এখন এই গুজরী মহল গোয়ালিয়র ষ্টেটের আর্কিয়লজিক্যাল মিউজিয়ম রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পুরাতন মূর্ত্তি, শিলালিপি এবং পুরাতন ছবি এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য জিনিষ এখানে রাখা আছে। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত অসিত-কুমার হালদার ইত্যাদির চিত্রিত বাঘগুহার ফ্রেস্কোর কপি এখানে একটি ঘরে রাখা আছে।



সাস-বহু মন্দির

চতুর্ভুজ মন্দির—গোয়ালিয়র গেটের রাস্তা দিয়া উপরে উঠিবার মধ্যপথে এই মন্দিরটি পাথরের গায়ে অবস্থিত। মন্দিরের ভিতর মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ

বিষ্ণু-মূর্ত্তি; এই জন্যই মন্দিরটিকে চতুর্ভুজ মন্দির বলা হয়। এই মন্দিরে দুইটি শিলালিপি পাওয়া যায়—যাহা হইতে



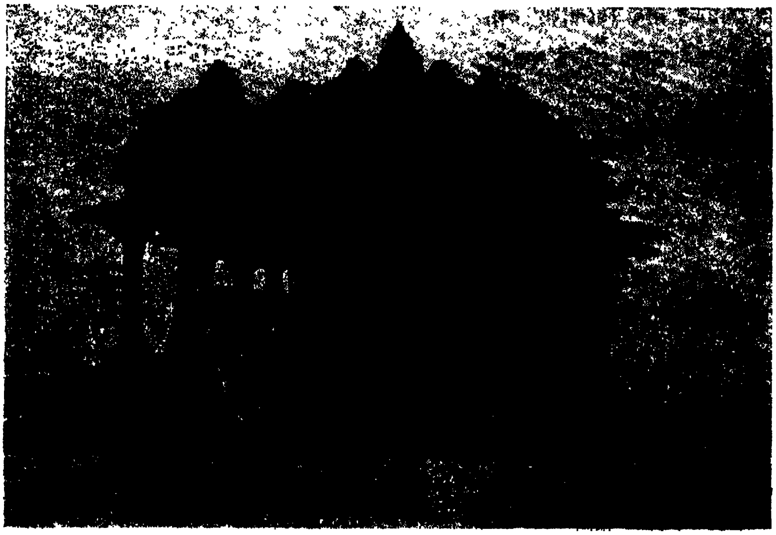
খাস-বহু মন্দিরের ভিতরকার দৃশ্য

বুঝিতে পারা যায় যে মন্দিরটি কনৌজ রাজা রামদেবের রাজত্ব-কালে নির্ম্মিত হয়।

মান-মন্দির কিংবা রাজা মানসিংহের প্রাসাদ (১৪৮৬-১৫১৬)—মানসিং মন্দির পুরাকালে হিন্দু রাজপ্রাসাদের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পূর্ব্বদিকের প্রশস্ত সম্মুখভাগ লম্বায় ৩০০ ফিট এবং উচ্চতায় ৮০ ফিট। দক্ষিণেও লম্বায় ১৫০ ফিট এবং ৫০।৬০ ফিট উচ্চতায়। দেওয়ালের গায়ে চতুর্দ্দিকে নীল, সবুজ, হলদে রঙের টাইলে হাঁস, মানুষ, হাতী বাঘ ইত্যাদির বিচিত্র ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। ছবিগুলি সত্যই সুন্দর।

প্রাসাদের ভিতর দুইটি অঙ্গন—অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে ঘর। প্রথম অঙ্গনটি ৩৪ফিট×৩৪ ফিট ৬ ইঞ্চি। এবং দ্বিতীয় অঙ্গনটি ৩১ফিট×৩৮ফিট ৬ ইঞ্চি। প্রাসাদটি দোতালা এবং পূর্ব্বদিকে মাটির নীচেও ঘর আছে।

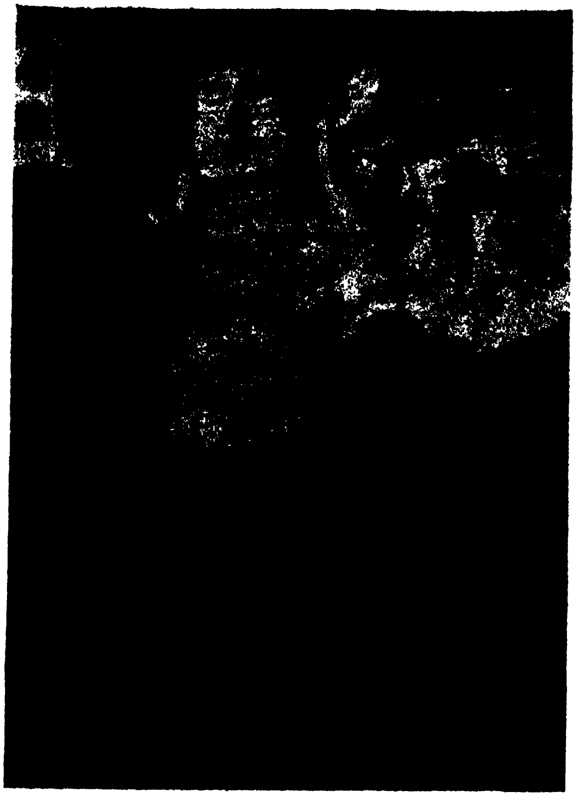
অঙ্গন দুইটি যদিও খুব বড় নয় কিন্তু ঘরে ঢুকিবার দরজায়—ব্র্যাকেটে, জানালায় নানারূপ ডিজাইনের খোদাই কাজ দেখা যায়। মানসিংহের প্রাসাদের উপর হইতে সহরের দৃশ্য অতি সুন্দর, এবং সন্ধ্যায় মানসিংহ-প্রাসাদের গম্বুজের উপর যখন ময়ূরের দল ঘুরিয়া বেড়ায় তখন সন্ধ্যাকাশের গায়ে গম্বুজ এবং ময়ূরগুলিকে যেন শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মত মনে হয়।



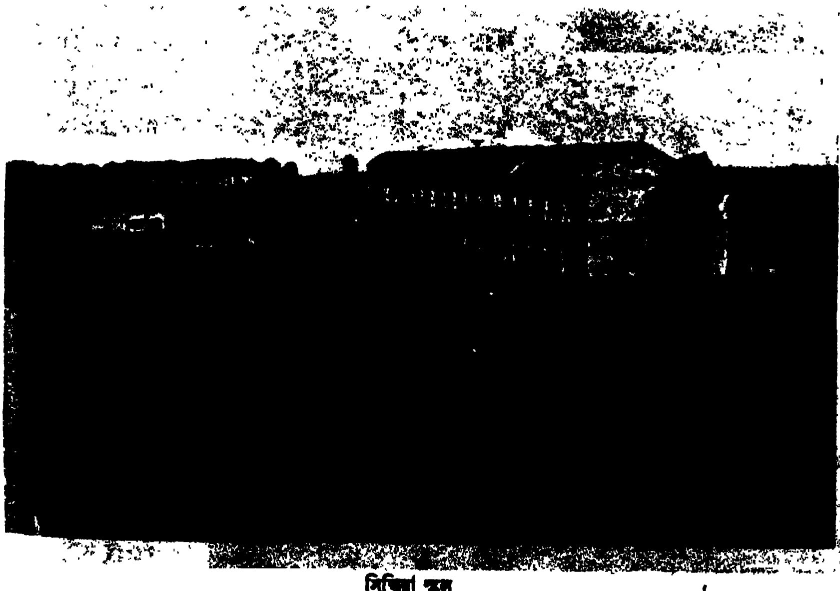
ছোট খাস-বহু মন্দির

শ্বাস-বহু মন্দির। এক জোড়া মন্দির। মন্দির দুইটি সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। শ্বাস্-বহু অর্থাৎ শ্বাশুড়ী এবং বউ। অনেকের বিশ্বাস এ মন্দির দুইটি জৈন মন্দির। কিন্তু মন্দিরের মূর্ত্তি, কারুকার্য্য এবং হিন্দু শিলালিপি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় মন্দির দুইটি জৈন মন্দির নয়।

এই মন্দির দুইটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরটি হিন্দু বিষ্ণুমন্দির এবং ১০২ ফিট লম্বা এবং ৭৪ ফিট চওড়া। এই মন্দিরটি সত্যই অতি সুন্দর। মন্দিরে একটি সংস্কৃত শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহিপাল এক রাজপুত রাজা ১০৯৩ সালে মন্দিরটি স্থাপন করেন। মন্দিরের ভিতরে ঘরটি ৩২ফিট × ৩১ ফিট ৩ ইঞ্চি। মন্দিরের মাঝখানের ছাদটির কারুকার্য্য অত্যন্ত সুন্দর। এই ছাদটি প্রকাণ্ড চারটি থামের উপর অবস্থিত। মন্দিরে নূতন মেরামতগুলি খুব সহজেই চোখে পড়ে। মন্দিরে ঢুকিবার দরজাটি নানারূপ মূর্ত্তি এবং খোদিত কার্য্যে পরিপূর্ণ। বাহিরের প্রথম প্যানেলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের মূর্ত্তি। বাম দিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মধ্যে এবং শিবমূর্ত্তি ডাইনে। মন্দিরটি বিষ্ণুমন্দির—সেইজন্যই বিষ্ণুমূর্ত্তিটিকে মধ্যস্থান দেওয়া হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলির নীচের প্যানেলটিতে গরুড়ের মূর্ত্তি।



জৈন ভাস্কর্য্য



সিন্ধিয়া স্কুল

মন্দিরের থামগুলির কাজও অতি সুন্দর। এই থামগুলির নীচের দিকটা নানান দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদাই করা। গঙ্গা, যমুনা, গণেশ, কুবের ইত্যাদির মূর্ত্তি এই মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দিরটিও বিষ্ণুমন্দির। মন্দির দুইটির খোদাই কাজ একই ধরণের। এ মন্দিরটি ছোট হইলেও একটি সুন্দর জিনিষ।

জৈন-ভাস্কর্য্য—গোয়ালিয়রে দুর্গের চারপাশে পাথরে খোদিত জৈন মূর্ত্তিগুলি প্রকাণ্ড এবং উত্তর ভারতে প্রসিদ্ধ হইলেও অত্যন্ত এক ধরণের এবং শিল্প হিসাবেও ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া যায় না। দুর্গের চারধারে যে স্থানে পাথর কাটিবার এতটুকু সুবিধা মিলিয়াছে সেখানেই এই মূর্ত্তিগুলি দেখা যায়। সবচেয়ে বড় মূর্ত্তিটি উচ্চতায় ৫৭ ফিট!

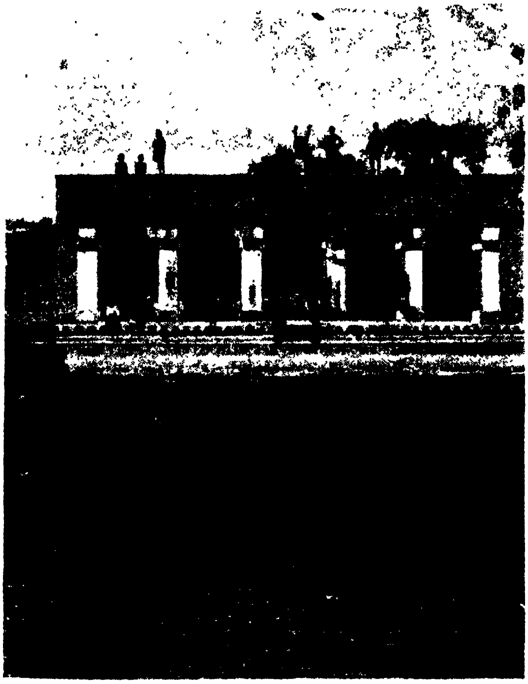


পূর্ব্বকালে দুর্গের উপর জলের ব্যবস্থার জন্য পাথর বাঁধানো কতগুলি পুকুরের বন্দোবস্ত ছিল। এখনো সেই সব পুকুরের কোনো কোনোটায় যথেষ্ট জল আছে। সূর্য্যকুণ্ড, গঙ্গোলা তাল, একখাম্বা তাল, কাটোরা তাল, রাণী তাল ইত্যাদি নামে এই পুকুরগুলি পরিচিত। রাণীতালটি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভালো অবস্থায় আছে। সিন্ধিয়া-স্কুলের ছাত্রদের সাঁতারের বন্দোবস্ত এই বাঁধানো পুকুরটিতেই করা হইয়াছে।

তেলী-মন্দির—গোয়ালিয়র দুর্গে যতগুলি মন্দির আছে তাহার মধ্যে এই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। উচ্চতায় ১০০ ফিটের হইতেও বেশী। আকারে এই মন্দিরটি অন্যান্য মন্দিরের মত একেবারেই নয়। নবম শতাব্দীতে ইহা স্থাপিত হয়। ইহাও বিষ্ণুমন্দির। ইহা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের ন্যায় গঠিত কিন্তু ভিতরকার কারুশিল্প অন্যান্য উত্তর ভারতের মন্দিরের কারুশিল্পেরই ন্যায় খোদিত। এই মন্দিরটির প্রকৃত নাম খুব সম্ভবতঃ তেলেঙ্গনা মন্দির ছিল—যাহা দ্বারা বোঝা যায়, তেলেগু দেশের সহিত এই মন্দিরটি সংশ্লিষ্ট। তেলী-মন্দির নাম তেলেঙ্গনা মন্দিরের অপভ্রংশ। এই মন্দিরের মূর্ত্তিগুলি অতি সুন্দর। প্রায় সমস্ত মূর্ত্তিগুলিরই ভগ্ন অবস্থা হইলেও শিল্প হিসাবে এই দুর্গের অন্যান্য মন্দিরের মূর্ত্তির চেয়ে এই মন্দিরের মূর্ত্তিগুলি যে উচ্চ-অঙ্গের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।



(উপরে) তেলী-মন্দির (নিচে) সিন্ধিয়া স্কুলের খেলার মাঠ



সিন্ধিয়া স্কুল—দুর্গের উপর গোয়ালিয়র রাজ্যের সর্দার এবং জায়গীরদারদিগের সুবিধার জন্য গোয়ালিয়রের স্বর্গীয় মহারাজা মাধব রাও ১৮৯৮ সালে সর্দার স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সর্দার স্কুলটির নাম গত বৎসর হইতে সিন্ধিয়া স্কুল হইয়াছে। আজকাল কেবলমাত্র সর্দার, জায়গীরদার ছাড়াও অন্য সাধারণ সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারে। এই স্কুলের ছাত্রেরা কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং আজমীর বোর্ডের পরীক্ষায় বসিতে পারে। ইহা ছাড়া সন্তরণ-বিদ্যা, ঘোড়ায় চড়া, কলাবিদ্যা ইত্যাদি সব আয়োজনই আছে। দুর্গের উপর স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় এবং ছাত্রদের খেলা ইত্যাদির যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকায় প্রত্যেক ছাত্রই স্বাস্থ্যবান। সিন্ধিয়া স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রগণ সহরের জনাকীর্ণ কোলাহল হইতে বহুদূরে না হইলেও কিছু উপরে—আপন আপন কার্য্য করিয়া স্কুলটিকে আদর্শ করিয়া গড়িয়া তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

গোয়ালিয়র দুর্গের মোটামুটি দ্রষ্টব্যস্থান গুলির কথা কেবলমাত্র এই প্রবন্ধে লিখিত হইল।

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির



(উপরে) সিন্ধিয়া স্কুলের ছাত্রদের সাঁতারের জায়গা (রাণী-তাল) (নিচে) সিন্ধিয়া স্কুলের কলাভবন

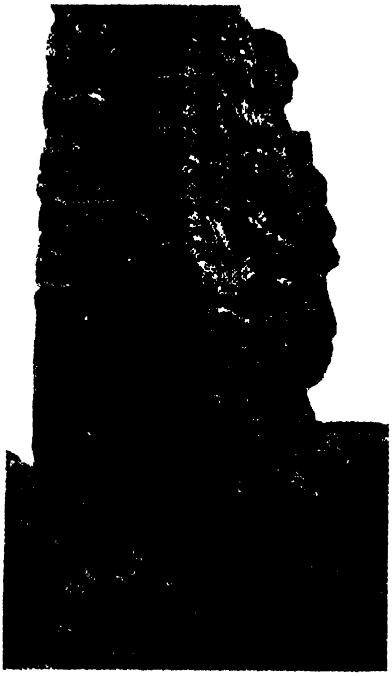
মধুপর্ক

শ্রীআশীষ গুপ্ত

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

মায়ার দেশে

এ কাহিনী কামরূপের নয়। রূপকথার রাজপুত্র পথ হারিয়ে প্রায়ই যে যাদুর দেশে গিয়ে পৌঁছোয়। হয়ত সেখানকার রাজপুরীর সিপাহী-শান্ত্রী একশ' বছর ধরে নিদ্রিত,



কোপ্যানের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত মায়া ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

হয়ত সেই প্রাসাদের রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শে জাগবে, এ মায়ার কাহিনী সে দেশের ইতিবৃত্তও নয়।—দক্ষিণ এ্যামেরিকার মেক্সিকোর দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে ব্রিটিশ হণ্ডিউর‍্যাস অবস্থিত, তথাকার অধিবাসীদের নাম মায়া, অতএব এ মায়া ইংরেজের মায়া।

ব্রিটিশ হণ্ডিউর‍্যাসের আয়তন ৮৫৯৮ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা মাত্র ৪৬,০০০। এর মধ্যে বেশীর ভাগই নিগ্রো। সমস্ত উপনিবেশের মায়াভাষী লোকের সংখ্যা ৭৮০০ এর বেশী নয়। রাজধানীর নাম বেলিজ।

মায়ারা নামে রোম্যান ক্যাথলিক হ'লেও তাদের পিতৃ-পিতামহের দেবতাদের পরিত্যাগ করেনি। তাদের মতে ডিয়স সমস্ত পৃথিবী রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং পর্ব্বত ও উপত্যকার দেবতা হুইজহক অতিশয় শক্তিশালী। ওরা একদিকে কুমারী মেরী, সাধু এ্যাণ্টনি, সাধু লুই এবং অন্যদিকে শুকতারা, ইন্দ্র, পবন, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ইত্যাদির সংমিশ্রণে এক চমৎকার জগাখিচুড়ী বানিয়েছে।

মায়ারা প্রধানত কৃষিকার্য্যের উপরেই তাদের জীবিকার জন্য নির্ভর করে। বল্‌তে গেলে কৃষিই একরকম তাদের সব। যে সকল স্থানে তারা তাদের ফসল বোনে সেগুলিকে মিলপা বলে, এর আয়তন নয় দশ বিঘা হ'বে। মিলপা ব্যতীত তাদের প্রত্যেকেরই খানিকটা করে' ভালো জায়গা থাকে কমলা লেবু এবং কোকোর চাষ করবার জন্য; কিন্তু এদের শূকর পালনের অভ্যাসের ফলে এই সব চাষ-বাসের কাজ সেই জীবগুলির কৃপায় প্রায়ই কঠিন হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মায়ারা যেসব ফল, শাকসবজী এবং নানাবিধ শস্য উৎপন্ন করে তার পরিমাণ বিস্ময়জনক। এনথকার মেহগ্যানি বিশ্ববিখ্যাত এবং এই মেহগ্যানিই ব্রিটিশ হণ্ডিউর‍্যাসের ক্রমোন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ।

চাষবাসের কাজে মায়ারা দল বেঁধে পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে। গাছ কাটবার আগের দিন রাত্রিতে তারা গ্রামপতির গৃহে সমবেত হয় এবং মুরগী, শূকর, কোকো

ও মদ ইত্যাদি সহকারে প্রচুর খানাপিনা লাগায়, তার সঙ্গে বেশ কিছু গানবাজনা যে না চলে তাও নয়।



মায়াদের গৃহ, পেরেকের সাহায্যব্যতিরেকে নির্ম্মিত—
ইহার দেওয়ালগুলিকে ছাদের ভার বহন করিতে হয় না

মায়া পুরুষেরা কুড়ি বছর বয়সের আগেই বিবাহ করে, মেয়েদের বিবাহের বয়স সাধারণতঃ ষোলর পূর্ব্বেই। বহু-বিবাহ প্রথা এদের অজ্ঞাত, বিবাহ-বিচ্ছেদও তাই,—কিন্তু পত্নীত্যাগ সুপ্রচলিত। নারীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ বহু স্থলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু শিশুদের সম্বন্ধে এদের মনোবৃত্তি স্নেহশীল।

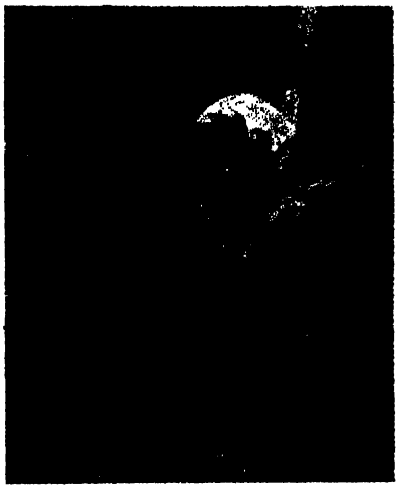
কোনও উৎসবের সময় মায়া পুরুষেরা প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করে এবং মত্ত স্বামীদের গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ত্রীলোকেরা বাহিরে অপেক্ষা করে' থাকে।

মৃত্যু এবং কবর দেওয়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠান এদের অতিশয় সাদাসিধে। মৃতদেহকে এরা যত শীঘ্র মাটি চাপা দিতে পারে ততই যেন এদের শান্তি! অনেক সময় এরা মৃতের জন্য শেষ প্রার্থনাটি অবধি করেনা। মৃত ব্যক্তির জন্য কফিন এরা কদাচিৎ ব্যবহার করে কারণ এদের ধারণা যে তাহ'লে নাকি বিগত প্রাণ ব্যক্তিটিকে স্বর্গ অবধি ওই কফিন বহন করে' নিয়ে যেতে হবে।

কৃষিকার্য্যের পরেই মায়ারা যা ভালবাসে তা হচ্ছে শিকার। এরা আধুনিক বন্দুকের সাহায্যে শূকর, হরিণ, জলহস্তী এবং নানাবিধ পশুপক্ষী শিকার করতে ভালবাসে। কখন কখন তীর ধনুকও ব্যবহৃত হয়। শিকারের পূর্ব্বে হুইজহকের কাছে প্রার্থনা করা হ'য়ে থাকে।

মায়াদের গৃহগুলি এমন ধরণে তৈরী যে এর ছাদের ভার দেয়ালের উপর পড়েনা। এদের বাড়ীতে স্ত্রীলোক অতিথি এলে তারা সাধারণতঃ রন্ধনগৃহে বসে গল্পগুজব করে, পুরুষেরা বৈঠক বসায় শয়ন গৃহে।

মায়াদের প্রধান গ্রামগুলিতে একজন করে' গ্রামাধ্যক্ষ থাকে। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে নূতন মণ্ডল নির্ব্বাচিত হয়। বয়োজ্যেষ্ঠরা এদের নাম প্রস্তাব করে এবং সতেরো বছরের অধিক বয়সের পুরুষেরা হাত তুলে তাদের মনোমত ব্যক্তির পক্ষে ভোট দেয়। মণ্ডলমশাইয়ের মাহিনা মাসে চার ডলার, অর্থাৎ প্রায়, সাড়ে দশ টাকা। গ্রামের লোকদের স্বভাব চরিত্র এবং দোষ-ত্রুটির জন্য মণ্ডলই দায়ী। পাণ্ট্যা গর্ড্যার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে কাজ করতে আদেশ দেবেন তার জন্য লোক সরবরাহ করবার ভারও এই মণ্ডলের। গ্রামাধ্যক্ষ স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজও করে' থাকে। কোনও বে-আইনী কাজ অথবা অপরাধের জন্য পঁচিশ ডলার অবধি জরিমানা করবার অথবা সাতদিন পর্য্যন্ত



স্বহস্তে সেলাই করা ব্লাউজ-পরিহিতা আধুনিক মায়া-নারী

কারাদণ্ডের আদেশ দেবার ক্ষমতা তার আছে। যেসব গুরুতর অপরাধের শাস্তি দেবার অধিকার তার নেই

সে সকল অপরাধের মামলা পাণ্ট্যা গর্ডার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করা হয়। মণ্ডলের কাজে সাহায্য করবার জন্ত একজন সহকারী এবং আটজন চৌকিদার আছে। চৌকিদারেরা মাহিনা পায়না, কিন্তু ধৃত অপরাধীর শাস্তি বিধান হ'লে, প্রতি অপরাধীর জন্ত পঁচিশ সেণ্ট পুরস্কার পেয়ে থাকে।

"ভে হুয়ে বিন্ সে আ"

চীনদেশে কানে টেলিফোন তুলে ধরলেই খুব মিষ্টি সুরে এই অদ্ভুত কথা শোনা যায়। এর মানে "নাম্বার প্লিজ"। চীনা মেয়ে "অপারেটর" সবারই নাম আর টেলিফোন নম্বর মুখস্ত করে রাখে। অন্তান্ত দেশে নম্বর ডেকে টেলিফোনে যোগাযোগ ঘটে কিন্তু চীনদেশের রীতি সেখানে নাম ধরে ডাকতে হয়। কাজেই টেলিফোন আফিসে চাকরী নিতে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে সহরের সমস্ত লোকের নাম আর টেলিফোন নম্বর কণ্ঠস্থ করা।

জাপানে কিন্তু আমাদের দেশের মত নম্বর ধরেই ডাকা হয়। কিন্তু এই টেলিফোনের নম্বরগুলি সেখানে বিশেষ গুরুতর একটা জিনিষ। জাপানীদের ধারণা যে কতকগুলি নম্বর শুভ ও কতকগুলি অশুভ। তাই সেখানে টেলিফোনের নম্বর রীতিমত বেচাকেনা হয়। নম্বর বিক্রী করবার দালালের কাছে গেলেই নূতন নম্বর কিনতে বা নিজেরটি বিক্রী করতে পারা যায়। ৪২ নম্বরটি জাপানীদের মতে ভয়ানক অশুভ, কারণ এর গূঢ় অর্থ না কি মৃত্যু। ৪৯ সংখ্যাটিও ভালো নয়। যে নম্বরগুলি অশুভ বলে কেউ নিতে চায়না, সেগুলিকে পুলিশ-থানার নম্বর করে দেওয়া হয়—ভাবটা বোধহয় এই যে পুলিশদের আবার শুভাশুভ কি? যে নম্বরগুলি শুভ বলে সকলে মনে করে, সেগুলির বেশ দাম ওঠে, এমন কি এক একটার হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাম পাওয়া যায়।

সকলের চেয়ে শুভ নম্বর ৮ আর তারপরই ৩৫৭।

খবর কানে হাঁটে

ছোট্ট একটি গলির মোড়ে ঝরঝরে একখানি মোটর গাড়ীর ড্রাইভারের হাতে আচমকা অত্যন্ত জোরে ভেঁপু বেজে উঠতেই, জীর্ণ একটি ঠিকা-গাড়ীর ততোধিক শীর্ণ ঘোড়াটি চমক্ খেয়ে ভড়্কে গিয়ে লাফিয়ে ওঠার ফলে তার পায়ে লেগে এক টুকরো পাথর ছিট্‌কে গিয়ে পাশের দোকানের সার্সি ভেঙ্গে ফেললে। ঝন্‌ঝন্ করে শব্দ হতেই পথচারী একটা ছেলে এগিয়ে ব্যাপারখানা দেখবার চেষ্টা করতেই এক টুকরো কাচ পড়ে তার নাকটা কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক জুটে হট্টগোল করে এ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল হাঁসপাতালে আর পরদিনই খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে খবর বার হল—"ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা; কাচের টুকরায় পথিক বালক জখম; এ্যাম্বুলেন্স যোগে প্রাণরক্ষা।" সম্পাদক তীব্র মন্তব্য করলেন যে দিন দিন মোটর চালকদের শৈথিল্য ও অসাবধানতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ বিষয়ে পুলিশের দৃষ্টিপাত করা একান্ত বাঞ্ছনীয় আর প্রত্যেক মোটর গাড়ীতে সেফ্‌টি কাচ লাগান অত্যন্ত আবশ্যক।

নাক—ইন্‌সিওর

সেখ জালাল কোয়ারাইসি (Sheik Jelal Quaraishi) নামে জনৈক আরববাসী একটি বিলাতী কোম্পানীতে ত্রিশ হাজার টাকায় তাঁর-নাকটি ইন্‌সিওর করেছেন। সেখ সাহেবের ব্যবসা দুষ্প্রাপ্য সুগন্ধি সংগ্রহ করা। তাঁর ঘ্রাণশক্তি এতই অদ্ভুত যে তিনি একবার মাত্র আঘ্রাণ নিয়ে বলে দিতে পারেন কোন্ সুগন্ধি কোন্ ফুলের নির্য্যাসে প্রস্তুত হয়েছে ও সেই নির্য্যাসে কি কি ফুল মিশ্রিত করা হয়েছে। দেশবিদেশে ভ্রমণ করে তিনি বহুশত সুগন্ধি সংগ্রহ করেছেন। সকলের চেয়ে দুষ্প্রাপ্য সুগন্ধিটি সংগ্রহ করা হয়েছে টুটেন খামেনের সমাধি থেকে; সেটি প্রায় চার হাজার বছরের পুরাণ।

মানুষের চামড়া

মানুষের চামড়ায় যে বই বাঁধান হতে পারে, একথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু সম্প্রতি সত্যই নরচর্ম্মে একটি বই বাঁধান হয়েছে। বইটির রচয়িতা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ক্যামিল্লা ফ্ল্যামমারিয়ন

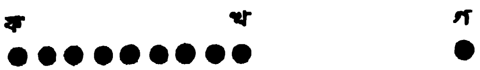
(Camilla Flammarion)। বইখানি এখন আছে ফরাসী জাতীয় গ্রন্থালয়ে ও সেটি বাঁধান হয়েছে পণ্ডিতের গুণমুগ্ধা একটি রমণীর দেহচর্ম্মে।

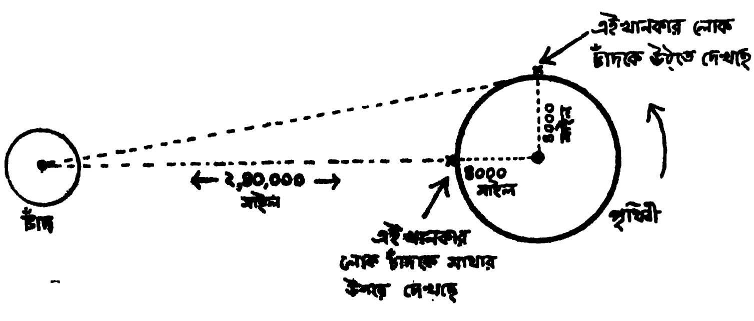
কুকুরের হোটেল

কুকুরের হোটেল কেউ কোনদিন দেখেনি, কোথাও আছে বলে এতদিন শোনাও যায়নি। কিন্তু দিন কয়েক হল প্যারিস্ নগরীতে কুকুরদের জন্য একটি রেস্তর‍াঁ খোলা হয়েছে। খাবার পাওয়া যায়, সুপ, বিস্কুট, মাংসের পুডিং, গাজর, বীন, ভাত ও মিষ্টি। যে কুকুর মাংস খেতে চায় না তার জন্য নিরামিষ খাবারও পাওয়া যায়। সুপের দাম দিতে হয় না আর অন্যান্য খাবারের দাম অবশ্য দিতে হয় কুকুরের মালিককে।

চাঁদের ধাঁধা

চারিদিক আলো করে সন্ধ্যাবেলা যখন চাঁদ ওঠে তখন তাকে দেখে মনে হয় ক-ত বড়। আবার যখন সেই চাঁদ ঠিক মাথার ওপরে আসে, তখন মনে হয় যেন আকারে অনেকখানি ছোট হয়ে গিয়েছে। আসলে কিন্তু ব্যাপারখানা





ঠিক উল্টো। চাঁদ যখন ওঠে তখনই আমরা তাকে দেখি ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরে আর মাথার ওপরে এলেই সেই চাঁদ ৪০০০ মাইল কাছে চলে আসে; সুতরাং তখন তার আকার ১/৬০ বড় হওয়া উচিৎ। এ ধাঁধার মানে আর কিছুই নয়, এটি আমাদের চোখের ধাঁধা। পাশের ছবিখানিতে ক থেকে খ পর্য্যন্ত বেশী দূর, না খ থেকে গ পর্য্যন্ত? হঠাৎ দেখে মনে হবে যে ক থেকে খ পর্য্যন্তই বেশী। কিন্তু মাপ্‌লে দুটোই ঠিক সমান দেখতে পাওয়া যাবে। ক আর খ'র মাঝে অনেকগুলি বিন্দু আছে বলে মনে হচ্ছে এটি বেশী লম্বা। চাঁদের বেলাও ঠিক তাই। চাঁদ যখন সবে ওঠে তখন তাকে আমরা দেখতে পাই গাছের ফাঁকে, বাড়ীর ছাদের ওপরে, পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে; আর যখন মাথার ওপরে আসে তখন তাকে দেখি একেবারে ফাঁকা শূন্যের মাঝখানে। ফুট খানেক লম্বা সরু একটা কাগজের নল পাকিয়ে তার ভেতর দিয়ে উদীয়মান চাঁদটি দেখলেই এ ধাঁধা ধরা পড়ে যাবে। গাছপালা বা ঘর-বাড়ী তখন আর চোখে পড়বে না; মাথার ওপরে চাঁদকে যত বড় দেখায়, উঠবার সময়ও তখন তেমনই দেখাবে।

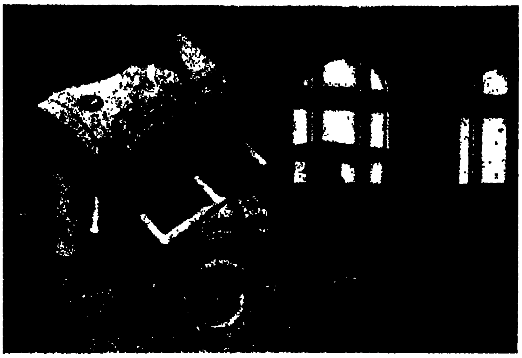
ধূলিহীন আবর্জ্জনা

আজকালকার দিনে আমরা চতুর্দ্দিকে ধূলা ও কোলাহলের অনিষ্টকারিতার কথা শুনতে পাই, অতএব ধূলিবিহীনভাবে এবং নিঃশব্দে রাস্তার আবর্জ্জনা অপসারিত করবার কোনও নব আবিষ্কৃত উপায় সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক। এই পন্থা সর্ব্বত্র অনুসৃত হ'লে আর পথের পাশে পাশে ডাষ্টবিনের প্রয়োজন হ'বে না, প্রয়োজন হ'বে না তার দুর্গন্ধের, তার মশামাছির—শত ব্যাধির লক্ষ বীজাণু যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়্‌বে তার আর উপায় থাক্‌বে না।

মোটের উপর জিনিষটা এই। দুটি মালবহনোপযোগী মোটর গাড়ীর একটির উপরে ৭৫ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট মোটর

স্থাপিত করা হয়,—এই মোটরের সঙ্গে ভ্যাকুয়ুউয়াম প্রডিউসার যন্ত্রের যোগ আছে।

অপর মোটর গাড়ীখানাতে বড় এক ইস্পাতনির্ম্মিত আধার থাকে, তারই মধ্যে আবর্জ্জনা আকর্ষণ করে' নেওয়া হয়। গৃহের নিম্নতল থেকে দীর্ঘ নলের ভিতর দিয়ে শোষণ-যন্ত্রের সাহায্যে লোকচক্ষুর অগোচরে নির্ব্বিবাদে এই কার্য্য সাধিত হয়। সম্মুখের গাড়ীখানা যখন জঞ্জালে পূর্ণ হ'য়ে যায় তখন সেটাকে আবর্জ্জনা ফেল্‌বার জায়গায় চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং আর

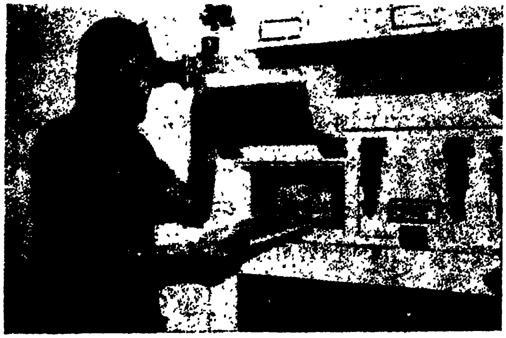


আবর্জ্জনা অপসারণে ব্যবহৃত মোটর গাড়ী

একখানি গাড়ী তার স্থান অধিকার করে। অতএব সময়ের বিন্দুমাত্র অপব্যয় হয়না, এমনি করেই সহরের জঞ্জাল সংগৃহীত হ'তে থাকে। যেসব জায়গায় এইরূপে আবর্জ্জনা অপসারণের স্থায়ী প্রয়োজন অনুভূত হ'বে, সেখানে জঞ্জালের খাত থেকে রাস্তা অবধি কায়েমীভাবে নল সংযুক্ত করে' রাখা যেতে পারে, তাতে সুবিধে হ'বে এই যে সহরের আবর্জ্জনা এই গাড়ীর সাহায্যে দ্রুততর গতিতে দূরীভূত হ'তে পারবে।

অষ্টপ্রহরব্যাপী বাজার

"ডেলাম্যাট" নামে এ্যামেরিকায় একরকম যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত দোকানের উদ্ভব হ'য়েছে,—এখানে মাংস এবং মুদিখানার যাবতীয় সামগ্রী কিন্‌তে পাওয়া যায়। পয়সা না দিলে যে সব পাত্রের ভিতর হ'তে জিনিষ বেরোয় না তেমনিতর পাত্র হ'তে শীতল অথবা স্বাভাবিক উত্তাপযুক্ত খাবার সরবরাহ করা হয়। দিনের বেলা একটি মেয়ে এসে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন



মেয়েটি রিফ্রিজারেটেড ইউনিট হইতে মাংস কিনিতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যেই গোলাকার শিকলের সাহায্যে টাট্‌কা মাংসখণ্ড নামিয়া আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করিবে।

করে' দিয়ে যায় এবং কলগুলিতে যথারীতি দ্রব্যসামগ্রী আছে কিনা তার তত্ত্বাবধান করে। অবশ্য সে যাবার সময়ে যন্ত্রের অন্তর্গত অর্থাধারগুলির ভিতর হ'তে সঞ্চিত অর্থ নিয়ে যেতে



যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত দোকানের অভ্যন্তর
চেন্, সামগ্রীবহনকারী ট্রে এবং ক্লাচগুলি দেখা যাইতেছে।

ভোলে না,—এবং এই কলগুলি মানুষের সাহায্য ব্যতীতই পরদিন পর্য্যন্ত চল্‌তে থাকে।

এই বন্ত্র দু'প্রকারে নির্ম্মিত হয়। প্রথম শ্রেণী জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক রিফ্রিজারেটারের পদ্ধতিতে এবং দ্বিতীয় শ্রেণী, যাতে তাদের ভিতরকার দ্রব্যসামগ্রী গৃহের উত্তাপেই নাড়াচাড়া করতে পারা যায় সেই উপায়ে।

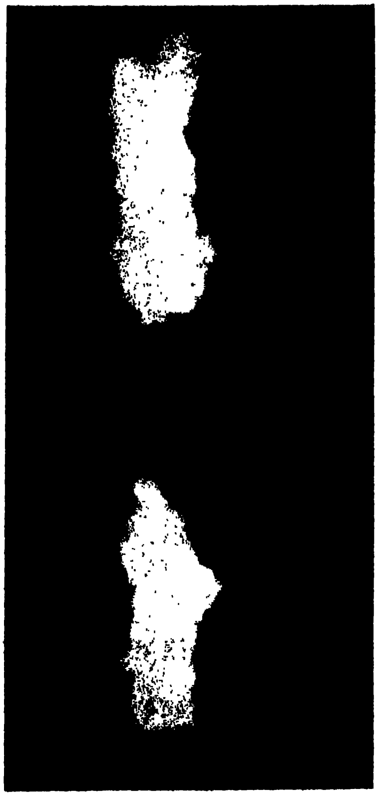


মিঃ হার্ডে তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের কৌশল বুঝাইয়া দিতেছেন। সমস্ত জিনিষগুলিই বাহির হইতে দেখা যায় বলিয়া, বিজ্ঞাপনের দিক হইতেও এই যন্ত্রের মূল্য অপরিমেয়।

ক্রীত জিনিষের মূল্য যখন প্রদত্ত অর্থের চেয়ে কম হয়, তখন এই যন্ত্রগুলি ঠিক মানুষের মতই হিসাব করে' প্রাপ্য পয়সা ফেরত দেয়। জিনিষপত্রগুলি উত্তমরূপে প্রদর্শিত হয়, এবং ছিদ্রপথে মূল্য প্রদান করবার পর একটা হাতল ঘুরিয়ে দিলেই ক্রীত সামগ্রী ক্রেতার হাতে চলে' আসে। তৎক্ষণাৎ গোলাকার শৃঙ্খলসংযুক্ত বারকোষের উপরে পুনরায় নূতন সামগ্রী এসে উপস্থিত হয়। একটি ক্ষুদ্র মোটরের সাহায্যে সমস্ত যন্ত্রটি পরিচালিত হ'য়ে থাকে।

টোরাক বিজলী শলাকা

বজ্র এবং বিদ্যুতের অত্যাচার হ'তে বিজলীবাতির তারগুলোকে রক্ষা করা এক বিরাট ব্যাপার। প্রত্যেকবার বজ্রপাতের পরেই সেগুলোর পরীক্ষা কার্য্য এবং তাদের ইন্‌সিউলেশনগুলোর পরিবর্ত্তন আবশ্যক এবং যে স্থলে ফিউজ ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে সেখানে নূতন ফিউজ সংযুক্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু এসব করতে বহু লোকের নিয়বসর সতর্ক দৃষ্টির এবং বহু অর্থের আবশ্যক,—অথচ এর সমস্তটাই অপব্যয়, বজ্র এবং বিদ্যুতের প্রতি-বাৎসরিক ধ্বংসকার্য্যের ফল। নবউদ্ভাবিত বিজলী শলাকার সাহায্যে এই অপচয় হ'তে আমরা অব্যাহতি পাব। এর গঠনপ্রণালী সরল। মেয়েদের ছাতার ন্যায় দীর্ঘ একটি নল নেওয়া হয়, তার দুই প্রান্তে একখণ্ড করে' ধাতু সংযুক্ত থাকে, এরাই ক্যাথোড্ এবং এ্যানোডের কাজ করে এবং লোভ দেখিয়ে বিদ্যুৎকুমারীকে নলের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ এত দ্রুত-গতিতে পরিবাহিত হয় যে গৃহের বিজলীবাতির দীপ্তিও নাকি ক্ষীণতম মাত্রাতে কাঁপে না।



কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বজ্র টোরাক বিজলী শলাকার উপরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর দ্রুতগতিতে টোরাকের মধ্য দিয়া পরিবাহিত হইতেছে।

ওয়েষ্টিংহাউসে এই বিজলীশলাকা নিয়ে যে পরীক্ষাকার্য্য চলেছিল তাতে এর মধ্য দিয়ে ১০২,০০০,০০০ ভোল্ট্

এ্যস্‌পিরায়স্‌ বিজলী ব্যবহার করা হয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন বিজলী-শলাকার উভয় প্রান্তে আগুন ধরে' গিয়েছে এবং ছ'ইঞ্চি কামানের থেকে গোলা নিক্ষিপ্ত হ'লে যে রকম শব্দ শুনতে পাওয়া যায় তেম্‌নিতর শোনা গিয়েছিল! সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে কিন্তু ১/৫০০ সেকেণ্ডের অধিক সময় লাগেনি। এঞ্জিনিয়াররা এবং এর উদ্ভাবক টোয়াক সাহেব বলছেন যে এই বিজলী-শলাকাকে যদি সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করে' তুলতে পারা যায়, তাহ'লে প্রতি বৎসর পৃথিবীর কোটি কোটি টাকা বেঁচে যাবে।

লজিক

খোকা—মা, ভোঁদার সঙ্গে খেলা করব?

মা—না, ভোঁদা বড় দুষ্টু ছেলে।

খোকা—(একটু পরে) ওর সঙ্গে মারামারি করব তবে?

যুক্তি

এই ঘড়িটার দাম কত?

পনেরো টাকা।

এই ছোটটার?

পঁচিশ টাকা।

আর এই ছোটটার?

পঞ্চাশ টাকা।

সর্ব্বনাশ! আর যদি ঘড়ি না-ই কিনি তা'হলে কত লাগ্‌বে?

সিংহ বশ করার সহজ উপায়

বিখ্যাত সিংহবশকারী ভ্যান এ্যাম্‌বুর্গকে একদিন এক হোটেলে জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছিল, যে পশুদের উপর তাঁর অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবের কারণ কি। তাতে তিনি বল্‌লেন, "প্রথমতঃ আমি সবসময়েই তাদের একথা বুঝিয়ে দিই যে তাদের সম্বন্ধে আমার একটুও ভয় নেই, দ্বিতীয়তঃ আমি আমার চোখের দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও জীবজন্তুর উপর থেকে অপসারিত করিনা। আমার দৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় আমি এখনই আপনাদের দিচ্ছি—" বলে' নিকটবর্ত্তী এক চাষাড়ে চেহারার লোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' তিনি বল্‌লেন, "আপনারা ওই লোকটাকে, দেখ্‌ছেন,—যেন একটি ষাঁড়! ওকে উদ্দেশ করে' একটি কথাও না বলে' আমি লোকটাকে এদিকে নিয়ে আস্‌ব—" এই কথা বলে', আসন গ্রহণ করে', এ্যাম্‌বুর্গ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পিঠ সোজা করে' সে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল এবং ঘরের ওদিক থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'য়ে এপাশে ভ্যান্‌ এম্‌বুর্গের নিকটে এসে উপস্থিত হ'ল।

এ্যাম্‌বুর্গের মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠ্‌বার আগেই নিদারুণ দুর্ঘটনার ফুৎকারে তা নিমেষ মধ্যে মিলিয়ে গেল! সম্মুখে এসে লোকটা তাঁর মুখে এক বিরাট মুষ্ট্যাঘাত করল, দৃষ্টিশক্তির সম্মোহন ক্ষমতার সকল গর্ব্ব নিয়ে এ্যাম্‌বুর্গ ভূতলশায়ী হ'লেন। লোকটা চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌ল, "আর আমারদিকে অমন কট্‌মট করে' তাকাবি? তাকাবি আর—?"

শিশুপ্রীতি

গৌরমোহনবাবু মস্তিষ্কবিদ্যা বেশ ভালো করেই আয়ত্ত করেছেন, অর্থাৎ মাথার গঠন দেখে তিনি নির্ভুলভাবে মানুষের প্রকৃতি বলে' দিতে পারেন। পদ্মলোচনবাবুর মাথার পিছনের দক্ষিণদিকের স্ফীত অংশের দিকে চেয়ে গৌরমোহনবাবু বল্‌লেন, "ওই যে মাথার ফোলা জায়গাটা, ওতে শিশুপ্রীতি প্রকাশ করে—"

পদ্মলোচনবাবু কাতর! তাঁর চোখে জল! তিনি বল্‌লেন, "বলুন বলুন আপনার বিজ্ঞানে যা বলে তাই বলুন! ওইখানটাতেই ছোঁড়াগুলো কাল ঢিল ছুঁড়ে মেরেছিল বটে!"

তারা এত ঘামেনি

একজন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক একবার তুরস্কের সুলতানের সম্মুখে কয়েকখানি অপূর্ব্ব গৎ বাজিয়েছিলেন! যতক্ষণ বাজনা চলছিল ততক্ষণ সুলতানের চোখেমুখে যে তা'

ফুটে উঠেছিল, তা যে প্রশংসার এবং বিমুগ্ধতার সে বিষয়ে বাদকের মনে সন্দেহ ছিলনা। বাজনার শেষে সুলতান বললেন, "আমি অ্যালবার্গের বাজনা শুনেছি—"

শিল্পী মাথা নুইয়ে সুলতানকে অভিবাদন করলেন এবং বিনয়ের হাসি হাসলেন।

"আমি লিস্‌তের বাজনা শুনেছি—"

শিল্পীর মাথা অভিবাদনের উৎসাহে আরও নুয়ে পড়্‌ল এবং মনোযোগ খরতর হ'ল।

"কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যারা আমার সম্মুখে বাজনা বাজিয়েছে, তাদের মধ্যে একজনও আপনার মত ঘামেনি!"

সমাধান

ট্রেনের এক কামরায় বসে' দু'জন ভদ্রমহিলার জানালা নিয়ে কলহ বাঁধে। একজন জানালা বন্ধ করবার এবং অন্যে সেটা খুলে রাখবার পক্ষপাতী। তাদের ঝগড়া মিটাবার জন্য অবশেষে গার্ডকে ডাকা হ'ল। প্রথমা বল্‌ল, 'জানলা যদি বন্ধ থাকে আমি দমবন্ধ হ'য়ে মরব—"

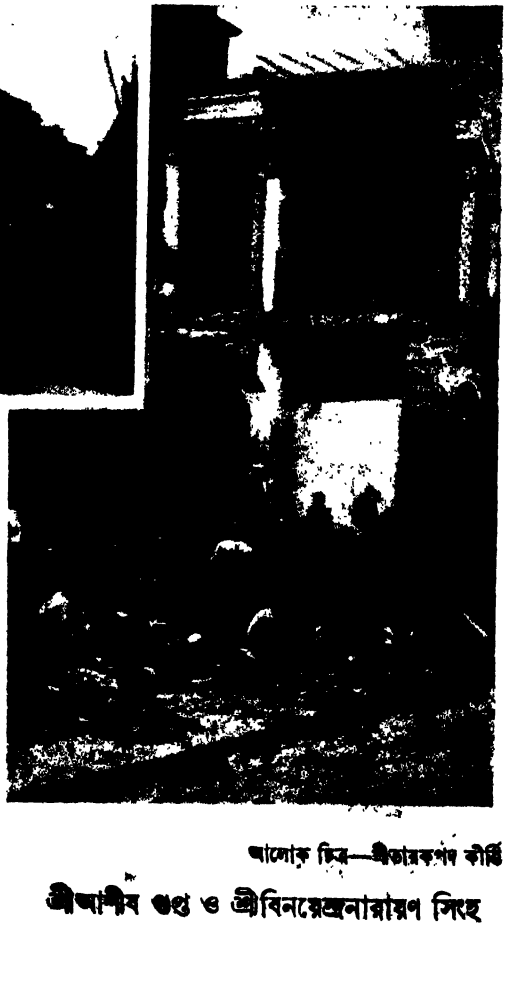
দ্বিতীয়া বল্‌ল, "জানলা যদি খোলা থাকে তাহ'লে ঠাণ্ডাতেই আমার হ'য়ে যাবে!"

গার্ড ত ফাঁপরে পড়্‌লেন।

দুইজন উত্তেজিত ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তী আসন অধিকার করে যে নিরীহ চেহারার লোকটি এতক্ষণ অবধি নিঃশব্দে বসেছিলেন, তিনি বললেন, "মশাই শুনছেন, প্রথমে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে ১ নম্বরকে দমবন্ধ করে' মারুন, তারপর খুলে দিয়ে ২ নম্বরকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে শেষ করুন, তবেই আমরা শান্তি পাব!"

ভূমিকম্পবিধ্বস্ত কলিকাতা!





হয় নাই, কিন্তু গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখের ভূমিকম্প আর একটু গুরুতর হইয়া কলিকাতায় দেখা দিলে এমনটিই হইতে পারিত। ছবিটি কল্পনাপ্রসূত নহে—কলিকাতার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটেরই একটি স্থান।

শুধু ভূমিকম্পে বিপদ নয়, কলিকাতার রাস্তায় চলিয়া বেড়ানো যে অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ারই সামিল, উপরের ছবিখানা মনোযোগ দিয়া দেখিলেই সে কথাও বুঝা যাইবে। ডানদিকের ফুটপাথের প্রান্তসীমায় দণ্ডায়মান উড়িয়া ঠাকুরটির বড় রাস্তা মহাসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে কত শঙ্কা, কত দ্বিধা; এবং যিনি একবার অকূলে ভাসিয়াছেন তীরে পৌঁছিবার জন্ত তাঁহার যে কি অপরিসীম ব্যাকুলতা সে কথা বুঝিতে হইলে দ্রুতধাবমান পথমধ্যবর্ত্তী লোকটির পদদ্বয়ের মাঝখানের ব্যবধানের প্রতি একবার চাহিয়া দেখুন! অবশেষে কূলে যখন তরী নিরাপদে ভিড়িল তখনকার শান্তি এবং নিশ্চিন্ততা বামদিকের লোকটির চরণের নৃত্য-দোদুল ভঙ্গীতেই সুপ্রকাশ।

আলোক চিত্র—শ্রীতারকপদ কীর্ত্তি

শ্রীআশীষ গুপ্ত ও শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

খেলাধূলা

সি, জে

অষ্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের চতুর্থ 'টেষ্ট'

২০শে জুলাই হ'তে লিড্‌সে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেষ্ট খেলা আরম্ভ হয়। 'টস' করিয়া ইংলণ্ড প্রথম খেলার অধিকার পাইল এবং প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়াই "ব্যাট্" করিল—কিন্তু গ্রিমেট ও রিলার ''বোলিঙে'' বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। সকলে মিলে মাত্র ২০০ শত 'রান' করিতে সক্ষম হয়। ইংলণ্ডের খেলার পর অষ্ট্রেলিয়া 'ব্যাট্' করিতে নামিয়া প্রথম দিনে মোটেই সুবিধা করিতে পারে নাই—তিন জন 'আউট্' হইয়া মাত্র ৩৯ 'রান' করে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন পন্‌স্‌ফোর্ড ও ব্র্যাডম্যান দুজনে খেলিয়া 'রানের' সংখ্যা ৩৯ হইতে ৪২৭ পর্য্যন্ত তোলে; ইঁহারা দুজনে মোট ৩৮৮ 'রান' করে। ইহার পূর্ব্বে আজ পর্য্যন্ত কোন টেষ্ট খেলার (দুজনে মিলিত 'রান') এর চেয়ে বেশী হয় নাই; এইটাই হচ্ছে টেষ্ট খেলার যে কোন উইকিটের 'পার্টনারসিপে'র রেকর্ড 'রান'। পন্‌স্‌ফোর্ড ১৮১ 'রান' করিয়া 'আউট' হইয়াছিলেন, ব্র্যাডম্যান ২৭১ 'রান' করিয়াও 'নট-আউট' থাকেন—তৃতীয় দিনে ব্র্যাডম্যান ৩০৪ 'রান' করিয়া 'আউট' হইয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার 'রান'-সংখ্যা হইল মোট ৫৮৪। প্রথম 'ইনিংসে' ইংলণ্ড অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়া ৩৮৪ 'রান' বেশী করে। যথেষ্ট সময় থাকায় সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে চতুর্থ টেষ্ট অষ্ট্রেলিয়া অতি সহজেই জিতিবে। চতুর্থ দিবস যখন ২২৯ 'রানে'ই ইংলণ্ডের ভাল ছয় জন ব্যাট্‌স্‌ম্যান 'আউট' হইয়া গেল তখন ইংলণ্ড 'ইনিংসে' হারে কিনা সেইটাই ভাবনার কথা ছিল। ইংলণ্ডের হার যখন সুনিশ্চিত, তখন বৃষ্টি এসে ইংলণ্ডকে বাঁচিয়ে দিল; এমন বৃষ্টিই আরম্ভ হল যে মাঠ ডুবে গেল খেলা আর সম্ভব হল না—কাজেই খেলা 'ড্র' হল; ইংলণ্ডও নিশ্চিত পরাজয় হইতে রক্ষা পাইল। কেবলমাত্র বৃষ্টি এ যাত্রায় ইংলণ্ডকে বাঁচাইয়া দিল—অষ্ট্রেলিয়ার নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। প্রথম 'টেষ্ট' অষ্ট্রেলিয়া জিতিয়াছিল, দ্বিতীয় 'টেষ্টে' ইংলণ্ড, এবং তৃতীয় চতুর্থ 'টেষ্টে' 'ড্র' হয়েছে—কাজেই পঞ্চম 'টেষ্ট' যত দিনই হোক না কেন শেষ পর্য্যন্ত খেলিয়া একটা মীমাংসায় আনিতে হইবে। 'ওভালে' ১৮ই আগষ্ট হইতে ৫ম 'টেষ্ট' আরম্ভ হইবে। এই 'টেষ্টে' যে দল জয়লাভ করিবে, সেই দলই 'অ্যাসেস' পাবে—কাজেই এই খেলার ফলাফলের জন্য সকলেই বিশেষ আগ্রহে প্রতিক্ষায় থাকিবে।



ব্র্যাডম্যান্
(অষ্ট্রেলিয়া)

ফুটবল

এ বৎসর কলিকাতার ফুটবল খেলার ইতিহাসে দুটি অভিনব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে—প্রথমটি মহমেডান স্পোর্টিং দলের লিগ্ খেলায় শীর্ষস্থান অধিকার কারণ ভারতীয় দলের ইহাই প্রথম লিগ-বিজয়। দ্বিতীয়টি আই, এফ, এ, সিল্ডের ফাইনাল খেলা বন্ধ হওয়া। এ বৎসর ডারহাম ও কে-আর-আর এই দুইটি স্থানীয় সেনাদল আই, এফ, এর 'ফাইনালে' উঠিয়াছিল—৩০শে জুলাই কলিকাতার মাঠে 'ফাইনাল' খেলা হইয়াছিল। রেফারি এ্যাসোসিয়সনের প্রেসিডেন্ট মিঃ পি, গুপ্ত সেদিনকার খেলার রেফারি ছিলেন। খেলার প্রথমেই ডারহাম একটি 'গোল' দেয়, কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধ খেলা শেষ হওয়ার ৭।৮ মিনিট পূর্ব্বে কে, আর, আর, গোলটি পরিশোধ করে এবং এর দুই মিনিট পরেই তাহারা আরও

একটি গোল দেয়। ডারহামের পরাজয় তখন সুনিশ্চিত, সেই সময় শেষ মুহূর্তে ডারহাম একটি 'ফ্রি কিক্' হইতে 'গোল' পরিশোধ করায় খেলাটা অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ২৫ মিনিটের বেশী খেলান হইয়াছিল। এবং ডারহাম তাহাদের 'গোল'টি সেই অতিরিক্ত সময়ে দেয়। রেফারী স্বীকার করেন যে খেলার মাঝে সময় অযথারূপে নষ্ট হওয়ায় ৬৪ সেকেণ্ড বেশী খেলান হইয়াছে। কিন্তু কে, আর, আর, বলে যে দু' মিনিটের বেশী খেলান হইয়াছে

কিঙ্গ্‌স্ রয়াল রাইফ্‌ল্‌স্



১৯৩৩ সালের র‍্যানার্স অপ্ — ১৯৩৪ সালের ফাইনালিষ্ট

এবং সেই অতিরিক্ত সময়ে ডারহাম 'গোল' দিয়াছে। ইহার জন্ত কে, আর, আর প্রটেষ্ট (protest) করে; কিন্তু তাহাদের সে 'প্রটেষ্ট' গ্রাহ্য হয় নাই, এবং কে, আর, আর-এর আপত্তি সত্ত্বেও মিঃ পি গুপ্তকেই শেষের দিনও সেই খেলার রেফারি নিযুক্ত করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ ৩১শে জুলাই পুনরায় খেলা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেদিন দুপুরেই খবর বাহির হইল যে 'ফাইনাল' খেলা হইবে না কারণ ডারহাম ও কে আর আর দুটি দলই 'শিল্ডে'র প্রতিযোগিতা হইতে বিরত হইয়াছে। রেফারীর বিরুদ্ধে অনুযোগ ছাড়াও দুটি দলের কর্তারা পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে এই খেলার জন্ত দুটি দলের পরস্পরের প্রতি যে প্রকার মনোভাব দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তাদেরকে পুনরায় খেলিতে দিলে একটা গোলযোগ বা অশান্তির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা এবং তাহার ফলে দুটি regiment-এর সখ্য ভাব নষ্ট হইতে পারে, এমন অবস্থায় খেলা হইতে বিরত হওয়াই তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। আই এফ এ ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগীতা—তার 'ফাইনাল' এই ভাবে বন্ধ হওয়া সত্যই দুঃখের ও লজ্জার কথা। সামান্ত একটা কারণ বা ওজুহাতে 'ফাইনালে' পুনরায় খেলিতে অস্বীকৃত হওয়াটাও কোনো দলের পক্ষেই ন্যায়সঙ্গত কাজ হয় নাই; Sporting Spirit বলাই চলে না।

এবার কিন্তু খেলায় এক মহমডান স্পোর্টিং ভিন্ন আর কোনও ভারতীয় দল 'শিল্ডে'র থার্ড রাউণ্ডে যেতে পারে নাই বা কোনও ইউরোপীয় বা মিলিটারী টিম্ হারাইতে পারে নাই এটা—ভারতীয় দলের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। অবশ্য 'শিল্ডে'র অধিকাংশ খেলাই জল-কাদায় মধ্যে হওয়ায় দেশীয় দল তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই; এমন কি ক্যামেরোনিয়ান বা সরপ্ সায়ারের মত ভাল ভাল মিলিটারী টিমকেও যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে এবং হারও স্বীকার করিতে হইয়াছে। 'শিল্ড' খেলাটা আরও কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ লিগ খেলার প্রথম অর্দ্ধেক শেষ হওয়ার পরই আরম্ভ করিলে টিমদের জল-কাদার এ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না—এবং ভাল ভাল টিম গুলির খেলাও আরও অনেক ভাল হইতে পারে। জুন মাসে 'শিল্ড' খেলা আরম্ভ করায় আপত্তি কি তা আই, এফ এ-র কমিটিই জানে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ভারতীয় টিম আই, এফ, এ পাঠাইয়াছিল তাহাদের ১৩ই আগষ্ট কলিকাতায় পৌছিবার

কথা। সেখানে একটি ভিন্ন সমস্ত খেলাতেই তাহারা জয়লাভ করিয়াছে। সেখানে তিনটী 'টেষ্ট' ম্যাচ্ খেলারও ব্যবস্থা হইয়াছিল—এ তিনটি খেলাতেই ভারতীয় টিম জয়লাভ করিয়াছে ইহা সত্যই আনন্দের কথা। দক্ষিণ আফ্রিকায় টিম যাওয়ায় এখানে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হইয়াছে এরিয়ানের। এরিয়ানের তিনটি ভাল খেলোয়াড় এস্ মজুমদার, এস চক্রবর্ত্তী এবং এ গাঙ্গুলী ভারতীয় টিমের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া যাওয়ায় এবারে লিগ্ খেলায়

ডারহাম্‌স্ লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রি,



১৯৩১ সালের রানার্স অপ্ ১৯৩৪ সালের ফাইনালিষ্ট,

এরিয়ান মোটেই সুবিধা করিতে পারে নাই এবং উহারা লিগ্ খেলায় মাত্র ১২ পয়েন্ট পাইয়া নিম্নতম স্থান অধিকার করিয়াছে। আগামী বৎসর তাহাদিগকে সেকেণ্ড ডিভিসনে খেলিতে হইবে। লিগের ওঠা নামা বন্ধ হইবে কিনা সে সম্বন্ধে স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত নিজেদের ভাল ভাল খেলোয়াড়কে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতে দেওয়া এরিয়ান টিমের কর্ত্তাদের বুদ্ধিমানের কাষ্য হয় নাই।

সেকেণ্ড ডিভিসন লিগ খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ান ও ও ই, বি, রেলওয়ে দু'দলই লিগ জয়ী হইবার চেষ্টা করে। শেষ পর্য্যন্ত দুই টিমেরই সমান পয়েন্ট হওয়ায় তাদের পুনরায় খেলিতে হইয়াছিল—এ খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ান যদিও অনেক ভাল খেলিয়াছিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তিন গোলে হার স্বীকার করিতে হইয়াছিল—আগামী বৎসর হইতে ই, বি, রেলওয়ে প্রথম ডিভিসন লিগে খেলিবে।

ট্রেড্‌স্ কাপ 'ফাইনাল' খেলায় পুলিস সেণ্ট জোসেফকে ৩-১ গোলে পরাজিত করিয়াছে।—

রেফারিং—এবারে লিগ খেলা দুজন রেফারী তদারক করিয়াছে—অবশ্য মিলিটারী টিমের খেলাতে একজন করিয়াই রেফারী খেলাইয়াছে। কারণ Army Bourd দুজন রেফারীর তদারকে মিলিটারী টিমকে খেলিবার অনুমতি দেয় নাই। Army Sports Central Board of India এবারে স্থির করিয়াছেন যে যে সব ফুটবল প্রতিযোগীতায় দুজন রেফারী নিযুক্ত হইবে সেই সব প্রতিযোগীতায় কোনও মিলিটারী টিম খেলিতে পারিবে না—বা মিলিটারীর কোন লোকও রেফারী হইতে পারিবে না। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আর কোনও খেলায় দুজন রেফারী নিযুক্ত করা হইবে না। লিগ খেলায় দুজন রেফারী থাকা সত্ত্বেও অনেক খেলায় রেফারিং মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। পূর্ব্বে যখন খেলার Standard এর চেয়ে অনেক বেশী উচ্চ ছিল এবং খেলার বেগও যখন এর চেয়ে বেশী দ্রুত ছিল, তখন যদি একজন রেফারী দ্বারা খেলার তদারক করা সম্ভব হইত তবে এখন তাহা কেন হইবে না তা বোঝা কঠিন। একটি রেফারী এ্যাসোসিয়েসন আছে সত্য, কিন্তু তাদের কর্ত্তারা নিজের টিমের বা নিজের স্বার্থ লইয়া এত ব্যস্ত যে রেফারীংএর উন্নতি করার একটা ব্যবস্থা করিবার সময় পান না। লিগ খেলার মত, সিল্ড খেলাতেও এবারে

রেফারীদের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ শোনা গিয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলে রেফারীর ভুলের চেয়ে তাদের অক্ষমতাই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। রেফারীদের এই দুর্ণামের জন্ম রেফারী পোষ্টিং বোর্ড, বিশেষ করে রেফারী এ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট অংশতঃ দায়ী।

সিল্ড খেলায় ডালহৌসী ও নরফক ম্যাচে রেফারীর দোষে নরফ্‌ক যে ভাবে হারিয়াছে তাহা সত্যই দুঃখের। ইউ চক্রবর্ত্তী যিনি এ ম্যাচে রেফারি ছিলেন তার অক্ষমতার পরিচয় তিনি নিজে ডারহাম, ইষ্টবেঙ্গল খেলাতে যথেষ্টই দিয়াছিলেন এবং তাঁহার রেফারিং এতই খারাপ হইয়াছিল তার জন্ম ডারহাম লিগে আর খেলিবে না এইরূপ জনপ্রবাদও হইয়াছিল। পোষ্টিং বোর্ডের সদস্যেরা তাঁহার অক্ষমতা জানা সত্ত্বেও সিল্ডের অত বড় এক খেলায় তাঁহাকে রেফারী নিযুক্ত করাটা সুবিবেচকের কার্য্য করেন নাই। সিল্ড প্রতিযোগিতার শেষ দিনের সব খেলার ভার দেওয়া হইয়াছিল মাত্র দুই জন রেফারীর উপর, কারণ পোষ্টিং বোর্ড মনে করিয়াছিল যে ডানকান্‌ ও পি গুপ্ত ছাড়া অন্য রেফারী নিযুক্ত করিলে খেলার গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে 'সেমি-ফাইনাল' ও 'ফাইনালে' এদের উভয়ের কাহারও রেফারিং মোটেই সন্তোষ জনক হয় নাই এবং রেফারীর দোষে 'ফাইনাল' খেলা বন্ধই হইয়া গেল। খারাপ রেফারিং-এর জন্য মিলিটারীর বড় কর্ত্তার নিকট হইতে যে চিঠি আই, এফ্‌ এর নিকট আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় কলিকাতার রেফারিং এর উন্নতি না হইলে মিলিটারী টিম লিগে বা সিল্ডে ভবিষ্যতে খেলিবে কি না তাতে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। নিজের দিকে না টানিয়া বা তোষামোদের দ্বারা রেফারীর উপযুক্ততা বিচার না করিয়া যদি ঠিক ভাবে রেফারী পোষ্ট করা হয় তবে রেফারিং এর অনেক গলদ দূর হইতে পারে।

সি, জে



দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

কংগ্রেস ও সোসালিষ্ট দল

কংগ্রেস প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও ধনীদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এখনও ইঁহারাই তাহার সর্ব্বপ্রধান শক্তি। পৃথিবী ব্যাপিয়া ধনিকদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলিয়াছে, তাহার ঢেউ ভারতবর্ষেও আসিয়া পৌছিয়াছে এবং এখানকার মধ্যবিত্ত ও ধনীদের (?) মনে ইহা কতকটা শঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে। কংগ্রেসকে দেশের সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইয়া উঠিতে হইলে, তাহাকে ধনী ও মধ্যবিত্তদের বর্ত্তমান স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইতে হইবে, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সম্ভবত অনেক পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্য ও আলোচনাদি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন, কংগ্রেসকে বাধ্য হইয়া দ্রুত এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে হইতেছে।

কিন্তু, কংগ্রেসে সোসালিষ্ট দলের অভ্যুত্থানে, শ্রেণী-বিরোধ, ব্যক্তিগত সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি আশঙ্কা করিয়া অনেকেই যে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন তাহা, কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির গত বোম্বাই অধিবেশনে, সোসালিষ্টদের বিরুদ্ধে লোককে আশ্বাস দিয়া কংগ্রেসকে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন ও শ্রেণীবিরোধ যে কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ, সে সম্বন্ধে আশ্বাস দিবার জন্ত করাচি সিদ্ধান্তের কতকাংশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইয়াছে।

কংগ্রেসের সোসালিষ্টদল যে অনেকটা প্রভাব সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা, বেনারস্ অধিবেশনে কংগ্রেসকে, বোম্বাই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে, তাহা হইতেই স্পষ্ট হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল মুক্তি পাইলে, তাঁহার নেতৃত্বে এই দল আরও শক্তিশালী হইবেন বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

ভারতবর্ষ ও সোসালিজ্‌ম্

আমাদের দেশের রাষ্ট্রিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকল দলের আশা ও ধারণা সমান না হইলেও প্রকৃত অনৈক্য বিশেষ মারাত্মক নহে। সর্ব্বোচ্চ দাবী সর্ব্বপ্রকার পর-মুখাপেক্ষীতাহীন পূর্ণস্বাধীনতালাভ এবং সর্ব্বনিম্ন দাবী, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলির ন্যায় অধিকার ও মর্য্যাদা লাভের অপেক্ষা কম নহে। এই উভয় আদর্শের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য খুব অধিক না থাকিলেও, ইহা লইয়া আমাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে তীব্রতার অভাব নাই। কিন্তু, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হইবে, সে সমস্যা অপেক্ষা আমাদের রাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতি কি হইবে, দেশের কোন সম্প্রদায় ও কোন শ্রেণীর তাহাতে কি স্থান, ও কতটুকু আধিপত্য থাকিবে, কোন্ পথ অনুসরণ করিয়া আমাদের অভীষ্টলাভ হইবে, তাহা লইয়াই দলাদলি এবং মতভেদ তীব্রতর।

আমাদের রাজনৈতিক চেতনার পশ্চাতে ইউরোপের রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তার প্রেরণা ও প্রভাব রহিয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষা, ইউরোপের বহুপরীক্ষিত বুদ্ধিজীবি ও ধনিকদের দ্বারা প্রভাবিত গণতান্ত্রিকতার

মূলনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং আমাদের রাষ্ট্রিক অধিকার লাভের চেষ্টা, রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বিরোধ, ইউরোপের প্রজাশক্তির অধিকার লাভের নিয়মানুগ প্রচেষ্টার অনুগামী।

রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অথবা কোনও মৌলিক অধিকার লাভের জন্য, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রজাশক্তি অনেক সময় সশস্ত্র বিদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু, ভারতবর্ষের অবস্থার পক্ষে কোনও প্রকার সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভব, সফল অথবা দেশের কাহারও পক্ষে শুভকর হইত না। ইহা ভারতবর্ষের চিরন্তন নীতি এবং আদর্শের বিরুদ্ধগামীও হইত। সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব ও অহিংসভাবে গণ আন্দোলন পরিচালন করিবার পন্থা প্রদর্শন করিয়া মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শের অনুগামী এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী যে নূতন রাজনৈতিক অস্ত্রের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা শুধুমাত্র ভারতের মুক্তিসংগ্রামে নহে, হয়ত সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে। শক্তি প্রয়োগের পদ্ধতিতে এই দূরপ্রসারী ফলপ্রসূ অভিনবত্ব থাকিলেও, আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির সমগ্র প্রকৃতি, ইহার উদ্ভবের প্রেরণা এবং আকাঙ্ক্ষিত পরিণাম পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক আদর্শ হইতে উদ্ভূত।

কিন্তু, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত কোনও প্রকার পদ্ধতি মানুষকে সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধা প্রদান করিতে পারে নাই; ইউরোপীয় গণতান্ত্রিকতাও পারে নাই। এইজন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রনীতিক অশান্তি, নূতন নূতন রাষ্ট্রনীতিক আদর্শের পরিকল্পনা এবং পরস্পর বিরোধী বহুদলের সৃষ্টি হইয়াছে। রাশিয়ার সমাজ তান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা, এই ব্যবস্থার অধীনে, রাশিয়ার সর্ব্বতোমুখী উন্নতি, তথাকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত কৃষক ও শ্রমিক-কুলের দুর্দ্দশার অপ্রত্যাশিত অবসান, জগৎব্যাপী বিরুদ্ধতার মধ্যেও তাহার ক্রমিক প্রতিপত্তি লাভ, সকল কল্পনাপ্রবণ লোকেরই বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তরুণ সম্প্রদায়েরও রাজনীতিক চিন্তা ইহাদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া রাশিয়ার পূর্ব্বের অবস্থার সহিত নানা বিষয়ে ভারতবর্ষের অবস্থার একটা মিল আছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহিত, শুধু রাশিয়া কেন, পৃথিবীর কোনও দেশেরই অবস্থার ঐক্য নাই।

সকল দেশেরই রাষ্ট্রের রূপ সেই দেশের বিশেষ অবস্থার উপযোগী হইয়া থাকে, এবং সেই দেশেরই বিশেষ অবস্থা হইতে তাহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। একদিকে কৃষক ও শ্রমিক ও অন্যদিকে ধনিক এই উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধই আমাদের রাষ্ট্রনীতির সর্ব্বপ্রধান সমস্যা নহে; এমন কি আর্থিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিশালী একটি রাজনীতিক দলও দেশের মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই। এই প্রকার কোনও দল গড়িয়া উঠিয়া, তাহা শক্তিশালী হইবার সম্ভাবনা এইজন্য বিশেষ কম থাকিবে যে, এখনও দেশের মধ্যে এই প্রকারের চেতনা জাগ্রত হয় নাই এবং জাগ্রত হইবার পক্ষে নানা বিঘ্ন রহিয়াছে। এখনও দেশের সাধারণ লোক রাজনৈতিক স্বার্থ বলিতে হিন্দুর স্বার্থ, মুসলমানের স্বার্থ, বর্ণহিন্দুর স্বার্থ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থ এই প্রকার বুঝিতেছে। বর্ত্তমানে একমাত্র জাতীয়তা বোধের প্রসারের দ্বারা, দেশের লোকের এই মনোভাব পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, সমাজ-তান্ত্রিকতা প্রচারের চেষ্টা দেশকে আরও খণ্ডিত করিয়া ফেলিবে।

আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে ধনিক নাই; মজুরদের সমস্যা দেশব্যাপী নহে। দেশের মধ্যে স্বার্থের কিছু বিরোধ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও কৃষকদের মধ্যে রহিয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিলে, এবং এই বিরোধিতার কার্য্যে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিলে, এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ পাকা হইয়া উঠিতে পারিবে। এই প্রকার বিরোধের সময় কৃষকেরা কর্ম্মীদের দ্বারা পরিচালিত হইতে চাহিতে পারেন এবং এই সময় তাঁহাদের প্রতি আনুগত্যও দেখাতে পারেন। কিন্তু, কোনও রাজনীতিক প্রয়োজনের সময়, কৃষকদের উপর কর্ম্মীদের এই প্রভাব

কার্য্যকরী হইবে কিনা, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে এখনও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি প্রবল; এবং এই বুদ্ধিকে জাগাইয়া রাখিবার লোকের এবং দলের অভাব নাই।

কোনও রাজনীতিক সঙ্কটের সময় মুসলমান কৃষকেরা সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের প্রভাব এড়াইতে পারিবেন না এবং হিন্দু কৃষকেরাও, কোনও কোনও অভিসন্ধি-সম্পন্ন অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতার প্রভাবাধীন হইতে পারেন। ফলে, কথিত মত চেষ্টার দ্বারা, দেশের মধ্যে কোনও প্রকার লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও, শ্রেণী-বিরোধের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ইহার আরও একটা কুফল এই হইতে পারে যে বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কার্য্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহা সকল দিক দিয়া সকল প্রকারে তাঁহাদের অর্থে, কর্ম্মে ও বুদ্ধিতে পুষ্ট। দেশের মধ্যে শ্রেণীবিরোধ বাধিয়া গেলে, আত্মরক্ষার জন্য ইঁহাদের অনেককে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইবে। এই বিরোধের ফলে পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে এই সম্প্রদায়ের যুবকদের অনেকের মনোভাব সঙ্কীর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে কতক পরিমাণে সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিবে।

আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসার অল্পই ঘটিয়াছে। এখনও সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেশের মধ্যে প্রবল। সমগ্র দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে যে স্বল্প সংখ্যক লোক জাতীয়তার পক্ষপাতী, তাঁহাদের কেহ কেহ এমন কোনও বিশেষ রাজনীতিক আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া দলগঠনের চেষ্টা করেন, যাহাতে জাতীয়তাবাদী লোকগুলি পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত হইতে বাধ্য হইবেন, তাহা হইলে, তাহাতে জাতীয়তাবাদীদের শক্তি ক্ষীণতর হইবে, এবং তাহার অনেকটা অংশের আত্ম-কলহে অপব্যয় হইবে।

কিন্তু, বর্ত্তমানে গণতান্ত্রিকতার মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া সকল মানুষকে সমান অধিকার দিতে হইবে, শ্রেণী-বিরোধ জাগ্রত না করিয়া, কাহারও বাঁচিবার অধিকার অস্বীকার না করিয়া, সকল সম্প্রদায়ের লোকের পরিপূর্ণ বিকাশে এবং সংযোগ সাধনেই যে জাতির প্রকৃত শক্তির উৎস নিহিত সে কথা মনে রাখিয়া জাতিগঠনের এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত হইবে। আমাদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির উপর জাতীয়তাবোধ জয়ী হইবার পর, কোনও একটি বিশেষ আদর্শ দেশের পক্ষে উপযোগী বোধ হইলে তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা অন্যায় বা বর্ত্তমানের ন্যায় ক্ষতির কারণ হইবে না।

ইউরোপে সমাজ-তান্ত্রিকতার উৎপত্তির মূল কারণটির প্রতি আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইউরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ দিক হইতেছে যে, ইহা নিজ দেশের এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের বহু লোককে বঞ্চিত করিয়া অল্পসংখ্যক লোকের কল্পনাতীত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াছে। এই সকল দেশে সাধারণ লোকে যে সকল সুখ সুবিধার অধিকারী হইয়াছেন, তাহার পশ্চাতে ধনিকদের সদিচ্ছা বা সহযোগিতা যে কিছুমাত্র নাই, তাহা নহে, তাহা হইলেও, সে সকল সুখ সুবিধা প্রধানতঃ লাভ হইয়াছে, সাধারণ লোকের এবং শ্রমিক, কৃষক, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের সংঘবদ্ধতার চাপে। এই সকল দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালনে, প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তীতায় সাধারণ লোকের যথেষ্ট হাত আছে বলিয়া যদিও উপর হইতে দেখা যায়, তাহা হইলেও, এই সকল রাষ্ট্রে ধনিকদের প্রভাব এখনও অপরিসীম এবং তাঁহাদেরই স্বার্থরক্ষার বিবেচনা ও ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী।

এখানে একদিকে, সুখ, সম্ভোগ এবং বিলাসের আতিশয্য, ঐশ্বর্য্যের অতিসঞ্চয় এবং অন্যদিকে, তাহারই পশ্চাতে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা। এখান হইতে ধনিকদের বিরুদ্ধে যে সঙ্গত অসন্তোষের আরম্ভ, তাহাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সমাজ-তান্ত্রিকতার মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

এখন ভারতবর্ষে এই প্রকারের বৈষম্য এবং তাহার প্রতিকারের জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রয়োজন আছে কিনা, তাহাই বিশেষভাবে বিবেচ্য। ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে ধনীর সংখ্যা খুবই কম। এখানে যে

শোষণ এবং বঞ্চনা আছে, তাহা এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক দেশের অন্য সম্প্রদায়ের উপর অনুষ্ঠিত হইতেছে না। এই শোষণ চলিয়াছে সমগ্র দেশের উপর বিদেশীদিগের দ্বারা।

যে স্বল্পসংখ্যক ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকদের ভুল করিয়া ইউরোপের সমশ্রেণীর লোকদের সহিত তুলনা করা হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের অবস্থা দেশের অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা ভাল নহে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণতঃ শিক্ষিত বলিয়া অন্যান্য শ্রেণীর সম-আর্থিক-অবস্থাপন্ন লোকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক জাগতিক সুখ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে, দেখা যাইবে যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের গড় আর্থিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। অনেক সময়েই বিশেষ আর্থিক কষ্টভোগ করিয়াও ইঁহাদিগকে অভাবের উর্দ্ধে থাকিবার ঠাট বজায় রাখিতে হয়।

দেশে যে অল্পসংখ্যক ধনী আছেন, তাঁহারাও ধনের সংঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োগের দ্বারা দেশের জনসাধারণকে পিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের যদি সে শক্তি থাকিত, তাহা হইলে বিদেশীয় শোষণ হইতে দেশকে বরং কতকটা রক্ষা করিতে পারিতেন এবং তাহাতে বর্ত্তমানে অপকার অপেক্ষা উপকার হইবারই সমধিক সম্ভাবনা থাকিত।

আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া বাংলায়, জমিদারী ব্যবস্থার জন্য, জমিদার, গাঁতিদার, প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের সহিত কৃষকদের একটা স্বার্থের বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং কতকটা শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

কিন্তু, এই ব্যবস্থা বর্ত্তমান অবস্থায় অধিক দিন স্থায়ী হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারী, গাঁতিদারী প্রভৃতি সম্পত্তি রক্ষা ক্ষতির কারণ হইয়া পড়িয়াছে। যাহার আর্থিক ভিত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে ব্যবস্থার অধিকদিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে। অনেক ক্ষেত্রে আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, প্রজারা সংঘবদ্ধ হইলে, জমিদারের অন্যায় শোষণ বন্ধ ত হয়ই; বরং জমিদারের অবস্থাই শোচনীয় হইয়া উঠে।

যাহা হউক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে দেশের পক্ষে নানাদিক দিয়া অহিতকর, ইহা যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্যম এবং কর্ম্মশক্তিকে অনেকটা পরিমাণে নষ্ট করিয়াছে, একথা সকলেই বুঝিয়াছেন এবং অনেকেই এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু, দীর্ঘ দিনের আর্থিক ব্যবস্থার ফলস্বরূপে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে একদিনেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নহে। ইহার জন্য কোনও প্রকার শ্রেণীবিরোধ না জাগাইয়া, অন্য মৃদুতর উপায়ে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা দেশের পক্ষে শুভকর হইতে পারে। শুধুমাত্র শিক্ষার বিস্তারের দ্বারাই ইহার অনেকটা সহায়তা হইবে।

কংগ্রেসের সোসিয়ালিস্ট্ দল সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিয়াছেন, "এই দলের কর্ম্মতালিকার পশ্চাতে এই ধারণা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, জনসাধারণ ও কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে, ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে এরূপ স্বার্থের বিরোধ নিশ্চয়ই রহিয়াছে যে তাঁহারা কখনই একযোগে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য কাজ করিতে পারেন না। আমি এই ধারণার পক্ষপাতী নহি। আমার বহু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত ধারণার পরিপোষক। শ্রমিকেরা যাহাতে নিজেদের অধিকারের কথা এবং তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার কথা শিখিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থারই বিশেষ প্রয়োজন।"

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক আদর্শ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করিতে হইবে, অন্ধভাবে কোনও একটি ইউরোপীয় আদর্শ এদেশের উপযোগী হইবে না।

সমন্বয়ের প্রকৃত উপায় কি

কৃষকদের প্রকৃত উপায় ও অভিযোগের কারণ যে রহিয়াছে এবং জমিদার গাঁতিদার মহাজন প্রভৃতির বিরুদ্ধে ইঁহাদের বিদ্বেষ যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একদিকে জমির মালিকেরা এবং অন্যদিকে মহাজনেরা দেশের লোককে নানা উপায়ে শোষণ করিয়া এবং তাঁহাদের উপর নানাবিধ অন্যায় অত্যাচার করিয়া দেশের লোককে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের এই নীতিকে ভবিষ্যতে চালাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার মত শক্তি তাঁহাদের

নাই। এবং বর্ত্তমানে তাহা আর লাভজনক নহে। তদ্ব্যতীত এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকেরাই এ কথা ভাবিতেছেন, কৃষক ও মজুরদের দুঃখ দূর ও উন্নতি না হইলে দেশের মুক্তি সম্ভব হইবে না; তাঁহারাই দেশের এই সকল বহুদুঃখে অবনত লোকের সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; কাজেই, ইঁহাদের মধ্যবর্ত্তিতা ও চেষ্টায় এই বিরুদ্ধতার অবসান এবং স্বার্থের সমন্বয় বিধান অসম্ভব নহে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত কারণের সহিত হিন্দু সমাজের আভিজাত্য এবং জাতি-বৈষম্য সমস্যাটিকে জটিলতর করিয়াছে এবং অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে এই বিদ্বেষকে তীব্রতর করিয়াছে। যাহাতে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য এবং সমগ্র হিন্দু সমাজও নিজেদের মঙ্গলের জন্য বর্ণ হিন্দুদিগকে এই মিথ্যা অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে যাহারা স্বীকার করিয়া লইতে পারে, তাহারাই এ জগতে বাঁচিবার অধিকার পায়।

ডাঃ বীরবল সাহানী

১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমষ্টার্ডাম নগরে আন্তর্জাতিক বোটানিক্যাল কংগ্রেসের যে ষষ্ঠ অধিবেশন হইবে, তাহার একটি বিশেষ শাখার সহকারী সভাপতির পদগ্রহণ করিবার জন্য উক্ত কংগ্রেসের অরগ্যানাইজিং কমিটি কর্ত্তৃক, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ বীরবল সাহানী ডি-এস্ সি (লণ্ডন), এস্ সি-ডি (ক্যাণ্টাব) নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সভার কোনও শাখার সহকারী সভাপতি হইবার সম্মান আর কোনও ভারতীয় এবং সম্ভবতঃ আর কোনও এশিয়াবাসী প্রাপ্ত হন নাই। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্ সি-ডি উপাধিও ভারতবাসীদের মধ্যে ডাঃ সাহানীই প্রথম পাইয়াছেন। ইউরোপীয় বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ বিভাগে ভারতীয়দের সাফল্য ও কৃতিত্ব, বিশ্বে ভারতীয়দের সম্বন্ধে অনুকূল মত সৃষ্টিতে যে সহায়তা করে, বাহিরের অন্য কোনও প্রকার কার্য্যের দ্বারা তাহা সম্ভব হয়না। যে-সকল মনীষি বিদ্যা এবং প্রতিভার বলে, বিশ্বসভায় ভারতবাসীর মর্য্যাদা বাড়াইতেছেন, অধিকতর উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে যাহাতে তাঁহাদের দলের কথা বিস্মৃত না হইয়া, তাহার উপযুক্ত মূল্যদান করিতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের সাবধান হইতে হইবে।

আমরা ডাঃ সাহানীকে তাঁহার এই অসাধারণ সম্মান লাভের জন্য অভিনন্দিত করি।

একজন কৃতী বাঙ্গালী

ফরিদপুরের সরকারী উকিল রায় নলিনীকান্ত সেন বাহাদুরের পুত্র ডাঃ পি-কে-সেন, এম-বি (ক্যাল), এম-ডি (বার্লিন), ইংলণ্ডের কেড্রিফ্ (Cadriff) বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। এখানকার যক্ষ্মা হাঁসপাতালটি ব্রিটীস সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, মেডিসিন ও প্যাথোলজিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মার্ক পাইয়া এবং প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "টি-ডি-ডি" (যক্ষ্মা বিষয়ক রোগ সমূহের বিশেষজ্ঞ) উপাধি লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে আরও গবেষণা করিবার জন্য বিলাতস্থ ভারতের হাই কমিশনার তাঁহাকে একটি বিশেষ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের কৃতিত্ব ও গৌরব, ভারতের গৌরবকে বর্দ্ধিত করে।

বাঙ্গালীর সম্মান

লণ্ডনের ব্রিটীস সাম্রাজ্যের ইউনিভার্সিটিজ ব্যুরো, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ দাসকে জানাইয়াছেন যে, গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য ১৯৩৪-৩৫ সালের কর্ণেগী কর্পোরেশন বৃত্তি, তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন, ইংরাজী সাহিত্যে গবেষণার জন্য ডাঃ দাস আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন। আমরা বাঙ্গালী অধ্যাপকের এই সম্মান লাভে আনন্দিত।

মহাত্মাজীর বাংলাভাষা প্রীতি

কর্পোরেশনের বাংলা অভিনন্দনের উত্তর মহাত্মাজী বাংলায় দিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বাংলাভাষা ও তাহার মাধুর্য্যের অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে যে অক্ষয় সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধাদানে বাধ্য করে। বাংলা শিক্ষার ইচ্ছা তাঁহার চিরদিনের স্বপ্ন হইয়া আছে, যদিও এই স্বপ্ন আজও সফল হয় নাই। বয়স বৃদ্ধির সহিতও তাঁহার বাংলা শিক্ষা করিবার আগ্রহ কমে নাই।

অন্য কেহ এই কথা বলিলে, তাহাকে শুধুমাত্র ভদ্রতার কথা বলিয়া ধরা যাইতে পারিত। কিন্তু, মহাত্মাজী কেবল ভদ্রতার জন্য এতটা অনর্থক কথা এতটা আবেগের সহিত বলিবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

যদি মহাত্মাজীর বাংলার প্রতি এইরূপ প্রীতি এবং শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে, এতদিন ধরিয়া তিনি বাংলার প্রতি বিশেষ অবিচার করিয়াছেন বলিতে হইবে। হিন্দী যে এতটা প্রাধান্য এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে মহাত্মার ন্যায় সর্ব্বজনমান্য প্রতিপত্তিশালী নেতা হিন্দীর পক্ষ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যদি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকেরদ্বারা ব্যবহৃত, অন্ততঃ সাধারণ হিসাবেও ভারতের দ্বিতীয় প্রধান ভাষা, বাংলা শিক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা মধ্যে মধ্যে বলিতেন, তাহা হইলেও, সম্ভবতঃ অন্যান্য প্রদেশে বাংলার চর্চ্চা কিছু অধিক হইতে পারিত। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বলিয়া ইহাতে শিক্ষার্থীদের অন্যদিক দিয়াও যথেষ্ট লাভ হইতে পারিত।

সকল ভারতবাসীকে যেমন মহাত্মা হিন্দী শিক্ষার কথা বলিয়াছেন, তেমনি হিন্দী ভাষী লোকদের পক্ষেও যে বাংলা অথবা অন্য কোনও একটি প্রধান ভারতীয় ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয়, একথা বলা মহাত্মার পক্ষে বিশেষ ন্যায়সঙ্গত হইত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ভাইস্ চ্যান্সেলর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলরের পদে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিয়োগে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৩৩ বৎসর মাত্র; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়কনিষ্ঠ। তিনি স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বনামখ্যাত দ্বিতীয় পুত্র। ইতিমধ্যেই নানাদিকে তাঁহার শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা, স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য শক্তি ও প্রতিভার পরিচায়ক। দেশবাসী আশা করে, শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁহার পিতার শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে পারিবেন।

হিন্দী প্রচারে পাঁচলক্ষ টাকা

নিখিল ভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনে হিন্দী প্রচারের জন্য পাঁচলক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। হিন্দীকে অধিকতর জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা হইবে।

আসামে হিন্দী প্রচলনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইবে। আসামে যে, কোনও একটি প্রধান ভারতীয় ভাষার প্রসারের উপযুক্ত ক্ষেত্র রহিয়াছে, সে কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি এবং একথাও বলিয়াছি যে, এখানে বাংলার দাবী ও সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু, আমাদের নিশ্চেষ্টতা ও উদ্যমহীনতার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। বাঙালীর আত্মপ্রসারের জন্য যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা আছে, একথাটা আমরা আজও ভাল ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

বিদেশে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য দান

প্রকাশ, শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মা নামক, ইউরোপে নির্ব্বাসিত কোনও ভারতীয়ের পত্নী মৃত্যুকালে বিদেশে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য, প্রায় ৩০ লক্ষ পরিমাণ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। দাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত ট্রাষ্টিরা এবং প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্মিলিতভাবে এই টাকা হইতে বৃত্তি প্রভৃতি দান সম্বন্ধে সকল কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

এদেশ হইতে প্রতিভাশালী যোগ্য ছাত্র ছাত্রীরা এদেশের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যত অধিক সংখ্যায় উচ্চতর বিদ্যালাভের জন্য বিদেশে যাইবার সুযোগ পান, ততই ভাল।

আমরা রাজনীতির মধ্যে আসিয়া পড়িতে বাধ্য হই

যদিও জাতীয় কার্য্য বলিতে আমরা প্রধানতঃ রাজনীতিক কার্য্যই বুঝিয়া থাকি, এবং ইহাই আমাদের কর্ম্মজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজনা আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও, মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার মূল্য নিতান্ত সাময়িক; আজ যাহার মূল্য অপরিমেয় কাল তাহা মূল্যহীন হইয়া পড়ে; একদেশের সর্ব্বজনপূজ্য রাজনীতিক নেতা, অপর দেশের শত্রু বলিয়া বিবেচিত হন। বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য আমাদের রাজনীতিকে গ্রহণ করিতে হয়। চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে মহাত্মা গান্ধীর এই সম্বন্ধীয় উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন ;—

"পরলোকগত লালা লজ্‌পত রায় এবং দেশবন্ধু দাশ, তাঁহাদের সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক নেতা ছিলেন এবং রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামেই তাঁহাদের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে যে তাঁহারা মৃত্যুকালে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দান না করিয়া, মানব ও সমাজ সেবায়, তাহাও আবার নারীদের জন্য, দান করিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনাটি আমাদের সূক্ষ্মদর্শী লোকদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার ও উপলব্ধি করিবার বিষয়। ইহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হয়ত আমাদের প্রকৃতির মূলধর্ম্মই হইতেছে সমাজ ও মানব সেবা। আমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজনীতির মধ্যে আসিয়া পড়িতে বাধ্য হই। আমাদের নির্ব্বাচন করিয়া লইবার স্বাধীনতা থাকিলে, আমরা সমাজ সেবাই গ্রহণ করিতাম। ঠিক এই বিষয়টির জন্যই লোকমান্যও অনুশোচনা করিয়া গিয়াছেন। সকলেই জানে, তিনি দুইবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং এই দুইবারেই, বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিয়া তাঁহার সময় ও প্রতিভা ব্যয় করিয়াছিলেন—কোনও রাজনীতিক পুস্তক লিখিয়া করেন নাই।"

সহশিক্ষা অথবা কোন শিক্ষাই নয়

ভবানীপুর ওয়াই-এম-সিতে অনুষ্ঠিত সহশিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিতর্কে সভা কর্ত্তৃক সহশিক্ষার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইলেও, এই সভার সভাপতি ডাঃ আরকুহার্টের কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায়, বালিকাদের পক্ষে, হয় সহশিক্ষা না হয় কোন শিক্ষাই নয়, এই দুইয়ের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হইবে। তিনি বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে আর একটু অগ্রসর হইয়া আমি বলিব যে, শুধু বর্ত্তমান অবস্থায় নয়, বস্তুত সর্ব্বাবস্থায়ই, উচ্চ শিক্ষার পক্ষে সহশিক্ষাকে সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা বলিয়া আমি মনে করি।" ডাঃ আরকুহার্ট তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, কলেজে ছাত্রীদের উপস্থিতি কলেজের সমগ্র আবহাওয়াকে পরিমার্জ্জিত করিয়া তুলে। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও বলেন যে, ছাত্রীরা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে বিশেষ আত্ম-মর্য্যাদার পরিচয় দিয়াছেন।

অন্যদিক সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন, "কলেজে ছাত্রীদের উপস্থিতি ছাত্রদের ভদ্র ব্যবহার ও পৌরুষের উপর যে দাবী উপস্থিত করিয়াছে, তাঁহারা তাহাতে বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য ভাবে সাড়া দিয়াছেন।"

সহশিক্ষার পক্ষে এই সকল কথা আমরাও পূর্ব্বে একাধিক বার বলিয়াছি। তিনি কলেজে সহশিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সুবিবেচনার সহিত পরিচালিত হইলে, স্কুলের পক্ষেও তাহা সত্য হইবে। স্কুলে সহশিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায় যে, এই ব্যবস্থা ব্যতীত বালিকাদের শিক্ষার, বিশেষ করিয়া পল্লীতে কোনও প্রকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। কাজেই, এখানে সহশিক্ষা অথবা শিক্ষাহীনতার মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। বরং পল্লীতে পরিচিত আবেষ্টনের জন্য এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাল্পতার জন্য, শিক্ষকদের সহিত ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত

সম্পর্ক অনেকটা ঘনিষ্ঠ হইবে এবং তাহার ফলে, এই সব ছাত্রছাত্রীর উপর নিজেদের চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করা এবং তাহাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা, শিক্ষকদের পক্ষে অনেক সহজ হইবে।

স্কুলেও ছাত্রীদের উপস্থিতি, ছাত্রদিগকে কথাবার্ত্তায় এবং ব্যবহারে অধিকতর সংযত ও ভদ্র করিবে এবং উভয় পক্ষেরই মর্য্যাদা-জ্ঞান বাড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

কংগ্রেস ও জনসাধারণের স্বার্থ

মহাত্মাজী কলিকাতায় আসিলে, একদল ছাত্র তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন করেন, তাহার মধ্যে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি মনে করেন না যে, এমন সময় আসিয়াছে যখন, কংগ্রেসের, ভূম্যধিকারী ও ধনিকদের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া জনসাধারণের স্বার্থের জন্য দৃঢ়ভাবে দাড়ান উচিত ?"

ইহার উত্তরে মহাত্মাজী বলেন ;—

"না ; আমরা, জনসাধারণের তথাকথিত বন্ধুরা, যদি এইরূপ দাঁড়াইতে চাই, তাহা হইলে, আমরা তাহাদের ও আমাদের সমাধি খনন করিব। আমি পরলোকগত স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় ধনিক ও জমিদারদিগকে জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করিতে চাই।.........আপনারা কি মনে করেন যে এই সকল তথাকথিত সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্পূর্ণভাবে দেশাত্মবোধ বর্জ্জিত। আপনারা যদি এরূপ মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, ইঁহাদের প্রতি দারুণ অবিচার এবং জনসাধারণের স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি করিবেন।.........মহৎ আদর্শের আহ্বানে ইঁহারাও সাড়া দিতে জানেন।......আমরা যদি তাঁহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিতে পারি, তাহা হইলে, আমরা দেখিতে পাইব যে, ক্রমেই তাঁহারা অধিকপরিমাণে জনসাধারণকে তাঁহাদের ধনসম্পদের অংশ দিতেছেন।

"তদ্ব্যতীত, যেন আমরা নিজেদের কাছে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যে, আমরা কতটা জনসাধারণের সহিত একীভূত হইতে পারিয়াছি। দেশের সংখ্যাতীত সাধারণ লোক ও আমাদের মধ্যের ব্যবধানকে কি আমরা দূর করিতে পারিয়াছি। কাচের ঘরে বাস করিয়া আমাদের অপরের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা উচিত নহে।......ধনিকেরা যে ভাবে জীবনযাপন করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের দোষ দিয়া থাকি, আমরা নিজেরা এখনও সে দোষ সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে পারি নাই। শ্রেণীবিরোধের কল্পনা, আমি ভাল বলিয়া মনে করি না। ভারতবর্ষে শ্রেণীবিরোধ শুধু যে পরিহার্য্য তাহা নয়, সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য...।"

মহাত্মাজী ভূম্যধিকারী ও ধনিকদের নিকট হইতে যতটা আশা করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যে ততটা কাজ খুব সহজে পাওয়া যাইবে, আমরা তাহা মনে করি না। সেজন্য চেষ্টাও করিতে হইবে এবং তাঁহাদের উপর চাপও দিতে হইবে ; অবশ্য যাহাতে শ্রেণী বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কোনও পন্থা দেশের পক্ষে কখনই শুভকর হইবে না।

কিন্তু, আমরা যাহারা বিশেষ জোর করিয়া সোসালিজমের কথা বলিতেছি ; দেশের জনসাধারণের সহিত তাহারা এখনও সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে নাই। এই সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে স্থাপিত হইবে, বর্ত্তমানের ব্যবধান ও অসন্তোষের কারণ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে।

সংস্কৃত 'উপাধি' পরীক্ষায় ছাত্রীর কৃতিত্ব

চট্টগ্রামের জগৎপুর আশ্রমটোল হইতে, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মচারিণী ও শ্রীমতী বাসন্তী ব্রহ্মচারিণী নামক দুইটি প্রতিভাশালিনী ছাত্রী, এ বৎসর সাংখ্য দর্শনের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বালিকাদ্বয়ই ঢাকার পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের উপাধি বিতরণী সভায় মহামান্য বাংলার গভর্ণরের নিকট হইতে দুইটি সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন এবং এখানেই 'কলাপে'র উপাধি পরীক্ষায় তাঁহাদের অসামান্য কৃতিত্বের জন্য, তাঁহারা সরস্বতী ও ভারতী উপাধি প্রাপ্ত হন।

সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ইঁহারা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

এই টোলের অপর দুইটি ছাত্রীও ব্যাকরণে পাণ্ডিত্যের জন্ম সরকারের নিকট হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা ব্যতীত আরও অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে পারদর্শিতার সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দিকে মেয়েরা বহু সংখ্যায় ঝুঁকিয়াছেন এবং সেখানে সংস্কৃত বিদ্যায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু, টোলের শিক্ষায় তাঁহাদের এরূপ যোগ্যতার নিদর্শনের কথা ইহার পূর্ব্বে আমরা শুনি নাই। মেয়েদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্ম যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।

ভারতবাসীদের স্বাস্থ্যের হিসাব

ভারতবাসীদের বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয়। আমাদের অজ্ঞতার জন্ম, দারিদ্র্যের জন্ম, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের জন্ম, এবং সংঘবদ্ধতা, খাদ্য ও উদ্যমের অভাবের জন্ম নিবারণযোগ্য নানাপ্রকার অসুখে আমরা বহু সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হই, এবং আরও অনেক বেশী সংখ্যায় ভুগিয়া চিরকালের অথবা দীর্ঘ বা অল্প সময়ের জন্ম সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্বাস্থ্যহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকি।

কিন্তু, আমাদের স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থা কি, স্বাস্থ্যহীনতার জন্ম কোন্ স্থানে কোন্ কারণ কতটুকু দায়ী, আমাদের এ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত কোনও কারণে আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে কিনা, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যহীনতার বিভিন্ন কারণ বর্ত্তমান আছে কি না, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার কতটা প্রতিকারযোগ্য, প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা অনুসন্ধান হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার স্থানীয় নানাকারণ ত রহিয়াছেই; সম্ভবতঃ অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, একই স্থানের অধিবাসী সকল সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা এক প্রকার নহে এবং একই রোগের প্রাদুর্ভাবও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান নহে। বলিষ্ঠ, বর্দ্ধিষ্ণু, স্বাস্থ্যবান সম্প্রদায়ের পাশেই, ক্ষীণকায়, ক্ষয়িষ্ণু এবং নির্জ্জীব সম্প্রদায়ের বাস এদেশে একেবারেই বিরল নহে। অনুসন্ধানের ফলে এ সকল সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য এবং প্রতিকারের উপায় আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নহে।

ভারত সরকারের হেল্‌থ্ কমিশনার মেজর জেনারেল জে ডি গ্রেহাম ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্ম, তাঁহার গত বার্ষিক রিপোর্টে একটি কমিশন নিয়োগের পরামর্শ দান করিয়াছেন। এই কমিশন, স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব আছে, এমন সকল বিষয়ই,—বিশেষ করিয়া, জনসংখ্যা, আর্থিক অবস্থা, বেতন খাদ্য প্রভৃতির কথা বিবেচনা করিবেন। ইহার ফলে দেশের আর্থিক উন্নতির জন্ম কোনও কার্য্যকরী উপায় অবলম্বনের পথও প্রশস্ত হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

তিনি বলিয়াছেন, ফেডারেল শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তনের সহিত একটি ফেডারেল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। আমরা মনে করি ইহার আবশ্যকতা তাহারও পূর্ব্বে।

কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত

কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেন নাই, কারণ স্বাজাতিকতার আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী তাঁহারা তাহা করিতে পারেন না; বর্জ্জনও করিতে পারেন নাই, কারণ, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ফলে যাঁহারা সুবিধা পাইয়াছেন, ইহাকে বর্জ্জন করিলে তাঁহারা দল ছাড়িয়া যাইতেন।

কিন্তু, গ্রহণ বা বর্জ্জন, কোনটিই করিতে না পারিবার ফল কতকটা গ্রহণ করিবার মতই হইয়া গিয়াছে।

কংগ্রেস যে শুধুমাত্র দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাহা নহে, ইহা সাম্প্রদায়িকতাহীন জাতীয়তার আদর্শকে সৃষ্টি করিয়াছে, প্রচার করিয়াছে, ও সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যে ইহাকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে।

কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহা এইজন্ম করেন নাই যে, দেশের সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকে সেই সকল মত বা কাজ চাহিতেছিলেন। দেশের স্বার্থের পক্ষে এবং জাতি-গঠনের পক্ষে যে আদর্শ, মত বা কাজ কংগ্রেস প্রয়োজনীয়

মনে করিয়াছেন, তাহা নির্ভীকভাবে করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই কংগ্রেস এতটা মর্য্যাদা এবং শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কংগ্রেস প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বটে, কিন্তু, এই প্রতিনিধি মাত্র তাঁহারাই নির্ব্বাচন করিতে পারেন, যাঁহারা কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাস করেন এবং তাহা মানিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। যাঁহারা জাতীয়তার ও জাতীয়মুক্তির আদর্শে বিশ্বাসী নহেন, কংগ্রেস এমন লোকদের প্রতিষ্ঠান নহে। কাজেই, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিতে না পারায়, কংগ্রেসের আদর্শ খর্ব্ব হইয়াছে।

আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া কোনও প্রতিষ্ঠানের শক্তি ক্ষয় হওয়া সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ততটা দুর্দ্দৈবের কথা নয়। যতটা দুর্দ্দৈবের কথা, কোনও বিশেষ অবস্থার জন্য আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে বাধ্য হওয়া।

কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক আব্দারকে মানিয়া লওয়া যে কংগ্রেসের আদর্শের বিরোধী, তাহা, এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে পরোক্ষে গ্রহণ করিতে যাইয়াও, কংগ্রেসকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

পণ্ডিত মালবীয় এবং শ্রীযুক্ত আনের পদত্যাগে লোকচক্ষে কংগ্রেসের মর্য্যাদা আরও নামিয়া গিয়াছে।

কিন্তু, এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। কংগ্রেস নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন যাহাতে শক্তির প্রমাণ দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ, এদিকে প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, কতকগুলি সম্প্রদায়কে এমন লুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বর্জ্জিত জাতীয়তার পরিপোষক কোনও প্রস্তাবে তাঁহারা কখনই সম্মত হইতেন না। এইরূপ অবস্থায় যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন পাইতে পারেন, এই আশায় সম্ভবতঃ কংগ্রেস এই প্রকার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহাতে লাভ লোকসান কতটা হইবে, তাহাও দেখিবার বিষয়। তাঁহাদের এই নিরপেক্ষতার নীতিতে সাম্প্রদায়িক মনোভাববিশিষ্ট মুসলমানেরা খুসী হইবেন না, এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের অপেক্ষা মুসলমান ভোটারদের উপর তাঁহাদের প্রভাব অনেক বেশী। কাজেই, এদিক দিয়া কংগ্রেস লাভবান হইবেন, এমন আশা খুবই কম। অন্যদিকে জাতীয়তার পক্ষপাতী হিন্দুদের সহানুভূতিও কংগ্রেস বর্ত্তমান নীতির ফলে কিছু পরিমাণে নিঃসন্দেহ হারাইয়াছেন। কাজেই, বর্ত্তমানে অনুসৃত নীতির ফলে কংগ্রেস যে বিশেষ লাভবান হইবেন, এমন মনে হয়না।

বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য কি হইবে

বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের সমর্থক জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য হইবে, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কংগ্রেসই দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতের মর্য্যাদা বাহিরে এবং সরকার পক্ষের কাছে যাহা কিছু বাড়িয়াছে, তাহা কংগ্রেসের জন্য। আমরা যতটুকু রাজনৈতিক অধিকার ও সুবিধা পাইয়াছি, জনসাধারণের মধ্যে যতটুকু দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছে, জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে যতটুকু প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে, তাহার জন্য আমরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে কংগ্রেসের নিকট ঋণী। ভবিষ্যতে আমাদের যে রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতে হইবে, তাহাও কংগ্রেসের মধ্য দিয়াই পাইতে হইবে। কাজেই, কংগ্রেস যদি ভুলও করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও, যাহাতে কংগ্রেসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে অথবা বাহিরের লোকের কাছে, তাহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতে পারে, এমন কোনও কাজ করা আমাদের পক্ষে মারাত্মক রকমের ভুল হইবে।

কংগ্রেস যাহাতে ভুল সংশোধন করিয়া তাহার চিরন্তন নীতি আদর্শের অনুসরণ করিতে পারে, কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া, তাহা করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তির কার্য্য হইবে।

কংগ্রেসের বাহির হইতেও আইন পরিষদে ঢুকিয়া জাতির মঙ্গলকর সকল কার্য্যে, কংগ্রেসদলের সহিত একযোগে কার্য্য করিব,—দেশের পক্ষে এ আশ্বাস যথেষ্ট নহে। কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিরা যাহাতে সর্ব্বত্র জয়ী হইতে পারেন, দেশের লোকের উপর কংগ্রেসের প্রভাব যাহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করা দেশের হিতকামী সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য হইবে।

শ্রীসুশীল কুমার বসু



কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধী

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতায় আগমনে কলিকাতাবাসীর দৈনন্দিন জীবনে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ কলিকাতায় বেশিদিন অবস্থানের তাঁর অবকাশ হোলো না, যদি হোত তবে হয়ত বাংলার বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় দলাদলির সমস্যাটা মীমাংসার পথে কতকটা অগ্রসর হ'তেও পারত। সামান্ত কয়েকঘণ্টার কথাবার্ত্তায় কোনো ফলই হয়নি। মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য ছিল,—রাষ্ট্রীয় দলাদলি ও সঙ্কীর্ণ কলহের মূল কারণটি বাঙালীর অন্তর থেকে উৎপাটিত করে দেওয়া,—কিন্তু অনেকদিন ধরে একটু একটু করে যা' অন্তরের মধ্যে শিকড় গেঁথেছে,—একদিনে তা' উৎপাটিত করার মত যাদুমন্ত্র বোধ হয় কেউ



দেশবন্ধু পার্কে মহাত্মা গান্ধী মঞ্চের উপর উঠ্‌ছেন
আলোক-চিত্রক—শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

জানেন না, মহাত্মাও না। আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদের যতই দোষ দিই না কেন তাদের পরস্পরের বিরোধের মধ্যে যতই লজ্জার কারণ থাকুক না কেন,—এ লজ্জা বাঙালীকে ততদিন বহন করতে হ'বে, যতদিন না পর্য্যন্ত আবার একজন দেশবন্ধুর মত নেতার আবির্ভাব বাঙলা দেশে হ'বে। অনেকে মনে করেন,—বাঙালীর মধ্যে দলাদ'ল মেটাবার জন্ম একজন



দেশবন্ধু পার্কে মহাত্মা গান্ধী মঞ্চের উপর বসে বক্তৃতা দিচ্ছেন

আলোক-চিত্রক—শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

অবাঙালী নেতার প্রয়োজন হওয়াটা বাঙালীর পক্ষে লজ্জাকর, একথা ঠিক। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দলাদলির জন্ম যে সকল কলঙ্ক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘটল,—যার একটা চরম দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছিলাম কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপারে, তা' আরও বেশি লজ্জাকর।

যা হো'ক যদিও মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতা আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হয়নি,—তবুও আমরা যে তিন দিন তাঁকে আমাদের মাঝে পেয়েছিলাম,—তাঁর মহত্ত্ব ও পবিত্রতার সংস্পর্শে এসেছিলাম, তাঁর বাণী শুনেছিলাম,—একথা আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে। পুণাচুক্তির প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে বাঙালীর মনে কিছু অভিমান আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এই মহাপুরুষের প্রতি বাঙালীর যথার্থ মনোভাব কি,—তা প্রকাশ পেয়েছিল সেদিনকার দেশবন্ধু পার্কের বিরাট জনতায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের অভিভাষণে, এবং হরিজন কার্য্যের জন্ম কলিকাতায় মহাত্মাজী যে অর্থসংগ্রহ করতে পেয়েছিলেন তার অঙ্কের মধ্যে।



দেশবন্ধু পার্কে গান্ধী-সন্দর্শন-প্রার্থী জনসমুদ্র

আলোক-চিত্রক—শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাত্মাজীর মহত্ত্ব বাঙালী কোনোদিন ভুলবে না, যদিও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ঘূর্ণিপাকে এবং কঠিন সমস্যাজালের মাঝখানে মহাত্মাজী বাঙালীর প্রতি তথা অন্যান্য প্রদেশবাসীর প্রতি একটু আধটু অবিচার ক'রেও ফেলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ

স্বর্গীয় সার রমেশচন্দ্র মিত্র থেকে আরম্ভ করে অনেক বাঙালীই অস্থায়ীভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদের যোগ্য বিবেচিত হ'য়েছেন,—কিন্তু স্থায়ী-ভাবে যে কেন যোগ্য বিবেচিত হননি,—তা বোঝা দুঃসাধ্য। আমরা আশা করেছিলাম, আজকালকার প্রগতির যুগে সর্বজনপ্রিয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় স্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির পদে বাঙালীর নিয়োগের পথে সংস্কারগত বাধা ঘোচাতে সক্ষম হ'বেন। কিন্তু আমাদের এ আশা পূর্ণ না হওয়ায় আমরা দুঃখিত হ'য়েছি। অস্থায়ীভাবে মন্মথবাবু যে সম্মানের অধিকারী হ'য়েছেন, আমরা তাতে খুসী হ'য়েছি বটে, কিন্তু তাঁর মত সুযোগ্য বিচারপতির পক্ষে এ সম্মান কিছু বেশি নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্-চান্সেলার

সার হাসান সুরাবর্দ্দীর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলারের পদে স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে মনোনীত এবং নিযুক্ত ক'রে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট দেশের জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

শ্যামাপ্রসাদের বয়ক্রম মাত্র ৩৩ বৎসর। এত অল্প বয়সে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার এ পর্য্যন্ত আর

কেউ পাননি। কিন্তু বয়সের কথাটা শুনতে ভাল হ'লেও কতকটা অবান্তর; কারণ আসল কথা হচ্চে যোগ্যতার,—



শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বয়সের ন্যূনতা সেই যোগ্যতারই প্রমাণ। যোগ্যতার বেগ দুর্দমনীয় না হ'লে এত অল্প বয়সে কেউ এ পদলাভ করতে সমর্থ হন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যাপারে অতি দ্রুতবেগে শ্যামাপ্রসাদের শক্তি-সঞ্চয় লক্ষ্য ক'রে এ কথা আমরা সকলেই জানতাম যে, একদিন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হ'য়ে বসা অনিবার্য্য। সেই 'একদিন' এত শীঘ্র উপস্থিত হওয়ায় আমরা বিস্মিত হইনি, সুখী হয়েচি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরলোকগত স্যর আশুতোষের হাতে-গড়া জিনিস। তিনি এ'কে কেটেছেন, ছেঁটেচেন বদলেছেন, বাড়িয়েছেন, এ'কে নূতন মূর্ত্তি দান করেছেন, জগতের বিশ্বশিক্ষায়তনে এ'কে গৌরবের আসনে বসিয়েছেন, কিন্তু তবু তাঁর সমস্ত অভিপ্রায় সমস্ত কল্পনা শেষ করতে পায়েন-নি, অনেক কিছু অপরিসমাপ্ত রেখে চ'লে যেতে হয়েচে। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁর প্রতিভাশালী সুযোগ্য পুত্র তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই অনধিগত গৌরবে ভূষিত করবেন। আমরা শ্যামাপ্রসাদের অটুট স্বাস্থ্য এবং এই নবলব্ধ পদে সুদীর্ঘ অবস্থিতি কামনা করি।

গত ৮ই আগষ্ট ১৯৩৪ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন।

শ্রীযুক্ত সুশীল সেন

ভারতবর্ষীয় কোম্পানী আইন এবং বীমা-আইন সংশোধনের জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক মাসিক তিনহাজার টাকা বেতনে একটি বিশেষ পদ সৃষ্টি করা হ'য়েছে,—এবং ঐ পদে কলকাতার সুবিখ্যাত এটর্ণি শ্রীযুক্ত সুশীল সেনের নিয়োগে আমরা বিশেষ সুখী হ'য়েছি; অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে আইন ব্যবসায়ে সুশীলবাবু যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্য আমরা তাঁকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ

বাংলাদেশের Director of Public Instruction-এর পদে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দের নিয়োগে আমরা বিশেষ আনন্দিত হ'য়েছি। সরকারের শিক্ষা-বিভাগের এই উচ্চপদে বাঙালীর নিয়োগ এই প্রথম।

বাঁশবেড়িয়া গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র

সুপরিচালিত গ্রন্থাগার সভ্যজগতের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। উন্নত প্রণালীতে গ্রন্থাগার

পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যাটি শিক্ষা করা আবশ্যক। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে, এমন কি ভারতবর্ষেরও কোন কোন অংশে গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে; বাংলাদেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নেই।



হুগলী জেলা পাঠাগার সমিতি
বাঁশবেড়িয়া গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যাপকবৃন্দ ও শিক্ষার্থিগণ

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এবং শ্রীতিনকড়ি দত্ত প্রভৃতি কর্ম্মিগণের উদ্যোগে গত জুন মাসে হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমিতির অধীনে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে মাত্র পনের দিনের জন্য বাংলাদেশে সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও বরোদায় গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু নামক জনৈক যুবক শিক্ষাকেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেছিলেন। এবং কেন্দ্রের অবৈতনিক পরিচালকের পদ গ্রহণ করেছিলেন কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক।

মাত্র পনরদিনে গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় ব'লে শিক্ষাকেন্দ্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিক পদ্ধতি সমূহের সহিত শিক্ষার্থীগণের সাধারণভাবে পরিচয় সাধনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেন্দ্রটিকে স্বল্পকাল স্থায়ী পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা (Experimental Scheme) হিসাবে স্থাপন করা হয়েছিল ব'লে কেন্দ্রে যোগদানের নিমিত্ত দেশের নানা স্থান হ'তে বহু শিক্ষার্থীর আবেদন পাওয়া সত্ত্বেও মাত্র এগার জনের অধিক শিক্ষার্থীর আবেদন মঞ্জুর করা সম্ভব হয় নি। উক্ত এগারজন শিক্ষার্থীর মধ্যে দুইজন এম, এ; তিনজন বি, এ; অবশিষ্ট সকলে আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছিলেন। 'মোহনবেণু' কাগজের ভূতপূর্ব্ব পরিচালক শ্রীযুক্ত দেবীকুমার গোস্বামী এম-এ Librarian Training পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগারিকের কার্য্য শিক্ষা দেবার এইটিই প্রথম প্রচেষ্টা ব'লে শিক্ষাকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে কার্য্য করিতে হয়েচে এবং বহু প্রকারের অসুবিধা ভোগ করতে হয়েচে। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রের কার্য্য বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েচে, তাই আনন্দের বিষয়। গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যাশিক্ষা করবার জন্য শিক্ষার্থিগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিষয় অবগত হওয়ার পর শিক্ষার্থিগণ এই বিজ্ঞানের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ফলে দেশের সর্ব্বত্র বিশেষ সাড়া পড়েছে এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল ব্যক্তিই গ্রন্থাগারিকের কার্য্য শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন। কেন্দ্রের কার্য্য শেষ হওয়া সত্ত্বেও এক্ষণে প্রায় প্রত্যহ নানা স্থান হ'তে গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে সংবাদাদি জানবার জন্য এবং শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করবার জন্য কেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের নিকট বহু পত্র ও আবেদন আসছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের কার্য্য

শিক্ষা দেবার জন্য সিণ্ডিকেটের এক প্রস্তাব এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। ঐ প্রস্তাব যা'তে সত্বর কার্য্যে পরিণত হ'তে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েরই এক্ষণে বিশেষ তৎপরতা সহকারে চেষ্টা করা আবশ্যক।

পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ

জার্ম্মাণীর স্বদেশ প্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেণ্ট্ হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যুতে জগতের একজন বরণ্যে মহামানবের তিরোভাব হ'ল। হিণ্ডেনব্যর্গের কল্পনাশক্তি ছিল বিরাট এবং কার্য্য করবার শক্তি এবং সাহস ছিল অপরিমেয়। সেই শক্তির প্রভাবেই তিনি ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে হার হিট্লারের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হন। আমরা এই বিরাট পুরুষের পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘ

বিগত ২৩শে জুলাই সোমবার এলবার্ট হলে ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের দ্বাদশ বাৎসরিক সম্মেলনের অধিবেশন হ'য়েছিল। এই অধিবেশনের একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে এবারকার কর্ম্মী-নির্ব্বাচন সকলের সম্মতিক্রমেই হ'য়েছিল, ভোট নেবার প্রয়োজন হয়নি। সভাপতির পদে 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর নির্ব্বাচনে সকলেই বিশেষ রকম আনন্দিত হ'য়েছেন। বস্তুতঃ ১৯২২ সালে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনিই সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপ হ'য়ে আছেন,—একথা একবাক্যে স্বীকার করতেই হ'বে। আমরা আশা করি তাঁর নেতৃত্বে সঙ্ঘের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হ'বে, এবং সঙ্ঘ তার সার্থকতার দিকে অগ্রসর হ'বে।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও অশান্তির যুগে সংবাদপত্র পরিচালনা যে কিরূপ দুরূহ ও বিপদ-সঙ্কুল কাজ তা সকলেই অবগত আছেন। এমন দিনে,—এই রকম সঙ্ঘের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুভূত হয়। কলিকাতার ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘ,—দেশের অন্যান্য সাংবাদিক সঙ্ঘগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এর সভ্যতালিকায় শুধুই বাংলাদেশের সাময়িক পত্রিকাগুলি নয়, ব্রিটিশ-শাসিত অন্যান্য প্রদেশের, দেশীয় রাজ্যসমূহের ও পর্ত্তুগীজ ভারতেরও অনেক সাময়িক-পত্রিকার নামও আছে। অদূর ভবিষ্যতে দেশের সমস্ত সাংবাদিক সঙ্ঘগুলির একটি বৃহত্তর সঙ্ঘের পরিকল্পনাও কর্ত্তৃপক্ষের মনে আছে।

এই সঙ্ঘের বর্ত্তমান বার্ষিক বিবরণে প্রকাশ যে দেশের প্রেস-আইনের কঠোরতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিপূর্ণ উদ্যমেই চালানো হ'য়েছিল, যদিও এদিকে আশানুরূপ সফলতা লাভ করা যায়নি। সংবাদপত্রের তার-বার্ত্তাবহনের মূল্য বৃদ্ধির যে প্রস্তাব সম্প্রতি সরকার থেকে করা হ'য়েছে,—তার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি প্রকাশ করার ফলে উক্ত প্রস্তাব ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মুলতুবি আছে,—এবং ইতিমধ্যে সরকারপক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্র পরিচালকদের মতামত আহ্বান করা হয়েচে। এ ছাড়া সংবাদ-পত্রের কার্য্যালয় সমূহে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধা সুখ দুঃখের দিকে এই সঙ্ঘের দৃষ্টি আছে দেখে আমরা সুখী হ'লাম।

বিবরণে আরও প্রকাশ যে এ বৎসর সংবাদপত্র পরিচালকদের জন্য একটি ক্লাব ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছে। সুখের বিষয় কাশিমবাজারের মহারাজা অনারেবল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী সমবায় ম্যান্সনের মধ্যে বিনা খাজনায় ক্লাবগৃহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ যথাযথ ক্লাবটীকে পরিচালনার জন্য যতটা অর্থের প্রয়োজন,—ততটা অর্থসংগ্রহ এখনো করতে পারা যায়নি।

পরিশেষে বিবরণে আমরা দেখে সুখী হ'লাম যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবাদপত্র পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করার জন্য এই সঙ্ঘ চেষ্টা করছেন। এঁদের এই সকল বহুমুখী প্রচেষ্টা সফল হোক আমরা এই কামনা করি।

মশক উচ্ছেদ সমিতি

গত কয়েক বৎসর যাবত কলিকাতায় মশার উৎপাত বৃদ্ধি ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে। এর নিবারণের

জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সাহায্যে একটি Mosquito Brigade Union প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এই সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত তিনটি ছাপানো পত্র আমাদের হস্তগত হ'য়েছে। তর্ক-মীমাংসা নাম দিয়ে কথোপকথন ছলে এই পত্রগুলির মধ্যে মশক-উচ্ছেদ ও ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা আছে। আমরা আশা করি এই পত্রগুলি সাধারণের মধ্যে এ সংবন্ধে জ্ঞান-বিস্তারের সহায়তা করবে।

ফ্লুয়েলিন (FLUELENE)

কলিকাতায় এমিল্ মেডিকাল প্রোডাক্টস-এর নবাবিস্কৃত ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের মহৌষধ এক বোতল ফ্লুয়েলিন উপহার পেয়ে ব্যবহারের পর ইহার অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতায় আমরা বিস্মিত হয়েছি। যে তিন চারটি ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করেছিলাম সবগুলিই অতি সত্বর আরোগ্যলাভ করেছিল। কঠিন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সমস্ত জানা উপকরণগুলি ত এতে আছেই, কিন্তু এর প্রধান উপকরণ বহু কষ্টে এবং বহু অর্থলোভের সাহায্যে একজন সাঁওতাল কবিরাজের নিকট হ'তে প্রাপ্ত সাঁওতাল পরগণার অরণ্যের কোনো উদ্ভিৎ। জনৈক সিভিল সার্জ্জেন দুমকায় অবস্থান কালে উক্ত কবিরাজের ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসায় বিস্মিত হন, সেই কবিরাজেরই নিকট থেকে উপকরণটি সংগৃহীত। রোগের সূচনায় প্রতিষেধকরূপে, এবং রোগাবস্থায় আরোগ্যের জন্য, উভয়তই, এ ঔষধটি পরম উপকারী। আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, অচিরে এই ঔষধটি পরিচিতি লাভ ক'রে রোগপীড়িত জনসাধারণের অশেষ মঙ্গলসাধন করবে।

মহিলা শিল্প-প্রদর্শনী নারী শিক্ষা সমিতি

নারী শিক্ষা সমিতির কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নমুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি আমরা প্রকাশিত করলাম।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলা ২৯শে ভাদ্র শনিবার, বৃহস্পতিবার শিল্প ও নানাবিধ কারুকার্য্যের অনুশীলনে উৎসাহদান করে একটি মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইবে। প্রদর্শনী চারদিন খোলা থাকিবে।

১। স্থান—বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন আশ্রম, ২৯৪।৩ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

২। সময়—২টা হইতে ৬টা।

৩। প্রবেশ ফিঃ পুরুষদিগের জন্য—৵০, মহিলা ও বালকদিগের জন্য—৴০। ফি দ্বারে গৃহীত হইবে।

৪। ষ্টল—(নানাবিধ জিনিস বিক্রয়ের জন্য) পরিসর —৭৷৷০ × ৭৷৷০ ফুট, বাঁধান ষ্টল দুইটী বিজলী বাতী পয়েণ্ট সহ ভাড়া ৭৲ টাকা।

এই উপলক্ষে মহিলাদিগকে হস্তনির্ম্মিত নানাপ্রকার শিল্প ও কারুকার্য্য প্রদর্শনী কমিটির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবীর নামে ২৯৪।৩ নং আপার সারকুলার রোড (বাণী-ভবনে) পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি গৃহীত হইবে। দ্রব্যাদির দুইটি তালিকা তৎসঙ্গে প্রেরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক জিনিষের পশ্চাতে নির্ম্মাতার নাম ও ঠিকানা ও মূল্যের টিকিট দৃঢ়রূপে লাগান না থাকিলে তাহা গ্রহণ করা হইবে না। সম্পাদিকাকে খবর পাঠাইলে তিনি লোক পাঠাইয়া কলিকাতার অধিবাসিনী মহিলাগণের নিকট হইতে প্রদর্শনীর জন্য দ্রব্যাদি আনাইতে পারিবেন।

কোন জিনিস নষ্ট হইবার বা হারাইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। প্রদর্শনী অন্তে ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ২২শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দ্রব্যাদি ফেরত লইতে হইবে, বিলম্বের জন্ম নষ্ট হইলে বা হারাইলে আমরা দায়ী হইব না।

যাঁহারা প্রদর্শনীতে "ষ্টল" লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রদর্শনী কমিটীর সম্পাদিকা মহাশয়ার নিকট নারী শিক্ষা সমিতির আপিস্ ২৯৪।৩, আপার সারকুলার রোডে আবেদন করুন। ষ্টলের ভাড়া সাত (৭৲) টাকা আবেদন পত্রের সহিত জমা দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত বিভাগে কার্য্যের উৎকৃষ্টতা অনুসারে পারিতোষিক দান করা হইবে। মহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হস্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদির জন্ম মাননীয় সন্তোষের রাজা স্তর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সহধর্ম্মিণী লেডি রাণী সাহেবার নামে একটী স্বর্ণ পদক পুরস্কার দিবেন এবং বালিকা বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট কার্য্যের জন্ম অনরেবল নবাব ফারোকী সাহেবের প্রদত্ত কাপ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(১) বয়ন—সুতী, রেশম, পশম।
(২) আলপনা—(কাগজে এবং কাঠে)।
(৩) সাধারণ সেলাই।
(৪) পশমের, সুতির জিনিস বোনা (নিটিং ও ক্রুশে)।
(৫) বেতের কাজ।
(৬) সূক্ষ্ম সূচী কার্য্য (এমব্রয়ডারী)।
(৭) কাঁথা।
(৮) মাটীর কাজ।
(৯) চরকার সুতা।
(১০) চামড়ার কাজ।
(১১) খেলনা (কাপড়ের ও কাগজের)।
(১২) চিত্রকলা।
(১৩) কাশ্মিরী কাজ (শালের কাজ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতিদিন অপরাহ্নে শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে বক্তৃতা ও আমোদজনক ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থা করা হইবে।

মহিলা শিল্প-প্রদর্শনী কমিটীর সম্পাদিকা—
শ্রীশ্যামমোহিনী দেবী।

নারী শিক্ষা সমিতির সম্পাদিকা—
শ্রীঅবলা বসু।
৯ই আগষ্ট, ১৯৩৪।

সহকারী সম্পাদিকা—
শ্রীপ্রতিভা সেন।
শ্রীশোভনা গুপ্ত।

বেথুন কলেজের পুরাতন ছাত্রী তালিকা

বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়া কলেজের পুরাতন ছাত্রীবৃন্দের একটী তালিকা সঙ্কলন করছেন। এই সংবাদে আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। বঙ্গদেশের তথা প্রাচ্য-ভারতের শ্রেষ্ঠ স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীবৃন্দের এই তালিকা বাঙ্গালার স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসের দিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান হ'বে। তা ছাড়া নূতন ও পুরাতন ছাত্রীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসম্বন্ধ স্থাপন বিষয়েও এই তালিকা সহায়তা করবে। আমরা আশা করি, কলেজের সকল পুরাতন ছাত্রীই অবিলম্বে তাঁদের নাম ধাম ও কলেজে অধ্যয়নের সন প্রভৃতি অধ্যক্ষ মহোদয়ার নিকট পাঠিয়ে তালিকাটীকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করবার সহায়তা করবেন।

পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

মৈমনসিংহ মুক্তাগাছার স্বনামধন্য জমীদার ও দেশপ্রেমিক ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় বিগত ৬ই শ্রাবণ ১৩৪১ রবিবারে পরলোক গমন করেছেন। কয়েকদিন জ্বর ভোগের পর তাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র ৫৯ বৎসর হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর নিজ অঞ্চলের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৈমনসিংহ নারী রক্ষা সমিতি এবং হিন্দু সভার তিনি সভাপতি ছিলেন; এবং তাঁর নিজ হাতে গড়া মৈমনসিংহ জমিদার সভার তিনি ছিলেন সম্পাদক। দুস্থ এবং দরিদ্রজনকে সাহায্য দানকরতে তিনি কখনো পরাঙ্মুখ হতেন না। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে মৈমনসিংহ যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মুক্তাগাছা জমিদার বংশ শিকার বিষয়ে খ্যাতি দীর্ঘকাল থেকে বহন ক'রে আসছে। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সে খ্যাতির মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা ক'রে গিয়েছেন। তাঁর রচিত পুস্তক "শিকার কাহিনী" শিকার বিষয়ে একটি মূল্যবান এবং উপাদেয় পুস্তক।

আমরা ব্রজেন্দ্রনারায়ণের শোকসন্তপ্ত পরিজনদিগকে আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আশ্বিন এবং কার্ত্তিকের বিচিত্রা

আগামী আশ্বিন মাসের বিচিত্রা ২৭শে ভাদ্র এবং কার্ত্তিকের বিচিত্রা ১৭ই আশ্বিন প্রকাশিত হবে। বিজ্ঞাপন-দাতাগণ তদনুসারে উক্ত দুই মাসের কাগজে নূতন বিজ্ঞাপন দেবার এবং পুরাতন বিজ্ঞাপনে পরিবর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করবেন।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259 Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.



বিচিত্রা
আশ্বিন, ১৩৪১

দিবাস্বপ্ন

শিল্পী
শ্রীনির্ম্মল গুহ

বিচিত্রা

অষ্টম বর্ষ, ১ম খণ্ড	আশ্বিন, ১৩৪১	৩য় সংখ্যা

কাঠবিড়ালী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাঠবিড়ালীর ছানা দুটি
আঁচল তলায় ঢাকা,
পায় সে কোমল করুণ হাতে
পরশ সুধামাখা।
এই দেখাটি দেখে এলেম
ক্ষণকালের মাঝে,
সেই থেকে আজ আমার মনে
সুরের মতো বাজে।
চাঁপা গাছের আড়াল থেকে
একলা সাঁজের তারা
একটুখানি ক্ষীণ মাধুরী
জাগায় যেমন ধারা;
তরল কলধ্বনি যেমন
বাজে জলের পাকে
গ্রামের ধারে বিজন ঘাটে
ছোটো নদীর বাঁকে,

লেবুর ডালে খুসি যেমন
প্রথম জেগে ওঠে
একটু যখন গন্ধ দিয়ে
একটি কুঁড়ি ফোটে ;
ছুপুর বেলার পাখী যেমন
—দেখতে না পাই যাকে—
ঘন ছায়ায় সমস্ত দিন
মৃতুল সুরে ডাকে ;
তেম্‌নিতরো ঐ ছবিটির
মধুরসের কণা
ক্ষণকালের তরে আমায়
করেছে আন্‌মনা।
ছুঃখ সুখের বোঝা নিয়ে
চলি আপন মনে,
তখন জীবনপথের ধারে
গোপন কোণে কোণে,
হঠাৎ দেখি চিরাভ্যাসের
অন্তরালের কাছে
লক্ষ্মী দেবীর মালার থেকে
ছিন্ন পড়ে আছে
ধূলির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে
টুক্‌রো রতন কত,—
আজকে আমার এই দেখাটি
দেখি তারির মত ॥

শান্তিনিকেতন
২২ আষাঢ়
১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তান্ত্রিক সাধনা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচির আবিষ্কৃত কৌলজ্ঞাননির্ণয় সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছি এবং সেটি বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হয়েছে। এখন তান্ত্রিকধর্ম্মের গোড়ার কথায় আসা যাক্। আমাদের দেশে ধর্ম্মের তিনটি মার্গ সুপরিচিত। যথা (১) কর্ম্মমার্গ (২) জ্ঞানমার্গ (৩) ভক্তিমার্গ। এ তিন মার্গেরই উদ্দেশ্য এক—মুক্তি। কৌলধর্ম্মের চতুর্থমার্গকে শক্তিমার্গ বলা যায়। কারণ এ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যুগপৎ ভুক্তি ও মুক্তি। কতকগুলি অলৌকিক শক্তিলাভ করাই এ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। শক্তির ধ্যানধারণা উপাসনা এই শক্তি লাভের মুখ্য উপায়।

এখন দেখা যাক্ কৌলরা কি কি "মহদাশ্চর্য্যকারকম্" শক্তি অর্জ্জন করতে ব্রতী হয়েছিলেন।

(১) অনিমাদি গুণ (২) দূরাৎ দর্শন (৩) দূরাৎ শ্রবণ (৪) মৃতকোত্থাপন। (৫) পরকায় প্রবেশন (৬) প্রতিমা-জল্পনা (৭) ঘটপাষাণ স্ফোটন (৮) রূপাদি পরিবর্ত্তন (৯) আকাশ-ভ্রমণ (১০) চণ্ডবেগ (১১) জরামরণ নাশন (১২) যোগিনী-মেলন।

এসব শক্তি লাভ করবার লোভ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; আর এর মধ্যে কতকগুলি শক্তি লাভ করা মানুষের সাধ্যাতীত নয়।

আমরা এ যুগে যাকে বিজ্ঞান বলি তার সাধনার প্রসাদে এর মধ্যে অনেকগুলি শক্তিই আজ মানবের করায়ত্ত, যথা :—

(১) দূরশ্রবণ (Telephone, Radio)

(২) দূরদর্শন (Telescope, tele-vision)

(৩) প্রতিমা জল্পন (Talkie)

(৪) পাষাণ স্ফোটন (Dynamite)

(৫) আকাশভ্রমণ (Aeroplane)

(৬) চণ্ডবেগ (Motor)

(৭) জরানাশন (Monkey-gland)

(৮) মৃতকোত্থাপন (Soviet ডাক্তার করেছেন), তবে আজ পর্য্যন্ত পরকায়-প্রবেশনের কৌশল কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন নি, সম্ভবতঃ কখনও করবেন না। কারণ এ যুগে পরের দেহে প্রবেশ করবার লোভ আমাদের নেই।

তান্ত্রিকদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের প্রভেদ এই যে, উভয়ে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছেন। বৈজ্ঞানিকদের উপায় হচ্ছে যন্ত্র ও তান্ত্রিকদের মন্ত্র। বৈজ্ঞানিক ও তান্ত্রিক উভয়েরই কারবার প্রকৃতি নিয়ে। তান্ত্রিকরা চেয়েছিলেন "পরা-প্রকৃতিকে" বশ করতে আর বৈজ্ঞানিকরা বশ করেছেন অপরা প্রকৃতিকে। এখন তান্ত্রিক সাধনার সংক্ষেপে পরিচয় দেব।

২

এ সাধনার প্রথম পদ হচ্ছে যোগাভ্যাস। যোগ কথাটা আমাদের অভিধানে বহুকাল থেকেই আছে। কিন্তু এ কথাটার অর্থ কি? বহু শাস্ত্রে যোগের নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এক গীতাতেই নানাবিধ যোগের উল্লেখ আছে। এস্থলে আমি কালিদাসের একটি বাক্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। কালিদাস শিবের উদ্দেশে বলেছেন যে

যোগিনো যং বিচিন্বন্তি ক্ষেত্রাভ্যন্তর বর্ত্তিনম্।
অনাবৃত্তি ভয়ং যস্য পদমাহু মনীষিণঃ॥

(কুমারসম্ভব ষষ্ঠসর্গ, ৭৭ শ্লোক)

এই শ্রেণীর যোগীদের বোধ হয় সেকালে রাজযোগী বলত। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রাজগুহ্যযোগের উপদেশ দিয়ে শেষ কথা বলেছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু"

(গীতা নবম অধ্যায়)

পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রেও এ জাতীয় যোগের উল্লেখ আছে। "ঈশ্বর প্রনিধাণাৎ বা"—এ সূত্রের সাক্ষাৎ যোগদর্শনেই পাওয়া যায়।

কোন কোনও ব্যক্তি যে ঈশ্বর প্রণিধান করতে পারেন—এ কথায় আমি বিশ্বাস করি। ইংরেজীতে এঁদেরই বলে mystics, আর mysticism আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কেন সে কথা পরে বলব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করেছেন, "মন্মনা ভব", অপরপক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রে বলে 'উন্মনা ভব"। সম্ভবতঃ কথাটি বৌদ্ধদের কল্পিত। কারণ বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁরা একের স্থানে শূন্য বসিয়েছেন। বর্ত্তমান যুগে যাঁরা ঈশ্বর মানেন না, কিম্বা লজিক যাঁদের মান্‌তে বারণ করে, তাঁরা "মন্মনার" বদলে উন্মনা কথাটা গ্রাহ্য করতে পারেন। উন্মনা হওয়ার অর্থ ঊর্দ্ধ চৈতন্যে আরোহণ করা। মানুষের অন্তরে যে অধঃ চৈতন্য আছে তা আমরা আজকাল সকলেই মানি ; এর থেকে অনুমান করা যায় ঊর্দ্ধচৈতন্য বলেও মনের একটা উপরের ধাপ আছে। আর আমরা যে মনোভাবকে æsthetic ও religious বলি সে সবই এই লোকেরই বস্তু। আর সে সব মনোভাবই ঊর্দ্ধমূল অবাঙশাখ। এই কারণে তন্ত্রশাস্ত্রের উন্মনা কথাটি যেমন চমৎকার তেমনি সত্য। এ যোগের সাধনের উপায় হচ্ছে ধ্যান।

৩

এখন কালিদাসের আর একটি বচন উদ্ধৃত করে দেওয়া যাক্। শিবের বিষয় তিনি বলেছেন যে,—

"অণিমাদি গুণোপেতমস্পৃষ্ট পুরুষান্তরম্।"

এখন শিব ব্যতীত অপর কোনও পুরুষের অর্থাৎ জীবের যে শক্তি নেই, সেই শক্তি অর্জ্জন করাই তান্ত্রিক সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং এই সব অসাধ্য সাধন করবার অন্যতম উপায় হচ্ছে হঠযোগ অভ্যাস।

এই হঠযোগ ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যায়াম। এ ব্যায়াম যুগপৎ শরীরের ও সূক্ষ্ম শরীরের। সূক্ষ্ম শরীর বস্তুটি কি জানিনে। হয়ত তা মনেরই একটা অঙ্গ, অর্থাৎ মন হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীরের একটা বিকার। এ Gymnastics সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নেই, কারণ এ দেহতত্ত্ব আমি জানি নে। কারণ এক্ষেত্রে আমি কোনরূপ মেহনত করিনি।

তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে, কালিদাস যে যোগের কথা উল্লেখ করেছেন—তাতেও সিদ্ধিলাভ করা কতকগুলি ক্রিয়া সাপেক্ষ ছিল। গীতার পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে সে সব প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। আমি এস্থলে গীতার সুধু একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"স্পর্শান কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাং শ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ
প্রাণাপানৌ সমৌ, কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ"

(গীতা ৫ অধ্যায় ২৭ শ্লোক)

এই প্রাণায়াম আর চোখ ভ্রূমধ্যে নিবিষ্ট করাই হচ্ছে হঠ্‌যোগের আদি প্রক্রিয়া। আর এ সব শারীরিক ক্রিয়া যে, যোগ-সাধনের সহায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাণায়াম যে, যোগের মূল প্রক্রিয়া তার প্রমাণ ইড়া ও পিঙ্গলা হচ্ছে প্রাণবায়ুর গমনাগমনের বাম ও দক্ষিণ পথ। ও সুষুম্না হচ্ছে একটি কাল্পনিক মধ্যপথ, যে পথ দিয়ে প্রাণ মস্তিষ্কে আরোহণ করে অর্থাৎ মনে পরিণত হয়। মন যে প্রাণেরই বিকার, একথা ইউরোপের কোনও কোনও বড় দার্শনিকের মুখেও শুনতে পাই। Elanvital নামক কথাটা কি উক্ত মতের বর্ত্তমান সংস্করণ নয়? সে যাই হোক্ বায়ুর্ব্বেদে আমার অধিকার নেই অতএব সে বেদ সম্বন্ধে আর বাচালতা করব না।

অবশ্য হঠযোগ আরও নানারূপ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছে। কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে দেখ্‌তে পাই—

"মাসেন জিতয়েম্‌ত্যুং সত্যং সত্যং মহাতপে।
রসনা তালুমূলেতুকৃত্বা বায়ুং পিবেচ্ছনৈঃ॥

এ সব কথা শুনে আমার মনে খট্‌কা লাগে। যাঁর তা লাগে না তিনি রসনাকে কুঁচিমোড়া ভাঁজিয়ে তালুমূলে নিবিষ্ট করে দেখুন ; এক মাসের মধ্যে অমর হন কি না।

৪

তান্ত্রিকদের সাধনার দ্বিতীয় পন্থ হচ্ছে মন্ত্রজপ। এই কারণে তান্ত্রিক সাধকেরা মন্ত্রী নামেও অভিহিত। মন্ত্রশক্তিতে

বিশ্বাস এ দেশে অবশ্য সনাতন ও সর্ব্ব-সাধারণ। বেদ আমি জানিনে কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র ত জানি। আর শুনতে পাই যে গায়ত্রী হচ্ছে বেদমাতা। আর গায়ত্রী মন্ত্রকে কি কোনও হিন্দু কখনও নির্বির্য্য মনে করেছে? আর এক কথা, যে দার্শনিক দল বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মকে rationalism এর ভিত্তির উপর খাড়া করতে চেয়েছেন সেই মীমাংসকেরা কি দেবতাদেরও মন্ত্রাত্মক বলেন নি? এমন কি তন্ত্রশাস্ত্রেও গায়ত্রী মন্ত্র যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র তা স্বীকৃত হয়েছে। এখন তন্ত্রমতের সঙ্গে বৈদিক মতের প্রভেদ কি? আমার বিশ্বাস মন্ত্রোদ্ধার করা ও মন্ত্রচৈতন্য উদ্রেক করাই হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। মন্ত্রোদ্ধারের অর্থ হচ্ছে মন্ত্রের অর্থ উদ্ধার আর মন্ত্রচৈতন্যের অর্থ হচ্ছে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার জ্ঞানলাভ। কি করে মন্ত্র উদ্ধার করতে হয় আর কি করে মন্ত্র-চৈতন্য জাগ্রত করতে হয় তার বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রেই আছে।

ভাষারও যে একটি শক্তি আছে একথা আমিও মানি, কারণ সকলেই মানতে বাধ্য। আমরা যাকে সাহিত্য বলি, পলিটিকস্ বলি, তার অন্তরে সর্ব্বপ্রধান শক্তি কি কথার শক্তি নয়? কিন্তু সে শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে মনোজগতে। কিন্তু কোন একটি শব্দসমষ্টির অন্তরে electricityর মত যে অদ্ভুত শক্তি আছে, তা আমরা কেউ বিশ্বাস করিনে। মন্ত্র অসিদ্ধ প্রমাণাভাবাৎ। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কৌলমতে মন্ত্রের দ্বারাই সাধিত হয়। মন্ত্রের এইরূপ অলৌকিক শক্তি শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করে না, করে শব্দসমষ্টির উপর। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে কবজ, তাবিজ মাদুলির শক্তিতে কৌলরা বিশ্বাস করতেন। কারণ এইসব তাবিজ, মাদুলির অন্তরে তাঁরা মন্ত্রগর্ভ ভূর্জ্জপত্র পূরে দিতেন। শব্দব্রহ্মের এরূপ পরিণতি অথবা উন্নতি আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর। মন্ত্রবলে কৌলেরা নানারূপ অসাধ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন,—যে চেষ্টা আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে। কথায় জড়জগৎকে বশ করা যায় না, জয় করাও যায় না। প্রকৃতি শুধু অন্ধ নন, বধিরও বটেন।

৫

তান্ত্রিকদের হাতে পড়ে মন্ত্র সব বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ ভাষার শক্তির অপেক্ষা অক্ষরের শক্তি বেশি প্রবল বলে গণ্য হয়েছিল। অর্থাৎ ভাষার molecule এর চাইতে তার atom এর শক্তিই প্রাধান্য লাভ করেছিল।

এই অক্ষরের শক্তিকে আমরা বৈদিক যুগ থেকে বিশ্বাস করে আসছি। আমাদের ধর্ম্মে ওঁ-এর চাইতে বড় ধ্বনি নেই। আর ওটি হচ্ছে আদি-অনাদি-বীজমন্ত্র। কৌল-জ্ঞাননির্ণয়ে অকার থেকে হকার পর্য্যন্ত—বর্ণমালার সকল অক্ষরের মাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে। ওঁ যেমন বৈদিক ধর্ম্মের মূল শব্দ, বোধ হয় "হুম্" হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম্মের তাদৃশ মূলমন্ত্র। আর হুম্‌ও বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। "ওঁ মণিপদ্মে হুম্" এই মন্ত্রের দিব্যাবদানে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর আপনি জানেন দিব্যাবদান কালকের বই নয়। এ দুই ধ্বনি হয়ত প্রাণায়াম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জনৈক বন্ধুর মুখে শুনেছি নিশ্বাস টানতে হলে ওঁ উচ্চারিত হয় আর ফেলতে হলে "হুম্"। এস্থলে একটি কথা বলে রাখি, অক্ষর সব যুগেই সব দেশেই একটি মহা আবিষ্কার হিসেবে গণ্য হয়েছে। সংখ্যার আবিষ্কার চাইতেও অক্ষরের আবিষ্কার কোন হিসেবেই কম আশ্চর্য্যজনক নয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক বলেছেন যে, "The forms of mathematical expressions must be regarded as discoveries of fundamental importance; the alphabet is a symbolic discovery of similar type, whose importance likewise cannot be over-estimated" এই কারণেই তান্ত্রিকরা অক্ষরকে সর্ব্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করতেন।

তান্ত্রিকরা আবিষ্কার করেছিলেন যে ব্যঞ্জনবর্ণ বীজ, স্বরবর্ণ শক্তি ও বিসর্গ কীলক অর্থাৎ গোঁজ। এর অর্থ কি বুঝলেন? তার উপর বিন্দু অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু ত আছেই—আর রেফে নাকি বীজমন্ত্র দীপিত হয়। ফলে বীজমন্ত্রের নমুনা হচ্ছে হ্রীং ক্লিং ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ যাকে হিং টিং ছট্ বলেন তা আসলে হ্রিং ট্রিং ফট্। কারণ রেফদীপিত না হলে, বীজমন্ত্র দীপিত হয় না। আর ফট্ বষট্ যথা স্বাহা প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ বৈদিক। ও সব হোমের ভাষা। এই বীজ মন্ত্রের প্রধান গুণ এই যে এ মন্ত্র অনায়াসে কণ্ঠস্থ

করা যায়। এবং সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এ মন্ত্রে অধিকার আছে। আর পূর্ব্বে বলেছি যে, এ ধর্ম্ম হয়ত অবৈদিক সমাজে প্রচারিত হয়।

এ ছাড়া অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্রে নানারূপ মণ্ডলের বর্ণনা আছে। সে সবের আর উল্লেখ করব না। তাহলে এ পত্র প্রকাণ্ড প্রবন্ধ হয়ে উঠবে। সংক্ষেপে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, পাটীগণিতের প্রথম ন সংখ্যা ও জিয়োমেট্রির ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্ত প্রভৃতির অন্তরে তাঁরা নানা প্রচ্ছন্ন শক্তির আবিষ্কার করেছিলেন, আর তাদেরই সাধনা করতেন। শুধু অক্ষরের অন্তরে নয়, রেখাবদ্ধ খণ্ড আকাশের অন্তরেও তাঁরা জমাট শক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এ একরকম New Physicsএর বৈমাত্র দাদা। তান্ত্রিকরা দেহস্থ শক্তিবিন্দুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, বৈজ্ঞানিকেরা পেয়েছেন বহিস্থ শক্তিবিন্দুর। আমরা এ বিশ্বের বীজ উদ্ধার করলে দেখতে পাই বাইরেও বিন্দু—ভিতরেও তাই, অর্থাৎ শূন্য।

৬

তান্ত্রিকরা alchemyরও চর্চ্চা করতেন। তাঁরা যে রূপোকে সোনাতে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিলেন শুধু তাই নয়। দ্রব্যগুণের সাহায্যে মৃত্যুকেও জয় করতে চেষ্টা করেছিলেন।

মীনভাষিত "অকুলবীর" তন্ত্রে দেখ্‌তে পাই যে নানা শ্রেণীর সিদ্ধ ছিলেন, যথা—"পাতাল-সিদ্ধ" "রসায়ন-সিদ্ধ" ইত্যাদি। পাতাল-সিদ্ধ বল্‌তে কি বোঝায় তা জানিনে। কুলার্ণবের জলে আমি নেমেছি বটে কিন্তু সে হাঁটু পর্য্যন্ত, "ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি দেখি পাতাল কতদূর" এ দৃঢ় সঙ্কল্প করে নয়। তবে আমার বিশ্বাস "রসায়ন-সিদ্ধ" বল্‌তে alchemistই বোঝায়। সিদ্ধ নাগার্জ্জুন ত প্রসিদ্ধ alchemist। তাঁর কীর্ত্তিকলাপের লম্বা বর্ণনা কথাসরিৎ-সাগরে আছে। তিনি নাকি এমন একটি "সিদ্ধ রসায়ন" বানিয়েছিলেন যা খেলে মানুষ অমর হত। ইউরোপের alchemistরাও Elixir of Life বানাতে চেষ্টা কর্‌তে ত্রুটি করেননি। কিন্তু কৃতকার্য্য হননি। নাগার্জ্জুন এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। কিন্তু সে "সিদ্ধরস" তাঁর কোনও কাজে লাগেনি।

বিভীষণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি যে আজও ভূভারতে পর্য্যটন কর্‌ছেন, সে নাগার্জ্জুনের রসামৃত খেয়ে নয়।

বিলেতি alchemistদের প্রধান কারবার ছিল পারা নিয়ে; আমাদেরও দেশের সিদ্ধরাও ঐ না-স্থূল না-তরল ধাতুর অন্তরেই নানা শক্তির সন্ধান করেছিলেন। পারদ দর্শন বলে এ দেশে একটা দর্শনও আছে।

অবশ্য এঁদের সাধনা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। এদেশে এঁদের researchএর ফলে নানারূপ নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। ইউরোপেও ঠিক তাই হয়েছিল। ইউরোপের সর্ব্বাগ্রগণ্য alchemist সম্বন্ধে একজন বড় ডাক্তার লিখেছেন :—

"of Panacelsus (1493—1541) it is enough to say that inspite of the fantastic life he led, the list of discoveries assigned to him in chemistry and general medicine is astonishing. He discredited Galen whose medicines were largely from the plant-world, and introduced the use of metals such as, mercury, calomel, iron, antimony and others. (Science Today. P. 62)

এখন বৈদিক ঔষধ ও তান্ত্রিক ঔষধের প্রধান প্রভেদই এই যে বৈদিক ঔষধের মূল উপকরণ হচ্ছে ওষধি ও তান্ত্রিক ঔষধের ধাতু যথা পারদ, লৌহ ইত্যাদি। আমাদের শাস্ত্রে বলে রোগ প্রশমনের তিনটি উপায় হচ্ছে মণি, মন্ত্র, ওষধি। এস্থলে মণির অর্থ বোধহয় minerals অথবা metals।

৭

হঠযোগ, মন্ত্রজপ, মণ্ডল, অঙ্কন, alchemy অর্থাৎ রসায়ন, এই সকলই হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনার মাল মশলা। আর এ সকল প্রয়াসের মূলে আছে অলৌকিক শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা।

হঠযোগের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মশক্তি উদ্ধার করা। মানুষের দেহাভ্যন্তরে যে অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তি সুপ্ত

আছে, সেই শক্তিকে জাগ্রত করতে পারলেই সাধক যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করবেন, সে বিষয়ে কৌলদের মনে কোন সন্দেহ ছিলনা।

প্রাণায়ামই হচ্ছে যোগের আদি প্রক্রিয়া। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই যে প্রাণকে বশীভূত করা যায়, এই ছিল যোগীদের ধারণা। এই কারণেই ইড়া পিঙ্গলা নামক প্রাণবায়ুর যাতায়াতের পথের এত মাহাত্ম্য। আর সুষুম্না হচ্ছে "মন পবনের" আরোহণের যোগীদের কল্পিত পথ। এই পৃষ্ঠ দণ্ডের সুরঙ্গ দিয়ে যা উপরে ওঠে তাকে মনোপবন বলা হয়েছে। আর মন জিনিষটে আগেই বলেছি যে প্রাণেরই একটি বিশেষ বিকার, এ যুগের ইউরোপীয় দার্শনিকরা তা আবিষ্কার করেছেন। আর প্রাণ যে দেহস্থ তা সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং তান্ত্রিকদের মতে প্রাণকে বশীভূত করতে পারলে মনকেও বশীভূত করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রজপের উদ্দেশ্য মন্ত্রশক্তির দ্বারা নানা-জাতীয় স্ত্রী দেবতা উপদেবতা ও অপদেবতার বশীকরণ। এখন এই সব উপদেবতা ও অপদেবতার নামরূপের আর বর্ণনা করব না। কাকিনী থেকে আরম্ভ করে হাকিনী পর্য্যন্ত সর্ব্ব অক্ষরের আশ্রয়ে তাদের নামকরণ করা হয়েছে। আর, রূপ তাঁদের মনোহারী নয়, ভীতিপ্রদ। ফলে তাঁদেরই ভয়ে মন্ত্রগর্ভ কবচ ধারণ, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বীজমন্ত্রের ন্যাস প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধনের আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপে গণ্য হয়েছিল।

নিরাকার অসীম আকাশকে সাকার সসীম আকাশে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে ত্রিকোণাদি মণ্ডলাদি স্থাপন। তান্ত্রিকরা সব ছিলেন Einsteinএর শিষ্য। তাঁরা absolute spaceয়ে বিশ্বাস করতেন না, করতেন relative spaceয়ে, কারণ রেখাবদ্ধ হলেই শক্তি সংহত হয়। তান্ত্রিকরা একে বলতেন "দিগ্‌বন্ধন"। এবং অগ্রগ (horizontal) এবং উদগ্রগ (perpendicular) রেখার সাহায্যেই তাঁরা নিরাকার আকাশকে সাকার করতেন। এ হচ্ছে আসলে রেখাক্ষরের সাধন। এই সব মণ্ডলকে তান্ত্রিকরা যন্ত্র বলতেন। অর্থাৎ তান্ত্রিকদের যন্ত্র মন্ত্রেরই রেখাক্ষরে রূপান্তর মাত্র। অবশ্য সব রেখারই আদি হচ্ছে বিন্দু, অন্তও তাই। এই কারণেই তন্ত্রশাস্ত্রে বিন্দুর এত প্রাধান্য।

৮

তাঁরা বিশ্বাস করতেন বিশ্বের ধাতু এক। আমাদের মামুলি পঞ্চভূতও নয় বিলেতের ৯২ elementsও নয়। ফলে তাঁরা আপাতঃদৃষ্টিতে বিভিন্ন ধাতুকে এক ধাতুতে পরিণত করাকে বলতেন, রসায়ন সিদ্ধি। অবশ্য তাঁরা রূপোকে সোনা করতে চেয়েছিলেন, সোনাকে রূপো করতে নয়।

ছেলেবেলায় চাকরদের মুখে শুনেছি যে—

"বনমানুষের হাড়ে হাড়ে গুণ
সে চুনকে বানায় চুণ, আর চুণকে বানায় চুন।"

বনমানুষের হাড়ের এই গুণ আছে কিনা জানিনে। কিন্তু শ্বেতমানুষের হাতে এ বিদ্যা আছে তা সকলেই জানেন, তাঁরা alchemical না হোক chemical-gold বানিয়েছেন। বিশ্বে যে ৯২টি আদিভূত আছে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। সম্ভবতঃ hydrogenই হচ্ছে আদিভূত, বাকী কটি তার বিকার মাত্র। মানুষকে হয় সব ধাতুকে এক ধাতুতে পরিণত করতে হবে নয়ত তাদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ইতিমধ্যেই শুনছি ইতালির কোন বৈজ্ঞানিক একটি নূতন ধাতু নির্ম্মাণ করেছেন। ফলে ধাতুর সংখ্যা এখন ৯২ থেকে ৯৩ হয়েছে। ধাতুর ধাৎ বদলানো এখন মানবশক্তির অতীত নয়। এ যুগের বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন যে বিশ্বে substance বলে কোনও পদার্থ নেই। যা আছে সে শুধু অর্থ। যা নেই তাকে আমরা যা খুসী তাই রূপ দিতে পারি।

মুদ্রাও ছিল তান্ত্রিক সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। মুদ্রা হচ্ছে কণ্ঠের নয় করের ভাষা। আর এ ভাষার মূলে আছে করলিপি। এ ভাষায় নর্ত্তক নর্ত্তকীরাও তাঁদের মনোভাব দর্শকদের কাছে প্রকাশ করেন, আর তান্ত্রিকরা তাঁদের মনোভাব দেবদেবীর কাছে প্রকাশ করতেন।

৯

কুলার্ণবের মতে—

"গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষর বুদ্ধিকম।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বানে নরকং ব্রজেৎ।"
(দ্বাদশ উল্লাস ৪২।)

অতএব এ শাস্ত্র আমার জন্যে নয়। আমি সহজ মন নিয়ে তন্ত্রশাস্ত্র পড়েছি আর সহজ ভাবে যা বুঝেছি তাই উপরে বললুম। Magic-য়ে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু সে বিজ্ঞানের, তন্ত্রশাস্ত্রের নয়। যন্ত্রশক্তিতে আমি বিশ্বস্ত কিন্তু তান্ত্রিকদের "যন্ত্র মন্ত্র" শক্তিতে নয়। তন্ত্রশাস্ত্র ধর্ম্ম হ'তে পারে কিন্তু বিজ্ঞান নয়, আর যদি বিজ্ঞান হয়ত আরব্য উপন্যাসের দেশের। তবে এ কথাও সত্য যে পৃথিবীতে এমন কোনও ধর্ম্ম নেই যার অন্তরে তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির অস্তিত্বের সাক্ষাৎ না পাওয়া যায়। নিষ্ক্রিয় কর্ম্মও নেই ধর্ম্মও নেই। আর ক্রিয়া মাত্রই ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগ। আর মানুষের সকল চেষ্টার মূলে আছে তার আত্মশক্তির উদ্বোধন আর প্রয়োগ। তান্ত্রিকরা মন্ত্র পড়ে অবশ্য মানুষকে অতিমানুষ করতে পারেন নি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা যন্ত্র গড়ে মানুষকে অতিমানুষ ক'রে তুলেছেন, না অমানুষ ক'রে ফেলেছেন? আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে বিজ্ঞান মানুষকে অতিমানুষে পরিণত করেছে, ত সে শুধু বাহুবলে, আত্মবলে নয়। সে যাই হোক যে সাধনার বলে মানুষ তার লৌকিক মানবশক্তিকে অতিক্রম করতে চায়, সে প্রচেষ্টাকে আমি সম্পূর্ণ নিষ্ফল মনে করিনে। কারণ এই সাধনাই প্রমাণ যে মানুষ মনে করে যে তার পরিচিত তুচ্ছ মানবতার লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব। আর তান্ত্রিকরা যাকে সাধন বলতেন সে প্রক্রিয়া হচ্ছে experiment। এখন তাঁরা শরীর ও মন নিয়ে যে experiment করেছেন, তা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। উক্তরূপ সাধনার ফলে তাঁরা হয়ত নিজ নিজ দেহ-মনের উপর অসাধারণ প্রভুত্ব লাভ করেছিলেন। কিন্তু মন্ত্র জপ করে যে তাঁরা জড় প্রকৃতির উপর জয়ী হয়েছিলেন, এ কথায় আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে।

তবে এ যুগের কোনও কোনও মহা-বৈজ্ঞানিক যে বিশ্বাস করেন তার প্রমাণ স্বরূপ প্যারিস বিদ্যালয়ের গণিত-শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক Le Royএর কটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন:—

Une Causalité efficace jusqu' au sein du physique আছে। (Le Problème de Dieu par. Le Roy p 311) একটি কথায় অর্থ হচ্ছে prayer (মন্ত্র?) শক্তি জড় উপরও কার্য্যকরী।

উক্ত গণিত শাস্ত্রীর একথা শুনে আমার মন ডিগবাজী খায় না। শাস্ত্রে বলে অঙ্কস্য বামাগতি। আর সম্ভবতঃ অঙ্কশাস্ত্রীদের মতিরও বামা গতি। শুধু ফরাসী কেন, ইংলণ্ডের জনৈক বিজ্ঞানাচার্য্য Jeans বলেছেন যে বিশ্ব তেরিজ বারিজ দিয়ে গড়া—আর ভগবান হচ্ছেন একমেবা-দ্বিতীয়ং অঙ্কশাস্ত্রী। এর থেকে প্রমাণ হয় যে বহির্জগৎ যে আত্মশক্তির অধীন এ বিশ্বাস এ যুগের বিজ্ঞানাচার্য্যরা হারাননি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১১

বেড্-সুইচ টিপে ঘর আলোকিত ক'রে পার্শ্ববর্তী নিদ্রিত স্বামীর গা নাড়া দিয়ে সবিতা ডাক্‌লে, "ওগো, ওগো, শুনছ?"

ধড়মড় ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রকাশ বল্‌লে, "কি?"

অবরুদ্ধ স্বরে সবিতা বল্‌লে, "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? চোর ডাকাত নয়। তুরৎ সিং বল্‌ছে, কে একজন মেয়ে-মানুষ কল্‌কাতা থেকে এসেছে।"

"মেয়েমানুষ? কোথায়?"

"কি আশ্চর্য্য! কোথায় আবার? আমাদের বাড়ি।"

তুরৎ সিং বাইরের বারান্দা থেকে প্রভু এবং প্রভুপত্নীর কথোপকথনের মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেয়ে প্রকাশ জাগ্রত হয়েছে বুঝ্‌তে পেরে কপট কাশির শব্দ ক'রে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করলে।

প্রকাশ ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে, "তুরৎ সিং!"

"হুজুর!"

"কিয়া হায়?"

"হুজুর, এক্‌গো মায়ী লোক কলকত্তে সে আয়ী হৈঁ।"

"কাঁহা হৈঁ?"

"বরন্দে পর খড়ী হৈঁ।"

'কলকত্তে সে আয়ী হৈঁ'—এ তুরৎ সিংএর অনুমানের কথা, কেউ তাকে বলে নি। বহুদর্শিতার ফলে সে জানে যে, রাত চারটায় সময় রেল থেকে কেউ এলে কলিকাতা থেকেই এসে থাকে;—এ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারে অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন।

তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ ক'রে হল ঘর পেরিয়ে এসে উত্তরকোণের অলিন্দ দোর খুলে প্রকাশ দেখ্‌লে সিঁড়ির নিকট বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক, এবং তার নিকটেই নিয়ে গাড়ি-বারান্দায় একজন পুরুষ। কম্পাউণ্ডের প্রান্তে রাজপথে একটা মোটারের অস্তিত্ব এঞ্জিন চলার মৃদু ধক্ ধক্ শব্দে বোঝা যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সবিতাও স্বামীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

প্রকাশ এবং সবিতা আবির্ভূত হ'তেই ইরাসিন্ সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠিক চিন্‌তে পাচ্ছেন? এঁরাই ত?"

তুরৎসিং পূর্ব্বেই বারান্দার বিজলী-বাতি জেলে দিয়েছিল, সুতরাং ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাওয়ার পক্ষে কোনো অসুবিধা ছিল না। মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এখন আসি,—নমস্কার!" ব'লে যুক্তকরে সন্ধ্যাকে নমস্কার করে ইরাসিন্ ত্বরিতপদে অন্তর্হিত হ'ল, এবং পর মুহূর্ত্তে বিকট শব্দ ক'রে রাজপথের মোটারকার দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে।

সবিতা সন্ধ্যার কাছে এগিয়ে এসে বল্‌লে, "আপনি কে, চিন্‌তে পারছিনে ত।"

"চিন্‌তে পারছনা সবি দিদি, পোড়ারমুখীকে চিন্‌তে পারছনা?" ব'লে সন্ধ্যা একেবারে ঝাঁপ দিয়ে সবিতার দেহের উপর প'ড়ে দু হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

তাড়াতাড়ি এক হাতে সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধ'রে অপর হাত দিয়ে তার মুখ আলোয় তুলে ধ'রে দেখে গভীর বিস্ময়ে সবিতা ব'লে উঠ্‌ল, "ওমা, ওমা, সন্ধ্যা যে! তুই কোথা থেকে এলি রে সন্ধ্যা? তুই কোথা থেকে এলি?"

কিন্তু সন্ধ্যার তখন সবিতার প্রশ্নের উত্তর দেবার মত অবস্থা একেবারেই ছিল না,—তার বুক ভেঙে গিয়েছিল গ'লে, চোখ আসছিল বুজে, দেহ আসছিল এলিয়ে।

"ওগো, ওগো, শীগ্‌গির ধর, সন্ধ্যা প'ড়ে যাচ্ছে।" ব'লে সবিতা সন্ধ্যাকে সজোরে চেপে ধরলে।

দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে প্রকাশ দুই বাহুর উপর সন্ধ্যার বিবশ দেহ তুলে নিলে, তারপর ধীরপদক্ষেপে হলঘর অতিক্রম ক'রে শয়ন-কক্ষে পৌঁছে তাদের শয্যার উপর সন্তর্পণে তাকে শুইয়ে দিলে।

সবিতা ভয়ার্ত্তকণ্ঠে. বল্লে, "ওমা, কি হবে গো! শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকতে পাঠাও!"

প্রকাশ বল্লে, "কিছু ভয় নেই, মানসিক উত্তেজনায় এরকম হয়েচে। তুমি শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে এস,—আর তোমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা।"

মুখে চক্ষে কিছুক্ষণ জল হাত বুলিয়ে দিয়ে প্রকাশ স্মেলিং সল্টের শিশিটা নেড়ে নিয়ে ছিপি খুলে সন্ধ্যার নাকের কাছে ধরলে। তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্ধ্যা পাশ ফিরে শুলো।

প্রকাশ বল্লে, "আর ভাবনার কথা কিছু নেই। খানিকটা ঘুম হ'লে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। তুমি পাশে শুয়ে থাক, আমি ততক্ষণ ও-ঘরে গিয়ে একটা সোফা-টোফায় আশ্রয় নিই।"

কিন্তু হল ঘরে গিয়ে সোফার মধ্যে আশ্রয় নিতে ইচ্ছা হ'ল না। পূর্ব্বদিকের আকাশে অন্ধকার তরল হ'য়ে এসেছে, খোলা দোর-জানলার মধ্য দিয়ে ঝির্‌ঝির্ ক'রে যে বায়ু প্রবেশ করছে তার মধ্যে প্রত্যূষের লঘুতা, দূরে কম্পাউণ্ডের সীমানায় একটা কিংশুক গাছের ভিতর পাখীর ঝাপট শোনা যাচ্ছে। অতি-প্রত্যূষের এ কমনীয় শোভা উপভোগ করবার সুযোগ কদাচিৎ ঘ'টে থাকে। ঘটনাচক্রে যদিই বা সে সুযোগ উপস্থিত হ'ল, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে প্রকাশের ইচ্ছা হ'ল না। সিগার কেস, অ্যাশ্-ট্রে এবং দেশলাই নিয়ে সে বাহিরে বারান্দায় গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসল। তারপর কেসের ভিতর থেকে একটা মোটা চুরুট বার ক'রে ভাল ক'রে ধরিয়ে নিয়ে সমস্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

নিদ্রার খানিকটা প্রয়োজন যে একেবারে ছিল না তা নয়, কারণ রাত্রি [illegible] পূর্ণ হ'তে তখনো ঘণ্টা দেড়েক বাকি ছিল। কিন্তু রাত্রি শেষের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিস্ময় মনকে তখনো এমন নাড়া দিচ্ছিল যে, নিদ্রা তাকে পরাজিত করতে পারলে না। বস্তু-অপহৃতা এই মেয়েটি তার গৃহে সহসা এসে উপস্থিত হ'ল কেন, কোথা থেকে সে এখন আসছে, কে তাকে রেখে গেল, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে ত্বরিতবেগে সে কেনই বা প্রস্থান করলে,—ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতর কথাবার্ত্তার শব্দে প্রকাশ বুঝ্‌তে পারলে সন্ধ্যা সুস্থ হয়ে জেগে উঠেছে, কিন্তু সে সেখানে না গিয়ে চুপ করে চেয়ারেই প'ড়ে রইল। মনে মনে ভাবলে, নারীর মনের গভীর দুঃখের এবং লজ্জার কথা একজন নারীরই কাছে প্রথমে ব্যক্ত হয়ে কতকটা সহজ হ'য়ে যায়, সেই ভাল। এ কথাও সে মনে মনে স্থির করলে যে, সন্ধ্যার বিগত দুঃখময় জীবনের বিষয়ে কোনো ঔৎসুক্যই সে তার কাছে কখনো প্রকাশ করবে না,—যে-টুকু সে নিজে বল্‌বে অথবা সবিতার কাছে শুন্‌তে পাবে তাই যথেষ্ট।

মূর্চ্ছিতা সুন্দরী সন্ধ্যার অপূর্ব্ব স্তিমিত শ্রী মনে ক'রে প্রকাশের মন সমবেদনায় সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। নিজের শয্যার উপর সে যখন তাকে শুইয়ে দিয়েছিল তখন তাকে কমলেরই মত সুন্দর মনে হয়েছিল, কিন্তু সে কমলের উপর যেন গন্ধক-ধূমের মলিন পীতাভ অবলেপ।

"তুমি এখানে রয়েছ? আমি ভেবেছিলাম হলঘরে হয়ত ঘুমচ্ছ।"

প্রকাশ চেয়ারে উঠে-ব'সে পিছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে সবিতা আসছে এবং তার পিছনে পিছনে সন্ধ্যা। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে স্নিগ্ধকণ্ঠে সন্ধ্যাকে আহ্বান করলে। "এস, এস সন্ধ্যা!" একটা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে "ব'স এখানে।"

সন্ধ্যা এগিয়ে এসে নত হ'য়ে প্রকাশের পদধূলি গ্রহণ করলে। শশব্যস্তে স'রে গিয়ে প্রকাশ বল্লে, "আহা হা, পায়ে হাত দিয়োনা! আমার পা'টা এমন কিছু বস্তু নয় যে, তার ধূলো কারো মাথায় যেতে পারে। আচ্ছা, তোমরা এক-একটা চেয়ার নিয়ে বোসে পড়।"

সন্ধ্যা এবং সবিতা উপবেশন করলে প্রকাশ নিজের আসন গ্রহণ ক'রে বল্লে, "একটু ঘুমোলে না কেন সন্ধ্যা? শরীরটা সুস্থ হ'য়ে যেত।"

সবিতা বল্লে, "ঘুমোবে কি, কেঁদে কেঁদেই ত' [illegible]

বার করলে। তুমি চ'লে এলে, তার ঠিক পাঁচ মিনিট পরে উঠে বসল, সেই থেকে কান্না! আহা, ওর কষ্টের কথা শুনলে পাষাণও বোধহয় গ'লে যায়। কিন্তু ওকে যে শেষ-পর্য্যন্ত ফিরে পাওয়া গেল, এই আমাদের পরম ভাগ্য বলতে হবে।" ব'লে বিশেষ কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে যুক্ত-কর মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, "সন্ধ্যা যে মুক্তি পেয়েছে সে খবর কলকাতায় সকলে জেনেছেন কি?"

সজোরে মাথা নেড়ে সবিতা বললে, "কেউ জানে না, মুক্তি পেয়ে প্রথম ও তোমার কাছেই ছুটে এসেছে।"

প্রফুল্ল মুখে প্রকাশ বললে, "সে আমার পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করলাম। তোমাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দের বোধনটি যে আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হ'ল, এ সত্যই আমার সৌভাগ্যের কথা সন্ধ্যা! এখন আজকের দিনের উৎসবটি কি ক'রে জাগিয়ে তুলতে হবে তাই হচ্চে চিন্তার বিষয়।"

সবিতা বললে, "উৎসব তুমি কি বলছ? সন্ধ্যা ত' আজই কলকাতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েচে; যদি সম্ভব হয় আজ সকালের গাড়িতেই।"

একটু বিস্ময়ের সুরে প্রকাশ বললে, "আজ সকালের গাড়িতেই? কেন এত তাড়া কিসের? আমি কলকাতায় তার ক'রে খবর দিচ্ছি, তাঁরা এসে সন্ধ্যাকে নিয়ে যান। খবর পেয়ে তাঁরা এসে নিয়ে যান, সেইটেই ঠিক।"

প্রকাশের কথার শেষাংশ শুনে সন্ধ্যার মুখ দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। আমিনা তার মনের মধ্যে যে আশঙ্কার বীজ নিক্ষেপ করেছিল তা থেকে উৎপন্ন কাঁটা মুক্তির আনন্দের মধ্যেও অনুক্ষণ তাকে বিদ্ধ করেছে। কেবলই মনে হয়েচে আমিনা যা বলেছিল তা যদি মিথ্যে না হয়! তা ছাড়া সে নিজেও ত কতকটা সেই হিন্দু সমাজকে চেনে যে-সমাজ শুধু দ্বার রুদ্ধ করতেই জানে, খুলতে জানে না; যে শুধু বলতে পারে 'যাও',—'এস' বলবার শক্তি যার নেই। যে অবস্থা থেকে সে বিচ্যুত হয়েচে সেই অবস্থা ফিরে পাওয়া ছাড়া সন্ধ্যার জীবনের আর কোনো কাম্য কোনো চিন্তাই নেই, তাই অসঙ্কোচে সে আর্ত্তস্বরে প্রকাশকে বললে, "কেন মুখুজ্যে মশাই, আমি নিজে গেলে কি-এমন ক্ষতি হ'তে পারে? আপনি কি মনে করেন তাঁরা আমাকে না নিতেও পারেন?"

সে আশঙ্কা যে প্রকাশের মনে একেবারে ছিল না তা নয়, এমন কি সেই কথারই ইঙ্গিত বোধহয় অজ্ঞাতসারেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল,—কিন্তু সন্ধ্যাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সে একটু প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললে, "না, না, আমি সে সব কিছুই মনে করছিনে সন্ধ্যা। আমার বলার অর্থ, তুমি গিয়ে এখন কোথায় উঠ্‌বে বল?—বাপের বাড়িতে, না শ্বশুরবাড়িতে? শ্বশুরবাড়ি যদি যাও, মেসো-মশাই, মাসিমা হয়ত' একটু ক্ষুণ্ণ হবেন; বাপের বাড়ি যদি যাও তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী হয়ত অপমানিত বোধ করবেন। তার চেয়ে খবরটা দিয়ে গেলে তোমার আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। তাঁরা সেখান থেকে একটা যা হয় স্থির ক'রে এখানে এসে তোমাকে নিয়ে যান সেই ত ভাল?"

"কিন্তু তাঁরা যদি এখানে না আসেন?"

প্রকাশ বললে, "তা হলে অবশ্য তোমাকেই যেতে হবে। পাহাড় যদি মহম্মদের কাছে না আসে ত' মহম্মদ পাহাড়ের কাছে যাবে—এ আপ্ত বাক্য।"

অনুনয়ের করুণকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "সেই যদি যেতেই হয় মুখুজ্যে মশাই, তা হ'লে আগেই যাইনে কেন?"

প্রকাশ স্মিতমুখে বললে, "যুক্তি চালাবার তোমার ক্ষমতা আছে সন্ধ্যা, কিন্তু আমার যুক্তিটাও নেহাৎ বাজে ব'লে মনে হচ্চে না।"

"কিন্তু আমি যে আর স্থির থাকতে পাচ্ছিনে!"

সবিতা বললে, "আহা, সত্যি, ওর কষ্ট আর দেখ্‌তে পারা যায় না! তুমি আজকেই ওকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা কর। ব্যবস্থা আর কি করবে, নিজে গিয়ে রেখে এস।"

প্রকাশ বললে "তথাস্তু। আজই তোমার যাওয়া স্থির। দুপুরের গাড়িতে সম্ভব হবে না, কারণ অফিসে কতকগুলো জরুরী কাজ সারতে হবে। রাত দুটোর বম্বে মেলে রওনা হ'য়ে কাল সকালে কলকাতায় পৌঁছোনো। কেমন? খুসী তো?"

সন্ধ্যার মুখে মৃদুহাস্যের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌ল; মাথা নেড়ে বললে, "আচ্ছা।"

"বেশ কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এখনি দু' জায়গায় দুটো জবাবি তার ক'রে দিচ্ছি; তার ফলে যদি এই উত্তর আসে যে, বৈকালে বম্বে মেলে রওনা হ'য়ে তাঁরা রাত্রি দশটার সময়ে এখানে এসে পৌঁছবেন, তা হ'লে অন্ততঃ পাঁচ দিন এখানে তুমি বন্দী থাকবে। অবশ্য, সে কারাগার সুখের আগারই হবে।"

সন্ধ্যার মুখে পুনরায় একটা ক্ষীণ হাসির আভা দেখা দিলে। সবিতা বল্‌লে, "তা প্রিয়লালই যদি ওকে নিতে আসে তা হ'লে কি সহজে ওদের ছাড়ব? সম্পর্ক ত' আর একটা নয়,—দুটো!" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "ওরে সন্ধ্যা, তোর শ্বশুর দূর-সম্পর্কে আমার মামাশ্বশুর হ'ন তা জানিস্?"

সন্ধ্যা বল্‌লে "না।"

"তোর শ্বশুর আমার শাশুড়ীর দূর সম্পর্কের পিসতুত ভাই। অনেক দূর হ'য়ে গেল বটে, কিন্তু তবু সম্পর্ক তো?" তারপর হঠাৎ প্রকাশের দিকে চেয়ে সবিতা ব'লে উঠ্‌ল, "ও মা, তুমি সন্ধ্যার সঙ্গে কথা কচ্ছ কি ক'রে! সন্ধ্যা যে তোমার ভাদ্র-বউ হোল।" বলে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

প্রকাশ হাসিমুখে বল্‌লে, "ক্ষেপেচো? শালী কখনো ভাদ্র আশ্বিন হয় না,—চিরকালই ফাগুন। সোনা কখনো তামা হয় না, তা যতই তাকে পয়সার হিসেবে গুণ্‌তে চেষ্টা কর না কেন। কি বল সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা কোনো কথা না ব'লে মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল।

সবিতা চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বল্‌লে, "সোনা কখনো তামা হয় কি-না সে হিসেব পরে করা যাবে, এখন চল্ সন্ধ্যা, খানিকটা শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাক্। তোর যাবার ব্যবস্থা ত' সব ঠিক হয়ে গেল।"

প্রকাশ বল্‌লে, "সেই ভালো, আমিও ততক্ষণ দুটো তার লিখে ফেলে পাঠিয়ে দিই। শুভ সংবাদটা যত শীঘ্র দেওয়া যায় ততই ভাল। তারপর সাড়টার সময়ে সকলে মিলে ভাল ক'রে চা খাওয়া যাবে,—তোমরা তার মধ্যে তৈরী হ'য়ে নিয়ো।"

সন্ধ্যা ও সবিতা চ'লে যাচ্ছিল, প্রকাশ ডেকে বল্‌লে, "সন্ধ্যা, তোমার শ্বশুর বাড়ির নম্বরটা মনে আছে? রাস্তা আমি জানি, কিন্তু নম্বরটা ঠিক মনে নেই।"

সন্ধ্যা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "এগারো নম্বর।"

"দেখ, সুস্থ সবল চিত্তে আমি নম্বরটা ভুলে গেছি, কিন্তু তুমি এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও ঠিক মনে রেখেছ। সাধে কি আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের পতিগত প্রাণ ব'লে থাকে!" ব'লে প্রকাশ হাস্‌তে লাগ্‌ল।

সবিতা বল্‌লে, "তবুও ত তোমরা কথায় কথায় আমাদের সীতা-সাবিত্রী ব'লে ঠাট্টা করতে ছাড় না!"

সহাস্যমুখে প্রকাশ বল্‌লে, "সেটা-কি জানো?—কবির ভাষায় যাকে বলে 'তরল সুরে ঠাট্টা ক'রে শুনিয়ে দিতে চাই, আসল কথাটাই'—আমাদের ঠাট্টাও তাই!"

প্রকাশের কথা শুনে সবিতা ও সন্ধ্যা হাস্‌তে হাস্‌তে প্রস্থান করল।

আর একটা চুরুট ধরিয়ে খানিকটা পুড়িয়ে বাকিটা অ্যাশ-ট্রের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে প্রকাশ উঠে পড়ল। অফিস-রুমে গিয়ে সন্ধ্যার পিতাকে এবং শ্বশুরকে দুটো টেলিগ্রাম লিখে ফেললে। দুটোরই এক মর্ম্ম, এক শব্দ,—'শুভ সংবাদ। সন্ধ্যা আজ হঠাৎ টাটানগরে উপস্থিত হয়েচে। সে আপনাদের কাছে যাবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত। আমি নিয়ে যাব, অথবা আপনারা নিতে আসবেন, সে কথা তার ক'রে জানাবেন'। তারপর বেল্ বাজিয়ে একজন বেয়ারাকে ডেকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে টেলিগ্রাম দুটো ডাকঘরে পাঠিয়ে দিলে।

বেলা তখন প্রায় দশটা, প্রকাশ অফিস যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় সন্ধ্যার পিতার তারের জবাব এল,—'শুভ সংবাদে সকলেই সুখী। সন্ধ্যার শ্বশুরকে যদি সংবাদ না দিয়ে থাক ত' অবিলম্বে দেবে। তাঁর ঠিকানা ১১ নং মনোহরপুকুর রোড। চিঠি যাচ্ছে'।

নিকটে সবিতা এবং সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে ছিল, প্রকাশের পড়া হয়ে গেলে তারা তার হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে একে একে প'ড়ে দেখে ফিরিয়ে দিলে। সন্ধ্যাকে নিতে আসার অথবা আনিয়ে নেওয়ার বিষয়ে টেলিগ্রামে একটি কথা নেই,—সে বিষয়ে প্রকাশের যে প্রশ্ন ছিল সে সম্বন্ধে

একেবারেই নীরব। আর যা নেই, তা শুভ সংবাদের পরিমাণের হিসাবে আনন্দ প্রকাশের সঙ্গলতা। নেহাৎ যে আনন্দটুকু প্রকাশ না করলে সাধারণ সজ্জনতার ব্যতিক্রম ঘটে, শুধু সেইটুকু। সন্ধ্যার প্রতি নিমেষের জন্য দৃষ্টিপাত ক'রে সবিতা লক্ষ্য করলে নৈরাশ্যের আঘাতে তার মুখ কঠোর হয়ে উঠেচে। যতটা সম্ভব তাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সে বললে, "যতই হোক, মেয়ের বাপ তো, সব দিক বিবেচনা ক'রে না চললে চলে না। পাছে কোনো কথা ওঠে সেই জন্যে নিজের তরফ থেকে কোনো-কিছু না ক'রে শ্বশুরকে খবর দিতে বলেছেন।"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমাকে কলকতা যাবার জন্যে অনুমতি দিলেও কি কোনো কথা উঠ্‌ত সবিদি? মুখুয্যে মশাই ত' লিখেছিলেন যে তিনি পৌঁছে দিতে পারেন।"

এ কথার উত্তর দিলে প্রকাশ; বললে, "বাঙালী মেয়ের বাপ সন্ধ্যা, ভয়ে আধমরা হ'য়েই থাকে। তোমাকে দেখবার জন্যে ছুটে আসবার সাহস যাঁর হয় নি, তিনি তোমাকে যাবার জন্যে কেমন ক'রে লেখেন বল? সে যে আরো বেশি দায়িত্বের কথা হোতো।"

দৃঢ়স্বরে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু দায়িত্ব কেন, তা আমি একটুও বুঝ্‌তে পারছিনে মুখুজ্জেমশাই! কিসের দায়িত্ব?"

সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে প্রকাশ দেখ্‌লে তার দুই চোখের মধ্যে অগ্নিকণা প্রজ্জলিত হয়েচে। সে ভয় পেয়ে গেল; শান্ত স্বরে বললে, "এ সব আলোচনা এখন বন্ধ থাক সন্ধ্যা। হয় ত' এ সমস্ত কথাই নিরর্থক হচ্চে। আর একটু পরে তোমার শ্বশুরের তার এলে তখন হয় ত' এ সব কথা আলোচনা করবার কোনো প্রয়োজনই হবে না। এখন তোমরা যাও, খেয়ে নাও গে।"

সন্ধ্যার শ্বশুরের কাছ থেকে যখন টেলিগ্রাম এল তখন বেলা দুটো। একটা শীট্-মিল-এ প্রকাশ ব'সে মিলের একটা বেমেরামৎ অংশ পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে তার একজন আরদালী গিয়ে তাকে তারখানা দিলে। খাম খুলে তাড়াতাড়ি তারখানার উপর একবার চোখ বুলিয়ে প্রকাশের মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ল। এক মুহূর্ত কি ভাবলে, তারপর টেলিগ্রামটা ভাঁজ ক'রে খামের মধ্যে পুরে জামার বুক পকেটে রাখ্‌লে। খানিকটা কাজ করার পর দেখ্‌লে একটা সম্ভাবিত দুরূহ সমস্যার চিন্তায় কাজে মন বসছে না। বিরক্ত হয়ে সেদিনের মতো সেইখানে শেষ ক'রে নিজের অফিসঘরে চ'লে গেল।

বেলা তখন সাড়ে তিনটে। প্রশস্ত বারান্দার এক প্রান্তে একটা মারব্‌ল্ পাথরের গোল টেবিল ঘিরে আট দশখানা চেয়ার ছিল, তারই দুখানা অধিকার ক'রে সবিতা ও সন্ধ্যা গল্প করছিল। সন্ধ্যার চক্ষু রক্তাভ,—বোধ হয় একটু পূর্ব্বেই কেঁদেছিল, তারই চিহ্ন।

সবিতা বললে, "ও-সব চিন্তা তুই ছেড়ে দে সন্ধ্যা। কোথাকার কে এক আমিনা তোর মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়েছে দেখেচি।"

ম্লান হাসি হেসে সন্ধ্যা বললে, "শুধু আমিনার কথা কেন বলছ সবিদি, তুমি নিজেই কি হিন্দু সমাজের কথা জানো না? গল্পে উপন্যাসে পড়োনি? খবরের কাগজে দেখোনি?"

"গল্প উপন্যাসের কথা এখন ছাড়্‌, উপন্যাসে সব-কথা একটু বাড়িয়ে না বললে লোকের ভালো লাগবে কেন? এখন লোকের মতি গতি অনেক বদ্‌লে গেছে।"

সন্ধ্যা বললে, "মতি বদ্‌লে থাকতে পারে, কিন্তু গতি বদলায়নি। আর তাও যদি বদ্‌লে থাকে ত' সে সাধারণ ভদ্রলোকদের মধ্যে, বনেদী বংশে নয়। আমার শ্বশুররা যে বনেদী বংশ!"

"আচ্ছা, দেখ্‌না তোর শ্বশুরের কাছ থেকে কি জবাব আসে, তারপর যা বলতে হয় বলিস্। আগে থেকেই খাঁড়া উচিয়ে রাখ্‌চিস কেন?"

"খাঁড়া উচিয়ে আর আমি কি রাখ্‌ব সবিদি। কিন্তু আমার কি মনে হচ্চে জানো? বাবার কাছ থেকে তবু যা হোক একটা উত্তর এসেচে, শ্বশুরের কাছ থেকে কোনো উত্তরই আসবে না। বেলা চারটে বাজ্‌তে চল্‌ল এখনো জবাবি এক্সপ্রেস্ টেলিগ্রামের উত্তর এলনা,—এ তুমি বুঝতে পারছ না?"

"হয়ত অফিসে এসেছে।"

"তা যদি এসে থাকে ত' খারাপ খবরই এসেছে, ভালো হ'লে মুখুজ্জে মশাই তখনি পাঠিয়ে দিতেন।"

দূরে একটা মোটরকারের হর্ণ শুনে সবিতা বললে, "ঐ উনি আসছেন। সকাল সকাল যখন ফিরছেন তখন নিশ্চয়ই ভাল খবর নিয়ে টেলিগ্রাম এসেছে।"

কিন্তু গাড়িবারান্দায় যখন মোটর এসে দাঁড়াল তখন ভিতরে প্রকাশের উৎসাহহীন মুখ দেখে শুভসংবাদের ভরসা আর বড় কিছু রইল না।

প্রকাশ গাড়ি থেকে নেমে এলে সবিতা জিজ্ঞাসা করলে "টেলিগ্রাম এসেছে ?"

"এসেছে।"

"কি খবর ?—ভালো ?"

"ঐ একই রকম।" মুখখানা একটু কুঞ্চিত বোধহয় অজ্ঞাতসারেই হ'য়ে গেল। সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়েছিল, আস্তে আস্তে চেয়ারে ব'সে পড়ল।

সবিতা হাত বাড়িয়ে বললে, "কই দেখি ?"

পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বার ক'রে প্রকাশ সবিতার হাতে দিলে। সবিতা প'ড়ে সন্ধ্যার সামনে টেবিলের উপর রেখে দিলে। স্পর্শ না ক'রেই সন্ধ্যা টেলিগ্রামটা ধীরে ধীরে প'ড়ে নিলে।

টেলিগ্রামের মর্ম এইরূপ,—'শুভসংবাদের জন্য ধন্যবাদ। বৌমা উপস্থিত এখন কিছুদিন তাঁর বাপের কাছে থাকেন সেইটেই বাঞ্ছনীয়। তাঁকে যদি এখনো খবর না দেওয়া হ'য়ে থাকে ত অবিলম্বে যেন হয়। চিঠি যাচ্ছে।'

টেলিগ্রামের মধ্যে যে কঠোর কথা মৌন হয়ে বর্ত্তমান রয়েছে তার আঘাতে তিনটি প্রাণী ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। কেউ তা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে সাহস করলে না। এ যেন ঠিক বিদ্যুৎপূর্ণ তামার তার, চোখে দেখতে নিরাপদ, কিন্তু স্পর্শ করলেই ভিতরে তার মৃত্যুদায়ী প্রবাহ।

মৌনভঙ্গ করলে প্রকাশ; বললে, "আমি ত অফিসের কাজ গুছিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি। কিন্তু তুমি কি আজ রাত্রে কলকাতা যেতে চাও সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল; মৃদুস্বরে বললে, "না।"

প্রকাশ বললে, "সেই কথাই ভালো। কাল দুজনেরই চিঠি আসবে, সেই দেখে যেমন ভাল হয় ব্যবস্থা করলেই হবে।"

"কিন্তু চিঠিতেও যদি আমাকে নিয়ে তাঁরা এমনি ছেঁড়াছুঁড়ি করেন, তখন আমি কোথায় যাব মুখুজ্জে মশাই!" ব'লে দুই বাহুর মধ্যে মুখ গুঁজে সন্ধ্যা নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

সন্ধ্যার পিঠের উপর দক্ষিণ বাহু রেখে সমবেদনার করুণকণ্ঠে সবিতা বললে, "তাই যদিই হয় তা হ'লে কোথায় আবার যাবি ভাই ? আমাদের কাছেই থাকবি। যতদিন দরকার, যতদিন ইচ্ছে। আমাদের ত' আর ছেলেপিলে নেই যে, সমাজের ভয় করতে হবে!"

প্রকাশ বললে, "আমার আবার বোনও নেই সন্ধ্যা, সুতরাং আমি মনে করব এতদিনে আমি একটি বোন লাভ করলাম। কিন্তু এ সব বাজে কথার কোনো দরকার নেই, কাল চিঠি এলে দেখবে আজ তুমি যা ভয় করছ তার কোনো কারণই ছিল না।"

কিন্তু পরদিন যখন চিঠি এল তখন দেখা গেল, কারণ যথেষ্টই ছিল। দুটি চিঠিই দুখানি টেলিগ্রামের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত সংস্করণ মাত্র,—বাহুল্যবর্জ্জিত, উচ্ছ্বাসবিহীন, যুক্তির সারবত্তায় সুনিবিড়। উভয় চিঠিরই প্রতিপাদ্য, সন্ধ্যা এখন কিছুদিন অপর পক্ষের কাছে থাকে সেইটেই বাঞ্ছনীয়। আনন্দ অথবা সমবেদনার বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র নেই, পাছে তদ্দ্বারা বিবেচনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। উভয়পক্ষের সহিত উভয়পক্ষের দেখাশুনার পর চিঠি লেখা, তার ইঙ্গিত চিঠির মধ্যে বর্ত্তমান।

চিঠি পড়ার পর মিনিটখানেক চুপ ক'রে ব'সে থেকে সন্ধ্যা উঠে ধীরে ধীরে তার ঘরের দিকে চ'লে গেল। কাল টেলিগ্রাম এলে সে কেঁদে আকুল হয়েছিল, আজ তাকে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও দেখা গেল না।

ভয়ার্ত্তকণ্ঠে সবিতা বললে, "কি হবে গো! শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটা ভেসে যাবে নাকি ?"

প্রকাশ বললে, "বাঙলা দেশ ত! ভেসেও যেতে পারে, ডুবেও যেতে পারে,—কিছুই আশ্চর্য্য নয়!"

"তারপর ?"

"তারপর যা' তাকেই বলে অদৃষ্ট,—এখন কেমন ক'রে বলব বল ?"

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সুন্দরের সীমানা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

এই কদিন হ'ল "আর্য্য পাবলিশিং হাউস" সুন্দরের সীমানা নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ ক'রেছেন। এ পুস্তিকা হচ্ছে আসলে পত্রাবলী। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত পরস্পরকে আর্ট সম্বন্ধে যে চিঠি লিখেছেন সেই চিঠি কখানি একত্র করে, পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হ'য়েছে।

উক্ত পুস্তিকার প্রকাশক এঁদের মতামত সম্বন্ধে আমাকে দু'কথা বলতে অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধ আমি ভয়ে ভয়ে রক্ষা করছি। কারণ, "সুন্দরের সীমানা"র আলোচনা করার অর্থ হচ্ছে আর্ট সম্বন্ধে তর্কে যোগ দেওয়া।

এ তর্কে যোগ দিতে যে আমার সাহস হয়না—তার কারণ Plato, Aristotle থেকে সুরু ক'রে Aldous Huxley ও T. S. Elliott প্রভৃতি এ যুগের বিলেতি কবি ঔপন্যাসিকরা আর্ট সম্বন্ধে তাঁদের কাঁচা পাকা মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং করছেন। অর্থাৎ এ তর্কের কোন সীমানা নেই অন্ততঃ কালের হিসেবে। আর বর্ত্তমানে যে কেউ নূতন কথা বলছেন, তাও ত মনে হয় না।

Croce এ যুগের একজন বিখ্যাত দার্শনিক। আর তাঁর খ্যাতি তাঁর Æsthetics এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এখন যদি কেউ তাঁর উক্ত গ্রন্থ পড়েন ত দেখ্‌তে পাবেন যে আজ আড়াই হাজার বৎসর ধরে ইউরোপে সুন্দর সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত উক্ত গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে আর Croce সে সব মতকে তাঁর দর্শনের কষ্টি পাথরে পরখ করে দেখেছেন ও দেখিয়ে দিয়েছেন যে তার একটীও খাঁটি সোনা নয়। আর মজা হচ্ছে এই যে, আমরা যাকে নব্য মত বলি, তার অধিকাংশই অতি প্রাচীন মত। Poor humanity! মানুষে যত নতুন কথাই বলুক তা সব প্রায়ই পুরানো কথার পুনরুক্তি মাত্র। অন্ততঃ ধর্ম্ম ও আর্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে।

তর্কটা উঠেছে পণ্ডিচেরীর আশ্রমে বন্ধু সমাজে। "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" এই কথাটা নিয়ে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র উক্ত মতের পক্ষে ওকালতি করেছেন—শ্রীমান্ দিলীপ তার বিপক্ষে বাহাস্ করেছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বলেছেন আর্টের মূল পাওয়া যাবে ধর্ম্মে। শ্রীঅরবিন্দ এ উভয় পক্ষের সমন্বয় করেছেন।

আমি প্রথমেই বলে রাখি যে আমি "আর্ট ফর আর্টস সেক" মতটি গ্রাহ্য করি। কেন না তা প্রত্যাখ্যান করবার কোনও কারণ নেই।

ধরুন যদি উক্ত বাক্যে Art এর বদলে Science বসিয়া দেওয়া যায় তাহলে কি কোনও বৈজ্ঞানিক চমকে উঠবেন। বৈজ্ঞানিকরা সত্যের যে রূপ দেখ্‌তে চান, সত্যের সেই রূপের সাক্ষাৎ লাভ করাই বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক সত্যকে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে কাজে ভাঙিয়ে নেওয়া যায়, তাই বলে সাংসারিক লাভ লোকসানের হিসাব বৈজ্ঞানিককে উদ্‌ভ্রান্ত করে না।

তার পর উক্ত বাক্যে যদি আর্টের বদলে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করা যায় তাহলেও আমরা চম্‌কে উঠবো না। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা যে কর্ম্ম জিজ্ঞাসা নয় তা আমরা সকলেই জানি। এখন "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" বলায় আর্টের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না, বলা হয় শুধু আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্ট। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্যের মত, ধর্ম্মের মত, আর্ট একটি স্বতন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠিত সত্তা। আর এ সত্যের প্রতি পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে আর্ট সকল প্রকার সাংসারিক ফল নিরপেক্ষ। উক্ত বাক্যকে আর্টের negative definition বলা যেতে পারে। অর্থাৎ নেতি নেতি বলে আর্টকে

বুঝিয়ে দেওয়া। আর্ট ফর আর্ট বলতে আমি বুঝি যে আর্ট utilityর কোঠাতেও পড়ে না moralityর কোঠাতেও নয়। এর থেকে অবশ্য কেউ যেন মনে না করেন যে utility এবং moralityর কোন মূল্য নেই।

সুরেশচন্দ্র আরও বলেছেন যে আর্ট হচ্ছে non-moral। একথাতেও আপত্তি করবার কোন কারণ নেই। যদি কেউ বলেন যে Science non-moral তাহলে কোনও বৈজ্ঞানিক ক্ষিপ্ত হবেন না। গত শতাব্দীর atom এ শতাব্দীতে electron হয়ে গেছে। আর এ বিষয়ে অনেক তর্কও আছে। কিন্তু atom moral এবং electron immoral এমন কথা কেউ বলেন নি। যদিচ atom ছিল অতিশয় শান্ত শিষ্ট অর্থাৎ জড় পদার্থ আর electron হচ্ছে চঞ্চল, স্বেচ্ছাচারী ও অব্যবস্থিতচিত্ত। অবশ্য electronএর এ হেন চরিত্রের পরিচয় পেয়ে কেউ কেউ চটে যেতে পারেন, যেমন গিয়াছেন Bertrand Russell, কেন না, electron তাঁর determinism নামক moral doctrineএর তলা কাঁপিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আর্ট non-moral বলে, যে তার moralityর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এ কথাও সত্য নয়। রামায়ণ ঘোর moral কাব্য এবং সেই সঙ্গে মহাকাব্য। অপরপক্ষে Guy de Maupassantর গল্প moral নয় অথচ Maupassant মহা আর্টিষ্ট। বাল্মীকি ও মোপাসাঁ। এ উভয়কেই আমরা কেন আর্টিষ্ট বলি, সেইটি ধরতে পারলেই আমরা আর্টের ধর্মের সন্ধান পাব।

শ্রীমান দিলীপের বক্তব্য যদি আমি বুঝে থাকি তাহলে আমার ধারণা তিনি দেখিয়েছেন, যে আর্টের form ছাড়াও content বলেও একটা জিনিষ আছে। অবশ্য আছে; শূন্যের কোনও form নেই। formএর অস্তিত্ব উপাদান নিরপেক্ষ নয়। এই form ও contentএর কথাটা অতি সেকেলে তর্ক। এ তর্কের সহজ মীমাংসা এই যে form এবং content উভয়ে মিলে আর্ট হয়। অতএব আর্টে এ দুইকে পৃথক করা যায় না। আর তা ছাড়া উপাদানই form গড়ে তুলেছে, অথবা formই উপাদান গড়ে তুলেছে তাও বলা কঠিন। আর morality প্রভৃতি সবই আর্টের উপাদান হতে পারে কিন্তু আর্ট নয়। কেননা আর্টের স্পর্শে তাদের চরিত্র বদলে যায়। শ্রীঅরবিন্দ তার ইংরাজী পত্রে এ তর্কের যে সমাধান করেছেন, আমার মনে হয় যে সেইটিই সঙ্গত।

সুরেশচন্দ্রের পত্র পড়ে যদি কারও মনে হয় যে তিনি techniqueকেই আর্ট বলেছেন, তাহলে তিনি শ্রীযুক্ত সুরেশের কথা ভুল বুঝেছেন। Technique অবশ্য, ছবিতেও চাই গানেতেও চাই লেখাতেও চাই। এর কারণ অনাত্ম বস্তুর inertia অতিক্রম করবার কৌশলের নামই technique। এবং যে technique অতিক্রম করতে না পারে সে artist নয় artisan মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে There is not only physical beautyর of the world—there is moral, intellectual, spiritual beauty also। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। যাকেই মানুষে বড় মনে করে, তার অন্তরে সে হয় সত্য নয় সুন্দরের সাক্ষাৎ পায়।

এই সব beautyর যিনি সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং উপযুক্ত formএর সাহায্যে তা আমাদের মনোগোচর করতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ আর্টিষ্ট যথা কালিদাস প্রভৃতি।

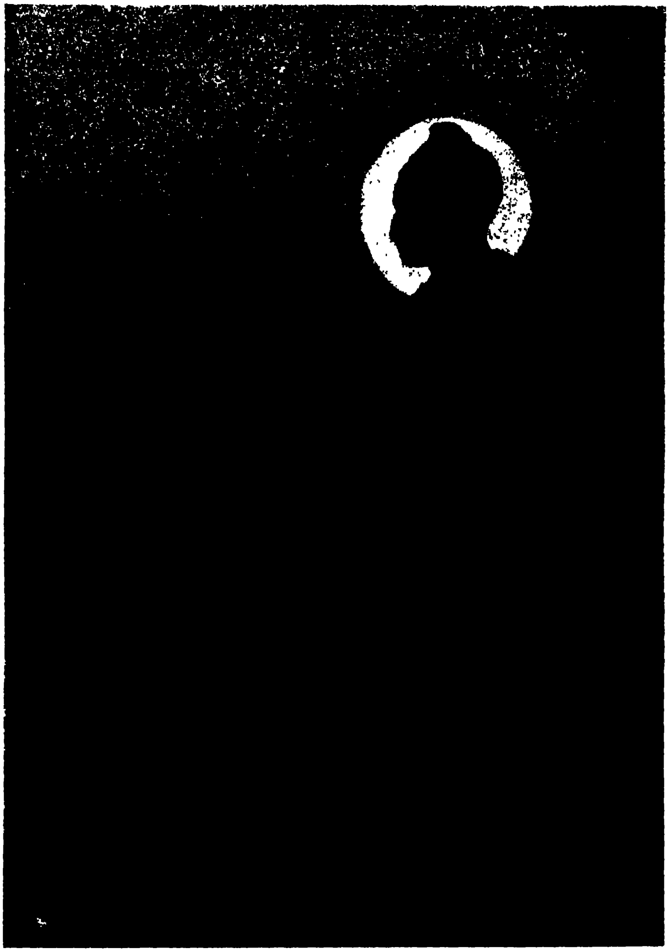
তর্কের অবশ্য পূর্ব্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষ আছে—কিন্তু আর্টের সদর মফঃস্বল বলে দুটি পিঠ নেই। তর্কের উভয় পক্ষকে যা reconcile করে তাই আর্ট—কারণ যথার্থ আর্ট সকল তর্ককে অতিক্রম করে। যে তর্কের কোনও মানে বোঝা আছে তা logicএর উপর প্রতিষ্ঠিত। logicএর আমি মহাভক্ত, কেননা আমাদের বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে logic নিয়মিত করে। কিন্তু সুন্দরের সীমানা লজিকের সীমানায় অন্তর্ভূত নয়।

উপরে যা বললুম তা অবশ্য খুব স্পষ্ট হল না। তার কারণ আর্ট ও ধর্ম সম্বন্ধে কোন ভাষাতেই কোনও স্পষ্ট কথা নেই। কেননা ভাষার কারবার আসলে চেনা কথা নিয়ে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শিল্প ও সমাজ

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়



বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরাণে পাঠ করিয়াছি স্বর্গে দেবাসুরের সংগ্রাম হইত—অমৃত লইয়া, ত্রিলোকের অধিশ্বরত্ব লইয়া, অমরতা লইয়া। এইরূপ একটি সংগ্রামে একবার অসুরেরা দেবগুরু, ব্রাহ্মণ, বিদ্বান, বৃহস্পতির মন্ত্রণা-বশে ও সেনাপতি সহস্রাক্ষের শৌর্য্যে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া সমুদ্রগর্ভে ও পর্ব্বতকন্দরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। পরাজয়ের গ্লানি ও শ্রান্তি কিঞ্চিৎ উপশমিত হইলে অসুরদিগের গুরু ভৃগু-পুত্র, ব্রাহ্মণ-সন্তান শুক্রাচার্য্য* নিভৃত পর্ব্বতকন্দরে অসুরদিগের

* শুক্রাচার্য্য কবি ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম কবিতা বা কাব্যমাতা। পুরাণকার তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ ভৃগুর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কারণ, হেতু বা শক্তি বলিতেছেন। এবং শুক্রের বিশেষণ স্বরূপ নিম্নলিখিত শব্দগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন; যথা,—কবি, স্রষ্টা, শ্রেষ্ঠা, বৈদ্য, বজ্রধর।



পঞ্চপাণ্ডবের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা

শ্রীনন্দলাল বসু

এক গুপ্তসভায় এইরূপ বলিতে লাগিলেন, বৎসগণ,—দেবতাগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার যে কারণ ধ্যান বলে আমি জ্ঞাত হইয়াছি, তাহা কহিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। দেহের যেরূপ মস্তিষ্কই চালক এবং মস্তিষ্কের বিকৃতির সহিত দেহ বিকৃত হয়, সেইরূপ সমাজের গুরু বা নেতাই সমাজ দেহের শ্রীবৃদ্ধি বা শক্তিহীনতার কারণ। মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি হয় ঋষ্‌ হইতে এবং ঋষিগণই জীবধর্ম্মের গুরু বলিয়া খ্যাত। আমি স্বয়ং ঋষি ও জীবধর্ম্মী অসুরগণের গুরু হইয়াও দৈবদুর্ব্বিপাকে ক্ষীণদৃষ্টি ও হীনবীর্য্য হইয়াছি এবং আমারই দৃষ্টিহীনতা ও হীনবীর্য্যতা নিবন্ধন তোমরা আজ পরাজিত ও হতশ্রী হইয়াছ। বিগত শৌর্য্যের জন্য অনুতাপে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া আমি যাহা আদেশ করিতেছি তাহা পালন করিলে তোমরা আগামী যুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হইবে। বুধগণ এইরূপ কহিয়াছেন যে, আপনাদের দুর্ব্বল



গরুড়
শ্রীনন্দলাল বসু

মুহূর্ত্তে কদাচ নগণ্য শত্রুর বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিবে না। অতএব বৎসগণ সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে সাময়িক ভাবে দেবতাদিগের সহিত কপট সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে এবং তোমরা যে অস্ত্রত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রতধারী ও নিরামিষাশী হইয়াছ তাহাই জানাইতে হইবে। ইতিমধ্যে আমি একশত বৎসরের জন্য সুন্দরের উপাসনা করিব এবং তপস্যান্তে তাঁহারই বরপ্রসাদাৎ পুনরায় দৃষ্টিলাভে সক্ষম হইব। পিতামহ ব্রহ্মা এই সত্যদৃষ্টিকেই মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা আখ্যা দিয়াছেন। আমি একশত বৎসর গত হইলে সুন্দর উপাসনার সঞ্জীবনী সুধায় তোমাদিগকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিব এবং অসুরেরাই ত্রিলোকের অধীশ্বর হইবে। আমার অনুপস্থিতিতে কোনও আপদ উপস্থিত হইলে আমার গর্ভধারিণী ভৃগুপত্নী কাব্য-মাতার স্মরণাপন্ন হইলে বিপদ তোমাদিগকে স্পর্শও করিতে



মনসা দেবী
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

পারিবে না। কবিতা স্বয়ং প্রকৃতি বলিয়া ত্রিলোকের পূজ্যা ও অবধ্যা—ইহাও পিতামহের নির্দ্দেশ।

জীবন বীর্য্যহীন হইলে, দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন হইলে, দেহ রোগগ্রস্ত হইলে, ভারতবর্ষের দেহধর্ম্মের গুরু শুক্রাচার্য্য পরাজিত বিধ্বস্ত অসুরদিগকে পুনরায় সুস্থ পরাক্রমশালী শ্রীমান ও বীর্য্যবান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন একমাত্র সুন্দরের উপাসনা করিয়া। সুন্দরের উপাসনা করিলে বল ও বীর্য্য লাভ হয় এবং "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"।

এই প্রসঙ্গে আর একটি পৌরাণিক রূপক উল্লেখযোগ্য। দক্ষ প্রজাপতি দৃষ্টিহীনতা নিবন্ধন সুন্দরের অবমাননা করিয়াছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা সতীশূন্যা হইয়াছিলেন এবং তিনি নৃমুণ্ড হারাইয়া ছাগমুণ্ডে বিভূষিত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ যে শক্তিকে সহধর্ম্মিণী করিয়া মানবের চিরন্তন শ্রেষ্ঠ কামনা সীমাহীন অব্যক্তকে, সর্ব্বব্যাপী ও শাশ্বত আত্মাকে মূর্ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সেই শক্তি সেই অনুভূতিকে কবিতা বা কাব্যমাতা বলা হইয়াছে।



সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইনিই মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যার জনক শুক্রাচার্য্যের জননী। ইনিই তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। সাধনা করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিতে না পারিলে সাধকের সিদ্ধি নাই। এই আনন্দস্বরূপা প্রকৃতি দেবীকে ভক্তরূপে যাঁহারা বন্দনা করেন তাঁহারাই ঋষ্ অর্থাৎ সত্যদৃষ্টি প্রভাবে সর্ব্বত্রই রসরূপী সুন্দরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া কখনও কথায় কখনও সুরে কখনও রঙে কখনও রেখায় কখনও সঙ্গীতে কখনও ভঙ্গীতে মূর্ত্তিদান করিয়া আচার্য্য, কবি, গুরু, ঋষি প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। অন্তরের আনন্দে নানা উপকরণে বিভিন্ন রূপে কবি সুন্দরকে সৃজন করিয়া মুমূর্ষুকে প্রাণ দিতেছেন, ভীতকে অভয় দিতেছেন, বীর্য্যদান করিতেছেন দুর্ব্বলকে। এই জন্যই শুক্রাচার্য্য আপদ্‌কালে কাব্যমাতার শরণাপন্ন হইতে অসুরদিগকে আদেশ করিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে এই ধানভানিতে শিবের গীত



বোধিসত্ত্বের হস্তিদন্ত
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেন? সম্পাদক মহাশয় অনুরোধ করিয়াছেন আধুনিক ভারতশিল্প ও বিশিষ্ট শিল্পীগণের বিশেষত্ব লইয়া একটী প্রবন্ধ লিখিতে। এতখানি পৌরাণিক আখ্যায়িকার অবতারণা আপাত-দৃষ্টিতে অবান্তর মনে হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু গৃহে জন্মলাভ করিয়া কথা বলিতে বা বুঝিতে শিখিবার পূর্ব্ব হইতেই মাতা ভগিনীর ক্রোড় হইতেই দেবদেবীর প্রতিমাকে প্রণাম করিতে শিখিয়াছি, পৌরাণিক দশকর্ম্মের মধ্য দিয়া মানুষ হইয়াছি, এমন কি মাতার কুমারীজীবনের শিবপূজার স্বপ্ন পর্য্যন্ত শোণিত স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। আজিকার অবনীন্দ্র, নন্দলাল প্রমুখ রূপদক্ষগণের চিত্রকাব্যে, প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তিতে, দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে এবং বিশ্বের অপরাপর জনপদের প্রাচীন ও আধুনিক রূপকর্ম্মগুলি হইতে যে রসাস্বাদন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি তাহার প্রথম ইঙ্গিত আসিয়াছিল আমাদের পুরাণ-পরিকল্পিত



উমার তপস্যা
শ্রীনন্দলাল বসু

নিত্য-আরাধ্য সামাজিক জীবনের দেবদেবীর প্রতিমা দর্শনের ভিতর দিয়া, চণ্ডীমণ্ডপে গন্ধপুষ্পচর্চ্চিত কথকঠাকুরের পুরাণ গান হইতে। তথাকথিত শিল্প-সমালোচকের ন্যায় আধুনিক ভারতশিল্পকে ভাষান্তরিত করিতে না পারিয়া, পাঠকের মন ও চক্ষুকে ভারতশিল্পের রূপের দিকে আকৃষ্ট না করিয়া এক ঝলক আধ্যাত্মিক ধোঁয়া উড়াইয়া তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ চশমা পরিশোভিত ক্ষীণ দৃষ্টিকে চিরতরে মুদ্রিত করিয়া দিবার বাসনা বা তাঁহাদের সুদূর ভবিষ্যতে কোনও কালে রূপদৃষ্টি ফুটিবার সম্ভাবনাকে কোনও রূপ তাত্ত্বিক বোমা মারিয়া বিনাশ করিবার ইচ্ছা আমার নাই। ●

মানব মনের শ্রেষ্ঠ বাসনাকে রূপদান করাই যদি আর্টের উদ্দেশ্য হয়, এবং পৌরাণিক সাহিত্যের তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর সার্থক রূপ কল্পনা, ও পৌরাণিক ঋষির ধ্যাননেত্রে



কিরাতার্জ্জুন
শ্রীনন্দলাল বসু

যদি মানব-মন-সিন্ধু-মথিত ভারত প্রতিভার মানস শতদলের উপর লীলাকমল ও অমৃতভাণ্ড হস্তে কলাকমলার রূপমূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়া থাকে তাহা হইলে পুরাকালে লিখিত হইলেও পুরাণ সাময়িক সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ পর্ণকুটীর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহাকালের বিরাট ও বিস্তীর্ণ চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে। এবং সেই কারণেই আজিকার অবনীন্দ্র নন্দলাল এবং অপরাপর সার্থক শিল্পীগণ যাঁহারা এ জীবনের সর্ব্বত্রই মানবে দেবতায় পশুতে পক্ষীতে জলেস্থলে পত্রেপুষ্পে সুন্দরকে দেখিতেছেন ও আঁকিতেছেন। তাঁহারাও রূপদৃষ্টি ও শিল্পসৃষ্টির প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, পৌরাণিক সাহিত্য, মূর্ত্তি ও চিত্রশিল্প হইতে।

ভারতবর্ষের শিক্ষাভিমানী বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলী বা অর্থবান তথাকথিত শিল্পরসিকবৃন্দ ভারতমাতার রূপমূর্ত্তি দেখিতে অভিলাষী হইয়া আধুনিক রূপদক্ষদিগের



দময়ন্তী
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রথম যুগের শিল্প-সৃজন পরিদর্শন করিলে সে যুগের অবনীন্দ্র নন্দলাল, শৈলেন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র বিচিত্রিত ভারতীয় শিল্পকলা, শিবদুর্গা, রাধাগোবিন্দ, কালীয়দমন, দুষ্মন্ত শকুন্তলা, কচ ও দেবযানী প্রভৃতি রামায়ণের ও মহাভারতের ও অপরাপর পৌরাণিক চিত্রমূর্ত্তিতে পূর্ণ দেখিবেন। ইহাই আমার চিত্র-শিল্প আলোচনা করিতে পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবতারণা করিবার কারণ।

কাব্য ও চিত্র-শিল্প সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্প একই আনন্দ ও রসরূপে মূর্ত্ত হইলেও, তাহাদের উদ্দেশ্য ও আবেদন এক হইলেও, রসিক মনের মণিকোঠায় প্রবেশের পথ তাহাদের এক নয়। একজন কাব্য ও সঙ্গীতরূপে কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করেন মনপ্রাণ আকুল করিতে নব নব সুর বাণী ও ছন্দের রত্নচতুর্দ্দোলায়, আর একজনের প্রবেশ পথ একই প্রয়োজনে আঁখির ভিতর দিয়া বর্ণের সপ্তাশ্বযোজিত



যম ও নচিকেতা

শ্রীনন্দলাল বসু

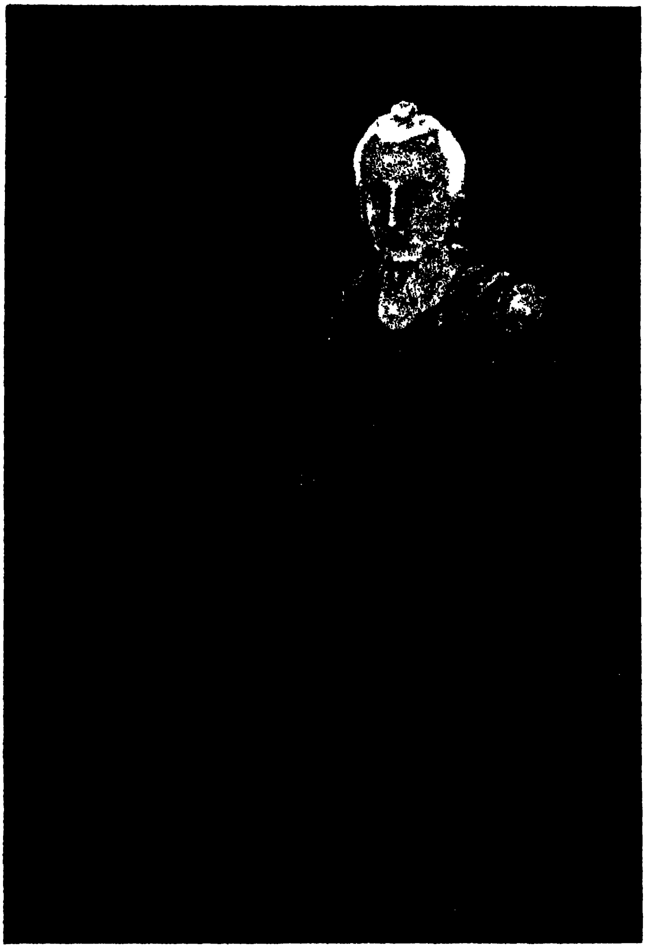
বিচিত্র আলোকময় রেখার রথারোহণ করিয়া। যাত্রারম্ভে দুইএর ভিন্ন মূর্ত্তি থাকিলেও যাত্রাশেষে রসিকের হৃদ্‌-বৃন্দাবনে দুইএ মিলিয়া একই আনন্দরসঘন ভাবে ভরা যুগলমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইতেছেন।

সঙ্গীত উপভোগ করিতে হইলে শ্রোতার যেরূপ সুরে কান তৈয়ারী থাকা প্রয়োজন, কাব্য-সমালোচকের যেমন ধ্বনি ও ছন্দে কান প্রস্তুত চাই, চিত্র-সমালোচকেরও তদ্রূপ রেখা ও বর্ণ-ছন্দের আবেদন বা সুর ধরিতে পারিবার মত দৃষ্টিশুদ্ধির প্রয়োজন আছে। চিত্র-সমালোচককে জানিতে হইবে রূপদক্ষ অঙ্কিত চিত্র দৃষ্ট বস্তুর ছাপ নয়, জীবনের ন্যায়ই তাহা প্রাণবন্ত। তাহার মন রহিয়াছে, মনের কথা রহিয়াছে, সহানুভূতি লইয়া ইহার সান্নিধ্য লাভ করিলে অর্থাৎ চোখের সহিত মন মিলাইয়া ছবি দেখিলে রূপ তাহার নীরব রেখার ভাষায় রঙের ভাষায় জীবনের বন্দনা-গান করিয়া মনপ্রাণ



শিবতাণ্ডব
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

আকুল করিয়া দিবে। রূপ সান্নিধ্যে রূপদৃষ্টি লাভ হইলে রূপ-রসিক বুঝিতে পারিবেন এবং পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষাভিমানী অর্দ্ধশিক্ষিত তথাকথিত পণ্ডিত মণ্ডলীকে বুঝাইতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের রূপ-দেবতা সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ কেবলমাত্র কথিত ভাষায় পয়ার অমিত্রাক্ষর ও মন্দাক্রান্তা ছন্দে নৃত্য করিতেছেন না, কথার অন্তরালে রূপলোকের নাট্য বেদীকায় তিনি রেখা ও বর্ণ-ছন্দেও নৃত্য করিতেছেন। রূপরসিক তাহাদিগকে বুঝাইতে সক্ষম হইবেন জাতীয় জ্ঞানমন্দির বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কলালক্ষ্মীকে নির্ব্বাসিত করিলে এই জাতীয় দুর্দ্দিনে বীর্য্য সাধনা, শক্তিসাধনা, জ্ঞানসাধনা, অসম্পূর্ণ থাকিবে। কাব্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জীবনকে উৎসবময় করিতে হইলে, কদর্য্যতার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, জাতীয় স্বরাজ্য কামনা সত্য হইলে, সাময়িক মাসিক পত্র প্রকাশিত শিল্প-সমালোচনারূপ সাহিত্যিক



ভিক্ষার্থী বুদ্ধ
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বৈরচারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বর্ত্তমান সমাজের স্তম্ভরূপী বাক্‌সর্ব্বস্ব পণ্ডিতমণ্ডলীকে অবহেলিত নীরব শিল্পসাধকদিগের রূপসাধনার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে হইবে। কবি-জয়ন্তীর ন্যায় জাতীয় চিত্রশালা স্থাপনায় দেশব্যাপী উৎসব করিতে হইবে। আপনার শুদ্ধদৃষ্টি লইয়া শিল্পবস্তুর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় লাভ করিয়া শিল্প-সমালোচনা করিতে হইবে। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে অসনে বসনে জাতীয় সংস্কৃতি ও সুরুচি প্রকাশ করিতে হইবে। মাসিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় কেবল মাত্র শিল্পীর নাম দেখিয়াই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট চিত্র প্রকাশ করিয়া, কোনও অখ্যাতনামা সার্থকশিল্পী অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্রখানি পত্রিকার মধ্যে বা শেষভাগে ছাপিয়া আপনাকে শিল্পরসিক বলিলে চলিবে না।

এক সময়ে ভারতবর্ষে আপামর সাধারণে তীর্থযাত্রাকে



শিবের বিষপান
শ্রীনন্দলাল বসু

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিত। সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক কর্ম্মের অবসানে পরিণত ও পরিতৃপ্ত মন লইয়া বহুযোজনব্যাপী দুরূহ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া জাতীয় প্রতিভাকে অভিনন্দিত করিবার যে অভিনব রীতি সমাজে বর্ত্তমান ছিল, ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আজিকার আমরা বহুদিনপুষ্ট সেই জাতীয় সংস্কার বর্জ্জন করিয়াছি, ইংরাজী শিক্ষিত আধুনিক ধর্ম্ম-সংস্কারকগণের আত্মঘাতী উদ্যম ও ওজস্বিতার ফলে ভারতবর্ষের বহুরূপী ভগবান আজ নিরাকার হইয়াছেন। ভারতের তীর্থক্ষেত্রগুলি আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টির অন্তরালে সংস্কারাভাবে জীর্ণ ও হতশ্রী হইয়া বিগত সভ্যতার পরিত্যক্ত কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভাস্কর্য্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, পৃথিবীর যে কোন দেশের রূপদক্ষগণের রূপকর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ এদেশের নটরাজ, শিবকামসুন্দরী প্রভৃতি বিগ্রহমূর্ত্তিগুলি



জতুগৃহ দাহ
শ্রীনন্দলাল বসু

শিক্ষিত ভারতবাসীর দৃষ্টির অলক্ষ্যে বৈদেশিক প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ কর্ত্তৃক মৃত্তিকাগর্ভ ও পরিত্যক্ত ভগ্নমন্দিরের রত্নসিংহাসন হইতে নিক্রান্ত হইয়া ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন জ্ঞানমন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। জীবন্ত জাতি সমূহের নবীন ভক্তপূজারীবৃন্দ তাঁহাদের পূজা করিতেছেন, ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আপনাদিগের নিবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন, রূপশিল্পীগণ নূতন সৃজনের প্রেরণালাভ করিতেছেন এবং রূপরাসকবৃন্দ আমাদের নিত্য-উপাস্য দেবদেবীর রূপমূর্ত্তি হইতে বিমল আনন্দলাভ করিয়া জীবন উৎসবময় করিতেছেন। অপর পক্ষে বিদ্যাভিমানী ও স্বরাজ্যকামী আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার ঐশ্বর্য্যের বাহ্যিক চাকচিক্য প্রসূত তমাসাচ্ছন্ন দর্শন লইয়া ইউরোপীয় জাতি সমূহের আত্মসৌন্দর্য্য ও সত্য-সাধনার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছি না; স্বধর্ম্ম হারাইয়া



কালিয় দমন
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

ভয়াবহ পরধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বাহ্যিক উপকরণ বাহুল্যে জীবনকে ভারাক্রান্ত করিতেছি। সর্ব্বপ্রকার জাতীয় সৃজন-সংকল্প স্বতঃস্ফূর্ত্ত না হইয়া অনুকরণে পর্য্যবসিত হইতেছে। জীবন বীর্য্যহীন ও শ্রীহীন হইয়াছে। যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছি তাহাদিকেও সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছিনা, জাতীয় ধমনীতে প্রাণস্পন্দন নাই বলিলেই চলে এবং সামাজিক জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন, ভাণ ও মিথ্যাচার প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে।

এইরূপ অবস্থায় একমাত্র আশার কথা হইতেছে যে, সত্যের মৃত্যু নাই এবং অবনীন্দ্র নন্দলাল প্রমুখ সত্যাশ্রয়ী অমর আদর্শবাদী রূপশিল্পীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। জাতীয় আত্মাকে তাঁহারা মূর্ত্তিদান করিয়াছেন। প্রগলভতা ত্যাগ করিয়া ভক্ত পূজারীর ন্যায় শিক্ষার্থীর ন্যায় তাঁহাদের সার্থক শিল্পসৃজনের সম্মুখীন হইলে জাতীয় মস্তিষ্ক সমতালাভ করিবে; সত্য, শিব, সুন্দরের সান্নিধ্যে আসিয়া জাতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে এবং আত্মসচেতন



একলব্য
শ্রীনন্দলাল বসু

হইয়া জাতি জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইয়া শ্রী ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইবে।

শিল্প-সমালোচনা করিতে বসিয়া প্রথমেই মনে হইল, যে দেশে শিল্পের সহিত জীবনের কোনও যোগ নাই সে দেশে শিল্প-সমালোচনা না করিয়া শিল্পের সহিত সমাজের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখাই বেশী প্রয়োজনীয় এবং সেই কারণেই যিনি আপনার অন্তরালোকে রূপসৃজনের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের অন্ধকার নাশ করিতেছেন সেই সর্ব্বজন প্রণম্য শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহার ও অপরাপর শিল্পীগণের কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র প্রকাশিত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

এক যাত্রায় পৃথক ফল

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

প্রথম অঙ্ক

[চৈত্রমাসের প্রভাত। কমিশ্‌নার সাহেবের বাংলোর সামনের দিক্। প্রশস্ত বারান্দার নীচে লাল কাঁকরের রাস্তা, বাগানের সামান্য অংশ চোখে পড়ে। বারান্দার পশ্চিম দিকে কাঠের পার্টিশান করিয়া বারান্দাকে দুই অসমান অংশে খণ্ডিত করা হইয়াছে। ক্ষুদ্রতর অংশে সুনীতি দেবী বসিয়া আছেন, বিরদা দাসী তাঁহার নিকট হইতে কি কি তরকারি কুটিতে হইবে সে সম্বন্ধে আদেশ লইতেছে। বাংলোর বাহিরে একটা গাড়ী থামিবার শব্দ হইল। অল্পক্ষণ পরেই সৌম্য ও শীলা আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন।]

সৌম্য। এই বাড়ীই ত? দেখ। আমি এর আগে এখানে আসিনি।

শীলা। হাঁ গো হাঁ, এই বাড়ী। চুপ, ঐ যে মা বসে আছেন। বাবা বোধ হয় কোথাও বেরিয়েছেন।

সৌম্য। তাহলে আমি হরি সিংকে ইসারা করে দিচ্ছি বাক্সগুলো নামিয়ে আনুক গাড়ী থেকে।…খবর না দিয়ে চুপি চুপি এসেছি, কেউ জানে না। দেখনা, এক মজা করি।…এই, কোই হায়! (দুখিৎ সিং বাহির হইয়া আসিল) কমিশ্‌নার সাহাব কোঠিমে হায়?

দুখিৎ সিং। জী নেহি। সাহাব বাহাদুর বাহার গিয়া, আনেকো কুছ্ ঠিকানা নেহি। মেম সাহেব বাহাদুর কামরে হায়, ফুর্সৎ নেহি। মুলাকাৎ কো টাইন্ সাড়ে পাঁচ বাজে সে।

সৌম্য। অর্থাৎ আমাদের ভাগিয়ে দিতে চায়।… দেখো, তুম এই দো কার্ড লে যাকে দেও।

দুখিৎ সিং। (দুইখানি জলে ভেজা রোদে পোড়া চেয়ার বাহির করিয়া বসিতে দিয়া কহিল) আপলোক বৈঠিয়ে, হাম্ কার্ড লে যাতা। (প্রস্থান)

শীলা। কি দুষ্টুমি করছ তুমি কার্ড পাঠিয়ে।

সৌম্য। এস বসা যাক। বেশ weather-beaten চেয়ার দুখানি।

শীলা। ছিঃ ওতে বসনা। আরশোলার ফুর্তি।

সৌম্য। হোক আরশোলা, ওরা হল India's dumb millions!

[বারান্দার অপর অংশে যাইয়া দুখিৎ সিং সুনীতি দেবীকে কার্ড দুখানি দিল]

দুখিৎ সিং। ভাগায় দেনেকো বহুৎ চিষ্টা কিয়া, লেকিন্ গিয়া নেহি। মুলাকাৎ করনে মাংতা।

সুনীতি দেবী। কে আবার এই সকাল বেলার কাজের সময় জ্বালাতন করতে এল। লোকদের আক্কেল বলে কি পদার্থ নেই বাছা। চশমাটা আবার কোথায় ফেললুম। এই বিরদা, যা ত মা, চশমাটা খুঁজে এনে দে, পড়ে দেখি কার কার্ড।

[ইতিমধ্যে সৌম্য ও শীলা চুপিচুপি সরিয়া গেলেন]

বিরদা। (বারান্দা সংলগ্ন ঘরের মধ্যে গিয়া সেখান হইতে চেঁচাইয়া কহিল) খুঁজে ত পাচ্ছিনি মা, ছিষ্টি খুঁজনু, কুথাকে যে গেলেন চশমা জোড়াটি—

সুনীতি দেবী। দেখ্‌না, আয়না-টেবিলে, নয়ত গোসলখানায়, নয়ত আলমারির মাথার উপর, নয়ত তুলির মধ্যে। ঐখানেই আছে, যাবে আবার কোন্ চুলায়। ওরে, এই এই, কে আছিস! বাইরে একটা কুকুর ঘুরছে, যা যা, এখুনি ওর মুখে একটা লাথি মেরে আয়। দুধের কড়ায় মুখ দেবে।

বিরদা। (ঘরের মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে) না পেলি গো মা, হাই জুতার ভিতর হাত পুরে দেখলি, ছাতাটি খুলে দেখলি, বাকী আর কিছু রাখলি না, পেলি না।

সুনীতি দেবী। মাগী যেন স্তাকা !···ওরে ঐ ছোঁড়া, আবার বসল বসল, ঐ কাগটা বসল ঐখানে। যা যা, ঝাঁটা রেখে ওর কানটা মলে দিয়ে আয়, কাল আমার সমস্ত বড়ী খেয়ে গেছে।

ছুখিৎ সিং। হো কাউয়া নেহি হজুর, সো এক দুসর ধাড়ি কাউয়া বা !

সুনীতি দেবী। আরে না না ঐটেই। সেটাও ছিল কালো কুচকুচে দেখতে, আর ডাকছিল কা কা করে। ঐটেই সেইটে।

জমাদার। কাগটা পেলিয়ে গেলেন মা।

সুনীতি দেবী। পেলিয়ে গেলেন মা ! কোনো কর্ম্মের নস, কেবল গিলতে পারিস। দে বারান্দাটা আর একবার ঝাঁটা দে।···অ বিরদা, পেলি চশমা ? ও মাগীর কর্ম্ম নয়, যাই আমি নিজে গিয়ে দেখি। (যেমন উঠিলেন, অমনি ঠক্ করিয়া খাপশুদ্ধ চশমা পড়িয়া গেল) এই ত চশমা রয়েছে, আর মাগী চারিদিক খুঁজে মরছে, মাগী যেন কানা। ···(চশমা পরিয়া কার্ড পড়িলেন) এস্ রয়, আই-সি-এস, মিষ্টার এণ্ড মিসেস্ রয়,—এরা আবার কারা ?...ওমা, এযে শীলা সৌম্য,—দেখদিকি দুষ্টুমি, চুপিচুপি এসেছে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে। ওরে ও ছুখিৎ সিং, অবিরদা, এই ঠাকুর, ওরে তোরা সবাই গেলি কোন্ চুলায়, মেয়ে জামাই এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তোরা কি সবাই চোখের মাথা খেয়েছিস্ নাকি—ওরে—

[হুড়মুড় করিয়া যে যেখানে ছিল সবাই আসিয়া পড়িল—বিরদা তরকারি কুটিতে ছিল তাহার হাতে বঁটি, ঠাকুর রাঁধিতেছিল আসিবার কালে তাড়াতাড়ি খুন্তিটা হাতে করিয়াই আনিয়াছে, মালী ছিল বাগানের কাজে, কোদালটি সঙ্গে আনিয়াছে, জমাদার ঝাড়ুটি পরিত্যাগ করে নাই]

সকলে। কি হয়েছে মা, কি হয়েছে ?

সুনীতি দেবী। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। দিদিমণি আর দাদাবাবু এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তোরা সবাই হাঁ করে ঘুমুচ্ছিস্ ?

সকলে। আমাদের দিদিমণি ?

সুনীতি দেবী। আরে হাঁ হাঁ—আমাদের দিদিমণি নয়ত কি ওপাড়ার নন্দ বাবুদের দিদিমণি ! তোদের কথা শুনলে গা জ্বলে।

[সকলে বাহিরের দিকে তাকাইতে লাগিল]

ছুখিৎ সিং। আগ্ গিয়া। দিদিমণি দাদাবাবু নেহি, আউর কোই হোবে।

সুনীতি দেবী। না না, ভাল করে দেখ্। যাই আমিই গিয়ে দেখি।

[সবাই ভাল করিয়া বাহিরের দিকে দেখিতে লাগিল, এমন সময় সৌম্য ও শীলা ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা ইতিমধ্যে কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছেন। যথাবিহিত প্রণামাদির পর—]

সুনীতি দেবী। এস এস বাবা এস। এস এস আমার মা এস। বড্ড রোগা দেখছি। একটা খবর দিয়ে আসতে হয়। কী যে সব ছেলেমানুষী কর তোমরা বাছা, দেখ দিকি কত কষ্ট হল !

সৌম্য। কষ্ট আবার কি মা ! চুপি চুপি ঘরে ঢুকে দেখি তোয়ালে সাবান, কাপড় চোপড় সব সাজান রয়েছে, আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সে সমস্ত সদ্ব্যবহার করলাম।

সুনীতি দেবী। বেশ করেছ। বেয়ারাকে ডাকলে না কেন, দেখ দিকি কত কষ্ট হল।

সৌম্য। খুব মজা হল মা। বিরদা আপনার চটিজুতার ভেতর হাত দিয়ে দেখছিল সেখানে চশমা আছে কি না।

শীলা। আর মা, তোমার কি বিরক্তি ! বলছিলে লোকগুলার কি আক্কেল বলে কোনো জিনিষ নেই বাছা !

সুনীতি দেবী। আমি কি জানি বাছা যে তোমরা এসেছ।

শীলা। মা, তোমার ছুখিৎ সিং আমাকে চিনতেও পারল না। নতুন লোক হলেও মাস ছয়েক আগে আমাকে দেখেছে ত।

ঠাকুর। ছুখিৎ সিং, তুমি একটি আস্ত গর্দ্ধভ আছ।

ছুখিৎ সিং। কাহে না !

সৌম্য। এই যে ঠাকুর, চিনতে পার ? তোমার কলকাতার বাড়ীতে দেখেছিলাম। কেমন আছ ?—তা হাতে খুন্তি কেন, লড়াই করছিলে নাকি ?

ঠাকুর। রান্না করছিলুব দাদা,—সিঙাড়া ভাজিকিরি পাঠাতে হবে নোল্‌তি বাবুদের বাড়ী, আর ডাক্তার সাহেবের বাড়ী মালোপুয়া।

সৌম্য। ধন্য কপাল ওদের! তা আমরা কি খাব মা—

সুনীতি দেবী। খাবে বই কি বাবা,—অ ঠাকুর, এঁটো খুন্তিটা রাখ বাছা, হাত ধুয়ে আর এক কড়া ঘি নিয়ে যাও, দাদাবাবু ডালপুরী ভালবাসেন, বেশ ভাল করে ডালপুরী তৈরী কর।

শীলা। আর মা, আমার জন্তে খাজা।

সুনীতি দেবী। নিশ্চয়! ঠাকুর, অমন সঙের মতন দাঁড়িও না বাছা—নাও, আর এক কড়া ঘি—

সৌম্য। জয় প্রভু জ'গঁড়নাথ, ঠাকুর, আজ পেলে তিন তিন কড়া ঘি। দেখো, লোভে পড়ে যেন চুরি করে বস না, তাহলে স্বর্গে যেতে পাবে না, সেখানে তুমি না থাকলে আমাদের খাওয়াবে কে!

সুনীতি দেবী। কি দাঁড়িয়ে হাসছ ঠাকুর। এই নাও চাবি নাও, ঘি বের করে নাও আর বাবুর্চিকে বলে দাও দাদাবাবু দিদিমণির জন্তে একুণি চা রুটি ডিম করে আনবে—যাও।

[সৌম্য ইতিমধ্যে একটি গ্লাস হাতে লইয়া সোরাই হইতে জল ঢালিবার উপক্রম করিলেন]

সুনীতি দেবী। ওমা, ওকি, ওকি! বাবা তুমি নিজের হাতে জল গড়িয়ে খাবে! কেন, এই বিরদা, ও ঠাকুর, ঐ ছুখিৎ সিং—তোরা সবাই কি মরেছিস্!

[তাহারা মরে নাই একথা প্রমাণ করিবার জন্ম হুড়মুড় করিয়া সকলে আসিয়া সৌম্যের হাত হইতে গ্লাস কাড়িয়া লইল। মালীর কোদালের চোট্ লাগিয়া সোরাই ভাঙিয়া বিরদার পায়ের উপর পড়িল,—জল ছিটাইয়া গেল। জমাদার ঝাঁটা সমেত ঠাকুরকে ছুঁইয়া ফেলিল]

বিরদা। (তার স্বরে) মালী মুখপোড়া আমার খুন করলে রে—

ঠাকুর। (রোষ কষায়িত নেত্রে) তুই ঝাড়ু, মিইকিরি মোরে ছুঁইলি কেমতি রে মেথর!

মালী। (ভাঙা সোরাই হাতে লইয়া) শড়া সোরাই ত ভাঙিকিড়ি পকাই গেল!

সুনীতি দেবী। আজ তোদের সবাইকে বিদের করব, আসুন উনি ফিরে! এই জমাদার, দে বারান্দা আর একবার ঝাঁটা দে!

সৌম্য। নিজের হাতে জল গড়িয়েও খেতে দেবেন না মা! কি মুস্কিল!

সুনীতি দেবী। না বাবা, দুদিনের জন্তে এসেছ, কেন কষ্ট করতে যাবে!

[এমন সময় বাহিরে মোটর আসিয়া থামিল]

শীলা। ঐঃ বাবা এলেন, যাই। (দৌড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, প্রায় তখনি মিষ্টার ব্যানার্জির কাঁধে ঝুলিতে ঝুলিতে পুনরায় প্রবেশ করিলেন)

মিঃ ব্যানার্জি। এঁ্যা, তোমরা যে হঠাৎ, কোনো খবর দেওয়া নেই কিচ্ছু নেই, কখন এলে?

শীলা। খুব মজা, নয় বাবা? উনি চারদিনের casual leave নিয়ে বললেন, চল, না বলে হঠাৎ গিয়ে পড়া যাক্, আমিও বললুম চল। তোমাদের খুব আশ্চর্য্য করে দেব বলে খবর দিইনি। তা আজ সকাল থেকে যা মজা হচ্ছে—যাকে বলে হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড! এই ভাঙা সোরাই হচ্ছে তার latest outburst!

মিঃ ব্যানার্জি। এই, তোরা সবাই সঙের মত কোদাল কুড়ুল নিয়ে কি করছিস্? যাঃ, পালা।...পাগলী মা আমার, চিরদিনই কি এম্‌নি ছেলেমানুষ থাকবে? তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে বাড়ী আমাদের অন্ধকার হয়ে গেছে। কেউ যদি হাসে, আমি বলি আমার শীলা মা বুঝি! তোমার মা আর আমি রোজ সন্ধ্যায় বসে বসে ভাবি তোমরা ছুটিতে কি করছ।

সুনীতি দেবী। (হাতপাখা লইয়া মিঃ ব্যানার্জিকে বাতাস করিতে করিতে) বস, একটু ঠাণ্ডা হও, এই রোদ্দুর থেকে এলে। তোমার জন্তে লেবুর সরবৎ করে রেখেছি, বরফ দিয়ে এখুনি নিয়ে আসছে।

মিঃ ব্যানার্জি। তুমি আবার কষ্ট করে পাখা করছ কেন? (শীলাকে) তোমার মায়ের কী যে বাতিক, মাথার

ওপর ফ্যান্ ঘুরলেও হাতপাখাটি করা চাই। যাক, তারপর সৌম্য তোমাদের প্রোগ্রাম কি বল শুনি।

শীলা। বাবা, উনি ভগ্নস্তূপ দেখেন নি। চলনা আজ সবাই মিলে যাওয়া যাক, সোজা মোটরের রাস্তা ত রয়েছে।

মিঃ ব্যানার্জি। বেশত, তোমরা যাও। প্রাচীন পাল ও সেন রাজাদের অনেক কীর্ত্তি কাহিনী দেখতে পাবে। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে দুটোর সময় বেরিয়ে পড়।

সৌম্য। আপনারাও চলুন না।

মিঃ ব্যানার্জি। আজ আমার একটু কাজ আছে। তাছাড়া আমি ওসব অনেকবার দেখেছি আর ভাল লাগে না। বরং তোমার শাশুড়ীকে নিয়ে যাও।

সুনীতি দেবী। না না, রক্ষে কর। ওসব ভাঙা কলসি আর কাণা হাঁড়ি কতবার মানুষ দেখতে পারে। তাছাড়া আমি না থাকলে ঠাকুর ডালপুরী ধরিয়ে ফেলবে, খাজা মোটা করে ফেলবে।

মিঃ ব্যানার্জি। এই, কোই হায়, ড্রাইভার বাবুকো বোলাও।

[ড্রাইভার জগু প্রবেশ করিল। বয়স পঁয়ত্রিশও হইতে পারে পঁয়তাল্লিশও হইতে পারে। পাকানো পাকানো রোগা চেহারা, মাথায় লম্বা টেরি, চোখ ঈষৎ বসিয়া গিয়াছে, গালের হাড় ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে। পরিয়া আছে ড্রাইভারের খাকী সুট—আড়ষ্ট হইয়া আছে]

মিঃ ব্যানার্জি। দেখ জগু, আজ দুটোর সময় বড়-গাড়ী তৈরী রাখবে। দাদাবাবু দিদিমণি ভগ্নস্তূপ দেখতে যাবেন। যাও, তেলটেল সব ঠিক আছে কিনা দেখে নাও।

জগু। আজকে?

সুনীতি দেবী। এই রেঃ, ওর মাথায় বাজ পড়েছে! দুপুর বেলার ঘুমটি আজ আর হচ্ছে না, বুঝেছ?

সৌম্য। বড়গাড়ী কেমন চলছে জগুবাবু?

জগু। কেমন আর চলবে, ভালই চলছে।

সুনীতি দেবী। সে তোমার গুণে নয়, গাড়ীর গুণে। অথচ পয়মাবু্ গাড়ীর তাই জগুর হাতে এখনো টিঁকে আছে। গিয়ার টানে যখন তখন আওয়াজ হয় যেন চাঁদ্ বোলায় চলে গেল। এঞ্জিনটার মধ্যে দুশো মণ ধুলো, একটিবারও মোছে না।

সৌম্য। সে কি, জগুবাবু?

জগু। কি হবে মুছে দাদাবাবু! আবার চললেই ত আবার ধুলো জমবে।

সুনীতি দেবী। শোনো কথা! এম্নি কুঁড়ে ওটা,— সাইকেল কিনে দেবার পর থেকে ও আর পায়ে হাঁটে না। যদি বলি জগুবাবু একবার হাঁচ ত, সাইকেল করে গিয়ে হেঁচে আসবে।

[দুখিৎসিং এর প্রবেশ]

দুখিৎ সিং। ছোটা হাজরি তৈয়ার হুজুর।

সুনীতি দেবী। চল চল সমস্ত রাত ট্রেনে এসেছ, আর সকাল থেকে যা হৈ হৈ। খুব খিদে পেয়েছে তোমাদের। চল চল, আর দেরি নয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[শোবার ঘর। মেঝের উপর নীল রঙের কার্পেট পাতা; দুইটা স্প্রীংএর খাটে বিছানা করা, মশারি ফেলা। দুই ধারে দুইটা টিপয় তাহাতে কাঁচের জলাধারে জল ও গ্লাস। প্রত্যেক খাটের সঙ্গে সংলগ্ন নীল শেড্ দেওয়া বাতি। ঘরের এক কোণে আয়না টেবিল, তাহার উপর প্রসাধনের বিভিন্ন সরঞ্জাম। একপাশে, আয়না টেবিলের অনতিদূরে ছোট্ট বেঞ্চের উপর দুইটা চামড়ার সুটকেস্, একটার ডালা খোলা। জানালায় কার্টেন্ দেওয়া। গোসলখানায় যাইবার দরজা উন্মুক্ত রহিয়াছে, গোসলখানার ভিতরে অন্ধকার। একটিমাত্র বাতি শোবার ঘরে জলিতেছে।]

(এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অতি সন্তর্পণে জগু প্রবেশ করিল)

জগু। সবাই খেতে বসেছে। কতই খাচ্ছে মাইরি, কাটলিস্ আম্লেট্ মামলেট্! এই তকে যদি কিছু হাতিয়ে নিতে পারি। এই যে, আজ বরাৎ ভাল্, সুটকেসটা খোলাই পড়ে আছে। আহা কিবা চটকদার ভোকা সব শাড়ীরে দাদা! নিই দুখানা বেছে। (দুখানি শাড়ী

উঠাইয়া লইয়া কোটের বোতাম খুলিয়া ভিতরে গুঁজিয়া ফেলিল)। আরে গেল যা,—গোসলখানায় ও শব্দটা কিসের! জমাদার শালা নিশ্চয়। একটু আড়াল হওয়া যাক। সাড়ী পেলে যা খুসী হবে জুঁই মাইরি! পেট্রল চুরি করে বেচা পয়সা দিচ্ছি, নিত্যি লুকিয়ে মোটরে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসছি, সাতপুরুষে কেউ কখনো তার মোটর গাড়ী চক্ষে দেখে নি,—তবু শালীর মন পাইনে! (চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল এমন সময় বাহিরে শীলা ও সৌম্যের গলার আওয়াজ পাইয়া ক্ষিপ্রতা সহকারে ফিরিল) এই রে সেরেছে, সর্ব্বনাশ করেছে। (তাড়াতাড়ি জানালার ধারে ঘন নীল পর্দ্দার ভিতর লুকাইয়া পড়িল)।

[শীলা ও সৌম্য প্রবেশ করিলেন—সমস্ত বাতি জ্বালিয়া দিলেন]

সৌম্য। আঃ, এতক্ষণে তোমায় একলা পেয়ে বাঁচলাম। 'চুম্বন দাও সখি তূর্ণ!' (চুম্বন)। চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য,—শ্বশুরবাড়ী ত নয়, যেন মিউনিসি-প্যালিটির pay day!

শীলা। এতদিনের পর এলুম কিনা, তাই সবাই দেখা করতে এল,—ললিত বাবুরা এলেন, তাঁর মেয়ে পান্নু এল—

সৌম্য। ঐ জলন্ত বন্ত মহিষের মতন যাঁর চেহারা—

শীলা। রেভারেণ্ড্ ক্রীক্ এলেন—

সৌম্য। ক্রন্দনশীল কুমীরের মত যার মুখ—

শীলা। ঠাট্টা হচ্ছে, দেখবে মজা!—(সৌম্যের পিঠে ঘুসি মারিলেন) আহা, হা,—লাগল নাকি গো?

সৌম্য। লেগেছে বই কি, খুব লেগেছে। কথায় কথায় এমন মারধোর ভাল না, কোনদিন তোমায় পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে।

শীলা। আর কখ্খনো তোমায় মারব না, এই কান মলছি।

সৌম্য। আহাহা, করকি, ছিছি. কেন কান মললে শীলু, আমি শুধু ঠাট্টা করছিলুম। এস কাছে এস, ওকি তোমার চোখে জল এল কেন?

শীলা। তুমি শীলু বলে ডাকলে আমার খুব ভাল লাগে, চোখে জল আসে।

সৌম্য। শীলু আমার শীলু। উল্টালে হবে লুসি। তুমি আমার শীলু-লুসি। "She I cherished turned her wheel—

শীলা। "Beside a Bengali fire"—কি বল? কবির ওপর কবিরানা করা গেল, কিন্তু ছন্দে বাধল।

সৌম্য। তা বাধুক, কবির ওতে আপত্তি হবে না। শীলু-লুসি, এই তোমার চোখ চুমি, মুখ চুমি, চুল চুমি, কপাল চুমি।

শীলা। তুমি ত সব সময় আমার নাম ধরে ডাক না!

সৌম্য। অর্দ্ধরাত্রে ধীরে ধীরে যে নামে ডাকিব প্রেয়সীরে,—সেই কানে কানে ডাকা নাম হল শীলু-লুসি, শীলু-লুসি। আর বইটা কোথায় গেল, পেন্সিলটা জান কি, চাবিটা দাও ত,—এ সবের পক্ষে 'ওগো শুনছ'ই যথেষ্ট।···এই দেখ, শীলু-লুসি, তোমার জন্যে কি চুরি করে এনেছি। (পকেট হইতে একটি সদ্যবিকশিত ম্যাগ্নোলিয়া ফুল বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন) নেবে তুমি?

শীলা। ওমা কি সুন্দর, দাও দাও। আঃ, কি মিষ্টি গন্ধ! কোথায় পেলে গো?

সৌম্য। ঐ যে রাস্তার ধারে কাদের মস্ত বাগান, সেখানে ফুটেছিল। আমি পাঁচিল টপ্কে তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি।

শীলা। মাগো, কী চোর তুমি! যদি ধরা পড়তে?

সৌম্য। ধরা ত পড়ি নি।···এনেছি শুধু তোমায় দেব বলে।

শীলা। আমার মাণিক! (সৌম্যের মাথার চুলের পরে চুম্বন দিলেন)

সৌম্য। রামচন্দ্র যেমন দেবীর পূজায় নীলোৎপলের জন্যে নিজের চোখ দিতে গেছলেন, আমিও যদি তেমনি একাগ্র সাধনায় তোমার আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারতাম!—

শীলা। সবই ত দিয়েছ আমায়, আমি ত আর কিছুই চাই না! তুমি চিরদিন এমনি থাক, আমায় এমনি ভালবাস। (ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল) ওমা, দশটা বেজে গেল,—যাও তুমি কাপড় চোপড় ছেড়ে এসে শুয়ে পড়।

সৌম্য। ধর, যদি বলি শোব না?

শীলা। দুষ্টুমি করো না, যাও শুয়ে পড়।

সৌম্য। ধর, যদি বলি ঘুম পায় নি?

শীলা। তোমার 'ধর যদি বলা' বার করছি। শোবে কিনা বল?

সৌম্য। কি করে শোব, আমার মাথায় যে হঠাৎ কবিত্ব এল।

শীলা। এত রাত্রে আবার কিসের কবিত্ব এল তোমার মাথায়?

সৌম্য। ঘুম পায়নির ওপর কবিত্ব।

শীলা। আচ্ছা বলে ফেল চট্ করে। তারপর শুতে যাবে। (আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল খুলিয়া চিরুণী করিতে লাগিলেন)।

সৌম্য। Shakespereএর বাংলা অনুবাদ। কবিতাটি ছোট্ট। শোনো—

গরম ক্লাসের মাঝে টেবিলে তুলিয়ে পদ
পণ্ডিতে ঘুমায়ে রয়। হাতেতে পাথার দড়ি—
ভোঁস্ ভোঁস্ নিদ্রা যায় যত পাখাওলা।
আর আমি রাজশয্যাপরে,—আমারি কি ঘুম নাই!
সিন্দুক খুলিতে গিয়া চোরেতে ঘুমায়ে পড়ে—
আমারি কি ঘুম নাই! সত্য বটে, সত্য বটে—
যে মুণ্ডেতে করে থাকে মুকুট ধারণ,
সে মুণ্ডই করে ছট্ ফট্ বিছানায় বালিসের পরে।

শীলা। চমৎকার, অনেক মেঘদূতের কবিতানুবাদের চেয়ে ভাল। দেখ, তোমার কবিত্ব শুনে আমার হঠাৎ মনে পড়ল—আমার সুটকেসে চাবি দিতে ভুলে গেছি! (সুটকেসের দিকে যাইলেন) এ কি, আমার কাপড় চোপড় এমন করে ঘাঁটল কে!

সৌম্য। তুমিই ঘেঁটেছ, আবার কে ঘাঁটবে?

শীলা। ওগো, দেখ, আমার সেই জর্জেট সাড়ীখানা ত পাচ্ছি না—সেই যাতে আমি অমন সুন্দর করে পাড় বসিয়ে ছিলাম, সেইটে। কোথায় গেল গো, ওমা কি হবে, আমার অমন সাড়ীটা কেউ চুরি করলে নাকি গো!

সৌম্য। চুরি আবার কে করবে! ভাল করে খুঁজে দেখ, ঐখানেই কোথাও ফেলেছ!

শীলা। (সমস্ত ভাল করিয়া খুঁজিলেন) নাঃ, কোথাও নেই। ওগো, আমার অমন সাড়ীটা গেল!

সৌম্য। না, না যাবে কি বল, আছে ঐখানেই কোথাও। বোধ হয় ওঘরে ফেলে এসেছ। ছিঃ কেঁদনা শীলু-লুসি, লক্ষ্মীটি চুপকর। না পাওয়া যায়, আমি তোমায় ঠিক ঐ রকম আর একটা সাড়ী কিনে দেব।

শীলা। আমি অত কষ্ট করে অত দিন ধরে খেটে পাড় বসালুম, আমার অমন সখের জিনিষ কে নিলে গো!

সৌম্য। কেউ নেয় নি। চল ও ঘরে গিয়ে দেখি; ওইখানেই ফেলে এসেছ হয়ত।

শীলা। না আমি ওখানে ফেলি নি, তবু চল দেখি।

[দুজনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন]

[তৎক্ষণাৎ পরদার আড়াল হইতে জগু বাহির হইয়া আসিল]

জগু। জয় মা কালী, বড্ড বাঁচিয়ে দিয়েছ বাবা! দূর হোক্‌গে সাড়ী দুখানা ফিরিয়েই দিয়ে যাই, মেয়েটা চোখের জল ফেলছে যখন! (সুটকেসের কাছে আসিতেই আয়না টেবিলে রাখা ম্যাগ্নোলিয়া ফুলটির উপর জগুর দৃষ্টি পড়িল। সেটা দেখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল, কি ভাবিল, ফুলটি ধীরে ধীরে হাতে লইয়া ঘ্রাণ লইল, তারপর ফুলটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল) দেব না ফিরিয়ে!

[পলায়ন করিল]

তৃতীয় অঙ্ক

[পরের দিন সকাল বেলা। আলাপন কক্ষে পুরু মৃজাপুরী কার্পেটের উপর টেপস্ট্রী-ঢাকা 'সেটি', মাঝখানে ছোট্ট গোলটেবিলের উপর একগুচ্ছ গোলাপ ফুলদানীতে সাজান। দেয়ালে নানাবিধ ফটোগ্রাফ্। ম্যান্টল্‌পিসের উপর একধারে তাজমহলের মর্ম্মর-অনুকৃতি, অপরধারে বুদ্ধদেবের ভূমিস্পর্শ মূর্ত্তি। এক কোণে সুদৃশ্য আধারে রক্ষিত গ্রামোফোন, আর এক কোণে হাল্‌কা লিখিবার টেবিল।]

মিঃ ব্যানার্জি। চাকরদের মধ্যে জমাদার আর ড্রাইভার হল নতুন লোক।

সুনীতি দেবী। এটা জমাদারের কাজ, আমি বলে দিলুম, তোমরা দেখে নিও।

সৌম্য। যদি চুরি করে থাকে তাহলে ওকে মারা উচিত।

সুনীতি দেবী। খুব উচিত বাবা। ওটাকে বেশ করে মারা উচিত।

মিঃ ব্যানার্জি। না না, মারধোরের দরকার নেই।

সুনীতি দেবী। তুমি হলে বুদ্ধদেবের অবতার। জ্ঞাতিরা সাতগুষ্টি মিলে তোমার পৈতৃক বিষয় ঠকিয়ে নিলে, তুমি কথাটি কইলে না।

মিঃ ব্যানার্জি। সে সবের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে?

সুনীতি দেবী। খুব সম্পর্ক আছে। দেখ তুমি বড় বেশী বাজে কথা বল, আমি তোমার মতন অমন বাজে বকি না।

মিঃ ব্যানার্জি। এই, কে আছিস, জমাদারকে ডেকে দে।

(জমাদারের প্রবেশ)

এই, তুই কিছু জানিস দিদিমণির সাড়ী হারাণর কথা?

জমাদার। আমি হুজুর?

সুনীতি দেবী। হাঁ হাঁ তুই! দেখনা বেটার চেহারা! পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত টেরি, তেলে জব্ জব্ করছে। আর দিন রাত কেবল বিড়ি আর বিড়ি! ওই নিয়েছে।

মিঃ ব্যানার্জি। দেখ, সমস্ত দিন বিড়ি খায় বলেই প্রমাণ হল না যে ও চোর।

সুনীতি দেবী। খুব প্রমাণ হল। তুমি আর আমাকে প্রমাণ শেখাতে এস না।

মিঃ ব্যানার্জি। এই ছোঁড়া, জানিস্ কিছু তুই?

জমাদার। এজ্ঞে জানিও বটে জানি নাও বটে। যদি বলেন সাড়ী মুই নিয়েছি, তবে জানি না, আর যদি বলেন দুস্রা কেউ নিয়েছে কিনা তবে জানি বটে।

মিঃ ব্যানার্জি। সে কিরে! কে নিয়েছে?

জমাদার। কাল রাতে দিদিমণির গোসলখানায় ঝাড়ু দিয়ে ঘর যাব, সেই ঢুকে দেখি কি ডেরেইভর বাবু দিদিমণির বাক্স থেকে কি লিল, লাল পারা!

মিঃ ব্যানার্জি। বলিস কি! মিথ্যে কথা বলছিস না ত! নিতে দেখেছিস জগুকে?

সুনীতি দেবী। হাঁ গো হাঁ, ও জগুরই কাজ। বলিনি আমি তোমাদের, তখন থেকেই ত বল্‌ছি। মানুষ চিনতে আমার আর বাকী নেই।

মিঃ ব্যানার্জি। ডাক জগুকে।

[জগুর প্রবেশ]

জগু। আমাকে কি ডেকেছেন হুজুর?

মিঃ ব্যানার্জি। জমাদার বলছে কাল রাত্রে তোমাকে দিদিমণির সুটকেস্ থেকে লালরঙের কোনো কাপড় উঠিয়ে নিতে দেখেছে।

জগু। আমাকে! হায় ভগবান, হায় মা কালী! হুজুর বাহাদুর আপনি একজন বড় অফিসার হয়ে সামান্ত মেথরের কথায় আমাকে চোর বললেন! উঃ, কী লজ্জা, কী অপমান! ইচ্ছা করছে গঙ্গায় ডুবে মরি!

সুনীতি দেবী। তাই মর, আপদ চুকে যাক।

জগু। (সুনীতি দেবীর পা জড়াইয়া ধরিয়া) মা, আপনি শুদ্ধ আমায় সন্দেহ করেন! হায় রে, আজ যদি আমার নিজের মা থাকত!

সুনীতি দেবী। না, না, বাছা, ওঠ, পা ছাড়। দেখ তোমরা সবাই ভুল করছ। আমি তখন থেকেই বলছি জগু অমন কাজ কখনো করবে না। আমি ওকে খুব চিনি।

মিঃ ব্যানার্জি। তুমি সকলকেই খুব চেন। আমার মনে হয় ও জগুরই কাজ।

সৌম্য। ওকে পুলিসে দিন।

শীলা। না না, পুলিসের হাঙ্গামে আর দরকার নেই। দেখ জগু যদি নিয়ে থাক ত ফিরিয়ে দাও, আমরা আর কিছু বলব না, কি বল বাবা?

মিঃ ব্যানার্জি। আচ্ছা, বেশ!

জগু। ভদ্র লোকের ছেলে আমি, পেটের দায়ে চাকরি করি দিদিমণি। আপনি আমায় চোর ভাবলেন! তার চেয়ে (পকেট হইতে পেন্সিল কাটা ছুরি বাহির করিয়া)

এই নিন ছুরি নিন, দিচ্ছি এই গলা বাড়িয়ে, আমায় হত্যা করুন!

লীলা। (মিঃ ব্যানার্জির কাছে ঘেঁসিয়া) বাবা, ও অমন করছে কেন!

সৌম্য। থিয়েটার করবার আর জায়গা পাওনি, এখানে এসেছ থিয়েটার করতে! চলে এস আমার সঙ্গে...আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি ফিরে আসছি।

[জগুকে টানিতে টানিতে প্রস্থান করিলেন, বাহিরে মোটর ছাড়িবার শব্দ হইল]

মিঃ ব্যানার্জি। ওরা গেল কোথায়?

সুনীতি দেবী। এই দেখ, সৌম্য ছেলেমানুষ, কিছু না করে বসে!

(বিরদার প্রবেশ)

বিরদা। দাদাবাবুর সেই শিখ বেয়ারাটি সকাল থেকে বকর বকর করছে।

লীলা। কেন কি হয়েছে?

বিরদা। কি জানি দিদিমণি।

(হরি সিং এর প্রবেশ। বিপুল তাহার দাড়ি গোঁফ; মাথার মস্ত খুঁটির উপরার্দ্ধ পাগড়ীতে ঢাকা)

হরি সিং। সালাম হুজুর, সালাম মেম্ সাব, সালাম। (জোড় হাত করিয়া) কমিশ্‌নার সাহাব, মেরে নাল্‌সি হায়।

মিঃ ব্যানার্জি। কিয়া নালিস্?

হরি সিং। হুজুরে দেখিয়ে ম্যায় খানী দানী ঘরকা লড়কা হুঁ—

মিঃ ব্যানার্জি। কিয়া হুয়া?

হরি সিং। বাইয়ে মেম্ সাব মেরে মুল্‌ক্ পাঞ্জাব জিলা গুরদাসপুর—

সুনীতি দেবী। হাঁাঃ, এই সকালবেলা তোমার মুল্‌ক্ পাঞ্জাব জেলা গুরদাসপুর না গেলে আর চলছে কেন! চলুম এখুনি আর কি!

হরি সিং। মেরে পাঁচি পাঁচি বিঘা জমিন, পাঁচি পাঁচি গাই, পাঁচি পাঁচি ভঁইসা, কিয়া রোশনাই,—দিন মে রোশনাই, রাতমে রোশ্‌নাই,—আলকাট্রি সে জবর!

মিঃ ব্যানার্জি। আল্‌কাট্রি কৌন চিজ হায়?

হরি সিং। আল্‌কাট্রি নেহি মালুম আপকো? ঐ যো কাট্ বাত্তি, কাট্ পাঙ্খা (অঙ্গভঙ্গী সহকারে)—ঐ যো বিজলী বাত্তি উস্কো আল্‌কাট্রি বোলতী হায়।

বিরদা। (হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিল) ওমা, আল্‌কাট্রি কি রে মুখপোড়া শিখ, এলেক্‌টিরি, জানিস্ না! কি মুখ্‌খু রে তুই!

হরি সিং। মুরুখ্! নেহি জী, ম্যায় মুরুখ্ নেহি, ম্যায় তিনঠো পাশ হায়।

মিঃ ব্যানার্জি। হাঁ!

হরি সিং। হাঁ জী! ম্যায় একঠো পাশ হায় টেক্সীমে, আউর এক প্রাইভেট্ গাড্ডী মে, আর তিসরা পাশ লেরি মে। এই তিন পাশ। মেরে লাইসন্স্ ভি হায়।

লীলা। মস্ত পাশ। জান বাবা, হরি সিং আবার ইংলিস পোয়েট্রিও জানে। হরি সিং, সাহেবকো তুম ইংলিস্ পোয়েট্রি শুনাও ত।

হরি সিং। আপকী মেহেরবাণীসে মেম্‌সাব মেরে সভি কুছ্ কুছ্ মালুম হায়। শুনিয়ে হুজুর ইংলিস্ পোট্রি—

টুইংকেলে টুইংকেলে লিটিল সটার—
হা ভাই ভাণ্ডার ভাট্ ইউ আর।

মিঃ ব্যানার্জি। আচ্ছা, সব মালুম হুয়া। তো তোমরা নালিস কিয়া বাত্‌লাও।

হরি সিং। হুজুর, আপকা ড্রাইভার গাড্ডীকো সটার্ট্ দেনেকো ওয়াখ্‌ৎ হ্যাণ্ডিল্ নেহি মারতা, সেল্‌ফ্ লাগাতা, ম্যায় বোলা কি ভাই এয়্‌সা ঠিক্ নেহি হায়। বাস্ এত্নি বাৎ বোলা, ত ইসলিয়ে ও ম্যায়কো বহুৎ খারাব জবান্ সে গালি দিয়া। ম্যায় খানীদানী ঘরকা লড়কা, মিরা মোকান্ জিলা গুরদাসপুর মুল্‌ক্ পাঞ্জাব মে পাঁচি পাঁচি বিঘা জমিন—

মিঃ ব্যানার্জি। আবার আরম্ভ করলে রে! কি আপদ! আচ্ছা আচ্ছা, তুম বাকে সামনে বৈঠো।

হরি সিং। বহুৎ আচ্ছা হুজুর। ম্যায় যাতা হুঁ।

(প্রস্থান)

মিঃ ব্যানার্জি। আঃ, লোকটা কি বকতেই পারে! ওকে নিয়ে তোমরা চালাও কি করে?

শীলা। লড়ায়ে গিয়েছিল লোকটা, গুলির দাগও গায়ে আছে। ওর ওপর কেমন মায়া পড়ে গেছে।

[এমন সময় বাহিরে মোটর ফিরিয়া আসিল। জগুকে টানিতে টানিতে সোম্য প্রবেশ করিলেন]

সৌম্য। (লাল রঙের একটি সাড়ী বাহির করিয়া) এই নাও তোমার সাড়ী।

শীলা। ওমা ! এটাও নিয়েছে !

সুনীতি দেবী। সে কি! তুমি যেটা হারিয়েছিলে এটা সে সাড়ী নয়! কতগুলো সাড়ী হারিয়েছে তারও খোঁজ নেই? আচ্ছা মেয়ে যাহোক, বেশ!

মিঃ ব্যানার্জি। আহা, ওকে বোকো না, দুদিনের জন্যে এসেছে। যাও ত মা আমার, ভাল করে খুঁজে দেখে এস ত কখানা হারিয়েছে সব শুদ্ধ।

শীলা। এখানা আর সেইখানা বাবা, মোট দুখানা।

সৌম্য। এই হতভাগা! সে সাড়ীখানা কোথায়?

(জগু আর একখানা সাড়ী বাহির করিয়া দিল)

মিঃ ব্যানার্জি। স্বীকার করালে কি করে?

সৌম্য। পুলিস্ সাহেবের কাছে নিয়ে যাব বলে ভয় দেখাতেই বল্লে চলুন বার করে দিচ্ছি।

সুনীতি দেবী। কোথায় রেখেছিল?

সৌম্য। (ইতস্ততঃ করিয়া) বাজারের একটা স্ত্রীলোকের কাছে।

সুনীতি দেবী। ছিঃ ছিঃ জগু তোমার এই কাজ!

মিঃ ব্যানার্জি। এখুনি তুমি দূর হয়ে যাও।

জগু। মা—

সুনীতি দেবী। মা মা করো না, দূর হও।

জগু। মা, আমি কাল থেকে কিছুই খাই নি, সাড়ী দুখানা নিয়ে পর্য্যন্ত মনের মধ্যে আমার কি রকম যে হচ্ছে—

সুনীতি দেবী। দূর হও, দূর হও, এই দশটা টাকা নিয়ে দূর হয়ে যাও। (টাকা দিলেন)

মিঃ ব্যানার্জি। হাঁ হাঁ, ওকে টাকা দিও না, এতে ওকে প্রশ্রয়—দেওয়া হবে।

সুনীতি দেবী। যাক্ সে মরুক সে, কত টাকা কত দিকে যায়, আর ওর বিচার ভগবান করবেন। সাড়ী দুটো যে পাওয়া গেল এই ঢের।

জগু। মা আপনার দয়া চিরকাল মনে থাকিবে। চললাম মা (প্রণাম করিল; উঠিয়া যেমন প্রস্থানোদ্যত হইল, অমনি একজন পুলিস্ ইন্‌স্‌পেক্টার দরজার কাছে পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া হরি সিং। ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ ব্যানার্জি প্রভৃতিকে মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিল)

জগু। দোহাই হুজুর, আমাকে বাঁচান!

মিঃ ব্যানার্জি। (ইন্‌স্‌পেক্‌টারকে) কে আপনাকে খবর দিল?

হরি সিং। মায় দিয়া হুজুর।

[সকলে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ, জগু জলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল]

চতুর্থ অঙ্ক

[আদালত সংলগ্ন একটি ঘর, সেই ঘর দিয়া এজলাস্ ঘরে যাইতে হয়। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল পাতা, চতুর্দ্দিকে বেঞ্চ। একপাশে একটা আলমারিতে কি সমস্ত কাগজপত্র ঠাসা। আলমারিতে প্রতি খাঁজে ধূলা জমিয়াছে, ভিতরের কাগজগুলি হলদে হইয়া গিয়াছে।

এজলাস ঘর এই ঘরের ডানদিকে। এজলাস ঘর দেখা যাইবে না—কেবল এই দুই ঘরের মাঝখানে যে দরজা আছে তাহা দিয়া লোক যাতায়াত করিবে।]

উকীল। আজ দায়রা রয়েছে, বোধ হয় তোমার কেস্ আজ আর হবে না।

মক্কেল। আমার কেস্ যেদিনে সেদিনে আবার দায়রা রাখা কেন? রোজ রোজ কাজের ক্ষতি করে কাঁহাতক আসি বলুন?

উকীল। তা আমি কি করব বাপু!

[দক্ষিণদিকের দরজা দিয়া পেস্কারবাবু এই ঘরে আসিলেন]

পেস্কার। কোন্ কেস্ আপনার?

মক্কেল। ১৭ নম্বর ও, সি, অ্যাপীল। আমি হলাম অ্যাপীল্যান্ট্।

পেস্কার। ওঃ।

মক্কেল। আপনি ত পরম নিশ্চিতভাবে বললেন, 'ওঃ' পেস্কার মশাই, এদিকে আমার মামলা যদি আজ না ওঠে তাহলে আমি ত মারা যাই। অনেক দূর থেকে এসেছি।

পেস্কার। সকলেরই তাই।

(মক্কেল ও উকীল দৃষ্টি বিনিময় করিলেন)

মক্কেল। (পেস্কারের হাতে কিছু গুঁজিয়া দিয়া) আপনি একটু অনুগ্রহ করলেই আমার কেস্‌টি আজ শোনা হয়।

পেস্কার। নিশ্চয় দেখব! আপনি যখন অতদূর থেকে কাজের ক্ষতি করে এসেছেন!—এ কথা আগে বলতে হয়।

[ছয় সাত জন জুরারের প্রবেশ]

পেস্কার। আপনারা সবাই জুরার ত? যান, এজলাস ঘরে গিয়ে বসুন। এখনি দায়রা সুরু হবে।

একজন জুরার। দেখুন পেস্কারবাবু, আজ আমার একটু বিশেষ জরুরি কাজ আছে। আমাকে যদি বাদ দিয়ে দিতে পারেন!

পেস্কার। তা কি হয়! আইনে বাধবে যে!

ঐ জুরার। দেখুন, বিশেষ দরকার। ছেলেটাকে কুকুরে কামড়েছে।

পেস্কার। আপনাকে ত কামড়ায় নি।

ঐ জুরার। (পেস্কারের হাতে কিছু গুঁজিয়া দিয়া) দেখুন পেস্কারবাবু একটু দয়া করে।

পেস্কার। বিলক্ষণ! তা আর বলতে! আপনার ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে! কই এ কথা ত শুনি নি! আগে বলতে হয়! একটা কাগজে দরখাস্ত করে ঠিক করে রাখুন, রেহাই করে দেব।

আর একজন জুরার। এই যে বললেন আইনে বাধবে!

পেস্কার। কখন বললুম! কুকুরে কামড়ালে আর আইনে বাধবে না। যান, আপনারা আর গোলমাল না করে এজলাস ঘরে গিয়ে বসুন।

(জুরারগণ দক্ষিণদিকের দরজা দিয়া চলিয়া গেলেন)

[সৌম্যের প্রবেশ]

সৌম্য। ওঃ আপনি বুঝি পেস্কার? সেসন্‌স্ কেস্‌টা কখন হবে বলতে পারেন?

পেস্কার। জজ সাহেবের কাগজ সই করা হলে।

মক্কেল। তখন থেকে শুনছি কাগজই সই করছেন। এত কিসের কাগজ রে বাপু!

উকীল। চুপ চুপ, বেয়াদপি করো না।

সৌম্য। তাইত, তাহলে কি করা যায় এখন! পেস্কার বাবু, তা আমি কোথায় থাকব এতক্ষণ বলতে পারেন?

পেস্কার। আপনার যেখানে খুসি। এখানে এই বেঞ্চটায় বসতে পারেন ইচ্ছা করলে, আবার দাঁড়িয়ে পায়চারিও করতে পারেন।

সৌম্য। সাক্ষীদের বসবার কোনো ঘর নেই?

পেস্কার। আছে বই কি, ঐ বটগাছের তলায় ঐ যে টিনের ঘর দেখছেন, ঐ যে লোকটা তামাক খাচ্ছে বসে ঐখানে, ইচ্ছা করলে ওখানে গিয়েও বসতে পারেন।

সৌম্য। ঐখানে! উঁহুঃ!

উকীল। আপনি কি এই দায়রা মামলায় সাক্ষী আছেন আজ?

সৌম্য। হাঁ।

উকীল। যদি বেয়াদপি মাফ্ করেন, আপনার নামটি জিগেস করতে পারি কি সার?

সৌম্য। নিশ্চয় পারেন, সার। এই নিন আমার কার্ড নিন।

উকীল। (পড়িয়া) ও: বটে বটে, আপনিই এস্ রয় আই, সি, এস,—ও পেস্কার মশাই—

পেস্কার। (যোড়হস্তে) হুজুর এতক্ষণ বলেন নি কেন! আহা হুজুরের কত কষ্টই না হল! আমি কি আগে জানি ছাই! দেখ দিকি, কত কষ্টই না হল। আসুন হুজুর, জজসাহেবের খাস্ কামরায় বসবেন।

[পেস্কার ও সৌম্যের প্রস্থান]

মক্কেল। দেখলেন বাবু! যেমন শুনল আই, সি, এস্, অমনি ভিন্নমূর্ত্তি, 'আসুন হুজুর, আসুন হুজুর।' আর এতক্ষণ

বলছিল গাছতলায় ঐ তামাক খাওয়া লোকটার পাশে বসতে! দেখলেন!

উকীল। স্লেভ্-মেণ্টালিটি আর কাকে বলে! …… (ডানদিকের দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া) ঐ যে জজ সাহেব এজলাসে এসে বসেছেন।

মক্কেল। বসেছেন নাকি! তাহলে বোঝা যাচ্ছে আদালতে এবার কাগজের মড়ক হয়েছে, সই করবার মতন কাগজ আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

উকীল। চুপ চুপ, ও রকম কথা বলতে আছে! কোথাকার গেঁয়ো লোক হে তুমি!

[প্রথম জুরার বাহির হইয়া আসিলেন]

উকীল। কি মশাই, ছুটি পেলেন?

জুরার। হাঁ পেয়েছি।

উকীল। আপনারই ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে না?

জুরার। সাতপুরুষেও নয়। আসল কথাটি কি জানেন, জুরীর হাঙ্গাম ধাতে সয় না। সমন করে ধরে নিয়ে আসে, কি করি বলুন।

উকীল। এই কি প্রথম?

জুরার। না প্রথম কেন হবে। প্রথমবারে কালা সেজেছিলুম, জজসাহেব ছেড়ে দিলেন।

উকীল। বাঃ, আর দ্বিতীয় বার?

জুরার। বললাম মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে। হৈ হৈ করে সকলে বার করে দিলে।

উকীল। বটে, আপনার ত মশায় চমৎকার বুদ্ধি!

জুরার। তা আর বলতে! কাউকে বলে দেবেন না যেন! তৃতীয়বার বলেছিলুম আসামী আমার জ্ঞাতি ভাই হয়। আসামীর অস্বীকার জজসাহেব সন্দেহের চক্ষে দেখে আমায় ছেড়ে দিলেন। আর এবার ছেলেকে কুকুরে কামড়াল।

উকীল। এত হাঙ্গামের দরকার কি, ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিলেই ত হয়।

জুরার। হয়, তবে ডাক্তার বেটাকে আট গণ্ডা পয়সা দিতে হয়। তার উপর পেক্সার আছে।

উকীল। তা বটে। তবে আজকের কেস্‌টা ছিল মজার।

জুরার। হাঁ, শুনছিলাম বটে কমিশানার সাহেবের মেয়ের সাড়ী চুরি করেছে তাঁর ড্রাইভার। তা সেসনে দিলে কেন?

উকীল। লোকটা দাগী চোর। এর আগেও চুরি করে জেল খেটেছে।

জুরার। আইনের কথা আপনারাই ভাল বোঝেন। এমন লোককে মানুষ ড্রাইভার রাখে!

উকীল। জেনে শুনে কি আর রেখেছে!

জুরার। তা বটে। আচ্ছা তাহলে আসি।

[প্রস্থান]

[সৌম্য ও একজন দারোগার প্রবেশ]

সৌম্য। কি রকম হচ্ছে দারোগা বাবু?

দারোগা। ভালই হচ্ছে সার। কেস ত খুব ষ্ট্রং—আসামীর উকীল জমাদার ছোঁড়াকে খুব জেরা করছে।

সৌম্য। জেরা করছে নাকি! জেরাকে আমি বড় ভয় করি।

উকীল। দেখছেন না সার, আদালতের ভেতর আজ কী ভিড়! আপনাকে জেরা করবে কিনা, তাই সবাই শুনতে এসেছে।

সৌম্য। এঁ্যা—তাই নাকি! (ঘাম মুছিয়া) আচ্ছা।

দারোগা। এর পরই আপনার সাক্ষ্য।

সৌম্য। এর পরই আমার! সর্ব্ব—, আচ্ছা।

[দারোগার প্রস্থান]

উকীল। এই বুঝি আপনার প্রথম সাক্ষী দিতে আসা, সার? (সৌম্য ঘাড় নাড়িলেন) প্রথম অনেকের ভয় ভয় করে, কারো কারো কাছা খুলে যায়, কেউ বা নিজের নাম আর কিছুতেই মনে করতে পারে না। আমরা রাতদিন দেখছি কি না!

সৌম্য। নিজের নাম মনে করতে পারে না, কি আশ্চর্য্য! (তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একটা কার্ড লইয়া নিজের নাম পড়িতে লাগিলেন)।

[দারোগা ত্বরিৎ এজলাস ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল]

দারোগা। আসামী দোষ স্বীকার করেছে, আর আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে না সার!

সৌম্য। তাই নাকি, সত্যি! যাক্ বাঁচা গেল। (বিনা কারণে দারোগার সহিত ঘন ঘন করমর্দ্দন করিতে লাগিলেন)।

দারোগা। জজসাহেব জুরীকে চার্জ্জ দিচ্ছেন, এখুনি তাঁরা এই ঘরে আসবেন।

সৌম্য। এই ঘরেই জুরীরা retire করে বুঝি?

(দারোগা ঘাড় নাড়িল)

[জজের চাপরাশি আসিয়া সকলকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিল। সকলে বাহির হইয়া গেলে এজলাসে যাইবার দরজা ছাড়া আর সমস্ত দরজা জানালা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিল। খানিকপরে জুরাররা আসিয়া পৌঁছিলে এজলাসে যাইবার দরজাও বন্ধ হইয়া গেল]

ফোরম্যান্। আসুন, আগে আমাদের বিলগুলো লিখে ফেলা যাক। পরে আর সময় পাওয়া যাবে না।

১ম জুরার। আপনারা যখন মকরদামার নোট লিখছিলেন, আমি তখনি নিজের কাজ গুছিয়ে রেখেছি।

২য় জুরার। দেখুন ফোরম্যান্ বাবু, এসেছি থার্ডক্লাসে, তা সেকেণ্ড্ ক্লাসের ভাড়ার বিল করব ত?

ফোরম্যান্। নিশ্চয়, এ ত জানা কথা। যাক, আপনাদের সকলের বিল ত লেখা হয়ে গেল, এখন আসুন মামলাটা একটু আলোচনা করা যাক।

১ম জুরার। চুরির কেসে জুরীর বিচার কেন? ছাগল চুরি, গোরু চুরি, সাড়ী চুরি এসবের বিচার করে অনাহারি হাকিম। আমরা হলাম ফাঁসীর হাকিম, দ্বীপান্তরের হাকিম, আমাদের কাছে এর বিচার কেন?

২য় জুরার। আসামী বেটা হল দাগী চোর। বেটার চেহারাটা দেখলেন না! এর আগে ত বার তিনেক জেল খেটেছে, দারোগা চুপি চুপি আমাদের বলছিল, শোনেন নি বুঝি? তাই দায়রার বিচার। শাস্তি বেশী হবে।

ফোরম্যান্। শুনুন, শুনুন, জজসাহেব বলে দিয়েছেন, মনে নেই, আমাদের বিচার করতে হবে আসামী সাড়ী দুটো চুরি করেছে কি না—শুধু এই টুকু মাত্র। সে আগে কি করেছে না করেছে তা আমাদের ধর্ত্তব্য নয়।

১ম জুরার। আরে রাখুন মশায় জজসাহেবের বক্তৃতা। ঘটনা সম্বন্ধে বিচারের মালিক আমরা, জজ নয়।

২য় জুরার। এই সোজা কথাটি বুঝছেন না ফোরম্যান্ বাবু, বেটা যখন এর আগে তিন তিনবার চুরি করেছে ম—তখন এ চুরিও না করলে করল কে? চোরের ধ চুরি করা।

৩য় জুরার। (নাকে নস্য ঠাসিয়া) যা বলেছেন মশা "যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ—"

৪র্থ জুরার। এমন লোককে ড্রাইভার রাখে! ছিঃ ছি

১ম জুরার। গ্রহের ফের! এমনি হয়েছিল আমা ইস্কুলের একবেটা মালীর বেলায়। গল্পটা বলি শুনুন—

২য় জুরার। আমার নিজের বেলা কি হয়েছিল জা না বুঝি! শুনুন তবে, সে ভারি মজা। আমার চাকরটা

ফোরম্যান্। ওসব কথা এখন যেতে দিন। আমা প্রথম দেখতে হবে সাড়ী দুখানা চুরি গিয়াছিল কি না—

১ম জুরার। যাবে না চুরি! অমন করে খোলা ব ফেলে রাখা কেন?

২য় জুরার। গরীবের সামনে প্রলোভন ছড়িয়ে রাখা

৩য় জুরার। কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখান।

৪র্থ জুরার। মেয়েটা যেন হ্যাকা—

১ম জুরার। বড়লোকের নভেলপড়া মেয়ে আর ভাল হবে!

২য় জুরার। কখানা সাড়ী চুরি গেছে তার হুঁস্ই নে শুনলেন না সরকারি উকীলের বক্তৃতা—

৩য় জুরার। বুঝছেন না, বিস্তর আছে, দুখানা গে বা কি, আর থাকলেই বা কি!

৪র্থ জুরার। টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। অথচ ব লোক না খেয়ে মরছে।

৩য় জুরার। (নস্য লইয়া) যা বলেছেন। "অহন্যহ ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ং"।

২য় জুরার। আহা আসামী বেচারা গরীব লোভে পড়ে যদি নিয়েই থাকে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

১ম জুরার। আর সে নিজের জন্যে নেয় নি, নি ছিল তার এক ইয়ের জন্যে—

২য় জুরার। তার মোটিভ্‌টা দেখতে হবে ত! আ গরীব বেচারা।

৩য় জুরার। তার ওপর সে কি বললে শুনলেন ত? বললে জামাই বাবু একটা ফুল চুরি করে তাঁর স্ত্রীকে উপহার দিলেন দেখে তারও সাড়ী দুখানা নিয়ে গিয়ে তার ইয়েকে উপহার দেবার কথা মনে হল।

৪র্থ জুরার। তবেই দেখুন, তার চুরির জন্তে জামাই বাবুই দায়ী।

ফোরম্যান। আপনারা বলছেন কি! সে হল সামান্ত ফুল আর এ হল দামী সাড়ী।

১ম জুরার। ওর কাছে ফুলের যা দাম, এর কাছে সাড়ীরও তাই দাম।

২য় জুরার। এও চুরি, সেও চুরি।

৩য় জুরার। তার জন্তে জামাইটার ত কিছু হল না।

৪র্থ জুরার। বড় লোকের সাতখুন মাফ্।

১ম জুরার। আইনের চোখে গরীব বড়লোক প্রভেদ করে না।

২য় জুরার। আর আমরা হলুম বিচার করবার মালিক।

১ম জুরার। আমার মতে আসামী নির্দ্দোষ।

২য়, ৩য় ও ৪র্থ জুরার। আমাদেরও সেই মত।

ফোরম্যান্। কিন্তু আপনারা ভুলে যাচ্ছেন আসামী নিজে দোষ স্বীকার করেছে।

১ম জুরার। ওহো তাও তো বটে!

২য় জুরার। বেটা একটা আস্ত গাধা! কেন স্বীকার করতে গেলি—

৩য় জুরার। বেটার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!

ফোরম্যান্। তাহলে আপনাদের সবাইএর মত যে আসামী দোষী?

অন্তান্ত সকলে। অগত্যা তাই বলতে হবে বই কি!

[জুরারগণ এজলাসে চলিয়া গেল]

[চাপরাশি দরজা জানালা খুলিয়া দিল]

(উকীল ও মক্কেলের পুনঃ প্রবেশ)

মক্কেল। এইবার আমার মামলাটা হবে ত বাবু?

উকীল। হাঁ হাঁ—তুমি যে তখন থেকে ছটফট করছ।

মক্কেল। দেখুন বাবু জজ সাহেবকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন, সবজজ যে বলেছে বাদীর রাস্তার আমি কোনোদিন হাঁটি নি ওটি একেবারে মিছে কথা—এই দেখুন না, এই যে আমার জুতার সুকতালা ক্ষয়ে গেছে এত, কি করে?—বাদীর রাস্তা হেঁটে হেটেই না? বেশ করে আপনি বুঝিয়ে দেবেন।

[সৌম্য ও সরকারী উকীলের প্রবেশ]

সরকারী উকীল। (হাসিয়া) আসামীর চার বচ্ছর জেল হয়ে গেল সার।

সৌম্য। চারবচ্ছর!...সামান্ত দুখানা সাড়ীর জন্তে চারবচ্ছর জেল! মনটা খারাপ হয়ে গেল!

[হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় জগুকে সিপাহীরা লইয়া যাইতে লাগিল]

জগু। মনটা খারাপ হয়ে গেল! আহা কি দয়ার শরীর! আপনিও গেছলেন যে পথে আমিও গেছলুম সেই পথে। আমার হয়ে গেল শ্রীঘর আর আপনার ভাগ্যে বাসর ঘর!—একেই বলে একযাত্রায় পৃথক ফল।

(যবনিকা)

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার



রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' কবিতার ভূমিকা

অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্ত্তী এম্‌-এ

এই কবিতাটি কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের "মানসী" নামক কবিতাগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাটির মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন কবি-চিত্তের যে অপূর্ব্ব রসঘন মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছে তাহা তুলনাহীন। কবি রবীন্দ্রনাথ নিসর্গকে কেবল মাত্র দেখেন নাই, ইহাকে অনুভব করিয়াছেন। নিসর্গ সৌন্দর্য্যে সমাহিত-চিত্ত কবি সৌন্দর্য্যের অন্তরালে কি সত্তা আছে তাহা অনুভব করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। কবির নিকট এই সৃষ্টি শুধু সুন্দর নয় রহস্যময়ও বটে। বর্ত্তমান জীবনে কবি এই যে সৃষ্টির বিচিত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন ইহাত শুধু তাঁহাকে মুগ্ধই করে নাই, সেই সঙ্গে কত জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতি তাঁহার মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছে, এই সৃষ্টি তাহার বর্ত্তমানের পরিদৃশ্যমান বিচিত্ররূপ দিয়াই কবি চিত্তকে মুগ্ধ করে নাই, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের মধ্যে বহু জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতিরেখার রূপ-সমারোহ বহিয়া আনিতেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বলাকা'র একটি কবিতায় বলিয়াছেন,

"তাই যা দেখিছ তারে ঘিরিছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভিড়।"

এই সৃষ্টির বর্ত্তমান সৌন্দর্য্য-সত্তারই তাহা হইলে কবিকে বিস্মিত করে নাই, অধিকন্তু তাঁহার মনের অবচেতন লোকে যে সমস্ত স্মৃতি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিয়া কবিকে রহস্যময়ের পূজারী করিয়াছে।

তাই আজি দক্ষিণ পবনে
ফাল্গুনের ফুল গন্ধ ভরিয়া উঠেছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,—
বহু শত জনমের চোখে চোখে কানে কানে কথা।

এই ভাবে এই সৃষ্টির বিচিত্র সৌন্দর্য্য কবির মনকে অতীতের পানে উধাও করিয়া লইয়া যায়। মহাকবি কালিদাসও দুষ্যন্তের মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন,

রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ পূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি॥

আজ এই বৈজ্ঞানিক জগতে বাস করিয়া মানুষ আর সৃষ্টিকে তাহার সহজ সরল বাহিরের রূপের ভিতর দিয়া দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেনা। সৃষ্টিতত্ত্বের তথা জীব-পর্য্যায়ের অভিব্যক্তির জটিলতা মানুষের মনকে সৃষ্টি এবং মানব জীবনের সহজ সরল রূপের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম নয়। এই বৈজ্ঞানিক জগতে বাস করিয়া আমরা বর্ত্তমানকেই খণ্ডভাবে দেখিতে পারিনা, সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় অনন্ত প্রবহমান অখণ্ড সৃষ্টি প্রবাহের কথা। কবি রবীন্দ্রনাথের উপরও এই অভিব্যক্তিবাদের ছাপ কম পড়ে নাই; তাই তাঁহার নিকট আমাদের বর্ত্তমান জীবন একটি খণ্ড সত্তামাত্র নহে—ইহা একটি অখণ্ড জীবন-প্রবাহের ক্রমধারা। ইহার বর্ত্তমান অস্তিত্বকে তিনি অখণ্ড সৃষ্টিধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। এই সৃষ্টিও সেইজন্ত কবির নিকট চির রহস্যময়। কিন্তু ইহার সবখানি ত কবি দেখিতে পান নাই—যাহা দেখিয়াছেন তাহা যে খণ্ডমাত্র; তাহার সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছে যে যুগ যুগান্তরের স্মৃতি-বাহিনী! এই বস্তু জগতের অসংখ্য বিচিত্র আনন্দ বেদনা কবিচিত্তে অহরহ যুগ যুগান্তরের লক্ষ স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে। নারীর সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ শোভা কোনদিনই কবিচিত্তকে বর্ত্তমানের সসীমতার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। কবির যে "নাল্পে সুখমস্তি" তাঁর যে অল্পে, অংশে সুখ নাই! সীমার মধ্যে খণ্ডের মধ্যে

তাঁহার চিত্ত যে ব্যাকুল ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠে! তাই বর্ত্তমানের সহিত অতীতকে, খণ্ডের সহিত অখণ্ডকে, রূপের সহিত অরূপকে যুক্ত করিয়া না দিতে পারিলে যে তাঁর চিত্ত দ্বিধায় কুণ্ঠায় ম্লান হইয়া পড়ে। সেই জন্য বর্ত্তমান জীবনের প্রিয়াকে দেখিয়াও তাঁর মনে হয়,

"আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদি কালের আদিম উৎস হতে ॥

নারীকেও তিনি প্রয়োজনের সসীম বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিয়াই দেখিয়াছেন। উর্ব্বশীকে তিনি সমস্ত জাগতিক সম্বন্ধের অতীতরূপে অখণ্ড শাশ্বত নারীভাবেই দেখিয়াছেন। এই সুন্দরী বসুন্ধরা সম্বন্ধেও কবির ঐ একই প্রকার মনোভাব। তিনি বলেন,

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃ মণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধরি'।"

সেই একই কথা,—সেই বর্ত্তমানকে অতীতের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখা,—সেই খণ্ডকে অখণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া উপভোগ করা। কিন্তু ইহাতেও কবিচিত্ত সুস্থির হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান জীবনের খণ্ড ধারাকে অতীতের অনন্ত সৃষ্টিধারার সহিত সংযুক্ত করিয়াও কবি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠিল—এই সৃষ্টি ধারা কি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে? অনন্তকাল ধরিয়াই কি ইহা চলিতে থাকিবে? ইহার কি কোন আদিও নাই, অন্তও নাই? তাহা যদি হয় তবে এ সৃষ্টির কোন অর্থ ই থাকেনা। কবি বলেন যে এই সৃষ্টি একটি অখণ্ড সত্তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং একদিন এই অখণ্ড সত্তায় পৌঁছিয়াই নিজকে সার্থক করিয়া তুলিবে। সৃষ্টির মধ্যে এই যে এত খণ্ডতা এত বৈচিত্র্য, এত বিচ্ছিন্নতা ইহার মূলে একই অখণ্ড সত্য বিরাজ করিতেছে। আমরা সকলেই সেই এক পরম সত্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছি। তাইত আমরা পরস্পরকে এত ভালবাসি, তাইত প্রকৃতির খণ্ড সৌন্দর্য্য আমাদিগকে এত মুগ্ধ করে। আমরা যে একদিন একের মধ্যে ছিলাম আজ বহু হইয়াছি। তাই জীবনের নিবিড়তম রস মুহূর্ত্তে কবির চিত্ত সুদূরতম অতীত স্মৃতির ছায়াপথ ধরিয়া আবার সেই আদিমতম জন্মক্ষণে ফিরিয়া যাইবার জন্য মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠে। কবি তাই আকুল আগ্রহে উচ্ছ্বাসভরা ভাষায় বলেন,

"আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব্বমাঝে, যেথা হ'তে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষসুরে, উচ্ছ্বসি' উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে প্রবাহি' যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু।"

কিন্তু এই যে সৃষ্টিধারার উৎসমুখ, এই যে বিরাট গোপন রস যজ্ঞশালা, যেথান হইতে এই বিচিত্র রস ধারার অজস্র পরিবেশন যুগ যুগ ধরিয়া চলিতেছে, সেই স্থানের সন্ধান আমাদের কে বলিয়া দিবে? ইন্দ্রিয় গ্রাম সেইখানে পৌঁছিতে পারে না। জীব-পর্য্যায়ের বিবর্ত্তন পথে আমরা সেই আদি উৎসমুখ হইতে বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছি, সেখানে ফিরিবার আর উপায় নাই। কেবল কল্পনার সাহায্যে আমাদের মন মাঝে মাঝে সেই কল্পরাজ্যে উধাও হইয়া যায়। কবি চিত্ত তখন আকুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে,—

"জননী লহ গো মোরে
সঘন বন্ধন তব বাহুযুগে ধ'রে
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের,
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপনপুরে
আমারে লইয়া যাও রাখিও না দূরে।"

কিন্তু সেখানে আর ফিরিয়া যাওয়া যায় না। সেখানে ফিরিয়া যাইতে হইলে যে ক্রম বিবর্ত্তনের সমস্ত স্তরগুলিকে আবার ফিরিয়া পার হইয়া যাইতে হয়! জড়ত্ব হইতে চৈতন্যের পর্য্যায়ে চলিয়া আসিবার পথে বিবর্ত্তনের যে সমস্ত বিচিত্র স্তর পার হইয়া আসিতে হইয়াছে সে সকলকে নিশ্চিহ্ন

করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু তাহা ত সম্ভব নয়, চৈতন্ত হইতে জড়ে ফিরিয়া যাওয়া যে অসম্ভব।

হঠাৎ কবির মনে পড়িয়া যায় যে অহল্যা ত এক নিমিষে চৈতন্ত হইতে জড়ে পরিণত হইয়াছিলেন! তিনি জীব পর্য্যায়ের ক্রম বিবর্ত্তন পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময় গৌতমের অভিশাপে এক মুহূর্ত্তে বিবর্ত্তন ধারার বিপরীত গতির চরমতম সীমায় উপনীত হইয়া জড় পদার্থে পরিণত হইয়াছিলেন! এই ত একজনকে পাওয়া গিয়াছে যিনি সৃষ্টির জড়তম পদার্থ হইতে হঠাৎ জীবপর্য্যায়ের চেতনতম সত্তায় ফিরিয়া আসিয়াছেন! তবে ইঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্ না কেন সেই আদি উৎসমুখ, জননীর সেই গোপন অন্তঃপুর যেখান হইতে সৃষ্টিধারা প্রথম উৎসৃত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানের সংবাদ তিনি কিছু বলিতে পারেন কিনা। তাই কবি আকুল আগ্রহে অহল্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"আছিলে বিলীন
বৃহৎপৃথ্বীর সাথে হ'য়ে এক দেহ
তখন কি জেনেছিলে তার মহা স্নেহ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্য্যে মৌনমূক সুখ দুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মত
সুপ্ত আত্মা মাঝে?"

ধরিত্রীর সদ্যোজাতা কুমারী অহল্যা আজ চৈতন্তময় সত্তায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান পরিচিত জগতকে তিনি যুগ যুগান্তরের সংস্র স্মৃতির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখিতেছেন। তাই যখন 'হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার' তখন অহল্যার হৃদয়

কোন দূর কাল ক্ষেত্রে চলে গেছে একা
আপনার ধূলিলিপ্ত পদচিহ্ন রেখা
পদে পদে চিনে' চিনে'।

সুতরাং এই বিশ্বপ্রকৃতি অহল্যার নিকট এক বিস্ময়ের বস্তু, একটি বিশেষ রহস্যের আধার হইয়াছে। কবি তখন বলেন,—

"তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয়,
দোঁহে মুখোমুখী। অপার রহস্যতীরে
চির পরিচয় মাঝে নব পরিচয়।"

হেরম্ব চক্রবর্ত্তী



প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

একাঙ্ক নাটিকা

প্রথম দৃশ্য

সগানারেলের বাড়ী ; সম্মুখে রাজপথ।

সগানারেল। (নেপথ্যে) এই ফিরে এলাম বলে; সাবধানে থেকো। বাইরের দুয়োর বন্ধ করে দাও এখনি; কাজকর্ম্ম যেমন চলছে তেমনি চলুক। যদি কেউ টাকা দিতে আসে চট্ করে জেরোনিমোর বাড়ীতে আমাকে দিয়ে এসো, আর যদি কেউ টাকা চাইতে আসে, বলে দিও আমি বাইরে গিয়েছি, আজ আর ফিরব না।

জেরোনিমো। (শেষ কয়টি কথা শুনতে শুনতে প্রবেশ) বাঃ চাকরদের খাসা উপদেশ দেওয়া হচ্ছে ত।

সগানারেল। এই যে জেরো। বেশ হয়েছে, তোমারই বাড়ী যাচ্ছিলাম। চল চল ঘরে চল।

জেরোনিমো। কেন? হঠাৎ এত অনুগ্রহ?

সগানারেল। ভাই তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে; ঘরে চল।

জেরোনিমো। এইখানেই শুনি না কেন?

সগানারেল। তবে একটু নিরালায় এসো ভাই। কাজটা একটু জরুরী কি না, তাই ভাবলাম একবার বন্ধু লোকের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

[দুইজনে দুয়ারের এক পাশে সরে এসে]

জেরোনিমো। এত লোক থাকতে আমার মত জানতে চাও এ জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু ব্যাপার কি?

সগানারেল। দাঁড়াও; আগে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আমাকে খুসী করবার জন্য কিছু বলবে না; তোমার স্পষ্ট কথাই শুনতে চাই।

জেরোনিমো। বেশ, তোমার যা ইচ্ছে।

সগানারেল। তা হবে না, প্রতিজ্ঞা কর।

জেরোনিমো। করলাম। কিন্তু এখন ব্যাপার কি বল।

সগানারেল। (একটু সলজ্জভাবে) আমার বিয়ে করা সম্বন্ধে তোমার কি মত?

জেরোনিমো। কার বিয়ে? তোমার?

সগানারেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার।

জেরোনিমো। দাঁড়াও, আগে একটা কথার উত্তর দাও।

সগানারেল। কি?

জেরোনিমো। তোমার বয়স কত?

সগানারেল। আমার?

জেরোনিমো। হ্যাঁ।

সগানারেল। (হেসে) সত্যি, জানি না ভাই।

জেরোনিমো। খুব কম করে হলেও তুমি বাহান্ন কি তিপ্পান্ন পার হয়ে গিয়েছ।

সগানারেল। কে, আমি? মোটেই না।

জেরোনিমো। তা' হলে যখন প্রতিজ্ঞাই করেছি, খোলাখুলিই বলি যে বিয়ে করা তোমার সাজে না। বিয়ের স্বপ্ন দেখতেও তোমায় আমি বারণ করি। এতদিন এমনি থেকে এখন যদি দুনিয়ার সব চেয়ে ভারী বোঝাটা সাধ করে কাঁধে তুলে নাও, তাহলে তোমাকে নিতান্তই নির্ব্বোধ ভাবব।

সগানারেল। (ঈষৎ রেগে) আর আমি তোমাকে বলে রাখছি যে বিয়ে আমি করবই। যাকে বিয়ে করব

Molièreএর L' Amour Médecinএর ছায়া নিয়ে

ঠিক করেছি তাকে বিয়ে করা মোটেই বোকামীর কাজ হবে না।

জেরোনিমো। ও! তাহলে স্বতন্ত্র কথা। তুমি ত আমাকে সে কথা বল নি।

স্গানারেল। মেয়েটিকে আমার খুব ভালো লাগে। নিজের চেয়েও আমি তাকে বেশী ভালোবাসি।

জেরোনিমো। নিজের চেয়েও? বল কি!

স্গানারেল। নিশ্চয়ই। তার বাবাকেও বলেছি

জেরোনিমো। মেয়েটি রাজী হয়েছে?

স্গানারেল। আলবৎ, আজ রাত্রেই বিয়ে, সব ঠিক ঠাক।

জেরোনিমো। ওঃ তবে ত আমার আর কিছুই বলবার নাই, স্বচ্ছন্দে বিয়ে কর।

স্গানারেল। এখন কি সব ভেঙে দিতে বল? বিয়ের চিন্তা করাও আমার অন্যায়? বয়সের বিচার করতে যেয়ো না, আমার দিকে চেয়ে দেখ। পঁচিশ বছরের ছোকরা কি আমার চেয়ে বেশী তাজা? আমাকে কোনও দিন বাতে ভুগ্‌তে দেখেছ? লাঠি হাতে কি হাঁপাতে হাঁপাতে আমাকে কোনও দিন সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা করতে হয়েছে?

জেরোনিমো। সত্যি, আমারই ভুল হয়েছিল। তুমি বিয়ে কর। তোমার বিয়ে করাই উচিৎ।

স্গানারেল। আগে আমি বিয়ে করতে ভয় পেতাম কিন্তু এখন এ কাজ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। একটা স্ত্রী থাকলে সময়ে অসময়ে একটুখানি আদর যত্ন করবে, একটু দেখবে শুনবে। আর তা ছাড়া যদি চিরকাল কুমারই থাকি, পিতৃপুরুষের বংশ যে একেবারে লোপ পাবে।

জেরোনিমো। বাস্তবিক! এর চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে। যত শীঘ্র পার বিয়ে কর।

স্গানারেল। সত্যি তোমার এই মত?

জেরোনিমো। নিশ্চয়ই, তিন সত্যি।

স্গানারেল। তোমার মত বন্ধুর এই কথা শুনে ভারী আনন্দ হচ্ছে।

জেরোনিমো। যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তিনি কে?

স্গানারেল। ডোরিমেন।

জেরোনিমো। ডোরিমেন? বেচারী ডোরিমেন?

স্গানারেল। হ্যাঁ।

জেরোনিমো। এলক্যান্টরের মেয়ে?

স্গানারেল। হুঁ।

জেরোনিমো। লড়ুয়ে এল্‌সিয়াডিসের ভগ্নী?

স্গানারেল। বাস্।

জেরোনিমো। খাসা!

স্গানারেল। কেন, কেন, তুমি কি বল?

জেরোনিমো। কিছুই না। চমৎকার। চট্ করে সেরে ফেল।

স্গানারেল। কেন, ভালো মানাবে না?

জেরোনিমো। নিশ্চয়ই মানাবে। আর দেরী করো না।

স্গানারেল। তোমার কথা শুনে আমার বুক ফুলে উঠছে। তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। আজ রাত্রে আমার বিয়েতে তুমি এসো ভাই।

জেরোনিমো। আলবৎ। (স্বগতঃ) ডোরিমেন। স্গানারেল আর ডোরিমেন। সতেরো আর ভিপ্পান্ন। চমৎকার।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডোরিমেনের পিতৃগৃহের বারান্দা

স্গানারেল। ডোরি, ডোরি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ ডোরি?

ডোরিমেন। বাজারে যাচ্ছি।

স্গানারেল। (ব্যাকুল ভাবে) ডোরি, এতদিনে এবার আমাদের সব সাধ মিটবে, না? আর তোমার কোনও কথা শুনছি না। এবার যা খুসী হবে তোমাকে নিয়ে তাই করব তুমি কিছু বল্‌তে পাবে না। তোমার আনন্দ হচ্ছে না ডোরি?

ডোরিমেন। হচ্ছে না? নিশ্চয় হচ্ছে; চূড়ান্ত হচ্ছে। বাবার কাছে এতদিন ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে হত। কতদিন ভেবেছি কবে একটু হাত পা নেড়ে ইচ্ছে মত চলে

ফিরে বেড়াব, কে এসে আমার বাবার ঘরের বাঁধন খুলে দেবে—ভাগ্যি তুমি এলে। এবার আমি স্বাধীন, এবার আমি হাওয়ার পরী। তুমি বুদ্ধিমান্, আমার কথা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। এতদিন বাঁধা ছিলাম, এবার সুদ্ শুদ্ধ আদায় করে নেব। গালফুলো লোক আমার ভালো লাগে না, সত্যি বলছি খুঁত খুঁতে স্বামী থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। একলা আমি একদণ্ড থাকতে পারি না। হাসি, নাচ গান, আমোদ-প্রমোদ আমার বড্ড ভালো লাগে—স্ফূর্ত্তি আমার চাইই। তোমার সঙ্গে আমার খু-উ-ব ভালো বন্‌বে। তোমার কোনও কাজে আমি বাধা দেব না আর আমাকেও তুমি—ও কি, তোমার কি হল ?

স্গানারেল। (হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে) কিছু না, মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল।

ডোরিমেন। ও কিছু না। বুড়ো বয়সে ও রকম হয়ে থাকে। যাক্ আমি বাজারে যাই। নূতন একটা পোষাক দেখে এসেছি কিনতে হবে। "বিল্" গুলো তোমার কাছে পাঠাতে বলে দেব, টাকা দিয়ে দিও। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

জেরোনিমো। এই যে স্গানারেল, তোমাকেই খুঁজছিলাম। তোমার ভাবী কনের জন্যে একটা হীরের আংটি চাই না ? একজন লোক খাঁটী—

স্গানারেল। না, না, এখন কিছু তাড়াতাড়ি নাই।

জেরোনিমো। (সবিস্ময়ে) অর্থাৎ ?

স্গানারেল। এখন কয়েকটা নতুন কথা মনে হচ্ছে জেরো। বিয়ের বিষয় আর একটু ভেবে দেখতে হবে আর তাছাড়া গত রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি এক বিরাট্ সমুদ্রের ওপর আমি ভেসে চলেছি, ছোট্ট একটা জাহাজে, হঠাৎ—

জেরোনিমো—আমার একটু কাজ আছে ভাই; আর স্বপ্ন জিনিষটা আমি ঠিক বুঝি না কিনা। তোমার বাড়ীর কাছেই ত দুজন পণ্ডিত থাকেন, তাঁদের কাছে একবার যাও না কেন। আমি যাই ভাই। [প্রস্থান]

স্গানারেল। ঠিক্ ঠিক্ একবার পণ্ডিতদের কাছে যাই।

চতুর্থ দৃশ্য

প্যান্‌ক্রে নামে পণ্ডিতের বাড়ী। পণ্ডিত মহাতার্কিক। বাড়ীতে পা দিয়েই নেপথ্যে শোনা গেল—

যাও, যাও, একটা কথা বোঝ না, আবার তর্ক করতে আসা। নিয়ম জানো না, ন্যায় মানো না, দর্শনে তোমার কি অধিকার ?

স্গানারেল। পণ্ডিত মশাই।

প্যান্‌ক্রে। (বাইরে এসে, কিন্তু ঘরের ভিতরে দৃষ্টি রেখে) নিশ্চয়ই ; আমি বলেছি, বলছি ও বলব যে তর্কে তোমার কোন অধিকার জন্মায় নি। এরিষ্টটলের বিচারে প্রমাণ করে দেব তুমি অবোধ, অবোধ্য, অবধ্য, অবাধ্য।

স্গানারেল। পণ্ডিত মশাই।

প্যান্‌ক্রে। (পূর্ব্ববৎ) তর্ক করতে আসার স্পর্দ্ধা আছে কিন্তু তর্কের রীতি শেখ নি।

স্গানারেল। (খুব জোরে) পণ্ডিত মশাই।

প্যান্‌ক্রে। (পূর্ব্ববৎ) কোনও পুঁথিতে দেখাতে পার এমন কথা ?

স্গানারেল। (আরও জোরে) প-ণ্ডি-ত মশাই।

প্যান্‌ক্রে। আসুন্, আসুন্, জয়োঽস্তু।

স্গানারেল। আমি—

প্যানক্রে। (মুখ ফিরিয়ে) তোমার পূর্ব্বপক্ষ কল্পিত, উত্তর পক্ষ অসম্ভব, আর সিদ্ধান্ত অহেতুক।

স্গানারেল। আমি বলছি—

প্যানক্রে। অর্ব্বাচীন, শাস্ত্র মানো না, তোমার সহিত তর্ক মহাপাপ।

স্গানারেল। (ভীষণ ভাবে) পণ্ডিত অগ্নিশর্ম্মা, আপনার ক্রোধের কারণটি জানতে পারি কি ?

প্যানক্রে। অবশ্য ; এক নির্ব্বোধ অবোধ্য এক তর্ক উত্থাপন করেছিল, অদ্ভুত, অসম্ভব, অসংবদ্ধ।

সৃগানারেল। কেন, কি?

প্যানক্রে। (বিমর্ষ ভাবে) কি নয়? কলি, ঘোর কলি। দেশে রাজা নাই, কে দেখবে বলুন।

সৃগানারেল। আরে ব্যাপারটাই বলুন না।

প্যানক্রে। মানুষ কখনও ভূতের মত হতে পারে? ভূতের আকারের মত হতে হবে কারণ—

সৃগানারেল। (হেসে) তাই হোক্। আমি ভেবেছিলাম বুঝি ভয়ানক কিছু।

প্যানক্রে। (সরোষে) কি বলেন? একটা বুঝি ভয়ানক নয়? অর্ব্বাচীন।

সৃগানারেল। শুনুন।

প্যানক্রে। নির্ব্বোধ, অশ্রাব্য—

সৃগানারেল। সর্ব্বনাশ! শুনুন মশাই।

প্যানক্রে। ভূতের মত? কুষ্মাণ্ড।

সৃগানারেল। (খুব তাড়াতাড়ি) আমি আপনাকে একটি কথা বলতে এসেছি। আমার জন্ম একটি—

প্যানক্রে। গর্দ্দভ, বর্ব্বর, নাস্তিক।

সৃগানারেল। (স্বগতঃ) চুলোয় যাও। (জোরে) মশাই ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে আছি, অবসর হবে কি?

প্যানক্রে। এহ হে হে মাপ করবেন। বলে কি না—

সৃগানারেল। থামুন্ একটা কথার উত্তর দেবেন?

প্যানক্রে। নিশ্চয়। আপনি কিসে আলাপ করবেন?

সৃগানারেল। (অবাক্ হয়ে) কিসে আলাপ?

প্যানক্রে। আজ্ঞে…

সৃগানারেল। কিসে আলাপ? মুখে আলাপ মশাই, মুখে আলাপ!

প্যানক্রে। তা নয়, আপনি কোন ভাষায়—

সৃগানারেল। ও তাই বলুন।

প্যানক্রে। আরবীতে কথা কইবেন?

সৃগানারেল। না।

প্যানক্রে। পারসীতে?

সৃগানারেল। না।

প্যানক্রে। জারম্যান?

সৃগানারেল। না।

প্যানক্রে। গ্রীক?

সৃগানারেল। না।

প্যানক্রে। হিব্রু?

সৃগানারেল। না?

প্যানক্রে। তুর্কী?

সৃগানারেল। না, না, না, বাংলা, বাংলা, বাংলা।

প্যানক্রে। ওঃ বাংলাতে?

সৃগানারেল। হুঁ।

প্যানক্রে। তা'হলে ডান ধারে আসুন। বাঁ কানে আমি অন্যান্য ভাষাগুলি শুনি আর ডান কানে শুধু বাংলা।

সৃগানারেল। আমি বিয়ে করব ভেবে একটি পাত্রী ঠিক করেছিলাম কিন্তু—

প্যানক্রে। (সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে) চিন্তাস্রোত প্রকাশের চেষ্টার মূলে বাক্যের স্ফূর্ত্তি। বস্তুর ছায়া চিন্তা, চিন্তার কায়া বস্তু, আশ্চর্য্য।

[শশব্যস্তে সৃগানারেল পানক্রের মুখে হাত চাপা দিল। হাত সরিয়ে নিলেই প্যানক্রে আবার নিজের মনে বকে চলে]

বাক্য ও চিন্তা মূলে এক। বাক্য চিন্তার অনুবৃত্তি। সুগঠিত চিন্তার ফল সুষ্ঠু বাক্য।

[সৃগানারেল প্যানক্রেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্ধ করে দিল]

প্যানক্রে। (বাইরে এসে) বাক্যই শব্দ, শব্দই জগৎ; বাক্যের সাহায্যে আপনার বক্তব্য বোঝান না কেন?

সৃগানারেল। তাই ত বোঝাতে এসেছি, শোনেন কোথায়?

প্যানক্রে। বলুন, আমি অবহিত।

সৃগানারেল। আমি নিজের জন্ম একটি—

প্যানক্রে। সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেন।

সৃগানারেল। আমি একটি মেয়েকে—

প্যানক্রে। বেশী দীর্ঘসূত্রতা করবেন না।

সৃগানারেল। আঃ।

প্যানক্রে। যা বলবার সংক্ষেপে, সূত্রাকারে বলুন।

সৃগানারেল। আমি—

প্যানক্রে। অতি বিস্তার, বাগাড়ম্বর, পূর্ব্বানুবৃত্তি, এ সকল বক্তব্যের হানিকর।

[রাগের বশে স্গানারেল ছাতা তুলে প্যানক্রেকে আক্রমণ করলে]

প্যানক্রে। কী! আপনি আমাকে হত্যা করতে চান? নিজে সরল করে বোঝাতে পারেন না, দোষ কি আমার? আমি সাত বছর বয়স থেকে এরিষ্টটল—

স্গানারেল। কাকাতুয়া!

প্যানক্রে। ন্যায়শাস্ত্র আমার কণ্ঠস্থ। জ্যোতিষ, ছন্দ, অর্থনীতি (দুই পা পিছনে গিয়ে) ভূগোল, জ্যামিতি, ব্যাকরণ, (এগিয়ে এসে) ভূতত্ত্ব, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, ইতিহাস (ফিরে গিয়ে) বিজ্ঞান, স্থাপত্য, রসায়ন, (এগিয়ে এসে) বীজগণিত, সামুদ্রিক, ভূতবিদ্যা, আমার—

স্গানারেল। (সরোষে) আমার প্রস্থান। বর্ব্বর, ভন্ড, আহাম্মক!

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

অপর পণ্ডিত মারফুরিয়াসের গৃহ

মারফুরিয়াস্। আসুন স্গানারেল।

স্গানারেল। (স্বগতঃ) না এটি গরু নয়। (জোরে) পণ্ডিত মশাই আমি এসেছি আপনার কাছে কয়েকটি বিশেষ কারণে। আমাকে সৎপরামর্শ দিতে হবে।

মারফুরিয়াস্। এমন কথা বলবেন না। আমাদের মায়াবাদে বলে যে কিছুই নিশ্চয় করে বলা যায় না—সব বিষয়েই সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত। অতএব 'আমি এসেছি' না বলে "বোধ হচ্ছে যেন আমি এসেছি" বলা উচিৎ।

স্গানারেল। বোধ হচ্ছে?

মারফুরিয়াস্। নিশ্চয়ই।

স্গানারেল। কিন্তু এতে সন্দেহ কি? আমি ত এসেই ছি।

মারফুরিয়াস্। তা'তে সন্দেহ আছে। বোধ হলেও সত্য না হতেও ত পারে।

স্গানারেল। সে কি মশাই? আমি এসেছি, এটাও কি মায়া?

মারফুরিয়াস্। ভেবে দেখা দরকার, কিন্তু পুঁথির বিধান।

স্গানারেল। বলেন কি? আমি কি এখানে আসিনি? আপনি কি আমার সঙ্গে কথা কইছেন না?

মারফুরিয়াস্। আমার বোধ হচ্ছে যেন আপনি এসেছেন, যেন আমি আপনার সঙ্গে কথা কইছি—কিন্তু এ যে সত্য তা'র নিশ্চয়তা কি?

স্গানারেল। না মশাই রসিকতা করবেন না। যাক্ গে, আপনাকে বলতে এসেছি যে আমি বিয়ে করব ভাবছি।

মারফুরিয়াস্। এ বিষয়ে আমি ত কিছু জানি না।

স্গানারেল। আপনাকে তাই বলছি।

মারফুরিয়াস্। তা' হ'তে পারে।

স্গানারেল। যা'কে বিয়ে করতে চাই তা'র মত সুন্দরী আর আছে কি না সন্দেহ। দেখ্‌লেই বিয়ে করতে ইচ্ছে করে।

মারফুরিয়াস্। অসম্ভব নয়।

স্গানারেল। তা'কে বিয়ে করা ভালো হবে কি না?

মারফুরিয়াস্। হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে।

স্গানারেল। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ—এ যে আর এক সুর। (প্রকাশ্যে) আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। যা'র কথা বল্লাম, তা'কে বিয়ে করা ভালো হবে?

মারফুরিয়াস্। হতে পারে।

স্গানারেল। খারাপ হবে?

মারফুরিয়াস্। হয়ত হবে।

স্গানারেল। মশাই, ঠিক একটা জবাব দেবেন?

মারফুরিয়াস্। আমারও ত তাই ইচ্ছে।

স্গানারেল। মেয়েটিকে আমার খুব ভালো লাগে।

মারফুরিয়াস্। লাগা অসম্ভব নয়।

স্গানারেল। তা'র বাবাও রাজী হয়েছেন

মারফুরিয়াস্। হয়ে থাকতে পারেন।

স্গানারেল। কিন্তু ভয় হচ্ছে যে হয়ত বিয়ে করে ঠক্‌তে পারি।

মারফুরিয়াস্। আশ্চর্য্য নয়।

সগানারেল। আপনার কি মনে হয়?

মারফুরিয়াস্। কিছুই না।

সগানারেল। কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন?

মারফুরিয়াস্। কি জানি—

সগানারেল। আমাকে কি পরামর্শ দেন?

মারফুরিয়াস্। আপনার যা ইচ্ছা।

সগানারেল। মশাই, এবার সত্যি ক্ষেপে যাব।

মারফুরিয়াস্। তার আমি কি করতে পারি?

সগানারেল। চুলোয় যান্—

মারফুরিয়াস্। যেতেও পারি।

সগানারেল। (স্বগতঃ) দাঁড়াও এবার সুর বদ্‌লে দেব।

[মারফুরিয়াস্‌কে প্রহার]

মারফুরিয়াস্। হাঁ, হাঁ, ওকি, ওকি থামুন্।

সগানারেল। একটু দক্ষিণা মন্দ কি?

মারফুরিয়াস্। আপনার এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার মতন পণ্ডিতকে প্রহার করা?

সগানারেল। মশাই, আপনিই শিক্ষা দিয়েছেন সব বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত। "আমাকে প্রহার করা" না বলে "বোধ হচ্ছে আমাকে প্রহার করা" বলা উচিত নয় কি?

মারফুরিয়াস্। আচ্ছা আদালত খোলা আছে।

সগানারেল। তার আমি কি করতে পারি?

মারফুরিয়াস্। সারা শরীরে কালশিরে পড়েছে।

সগানারেল। পড়ে থাকতে পারে।

মারফুরিয়াস্। আপনিই এর জন্য দায়ী।

সগানারেল। অসম্ভব নয়।

মারফুরিয়াস্। আপনার নামে নালিশ করব।

সগানারেল। হয় ত করবেন।

মারফুরিয়াস্। আপনার জেল হবে।

সগানারেল। হতেও পারে।

মারফুরিয়াস্। যান্ যান্, ঢের হয়েছে, খুব শিক্ষা হল।

সগানারেল। হ'লে হয় ত।

[প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজপথ

সগানারেল। ভারী মুস্কিল ত। কার কাছে যাই এবার? আচ্ছা ঐ ত দুটো বেদে ঝোলাঝুলি নিয়ে আসছে, একবার হাত দেখালে হয় না?

[বেদে দুজন কাছে এল]

সগানারেল। ওহে বাপু, হাত দেখতে পার?

প্রথম বেদে। পারি বৈ কি। ঠিক বলে দেব।

দ্বিতীয় বেদে। এ হাতে চার আনা দেবেন আর এ হাতে দেখে দেব।

সগানারেল। (পয়সা দিয়ে) এই নাও। দুই হাত দেখে ঠিক ঠিক বল দেখি।

প্রথম বেদে। চার আড়াইয়ে দশ।

দ্বিতীয় বেদে। দশ।

প্রথম বেদে। গুপ্তধন।

দ্বিতীয় বেদে। স্ত্রী লাভ।

প্রথম বেদে। একটু—

দ্বিতীয় বেদে। হুঁ।

প্রথম বেদে। রাজা হতে হতে হলেন না।

দ্বিতীয়। দাতা, জ্ঞানী।

সগানারেল। তা না হয় হল। কিন্তু যদি বিয়ে করি পরে অনুতাপ করতে হবে না ত?

দ্বিতীয় বেদে। অনুতাপ?

প্রথম বেদে। এঁ্যা, অনুতাপ?

সগানারেল। হাঁ; কখনও আমার বঞ্চিত হবার ভয় আছে?

[বেদে দুজন পরস্পরের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একটু-খানি চেয়ে চুপ করে থাকল]

সগানারেল। এ আবার কি? আচ্ছা বিপদ! শুনছ আমার স্ত্রী আমাকে কখনও ছলনা করবে?

প্রথম বেদে। ছলনা?

সগানারেল। হুঁ।

দ্বিতীয় বেদে। আপনার স্ত্রী?

স্গানারেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

[কোনও উত্তর না দিয়ে একটু হেসে বেদে দুজন নাচতে নাচতে চলে গেল]

সপ্তম দৃশ্য

ডোরিমেনের পিতৃগৃহ

লাইকাষ্ট। সত্যি ?

ডোরিমেন। সত্যি।

লাইকাষ্ট। তুমি শেষে ঐ বুড়ো—

ডোরিমেন। হ্যাঁ।

লাইকাষ্ট। আজ রাত্রেই ?

ডোরিমেন। আজই রাত্রে।

লাইকাষ্ট। ডোরি, তোমাকে যে নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসে, তার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছ ?

ডোরিমেন। ভুলিনি লাইকাষ্ট। ওকে কেন বিয়ে করছি তুমি জানো না। টাকাকড়ি তোমারও নাই আমারও নাই। ও বুড়ো আর ক'দিন ? তারপর সব টাকা আমার; তখন তুমি আর আমি, আমি আর তুমি—(হঠাৎ স্গানারেলকে দেখে)—এই যে তোমার কথাই বলছিলাম আমার বন্ধুকে।

লাইকাষ্ট। ইনিই ?

ডোরিমেন। হ্যাঁ আমার ভাবী স্বামী।

লাইকাষ্ট। নমস্কার, ডোরির সঙ্গে আমার আলাপ ছেলে বেলা থেকেই। ঈশ্বরের কাছে—

[সরোষে ও বেগে স্গানারেল-এর প্রস্থান]

* * * *

[এলক্যান্‌টরের ঘরে]

এলক্যানটর। এসো বাবা এসো।

স্গানারেল। আজ্ঞে আমি—

এলক্যানটর। কিছু বল্‌তে চাও ?

স্গানারেল। হ্যাঁ আমি—

এলক্যানটর। বল, বল, লজ্জা কি ?

স্গানারেল। আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু এখন দেখছি আমার বয়স অনেক হয়েছে, আমি তাঁর যোগ্য নই।

এলক্যানটর। সে কি কথা। তুমি যেমন আছ আমার মেয়ে ত তোমাকে তেমনি পছন্দ করেছে।

স্গানারেল। থাকে না, সময়ে সময়ে আমার ব্যবহার বড়ই অভদ্র হয়। তিনি আমার সঙ্গে বাস করতে পারবেন না।

এলক্যানটর। আমার কন্যা সাধ্বী; বেশ মানিয়ে নেবে, কোনও ক্ষতি হবে না।

স্গানারেল। আমার শারীরিক কতগুলি—

এলক্যানটর। ও কিছু না, সতী নারী স্বামীর শরীরের বিষয় কিছু জান্‌তে চায় না।

স্গানারেল। তবে স্পষ্টই বলি—আমার হাতে তাঁকে দেবেন না।

এলক্যানটর। অর্থাৎ ? আমি কথা দিয়েছি, এখন—

স্গানারেল। আমি আপনাকে অঙ্গীকার থেকে মুক্তি দিলাম

এলক্যানটর। আমাদের বংশে কেউ কথা দিয়ে ফিরিয়ে নিতে জানে না।

স্গানারেল। দেখুন আমি পরিষ্কার বলছি যে আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করব না।

এলক্যানটর। বিয়ে করবে না ?

স্গানারেল। না।

এলক্যানটর। কেন ?

স্গানারেল। প্রথমতঃ আমার আর বিয়ের বয়স নাই; দ্বিতীয়তঃ আমার পিতা পিতামহ কেউ কখনও বিয়ে করেন নি; আমিও তাঁদের মত চিরকুমার থাক্‌তে চাই।

এলক্যানটর। আচ্ছা, তবে আমি একবার বাড়ীর ভেতর থেকে ঘুরে আসি।

[প্রস্থান]

[এল্‌সিয়াডিসের প্রবেশ]

এলসিয়াডিস্। (অত্যন্ত গোবেচারাভাবে) আজ্ঞে।

স্গানারেল। বলুন বলুন।

এলসিয়াডিস্। বাবা বলছিলেন যে আপনি ডোরিমেনকে বিয়ে করবেন না ?

স্গানারেল। হ্যাঁ, আমি বড় দুঃখিত, কিন্তু—

এলসিয়াডিস্। থাক্ থাক্ তা'তে কি ?

স্গানারেল। আমি বড়ই লজ্জিত, কিন্তু—

এলসিয়াডিস্। না, না, কোনও ক্ষতি নাই

[স্গানারেলকে দুটো তরোয়াল দিয়ে]

এর মধ্যে একটা দয়া করে বেছে নেবেন কি ?

স্গানারেল। তরোয়াল ?

এলসিয়াডিস্। (সবিনয়ে) আজ্ঞে যদি কিছু মনে না করেন—

স্গানারেল। মানে ?

এলসিয়াডিস্। আপনি বলেছিলেন যে আমার সহোদরাকে বিয়ে করবেন, এখন বলছেন করবেন না ; অতএব—

স্গানারেল। অতএব ?

এলসিয়াডিস্। আর কেউ হ'লে হয়ত হট্টগোল ক'রে লোক ডেকে এনে গালাগালি করত। কিন্তু আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে চুপি চুপি জানাতে এসেছি যে যদি আপনার বিশেষ আপত্তি না থাকে তা' হলে আমরা পরস্পর পরস্পরের গলা কাটাকাটির চেষ্টা করি আসুন।

স্গানারেল। সর্ব্বনাশ!—সে কি ?

এলসিয়াডিস্। কি করব বলুন ? আসুন, নেন—(তরোয়াল প্রদান)

স্গানারেল। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু এতে আমার প্রবৃত্তি নাই। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ করলে।

এলসিয়াডিস্। আসুন তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়া যাক্। আমাকে আবার একটু কাজে বাইরে যেতে হবে।

স্গানারেল। আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

এলসিয়াডিস্। আপনি যুদ্ধ করবেন না ?

স্গানারেল। না।

এলসিয়াডিস্। খাঁটি ?

স্গানারেল। একেবারে।

এলসিয়াডিস্। (হাতের বেত দিয়া স্গানারেলকে কয়েক ঘা প্রহার) কিছু মনে করবেন না ; আমি নিয়মমত সব ঠিক করছি। আপনি কথা দিয়ে কথা ভাঙলেন—আমি আপনাকে যুদ্ধে ডাকলাম—আপনি রাজী হলেন না—অতএব আমি বেত্রাঘাত করলাম। সব কেতামত ঠিক করেছি, কোনও খুঁৎ হয় নি। আসুন এবার (তরোয়াল প্রদান) নইলে কান টেনে দেব।

স্গানারেল। আপনি নিতান্তই যুদ্ধ করবেন ?

এলসিয়াডিস্। আমি বৃথা জোর করব না। হয় ডোরিমেনকে বিয়ে করবেন, নয় লড়বেন, আসুন—

স্গানারেল। আমি একটাও পারব না।

এলসিয়াডিস। বটে ?

স্গানারেল। হুঁ।

এলসিয়াডিস্। কিছু মনে করবেন না, তা' হলে। (প্রহার)

স্গানারেল। ও রে রে রে থামুন্, থামুন

এলসিয়াডিস্। কি করব বলুন ? যতক্ষণ না বিয়ে করতে রাজী না হন ততক্ষণ আমাকে এই রকমই চালাতে হবে। কিছু মনে করবেন না তা' হলে। (বেত উত্তোলন)

স্গানারেল। থামুন্ মশাই, আমি বিয়েই করব।

এলসিয়াডিস্। যাক্ গে, আমি ভারি খুসী হলাম ; সত্যি আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। যাই ভেতরে খবর দিই গে।

(প্রস্থানোদ্যত)

[ডোরিমেন সহ এলক্যানটরের প্রবেশ]

এলসিয়াডিস্। বাবা ইনি রাজী হয়েছেন—

এলক্যানটর। ভালো, ভালো, এসো বাবাজী। এই আমার কন্যা, এই তুমি ; চার হাত এক হ'ল। জয় ভগবান্—এবার আমি দায়মুক্ত ; এবার থেকে একে তুমি সাম্‌লাবে। চলহে রাত হয়েছে, খাবারও প্রস্তুত।

[নিষ্ক্রামণ]

যবনিকা

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

কীর্ত্তন-গানে অভিনয়—নাচে, সুরে, স্বরে

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভাগবতভূষণ

হিন্দু-সঙ্গীতের নৃত্য হইতেছে পুরাদস্তুর Scientific। নৃত্যই কলা-বিদ্যার আদি। গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটির সমাবেশকে আমাদের শাস্ত্রে "সঙ্গীত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই জন্য হিন্দু-সঙ্গীতের আর একটি নাম হইতেছে—তৌর্য্যত্রিক। সাধারণতঃ কীর্ত্তন-গান হইতেছে পূর্ণভাবেরই তৌর্য্যত্রিক। কীর্ত্তন-গানের এরূপ অনেক পদ আছে, নাচে আর সুরের ও স্বরের বিশেষ বিশেষ প্রকারের অভিব্যক্তির ভঙ্গিতেই যাহাদের পূর্ণতা আমরা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বহুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া উল্লাসবশতঃ প্রোষিত-ভর্তৃকা লাস্যময়ী শ্রীরাধার উক্তি-সম্বন্ধে বিদ্যাপতির রচিত—

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহাইনু
পেখনু পিয়ামুখ চন্দা"

ইত্যাদি পদ হইতেছে আমাদের কথিত ঐ পদ-সকলের অন্যতম।

বাস্তবিক যখন আমরা সে কালের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াদের মুখে ঐ পদ এবং ঐ ভাবের অন্যান্য পদ সব শুনিয়াছিলাম, তখন তাঁহারা শ্রীরাধা-চরিত্রের অনুকরণ করিয়াই আবেশে নাচিতে নাচিতে * ঐ সকল গাইয়াছিলেন; বেশ মনে পড়ে, তখন আমরা ক্ষণমাত্রের জন্যও বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদের সামনে পুরুষের নাচ হইতেছিল; বরং মনে হয় সে নাচে যেন গোপীভাবেরই পূর্ণ জমাটে গানের আসর "জম-জম" করিতেছিল। গানে উক্ত সকল প্রকার অভিনয়ের সমাবেশই ইহার মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। নাচিয়া নাচিয়া ঐ সকল পদ না গাইলে উহাদের কার্য্যকারিতা শক্তি অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। তাই বলিয়া যে-সে রকমে নাচিলে সে সব গানে ভাব ফুটিয়া উঠে না। ঐ সব গানে সুরে, স্বরে, তদ্ভিন্ন নাচেও সময়োপযোগী—ভাবোপযোগী প্রাগুক্ত অভিনয় করিবার মত বিলক্ষণ কিছু থাকে, যাহা জগতের যে-কোন বড় নাট্যশালার গৌরব-বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু সেরূপ অভিনয় ত সকলের আয়ত্ত হইতে পারে না; কারণ ভাবুক না হইলে শুধু "নাচিব" মনে করিয়া নাচিতে গেলে সে আসল নাচ হয়

* সাংসারিক আনন্দেই কত লোক নাচে, শ্রীরাধার কুলবতী হইয়া পরানন্দে নাচা তো অনেক দূরের কথা। আমি এক বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বাড়ীতে বহু পূর্ব্বের কোন এক বিবাহে স্ত্রীলোকদের এইরূপ নাচের কথা জানি। উৎসব-পূর্ণ সে বাড়ীতে ইংরেজী ব্যান্ড্ আসিয়া প্রথম বাজনা সুরু করিল; তাহা শুনিবামাত্র বরের ভগ্নি সম্পর্কীয়া দুইজন—বয়সে প্রায় প্রৌঢ়া, সেকালের বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে—উভয়ে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া অন্দর মহলে নাচ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এটা হইল —এখন যে কথা বলিব, তাহার তুলনায়—যেন ছোট ঘরের ছোট কথা। বরং মহারাণী Victoriaর কথা কোন ইংরেজি পত্রিকায় এইরূপ পড়িয়াছি। খৃষ্টীয় ১৮৫৯ শতকের একদিন প্রভাতে মহারাণী একখানা টেলিগ্রাম্ হাতে লইয়া Windsor castleএর এ-ঘর ও-ঘর ছুটিয়া ছুটিয়া যাহাকে সামনে পাইতেছিলেন তাহাকেই বলিতেছিলেন, "মনে কর কি?—আমি মাতামহী হয়েছি যে।" পরক্ষণেই তিনি নাচিতে আরম্ভ করিলেন। সে নাচে তখন কোন ব্যক্তি-বিশেষের আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। কারণ উহা সাধারণতঃ রাণী-পদবীর নারীর উচিত আদব-কায়দার—বিশেষতঃ মহারাণীর মত গম্ভীরভাবের চাল-চলনের রাজ্ঞীর অনুপযোগী ছিল। ঐ টেলিগ্রামে Ex-Kaiserএর জন্মের সংবাদ ছিল। ঐ কাগজ হইতে কিছু উঠাইতেছি:—

The Queen ran from room to room in Windsor castle holding a telegram in her hand and calling to every body she met: "What do you think? I am a grandmother!" Then she danced on to astonish some body else not only with her news but with her unregal behaviour for as a rule the Queen was very severe in her deportment.

আমাদের ঠাকুরদাদার নাচের কথাও আমি জানি। নাতি "জীবটি" সকল জাতিরই কাঙ্ক্ষিত বস্তু বটে। এই যেমন Tennyson তাঁহার "Dora"য় লিখিয়াছেন:—

—I would wish to see,
My grand child on my knees before I die.

না। সে নাচে গানের সঙ্গে ভাবের ঝোঁকে হাব*—অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ প্রকারের অঙ্গ-ভঙ্গী—তৎসহ কখন অশ্রুপাত, কখনও বা মুখে ফুটন্ত হাসির রেখা—ইত্যাদি যথাযথ ভাবে আপনিই আসিয়া পড়ে। আশ্চর্য্যের বিষয় বৃদ্ধও সে নাচ নাচিলে রস-ভঙ্গ হয় না; বালক, যুবা, বৃদ্ধ—হয় ত বা বৃদ্ধা—সকলকেই সমানভাবে জড়াইয়া ধরিয়া কি যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য্য উপরের কোন এক অজানা দেশ হইতে নামিয়া আসিয়া গানের আসর জুড়িয়া খেলিয়া বেড়াইতে থাকে।

সুরের বা স্বরের অভিনয়ও কীর্ত্তন-গানে বিলক্ষণ ভাবেই আছে। গাইবার সময় সুরের উচ্চতা, লঘুতা, কম্পন এমন কি শোক, দুঃখ ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সুরের বা কথার তত্তদুপযোগী ভঙ্গী ইত্যাদিতে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। † যাঁহারা কীর্ত্তন-গানে এই সকলের অবতারণা করিতে পারেন, অর্থাৎ ভাবাবেশে—অনেকটা নিজেদের অজ্ঞাতসারে—যাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য হয়, তাঁহারাই যথার্থ কীর্ত্তন-সিদ্ধ। এ সকলে কৃত্রিমতা আসিলে অভিনয় ঠিক হয় না, ভাব নষ্ট হইয়া যায়—"ভাবের ঘরে চুরি" হয়। কেবল রাগিণী বজায় রাখিয়া কীর্ত্তন গাইবার দক্ষতা হইলেই "কীর্ত্তনীয়া" হওয়া যায় না। এখানে ইহাও বলা উচিত যে, কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের দেশে প্রচলিত অন্য সকল প্রকার গানে ঐ রূপ নাচের, সুরের ও স্বরের একত্রে অভিনয় নাই। কীর্ত্তন-গানের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। ‡

ব্রজলীলা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার গানে (এই যেমন শ্যামা-বিষয়ক গীত ইত্যাদিতে) কীর্ত্তনের সুর খাপ খায় না। যে সকল রসের উপর ব্রজ-লীলা প্রতিষ্ঠিত, অন্যত্র তাহার অভাববশতঃ সেখানে কীর্ত্তনের সুরের কার্য্য-কারিতা শক্তি থাকে না। কীর্ত্তনের সুরে গেয় ব্রাহ্ম-সঙ্গীত ও মিশনারিদের যীশুসম্বন্ধীয় সঙ্গীত তাহার প্রমাণ। কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ (খোল) অদ্ভুত রকমের সঙ্গতের যন্ত্র। কীর্ত্তন-গানের ইহা প্রাণ বলিলেই হয়। এ হেন মৃদঙ্গও ব্রজ-লীলা ব্যতীত অন্য সকল কীর্ত্তন গানে রসোদ্দীপনে অক্ষম। কেবল মাত্র মৃদঙ্গের বাজনা যাঁহারা শুনেন, তাঁহারাও মাতিয়া উঠেন। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সুর বাঁধাই থাকে; ইহা বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সকলের কণ্ঠের সহিত যখন-তখন মিলে।

কবিতার (গানের) ছন্দ আছে; নাচেরও উপযোগী ছন্দ আছে; সে ছন্দ ধরা পড়ে দর্শকের চোখে, যখন নাচ হয়। গীতি কবিতার ছন্দ-বিন্যাসের উপযোগী নাচ ঐ কবিতার ভাবের ব্যঞ্জনার পক্ষে অধিকতর সহায়ক; নৃত্য-কালে হস্ত-পদাদির বিশেষ ভাবে বিক্ষেপ বা বিন্যাস-ভঙ্গী প্রভৃতি যা-কিছু সব তাহার উদ্দীপন করার চেষ্টা মাত্র।

কীর্ত্তনের আর একটি বৈশিষ্ট হইতেছে গায়কের কীর্ত্তন গাওয়ার উপযোগী "গলা"। যেমন বেহালার সুর বা আওয়াজ তাহার নিজের, বাঁশীর সুর

---

* ভাব প্রথম আসে মনে; তখন তাহার বাহ্য-প্রকাশ কিছুই থাকে না। মন ক্রমশঃ ভাবে বিভোর হইয়া উঠিলে ভাবুকের শরীরের যথাযোগ্য স্থান-সমূহে ভাবের স্বতঃ বিকাশ হইতে থাকে; এই যেমন চোখে, মুখে, চলা-ফিরায়, হাসি-কান্নায় এই সকলে। এই বিকশিত ভাবের নাম হইতেছে 'হাব'।

† এই জন্য কীর্ত্তনে হার্ম্মোনিয়ম, বেহালা প্রভৃতি গানের সহিত বাজাইবার (accompaniment) যন্ত্র-ব্যবহারের নিয়ম নাই। এমন কি কেবল সুর রাখার যন্ত্রের—এই যেমন তানপুরার ব্যবহারও কীর্ত্তনে চলে না। ঐ সকল যন্ত্র বাদিত হইলে কণ্ঠের সুর কিম্বা স্বরজনিত কার্য্য বা অভিনয় স্পষ্ট বুঝা যায় না, অনেক স্থলেই একেবারে বুঝা যায় না। ইহাতে রসভঙ্গ হয়।

‡ বহু বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার আমার বন্ধু প্রথিত-নামা অমৃতলাল বসু মহাশয়কে রঙ্গ-মঞ্চে যথার্থ কীর্ত্তন-গানের ও তৎসহ কথিত প্রকারের অভিনয় প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম; উত্তরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে সে সময় আসে নাই, সে কারণ অভিনেতা-শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে উপযুক্ত অভিনেতা পাওয়া দুর্ঘট, আর সাধারণ দর্শকেরা বাহ্যিক ক্রিয়া (action) বহুল অভিনয়ই দেখিতে চাহেন; প্রেম-রাজ্যের মনস্তত্বের গভীর তরঙ্গ-লীলাসকল দুই একটি কথায় বা সুরে কিম্বা ভঙ্গীতে অথবা অন্য কোন প্রকারের অভিনয়ে তাঁহাদের চোখে তেমন করিয়া ফুটিতে পারে না। আমি তখন বুঝিয়াছিলাম, বন্ধুর কথাই খুব ঠিক। ইহার পর একদিন সন্ধ্যা বেলায় তিনি তাঁহার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে "কীর্ত্তনে-অভিনয়" বুঝাইবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টার থিয়েটারের ষ্টেজে দুই ঘণ্টারও অধিক কীর্ত্তন শুনাইয়াছিলেন। সে রাত্রি সে থিয়েটারের অভিনয় বন্ধ ছিল। পরে তিনি নিজের বাড়ীতেও এক রাত্রি ঐরূপ ভাবের কীর্ত্তন শুনিয়াছিলেন। তিনি কীর্ত্তনের একজন "গোঁড়া" ছিলেন।

তাহার নিজের, এসরাজের সুর তাহার নিজের, হার্ম্মোনিয়মের সুর তাহার নিজের—যেমন ঐ সকল যন্ত্রের প্রত্যেকটিই নিজস্ব, প্রধান—সে নিজস্ব হিসাবে তাহাদের কোনটিও অন্য কোনটির সঙ্গে মিল খায় না, সেইরূপ কীর্ত্তন-গানের আওয়াজেরও একটা নিজস্ব—একটা উপযোগী কণ্ঠ আছে। সে "গলা" তথা-কথিত কীর্ত্তনীয়াদের নাই। তাহা ঠিক পুরুষ-কণ্ঠ নয়, নারী-কণ্ঠও নয়; তাহা ঠিক কি বুঝান কঠিন। তবে সে গলা যেন কখন সুখের উচ্ছ্বাসে, কখনও বা দুঃখের আবেগে সদাই ভরপুর। আমার মনে হয়, এটা যেন একটা gift.

Cowper বলেন—

There is, in souls a sympathy with
sounds.

* * * *

Some chord in unison with what we hear
Is touched within us and the heart replies.

কবিতায়, গানে আর নাচেও বটে, এ উক্তির সার্থকতা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

নাচ হইতেছে এক প্রকার Mute কবিতা বা গান, নাচে ঐ "Sounds" যেন একটু সুপ্তভাবে থাকে; গান-বাজনার সাড়া পাইলে সেটা একেবারে জাগিয়া উঠে। ঐ যে শব্দের কথা Cowper বলিয়াছেন;—যে শব্দ-জনিত কম্পনের (Vibration) সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়-তন্ত্রী স্বতঃই কাঁপিয়া উঠে, ঠিক সেই শব্দের উদ্ভব করা সাধারণ-কবি বা কীর্ত্তন-গায়কদিগের কার্য্য নহে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ কবিদিগের কৃত "শব্দ"-জনিত অল্পাধিক স্পন্দন আমাদের হৃদয় ঘেঁষিয়া যায় মাত্র—তাহাকে ছোঁয় না—কাঁপাইয়া তোলে না। বাণীর যথার্থ বর-পুত্র কবিগণেই সে স্পন্দনের পূর্ণ মাত্রায় সৃষ্টি করিতে পারেন। কীর্ত্তন-গানের "মহাজন"-গণ তাঁহাদেরই শ্রেণীর। কীর্ত্তনের পদের ও গানের "শব্দ" আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঘা দিয়া বিলক্ষণ ঝঙ্কার উঠায় এবং সমস্ত দেহে একটা সাড়া জাগাইয়া তোলে। সাধারণতঃ বৈষ্ণব-পদাবলী Cowper-কথিত "sounds"এ বিলক্ষণ ভরপূর। ঐ পদাবলী ও কীর্ত্তন-গান চিরদিনের মত আমাদের বাংলায় Highest aesthetical culture এর আদর্শ স্বরূপ হইয়া থাকিবে। যদি কোন বিদেশীয় ব্যক্তি আমাদের বলেন, "বাঙ্গালীদের আবার আছে কি?" আমরা সদর্পে উত্তর দিব, "কেন—কীর্ত্তন?" আবার সঙ্গে সঙ্গে Goethe এর কথায় ইহাও বলিব—"And all at once is said"।

"মধু কান" প্রবর্ত্তিত ঢপ-কীর্ত্তন বলিয়া আর এক প্রকার কীর্ত্তনের অল্পাধিক প্রচলন বাংলায় আছে। উহা সাধারণ শ্রোতাদের (Mass) পক্ষে সহজ-বোধ্য, কিন্তু বৈষ্ণবদিগের কীর্ত্তন-গান হইতে উহা সর্ব্বপ্রকারেই সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন। "ঢপ" আমাদের এ প্রবন্ধের একেবারেই লক্ষ্য নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। কালী-কীর্ত্তন সম্বন্ধেও আমাদের ঐ কথা। পূর্ব্বে "কীর্ত্তন" বলিলে কেবলমাত্র বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনই বুঝাইত। এ প্রস্তাব আমরা সেই কীর্ত্তনকেই উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছি।

মনুষ্যত্বের বড় কিছুই নাই। হৃদয়বান্ হওয়া যদি মনুষ্যত্ব হয়, তবে এক কীর্ত্তন-গানেই সে মনুষ্যত্ব দিতে পারে, ইহাই আমার বিশ্বাস। কিন্তু সমাজের আর এক দিক—যাহা রজোগুণের—সে দিক হইতে দেখিলে বলিতে হয়, কীর্ত্তন-গান মানুষের পুরুষকারের এককালীন উচ্ছেদ সাধন করে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সকলকেই গোপীভাবের দিকে—স্ত্রীত্বের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সে আকর্ষণের ফলে এক হিসাবে সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায় না কি?

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইন্দির

শ্রীঅবনীনাথ রায়

কলিকাতা হইতে দিল্লী আসিতেছিলাম। তুফান মেলে ভিড় বেশি হয় বলিয়া তার দু' ঘণ্টা আগে যে ট্রেণ ছাড়ে তার যাত্রী হইয়াছিলাম। গাড়ীটার নাম 15 Up. এটা তুফান মেলের আগে ছাড়িয়া পরে আসিয়া দিল্লী পৌঁছায়।

ট্রেণ চলিতে লাগিল—বাংলা দেশের ভিজা স্যাঁতসেতে মাটি ক্রমশঃ পিছনের দিকে হাঁটিতে লাগিল। খানা, ডোবা, জলাশয়ের প্রাচুর্য্য ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। বন, বাদাড়, ঘাসের অবাধ উৎপত্তি ধীরে ধীরে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। অণ্ডাল জংসনে যখন গাড়ী থামিল তখন চারিদিকের শুক্‌নো খট্‌খটে লাল জমির মাঠ দেখিয়া মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সময়টাও ছিল সন্ধ্যার প্রাক্কাল। ট্রেণে বসিয়াই দেখিতে লাগিলাম একটি সরু পথ ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ক্রমে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেছে। সহরের কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া পরিচ্ছন্ন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গলা টিপিয়া ধরিতেছে না। ছোট্ট পাড়াগাঁর মত সহর—রেলের জংসন না হইলে লোকে এ জায়গার নামই হয়ত জানিত না।

ট্রেণ আবার চলিতেছে—রাণিগঞ্জ, আসানসোল পার হইয়া গেল। মনে করিলাম এইবার একেবারে ধানবাদ যাইয়া থামিবে। হঠাৎ গাড়ী থামিল দুর্গাপুর। হয়ত লাইন ক্লিয়ার ছিল না কিন্তু আবার থামিল সীতারামপুর। মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। তুফান গাড়ীতে আসিলে এত জায়গায় গাড়ী থামিত না—এতক্ষণ কতদূর আগাইয়া যাওয়া যাইত—এক্‌স্‌প্রেসের এবং এক্‌স্‌প্রেসের সওয়ার লোকদেরও মর্য্যাদা রক্ষা হইত। মনে মনে বলিলাম, যত ভিড়ই হোক্, ভবিষ্যতে তুফান গাড়ীর চড়ন্দার হইয়া বসিতে হইবে।

পুনরায় এত শীঘ্র গাড়ী থামিবে মনে করি নাই—আমার বিরক্ত মনকে যেন অধিকতর উত্যক্ত করিবার জন্য কয়েক মাইল গিয়া পরের ষ্টেশনেই গাড়ী থামিল।

কুল্‌টি.........

কুল্‌টি?

হাঁ, কুল্‌টি।

নাম শুনিয়া অনেকদিন আগেকার এক ইতিহাস মনে পড়িল। ঘটনাটির উপর মহাকাল আজ যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। যাহারা জানিত তাহাদের অধিকাংশ বোধ হয় আজ বাঁচিয়া নাই। আর যদিও বা বাঁচিয়া থাকে তবে এ ঘটনা তাদের স্মৃতির বাহিরে চলিয়া গেছে।

* * *

বেঙ্গল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী যখন কুল্‌টিতে তাঁদের কারখানা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন সে অনেক কাল আগের কথা। দেখিতে দেখিতে অখ্যাতনামা পল্লী সহর হইয়া ফাঁপিয়া উঠিল। বিলাত হইতে সাহেব আসিলেন, বাংলাদেশ হইতে আসিলেন আপিসের বাবুরা, পাঞ্জাব হইতে আসিল ফিটার মিস্ত্রি, প্রভৃতি। আপিস ঘর তৈয়ার হইল, কারখানা ঘর হইল, Blast Furnace এর হাপর দিনরাত হাঁপাইতে লাগিল। আকাশের শূন্যতাকে বিদীর্ণ করিয়া ক্রেণ ঝুলিতে লাগিল। কারখানার শ্রমিকদের এবং আপিসের বাবুদের চিকিৎসার জন্য আসিলেন বাঙালী ডাক্তার সাহেব। বিজ্‌লি বাতি জ্বলিল, জলের কল হইল। বাবুরা থাকিবার জন্য কোয়াটার পাইলেন। তাঁদের ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার জন্য ক্রমে একটি ছোট স্কুলেরও প্রতিষ্ঠা হইল।

কিন্তু কোথায় গেল চারিদিকের সেই দিগন্তপ্রসারী মাঠ, দুপুরের সেই নিরালা অবসর, অপরাহ্নের শান্ত নিস্তব্ধতা! সকল মানুষই হঠাৎ যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইয়া পড়িল। পরস্পর দেখা হইলে কেউ আর আগের মত পাঁচ মিনিট দাঁড়াইয়া কুশল প্রশ্ন করে না, সেই সময়টা কারখানায় কাটাইলে তাহার পরিবর্ত্তে অর্থ পাওয়া যাইবে। মাঠের মধ্য দিয়া গড়িয়া

উঠিল আঁকা বাঁকা রাস্তা, তাহার উপর দিয়া চলিতে লাগিল দলে দলে লোক। হর্ণ বাজাইয়া মোটর গাড়ী সকলকে সচকিত করিয়া তুলিল। বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলো কোথায়ও আর এতটুকু আড়াল আব্ডাল রাখিল না।

প্রতি সন্ধ্যায় শ্রমিক জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিতে লাগিল। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাত্রে চলিতে লাগিল তাদের বেপরোয়া স্ফূর্তির তাণ্ডবলীলা। যে পয়সা তারা কোম্পানীর কাছ থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করিল তার অধিকাংশই রাত্রে অন্ধ রাস্তায় শুঁড়ির টাকার থলি পূর্ণ করিয়া তুলিল।

নৈতিক জীবনের শুচিতা বলিয়া কোথাও কিছু অবশিষ্ট রহিল না।

আপিসের বাবুরা ছিল সামান্য লেখাপড়া জানা। কাঁচা পয়সা হাতে পড়ায় তাদের অধোন্নতি হইতে দেরি হইল না। নগর-জীবনের যে বেড়াজাল আকাশে বাতাসে প্রসারিত হইয়াছিল তার কবল থেকে কাহারও মুক্তি ছিল না। কারখানার ধোঁয়া যেমন স্বচ্ছন্দ বায়ুর গতি পঙ্কিল করিল, নাগরিক জীবনের কদর্য্যতাও তেমনি পল্লীর স্বচ্ছন্দ জীবনের সরল পথ রুদ্ধ করিয়া দিল।

বাংলাদেশের এক পাড়াগাঁ থেকে বিপিন আসিল এই কোম্পানীতে চাকরি করিতে। বিপিনের শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি ছিল। একবার নাকি বিনা হাতিয়ারে কেবলমাত্র মুষ্ট্যাঘাতের সাহায্যে সে বাঘ মারিয়াছিল। দুর্গাপূজার সময় নবমীর দিন তাদের গ্রামে বড় মহিষকে কামার যখন বলি দিতে সাহস করিত না তখন বিপিন দীর্ঘ খড়্গ স্বচ্ছন্দে উত্তোলন করিয়া অবলীলাক্রমে মহিষের মুণ্ড ছেদন করিয়াছে।

কারখানায় আট ঘণ্টা ডিউটি—কখনো সকালে, কখনো দুপুরে, কখনো বা রাত্রে সুরু হয়। রান্নাবান্না এবং বাসার আবশ্যকীয় কাজকর্ম্ম করিবার জন্য একজন লোক দরকার। লোক অবশ্য সহজেই পাওয়া গেল—কারখানার কুলিদেরই একটি মেয়ে। নাম ইন্দির। বাঙালী ভদ্রলোকের গলা দিয়া নামিতে পারে এমন রান্না যদিচ সে জানিত না কিন্তু কয়েকদিনেই দেখা গেল মেয়েটি চট্পটে—জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মোটামুটি সব কাজকর্ম্ম সে শিখিয়া লইয়াছে।

একদিন দেশ থেকে বিপিনের নিকট এক পত্র আসিল যে তার বিবাহের আয়োজন সব ঠিকঠাক হইয়া গেছে—সে যেন পত্রপাঠ বাড়ী আসে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন একটু চাকরি হইয়াছে, আর সংসার ধর্ম্ম না করিলে ভাল দেখায় না ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য সংসার ধর্ম্ম পালন করিবার ইচ্ছা বিপিনেরও কম ছিল না—সুতরাং সে কয়েকদিনের ছুটি লইয়া বাড়ী গেল এবং কয়েকদিন পরেই বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু এমনি দুর্দ্দৈব যে একদিন রাত্রের ডিউটি করিবার সময় সাহেবের সঙ্গে বিপিনের ঝগড়া হইয়া গেল। ব্ল্যাক-বোর্ড সামনে রাখিয়া একখানি লোহার চেয়ারে বসিয়া বিপিন ঢুলিতেছিল—Blast Furnace এর ভিতর যত Slag পাঠান হইতেছিল মাঝে মাঝে তার হিসাব ঐ বোর্ডে লিখিতেছিল। হঠাৎ সাহেব আসিল ইন্স্পেকশান করিতে।

ওয়েল বাবু, এটা ঘুমোবার সময় নয়।

চোখ রগ্ড়াইয়া বিপিন বলিল, সাহেব, তোমরা যা' মাইনে দাও তার তুলনায় ঢের কাজ করছি। মাইনে বাড়াও, আরো ভাল কাজ পাবে।

সেই লেবার এবং ক্যাপিটালের সনাতন দ্বন্দ্ব।

বলা বাহুল্য এর ফল ফলিতে দেরি হইল না। কয়েক দিনের মধ্যেই বিপিনের চাকরিতে জবাব হইয়া গেল।

পাড়াগাঁয়ে দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিল না। আর একটা ষ্টীল কোম্পানীও খুলিয়াছিল, সেখানে হয়ত একটা চাকরিও মিলিত কিন্তু এই চাকরির উপর বিপিনের কি রকম একটা ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল।

যাওয়ার আগে ইন্দিরের হাত দু'টি ধরিয়া বিপিন বলিল, তোমাকে পর ব'লে ভাবতে পারি নে। এই বিদেশে তোমার যত্ন আত্তির জন্যেই বাড়ীর কথা একদিনও মনে পড়ে নি। কিন্তু আমার ত চাকরি গেল। তুমি অন্য কোন বাসায় চাকরি জোগাড় করে নাও।

মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইন্দির বলিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন, কি করবেন?

কি যে করবো, তা' নিজেই এখনো জানিনে। তবে দেশে একখানা ঘর যখন আছে তখন আপাতত সেখানে গিয়েই উঠ্‌তে হবে।

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কুণ্ঠিতস্বরে ইন্দির কহিল, আমাকে দেশের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারেন না?

এরূপ প্রস্তাব একেবারে অপ্রত্যাশিত। সুতরাং বিপিন সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু সে কি সুবিধে হবে? কত লোকে কত কথা বল্‌বে। পরের কথা তুমি সইতে পারবে কেন? আর এখন ত আমার অবস্থাও সঙীন—নিজেদের খাওয়া-পরার সুবিধে নেই, তোমার মাইনে পত্র আমি কোথা থেকে দেব?

টাকা-কড়ির কথা বলছিলেন কিন্তু আমার মত একটা লোকের কি-ই বা খরচ? সে আপনাদের সংসারে একরকম ক'রে কুলিয়ে যাবেই! সেই বরং ভাল—আমাকে নিয়ে চলুন।

একথায় সেদিন ওখানেই যবনিকাপাত হইল। কিন্তু যাওয়ার সময় দেখা গেল ইন্দির মিথ্যা বলে নাই। সে যাওয়ার জন্য মনস্থির করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং তাহাকে সঙ্গে লইতেই হইল।

* * * *

দেশে একখানা পাকা ঘর এবং আম কাঁঠালের সামান্য একটু বাগান ব্যতীত বিপিনের আর কিছুই সঙ্গতি ছিল না। তখন গৃহে কর্ত্রী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—বিপিনের স্ত্রী নয়নকালী ইন্দিরকে সুনজরে দেখিল না। ইন্দির কাঁদিয়া কাটিয়া একশা করিল! বলিল, মা, তোমার ত চাকরাণিরও দরকার, আমি বাসন মাজা থেকে সুরু ক'রে তোমার সংসারের সমস্ত ঝিয়ের কাজ ক'রে দেবো। এই কথার পর নয়নকালী কেবলমাত্র পেটভাতায় একটা লোক পাওয়া গেল দেখিয়া মুখে আর কিছু বলিল না।

সংসারে কিন্তু কষ্টের অবধি রহিল না। কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে বিপিনের একটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মিল। বাড়ীর উঠানে একটু শাক-সব্‌জি তরি-তরকারি তৈয়ার করিয়া অপরের নিকট হইতে বাগান জমা করিয়া লইয়া বাঁশ চিরিয়া বেড়া দিয়া কোন রকমে দিন গুজরাণ হয় কিন্তু মুস্কিল হইল সকলের কাপড় জামার খরচ লইয়া। নগদ এক পয়সাও হাতে নাই বলিলেই চলে। বিপিনের অঙ্গে কাপড়ের বদলে লুঙ্গি উঠিল, চাকরি থাকিতে একটু মাছ মাংস প্রভৃতি সুখাদ্য খাওয়ার অভ্যাসও হইয়াছিল কিন্তু কোন দিক হইতেই এখন আর বাজার খরচের পয়সা সংগ্রহ হয় না। আরো সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিল অসুখ বিসুখের কৃপায়। ম্যালেরিয়ায় দেশ ভরা, ছেলেপুলে দু'দিন ভাল থাকে ত তার পরদিন জ্বরে পড়ে। একটা চ্যারিটেব্‌ল ডাক্তারখানা আছে, সেখানে একটা শিশি লইয়া গেলে খানিকটা কিসের গোলা শিশিতে ঢালিয়াও দেয় কিন্তু তাতে ফল বিশেষ কিছু হয় না। পেটের পিলেও ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠে, বুকের পাঁজরাগুলিও ক্রমশঃ বাহিরের দিকে ঠেলিয়া আত্মপ্রকাশ করে, মুখে কোন স্বাদ বা মনে কোন সাধ আছে বলিয়া বোঝা যায় না।

একবার অসময়ে একটি মরা ছেলে প্রসব করিয়া নয়নকালী অসুস্থ হইয়া পড়িল। ইদানীং সংসার একরকম অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পাশের গ্রামেই এক মুসলমান জমিদারের বাস—তাদের জমিদারির ভিতর বিপিন আদায়-তশিলের একটু কাজ পাইয়াছিল। কিন্তু মুস্কিল হইল এই যে বিপিন মাঝে মাঝে ডুব দিতে সুরু করিল—বাড়ী আসিত না। জমিদারের ছেলেদের সঙ্গে নানা আমোদপ্রমোদে সেখানেই সময় কাটাইত।

এদিকে নয়নকালী অসুস্থ হইয়া পড়ায় ইন্দির বড় বিব্রত বোধ করিল। অনেক কষ্টে একটি লোককে বলিয়া কহিয়া পাশের গ্রামে বিপিনকে খবর পাঠাইল। দুপুর নাগাদ লোকটি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে বিপিন সেখানে নাই, জমিদারের এক ছেলের সঙ্গে দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে, কবে ফিরিবে তাহা কেহ বলিতে পারিল না।

সেদিন সকালে উঠিয়া নয়নকালী ইন্দিরকে ডাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, হাঁড়িতে একটাও ত চাল নেই, মা। আজ তোমাদের রান্নার কি হবে?

ইন্দির সাহস দিয়া বলিল, তার জন্যে কোন ভাবনা নেই, মা। আমি কাল মজুমদারদের বাসন মেজে দিয়েছিলুম কিনা, তারা আমাকে চাল দেবে বলেছে। আমি এখনি গিয়ে নিয়ে আসছি।

ইন্দির চলিয়া গেল। নয়নকালী কিন্তু কান্নার বেগে সেখানে একেবারে উপুড় হইয়া পড়িল। বাস্তবিক আজকাল এমনি করিয়াই দিন চলিতেছিল। এক মাসের উপর হইল স্বামীর কোন খবর নাই, ঘরে এমন কোন সম্পত্তি তিনি রাখিয়া যান নাই যাতে ছেলেমেয়েটির এবং ইন্দিরের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটে। তিনি নিজে খাওয়া দাওয়া এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন কিন্তু ছেলেমেয়েটার মুখে দুটো ভাত ত দিতে হইবে। আর যে কুলির মেয়েটা অন্যত্র খাটিয়া আসিয়া তাদের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছে তাকেও দুটো খাইতে দিয়া সক্ষম রাখিতে হইবে।

অথচ তার বয়স তখনো বাইশ পেরোয় নাই। তার কি না হইতে পারিত! কিন্তু এমনি কপাল যে এই বয়সেই তার সাধ আহ্লাদ সব ফুরাইয়াছে। নিজে ভগ্নস্বাস্থ্য, তার উপর ইন্দিরের গতর খাটানো পয়সায় সকলের জীবিকানির্ব্বাহ। এই ব্যবস্থার কৃত্রিমতা এবং অপমান তাকে একেবারে পিষিয়া মারিতেছিল।

এক নিবিড় বর্ষার রাত্রে বৃষ্টির আর বিরাম ছিল না। যে চণ্ডীমণ্ডপখানায় তাদের শোওয়া চলে তার এক পাশের চাল বিদীর্ণ করিয়া ঘরের মধ্যে জল পড়িতে সুরু করিল। নয়নকালী ইতিপূর্ব্বেই বিছানা নিয়াছিল—আর উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইবার সাধ্য ছিল না। শরীরের দিকে তাকাইলে তাকে আর চিনিবার উপায় নাই—কয়েকখানি হাড়মাত্র অবশিষ্ট আছে। সে রাত্রে কেমন যেন হটাৎ সে চম্‌কাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হয় দরজার দিকে সে যেন একটি কান সযত্নে পাতিয়া রাখিয়াছে। ব্যগ্র চোখ দুটিও যেন কার প্রতিক্ষায় আকুল। জ্ঞান বড় একটা ছিল না—কেমন একটা আচ্ছন্ন ঘোরের ভাব।

মাঝে মাঝে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছিল। ইন্দিরের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ঔষধ খাওয়াইবার বিড়ম্বনা বড় একটা ছিল না—ডাক্তার কয়েকদিন আগেই বলিয়াছে আর কোন আশা নাই।

হঠাৎ যেন সম্বিৎ পাইয়া নয়নকালী বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। চুপি চুপি ইন্দিরকে কাছে ডাকিয়া বলিল, ইন্দির, শুনতে পাচ্চিস্? ঐ বোধ হয় তিনি আসচেন। শুনতে পাচ্চিস্ তাঁর পায়ের শব্দ?

বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া ইন্দির বলিল, ও বাতাসের শব্দ, মা। বাইরে ঝড় উঠেচে।

সমস্ত রাত্রি এই রকম ধস্তাধস্তির পর ভোরের দিকে নয়নকালীর দেহ একেবারে ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেল। কেবল মনে হইল ঠোঁট দুটি যেন তখনো কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিতেছে, দেখা হ'ল না।

পরের দিন সকালে ইন্দির কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিল না। পাড়ার সকলকে খবর দিয়া মৃত দেহের সৎকার করাইল এবং নিজের কাঁধে ছেলেটির এবং মেয়েটির সমস্ত ভার তুলিয়া লইল।

* * *

ইহার অনেক দিন পরে বিপিন একদিন দেশে ফিরিয়া আসিল। মথুরা, বৃন্দাবন, আজমীর, এলাহাবাদ প্রভৃতি দেশ বেড়াইয়া এবং জমিদারের ছেলের সঙ্গে স্ফূর্ত্তি করিয়া সে যখন গ্রামে আসিবার অবকাশ পাইল তখন দারুণ ব্যাধি তার শরীরকে আক্রমণ করিয়াছে। কেহ বলিল, থাইসিস্, কেহ বলিল, রক্তপিত্ত, কেহ বলিল, পুরানো অম্ল। কিন্তু শয্যা তাকে আশ্রয় করিতেই হইল। কয়েক দিন তার চিকিৎসার যখন কোন বন্দোবস্ত হইল না তখন জমিদারের লোক এক দিন গাড়ী করিয়া তাকে মহকুমার হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

যাওয়ার আগে কিছুক্ষণের জন্য ইন্দিরের সঙ্গে বিপিনের কথা হইয়াছিল। তার চোখের দিকে তাকাইয়া বিপিন বলিল, অনেক কষ্ট দিলুম।

আপনি কষ্ট দিতে যাবেন কেন, আমার কপালে লেখা ছিল।

কিন্তু তোমার কষ্টের জন্য আমিই ত দায়ী। তোমাকে মাইনে কিছু দিতে পারিনে. এমন কি পেটভরে দু'বেলা দুটো খেতে দিতে পারিনে।

তাতে আমার কোন কষ্ট বোধ হয় না। মানুষের শরীরে ক্রমে সব সয়ে যায়। বিপিনের সেদিন সত্যই বোধ হয় অনুতাপ হইয়াছিল। তাই না থামিয়া আবার বলিল,

তোমার বাপ মা আত্মীয় বন্ধু সকলের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলুম কিন্তু কোন সুখীই করতে পারলুম না।

ইন্দিরের চোখ এবার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তবু নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, আপনি এসব কথা মনে করে আজ দুঃখ পাচ্চেন কেন? আমি ত আগেই বলেচি আমার মনে কোন কষ্ট নেই। আমি কল্যাণেশ্বরীর কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিলুম তাই এখানে এসেছিলুম। আপনি ভালয় ভালয় সেরে ফিরে আসুন। ততদিন আমি এখানে রইলুম।

বিপিন বিচলিত হইয়া বলিল, আমি কি আর সারতে পারব? তুমি কি বুঝতে পারচ না যে এই শেষ? আমার এতদিনকার পাপের পূর্ণ ফল এইবার ফল্‌বে।

যাওয়ার সময় অমন কথা বল্‌তে নেই। ও সব অলক্ষণের কথা। অসুখ বিসুখ কি মানুষের হয় না? আপনি ভয় পাচ্চেন কেন? আপনি সেরে না উঠ্‌লে আপনার ছেলেমেয়েকে কে দেখ্‌বে?

ট্রেণের সময় হইয়া আসিয়াছিল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের হাঁকডাকে বিপিনকে রওনা হইতে হইল।

* * *

তারপর বোধ হয় একমাসও পেরোয় নাই এমন সময় জানা গেল বিপিন সেই হাসপাতালেই তার অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে।

ইন্দিরের জীবনে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ছেলেটির এবং মেয়েটির গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যতটুকু পরিশ্রম করা দরকার তার বেশি সে যেন আর পারিয়া উঠে না। কিসের একটা অপরিসীম ক্লান্তি তার দেহ এবং মনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে। পাড়ার অনেকে বেশি মাইনে দিয়া তাকে ঝি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সে বিপিনের ভাঙা ঘর ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতে রাজী হইল না।

একদিন সবিস্ময়ে সকলে দেখিল ইন্দির সেই ঘরে মরিয়া পড়িয়া আছে। কি করিয়া মরিল তার সঠিক খবর কেউ দিতে পারিল না। কেউ বলিল আত্মহত্যা করিয়াছে, কেউ বলিল ভূতে মারিয়াছে।

পাড়ার পরার্থপরায়ণ লোকেরা বিপিনের মেয়েটিকে কলিকাতা কর্পোরেশানের একটি স্কুলে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিল। কুলটির একটি বাবু ছেলেটিকে বাসায় স্থান দিল—সে বিপিনের সঙ্গে চাকরি করিয়াছিল।

* * *

উপরের কাহিনীটি বলিতে যত সময় লাগিল ভাবিতে তত সময় লাগে নাই। যখন ঘটনাটি আগাগোড়া মনে মনে আলোচনা করিয়া লইয়াছি তখন দেখিলাম ট্রেণ ধীরে ধীরে কুলটির প্ল্যাটফর্ম্ম ত্যাগ করিতেছে। ইন্দিরের বিদেহ আত্মাই আমার মনে ঘোর লাগাইয়াছিল বোধ হয়! সে হয়ত সেই সুদূর পাড়াগাঁ হইতে এই কুলটিতেই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

কারাগার

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

আমার যৌবন ঘিরে সখী তব রূপকারাগার
এ বন্ধনে মুক্তি নাই, এ মিলনে বিচ্ছেদ যে নাহি,
এ জীবন তট ঘিরে তব প্রেম অশ্রু পারাবার
উদ্দাম উন্মত্ত হয়ে নিত্য—নিত্য ওঠে গান গাহি!

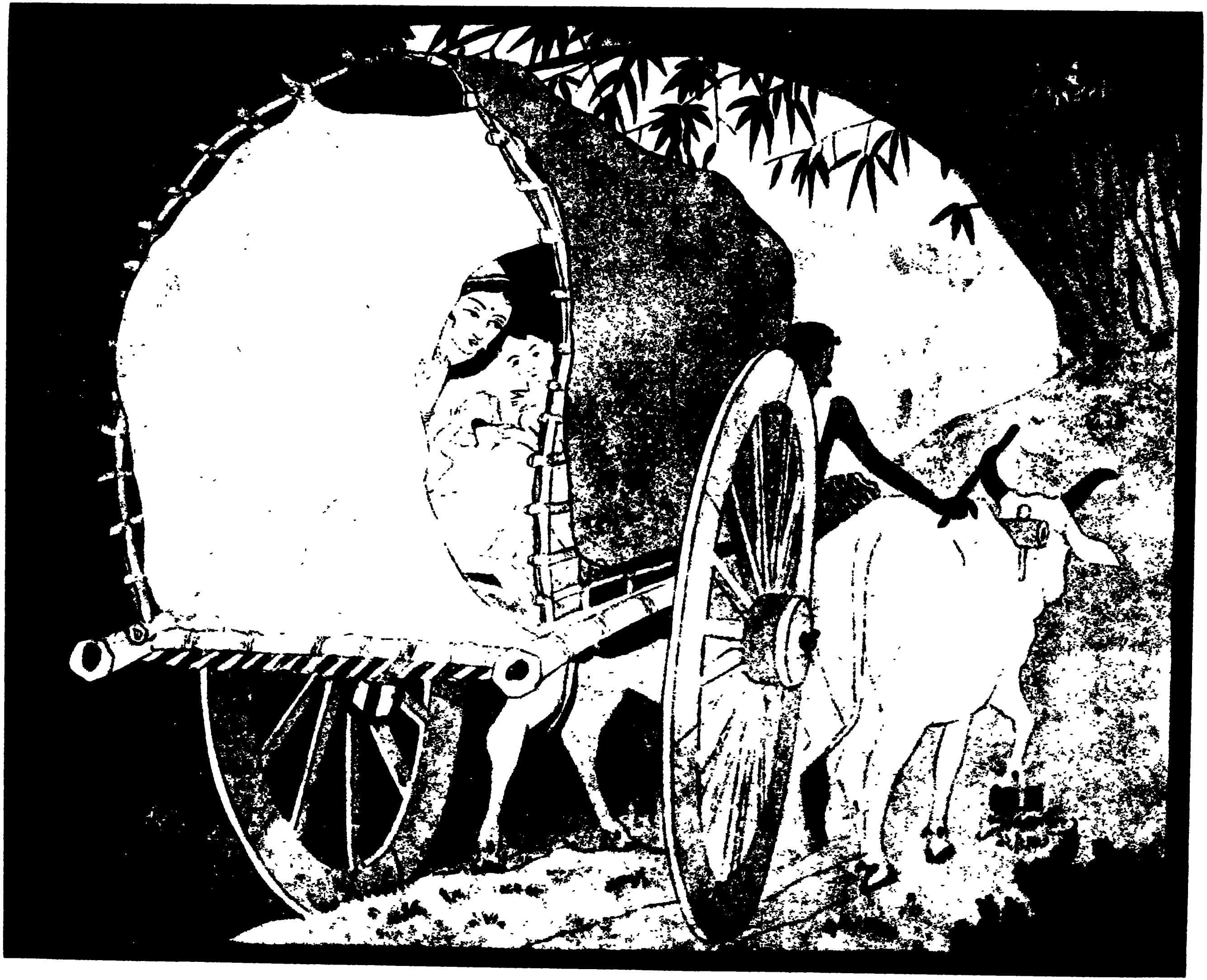
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে হে বিচিত্রা মায়া-মন্ত্রে তব
মুগ্ধ মনের মোর স্বপ্নগুলি জাগে ধীরে ধীরে;
আমারে আজন্ম বন্দী রেখেছে ও স্পর্শের সৌরভ
আত্মার আত্মীয় তুমি রহিয়াছ আলিঙ্গনে ঘিরে।

আমার সঙ্গীতে আজ বিলাসিয়া ওঠে তব চোখ
আমার সকল ছন্দ অলি সম বন্দে তব পায়;
সব অন্ধকার আজ তোমার আলোকে লয় হোক
ওগো জ্যোতির্ম্ময়ী আজ জ্বলে ওঠো যৌবন বিভায়।

আমরা বেসেছি ভাল দেহ মনে পবিত্র মধুর
নশ্বর দেহের মাঝে অবিনাশী আমরা প্রেমিক;
মোদের দৃষ্টির সাথে মিলিয়াছে আকাশের সুর
মোদের অন্তর-বীণা ধ্বনিয়া তুলেছে দশ-দিক্।

মর্ম্মের নিগূঢ়-লোকে তব সহ-মর্ম্মীতা হে প্রিয়া
অপরূপ-অনুভবে তৃপ্তি আনে অদ্ভুত আবেশে;
আমার আমিত্ব আজ তব রূপে উঠেছে রাঙিয়া
মোদের মিলনে তাই সারা সৃষ্টি উঠিয়াছে হেঁসে।

ক্রন্দন হয়েছে হাঁসি, ব্যথা হোলো নিগূঢ় পুলক
আজ মনে হয় মোর পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ আমি;
তব রূপে তব প্রেমে একাকার ভূলোক দ্যুলোক
ব্যথাহীন এ বন্ধনে আছে প্রাণ চির অগ্রগামী।



বাপের বাড়ীর পথে

রাশ্যার সাহিত্য

শ্রীসুনীল মজুমদার

'Thou art the barren one,
And the abundant one
And the ascended one
Dear mother Rus' !'

—Nekrasov

রাশ্যার কবি নেক্‌রাসভের কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে বা যে কারণেই হোক রাশ্যার সাহিত্যেরও আর সেদিন নেই। বিগত একশো বছরের ভেতর রাশ্যার সাহিত্য এমনি একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছে যে সমগ্র জগতের যুগপৎ দৃষ্টি পড়েছে গিয়ে তার ওপর। তার ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলো এখন নানা ভাষায় অনুবাদিত হ'য়ে পৃথিবীর এক সীমা থেকে সীমান্তরে তারই বিজয়পতাকা ওড়াচ্ছে। তাই আমরা সুদূর বাঙ্‌লার নিভৃত কোণে বসেও গোগোল, ডষ্টয়েভ্‌স্কী, টলষ্টয়, টুর্গেনিভ প্রভৃতি কথাসাহিত্যিকদের— ইভান ক্রিলভ, জুকোভ্‌স্কী, পুস্কিন, লারমনটভ, টুচেভ, নেক্‌রাসভ প্রভৃতি যশস্বী কবিদের সাথে পরিচিত হ'বার সুযোগ পাই।

রাশ্যার সাহিত্যকে উন্নতির এই তুঙ্গশৃঙ্গে বসাবার জন্যে তার কত সাধককে যে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হ'তে হ'য়েচে তার ইয়ত্তা নেই। আবার এই উন্নতির পথে ঘোর অন্তরায় ছিল রাজরোষ। রাশ্যায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা তখন ছিলনা, এখনো নেই। রাজশক্তির অত্যাচার অনাচারের দুর্ব্বিসহ ভার সইতে সইতে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষ অরাজকতা রাশ্যার বুকের ওপর তাণ্ডবনৃত্য কোরতে ছিল। কে কোথায় অযথা কিছু লিখে গোলমাল বাঁধিয়ে তোলে এই ভয়ে গভর্ণমেণ্ট সদাই সন্ত্রস্ত থাকতেন। কারুর লেখার ভেতর যদি রাজদ্রোহের কোন একটু ছাপ থাক্‌তো তাহ'লে তার আর রক্ষে ছিলনা। তাকে সাইবেরিয়ায় রওনা করিয়ে দিয়ে তবে গভর্ণমেণ্ট শান্ত হ'তেন। এর ফলে সাহিত্যের সাধনা চুলোয় গেল। এ বিষয়ে দেশের ধনীসম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত লোকদের ত্রুটি ছিল যথেষ্ট। তারা সাহিত্যের উন্নতির জন্যে কোন চেষ্টাতো কোরতই না বরং ওটাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতো। তখন সবে মাত্র ফরাসী সভ্যতার আলোক-রশ্মি তাদের চোখে পড়েছে। তখন সবাই ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতো আর খাঁটি রাশ্যার ভাষা বলতো কুলী-মজুরেরা। সেখানে রাজভাষাও ছিল ফরাসী। চিঠিপত্র, বক্তৃতা—এসবই চল্‌তো ফরাসী ভাষায়।

'নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'য়ে' রাশ্যার জাতীয় ভাষা যখন সমাজের অনেক নীচুতে আশ্রয় গ্রহণ কোরেছিল তখন সেই পঙ্কিল থেকে সর্ব্বপ্রথম উদ্ধার কোরতে চেষ্টা করেন —সাইমন পোলোটোস্কী। তার বাড়ী ছিল কিভ নগরে। তখনকার দিনে রাশ্যার প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মস্কোতে। মস্কোতে এসে পোলোটোস্কীই প্রথম রুশভাষায় পদ্য লেখবার পথ দেখান। তাঁর কবিতা পড়ে সবারই মাতৃভাষার ওপর টান আসতে সুরু হোল—সে-সব কবিতার রস-মাধুর্য্যের সন্ধান পেয়ে। তখন সব শিক্ষিত লোকই ফরাসী জার্ম্মান ভাষার মোহ দূর করে রাশ্যার ভাষায় বই লিখতে সুরু কোর্‌ল। সাহিত্য হিসেবে এগুলোর মূল্য বেশী না হ'লেও এগুলোর সাময়িক মূল্য ছিল বেশী। এদেরই ভিত্তির ওপর বর্ত্তমান রাশ্যার সাহিত্য গড়ে উঠেছে।

সংস্কৃতে পশুপক্ষীর উপাখ্যান নিয়েই পঞ্চতন্ত্র রচনা হয়েছে—রাশ্যান্ সাহিত্যে সেই উপাখ্যানের স্রষ্টা ইভান ক্রিলভ। ক্রিলভের উপাখ্যানের ভেতর আছে—রাশ্যান জীবনের সুদৃঢ় যোগ ও বিশ্বজনীনতা। রাশ্যায় তাকে Grandfather Krylov বলে জানে। রাশ্যায় এমন কোন শিক্ষিত লোক নেই যে ক্রিলভ থেকে দু'চার লাইন আওড়াতে না পারে। রাশ্যার বল্‌শেভিক নেতা লেনিন তাঁর কথায়, বক্তৃতায় প্রায়ই ক্রিলভের উপাখ্যান থেকে উদাহরণ দিতেন।

ক্রিলভের এই উপাখ্যানের অন্তরালে জাতির ওপর দোষ ত্রুটির তীব্র কশাঘাত রয়েছে। সে-আত্মচেতনায়

মর্ম্ম বাণী ক্রিলভই পরবর্ত্তী সব কথা-সাহিত্যিকদের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ; তাই তারা বুকের রক্ত ঢেলে লেখনী চালাতে পেরেছিলেন।

ক্রিলভ অত্যন্ত দরিদ্র সংসার থেকে আসেন। আবার অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। মা ছোট শিশুপুত্রটীকে নিয়ে অকূলসাগরে ভাসলেন। অনেক নির্য্যাতন সহ্য কোরে অনেক কষ্টে তিনি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ক্রিলভের বয়স যখন পনেরো তখন থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি এক অনুরাগ আসে। কিন্তু অর্থচিন্তা সে চিন্তাকে দাবিয়ে রাখে। তাইতে তাঁর রাজধানীতে এসে অল্প বেতনে চাকরী নিতে হ'য়েছিল। অবসর সময়ে তিনি লেখাপড়া ও পত্রিকা পরিচালনায় মন দিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি তাঁর উপাখ্যানগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর প্রতিভার বিকাশে রাশ্যার তদানীন্তন সকল কবিগণ তাঁকে আদরে দলভুক্ত কোরে নিলেন। এবং রাজাও তাঁকে Imperial Libraryর প্রধান কর্ত্তা কোরে দিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ছিয়াত্তর বছর বয়সে অতিরিক্ত আহারের জন্যে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সব খরচ দিয়েছিলেন রাজা এবং বহু গণ্যমান্য রাজকর্ম্মচারী তাঁর শববাহক হ'য়েছিলেন।

রাশ্যার রোমাণ্টিক কবি জুকোভ্স্কীর জীবন চরিত একটু বিচিত্র। তার পিতা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ জমিদার— কিন্তু মা ছিলেন তুর্কী ক্রীতদাসী। তাঁর জন্ম হ'য়েছিল বিগত ১৭৮৩ সালে। সৎ-ভাইদের সাথে লালিতপালিত হওয়ায় জুকোভ্স্কীর আদরের সীমা ছিলনা। যৌবনে তিনি aristocratic familyর ছেলেদের কলেজ University Pension for Noblesএ ভর্ত্তি হন। কলেজের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি প্রথম নিকোলাসের পত্নীর সাহিত্যের শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হ'ন। কিছুকাল পরেই যুবরাজদের গৃহশিক্ষকের কাজে ব্রতী হয়ে এক রকম রাজপরিবারভুক্তই হ'য়ে যান।

জুকোভ্স্কী রোমাণ্টিক কবি। রাশ্যার সাহিত্যের বেদনার অশ্রুমতী অন্তরলক্ষ্মী প্রথম তাঁর কবিতাতেই অশ্রুর বন্যা বইয়েছিলেন। জুকোভ্স্কী একজন ভাল অনুবাদকও ছিলেন। তাঁর Grayর Elegy, Byronএর The Prisoner of Chillion, Schiller প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ রাশ্যার সাহিত্যে এক বিশেষ আসন দখল করেছে। তিনিই প্রথম সোরাব-রুস্তম ও নল-দময়ন্তীর অনুবাদ করেন রাশ্যান ভাষায়। যখন নেপোলিয়ন মস্কোতে প্রবেশ করেন তখন জুকোভ্স্কী তাঁর বিখ্যাত কবিতা "Bard in the Camp of the Russian Warriors." রচনা করেন। তাতে এক জায়গায় আছে—

> "This brimful goblet Love to thee !
> Amid the fighting gory,
> Throb, comrades with a sacred glee :
> Love is at one with glory."

আবার ভগ্ন-আশা ক্লান্ত সৈনিক দেখতে পায়—

> "She on the standard flutters high,
> She is close to us in battle."

রাশ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি পুস্কিন জুকোভ্স্কীর কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন,—When harking to them, youth will sigh for greatness. তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৫২ সালে।

রাশ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—পুস্কিন। তিনি রাশ্যার জনসাধারণের বড় আদরের কবি। কারণ রাশ্যার অন্তরের দুঃখ, জনসাধারণের দুঃখের ইতিহাস মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতার ভেতর। তাঁর লেখায় আছে একটা মুক্ত সহজ, সরল ভাব। তাতে পর্দ্দার কোন ঢাকনা নেই। যেমন এক-দিকে রাশ্যার অন্তরের কাম্য কথা—Ode to Libertyতে

> "Hark to the Truth, Ye Tsars and Kings
> Neither rewards nor persecutions,
> Nor prison's gloom, nor altars wings
> Can shield you, safe from revolutions,"—

"ওহে জার, নির্ম্মম সত্য শোন—পুরস্কার নির্য্যাতন, কারাগারের ভয়াবহ আঁধার, ধর্ম্মের আবরণ—এর কোনটীই আজ তোমাকে বিপ্লবের বহ্নি থেকে রক্ষা কোরতে পারবে না।" এই হ'য়েছে পুস্কিনের অন্তরের একদিক। তাঁর দৌর্ব্বল্য আমরা দেখতে পাই Tenth Commandmentএ। সেখানে তিনি ভগবানকে উদ্দেশ্য কোরে বলেছেন—হে ভগবান, দশটী অনুজ্ঞা সবই আমি পালন কোরতে প্রস্তুত, প্রতিবেশীকেও ভাই বলে গ্রহণ কোরতে পারি—

"But if his youthfullest maid-servant
Is pretty—Lord! There I am weak."

একদিকে যেমন তাঁর তেজদীপ্ত উক্তি আবার আর একদিকে তেমনি হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য। এ দৌর্ব্বল্য কেবল পুস্কিনের নয়—সমগ্র রাশ্যান জাতির। রাশ্যার জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও দুর্ব্বলতার সাথে পুস্কিনের কবিতা সমভাবে যাতায়াত করেছে। তাই পুস্কিন রাশ্যার আদরের, গৌরবের কবি।

পুস্কিনের জীবনচরিতও বিচিত্র। তিনি ছিলেন বড় ঘরের ছেলে। তিনি যে ঘরের ছেলে, সেখানে অভিজাত রাশ্যার সকল দোষ পরিপূর্ণ মাত্রায় এসে গিয়েছে। পুস্কিনের পিতা ছিলেন খাঁটি রাশ্যান, তাছাড়া রাশ্যার নিজস্ব বলতে সে বাড়ীতে আর কিছু ছিল না। তখন ফরাসী সভ্যতা, ফরাসী সাহিত্য রাজপরিবার থেকে আরম্ভ কোরে সকল অভিজাত মহলে এসে আস্তানা গেড়েছিল। পুস্কিনের বাড়ীর সবাই এই ফরাসী আওতায় পড়ে গিয়ে একেবারে খাঁটি ফরাসীদের মতো হ'য়ে গেলেন। কাজে কাজেই পুস্কিনও বারো বছর বয়সেই রুশো, ভলটেয়ার মেলোয়ারের সাথে পরিচিত হ'বার সুযোগ পেয়েছিলেন। এবং সেই সময় বালক পুস্কিন মেলোয়ারের অনুকরণ কোরে ফরাসী ভাষায় এক নাটক লিখে ভাইবোন ও পাড়াপরশীদের নিয়ে ওর অভিনয় করেন।

রাশ্যায় তখন বড়লোকের ছেলেদের শিক্ষার জন্যে Lyceum খোলা হ'ল। পুস্কিন বারো বছর থেকে সতেরো বছর পর্য্যন্ত Tsarskoyeseliর Lyceumএ অধ্যয়ন করেন। সেখানে পড়া মানে to enjoy life to the lees. এই কলেজে মোট তিরিশটি ছেলে পড়তো। কিছুদিন যেতে না যেতেই তার পরিচালক গেলো মরে। তাঁর স্থান অধিকার কোরে কলেজ চালাবার মতো সামর্থ্যের একটা লোকও জুটলো না। পুস্কিন নিজে একটা দল গঠিত কোরে তিনি নিজে তার Anacreon হ'লেন, আর তাদের মদ, প্রেমাভিযান, কাব্যচর্চ্চা—এই তিনটে সোনার চাকায় তাদের জীবন-রথ চলতে সুরু কোরল।

একবার Lyceumএর বাৎসরিক সভায় রাশ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ critic বৃদ্ধ D'erjavin সভাপতি হ'লেন। একে একে Lyceumএর সকল ছেলেই তাদের রচনা পড়ে যেতে লাগলো। তারপর সুরু হ'ল পুস্কিনের পালা। বৃদ্ধ সভাপতি এতক্ষণ চোখ বুঁজে সব শুনছিলেন। কিন্তু পুস্কিনের রচনায় তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় পেয়ে চোখ খুলে চেয়ে দেখলেন। তারপর পুস্কিনকে ডেকে এনে আলিঙ্গন কোরলেন।

এ ঘটনার পর পুস্কিনের নাম সমস্ত দেশ ও রাজপরিবারে ছড়িয়ে পড়লো। জুকোভ্স্কী নিজে তরুণ কবি পুস্কিনকে ডেকে আত্মীয়তা কোরলেন। ক্রমে এমন মিল হ'য়ে গিয়েছিল যে জুকোভ্স্কী কোন কাব্য লিখে পুস্কিনকে না শুনিয়ে সেটা ছাপাতেন না। জুকোভ্স্কী মারা যাওয়ার আগে তাঁর নিজের একখানা photo পুস্কিনকে দিয়ে যান, —তার নীচে লেখা ছিল—

"To the victorious pupil from his conquered teacher."

পুস্কিন সতেরো বছর বয়সে পড়া শেষ কোরে রাশ্যার Foreign Officeএ Civil Serviceএ যোগদান কোরলেন। এখানে থেকেই তিনি তাঁর প্রথম কাব্য 'Ruslan and Ludmilla' প্রকাশ করেন।

রাশ্যা আনন্দে বিস্ময়ে এই কাব্যের কবির দিকে ফিরে চাইলো। তার কারণ পুস্কিনের কাব্যে তারা পেলো তাদের প্রতিদিনের সুখদুঃখের কথা, তাদের দিনরাত্তির, তাদের আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাভিলাসের কথা—অর্থাৎ Realism বা Naturalism যাকে বলে তাই।

চিরপুরাতন বিধি ব্যবস্থার চাপে মানুষ যখন অস্থির হ'য়ে ওঠে, সে চায় তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন—সে চায় পুরাতনকে ভেঙে ফেলে নতুনকে গড়ে তুলতে। অত্যাচারে অনাচারে নিষ্পেষিত হ'য়ে রাশ্যার জনসমাজ জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দল প্রতিষ্ঠিত কোরতেছিল। এ সময় রাশ্যায় Decembrist দল গড়ে ওঠে। পুস্কিনও আভিজাত্যের দল ছেড়ে এই দলে যোগ দিলেন। তখনই তার লেখনী দিয়ে বিখ্যাত কবিতা 'Ode to Liberty' বেরিয়েছিল।

"Looking around I ever face
Whips upon whips and fetters groaning,

Law's peril in a world's disgrace
And helpless slaves forever moaning."

—যেদিকে মুখ ফেরাই, সেদিকেই দেখি আঘাতের পর আঘাত চল্‌ছে—যেদিকে কান পাতি সেদিকেই শুনি শৃঙ্খলের ক্রন্দনধ্বনি, বিচার আজ পৃথিবীর নির্লজ্জতায় আত্মগোপন করেছে আর অসহায় সম্বলহীন ক্রীতদাসগুলো অনন্তকাল ধরে বিলাপ কোরে চলেছে।

এ সকল কবিতা সাধারণে প্রকাশিত হচ্ছে দেখে আলেকজান্দার পুস্কিনকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন করবার হুকুম দিলেন। কিন্তু জনকতক গণ্যমান্য ব্যক্তির অনুরোধে অবশেষে তাকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত না কোরে Bessarabiaতে এক রাজকার্য্যের ভার দিয়ে পাঠানো হ'ল। এই নির্ব্বাসনের অবসরে কাব্য-লক্ষ্মী পুস্কিনের অন্তরকে নানা কবিতায় পুষ্পিত কোরে দিলেন। তারপর সেখান থেকে Pskov প্রদেশে তাকে নির্ব্বাসিত করা হ'ল। এখানে বাস করার পর তাঁর লেখনী জয়যুক্ত হ'য়ে ওঠে। রাশ্যার তুহিনস্তরা তেপান্তরের মাঠ—তার নিশীথের নিস্তব্ধতা—শীতের আবির্ভাবে তুহিন ঝঞ্ঝা সব ছবি তাঁর কবিতার স্তরে স্তরে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো। এ সময় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Autumn', 'The Devils' ও কাব্য 'Evgini On'egnin' রচনা করেন।

Poet of Superhumanity বা জীবনাতীতের কবি লারমনটভের জন্ম হ'য়েছিল ১৮১৪ সালে। পুস্কিনের কাছে প্রকৃতি বা চিন্তারাজ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলে মনে হ'ত যখন এই জীবনের সাথে আত্মীয়তা স্থাপিত হ'ত। কিন্তু লারমনটভ্‌ এই পৃথিবীর লোক হ'য়েও ছিলেন—প্রবাসী। পৃথিবীর সমুদ্রসৈকতে কতো সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হ'য়েছে—কতো তারা আকাশে ঝল্‌মল্‌ কোরে সূর্য্যালোকে নিবে গিয়েছে—এ সবই তাঁর মনে গভীর ছোপ লাগিয়ে দিয়েছিল। তাই তাঁর কাব্যে আমরা অনন্তের কথাও দেখতে পাই। তাই Merejkovski বলেছেন—He remembered the future of Eternity.'

ছোটবেলা থেকেই বালকের প্রতিভা লোকচক্ষু এড়ায়নি। রীতিমত শিক্ষালাভ কোরে কৈশোরে পদার্পণ করার সাথে সাথেই তিনি বহু য়ুরোপীয় ভাষা আয়ত্ত কোরে ফেললেন।

যখন লারমনটভের বয়স পনেরো বছর তখন তিনি তাঁর ঠাকুরমার সাথে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে ককেসাস্‌ পাহাড়ে বেড়াতে যান। সেখানে নিবিড় সৌন্দর্য্যের ভেতর বালকের কবি-প্রতিভা বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'The Demon' এই পাহাড়ের পাদমূলেই আরম্ভ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত কোরে লারমনটভ্‌ প্রবেশ কোরলেন সৈন্য বিভাগে। এ সময়ই তার কাব্য The Demon প্রকাশিত হয়। তখন সমগ্র রাশ্যা যুগপৎ নেত্রে এই কাব্যের কবি-সৈনিকটীর দিকে চেয়ে রইলো।

এক ওজস্বিনী ভাষার কবিতার জন্যে লারমনটভ্‌কে বন্দী করা হোল। এবং বিচারে তাঁকে ককেসাস্‌ পাহাড়ে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই নির্ব্বাসনকে লারমনটভ্‌ পুরস্কার বলে মেনে নিলেন। কারণ ককেসাস্‌ পাহাড়ের নিবিড় সৌন্দর্য্যে নিত্য অবগাহন করা তাঁর কাছে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলে মনে হোল। লারমনটভ্‌ ককেসাস্‌ পাহাড় থেকে কাব্য লিখে রাজধানীতে পাঠাতে লাগলেন প্রকাশিত করবার জন্যে। এ ধারে তাঁর ঠাকুরমার করুণ আবেদনে লারমনটভ্‌ নির্ব্বাসন দণ্ড থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু ১৮৪০ সালে আবার তাঁকে নির্ব্বাসিত করা হয়। এখানেই তাঁর জীবনশিখা নিবে যায়। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৪১ সালে।

রাশ্যার জনসাধারণের বড় আদরের কবি নেক্‌রাসভের জন্ম হয়েছিল ১৮২১ সালে। তখন রাশ্যায় ক্রীতদাস প্রথা বিভীরূপ ধারণ কোরেছে। দেশের চারদিকে তখন ভয়ানক অবস্থা! দুর্ভিক্ষ, মহামারী গ্রামের পর গ্রামকে শ্মশান কোরে তুলছিলো। এ সময়ই রাশ্যায় এক আমূল পরিবর্ত্তনের কল্পনা চলছিলো। রাশ্যার সাহিত্যের সম্মুখে তখনো মুটে, মজুর, কুলী আর সব নতুন মানুষের দল। এ সব দলই নির্য্যাতনের ভেতর দিয়ে মানবতার কল্যাণ স্বপ্ন এনে দিল।

নেক্‌রাসভ্‌ এ সব নতুন মানুষদের কবি। তখনকার রাশ্যার প্রকৃত রূপ নেক্‌রাসভের কবিতায় মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। নেক্‌রাসভের জীবন বড় দুঃখে কেটেছিলো। তাঁকে কখনো

কখনো পথের ভিখারীর জীবন অতিবাহিত কোরতে হয়েছে। এ সময় তাঁর জীবনের পরিচয় আমরা পাই তাঁর—'Who lives in mother Russia now quite happily and free ?'

আজকালও প্রত্যেক রাশ্যানদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়—

'Thou art the barren one,
And the abundant one
And the ascended one
Dear mother Rus' !''

'হে জননী রাশ্যা, তুমি আজ রিক্ত, কাল তুমি পূর্ণ হবে। আজ তুমি নিপীড়িত—কাল, তুমি আবার মহীয়সী হবে—হে জননী রাশ্যা!' রাশ্যার বিরাট নবজাগরণের সাথে মিলিয়ে পড়লে কবির ভবিষ্যৎ বাণী সফল হ'য়ে ওঠে।

* * * *

রাশ্যার প্রথম নামজাদা ঔপন্যাসিক হচ্ছেন নিকোলাস গোগোল। তিনি জাতিতে ছিলেন কসাক। এঁর জন্ম হয়েছিল ১৮০৯ খৃঃ আর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৫২ সালে। প্রথম জীবনে গোগোল গভর্ণমেণ্টের আফিসে কেরাণীগিরি কোরতেন। শেষে কিছুকাল পর তিনি সেণ্ট্ পিটার্স বর্গ ইউনিভার্সিটীর ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'লেন। 'ইনস্পেক্টার জেনারেল' নামে একখানা হাস্যরসাত্মক নাটক লিখে গোগোল অসামান্য যশ অর্জ্জন কোরেছিলেন। য়ুরোপের সকল দেশের নাট্যশালায় সেখানা অভিনীত হ'য়েছিল।

পুস্কিনই রাশ্যার কথাসাহিত্যের প্রবর্ত্তক গোগোলকে আবিষ্কার কোরে 'মৃত-আত্মা' ও 'ইনস্পেক্টার জেনারেল' নামক দু'খানা বিখ্যাত বইয়ের plot বলে দিয়েছিলেন। গোগোলের লেখা পড়ে পুস্কিন বলেছেন—'That rascal robs me in such a bewitching way that it is impossible to be angry with him. —অর্থাৎ পুস্কিনের দেওয়া বিষয় গোগোল এ ভাবে আত্মস্থ কোরেছেন যে তাতে পুস্কিনের বড় একটা দাবী থাকতে পারে না।

'মৃত-আত্মা' বইখানা তিনি লিখেছিলেন রোমে। তাঁর মতলব ছিল বইখানাকে তিন খণ্ডে লেখার। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম খণ্ড লিখে দ্বিতীয় খণ্ড খানিকটা লেখার পরই তাঁর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়, বইখানা তাই শেষ হয়নি। তাঁর উপন্যাস সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যে ছিল অসীম তা তাঁর বই দু'খানা পড়লেই বেশ বোঝা যায়। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে যে তিনি রাশ্যার সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী কোরে তুলতে পারতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাশ্যার সাহিত্যকে রাশ্যার বাইরে জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত কোরে দিয়েছিলেন আইভান টুর্গেনিভ। প্রায় সকল রাশ্যার সাহিত্যিকদের মতো গভর্ণমেণ্টের অপ্রীতিকর কটাক্ষের ভেতর দিয়ে টুর্গেনিভকেও আপনার আসন নির্দ্দেশ কোরতে হয়েছিল। রাশ্যার গভর্ণমেণ্ট তাঁকে কোন কারণে তাঁর নিজের বাড়ীতেই নজরবন্দী কোরে রেখেছিলেন। তারপর সেখান থেকে জার্ম্মানী হয়ে প্যারীতে একেবারে আস্তানা গেড়ে বসলেন।

টুর্গেনিভের লেখার ভঙ্গীই আলাদা-রকমের। রাশ্যা থেকে দূরে থাকতে থাকতে তিনি সে-সময়কার রাশ্যার সমাজের চিত্র আঁকতে কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। লেখার সময় প্যারীর পারিপার্শ্বিক প্রভাব তাঁর উপন্যাসে বিস্তার লাভ কোরেছে। আর অল্প কথায় বক্তব্য শেষ করা ছিল তাঁর অভ্যাস-বিরুদ্ধ। তাই সুযোগ পেলেই কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে তবে ছাড়তেন।

টুর্গেনিভের প্রথম লেখা 'খেলোয়াড়ের নক্সা'। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'পূর্ব্ব ও উত্তর পুরুষ' হলেও তিনি দেশ বিদেশে নাম কোরেছেন 'ভদ্র-ঘরাণা' লিখে। তাঁর বুড়ো বয়সের লেখা 'অকৃত ক্ষেত্র' অন্যগুলোর তুলনায় তেমন ভাল হয় নি।

রাশ্যার চরিত্র সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদের মতে থিওডোর ডষ্টয়েভ্স্কিই হচ্ছেন রাশ্যার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। যৌবনের প্রারম্ভেই ডষ্টয়েভ্স্কির আশা ছিল যে তিনি সমর-বিভাগে চাকরী করিবেন। তাই তাঁর শিক্ষাও তেমনি ভাবে সুরু হোল। সাহিত্যচর্চ্চা শেষে সখের খাতিরে

আরম্ভ কোরেছিলেন! তিনি জনসমাজে পরিচিত হ'ন 'গরীব লোক' নামক একখানা উপন্যাস লিখে। তারপর রাজদ্রোহীদের সাথে ষড়যন্ত্র করায় অভিযোগে পুলিশ একদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল কিন্তু কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির পরামর্শে এ দণ্ডাজ্ঞা রহিত হয়ে তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়। এই নির্ব্বাসনের স্মৃতি তাঁর মনে এক গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল।

সাইবেরিয়ায় কয়েদীদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচর হোত তা দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে এ ভাবে মানুষ আর বেশী দিন মানুষের ওপর অত্যাচার কোরতে সক্ষম হবেনা। তাঁর আরো ধারণা ছিল যে শীগ্‌গিরই ভগবানের কাছ থেকে একটা প্রতিক্রিয়া এসে পৌছবে যাতে মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। মানুষ তখন আর কুকাজ কোরে পাপের বোঝা বাড়াতে চাইবে না।

'সাইবেরিয়ায় জীবন্ত কবর' নামক বইয়ে ডষ্টয়েভ্‌স্কি তাঁর কারা জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ কোরেছেন। রাশ্যার তখনকার গভর্ণমেণ্টের পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ যদি কারুর জানবার আগ্রহ হয় তবে তাঁকে সে-বইটে পড়ে দেখতে বলি। 'দোষ ও দণ্ড' নামক উপন্যাসেও তিনি সাইবেরিয়ার অত্যাচারের কথা লিখেছেন। যে বইখানা লিখে তাঁর যশ রাশ্যার এক সীমা থেকে সীমান্তরে পৌছেছিল তার নাম 'বোকা'। তাঁর রচনার ভেতর এমন একটা মধুর করুণ-বিষাদের ভাব আছে যে তা' পড়ে বিশ্বের সাহিত্যরসসন্ধিৎসু ব্যক্তি বিস্মিত হ'য়ে থাকেন।

ডষ্টয়েভ্‌স্কি মারা যান ১৮৮১ খৃঃ। মৃত্যুর পর তিনি যে সম্মান পেয়েছিলেন বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তেমন সম্মান অর্জ্জন কোরতে পারেন নি। মৃত্যুর পর রাশ্যার প্রত্যেক প্রদেশ থেকে অসংখ্য নরনারী শবানুগমন কোরতে এসেছিল।

টুর্গেনিভ ও কাউণ্ট টলষ্টয় যদিও শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে খ্যাত হয়েছেন কিন্তু জগতের লোক কিন্তু টলষ্টয়কে বেশী আপনার বলে চেনে। তার একটা কারণ হচ্ছে যে টলষ্টয় বেশীর ভাগই জনহিতকর বই লিখেছেন। তিনি তাঁর উপন্যাসের ভেতর কথার ছলে—রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্ম ও সামাজিক নীতিকে ঠিক এমনি ভাবে বুঝিয়ে লোকের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন যে যারা সে সব বই পড়েছে তারাই মুগ্ধ হ'য়েছে স্রষ্টার তুলির আঁকে। একজন ইংরেজ লেখক তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—'Count Tolstoy is the landmark in the world of literature.'—কাউণ্ট টলষ্টয় সাহিত্যের জগতে একটা দেখবার জিনিষ—কথাটা মিথ্যে নয়। সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে তার শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে—'শান্তি ও সংগ্রাম' ও 'অ্যানা-কারেনিনা'। তাঁর অন্যান্য বই 'হাজি-মুরাদ', 'হারানো নিদর্শনপত্র,' রিসারেক্সন' ও 'ক্রুয়েজার সোনাটা' প্রভৃতি।

টলষ্টয় ছিলেন খাঁটি রাশ্যার লোক। তাঁর চরিত্রের ভেতর রুশ চরিত্রের সঙ্কীর্ণতা, একগুঁয়েমি প্রভৃতি দোষগুলোও যেমন ছিল আবার তেমনি সদাশয়তা, আতিথেয়তা প্রভৃতি গুণগুলোও তাঁর ভেতর ছিল যথেষ্ট।

সাইমন পোলোটোস্কী যে ব্রত আরম্ভ কোরেছিলেন কাউণ্ট টলষ্টয় তার উদ্‌যাপন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সৃষ্টি—বাধা বিপত্তি বা সমালোচনা থেকে বড়। তাই সৃষ্টির জলন্ত শিখায় যুগান্তব্যাপী অবহেলা বাধাবিপত্তি পতঙ্গের মতো জলে পুড়ে আজ রাশ্যার সাহিত্য আপনার বাঞ্ছিত স্থানে এসে পৌচেছে।

শ্রীসুনীল মজুমদার

হীরাবাই

শ্রীযামিনীমোহন কর

১

ডিসেম্বরের X'mas-এর ছুটীতে বন্ধু নন্দগোপাল বললে—"চল তোমাকে আমাদের গ্রাম রেওয়ারী দেখিয়ে আনি।" চিরকাল সহরে থাকি, কখনও গ্রাম দেখিনি। তাই দেখবার জন্ম মনটা নেচে উঠল। মাকে বল্লুম, মা মত দিলেন। চলে গেলুম দু'জনে রেওয়ারী।

হিন্দুস্থানী বন্ধু—খাওয়াত পেটভরে ডাল আর রুটী। রাত্রিবেলা দরজা বন্ধ করে ষ্টোভে ডিমটাও চলত। সমস্ত দিন বসে বসে গল্প করে কাটত। বিকেলে বেড়াতে বেরুতুম। এক নূতন বন্ধুও জুটেছিলেন। তিনি হ'লেন সেখানকার বৈদ্য ও সংস্কৃত পণ্ডিত।

দু' তিন দিন এই রকমেই কাটল। একদিন বিকেলে বেড়াতে যাচ্ছি পথে দেখি পায়ে 'লেডি শু' ও গায়ে ওভার-কোট পরা একটী মহিলা। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম—জিজ্ঞেস করলুম—"এ মরুভূমিতে ফুল ফুটল কি করে?" পণ্ডিতজী বল্লেন—"এখানকার Municipalityর Health Visitor"। "এর নাম জানেন" বলতে নন্দগোপাল বল্লে, "তোমার তাতে দরকার কি হে বাপু।" হেসে বল্লুম—"আহা চট কেন? তোমাদের দেশের ফুল তোমাদের দেশেই থাকবে—আমি তো আর নিয়ে পালাচ্ছি না।" পণ্ডিতজী বল্লেন—"নাম হীরাবাই"। মেয়েটী চলে গেছে গলি পেরিয়ে।

"আচ্ছা পণ্ডিতজী, এর বাড়ী কোথায় জানেন?" প্রশ্নটা নিজের কানেই কেমন শোনাল। নন্দগোপাল বল্লে—"তোমার বাড়ী জেনে কি হবে?" উত্তর দিলুম না। একটু এগিয়ে যেতে পণ্ডিতজী বল্লেন—"ঐ ওর বাড়ী।" নির্লিপ্ত ভাবে বল্লুম—"হুঁ।" এইবার তিনি জিজ্ঞেস কর্লে'ন—"বোস্, ওর সম্বন্ধে তোমার জানবার এত আগ্রহ কেন?" বল্লুম—"অমনি"।

২

পরদিন সকালে উঠেই দাড়ী কামাচ্ছি দেখে নন্দগোপাল বল্লে—"কি হে, হঠাৎ সকালেই—" কথাটা শেষ হবার আগেই আমি বল্লুম—"তোমায় কতকগুলি কথা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দাও তো।" সে বল্লে—"বেশ বল।" বল্লুম—"এই মেয়েটীকে তুমি বা পণ্ডিতজী কেউ চেন কি?" বল্লে—"আমি চিনিনা, পণ্ডিতজী চেনেন।"

জিজ্ঞেস করলুম—"এর সম্বন্ধে এখানকার লোকের কিরূপ ধারণা।" সে বল্লে—"খারাপ।"

বল্লুম—"হুঁ, আর কিছু এর বিষয়ে আমায় বলতে পার!"

সে বল্লে—"শুনেছি একজন Municipal Commissioner-এর সঙ্গে সে এখানে আসে; তারিফ্ পারিশে চাকরী পেয়েছে। তবে এখন চাকরী নিয়ে একটু টানাটানি পড়েছে কারণ আর সব মেম্বারেরা একে রাখতে চাইচে না, তারা এর নামে রিপোর্টও করেছে।"

আমি বলে উঠলুম—"ঠিক হয়েছে।"

সে অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে বললে—"কি ঠিক হয়েছে?"

আমি উত্তর দিলাম—"হীরাবাই-এর বাড়ী যাব—আজ খেয়ে দেয়ে। দুপুরবেলা সে নিশ্চয়ই বাড়ী থাকবে। কারণ, এখন জিজ্ঞেস কোরোনা—এসে তোমায় বিকেলে সবই বলব।"

বল্লে—"কিন্তু তাকে তো চেননা—আলাপ করবে কি কি করে?" একটু হেসে বল্লুম—"বুদ্ধির জোরে"।

খেয়ে দেয়ে উঠে নূতন সুট বাক্স থেকে বার করলুম। Stiff কলারের উপর টাই বেঁধে হাতে রিষ্ট ওয়াচ লাগিয়ে পায়ে নূতন জুতো পরে মাথায় হ্যাট দিয়ে যখন নন্দগোপালের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম, সে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বল্লে—"এ বেশ কেন?"

উত্তর দিলুম—এখন আমি এ Districtএর Divisional Superintendent. হীরাবাই তাকে চেনেনা, বাকী কথা বিকেলে—এসে চা খাব"—বলে বেরিয়ে গেলুম।

৩

পণ্ডিতজীর নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম হীরাবাই সেখানে আগে ছিল এখন নাই, তবে যদি আমি ইচ্ছা করি নূতন বাড়ী তারা বলে দিতে পারে। তারা দেখিয়ে দিলে। সেইখানে গিয়ে সাহসে ভর করে কড়া নাড়লুম। একটী ষোল সতের বছরের ছেলে এসে দরজা খুলে দিলে এবং একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে—"সাহেব আপনি কাকে চান?" আমি বল্লুম—"হীরাবাই এখানে থাকেন?" সে বল্লে—"হাঁ, ভিতরে এসে বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।" একবার দ্বিধা হ'ল, কিন্তু এখন আর ফেরা যায় না—গিয়ে বসলুম। সে ভিতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একটী তরুণী এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। বয়স বাইশ কি তেইশ হবে। চেহারাটা—যাক, সে বর্ণনাটা না হয় নাই করলুম, অবিবাহিত যুবকের পক্ষে খারাপ দেখায়। তবে দেখতে মন্দ নয়। বল্লুম—"তোমার নামই তো হীরাবাই।" বল্লে—"আজ্ঞে হাঁ।"

আমি বল্লুম—"দেখ তোমার বিরুদ্ধে কতকগুলি রিপোর্ট হেড আপিসে গেছে তাতে তোমার চাকরী না থাকবারই সম্ভাবনা বেশী। আমি হঠাৎ এখানে এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে এসেছিলুম—তাই জানতে এলুম কতদূর সত্যি। যদি মিথ্যা হয়, তবে আমি একবার চেষ্টা করে দেখব।" বল্লে—"আপনি বিশ্বাস করুন সব মিথ্যা কথা। দুষ্ট লোকে কত কথা বলে সবই কি সত্যি হয়। আর আপনি একবার ভেবে দেখুন এ চাকরী গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে। দেশে বিধবা মা আছেন, ছোট ছোট ভাই বোন আছে, তারা সব—"বলতে বলতে দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল, বল্লুম—"আর সময় নেই, আমার এখুনি যেতে হবে।" চোখের জল মুছে বল্লে—"আচ্ছা, আপনাকে আর আটকাব না; কাল কিন্তু একবার গরীবের বাড়ী পায়ের ধুলো দেবেন"—বলে এমন হাসল যে আমি একেবারে—

"কাল আসব"—বলে বেরিয়ে পড়লুম।

বাড়ীতে আসতে বন্ধু জিজ্ঞেস করলে—"কি রকম হোল—গিছ্‌লে?"

বল্লুম—"হাঁ"।

"কি বুঝলে?" "ধাঁধাঁ, বুঝতে পারলুম না।"

৪

পরদিন আবার গিয়ে পৌঁছলুম। হীরাবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, ডাক্‌তেই সঙ্গে করে একেবারে তার ঘরে নিয়ে গেল। বল্লে,—"জলটল কিছু খাবেন?" বল্লুম—"না, কি বলবে বল।"

ঈষৎ হেসে মিনতিভরাকণ্ঠে বল্লে—"আপনার জন্য আমি সরবৎ করে পান সেজে রেখেছি, খাবেন না?" বল্লুম—"আচ্ছা দাও।" সরবৎ খেলুম, পান খাই না তাও খেলুম।

বল্লে—"আপনাকে আমার সমস্ত ঘটনা আজ বলব বলে ডেকেছি, আপনি শুনে বিচার করবেন। আমি ইন্দোরে থাকতাম। আমরা দুই বোন তিন ভাই। বাবা মারা যেতে আমরা বড় মুস্কিলে পড়েছিলুম। আমার ভাই কিছু কিছু রোজগার করত, তাইতেই আমাদের চলত'। আমি নাগপুরে গিয়ে নার্সিং শিখতে লাগলাম। সেখান থেকে পাশ করে মথুরায় এসেছিলুম একটা চাকরীর সন্ধানে। ধর্ম্মশালায় গোবর্দ্ধনলালজীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁকে দুঃখের কথা জানাতে তিনি এখানে এনে আমার এই চাকরীটা করে দিয়েছেন—এতে কি কোন দোষ দেখেন?"

আমি বল্লুম—"যা বল্লে তাতে কিছু নেই বটে, কিন্তু কতকগুলি কথা জিজ্ঞেস করব, ঠিক উত্তর দেবে কি?" বল্লে—"করুন"।

"তুমি যা বল্লে তাই কি সব সত্যি, কিছুই কি লুকোও নি"—বলে দেখলাম সে যেন হঠাৎ কি রকম চমকে উঠল, পরে সামলে নিয়ে বল্লে—"সত্যি বইকি।"

তার চমকান দেখে ব্যাপারটা আন্দাজ করে অন্ধকারে

ঢিল ছুঁড়লাম—"গোবর্দ্ধন লালের সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধ নেই—লোকে যা বলে তা কি সত্যি নয় ?"

হঠাৎ কেঁদে ফেল্লে, বল্লে—"আপনি তাই বিশ্বাস করেন ?"

বল্লুম—"যা রটে তা কিছু তো বটে।"

চোখ মুছে বল্লে—"তিনি আসেন বলে লোকেদের চোখ টাটায়। অনেকে অনেক কথা বলে পাঠায়, আমি শুনিনা বলে তারা আমার নামে রিপোর্ট করেছে। আমি একেবারে নির্দ্দোষী, ভগবান আমার সহায়।"

বল্লুম—"তা বটে, তবে যাই।"

বল্লে—"এখনই যাবেন ?"

বল্লুম—"তিনটে বেজেছে, তোমার হাসপাতালে যাবার সময় হয়েছে।"

বল্লে—"হোক, হাসপাতাল তো রোজই আছে, আপনাকে তো আর চিরদিন পাবনা।"

কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলুম—উঠে দাঁড়ালুম, বল্লুম—"না যাই, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—"বেশ তবে যান, আপনাকে ধরে রাখবার ক্ষমতা তো আমার নেই।" দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে হঠাৎ হাতটা ধরে বল্লে—"কাল একবার আসবেন।" বলে ঈষৎ চাপ দিয়ে এমন ভাবে হাসলে যে আমি লজ্জায় "আসব" বলে কোন রকমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। মোড়ে গিয়ে ফিরে দেখি, তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

৫

এমনি করে রোজ রোজ যাওয়া আসাতে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল। সেদিন দুপুরে গেছি, হীরা জিজ্ঞেস কর্লে—"মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে, অসুখ করেনি তো।"

আমি বল্লুম—"না, মাথাটা একটু ধরেছে।"

হীরাবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে বল্লে—"তবে বসে থেকনা, একটু শুয়ে বিশ্রাম কর।" বলে আমার হাতটা ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে। মাথায় হাত বুলোতে ও হাওয়া করতে লাগল।

চোখ বুজে পড়ে রইলুম। সে চুপি চুপি জিজ্ঞেস কর্লে—"তুমি কি শীগ্‌গীরই চলে যাবে।" তেমনি ভাবেই থেকে বল্লুম—"হাঁ, কেন ?" বল্লে—"বোধ হয় আমায় ভুলে যাবে।" কথার উত্তর দিলুম না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—"তা ত' যাবেই, তোমরা পাঁচ কাজের মানুষ। মধ্যে মধ্যে চিঠি দেবে কি ?" তবুও চুপ করে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে আবার বল্লে—"একটা কথা বিশ্বাস করবে ? আমি জানি তুমি আমায় ঘৃণা কর, বিশ্বাস করনা, কিন্তু অনুরোধ কর্চ্ছি একথাটা মিথ্যে বলে মনে কোরো না; পাপ আমি করেছি কিন্তু দায়ে পড়ে—আজ থেকে আর করব না। গোবর্দ্ধনলালকে এখানে আর আসতে আমি কাল বারণ করে দিয়েছি।"

বিদ্রূপ করবার ইচ্ছেটা চাপতে পারলুম না। মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—"এযে পৈতে পুড়িয়ে ভটচায্যি—" বলেই চোখ চেয়ে দেখি তার মুখটা একেবারে নীল হয়ে গেছে। বড় অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম—সামলে নেবার মত কোন কথাও মনে পড়ল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে—"হয় ত' তাই—" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বাইরে এলুম। দেখলুম সেই রৌদ্রে ছাদের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কাছে এসে তার মাথাটা কোলের উপর তুলে নিলুম—জোর করে মুখটা তুলে তার দিকে চাইতে কি রকম অভিভূত হয়ে গেলুম। পাগলের মত তাকে বুকে চেপে ধরে অজস্র চুম্বনে তার মুখ ভরিয়ে দিলুম। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—"বাড়ী যাও।" লজ্জায় অপমানে চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল। চীৎকার করে বল্লুম—"তোমাদের মত মেয়ে মানুষদের আবার লজ্জা কিসের। এ সব তো তোমাদের নিত্যকর্ম্ম"—তার মুখের দিকে চেয়ে কথাটা আর এগোল'না।

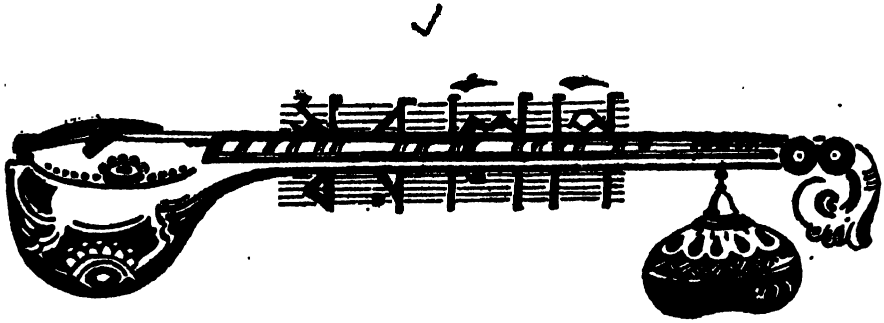
বজ্রের মত গম্ভীর স্বরে বল্লে—"বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে।"

মাথা হেঁট করে চলে এলুম।

* * *

দিন চার পাঁচ পরে রেওয়ারী থেকে নন্দগোপালের চিঠি এল—হীরাবাই আত্মহত্যা করেছে।

শ্রীযামিনীমোহন কর



মিশ্র তিলক কামোদ—দাদ্‌রা

শোন শোন ওগো
বিজন বনের পাখী,
নদীর ওপারে
কোথায় যেতেছ ডাকি ?
সারা রাতি ধরে কাহারে খুঁজিলে
বিদেশী বনের আঁধারে কি ছিলে ?
আকাশের পথে কোথায় চলিলে
শুক তারা ডাকে নাকি ?

ওগো পাখী শোন শোন'
বিদেশের কথা কিছু কয়ে যাও
পাতিয়া রেখেছি কান,
যেও চলে শেষে যেথা যেতে চাও
যত দূরে চাহে প্রাণ।
ভোরের বাতাসে এই ফুলবাসে
ক্ষীণ অরুণের আধেক আভাসে
রয়ে রয়ে রয়ে কোন্ কথা আসে
কিছু কয়ে যাবে তাকি ?

কথা—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, বি-এল্   সুর—ডাঃ সুধামাধব সেনগুপ্ত, বি এস্-সি, এম্-বি

স্বরলিপি—কুমারী মণিকা রায়

II	রা	পা	পা	পা	পা	পা	।	মা	মধা	পা	মা	গা	রগা	I
	শো	ন	শো	ন	ও	গো		বি	জ	ন	ব	নে	র	
	সরা	গরা	সা	ন্‌া	-া	-া	।	প্‌া	ন্‌া	-া	সা	সা	রা	I
	পা	•	খী	•	•	•		ন	দী	র	ও	পা	রে	
	গা	নসা	-া	-া	-া	-া	।	রা	গা	পমা	গরা	ন্‌া	সা	I
	কো	থা	য়	•	•	•		যে	তে	ছ	•	ডা	কি	
	মা	মপমমা	সরা	রা	সা	সা	।	সরা	রা	মা	মা	পা	পা	I
	সা	রা	রা	তি	ধ	রে		কা	হা	রে	খুঁ	জি	লে	
	পণা	ণা	ণা	ধা	ণা	ণা	।	ধা	ণর্সা	সণা	ধা	ধা	পা	I
	বি	দে	শী	ব	নে	র		আঁ	ধা	রে	কি	ছি	লে	

মা পা না র্সা র্সা র্সা । নসা পনা র্সর্রা ণা ধা পা I
আ কা শে র প থে কো থা য় চ লি লে

পা ধা পা মা গা রগা । সরা গরা সা ন্‌া -া -া I
শু ক তা রা ডা কে না • কি • • •

নদীর ওপারে কোথায় ইত্যাদি—

I মা পা না র্সা র্রা র্রা । র্সর্রা র্গর্রা নর্সা -া -া -া I
ও গো পা খী শো ন শো • ন • • •

র্সা র্রর্সা র্রা ণা ণা ণা । ধা ধর্সা র্সণা ধা পা -া I
বি দে শে র ক থা কি ছু ক রে যা ও

পা ধা পা মা মা গমা । রা রা -া ণা -া -া I
পা তি য়া রে খে ছি কা ন • • • •

ধা ধর্সা র্সণা ধা ধা ধণা । পা পা -া -া -া -া I
পা তি য়া রে খে ছি কা ন্‌ • • • •

গরা রপা মা গা রা রা । সা সগা গা রা সা ন্‌া I
যে ও চ লে শে ষে দে খা যে তে চা ও

পা ন্‌া সা সা রা গা । সা সা -া -া -া -া I
য ত দূ রে চা হে প্রা ণ্‌ • • • •

II মা পা -া না না না । র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা I
তো রে র বা তা সে এ ই ফু ল বা সে

নর্সা র্রর্মা র্রা র্রা র্সা র্সা । নর্সা নর্সা র্রর্সা ণা ণা পা I
জী ণ অ রু ণে র আ ধে ক আ ভা যে

গরা রপা মা গা রা রা । সা সগা গা রা সা ন্‌া I
র ঙে র রে র্ব রে কো ন্‌ ক থা আ সে

পা ন্‌া সা সা রা গা । রগা মমা গরা সা না -া II
কি ছু ক রে যা যে তা • • কি • •

এই গানটি কুমারী রণিকা রায় কর্তৃক হিন্দুস্থান রেকর্ডে গীত হইয়াছে।

ভীমপলশ্রী—তেতালা

হরি ছবি দেখি নৈন ললচানে,
একটক রহে চকোর চন্দ্র জ্যোঁনিমিষ বিসরি ঠহরানে।
মেরো কহো সুনত নহি শ্রবণনি লোকলাজন লজানে
পরে অকুলায় ধায় মো দেখত নেকহু নাহি সকানে।
জৈসে সুভট জাত রন সনমুখ পরত ন কবহুঁ পরানে
সুরদাস ঐসে হী ইনকে শ্যাম রঙ্গ লপটানে॥

কথা—সুরদাস

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ
(সঙ্গীত রত্নাকর)

আস্থায়ী—

০ ১ ২´ ৩
পা জ্ঞমা পণা ণা । পা মা ধা পা I মজ্ঞা জ্ঞা সা জ্ঞা । মা পা -া পা I
হ . রি • • • ছ বি • দে খি নৈ • • ন ল ল চা • নে

০ ১ ২´ ৩
পা মা ধা পা । মজ্ঞা মজ্ঞা মা -া I ণ্‌া সা মা জ্ঞা । মজ্ঞা -া রা সা I
এ ক ট ক র • হে • • • চ কো • র চ • • ন্দ্র জ্যোঁ

০ ১ ২´ ৩
ণ্‌া সা মা জ্ঞা । মা পা মজ্ঞা মা I পর্সা নর্সা -া -া । ণা -া ধা পা II
নি মি ষ বি স রি ঠ • হ রা • • • • • নে • • •

১ম অন্তরা—

০ ১ ২´ ৩
পা পা -া পা । পধা পপা মজ্ঞা মা I পা না না না । র্সা না র্সা র্সা I
মে রো • ক হো • • • সু • • ন ত ন হি শ্র ব ণ নি

০ ১ ২´ ৩
পণা র্সর্মা জ্ঞর্া জ্ঞর্া । র্রা র্রা র্সা -া I র্সা ণর্রা র্সর্সা ণা । ণা ধা পা -া I
লো • • • ক লা • জ ন • ল জা • • • • নে • • •

০ ১ ২´ ৩
পা পর্সা ণা ধা । র্সণা ধা পা -া I পধা পপা মজ্ঞা মা । পা -া পা পা I
প রে • অ কু লা • • রে • ধা • • • য় • মো দে • খ ত

০ ১ ২´ ৩
ণা সা মা জ্ঞা । পা মা ণা পা I পা পণা র্সর্রা র্সর্সা । ণা -া ধা পা II
নে • ক হু না • • হি স কা • • • • • সে • • •

২য় অন্তরা—

০ ১ ২´ ৩
পা -া পা পা । পা ধপা মজ্ঞা মা ‖ পা না না -া । র্সা -া র্সা -া ‖
বৈ • সে সু ভ ট • আ • ত র ন স ন মু • খ •

০ ১ ২´ ৩
পা ণা র্সা র্মজ্ঞা । র্মজ্ঞা র্রা র্সা -া ‖ র্সা ণর্রা র্সর্সা ণা । র্সণা ধা পা -া ‖
ল র ত ন • ক • ব হুঁ • প রা • • • • পে • • • ,

০ ১ ২´ ৩
পণা -া পা পর্সা । -া র্সা ণর্রা র্সর্সা ‖ ণা ধা ণা -া । পধা ধা পা পা ‖
সু • • র দা • • স ঐ • • • সে • হী • ই • • ন কে

০ ১ ২´ ৩
ণ্‌া সা মা জ্ঞা । পা মা ণা পা ‖ পনা র্সর্রা র্সনা র্সা । ণা -া ধা পা ‖‖
জ্ঞা • ম র • ক ল প টা • • • • • • নে • • •

তান—

০ ১ ২´ ৩
১। ণ্‌সা জ্ঞমা পা -া । মধা পপা মজ্ঞা মা ‖ পণা -া পধা পা । মপা মধপা মজ্ঞা মা ‖
আ •

০ ১ ২´ ৩
২। জ্ঞমা পণা র্সর্রা -া । র্সা ণা ধা পা ‖ পা মপা জ্ঞা মা । সমা জ্ঞপা মণা পর্সা ‖
আ •

০ ১ ২´ ৩
৩। ণ্‌সা জ্ঞমা পমা জ্ঞমা । পণা ধপা মজ্ঞা রসা ‖ জ্ঞমা পণা র্সর্রা র্সণা । ধপা মজ্ঞা রসা ণ্‌সা ‖
আ •

০ ১ ২´ ৩
৪। র্সণা র্রর্সা র্জ্ঞর্রা র্সণা । ধপা মপা জ্ঞমা পণা ‖ পণা র্সা ণধা পমা । জ্ঞমা পা মজ্ঞা রসা ‖
আ •

সৃষ্টি করিল। মনে হইল, দু'দিনের জন্য আসিয়া সেই শিশুটি কি শত্রুতাই করিয়া গিয়াছে,—হৃদয়ে কেবল একটা ক্ষুধা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে, সারা জীবনে যাহা মিটিবার নয়। নারী হৃদয়ের এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা যখন নিতান্তই নিষ্ফল হইতে বসিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই সারদা এই একটি প্রাণীকে কুড়াইয়া পাইল, যে বয়সে তাহার সন্তান-স্থানীয় না হইলেও শিশুরই মত জ্ঞানহীন, ভাষাহীন, অসহায়।

তাই কুড়ানীর আদর-যত্ন দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মহেন্দ্রকে বলিয়া তাহার জন্য নূতন জামা-কাপড় আসিল। বাড়ীতে ফেরিওয়ালা ডাকিয়া জামা, কাপড়, চুড়ি, খেলনা প্রভৃতি কেনা হইল। সদর দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিতেই নীচের তলায় যে ছোট ঘরখানি এতদিন পুরাতন জিনিসপত্রে বোঝাই ছিল, তাহা খালি করিয়া কুড়ানীকে থাকিতে দেওয়া হইল।

ক্রমে কুড়ানী এই ছোট পরিবারটির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া গেল। দিন দিন তাহার শারীরিক ও মানসিক উন্নতিও হইতে লাগিল। একটি একটি করিয়া সে এখন অনেক জিনিসের নাম শিখিয়াছে এবং অস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতেও চেষ্টা করে। গোড়ায় গোড়ায় সে সারদাকে বলিত 'বুম্মা',—সম্ভবতঃ 'বৌমা' শব্দের অপভ্রংশ, আর মহেন্দ্রকে বলিত 'বাব্বু'। এই দুইটি শব্দ তাহার রহস্যাবৃত অতীত জীবনের স্মৃতি। সারদা কিন্তু 'বৌমা' কথাটার উপযোগিতা দেখিল না, তাই তাহাকে 'দিদি' বলিতে শিখাইল।

ঘরের খুঁটিনাটি অনেক কাজ কুড়ানী এখন করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করা চলেনা, খেয়ালের মাথায় যখন যতটুকু ইচ্ছা করে। আবার যখন ঝোঁক চাপে, তখন তাহার কাজ আর শেষ হয় না। একদিন তাহাকে আলু ছাড়াইবার প্রক্রিয়া হাতে ধরিয়া শিখাইয়া দিলে, কাজটা তাহার এত ভাল লাগিয়া গেল, যে ঝুড়িতে যত আলু ছিল—দু'সের আন্দাজ—সবগুলি ছাড়াইয়া শেষ করিয়া তবে উঠিল। কিন্তু বলিয়া না দিলে নিজের ইচ্ছায় প্রায় কোন কাজই করেনা। কেবল একটা কাজ সে নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছে,—মহেন্দ্রের পরিচর্য্যা। সকালে গাড়ু, গামছা যোগাইয়া দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, রাত্রে আহারের পর পান আনিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত, সমস্তই সে নিজের মনে নিয়মিত ভাবে করিয়া যায়।

মহেন্দ্র দেখিলেন সারদা ঠিকই বলিয়াছিল। খাইতে পরিতে পাইয়া কুড়ানীর চেহারা বেশ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। আহার শীর্ণ দেহ পুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে, গাত্রবর্ণ পরিচ্ছন্নতার গুণে উজ্জ্বল হইয়াছে, সর্ব্বোপরি যৌবনের তুলিকাস্পর্শে তাহার সারা অঙ্গে একটা নূতন শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তাহার দেহের রূপ যেমন বয়সের অনুপাতে বিকশিত হইয়া উঠিল, মনোবৃত্তির তেমন ক্রমোন্নতি হইল না,—হইলেও তাহা বাহিরে প্রকাশ হইবার উপায় ছিল না। হয়ত তাহার প্রাণেও নব নব আশা—আকাঙ্ক্ষা উন্মিষিত হইয়া মরু-কুসুমের মত শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু এ সংবাদ তাহার অলস চক্ষু দুটির মৌন ভাষায় যতটুকু প্রকাশ হইতেছিল কেহ তাহা বুঝিল না।

৪

একদিন বৈকালে মহেন্দ্র কাছারি হইতে আসিয়া শুনিলেন কুড়ানীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বাড়ীর বাহিরে সে বেশী যায় না; তাহাকে লইয়া রঙ্গ করে বলিয়া পাড়ার কাহারও সহিত তেমন মিশে না। আজ কখন বাহির হইয়া গিয়াছে এতক্ষণেও ফিরিল না দেখিয়া সারদা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সংবাদ শুনিয়া মহেন্দ্র একটু শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন—"আমি ত আগেই ব'লেচি,—পাগলের মন, যখন খেয়াল হ'বে আপনিই চ'লে যা'বে। তুমি ত তখন ওকে তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলে। নিজেই যখন চলে গেল—"

সারদা বলিল—"ও কি কথা গো! সন্ধ্যে হ'তে যায়, সোমত্ত মেয়েটা কোথায় চলে গেল,—তোমার একটু ভাবনা হচ্চে না? তখনকার কথা ছেড়ে দাও। এখন আমাদের আশ্রয়ে যখন রয়েচে—"

"না না, আমি তামাসা করে বলেছিলাম,—সত্যি কি আর—"

"ও রকম তামাসা ভাল লাগে না, হাঁ। চট্ করে জল

খেয়ে নিয়ে তুমি একবার বেরিয়ে দেখ। ঠাকুরপোকে পাড়ায় খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম,—পাওয়া গেল না। এখন আবার দক্ষিণ-পাড়ার দিকে গেছে,—যদি কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে। ও সব কাণ্ড যত ঐ দিকেই ত হয়।"

পথে বাহির হইয়া, মহেন্দ্র কোথায় খুঁজিতে যাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। শেষে মনে করিলেন থানায় খবর দিয়া পরে খোঁজাখুঁজি করা যাইবে। ষ্টেশনের রাস্তার মোড়ে পৌঁছিয়া ভাবিলেন, যদি কেহ ভুলাইয়া লইয়া গিয়া থাকে, ট্রেনে পলাইবার চেষ্টা করিবে। ষ্টেশনের দুই-একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে তাহার আলাপ ছিল, মনে করিলেন তাহাদের একটু নজর রাখিতে বলিয়া যাইবেন।

ষ্টেশনের কাছে আসিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন একটা ময়রার দোকানের সম্মুখে কুড়ানী খাবারের ঠোঙা হাতে উদাস নয়নে চাহিয়া বসিয়া আছে। মহেন্দ্রকে দেখিয়া সে ঠোঙা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল,—মুখে একটা অস্ফুট করুণ ধ্বনি।

ঠিক সেই সময়ে দুইদিক হইতে দুইজন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। একজনের হাতে ছোরা দেখিয়া মহেন্দ্র তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটা কাছে আসিলে তাহার পেটে এক লাথি মারিতেই সে পড়িয়া গেল। কিন্তু ছোরার আঘাতে মহেন্দ্রের পায়ে বিষম চোট লাগিল,—তিনি বসিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতেই আক্রমণকারীরা পলাইল। কয়েকজন তাহাদের ধরিবার চেষ্টায় ছুটিল। যাহারা রহিল তাহারা মহেন্দ্রের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া, গাড়ী ডাকিয়া তাঁহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

গাড়ীতে উঠিয়াও কুড়ানীর ভয় ভাঙিল না। মহেন্দ্রের পাশে বসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল। তাহার কোমল স্পর্শে মহেন্দ্র ক্ষতের জ্বালা ভুলিয়া, একটা মধুর আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পরে কুড়ানীর প্রাণে যে একটা ভয় ঢুকিয়াছে তাহা বেশ দেখা গেল। সে আর এখন একবারও বাড়ীর বাহির হয়না, সর্ব্বদাই শঙ্কিত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। কেবল যতক্ষণ মহেন্দ্রের কাছে থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করে, ততক্ষণ তাহার চোখে-মুখে একটা শান্ত নিরুদ্বেগের ভাব ছড়াইয়া থাকে।

৫

পায়ের ঘা সারিতে বেশীদিন লাগিল না। তথাপি ছুটি পাওনা ছিল বলিয়া, এই সুযোগে মহেন্দ্র এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী বসিয়া রহিলেন। প্রথম যে কয়দিন পা লইয়া ভুগিতে হইয়াছিল, কুড়ানী সদাসর্ব্বদা তাঁহার কাছে কাছে থাকিত। তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিত একান্ত মনে তাঁহার সেবা করিয়া যাইত। রাত্রেও নিজের ঘরে গিয়া শুইতে চাহিত না, বলিত—"না, বয়!" অগত্যা মহেন্দ্রের শয়নকক্ষেরই এক প্রান্তে পড়িয়া থাকিত।

মহেন্দ্র বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলে পর, সারদা একদিন বৈকালে দেখিল কুড়ানী তাহার বিছানা-মাদুর গুটাইয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। সারদা বলিল—"কি রে, তল্পিতল্পা নিয়ে কোথায় চল্লি?" নীরব অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে কুড়ানী তাহার নিজের ঘরটি দেখাইয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

ছুটি ফুরাইতে তখনও বিলম্ব ছিল। সুস্থ শরীরে দিবা রাত্র বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া মহেন্দ্রের ক্রমে বিরক্তি ধরিয়া গেল। কাজেই সন্ধ্যার সময় একবার বেড়াইতে বাহির হওয়া আর আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল। আড্ডা দিবার ঝোঁক তাঁহার কোনদিনই ছিলনা, কালে ভদ্রে ছুটির দিনে তাস-পাশার আসরে গিয়া জুটিতেন। এখন তাহা ক্রমে নিত্যকর্ম্ম হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া এক একদিন ফিরিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া যায়, সারদাকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হেঁসেল আগ্‌লাইয়া থাকিতে হয়। তাই মহেন্দ্র সন্ধ্যার পরেই আহার সারিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে এই নেশাটা বেশ ভাল করিয়াই জমিয়া উঠিল। তাই ছুটি যখন ফুরাইল, তখনও কাছারি হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার পর বাহির হওয়ার অভ্যাসটা থাকিয়া গেল। রাত্রের আহার সারিয়া যান, সুতরাং বাড়ী ফিরিবার তাড়া

থাকে না। সারদা প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়ে। শিকল নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিলে নীচে নামিয়া আসিবার পূর্ব্বেই কুড়ানী সদর-দরজা খুলিয়া দেয়। কাজেই সারদা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, মহেন্দ্র কখন আসেন অনেক দিন জানিতেই পারে না।

কুড়ানীকে লইয়া আর কোন গোল হয় নাই। কিন্তু মহেন্দ্রের বোধ হয় মনে মনে ইচ্ছা যে এই গলগ্রহটাকে সরাইয়া দিয়া একটা দায়িত্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিছুদিন হইতে তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। একদিন সারদাকে বলিলেন, দেওয়ান-পাড়ায় একটা অনাথ-আশ্রম আছে, সেখানেই কুড়ানীকে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সারদা প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজি হয় না। কিন্তু মহেন্দ্র বুঝাইলেন, যে, এই অজ্ঞাত কুলশীলা অপরিণত বুদ্ধি মেয়েটাকে চিরকাল পুষিতে হইলে পরে অনেক ভুগিতে হইবে। সেখানে থাকিলে তাহাদের কোন ভাবনা বা দায়িত্ব থাকিবে না, সেও বেশ যত্নে থাকিবে, কোনও কষ্ট হইবে না। এতগুলি যুক্তিতর্ক শুনিয়া সারদা অগত্যা রাজি হইল।

৬

তাহার পর প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র সারদাকে মধ্যে মধ্যে কুড়ানীর সংবাদ আনিয়া দেন। পূজার ছুটিতে তাহাকে কয়েকদিনের জন্ম বাড়ীতে আনাও হইয়াছিল। তখন তাহার নূতন শ্রী দেখিয়া সারদার চোখ জুড়াইল। সে যে এখন বেশ সুখেই আছে তাহা বুঝিয়া সারদা আশ্বস্ত হইল। তাই সেবার কুড়ানী যখন আবার চলিয়া গেল, সারদা বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাকে বিদায় দিল।

মহেন্দ্রের এখনও রাত্রে বাড়ী ফিরিতে সেইরূপ বিলম্ব হয়। তবে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ বাহির হওয়ার অভ্যাস আর নাই। কাজের ভিড়ে যেদিন কাছারি হইতে ফিরিতে বিলম্ব হয় সেদিন আর যাওয়া ঘটেনা।

একদিন মহেন্দ্র বাহির হইয়াছেন; সারদা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এখন কুড়ানী নাই যে দরজা খুলিয়া দিবে। নরেনের ঘর হইতে শিকল নাড়ার শব্দ ভাল শোনা যায় না। কাজেই সারদা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারে না। আজও হঠাৎ একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল একটা বাজে,—মহেন্দ্র তখনও আসেন নাই। তাই ত! এত দেরি ত কখনও হয় না। ভাবিল আর একটু দেখিয়া নরেনকে তুলিয়া একবার খোঁজ লইতে পাঠাইবে।

কান খাড়া করিয়া বসিয়া থাকিয়া ক্রমে যখন দেড়টা বাজিয়া গেল, তখন নরেনকে ডাকিয়া তুলিতে হইল। তাদের আসর সব দিন একস্থানে হয়না। কোথায় কোথায় সন্ধান লওয়া দরকার, দু'জনে মিলিয়া তাহা ঠিক করিয়া, লণ্ঠনটা জ্বালিয়া লইয়া নরেন বাহির হইল।

মহেন্দ্র তখন সহরের এক প্রান্তে একটা ছোট একতলা বাড়ীর একটি কুঠরিতে তক্তপোষের উপর বসিয়া তামাক ধরাইতেছেন,—অদূরে কুড়ানী বিষণ্ণ মুখে উপবিষ্ট।

* * *

এদিকে নরেন পাঁচ-সাত জায়গায় ঘুরিয়াও মহেন্দ্রের কোন সন্ধান না পাইয়া ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সারদার উদ্বেগ ও আশঙ্কার সীমা রহিল না। বাকি রাত্রিটুকু কোনরূপে কাটাইয়া ভোর হইতেই নরেন যখন আবার বাহির হইতেছে, তখন মহেন্দ্র ফিরিলেন।

ও-পাড়ার গয়লাদের একটি ছেলের নাকি কলেরা হইয়াছিল,—তাই তাহারা মহেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। বলিলেন—"অনুকূল ডাক্তারকেও আনা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ওষুধের ব্যবস্থা করেই চলে গেলেন। আমাকে থেকে যেতে হ'ল,—অমন সঙ্গীন্ কেস্, ফেলে আসি কি করে।...কিন্তু আমি ত খবর দিতে লোক পাঠিয়েছিলাম—আসেনি?"

সারদা শুষ্ক মুখে উত্তর করিল—"কই, আসেনি ত কেউ। কিংবা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ডেকে ফিরে গেছে।"

আদালতের চাকরি জুটিবার পূর্ব্বে মহেন্দ্র কিছুদিন হোমিওপ্যাথিক স্কুলে পড়িয়াছিলেন। ওরকম অনেকেই পড়ে, আবার একটা কাজকর্ম্মের সুবিধা হইলেই ছাড়িয়া দেয়। মহেন্দ্র কিন্তু হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা বরাবরই রাখিয়াছেন। এখনও ছেলেপুলের সর্দ্দি কাশি হইলে পাড়ার

অনেকেই আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়। কিন্তু এমন 'সঙ্গীন্ কেস্' কখনও তাঁহার হাতে আসিতে সারদা দেখে নাই। তথাপি এ সব সংশয়ের কথা সারদার মনে আসিল না, মহেন্দ্র যে ভালয় ভালয় বাড়ী ফিরিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট।

ইহার পর কয়দিন মহেন্দ্রের কাছারি হইতে ফিরিতে বিলম্ব হয়। রাত্রে আর তাস খেলিতে যাওয়া ঘটেনা।

৭

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সকালে কুড়ানীর আবির্ভাব। সেদিনও রবিবার। মহেন্দ্র বাজার গিয়াছেন, সারদা হেঁসেলে। কুড়ানী নিঃশব্দে আসিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার সেই পূর্ব্ব-পরিচিত খুঁটিটিতে ঠেস্ দিয়া তেমনই ম্লান মুখে বসিয়া রহিল।

সারদা বাহিরে আসিয়া কুড়ানীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। সে এমন সময়ে কি করিয়া কাহার সহিত আসিল! কুড়ানী তাহার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে যে উত্তর দিল তাহাতে সে যে একলা আসিয়াছে কেবল এইটুকুই বোঝা গেল।

সারদা বলিল—"হঠাৎ এমন চলে এলি যে? পালিয়ে এসেচিস্ বুঝি,—কেন রে?"

ভীতি-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া কুড়ানী বলিল—"বয়! ওয়া মাব্বে!"

তাহাকে প্রবোধ দিয়া সারদা বলিল—"না না, মারবে কি, শুধু শুধু অমনি মারলেই হ'ল! আচ্ছা আমি বাবুকে বলবো—ওরা তোকে কক্ষনো মারবে না। এখন এসেচিস্, দু-চার দিন থাক। তারপর একদিন ওঁর সঙ্গে যাস্'খন। তোর কোনও ভয় নেই, বুঝ্লি?"

কিন্তু কুড়ানী কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। সেখানে ফিরিয়া যাইতে যে তাহার ঘোর অনিচ্ছা, তাহা সে বেশ জোরের সহিত জানাইয়া দিলেও, সারদা যখন আবার বুঝাইতে গেল, তখন সে উচ্ছ্বসিত অভিমান ভরে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"ঝাই যাবো না, ঝাঁর যে চেলে অবে।"

কথাটা সারদা ঠিক বুঝিতে পারিল না। কুড়ানী তখন ছেলে কোলে করার ভঙ্গীতে হাত দু'খানি বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া তাহার কথার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া সারদা একেবারে কাঠ হইয়া গেল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল —"কি বল্‌চিস্ কুড়ানী, তোর ছেলে হ'বে? তোর আবার ছেলে হ'বে কি রে? না না, কে বল্‌লে?"

কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কুড়ানী মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল—"হুঁ", ওয়া যে বল্‌লে।"

এই 'ওরা' যে কাহারা তাহা কুড়ানী বুঝাইয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহার দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সারদার বুঝিতে বাকি রহিল না যে কুড়ানী যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা নয়। সারদা হতবুদ্ধি হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

মহেন্দ্র বাজার করিয়া আসিলে, সারদা তখনই তাঁহাকে কুড়ানীর কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাম্‌লাইয়া গেল। ভাবিল মানুষটা তাতিয়া পুড়িয়া আসিয়াছে, এমন দারুণ সংবাদটা এখন শুনাইয়া কাজ নাই।

তারপর মহেন্দ্র যখন আহারান্তে পান মুখে দিয়া হুঁকা লইয়া বসিলেন, তখন সারদা তাঁহাকে কুড়ানী সংক্রান্ত এই কুৎসিত কাহিনী না শুনাইয়া আর থাকিতে পারিল না। শুনিয়া মহেন্দ্র নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সারদা দৃপ্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"সাধে কি বলেছিলাম তোমাদের পুরুষ জাতটাকে মোটেই বিশ্বাস নেই! এমন একটা অজ্ঞান, অনাথা, অসহায়া মেয়ে—যে শিশুর মতন নির্দ্দোষ, ফুলের মতন পবিত্র—তা'র এত বড় সর্ব্বনাশ যে কর্‌তে পারে সে কি মানুষ! ছি ছি, লজ্জায় ঘেন্নায় আমার মরে' যেতে ইচ্ছে কর্‌চে। আর দোষ সত্যি আমাদেরও আছে। এখানে ছিল, বেশ ছিল,—কেন মর্‌তে তোমার কথা শুনে—"

উদগত অশ্রুর বেগ রোধ করিতে না পারিয়া সারদা সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া, অন্তরালে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অকস্মাৎ এই বিস্ময়কর কাহিনী শুনিয়া এবং পুরুষজাতির এতবড় একটা কলঙ্কের প্রমাণ পাইয়া, তীব্র গ্লানি ও ক্ষোভে

মহেন্দ্রের হৃদয় ভরিয়া গিয়া থাকিবে,—নতুবা এমন মুহ্যমান হইয়া এতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন কেন ?

তখন হইতে সারদার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ,—মহেন্দ্রও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

দিন চারেক পরে মহেন্দ্র কুড়ানীকে পুনরায় 'অনাথ-আশ্রমে' রাখিয়া আসিবার কথা উত্থাপন করিতেই সারদা বলিয়া উঠিল--"ওমা, তুমি কি গো ! ওটাকে আবার সেই নরকে ফেলে রেখে আসতে চাইচো ?"

মহেন্দ্র একটু নরম সুরে উত্তর করিলেন—"সেখানে না হ'ক, আর কোথাও ওর একটা ব্যবস্থা করে দিতে হ'বে ত।"

"না, ও আর কোথাও যাবে না"—সারদা দৃঢ়স্বরে সংক্ষেপে এই উত্তর দিল।

মহেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। বলিলেন—"তবে কি নিজের ঘরে এ পাপ পুষে রাখ্‌তে হ'বে ? তা' হবে না, ওকে এখান থেকে বিদেয় কর্‌তে হ'বে।"

সারদা তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল—"ও কি কথা গো ! তুমি কি মানুষ ? ওর এখন এই অবস্থা, এ সময়ে···। না, সে হ'বে না,—ও এখানেই থাক্‌বে। আর পাপ ত ওর নয়,—ও ত আমাদের চেয়েও নিষ্পাপ, পবিত্র। আর একজনের পাপের শাস্তি এই নিরপরাধিনী মেয়েটাকেই ভুগ্‌তে হ'বে ? ও কথা আর মুখে এনোনা—যাও।"

৮

যথা সময়ে কুড়ানীর ছেলে হইল। সারদা অম্লানচিত্তে সুতিকাগৃহে যাইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিন্তু ছেলেটাকে দেখিলেই একটা বিজাতীয় ঘৃণায় তাহার দেহমন ভরিয়া যায়। পাপে যাহার জন্ম তাহাকে অশুচি জ্ঞানে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না।

কিন্তু ঘটনাচক্রে এই অস্পৃশ্য ছেলেটার সকল ভারই ক্রমে সারদাকে লইতে হইল,—যখন কঠিন রোগে কুড়ানীর জীর্ণ দেহখানি শয্যার সহিত মিশিয়া গেল। দুই তিন মাস রোগ ভোগ করিয়া সে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেল, উঠিয়া বসিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। রোগের দারুণ ক্লেশ নীরবে সহ্য করিয়া অসীম ধৈর্য্যের সহিত সে যেন কাহার প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া থাকে। তাহার বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

সারদা বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। এদিকে সংসারের কাজ, ওদিকে ছেলেটার পরিচর্য্যা,—রোগিনীর কাছে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। নরেন মাঝে মাঝে আসিয়া বসে বটে। কিন্তু তাহার সহিত এতদিনেও কুড়ানীর বনিবনাও হইল না। তাই নরেন যতক্ষণ থাকে, সে বিষম অবজ্ঞাভরে চোখ বুজিয়া নীরবে পড়িয়া থাকে।

সারদা মাঝে মাঝে ছেলেটাকে তাহার কাছে আনিয়া দেয়। তখন তাহার পাণ্ডুর মুখে একটা আনন্দের ছটা ফুটিয়া উঠে। ছেলেকে আদর করিয়া অস্ফুটস্বরে সে কত কি বলিবার চেষ্টা করে এবং থাকিয়া থাকিয়া সারদাকে বলে—"দিদি, বাব্‌বু ?"

মহেন্দ্রকে সারদা বলে—"ছুঁড়িটা তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে হেদিয়ে মরে, সময় মত মাঝে মাঝে একটু কাছে গিয়ে বস না।" মহেন্দ্র বিনা আপত্তিতে কুড়ানীর কাছে গিয়া একটু বসেন।

একদিন মহেন্দ্র কাছারি হইতে আসিলে সারদা বলিল—"আজ বড় ছট্‌ফট্‌ করচে। কাজকর্ম্ম ফেলে আমি সারাদিন ওর কাছেই ছিলাম। জলটল খেয়ে তুমি গিয়ে একটু বস্‌বে ? আমি তা'হ'লে কাপড়টা কেচে এদিককার একটু ব্যবস্থা করি।"

মহেন্দ্রকে কুড়ানীর কাছে বসাইয়া সারদা বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই মনে পড়িল কুড়ানীকে ঔষধ দিবার সময় হইয়াছে। মহেন্দ্রকে সে কথা বলিতে গিয়া কুড়ানীর ঘরের কাছে আসিতেই, ঘরের ভিতরে একটা মৃদু অথচ সুস্পষ্ট, শতসুখস্মৃতিবিজড়িত সুপরিচিত ধ্বনি শুনিয়া সারদা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। অদম্য কৌতূহলের বশে জানালার ফাঁকে চোখ দিয়া দেখিল—কুড়ানী মহেন্দ্রের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে, ডান হাতে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া নিজের বক্ষের উপর চাপিয়া রাখিয়াছে এবং বাঁ হাতখানি মহেন্দ্রের গলা বেষ্টন করিয়া আছে,—আর মহেন্দ্রের মাথাটা কুড়ানীর

আনন্দোজ্জ্বল শীর্ণ মুখের উপর অনেকখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

সারদা অবসন্ন দেহে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তারপর উঠিয়া দেওয়াল ধরিয়া অতি সন্তর্পণে চলিয়া গিয়া, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন একটা মেঘ সরিয়া গিয়া চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল, তাহার বিবর্ণ মুখের প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিল। ছুটিয়া গিয়া কুড়ানীর ঘুমন্ত শিশুটিকে তুলিয়া লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল এবং অজস্র চুম্বন বৃষ্টি করিয়া তাহাকে জাগাইয়া, কাঁদাইয়া বিষম বিব্রত করিয়া তুলিল।

৯

কুড়ানীর তৈলহীন জীবন-প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটি এক সময়ে নিতান্ত অতর্কিতভাবে নিবিয়া গেল। একটা দীন নিষ্ফল মানব-জীবনের অবসান হইল।

তাহার মৃত্যুতে চক্রবর্ত্তী পরিবারে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। সারদা কয়েকদিন ধরিয়া কাঁদিল, তারপর মাতৃহীন শিশুটিকে লইয়া অত্যধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ভাল জামা, নূতন বিছানা, নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে সাজাইয়া, খাওয়াইয়া, নাচাইয়া, খেলাইয়া সারদার দিন কাটে। সংসারের কাজ কতক হয়, কতক পড়িয়া থাকে।

মহেন্দ্রের মনটা কিন্তু এত সহজে হাল্কা হইল না, কি যেন একটা দুশ্চিন্তা লাগিয়া রহিল।

একদিন কয়েকজন লোক আসিয়া মহেন্দ্রকে ডাকিলে, তিনি তাহাদের বসিতে বলিয়া সারদাকে আসিয়া বলিলেন—"ছেলেটাকে একবার দাও ত।"

সারদা তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"কেন?"

"ঐ একজনরা ওটাকে নিতে রাজী হয়েচে, তাই এসেছে একবার দেখ্‌তে।"

"সে কি! তা' হ'বে না। ছেলে আমি দেবো না।"

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কেন মিছামিছি মায়া বাড়াচ্চো? কি হ'বে ওটাকে পুষে,—কোথাকার কে, কা'র ছেলে—"

সারদা দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল—"এ আমার ছেলে! কেবল পেটে ধর্‌তে পারিনি এই যা। দুদিনের তরে এসেছিল একটা কাঙাল। কিন্তু ঐ কাঙালের দান পেয়েই আমার আজ রাজরাণীর ঐশ্বর্য্য। আমি আজ মা হয়েচি,—সত্যিকার মা। এখন কার সাধ্যি মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে যায়।"

মহেন্দ্র মূঢ়ের মত শূন্য বিহ্বল দৃষ্টিতে সারদার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অসীম ক্ষমার আধার নারী এইবার তাহার মহীয়সী মূর্ত্তিতে দেখা দিল। মাতৃত্বের বিরাট গাম্ভীর্য্য মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গিয়া তাহার স্থানে ফুটিয়া উঠিল প্রেয়সীর পরিপূর্ণ অনুরাগের দীপ্তি। স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসিতে সকল গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া সারদা বলিল—"অমন করে চেয়ে দেখ্‌চো কি? একে যে আমি কিনে ফেলেছি, আর ত ছাড়্‌বো না। এখন যাও, ওদের ফিরে যেতে বল।"

মহেন্দ্র স্খলিত-চরণে—বাহির হইয়া গিয়া, মুখে একটু ম্লান হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"না, মেয়েরা দিতে চাইচে না।"

"বেশ ত, তা'র ওপর আর কি কথা আছে?"—বলিয়া তাহারা বিদায় লইল।

মহেন্দ্র একাকী দাঁড়াইয়া কি একটু ভাবিলেন। তারপর চোরের মত অতি সন্তর্পণে গৃহে প্রবেশ করিয়া, আল্‌না হইতে জামা-চাদর পাড়িয়া লইয়া আবার তেমনই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

বিতর্কিকা

১। ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা

শ্রীকরুণাকেতন সেন

ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা কি হওয়া উচিত এ নিয়ে অনেকদিন থেকেই আলোচনা চ'ল্‌ছে। আষাঢ় সংখ্যা বিচিত্রার দেশের কথায় এসম্বন্ধে আলোচনা পড়ে দু'একটা কথা বল্‌তে উৎসুক হয়েছি। যদি ভাল মনে করেন, বিচিত্রার বিতর্কিকায় অথবা অন্যত্র এই চিঠিটা প্রকাশ ক'র্‌লে সুখী হ'ব।

একথা সত্য যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কৃষ্টির আদান প্রদানে যে ভাষা প্রয়োজন ইংরাজী ভাষাই এখন তার কাজ ক'রছে। খবরের কাগজে, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম্ম, সামাজিক তথ্য প্রভৃতি যে সব ব্যাপার শুধু এক প্রদেশের নয় সে সব সম্বন্ধে পুস্তকে, রাজনৈতিক আলোচনায় এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনে আজকাল ইংরাজীরই ব্যবহার। কিন্তু ভারতীয় কোন ভাষাই যে ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত এর সপক্ষেও কতগুলো যুক্তি আছে। কথোপকথনের সময় ভাষা যদি অন্ততঃ একপক্ষের মাতৃভাষা না হয় তাহ'লে তার স্বাচ্ছন্দ্য এবং মূল্য অনেকটা কমে যায়। দেশে থাক্‌তে হয়ত ততটা বোঝা যায় না; কিন্তু বিদেশে, বিশেষতঃ বিদেশীর সাম্‌নে যখন দুজন ভারতীয়কে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বল্‌তে হয়, তখন আপনা থেকেই লজ্জাবোধ হয়। ইউরোপ একথা বল্‌তে পারে যে ভাষার দিক দিয়ে ভারতবর্ষের চেয়ে ইউরোপের ঐক্য বেশী, কেননা দুজন ইউরোপীয় যখন কথা বলে তখন তারা ইউরোপীয় ভাষাতেই কথা বল্‌তে পারে। দুজন ভারতীয়কে কথা বল্‌তে হয় সম্পূর্ণ অভারতীয় এক ভাষায়।

দ্বিতীয় কথা এই, আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন আজকাল জনসাধারণের ব্যাপার। রাজনীতি যতদিন শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চর্চ্চার বস্তু ছিল, ততদিন ইংরাজীতে আলোচনা হ'লে কোন ক্ষতি হ'ত না। জনসাধারণের পক্ষে ইংরাজীর চেয়ে যে কোন ভারতীয় ভাষা অধিকতর সুবোধ্য এবং নূতন শিখ্‌তেও অনেক সহজ। এক প্রদেশের নেতা যদি অন্য প্রদেশে এসে সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে কথা না বল্‌তে পারেন, সেখানকার লোক যদি তাঁর বক্তব্য বুঝ্‌তে না পারে তাহ'লে ভারতবর্ষের ঐক্য কি করে সম্ভবপর হবে জানিনা। অনুবাদে অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। আমার মনে আছে, বিহারের ছোট একটি জায়গায় মহাত্মাজী একবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন; শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত লোক; কিন্তু তাঁর কথাগুলো তাদের হৃদয়কে কি রকম স্পর্শ করেছিল কয়েক বৎসর পরেও আমি তার পরিচয় পেয়েছি। মহাত্মাজী যা বলেছিলেন তাতে রাজনীতির কথা খুব কমই ছিল—দৈনন্দিন জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে খুব সহজভাবে কয়েকটি উপদেশ। তার যা কিছু জোর কেবল মহাত্মাজীর নিজের মুখের কথা বলে। মহাত্মাজী যদি ইংরাজী কিংবা তেলেগুতে বল্‌তেন এবং হিন্দীতে অনুবাদ করা হ'ত—তাহলে তার মূল্য যে অনেক কমে যেত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা কি হওয়া উচিত—হিন্দী, উর্দ্দু, না বাংলা—সে সম্বন্ধে অনেক তর্ক উঠ্‌তে পারে।

কিন্তু সে প্রশ্ন উত্থাপন না করেও বলা যেতে পারে এবিষয়ে বাংলাদেশের একটা কর্ত্তব্য আছে। আমরা যদি চাই যে বাংলা ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা না হলেও অন্ততঃপক্ষে কৃষ্টির ভাষা হবে এবং অন্যান্য প্রদেশের লোক সে ভাষা শিখ্‌বে, তাহলে আমাদেরও অন্য প্রদেশের ভাষা শিখ্‌তে প্রস্তুত হওয়া উচিত। যে দেশে একাধিক ভাষার প্রচলন সে দেশে সাধারণতঃ একটা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না—একের অধিক ভাষাই সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। সুইজারল্যাণ্ডের সব অংশের লোকেরা ফরাসী এবং জার্ম্মান ভাষা দুই-ই শেখে। আমরা যদি হিন্দী অথবা উর্দ্দু শিখি তাহলে একথা আশা করা অন্যায় হবে না যে হিন্দীভাষীরা বাংলা শিখ্‌বে। দেশ ভ্রমণে, ব্যবসা বাণিজ্যে, সঙ্গীত-চর্চ্চায়, ভারতের মধ্যযুগের সাধনার আলোচনায় এবং আরও নানারকমে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার জ্ঞান আমাদের সাহায্য কর্‌বে। বাংলাদেশে আজকাল হিন্দী ভাষার চর্চ্চা কিছু কিছু হচ্ছে—কিন্তু আরও অনেক বেশী হওয়া দরকার। তার একমাত্র উপায় আমাদের বিদ্যালয়ে—বিশেষতঃ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হিন্দী অথবা উর্দ্দুকে অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ের অন্যতম করা। সপ্তাহে একঘণ্টা করে তিন চার বৎসর পড়্‌লে হিন্দী অথবা উর্দ্দুর বেশ খানিকটা জ্ঞান হওয়া অসম্ভব নয়—এতে বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা অযথা ভারাক্রান্ত হবে না। ইউরোপের অধিকাংশ দেশের উচ্চ বিদ্যালয়েই মাতৃভাষা ছাড়া দু'তিনটা বিদেশী ভাষা শিখ্‌তে হয়। জার্ম্মানীতে ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষাও শিখ্‌তে হয়। হল্যাণ্ডে ডাচ ছাড়াও জার্ম্মান, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শেখান হয়। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে হিন্দী অথবা উর্দ্দুকে অবশ্য শিক্ষণীয় ক'র্‌লে আনুসঙ্গিকভাবে আর একটা সুফল হবে বলে আশা করি। বাংলাদেশের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বাংলা না পড়ে উর্দ্দু পড়ে। আমার মুসলমান বন্ধুদের মধ্যে এমন দু একজনকে জানি যাঁরা বাংলাদেশের স্কুলে অনেক বৎসর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেও বাংলা পড়্‌তে পারেন না। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে যদি উর্দ্দু অবশ্য-শিক্ষণীয় হয় তাহ'লে তার সঙ্গে বাংলাকেও মুসলমানদের জন্য অবশ্য-শিক্ষণীয় করায় কারও আপত্তি হবার কোন কারণ থাকৃতে পারে না। ভাষাগত পার্থক্য বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমানের মিলনকে আরও কঠিন করে তুলেছে। এতে যদি সেই পার্থক্য যায়, তাহলে সে আমাদের একটা বড় লাভ।

২। ইংরেজি কালচারের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত বি-এ

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক কাগজে ইংরেজী "কালচার" শব্দটীর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নির্ণয়ে একটা সুন্দর বিতর্কিকার সৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকায় একপক্ষ কালচারের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হিসাবে "শীল" অথবা অধিকতর শ্রবণ-মাধুর্য্যের জন্য "শীলতা" শব্দ ব্যবহারের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অপরপক্ষ বলিয়াছেন চলিত ভাষায় কৃষ্টি যেমন ক্ষেত্রকর্ষণ বুঝাইতে পারে, পারিভাষিক অর্থে তদ্রূপ উহা ইংরেজী Culture-এর লিপ্যন্তর 'কালচার'-এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দও হইতে পারে। এবং এই অর্থে শব্দটা বিশিষ্ট লেখকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াও আসিতেছে। তিনি আরো বলিয়াছেন, "কৃষ্টি যার সাধনোপায়, শীল তার ফসল।" তাঁহার মতে শুধু শ্রুতিকটু বলিয়াই 'কৃষ্টি' ত্যাজ্য হইতে পারে না—যেমন পারে না বৃষ্টি, সৃষ্টি, কৃষ্ণ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহৃত শব্দসমূহ। প্রথম পক্ষ চাহিয়াছেন, 'কালচার' শব্দের বিশেষার্থবোধক একটা বাঙ্গালা পরিভাষা রচনা। তিনি 'শীল' ও 'কৃষ্টি'র অর্থভেদ কল্পিত বলিয়াই মনে করেন। তিনি বলেন, কেবল শীলই যে কালচারের পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে মাত্র তাহাই নহে, কালচারের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগেও শীল হইতে উৎপন্ন শব্দ বেশ খাটিয়া যায়—যে সব স্থলে কৃষ্টি বা তন্মূলক শব্দ একেবারেই অচল। কৃষ্টি শব্দটীকে তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে (?) কবরস্থ করিতে চাহিয়াছেন। উত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়াছেন 'কৃষ্টি' একেবারেই চলিয়া যা... অথবা একমাত্র শীলই cultureএর পারিভাষিক প্রতিশব্দরূপে

প্রবর্ত্তিত হইয়া টিকিবে কিনা, তাহা ভবিষ্যতের উপরই নির্ভর করে। প্রথম পক্ষ শেষদফা আলোচনায় কালচারের প্রতিনিধি স্থানীয় হিসাবে 'সংস্কৃতি' ও 'শীলতা' এই দুই শব্দের তুলনামূলক সমালোচনা আহ্বান করিয়াছেন। এইখানেই উক্ত পত্রিকায় বিষয়টার উপর বিতর্কিকা শেষ হয়।

কৃষ্টি শব্দটার ব্যবহারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট ও দৃঢ় একটা মত ১৩৪০ সালের পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষ' হইতে আমরা পাইয়াছি। স্পষ্টতর এবং দৃঢ়তর একটা মত ১৩৩৯ সালের ৩য় সংখ্যা 'পরিচয়ে' আছে। বলা বাহুল্য, কবি-সার্ব্বভৌম 'সংস্কৃতি' শব্দটা ব্যবহারের পক্ষপাতী। 'কৃষ্টি' শব্দের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় ১৯৪০ সালের পৌষ মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। 'কৃষ্টি' শব্দটার বিপক্ষে এত আপত্তি সত্ত্বেও বর্ত্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবর্ত্তকের প্রথম প্রবন্ধের নামই দেখা গেল "ভারতের কৃষ্টিরক্ষা"। বস্তুতঃ আধুনিক সাময়িক পত্রিকাদিতে culture শব্দটার বাঙ্গালা প্রতিশব্দের বৈচিত্র্য একটা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। কালচারের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা পাইয়াছি সংস্কৃতি, কৃষ্টি, অনুশীলন, পরিশীলন, কর্ষণা, চর্চ্চা, সাধনা, মনঃপ্রকর্ষ, চিৎপ্রকর্ষ (চিত্তপ্রকর্ষ), উৎকর্ষ, শীলতা, বৈদগ্ধ্য এবং সম্ভবতঃ আরো অনেক। ১৩৪০ সালের আশ্বিন মাসের উদয়নে (৬২৩ পৃষ্ঠায়) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের লেখায় 'কৃষ্টি' শব্দটার ব্যবহার দেখা যায়। উক্ত সালের মাঘ মাসের উদয়নে (১২৮৬ পৃষ্ঠায়) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ও তাঁহার প্রবন্ধে কৃষ্টি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায় এবং আরো অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 'সংস্কৃতি' শব্দটা ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে 'চর্চ্চা' ও 'অনুশীলন' শব্দ দুইটার প্রয়োগ লক্ষ করিবার বিষয়:—(১ম) "এইজন্য একদিকে যেমন সংস্কৃত আরবী পারসীর অনুশীলনের প্রয়োজন, অপরপক্ষে তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশিষ্ট চর্চ্চা ও অনুবাদ প্রচারের আবশ্যক। [লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১] (২য়) "মানসবুদ্ধির অতিরিক্ত চালনায়, প্রত্যেক বিদ্যার অনুশীলনে যে অহংজ্ঞান ও ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায় তাহাতে, সর্ব্ববিদ্যার অতিরিক্ত যে বিদ্যা—জীবন-জিজ্ঞাসা বা আত্মজ্ঞান—তাহার অবকাশ আর থাকে না, বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ অন্তর্হিত হয়।" (শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৪১)। নিম্নের উদাহরণগুলিতে কালচার বুঝাইতেই বোধ হয় উৎকর্ষ, উৎকর্ষতা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে: (১ম) "হজম করিবার শক্তি থাকিলেও কেবল পুস্তকের সংখ্যার উপর মনের উৎকর্ষ নির্ভর করে না।" (শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৪১)। (২য়) "জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও আরো অনেক বাঙ্গালীর মুখে বিগত বাঙ্গালার উৎকর্ষতার বিবরণ শুনিয়াও আমরা মনে করি ইত্যাদি। (লেখক—ডাঃ প্রসন্নকুমার আচার্য্য, উত্তরা, চৈত্র, ১৩৪০)। তারপর পরিশীলন, শীলতা প্রভৃতি শব্দের 'কালচার'এর অর্থে কয়েকটা প্রয়োগ দেখা যাউক:—"প্রত্যেক পরিশীলনোৎসুক বাঙ্গালীর এই বইখানি পড়া উচিত।" (লেখক—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, উত্তরা, ফাল্গুন, ১৩৪০)। "এ সমস্ত রচনা, সকল শীলতার (culture) পক্ষেই লজ্জার ব্যাপার।" (লেখক—শ্রীযামিনীকান্ত সেন, উদয়ন, পৌষ, ১৩৪০)। শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'কৃষ্টি' ও 'পরিশীলন' শব্দ দুইটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসের উত্তরায় প্রকাশিত উক্ত লেখকের "আষাঢ়ে" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদাহরণ উৎকলিত হইল:—"........প্রধান কারণ হল আমাদের পরিশীলনের সম্পূর্ণ রূপ-সম্বন্ধে অজ্ঞানতা।"......"আমাদের কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ও মানসিক ধারার সমন্বয়-সাধন।"......"কৃষ্টির বিধিনিয়ম জানতে হবে, জানলে বোধ হয় আমাদের পরিশীলন সম্বন্ধে লজ্জা কি সঙ্কোচের কোন কারণ থাকবে না।" তবে কি সত্যই "কৃষ্টি যার সাধনোপায়, শীল তার ফসল?" মনঃপ্রকর্ষ, চিৎপ্রকর্ষ শব্দগুলিও সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা উত্তরা হইতে একটা উদাহরণ দেওয়া গেল:—"স্বয়ং রাষ্ট্রনায়কেরা যেকালে তাঁদের স্বেচ্ছাচারের স্থালনে ঐতিহাসিক যুক্তির দোহাই দিতে বাধ্য, তখন চিৎপ্রকর্ষের পক্ষে পূর্ব্বগামী চিন্তাধারায় আত্মীয়তা অস্বীকার

করা অসম্ভব।" (লেখক—শাহেদ সুরহুর্দি।) অনেক লেখক cultureএর কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার না করিয়া ও-কথাটার লিপ্যন্তর বাঙ্গালায় ব্যবহার করেন। যথা—"তাঁদের ভাষার শব্দ একেবারেই সংকীর্ণ—ভাবকে ফোটাতে পারে ঠিক তাদের যতটা প্রয়োজন ততটাই। তাই সেখানে 'কালচার' বা আর্ট নেই।" যতদূর মনে পড়ে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় ইংরেজি cultureএর জন্ম বাঙ্গালায় 'সাধনা' শব্দটা ব্যবহার করিতেন। Cultureএর প্রতিশব্দ হিসাবে 'বৈদগ্ধ্য' শব্দটার ব্যবহার সম্প্রতি বড় একটা দেখা যাইতেছে না।

বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেল না। মনে হয় 'কালচারে'র প্রতিনিধি হিসাবে একাধিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিবে। ইহা বাঙ্গালা ভাষার দুর্ব্বলতা না হইয়া বলিষ্ঠতার পরিচায়কও হইতে পারে। শ্রুতিলালিত্যের জন্য, অনুপ্রাসের খাতিরে, বাক্যকে গাঢ়বন্ধ করিবার নিমিত্ত cultureএর বিভিন্ন বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচনায় স্থান পাইতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। উপরি উদ্ধৃত উদাহরণগুলির প্রত্যেকটীতে cultureএর প্রতিশব্দ হিসাবে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ সম্যক সুষ্ঠু হইয়াছে কিনা তাহাও অবশ্য বিবেচ্য। বিশ্বপ্রেম, বিশ্বসভ্যতা, মানবধর্ম্ম প্রভৃতির মত বিশ্ব-সংস্কৃতি, মানবকৃষ্টি, সার্ব্বজনীন শীলতা প্রভৃতি চলিবে কিনা জানিনা। আশা করি বঙ্গভাষাভাষী মনীষীগণের দৃষ্টি এই প্রবন্ধের বিষয়ের উপর আকৃষ্ট হইবে।

৩। ছন্দ-জিজ্ঞাসা

শ্রীমমতা মিত্র

কিছুকাল আগে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন 'বিচিত্রা'য় বাংলা ছন্দের তিনটি রূপের বিশদ আলোচনা ক'রেছিলেন। সে সময়ে তাঁর সুলিখিত ও মূল্যবান প্রবন্ধগুলি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি এবং ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখেছি। আধুনিক ছন্দের ঠিক রূপটি তিনি উপলব্ধি ক'রতে পেরেছেন ব'লে আমি মনে করি। তাঁর অবলম্বিত সূত্রানুসারে রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী আবার পড়েছি, তাঁর উদ্ভাবিত নিয়ম খাটে না এমন জায়গা চোখে পড়ে নি এত দিন।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা" কাব্য গ্রন্থখানি প্রবোধ বাবুর "ছন্দ পাটির অনুসারে পাটিয়ে" দেখ্‌ছিলুম। দু'তিন জায়গায় একটু খট্‌কা বেধেছে ব'লে আজ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সেই কথা বল্‌ছি। আশা করি প্রবোধচন্দ্র "বিচিত্রা" মারফৎ তাঁর মতামত জানাবেন।

প্রবোধবাবুর মতে দিও, নিও প্রভৃতি শব্দগুলি স্বরবৃত্ত ছন্দে দুই সিলেব্‌ল্‌ ব'লে গণ্য হয়, এর বানান কখনও 'দিও', আবার কখনও বা 'দিয়ো' লেখা হয়। কিন্তু বাজিয়োনাক' কথাটি প্রবোধবাবু কয় সিলেব্‌ল্‌ ধরেন জানতে পারলে খুসী হ'ব। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র অধিকাংশ কবিতা চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে রচিত। ঐ পুস্তকের "অতিথি" কবিতার প্রথম দিকে আছে :—

পায়ে পায়ে | বাজিয়োনাক | মল,
ছুটোনাক, | চরণ চঞ্চল,
হঠাৎ পাবে | লাজ |

উল্লিখিতভাবে ছন্দ বিভাগ ক'রলে প্রথম লাইনের দ্বিতীয় পর্ব্বে "বাজিয়োনাক" পাঁচ সিলেব্‌ল্‌ হয়। প্রবোধবাবু অবশ্য নাচিয়ে, ঘুমিয়ে প্রভৃতি শব্দগুলি পর্ব্বের প্রথমে থাকলে দুই সিলেব্‌ল্‌ ও হাওয়া, নাওয়া শব্দের 'ওয়া'কে এক সিলেব্‌ল্‌ ধরতে ব'লেছেন স্বরবৃত্ত ছন্দে। কবি সত্যেন্দ্রনাথও তাই ব'লেছিলেন তাঁর "ছন্দ সরস্বতী" নামক সরস প্রবন্ধে। "অতিথি" কবিতাটি চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে রচিত, অথচ "বাজিয়োনাক" পাঁচ সিলেব্‌ল্‌ দেখ্‌ছি। প্রবোধবাবু তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন "স্বরবৃত্ত" ছন্দের পর্ব্বগুলিতে কখনও পাঁচ বা ছয় সিলেব্‌ল্‌ চালানো যায় না। এ ছন্দের পর্ব্বে যদি চারের অধিক সিলেব্‌ল্‌ থাকে তবে অমনি ছন্দ পতন ঘটে।" এই কবিতাটির পর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ চালিয়েছেন পাঁচ সিলেব্‌ল্‌, তা'তে কানে ত' কিছু বাধ্‌ছে না। এই শব্দটি চার সিলেব্‌ল্‌ ব'লে ধ'রবার কোন উপায়

আছে কিনা যদি প্রবোধবাবু 'জানান ত' বিশেষ উপকৃত হ'ব।

আর একটি কথা বল্‌বার আছে। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় একবার লিখেছিলেন "চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে ত্রিস্বর পর্ব্ব চতুঃস্বর পর্ব্বের সঙ্গে চমৎকার কাঁধ মিলিয়ে চল্‌তে পারে।" একথা কিন্তু প্রবোধবাবু কোন জায়গায় ব'লেছেন ব'লে স্মরণ হয় না। চতুঃস্বর পর্ব্বের সঙ্গে ত্রিস্বর পর্ব্ব অনেক লক্ষ ক'রেছি। 'অতিথি' কবিতাতেই আছে :—

ছুটোনাক' | চরণ চন | চল্‌

যদি পর্ব্ব-বিভাগে ভুল না হ'য়ে থাকে ত' এর দ্বিতীয় পর্ব্বে তিন স্বর পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষণিকার আরও কয়েক স্থানে এমন দৃষ্টান্ত আছে। এ সম্বন্ধে দিলীপবাবুর সঙ্গে প্রবোধবাবুর মতের মিল আছে কি না জান্‌বার কৌতূহল হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে চতুঃস্বর পর্ব্বে পাঁচ সিলেব্‌ল্‌ শুধু যে 'অতিথি' কবিতায় আছে তা' নয়, 'ক্ষণিকা'র "যাত্রী" কবিতাতেও আছে :—

এলে যদি | তুমিও এস,
যাত্রী আছে | নানা।

আমার প্রশ্ন দুটির উত্তর প্রবোধবাবুর কাছ থেকে পাব আশা করি।

৪। নারীনৃত্য ও নারীর মর্য্যাদা

ব্রহ্মচারী সরলানন্দ

কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলার সহর ও নগরে নারীর নৃত্য প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। প্লাবন বা ভূমিকম্পে বিপন্ন দুঃস্থ মানব-সমাজের জন্য নারী-নৃত্যের অনুষ্ঠান করিলে দর্শকের ভিড় হয়, অর্থ সংগ্রহ সহজে হয়। এইরূপ মানব-প্রীতির দোহাই দিয়াও অনেক সময় নারীনৃত্য চলিতেছে। তা' ছাড়া, আমোদ আনন্দ উপভোগের জন্য বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায়, বিবাহ-সভায় এমন কি শ্রাদ্ধ-বাসরেও নারীনৃত্যের অনুষ্ঠান এই দেশে প্রচলিত হইতেছে। ভদ্রঘরের নারীকে সহস্র অজ্ঞাত পুরুষের সম্মুখে তার প্রস্ফুটিত রূপ যৌবন নিয়া নৃত্য করিতে হইলে, সমাজের স্বাস্থ্যে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা আনিবে কিনা, নারী-প্রগতির নামে, নারী-মর্য্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে কিনা, ইহা বর্ত্তমান সমাজের প্রত্যেক চিন্তাশীল মানব-মানবীর ভাবিবার বিষয়।

দেশে সহ-শিক্ষা ধীরে ধীরে অনেক বিদ্যালয়েই প্রচলিত হইবে—এইরূপ ধারণা করিলে তাহা নিতান্ত অমূলক হইবে না। আজ সহ-শিক্ষা চলিয়াছে, কাল হয়ত সহ-নৃত্য চলিবে। এইরূপ আশঙ্কা একান্ত বাতুলতা বলিয়া মনে হয় না। সেইদিন ঢাকায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এক বক্তৃতায় ভদ্রললনাদের প্রকাশ্যে অর্থের বিনিময়ে নৃত্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য বা 'আর্টে'র খাতিরেও যদি ইহার আবশ্যকতা সমর্থন করি, তবে য়ুরোপীয় সমাজে যুবতীদের নৃত্যের পরিণামের কথা ভাবিয়া দেখিতে হয়। নারী-নৃত্যের জন্য ঐ দেশে অসংখ্য শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সব শিক্ষালয়ের ভিতরের কথা জানিলে, নারীর রূপ ও যৌবন নিয়া 'প্রগতি', 'আর্ট', ও 'কাল্‌চারে'র নামে কি বীভৎস ছিনিমিনি খেলা চলিয়াছে, তার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

য়ুরোপীয় সমাজ সহ-শিক্ষায়, নারীনৃত্য এবং সহ-নৃত্যে কতদূর সমৃদ্ধ বা সুসভ্য হইতে পারিয়াছে এবং এই জাতীয় নারীজাগরণের প্রবর্ত্তনে নারীকে তার আপন সুখ ও মর্য্যাদায় কতটুকু সুপ্রতিষ্ঠ করিতে সক্ষম হইয়াছে, আমাদের উৎসাহী তরুণ ও তরুণী ভাইবোনেরা ধীরে সুস্থে তাহা ভাবিয়া দেখিলে উত্তম হয়।

নারীকে নাচাইয়া, ভদ্রঘরের যুবতী কন্যাকে, অনূঢ়া নিরপরাধাকে নৃত্য-কলা শিখাইয়া তার সতীত্ব ও রূপ যৌবনে শকুনীর মত তীব্র নখর বসাইয়া লালসার পূর্ণ চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া ব্যবসা দ্বারা ঐ দেশে শত সহস্র নর-পশু অর্থ উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। নির্ব্বোধ কন্যা নৃত্য শিখিবার মোহে বা অর্থোপার্জ্জনের লোভে একবার শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইলে তাহাকে শত শত দালালেরা

বিপণির পণ্যের মত দেশে দেশে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সহস্র লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা করিয়াছে এবং করিতেছে। এই পাপ-ব্যবসায় ক্রমশঃ য়ুরোপের সমাজ-কল্যাণকামী মনীষীদের নিকট এক মহা ভাবনার বিষয়ে দাঁড়াইলে তাঁহারা 'বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে' (League of Nations)র সাহায্যে ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে যত্নশীল হইয়াছেন।

এই সেইদিনের দৈনিক কাগজে* দেখিলাম, য়ুরোপীয় সমাজে সভ্যতা ও শিল্পকলার নামে নারীনৃত্যের পরিণাম ক্রমশঃ কোন্ রসাতলে যাইয়া আত্মসমর্পণ করিতেছে। ছায়াচিত্রের ভিতর সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া নারী না নাচিলে, রূপ-যৌবনসম্পন্না কুল-ললনারা বাজারের টিকেট-কেনা দর্শকদের নয়ন সমক্ষে একেবারে বিবস্ত্রা হইয়া নৃত্য না করিলে য়ুরোপীয় রুচির আর তৃপ্তি হয় না। সভ্যতার ক্ষুধা কতদূর বিগর্হিত হইলে নারীর রূপ, যৌবন ও মর্য্যাদার উপর এমন লুণ্ঠন চলিতে পারে, প্রাচ্যের প্রগতিপরায়ণা ভগিনীরা সেই কথা ভাবিয়া দেখিবেন কি?

উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া সেই দিন উনিশ বছরের এক বালিকা ইংলণ্ডের বিচারালয়ে অভিযোগ আনিয়া পাঁচশত পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইয়াছে। চলচ্চিত্রে 'ষ্টার' হওয়ার কামনায় বালিকা প্রয়োগ-শিল্পী ওয়াল্‌টার সামার্সের (Capt. Walter Summers) ফিল্ম তুলিবার সময় নৃত্য প্রদর্শন করিতে গেলে শিল্পী তাহাকে বিবস্ত্রা করিতে থাকে। ইহাতে সে আপত্তি জানায়। কিন্তু, তাহাকে নানা যুক্তি দ্বারা প্রবোধ দেওয়া হয়। শেষে, এই চিত্র জনসাধারণে প্রদর্শিত হইবে না এবং এক সপ্তাহের ভিতর ছবির 'নেগেটিভ্' তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে, সর্ত্তে, বালিকা বিবস্ত্রা হইয়া নৃত্য-প্রদর্শন করে। প্রয়োগ-শিল্পী কিন্তু তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। জনসাধারণে এই বালিকার উলঙ্গ নৃত্য চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে বালিকা বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়ন করে এবং উল্লিখিত মুদ্রা ক্ষতিপূরণস্বরূপ পায়।

এই সব জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা য়ুরোপীয় সমাজের নারী-প্রগতির এবং নারী নৃত্যের ভয়াবহ পরিণতি হইতে সময়োপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের দেশের ও সমাজের আন্তর্ভৌমিক প্রাণধারার সহিত যাঁহাদের নিবিড় পরিচয় আছে, সেই মার্জ্জিত-রুচি-সম্পন্ন সমাজ-কল্যাণ-চেতা মানব-মানবীরা আজ নারী নৃত্যের 'সার্থকতা এবং ব্যর্থতা'—এই উভয় দিক্ বিশদভাবে 'বিতর্কিকা'র আলোচনা করুন—এই অনুরোধ।

* 'অমৃতবাজার পত্রিকা'; ২৪ জুলাই, পৃঃ ৫

৫। নামের পদবী

শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায়

ফাগুনের বিচিত্রায় আমার লেখা "নামের পদবী" সম্বন্ধে এর মধ্যেই বেশ সমালোচনা আরম্ভ হয়েছে। বিষয়টা যে acute এবং একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আজকালকার প্রগতির যুগে—এটা দেখ্‌ছি সকলেই প্রায় স্বীকার করেছেন। কিন্তু গোলযোগ বেঁধেছে—বিষয় বস্তুটা নিয়ে।

বোশেখের 'বিচিত্রা'র নীহারবাবু অনেক কথা আপন খেয়ালে বলে' গেছেন। আমার জিজ্ঞাস্য ছিল—'মেয়ে বন্ধুদের ডাক্‌তে হ'লে এক সামাজিক সম্বোধন ছাড়া আর কি সম্বোধন পুরুষরা ব্যবহার কর্‌তে পারে?' কিন্তু নীহারবাবু মেয়ে মেয়ে বন্ধুকে ডাক্‌তে হ'লে—কেন নাম ধরে ডাক্‌বে না—এবং পুরুষ মেয়ে বন্ধুকে ডাক্‌তে হ'লে—'দিদি' 'বৌদি'—বল্‌তেই বা দোষ কি—ইত্যাদি অনেক রকমের অবান্তর কথা বলে' কাটান্ দিতে চেয়েছেন। কেবল শেষে একটা গল্পের অবতারণা করে' বলেছেন যে অত ভীড়ের মধ্যে ছেলে তা'র বাবাকে 'বাবা' সম্বোধন হাতের পাঁচ থাকা সত্ত্বেও অমন অমুক বাবু বলে ডেকেছিল—তখন মেয়ে বন্ধুদের নাম ধরে' ডাক্‌তে দোষ কি? নীহারবাবু হয়ত জানেন না যে কোন কাল্পনিক গল্পের দোহাই দিয়ে সত্যিকারের কোন আলোচনা বা তর্ক চালানো যায় না—তা'তে কেবল বুদ্ধিহীনতার পরিচয়ই বাড়ে। আর নীহারবাবু বোধ হয় তাঁর গল্পের ঝুলি খুঁজে কোথাও বার কর্‌তে পার্‌বেন না—যেখানে ঐ রকম ভীড়ের মধ্যে কোথাও

কোন ছেলে তা'র মাকেও নাম ধরে' ডেকেছিল। নীহারবাবুর গল্পের ভিতর যদি সত্যির কোন রকম আঁচও থাকে—তবে সেটা পুরুষ-পুরুষের সম্বোধন বলেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এটা খুবই সত্যি যে এ ব্যাপারটা কোন মুখ চেনা বা একটু অন্তরঙ্গ মেয়েকে সম্বোধন কর্‌তে গেলে কখনই চল্‌তো না—ছেলে ও মায়ের মধ্যেত নয়ই।

নীহারবাবু আরও বলেছেন—কোন মেয়ে যদি কোন পুরুষের intimate friend (?) হন—তবে তাঁর নাম ধরে' ডাকতে বাধা কি? কিন্তু কোন মেয়ে পুরুষে আলাপ হ'লেই যে একেবারে পুরোপুরী intimacyতে দাঁড়িয়ে যাবে—তা'ও ত সব সময়ে হয় না। সুতরাং যতক্ষণ অন্ততঃ দুজনের মধ্যে intimacy না হয়—ততক্ষণ হয়ত নীহারবাবুর মতে—সেই দিনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা কর্‌তে হ'বে—কবে intimacy হ'বে—এবং সেইদিন সম্বোধনটা সরল হ'য়ে দাঁড়াবে। এটা কতদূর সম্ভব তা' পাঠক পাঠিকাদের উপরই ভার রইল।

জ্যৈষ্ঠের 'বিচিত্রা'য় নামের পদবী সম্বন্ধে আরও দুটো সমালোচনা পড়লুম। স্বরূপবাবু বলেছেন—"যখন সুরেন-বাবু বা উপেনবাবু বলে থাকি পুরুষ বন্ধুদের বেলায়—নারী বন্ধুদেরই বা নাম ধরে' ডাকতে কেমন কেমন লাগে কেন?" এই 'কেন'র জবাবের জন্যইত এত মাথা ঘামানো। Ladies' Prestige বলে—একটা কথা আছে সেটা সকলেই প্রায় অল্প বিস্তর মেনে চলেন। আর এও ঠিক মেয়ে-মেয়ে বন্ধুদের ভিতর যেমন অসঙ্কোচ ব্যবহার আছে, পুরুষ-পুরুষ বন্ধুদের ভিতরেও ঠিক তেমনিই আছে। কিন্তু পুরুষ যদি সামাজিক পরিচয়ের দাবী নিয়ে কোন স্বল্প পরিচিতা নারী-বন্ধুকে নাম ধরে' ডাকে—সেটা কি স্বরূপবাবুর মতে খুব সুরুচি সঙ্গত হ'বে? তিনি মেয়েদের সম্বোধন ব্যাপারটা এক "ভদ্রে"তেই সার্‌তে চেয়েছেন। কিন্তু 'ভদ্রে' শব্দটা একটাত general term. কোন ভীড়ের মধ্যে 'ভদ্রে' বলে ডাকলে কেইবা শুনবে আর কেইবা সাড়া দেবে। উপরন্তু 'ভদ্রে' শব্দটা যেন অনেকটা পোষাকী কথা বাংলা ভাষায়।

স্বরূপবাবু এও বলেছেন যে Missএর পরিবর্তে 'শ্রীমতী' এবং Mrsএর বদলে 'শ্রীযুক্তা' প্রতিশব্দ নামের আগে বসিয়ে মেয়েদের সম্বোধন করা যেতে পারে। কিন্তু যাঁদের পরিচয় অজ্ঞাত—কোন gatheringএ যাঁদের সঙ্গে স্বল্পকালের জন্য আলাপ—তাঁদের নামের আগে 'শ্রীমতী' বস্‌বে কি 'শ্রীযুক্তা' বস্‌বে—যদি তাঁরা ব্রাহ্ম, খৃষ্টান বা মুসলমান নারী হন—যাঁরা সিঁদুর ব্যবহার করেন না। তখন কি বলে তাঁদের সম্বোধন চল্‌বে? তখন শ্রীমতীও খাটবে না—শ্রীযুক্তাও খাটবে না। তবে যদি সব জায়গায় 'শ্রীমতী' বসানো যায়—তা'হ'লে হয়ত সমস্যাটা কিছু হাল্‌কা হয় কিন্তু নামটা একটা প্রকাণ্ড বড় হ'য়ে দাঁড়াবে।

আমি লিখেছিলুম "মিস্‌ বা মিসেস্‌ শব্দটা কানে বড় বিশ্রী বাজে।" তার উত্তরে শ্রীবিনয়কুমার মিত্র এম্‌, এ—এল্‌, এল্‌, বি, লিখ্‌ছেন "আমার বোধ হয় যে আমাদের পক্ষে মিস্‌ মিসেস শব্দদ্বয় ব্যবহার করা উচিত নয়, এইজন্য নয় যে তা' ব্যক্তি বিশেষের কানে বাজে, কিন্তু এইজন্য যে ঐ শব্দ দুটি ব্যবহার করতে হ'লে—আমাদেরকে অনাবশ্যক ভাবে ইংরাজদের অনুকরণ করতে হবে—আর সকলেই স্বীকার করবেন যে অনাবশ্যক অনুকরণ সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য।" বিনয়বাবুর একথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু আমি যে লিখেছিলুম "মিস বা মিসেস শব্দটা কানে বড় বিশ্রী বাজে' —বিনয়বাবু এটা আমার ব্যক্তিগত শ্রুতিকটু বলে উপহাস করেছেন—কিন্তু তিনি একটু ভাল করে ভেবে দেখ্‌লে সহজেই বেশ বুঝতে পার্‌তেন যে 'মিস বা মিসেস' শব্দদ্বয় ইংরাজি শব্দের অনুকরণ বলেই কানে বিশ্রী বাজে বলা হয়েছিল। তাঁর মত ডিগ্রীধারীর এটুকু বোঝা উচিত ছিল না কি? কারণ এমনি শুনতে মিস বা মিসেস শব্দ দুটো মোটেই শ্রুতিকটু নয়—যদি না তা'রা ইংরাজি শব্দ হ'তো।

অনেক গবেষণা করে, বিনয়বাবুর মতে দুটা শব্দের প্রয়োগ করে' নারীবন্ধুদের আহ্বান করা যেতে পারে—একটী 'দেবী' অপরটী 'শ্রীমতী'। তবে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে 'দেবী' শব্দের তত পক্ষপাতী নন কারণ তাঁর মতে নাকি—"পুরুষও যেমন দেব নন্‌—নারীও তেমনি দেবী নন্‌।" সুতরাং তিনি তাঁর রায়ে বলেছেন—'শ্রীমতী' শব্দ প্রয়োগ করে' মহিলাদের আহ্বান করা যেতে পারে—এবং তা'কে

তাঁদের সম্মানেরও কোন হানি হ'বে না। কিন্তু বিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করি 'দেবী' শব্দ প্রয়োগ করতে গেলে—তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে যদি আপত্তি থাকে—তবে 'শ্রীমতী' শব্দের প্রয়োগেই বা তাঁর এত পক্ষপাতিত্ব কেন? কারণ এমনও ও হ'তে পারে—পুরুষ মাত্রেই যেমন 'শ্রীমান' নন্—নারী মাত্রেই বা 'শ্রীমতী' হ'বেন কেন?

যাক্—নারীর নামের পদবী নিয়ে যে এতদিন পরে একটা আলোচনা চল্ছে—এই যথেষ্ট। সংস্কার আমাদের এমনিই হ'য়েছে যে হঠাৎ কোন নূতন সম্বোধন করে' কোন নারী বন্ধুকে ডাকা সহজ হ'য়ে উঠ্‌বে না। প্রথম প্রথম সেটা ওষুধ খাওয়ার মত করেই চালাতে হ'বে। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত সেটা সহজ স্বচ্ছগতিসম্পন্ন হ'য়ে যাবে। এমন হয়ত দিন আসবে যেদিন নামের আগে কোন প্রতিশব্দ যোগ করবার বালাই হয়ত থাকবে না। কিন্তু যতদিন না সে ceremonious দিনটী আসে—ততদিন একটা 'popular' শব্দ ঠিক করতেই হ'বে। আশা করি শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সম্পাদক উপেনবাবু ঐ বিষয়ে তাঁর পাকা মতামত জানাবেন।

প্রেম ও কামনা

শ্রীধীরেন মুখার্জ্জি

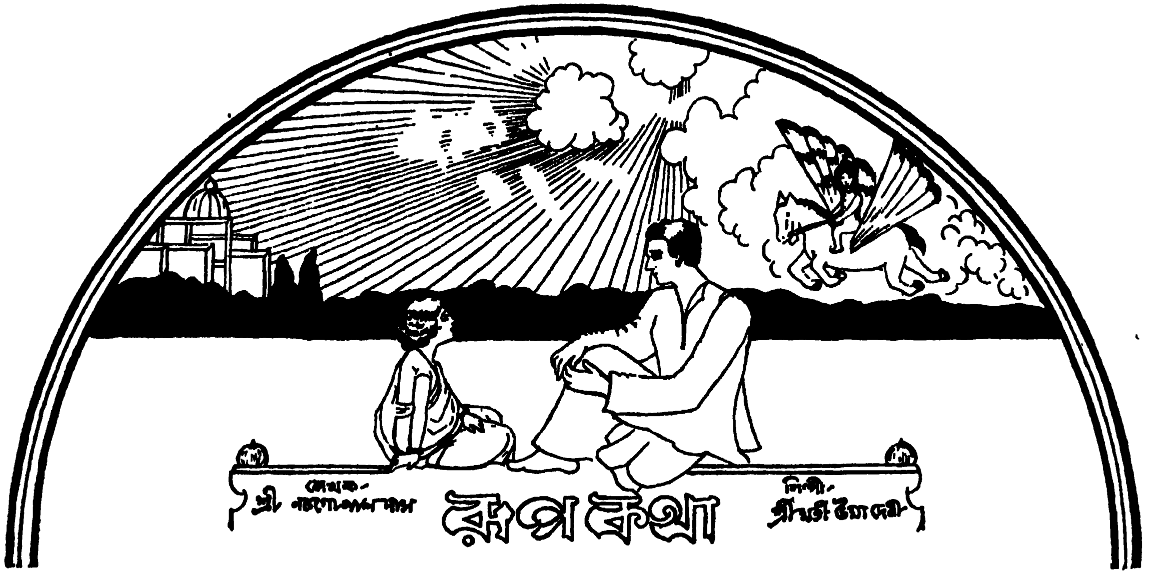
প্রেম ও কামনা, মানবের মনে,
পাশাপাশি দুটি রহে;
প্রেম গড়ে মনে আনন্দ-ভবন,
কামনা তাহারে দহে।

কামনার মনে প্রিয়-জন-সনে,
দেহ মিলাইতে আশ,
প্রেম গড়ে তার প্রিয়রে মধুর
কল্পনায় করি বাস।

কামনা প্রিয়রে আপনার করে,
প্রতিদান যদি পায়,
প্রেম শুধু খোঁজে প্রিয়-জন-সুখ,
নিজেরে বিলা'তে চায়।

ক্ষণিকের মোহ টুটিলে কামনা
অবহেলা করে পরে;
যুগ-যুগ ধরি ধ্যান-রত-প্রেম
প্রিয়-স্মৃতি বুকে ধরে।

কামনা ক্ষুদ্র দেহের মিলনে
সসীমের মাঝে রহে;
প্রেমের প্রবাহ অসীম-প্রসারী,
নিখিল জগতে বহে।



রূপকথা

আমার সাত বছর বয়সের বন্ধু, রেণু, আমার গলাটি জড়িয়ে ধরে বলে উঠ্‌ল, অনুদা', তুমি আজ আমায় একটি রূপকথা ব'লো না!

রূপকথা শুন্‌তে রেণুর এত আগ্রহ কেন?

রেণুর মন হচ্ছে সংসারের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার বাইরে—সে ত যুক্তি শুন্‌তে চায় না, সে চায় এমন কাহিনী শুন্‌তে যার সাথে সামঞ্জস্য হবে তার অসীম আকাশভরা কল্পনার। বস্তু-জীবনের উপর তার মুঠি যে শিথিল, তার সময়হীন মনের গতি যে রূপকথার রাজ্যে।

কী মোহিনীশক্তি এই রূপকথার!…সেই কোন্ অচিন্‌দেশের রাজপুত্তুর, তার পক্ষীরাজঘোড়া সাগর লঙ্ঘন করে এক লাফে, আকাশ দিয়ে উড়ে যায় নক্ষত্রবেগে!

রেণু প্রশ্ন করে, এই আমাদেরও উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, অনুদা'?

আমি বলি, নিশ্চয়ই…শুধু আমাদের উপর দিয়ে কেন, সব্বারই উপর দিয়ে…ঐ যে সেদিন মস্তবড় পাহাড় দেখেছিলে তারও উপর দিয়ে!

রেণু বিস্ময়ে বিভীষিকায় হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে।…না জানি কী তেজীয়ান্ সে ঘোড়া, আর কেমন সে রাজপুত্তুর!

আমি বলি, অমন ক'রে তাকিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না, রেণু। একদিন রাজপুত্তুর সত্যি সত্যি ঘোড়ায় চড়ে আস্‌বে তোমার কাছে।

এর তাৎপর্য্য রেণু একটু বুঝ্‌তে পারে। তার সুন্দর চোখ ঘুরিয়ে, পাত্‌লা ঠোঁট ফুলিয়ে তর্জ্জন করে বলে, আমার সাথে এমন দুষ্টুমি কর্‌লে আমি কিন্তু আর তোমার কাছে আস্‌ব না!

তা' কি হয়! রেণুর সাহচর্য্য যে আমার চাই-ই। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বলি, না, লক্ষ্মীটি, তোমার সাথে আর দুষ্টুমি কর্‌ব না।

রেণুর অভিমান তবু ভাঙে না। মুখখানা শ্রাবণ মেঘের কালোতে ঢেকে রেখে সংক্ষেপে বলে, ভারী ত গল্প বল্‌ছ তুমি!…বোকা হয়েছে, না?

আমি মনে মনে হাসি, মনের হাসি ঠোঁটের ফাঁক দিয়েও ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ে। কোনক্রমে তা' রোধ করে রেণুকে আবার আদর করে বলি, সত্যি বল্‌ছি, রেণু, আর দুষ্টুমি কর্‌ব না, এবার দেখ্‌বে কী রকম লক্ষ্মীছেলের মত গল্প বলে যাব!

রেণু শান্ত হয়, বলে, আচ্ছা, এবার ব'লো……

ছিন্নবন্ধন গল্পের সুতো ধরে আমি আবার চল্‌তে থাকি।…রাজপুত্তুর গেছে শীকার কর্‌তে, গহন বনে। সে কী দুর্য্যোগ আর অন্ধকার! সঙ্গী সাথী সব কোথায় গেল হারিয়ে…ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির মধ্য দিয়ে পথহারা পথিক চল্‌ল অনুদ্দিষ্টের উদ্দেশে……

—সব্বাই হারিয়ে গেল, অনুদা'?

—সব্বাই, রেণু।…ভয়ানক দুর্যোগ ছিল কিনা!…এই ধরো এখন যদি ভীষণ ঝড় আর বৃষ্টি আরম্ভ হয় আর সাথে সাথে বিদ্যুৎ চম্‌কাতে সুরু করে এবং আমরা দু'জনে বাড়ীর দিকে ছুট্‌তে আরম্ভ করি তাহ'লে আমরা দুজনেই হারিয়ে যাবো!

রেণু বিশ্বাস করেনা।…সেই সেবার বোশেখি ঝড়ে কী ভীষণ ছুট্‌তে ছুট্‌তে সে বাড়ীর আমবাগানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—কৈ, হারিয়ে যায়নি' ত।

আমি তার চোখে অবিশ্বাসের সুর দেখ্‌তে পাই। শশব্যস্তে বলি, তুমি ত রাজপুত্তুর নও, রেণু, তুমি যে রাজকন্যা!…রাজকন্যারা কখনও পথ হারায় না।

পার্থক্যটা রেণু বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু অবিশ্বাসের কুয়াসা তার স্বচ্ছ চোখের সাম্‌নে থেকে সরে যায়। আনন্দোজ্জ্বল আঁখিদুটি আমার দৃষ্টির উপর ন্যস্ত করে বলে, সত্যি?

পরক্ষণেই প্রশ্ন করে, আচ্ছা, অনুদা', হঠাৎ এরকম বিশ্রী ঝড় এলো কেন ?

কী জবাব দেব খুঁজে পাই না। রেণুর পেলব সুকুমার মনের স্বপ্নময় ইন্দ্রজালের সাম্‌নে আমার বাস্তু বহির্মুখ কাহিনীর ধারা প্রতিহত হয়ে আস্‌বার উপক্রম হয়।

খানিকক্ষণ ভেবে বলি, ঝড় আসা যে দরকার, রেণু, নইলে রাজপুত্তুরের সাথে রাজকন্যার দেখা মিল্‌বে কেমন করে ?

রেণু আমার ব্যাখ্যা বোঝে কি না জানিনা, কিন্তু বেশ শান্ত তৃপ্তস্বরে জবাব দেয়, ওঃ……

আমি আবার সুরু করি।·· রাজপুত্তুর খানিকটা দূর যেতে যেতে দেখ্‌তে পেলে একটা আলোর রেখা। ক্লান্তিতে তার শরীর অবসন্ন—তাড়াতাড়ি সে ছুটে চল্‌ল সেই রেখার আগুন লক্ষ্য করে।···জনমানবশূন্য পুরী, সবাই আছে ঘুমিয়ে, হাতী, কুকুর, সিপাই, শান্ত্রী, উজীর, নাজির সব।

অস্ফুটকণ্ঠে রেণু প্রশ্ন করে, কেন, অনুদা ?

—সে আরেক রূপকথা, রেণু।···আরেকদিন শুনো।

রেণু কোন প্রতিবাদ করেনা, তার ছোট্ট নরম হাত দু'খানি দিয়ে আমার গলাটি আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে বলে, তুমি ভারী সুন্দর গল্প বলতে পারো, অনুদা'···আমার কী চমৎকার ঘুম আস্‌ছে !

রেণুর দিকে তাকাই। রূপকথার মোহনস্পর্শে তার অঙ্গ হয়ে এসেছে শিথিল, তার মন ঘুর্‌ছে শান্ত-সোনালি সুখের রাজ্যে।

আস্তে আস্তে প্রশ্ন করি, ঘুম পাচ্ছে, রেণু ?···আজ থাক্‌, আরেকদিন গল্প শেষ করা যাবে, কেমন ?

তন্দ্রালস স্বপ্নরাজ্য থেকে সচকিত হয়ে ফিরে এসে রেণু বলে, না অনুদা', আমার একটুও ঘুম পায় নি'···তুমি গল্প ব'লো।

রেণুর আদেশ লঙ্ঘন কর্‌বার মত মনের জোর এবং সাহস আমার নেই। কাহিনী আবার সুরু করি।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে বিদ্যুৎ চম্‌কায়—রাজপুত্তুরকে যে বিদ্যুতের আলো পথ দেখিয়েছিল বুঝিবা তারই একটি ছিট্‌কে-পড়া কণা। রেণু শিউরে ওঠে, বলে, আমার ভয় কর্‌ছে অনুদা' !

তাকে আরও নিবিড় ক'রে বুকে ধরে বলি, ভয় কিসের, রেণু ? রাজপুত্তুর আস্‌ছে তারই আলো যে ঐ !

এবার কিন্তু রেণু রাগ করেনা। দিগন্তে সন্ধ্যার মত শান্ত নিষ্কম্প চোখ দুটি তুলে আমায় শুধু মনে করিয়ে দেয়, গল্প কিন্তু তুমি এখনও শেষ কর্‌লে না অনুদা' !

কোথায় গল্পের সুতো শেষ হয়েছিল ভুলে গিয়েছিলুম। একটুখানি ভেবে নিয়ে আবার চল্‌তে আরম্ভ করি।

……সেই বিরাট্ থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে রাজপুত্তুরের শরীরটা একবার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, তবু তার বুকের অদম্য সাহস নিয়ে সে প্রাসাদের ভিতর ঢুক্‌ল।···গিয়ে দেখে সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে এক রাজকন্যা, তার হাত থেকে পাখা স্খলিত হয়ে পড়েছে শাদা পাথরের মেঝেতে, আর চারদিকে মাকড়সা এসে করেছে প্রহেলিকাময় গোলকধাঁধার সৃষ্টি !…রাজপুত্তুর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে শিয়রের কাছে এগিয়ে এল। দেখ্‌ল, দুটো কাঠি সেখানে পড়ে আছে, সোনার আর রূপোর।···মন্ত্রমুগ্ধের মত রাজপুত্তুর একটা কাঠি তুলে ধর্‌তেই আচম্‌কা তার পরশ লেগে গেল রাজকন্যার অধরে, অম্‌নি চারদিকে জীবনের বাঁশী উঠ্‌ল বেজে।…সে কী রব।···সবাই উঠ্‌ল জেগে, আর আলোর ঝর্‌ণাধারার মধ্যে রাজকন্যা দেখ্‌ল সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক কান্তিমান্ যুবা। অম্‌নি আর কোন দ্বিধা না ক'রে তার গলায় পরিয়ে দিল বরমাল্য !

রেণুর দিকে তাকিয়ে দেখি আমার গল্পের মোহন বাঁশীর মূর্চ্ছনায় তার অঙ্গ হয়ে এসেছে শিথিল, তার চোখের পাতায় এসে লেগেছে সোনালি সুখের আলো।

রূপকথার মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল বন্দিনী সে।



হিমাদ্রি-শৃঙ্গে

শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায় বি, কম

কোনও দিন বাংলার বাহির হই নাই, পূজার ছুটীটা পশ্চিমে কোথাও কাটাইব এই জল্পনা কল্পনা কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া ছুটীর বহুপূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। হাজারিবাগ, বিন্ধ্যাচল, আগ্রা, চুণার, দেওঘর প্রভৃতি কত স্থানেই যাইবার কল্পনা নিত্য গড়িতেছিলাম ও ভাঙ্গিতেছিলাম। ছুটীর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুগণ রণে ভঙ্গ দিয়া যে যাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন, আমি পড়িলাম একা। একসঙ্গে কয়েকজন থাকিলে বিদেশ-ভ্রমণটা বেশ উপভোগ্য করিয়া তোলা যায় এবং সকল বিষয়েই সুবিধা। এ সৌভাগ্য আমার আর ঘটিয়া উঠিল না। ছুটী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, আর ভাবিবার সময় নাই; সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করিলাম দার্জ্জিলিঙ্গ যাইব। এক বন্ধু ঠাট্টা করিয়া বলিলেন,—ভ্রমণটা পশ্চিম হইতে উত্তরে ফিরিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত হইবে বোধ হয় পূর্ব্বের দিকে। ইঙ্গিতটা এই যে ভ্রমণ করা আর হইবে না, বাড়ীর দিকে রওনা হইতে হইবে। বন্ধুর এ অনুমান সত্য হয় নাই; আমি সত্য সত্যই দার্জ্জিলিঙ্গ মেলে চড়িয়া বসিলাম।

জলপাইগুড়ি পৌঁছিতেই ভোর হইল। সকলকেই দেখিলাম গরম কাপড়-চোপড়ে দেহাচ্ছাদিত করিতেছেন। কিছুমাত্র শীত বোধ না করিলেও আমাকেও দেখাদেখি গরম বস্ত্রাদি পরিধান করিতে হইল। নূতন স্থানে চলিয়াছি, পাঁচজনে যা করে তাই করাই ভাল, কি জানি বিদেশে বিভূঁয়ে কিসে কি হইয়া পড়িবে। একজনে বলিলেন—ঐ পাহাড় দেখা যাইতেছে। দেখিলাম দূরে—বহুদূরে চক্রবালে দিগন্তবিস্তৃত কতকগুলি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জলভরা মেঘ। জিজ্ঞাসা করিলাম—পাহাড় কোথা? ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন—ঐ যে মেঘের মত দেখিতেছেন ঐগুলিই পাহাড়। বিশ্বাস হইল না। আমি পূর্ব্বে কখনও পাহাড় দেখি নাই, নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম।

গাড়ী প্রায় সাতটায় শিলিগুড়িতে পৌঁছিল। এইখান হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ হিমালয়ান রেলওয়ে আরম্ভ। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ ৫১ মাইল। গাড়ী বদল করিয়া narrow gauge এর গাড়ীতে উঠিলাম। খানিক পরে গাড়ী ছাড়িল। ক্রমেই পাহাড়ের শীর্ষ-দেশের গাছপালা অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইলাম। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, গাছপালা ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। মেঘগুলিই যে পাহাড় ইহাতে এখন আর কোন সংশয় রহিল না। পঞ্চানাই ষ্টেশন ও তিস্তানদীর সাঁকো পার হইলাম। সমতল ভূমির উপর মাত্র আর একটী ষ্টেশন। এই ষ্টেশনের নিকট কতকগুলি চা-বাগান। এইবার পাহাড়ে উঠিতে হইবে। দুর্গম পার্ব্বত্য পথে উঠিতে হইবে বলিয়া এঞ্জিনের সঙ্গে মাত্র আট দশ খানি গাড়ী সংযুক্ত। একটা বিরাটকায় সরীসৃপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া রেল গাড়ীখানি ধীরমন্থর গতিতে বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিল। দুইদিকে বহু শিশু, শাল এবং নাম-না-জানা কত কি গাছ চোখে পড়িল। তিনধেরিয়া ষ্টেশনের নিকট হইতেই ঢালু পর্ব্বত-গাত্রে গাড়ীর দুই পার্শ্বে বহু চা-বাগান। আমরা এখন ২,৮২২ ফুট উপরে উঠিয়াছি। বহুদূরের পাহাড়গুলি শ্যামল, শষ্পাচ্ছাদিত মনে হইতেছিল; উহার উপর অসংখ্য চা-বাগান। অপেক্ষাকৃত নিকটে চা গাছগুলি ছোট কপির চারার মত দেখাইতেছিল। একদিকে, যতদূর দৃষ্টি চলে অভ্রভেদী হিমাদ্রি-গাত্রে শুধু গাছপালা আর বনজঙ্গল; আর একদিকে, নিম্নে অতলস্পর্শী গভীর খাত। কোথাও ঘোর নিবিড় অরণ্যানী; কোথাও কঠিন ধূসর, রুক্ষ শিলা। কোথাও নির্ঝরিণীর শুভ্র, স্বচ্ছ, উপল-ব্যথিত বারিরাশি কোন্ অদৃশ্য, অজ্ঞেয় গিরি-গহ্বর হইতে নির্গত হইয়া অতি উচ্চ হইতে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া সহস্রধারায় দুলিয়া

ফুলিয়া, লক্ষ হস্তে করতালি বাজাইয়া, অট্টহাস্তে নৃত্য করিতে করিতে মহাসাগরের সন্ধানে বিপুল উল্লাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। এইরূপ কত ঝরণাই চোখে পড়িল। পাগলাঝোরার তাণ্ডব নৃত্য দেখিলাম।

"যতকাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি।"

এই সঙ্গীত গাহিয়াই যেন সকলে নিরুদ্দেশের যাত্রা করিয়াছে।

আমাদের বহু নিম্নে কোথাও পর্ব্বত-গাত্রে শুভ্র মেঘগুলি সংলগ্ন হইয়া আছে; কোথাও কুয়াসা আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিয়াছে; কোথাও সূর্য্য একবার দেখা দিয়াই আবার মেঘের আড়ালে লুকাইতেছে। আঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, কখনও আগাইয়া, কখনও পিছাইয়া পর্ব্বত-গাত্রের উপর দিয়া ধূম উদগীরণ করিতে করিতে রেল-গাড়ীখানি ছুটিতে লাগিল। যতই উপরে উঠিতেছি, ততই আনন্দে আত্মহারা এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিলাম। দার্জ্জিলিঙ্গ হিমালয়ান রেলওয়েতে চার পাঁচটী "লুপ" আছে। "লুপের" উপর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাড়ীখানি বড় সুন্দর ভাবে উপরে উঠিতে থাকে। দুই দিকে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য অপলক নেত্রে দেখিতে দেখিতে চলিলাম। মাঝে মাঝে গভর্ণমেণ্টের রিসার্ভ করা বন। যদিও অভ্রান্ত জানিতাম গাড়ীখানি পড়িবার কোনই সম্ভাবনা নাই, তবু মনে অকারণ ভয় হইতেছিল কখন বুঝি গাড়ীখানি উল্টাইয়া পড়ে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের, এই সুবিশাল সৌরজগতের সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট কঠিন শিলারাশির দ্বারা এই যোজন-বিস্তৃত, গগনচুম্বী পর্ব্বত নির্ম্মাণ হয়ত কিছুই নয়—কিন্তু মানুষ কি করিয়াছে, বিজ্ঞান কি করিয়া এই দুর্গম, পঙ্কিল পথকে সহজ ও সুগম করিয়াছে, কি করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের উপর লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছে ভাবিয়া একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। প্রথমেই মনে পড়িল ডিনামাইট আবিষ্কর্ত্তা নোবেল সাহেবের কথা।

উত্তর পার্শ্বে, পর্ব্বতগাত্রে লতায় পাতায় ঘেরা পাহাড়-বাসীদের ছোট ছোট কুটীর। লাউ, শশা, ঝিঙ্গা ও কত রকম শাকসজীর গাছ এবং গাঁদা প্রভৃতি ফুলের গাছ গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকিত করিয়া আছে। গৃহপালিত লোমশ গাভী ও ছাগ এবং হাঁস ও মুরগীও চোখে পড়িল। কোথাও ঝরণার জলে পাহাড়িয়া রমণীরা স্নান করিতেছে, কোথাও কাঠের মুগুর দ্বারা পিটিয়া পিটিয়া জামা কাপড় কাচিতেছে; পার্শ্বেই প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতপালিত পার্ব্বত্য বালকবালিকারা উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। ইহাদের এই সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রণালী বড়ই মধুর লাগিল।

হঠাৎ দেখিলাম এক জায়গায় গাড়ী থামিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম একখণ্ড শিলা পর্ব্বত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া লৌহপথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। গাড়ী এইখানে প্রায় আধঘণ্টা বিলম্ব হইল। ক্রমে কার্সিয়ঙ ছাড়াইয়া ঘুমে পৌঁছিলাম, বেশ শীত করিতে লাগিল। ঘুমের উচ্চতা ৭,৪০৭ ফুট, অর্থাৎ সমতল ভূমি হইতে আমরা প্রায় দেড় মাইল উপরে উঠিয়াছি। দার্জ্জিলিঙ্গ ঘুম হইতে প্রায় ৬০০ ফুট নীচে। ঘুম ষ্টেশনে বহু আলুর বস্তা দেখিলাম। এখানে প্রচুর পরিমাণে আলু উৎপন্ন হয়। ঘুমে পৌঁছিতেই প্রায় ছটা বাজিয়া গেল, পরের ষ্টেশনেই দার্জ্জিলিঙ্গ, পৌঁছিতে আর বিলম্ব নাই। উত্তর পার্শ্বের দৃশ্য এতই চিত্তাকর্ষক যে মনে হইতেছিল যতক্ষণ দিনের আলো থাকে গাড়ী চলিলে মন্দ হয় না; ক্ষুধাতৃষ্ণা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। দার্জ্জিলিঙ্গে নামিতেই বহু মেয়ে কুলি আসিয়া বাক্স বিছানা টানাটানি করিতে লাগিল। অতঃপর নির্দ্দেশমত একজনে মোট পিঠে তুলিয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। আমাদের দেশের মত এ দেশের কুলিরা মোট মাথায় করিয়া বহন করে না, মোট পিঠে লইয়া একটী মোটা দড়ির সাহায্যে মাথায় আটকাইয়া দেয়। মাথায় করিয়া ঢালু পাহাড়ের পথে মোট বহন করা অসুবিধা বলিয়াই পৃষ্ঠে করিয়া মোট বহনের ব্যবস্থা। খর্ব্বাকৃতি হইলেও ইহারা বেশ বলিষ্ঠা এবং বড় বড় মোট অনায়াসেই বহন করিতে পারে। একটা বোর্ডিং-এ আপাততঃ উঠিলাম; একটী মাত্র সীট খালি ছিল, ঐটী অধিকার করিলাম। তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, স্নানের জল পাইলাম না, কোন রকমে নাকে মুখে দুটী ঠাণ্ডা ভাত গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িলাম। রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেই মনে হইল, পদ্মার উপর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ

লাইনের ষ্টীমারের কথা। পাউরুটী সেকার উনুনের মত বড় বড় উনুন। নেপালী ঠাকুর ও চাকরগুলির মাথায় টুপি, পরণে কোট ও পায়জামা—ঠিক জাহাজের খালাসীদেরই মত। হাতাবেড়ী লইয়া যেন এঞ্জিনের কয়লা দিয়া জাহাজ চালাইতেছে।

খাওয়ার পর বাহির হইয়া পড়িলাম। যে দুইটী বোর্ডিংএর খবর জানিতাম সন্ধান লইয়া জানিলাম কোনটাতেই সীট খালি নাই। অগত্যা ঐখানেই থাকিতে হইল। পূজার সময় এত লোক সমাগম হয় যে ধর্ম্মশালা বা বোর্ডিংএ স্থান দিয়া কুলাইতে পারে না; অনেকের বেশ অসুবিধায় পড়িতে হয়। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া দেখি—আমাদের ঘরে আরও দুইটী অতিরিক্ত লোকের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঘর একেবারে গুলজার। কলিকাতার একজন এম, বি ডাক্তারের সীট আমারই পার্শ্বেই। তিনি পূর্ব্বের দিন আসিয়াছেন, মাসখানিক থাকিবেন শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ইনি নেপালের মহারাজার Chief Medical Officer ছিলেন। তাঁহার নিকট অনেক পাহাড় পর্ব্বতের গল্প শুনিতাম। যতটা অসুবিধা হইবে ভাবিয়াছিলাম তাহা মোটেই হয় নাই। সকলেই ভাল লোক, দুইদিনেই তাঁহাদের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা জন্মিয়া গেল। এরূপ অবস্থায় বোধ হয় আলাপ পরিচয় ও হৃদ্যতা একটু সহজেই হয়। কেহ হয়ত দুই চারিদিন পরে বিদায় লইয়া যাইতেছেন; তাঁহার বিদায়-ব্যথা হৃদয়ের এক নিভৃত তন্ত্রীকে আঘাত করিত বেশ বুঝিতাম।

এ কোন্ স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া পড়িলাম! আমাদের ভারতে, এই বাংলায় এমন সুন্দর দেশ থাকিতে পারে কোনও দিন কল্পনাও করিতে পারি নাই। এ যেন প্রকাণ্ড একটা চিত্রশালা, যত বড় বড় শিল্পীর চিত্র বহু অর্থব্যয়ে ও বহু চেষ্টায় একত্রিত করা হইয়াছে; যতই দেখা যায় ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। যে দিকেই দৃষ্টি পড়ে শুধু পাহাড় আর পাহাড়; চারিদিকেই পাহাড়ের প্রাচীর। হিমাদ্রি আকাশের গায় সগর্ব্বে তাহার শতসহস্র শৃঙ্গ তুলিয়া একটা বিরাট দৈত্যের মত অনন্তকাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেবল কয়েকটী মাত্র পাহাড়ের উপর ঘরবাড়ী, আর বাকী সবগুলিই তরু-লতা-তৃণ-গুল্মাবৃত গভীর বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। দিগন্তের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গগুলি যেন বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগরোর্ম্মি, কোন অদৃশ্য যাদুমন্ত্রে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথাও পাহাড়গুলি ধূসর, ধূম্র; কোথাও রৌদ্রকরোজ্জ্বল; কোথাও কুয়াসাবৃত। পর্ব্বতগাত্রে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, সানুদেশে ভাসমান শুভ্র, লঘু, খণ্ড মেঘগুলি বড়ই নয়ন-বিমোহন। দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা কতদিন নয়ন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; উহার অমল, ধবল ও নয়নাভিরাম রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতা ২৮,১৫৬ ফুট এবং ইহা দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

পাহাড় কাটিয়া কি সুন্দর বাড়ী, ঘর, রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে! উঁচু, নীচু ঢালু পাহাড়ের গায় লতায় পাতায় ফুল গাছে ঘেরা বাড়ীগুলি যেন সব ছবি! প্রকৃতি মুক্তহস্তে তাহার সৌন্দর্য্যরাশি এখানে বিলাইয়াছেন—কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। সারি সারি পাইন গাছগুলি আকাশের গায় ঋজুভাবে কি সুন্দর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! রাস্তার আশে পাশে পিচ, বার্চ, ওক, ধুবি মস প্রভৃতি কত রকমের গাছ; প্রতি গৃহের চারিদিকে, রাস্তার ধারে ধারে, ড্যালিয়া, কসমস, অর্কিড, ক্রিসেনথামাম, গোলাপ প্রভৃতি কত বিচিত্র বর্ণের ফুল! পথে পথে ছায়া-ঘেরা তরু-বীথি। যেদিকে দৃষ্টি যায়, চক্ষু জুড়ায়। এ যেন বাংলার সুইজারল্যাণ্ড। ইট পাথরের সঙ্গে প্রকৃতির একি অপূর্ব্ব সমাবেশ! লতায় পাতায়, ফলে ফুলে ও কুঞ্জবনে শোভিত এক একটী বাড়ী যেন মুনি ঋষিদের এক একটী আশ্রম-গৃহ—স্নিগ্ধ শান্তির আগার। আলোকমালা শোভিত দার্জ্জিলিঙ্গের দৃশ্য রাত্রিতেও অতীব মনোহর। প্রতি রজনীতেই দীপালির উৎসব।

দিনের অধিকাংশ সময়েই সূর্য্য অদৃশ্য থাকে। কখনও হয়ত সূর্য্য উঠিল, পরক্ষণেই বন্যার জলের মত ছুটিয়া আসিয়া কুয়াসা চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল। সময় সময় কুয়াসা এত নিবিড় হয় যে কয়েক হাত দূরের লোকও দৃষ্টি-গোচর হয়না। সব সময়েই কেমন একটা মেঘলা ভাব, প্রতি নিয়তই ছায়া ও রৌদ্রের, আলো ও আঁধারের

বিচিত্র খেলা চলিতেছে। আমি যতদিন এখানে ছিলাম বৃষ্টি হয় নাই; এই সময়টাই নাকি বৎসরের মধ্যে সব চেয়ে ভাল। দুইদিন আগেই গরমে ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম। আর এখানে আমাদের দেশের পৌষ মাঘ মাসের চেয়েও বেশী শীত। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যেরূপ শীত পড়ে, তাহাতে এখানকার অধিবাসীদেরও কষ্ট হয়। ঘরে ঘরে আগুন জ্বালার বন্দোবস্ত আছে। অনেকেই তখন পাহাড় হইতে নামিয়া সমতল ভূমিতে চলিয়া যান। এখানে যাঁহারা নূতন বেড়াইতে আসেন, তাঁহাদের বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়; একটু বেশী ঠাণ্ডা লাগিলেই নিমোনিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। উদরাময় রোগেও (Hill Diarrhœa) অনেকে আক্রান্ত হন। স্নানের পূর্ব্বে খানিকক্ষণ খালি গায়ে আছি, অনেকেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ঠাণ্ডা লাগাইবেন না, ঠাণ্ডা লাগাইবেন না। ভয়ে ভয়ে গরম জলে স্নান করি, সর্ব্বদাই গরম জামা কাপড় পরিয়া থাকি। রাস্তায় বাহির হইলেই চোখে পড়িবে কুলি মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই গরম বস্ত্রে দেহাচ্ছাদিত করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গেলে এই দৃশ্যই দেখা যাইবে। স্বামী স্ত্রী সন্ধ্যার পূর্ব্বে যতদূর সম্ভব গরম বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, পিছনে পিছনে ভৃত্য আরও কতকগুলি গরম কাপড়-চোপড়ের বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতেছে—এ দৃশ্যও চোখে পড়িল।

এখানকার লোকেরা বেশ কর্ম্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু হয়। শীতপ্রধান দেশের বিশেষত্বই এই। অধিকন্তু পাহাড়ের উপর দিয়া সর্ব্বদা চলাফেরা করাতেও অধিবাসীদের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা অনেকাংশে বাড়িয়া যায়। এখানে নেপালী, ভুটিয়া, তিব্বতী, লেপচা প্রভৃতি নানাপ্রকার পার্ব্বত্যজাতির বাস। ইহারা সাধারণতঃ খর্ব্বাকৃতি; অনেকের নাক চ্যাপটা ও চক্ষু ছোট। আকৃতিতে ছোট হইলেও ইহারা বেশ পরিশ্রম করিতে পারে। স্ত্রী বা পুরুষ কেহই আলস্যে দিন কাটায় না। নয় দশ বৎসরের বালিকা পর্য্যন্ত এক একটী ঘোড়া বা গাধা লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, আরোহী পাইলে পৃষ্ঠে চড়াইয়া সারাদিনে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করে। ছোট ছোট বালকবালিকারা কুলির কার্য্যও করিয়া থাকে। মেয়েদের দোকান পশারও আছে। যান বাহনের মধ্যে মোটর, ঘোড়া ও রিক্স। ইহা ব্যতীত অন্য যান-বাহন পাহাড়ের ঢালু পথে উঠা-নামা করিতে পারে না। একটী রিক্স টানিতে চার পাঁচ জন বলিষ্ঠ লোকের দরকার। দুইজনের সম্মুখে টানিতে হয় এবং দুই তিনজনের পশ্চাৎভাগ হইতে ঠেলিতে হয়। এখানে শ্বেতাঙ্গ মহিলারাও বীরদর্পে বেশ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়।

দার্জ্জিলিঙ্গের বাড়ী ভাড়া অত্যন্ত বেশী। সাধারণ তরিতরকারী, স্কোয়াস, শালগম, বীট, গাজর কপি প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। মাছ অপেক্ষা মাংস সুলভ। বোর্ডিংগুলিতে কলিকাতার প্রায় তিনগুণ খরচ দিয়া থাকিতে হয়। স্থানটী স্বাস্থ্যকর কিন্তু জল একটু বিস্বাদ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক। উদরসম্বন্ধীয় পীড়ার পক্ষে এ স্থান মোটেই ভাল নয়।

একদিন Observatory Hill দেখিতে গেলাম। ইহার উপরে চতুর্দ্দিকে ধ্বজা-পরিবেষ্টিত একটী ভুটিয়া মন্দির, মন্দিরের দ্বারে ধাতুনির্ম্মিত করাল-দশন দুইটী ভয়ঙ্কর জন্তু সংস্থাপিত। মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতার নাম দুর্জ্জয়লিঙ্গ বা মহাকাল। খুব সকালে গিয়াছিলাম, দেখিলাম ঘণ্টা বাজাইয়া পুরোহিত দেবার্চ্চনা করিতেছেন এবং স্থানে স্থানে মধুর স্তোত্রপাঠ হইতেছে। সহরটী এখান হইতে বেশ দেখা যায়। দার্জ্জিলিঙ্গের পূর্ব্বে ভুটান, উত্তরে সিকিম, উত্তর-পূর্ব্বে তিব্বত এবং পশ্চিমে নেপাল অবস্থিত। দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে এই দেশগুলি যে খুব বেশী দূরে নয় নিম্নে প্রদত্ত পর্ব্বত-শৃঙ্গগুলির দূরত্ব দেখিলেই বুঝা যাইবে।

নার্সিঙ (সিকিমে) ৩২ মাইল।
টিউললা (ভুটানে) ৪৫ মাইল।
জানু (নেপালে) ৪৬ মাইল।
টাকেহাম (তিব্বতে) ৪৯ মাইল।

আকাশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত থাকিলে এখান হইতে এই পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি দেখা যায়। পশ্চিম দিকটা পরিষ্কার থাকায় নেপালের শৃঙ্গগুলি এক ভদ্রলোক দেখাইলেন।

শুনিয়াছিলাম Observatory Hill হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা বেশ দেখা যায়। তিন দিন এখানে আসিয়াও কাঞ্চনজঙ্ঘা ভাল দেখিতে পাই নাই, একদিন কয়েকটী শৃঙ্গের সামান্য অংশমাত্র দেখিয়াছি। অথচ কতদিন পথ চলিতে চলিতে অথবা নির্জ্জন পাহাড়ের নিরালা পথ প্রান্তে বসিয়া তুষার-কিরীট কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছি।

Observatory Hill এর উপর একটী গুহার মুখ দেখিলাম। এ সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী আছে। কুচবিহার, কাশী অথবা নেপাল পর্য্যন্ত এই গুহার পথ চলিয়া গিয়াছে, নানালোকে এইরূপ নানা কথা বলিয়া থাকেন। এই পাহাড়স্থিত একটী লোক, সম্ভবতঃ মন্দিরের কোনও পুরোহিত হইবেন, বলিলেন পনর বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঐ গুহায় প্রবেশ করিয়া চলিতে চলিতে তিনটী পথের সন্ধিস্থল পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাকি কয়েকজন ইংরেজ ঐ গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর ফিরেন নাই।

লিবঙ্গে ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বহু নিম্নে অবস্থিত। কার্ট রোড দিয়া গেলে পাঁচ মাইল পথ, ভুটান পল্লী দিয়া গেলে প্রায় অর্দ্ধেক রাস্তা, তবে পথ খুব ঢালু। সে দিন Governor's Cup ছিল। ভুটান পল্লী দেখিতে দেখিতে চলিলাম। পল্লীগুলি অপেক্ষাকৃত নোংরা। পাহাড় কাটিয়া প্রকাণ্ড ঘোড়দৌড়ের মাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখানে একটী মিলিটারী ক্যান্টনমেণ্টও আছে। ছোটলাট বাহাদুরের Cup বিতরণের পর ভুটান পল্লী দিয়াই পদব্রজে ফিরিলাম, উপরে উঠিতে বেশ কষ্ট হইতে লাগিল।

কয়েকজন মিলিয়া একদিন সিঞ্চল হ্রদ দেখিতে গেলাম। এই হ্রদ দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে। মিউনিসিপ্যালিটীর একটী পাশ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম —পাশ ছাড়া এই হ্রদ দেখিতে দেওয়া হয় না। সিঞ্চল পাহাড় হইতে ঝরণা বহিয়া যে জল নামে উহা এই হ্রদে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া সমস্ত সহরে সরবরাহ করা হয়। সিঞ্চল পাহাড়ের উচ্চতা ৮৬০০ ফুট। হ্রদটী কৃত্রিম, তলদেশ ইটদ্বারা বাঁধান। দুই ভাগে বিভক্ত হ্রদটীর একটী অংশ ছোট পুকুরের মত, অপরটী দীঘির ন্যায়। নলদ্বারা ঝরণার জল হ্রদে আসিয়া পড়িতেছে। নলের পার্শ্বে জল পরিমাপক একটী যন্ত্রও সংস্থাপিত রহিয়াছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে সিঞ্চল পাহাড়ের উপর গভীর অরণ্য। নিম্নস্থ হ্রদ হইতে চারিদিকের সুউচ্চ পাষাণ-প্রাচীরের উপর ঘন-বিন্যস্ত বনরাজির দৃশ্য মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার করে। শুনিলাম সময় সময় দিনের বেলাও ভল্লুক বাহির হয়।

ঐ দিনই ঘুমের বৌদ্ধমন্দির দেখিয়া আসি। মন্দিরে যাইবার পথে কিয়দ্দূরে কতকগুলি দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড প্রোথিত। উহার শীর্ষভাগ হইতে প্রায় তলদেশ পর্য্যন্ত পতাকার মত বস্ত্র সংলগ্ন রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মৃতব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য ঐরূপ এক একটী দণ্ড প্রোথিত করা হয়। মন্দিরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বুদ্ধের নয় দশ হাত উচ্চ সোনালি রঙের একটী বড় মূর্ত্তি এবং ছোট ছোট আরও কয়েকটী বুদ্ধমূর্ত্তিও রহিয়াছে। ঐ মন্দির স্থাপনকর্ত্তা কি এক লামার মূর্ত্তিও দেখিলাম। বহুমুণ্ড ও ভুজবিশিষ্ট একটী মূর্ত্তিও রহিয়াছে, শুনিলাম উহা মহাকালের মূর্ত্তি। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে পৌরাণিক অনেক চিত্র খোদিত রহিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপি ঐ মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। শুনিলাম পাণ্ডুলিপিগুলি নেপালী ভাষায় লিখিত।

একটী মাত্র বারোয়ারী পূজা এখানে হয়। কৃষ্ণনগর হইতে দশভুজার মূর্ত্তি গড়াইয়া আনা হইয়াছে—গঠন প্রণালী দেখিয়াই বুঝিলাম। আনন্দময়ীর আগমনে দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট বাংলায় আবার আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বৎসরান্তে মা আসিয়াছেন, তাই বাঙ্গালীর প্রাণ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে মার দর্শন করিতে সমবেত হইয়াছে তাহাদের দুঃখ, দৈন্য, ব্যথা ও অভিযোগ জানাইতে—হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য অর্পণ করিতে। হিমাদ্রি-শৈল-শিখরে-গিরিরাজ-সুতা-দশভুজার অর্চ্চনা দেখিলাম। কাগঝোরা ঝরণার জলে প্রতিমা বিসর্জ্জন হইবে—দেখিতে গেলাম। মাটী দ্বারা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া জল অবরুদ্ধ

করিয়া রাখা হইয়াছে। অতি কষ্টে প্রতিমাটী নীচে নামাইয়া দেড় হাত দু' হাত জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল।

একদিন Birch Hill দেখিতে গেলাম। Mall-এর রাস্তা অতিক্রম করিয়া Government House-এর পাশ দিয়া ঐ পাহাড়ে যাইতে হয়। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম রাস্তা ততই খাড়া এবং দুই পার্শ্বের বনজঙ্গলও নিবিড় বোধ হইতে লাগিল। অনেক স্থান দেখিলাম যেখানে সূর্য্যদেব একেবারেই প্রবেশ করিতে পারেন না। আমরা ছায়াপূর্ণ তরু-বীথির নীচ দিয়া চলিতে লাগিলাম। আঁকা বাঁকা বহু সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া এই পাহাড়ে উঠা যায়। কতকগুলি রাস্তা দেখিলাম বনজঙ্গল কাটিয়া নূতন প্রস্তুত করা হইতেছে। উপরে Birch Hill Park, নানারকম ফুল ফুটিয়া আছে। Parkটীতে দোল খাইবারও ব্যবস্থা আছে। নিম্নে লিবঙের ঘোড়দৌড়ের মাঠ অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল। চারিদিকেই বহু চা-বাগান। এখানে অনেকে বন ভোজন করিতে আসেন—চুল্লীর বন্দোবস্তও আছে। ভিন্ন রাস্তা দিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। Forest আফিসের দুই একজন বড় কর্ম্মচারীর বাসা পথে পড়িল। চা বাগান কোনও দিন দেখি নাই, ইচ্ছা হইল বহু নিম্নস্থ বাগানগুলি দেখিয়া ঐ রাস্তায় বাসায় ফিরিব। ইংরেজদের গোরস্থানের ভিতর দিয়া নীচে নামিতেই এক বৃদ্ধ সাহেবের সহিত দেখা হইল। আমাদের অভিপ্রায় জানাইতে, তিনি উত্তর করিলেন, "You are very bold men, I see." আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "Why do you call us bold? সাহেবটী উত্তর করিলেন, "You want to take this long and tedious road. It is half past eleven now. When do you like to reach home? "আমরা উত্তর করিলাম, "No matter when we reach home. We are strange in this absolutely strange land. The steeper the road, the longer the journey, the more we enjoy. And we have come here for sight-seeing. একটু হাসিয়া সাহেবটী বেশ ধৈর্য্যের সহিত রাস্তাঘাট বুঝাইয়া দিলেন। সুবিখ্যাত Happy Valley Tea Estate এর ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। ঢালু পাহাড়ের গায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চা-গাছগুলি রোপিত হইয়াছে। গাছগুলি দু' আড়াই হাত উঁচু হইবে। সাদা ছোট ছোট চা-এর ফুল অনেক ফুটিয়া রহিয়াছে। নবপল্লবিত পত্রগুলি দ্বারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুলিরা কি ভাবে কাজ করে দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কোথাও কুলি দেখিতে পাইলাম না। কেবল দুই একটী বাগানে দেখিলাম কয়েকজন কুলি জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছে। আমরা অনেকটা নীচে নামিয়া আসিয়াছি, পূর্ব্বেই অনেকটা পাহাড় ভাঙ্গিয়া আসিয়াছিলাম—শ্রান্তি বোধ করিতে লাগিলাম। চা-বাগান হইতে বাহির হইয়া দুই পার্শ্বে স্কোয়াসলতায় বহু ফল ধরিয়াছে দেখিলাম। লাউ, শশা প্রভৃতি গাছও চোখে পড়িল। Botanical Gardenএর ভিতর দিয়া বাসায় ফিরিলাম।

এখানে আসিয়া অবধি পাহাড়ের পশ্চাদ্দেশে কখন সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত হয় টের পাই নাই। Tiger Hill হইতে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য নাকি খুবই সুন্দর। য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে অনেকেই এই দৃশ্য দেখিতে আসেন। Tiger Hill দার্জ্জিলিঙ হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে; কয়েক দিন যাবৎ দেখিতে যাইব ভাবিতেছি, কিন্তু কোনও সুযোগ ঘটিয়া উঠিতেছিল না। একদিন আমরা কয়েকজন মিলিয়া যাইবার আয়োজন করিলাম। পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার বাবু এবং ঢাকা ও কলিকাতা বারের কয়েকজন উকীলও পার্টিতে ছিলেন। একটা বাস ভাড়া করা গেল। যাইবার উৎসাহ ও উত্তেজনায় রাত্রিতে মোটেই ঘুম হইল না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সেখানে পৌঁছিতে হইবে, রাত্রি একটায় রওনা হইলাম। দুই জোড়া মোজা, গোটা চারেক জামা, আণ্ডার-ওয়ার, র‍্যাপার, টুপি, মাফ্‌লার প্রভৃতি পরিধান করিয়া শীতের হাত হইতে পরিত্রাণের যথাসম্ভব উপায় করিলাম। কেহ কেহ পুরা সাহেব সাজিয়াও তার উপর একখানা র‍্যাপার লইলেন; কাহারও দেখিলাম ওভার-

কোটের উপর মোটা একটা র‍্যাগ চড়ান। এ যেন সব ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসী। বাস হইতে জোড়-বাংলায় নামিলাম। এখান হইতে প্রায় সাড়ে তিন মাইল পাহাড়ের পথ হাঁটিয়া ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিলাম। সঙ্গে দুইটা টর্চ্চ-লাইট ছিল। একজন সুগায়ক ছিলেন, গান ধরিলেন। হাস্য কৌতুকে, গল্প গুজবে ক্লেশ বিশেষ বুঝিলাম না। শুক্লপক্ষ হইলেও চন্দ্র তখন অস্তমিত হইয়াছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, নক্ষত্র-খচিত এমন সুনির্ম্মল আকাশ দার্জ্জিলিঙে প্রায়ই দেখা যায় না। পূর্ব্বদিনে সারাদিন রৌদ্র দেখা গিয়াছে বলিয়াই আমরা ঐ সময়ে সূর্য্যোদয় দেখিতে যাইব স্থির করিয়াছিলাম। উভয় পার্শ্বে নিবিড় অরণ্যানীর ভিতর সূচীভেদ্য অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘন-বিন্যস্ত বৃক্ষরাজির শীর্ষভাগ অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছিল। একপার্শ্বে অভ্র-ভেদী পর্ব্বত-গাত্রে ঘুমন্ত গাছের সারি, আর একদিকে অতলস্পর্শী গভীর খাত। রাস্তা অতি সঙ্কীর্ণ, পা পিছলাইলেই Tiger Hillএর সূর্য্যোদয় দেখা এইখানেই শেষ হইবে।

"দুর্গমগিরি···লঙ্ঘিতে হবে, যাত্রীরা হুশিয়ার" বলিয়া যাত্রীদের সাবধান করা হইতেছিল। শুনিলাম ভল্লুক ও চিতাবাঘ এই পথে সময় সময় দেখা যায়—গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। কোথাও নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঝিল্লী ঝি ঝি রব করিতেছে; কোথাও অদৃশ্য ঝরণার কল কল শব্দ। দুই মাইল আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করার পর পথ এত খাড়া যে উপরে উঠা ক্রমেই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল; মনে হইতেছিল একটা পঞ্চাশ তালা বাড়ীর সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতেছি। এইরূপ পথ প্রায় এক মাইল চলার পর আমরা গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। Tiger Hillএর উচ্চতা ৮,৫১৪ ফুট। আলোক-মালা-শোভিত দার্জ্জিলিঙ মনে হইতেছিল আমাদের অতি সন্নিকটে এবং কয়েক মিনিটেই পৌছান যায়।

সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্ত পাহাড়ের উপর ছোট একটী ইষ্টক গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; ছাদের উপর হইতে সূর্য্যোদয় দেখিতে হয়। স্থানটী সঙ্কীর্ণ, বেশী লোক একসঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না এবং সময় সময় ভিড় এবং ঠেলাঠেলিও বেশ হয়। আমরাই সর্ব্বপ্রথমে সেখানে পৌছিয়াছিলাম। পাছে স্থানাভাব হয় এই ভয়ে উন্মুক্ত স্থানে ছাদের উপর ভোরের প্রতীক্ষায় অত রাত্রে বসিয়া রহিলাম। সঙ্গে কিছু পুরাতন খবরের কাগজ নিয়াছিলাম, আগুন জ্বালিয়া হাত পা সেকিলাম। কিছুক্ষণ থাকার পর হাত পা খুব কণ কণ করিতে লাগিল, গা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং শীতে আমাদের এইবার বেশ কষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমেই লোক সমাগম হইতে লাগিল। ভোর হইবার পূর্ব্বেই দেখি "ন স্থানং তিলধারণম্।" দুইজন জাপানী ছিলেন, সাহেব মেমের সংখ্যাও কম নয়। কখন ভোর হয় এই প্রতীক্ষায় সকলেই বসিয়া আছি, মনে কত কি সন্দেহ জাগিতেছে—সূর্য্যোদয় দেখিতে না পাইলে এতটা শ্রম সব পণ্ড হইয়া যাইবে। আরও কিছুক্ষণ কাটিল। কয়েকজন রমণী সুললিত কণ্ঠে সূর্য্যদেবের একটা স্তবগান করিলেন। গানটী খুবই মধুর এবং মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—ঐ এভারেষ্ট দেখা যাইতেছে। সকলেই সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া দেখিলাম হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গ গৌরীশঙ্করের কয়েকটী মাত্র চূড়া দেখা যাইতেছে এবং তাহাও অতি অস্পষ্টভাবে। চূড়াগুলি ঈষৎ লোহিতাভ মনে হইতেছিল। কিছু বেলা হইলে একজন আরমেনিয়ান মহিলার নিকট হইতে একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া গৌরীশঙ্কর দেখিয়াছিলাম। এই সেই গৌরীশৃঙ্গ যাহার অভিযানে কত ইংরেজ, আমেরিকান, ইটালীয় প্রভৃতি নির্ভীক পাশ্চাত্যজাতি দলে দলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ম্যালোরি ও আরভিং ২৭,৫০০ ফুট উচ্চে উঠিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। গৌরীশঙ্করের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট এবং ইহা দার্জ্জিলিঙ হইতে ১০৭ মাইল দূরে অবস্থিত।

আরও কিছুক্ষণ কাটিল; সংশয়াকুল চিত্তে আমরা সকলেই প্রতিমুহূর্ত্ত কাটাইতেছি। ক্রমেই মেঘ ও কুয়াসা চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল—সূর্য্যোদয় দেখিতে পাইব এই আশা একেবারে ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম। মনটা খুবই দমিয়া গেল। হঠাৎ দেখিলাম দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া একটী

সোনার থালার মত, ধীরে ধীরে পাহাড়ের পশ্চাদ্দেশ হইতে সূর্য্যদেব উঠিতেছেন এবং লাল, নীল, হরিৎ, পীত প্রভৃতি কত বিচিত্র বর্ণ পূর্ব্বাকাশে প্রতিমুহূর্ত্তেই ছায়াচিত্রের দৃশ্যের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এ যেন রঙের একটা মেলা বসিয়া গিয়াছে। আকাশের গায়, পাহাড়ের আশে পাশে, আলোয় আলোয় গলাগলি, রঙে রঙে কোলাকুলি—বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া প্রমোদ-মত্ত সুরবালারা যেন নন্দনবনে লুকোচুরি খেলিতেছে। বালারুণের স্নিগ্ধ, কান্ত, চূর্ণ রশ্মিগুলি সুন্দর উজ্জ্বল, প্রশান্ত প্রভাতের নির্ম্মল, মুক্ত, উদার ব্যোমপথে কত বিচিত্র বর্ণে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হইয়া দর্শকের মন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে অভিষিক্ত করিতেছিল। পূর্ব্বাকাশে আঁকিয়া বাঁকিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত কতকগুলি গলিত স্বর্ণের নদী বহিয়া যাইতেছে। চারিদিকে সূর্য্যরশ্মি পড়ায় দিগ্বলয় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য-ধারণ করিয়াছে। একটার পর একটা কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ নয়নপথে পতিত হইতেছিল; ক্রমে যোজন-বিস্তৃত শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা আকাশের একদিক জুড়িয়া দাঁড়াইল। প্রথম প্রভাত-সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে সহসা দেখিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা শৃঙ্গ স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে তারপর আর একটা—তারপর আর একটা—নিমিষেই সবগুলি শৃঙ্গ কনকাঙ্কিত হইয়া গেল। সত্যসত্যই কাঞ্চনজঙ্ঘা সোনার পাহাড়ে পরিণত হইল—কাঞ্চনজঙ্ঘা নামের সার্থকতা বুঝিলাম। মুক্ত, উদার, বিরাট গগনের চন্দ্রাতপতলে হিমগিরির তুঙ্গ শৃঙ্গে, আঁধার ও আলোকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব শোভা মুগ্ধ ও বিহ্বলচিত্তে নয়ন ভরিয়া পান করিলাম। যে দৃশ্য দেখিয়াছি, যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছি, জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না; আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে এ সৌন্দর্য্যের শতাংশও বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। এমন সৌন্দর্য্য কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবারও নয়, স্বচক্ষে দেখিবার জিনিষ—অনুভূতির জিনিষ। এ সৌন্দর্য্য দেখিলে—এই ভীমকান্ত অনির্ব্বচনীয় রূপ প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের কল্পনার ক্ষেত্র সুদূর প্রসারিত হইয়া যায়—অভিভূত মন চিরদিনের অভ্যাস ভুলিয়া গ্রহে গ্রহে, ছায়াপথের বীথিপথে তারায় তারায়, নীহারিকার অস্ফুট অন্ধকারে ধ্যানধনের সন্ধান করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে। বারম্বার মনে পড়ে তাঁহাকে যিনি এই বিরাট বিশ্বশিল্পের রচয়িতা; বিপুল সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে সেই নিখিল শরণের চরণোপান্তে মস্তক স্বতঃই নত হইয়া পড়ে। বুঝিলাম পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কেন লোকে Tiger Hillএর সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য দেখিতে আসেন। সৌন্দর্য্য-পিপাসা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান্ তাহাই মানব মনকে আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। পর্ব্বত-গাত্রে কোথাও বরফের নদীর মত শুভ্রমেঘগুলি ভাসিয়া যাইতেছে, কোথাও কুয়াসা আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিতেছে, পরমুহূর্ত্তেই আবার কোনও পর্ব্বতশৃঙ্গ সূর্য্যকরোদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, কোথাও ধূসর, ধূম্র, পাহাড়গুলি অপূর্ব্ব মহিমায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটার পর একটা চলচ্চিত্রের ন্যায় কত বিচিত্র দৃশ্য নয়নপথে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। মহাযোগীশ্বরের ন্যায় গিরিরাজ মৌনভাবে প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে অচল আসনে বসিয়া কতকাল ধরিয়া এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিতেছেন কে জানে? কিছু বেলা হইলে আমরা দুই ধারের নয়ন-বিমোহন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বাসা অভিমুখে ফিরিলাম। পৌঁছিতে প্রায় দশটা বাজিয়া গেল।

ভিক্টোরিয়া প্রপাত, বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম প্রভৃতি এখানে আরও দর্শনীয় জিনিষ আছে। এখানকার মিউজিয়মটী অতি ছোট। জনাকীর্ণ হাটবাজার, রাস্তাঘাট অপেক্ষা, জলা পাহাড়, কাটাপাহাড় ও কত নাম-না-জানা পাহাড়ের নির্জ্জন পথে পথে, প্রকৃতির ছায়া-সুনিবিড় রম্য কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিয়াই বেশী আনন্দ পাইতাম। এই শৈল-বিহারের স্মৃতি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না—আমার মনের মণিকক্ষে দুর্ল্লভ রত্নের মতই তাহা চিরদিনের জন্য সঞ্চিত থাকিবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রমোদ-কুঞ্জ

শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসু এম-এ

ফুলের বাগান।

প্রত্যেকটি কেয়ারীতে কেয়ারীতে, প্রতিটি গাছের আশে পাশে, ও লঘুছন্দে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়। ফোটা ফুলের অজস্র প্রাচুর্য্য, মিষ্টিগন্ধের একটা আমেজ—। রূপ, রস, গন্ধের এই আমন্ত্রণ নারীর মনে আনন্দের হিল্লোল জাগায়।

দুহাত ভরে ও ফুল তোলে ········।

········ধীরে, ধীরে অতি ধীরে, পাণ্ডুর, বিবর্ণ অথচ সুস্পষ্ট মূর্ত্তি নিয়ে 'কর্ত্তব্য' এসে দাঁড়ায় ওর সামনে·····। নারীর ফুল তোলা হঠাৎ থেমে যায়। কিন্তু হাতের তোলা-ফুলগুলি নিয়ে হেসে ও ফুলের ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

·········আরো বিবর্ণ, আরো পাণ্ডুর মুখ নিয়ে। কর্ত্তব্য আবার আসে, ওর চোখের দিকে তাকায়, কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। শেষ পর্য্যন্ত ওই করুণ শুভ্রতা ওর চোখ এড়ায়না। হাত মেলে সব চাইতে সুন্দর ফুলটি ও পেছনে রেখে যায় নীরবে।

·········আবার আসে। এধারে নারীর বুকে কিসের দোলা লাগে—আর্ত্তনাদ ক'রে উঠে নতশিরে ও বাগানের খোলা দরজার দিকে পা বাড়ায়—কি জানি কেন। ছোট ছোট আলোর টুকরোগুলি ফুলের বুকে নাচে—পেছন ফিরে তাই দেখে, আর এক না-জানা-বেদনায় ওর চোখে অশ্রুর বন্যা নেবে আসে। ধীরে বেরিয়ে চলে যায়—বাগানের দরজাখানি চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে যায়।

·········ফুলগুলি তখনও ওর হাতে—আর তার একটা মিষ্টি গন্ধ—সেই সীমাহারা মরুভূমির সমস্ত কঠোরতার মধ্যে ওর প্রাণে তখনও একটা আব্‌ছা স্পন্দন তোলে।

·········'কর্ত্তব্য' তবুও আসেই—মুখখানা মৃত্যুর মত শুষ্ক, বিবর্ণ, প্রাণহীন। এধারে নারী যেন বোঝে সে কি চায়। ধীরে কোমল আঙুলগুলির বাঁধন শিথিল করে ফুলগুলি এক এক করে ঝরিয়ে দেয় বালির নীরসতার ওপর—। পাঁজরাগুলো টন্ টন্ করে ওঠে—এ ফুলের প্রত্যেকটি যে ওর—।

তারপর শূন্য হাতে চলে সামনে—আঁখির পাতা শুষ্ক, দৃষ্টি জ্বালাময়ী। চোখ দুটো যেন ফেটে পড়ে।

কিন্তু কর্ত্তব্য'ও ছাড়ে না। আবার এসে সামনে দাঁড়ায়। নারী শূন্য হাত দেখায়—আর কি দেবে ও—নাই—ওগো আর কিছুই যে নাই। তবুও—তবুও সে নির্নিমেষ চোখে চেয়েই থাকে অবশেষে·········এবারে নারী ওর হৃদয়খানি খুলে তারই গহন কোণে ছোট্ট একটী কুঁড়ি ও লুকিয়ে রেখেছিল সংগোপনে—তাই উপড়ে নিয়ে তপ্ত বালির বুকে রাখে।

·········লক্ষ্যহারা—পথের বাঁকে ওর করুণ ছায়াখানি মিলিয়ে যায়—আর বালিরাশি তাণ্ডব নৃত্যে মেতে ওঠে।*

* Olive Schrener-এর Gardens of Pleasure-এর অনুবাদ।

জেনারেল ক্ল্যদ্ মার্টিন

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাউণ্ট আশের মত অযোগ্য ব্যক্তিকে নৌবহরের অধ্যক্ষ করিয়া পাঠান ফরাসী সরকারের ঘোর অনুচিত হইয়াছিল। বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবার মত সাহস তাঁহার ছিলনা। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে করমণ্ডল উপকূলে পোককের সহিত কয়েকটা খণ্ডযুদ্ধে তিনি লিপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ২৯শে এপ্রিল



ক্ল্যদ্ মার্টিন

এবং ১লা আগষ্টের জলযুদ্ধই উল্লেখযোগ্য। উহাতে কোন পক্ষ সুস্পষ্ট বিজয়লাভ না করিলেও ফরাসী রণপোতগুলিরই সমধিক ক্ষতি হইয়াছিল। লালীর নিষেধ না মানিয়া আশে জাহাজগুলি মেরামতের জন্য মরিশসদ্বীপে লইয়া চলিয়া গেলে মান্দ্রাজ অবরোধকালে লালীকে কতকটা হীনবল হইতে হইয়াছিল এবং পোকক অবরুদ্ধ ইংরাজসেনার জন্য সাহায্য আনয়নকালে বাধাপ্রাপ্ত হন নাই। পর বৎসর আশে পুনরায় বঙ্গোপসাগরে আসিয়া দেখা দিলেও তাঁহারই অক্ষমতার জন্য মসলিপত্তনের পতন হইয়াছিল। ইহার পর ত্রিণকমলির যুদ্ধে (১০।৯।১৭৫৯) বিপক্ষের নিকট পর্য্যুদস্ত হইয়া তিনি এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তখন ইংরাজরা জলপথে পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিল। পর বৎসর বন্দীবাসের ভীষণ যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হইল, বুসী শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। ইহার পর প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই ইংরাজদের জয় হইতে লাগিল। বিজয়োদ্দীপ্ত ইংরাজসেনা জলে স্থলে পন্দিচেরী অবরোধ করিল। সাগরবক্ষে তাহাদের একাধিপত্য থাকায় ফলে ফরাসীদের স্বদেশ হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ছিলনা। অর্থ ও সামর্থ্যহীন লালী অসন্তুষ্ট সেনাদল লইয়া বিষম বিপদে পড়িলেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও তিনি অসমসাহসে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ইংরাজরা বাহুবলে পন্দিচেরী অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। দীর্ঘ অবরোধের পর খাদ্যাভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ফরাসীসেনা শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল (১৭।১।১৭৬১)। অবরোধকালে অধিবাসীগণ অশ্ব, গর্দ্দভ, কুকুর, বিড়াল যাহা পাইয়াছিল তাহাই উদরসাৎ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিল।* শুনা যায় একটি দেশীয় কুকুর তখন চব্বিশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। ইংরাজরা চন্দননগরের মত পন্দিচেরীর দুর্গপ্রাচীরও সমূলে উৎখাত করিয়া ফেলিলেন। তখন গিঞ্জিছাড়া ফরাসীদের এদেশে আর কোন অধিকৃত স্থান রহিল না। কিন্তু তাহারও শীঘ্রই পতন হইল।

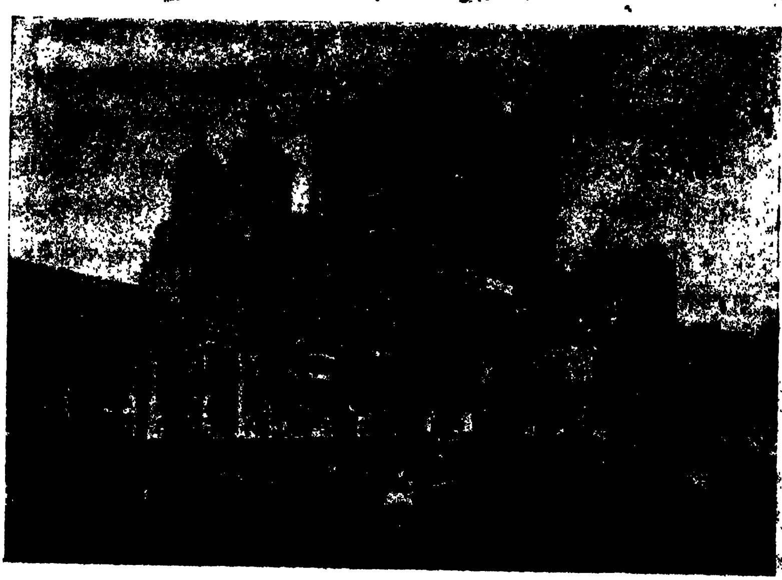
লালীকে ইংলণ্ডে পাঠান হইল। সেখানে তিনি শুনিলেন

যে ফ্রান্সে তাঁহার নামে বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশদ্রোহের অভিযোগ আরোপিত হইতেছে। ইহাতে কাহারও নিষেধ না মানিয়া তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকিবার অঙ্গীকার দিয়া ইংরাজদিগের নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিলেন এবং ফ্রান্সে গিয়া রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। দুই বৎসর পরে তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিচারের নামে প্রহসনের * পর লালীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। ১২ই মে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত আদেশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। লালীর প্রাণদণ্ড এদেশে সুপরিচিত নন্দকুমারের ফাঁসির মত বিচারের নামে নরহত্যা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। তাঁহার অপর সহস্র দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি স্বদেশদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। ভারতবর্ষে পরাজয়ের জন্য তিনি একা দায়ী ছিলেন না। অপর্য্যাপ্ত সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজ অবরোধে প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার ব্যর্থতার প্রধান কারণ; সে কথা ক্লাইভ, ফোর্ড এবং পোকক সকলেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য লালী অপেক্ষা ফরাসী গভর্ণমেন্টের দায়িত্বের পরিমাণ অধিক। পণ্ডিচেরীর গভর্ণর ও কাউন্সিলের তাঁহার সহিত সহযোগিতার অভাব, অধস্তন ব্যক্তিবৃন্দের কর্ত্তব্যচ্যুতি, নৌবহরের অধ্যক্ষের ভীরুতা এ সকলও তাঁহার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। ঘোর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি যেভাবে দীর্ঘকাল যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বীরত্বের ও কৃতিত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কথিত আছে লালী যখন মান্দ্রাজ অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তখন পণ্ডিচেরীর কর্ম্মচারীগণ স্পষ্টই তাঁহার অসাফল্যে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাদল এক বৎসরেরও অধিক কাল বেতন না পাইয়া বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের উদর পূরিয়া আহার জুটিত না, না ছিল তাহাদের পর্য্যাপ্ত গোলাগুলি বারুদের সংস্থান;—তবুও এ অবস্থায় যে যুদ্ধ এত দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল ইংরাজ সেনাপতি কূট বলেন তাহার একমাত্র কারণ লালী। তাঁহার স্বদেশীয়গণের মধ্যে যাহারা তাঁহার উচ্ছেদ কামনা করিত তাহারাই শুধু তাঁহাকে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, অযোগ্য বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষে পরাজয়ের জন্য ফ্রান্সের সকলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে মন্ত্রিসভা সকল অপরাধের বোঝা লালীর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছিলেন এবং দুর্ব্বল পঞ্চদশ লুই অর্দ্ধ-বিদেশী সৈনিককে রক্ষা করিবার চেষ্টা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পারীনগরীর সন্ধির ফলে যুদ্ধের অবসান হইল। ফরাসীরা তাহাদের অধিকৃত রাজ্যসমূহ ফিরিয়া পাইলেও এদেশে তাহাদের সকল শক্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আর তাহাদের মস্তকোত্তোলনের সামর্থ রহিল না। ভারতবর্ষে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অতঃপর ইংরাজদের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না।

এদেশে ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সাধারণতঃ ইতিহাসে উক্ত হইয়া থাকে যে উভয়পক্ষ বাহুবলে সমকক্ষ হইলেও এবং অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য শত্রু-পক্ষে থাকিলেও ক্লাইভ, লরেন্স, ফোর্ড, কূট, প্রমুখ ইংরাজ সেনাপতিগণের শ্রেষ্ঠত্বই তাঁহাদের বিজয়লাভের কারণ। উঁহাদের নৈপুণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই; কিন্তু শুধু একমাত্র ঐ কারণে ফরাসীদের পরাজয় হইয়াছিল একথা কোনমতে বলা চলে না। তদ্ভিন্ন এ কথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে সাহস, বীরত্ব ও সামরিক বিজ্ঞান জ্ঞানে লালী ও বুসী ইঁহাদের সকলকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে ফরাসীরা পরাজিত হইয়াছিল, তাহার কারণ স্বদেশ হইতে আবশ্যকমত সাহায্য ও সহানুভূতির অভাব। ম্যালিসন স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন যে ইংরাজ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দীর্ঘকাল হইতেই যে কোন প্রকারে হউক ভারতবর্ষে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প

* "Nothing whatsoever was proved, except that his conduct did not come up to the very perfection of prudence and wisdom, and that it did display the greatest ardour in the service, the greatest disinterestedness, fidelity and perseverence, with no common share of military talent and of mental resources". Mill's History Bk. IV, Ch. V. p. 265.

উপনীত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাদের কর্মচারীদের রাজ্যবিস্তারের সকল প্রচেষ্টার শুধু সমর্থন নহে, পরন্তু রীতিমত উৎসাহদান করিতেন; এবং আবশ্যকীয় সর্ববিধ সৈন্য ও অর্থসাহায্য জোগাইতে তাঁহারা সদাই তৎপর ছিলেন। দেশের রাজা হইতে জনসাধারণ সকলেরই কোম্পানীর সকল কার্য্যের প্রতি সবিশেষ সহানুভূতি দেখা যাইত। কিন্তু ফরাসীদের অবস্থা ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। ডিরেক্টররা কর্মচারীদের রাজ্যবিস্তারের চেষ্টার সমর্থন করিতেন না। তাঁহারা বারম্বার উহাদিগকে উক্ত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বাণিজ্য ব্যাপারে মনঃসংযোগ করিবার আদেশ দিতেন। ডুপ্লে যাহা কিছু করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে নিজের দায়িত্বে, স্বদেশ হইতে প্রাপ্ত আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াই, সাধন করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের জনসাধারণ কোম্পানীর ব্যাপারে উদাসীন ছিল। ফরাসীরাজের কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতি থাকা দূরের কথা, তিনি স্পষ্টই তাহাদের বিরোধী ছিলেন। বোর্বোঁ নৃপতিগণ ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করিবার তাঁহাদের অবসর কোথায়? ইউরোপীয় রাজনীতির চালবাজির জন্য তাঁহারা কানাডা ও ভারতবর্ষের আধিপত্য শত্রুকরে অবলীলাক্রমে তুলিয়া দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। বোর্বোঁদিগের একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া কোন জিনিস ছিল না। সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টায় ইংলণ্ডের ফ্রান্সই একমাত্র যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। রাইনতীরে সমরে লিপ্ত হইয়া ফ্রান্সের ইংলণ্ডের পাতা ফাঁদে পা দেওয়া উচিত হয় নাই। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স প্রুসিয়ার মিত্ররূপে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে সাইলিসিয়া প্রদেশ অধিকারে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ অবসানে আ-লা-শাপেলের সন্ধিসর্ত্তে ভারতবর্ষে মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ ও কানাডায় ইংরাজ করে কেপব্রেটন সমর্পণ ফরাসীসরকারের সমীচীন হয় নাই। কেপ ব্রেটনের অধিকার পাওয়ার ফলে ফরাসীদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজদিগের পক্ষে সমগ্র কানাডা বিজয় করা সহজসাধ্য হইয়াছিল। বার বৎসর পরে ফ্রান্স আবার প্রুসিয়ারাজের নিকট হইতে সেই সাইলিসিয়া প্রদেশ মারিয়া থেরেসাকে পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। ফলে যুদ্ধকালে প্রুসিয়ার মিত্র ইংলণ্ডের হস্তে ফরাসীরাজ কানাডা ও ভারতবর্ষ উভয়ই হারাইলেন। কিন্তু যখন সন্ধি স্থাপিত হইল তখন পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ইংরাজদিগের মত ফরাসীদিগের কানাডা ও ভারতবর্ষে নিজেদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইবার কোনই আগ্রহ পরিলক্ষিত হইল না। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আবার অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেবারও দীর্ঘ যুদ্ধের পর (১৭৭৮-৮৩) দক্ষিণভারতে মহিশুররাজ হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের এবং ফরাসীদের সম্মিলিত সেনাদল



লা মার্টিনিয়ার—লক্ষ্ণৌ

ইংরাজদিগকে পর্য্যুদস্তপ্রায় করিয়া তুলিলেও ঠিক সাফল্যের মুহূর্ত্তে ফরাসীরাজ ভার্সাঈয়ের সন্ধির ফলে পরিশ্রমলব্ধ সকল সুবিধা হেলায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলতঃ দূষিত বোর্বোঁসরকারের ইতিহাস মধ্যে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রকৃত কারণ পাওয়া যাইবে।

দুপ্লে যে কি অসাধারণ প্রতিভাশালী মনীষী ছিলেন তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা তিনি শুধু স্বীয় অনন্যসাধারণ শক্তি ভরে করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুপ্লে-ফতেহাবাদ জয়স্তম্ভের প্রত্যেকটী উপলখণ্ড তাঁহার স্বহস্ত আহৃত ও সযত্নবিন্যস্ত। উহার পরিকল্পনায় বা নির্ম্মাণে অপর কাহারও অংশ ছিল না। ফরাসীদের দুর্ভাগ্য, তাহারা দুপ্লের মর্য্যাদা বোঝে নাই। দুপ্লে, লালী ও লাবোর্দোনের সহিত ফরাসীদের ব্যবহার এবং ক্লাইভ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস এবং ওয়েলেসলির সহিত ইংরাজদিগের ব্যবহার হইতে উভয়জাতির পার্থক্য এবং ব্যর্থতা ও সাফল্যের কারণ প্রতীয়মান হইবে।

ভারতবর্ষে আগমন হইতে পন্দিচেরীর পতন পর্য্যন্ত দশ বৎসরব্যাপী কালের মধ্যে সংঘটিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কর্ণাটক সমরের অনেক যুদ্ধে মার্টিন প্রথমে সাধারণ সৈনিক এবং পরে নন-কমিশণ্ড অফিসররূপে উপস্থিত ছিলেন। তখনকার দিনে সরকারী কাগজপত্রে অধস্তন সৈনিকদের কার্য্যের বিবরণ যথাসম্ভব ভাবে রক্ষিত হইবার প্রথা ছিল না। এজন্য মার্টিনের জীবনের এই সময়ের সকল কথা জানা নাই। নানা বিভিন্ন সূত্র হইতে সামান্য যেটুকু জানা যায় তাহা বলা যাইতেছে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গভর্ণরের দেহরক্ষীদলে একজন সওয়ার ছিলেন। পরে তিনি Cavalry d'Aumont নামক রেজিমেন্টে প্রবেশ করেন এবং উহাদের সহিত পোর্টো নোভো নামক স্থানে দুর্গরক্ষায় প্রেরিত হন। ১৭৫৮ সালে তিনি বিখ্যাত "লোরেন রেজিমেন্টে" প্রবেশ করেন। লালীর কুদ্দালুর ও ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড অধিকারে, তাঞ্জোর অভিযানে এবং অন্যান্য বহু খণ্ডযুদ্ধে তিনি সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কর্ণেল ফোর্ড মসলিপত্তন অবরোধে প্রবৃত্ত হইলে বিপন্ন ফরাসীসেনার সাহায্যে পন্দিচেরী হইতে এক অভিযান পাঠান হইয়াছিল। এক পল্টন অশ্বারোহীসৈন্যের সার্জ্জেণ্ট-মেজররূপে মার্টিনও এই দলে ছিলেন। এই অভিযানের বিবরণ মার্টিনের সহকর্ম্মী মাদেক প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর উভয় সুহৃদশত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ পন্দিচেরীতে গোপনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পন্দিচেরীর পতনের পর অপরাপর বহু ফরাসীসৈনিকের মত মার্টিন ও মাদেকের জীবনের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইল।

মার্টিন ঠিক কোন সময়ে ইংরাজের কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কীণ পন্দিচেরীর পতনের পূর্ব্বেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহার কালনির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তখনকার দিনের প্রথামত মার্টিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মেয়াদের সময় অতিক্রান্ত হইলে তিনি উচ্চবংশসম্ভূত নহেন বলিয়া ফরাসী সেনাদলে আশানুরূপ পদোন্নতিলাভ সম্ভব নহে দেখিয়া আর নূতন করিয়া সর্ত্তবদ্ধ না হইয়া ইংরাজদের কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে লজ্জা বা অসম্মানজনক কিছু ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে স্বজাতিদ্রোহী বা নিয়োগত্যাগী পলাতক সৈনিক (deserter) বলা অনুচিত। এখানে বলা প্রয়োজন যে এ মতের পোষক কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। স্বদেশের সেনাবিভাগে পদোন্নতিলাভ কঠিন হইলে ইংরাজ সেনাবিভাগে বিদেশীর পক্ষে তাহা যে আরও সুকঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। তখনকার দিনে বৃটিশ সেনাদলে বিদেশীর অভাব না থাকিলেও কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল যে তাহাদের মেজর অপেক্ষা উচ্চতর পদ কোনমতে দেওয়া হইবে না। অধিকাংশ লেখকের মতে পন্দিচেরী অবরোধকালে লালীর যে বডিগার্ডদল বিদ্রোহ করিয়া শত্রুশিবিরে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল ক্ল্যদ মার্টিনও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু এ কথাও সত্য নহে বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে।

লালীর কঠোর শাসনে উত্যক্ত হইয়া সামরিক বা বে-সামরিক অনেক ব্যক্তিই শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়া স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে কুণ্ঠিত হয় নাই।

পন্ডিচেরী অবরোধকালে মার্টিন নামক দুই ব্যক্তি কর্ণেল আয়ার কুটের নিকট আশ্রয় লইয়াছিল। উহাদের সম্বন্ধে তিনি ১৪ই মে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গভর্ণরকে লিখিয়াছিলেন,—"আমার নিকট মার্টিন নামক দুইজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। মিঃ লালী ইঁহাদের সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। * এই দুই ব্যক্তিকে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া আমার মনে হয়। উঁহারা ইহার মধ্যেই আমার যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন এবং যে কোন বিপজ্জনক কার্য্যে যাইতে প্রস্তুত আছেন। ফরাসী পলাতকসৈন্য লইয়া গঠিত দলটীর নেতৃত্বে আমি ইহাদের একজনকে আমাদের সেনাবিভাগে কোন কমিসন বা পদ না দিয়া শুধু লেফটেনান্টের এবং অপর ব্যক্তিকে এনসাইনের বেতন দিয়া নিযুক্ত করিব স্থির করিয়াছি। আশা করি ইহাতে আপনার কোন আপত্তি হইবে না। আমার মতে এই ধরণের লোকদিগকে কার্য্যে লাগাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।" ঐ দলে প্রায় ৬০ জন ফরাসী সৈন্য ছিল। পার্ম্মা কোয়েল, বিল্লপুরম্, থিয়াগার এবং গিঞ্জির যুদ্ধে উহারা স্বজাতির বিরুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। স্বজাতিদ্রোহী ঐ দুই মার্টিনের পূর্ণ নাম এবং পরবর্ত্তী ইতিহাস অজ্ঞাত। পন্ডিচেরীর অবরোধকালে লালীর বডিগার্ডদল বিদ্রোহ করিয়া শত্রুশিবিরে পলায়ন করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যেও মার্টিন নামক একাধিক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ক্লদ মার্টিন বিখ্যাত "লোরেন রেজিমেন্টে"র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উহারা কখনও কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয় নাই; খাদ্যাভাবে শেষ মুহূর্ত্তে বাধ্য হইয়া শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। উত্তরকালে ক্লদমার্টিন প্রসিদ্ধি লাভ করায় এবং তাঁহার প্রথম জীবনের ইতিহাস সবিশেষ জানা না থাকায় অনেকেই তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মার্টিনের অন্যতম বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপে অন্যের কাহিনী তাঁহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া ক্লদের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। আধুনিককালে ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস জানা গিয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে।

ইংরাজরা তাঁহাদের সমস্ত বন্দীগণকে মান্দ্রাজে আনিলেন। তাঁহাদের নিকট তখন প্রায় দুই সহস্র ফরাসী বন্দী ছিল। উহাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশত ব্যক্তি স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য করা হইবে না ইংরাজ কর্তৃপক্ষের নিকট এ প্রকার অঙ্গীকার পাইয়া কারাগারে কষ্টভোগ করা অপেক্ষা তাঁহাদের কর্ম্ম গ্রহণ শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিল। উহাদের তিনটী দলে ভাগ করা হইল। প্রথম যে দলটী গঠিত হইয়াছিল তাহা পলাতকগণের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল; ইহাতে ১০৯ জন সৈন্য ছিল। ইহাদের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করিবার মত কোন ইংরাজ অফিসার পাওয়া সম্ভব না হওয়ায় বন্দীদের মধ্য হইতে, সম্ভবতঃ উপরিওয়ালাদের সুপারিশে, একজন তরুণবয়স্ক, কর্ম্মঠ, নন-কমিশণ্ড সৈনিকপুরুষকে সাময়িক ভাবে লেফটেনান্ট পদের বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হইল। ইনিই ক্লদ মার্টিন। বিজেতৃপক্ষের উর্দ্দি পরিয়াই যে ফরাসীরা বন্দীদশা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল তাহা নহে; কারণ সমরনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত উহারা যুদ্ধবন্দী ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ইংরাজ গভর্ণমেন্ট যে কোন মুহূর্ত্তে দল ভাঙ্গিয়া দিয়া উহাদের কারাগারে পুনর্নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। প্রধানতঃ বঙ্গদেশে দেশীয়গণের বিরুদ্ধে তাহাদের নিযুক্ত করা হইবে এই আশ্বাস পাইয়া উহারা কারাগারের

---

* তখনকার দিনে এ ধরণের ব্যাপার খুব সাধারণ ছিল। ঊর্দ্ধতন ব্যক্তির নিকট নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া সে যুগে অনেকেই শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সঙ্কোচ বোধ করিত না। নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা অধিকারকালে ইংরাজ সেনাদলে লেফ্টনাণ্ট লেবোম নামক জনৈক ফরাসী সৈনিকের নাম দেখা যায়। কলিকাতার পতনের পর ম্যানিংহাম ও উহার মারফৎ সে সংবাদ ফলতা হইতে মান্দ্রাজ পাঠান হইয়াছিল। শুনা যায় ঐ ব্যক্তি আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় চন্দননগর ছাড়িয়া ইংরাজের কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল। পর বৎসর টেরেনু নামক ঐরূপ একটী আত্মমর্য্যাদাশীল সৈনিক গুপ্ত-পথের সন্ধান দেওয়াতেই ক্লাইভ ও ওয়াটসনের পক্ষে চন্দননগর অধিকার করা সম্ভব হইয়াছিল। মার্টিন ও মাদেক যখন মসলিপত্তন উদ্ধারে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের দলে ৮০ জন ইংরাজ সৈনিক ছিল শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া উহারা তাহাদের কারাগার অপেক্ষা সেনাদল গ্রহণ করিয়াছিল।

কঠোরতা অপেক্ষা ইংরাজদের কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়াছিল এই মাত্র। কূট সাহেবের গঠিত দলের মত এই ফরাসী কোম্পানীকে স্বজাতিদ্রোহী আখ্যায় অভিহিত করা যায় না।

"ফতে সালাম" নামক জাহাজ যোগে অন্যান্য রেজিমেণ্টের সহিত মার্টিনের কোম্পানীও মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে উক্ত পোত জলমগ্ন হওয়ায় আরোহীগণের মধ্যে অনেকে সলিলসমাধি লাভ করিয়াছিল। মার্টিনের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অনেকে নৌকাযোগে কূলে অবতরণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাতে প্রীত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আর একদল সৈন্য আনিবার জন্য পুনরায় মান্দ্রাজ পাঠাইলেন। এই দ্বিতীয় কোম্পানীতে ১০৫ জন সৈন্য ছিল, ইহারা সকলেই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিল। মাদেক এই দলে সার্জ্জেণ্ট ছিলেন। পরবৎসর অর্থাৎ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইহারা "নরফোক" জাহাজে কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইল। ইংরাজরা যখন তাঁহাদের বন্দীদিগকে এইভাবে কার্য্যে লাগাইতেছিলেন তখন ফরাসী এডমিরাল পালিয়ের-ও তাঁহার হস্তে পতিত ইংরাজ নৌসেনা ও মাল্লাদিগকে লইয়া বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। অপরিসর জাহাজ মধ্যে আহত ও পীড়িতদের যথোচিত পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। অনর্থক লোকক্ষয় নিবারণার্থ তিনি উহাদের সকলকে ছাড়িয়া দিলেন এবং সমসংখ্যক ফরাসীবন্দীকে মুক্তি দিয়া মরিশসদ্বীপে পাঠাইয়া দিবার জন্য ইংরাজদিগকে বলিলেন। তদনুসারে তাঁহারা একদল ব্যক্তিকে "Ganges" নামক জাহাজে করিয়া রওনা করিয়া দিলেন। জাহাজটী নিতান্ত জরাজীর্ণ এবং সাগর যাত্রার একান্ত অনুপযুক্ত ছিল। উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল দীর্ঘপথ উহাতে পাড়ি দিতে ফরাসীরা ভরসা না করিয়া সাগরদ্বীপ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল; ক্লদ মার্টিনও এই দলে ছিলেন (এপ্রিল ১৭৬৩)। ফেব্রুয়ারী মাসে ইউরোপে সন্ধিস্থাপিত হইয়াছিল। সে সংবাদ আগষ্টমাসে এদেশে আসিয়া পৌঁছিল। তখন ফরাসী সৈনিকগণ সকলেই বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিল।

যে সকল ফরাসী সৈনিক ইংরাজদের কর্ম্ম লইয়াছিল তাহারা এবার ইচ্ছা করিলে অবসর লইতে পারিত। কিন্তু ঠিক এই সময় (সেপ্টেম্বর ১৭৬৩) মীরকাশিমের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাহারা নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে থাকাই পছন্দ করিল। ভারতবর্ষে ফরাসী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে, আর ইংরাজদের বাধাদানের চেষ্টা নিষ্ফল, ভবিষ্যতে এদেশের আধিপত্য তাঁহাদের অদৃষ্টেই ঘটিবে একথা তখনকার দিনে অন্যান্য অনেকের মত মার্টিনও বুঝিয়াছিলেন। ফরাসী সেনাদলে থাকিয়া এদেশে আর কৃতিত্ব দেখাইবার সম্ভাবনা নাই, স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াও কোন লাভ নাই দেখিয়া মার্টিন বুঝিলেন যে ঘটনাচক্র তাঁহাকে যে অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে চিরকালের মত তাহাতে থাকাই এক্ষণে তাঁহার পক্ষে সমীচীন। ইহার মধ্যে লজ্জাস্কর বা অপমানজনক কিছু নাই অথবা একার্য্যে স্বদেশ বা স্বজাতিদ্রোহিতাও করা হইতেছে না। কারণ ভবিষ্যতে পুনরায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ বাধিলে তাঁহাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বাধ্য করা হইবে না এ আশ্বাস ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দিতেছেন। মার্টিনের অবশিষ্ট জীবন অতঃপর ইংরাজের কর্ম্মে অতিবাহিত হয়। কিন্তু তিনি মনে প্রাণে বরাবরই ফরাসী ছিলেন, কখনও জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া ইংরাজের প্রজা (naturalised) হন নাই। কর্ত্তৃপক্ষের শত অনুরোধ উপরোধও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ইংরাজনাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহার পক্ষে আরও পদোন্নতি অথবা নাইট উপাধিলাভ হয়ত অসম্ভব হইত না। ফ্রান্সকে তিনি বরাবরই স্বদেশ বিবেচনা করিতেন এবং পরিণত বয়সে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম সুখ-উপভোগের কথা প্রায়ই বলিতেন, যদিও শেষ পর্য্যন্ত অদৃষ্টচক্রে কল্পনা আর কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে নাই। তাঁহার উইলে ফ্রান্সে অবস্থিত ধনসম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে দেখা যায়। তিনি যে Deserter ছিলেন না ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কারণ সেরূপ অবস্থায় তিনি ফরাসী নাগরিকের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতেন এবং তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত।

মীরকাসিমের সহিত যুদ্ধকালে ফরাসী সৈন্যগণও রণস্থলে প্রেরিত হইয়াছিল। যুদ্ধের বিবরণ সমরু, জাঁন্তিল ও মাদক প্রসঙ্গে বলা যাইবে। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী মার্টিনকে সেনাবিভাগে 'এনসাইন' পদ দিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি লেফটেনাণ্ট পদের বেতন পাইলেও কোন স্থায়ী পদ তাঁহাকে প্রদত্ত হয় নাই। পলাতক মীরকাসিমের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াই ইংরাজবাহিনী কর্ম্মনাশাতীরে আসিয়া উপনীত হইল। জামাতাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলে মীরজাফর সৈন্যদের প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু যথাকালে সে অর্থ প্রদত্ত না হওয়াতে তাহাদের অসন্তোষের সীমা ছিল না। একদিন সমস্ত শ্বেতকায় সৈন্যগণ একযোগে বিদ্রোহ করিয়া শিবির পরিত্যাগ করিল। সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে তাহারা স্পষ্টভাবেই জানাইল যে গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভঙ্গ দেখিয়া তাহারা একার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যতদিন না এ অবিচারের প্রতিকার হইবে ততদিন তাহারা কোন কার্য্য করিবে না। তাহারা অতঃপর প্রতিশ্রুত অর্থ আদায়ের জন্য পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে একথাও তাঁহাকে বলিল। কাপ্তেন জেনিংস বিপদে পড়িলেন। অবাধ্য সৈন্যদের প্রতি বলপ্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। কাহাকে দিয়াই বা করিবেন? তিনি উহাদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে অফিসরগণকে আদেশ দিলেন। কিন্তু মার্টিন, এনসাইন ডেভি ও সার্জ্জেণ্ট এলেন এই তিনজন ভিন্ন অপর কাহারও উত্তেজিত সৈনিকগণের সম্মুখীন হইতে সাহস হইল না। একজন ফরাসীসৈনিক মার্টিনকে নিভৃতে জানাইল টাকার কথাটা ছলমাত্র, সুজাউদ্দৌলার নিকট যাওয়াই তাহাদের আসল অভিপ্রায়; পরে হিন্দুস্থানের অভ্যন্তর প্রদেশে নিজেদের জন্য একটী রাজ্যস্থাপন করা তাহাদের উদ্দেশ্য। মার্টিন যদি তাহাদের সহগামী হন তবে তাহারা তাঁহাকে অধিনায়কত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত আছে সে কথাও ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে জানাইল। তাহার কথায় মার্টিন স্তম্ভিত হইলেন। একবার ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকারের পর নিজ প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিবার পাত্র তিনি ছিলেন না। সৈনিকের কথায় কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়া তিনি ধীরে ধীরে পিছাইয়া পড়িলেন এবং সবেগে অশ্বধাবন করিয়া একেবারে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফরাসীদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মহাভয়ে ভীত ইংরাজসৈন্যগণ আর অবাধ্যতাচরণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ শিবিরে ফিরিল, জর্ম্মণরাও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। ফিরিল না শুধু দেড়শতজন ফরাসীসৈনিক, মাদেক ও দেলামারের নেতৃত্বে উহারা অযোধ্যা নবাব সকাশে গমন করিয়া তাঁহার কর্ম্মে প্রবেশ করিল।* বিদ্রোহ দমন কার্য্যে মার্টিনের চেষ্টায় পুরস্কার স্বরূপ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত করিয়াছিলেন (১৮।৪।১৭৬৪)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅতুলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* ক্রম প্রমুখ ইংরাজ লেখকগণ সকলে সার্জ্জেণ্ট দেলামারকে পলাতক ফরাসী সৈন্যগণের নেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন জন্য মেজর এডামস তাহাকে একটি কমিশন দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহান্তের পর কর্ত্তৃপক্ষ সে কথা মনে না রাখায় ইংরাজদিগের প্রতি তাহার বিরাগ হওয়া স্বাভাবিক। দেলামারের আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। মাদেকের চরিতাখ্যায়ক এমিল বার্ব্বে তাহাকে ফরাসীদের অধিনায়ক বলিয়া লিখিয়াছেন। বিদ্রোহ ব্যাপারে ইঁহারা উভয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন মনে করায় কোন বাধা নাই। অতঃপর দলে যে কয়জন সামান্যসংখ্যক ফরাসীসৈনিক অবশিষ্ট রহিল তাহাদের লইয়া মার্টিন কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনে আদিষ্ট হইলেন। পরে আবার বহুব্যক্তি যোগ দেওয়ার ফলে কালক্রমে ইংরাজদের ভৃতিভুক ফরাসীসৈনিকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কাশীরাজ চেতসিংহের সহিত যুদ্ধকালে রামনগর আক্রমণে ফরাসী কোম্পানী বিধ্বস্ত হইয়া যায়। শতাধিক ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ১৪ জন কোনমতে রক্ষা পাইয়া চুণারে হেষ্টিংসের নিকট পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সন্ধ্যা

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা সেন

বড় বাড়ীর ছোট বৌ সে—রং যাই হোক, সুশ্রী গড়ন, তার লক্ষ্মী শ্রীর প্রশংসা একদিন সকলের মুখেই ছিল, আজ কিন্তু তার শ্রীর কথা কেউ বলে না—তার গড়নে আজ অনেক খুঁৎ ধরা পড়ে, আগেই অনেক বুঝেছিল ইত্যাদি।

সন্ধ্যা বিধবা—কোলে ছেলেপুলেও কিছু নেই, খালি হাত পা। নিয়মিত বরাদ্দ রান্না বান্না তো করেই, আরো কত কাজ করে, উদয়াস্ত হাত পা তার কাজ হতে একটু রেহাই পায় না। মুখকে তাই সে রেহাই দিয়েছে—কথা খুব কম বলে। একটু মিষ্টি হাসি—তা সেটুকু সব সময়েই লেগে আছে—শোকও তাকে মলিন করে নাই। ছেলের আবদার। বুড়োর ফাইফরমাস্, সবই সে অম্লানবদনে হাসিমুখে পালন করে।

শ্রাবণ মাস, সারাদিন টিপ টিপ কোরে বৃষ্টি পোড়্‌ছে, কাল থেকে একবারও রোদের মুখ দেখা যায়নি; ছেলে-পুলের কাঁথা কাপড় শুকোয়নি; বড় বৌয়ের মেজাজ খারাপ হোয়ে আছে। মেজ জাও বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে চিত্রায় ছবি দেখতে যাবেন, সব ঠিক ঠাক। এখন বৃষ্টিটা একটু না ধরলে কি করে চলে, তাঁরও মনটা ভাল লাগছে না। শাশুড়ীর মত হবে না, নতুবা এ আর এমন কি বৃষ্টি, এর চাইতে কত জল-ঝড়ে মানুষে বাইরে যায়, ইত্যাদি নানা রকম কথা অস্পষ্টভাবে বলেই চলেছেন। সন্ধ্যার বাদলা দিন বড় ভাল লাগে—দুপুরের কাজকর্ম্ম সেরে ঘরে যেতে অন্যদিন তার দুপুর পেরিয়ে যায়—আজ বৃষ্টির জন্য একটু আগেই সে ছুটি পেয়েছিল। বিছানায় অলসভাবে শুয়ে শুয়ে রবিবাবুর বর্ষার কয়েকটা কবিতা প'ড়বে ব'লে কাব্য-গ্রন্থখানি বাক্স থেকে বার ক'রে নিল। বই হাতে জানালার ধারটিতে এসে শুয়ে প'ড়ল। এ বইখানা তার স্বামী তাকে উপহার দিয়েছিলেন, স্বামীর দেওয়া অল্প কয়েকটা উপহারের মধ্যে এই বইখানি একটা—কত যত্নেই না সে আজ এগুলিকে নাড়ে চাড়ে। বিয়ের পর কটা দিনই বা রমেন বেঁচেছিল—অন্তরের স্মৃতি-কোটা যেমন সেই কটি দিনকে সে কৃপণের ধনের মত সঞ্চয় ক'রে রেখেছে—রমেনের দেওয়া জিনিষ-গুলিকেও সে তেমনি যত্নে আগ্‌লে রেখেছে। প্রত্যেকটা জিনিষের সঙ্গে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে—বই হাতে নিয়ে মন তার চ'লে যায় কোন্ অতীতে—কত কল্পনা, কত স্বপ্নের জালই না তারা সেদিন বুনেছিল। একের হৃদয়ে অন্যের প্রবেশ, আনন্দের জোয়ার তাদের দুকূল সেদিন ছাপিয়ে উঠেছিল, বিপুল সম্ভাবনায় তাদের কিশোর মন সংসারে স্বর্গ রচনা ক'রেছিল—আর আজ?

সন্ধ্যার মনে পড়ে বিয়ের পর এমনি এক বাদল দিনে রমেন চুপি চুপি ঘরে ঢুকে সন্ধ্যার খোঁপাটা খুলে দিয়ে ঠাট্টা ক'রে ব'লেছিল—"বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময়ী বেণী।—খুলে দাও, আজকে আর খোঁপা বাঁধে না।" কৌতুকে আনন্দে সন্ধ্যার মুখ খানি রাঙা হয়ে উঠেছিল, কি বল্‌বে ভেবে না পেয়ে সে শুধু ব'লেছিল—"কি কর, কেউ এসে পড়ে যদি—"

রমেন, দুষ্টু রমেন, কোন কথা শোনে নাই। দুরন্ত শিশুর মত জোর কোরে তাকে ছাদে নিয়ে যায়, তারপর চঞ্চল সেই বয়স্ক শিশু দুটীর বৃষ্টিতে সে কি ভেজা, দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে ছুটোছুটি—আর জল-ঝড়ের দাপটে লুটোপুটি খেয়ে দুজনে আত্মহারা। হঠাৎ নীচে মায়ের গলার সাড়া পাওয়া যায়,—সন্ধ্যা দ্রুত নেমে আসে, রমেনও সঙ্গে সঙ্গে। সিঁড়ির গোড়ায় মা দাঁড়িয়ে, তাঁর মুখে মৃদু তিরস্কার, বধূ লজ্জায় ঘরে যেতে পথ পায় না। ধরা পড়ে যাওয়ায় সন্ধ্যার সেদিন কি লজ্জা আর সঙ্কোচ, জায়েদের কাছে যেতেও ভয়। রমেন কিন্তু পরোয়া করে না, বরং সন্ধ্যার ভয় দেখে

খুব হাসে। সন্ধ্যা রান্না ঘরে যেতে যেতে শোনে, তাদের এই পাগলামির কথাই হোচ্ছে—সব শোনা যায় না, তবু বোঝে, ছোট দেওর-জায়ের এই ছেলেমানুষি বড় জায়ের বেশ মিষ্টি লাগে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাহস ক'রে ঘরে ঢোকে। আজও ভাবতে ভাবতে নিঃশ্বাস পড়ে—তার হতাশ সুরে সন্ধ্যার মনে চমক লাগে। কত প্রভেদ আজ। সেই রমেন যে শুধু দ্বিরাগমনের সময় ছাড়া আর একটী দিনও সন্ধ্যাকে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকতে দেয় নাই, কেউ নিতে এলেই মুখ ভার ক'রে, অসুখের ভাণ ক'রে অনর্থ বাধাত,—সে আজ নিজেই এতদূরে কোথায় গিয়ে রইলো? গোণা গুণ্‌তি কটি দিনের মধ্যেই তাদের আনন্দের অবসান হবে, জেনেই বুঝি সে কয়টি দিন সন্ধ্যাকে চোখের আড়াল ক'রতেও চাইত না।

তারপর সন্ধ্যার জীবনে চিরসন্ধ্যা নেমে এল, মৃত্যুর আঁধারে রমেন কোথায় মিলিয়ে গেল—এতটুকু আলোর রেখাও যে এ জীবনে আর দেখা যায় না। ভাবতে ভাবতে মন উদাস হ'য়ে যায়, একের পর এক আর সেই কটি পুরাণো দিনের অতি প্রিয় স্মৃতিগুলি মনের সামনে ভিড় করে আসে, ও ভাবে রমেনের দেওয়া এই বুঝি তার মণিমালা। তাদের ও সম্মানিত অতিথির মত যত্ন ক'রে কাছে বসায়, কাঁদে হাসে, আবার পরম যত্নে সরিয়ে রাখে। জানালার বাইরে আকাশের দিকে ওর চোখ পড়ে—টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি এখনও প'ড়ছে—পূবের দিকে এখনও ঘোর কালো মেঘ, এ বৃষ্টি শীগ্‌গির থামার মত নয়—অলস উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে ওর মনে হয় রমেনের কথা—এমনি এক দুপুরে রমেন ওকে বর্ষামঙ্গল পড়িয়ে শুনিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে গুন্‌ গুন্‌ ক'রে কটা গানও শুনিয়েছিল, কি মিষ্টি অথচ গম্ভীর ওর গলাটা ছিল। আপন মনে সন্ধ্যাও গুন্‌ গুন্‌ স্বরে দু-ছত্র গেয়ে চলে,—"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর—" চোখে ওর জলের ধারা।

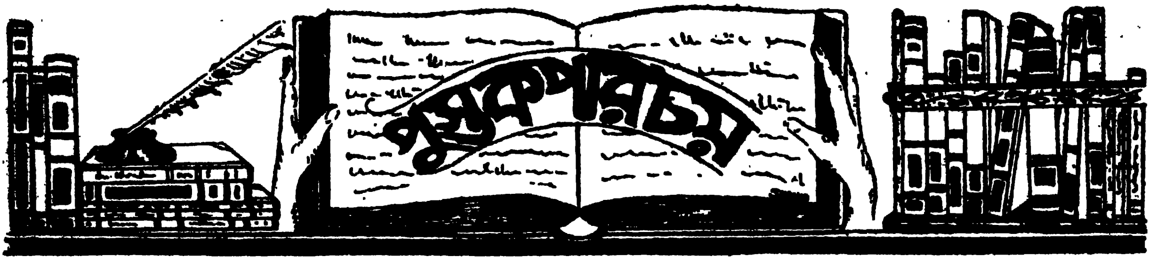
ওদিকে বাইরে শ্রাবণের জলধারা বেড়ে চলে, শাশুড়ী ডাকেন, "ও ছোট বৌমা, বাদলা দিনে ছেলেদের দুটি গরম ঘুঘনি ভেজে দাওনা মা।" বড় জা ছোট ছেলের কাঁথাগুলি এনে বলেন, "ছোট বৌ, তোর তো খালি হাত পা, দেনা ভাই এগুলি একটু উনুন ধারে শুকিয়ে।" এমনি আরও কত। ছেলে বুড়োর বিবিধ কাজ—সন্ধ্যার সংসারের কাজ মিটে গেছে—হাত পা ঝাড়া মানুষের কি ব'সে থাকা সাজে।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন

শেষ-চুম্বন

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কল্লোলিনী ভাগীরথী তীরে,
ধীরে, ধীরে,
সে-দিন যে সন্ধ্যা নেমে এলো,
সমীরণ বহে—এলোমেলো;
বুঝি মোর এ পরাণ সম,
—গাঢ়তম,
দুঃখে অভিভূত।
শুধু পূত,
জাহ্নবীর জল,
প্রিয়ার সে-তনু দেহ স্তব্ধ অচঞ্চল,
তট দেশে।
সেথা এসে,
দাঁড়ানু যখন,
এ-বাহু তখন,
মানিলনা বিঘ্ন কিছু,
হয়ে নীচু,
বাঁধিলো তাহারে নিবিড় বন্ধনে।
নীরব ক্রন্দনে,
ভাঙ্গিয়া পড়িলো বুক।
সেইটুকু,
মনে আছে শুধু;
শেষ-মধু
করেছিনু পান
কানে এসেছিল ভেসে, ভাগীরথী তরঙ্গের গান।



দেবারু—উপন্যাস শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে বরেন্দ্র লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২০৮ পৃঃ দাম দেড় টাকা।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত যে কয়টি গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করেছেন, তাতে বাংলার কথা-সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হ'য়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কথা-সাহিত্যিকের যা' প্রধান গুণ,—কল্পনা-শক্তি ও মানব-জীবনের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি,—সেগুণ যে লেখকের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে আছে, তার পরিচয় তিনি তাঁর প্রত্যেক লেখার মধ্যেই দিয়েছেন। তাঁর কল্পনা-শক্তি ও সমবেদনা অনায়াসেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'তে পারে, তাই তিনি সমাজের যে স্তর থেকেই তাঁর চরিত্র আহরণ করুন না কেন, তাকে একটা অপরূপ জীবন্ত রসমূর্ত্তি দিতে পারেন।

দেবারু উপন্যাসের নায়ক দেবারু এক ডুলেনীর সন্তান। তার পিতা আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন ধনী জমিদার, কিন্তু দেবারুর মায়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীপুরুষের সনাতন স্বাভাবিক আকর্ষণ ছাড়া অন্য কোনো সামাজিক সম্বন্ধ ছিল না। এমন অবস্থায় সমাজের যা' ব্যবস্থা,—দেবারু ও তার মায়ের প্রতি সেই ব্যবস্থাই হ'য়েছিল। সে ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবি, সকলকেই,—দেবারুর পিতামাতাকেও এবং পাঠককেও তা বিনাবাক্যে মেনে নিতে হ'য়েছে,—তাই আগাগোড়া উপন্যাসটির ঘটনা সমাবেশের মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় করুণার সঞ্চার হ'য়েছে। বলা বাহুল্য লেখকের কল্পনা ও সমবেদনা কোথাও বাস্তবের সম্ভাব্যতাকে ছাড়িয়ে যায়নি, তাই উপন্যাসের আগাগোড়া এই করুণ রসটি বড়ই উপভোগের বস্তু। যে দরদ দিয়ে লেখক জন্ম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত দেবারুকে সৃষ্টি করেছেন, সেই দরদ দিয়েই তিনি তার মাকে, বাবাকে ও বিমাতা বৌরাণীকেও সৃষ্টি করেছেন, তাই উপন্যাসের মধ্যে এই চারটি চরিত্রই বেশ জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে, এবং তাদের সুখদুঃখ পাঠকের চিত্তকে বেশ আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ দেবারুর মা, মালতী লেখকের একটি অপরূপ সৃষ্টি। গল্পাংশের বর্ণনা কোথাও সামাজিক বা অন্য কোনো বিষয়ের সমস্যা আলোচনার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, অথচ তা' অনেক কিছু বিষয়ের দিকেই চিন্তাশীল পাঠকের চিন্তার উদ্রেক করে।

উপন্যাসের শেষের দিকে ললিতা ও তার পিতামাতা, এই তিনটি চরিত্রকে নিয়ে এসে লেখক উপন্যাসটিকে ভারাক্রান্ত করেছেন বলেই মনে হয়। তাদের নিয়ে যে কাহিনীটি তিনি রচনা করেছেন, তা উপন্যাসটির মাধুর্য্য বাড়িয়েছে বলে মনে হোলো না। রায়নগরের জমিদার গৃহ থেকে দেবারু যখন বিদায় গ্রহণ করল, সেইখানেই গল্পের স্বাভাবিক ধারায় উপন্যাসটির শেষ হওয়া উচিত বলে মনে হয়। তথাপি মোটের উপর বিচার করলে বলতেই হয় যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে দেবারু অন্যতম।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

শান্তি-সোপান বা পান্থ প্রদীপ। খান বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাসেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী, জমিদার, বলিয়াদী, (ঢাকা)। দাম ২।০। পাওয়া যাবে, গ্রন্থকারের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে কিংবা ইসলামিয়া লাইব্রেরী পটুয়াটোলী, ঢাকায়।

বইখানা দার্শনিক পণ্ডিত হজরত এনাম গাজালীর লেখা "মেনহাজোল আবেদন" আর "ছেরা জোছালোকন" নামে দু'খানা ধর্ম্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থকার ভূমিকায় যা বলেছেন, তাতে বোঝা যায়, বাস্তবিক তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ। উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রাচীন ও প্রকৃত মোস্‌লেম ধর্ম্মের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। গ্রন্থকার দুঃখ করে বলেছেন আজকালকার মোস্‌লেম ভায়েরা—তাঁদের খাঁটি মুসলমান ধর্ম্মের আদর্শ হারিয়ে পরদেশী ভাবের ছায়ায় মানুষ হ'য়ে, নিজেদের ঘরে কতো বড় সম্পদ রয়েছে সে বিষয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌ছেন। আলো জ্বলছে ঘরে, অথচ তারা বুদ্ধি হারিয়ে আলোর সন্ধানে চলেছেন বাইরে—বিপথে। যাতে তারা প্রকৃত মোস্‌লেম ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝ্‌তে পারেন, সেই জন্যে গ্রন্থকার তাঁর বয়সের অসুবিধা আর রোগের যন্ত্রণা উপেক্ষা কোরে এ অনুবাদে হাত দিয়েছেন। খাঁটি বাংলায় সহজ, সরস করে লেখবার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, সে ঐকান্তিক চেষ্টা বাস্তবিক সফল হ'য়েছে।

বইখানা আগাগোড়া ধর্ম্মতত্ত্বে পূর্ণ। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব বল্‌তে যা বোঝায়, সে ধাঁচের নয়; এতে প্রকৃত ভাব্‌বার জিনিষ আছে। বিশেষ করে, "আওয়ারেজের ঘাটী" বলে চতুর্থ অধ্যায়টী বেশ গভীর।

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ছেড়ে দিয়ে, মানুষকে মানুষ বলে ধরে, যে সব কথা মানুষের অন্তর-চৈতন্যকে স্বতঃই আলোড়িত করে সেগুলোর সমাধান আজো হোলো না। কিন্তু সমস্ত ধর্ম্মেই তার চেষ্টা হয়েছে। এই বইএর ভেতর এই অধ্যায়টীতে অদৃষ্টবাদ নিয়ে বেশ গভীর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পড়্‌লে বোঝা যায়, আগে মোস্‌লেম ধর্ম্মে, কী ক'রে এ সব প্রশ্নের সমাধান করবার চেষ্টা হয়েছিলো। নিরাসক্ত হয়ে সংসার ভোগ করা, নিষ্কাম কর্ম্ম, ভগবানে আত্মসমর্পণ, অহঙ্কার বর্জ্জন করা, বা কামনার নাশ ক'রে শান্তির সন্ধান করা ইত্যাদি কথা,—এসব কারু নিজের কথা নয়…এসব চিরদিনের, চিরকালের, বিশ্বজনের কথা। গ্রন্থকারকে প্রশংসা করতে হয় এই জেনে, তিনি ঠিক উপযুক্ত সময়ে, বিচক্ষণের মত হাত দিয়েছেন ঠিক প্রয়োজনীয় জিনিষে। মনে হয়, এ সময় অন্য কোনো জিনিষের অনুবাদ করতে বস্‌লে তাঁর পণ্ডশ্রম হোতো। কিন্তু একটা চিরন্তন জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন বলে, একথা না বলে পারা যায় না যে তিনি ঠিক সময়ে ঠিক জিনিষের অনুবাদ করে, একটা প্রকৃত কিছু আশা করেছেন; আশা সঙ্গত; শোভন। আমরা প্রার্থনা করি, তাঁর আশা সফল হোক্‌।

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বসু

নারীজীবন ও প্রসূতি-পরিচর্য্যা—ডাঃ

শ্রীঅভয়কুমার সরকার প্রণীত, প্রকাশক সরকার এণ্ড সন্স, কলেজ রোড্‌, ফরিদপুর।

অজ্ঞ ধাত্রীরাই প্রধানতঃ, বাংলাদেশের প্রসূতি ও শিশু-মৃত্যুর ভয়াবহ হারের জন্য দায়ী। মোটামুটি ভাবে ধাত্রী বিদ্যাশিক্ষার জন্য অধিক বিদ্যার আবশ্যক না হইলেও, প্রসূতি-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে আধুনিক-জ্ঞান-সম্পন্না ধাত্রীর সাহায্য অধিকাংশ স্থলেই পাওয়া যায় না। সুখের বিষয়, মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড সমূহের দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে—ধাত্রীবিদ্যার প্রসার করে তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

ডাঃ সরকারের পুস্তকখানি লিখন-পঠনক্ষমা নারী মাত্রেই পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন। বইখানির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বইখানির একাধিক সংস্করণ বাহির হইয়াছে এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড সমূহের ধাত্রী-বিদ্যাশিক্ষার ক্লাসগুলির অনেকগুলিতে পাঠ্য-পুস্তকরূপে পুস্তকখানি ব্যবহৃত হইতেছে। বস্তুতঃ, পুস্তকখানি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত; ডাক্তারের সাহায্য ব্যতিরেকেই সকলে ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন।

বসন্তরোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীঅভয়কুমার গুহ প্রণীত। মূল্য ৷৷০

উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিলে, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতির ব্যাধি সমূহের অনেকগুলির প্রকোপ যথেষ্ট প্রশমিত করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৎসরের পর বৎসর এই সকল রোধ-যোগ্য ব্যাধি অনুহেই বঙ্গদেশে লক্ষ লক্ষ লোক অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

অবশ্য শিক্ষার অপ্রসার ও গবর্ণমেন্টের উদাসীনতাই এজন্য দায়ী।

এক বসন্তরোগেই প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হন; যদিও, উপযুক্ত সময়ে টীকা লইলেও রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় সাবধানতা অবলম্বন করিলে এই রোগকে অতি সহজেই দমন করা যায়। ডাঃ সরকার বসন্তরোগের হাত হইতে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তাহা পুস্তকখানিতে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পঠন-ক্ষম ব্যক্তিমাত্রই পুস্তকখানি পড়িয়া অতিমাত্রায় লাভবান হইতে পারিবেন। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

মনসিজা—শ্রীনীলরতন কুমার। মূল্য ॥০। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

লেখক কবিতা লেখা আর কিছুদিন অভ্যাস করিয়া কবিতার বই প্রকাশ করিলে ভাল করিতেন।

ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

জেনেভা-ভ্রমণ—শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। মূল্য ৸০। প্রকাশক—শ্রীনিখিলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, ২০ সুরিলেন, কলিকাতা।

১৯৩০ সালে "লীগ্ অব নেসনসের" সদস্যরূপে লেখক জেনেভায় গিয়াছিলেন। লেখকের মতে, ভারতবর্ষ অনেক দেশ অপেক্ষা অধিক চাঁদা লীগকে দিলেও, লীগের সভায় অন্যান্য দেশের সদস্যদের ন্যায় ভারতীয় সদস্যদের প্রতিপত্তি নাই। কিন্তু তবুও, লেখক ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া লীগের সভায় ভারতের সম্মান কিছু বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার কাহিনী জেনেভা ভ্রমণ প্রসঙ্গে পুস্তকখানিতে বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে লীগের নিকট হইতে কিছু সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা তাহাও লেখক বলিয়াছেন।

পুস্তকের অন্যান্য অংশ সাধারণ ভ্রমণ-যাত্রার বিবরণের ন্যায়। পুস্তকখানি সহজ-পাঠ্য। ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীসুশীল কুমার বসু

শনির দশা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রাপ্তিস্থান, বরেন্দ্র লাইব্রেরী ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা ১৬০। দাম এক টাকা।

এখানি যতীন বাবুর প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহার আখ্যানভাগ বেশ চিত্তাকর্ষক, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীগুলি বেশ সজীব, কথাবার্ত্তাগুলিও বেশ সময়োপযোগী ও প্রাণ শক্তিতে পরিপূর্ণ। আজকালকার পনেরো আনা উপন্যাস যেমন একঘেয়ে ও নিতান্ত সাধারণ গোছের, এখানি তেমন নহে। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে ইঁহার চিন্তা শক্তিও বেশ গভীর ও নির্ভীক-উজ্জ্বল। বইএর ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার।

বিদ্রোহী বালক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত প্রাপ্তিস্থান, ১০ নং ইন্দ্ররায় রোড্, ভবানীপুর। পৃষ্ঠা ১৮৪, দাম এক টাকা।

আজকালকার ছেলেদের বইএ আমরা দুইটি জিনিষ দেখিতে পাই—হয় সামান্য চুটকি গল্প, না হয় রোমাঞ্চকর এ্যাড্‌ভেনচারাস উপাখ্যান। ছেলেদের ও তাহাদের ছাত্র-জীবনের কথা লইয়া বাংলাভাষায় উপন্যাস নাই বলিলেও চলে। এই গ্রন্থখানি আমাদের সেই অভাব দূর করিয়াছে। গোবিন্দ নামে একটি দুরন্ত ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমি কথাতে এই বইখানি পূর্ণ; অথচ গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত গল্পাংশ ঘটনার পর ঘটনা লইয়া বেশ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। আমাদের ঘরের ছেলেরা গোবিন্দের দুষ্টুমির কথা পড়িয়া প্রচুর আমোদ পাইবে অথচ দুষ্টুমি করা ও শিক্ষকের অবাধ্য হওয়া যে নিতান্ত খারাপ তাহাও বুঝিবে। প্রত্যেক অভিভাবকের কর্ত্তব্য ছেলেদের বিদ্রোহী বালক পড়িতে দেওয়া। ইহাতে তাহারা একাধারে শিক্ষা ও আমোদ পাইবে।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

মধুপর্ক

শ্রীআশীষ গুপ্ত

যারা কাঁচা মাংস খায়

পৃথিবীতে সমগ্র এস্কিমো জাতির সংখ্যা বত্রিশ হাজার। এ্যালাস্কা, উত্তর ক্যানাডা, গ্রীণল্যাণ্ড ও ল্যাব্রাডর ছাড়া অন্য কোনও দেশে এস্কিমো নাই।

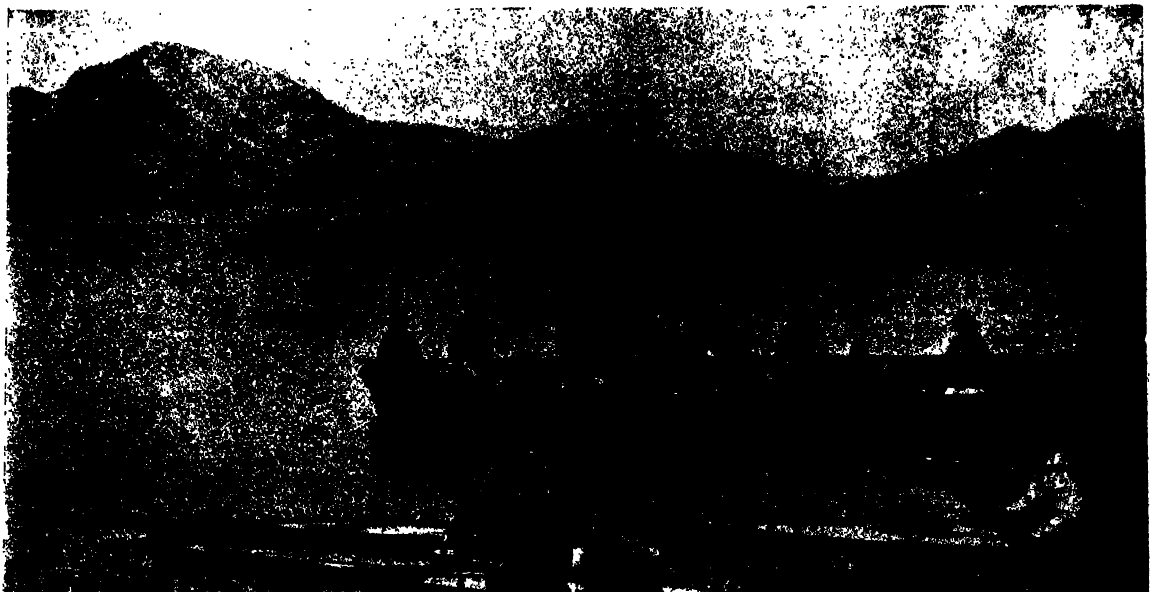
যে দেশে এস্কিমোদের বাস সেখানে বেঁচে থাকা বিশেষ সহজ ব্যাপার নয়। ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাতের দেশে, সিল, সাদা ভালুক, সিন্ধুঘোটকের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করে কায়ক্লেশে কোনও রকমে তারা জীবনযাপন করে।

এস্কিমোদের প্রধান খাদ্য সিল—কাঁচা বা পুড়িয়ে। তারা

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

পুরুষ মাত্রেই শিকারী কারণ শিকার না করলেই অনাহার। সাদা ভালুক, সিল, সিন্ধুঘোটক, ক্যারিবু, বল্গা হরিণ ও কদাচিৎ দু'চারিটি পাখী—যখন যা পাওয়া যায়, এস্কিমোরা তাই শিকার করে।

সাহসে তারা দুর্জ্জয়; একেলা ভালুকের সন্ধানে যেতেও দ্বিধা করে না। প্রকাণ্ড বরফের স্তূপগুলি যখন গলতে আরম্ভ করে, শিকারের নেশায় মত্ত হয়ে কখনও কখনও তারই উপর ভাসতে ভাসতে শিকার আর শিকারী দু'জনই চলে যায়—কেউ আর ফিরে আসে না। এস্কিমোরা ডিঙিও



সিলের চামড়ায় তৈরী কায়াক ও উম্-ইয়াক নামক নৌকা

শিকার করে। ছোট্ট ছোট্ট নৌকায় তীর বেগে ছুটে গিয়ে বৃষ্টিধারার মত হারপুন্ বা বর্শা বিদ্ধ করে অতিকায় তিমিকে জর্জ্জর করে ফেলে। কিন্তু সভ্যজাতির ক্রমাগত তিমি শিকারের ফলে তিমির সংখ্যা এত কমে গিয়েছে যে এখন কদাচিৎ দু'একটি তিমি দেখা যায়।

এস্কিমোদের নৌকার মতন দ্রুতগামী জলযান পৃথিবীতে আর নাই। এদের নৌকাগুলি দু'রকমের। তিমির হাড়ের কাঠামোর উপর সিলের চামড়া দিয়ে ঢেকে ক্যারিবু কিংবা বল্গা হরিণের শিরা ও পেশী দিয়ে সেলাই করে ১৭ ফুট লম্বা আর দু'ফুটেরও কম চওড়া তারা যে ক্ষুদ্র নৌকাগুলি তৈরী করে তার নাম কায়াক্ (Kayak)। এগুলিতে একটি মাত্র লোকের বসবার ব্যবস্থা থাকে এবং নৌকাটি এমন ভাবে তৈরী যে লোক বসলে আর একটুখানিও ফাঁক থাকে না। এস্কিমোদের নৌকার দাঁড় একটি করে আর তাও আবার দু'দিকেই চ্যাপ্টা।

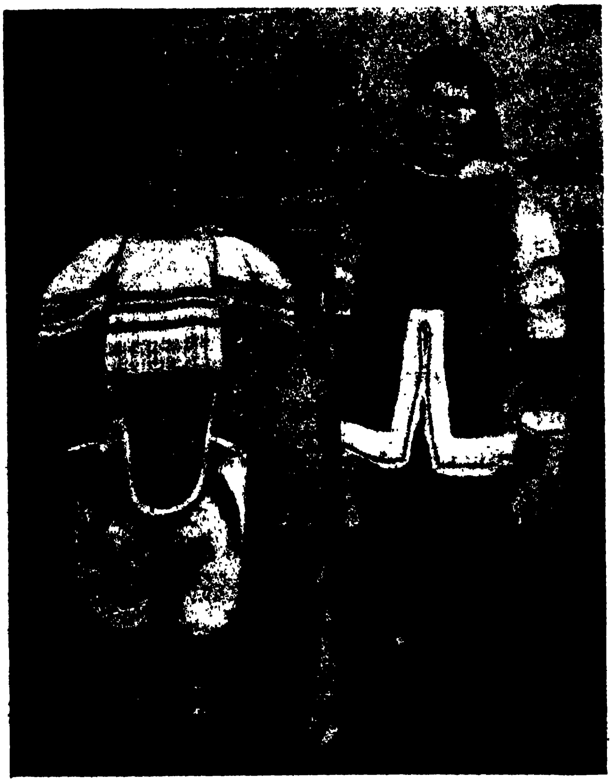


মৎস্য-শিকার রত এ্যালাস্কা-দেশীয় স্ত্রীলোক

এর চেয়ে বড় যে নৌকাগুলি তার নাম উম্‌ইয়াক্ (Umyak)। এগুলি তৈরী হয় হাড়, কাঠের টুকরো, আর চামড়া দিয়ে। দৈর্ঘ্যে এগুলি ৪০ ফুট, জিনিষপত্র আর শিশুদের নিয়ে এতে আট দশ জন নারীর বসবার স্থান থাকে। সাধারণতঃ এ নৌকাগুলি নারীরাই চালনা করে—পুরুষেরা বেশী পছন্দ করে কায়াক্।

বরফের উপর চলতে হলে এস্কিমোরা স্লেজ্ ব্যবহার করে। পাঁচটি কুকুর সাধারণতঃ স্লেজখানি টেনে নিয়ে যায়। জিনিষপত্র আর লোকজন নিয়ে এক একটি স্লেজ্ আট দশ মণ ভারী হয় ও বরফের উপর দিয়ে এদের গতি হয় ঘণ্টায় ৫ মাইল। কুকুরগুলি একসারি বেঁধে স্লেজ্ টানে না, স্লেজটি চলতে আরম্ভ করলেই ছত্রাকারে তারা ছড়িয়ে পড়ে। চারদিক বরফে ঢাকা পড়ে গেলেও কিংবা গভীর রাত্রেও এস্কিমোরা পথ হারিয়ে ফেলে না। কেমন করে যে তারা দিক্ নির্ণয় করে, 'সভ্য' মানুষ তার কিছুই বুঝতে পারে না।

শীতের আবির্ভাবে চারিদিক যখন বরফে ঢাকা পড়ে যায়, তখন শিকার পাওয়া অতি কঠিন। সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে গেলে সিলগুলি নিশ্বাস নেবার জন্য বরফের তলে অনেকগুলি ছোট ছোট ছিদ্র করে ফেলে। এস্কিমোরা এই ছিদ্রগুলির পাশে বর্শা হাতে চুপ করে বসে থাকে, কখনও কখনও হয়ত তিন চার দিনও বসে থাকতে হয়;



মেরু প্রদেশের শীতের উপযোগী পোষাক-পরিহিত এস্কিমো স্ত্রী ও পুরুষ

নিশ্বাস নেবার জন্য ছিদ্রের কাছে আসতেই নিশ্বাসের শব্দটুকু পেয়ে তারা সিলকে বর্শাবিদ্ধ করে।

কখনও বা আর এক উপায়ে সিল শিকার করা হয়। ছ'মাস রাতের পর যখন রোদ দেখা দেয়, সিল তখন জল ছেড়ে ডাঙায় আসে। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে শিকারী হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে অগ্রসর হয়। এমন ভাবে গড়াতে গড়াতে সে এগিয়ে আসে, দেখে মনে হয় যেন আর একটি সিল। শিকারীর এ চাতুরী সিল ধরতে পারে না তাই সহজেই নিহত হয়।

এস্কিমোদের পোষাকের যোগাড় হয় সিল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতির চর্ম্মে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সিলের চামড়ার পাজামা পরে আর সিন্ধুঘোটকের চামড়ার বুটজুতা পায়ে দেয়। এই জুতার নাম ক্যানিকার (Kaniker)। জুতা বা পোষাক তৈরী করবার জন্য কাঁচা চামড়া তারা 'ট্যান্' করে অদ্ভুত উপায়ে। এস্কিমো নারীগুলি কাঁচা চামড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন চিবোতে থাকে; মুখের লালায় ও দাঁতের পেষণে চামড়া নরম হলেই তখন সেলাই করা আরম্ভ হয়। কিন্তু এই চর্ম্ম-চর্ব্বণের ফলে দু'এক বছরের মধ্যেই তাদের দাঁত ও মাড়ির গোড়া পর্য্যন্ত একেবারে ক্ষয়ে যায়।

এস্কিমোদের বাড়ীর নাম ইগ্‌লু (Igloo)। গ্রীষ্মকালে তারা তিমির হাড়, পাথর, চামড়া, যা পায় তাই দিয়ে ঘর তৈরী করে বা শুধু চামড়ার তাঁবুতে থাকে, কিন্তু শীতকালে বাস করে বরফের ঘরে। বাইরে যখন প্রচণ্ড শীত, বরফের ঘরগুলি তখন ভারী আরামপ্রদ। কিন্তু এ ঘরগুলির প্রধান অসুবিধা যে আলো বা বাতাস আসে না। ঘরের মধ্যে সিলের চর্ব্বির প্রদীপ জেলে এস্কিমোরা বসে থাকে, ধোঁয়া বার হবার কোনও পথই তারা রাখে না। চিম্‌নী বা জানালা তৈরী করতে তারা জানে না; ঘরে প্রবেশ করবার যে সরু সুড়ঙ্গ থাকে তার ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তারা ঘরে আসে যায়; তার মুখে চামড়ার একটি পর্দা ঝোলান থাকে আর তারই ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঘরে ঢোকে।

পণ্ডিতেরা বলেন্ এস্কিমোদের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিল মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী। এস্কিমো কথাটির উৎপত্তি হয়েছিল যে কথাটি থেকে তার মানে "যারা কাঁচা মাংস খায়"।

এস্কিমোদের কথা কইবার ধরণটি অদ্ভুত। "আমি যাবো" বা "তুমি আসবে" না বলে তারা বলে, "একজন যাবে," "একজন আসবে"। শিকার ছাড়া একদিনও এস্কিমোরা বাঁচতে পারে না। গ্রীষ্মকালে শিকার করে তারা যে মাংসাদি সঞ্চয় করে, সারা শীতকাল তাতেই চালাতে হয়। সভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে তারা এখন অল্প অল্প ব্যবসা করতে আরম্ভ করেছে; কড্‌মাছ, সিল বা ভালুকের চামড়ার বিনিময়ে এখন তারা বন্দুক, গুলিবারুদ, কাপড় ও কখনও বা বিলাস সামগ্রী নিতে লালায়িত। কিন্তু এই সভ্য জাতিরাই তাদের সর্ব্বনাশ করেছে। প্রথম প্রথম এস্কিমো দেখলেই নাবিক ও শিকারীরা অসভ্য মনে করে তাদের গুলি করত। এখন অবশ্য তাদের গুলি করে আর মারা হয় না কিন্তু সে দেশে হাম, বসন্ত প্রভৃতি যে সব রোগ কোনদিন ছিল না, ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী সেই রোগগুলি বহন করে নিয়ে গিয়ে তাদের উচ্ছেদ সাধন করছে।

এস্কিমোরা স্বভাবতঃ শিশুপ্রকৃতি ও অত্যন্ত সরল। তারা সহজেই বিদেশীর কথায় বিশ্বাস করে' আপনার যথাসর্ব্বস্ব তার হাতে সঁপে দেয়। সভ্যজাতির কপটতা বা মিথ্যাচার তাদের মধ্যে একেবারে নাই। এস্কিমোরা চুম্বন করতে জানে না, নাকে নাক ঘষে তারা প্রীতিজ্ঞাপন করে।



এস্কিমোরা কড়ি ও পাথরে তৈরী 'ল্যাব্রেট' নামক অলঙ্কার চামড়া ফুঁড়ে পরে' থাকে



এস্কিমো পুরুষ ছুরি পেলে যতটা পারে খাবার মুখে পুরে ছুরি দিয়ে কেটে নেয়

এস্কিমোরা অতি দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। গ্রীণল্যাণ্ডে এখন বার চৌদ্দ হাজারের বেশী এস্কিমো নাই, ল্যাব্রাডরে আছে মাত্র ১৫০০। খাদ্যাভাবে, রোগের পীড়নে এই অতি পুরাতন জাতি আরও অনেকের মতই হয়ত অল্পদিনেই একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে।

নৃত্য-বিভীষিকা

ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা যা করে সবই অদ্ভুত। জার্ম্মানী দেশে ম্যাক্স হিউল নামে একটি মুচি বাজি রেখে সাড়ে দশ মিনিটে ৭৫টি ডিম গলাধঃকরণ করেছে। এর কাছে যে হেরে গিয়েছে তার বাড়ী আমেরিকায়, নাম জন উইলিয়াম্‌স্। মাত্র দেড় মিনিট বেশী তার সময় লেগেছিল।

আমেরিকায় একটি রমণী ৬০০ টাকা বাজী রেখে ক্রমাগত ১০৩ ঘণ্টা গ্রামোফোন শোনার পর বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি জিতলেন ঠিক্, কিন্তু তাঁকে হাঁসপাতালে পাঠাতে হল।

আজকাল হুজুগ উঠেছে কে কতক্ষণ নাচতে পারে। ১৯২৭ সালে আফ্রিকায় চার্লস্ নিকোলাস্ নামে একজন ফরাসী অবিরাম ২৬৩ ঘণ্টা নেচেছিলেন। তাঁর বয়স তখন চল্লিশ। আমেরিকায় মিস্ মার্গারেট মিলার নামে ১৮ বৎসর বয়সের একটি যুবতী নাচতে নাচতে সাড়ে উনচল্লিশ মাইল পথ চলে গিয়েছেন।

এ-ত গেল একলা একজনের নাচের কথা। কিন্তু একদল যুবক আর যুবতী অনেক সময় জোড় বেঁধে এই রকম নাচ আরম্ভ করেন।

যারা এই রকম নৃত্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তারা যে শুধু মজা দেখবার জন্ত করে, তা নয়। এতে তাদের হাতে বেশ দু' পয়সা আসেও। কোনও একটা সহরে বেশ ভালো, প্রকাণ্ড একটি ঘরভাড়া নিয়ে তারা বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করে যে, যে যুবক-যুবতী অন্ত সকলের চেয়ে বেশীক্ষণ নাচতে পারবে, তাদের প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার অবশ্য বেশ ভালোই দেওয়া হয়—প্রায় দশ পনর হাজার টাকা এবং কখনও কখনও আরও বেশী।

এই পুরস্কারের লোভে অনেকে, এবং হুজুগে মেতে আরও অনেকে নৃত্য প্রতিযোগিতায় এসে যোগ দেয়। সকলকেই টাকা দিয়ে ভর্ত্তি হতে হয় আর এই সব টাকা যায় যারা নাচের আয়োজন করে তাদের পকেটে। টাকা দিয়ে যে কেউ ভর্ত্তি হতে পারে কিন্তু তার আগে ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে দেখে নেয় অতখানি অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা শরীরে আছে কিনা। যে কোনও নারী যে কোনও পুরুষের সঙ্গিনী হতে পারে; কিশোর-কিশোরী থেকে আরম্ভ করে প্রৌঢ়েরা পর্য্যন্ত এই নৃত্য প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

রাতদিন অবাধে এই নাচ চলে। ব্যাণ্ড বাজাবার লোকেরা আট ঘণ্টা অন্তর বদলী হয়, দিনরাতে তিন দল লোক ব্যাণ্ড বাজায়। প্রতি ঘণ্টায় ৪৫ মিনিট করে নাচতে হয় আর এক মিনিট করে ছুটি। এই পনর মিনিটের মধ্যেই খাওয়া, ঘুম ও বিশ্রাম।

যেখানে নাচ হয় ঠিক তার পাশেই ছুটি ছোট্ট ঘর—স্ত্রী ও পুরুষদের আলাদা আলাদা। পনর মিনিট ছুটির মধ্যে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করা যেতে পারে। নাচিয়েদের খুব ভালো খাবার দেওয়া হয়—অনেকে নাচের শেষে বাড়ী ফেরে বেশ একটু হৃষ্টপুষ্ট হয়ে। কোনও মাদক দ্রব্য খাওয়া একেবারে নিষেধ, সিগারেট বা চুরুট যত ইচ্ছা খাওয়া যায়। যে ৪৫ মিনিট নাচ চলে তার মধ্যে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশটুকুও থাকে না। যে কোনও কারণে হোক্ এই সময়ের মধ্যে এক মুহূর্ত্ত নাচ থামলেই সেই "যুগলের" পরাজয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই নাচ চলে। কত দর্শক আসে, চলে যায়, আবার আসে;—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নাচের বিরাম নাই। দু' একদিনের মধ্যেই অনেককেই সরে যেতে হয়, দল ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। দল যত ক্ষীণ হয়, দর্শকদের উত্তেজনা ততই বেড়ে ওঠে; উত্তেজনা যত বাড়ে তত বেশী দর্শক আসতে আরম্ভ করে; যত বেশী দর্শক আসে, যারা নাচের আয়োজন করে তাদের পকেট ততই ভারী হয়।

নাচতে নাচতে বহু যুবক-যুবতী প্রেমে পড়ে যায়; নাচের সঙ্গী বা সঙ্গিনী নাচের শেষে জীবন-সাথী হয়ে ওঠে। অনেকে আবার পরিণয় পাশে আবদ্ধ হতে চায় না; নাচের সময়টুকু প্রেমের অভিনয় করেই তারা ক্ষান্ত হয়।

যারা নাচে তাদের জাগিয়ে রাখা এক বিষম সমস্যা। দু'একদিন নাচের পরেই পা আর ওঠে না, চোখ দুটি রক্তজবার মত হয়ে ওঠে, চোখের পাতা মনে হয় যেন পাথরের চেয়েও ভারী। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়ে যায়, নাচতে নাচতেই অনেকে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের জাগিয়ে রাখতে হবেই, এক মুহূর্ত্ত থামলে চলবে না। যারা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তাদের সরিয়ে দেওয়া মাত্র চেতনাহীন হয়ে তারা ঘুমে লুটিয়ে পড়ে। অনেকে বিকারগ্রস্ত হয়ে ভুল বকতে আরম্ভ করে বা অজ্ঞান হয়ে

যায়। আবার অনেক সময় পুরুষ কিংবা নারীর অর্দ্ধচেতন দেহখানি জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী শুধু জিদের বশেই নাচতে থাকে।

এদের জাগিয়ে রাখবার জন্ত পট্‌কা ফাটান হয়, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হয়, তুমুল কলরব করে বাজনা বাজান হয়, ও সকলে মিলে থেকে থেকে চীৎকার করে ওঠে।

অনেকে এই অত্যাচারের ফলে পাগল হয়ে যায়। বেশীর ভাগ দেখা যায় যে পুরুষের চেয়ে নারীর সহ্য করার ক্ষমতা অনেক বেশী। সঙ্গী যখন ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়তে চায় তখন তাকে জড়িয়ে ধরে রাখে তার সঙ্গিনী।

প্রচণ্ড করতালি আর আকাশ-ফাটা হট্টগোলের মাঝখানে নাচ যখন শেষ হয় তখন বিজয়ী "যুগল" বোধ হয় টাকার তোড়া ছুঁড়ে ফেলে ঘুমে লুটিয়ে পড়তে পেলে বাঁচে।

যে দেশে সর্দ্দি হয় না

মেরুর দেশের নাম শুনলেই আমরা ভয়ে কেঁপে মরি, না জানি কতই ঠাণ্ডা। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন যে আশঙ্কার কোনই কারণ নাই; সেখানে না কি ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হতেই পারে না। নানারকম রোগের জীবাণু বিষ বহন করে এনে আমাদের অসুখ ঘটায় কিন্তু মেরু প্রদেশে এই জীবাণুগুলি ঠাণ্ডায় একেবারেই বাঁচতে পারে না। যারা মেরু অভিযানে যায় আমরা ভাবি তাদের সর্দ্দি-কাশি বুঝি লেগেই থাকে, কিন্তু সত্যি সেখানে সর্দ্দি-কাশী হওয়া একেবারে অসম্ভব। এমন কি যদি একরাশ নরম বরফের ওপরে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তবুও তার নিউমোনিয়া হবার আশঙ্কা নাই; ঘুম ভেঙে শুধু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হবে।

সে দেশে ঘা, ক্ষত খুব শীঘ্র শুকিয়ে যায়, কাটা দেখতে দেখতে জোড়া লাগে। একবার অভিযান-যাত্রীদের মধ্যে একজনের মাথায় বিষম আঘাত লেগে মাথা প্রায় দু'টুকরো হয়ে কেটে গিয়েছিল। ধরাধরি করে তাঁকে শিবিরে নিয়ে গিয়ে সঙ্গীরাই যেমন তেমন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। দিন কয়েক পরেই কাটা মাথা সম্পূর্ণ জোড়া লেগে শুধু একটি ক্ষীণ দাগ সাক্ষী থেকে গেল।

যদি বাঁচতে চাও, ঘাস খাও

জাপানের অধিবাসীরা প্রায়ই দীর্ঘজীবি হয় ও অনেকেই শতাধিক বৎসর বেঁচে থাকে। ডাক্তার বেকার নামে জনৈক বৈজ্ঞানিক জাপানীদের খাদ্যতালিকা পরীক্ষা করে বলেছেন যে তারা প্রধানতঃ ভাত, সমুদ্রের মাছ ও সামুদ্রিক ঘাস (sea-weed) খেয়ে জীবনধারণ করে। জাপানীদের মতন সুন্দর দাঁত ও চুল আর কোনও দেশের অধিবাসীদের নাই। তাদের সমাজে টাকপড়া বা দন্তরোগ—অকালবার্দ্ধক্যের কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। ভাত ও মাছ অনেকেই খায় কিন্তু ডাক্তার বেকার বলেন যে সামুদ্রিক ঘাস খেয়ে পরীক্ষা করা উচিৎ যে অন্যান্য জাতি জাপানীদের মতন স্বাস্থ্যসম্পন্ন হতে পারে কি না?

ডিমের দীর্ঘজীবন লাভ

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের বৈজ্ঞানিকেরা সঞ্চিত ডিমের সুনামবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত প্রণালীর সাহায্যে ডিমের মধ্যে তার প্রাথমিক আর্দ্রতা এবং কার্ব্বণ ডায়অক্সাইড্ এমনভাবে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় যে নয় মাস পরেও তা প্রথম দিনকার মতই টাট্‌কা এবং তাজা থাকে।

সাধারণতঃ শীতল অবস্থায় ডিমকে সঞ্চিত করে' রাখ্‌তে গেলেই তার আর্দ্রতার এবং কার্ব্বণ ডায়অক্সাইডের পরিমাণ কমে' যায় এবং এই দুই বস্তুর হ্রাস মানেই হচ্ছে ডিমের গুণেরও অবনতি।

ডিমের খোলাটা হচ্ছে ছিদ্রবহুল, কিন্তু তেলে ডোবালে এইসব ছিদ্রগুলো বন্ধ হ'য়ে যায়। ডিমব্যবসায়ীরা ইতঃপূর্ব্বে আবিষ্কার করেছিল যে ভাণ্ডারে সঞ্চিত কর্‌বার পূর্ব্বে উন্মুক্ত পাত্রে ডিমগুলোকে ডুবিয়ে নিলে তাদের আর্দ্রতার এবং কার্ব্বণ ডায়অক্সাইডের অপচয় কথঞ্চিৎ নিবারিত হয় এবং ফলে তাদের আয়ুকাল বর্দ্ধিত হয়। এখন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকেরা আরও এক ধাপ অগ্রসর হ'লেন, তাঁরা বায়ু প্রতিরোধক পাত্রের ভিতর হ'তে পাম্পের সাহায্যে বাতাস বের করে' দিয়ে তারই মধ্যে ডিমগুলোকে বৈজ্ঞানিকভাবে



আংশিকভাবে বায়ুহীন পাত্রে ডিম রাখিয়া কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড এবং তেলের সাহায্যে দীর্ঘজীবন দান করা হইতেছে

করলেন। আংশিক বায়ুহীনতার দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে ডিমগুলো যে শুধু তেল গ্রহণ করে তাই নয়, নিজেদের মধ্য থেকে খানিকটা বাতাস নির্গত করেও দেয়। পাত্রের মধ্যে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড্ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য। বাহিরের বায়ুর চাপ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছোলেই, ডিমগুলো খোলার ভিতরে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড আকর্ষণ করে নেয়। কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড ভিতরে প্রবেশ কর্‌বার সময় পাত্‌লা পর্দ্দার মতন কিছু তেল বহন করে' ভিতরকার ঝিল্লীতে নিয়ে যায়।

এই কাজে খনিজ তেল ব্যবহার করা হয় এবং দেখা গিয়াছে যে এর ব্যবহারের দ্বারা ডিমের গুণের কিছুমাত্র তারতম্য হয় না। দশমাস পরের এই ডিম ভেঙে দেখা গিয়েছে যে মাত্র দু'একদিন হ'ল পাড়া ডিমের সঙ্গে এর কিছুমাত্র ভেদ নেই, না চেহারায়, না স্বাদে!

সেলিউলয়েড ট্যাক্সিডার্মি

বাংলায় বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোনও কিছু লেখা যে কতদূর কঠিন কাজ তা এই অনুচ্ছেদের নামকরণের পদ্ধতি দেখেই বুঝ্‌তে পারা যাবে,—নামটা আমাদের অতিরিক্ত রকমের ইংরাজীপ্রীতির পরিচয়রূপে গ্রহণ না করে' বাংলাভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষার দৈন্যের উদাহরণরূপে গ্রহণ করাই ঢের বেশী সঙ্গত হ'বে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

মৃত জীবজন্তুর দেহের চাম্‌ড়া প্রস্তুত করে' নিয়ে তার ভিতরটা পূর্ণ করে পুনরায় তাকে আকৃতি প্রদান করার নাম ট্যাক্সিডার্মি। এ্যামেরিকার ফীল্ড্ মিউজিয়াম্ অভ্ ন্যাচার্যাল হিষ্ট্রীর একজন কর্ম্মচারী আবিষ্কার করেছেন যে কোনও আংশিক স্বচ্ছ বস্তুর সহিত নানাবিধ রংয়ের সংমিশ্রণে স্বাভাবিক বর্ণ প্রস্তুত হ'তে পারে। এর নাম "সেলিউলয়েড



ছবির সম্মুখভাগে কৃত্রিম উপায়ে আংশিক প্রস্তুত চামড়া

প্রণালী", যদিও অত্যন্ত ব্যবহৃত উপাদানের মধ্যে সেলি-উলয়েড অন্যতম মাত্র। জীবজন্তুর স্বাভাবিক বর্ণের নকল করতে হ'লে, সেলিউলোজ সলিউশ্যনের সঙ্গে রং মেশাতে হ'বে এই কাজে সাধারণতঃ সেলিউলোজ্‌ নাইট্রেট, সেলিউলোজ্‌ এ্যাসিটেট্‌ অথবা পারেজাইলিন ব্যবহৃত হয় ও তারপর এই রং ছাঁচে লাগান হয়,—ছাঁচের অন্তর্ভাগে যেখানে যে রংয়ের প্রয়োজন সেইখানে তা লাগানো হ'য়ে থাকে। তৎপরে স্তরে স্তরে কাপড়, তারের কাপড় ইত্যাদির ব্যবহারের দ্বারা মূর্ত্তিটিকে দৃঢ় করে তোলা হয়। রংয়ের দিক দিয়ে নিখুঁত এই প্রতিকৃতিটিকে এইবার ছাঁচ থেকে স্থানান্তরিত করা হয়।



একটি সম্পূর্ণ হিপোপটেমাস—ছবি হইতে প্রতিকৃতির সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে; বর্ণ-রঞ্জিত আংশিক স্বচ্ছ কৃত্রিম চামড়ার সাহায্যে এই নিখুঁত হিপোপটেমাসটি গঠিত হইয়াছে

অভ্যর্থনা

ইংলণ্ডের জনৈক প্রধান মন্ত্রী একদা ছদ্মবেশে একটি পাগলা গারদ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, "গুড্‌ মর্ণিং, আমি তোমাদের প্রধান মন্ত্রী।" একটু হেসে দ্বারী উত্তর দিলে, "এইদিকে এসো—আরও তিনজন আগেই এসেছে।"

বিশুদ্ধ

কলিকাতায় টাইফয়েড ও বেরিবেরির আবির্ভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে বাবু একদিন তাঁর হিন্দুস্থানী গোয়ালাকে ডেকে বললেন, "এই, তোম্‌ আচ্ছা দুধ দেতা কি না? দুধমে বেমারকা পোকা থাক্‌তা নেই ত?"

খৈনী খাওয়া, কালো দাগ ধরা দু'পাটি দাঁত বিকসিত করে গোপ উত্তর দিলে, "নেহি বাবু, পোকা কাঁহাসে আয়েগা? হম্‌ ত পানি গরম্‌ কর্‌ তব্‌ দুধমে ডাল্‌তা।"

প্রেমের পারিশ্রমিক

অতি আধুনিক প্রেমিকা ছায়াচিত্রে প্রেমাভিনয় দেখে পাশে উপবিষ্ট যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, "একেই বলে প্রেম; তুমি ত কোনও দিন এমনি করে ভালবাসলে না আমাকে।"

একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অতি আধুনিক যুবক বললেন, "বাপ্‌রে! ও কত মাইনে পায় জানো?"

শুধু বই পড়ে' কিছু হ'বে না সাঁতার শেখো

নিম্নলিখিত কাহিনীটি কোনও চৈনিক ডাক্তারের সম্পর্কে বর্ণিত হ'লেও পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের চিকিৎসক সম্বন্ধে প্রযুক্ত হওয়ার বাধা দেখ্‌ছি না। এই ধন্বন্তরিটিকে একটি রোগী দেখতে ডাকা হয়, তিনি রোগীর এমনই চিকিৎসা করেন যে, বাড়ীর লোকেরা ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাঁকে ধরে' বেঁধে রাখে, কিন্তু রাত্রিতে ভিষকমহাপ্রভু বাঁধন খুলে একটি নদী সাঁতার দিয়ে পার হ'য়ে পালিয়ে যান। বাড়ী পৌঁছে তিনি দেখেন, তাঁর চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের নূতন ছাত্র পুত্রটি মনোযোগসহকারে তাঁর চিকিৎসা গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করছে। তিনি প্রথমে তাঁর ভিজে কাপড়গুলি নিঙড়ে ফেললেন, পরে তাঁর ছেলেকে বললেন, "বাপু হে, শুধু বই পড়ে' কিছু হ'বে না, যদি তুমি ডাক্তার হ'তে চাও তাহ'লে তোমার প্রতি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপদেশ হচ্ছে, সাঁতার শেখো।"

ঠোঙ্গায় করে' দিয়ো, বুঝ্‌লে?

গোব্‌রা তার কাকার সঙ্গে মনোহারীর দোকানে গিয়েছিল, দোকানদার তাকে গোটা তিন লজেঞ্জু দিলেন।

কাকার ইচ্ছে গোব্‌রা তার জন্য দোকানীকে ধন্যবাদ দেয়, তাই তিনি গোব্‌রাকে বল্‌লেন, "কারও কাছ থেকে কিছু পেলে কি বল্‌তে হয় গোবরা ?"

মুহূর্ত্তে গোব্‌রা প্রস্তুত হ'য়ে উঠ্‌ল, দোকানদারকে বল্‌ল, "বাঃ এই কটি "লজেন" দিলে যে! আরও দাও, আর একটা ঠোঙায় করে' দিয়ো, বুঝ্‌লে ?"

না জুড়ে দিলেও চলে

হ্যারিসন রোডে একখানা নূতন দোকান খোলা হ'য়েছে—এখনও টেলিফোনের কানেকশুন পাওয়া যায় নি। তবু দোকানের ম্যানেজার পশার জমাবার জন্য টেলিফোনের রিসিভার তুলে "কথাবার্ত্তা" চালাচ্ছিলেন। এমন সময়ে একজন লোক একটি ব্যাগ হাতে দোকানে ঢুকল। তাকে দেখে দোকানদারের টেলিফোনে "হ্যালো হ্যালো" এবং হাসিঠাট্টার পরিমাণ বর্দ্ধিত হ'ল। খানিক পরে রিসিভার যথাস্থানে রেখে সে হাসিমুখে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করল, "মশাইয়ের কি প্রয়োজন ?

"আমি টেলিফোনের কল জুড়ে দিতে এসেছি। কিন্তু দেখছি না জুড়ে দিলেও আপনার চলে !"

ঘটক-বিদায়

যুগোশ্লাভিয়ার কাটুচানিট্‌চ্‌কা প্রদেশে বোজা (Bozha) নামে একটি তরুণ কৃষকের বিয়ে করতে সাধ হল। কিন্তু তার দেশাচারের বিধান জ্যেষ্ঠা সহোদরা অবিবাহিতা থাকা পর্য্যন্ত তার বিয়ে হতে পারে না। তাই ভগ্নীর কুমারী নাম দূর করতে প্রয়াসী হয়ে একদিন নিরালা মাঠে বোজা একটি বন্ধুকে বললে, "আমার বোন্‌কে বিয়ে করবে ?" উত্তর হল, "না"। খাপ থেকে দীর্ঘ একটি ছুরিকা বার করে বোজা আবার বললে, "করবে না বিয়ে ?" আবার উত্তর হল, "না।" তৎক্ষণাৎ বোজা ও বন্ধুতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। বোজার জ্যেষ্ঠা দৈবগতিকে ঐ পথে চলেছিল, ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে এগিয়ে এসে দেখে বোজার ছুরিকাঘাতে বন্ধুটি জখম হয়ে পড়ে আছে। পরম মমতাভরে সে তার শুশ্রূষায় রত হল ও শেষে একদিন সেই ছেলেটি তাকে ভালোবেসে ফেলতেই দু'জনার বিয়ে স্থির হয়ে গেল। ছেলেটি একটু সেরে উঠলেই তাদের বিয়ে হবে আর ইতিমধ্যে যতদিন বিচার না হয় ততদিন বোজার কারাবাস।



লক্ষ্মী ভাই ষাঁড়, একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও।

বালুচর

শ্রীশান্তি পাল

সোনার বালুর চর—
কিনারে তোমার সুন্দর কোরে বাঁধিব পাতার ঘর।
ছোনের ছাউনি, পাট-খড়ি-বেড়া, খেজুর ছড়ির পাটি,
থাম খুঁটি দিয়া তাল্ কো বাঁশের নিরমিয়া পরিপাটি,
তারি চারিধারে বুনিয়া বুনিয়া ছোট ছোট ঝাউ চারা,
স্নিগ্ধ তাহার শ্যামল ছায়ায় ঘুরিব পাগল পারা।
যে বাঁশরী কবি হারাইয়া চরে ফিরে নাই আর গাঁয়ে,
সে বাঁশরী আমি কুড়াইয়া এনে বাজাব সাঁঝের বায়ে।
তারি সাথে সাথে কচি ঝাউ চারা কাঁপিয়া উঠিবে দুলি,
কিশোরী মেয়েরা পথ হারাইয়া আসিবে ও-পথে ভুলি।
গাঁয়ের গোধন আবার চরিবে সোনার বালুর চরে,
গোখুর ধূলায় রাঙাইয়া পথ ফিরিবে গাঁয়ের ঘরে।
গোধূলির রাঙা-রক্তিম-রাগে কৃষ্ণচূড়ার তলে,
সন্ধ্যা যখন ধীরে ধীরে এসে নমিয়া পড়িবে ঢলে ;—
ম্লান হোয়ে যাবে ভাঁটিফুলগুলো আঙিনার মাঝে যত,
রক্ত-করবী লাজে নত হবে বিয়ের কনের মত,
ডালিমের ফুল ধূলায় লুটিয়া কেঁদে যাবে গড়াগড়ি,
স্নেহাবেশে তারে বুকে তুলে লবে বুনোলতা শতনরী ;—
তারি মাঝে আমি বালকের মত কুড়াইব নানাফুল,
প্রিয়ার লাগিয়া কত না ভূষণ গড়িব সে নির্ভুল।
মিহি সুতো দিয়ে সুন্দর কোরে তিলফুলে গাঁথিমালা,
পঞ্চ-খোঁপায় পরাইয়া দিব আসিলে সে বনবালা।
কিনারে কিনারে কতনা ছন্দে গাঁথিয়া চন্দ্রহার,
পিরীতির রসে ভিজাইয়া আনি' তুলে দিব গলে তার।
বনফুল দিয়ে সাজাইব তারে যত কিছু মনে আছে,
বাঁশরীটি এনে বাজাইব আমি সদা থাকি' কাছে কাছে।
বড় ব্যথা পেয়ে তাই আসিয়াছি ফুল কুড়াইতে গাঁয়ে,
জুড়াইতে দেহ তনু মনপ্রাণ কৃষ্ণচূড়ার ছায়ে।

কোথা বিরহিণী সই,
আজি দেখে যাও বালুর চরেতে জল করে থই থই !
আষাঢ়ের জল আকুলি' ব্যাকুলি' দু'কূল প্লাবিয়া যায়
ঢেউগুলো ভেঙে বিদরিয়া বাঁধ উপছিয়া উগরায়।
তারি সাথে সাথে কিনারের ফুল ভেসে আসে তীরে কত,
কদম কেশর রজনী-গন্ধা চম্পক শত শত।
আথালিয়া আমি সে ফুল তুলিতে হাতে বিঁধে গেলো কাঁটা,
সেই ক্ষতখানি আজো শুকাল না এখনো রয়েছে ঘা-টা !
জানিতাম যদি ওই ফুলগুলো ঘেরা আছে কাঁটা দিয়ে,
কণ্টকগুলি নির্ম্মূল করি' ফুল লইতাম গিয়ে !
কাহার খোঁপার ফুল সে যে ওগো এমনি করিয়া হায়,
কূলেতে আসিয়া কূল না পাইয়া ভেসে যায় নিরুপায় !
এ-দশা দেখিয়া ঝাউচারাগুলো কেঁদে ভিজাইল মাটি,
পাতা দোলাইয়া বেদনা জানায় মুখেতে নাহিকো "রা"-টি।
কলার বাগুরা আথালি' বিথালি' ঝির্ ঝির্ করি' দুলে,—
বনের পাখীরা সম-বেদনায় গান সব গেলো ভুলে !
চকাচখী বক, ডাহুক ডাহুকী, সারস সারসী জলে,—
সারি শুক শ্যামা, দোয়েল কোয়েল কপোত কপোতী থলে;—
ডানার ভিতর মুখ লুকাইল—নির্ব্বাক নিশ্চুপ,
কার ব্যথা গিয়ে বাজে কার বুকে—অদ্ভুত অপরূপ !
পাগল বাতাস উন্মনা হোয়ে বারতা পাঠাল বনে,—
গুরু গম্ভীরে আষাঢ় আসিল বাদলের বরিষণে !
আবরিল সারা পথ,
অশোক নেহালী রঙ্গন যতি শ্বেত-জবা কত শত !
বকুল মালতী কদম কেয়া এ-ওর-পানেতে চেয়ে,
তারাও আজিকে লুটাইছে পথে বরষার গান গেয়ে !
ফুলে ফুলে আহা গলাগলি করি' চুপি চুপি কথা বলে,—
মোর মনে লয় ও-ফুলের সাথে ভেসে যেতে চায় জলে !

জলের মেয়েরা মৃণালে দুঁইয়া জলের আঙিনায়,
ছোট ছোট পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া চারিদিকে বাহিরায়।
অমনি তখন পানা-ফুল বলে,—"কেন কেঁদে মরি ঝুরে?
আমরাও আজ ঘর-ছাড়া হব জলের বুকটি জুড়ে।
পঙ্কিল জলে আমরা ফুটি-গো সেওলা হাবড় মেখে,
তবুও আমরা গন্ধ বিলাই তারি মাঝখানে থেকে!"
রক্ত-শাপ্‌লা বাহু পসারিয়া শ্বেত-শাপ্‌লারে কয়,—
"আজি হতে তবে ফুলগুলো সই করিব না অপচয়;
যে দিন আসিবে বাঁশরীর গানে বনের দুলালী মেয়ে,
সেদিন আমরা আবরিয়া দিব সারা তনুখানি ছেয়ে!"

এস প্রিয়তম, আর কতকাল থাকিবে এমনি দূরে,
বাদলের দিনে খুঁজিতেছি মোরা সারা গাঁওখানি ঢুঁড়ে।
তুমি এস সই আলুলিয়া কেশ, আষাঢ়িয়া মেঘে আজ,
আমরা বেড়িয়া বিজলীর মত পরাব কুসুম সাজ।
আর কতকাল এমনি করিয়া নিশীথ নয়ন জলে,
পল্লব ছায়ে মুখ লুকাইয়া ঝরে ঝরে যাব গলে?
আর কতকাল পরিজন মাঝে ম্লান হাসিখানি ঢাকি',
এমনি করিয়া আড়ালে আড়ালে কেমনে বলনা থাকি?
তুমি এস সই আমরা আজিকে দোঁহে দোঁহা পানে চেয়ে,
আপনি ফুটিব, আপনি টুটিব, বাদলের জলে নেয়ে।

কোথা তুমি প্রিয়তম,
ওগো প্রাণময়ী, ওগো মধুময়ী সুন্দর অনুপম!
একবার এসো এ-ঘোর বাদলে রঙের কুহেলি মেলে'
বাহিয়া তোমার সোনার নাও-টি উজাইয়া অবহেলে।
আর কতকাল আমারে ছাড়িয়া থাকিবে এমনি দূরে,
বাঁশরী আমার ডুকারি' কাঁদিছে মরম বিদারী সুরে!
আর কতকাল স্বপনের জালে তোমারে লইয়া ঘিরি,
এমনি করিয়া উধাও হইয়া বাউলের মত ফিরি?
আজি দেখে যাও কত যে আরতি কত আরাধনা করি,
বালুর চরেতে বসিয়া বসিয়া বালুর প্রতিমা গড়ি!
কি করিব সখি, মন যে বোঝেনা,—তাই ডাকি বারেবার-
সম্মুখে থুয়ে পুষ্প অর্ঘ্য সম্ভার উপচার;
কস্তুরী-মৃগ কুঙ্কুমরাগ চন্দন চুয়া লয়ে,
ফিরিতেছি আমি চর হতে চরে মাথায় করিয়া ব'য়ে।
আমি জানি তুমি ফুল ভালবাস, তোমার ফুলের প্রাণ,
তাই গড়িয়াছি ফুল-আভরণ—পাতার কুটীরখান।
তুমি এসো সই, তোমারি অঙ্কে উজোরিয়া সব ভার,
ব'সে ব'সে শুধু বাঁশরী বাজাই, চরণ করিয়া সার।
আজি উতরোল আষাঢ়িয়া বায়, দিন হল অবসান
তুলে লও তবে ফুল সম্ভার হ'ক সব সমাধান।

শ্রীশান্তি পাল



দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

কংগ্রেস্ কাহাদের দাবী শুনিয়াছেন

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, শ্বেতপত্রে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ না করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু জনমত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিপক্ষে এবং মুসলমান জনমত ইহার পক্ষে বলিয়া ইহাকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

কংগ্রেস, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আন্তঃসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান যদি হইত, তাহা হইলে, তাঁহাদের পক্ষে একথা বলা অন্যায় হইত না যে, কোনও বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে যখন, দুই বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র মত ভেদ রহিয়াছে তখন, এই সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সংঘ হিসাবে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির সম্ভবযোগ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মতের উপর ইহার মীমাংসার ভার দেওয়া উচিত। কিন্তু কংগ্রেস এইরূপ কোন আন্তঃসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে; ইহা জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল জাতীয়তাবাদী, দেশের মুক্তিকামী ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান। জন্মের পর হইতে, কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তার সবচেয়ে বড় শত্রু বলিয়া, বরাবর ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন এবং জনসাধারণের মধ্য হইতে এই মনোভাব দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহাদের উৎসাহে, চিন্তায়, যত্নে, অর্থে ও পরিশ্রমে এবং বহু লাঞ্ছনা ও দুঃখ বরণের ফলে কংগ্রেস বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা ও শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, প্রধানতঃ তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোক। তাহা হইলেও, কংগ্রেস কখনও তাঁহাদের কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সমর্থন করেন নাই; সাম্প্রদায়িক অনেক ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও হিন্দুদিগকে হিন্দুসভার মধ্যবর্ত্তিতা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কংগ্রেস, যে জাতীয়তার আদর্শ বহু পরীক্ষার মধ্যেও রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা মুখে বলিয়াছেন বটে, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর-বিরোধী দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিয়া তাঁহারা এই মধ্যপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা অথবা অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করেন নাই; প্রত্যেক স্বাজাতিক ভারতবাসীর যাহা দাবী করা উচিত ছিল, তাঁহারা তাহাই করিয়াছেন। এমন কি হিন্দুসভাও সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, কাজেই, 'দেখিতে অসাম্প্রদায়িক' তাঁহাদের এই দাবী পূর্ণ হইলে, তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থই কার্য্যতঃ সিদ্ধ হইত, এরূপ কথাও তাঁহাদের বিরুদ্ধে বলা যাইবে না, কারণ, যে সকল প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাল্প সে সকল প্রদেশেও তাঁহারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ চাহেন নাই। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যাহা হওয়া উচিত ছিল, হিন্দু ও অন্যান্য কোন কোন সম্প্রদায়ের দাবী যখন ঠিক তাহাই হইয়াছে, তখন এই দাবীকে হিন্দুর দাবী না বলিয়া, স্বাজাতিক ভারতীয়দের দাবী বলা যাইতে পারে। স্বাজাতিক মুসলমানদেরও অনেকে ইহার সমর্থন করিয়াছেন। কাজেই, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেসকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, ন্যায়তঃ সে কথা বলা চলে না। বরং এই কথা বলা চলে, শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক মনোভাববিশিষ্ট মুসলমানদের অন্যায় জেদের নিকট তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই

কার্য্য আরও এই কারণে অধিকতর অন্যায় হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা তাঁহারা স্বাজাতিক ভারতবাসীদের একান্ত ন্যায়সঙ্গত দাবীকে, মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবীর বিপরীত প্রান্তের সাম্প্রদায়িক দাবী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

মুসলমানদের সম্পর্কে কংগ্রেস অবশ্য বরাবরই এই প্রকার দুর্ব্বলতা দেখাইয়া আসিয়াছেন। তাহার কারণ, কংগ্রেস দেশের যে-রাষ্ট্রিক মুক্তি চাহিতেছেন, তাহার জন্য সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা প্রয়োজন। মুসলমানদের মধ্য হইতে স্বাজাতিক নেতা কেহ কেহ বাহির হইলেও, সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানেরা রাষ্ট্রিক আন্দোলন হইতে দূরে রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই বিশিষ্ট গুণটির (?) দোহাই দিয়া সরকারের নিকট হইতে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই, ইঁহাদিগকে হাত করিবার জন্য কংগ্রেসকে বরাবর দুর্ব্বলতা দেখাইতে হইয়াছে। কিন্তু, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারা উচিত ছিল যে, এই প্রকার নীতির দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না—বরং ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা বাড়িয়াই যাইবে। ইহাতে আপাত লাভ যদি কিছু হয়ও, তাহা হইলেও, জাতীয়তার অক্ষুণ্ণ আদর্শের দ্বারা ভবিষ্যতে জাতির যে লাভ হইতে পারিত, তাহার তুলনায় ইহা নিতান্তই নগণ্য।

কোন্‌টি অধিক ক্ষতিকর—শ্বেতপত্র না সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

শ্বেতপত্রে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র এইজন্য গ্রহণীয় না হইতে পারে যে, ইহাতে আমাদের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুমাত্র প্রতিফলিত হয় নাই। ইহাতে আমাদের সুখ সুবিধা ও অধিকার বিশেষ কিছু বাড়িবে না, অথচ ইহা পোষণ করিবার জন্য আমাদিগকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইবে, ইহার পশ্চাতে আমাদের শ্রম ও উৎসাহের অপব্যয় কম হইবে না এবং ইহাতে স্বরাজতন্ত্রের ছায়া আছে বলিয়া ইহা অনেককে অধিকতর রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের চেষ্টা হইতে বিরত করিবে।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা আমাদের মধ্যে জাতীয়তার বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করিবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে, কোন কোন সম্প্রদায়ের অনুকূলে পক্ষপাত দেখান হইয়াছে এবং অন্য কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া ইহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ এবং বিদ্বেষের সৃষ্টি হইবে, এবং তাহা আমাদের রাষ্ট্রিক ভবিষ্যৎকে বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিবে।

বর্ত্তমানের মূল্য কোন সময়েই কম নহে; রাষ্ট্রেও বর্ত্তমান লাভালাভের মূল্য জাতির পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু, যাহা জাতির ভবিষ্যতে বড় হইবার এবং শক্তিশালী হইবার পথে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহার ক্ষতি করিবার ক্ষমতাকে অধিক ভয় করিতে হয়। শ্বেতপত্রে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অংশ বাদ দিলে, ইহার অবশিষ্ট ভাগের ফলাফল অনেকটা বর্ত্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ও বাঁটোয়ারার কুফল শুধুমাত্র বর্ত্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কলহ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি করিবে যাহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একযোগে রাষ্ট্রিক প্রগতির চেষ্টা করা সম্ভবত অসম্ভব হইবে। এই জন্য জাতির উপর ইহার ক্ষতিকর প্রভাবকে কোনক্রমেই অবহেলা করা জাতির উন্নতিকামী কোনও লোক বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই উচিত হইত না; ভারতবর্ষে জাতীয়তার প্রবর্ত্তক ও পরিপোষক, আমাদের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পক্ষে ত উচিত হয়ই নাই। বিশেষ দৃঢ়তার সহিত, অন্য কোনও আপাত সুবিধার কথা না ভাবিয়া, তাঁহাদের ইহার বিপক্ষে মত দেওয়া উচিত ছিল। তাহাতে তাঁহাদের নৈতিক শক্তির হ্রাস ঘটিত না, সকল সম্প্রদায়ের স্বাজাতিক লোকদের বিশ্বাস তাঁহাদের উপর অটুট থাকিত এবং কংগ্রেসের ভিতর হইতেই বিরুদ্ধতা এবং সমালোচনার সম্মুখীন হইতে না হওয়ায়, সম্ভবতঃ সাময়িক লাভও তাঁহাদের বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক হইত।

শ্বেতপত্র বাতিল হইলে বাঁটোয়ারা বাতিল হইবে কি না

শ্বেতপত্রের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় সফল হইতে পারে এবং কোনও সম্প্রদায়ের

লোকের স্বার্থ (?) যাহাতে উপেক্ষিত না হয়, সেইজন্য, বাঁটোয়ারা প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেইজন্যই ইহা প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়াছে। এইজন্য সংস্কারের প্রস্তাব বাতিল হইবে, বাঁটোয়ারা আপনা হইতেই বাতিল হইয়া যাইবে, সে কথা সত্য।

শাসনতন্ত্র যাহাতে দেশের লোকের কাছে আরও অধিক দায়ী হয় এবং দেশের লোক যাহাতে আরও নানাবিধ রাষ্ট্রিক অধিকার বর্দ্ধিত পরিমাণে পায়, বর্ত্তমান অবস্থা সত্ত্বেও হয়ত তাহার জন্য দেশের সকল সম্প্রদায় একযোগে চেষ্টা করিতে পারেন, কারণ তাহাতে সকলেরই স্বার্থ আছে। যদিও বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অবস্থার উদ্ভব হওয়া খুবই সম্ভব যাহাতে কোনও প্রকার মিলিত চেষ্টার সুযোগ থাকিবে না। কিন্তু, এ সকল সত্ত্বেও যদি অধিকতর অধিকার লাভের আশায়, শ্বেতপত্র বাতিল করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও, বিশেষ সুবিধা পাইবার ফলে, সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্বন্ধে এরূপ লুব্ধতার সৃষ্টি হইবে যাহাতে, যে কোনও শাসনতন্ত্রই প্রতিষ্ঠার কথা হউক না কেন, তাহাতে কোন্ সম্প্রদায়ের কতটুকু স্বার্থ থাকিবে, তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি চলিবে।

কাজেই, যদিও বা শ্বেতপত্র বাতিল হইলে, বাঁটোয়ারা বাতিল হইয়া যায়, তবুও, ইহাতে যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সৃষ্টি হইল, এবং কংগ্রেস তাহাকে পরোক্ষে স্বীকার করিয়া নেওয়ায় ইহা এতটা শক্তি পাইল, যে, শীঘ্র এই দুর্দ্দৈবের অবসান হইবে, এরূপ মনে হয় না।

কংগ্রেস ও স্বাজাতিক দল

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবে বর্জ্জন করিতে না পারিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে অন্যায় করিয়াছেন ও দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা, আমরা পূর্ব্বে আলোচিত কারণ সমূহের জন্য নিঃসন্দেহে মনে করি। কংগ্রেস মতাবলম্বী এবং কংগ্রেস কর্ম্মীও অনেকে এই কথা মনে করিয়াছেন। আমরা এ কথাও মনে করি যে, কোনও প্রতিষ্ঠানের নীতি, আদর্শ বা কার্য্য কাহারও বিবেক বা মত বিরুদ্ধ হইলে, সেই প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা ও অধিকার সকল লোকেরই আছে।

আর যদি কেহ কোন প্রতিষ্ঠান ও আদর্শকে বিশেষভাবে ভালবাসেন এবং দেশের প্রয়োজনের পক্ষে সেই প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন, অথচ দেখিতে পান যে, তাঁহার প্রিয় প্রতিষ্ঠানটি চিরদিনের আদর্শ হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে তখন, প্রতিষ্ঠানটিকে পুনরায় যথাস্থানে আনিবার জন্য তিনি সর্ব্ববিধ নিয়মানুগ উপায়ে চেষ্টা করিতে পারেন। ইঁহাদের উপর জনমতের চাপ দিবার চেষ্টা করিতে পারেন বা যাঁহাদের দ্বারা ইহার নীতি নির্দ্ধারিত ও কার্য্য পরিচালিত হয়, তাঁহাদের প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

পণ্ডিত মালবীয় ও শ্রীযুক্ত আণে বর্ত্তমান অবস্থায় যদি কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করা অসম্ভব মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে, সেজন্য তাঁহাদিগকে কেহ দোষ দিতে পারিবেন না। কিন্তু, তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী যে স্বাজাতিক দলটি গড়িয়া তুলিলেন, কংগ্রেস নেতা হিসাবে, দেশের শক্তিশালী কর্ম্মী হিসাবে তাঁহাদের সে কার্য্য সমর্থনযোগ্য কিনা, তাহা বিশেষভাবে বিচার্য্য। একথা সত্য যে, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাহীন উদার জাতীয় আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এ পর্য্যন্ত কংগ্রেস কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন এবং এই আদর্শই প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ এবং ইহার শক্তির উৎসস্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু, তাই বলিয়া এ কথা সত্য নহে যে, যে কোনও প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের আদর্শ লইয়া দাঁড়াইলেই, তাহা কংগ্রেসের ন্যায় শক্তিশালী হইবে অথবা ইহার ন্যায় কাজ করিবার সামর্থ্য ও সুযোগ পাইবে। কংগ্রেসের এই আদর্শের পশ্চাতে বহু সহস্র লোকের বহু দিনের যে দুঃসাধ্য সাধনা রহিয়াছে তাহাই কংগ্রেসকে ইহার বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা এবং শক্তি দান করিয়াছে। রাষ্ট্রিক প্রগতির জন্য আমাদিগকে যখনই শক্তির পরিচয় দিতে হইবে তখনই, সেজন্য আমাদিগকে কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কংগ্রেসের কোন সাময়িক ভুলের জন্য এমন কোন কার্য্য যদি কেহ করে, যাহাতে কংগ্রেসের শক্তি

অথবা সম্মানের হানি হয়, তাহা হইলে তাঁহার সে কার্য্যের দ্বারা দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে।

আমরা যতটুকু রাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করিয়াছি, তাহা কংগ্রেসের মধ্য দিয়া নিয়মানুগ উপায়ে আমরা যে শক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছি সেইজন্য সম্ভব হইয়াছে। আমাদের এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির হ্রাস ঘটিলে, আমরা সেই অধিকার রক্ষা করিতে পারিব কি না, অথবা আরও লাভ করিতে পারিব কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। কংগ্রেসের আদর্শই প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস, কংগ্রেসের নামের বিশেষ কোন মূল্য নাই, একথা সত্য নহে। দেশের লোকের উপর কংগ্রেসের নামের যে প্রভাব রহিয়াছে, বাহিরের লোকের নিকট ইহার নাম যে মর্য্যাদা লাভ করিতেছে, এবং যে ব্রিটীস সরকারের উপর ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে, সেই ব্রিটীশ সরকার যাহাদের মতের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই গ্রেট ব্রিটেনের জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের নামের যে সামান্য পরিচয় আছে তাহা, আমরা সহজে উপেক্ষা করিতে পারি না। কংগ্রেসের নামকে আমরা সহজেই উপেক্ষা করিতে পারিতাম যদি বুঝিতাম, কংগ্রেস কোন একটি বিশেষ ব্যাপারে আদর্শচ্যুত হইবামাত্র অন্য কোন নবসৃষ্ট দল সেই আদর্শ গ্রহণ করিলে, কংগ্রেসের সকল শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং এই নবসৃষ্ট দল সেই শক্তির অধিকারী হইবেন।

কাজেই, কংগ্রেসের নাম প্রকৃত কংগ্রেস নহে, ইহার আদর্শই মাত্র ইহার সব, একথা সত্য নহে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহা সত্য হইবারও নহে। এই প্রকার কথা বলিয়া জনসাধারণের মনে মিথ্যা মোহের সৃষ্টি করা হইতেছে মাত্র।

এই প্রকার কার্য্য এবং উক্তির দ্বারা যে কোন সময়েই কংগ্রেসের এবং ফলে দেশের ক্ষতি হইতে পারিত, কিন্তু, বর্ত্তমানে কংগ্রেস যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ সাধারণ সময় অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় যদি দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেস জয়লাভ না করিতে পারেন, তাহা হইলে, ইহার শক্তি সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে সন্দেহ জাগিবে, বিদেশীদের মনে ইহার সব কথাবার্ত্তা এবং দাবী-দাওয়া অসার বলিয়া ধারণা জন্মিবে এবং প্রতিপক্ষীয়দের নিকট কংগ্রেস হাস্যাস্পদ হইবেন।

কাজেই, যাঁহারা কংগ্রেসকে ভালবাসেন এবং এখনও কংগ্রেসের নামে কাজ করিতে চান, কংগ্রেসের কোন কার্য্য তাঁহাদের বিবেক-বিরুদ্ধ হইলে, তাঁহারা ইহার সংশ্রব আপাতত ত্যাগ করিতে পারিতেন, এবং নিজেদের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করিয়া, প্রকাশ্য সাধারণ অধিবেশনে, কংগ্রেসকে তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। অথবা কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াও, নিজেদের মতকে ভিত্তি করিয়া একটি দলের সৃষ্টি করিতে পারিতেন এবং ক্রমে দলবৃদ্ধির দ্বারা নিজেরা প্রাধান্য লাভ করিতে পারিতেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং শ্রীযুক্ত এম এস আণে যে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাহার প্রতি সহানুভূতি থাকিলেও এবং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তিতর্ক ঠিক বলিয়া মানিলেও, তাঁহারা একটি পৃথক দল গড়িয়া কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কোন প্রকারে সমর্থনযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি না।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় বাঙ্গালী হিন্দুদের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবিচার করা হইয়াছে, এবং ইহার অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বাদ দিয়া এজন্যও ইহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের তীব্র অসন্তোষ আছে। এই কারণে বাংলাকে হাত করা সহজ হইতে পারে, সম্ভবতঃ এই আশায়, সে চেষ্টা কৌশলের সহিত চালান হইতেছে। বাঙলা অথবা বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতি অবিচারের জন্য ইহার পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইতে দেখা যায় নাই, তাঁহারা যে সহসা আজ বাংলাকে প্রাধান্য দিতেছেন, তাহার পশ্চাতে রাজনীতিক চা'ল আছে।

সম্প্রদায় হিসাবে যাহাতে বাঙ্গালী হিন্দুর ক্ষতি হইতে পারে, এমন কোন ব্যাপারের প্রতিই কোন হিন্দুর প্রীতি থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু, তাই বলিয়া, তাহার প্রতিকারে এমন কোন কার্য্য করা সঙ্গত হইবে না, যাহাতে কোন দিক দিয়া সমগ্র জাতির কোন ক্ষতি হইতে পারে। কারণ, জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে, হিন্দু বা মুসলমান কাহারও স্বার্থ রক্ষা হইবে না।

স্বাজাতিক দল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত কিনা

কোন প্রতিষ্ঠান বা দলের সদস্যেরা নিজ প্রতিষ্ঠান বা দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া এবং অবশ্য পালনীয় নিয়মগুলি মানিয়া ঐ প্রতিষ্ঠান বা দল হইতে কোন আদর্শ বা নীতির উচ্ছেদের জন্য অথবা কোন নূতন আদর্শ বা নীতি প্রবর্ত্তনের জন্য দল বাঁধিতে পারেন। কিন্তু, কোন প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দিষ্ট নীতি এবং কর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধতা করিবার জন্য তাহার কোন কোন্ সদস্য তাহার সহিত যদি সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সেই প্রতিষ্ঠানকে নানাদিক দিয়া লঘু করিবার কার্য্যে সহায়তা করেন এবং বাহির হইতে দল বাঁধিয়া তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন তাহা হইলে, তাঁহাদের কার্য্যকে সেই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য বা সেই দলকে সেই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে না। স্বাজাতিক দলটিকে এইজন্য কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সারা ভারতের কংগ্রেসের প্রতিনিধি স্থানীয়; যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস হারাইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন, অথবা যে পর্য্যন্ত না সাধারণ অধিবেশনে ইঁহাদের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়, এবং নূতন ওয়ার্কিং কমিটি আসিয়া নূতন সিদ্ধান্তানুযায়ী কাজ না করিতে পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীর অবশ্য প্রতিপাল্য। ইহা মানিবার ইচ্ছা না থাকিলে, কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু, ইঁহারা তাহা না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ইঁহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইলেই মাত্র ইঁহারা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। ইঁহারা শুধুমাত্র কংগ্রেসের সভ্য বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন লাভ না করা পর্য্যন্ত, কংগ্রেসের নামে কোন কংগ্রেস বিরোধী কাজ করিতে পারেন না। এরূপ অধিকার থাকিলে যে কোন স্থানের কতকগুলি কংগ্রেস সভ্য মিলিয়া যে কোনও প্রকার কার্য্য কংগ্রেসের নামে করিতে পারিতেন। স্বাজাতিক দলের কতকগুলি সদস্য যদি স্বাজাতিক দলের নাম করিয়া নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী নীতি এবং কর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণ করিতেন; তাহা হইলে পণ্ডিত মালবীয় কি তাঁহাদের কার্য্যকে সমর্থন করিতেন।

কংগ্রেসের নাম আমাদের রাষ্ট্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার এমন প্রতীকস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, কাহারও পক্ষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সাফল্য লাভ করা বা কংগ্রেসের ক্ষতি করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং শ্রীযুক্ত আণে উভয়েই বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা বলিয়া এবং ইঁহাদের নামের সহিত কংগ্রেসের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া, ইহাদের পক্ষে এই কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। ইঁহারা যে খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের মধ্য দিয়া করিয়াছেন বলিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইঁহাদের শক্তি প্রয়োগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।

বাংলা সংবাদপত্রের অভাব

আমরা কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত নহি; তাহা হইলেও, দেশ রাষ্ট্রনীতিক প্রগতির পথে অগ্রসর হ'ক ইহা সকল ভারতবাসীর ন্যায় আমরাও কামনা করি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও চাই যে, সর্ব্বপ্রকার প্রগতিমূলক চিন্তার সহিত দেশের পাঠক সাধারণের সংযোগ থাকুক এবং সর্ব্বপ্রকার মতামতের সহিত পরিচয়ের মধ্য দিয়া তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ক স্বাধীন মতামত গড়িয়া উঠুক।

অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায় আমাদের দেশে সংবাদপত্র জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রবেশ করিতে পারে নাই; দেশে শিক্ষার অভাই ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। শিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত লোকের মধ্যে গণজীবন ও বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য কম বলিয়া, দেশের সাধারণ লোক দরিদ্র বলিয়া, খবরের কাগজ পড়িতে পারেন, এমন সকল লোকেই অবশ্য কাগজ পড়েন না। তাহা হইলেও, আমাদের দেশে গণজীবন দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে এবং নানাবিষয় সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া সংবাদপত্রের পাঠক কয়েক বৎসরের মধ্যে আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও ভাল বাংলা সংবাদপত্র ছিল না বলিলেই হয়, এবং ইহার পাঠক সংখ্যাও

নিতান্ত নগণ্য ছিল। কিন্তু, বর্ত্তমানে দেশের উপর বাংলা সংবাদপত্রের প্রভাব উপেক্ষা করিবার মত নহে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন ও ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতে পারেন, তাঁহারা প্রধানতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত বলিয়া, সহসা তাঁহাদের কোন একটি বিশেষ মতের দ্বারা চালিত হইবার সম্ভাবনা কম। একমাত্র বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যবর্ত্তিতায় সকল প্রকার মতামত জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছিতে পারে।

বাংলার বর্ত্তমান কংগ্রেসী দলের কোন বাংলা দৈনিক না থাকায়, জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের মত ও কর্ম্ম-পদ্ধতির কথা প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। বাংলার হিন্দুদেরও একখানা বাংলা দৈনিক থাকা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টা

দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত সাব-কমিটির সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর, ডাঃ আর, সি, মজুমদার এবং ডাঃ মহম্মদ সহীদুল্লা, শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় আজিজুল হকের সহিত দেখা করিয়া অবিলম্বে দেশীয় ভাষা প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতার কথা দৃঢ়তার সহিত বলেন। ইঁহাদের সুপারিশ অনুসারে কাজ করা হইবে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এরূপ আশ্বাস প্রদান করেন।

বাংলার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে বাংলার প্রবর্ত্তন হইলে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন জীবন দেখা দিবে আশা করা যাইতে পারে। ইংরাজী ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ও ইংরাজীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া, ইংরাজীর চাপে এবং ইংরাজী জ্ঞানের অভাবে শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি ছাত্রদের ভালভাবে আয়ত্ত হয় না—এবং নানাকারণে চিত্তক্ষেত্রে অনুর্ব্বর রহিয়া যায়।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের স্বাভাবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিবার অন্য কিছু না থাকিলেও, কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন যে, ইংরাজীর জ্ঞান কমিয়া গেলে, আমাদের চাকরি পাওয়া উকিল হওয়া এবং আরও দু'একটি কাজে উপযুক্ততা লাভ করা কষ্টকর হইবে। কিন্তু, একথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার যে, কোনও জাতির শিক্ষানীতি, ভাল চাকুরে প্রস্তুত করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত হয় না। শিক্ষায় যদি আমাদের অধিকতর মানসিক উপযুক্ততা লাভ হয়, জীবন যুদ্ধে জয়ী হইবার পক্ষে আমরা অধিকতর যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কেহ কেহ এমন কথাও মনে করেন যে, ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের সম্বন্ধ শিথিল হইলে, তাহা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইতে পারে; কারণ, ইংরাজী সাহিত্য হইতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য তাহার প্রেরণা এবং সমৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ইংরাজীকে বাদ দেওয়া হইতেছে না, অথবা তাহাকে কোণঠাসা করিয়াও রাখা হইতেছে না। যদিও এইপ্রকার ব্যবস্থার দ্বারাই মাত্র, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিসমূহের প্রকৃত সংশোধন হইতে পারিত।

একদিন ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমাদের ছিল। কিন্তু, এতদিনের ইংরাজী শিক্ষার ফলে বর্ত্তমানে আমরা যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছি, তাহাতে শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার উপর নির্ভর করিবার সময় আসিয়াছে।

সাহিত্য ইংরাজী-শিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের দ্বারা পুষ্ট হয় না। যাঁহাদের নিকট হইতে সাহিত্য, মূল্যবান জিনিস আশা করিতে পারে এমন প্রতিভাশালী লোকেরা যাহাতে ইংরাজী এবং অন্যান্য বিদেশীভাষা শিক্ষা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা সব সময়েই রাখিতে হইবে এবং ইংরাজী শিক্ষার বাধ্যতা সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া গেলেও, নানাকারণে তাঁহারা ইহা শিক্ষা করিবেন ইহা আশা করা অযৌক্তিক নহে।

নারী-নিগ্রহ-মূলক অপরাধ বৃদ্ধি

১৯৩৩ সনের পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে ৩৬৬ ও ৩৫৪ ধারার অন্তর্গত নারী-নিগ্রহের অপরাধের সংখ্যা গত বৎসর ('৩২) অপেক্ষা ৫২টি বেশী হইয়াছে। ১৯৩২ সালে তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা উক্ত দুই ধারায় ৯৪টি অধিক অপরাধ হইয়াছিল; কাজেই দুই বৎসরে বৃদ্ধির সংখ্যা ১৪৬ হইয়াছে। ১৯৩৩ সনে উক্ত দুই ধারায়

অপরাধের সংখ্যা ৭৪৫ হইয়াছে; ইহার মধ্যে ৩৭৬ ধারার অন্তর্গত অপরাধগুলি ধরা হয় নাই। যে সকল অপরাধে বরাবর আদালতে নালিশ রুজু হইয়াছে, যে সকল ক্ষেত্রে আসামীকে চালান দেওয়া হয় নাই, অথবা যে সকল ক্ষেত্রে পুলিশ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নাই, এই রিপোর্ট হইতে সে সকল বাদ পড়িয়াছে।

কিন্তু, দেশে যত নারী নির্য্যাতীতা হন তাঁহাদের প্রকৃত সংখ্যা এতদপেক্ষা অনেক বেশী। ব্যাপার যেখানে নিতান্ত গুরুতর না হইয়া পড়ে, এবং সকলে ঘটনা জানিয়া না ফেলে, সে সকল স্থলে সমাজের ভয়ে লোকলজ্জার ভয়ে লোকে কোন প্রকার অত্যাচারের কথা চাপিয়া যায়। সমাজ ও লোকলজ্জার ভয়ের সহিত, দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারা আরও অত্যাচারিত হইবার ভয়ও অনেক ক্ষেত্রে লোককে প্রতিকারের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করে। যে সকল ক্ষেত্রে নারী অপহৃতা হন, এবং সহজে তাহার কোন খোঁজ না পাওয়া যায়, এমন অনেক ক্ষেত্রেই মাত্র প্রতিকারের চেষ্টা হইয়া থাকে। দারিদ্র্যের জন্য অথবা দুর্ব্বৃত্তদের ভয়ে, এরূপ সকল ক্ষেত্রেও যথোচিত চেষ্টা হয় না। ধর্ষিতা নারীদের সমাজে গ্রহণ করিবার সহজ পথ না থাকায়, অনেক সময় দরিদ্র লোকেরা অপহৃতা আত্মীয়াদের উদ্ধার সাধনে কতকটা উদাসীন হইয়া পড়েন। অশিক্ষিত এবং দরিদ্রলোকদের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, এই প্রকার লোকের কোন আত্মীয়ার উপর যখন অত্যাচার হইয়াছে, এবং ইঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন, অত্যাচারিতাকে সমাজে গ্রহণ করায় নানাবিধ অসুবিধা এবং বিপদের সম্ভাবনা আছে, তখন, দুর্ব্বৃত্তদের নিকট হইতে গোপনে কিছু টাকা লইয়া ইঁহারা সমগ্র ব্যাপারটি চাপিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন না থাকায়, ছেলে বড় এবং উপায়ক্ষম হইবার পূর্ব্বে নারী বিধবা হইলে, অনেকক্ষেত্রেই অসহায় এবং অপরের বোঝাস্বরূপ হইয়া পড়েন। এইরূপ কোন বিধবার উপর অত্যাচার হইলে, তাঁহার পক্ষ হইয়া দৃঢ়তার সহিত লড়িবার মত লোকের অভাব অনেক ক্ষেত্রেই হয়। এ সকলই, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের সংখ্যাবাহুল্যের পরোক্ষ কারণ।

ইহা ত গেল যে সকল ক্ষেত্রে অত্যাচার শেষ সীমায় পৌঁছায়, সেই সকল ক্ষেত্রের কথা। আদালতে যে সকল অপরাধের প্রতিবিধান হওয়া সম্ভব নয়, এমন ছোটখাট অত্যাচার যে কত হয়, বিশেষ করিয়া হিন্দু নারীদের উপর তাহা বাংলার পল্লীজীবনের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন। বাংলার পশ্চিমাংশ ব্যতীত, অন্য সর্ব্বত্র পল্লীতে হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যায় বাস করেন। তাহাও তাঁহারা আবার পরস্পরের সহিত সংযোগহীন বহু শ্রেণী এবং উপশ্রেণীতে বিভক্ত। যে কোন সমাজের যে কোন নারীর উপর অত্যাচার হইলেই যে, সকল ধর্ম্মের এবং সকল সমাজের লোকেরই তাহার প্রতি কর্ত্তব্য আছে, আমাদের মধ্যে এখনও সে বোধ জাগ্রত হয় নাই। কাজেই, এই প্রকার অপরাধের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, লোককে সাধারণত নিজের সামাজিক শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই শক্তিতে দুর্ব্বল বলিয়া, হিন্দুদের অনেকস্থলেই নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। ইহাই হইতেছে দেশের সাধারণ অবস্থা।

প্রতিকারের উপায়

দেশের লোকের পক্ষ হইতে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ নিবারণের জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা চলিলে, সকল সমাজের লোক ইহার প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলে, দুর্ব্বৃত্তেরা নিজ নিজ সমাজে আশ্রয় না পাইলে, অত্যাচারিতাদের সমাজে গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা না থাকিলে, সামাজিক-ভাবে হিন্দু বিধবাদের বিবাহের প্রচলন হইলে, শিক্ষার বিস্তার হইলে, বিশেষ করিয়া নারীদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রসার ঘটিলে, এইপ্রকার অপরাধ নিবারিত হইবে, অথবা বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

কিন্তু, এই সকলের জন্য অবহিত হইয়া চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা সকল লোকেরই থাকিলেও এবং ইহাতে সফলতা লাভ করা অসম্ভব না হইলেও, তাহা নিঃসন্দেহ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। এই দীর্ঘ সময়, অসহায় অবস্থায় নারীরা দুর্গতি ভোগ করিবেন ইহা ন্যায় বা যুক্তিসঙ্গত কথা হইতে পারে না।

কোন সভ্য দেশেই আত্মরক্ষার জন্য লোককে নিজশক্তি বা নিজ সামাজিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় না। আমাদেরও সর্ব্বপ্রকার আত্মরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করা অন্যায় নহে। এই অনাচার এমন আকস্মিক নহে যে ইহা দমন করিবার জন্য সরকার প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই এই প্রকার অপরাধের বাহুল্য সরকারের পক্ষে লজ্জার কথা। যদিও, বর্ত্তমানে পুলিশ ও অন্যান্য রিপোর্ট হইতে, অবস্থার গুরুত্ব কতকটা উপলব্ধি হইতেছে, তবুও, বাংলাদেশে এই প্রকার অবস্থা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বর্ত্তমানে লোকে এসম্বন্ধে কতকটা সচেতন হইয়াছে বলিয়া, পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা পুলিশের গোচরীভূত হইত না, তেমন অনেক ঘটনার প্রতিকারের জন্য লোকে চেষ্টা করিতেছে।

এদিকে যে বর্ত্তমানে সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সুখের কথা। ঢাকায় পুলিশ বাহিনীর এক প্যারেডে বক্তৃতার সময় বাংলার গভর্ণর এজন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের উপর অপরাধ সম্পর্কীয় অপরাধে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করা হইতেছে। কঠোর দণ্ডের বিধান অপরাধ দমনে অনেক সহায়তা করিতে পারে বটে, কিন্তু, তাহার পক্ষে বেত্রদণ্ড বিশেষ পর্য্যাপ্ত বলিয়া আমরা মনে করি না। ইহার সহিত অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার এবং এই প্রকার ব্যাপারে যাহারা পরোক্ষে সহায়তা করে, অথবা কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহাদেরও কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা, কতকটা ফলপ্রদ হইতে পারে।

কিন্তু, আমরা মনে করি, এবিষয়ে পুলিশের তৎপরতা এবং আন্তরিক চেষ্টায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীর অপরাধের সংবাদ পাইবামাত্র যদি পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়, অপরাধীদের অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে, এবং অত্যাচারিতেরা প্রতিকারেচ্ছু হইলে, যাহাতে তাহারা সামান্য মাত্রও বিপন্ন না হয়, এরূপ ব্যবস্থা কঠোর ভাবে অবলম্বন করে, তাহা হইলে অপরাধের সংখ্যা নিশ্চয়ই কমিবে। এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে যাহাতে পুলিশ বাধ্য হয়, এরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আশু ফলপ্রদ হইবে বলিয়া আশা করা অন্যায় নহে।

ডাঃ লঙ্কাসুন্দরমের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের গুরুত্ব যাহাতে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, ভারতের বহির্দেশিক সমস্যাসমূহের প্রতি যাহাতে আমরা মনোযোগী হইতে পারি, ভারতবর্ষের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রহিয়াছে ভারতের বাহিরের এমন সকল ব্যাপারের সংবাদ এবং তথ্যের সহিত যাহাতে আমাদের ভালভাবে পরিচয় থাকে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যাহাতে ভারত সম্পর্কীয় সমস্যাসমূহ ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করিতে পারেন, এসকল বিষয়ক পুস্তক, দলিল, প্রমাণ ও তথ্য সমূহ যাহাতে সংগৃহীত হয়, ও তাহা উৎসুক পাঠকেরা পাইতে পারেন, তাহার জন্য, কোন একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া, ভালভাবে চেষ্টা চালাইবার প্রয়োজন আছে।

ডাঃ লঙ্কাসুন্দরমের "ইন্‌ষ্টিটিউট অব ইণ্টারন্যাশান্যাল য়্যাফেয়ার্স" এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ও কর্ম্মতালিকানুযায়ী কাজ হইলে, ইহা আমাদের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিবে এবং জাতীয় উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

ইঁহারা অন্যান্য কাজের মধ্যে, এই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় পত্রিকাদি প্রকাশ করিবেন, ভাল পুস্তকাগার রাখিবেন, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের এই প্রকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত যোগ রক্ষা করিবেন, এবং এই সকল বিষয়ে ভালভাবে শিক্ষাদান করিবার জন্য, গ্রীষ্মকালীন স্কুল চালাইবেন ও সম্ভব হইলে বিভিন্ন বৎসরে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই স্কুল খুলিবার ব্যবস্থা করিবেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ

পৃথিবীর কোন দেশেরই রাজনীতি এবং ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সমগ্র পৃথিবীর ঘটনাসমূহের প্রভাব বহির্ভূত নহে। ভারতবর্ষেরও রাষ্ট্রিক এবং অন্যবিধ উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ এবং পৃথিবীর জনমতকে

আমরা কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারি না। এ কথা সাধারণভাবে আমরা অনেকেই বুঝি কিন্তু, ইহার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী, সে কথা যখনই কেহ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গিয়াছেন; তখনই তিনি তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের উন্নতি যাঁহাদের স্বার্থের বিরোধী, তাঁহারা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিরূপ উদ্যমের সহিত চেষ্টা করিতেছেন, তাহা দেখিয়াও ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের কতকটা ধারণা জন্মিতে পারে। ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে কি ভাবে কি প্রকার মিথ্যা প্রচারিত হয়, তাহার অনেক প্রমাণ অনেকের উক্তি হইতেই দেওয়া যাইতে পারে, এখানে সুভাষচন্দ্রের কিছুদিন পূর্ব্বের একটি বিবৃতির কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"অনেক দেশে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদিগের বিরুদ্ধে কেন; ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অস্পৃশ্যদিগের স্বার্থের বিরুদ্ধতা করিবার জন্য কেন তিনি উপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন? গত বৎসর যখন ভিয়েনায় আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম ইহা প্রশ্নকর্ত্তার অজ্ঞতা-প্রসূত। কিন্তু, পরে যখন একই প্রশ্ন অন্যান্য নানাদেশে আমাকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইতে লাগিল, তখন আমি আবিষ্কার করিলাম যে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে ইউরোপের সকল দেশেই ইহা প্রচারিত হইয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদিগের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন।

"মহাত্মা গান্ধীর সুনামের আরও হানি করিবার জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে ইউরোপের সকল দেশেই এই কথা প্রচারিত হইয়াছিল যে, মহাত্মা গান্ধী কমিউনিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইউরোপের সকল দেশই তীব্রভাবে কমিউনিষ্ট বিরোধী বলিয়া, এইরূপে তাঁহার এবং ভারতীয় জাতীয়দলের সুনাম নষ্ট করিবার জন্যই এই প্রচার কার্য্য চালান হইতেছিল।

"কলিকাতার মেয়রের পদে এক মুসলমান ভদ্রলোকের নির্ব্বাচন উপলক্ষ্য করিয়া কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার ন্যায় একটা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, এইরূপ সংবাদ ইউরোপীয় সংবাদপত্রসমূহে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।·· ইহা বলার বিশেষ আবশ্যকতা নাই যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়াই রহিয়াছে এবং ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টই এখানে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছেন এই প্রকারের সংবাদ ও প্রবন্ধ ইউরোপের সংবাদপত্রসমূহে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। নীতিকুশল এবং অভিজ্ঞ লোকদের ধারাবাহিক প্রচারের প্রতিকার কল্পে আমার ন্যায় ব্যক্তির চেষ্টা ফলপ্রদ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য আমাদের পক্ষ হইতেও সুব্যবস্থিতভাবে প্রণালীবদ্ধ প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যত শীঘ্র আমরা এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারি, ভারত ও ভারতের স্বার্থের পক্ষে ততই লাভ।"

ভারতবর্ষ অতীতে বরাবরই সমগ্র জগত হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। আমরা এখনও কতকটা এই বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই বাস করিতেছি। কারণ, আমরা যদি আমাদের সমস্যা-সমূহ জগৎবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতাম, এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে যথেষ্ট ঔৎসুক্য জাগাইতে পারিতাম, তাহা হইলে, ৩৫ কোটি লোকের সুখ দুঃখ ও ভাগ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা জগতবাসীর পক্ষে সম্ভব হইত না।



পরলোকে কবি অতুলপ্রসাদ সেন

কবি অতুলপ্রসাদ সেনের মৃত্যুতে বাংলাদেশে এমন একজন দেশপ্রেমিক কবি হারালো, যাঁর বীণায় দেশের জনমনের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা ভাষা ও সুর খুঁজে পেয়েছিল। দেশপ্রীতি ছিল তাঁর কাব্যের মূল সুর; সে কাব্য যে দেশের লোকের মর্ম্মস্পর্শ করেছে, তার প্রমাণ রোজই পাওয়া যায়, যখন বাংলা-দেশের গোধূলি-ধূসর আকাশে বাঙালী গৃহস্থের প্রাঙ্গণ থেকে সুর ভেসে ওঠে—"হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নতশির, নাহি ভয়।"

অতুলপ্রসাদের জীবনের অধিকাংশই কেটেছে প্রবাসে। লক্ষ্ণৌ-এ তিনি আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন, কিন্তু এর জন্য তাঁকে যে-সাধনা করতে হয়েছে, সে-সাধনা কোনো দিনই তাঁর প্রকৃত পরিচয়কে আবরিত করতে পারে নি। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি অণুতে অণুতে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের কবি,—তাই তাঁর প্রবাস জীবনের মধ্যে প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে বাংলা দেশের একটা অনায়াস ও সহজ যোগসূত্র স্থাপিত হবার সুযোগ হ'য়েছিল, এবং এই দিক দিয়ে বৃহত্তর বঙ্গের পরিকল্পনা তাঁর মধ্যে কতকটা রূপলাভ করেছিল। তাঁর মৃত্যুতে বৃহত্তর বঙ্গের যা ক্ষতি হোল, সহজে পূরণ করা যাবে না।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভা একটা বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের অনুসন্ধান করেছিল। প্রবাসী বাঙালীর সাহিত্যিক মুখপত্র 'উত্তরা'র তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া যখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাঁকে আহ্বান করা হ'য়েছে, তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে যোগ দিয়েছেন। বেনারসে ও লক্ষ্ণৌ-এ লিবারেল কনফারেন্সে তিনি দু'বার সভাপতিত্ব করেছিলেন। এ ছাড়াও স্বদেশী প্রচারে, শিক্ষাবিস্তারে হিন্দু মুসলমানের একতা সাধনে তিনি অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করি।

পরলোকগত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী ও বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেন্টের ভূতপূর্ব্ব মুনসিফ গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত ৩রা আশ্বিন সোমবার বৈকাল ৫½ ঘটিকার সময়ে পরলোকগমন করেছেন। বহুদিন হ'তে তিনি গ্যাষ্ট্রিক আলসার রোগে ভুগছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে মাত্র চারদিনের রোগ ভোগের পর মারা যান। গিরীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের খুল্লতাত মাতুল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহোদর এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন। ছোট গল্প লেখক হিসাবে গিরীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। বিচিত্রায় বহুবার তাঁর গল্পাদি প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত বড় কাগজগুলিতেই তাঁর লেখা সর্ব্বদা প্রকাশিত হোত। গিরীন্দ্রনাথ একজন জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙলা সাহিত্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোল।



৺গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গিরীন্দ্রনাথ আমাদের অতি নিকট আত্মীয় ছিলেন শুধু তাই নয়, আশৈশব তাঁর সঙ্গে প্রাণের যোগ; চিরদিনের সাহিত্য-বন্ধু। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা বিহ্বল হয়েছি। তাঁর দেহবিমুক্ত আত্মা অক্ষয় শান্তি লাভ করুক, এই এখন আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

নিখিল-বঙ্গ জলধর সম্বর্দ্ধনা

বাংলার প্রবীণ সাহিত্যিক ও সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুরের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্র বাংলা দেশের পক্ষ হ'তে ত্রিদিবসব্যাপী তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়েছিল। গত ২রা ভাদ্র রবিবার, সেনেট হলে তাঁকে দেশবাসী এবং বিভিন্ন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়। উক্ত উদ্বোধন সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অভিনন্দনের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে যথাক্রমে ক্যালিটা নাট্যপীঠে সাহিত্য সম্মেলন ও এলবার্ট হলে প্রীতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তৃতীয় দিবসে তরুণ সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সান্যালের সুপরিচালনায় ভারতীয় প্রচলিত সঙ্গীতের জলসা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

নিখিল-বঙ্গ জলধর সম্বর্দ্ধনার সাফল্য বাঙলা দেশের জলধর প্রীতির নিদর্শন। আমরাও শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ঈশ্বর কৃপায় তিনি শতায়ু হোন।

শরৎচন্দ্র

আজ আটান্ন বছর পূর্ব্বে ৩১শে ভাদ্র তারিখে বাংলা দেশে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই শুভদিনটি স্মরণ করে আমরা শরৎচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ প্রণিপাত করি।

শরৎচন্দ্রের সাধনায় আধুনিক বাংলা দেশের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি ভাষা লাভ করেছে, দেশ অনেকখানি আত্ম-চেতনা লাভ করেছে। অজ্ঞ মানুষের প্রতি জ্ঞান-সমৃদ্ধ ঋষির আদেশ, "আত্মানং বিদ্ধি"। শরৎচন্দ্র দেশের মধ্যে সেই আত্মবোধ জাগাবার জন্যে অনেকখানি সহায়তা করেছেন। তিনি যে শুধুই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন, তা নয়, আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যেখানে যত সঙ্কীর্ণতা ও গ্লানি আছে, সেগুলোকে তাদের নগ্ন কদর্য্যতায় উদ্ঘাটিত করে সংস্কারের প্রেরণা জাগাবার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কুসংস্কার ও ঔদ্ধত্যের অন্ধকারে আমরা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি যে নিদারুণ অবিচার করে থাকি, তিনি দরদ দিয়ে তার প্রতিবাদ করেছেন। শরৎ-সাহিত্যে আমাদের জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করবার অনেক কিছু উপকরণ আছে, জীবনের সংস্কার ও উন্নতি করবার জন্য অনেকখানি অনুপ্রাণনা আছে। সেই সব স্মরণ করে আজ তাঁর অষ্টপঞ্চাশৎ জন্মদিনে আমরা তাঁকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করে তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র

স্বনামধন্য স্বর্গীয় স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের বাংলার সরকার কর্ত্তৃক ডেপুটি

ডিরেক্টর অব্ ইন্ডাষ্ট্রীজ্ এর পদে নিয়োগে আমরা পরম আনন্দিত হ'য়েছি। এই পদটি অনেকদিন ধরে খালি ছিল, এখন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রকে এই পদে নিযুক্ত করে বাংলার সরকার যে বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সরকারের ইন্ডাষ্ট্রিয়াল্ এঞ্জিনিয়র হিসাবে, গত কয়েক বৎসর ধরে দেশের ছোট শিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করে বেকার সমস্যা সমাধান করবার জন্ম সতীশচন্দ্র যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, তার তুলনা বিরল। এই দিকে গত কয়েক বৎসর ধরে তিনি যা' গবেষণা ও পরীক্ষা করেছেন, তার ফল লিপিবদ্ধ করে তিনি শীঘ্রই "Recovery Plan for Bengal" নাম দিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করছেন। সতীশচন্দ্রের বয়স অল্প, মাত্র ৩৩ বৎসর, কিন্তু তাঁর সাধনা গভীর ও ব্যাপক। তাঁর সর্ববিষয়ে জয়লাভ কামনা করে আমরা তাঁকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বাঁশবেড়িয়ায় স্বায়ত্ত-শাসন মন্ত্রী

বিগত ১২ই আগষ্ট বাংলার স্বায়ত্ত-শাসন মন্ত্রী অনারেবল স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বাঁশবেড়িয়ায় পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার (Water Works) উদ্বোধন, মিউনিসিপ্যালিটীর নবগৃহ, হাঁসপাতাল ও মাতৃ-সদনের দ্বারোদ্ঘাটন এবং স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসি-প্যালিটীর চেয়ারম্যান কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে বাঁশবেড়িয়ায় যে সব উন্নতিকর কার্য্য হয়েছে এবং হচ্ছে, যেমন বাঁশবেড়িয়ায় কলিকাতার মত পীচের রাস্তা, পাকা পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা, জলের কল, বৈদ্যুতিক আলোক, চারিটী নগরোদ্যান (Park), অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা, তিনটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন, দুটী গ্রন্থাগার, একটি শিশু পাঠাগার, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, শান্তিরক্ষক সেনাদল গঠন, হাঁসপাতাল এবং মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা—স্যার বিজয়প্রসাদ সে সকল কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটী, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতি এবং শান্তিরক্ষক সেনাদলের পক্ষ হ'তে তাঁকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। তদুত্তরে মাননীয় মন্ত্রী যা বলেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল—"আপনারা নাগরিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান জন্ম যে সব আধুনিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি বস্তুতঃই আনন্দিত হইয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের এখানে বাসভূমি, সেই বংশ যেমন সম্মানিত বংশধরগণের সংস্কৃতিও তদুপযোগী উচ্চ—তাঁহারা দানধর্ম্মে এবং হিতজনক কার্য্যমাত্রেই অগ্রগণ্য। এই বংশের কার্য্যকুশলতা স্থানীয় প্রতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নিবিড় ভাবে দেদীপ্যমান, তাঁহাদের বাদ দিয়া বাঁশবেড়িয়ার কথা কেহ ভাবিতে পারে না। আপনাদের কলের জল সরবরাহের কৃতকার্য্যতায় আমি বিশেষভাবে আনন্দিত।



বাংলার স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী-কর্তৃক বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন
মধ্যস্থলে—মন্ত্রী স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বামদিকে—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ তোমাস্ ম্যাক্‌ফার্লেন্ দক্ষিণে—মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম্, এস্, সি

সরকার এইজন্ত বত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন আর বাকী টাকা চাঁদা তুলিয়া দেওয়ায় বিনাকর্জ্জে কাজটী সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সদনুষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটীর বড় রকম উন্নতি সূচিত করিতেছে, এই কার্য্যের দ্বারা নাগরিক সভার প্রাথমিক কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। আপনাদের জলনিকাশ সংক্রান্ত (Drainage Scheme) ব্যবস্থায় সরকারের সাহায্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে। স্বাস্থ্যোন্নতির ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। আপনাদের মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়ায় দুইটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। আপনারা রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোক দিতেছেন—সরকার যেজন্য কর্জ্জ দিতে পারেন, বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে অর্থ সাহায্য করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নহে। আপনারা নাগরিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নগরোদ্যান স্থাপনে এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী দেখিয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এই সব উন্নতিকর কার্য্যের দ্বারা আপনারা অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন।" হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন, "বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন এবং বঙ্গীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইন দ্বারা গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিপোষণ জন্য আপনারা যে সুব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন আমি তাহা অনুমোদন করিতেছি। যাঁহারা শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে সমুৎসুক, লাইব্রেরী আন্দোলনকে সমর্থন করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আইনের সংশোধন দ্বারা আপনারা বিশেষতঃ আপনাদের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, এম্, এল্, সি যে মহৎ আন্দোলন চালাইতেছেন তাহাকে শক্তিমান করিয়া তোলাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। লাইব্রেরীগুলির উন্নতিকল্পে কুমার মুনীন্দ্রদেবের প্রচেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আপনাদের প্রস্তাব মত আমি স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহে বিজ্ঞপ্তি জারির দ্বারা সংশোধিত আইনের লাইব্রেরী সংক্রান্ত ধারাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।" বাঁশবেড়িয়া শান্তিরক্ষক সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে তিনি তাঁহাদের নিঃস্বার্থ জনসেবার কার্য্যের প্রশংসা

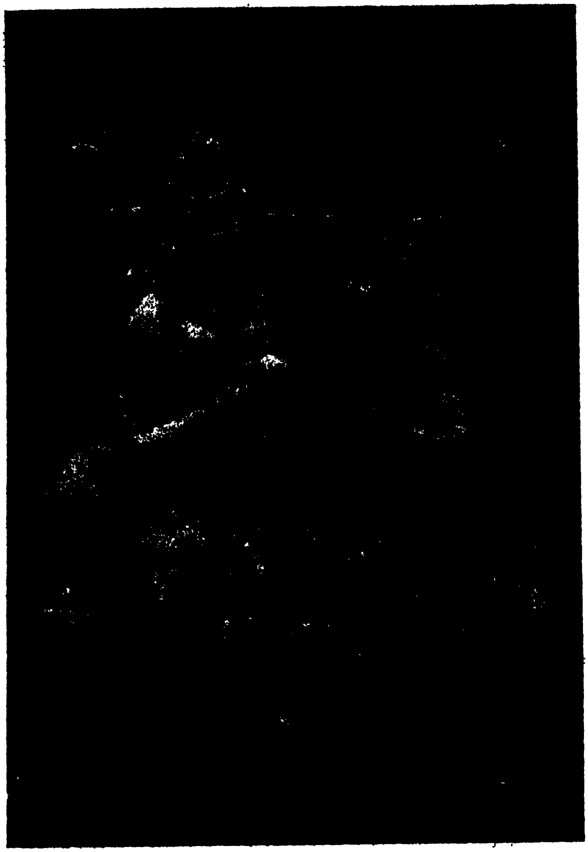


বিগত ১২ই আগষ্ট অনারেবল ডাঃ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কর্তৃক বাঁশবেড়িয়া জল সরবরাহ ব্যবস্থা (Water Works) উদ্বোধন, হাসপাতাল ও মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা
উপবিষ্ট—মধ্যস্থলে স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রী, বামদিকে হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, ম্যাকফার্সন্ ও ডানদিকে—মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম, এল, সি ও পশ্চাতে মিউনিসিপাল কমিশনারগণ

করেন। বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী ও শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে এই হিতজনক অনুষ্ঠানে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভ্রম সংশোধন

গত ভাদ্রমাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত 'পরলোকে প্রকৃতি দেবী' প্রবন্ধের 'পুরুষ ও প্রকৃতি' নামক চিত্রের চিত্র



পুরুষ ও প্রকৃতি
প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত নিতাই পাল কর্ত্তৃক প্রকৃতি দেবী অঙ্কিত 'পুরুষ ও প্রকৃতি' নামক ছবির রূপান্তরিত মূর্ত্তির প্রতিলিপি

পরিচয়ে লেখা হয়েছিল, "প্রকৃতি দেবী অঙ্কিত 'পুরুষ ও প্রকৃতি' নামক ছবিখানি প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি-শিল্পী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর পাল মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। তাহা হইতে প্রতিলিপি লইয়া উপরের ছবিটি প্রস্তুত।" উক্ত পরিচয়ে 'প্রসিদ্ধ মূর্ত্তিশিল্পী শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল'এর পরিবর্ত্তে অনবধানবশত 'প্রসিদ্ধ মূর্ত্তিশিল্পী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর পাল' মুদ্রিত হয়েছিল। এই অনিচ্ছাকৃত ভ্রমপ্রমাদের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত এবং নিতাইবাবুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। সাধারণের সম্যক অবগতির জন্য ছবিটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হ'ল।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যসম্মেলন কার্য্যকরী পরিষদ্ কলিকাতা অধিবেশন

এ বৎসর বড় দিনের অবকাশে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন কলিকাতায় হবে এ কথা সকলেই অবগত আছেন। এই অধিবেশনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য চেষ্টিত হওয়া প্রত্যেক বঙ্গবাসীর কর্ত্তব্য। বাঙ্গলার প্রবাসী আত্মীয় বাঙ্গলায় যেন যথোচিত মর্য্যাদা এবং সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা লাভ করতে পারেন। তদুদ্দেশ্যে একটি যে পরিষদ্ গঠিত হয়েছে, প্রচার বিভাগের সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে আমরা তা নিম্নে প্রকাশিত করলাম।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত
„ তুষারকান্তি ঘোষ
„ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
„ সত্যেন্দ্রকুমার বসু
„ প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র
„ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
রায় জলধর সেন বাহাদুর
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী
„ সরলা দেবী চৌধুরাণী
„ মানকুমারী বসু
মৌলানা আক্রাম খাঁ

খান্ বাহাদুর আহ্সান উল্লা
রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী
" নলিনীরঞ্জন সরকার
" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" মৃণালকান্তি বসু
" অনিলকুমার দে
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
" মতিলাল রায়
সাধারণ সম্পাদক—ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায়
সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ—কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
কার্য্যকরী সমিতির সভ্য—অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র মিত্র
ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী
খান্ বাহাদুর আহ্সান উল্লা
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু
সম্পাদক—প্রচার বিভাগ—শ্রীযুক্ত সুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী
" অভ্যর্থনা " " সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
" মণ্ডপ ও আমোদপ্রমোদ " বিধুভূষণ প্রামাণিক
" অর্থ বিভাগ " সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
" স্বেচ্ছাসেবক " ব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্র
" প্রদর্শনী " গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" সাহিত্য " প্রিয়রঞ্জন সেন
" রন্ধনশালা " নরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী

শিল্পী শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

উদীয়মান চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্ত বিচিত্রার এবারকার মনোহর প্রচ্ছদটি অঙ্কিত ক'রে দিয়ে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। আমরা অজিতকৃষ্ণের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মেসিউটিকেল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্

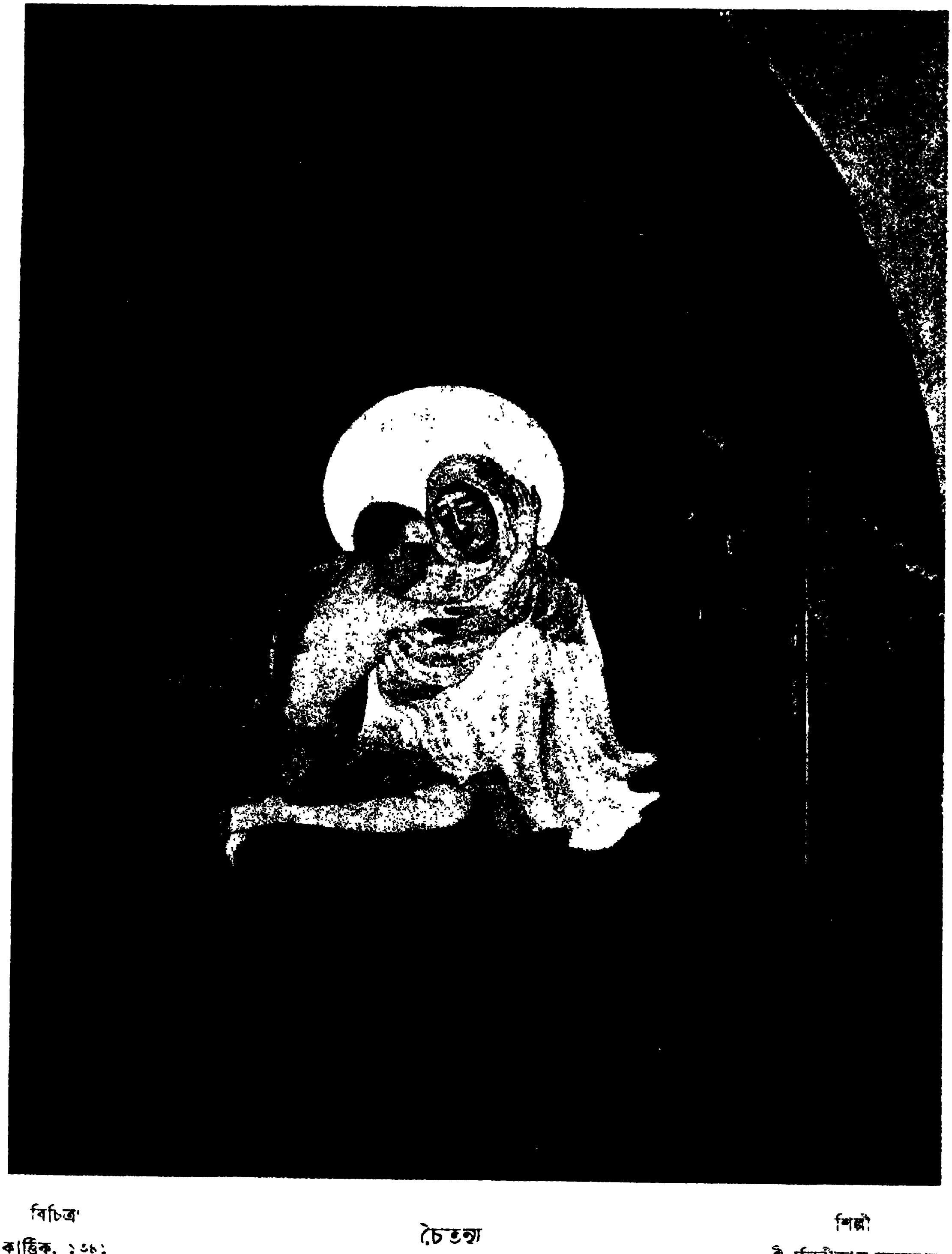
আমরা এই কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুত পেটেণ্ট ঔষধের চারটি নমুনা শিশি পেয়ে বিশেষ সুখী হয়েছি। এঁরা বহুদিন যাবৎ প্রকৃত দ্রাক্ষারিষ্ট দিয়ে শক্তিবর্দ্ধক ঔষধ তৈরী করবার জন্যে গবেষণা ও পরীক্ষা করেছেন। সেই গবেষণার ফল এই পেটেণ্ট ঔষধ ভিনুটোন্ ও তাহারই সংমিশ্রণে প্রস্তুত আরো তিন রকম ঔষধ। দ্রাক্ষাফল থেকে এল্‌কোহল আহরণ করে এই ভিনুটোন্ নামক ঔষধ প্রস্তুত। এলকোহল আহরণের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কতকগুলি সুরাজাতীয় শক্তিশালী উচ্চগুণবিশিষ্ট বাষ্প পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই পদার্থগুলিকে ভিনুটোন্ ও তৎসংমিশ্রিত অন্যান্য ঔষধগুলিতে অবিকৃত ভাবে তাদের গুণ সহ পূর্ণমাত্রায় রাখা হয়েছে। সেজন্য যে সমস্ত মাদক টনিক পরিষ্কৃত এলকোহল থেকে প্রস্তুত তাদের চেয়ে ভিনুটোনের উপকারিতা অনেক বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিনুটোনের প্রধান উপকরণ উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষাফলের রস থেকে প্রস্তুত অরিষ্ট। এই দ্রাক্ষারিষ্টের যে মৃতসঞ্জীবনী শক্তি আছে তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল চিকিৎসা শাস্ত্রেই একবাক্যে সম্মত। ভিনুটোন টনিকে এই সব সুরাজাতীয় শক্তিশালী পদার্থ ছাড়াও কয়েকটি স্নায়ু পরিপোষণের জন্য উপকরণ মিশ্রিত আছে; সেই উপকরণের প্রত্যেকটি মানবদেহের অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুকে পরিপুষ্ট করে এবং সকল প্রকার দেহের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে দেয়। অতএব যে কোন কারণেই হউক শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রক্তস্বল্পতা ঘট্‌লে ভিনুটোন্ যে বিশেষ ফলপ্রদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক কথায় ভিনুটোন্ আহার ও ঔষধ একাধারে দুই-ই।

পেপটোন্ সহ যে ভিনুটোন্ প্রস্তুত হয়েছে তা পরিপাক সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ। লেসিথিন সহ যে ভিনুটোন্ প্রস্তুত হয়েছে তা সর্ব্বপ্রকার কায়িক ও মানসিক শ্রমজনিত অবসাদ দূর করে সুনিদ্রায় সহায়তা করে। কুইনিন্ সহ যে ভিনুটোন্ প্রস্তুত হয়েছে তা ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় বিশেষ উপযোগী। কেননা সর্ব্বসম্মতিক্রমে কুইনিন্ই ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে কুইনিনের মধ্যে শরীরের অনিষ্টকারী আরো কয়েকটি গুণ আছে। ভিনুটোন্ ও কুইনিনের সংমিশ্রণে, যে ঔষধ প্রস্তুত হ'য়েছে, তাতে কুইনিনের সেই সকল অনিষ্টকারী শক্তিগুলিকে নাশ করা হয়েছে। সুতরাং ম্যালেরিয়ায় যাঁরা ভুগ্‌ছেন তাঁরা এই ঔষধ সেবনে শুধুই যে রোগের কবল থেকে মুক্তি পাবেন তা না অন্যান্য দিকেও তাঁদের শরীরের উন্নতি হবে।

আজকাল বাজারে নানা রোগের জন্য বিস্তর বিদেশী পেটেণ্ট ঔষধ চল্‌ছে। এর জন্য যে টাকা দেশ থেকে বেরিয়ে যায় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ও রোগের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য তা আমাদের না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু এই দেশী পেটেণ্ট ঔষধ যখন বেরিয়েছে তখন চিকিৎসকগণ কর্তৃক এর রীতিমত পরীক্ষা হওয়াটা বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি। তাই এ বিষয়ে আমাদের পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works
259 Upper Chitpore Road. and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.



বিচিত্রা

কার্ত্তিক, ১৩৪১

চৈতন্য

শিল্পী

শ্রী নলিনীকান্ত মজুমদার

বিচিত্রা

অষ্টম বর্ষ, ১ম খণ্ড	কার্ত্তিক, ১৩৪১	৪র্থ সংখ্যা

শরৎ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্য সম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্য্যের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্চ্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমি পানে
অবসাদে অবনত ক্ষীণশ্বাস চির প্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বদ্ধ প্রায়।
শূন্যে হেনকালে
জয় শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দন তিলক ভালে
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগন প্রাঙ্গণে;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণী কঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিঃকণা। আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্ব্বচনীয় নবীনের তরুণ আলোকে।
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতি দূর ভাবী কাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্ত্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্ত্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।

আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি'
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল,
সর্ব্ব দেহ মন হতে ছিন্ন হোলো অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হোলো সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি,
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি' এল ; তুচ্ছ তার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে, রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল
পশ্চিম দিগন্ত পারে নামহীন বন-নীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।
আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসার যাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ সম ॥

১৩ সেপ্টেম্বর
১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপ্রদাস

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৩

সংসারে বিপদ যে কোথায় থাকে এবং কোন পথে কখন যে আত্মপ্রকাশ করে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাজের মাঝখানে কল্যাণী আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, মা, উনি বলচেন ওঁর সঙ্গে আমাকে এখুনি বাড়ী চলে যেতে। ট্রেনের সময় নেই,—ষ্টেশনে বসে থাকবেন সে-ও ভালো,—তবু এ-বাড়ীতে আর একদণ্ডও না।

পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার শাস্ত্রীয় ক্রিয়া এইমাত্র চুকিয়াছে, এই মাত্র দয়াময়ী মণ্ডপ হইতে বাটীতে আসিয়া পা দিয়াছেন। ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মেয়ের কথাটা ভালো বুঝিতেই পারিলেন না, হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, কে বলচে তোমাকে যেতে,—শশধর? কেন?

বড়দা ওঁকে ভয়ানক অপমান করেছেন—ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন, এই বলিয়া কল্যাণী উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিতে লাগিল।

চারিদিকে লোকজন, কোথাও খাওয়ানোর আয়োজন, কোথাও গানের আসর, কোথাও ভিখারীদের বাদ-বিতণ্ডা, কোথাও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের শাস্ত্র-বিচার,—অগণিত মানুষের অপরিমেয় কোলাহল,—ইহারই মাঝখানে অকস্মাৎ এই ব্যাপার।

সতী ও মৈত্রেয়ী উপস্থিত হইল, বন্দনা ভাঁড়ারে চাবি দিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, আত্মীয় কুটুম্বিনিগণের অনেকেই কৌতূহলী হইয়া উঠিল, শশধর আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, মা আমরা চল্‌লুম। আসতে আদেশ করেছিলেন আমরা এসেছিলুম কিন্তু থাকতে পারলুম না।

—কেন বাবা?

—বিপ্রদাসবাবু তাঁর ঘর থেকে আমাকে বার করে দিয়েছেন।

—তার কারণ?

—কারণ বোধ করি এই যে তিনি বড়লোক। অহঙ্কারে চোখে-কানে দেখতে শুনতে পান না।

ভেবেচেন নিজের বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান করা সহজ। কিন্তু ছেলেকে এটুকু বুঝিয়ে দেবেন আমার বাবাও জমিদারী রেখে গেছেন সে-ও নিতান্ত ছোট নয়। আমাকেও ভিক্ষে করে বেড়াতে হয় না।

দয়াময়ী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, বিপিনকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি বাবা, কি হয়েছে জিজ্ঞেসা করি। আমার কাজ এখনো শেষ হলো না, ব্রাহ্মণ-ভোজন বাকি, বোষ্টম-ভিক্ষুকদের বিদায় করা হয় নি তার আগেই যদি তোমরা রাগ করে চলে যাও শশধর, যে-পুকুর এই মাত্র প্রতিষ্ঠা করলুম তাতেই ডুব দিয়ে মরবো তোমরা নিশ্চয় জেনো। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল।

শ্বাশুড়ীর চোখের জলে বিশেষ ফল হইল না। ভদ্র সন্তান হইয়াও শশধরের আকৃতি ও প্রকৃতি কোনটাই ঠিক ভদ্রোচিত নয়। কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে মন সঙ্কোচ বোধ করে। তাহার বিপুল দেহ ও বিপুলতর মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতো ফুলিতে লাগিল, বলিল, থাকতে পারি যদি বিপ্রদাসবাবু এখানে এসে সকলের সুমুখে হাত জোড় ক'রে আমার ক্ষমা চান। নইলে নয়।

প্রস্তাবটা এতবড় অভাবিত যে শুনিয়া সকলে যেন বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। বিপ্রদাস ক্ষমা চাহিবে হাত জোড় করিয়া! এবং সকলের সম্মুখে! কয়েক মুহূর্ত্ত সকলেই নির্ব্বাক, সহসা পাংশু মুখে একান্ত অনুনয়ের কণ্ঠে সতী বলিয়া উঠিল, ঠাকুর-জামাই, এখন নয় ভাই। কাজ-কর্ম্ম চুকুক, রাত্তিরে মা নিশ্চয় এর একটা বিহিত করবেন। তোমাকে অপমান করা কি কখনো হতে পারে? অন্যায় করে থাকলে তিনি নিশ্চয় ক্ষমা চাইবেন।

বন্দনার চোখের কোণ দুটা ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্ত কণ্ঠে কহিল, তিনি অন্যায় ত কখ্খনো করেন না মেজ দি!

সতী তাড়া দিয়া উঠিল, তুই থাম্ বন্দনা। অন্যায় সবাই করে।

বন্দনা বলিল, না তিনি করেন না।

শুনিয়া মৈত্রেয়ী যেন জ্বলিয়া গেল, তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, কি করে জানলেন? সেখানে ত আপনি ছিলেন না। উনি কি তবে বানিয়ে বলচেন?

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বানিয়ে বলার কথা আমি বলিনি। আমি শুধু বলেচি মুখুয্যে মশাই অন্যায় করেন না।

মৈত্রেয়ী প্রত্যুত্তরে তেমনি বক্র-বিদ্রূপে কহিল, অন্যায় সবাই করে। কেউ ভগবান নয়। উনি বাবাকেও অসম্মান করতে ছাড়েন নি।

বন্দনা বলিল, তা'হলে শশধরবাবুর মতো তাঁরও চলে যাওয়া উচিত ছিল, থাকা উচিত ছিল না।

মৈত্রেয়ী তীক্ষ্ণতর স্বরে জবাব দিল, সে কৈফিয়ৎ আপনার কাছে দেবার নয়, মীমাংসা হবে দ্বিজুবাবুর সঙ্গে, যিনি আহ্বান করে এনেছেন।

সতী সরোষে তিরস্কার করিল, তোর পায়ে পড়ি বন্দনা তুই যা এখান থেকে। নিজের কাজে যা।

শশধর দয়াময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের দরবার করতে আসিনি মা, এসেছি জানতে আপনার ছেলে জোড়-হাতে আমার ক্ষমা চাইবেন কি না? নইলে চললুম—এক

মিনিটও থাকবো না। আপনার মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে পারেন, না-ও পারেন, কিন্তু তারপরে শ্বশুর-বাড়ীর নাম যেননা আর মুখে আনেন। এইখানে আজই তার শেষ হয় যেন।

একি সর্ব্বনেশে কথা! শশধরের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়,—মেয়ে-জামাইকে বাড়ী আনিয়া একি ভয়ঙ্কর বিপদ। স্বমুখে দাঁড়াইয়া কল্যাণী কাঁদিতেই লাগিল, পরামর্শ দিবার লোক নাই, ভাবিবার সময় নাই, ত্রাসে লজ্জায় ও গভীর অপমানে দয়াময়ীর কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তিনি কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া সভয়ে বলিলেন, তুমি একটু থামো বাবা, আমি বিপিনকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আমি জানি কোথায় তোমার মস্ত ভুল আছে, কিন্তু এই এক-বাড়ী লোকের মধ্যে এ কলঙ্ক প্রকাশ পেলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে বাছা।

শশধর কহিল, বেশ, আমি দাঁড়িয়ে আছি তাঁকে ডাকান। বিপ্রদাসবাবু মিথ্যে করেই বলুন এ কাজ তিনি করেন নি।

মিথ্যে কথা সে বলেনা শশধর, এই বলিয়া দয়াময়ী বিপ্রদাসকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। মিনিট পাঁচেক পরে বিপ্রদাস আসিয়া দাঁড়াইল। তেমনি শান্ত, গম্ভীর ও আত্মসমাহিত। শুধু চোখের দৃষ্টিতে একটা উদাস ক্লান্ত ছায়া—তাহার অন্তরালে কি কথা যে প্রচ্ছন্ন আছে বলা কঠিন।

দয়াময়ী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, তোর নামে কি কথা শশধর বলে বিপিন। বলে, তুই নাকি ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়েচিস। এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

বিপ্রদাস বলিল, সত্যি বই কি মা।

—ঘর থেকে সত্যি বার করে দিয়েছিস আমার জামাইকে? আমার এই কাজের বাড়ীতে?

—হাঁ, সত্যিই বার করে দিয়েছি। বলেচি আর যেননা কখনো ও আমার ঘরে ঢোকে।

শুনিয়া দয়াময়ী বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণে এই অভিভূত ভাবটা কাটিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

—সে তোমার না শোনাই ভালো মা।

সতী স্থির থাকিতে পারিল না, ব্যাকুল হইয়া নিবেদন করিল, আমরা কেউ শুনতে চাইনে কিন্তু ঠাকুরজামাই কল্যাণীকে নিয়ে এক্ষুনি চলে যেতে চাচ্চেন, এই একবাড়ী লোকের মধ্যে ভেবে দেখো সে কত বড় কেলেঙ্কারি,—ওঁকে বলো তোমার হঠাৎ অন্যায় হয়ে গেছে,—বলো ওঁদের থাকতে।

বিপ্রদাস স্ত্রীর মুখের প্রতি একমুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, হঠাৎ অন্যায় আমার হয় না সতী।

—হয় হয়, হঠাৎ একটা অন্যায় সকলেরি হয়। বলোনা ওঁদের থাকতে।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া কহিল, না, অন্যায় আমার হয়নি।

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মাঝে দয়াময়ী স্তব্ধ হইয়া ছিলেন, সহসা কে যেন তাঁহাকে নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া দিল, তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, ন্যায়-অন্যায়ের ঝগড়া থাক্। মেয়ে-জামাই আমার চিরকালের মতো পর হয়ে যাবে এ আমি সইবো না। শশধরের কাছে তুমি ক্ষমা চাও বিপিন।

—সে হয়না মা, সে অসম্ভব।

—সম্ভব অসম্ভব আমি জানিনে। ক্ষমা তোমাকে চাইতেই হবে।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে স্থির হইয়া রহিল। দয়াময়ী মনে মনে বুঝিলেন এ অসম্ভবকে আর সম্ভব করা যাইবে না, ক্রোধের সীমা রহিল না, বলিলেন, বাড়ী তোমার একার নয় বিপিন। কাউকে তাড়াবার অধিকার কর্ত্তা তোমাকে দিয়ে যাননি। ওরা এ বাড়ীতে থাকবে।

বিপ্রদাস কহিল, দেখো মা, আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে যদি তুমি এ আদেশ দিতে আমি চুপ করেই থাকতাম কিন্তু এখন আর পারিনে। শশধর থাকলে এ-বাড়ী ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। আর ফেরাতে পারবে না। কোনটা চাও বলো?

জীবনে এমন ভয়ানক প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনদিন কেহ তাঁহাকে ডাকে নাই, এতবড় দুর্ভেদ্য সমস্যার সম্মুখীন হইতেও কেহ বলে নাই। একদিকে মেয়ে-জামাই, আর একদিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিপিন। যে-শিশুকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, যে সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, দুঃখের সান্ত্বনা বিপদের আশ্রয়—যে-ছেলে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়। এ অমর্য্যাদা তাহাকে মৃত্যু দিবে কিন্তু সংকল্পচ্যুত করিবে না। বুঝিলেন সর্ব্বনাশের অতলস্পর্শ গহ্বর তাঁর পায়ের নীচে, এ ভুলের প্রতিবিধান নাই, প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নাই—পরিণাম ইহার দৈবের মতোই অমোঘ নির্ম্মম ও অনন্যগতি। তথাপি নিজেকে শাসন করিতে পারিলেন না, অদম্য ক্রোধ ও অভিমানের বাত্যায় তাঁহাকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল, কটুকণ্ঠে বলিলেন, এ তোমার অন্যায় জিদ বিপিন। তোমার জন্যে মেয়ে-জামাইকে জন্মের মতো পর করে দেবো এ হয় না বাছা। তোমার যা ইচ্ছে করোগে। শশধর, এস তোমরা আমার সঙ্গে,—ওর কথায় কান দেবার দরকার নেই। বাড়ী ওর একার নয়। এই বলিয়া তিনি কল্যাণী ও শশধরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের পিছনে-পিছনে গেল মৈত্রেয়ী, যেন ইঁহাদেরই সে আপন লোক।

মনে হইয়াছিল সতী বুঝি এইবার ভাঙিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার অচঞ্চল দৃঢ়তায় বন্দনা ও বিপ্রদাস উভয়েই বিস্মিত হইল। তাহার চোখে জল নাই কিন্তু মুখ অতিশয় পাণ্ডুর, বলিল, ঠাকুর-জামাই কি করেছেন আমরা জানিনে, কিন্তু অকারণে তুমিও যে এত বড় কাণ্ড করোনি তা' নিশ্চয় জানি। ভেবো না, মনে মনে তোমাকে আমি এতটুকু দোষও কোন দিন দেব।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। সতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আজই চলে যাবে?

—না, কাল যাবো।

—আর আসবে না এ-বাড়ীতে?

—মনে ত হয় না।

—আমি? বাসু?

—যেতে তোমাদেরও হবে। কাল না পারো অন্য কোন দিন।

—না, অন্য দিন নয়,—আমরাও কালই যাবো। এই বলিয়া সতী বন্দনাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই কি করবি বন্দনা, কালই যাবি?

বন্দনা বলিল, না। আমিত ঝগড়া করিনি মেজদি, যে দল পাকিয়ে কালই যেতে হবে।

সতী বলিল, ঝগড়া আমিও করিনি বন্দনা, উনিও না। কিন্তু যেখানে ওঁর যায়গা হয় না সেখানে আমারও না। একটা দিনও না। তোর বিয়ে হলে এ কথা বুঝতিস্।

বন্দনা বলিল, বিয়ে না হয়েও বুঝি মেজদি, স্বামীর যায়গা না হলে স্ত্রীরও হয় না। কিন্তু ভুল ত হয়,—না বুঝে তাকেই স্বীকার করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, তোমার এ-কথা আমি মানবো না।

শ্বাশুড়ীর প্রতি সতীর অভিমানের সীমা ছিল না, বলিল, স্বামী থাকলে মানতিস্। বলিয়াই অশ্রু চাপিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বন্দনা কহিল, এ কি করলেন মুখুয্যে মশাই?

—না ক'রে উপায় ছিল না বন্দনা।

—কিন্তু মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ এ-যে ভাবতে পারা যায় না।

বিপ্রদাস বলিল, যায় না সত্যি, কিন্তু নতুন প্রশ্ন এসে যখন পথ আগলায় তখন নতুন সমাধানের কথা ভাবতেই হয়। এড়িয়ে চলবার ফাঁক থাকে না। তোমার মেজদি আমার সঙ্গে যাবেই—বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু তুমি? আরও দু'চার দিন কি থাকবে মনে করেছো?

বন্দনা বলিল, কতদিন থাকতে হবে আমি জানিনে। কিন্তু নতুন প্রশ্ন আপনার যতই আসুক আমি কিন্তু সেই পুরনো পথেই তার উত্তর খুঁজে ফিরবো—যে-পথ প্রথম দিনটিতে আমার চোখে পড়েছিল যেদিন হঠাৎ এসে এ-বাড়ীতে দাঁড়িয়েছিলুম। যার তুলনা কোথাও দেখিনি, যা আমার মনের ধারা দিয়েছে চিরকালের মতো বদ্‌লে।

বিপ্রদাস ইহার উত্তর দিল না শুধু ওষ্ঠপ্রান্তে তাহার একটুখানি ম্লান হাসির আভাস দেখা দিল। সে হাসি যেমন বেদনার তেমনি নিরাশার। কহিল, আমি বাইরে চললুম বন্দনা, আবার দেখা হবে।

অশ্রুবাষ্পে বন্দনার চোখ ভরিয়া উঠিয়াছে; বলিল, দেখা যদি হয় তখন শুধু দূর থেকে আপনাকে প্রণাম করবো। কঠোর আপনার প্রকৃতি, কঠিন মন,—না আছে স্নেহ না আছে ক্ষমা। তখন বলতে যদি না পারি, সুযোগ যদি না হয় এখুনি বলে রাখি মুখুয্যে মশাই, যাদের নিয়ে চলে আমাদের ঘর-কন্না, হাসি-কান্না, মান-অভিমান তাদের নিয়েই যেন চলতে পারি, তাদেরই যেন আপনার বলে এ-জীবনে ভাবতে শিখি। আলেয়ার আলোর পিছনে আর যেননা পথ হারাই। একটু থামিয়া বলিল, দূরে থেকে যখনি আপনাকে মনে পড়বে তখনি একান্তমনে এই মন্ত্র জপ করবো—তিনি নির্ম্মল, তিনি নিষ্পাপ, তিনি মহৎ। মনের পাষাণ-ফলকে তাঁর লেশমাত্র দাগ পড়ে না। জগতে তিনি একক, কারো আপন তিনি নয়,—সংসারে কেউ তাঁর আপন হতে পারে না। এই বলিয়া দুচোখে আঁচল চাপিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেদিন কাজ-কর্ম্ম চুকিল অনেক রাত্রে। এ গৃহের সুশৃঙ্খলিত ধারায় কোথাও কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। বাহিরে হইতে কেহ জানিতেও পারিল না সেই শৃঙ্খলের সবচেয়ে বড় গ্রন্থিই আজ চূর্ণ হইয়া

গেল। প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব নাই, কর্ম্মক্লান্ত বৃহৎ ভবন একান্ত নীরব,—যে যেখানে স্থান পাইয়াছে নিদ্রামগ্ন,—ভাঁড়ারের গুরু দায়িত্ব সমাপন করিয়া বন্দনা শ্রান্তপদে নিজের ঘরে যাইতেছিল, চোখে পড়িল ওদিকের বারান্দার পাশে দ্বিজদাসের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। দ্বিধা জাগিল এমন সময়ে যাওয়া উচিত কিনা, কাহারো চোখে পড়িলে সুবিচার সে করিবে না, নিন্দা হয়ত শতমুখে বিস্তার লাভ করিবে, কিন্তু থামিতে পারিল না, যে-উদ্বেগ তাহাকে সারাদিন চঞ্চল ও অশান্ত করিয়া রাখিয়াছে সে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, দ্বিজুবাবু এখনো জেগে আছেন?

ভিতর হইতে সাড়া আসিল, আছি। কিন্তু এমন সময়ে আপনি যে?

—আসতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে।

বন্দনা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল রাশীকৃত কাগজপত্র লইয়া দ্বিজদাস বিছানায় বসিয়া। জিজ্ঞাসা করিল, আজকের হিসেব বুঝি? কিন্তু হিসেব ত পালাবে না দ্বিজুবাবু, এত রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে যে।

দ্বিজদাস বলিল, হলে বাঁচতুম, এ-গুলো চোখে দেখতে হতো না।

— খরচ অনেক হয়ে গেছে বুঝি? দাদার কাছে গুরুতর কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

দ্বিজদাস কাগজগুলা একধারে ঠেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। শ্রীগুরুর কৃপায় সেদিন আর এখন আমার নেই বন্দনা দেবী, যে দাদার কাছে কৈফিয়ৎ দেবো। এখন উল্টে কৈফিয়ৎ চাইবো আমি। বলবো লাও শীগ্‌গির হিসেব,—জলদি লাও রুপেয়া—কোথায় কি করেছো বলো।

বন্দনা অবাক হইয়া বলিল, ব্যাপার কি?

দ্বিজ াস মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত মাথার উপরে তুলিয়া কহিল, ব্যাপার অতীব ভীষণ। মা দয়াময়ী আমাকে দয়া করুন, ভগ্নিপতি শশধর আমার সহায় হোন—সাবধান বিপ্রদাস! তোমাকে এবার আমি ধনে-প্রাণে বধ করবো! আমাদের হাতে আর তোমার নিস্তার নেই।

বন্দনার চিন্তা উদ্দাম হইয়া উঠিল, তবু সে না হাসিয়া পারিল না, বলিল, সব তাতেই হাসি-তামাসা? আপনি কি এক মুহূর্ত্ত সিরিয়াস হতে জানেন না দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস বলিল, জানিনে? তবে আনো শশধরকে, আনো—না, তাঁরা থাক্। দেখবে, হাসি-তামাসা পালাবে চক্ষের নিমিষে সাহারায়, গাম্ভীর্য্যে মুখ-মণ্ডল হয়ে উঠবে বুনো-ওলের মতো ভয়াবহ। পরীক্ষা করুন।

বন্দনা চৌকি টানিয়া লইল বসিল, কহিল, আপনি তাহলে শুনেছেন সব?

—সব নয়, যৎ-কিঞ্চিৎ। সব জানেন দাদা কিন্তু সে গহন অরণ্য। আর জানে শশধর। সে বলবে বটে, কিন্তু সমস্ত মিথ্যে ক'রে বানিয়ে বলবে।

বন্দনা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, যা জানেন আমাকে বলতে পারেন না দ্বিজুবাবু? আমি সত্যি বড় ভয় পেয়েছি।

দ্বিজদাস কহিল, ভয় পাওয়া বৃথা। দাদার সংকল্প টলবে না,—তাঁকে আমরা হারালুম।

দীপালোকে দেখা গেল এইবার অশ্রুজলে দু চক্ষু তাহার টল্ টল্ করিতেছে, ঘাড় ফিরাইয়া কোনমতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার সে সোজা হইয়া বসিল।

বন্দনা গাঢ়স্বরে কহিল, বিচ্ছেদ এত সহজেই আসবে দ্বিজুবাবু, সত্যিই ঠেকানো যাবে না?

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ও-বস্তু যখন আসে তখন এমনি অবাধে এমনি দ্রুতই আসে, বারণ কিছুতে মানে না। যার কাঁদবার সে কাঁদে, কিন্তু শেষ ঐখানে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি জানতে চাইছিলেন হেতু। বিস্তারিত জানিনে কিন্তু যতটুকু জানি সে শুধু আপনাকেই বলবো, আর সাহায্য যদি কখনো চাইতে হয়, যেখানেই থাকুন সে কেবল আপনার কাছেই চাইবো।

—কেবল আমার কাছেই কেন?

—তার কারণ হাত যদি পাততেই হয় মহতের দ্বারে পাতাই শাস্ত্রের বিধান।

—কিন্তু মহৎ কি আর কেউ নেই?

—হয়ত আছে, কিন্তু ঠিকানা জানিনে। দাদার কথা তুলবোনা, কিন্তু চিরদিন হাত পাতার অভ্যাস ছিল বৌদিদির কাছে, কিন্তু সে-পথ বন্ধ হলো। আপনি তাঁর বোন, আমার দাবী তাঁর থেকে।

—কিন্তু মা?

দ্বিজদাস বলিল, রথ যখন দ্রুত চলে মা তার অসাধারণ সারথি, কিন্তু চাকা যখন কাদায় বসে মা তখন নিরুপায়। নেমে এসে ঠেলতে তিনি পারেন না। সে দুর্দ্দিনে যাবো আপনার কাছে। দেবেন না ভিক্ষে?

—ভিক্ষের বিষয় না জেনে বলবো কি করে দ্বিজুবাবু?

—সে নিজেও জানিনে বন্দনা, সহজে চাইতেও যাবো না। যখন কোথাও মিলবে না যাবো শুধু তখনি।

বন্দনা বহুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, যা জানতে চেয়েছিলুম বলবেন না?

দ্বিজদাস বলিল, সমস্ত জানিনে, যা জানি তাও হয়ত অভ্রান্ত নয়। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে দাদা আজ সর্ব্বস্বান্ত। সমস্ত গেছে।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল—মুখুয্যে মশাই সর্ব্বস্বান্ত? কি করে এমন হলো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস বলিল, খুব সহজেই এবং সে ঐ শশধরের ষড়যন্ত্রে। সাহা-চৌধুরি-কোম্পানি হঠাৎ যেদিন দেউলে হলো দাদারও সর্ব্বস্ব ডুবলো সেই গহ্বরে। অথচ, এ শুধু বাইরের ঘটনা,—যেটুকু চোখে দেখতে পাওয়া গেল। ভিতরে গোপন রইলো অন্য ইতিহাস।

বন্দনা ব্যাকুল হইয়া কহিল, ইতিহাস থাক দ্বিজুবাবু, শুধু ঘটনার কথাই বলুন। বলুন সর্ব্বস্ব যাওয়া সত্যি কিনা।

—হাঁ, সত্যি। ওখানে কোন ভুল নেই।

—কিন্তু মেজদি? বাসু? তাদেরও কিছু রইলো না নাকি?

—না। রইলো শুধু বৌদির বাপের বাড়ীর আয়। সামান্য ঐ ক'টা টাকা।

—কিন্তু সে তো মুখুয্যে মশাই ছোঁবেন না দ্বিজুবাবু।

—না। তার চেয়ে উপোসের ওপর দাদার বেশি ভরসা। যে-কটা দিন চলে।

উভয়েই নির্ব্বাক হইয়া রহিল। মিনিট কয়েক পরে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি? আপনার নিজের কি হলো?

দ্বিজদাস বলিল, পরম নির্ভয়ে ও নিরাপদে আছি। দাদা আপনি ডুবলেন কিন্তু আমাকে রাখলেন ভাসিয়ে। জল-কণাটি পর্য্যন্ত লাগতে দিলেন না গায়ে। বলবেন, এ অসম্ভব সম্ভব হলো কি করে? হলো মায়ের সুবুদ্ধি, দাদার সাধুতা এবং আমার নিজের শুভ-গ্রহের চক্রান্তে। গল্পটা বলি শুনুন। এই শশধর ছিল দাদার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী। দুজনের ভালোবাসার অন্ত নেই। বড় হয়ে দাদা এর সঙ্গে দিলেন কল্যাণীর বিয়ে। এই ঘটকালিই দাদার জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি। শোনা গেল শশধরের বাপের মস্ত জমিদারী, বিপুল অর্থ ও বিরাট কারবার। অতবড় বিত্তশালী ব্যক্তি পাবনা অঞ্চলে কেউ নেই। বছর চারেক গেল, হঠাৎ একদিন শশধর এসে জানালে জমিদারী, ঐশ্বর্য্য, কারবার অতলে তলাতে আর বিলম্ব নেই,—রক্ষা করতে হবে। মা বললেন, রক্ষা করাই উচিত কিন্তু দ্বিজু আমার নাবালক তার টাকায় ত হাত দিতে পারা যাবে না বাবা। সে বললে বছর ঘুরবে না মা, শোধ হয়ে যাবে। মা বললেন, আশীর্ব্বাদ করি তাই যেন হয়, কিন্তু নাবালকের সম্পত্তি, কর্ত্তার একান্ত নিষেধ।

কল্যাণী কেঁদে এসে দাদার পায়ে গিয়ে পড়লো। বললে, দাদা বিয়ে দিয়েছিলে তুমিই, আজ ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবো দেখবে তুমি চোখে? মা পারেন কিন্তু তুমি? যেখানে ওঁর ধর্ম্ম, যেখানে ওঁর বিবেক ও বৈরাগ্য যেখানে উনি আমাদের সকলের বড়, কল্যাণী সেইখানে দিলে আঘাত। দাদা অভয় দিয়ে বললেন, তুই বাড়ী যা বোন্ যা' করতে পারি আমি করবো। সেই অভয়-মন্ত্র জপতে জপতে কল্যাণী বাড়ী ফিরে গেল। তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বন্দনা। কিন্তু চেয়ে দেখুন ভোর হয়েছে, এই বলিয়া খোলা জানালার দিকে সে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বন্দনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ঐ কাগজগুলো আপনার কি?

দ্বিজদাস বলিল, আমার নির্ভয়ে থাকার দলিল। আসবার সময়ে দাদা সঙ্গে এনেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনিও কি আমাদের আজই ফেলে চলে যাবেন?

—ঠিক জানিনে দ্বিজুবাবু। কিন্তু আর সময় নেই আমি চললুম। আবার দেখা হবে। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

যখ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীমান অলকচন্দ্র গুপ্ত

কল্যাণীয়েষু

যখ কাকে বলে জানো? সংস্কৃতে যাকে বলতো যক্ষ তারই বাঙলা অপভ্রংশ হচ্ছে যখ। আমাদের মুখে যে সুধু যক্ষ যখ হয়ে গিয়েছে তাই নয়;—তার রূপগুণও সব বদলে গিয়েছে। সংস্কৃত যক্ষের রূপ কি ছিল আমি জানিনে। তবে এইমাত্র জানি যে, সে যুগে লোকে তাদের ভয় করত। কারণ তাদের শক্তি ছিল অসীম অবশ্য মানুষের তুলনায়। আর যার শক্তি বেশী তাকেই লোকে ভয় করে। যক্ষরা ছিল, মানুষ ও পশুর মাঝামাঝি, এক শ্রেণীর অদ্ভুত জীব, এক কথায় তারা ছিল অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক পশু। তাদের একটি গুণের কথা সকলেই জানে। তারা ছিল সব ধনরক্ষক। তাই যক্ষের ধন কথাটা এদেশে মুখে মুখে চলে গিয়েছে।

বাঙলাদেশে যক্ষ জন্মায় না। তাই যখ লোকে বানায়; ধনের রক্ষক হিসেবে। ধন সকলেই অর্জ্জন করতে চায় কিন্তু কেউ কেউ অর্জ্জিত ধন রক্ষা করতে চায় চিরদিনের জন্য। এক কথায় ধনকে অক্ষয় করতে চায়। মানুষে চিরকালের জন্য দেহকেও রক্ষা করতে পারে না ধনকেও নয়। যা অসম্ভব তাকে সম্ভব করাই হচ্ছে বাঙলায় যখ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এদেশে কোটিপতিরা কি উপায়ে যখ সৃষ্টি করতেন জানো?

সোনার মোহর ভর্ত্তি বড় বড় তামার ঘড়া আর সেই সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণ বালককেও একটি লোহার কুঠরিতে বন্ধ করে দিতেন। বালক বেচারা যখন না খেতে পেয়ে মরে যেত তখন সে যখ হোত আর কোটিপতির সঞ্চিত ধনের রক্ষা করত। ধন আজও লোকে রক্ষা করে। শুনতে পাই Bank of France-এ কোটি কোটি টাকা মজুত রয়েছে আর তার রক্ষার জন্য বিজ্ঞানের চরম কৌশলে তালা চাবি তৈরী করা হয়েছে আর ধনাগার রয়েছে পাতালে। এর কারণ বেচারা ফরাসীরা যখ দেওয়া রূপ সহজ উপায়টি জানে না।

আমি একবার একটি যখ দেখেছিলুম—কোথায়, কখন কি অবস্থায় তার ইতিবৃত্ত একটা গল্প আকারে প্রকাশ করেছি। সে গল্পটি শুন্‌লে, গ্রীক আলঙ্কারিক আরিষ্টটেল বলতেন যে—সেটি একটি কাব্য, কেননা তার অন্তরে আছে সুধু terror and pity। অবশ্য বাঙলাদেশের কাব্য সমালোচকের মত সম্পূর্ণ আলাদা। এর কারণ বাঙালীরা গ্রীক নয়; আর গ্রীক হতেও চায় না, হতে চায় ইংরেজ। সে যাই হোক, আমার আহুতি নামক সে গল্পটি সম্বন্ধে বাঙালী সমালোচকের মত কি তা শুনে তোমাদের কোনও লাভ নেই—কেন না সে গল্পটি তোমাদের পড়তে আমি অনুরোধ করব না কারণ সেটি ছোট ছেলের গল্প হলেও ছোট ছেলেদের পাঠ্য নয়।

আজ যে যখের গল্পটি বলব, সে গল্প আমি শুনেছি পরের মুখে, আর এ গল্পটির ভিতর আর যাই থাক্ বিদঘুটে ভয় নেই।

আমি নিজে পথিমধ্যে যখ দেখে এতটা ভয় পাই, যে যখন বাড়ী গিয়ে উঠলুম, তখন আমার দেহের উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রিতে উঠে গিয়েছে। একে জ্যৈষ্ঠ মাস, আকাশে হচ্ছে অগ্নিবৃষ্টি, তার উপর ম্যালেরিয়ার দেশ, তার উপর মনের উপর বিভীষিকার প্রচণ্ড ধাক্কা, এই সব মিলে আমার নাড়ীকে যে ঘোড়দৌড় করাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাড়ী গিয়েই বিছানা নিলুম আর সাতদিন সেখান থেকে নড়িনি। আমার চিকিৎসার ভার নিলেন জনৈক পাড়াগাঁয়ে কবিরাজ। তাঁর ওষুধ হ'ল দুটি, লঙ্ঘন আর

পাঁচন। সে পাঁচন যেমন সবুজ তেমনি তিতো। লঙ্ঘনের চোটে ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করত, তাই সে পাঁচন ওষুধ হিসেবে নয় রোগীর পথ্য হিসেবে গলাধঃকরণ করতুম। আর আমার বিছানার পাশে সমস্তদিন হাজির থাকতেন রমা ঠাকুর। আর এই শয্যাশায়ী অবস্থায় তারই মুখে এ গল্প শুনেছি।

এখন দু কথায় রমা ঠাকুরের পরিচয় দিই; কারণ তিনি ছিলেন যেমন গরিব, তেমনি ভাল লোক। তাঁর পুরো নাম—রমাকান্ত নিয়োগী ঠাকুর। এঁরই পূর্ব্বপুরুষরা পূর্ব্বে আমাদের গ্রামের মালিক ছিলেন। পরে নিয়োগী বংশ ধনে প্রাণে উচ্ছন্ন যায়। শেষটা এঁদের মধ্যে অবশিষ্ট রইলেন একমাত্র রমা ঠাকুর। তিনি একা বাস করতেন একখানি খড়ো ঘরে। কখনও বিবাহ করেন নি, ফলে তাঁর ঘরে আর দ্বিতীয় লোক ছিল না। তিনি অবশেষে হয়েছিলেন আমাদের কুলদেবতার পূজারী। আমাদের কুলদেবতা 'শ্যামসুন্দর' ছিলেন জঙ্গমঠাকুর—কোন শরিকের বাড়ী পালাক্রমে থাকতেন দুদিন, কোনও বাড়ীতে বা তিন দিন। ঠাকুরের ভোগ খেয়ে ও দক্ষিণা নিয়েই তাঁর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হত। আর উপরি সময় তিনি পাঁচজনের শুশ্রূষা করতেন। লোকটি আকারে ছোটখাট; তার বর্ণ শ্যাম, আর মাথার চুল একদম সাদা। এমন নিরীহ, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী লোক হাজারে একটি দেখা যায় না। তাঁর নিজের কোনও কাজ ছিল না, কিন্তু পরের অনেক ফাইফরমাস খেটে তিনি হাঁপ জিরবার সময় পেতেন না।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে রমা ঠাকুরকে আমার যখ দর্শনের গল্প বললুম। তিনি সে গল্প শুনে আমাকে ভরসা দিলেন, যে কিছু ভয় নেই, তুমি দুদিনেই ভাল হয়ে উঠবে। যখ তোমার আমার মত লোকের হন্তারক নয়। তবে আমার গল্প তিনি সত্য বলেই মেনে নিলেন, কেননা রমা ঠাকুরও একবার দিনদুপুরে নয় রাতদুপুরে যখ দেখেছিলেন। আর তিনি যে জলজ্যান্ত যখ দেখেছিলেন সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। তিনি ইংরাজী পড়েন নি, সুতরাং যা দেখতেন, যা শুনতেন তাতেই বিশ্বাস করতেন। আমার কথা আলাদা। আমি ইংরেজী পড়েছি সুতরাং যা দেখি শুনি তাতে বিশ্বাস করিনে। আমার থেকে থেকেই মনে হত যে আমি যখ টখ কিছুই দেখিনি; পাল্কির ভিতর হয়তঃ ঘুমিয়ে পড়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম। ওষুধই যে শুধু স্বপ্নলব্ধ হয় তা নয়; কখনো কখনো স্বপ্নলব্ধ গল্প কবিতাও পাওয়া যায়। তা যে হয়, তা ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়লেই জানতে পাবে। এখন নিয়োগী ঠাকুরের গল্প শোনো। শুনতে কিছু কষ্ট হবে না কেননা গল্পটি ছোট্ট গল্প। এত ছোট্ট যে একটা ছোট এলাচের খোসার ভিতর তাকে পোরা যায়। রমা ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নন্দীগ্রাম কোথায় জানেন? আমি বললুম, না।

তিনি বললেন···

তা জানবেন কি করে? আপনি দু-পাঁচ বছরে একবার বাড়ী আসেন, আর দু-পাঁচদিন থেকেই চলে যান। নন্দীগ্রাম এখান থেকে দু'-পা। এই দক্ষিণের বিলটে পেরিয়ে তারপর মাঠটার ওপারে বাঁয়ে ভেঙ্গে যে পথটা পাওয়া যায় সেই পথটায় কিছুদুর গেলেই নন্দীগ্রাম পাওয়া যায়। এখান থেকে মোটে পাঁচক্রোশ রাস্তা মাত্র।

বছর তিনেক আগে আমার একবার নন্দীগ্রামে যাবার দরকার ছিল। দরকার আর কিছুই নয়, সেখানে গেলেই খালি হাতে আর ফিরতে হত না। সে গ্রামের অধিকারীবাবুরা দেব দ্বিজে অত্যন্ত ভক্তি করতেন যদিচ তাঁরাও ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁদের দ্বারস্থ হলে টাকাটা সিকেটা মিলত।

আমি স্থির করলুম কোজাগর পূর্ণিমার রাতে বেরিয়ে পড়ব। সেদিন ত সিদ্ধি খেতেই হয় আর সমস্ত রাত জাগতে হয়। তাই মনে করলুম যে, ঘরে বসে রাত জাগার চাইতে এক ঘটি সিদ্ধি খেয়ে রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়ব—আর হেসে খেলে পাঁচ ক্রোশ পথ চলে যাব। রাত এগারটায় বেরুলেও ভোর হতে না হতে নন্দীগ্রাম গিয়ে পৌছব।

আমি জিজ্ঞেস করলুম,

"রাত্তিরে একা এই বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে ভয় করল না। তিনি হেসে উত্তর করলেন।

"ভয় কিসের, চোর ডাকাতের? জানেন না লেংটার

নেই বাটপাড়ের ভয়। চোর ডাকাত আমার নেবে কি? গলার তুলসি কাঠের মালা, না গায়ের নামাবলী? তা ছাড়া এ অঞ্চলে যারা ডাকাতি করে তারা সব আপনাদেরই মাইনে করা লেঠেল। তারা আমাকে ছোঁবে না, সঙ্গে হীরা জহরৎ থাকলেও নয়। ভয় অবশ্য বাঘের আছে। কিন্তু তারাও আমাদের মত গরীব ব্রাহ্মণদের ছোঁয় না। আমাদের শরীরে আছে হাড় আর চামড়া, আর দু-তিন ছটাক রক্ত, কিন্তু রস একেবারেই নেই। বাঘরাও মানুষ চেনে, অর্থাৎ কে খাদ্য আর কে অখাদ্য। সে যাই হোক, রাত এগারটা আন্দাজ বেরিয়ে পড়লুম আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খঞ্জনার ধারে গিয়ে পড়লুম। খঞ্জনা কখনো দেখেছেন? চমৎকার নদী। রসি দু-তিনের চাইতে বেশি চওড়া নয়—কিন্তু বারোমাস তাতে জল থাকে আর সে জল বারোমাস টলটল করেছে, তক্ তক্ করছে। এই খঞ্জনার ধার দিয়েই সোজা নন্দীগ্রাম যেতে হয়।

কোজাগর পূর্ণিমার রাত চাঁদের আলোয় গাছপালা সব হাসছে, আর আলোকলতায় ছাওয়া ফুলের গাছগুলো দেখতে মনে হচ্ছে যেন সব সোনার তারে জড়ানো। আমি মহা ফূর্ত্তি করে চলেছি, এমন সময় পালপাড়ার সুমুখে গিয়ে উঠলুম। পালপাড়া বলে এখন কোনও গ্রাম নেই কিন্তু তার নাম আছে। সমস্ত গ্রাম বনজঙ্গলে গ্রাস করেছে। সুধু এ গ্রামের সেকালের ধনকুবের সনাতন পালের আধ ক্রোশ জোড়া ভাঙ্গা বাড়ী পালদের উড়ে যাওয়া টাকার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এমন সময় নদীর মধ্যে থেকে একটি গানের সুর আমার কানে এল। গানের সুর বোধ হয় ভাটিয়ালী। বাঁশীর মত মিষ্টি তার আওয়াজ—আর সে গান শোনবা মাত্র মন উদাস হয়ে যায়, আর চোখে আপনা হতেই জল আসে। জীবনের যত আক্ষেপ যেন, সে গানের মধ্যে আছে।

একটু পরে দেখি—পাঁচটী তামার ঘড়া উজোন বয়ে ভেসে আস্‌ছে আর উপরে একটী ছেলে জোড়াসন হয়ে বসে গান করছে। সে যেন সাক্ষাৎ দেব-পুত্র। ধবধবে তার রঙ, কুঁদে কাটা তার মুখ, পায়ে তার সোনার মল, হাতে সোনার বালা ও বাজু, গলায় সাতনলী হার। বুকে ঝুলছে সোনার পৈতা। পরণে রক্তের মত লাল চেলি, কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা। একটু লক্ষ্য করে দেখলুম যা তার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তা সোনার অলঙ্কার নয় সোনার সাপ। আর সেই দেব-বালকের কোলে রয়েছে একটি ছোট ছেলের কঙ্কাল। তখন বুঝলুম এটি হচ্ছে একটি যক। তখন মনে পড়ল ছেলেবেলায় শুনেছিলুম সনাতন পাল একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে যক দিয়েছিলেন, সে তাঁর ধন রক্ষা করেছিল কিন্তু তাঁর বংশ নির্ম্মূল করেছিল।

আমি সনাতন পালের পড়ো-বাড়ীর সুমুখে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে এই দিব্য-মূর্ত্তি দেখছিলুম আর এক মনে এই পাগল করা গান শুনছিলুম। হঠাৎ কোত্থেকে কষ্টি পাথরের মত কালো একটুকরো মেঘ এসে চাঁদের মুখ ঢেকে দিলে। অমনি চারদিক্ অন্ধকার হয়ে গেল। সেই ঘোর অন্ধকার যেন আমাকে চেপে ধরলে। আর সেই অন্ধকারে সেই সব তামার ঘড়া আর সেই দেব-বালক অদৃশ্য হয়ে গেল—আর তার গানের সুরও আস্তে আস্তে আকাশে মিলিয়ে গেল। অমনি সে মেঘও কেটে গেল আর দিনের আলোর মত ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় গাছপালা সব আবার হেসে উঠল।

তখন দেখি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে যেন আমার রক্ত-মাংসের শরীর পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

খানিকক্ষণ পরে আমার দেহে প্রাণ ফিরে এল। আর নিশিতে পাওয়া লোক যেভাবে হাঁটে সেই ভাবে হাঁটতে হাঁটতে সূর্য্য ওঠবার আগে নন্দীগ্রামে গিয়ে পৌঁছুলুম।

কিন্তু এই যখ দেখার কথা কাউকেও বলি নি। কারণ এ কথা মুখে মুখে প্রচার হলে, হাজার লোক খঞ্জনায় নেমে পড়ত, ঐ তামার ঘড়ার তল্লাসে। অবশ্য তাতে তাদের জলে ডোবা ছাড়া আর কিছু ফল হত না। সে সব ঘড়া ডুবুরীরা উপরে তুলতে পারত না—মধ্যে থেকে তারা খঞ্জনার ফটিক জল সুধু ঘুলিয়ে দিত। আর যদি তারা সেই মোহর-ভরা ঘড়া তুলতেই পারত, তাহলে আরও সর্ব্বনাশ হত। কারণ ঐ সব ঘড়ায় পোরা প্রতি মোহরটি সোনার সাপ হয়ে গিয়েছিল। সে সাপ যখের গায়ে গহনা, কিন্তু মানুষে ছোঁবামাত্র মারা যায়।

রমা-ঠাকুরের গল্পও শেষ হল, আর পিসিমা এক বাটী পাঁচন নিয়ে এসে হাজির হলেন। এ গল্প যেমন শুনেছি তেমনি লিখ্‌ছি। আশা করি এই পাড়াগেঁয়ে গল্প তোমাদের কাছে পাড়াগেঁয়ে কবিরাজী পাঁচনের মত বিস্বাদ লাগবে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

দিন ও রাত্রি

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এদিনের পথ দিয়ে আসিতে দুধারে
দুচোখে চেয়েছি বারে বারে।
জীবন আলোকে নেই নিঃসীমার দূর
রহস্যে মন্ত্রিত বাজে কাছাকাছি সুর।
সেই সুর তৃণে তৃণে, চেনা নামে নামে,
সেই সুর শুনে গেছি গ্রাম হ'তে গ্রামে।
মুগ্ধ মনে চাই জেনে নিতে
যা-কিছু প্রাণের ছন্দে রূপময় হোলো চারিভিতে
কুম্‌ড়ো-লতার ফুল খড়ের চালের পরে নামি'
দুপুরের রোদে ধরে মাটির প্রণামী।
সম্ভাবনার শেষ মেঠো পথ পাশে
কচু পাতা হোলো অনায়াসে।
স্বচ্ছ দিঘি জলে
গতিমগ্ন বোবা মাছ প্রাণের নিগূঢ় সুখে ঝলে।
তটপ্রান্তে সঙ্কলিত তেঁতুল তরুর কাঁপে ছায়া
রেখায় আলোকে রচে সূক্ষ্ম কায়া,
চারু চিত্রজালে তার
প্রজাপতি ফেরে পুনর্ব্বার।
বাঁকা-চোরা গলি বেয়ে কচিৎ চলেচে লোক ;
ঝরে অপরাহ্নভাঙা সোনার আলোক
পাতার অস্ফুট শব্দে, পাখী গানে—
সব মিশে প্রাণ কথা কয় প্রাণে।
কোনোখানে নাহি তল, ভাবের অবধি,
এই যা জেনেচি তাই শুভ্রকালে র'বে, রাখি যদি
দিনের বিচিত্র ভালোবাসা
এ যে তারি ভাষা।

কাটালু পরম দিবা অনুভবি' জীবন্ত ধরণী,—
সন্ধ্যা প্রান্তে মৌনতায় দাঁড়ালো সরণী ॥

এখানে অগণ্য দূর-লোক,
অন্ধকার জ্যোতির্ম্ময়, সৃষ্টিপটে মগ্ন হোলো চোখ।
স্তম্ভিত সন্ধান বুকে জাগে
চাওয়ার সিন্ধুর পার কোথা নাহি লাগে।
দিগন্তবিহীন চলা, স্তরে স্তরে, না-জানার ডাক।
মন মোরে শুধায় নির্ব্বাক—
এখানে দীনের ধন ধরণীর ধূলি
ছোটো মোর চেয়ে-দেখাগুলি
গ্রাম গ্রামান্তের কথা, তুচ্ছ নিমেষের ইতিহাস
দিবে না কি পথের আভাস ?
বেদনা-চঞ্চল মোর স্মৃতিস্বরা জাগ্রত চেতনা,
দিন-ধ্যান আলোক উন্মনা
প্রাণতীর্থ হতে মহাবাণী
দিবে না অন্তর তলে আনি' ?
মোর ছোটো গৃহদ্বারে যে-মুক্তি করেচি অবারিত
বেড়া-ঘেরা কুঞ্জ মোর যে পরম আকাশ-বিস্মিত,
সুন্দরের যে-মাধুরী উজ্জ্বলিয়া এনেচে আহ্বান,
জয়ী কি হবে না সেই সহজের অবিনাশী দান
অন্ধকারের পথে যেতে
অজানিত দূরের সঙ্কেতে ?
দিন রাত্রি মোর চিত্তে গাঁথিবে না প্রাণের অক্ষরে
বিচিত্র বাণীর সমস্বরে
পূর্ণের কবিতা ?
সামান্যের ব্যঞ্জনায় মহাকাশ ভরি'
শুনিবে না শেষক্ষণে মন্ত্রশান্ত মোর বিভাবরী
জীবন মৃত্যুর মর্ম্মগীতা ?

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"রংলাল"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

অনেক কাঠ-খড় পোড়াইয়া সুদূর মিথিলায় একটি চাকরি জুটিল। মনিব একজন কুঠিয়াল সাহেব।

ভাবিলাম—না, এ ধুতি-চাদরের কর্ম্ম নয়, হ্যাটকোট সিগারেট-চুরুটে জায়গাটাতে প্রথম হইতে জাঁকিয়া বসিতে হইবে, ওদিকে এখনও এ সবের কদর আছে শোনা যায়। স্ত্রী সুটকেসে একজোড়া ধুতি দিতেছিলেন, প্রবলভাবে নিবারণ করিয়া বলিলাম—"না, না, ও সব বাতিল; আমার জীবন থেকে ও-যুগই চলে গেছে ব'লে জেনো।"

স্ত্রী বলিলেন—"বুঝি না বাপু, কি মন্দ যুগটাই ছিল এমন?"

বলিলাম—"আমি সত্য-ত্রেতা যুগ ব'লে মেনে নিতেও রাজী আছি—পবিত্র খদ্দর, দায়িত্বহীন জীবন, অর্থমনর্থমের বালাই নেই···কিন্তু আপাতত পায়জামা, স্লিপিংসুট আর হাফ শার্ট দিতে যেন ভুল না; শ্রীরামচন্দ্রের দরবারে বাল্মীকী মুনি চ'লেচেন ব'লে যেন ভ্রম ক'রে ব'স না।" টাই-য়ে গেরো কষিয়া হ্যাটটা মাথায় চাপাইয়া লইলাম। চাকর আসিয়া খবর দিল ট্যাক্সি হাজির।

গন্তব্য ষ্টেশনে ট্রেণ পহুঁছিল পরের দিন প্রায় তিনটার সময়। গেটের কাছে বৃদ্ধ ষ্টেশন-মাষ্টার, আগে একটি সেলাম করিয়া টিকিটের জন্ম হাত পাতিলেন, তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়া বাহিরে আসিলাম।

এইখানে আমার সম্ভ্রমে প্রথম আঘাত লাগিল। চিঠিটা বোধ হয় সময়ে পৌঁছায় নাই, কুঠির দিক হইতে কোন রকম যান-বাহনের বন্দোবস্ত নাই। একটি মাত্র ভাড়াটে একা একটি বাদাম গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছে। চালক বোধ হয় আমায় দেখিয়াই, তাহার কঙ্কালসার ঘোড়াটাকে সাধ্যমত আমার হ্যাটকোটের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্ম প্রবলবেগে ডলাইমলাই সুরু করিয়া দিয়াছে। কঞ্চি আর ধনুকাকৃতি বাঁশের গাড়ি, স্প্রিং-এর নাম গন্ধ নাই, ফুটতিনেক উঁচু, গজদু'য়েক লম্বা। মনটা দমিয়া গেলেও উপায়ান্তর না দেখিয়া সেইটাই ভাড়া করা গেল। একমান শুকন ঘাসের উপর একটা ছিন্ন মলিন চট বিছাইয়া গদগদ হইয়া বলিল—"বইঠকে যাও" অর্থাৎ বসিতে আজ্ঞা হোক্।

সন্দিগ্ধভাবে একবার প্রশ্ন করিলাম—"কুঠি যেতে হবে; পার্‌বে তো?"

"আধ ঘণ্টার বেশী লাগবে না। বুঝতেই পারবেন না—মোটরে ব'সে আচি কি একায়"—বলিয়া গদির নীচে আরও দুইটি ঘাস দিয়া উপর হইতে ঠুকিয়া-ঠাকিয়া দিল। ঘোড়ার পিঠে একটা চাপড় মারিয়া বলিল—"চল্, নয়া বড়াবাবুর কাছে বক্‌শিষ···"

একটু রুক্ষস্বরে কহিলাম—"বড়াবাবু নেহি, ছোটা সাহেব কহো।"

পাঁচটা নাগাদ একা আসিয়া বাসার সাম্‌নে দাঁড়াইল। দেখিলাম এটি আমার সাহেবত্বের দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক। ছ্যাঁচা বেড়ার ঘর, খড়ের ছাউনির উপর কুমড়া গাছে ভরিয়া গিয়াছে; বেড়ায় ঝিঙে। সাম্‌নে একটা চাতালের উপর তুলসী গাছ, তাহার গোড়ায় একটা ভাঙা টবে মনসা। আমার পূর্ব্বতন 'বড়াবাবু' মহিম রায় বাড়ীটাকে এমন মারাত্মক রকম বাঙালী-মার্কা করিয়া গিয়াছেন যে এখানে টুপি-প্যাণ্টালুনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা একটা রীতিমত সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় বুঝি।

একার চারিদিকে শীঘ্রই একটু ভিড় জমিয়া গেল। কুঠির দু'একজন আমলা, দু'তিনটা পিওন, গ্রামের ইতর-

ভদ্র কয়েকজন লোক। আমি বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়িয়া গেলাম। মনে হইল যেন এই জীর্ণ একাগাড়ি আর সামনের ঐ বাড়ী—এই দুটাতে চক্রান্ত করিয়া আমার পোষাকশুদ্ধ আমাকে সকলের সামনে পরম দ্রষ্টব্যরূপে তুলিয়া ধরিয়াছে। সকলের লম্বা সেলাম আর নির্ব্বাক সশ্রদ্ধ ভাবটাতে মনের সঙ্কোচটা একটু কাটাইয়া নামিতে যাইব এমন সময় একটা বেশ বলিষ্ঠ গোছের দেশী কুকুর সবার পায়ের মধ্যে থেকে সামান্য একটু আগাইয়া আসিয়া ঠিক আমার সামনেটিতে মুখ উঁচু করিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীরটা রাঙা, ডান চোখের চারিদিকে একটা গোল সাদা দাগ, একদিকের কানটা খাড়া, একদিকের ঝোলা, দেখিতে হইয়াছে যেন চোখে পাঁশনে-পরা একটা অতি বখাটে ছোক্‌রা তাহার টুপিটা লক্ষ্ণৌয়ী কায়দায় বাঁকা করিয়া পরিয়াছে। দাঁড়াইয়া, যেদিকের কানটা খাড়া সেইদিকে ঘাড়টা অল্প একটু উঁচু করিয়া পরম অভিনিবেশের সহিত আমায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অন্য কুকুর হইলে বোধ হয় ডাকিয়া পাড়া মাথায় করিত, এ একেবারে সে দিক দিয়াও গেল না, শুধু একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল মাত্র।

হোক্ কুকুর, কিন্তু ভাবটা এতই মানুষের অনুরূপ যে আমি সেলামে-সমীহে যে সঙ্কোচটা কাটাইয়া উঠিতেছিলাম, তাহা হঠাৎ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া আমায় একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মনে হইল যেন হ্যাটকোটধারী কালা-সাহেব আমি সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া শেষ পর্য্যন্ত এক মহা বিচক্ষণ সমালোচকের হাতে পড়িয়া গিয়াছি। আর সকলে খাতিরে পড়িয়া সম্মান করুক্, এই একটি জীব আমার অপরূপত্বটুকু সমস্ত অন্তর দিয়া উপভোগ করিতেছে।

নামিতে গিয়া পায়ে প্যান্টালুন আট্‌কাইয়া একটু পড়-পড় হইলাম। কয়েকজন ব্যস্তভাবে আগাইয়া আসিল, কুকুরটা এক পা পিছাইয়া গিয়া মুখটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়া "হুঁফ" করিয়া একটা হ্রস্ব আওয়াজ করিল। স্পষ্ট যেন বলিল—"হুঁঃ, এই তো সাহেব, তা'র আবার···"—যদি কথা কহিয়া বলিত, এর চেয়ে স্পষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না, অন্তত আমি এর চেয়ে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না। এক-মানটাকে আনা পাঁচেক ভাড়া দিলেই যথেষ্ট হইত, একটা টাকা বাহির করিয়া দিলাম। কেন দিলাম যে স্পষ্ট বলিতে পারি না তবে ঐ বেয়াড়া কুকুরটার কাছে সাহেবী চালটা বজায় রাখা নিতান্ত দরকার—বোধ হয় আব্‌ছা আব্‌ছা এই রকম একটা কথা মনে হইয়াছিল।

একমান একেবারে তিনচারটা সেলাম করিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইল। চারিদিকের মৃদু-গুঞ্জনে বুঝিলাম আর সবার কাছেও আমার সাহেবিয়ানাটা দ্রুত অনুমোদিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু রংলাল কোথায়? যাহার জন্য এত...

দেখি ভিড় থেকে সরিয়া কয়েক গজ দূরে, একমানটা যেখানে একটা ইঁটের উপর টাকাটা বারংবার বাজাইয়া যাচাই করিতেছে, কুকুরটা পাশে জুটিয়া, উঁচু কানের দিকে মাথাটা ঈষৎ হেলাইয়া সেই রকম স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে। মুখে হাসি; অন্য কুকুর হইলে বলা চলিত জিভ বাহির করিয়া মাথা দুলাইয়া একটু একটু হাঁফাইতেছে, কিন্তু এর সম্বন্ধে আর আমার সন্দেহ রহিল না যে ওটা কুটিল হাসি,—অর্থ হইতেছে,—"কেমন হে ঠিক আছে তো?...বোকারামকে খুব ঠকান গেল—হিঃ-হিঃ—"

স্বীকার করি, আমার মনের ভুল; কিন্তু তখন এর চেয়ে সরল সত্য সেখানে আর কিছু ছিল না।

২

বাসায় আসিয়া উঠিলাম। উঠানের মাঝখানে একটা চটমোড়া তেলচিটে ডেক্‌চেয়ার, দেখিয়াই মনে হইল মহিমবাবু ইহাতে আটহাতী কাপড় পড়িয়া খেলো হুঁকায় তামাক টানিতেন। পাশে একটি চৌকি—রোদে বৃষ্টিতে মাঝখানটা বাঁকিয়া গিয়াছে, একটা পায়া নাই—সেখানে তিনখানা ইটের ঠেক্‌না দেওয়া। আমি বসিতে আগন্তুকদের কয়েকজন চৌকির উপর বসিল। ইহারা আমলা।

একটু পরিচয়াদি হইল। খুব বৃদ্ধ গোছের একজন অগ্রণী হইলেন—"উনি পেশকার সাহেব, ইনি হাজিরনবীশ, ইনি তহশীলদার; ইনি হচ্ছেন এক্‌মণ্ট্ বাবু (একাউন্টেন্ট)··· হুজুরের কোন রকম কষ্ট হয়নি তো পথে?"

অপর একজন বৃদ্ধের পরিচয় দিলেন—"ইনি দেওয়ানজি, লালা রামকিষুণলাল; সব চেয়ে প্রাচীন লোক এখানে।"

দেওয়ানজি দন্তলেশহীন মুখে হাসিয়া, সেলাম করিয়া বলিলেন—"সব হুজুরকা মেহেরবানি।"

তাঁহার প্রাচীনত্বে আমার কি মেহেরবানি থাকিতে পারে বুঝিতে না পারিলেও বলিলাম—"বড় আনন্দের বিষয়।"

একটু চুপচাপ রহিল। দেওয়ানজি গলা পরিষ্কার করিয়া কি একটা বলিবেন এমন সময় একজন পিওন একটা মাঝবয়সী, কাল, তেলচুকচুকে লোককে সামনে হাজির করিল। দেওয়ানজি বলিলেন—"হুজুরের 'টহলু' (চাকর), নাম লোট্না···নে, সাহেবের সব গোছগাছ ক'রে ফেল; খবরদার যেন কোন রকম কষ্ট না হয়, তাহ'লে···"

চাকর পাইয়া মনটা একটু প্রফুল্ল হইল, কিন্তু দেখি লোট্নার পাশে সেই কুকুরটা দাঁড়াইয়া! বুঝিলাম পিওনের সঙ্গে সঙ্গে সেও লোট্নাকে ডাকিয়া আনিতে গিয়াছিল। দেওয়ানজির কথা শেষ হইলে একটু সামনে আসিয়া লোটনার মুখেরদিকে ঘাড়টা বাঁকাইয়া চাহিল,—জিভ বাহির করা, ডান চোখটা একটু টেপা; ভাবটা যেন—'এর কথাই তোকে জানাতে গিয়েছিলাম···কেমন?··'

একটু পরে সবাই উঠিয়া গেলে লোটনা খুব লম্বা একটা সেলাম করিয়া বলিল—"হাম্ নৈহট্টি থাকছিল—তিন বরষ।"—বলিয়া একটা সেলাম করিয়া দন্ত বিকশিত করিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম এরকম অদ্ভুত আত্মপরিচয়ে একটু রাগ হইল। তাহা ভিন্ন সাহেবের সামনে ওরকম হাসির মানে কি? একটা ধমক দিয়া চৈতন্য সঞ্চার করিতে যাইতেছিলাম,—সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—না, এই এখন আশা-ভরসা, খুসী রাখাই ভাল। তা' ভিন্ন আমার হিন্দির পুঁজি যে রকম, ওর বাঙ্গলা জ্ঞানে অনেকটা সামলাইয়া লইবে। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"তিনবছর নৈহাটি ছিলি? তাই বলি যেন চেনা চেনা মুখ। আমার বাড়ি সেরামপুর কিনা···"

লোট্না হাতজোড় করিয়া কৃতার্থ হইয়া বলিল—"হাম সিরামপুর খুব জানে, হুঁয়াসে আদালত থেকে আমার মাসীর ছেইলার জেহল্ হ'য়েছিল!"

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জায়গা সম্বন্ধে আরও একটা এমন নূতন তথ্য পাইয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"সত্যি নাকি? তবে তো দেখছি..."

লোটনা আনন্দে হাত কচলাইতে লাগিল।

চাবির রিংটা প্যান্টালুনের পকেট হইতে বাহির করিয়া দিয়া বলিলাম—"যা সুটকেস্টা নিয়ে আয়তো—চামড়ার বাক্স।"

লোটনা সুটকেশটা আনিয়া চৌকির উপর রাখিল।

ডালাটা খুলিতেই কুকুরটা সরিয়া আসিয়া চৌকির উপর দু'টী পা তুলিয়া দিয়া দাঁড়াইল; আড় চোখে দেখিলাম দুইটী কানই খাড়া করিয়া গভীর কৌতূহলের সহিত বাক্সের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে।···ভ্যালা বিপদ তো!

লোটনা পরিচয় দিল, বলিল—"ওর নাম রংলাল আছে; সাধু ভালা আদমিদের কুছভি বোলে না, চোরদের খুব পহছানতে আছে।"

বেটা উজবুক কোথাকার! মনের রাগ মনে চাপিয়া বলিলাম—"আচ্ছা, তুই যা দু'বালতি জল তুলে নিয়ে আয় দিকিন।···চা করতে জানিস?"

লোটনা হাসিয়া বলিল—"নৈহট্টিমে আমার চায়ের ভি দোকান ছিল।"

সুটকেশ থেকে পায়জামা, তোয়ালে, খাটো শার্ট, হালকা চটি, সাবান প্রভৃতি বাহির করিলাম। লোটনা যতক্ষণে জল লইয়া আসিল আমি ততক্ষণে ধড়াচূড়া ছাড়িয়া ঢিলা ধারিওয়ালা পায়জামা, শার্ট, ঘাসের চটি পরিয়া তৈয়ার হইয়া গিয়াছি। এইবার হাতমুখ ধুইয়া লওয়া, চাটুকু হইলে চা পান করিয়া সাহেবের সহিত একটু দেখা করিয়া আসা। তাহা হইলে এক প্রস্থ কাজ শেষ হইয়া যায়।

রংলাল চাকরটার সঙ্গে ইঁদারায় গিয়াছিল। ঘুরিয়া আসিয়া একটু যেন অবাক হইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। ভঙ্গিটা ভাষায় প্রকাশ করিলে দাঁড়ায়—এ আবার কি রূপ! একটু পরে আমার পায়ের কাছে আসিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আঘ্রাণ লইতে লাগিল।

চাকরটা ধমক দিয়া বলিল—"খবরদার, মালিক হ্যায়!"

আমি একেবারে এতটুকু হইয়া গেলাম। কথাটি ঠিক,

এই রকম দাঁড়াইল যেন—হ্যাঁ, আমার বহিরাবরণে বিশেষ করিয়া মিনিটে মিনিটে তাহা পরিবর্ত্তিত করায় এমন কিছু আছে বটে যাহাতে সন্দেহ হইবারই কথা, তবে আসলে আমি এদের মনিব। আমি মাঝখানে অসহায়ভাবে পড়িয়া আছি, ইহারা দুইজনে এখন যা দাঁড় করায়।

কুকুরটা কথাটা ভাগ করিয়া যাচাই করিবার জন্য চৌকির ও কোণটার উপর গিয়া দাঁড়াইল। একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল, তাহার পর হঠাৎ যেন চিনিতে পারিয়া, কৌতুক রসে পরিপ্লুত হইয়া, দুসারি দন্ত বিকশিত করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়া গেল।

যাক্, আপদ গেল। উঠিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বেশ ভাল করিয়া হাত মুখ ধুইয়া লইলাম, একটি টাটকা চুরুট ধরাইলাম, তাহার পর চৌকির উপর সাহেবী কায়দায় পা ছড়াইয়া ডেক্ চেয়ারটায় গা ঢালিয়া দিলাম। লোটনা চায়ের যোগাড় করিতে লাগিল।

চায়ের সুমিষ্ট প্রত্যাশার সঙ্গে এই নবীনতম পদমর্য্যাদার উপলব্ধিতে মনটি বেশ একটি আত্মতৃপ্তিতে মজিয়া আসিতেছে, এমন সময় দোর-গোড়ায় নজর পড়িতেই দেখি—সারবন্দি একেবারে পাঁচ পাঁচটা কুকুর, মাঝেরটি রংলাল।

বোধ হয় এইমাত্র আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের তদ্গত ভাবে দাঁড়াইবার ভঙ্গিতে আমার যেন মনে হইল তাহারা অনেকক্ষণ আসিয়া আমায় নিঃশব্দে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। একটি কুকুর মাদী,—রংলাল যেন তাহার বান্ধবীকে এক আজগুবী চিজ্ দেখাইয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; আমার ঘাড়ের উপর দিয়া খাতির জমাইয়া-লওয়া গোছের।

আমি চাহিতেই সবগুলার মধ্যে একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেল। রংলাল মাদীটার ঘাড়ের কাছটা দাঁত দিয়া চুলকাইবার ভাণ করিয়া বোধ হয় কানে কানে কি বলিল, পাশের কুকুরটা হঠাৎ ঘুরিয়া আসিয়া সেইখানটাতে জিজ্ঞাসুভাবে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর এ ওর ল্যাজে একটা কামড় দিল, ও তা'র পা'টা ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিল এবং এই ভাবে জড়াজড়ি করিতে করিতে সামনের জমিটাতে গিয়া লুটাপুটি গড়াগড়ি সুরু করিয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে—হিঃ—হাঃ—ওফ্ প্রভৃতি নানারকম অস্পষ্ট, চাপা আওয়াজ।

ব্যাপারটা হাসিয়া খুন হইয়া যাইবার এত কাছাকাছি, যে আমি কোন মতেই নিজের সহজ ভাবটি রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমায় উঠিতেই হইল, ট্রাঙ্ক থেকে আয়নাটা বাহির করিয়া, যৎটা সম্ভব পোষাকের ছায়া ফেলিয়া মনের দ্বিধাটা মিটাইতে চেষ্টা করিলাম। এতই কি হাস্যকর একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইয়াছি, যাহাতে—শুধু কথার কথায় নয়—নিতান্ত বাস্তবরূপে কুকুর-বিড়ালের পর্য্যন্ত পেটে খিল ধরিয়া যায়?

চায়ের স্বাদ পাওয়া গেল না। স্ত্রীর উপরও একটু রাগ হইল,—না হয় করিয়াছিলামই একটু বারণ, দিয়া দিলেই হইত কাপড় জোড়াটা—সময় আছে, অসময় আছে, আর কি-ই-যে আমার এমন বাধ্য তিনি!...চের দেখা গেল।

৩

চাকরি বেশ চলিতেছে। সাহেব সদয়, আমলারা বেশ অনুগত, 'ছোটা সাহেব'—নামটাও চালাইয়া লইয়াছি; কিন্তু জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

কুকুরটার উপর দিয়া অনেক পরীক্ষা করা গেল। প্রথমটা এককোণে চেন দিয়া বাঁধিয়া রাখা গেল, যাহাতে আমায় যখন তখন দেখিতে না পারে। তাহাতে সদা সর্ব্বদা পাড়ার নানা জাতীয় কুকুরে তাহার কুশল সমাচারের জন্য এত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল যে ক্রমাগত কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া তাহাদের পেছনে লাগিয়া থাকার চেয়ে রংলালকে মুক্ত করিয়া তাহাদের নিশ্চিন্ত করাই সমীচীন বলিয়া মনে হইল।

এক এক করিয়া দুই তিন জনকে দান করিয়া দিলাম। যাহাকেই দান করি, তিন চার দিনের মধ্যেই তাহার বাড়ি হইতে চেনটা হারাইয়া যায়, তাহার পর রংলাল ফিরিয়া আসে। এই করিয়া প্রায় এক টাকা ঐদিক দিয়া দণ্ড দিলাম।

মুস্কিল এই যে খোলাখুলি মারধোর করিতে পারি না।

বাস্তুত তাহার অপরাধটা কি? দিব্য কাছে কাছে থাকে, কামড়াটে নয়, কিছু নয়, এমন 'নিমকহালাল' কুকুরকে তাড়না করিবার কোন স্থায়সঙ্গত কারণই নাই ;— তবুও, যখন বাড়িতে কেহ নাই, অথচ কুকুরটা একটা কান নামাইয়া, আর একটা কান খাড়া করিয়া পরম দার্শনিকের মত আমায় অবলোকন করিতেছে, তাহাকে তাড়া যে না করিয়াছি এমন নয়। প্রথমটা উপেক্ষা করিয়াছি—আছে তো আছে—সামান্ত একটা কুকুর তো! চাহিয়াও দেখি নাই। ক্রমে এমন একটা অস্বস্তি মনে খচ খচ করিতে থাকে যে একবার চাহিতেই হয় ; তাহার পর থাকিয়া থাকিয়া ক্রমাগতই চাহিতে হয়, এবং যদিও অপলক দৃষ্টিতে আমার নিরীক্ষণ করা ভিন্ন তাহার কোনও দোষই থাকে না, তথাপি আমার মাথায় ক্রমশঃ যেন আগুন ধরিয়া উঠিতে থাকে ; ইঁট, অ্যাশ-ট্রে, জুতা, ঘটি, লালঠেন— যা হাতের কাছে থাকে, তাহা লইয়াই উঠি। খুন চাপিয়া যায়, ক্ষতিবৃদ্ধি জ্ঞান থাকে না।

নিজেকেও বদলাইয়া দেখা গিয়াছে। হাফপ্যাণ্ট পরিয়া দেখিয়াছি, অর্থাৎ বিলাতী পোষাক অর্দ্ধেক বলি দিয়া,--ফল হয় নাই। লুঙ্গি পরিয়া দেখিয়াছি—তাহাতে রংলাল পাড়ার তাবৎ কুকুরকে ডাকিয়া আনিয়া এমন সমারোহের সহিত আপ্যায়িত করিয়াছে যে লুঙ্গিটা সেই দিনই সাহেবের খানসামা করিম শেখকে দান করিয়া দিয়াছি।

বাকী ছিল ধুতি-চাদরের পরীক্ষা। প্রাণের জ্বালায় ধরিতামও ; কিন্তু হায়রে! এদিকে যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিয়া বসিয়া আছি। 'ছোটা সাহেব' নামটা এমন সাংঘাতিকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে এখানে ধুতি, পাঞ্জাবী, পাম্পসু—আর আমায় এ জন্মে পরিতে হইবে না।

চারিদিকে নিরাশ হইয়া অবশেষে খোসামোদ ধরিয়াছি। তাহা হীন খোসামোদ। কাছে ডাকিয়া আদর করি— "আয়, রংলাল, বেটা, আয়—চু-চু—শুনচিস্ লোটনা, কুকুরটাকে মাঝে মাঝে একটু ক'রে নাইয়ে দিস্। জানিস তো কি ক'রে নাওয়াতে হয় কুকুরকে?"

লোটনা বিজ্ঞভাবে হাসিয়া বলে—"লৈহট্টিমে আমার একটা কুকুর থাক্‌ছিল, গঙ্গাজিমে চান করাতে গিয়ে ডুমে গেল..."

মনে মনে আশান্বিত হইয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, তোর জানা আচে তা'হলে। রোজ চান করাবি—পুকুরে নিয়ে গিয়ে। বড্ড উঁচুদরের কুকুর ; টের পাওয়া যাচ্ছে কিনা...

কিছুই ফল হয় না। সেই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ; সেই ব্যঙ্গভাব, এক কাণ নামান ; বেড়াইতে বাহির হইলে পাড়ার যত কুকুর জড় করিয়া সেই পিছু পিছু অনুসরণ,—কিছুরই এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নাই।

এসব অত্যাচারের ওপর আবার খরচের জন্য মনস্তাপ আছে। রোজ মাংসের বন্দোবস্ত করিয়াছি, রাত্রে ভাতের সঙ্গে আধ সের দুধ। সাক্ষাৎ আমারই বশীভূত হইবে বলিয়া— অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইলেও—নিজের হাতে খাওয়াই। এদিকে কয়েকদিন হইতে মাদীটাকে রোজ ডাকিয়া আনে ; মাংস দুধ আর একটু বাড়াইয়া দিয়াছি, তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিলে রংলাল শীঘ্র বশ মানিবে এই আশায়।

আশা কতটা সফলতার পথে জানি না, তবে ঘাড় নীচু করিয়া খাইতে খাইতে রংলাল যেভাবে সঙ্গিনীর দিকে এক একবার তাহার সেই মারাত্মক হাসির ভঙ্গীতে আড় চোখে চায় তাহাতে যেন মনে হয় স্পষ্ট মনে বলিতেছে—"বোকারামকে ঠকাইয়া চলিতেছে মন্দ নয়, কি বল গো?..."

৪

পূজার ছুটিতে পনের দিনের ছুটি পাইয়া বাড়ি আসিয়াছি। স্ত্রী দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"একি, একেবারে যে আধখানা হ'য়ে গেছ! অথচ শুনি এমন ভাল জায়গা— পশ্চিম..."

তাহা হইলে শরীরটাও ভাঙ্গিয়াছে! আশ্চর্য্য কি? যা অশান্তি!

উত্তর করিলাম—"বিরহটা সবার ধাতে সয় না।"

স্ত্রী রাগিয়া বলিলেন—"রঙ্গ রাখ' ; এ যেন জুনজরে পড়ার লক্ষণ, শরীর যে কালী মেরে গেচে!"

একটু চুপ করিলেন বটে কিন্তু মনের কথাটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; বলিলেন—"লোকে বলে—জায়গাটা কামিখ্যের নাকি খুব কাছে? ওখানেও নাকি ভেড়াটেড়া করে?"

বলিলাম—"এই তো আমারই ওপর ঝুঁকেছিল, যখন দেখলে ভেড়া হ'য়েই গেছি এখান থেকে তখন ভাবলে আর মড়া ভেড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন?…"

তাঁহার মনের অবস্থার হিসাবে তামাসাটা বোধ হয় খুবই অসাময়িক হইল। মুখ ভার করিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, হ'য়েচে, থাক্। তোমার কিন্তু আর ওখানে যাওয়া হবে না।" বলিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ জিনিষপত্র গুছাইয়া এমন দৃঢ়তার সহিত বাক্সে ভরিয়া চাবি দিতে লাগিলেন যেন এ বিষয়ে একেবারে চরম নিষ্পত্তি হইয়া গেল। ছুটির প্রথম দিকটা ভালই কাটিল। রংলালও নাই, প্যাণ্ট-কোটও বাক্সের ভিতর, কটা দিন ধুতি চাদরের মধ্যে শরীরটাকে মুক্তি দিয়া এবং লোটনার বাঙ্গলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

ক্রমেই ছুটি যেমন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, কর্ম্মস্থানের রংলালময় ছবিগুলি চোখের সামনে স্পষ্টতর হইয়া মনটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কি ভাবিলাম জানি না;—একদিন স্ত্রীর কাছে কথাটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম; হাসিচ্ছলেই বলিলাম—"সেখানে একটা ভারী মজা হ'য়েচে—কুকুর যে এত মানুষের মত লক্ষ্য ক'রতে পারে জানতাম না; অন্তত তার রং ঢং দেখলে তোমার মনে হ'তেই হবে সে খুব বিবেচকের মত তোমার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য ক'রচে।" কাহিনীটা আগাগোড়া বলিয়া গেলাম।

হাসিচ্ছলে আরম্ভ করিলাম বটে, কিন্তু ব্যাপারটা মূলতঃ আমার কাছে লঘু ছিল না বলিয়াই হোক আর যে জন্যই হোক বর্ণনাটা বেশ স্পষ্ট এবং একটানা হইল না। বাক্যে বাক্যে জড়াজড়ি করিয়া সুধু এইটুকুই স্পষ্ট করিয়া দিল যে এর মধ্যে কোথায় যেন আমার একটু দুর্ব্বলতা আছে—যা' আমি গোপন করিতে চাহি।

স্ত্রী শোনার সময় কোথাও একটু হাসিলেন না, শোনার শেষে আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন, এবং মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিলেন—"ওটা বুঝি তোমার কুকুর হ'ল?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"এতক্ষণ ধ'রে তবে শুনলে কি? দিশী কুকুর—গায়ের রং রাঙা ব'লে…"

স্ত্রী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"থাম' বাপু, কুকুরতো কখন কেউ দেখেনি। অমন একদিষ্টে চাউনি কুকুরের?"

"সেইটিই তো বুঝতে পারি না; তবে আর তোমায়…"

"বুদ্ধি কি তোমার রেখেচে যে বুঝবে? না, তোমরা পার' এ সব ব্যাপার বুঝতে?—এতো পষ্ট কোন খারাপ মেয়েমানুষ কুকুরের বেশ ধ'রে…"

আমি কুসংস্কারের দৌড় দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কহিলাম—"সর্ব্বনাশ! একটা জলজ্যান্ত কুকুর—দিনরাত হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি ক'রে বেড়াচ্চে—দিনের আলোর মত স্পষ্ট—আর তুমি কিনা…"

"যত পষ্ট তত সর্ব্বনাশের গোড়া। তোমরা যখন এসব কিছু বোঝ না তখন চুপ ক'রে থাক। বিশ্বাস না হয় এক্ষুণি তাঁতী বৌকে ডেকে পাঠাচ্ছি, তার মুখেই শোন। চন্দোরের মাও বোঝে কিছু কিছু, লক্ষণ মিলিয়ে ঠিক ব'লে দেবে কোন মেয়েমানুষ, কোথায় থাকে।…আমার অদৃষ্টে শেষ পর্য্যন্ত যে কি আছে; মা মঙ্গলচণ্ডী যে…"

বাড়াবাড়ির সম্ভাবনা দেখিয়া আমি বলিলাম—"থাক্, আর ওদের ডেকে কাজ নেই; কিন্তু খারাপ মেয়েমানুষই যদি হ'ত কুকুরটা অন্তত…"

স্ত্রী হাত উঁচাইয়া বলিলেন—"থাক্ যে বোঝে না তা'র সঙ্গে আর বেরথা তক্ক করতে চাই না। মোট কথা তোমার আর ওখানে যাওয়া হবে না। আমি জানি জায়গাটা কামিখ্যের একেবারে কাছে—তুমি আমায় লুকিয়ে ভেতরে ভেতরে এই সব…"

রাগ হইয়া পড়িল। বিশেষ করিয়া উঁহার এই কামাখ্যা-বাতিকে তো আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়াছে। সেবারে বম্বে বেড়াইতে গেলাম, অসুখের টেলিগ্রাম দিয়া পঁহুছিবার পরদিনই আনাইয়া লইলেন; আসিয়া শুনিলাম—টের পাইয়াছেন জায়গাটা কামাখ্যার কাছাকাছি। দিল্লী-লাহোর কামাখ্যা হইতে বেশী দূর নয় বলিয়া এ পর্য্যন্ত পূজার

ছুটিতে বেড়াইতে যাওয়া হইল না। রেঙ্গুন কামাখ্যা ওঁর মতে দু'টো পাশাপাশি ষ্টেশন,—দুইদিন উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিলেন, তিনশো টাকার অমন চাকরিটা লওয়া হইল না। আমার যাওয়ার কথা হইলে কামাখ্যা আবার রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসে—এর চেয়ে আর বিপদ কি আছে? মা-জানকীর দেশ বলিয়া—এক্ষেত্রে কোন রকমে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম—কিন্তু মনের সন্দেহ আর কতদিন চাপা থাকিবে?

বিরক্তির সহিত বলিলাম—"কামিখ্যে তো তোমার চারিদিকেই।...দেখত কাণ্ড—একটা কুকুর চেয়ে থাকে ব'লে আমায় চাকরি ছাড়তে হবে? এমন জানলে কোন মুখ্যু তোমায় ব'লতে যেত।"

প্রথম একরাশ প্রশ্ন বর্ষিত হইল। প্রাণের চেয়ে কি চাকরী বড়? শাকভাত খাইয়া লোকের দিন চলে না? দেশের যে সকল লোক বিদেশে চাকরি করে না, তাহাদের স্ত্রীপুত্র কি বাঁচিয়া নাই?...

প্রশ্নগুলি ক্রমে ব্যক্তিগত রূপ ধারণ করিল—এই মাস চারেকেই জায়গাটার উপর এতটা টান হইল কেন আমার? কুকুরটাকে ওপরে ওপরে দেখিতে পারি না, অথচ তাহার দুধ মাংস বরাদ্দ করিবার কারণ কি? যদি কথাটা সোজাই ছিল তো এতদিন লুকাইবার কি কারণ ছিল?

দেখিলাম হাতে আঁচল উঠিয়াছে, চোখের পাপড়িগুলি একটু ঘন ঘন উঠানামা করিতেছে। বুঝিতে বাকী রহিল না এবারে অশ্রুস্রোতে যে-সব প্রশ্ন নামিবে সেগুলি হইবে যেমন উত্তপ্ত তেমনই বেগবান। আপাতত চাকরি-সমস্যার চেয়ে সেটা গুরুতর হইবে জানিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

রাত্রে আহার করিবার সময় দেখিলাম ভাবটা প্রসন্ন। চাকরির কথাটা তুলিব তুলিব করিয়া প্রয়োজনানুরূপ শক্তি সঞ্চয় করিতেছি, বলিলেন—"একটা মস্তবড় সুখবর আছে কি খাওয়াবে বল।"

বলিলাম—"ভেড়ার মাংস খাও তো লোক ডাকি, গা থেকে কেটে নিক্।"

রাগিতে গিয়া হাসিয়া বলিলেন—"খালি তামাসা।... আজ তাঁতী-গিন্নী বুড়ীকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সব শুনে কি ব'ললে বলতো?"

"শেকল গড়াতে।"

"শুনেই বললে—কুকুর না হাতী; কোন মেম-পেত্নী; দিশী কোন কু-মেয়েমানুষ হ'লে ও-পোষাকের দিকে ঘেঁসত না।...ব'ললাম—তবু ভাল। মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে তক্ষুণি পাঁচ শিকে মানত করে তুলে রাখলাম।"

"মা তাঁতী-বৌয়ের কি বিদায় হ'ল?"

"ওরা গরীব মানুষ, ডাকলে আপন জেনে আসে, ভাল পরামর্শটা-আসটা দেয়। দোষ আবার কি? উল্টে বরং ব'ললে—ও পাপ কেরেস্তানী পোষাক আর বাড়ীতে রেখ না।...বার ক'রে দিলাম। বুড়ো মানুষ, বয়সের ভারে নুয়ে গেচে, তবু সেই পেল্লয় গাঁঠড়ি ঘাড়ে ক'রে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে গেল। শুনে অবধি এমন হয়েছিল, আদাড়ে জিনিসগুলো সরিয়ে হাড়ে যেন বাতাস লাগল।... ওকি, হাত গুটুচ্চ যে! তাঁতী-বৌয়ের কল্যাণে চাকরি রয়ে গেল, কোথায় খুসী হ'য়ে দুটি খাবে, না...মাছের ডালনাটা আর একটু দি, ব'স।"

রাগে, বিরক্তিতে সে-রাত্রে আর কথা কহিলাম না, কেননা মুখ খুলিলেই একটু বাড়াবাড়ি হইয়া যাইত। অন্তরাল হইতে একবার কানে গেল, স্ত্রী ঝিকে সঙ্গোপনে বলিতেছেন—"দেখছিস তো?—ঠিক মিলে যাচ্চে; তাঁতী—বৌ ব'লেই ছিল—ও-পোষাকের ওপর কুদৃষ্টির জন্যে একটা টান প'ড়ে গেচে, এক চোট ভয়ঙ্কর চটবেই—দেখেচিস্ তো রাগের বহর?"

দুঃখও হইল,—ন্যায়সঙ্গত রাগের এমন কদর্থ, এতটা অমর্য্যাদা পূর্ব্বে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। আমি যত চটিতেছি উঁহারা দিব্য বসিয়া বসিয়া ততই লক্ষণ মিলাইতেছে।

পরের দিন কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে অন্য ভাবে দেখা দিল। ভাবিলাম—যাক্, সমস্ত ব্যাপারটা গোটা ত্রিশ চল্লিশ টাকার উপর দিয়া যদি শেষ হয় তো মন্দের ভাল। এখন আমায় বাধ্য হইয়া ধুতিচাদরপরিহিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। নিজের ইচ্ছায়

কোট-প্যাণ্ট ছাড়া হইত না, এতে একটা সান্ত্বনাও রহিল, আর ওদিকে রংলাল-সমস্যাও মিটিল! দুঃখ রহিল—"ছোটা সাহেব" আবার 'বড়া বাবু' হইতে চলিলেন। তা'হোক, মোহটা অনেক কাটিয়া আসিয়াছিল, বাকীটুকু কাটিতে দেরী হইবে না।

বাকী থাকে হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনের জন্য সাহেবকে এবং অনুগত আমলাবৃন্দকে একটা অজুহাত দেখান, অন্তত জিজ্ঞাসা করিলে একটা সমীচীন উত্তর দেওয়া। একটি বেশ সভ্য এবং সুসঙ্গত মিথ্যা রচনায় ব্যাপৃত রহিলাম।

৫

কুঠির টম্‌টম্‌ হইতে নামিয়া দেখিলাম অভ্যর্থনার জন্য কয়েকজন আমলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত রহিয়াছেন। সেলাম, প্রতি-সেলাম কুশল প্রশ্নাদি হইল। লক্ষ্য করিলাম লালা রামকিষুণ সেলাম না করিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন। মুখে একটি তৃপ্ত হাসি।

সকলের নয়ন এবং অধর কোণে একটি প্রশ্ন নাচিয়া বেড়াইতেছিল, আগুসার হইয়া আমি নিজেই সবার কৌতূহল মিটাইয়া দিলাম। বলিলাম—"হ্যাঁ, আর সবই তো কুশল, তবে গাড়ি থেকে আমার সুটকেস্‌টা কাল রাত্রে চুরি হ'য়ে গেছে, পোষাক পরিচ্ছদ যা কিছু সব তাইতেই ছিল। এই দেখুন না, ভাগ্যিস্‌ একসেট কাপড়চোপড় এনেছিলাম ?"

চারিদিক থেকে সহানুভূতির একটি মৃদু কলরব উঠিল। লালা রামকিষুণ একেবারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—"তাই নাকি ? ভারী জুলুমতো !!"

বেশ বোঝা গেল সকলেই ভেতরে ভেতরে খুসী, এবং লালা রামকিষুণের আনন্দটা সকলের চেয়ে অধিক বলিয়াই তাঁহার এত আড়ম্বরের সহিত সহানুভূতি দেখান দরকার হইয়া পড়িল। এর পরে যে কথাবার্ত্তা হইল তাহার মধ্যে মর্য্যাদার ব্যবধান রক্ষা করিয়াও এমন একটি নিগূঢ় আত্মীয়তার সুর ছিল যে তাঁতীবৌয়ের ওপর আমার সমস্ত আক্রোশটা ধুইয়া মুছিয়া গেল। বুঝিলাম বিদেশে 'ছোট সাহেব' হইয়া একলা একলা থাকার চেয়ে 'বড়বাবু' হইয়া সবার হৃদয়ের সান্নিধ্য-লাভ করা সমধিক ভাগ্যের কথা।

কোঁচান চাদরের হাওয়া খাইতে খাইতে চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছি, রংলাল হাজির। দূরে দাঁড়াইয়া প্রথমে দুইটা কান খাড়া করিয়া, পরে একটা কান নামাইয়া, মাথাটা কাৎ করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। আমিও অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে দেখিতে লাগিলাম কি করে; ক্ষণিক পরে বলিলাম—"কিরে রংলাল, চিনতে পারিস না ?"

আওয়াজ শুনিতে যা দেরি, রংলাল ছুটিয়া আসিয়া একেবারে কোলে লাফাইয়া উঠিল, তখনই নামিয়া, মাটিতে বুক চাপিয়া, মাথা ল্যাজ নাড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; আবার লাফাইয়া, হাঁটুতে থাবা তুলিয়া, আদর খাইয়া, আমার জামা কাপড় চাটিয়া চুটিয়া এককাণ্ড করিয়া তুলিল।

অনেকদিন পরে দেখার জন্যই এই স্নেহের উপদ্রব; কিন্তু আমার মনে হইল—কোটপ্যাণ্টালুন মুক্ত বলিয়াই কুকুরটা আমাকে এতদিনে এই প্রথম তাহার নির্ম্মল পশু হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি দিয়া অভিষেক করিয়া লইল।

আমার ঘাড় থেকে মেম-পেত্নী না হোক সাহেব-ভূত যে নামিয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ওঝা-গিরির যশ খানিকটা তাঁতী-বৌকে দিতে হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশই যে রংলালের প্রাপ্য সে কথা আর কেহ না জানিলেও আমি মর্ম্মে মর্ম্মে জানি।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আধুনিকা

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী

‘গ্লোবে’ আজ সকালেই টিকিট্ কোরেচো ‘বুক্’ ?—থাক্‌গে’ !
‘ক্যান্সাল্’ দাও কোরে ! যাবোনা ওখানে ! টাকা—যাক্‌গে’ !
ইচ্ছে না থাকলেও তবু যেতে হবে নাকি ? - ভারী তো ! !
গোটা দশ টাকা যাবে ?···এক্ষুণি দিয়ে দিতে পারি তো !
ঢাউস ফিয়েট্‌খানা কেন মিছে নিয়ে এলো জ্বালাতে ?
আঁটা-‘হুড্’ ‘কার্’ দেখে মনে হয় কেঁদে ছুটে পালাতে !
পাঁচ হাজারেতে মিছে ওই আঁটা সাঁটা গাড়ী কিন্‌লে ?—
এত গাড়ী থাকতেও ‘ফিক্সড্ হুড্ কার্’টাই চিন্‌লে !
চড়লেই মনে হয় গদী আঁটা সিন্দুকে ঢুকেচি !
চাই না ও ছাই গাড়ী ! দূরে থেকে কুর্ণিশ ঠুকেচি !
নিচে গিয়ে চটপট্ শোফারকে বোলে আয় ‘কাস্তে’ !—
বড়ো গাড়ী তুলে রেখে গ্যারেজেতে,‘টু-সীটার্’ আন্‌তে !

আরামে দু’জনে বেশ যাওয়া যাবে নিউ বেবী কারেতে,
লঙ রাণ্ দেবো আজ ‘আছি-পুরে’ গঙ্গার ধারেতে।
ষ্টীয়ারিং ঘোরানোটা শিখে গেছি—দেখনি তো কালকে !···
আচ্ছা,—জিগেস্ করো আজ-ই গিয়ে ডাক্তার পাল্‌কে।
ওঁকে নিয়ে গিছলেম কাল ভোরে দম্‌দম্ বেড়াতে—
হঠাৎ যেশোর রোডে পথ জোড়া একপাল ভেড়াতে !—
কী করে সামলে গাড়ী—বাড়ী ফিরি যদি তুমি জান্‌তে !!···
এইবার ‘লাইসেন্স্’ নিতে পারি—নিশ্চয় মান্‌তে।
তারি ও ‘ফিয়েট্’খানা পারি নাকো দু’টি চখে দেখতে !
চালাতে যা’ ভয় করে বুক কাঁপে মোড় ঘুরে বেঁকতে।

সবচেয়ে ভালো বাপু ‘নিউ বেবী অষ্টিন্’ ‘টু-সীটার’,
ও-ই গাড়ী চালিয়ে তো ‘ড্রাইভে’ পেকেছে হাত ‘পুষি’টার !···
‘পুষি’কে চেনো না ? ওমা !···‘পুষ্পিতা,’ লরেটোয় পড়তো !
প্রতি ‘হলিডে’তে গিয়ে দম্‌দমে এরোপ্লেন্ চড়তো !
····· চড়্‌বে না ? ··কাকা তার ‘এ’ ক্লাসের পাইলট্
ডি, সি, সেন,
বিলাতে এখনো তিনি ‘এরিয়েল্ সার্ভিসে’ রয়েচেন !···

ওই দেখ ! জ্বালাতন !! অসময়ে একি অনাসৃষ্টি !
বিকেলেই মেঘ জমে এসে গেল ঝমাঝম্ বৃষ্টি !
ধ্যেৎ ! আজ সব মাটী ! —ড্রাইভিং প্ল্যান্ গেল ফস্‌কে !···
গ্লোবেতেই চলো যাই ডেকে নিয়ে প্রোফেসর ঘোষকে !
‘ষ্টার’ কে কে এ ছবিতে আছে আজ বলোদিকি
ঠিক ঠিক ?···
‘এমিল্ জ্যানিংস’ আর ‘লুপে ভ্যালে’ ‘মার্লিন্ ডিয়েট্রিক্ ?’···
চলো যাই দেখা যাক্ নেহাত অচল ছবি হবে না।
‘গ্রেটা’ হলে হ’ত ভাল, ছবিখানা জমে যেত’ তবে না !!
তোমার ‘সুইট্ হার্ট্’ কে যে তা কি ভাবো আমি
জানিনে ?···
‘জেনেট্ গেনার’ ।—নয় ?···লিলিয়ান্‌গীশ্ ? ··ঈষ্ ! মানিনে।
নাও, আর বকিও না,—বদলিয়ে আস্‌ছি এ শাড়ীটা !
—জোরে জল নামলো যে !·····আনুক্‌না আঁটাহুড্
গাড়ীটা !

স্থূল ও সূক্ষ্ম

আন্তন্ পিত্রোভিচ্ চেখফ্

(চিত্র)

নিকালা রেভ্স্কী রেলওয়ের একটা ষ্টেশনে দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ; একজনের শরীরে যেমন মাংসের প্রাচুর্য্য, অপরজন তেমনই অস্থিচর্ম্মসার। স্থূলকায় ব্যক্তিটি এইমাত্র ষ্টেশনের ভোজনাগারে আহার সারিয়া আসিয়াছে, তাহার ঠোঁট দুইটায় তখনও আহার্য্য হইতে তৈলাক্ত পদার্থের সামান্ত সামান্ত লাগিয়া আছে, তাহাতে তাহার ঠোঁট দুইটাকে বেশ চক্‌চকে দেখাইতেছে, যেন দুটি পাকা চেরী। তাহার সর্ব্বাঙ্গে "শেরী" (মদ) ও "ফ্লর্ দ' র্যাঁজে"র গন্ধ ভরভর্ করিতেছে।···ক্ষীণকায় ব্যক্তিটি সবে মাত্র গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়াছে, তাহার হাতে নানা আকারের কয়েকটা বাক্স পেঁটরা ও পুঁটুলি। তাহার গা দিয়া ভুক্তাবশেষ "হ্যাম" ও কফির গন্ধ বাহির হইতেছে। পিছনে একটি ছিপ্‌ছিপে চেহারার স্ত্রীলোক, পাত্‌লা মুখের গড়নটি, তাহার স্ত্রী, এবং চোখ্-পিট্‌-পিট্‌-করা ঢ্যাঙা চেহারার একটি ছোক্‌রা, তাহার পুত্র।

—পর্‌ফিরি!—স্থূলকায় ব্যক্তিটি সূক্ষ্মদেহ ব্যক্তিটিকে দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—আরে তুই! তার পর···ওঃ, কতদিন পরে, এঁ্যা!......

—আরে আরে!—ক্ষীণকায় ব্যক্তিটি বিস্ময়াম্বিতভাবে বলিয়া উঠিল—মিশা! ছেলেবেলাকার সেই···এঁ্যা! ··তুই কোত্থেকে?

দুই বন্ধুর এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে আনন্দের সীমা রহিল না, তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া নানা আলাপের পর ক্ষীণকায় ব্যক্তিটি বলিতে সুরু করিল—আরে ভায়া,......এঁ্যা···কী আশ্চর্য্য রকমের দেখা হওয়া ভাই এঁ্যা! হ্যাঁ, তাকা ত' দেখি আমার দিকে ভালো করে'···হ্যাঁ, ঠিক যেমন দেখ্‌তে শুন্‌তে সুন্দর সুপুরুষটি ছিলি সেই রকমই রয়ে গেছিস্! ঠিক সেই রকম বাবুটি!···তারপর বল সব খবর তোর···পয়সা-কড়ি কর্‌লি অনেক? বিয়ে থা' কর্‌লি?···আমি ত বিয়ে করেছি দেখ্‌তেই পাচ্ছিস্···এই যে আমার স্ত্রী লুইজা বান্‌ৎসেন্‌বাখ্, অবশ্য শেষের নামটা ওঁর বিবাহের আগের নাম···উনি লুথার-পন্থী (Lutheran)···আর এই হচ্ছে আমার ছেলে নাফানাইল, থার্ড ক্লাশে পড়ে···নাফানিয়া, ইনি হচ্ছেন আমার বাল্যবন্ধু। একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছি!

নাফানাইল কিছুক্ষণ ধরিয়া কী যেন ভাবিয়া অবশেষে মাথা হইতে টুপীটা খুলিল।

তাহার পিতা পূর্ব্বের ন্যায় বলিয়া যাইতে লাগিল—এক সঙ্গে ইস্কুলে পড়া, এঁ্যা!—মনে আছে তোর, তোকে একবার কী মারটা মারলে, সরকারী কী বই সিগারেটের আগুনে পুড়িয়েছিলি বলে, আর মনে আছে তোর আমায়ও একবার পিটেছিল বেদম কী একটা দুষ্টুমী করার জন্যে···হো হো—আমরা একেবারে ছেলেমানুষ ছিলাম তখন!···অমন ভয় পাস্ নে নাফানিয়া, যা ওর কাছে সরে' একটু···আর হ্যাঁ এই যে আমার স্ত্রী, বান্‌সেন্‌বাখ্ বংশে এঁর জন্ম,···লুথার-পন্থী।

নাফানাইল আবার কী যেন ভাবিয়া তাহার বাবার পিছনে মুখ লুকাইল।

স্থূলকায় ব্যক্তিটি বন্ধুর মুখের দিকে স্নেহার্দ্রভাবে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তার পর আছিস কেমন ভাই? চাক্‌রী-বাক্‌রী করছিস্ কোথাও, না সব শেষ করেছিস?

—আরে হ্যাঁ ভাই করছি বৈ কি একটা কিছু। "কলোঝস্কী আস্তেসর" (collegiate assessor) এর কাজ করছি আজ হলো প্রায় দু'বছর।…মাইনে তেমন সুবিধে নয় · যাক্ গে সে সব কথা।…আর আমার স্ত্রী গান শেখান্…আমি ঘরে বসে কাঠের সিগারের বাক্স তৈরী করি…. চমৎকার বাক্স ভায়া! এক রুব্‌ল্ করে' দাম করেছি।…অবশ্য দশটা কি তার বেশী কিন্‌লে, বুঝ্‌লি না, দাম একটু সস্তা পড়ে। · এই চালাই কোনো রকম করে'। তার পর জানিস্, ছিলুম হেড্ আফিসে কিছুদিন, তারপর দিলে বদ্‌লী করে' এই জেলায় হেড্ ক্লার্ক করে'…এখন এইখানেই কাজ কর্‌তে হ'বে।…হ্যাঁ, তারপর তোর খবর কী বল্! এঁ্যা, সিভিল্ সার্ভিস্ ত, এঁ্যা?—বল্!

—না ভাই, আরও একটু ওপর দিকে যা! বুঝ্‌লি না!—এখন সিক্রেট্ সার্ভিসে—দু'টো তক্‌মা দিয়েছে।

ক্ষীণকায় ব্যক্তিটি সহসা যেন পাংশু হইয়া গিয়া, খানিকক্ষণ পাথরের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর তাহার সমস্ত মুখটায় একটা অদ্ভুত হাসি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল, তাহার চোখে মুখে যেন কিসের একটা জ্যোতি দেখা দিল। তারপর সে যেন বেশ একটু নত হইয়া কেমন যেন মুষড়াইয়া গেল।…তাহার হাতের বাক্স পেঁট্‌রাগুলা পর্য্যন্ত যেন নীচু হইয়া গিয়া ভ্রুকুঞ্চন করিল …তাহার স্ত্রীর লম্বা চোয়াল যেন আরও একটু লম্বা হইয়া পড়িল। নাফানাইল সাম্‌নের দিকে সরিয়া আসিয়া তাহার "মুন্দিরের" (ওভারকোট্) বোতামগুলা আঁটিয়া দিল… ..

—আজ্ঞে হুজুর…আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভারী আহ্লাদ হলো…এই আপনি মানে অর্থাৎ আমার বাল্যবন্ধু …হঠাৎ আপনাকে এ অবস্থায় দেখ্‌বো আশা করি নি! …হি, হি, আজ্ঞে হুজুর!

—আরে, থাক্ ঢের হয়েছে—হঠাৎ অমন সুর বদ্‌লালো কেন?…ছেলেবেলাকার বন্ধু আমরা ··এঁ্যাঃ—আর এই সব মস্ত মস্ত সেলামী!

ক্ষীণকায় ব্যক্তি আরও মুসড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—আজ্ঞে, মাপ করবেন, আজ্ঞে আপনার মেহেরবাণী অনেক এই গরীবের ওপর…হি, হি, কিন্তু সে যেন ভারী হাস্যাস্পদ কাণ্ড হবে একটা।…হি, হি, এই যে, আমার ছেলে নাফানাইল…স্ত্রী লুইজা,…এই সব একরকম আছি, আর কি……

স্থূলকায় ব্যক্তিটি কী যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার বন্ধুর মুখের উপর মুদ্রিত সপ্রতিভ নম্রতা ও কেমন একটা অম্লরস পরিপূর্ণ ভদ্রতার ভাব দেখিয়া বেশ একটু আহত হইয়া চুপ করিল। বিদায় লইবার জন্য হাতটাকে বাড়াইয়া দিয়া সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

সূক্ষ্মদেহ ব্যক্তিটি তিনটিমাত্র আঙুল কোনো রকমে ধরিয়া হস্তমর্দ্দনকার্য্য শেষ করিল। তাহার পর সমস্ত দেহটাকে আনত করিয়া অভিবাদন করিয়া চীনেম্যানের মত হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী মৃদুহাস্যে বিদায় জানাইল। নাফানাইল্ ড্রিলের ভঙ্গীতে পা দিয়া একপ্রকার অভিবাদনসূচক শব্দ করিয়া মাথা হইতে টুপীটা খুলিয়া লইল। তাহারা তিনজনেই এই আকস্মিক সাক্ষাতে বেশ আনন্দলাভ করিল, সন্দেহ নাই। *

—অনুবাদক

শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

* মূল রুশীয় হইতে অনূদিত।

যান্ত্রিক সভ্যতার একদিক

ভবরঞ্জন দেব (বি-এন্ রেলওয়ে)

চার হাজার মাইল উচ্চে ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে বায়ুযানে যাত্রীকে এসে যখন Waiter জিজ্ঞাসা করে lunchএ sardine না ox tongue পরিবেশন হবে তখন শুধু এই মনে হয়—একেই বলে যান্ত্রিক অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতা। শিশুরা জন্মেই চলচ্চিত্রে Charlie Chaplin কিংবা Laurel Hardyর মুখভঙ্গি, ব্যঙ্গকৌতুক দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে আবার সাথে সাথেই সামান্য একটা dial ঘুরালেই Moscow, Berlin, Paris কিংবা Vienna থেকে গান বাজনা আসে; হাঁ করে মন্ত্রমুগ্ধের মত গান শুনে; টিপ্ টাপ্ করে তালে তালে পা ফেলে; Wimbledonএ Vines এবং Austinর championship final খেলা উপভোগ করে। দূরত্ব বলে জিনিষ যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে নেই। যান্ত্রিক সভ্যতা সমস্ত পৃথিবীটাকে চতুঃসীমানায় ঠেসে দিয়েছে। দূরত্ব এখন অতীতের কথা। পাশ্চাত্যের লোক দৈনন্দিন জীবনে মেনে নিচ্ছে এই জিনিষগুলা তাদের জীবনের জন্মগত অংশ। Miraclesর যুগে তাদের জন্ম। নায়েগ্রার জলপ্রপাত, চীনের প্রাচীর, ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান তাদের মনে আশ্চর্য্যের উল্লাস উদ্দীপন করে না। Dr. Eckner এর Graf Zepplinএ ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আমেরিকাতে যাত্রী ও ডাক সরবরাহ করা, Paris থেকে Constantinopleএ উড়োজাহাজে ১০ ঘণ্টায় পৌছান, Switch টিপ্‌লে বাতি জ্বলে উঠা, Warsaw Belgrade Praguer গানবাজনা নৃত্য Londonএ বসে উপভোগ করা, Janet Gaynor, Norma Shearer অথবা Greta Garboর সবাক্ চিত্র—এই গুলাও আজ তাদের কাছে miracle নয়; ইহা তাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অংশবিশেষ। Australiaর মাংস ও ফল, South Africaর জেব্রার পশম, Argentineএর beef, America ও Egyptএর তুলা আর ভারতের পাট ও চা London Glasgow Hamburg কিংবা Genoa বন্দরে পাওয়া—তাদের জন্মগত অধিকার। যান্ত্রিক সভ্যতার ইহা মামুলী দান।

যান্ত্রিক সভ্যতার প্রধান উপসর্গ—সাময়িক মোহে ও প্রেরণায় পাশ্চাত্যে আজ একটা record ভেঙ্গে আর একটা recordর সৃষ্টি হচ্ছে। Lindbergh সর্ব্বপ্রথম monoplaneএ পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে আট্লাণ্টিক্ পার হ'ল; Mollison ভাব্‌লে আর পূর্ব্ব-পশ্চিমই বা বাকী থাকে কেন? Sir Malcolm Campbell Florida Beachএ ঘণ্টায় ২৫৩ মাইল বেগে মটর চালিয়ে প্রতিযোগিতায় বাহবা পেলেন; Kayedon Palm Beachএ Motor Boat ঘণ্টায় ১১১ মাইল গিয়ে রেকর্ড কর্‌লেন। খবরের কাগজে তাদের ফটো-সহ বড় বড় head line দিয়ে বীরত্ব কাহিনীর লহরী বের হল। মেয়েরাও ভাব্‌লে প্রশংসার পুরোপুরিটা পুরুষেরা নেবে কেন। তারাও তাই উঠে পড়ে লাগল জয়মাল্যের কয়েকটা ফুলের পাপ্‌ড়ী তাদের গলদেশে ঝুলাবার আকাঙ্খায়। বুকের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় আশা—তাদের পুরুষের সাথে সর্ব্বতোভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া। কাজে নেমে মানুষ ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের আঘাত না পেলে স্বভাবতঃই মন আশার উৎসাহে ভরপুর হয়ে উঠে। সফলতাই ত মানুষকে বাঁচিয়ে সজীব করে রাখে। আশা তার ইন্ধন যোগায়। পুরুষদের থেকে পাশ্চাত্যের নারীরা স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে; Parliamentএ জোর করে চেয়ার দখল করে বক্তৃতায় মুখরিত কচ্ছে; হকি, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিসেও তারা নেমেছে; মন্ত্রিসভাতেও স্থানের অভাব হয়নি; Ambassador, Nobel Prize winnerও তারা হয়েছে;

স্কুল কলেজ, Divorce Court এ তাদের সমান অধিকার; পুলিশ এবং গোয়ান্দাগিরিতেও তারা কম নয়। উড়োজাহাজ শুধু ছিল বাকী। Amy Johnson একেবারে Australia বাহিনী হল। গান রচনা হয়ে গেল Amyর নামে—"Wonderful Amy, how can you blame me for loving you."

যান্ত্রিক সভ্যতার জন্মদাতা বিজ্ঞান মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে। পার্থিব সুখভোগ দেওয়াতে কার্পণ্য বিজ্ঞান করে নি। তারই ফলে আজ সমস্ত জগতটা একটা আর্থিক গণ্ডীতে এসে পড়েছে; আবার তারই ফলে আজ সমস্ত ইউরোপ একটা বারুদখানা: ধূমময় একটী আগ্নেয়গিরি। বিজ্ঞান মানুষকে রেল, জাহাজ, Submarine (ডুবোজাহাজ), উড়োজাহাজ, বেতার "Progress Label" ছাপ মেরে অনেক কিছু দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে তলিয়ে দেখেনি এই যান্ত্রিক উন্নতির পিছনে কত অমূল্য জীবনের বিসর্জ্জন হয়েছে। এই উন্নতিকে সম্ভব করাতে, ইহাকে বাঁচাতে ও আঁকড়ে ধরে রাখতে গিয়ে তারা দাম দিয়েছে কত। কত লোকের জীবন, কত লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর কত লোকের মানসিক সুখ শান্তি জলাঞ্জলি দিয়েছে এই সভ্যতার পিছনে। কতলোক উড়োজাহাজে Atlantic পার হতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি; এক আমেরিকাতে মটর গাড়ী চাপাতে প্রতি বৎসর গড়ে অন্যূন ২৪০০০ লোকের জীবনলীলা অবসান হচ্ছে। Submarine এ দমবন্ধ (trapped) হয়েও না কতলোক ইহলোক হতে বিদায় নিয়েছে ও নিচ্ছে ও নেবে। কয়লার খনিতে explosion ত যমরাজার একটা প্রকাণ্ড লীলা-নিকেতন। এখনও R 101 tragedyর কথা ইউরোপের স্মৃতি হতে মুছে যায় নি। যান্ত্রিক সভ্যতা কতভাবে যে মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, দমবন্ধ করে মৃত্যুর অঙ্কশায়িত কর্চ্ছে এবং সভ্যতার পিছনে জীবন আহুতির দাম যে কত ইউরোপ তা খতিয়ে দেখেনি। শিল্প-সভ্যতা পৃথিবীকে উন্নতির শেষ ধাপে নিয়ে যেতে পারে, হয়ত বা বাহ্যিক আড়ম্বরের চরম শিখরে পৃথিবী পৌঁছাতে পারে কিন্তু মানব জীবনের প্রকৃত সুখশান্তিকে যে ধ্বংস করেছে সে ক্ষতিপূরণ সভ্যতা করতে পারেনি। অন্তঃসারশূন্য ভিতর আর বাহ্যিক জাঁকজমক আমোদপ্রমোদের বিনিময় কখনও হয় না। ভোগ-বিলাসের উপাদান যন্ত্রসভ্যতা হয়ত বা ঘণ্টায় ঘণ্টায় তৈয়ার করতে পারে, efficiency ও speed বাড়াতে পারে, সুযোগ সুবিধে, জীবনের তথাকথিত সুখস্বচ্ছন্দতার পথ নানাদিকে নানাভাবে উন্মেষ করতে পারে কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার গতি এক মানবজাতির চরম ধ্বংসের (Humanity's ultimate destruction) দিকে।

মানুষ প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের প্রভাবে অনেকভাবে জয় করেছে সত্য, নিজ নিজ জাতীয় জীবনে প্রকৃতির শক্তিকে জুড়ে দিয়েছে বটে কিন্তু সসীম মানব-ক্ষমতা অসীম প্রকৃতিকে সর্ব্বতোভাবে জয় করতে পারে নি। প্রকৃতি ও যন্ত্রে একটা তুমুল দ্বন্দ্ব আবহমান কাল হতে চলে এসেছে। মানুষ খনি খুদতে পারে, উড়োজাহাজ দ্বারা উপরকে জয় করতে পারে; Submarine এ জলজন্তুর মত ঘুরে বেড়াতে পারে কিন্তু প্রাকৃতিক বলকে সর্ব্বতোভাবে জয় করে যন্ত্রকে আয়ত্ত করার মত ক্ষমতা তার হয়নি। Frankestein মানুষ গড়তে পারে কিন্তু তাকে আয়ত্ত সে করতে পারে নি। প্রকৃতির বল যন্ত্রের থেকে অনেক বেশী। প্রকৃতিকে এই জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক death toll দিয়েছে।

General Smuts একদিন লণ্ডনে বক্তৃতায় বলেছিলেন, "পৃথিবীতে সব চেয়ে সুখী লোক হচ্ছে ঐ আফ্রিকার তথাকথিত অসভ্য লোকগুলি।" যান্ত্রিক সভ্যতার আজীবন উপাসক ইউরোপের শতকরা ৯৮ জন লোক ভাবলে General Smuts ক্ষেপা নাকি। তারা হয়ত মনে করলে Smutsর একমাত্র উপযুক্ত স্থান Hollow Way কিংবা Pentonville অথবা রাঁচির পাগলা গারদ। ইউরোপ আজ ভুলে গেছে সাময়িক উত্তেজনাবিহীন, তথাকথিত বাহ্যিক ভোগবিলাসশূন্য জীবনেরও একটা চরম মূল্য আছে। সাদাসিদে মনভোলা তন্ময় ইউরোপের কাছে এটা স্বপ্নাতীত ব্যাপার, তার চিন্তার ধারায় এর কোন স্থান নেই; জটিলতাময় সভ্য জীবনের সার্থকতা তার চেয়ে

অনেক বেশী। যান্ত্রিক সভ্যতা সজাগ ইউরোপ থেকে ধীরে ধীরে সে চিন্তা শক্তি কেড়ে নিয়েছে। সভ্যতার জন্ম তারিখ থেকে ইউরোপ একটা চুক্তি করেছিল সভ্যতার সাথে। এই চুক্তিতে ইউরোপ দিয়েছে কি আর পেয়েছে কি—এখন সেটাই ভাব্‌বার ও আলোচ্য বিষয়।

যান্ত্রিক সভ্যতার থেকে ইউরোপ হাঁসপাতাল পেয়েছে। কিন্তু এই হাঁসপাতালগুলিত সভ্য অবস্থায় থাকার একটা indictment। মটরগাড়ী চাপাতে, কয়লার খনিতে, লৌহ ইস্পাতের কারখানায়, Flanders অথবা Marneএর যুদ্ধে আহত এবং মুমূর্ষ লোকের আর্ত্তনাদের এবং দৈহিক যন্ত্রণার প্রলেপ যোগাবার জন্তেই হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠান। মানুষকে শরীরে প্রাণে মেরে আশার বাণী শুনাবার জন্তেই ত এক একটী হাঁসপাতালের জন্ম। প্রলেপ যোগাতে পারে হাঁসপাতাল কিন্তু দৈহিক যাতনার মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যের লাঘবতা তাতে হয় না।

সামাজিক দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলেও যান্ত্রিক সভ্যতার গৌরব করবার বেশী কিছু আছে বলে মনে হয় না। পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির গৌরবের জিনিষ ছিল তাদের ঘর বাড়ী (Hearth and home) আর মাতৃত্ব। এখন তারা ভিড় করে আফিসে ফেক্টরীতে, রেঁস্তরাতে, মদের দোকানে। ঘর ত এখন পাখীর বাসা। পাশ্চাত্যের এই মাতৃত্ব, গার্হস্থ্য জীবন নষ্ট করেছে এই যান্ত্রিক সভ্যতা। স্ত্রীজাতির এই নষ্ট গৌরবকে পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশেই Mussolini ও Hitler মেয়েদের বল্‌ছে ঘরে যেতে। তাই আজ নব-দম্পতীর হাতে Mussoliniর "Marrige Present"। সভ্যতা ঘর থেকে মেয়েদের টেনে এনেছে বাহিরে। Divorce Courtএর মর্ম্মান্তিক দৃশ্য, সন্তানজন্ম ইচ্ছানুরূপ নিয়োজিত করা, দলে দলে Spinsters, Road House, New York Bowery, Hamstead Heath, Dr. Barnado's Home, vice dens, gambling house, ঘোড় দৌড়ের মাঠ—এইগুলি যান্ত্রিক সভ্যতার এক একটী মূর্ত্ত প্রকাশ। সভ্যতা ক্ষান্ত হয় নি এখানে। তার ক্রীড়াভূমির পরিমাপ অনেক বেশী। মটরগাড়ী সিনেমা, smart clothes দিয়েছে সত্য, আবার drugs, cocaine traffice সভ্যতা আন্‌তে কসুর করেনি! লোভ ও চাক্‌চিক্যের আড়ালে থেকে প্রভাব বিস্তার করে বসেছে ইউরোপের জীবনের উপর। এখন সভ্যতার একেবারে মৌরশী পাট্টা। ছুটেছে পাশ্চাত্যের লোক দিগবিজয়ী অশ্বমেধ ঘোড়ার মত। এর কাছে সমুদ্রগুপ্তের আর্য্যাবর্ত্ত জয় অথবা সুলতান মামুদের ভারত লুণ্ঠন স্থান পায় না।

এই সভ্যতা একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল গেল ইউরোপ মহাসমরে। যেতে যেতে বেঁচে গেল। এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতার তাণ্ডবলীলার কাহিনী শত শত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। Flandersএর মাঠে ধ্বংসের চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়নি। শুধু গড়ে উঠেছে অসংখ্য Cenotaph—"To the Glorious dead." জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব হিংসা দ্বেষের মাল-মসলা জুগিয়েছে এই সভ্যতা।

যে দিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে বাস্তব উন্নতির কাজ থেকে সরিয়ে ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত করেছে সে দিন থেকেই এই যান্ত্রিক সভ্যতার গোরখানা (grave) তৈরার সুরু হয়েছে। সভ্যতা-বিকারগ্রস্ত ইউরোপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বশে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, প্রতিযোগিতায় নেমে গেল। ফলে চক্ষের নিমেষে উড়ে গেল চারখানা বড় বড় সাম্রাজ্য। অতবড় Tsar, Kaiser, অতবড় Austro-Hungarian Empire, Ottoman Empire ধ্বংস হল সভ্যতার অন্তঃসারকে অনুসরণ করতে গিয়ে। এক নিমেষে সমস্ত ইউরোপের মানচিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। কত রকম "ism"এর জন্ম হল। কৈশর বন্দি হল Doornএ; আরও কত সুলতান, কত রাজা, কত উজির, কত Grand Duke নির্ব্বাসিত হল নিজেদের দেশ থেকে। কত ব্যবসায়ী, কত ধনী, কত Industrial Shipping Magnates রাতারাতি রাস্তায় দাঁড়ালো। একেবারে এক একটা জাতি দেউলিয়ে। মুমূর্ষু সভ্যতাকে বাঁচাতে গিয়ে তারপর কত সন্ধিপত্র, Kellog pact, Young Plan, Reparations বৈঠক, Disarmament Conference, Leagne of Nations। এই গুলা হচ্ছে যান্ত্রিক সভ্যতার এক একটী বিকৃত উন্মেষকে ধামাচাপা দিয়ে রাখার ইউরোপের রাজনৈতিকদের ব্যর্থ চেষ্টা।

যান্ত্রিক সভ্যতা হিংসা, দ্বেষ, সন্দেহের বিষাক্ত জীবাণু ছড়িয়ে দিয়েছে ইউরোপের জাতীয় জীবনে। শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে অলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এ বিষাক্ত বীজাণু। বর্ত্তমানের ইউরোপের মানচিত্র একটু ভাল করে তলিয়ে দেখ্‌লে ইহার সভ্যতা বুঝ্‌তে বেশী কঠিন বলে মনে হবে না। Polish Corridor, Alsace Lorraine, Upper Silesia এক একটী বারুদখানা। Polish Corridor Eastern Prussiaকে Germanyর mainland থেকে বিভক্ত করে ফেলেছে এই কথা না ভেবে বোধ হয় কোন জার্ম্মান যুবক ঘুম যায় না। Territorial vivisection, Versailles Treatyর অবমাননা জার্ম্মেনী আজও ভুল্‌তে পারেনি।

Upper Silesiaর কয়লার খনি আর Lorraineর লোহের খাদ হু হু করে দিবারাত্রি জ্বল্‌ছে তাদের প্রাণে। যান্ত্রিক সভ্যতার ধ্বংসের বীজ বপন হয়েছে এখানে। সুযোগ পেলেই তাহা মহা বিষবৃক্ষে পরিণত হবে।

আজ যান্ত্রিক সভ্যতার ভিত্তি দাঁড়িয়েছে Territorial Expansion, National Aggrandisementএর ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্তর্জাতীয় রেশারেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর। অত বড় একটা জিনিষের ভিত্তি আর কত কাল এই ভিত্তিহীন জিনিষের উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। "It has reached a stage where there is a race for competition, territorial settlement, supremarcy of the seas, leadership in commerce and trade and world markets" অন্তর্জাতীয় বিশ্বাস, সৌহার্দ্দ উঠে গেছে ইউরোপ থেকে। একে অন্যের গলা টিপে ধর্‌তে সদা সচেষ্ট। বৈঠক বস্‌ছে বৎসর বৎসর। তার কোন অভাব নেই। কিন্তু জোড়াতালিতে কি আসল জিনিষ চাপা পড়ে? বৈঠকে (conference) শুধু গলাবাজি, আসলে কিছুই হয় না। "All's well that ends well" না হয়ে যদি All's well that begins well হত তবে Conference পারত কতক পরিমাণে অন্তর্জাতীয় রোগ উপশম কর্‌তে। অস্ত্র বারুদ, নৌ-জাহাজ কমিয়ে দাও—এই হচ্ছে আজ ইউরোপের কথা। অথচ বিশ্বাস নেই, সরলতা নেই, সৎ-সাহস নেই,—কাজেই Disarmament বৈঠক বসে আর ভাঙ্গে। ইটালী চায় ফরাসীর সমান নৌবহর মালমশলাদি রাখ্‌তে। America চায় Supremacy of the Seas, ফরাসী ত Rhine নদীর পশ্চিমতীর দুর্ভেদ্য দুর্গ দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। Polland বেচারী একদিক রুশের ও অপরদিকে জার্ম্মেণীর ভয়ে জড়সড়। সবাই বল্‌ছে disarm কর অথচ national budgetএ দেখা যায় এক Germany বাদে ১৯১৪ সালের থেকে military খরচ সকল জাতীর বেশী। এক জাতিকে খর্ব্ব ও হীন করার প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ ১৯১৪ সালের থেকে কম বলে মনে হয় না। সশস্ত্র যুদ্ধোন্মুখ ইউরোপ বল্‌ছে চাই শান্তি—এসব উক্তি হচ্ছে যান্ত্রিক সভ্যতা আক্রান্ত বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ।

আর্থিক জীবনেও যান্ত্রিক সভ্যতা-লীলার শেষ নেই। এক জাতি অন্য জাতির পণ্যদ্রব্য ঢুক্‌তে দেবে না। তার জন্য কত আর্থিক অস্ত্রের ব্যবহার। প্রত্যেক জাতি চায় বিক্রি কর্‌তে, খরিদের বেলায় তারা নারাজ। বল্‌বে dumping হচ্ছে। তার জন্য Tariff wallএর কত সাজ-সজ্জা। প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা পাশ্চাত্যের এখন মূল-মন্ত্র। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভাল জিনিষ। কিন্তু যখন ঈর্ষা, সন্দেহ, হিংসা ইহাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধন করে তখন ইহার ভালত্ব চলে গিয়ে একটা বিকট, বীভৎস মূর্ত্তি এসে পড়ে। সেখানে মঙ্গলের থেকে অমঙ্গলের সূচনা অনেক বেশী। সভ্যতার ভালত্বকে জাতীয় ও ব্যক্তিগত কল্যাণে প্রয়োগে সার্থকতা অনেক বেশী।

আটলান্টিকের এপার ওপার ঘুরে দেখ্‌লেই উপলব্ধি হয় যে গত মহাযুদ্ধের গৌণ কারণগুলি স্পষ্টভাবে এখনও মূর্ত্ত হয়ে বিরাজ কচ্ছে। কত রাজনীতিজ্ঞ, প্রধান মন্ত্রী, বৈদেশিক মন্ত্রী এ সব জটীল প্রশ্নের সমাধানের জন্য মাথা খুঁড়ে মরছে। উদ্দেশ্য যান্ত্রিক সভ্যতা যে আসল শান্তি সুখকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার পুনস্থাপন। পাশ্চাত্য সভ্যতা জাতীয় জীবনকে এমন জটিল করে তুলেছে যে যারা জাতীয় জীবনের কর্ণধার তারাও কূল পাচ্ছেনা ভেবে এর সমাধান কোথায় ও কিসে হতে পারে।

তারপর Capitalists ও Labouritesদের শাশ্বত দ্বন্দ্বকলহ আজ ইউরোপের মজ্জাগত রোগ। একদল সুযোগ পেলেই চুল টেনে ধরছে অন্য দলের। শ্রমিক বলছে ধনওয়ালাদিগকে—তোমরা ব্যবসাবাণিজ্যের লাভাংশ সব আত্মসাৎ করে নিচ্ছ; আমরা শুধু তোমাদের ও তোমাদের পরিবারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দিবারাত্রি খেটে মরছি। দুঃখকষ্ট আমাদের চিরসাথী, ফ্যাক্টরীর ধুঁয়া ধুলাতে আমাদের ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হয়ে কত কঠিন সংক্রামক রোগে ভুগ্‌ছি; আমরা তোমাদের ফ্যাক্টরীর জীবন অথচ লাভের বেলায় তোমরা; bank balance বৃদ্ধি পাচ্ছে তোমাদের আমাদের দৌলতে; আমাদের পরিশ্রম-লব্ধ অর্থে তোমরা রাজপ্রাসাদ তৈয়ার কচ্ছ; Montecarlo, Riviera, Palm Beach, Mediterranean cruise, Hawaii, Honolulu তোমাদের নিত্য ক্রীড়াভূমি। এ অতি অন্যায় অবিচার। 50/50 ratio চাই। এই যুদ্ধ শিল্পবাণিজ্যে চিরন্তন। ইহা যান্ত্রিক সভ্যতার আর একটী উন্মেষমাত্র। যান্ত্রিক সভ্যতা এই দ্বন্দ্বের প্রাণ, ইহার সঞ্জীবনী সুধা।

পাশ্চাত্যে এই দ্বন্দ্ব চলেছে সর্ব্বত্র—কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক কি আর্থিক জীবনে। শান্তির মূলে "ঘা" দিয়েছে ইউরোপ সে দিন, যে দিন "ভিতরকে" ভুলে গিয়ে "বাহিরকে" সত্য স্থায়ী বলে মেনে নিলে; যে দিন জাতীয় আত্মা মনকে ছাপিয়ে উঠ্‌ল শারীরিক সুখভোগ অতৃপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষা; যে দিন জাতিগুলা Mammonএর একনিষ্ঠ সেবক হয়ে পাগলের মত ছুটেছে তার পেছনে; যে দিন মেয়েরা ঘর ছেড়ে আফিস ফ্যাক্টরীকে তাদের কর্ম্মস্থান বলে বরণ করে নিলে; যে দিন তারা মাতৃত্বের পরিবর্ত্তে নিলে মাতৃত্বের প্রতিষেধক ও প্রতিবন্ধক; যে দিন তারা flirtation ও romanceকে বল্লে বাস্তব প্রেম ও ভালবাসা; গার্হস্থ্য জীবনের পরিবর্ত্তে নিলে Reno Divorce। যে বিজ্ঞান এই সভ্যতাকে ভূমিষ্ঠ করেছে সে বিজ্ঞানই আবার ইহার সংহার কর্ত্তা। "Science would play the same part of a creator as well as of a destroyer". যন্ত্রের সভ্যতা ত; যন্ত্র বিকল হতে কতক্ষণ। একবার গোড়ায় গলদ সুরু হলে তখন কোনরূপ palliatives, lubricationএ তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারে না; তখন চাই আমূল পরিবর্ত্তন। বিকারগ্রস্ত রোগীর মত বিকারগ্রস্ত সভ্যতার গোড়ায় "দাওয়াই" দিতে হবে। অন্তর্জাতি ঘৃণা, দ্বেষ কুপ্রবৃত্তিগুলিকে প্রাণে মেরে সভ্যতাকে দাঁড়া করাতে হবে অন্তর্জাতি সৌহার্দ্য ভালবাসা ও প্রাণের মিলনের উপর। তখন সভ্যতার আবার যৌবন ফিরে আস্‌বে, তাতে সভ্যতা বাঁচার মত বেঁচে থাক্‌বে।

আপনাদের মধ্যে হয়ত কেহ ভাব্‌তে পারেন আমি যান্ত্রিক সভ্যতার এত বিরুদ্ধবাদী কেন; কেনই বা পৃথিবীর এই যান্ত্রিক উন্নতির বিরুদ্ধে শেলক্ষেপ কচ্ছি। যান্ত্রিক সভ্যতা পৃথিবীতে যে উন্নতি এনে দিয়েছে, অন্ধবিশ্বাস নিয়ে তাকে শুধু আমি প্রশংসার সপ্তম স্বর্গে উঠিয়ে দিতে চাই না। এই সভ্যতার যে একটা নিখুঁত ভালর দিক আছে সে কথাও মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। সে "দিকটা" ভবিষ্যৎ আলোচ্য বিষয়ের জন্য রইল।

Majestic অথবা Leviathan কিংবা Breman এবং Europa যখন ক্ষিপ্ত Atlantic মহাসমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করে বিজয়ী হয়ে New York কিংবা Southampton Harbourএ পৌঁছে; Cornish Reviera অথবা Royal Scott যখন ঘণ্টায় ৭০ মাইল গতিতে নিমিষে যাত্রীকে গন্তব্য স্থানে নিয়ে যায়; Candadian Pacific Railway যখন Rocky Mountain ভেদ করে Atlantic হতে Pacificএর পারে উপস্থিত হয়, Dial ঘুরালেই যখন Moscow কিংবা Venice পাওয়া যায় অথবা Jack Hyltonএর Band এবং Tauberর "You are my heart's delight" কর্ণকুহর মুগ্ধ করে; Owttowa Conferenceএ King's Speech অথবা Disarmament Conferenceএ Hendersonএর বক্তৃতা loungeএ আরাম কেদারায় বসে শুনতে পারা যায়, Chicagoর Elevator অথবা Londonএর Subway যেমন মুহূর্ত্তে একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে নিয়ে যায়; যেমন এক শিলিং ব্যয়ে Holy-Woodর প্রধান প্রধান Film Stars-দের সবাক্ চিত্র চক্ষু ও কর্ণকে এক সময়েই অজস্র তৃপ্তি দান করে, তখন বৈজ্ঞানিক সভ্যতার উপর শ্রদ্ধা ও

সম্মান স্বভাবতঃই এসে পড়ে। কিন্তু ভুলিয়ে দেখার বিষয় হচ্ছে মানুষ এই সভ্যতার বাহ্যিক মোহে এবং নেশায় নিজের ভিতরকার নিজস্বটাকে বিকিয়ে দিয়েছে। সভ্যতা হীরার বিনিময়ে দিয়েছে কাচ; সোনার পরিবর্ত্তে দিয়েছে পিতল; ভিতরের পরিবর্ত্তে দিয়েছে বাহির। যে London সহরে Einstein এর মত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এসে নীরবে অলক্ষ্যে ঘুরে যায়, অথচ Douglas Fairbanks কিংবা Joan Crawford এর নামে জনসাধারণ মাতালের মত ক্ষিপ্ত হয়ে চক্ষের দেখা দেখার জন্যে ষ্টেশনে ছুটে যায়, রাস্তায় ভিড় করে, তিতির পক্ষীর মত দাঁড়িয়ে থাকে শুধু ক্ষণিকের দেখার জন্য, সে দেশ যে "বাহিরকে" আঁকড়ে ধরেছে এই কথা আর বলে দিতে হবে না। বিজ্ঞানপ্রসূত যান্ত্রিক সভ্যতা এর জন্য দায়ী।

এই সভ্যতা মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে স্বীকার করি। Medical Science দিয়েছে; দিয়েছে birth control, modestyর পরিবর্ত্তে দিয়েছে flirtation, মাতৃত্বের পরিবর্ত্তে দিয়েছে সন্তানবিহীন পরিবার; Kitchenette নিয়ে দিয়েছে restaurant রাস্তার প্রতি কোণে কোণে; দুধ, ফল নিয়ে দিয়েছে Tea, Coffee আর Cocoa; গার্হস্থ্য জীবনের পরিবর্ত্তে দিয়েছে নৈশ ক্লাব, জুয়ার আড্ডা; রসুই নিয়ে দিয়েছে Tinned Sardine, Sausage, Tinned meat; খাঁটী রূপোর টাকার বিনিময়ে এনেছে Notes, Cheque, Bill of Exchange; সুষ্ঠু দেহ দেবোপম স্বর্গীয় ভাবের পরিবর্ত্তে এনেছে snobbery ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা; দিয়েছে rouge, powder, cream আর snow, নিয়েছে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা; আসল নিয়ে দিয়েছে নকল। Garden Party, New York Bowery এবং Night club এ সাময়িক উত্তেজনার সার্থকতা হতে পারে কিন্তু তাতে যে প্রকৃত সুখশান্তি আসে না এ কথাটা মেনে নিতেই হবে। বিজ্ঞান দিয়েছে অনেক সত্য, কিন্তু সে দেবার বিনিময়ে যা কেড়ে নিয়েছে তাতে পাশ্চাত্য হারিয়ে বসেছে তার থেকে অনেক বেশী। মানুষ যে শিল্পসভ্যতা গড়ে তুলেছে সে সভ্যতা যদি মানুষকে গ্রাস না করে বাহ্যিক উন্নতির সাথে সাথে ভিতরের উন্নতির সামঞ্জস্য এনে দিত, মানুষকে "যন্ত্রে" পরিণত না করে যদি "মানুষই" থাকতে দিত, তাহলে যান্ত্রিক সভ্যতায় মানবজাতির কল্যাণ অশেষভাবে সাধিত হত; সভ্যতারও গর্ব্ব করার অনেক কিছু থাকতে পারত।

ভবরঞ্জন দেব

যান্ত্রিক সভ্যতার অন্য দিকটা অপর প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ইন্‌ভেন্‌শন!

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

ভাদ্রের বিচিত্রায় শ্রীহিতেশ চক্রবর্ত্তীর যে অভিযোগ পড়লাম, তা থেকে সাধারণের ধারণা হ'তে পারে, আমার শ্রীরস্তু গল্পটা ইংরেজীর translation এবং না-ব'লে পরের-জিনিস-নেওয়া। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, গল্পটি হুবহু অনুবাদ নয়, এমন কি free translationও নয় এবং plot ব'লে যেটুকু নেওয়া হয়েছে তাতে 'ছায়া-অবলম্বনে' লিখ্‌লেও বেশী হয়। এরকম ক্ষেত্রে—অর্থাৎ একটা গল্প লিখ্‌তে লিখ্‌তে, ইংরেজী থেকে খানিকটা ভাব নিয়ে শেষ ক'রে দিলে সচরাচর কিছু উল্লেখ করার পদ্ধতি নেই, থাক্‌লে, বাঙ্‌লা দেশের পনেরো আনা গল্পই পাদ-পূরণের ভারে কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌ত এবং Grand Magazineএর অতিরিক্ত কিছু পড়াশুনা থাক্‌লে এরকম আবিষ্কারকে মহা আবিষ্কার মনে করবার কারণও ঘটতনা। ইংরেজী গল্পটার নামোল্লেখে কিছু ভুল আছে, সেটা লেখকের ভুল, কিম্বা ছাপার, জানিনে। তবে 'আশ্চর্য্য ঐক্যে'র পরমাশ্চর্য্য বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে নীরব থাক্‌বই মনে করেছিলাম, কিন্তু ঐ বিশেষ গল্পটা লক্ষ্য ক'রে দেওঘর, বেনারস ও অযোধ্যা থেকে বিচিত্রার কয়েকটি গ্রাহক গ্রাহিকার যে সপ্রশংস চিঠি পেয়েছি এবং সম্পাদকমহাশয় ও অন্যান্য বন্ধুবর্গকে নামকরণ নিয়ে যে পরিমাণে ভাবিয়ে তুলেছে, তাতে, পাছে তাঁরা সকলে আমার চৌর্য্য অপবাদে আহত হন, এইজন্যেই প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে রাখিলাম।

জগৎশেঠ

শ্রীপিণাকীলাল রায়

১

সে অনেক দিনের কথা। যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নাজিম মুরশিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে সমাসীন, সেই সময়ে সুদূর রাজপুতানা হইতে হীরালাল ও মোতিলাল নামে দুই সহোদর ভাগ্যান্বেষণে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। আধুনিক কলিকাতা নগরীর ন্যায় তখন মুর্শিদাবাদও, কি ব্যবসা-বাণিজ্যে, কি শিল্প-চাতুর্য্যে, কি উৎপন্ন পণ্যের প্রাচুর্য্যে, কি ঐশ্বর্য্য গরিমায়, কি জ্ঞান-গবেষণায় উন্নতির চরমোর্দ্ধে উঠিয়া ভারতের—তথা সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহারা যখন মুর্শিদাবাদে আসেন তখন ইহাদের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না,—একপ্রকার লোটা-কম্বল সম্বল বলিলে যাহা বুঝায়, সেই রকম দীনহীন অবস্থায় তাহারা নিজামত রাজধানীর সন্নিকটে একটি দরিদ্র পল্লীতে বাস করিতে থাকেন। প্রথমতঃ কোনো মহাজনের নিকট হইতে সামান্য দুই এক টাকার জিনিষ লইয়া তাহা ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থে অতিকষ্টে মূলধনের টাকাটি বজায় রাখিয়া, কোনো রকমে ভরণ-পোষণ চালাইতে থাকেন। এমন এক একটি দিন গিয়াছে যে, হয় তো একটি পয়সার ছাতু কি চানাও তাহাদের ভাগ্যে জোটে নাই।

বৎসরাধিক কাল এই ভাবে এক হস্তে দারিদ্র্য-রাক্ষসীর টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া ও অপর হস্তে দেবী সততাসুন্দরীর পাদ-স্পর্শ করিয়া, সংসার-পথের নবীন যাত্রী দুই ভাই, ভাগ্য পরিবর্ত্তনের পথটা একটুখানি সুগম করিয়া লইলেন—ছোটো হইতে বড় হইবার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুদিন পরে, তাহারা ফেরি- করা ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া ও রাজধানীর মধ্যেই একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইয়া তথায় ছোটোখাটো রকমের দোকান ফাঁদিয়া বসিলেন। উত্তরোত্তর ব্যবসার উন্নতি হইতে লাগিল।

চার পাঁচ বৎসর পরে ইহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে, দুই সহোদর স্বদেশে গিয়া বিবাহ করিলেন এবং বিবাহান্তে স্ব-স্ব পত্নীদের সঙ্গে করিয়া ব্যবসাস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। এই বিবাহে যৌতুক স্বরূপ নগদ টাকা যাহা পাইয়াছিলেন তাহাও তাহারা এই ব্যবসায়ের মূলধনের সহিত যোগ করিয়া লইলেন। ইহাতেও ব্যবসার কলেবর আরও একটু স্ফীত হইয়া উঠিল।

ইহারা দেশে বিবাহ করিতে যাইবার পূর্ব্বে দোকানের সন্নিকটে একটি ছোটো একতালা কোটা বাড়ি ভাড়া করিয়াছিলেন। দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সপরিবারে সেই বাড়িতে বাস করিতে লাগিলেন। মোটের উপর একপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দেই তাহাদের বিবাহিত জীবন কাটিতে লাগিল।

বড় ভাইয়ের পত্নীর নাম ছিল তারাবাই ও ছোট ভাইয়ের পত্নীর নাম ছিল ললিতাবাই।

সারল্যের মূর্ত্তপ্রতিক এই তারাই মমতাময়ী মাতার মত হৃদয়খানি লইয়া যখন এই সংসারে দেবর ও দেবর-পত্নীর সম্মুখে একটা অভয়বাণীর ন্যায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখনই তাহারা এই নারীর মধ্যে মাতৃত্বের মধুর স্বাদ পাইয়াছিলেন; আর হীরালাল পত্নীত্বের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিলেন। মোতিলালের স্ত্রী ললিতাবাই তারাবাইয়ের উপর এতটা নির্ভরশীলা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এই নবোঢ়া পত্নীর নাগাল পাইবার জন্য মোতিলালকে সময়ে সময়ে দীন ভিক্ষুকের ন্যায় বৌদির দ্বারস্থ হইতে হইত।

তারাবাই অল্পদিনের মধ্যেই এই শেঠদের ক্ষুদ্র সংসারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। তাহার রূপের ছটায়, স্নেহের ঘটায়, অভিমানের বাণে, আদরের টানে, সেবার মহিমায়, গৃহিণী গরিমায় স্বামীর হৃদয়-রাজ্যটি জয় করিয়া লইলেন,—দেবর ও দেবর-পত্নীকে নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিলেন,

পাড়া-প্রতিবেশীগণকে যথারীতি প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বোপরি তাহার চরিত্রে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত যাহা নারীদের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। ন্যায়ের স্বপক্ষে যে মূর্ত্তি কুসুমাদপি কোমল বলিয়া অনুভূত হইত, অন্যায়ের বিপক্ষে তাহাতেই আবার বজ্রাদপি কঠোরা সংহারিণী মূর্ত্তির বিকাশ মূর্ত্ত হইয়া উঠিত। কে যে কখন কি মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের এই গৃহস্থাশ্রমে আসিয়া প্রবেশ করে এবং আশ্রম ও আশ্রমবাসীকে ধন্য করিয়া চলিয়া যায়, আমাদের এই স্থূল দৃষ্টিতে তাহার সম্যক্ পরিচয় আমরা পাই না। যখন পাই, তখন হয়তো সে আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়,—আর আমরা নিষ্করুণ স্মৃতির তাড়নায় আজীবন অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতে থাকি।

তারাবাই তাহার স্বামী ও দেবরকে তাহার একটি আদেশ পালন করিবার জন্য প্রায়ই অনুরোধ করিতেন। হীরালাল তাহা পালন করিতেন কিন্তু দেবর মোতিলাল মধ্যে মধ্যে ভুলিয়া যাইতেন। তাহার আদেশ দিল :—

"তাহারা যখন কোনো কার্য্য উপলক্ষ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইবেন, তখন যেন তাহারা রিক্ত হস্তে বাহির হইয়া যান, কিন্তু ফিরিবার কালে যেন নিঃস্ব হইয়া না ফিরেন। কিছু না মিলে, অন্ততঃ একগাছি তৃণও যেন হস্তে লইয়া গৃহে প্রবেশ করেন।"

মোতিলাল যদি কোনোদিন ভুলক্রমে শুধু হাতে ফিরিতেন, আর তাহা যদি তারাবাইয়ের চক্ষে পড়িত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে অল্পে ছাড়িতেন না। দেবরকে যথেষ্ট স্নেহের ভর্ৎসনায় আপ্যায়িত করিতেন আর বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিতেন যেন বারান্তরে এরূপ না হয়। মোতিলাল তাহার বৌদির এই ভর্ৎসনা আশীষ-বাণীর ন্যায় হাসিমুখে শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে রহস্য করিবার লোভটুকুও সম্বরণ করিতে পারিতেন না। মাঝে মাঝে বলিতেন, "এই পাগলা খেয়াল আর তোমার কতদিন চলবে বৌদি, আমি তো আর পেরে উঠছিনে।" তারাবাই তার উত্তরে বলিতেন, "যতদিন তোমাদের সংসারে আছি ঠিক ততদিন—তারপর আমার অবর্ত্তমানে তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কোরো, ঠাকুরপো…"

একদিন মোতিলাল গৃহে ফিরিবার সময় দেখিতে পাইলেন, পথিপার্শ্বে একটি মৃত ঢোড়া সাপ পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র তাহার মনের মধ্যে দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। "আজ ভারী মজা হ'বে…বৌদিকে জব্দ করবার ঠিক জিনিষ মিলেছে।" মনে মনে এই ভাবিয়া মৃত সর্পটি একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠদণ্ডে তুলিয়া লইয়া মহানন্দে গৃহাভিমুখী হইলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন সম্মুখে ললিতাবাই দণ্ডায়মানা। মোতিলাল রহস্য করিয়া সেই সাপটি ললিতাবাইয়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিবার ভাণ করিতেই সে ভয়ে "বাপরে, মলাম রে, গেলাম রে," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তারাবাই তখন কি করিতেছিল এই চীৎকারে তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখেন ললিতাবাই হস্তাধিক পরিমিত অবগুণ্ঠন টানিয়া কলা-বউয়ের মত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আর মোতিলাল হো হো করিয়া হাসিতেছেন এবং ঘটনাস্থলে শীঘ্র আসিয়া মজা দেখিবার জন্য বৌদিকে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন…

তারাবাই আসিবামাত্র ললিতাবাই হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তারাবাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ঠাকুর পো, এ মরা সাপটা এখানে কে নিয়ে এলো! ও বুঝেছি এই মরা সাপটা দেখিয়ে ছোট বৌকে ভয় দেখানো হচ্ছিল বুঝি? আচ্ছা ছেলেমানুষ তো তুমি ঠাকুর পো… যাও, এখন সাপটাকে ফেলে দিয়ে হাত পা ধুয়ে ঘরে এস… সাপটা যে দেখছি মরে'—পচে' ঢোল হ'য়ে উঠেছে—দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে—কি ছেলে মানুষ গো—ছিঃ!……"

মোতিলাল বলিলেন, "আজ ঘরে ফিরবার কালে কিছুই পাওয়া গেল না। দেখলাম রাস্তার পাশে এই মরা সাপটা পড়ে' আছে। রিক্ত হস্তে তো গৃহে প্রবেশ নিষেধ কি না, তাই মনে ভাবলাম, এই সাপটা আজকার শিকার হ'লে তো মন্দ হয় না। একটা কিছু হাতে করে' নিয়ে যেতেই হ'বে, তা এই নতুন রকমের জিনিষটাই নিয়ে যাই না কেন,—ভারী মজা হবে এখন। এই ভেবে এটা যত্ন করে' নিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন দেখছি, লোকের মনযোগানোর মত পাজী কাজ আর নেই।" এই বলিয়া সকৌতুক দৃষ্টিতে মোতিলাল তারাবাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

তারাবাই নিমেষের মধ্যে একটু যেন গম্ভীর হইয়া কি ভাবিয়া লইলেন, তারপর আগ্রহভরা স্বরে বলিলেন, "...তা হ'লে তো এটাকে কোনো রকমেই ফেলে দেওয়া চলে না ঠাকুর পো,—এ ব্যাপারে তোমারই জিত ভাই—আমি ঘাট্ মানছি! দেখ, এটাকে আজকের মত ছাদের উপর রেখে দিলে তো বেশ হয়,—কি বল?"

"...তুমি কি পাগল হ'লে বৌদি!—এই অস্পৃশ্য মরা সাপ, যার ভিতর থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে তাই ছাদের উপর রেখে দিতে বল, বৌদি? নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হয়েছে আর নয়তো তুমি আমার কৃতকর্ম্মের শাস্তিস্বরূপ আমার উপর তোমারও কোনো দুষ্ট বুদ্ধি প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা কোরছ। না বৌদি এই জঘন্য জিনিষটাকে তোমার কথায় আমি কোনো রকমে ছাদের উপর রাখতে পারবো না কিংবা কাকেও রাখতেও দোবো না বলে দিচ্ছি।"

"...লক্ষী ভাইটি আমার, আমার কথা শোনো। নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার সঙ্গে এখন আর রহস্য করছিনে—আমার মাথাও খারাপ হয়নি। দেখ, ঠাকুর পো, প্রথমে আমি তোমার এই নতুন রকমের ব্যাপার দেখে, ভড়কে গিয়ে এটাকে ফেলে দিতে বলেছিলেম। কিন্তু তোমার শ্লেষ বাক্য যখন আমাকে প্রকৃতিস্থ ক'রে নতুন জ্ঞান দান করলে, তখন বুঝতে পারলেম ঠাকুর পো, 'জগতে কোনো কার্য্যই বিফলে যায় না।' যিনি যে উদ্দেশ্যে তোমার মনে দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়ে দিয়ে এই কাজ করিয়েছেন, তাঁর উদ্দেশ্যের মূলে যে কোনো গূঢ়তত্ত্ব নিহিত নেই, তা কে বলতে পারে? যা অতি তুচ্ছ, অতি কদর্য্য, অতি ঘৃণিত বলে আমরা অবহেলার চক্ষে দেখি, তাহারি মধ্যে হয়তো কোনো অদৃশ্য হস্তের যোগাযোগ আছেই। তুমি আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব, তার কার্য্য কারণ কি বুঝতে পারি ভাই? আমার কথা শোনো—তুচ্ছ নারীর কথা অবহেলা করো না—আর মনে রেখো, জগতে কোনো কার্য্যই বিফলে যাবার নয়, যাও..."

এমন কে দুর্ম্মুখ পুরুষ আছে যে, এই মহিয়সী নারীর কথার প্রতিবাদ করে! মোতিলাল আর কোনো বিরুক্তি করিতে সাহসী হইলেন না বটে, কিন্তু বৌদির মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহটুকু তখনকার মত থাকিয়াই গেল।*

২

পরদিন শোনা গেল করিমোন্নেসা বেগমের একছড়া বহুমূল্য হার চুরি গিয়াছে। এই করিমোন্নেসা নবাব নাজিম মুরশিদকুলিখাঁর প্রধানা ও বড় পেয়ারের বেগম। যে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে নবাব নাজিমগণ বেগম মহলের ছাদের উপর পরম রমণীয় বিমান-বাগিচা রচনা করাইতেন। কেমন করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে হয় ও কিরূপে তাহা উপভোগ করা যায় তাহার নানারকম প্রক্রিয়ার জনন কর্ত্তা এই মুসলমান নবাব বাদশাহগণ জগতে যে সকল অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

এই ভাগীরথীগর্ভসম্ভূত সমুন্নতশীর্ষ নবাব-প্রাসাদ যে এক কালে কত দেশ ও বিদেশের পথিক ও পর্য্যটকগণের পরম বিস্ময়ের বস্তু ছিল তাহার ভূয়সী প্রশংসা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। স্থাপত্য-শিল্পকলার মধ্যমণি নবাব-মহলের হর্ম্ম্যরাজী উৎসবময়ী ভাগীরথীর বক্ষে সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা ছড়াইয়া দিয়া নিজেরা ধন্য হইয়াছে, কি সেই প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া ভাগীরথী নিজে ধন্য হইয়াছেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। অলক্তক এক একখানি সুন্দর পাদপদ্মে অনুলিপ্ত হইতে পাইলে ধন্য হয়—না সেই সুন্দর পদযুগলই অলক্তক অনুলেপনে ধন্য হয়—এ দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সমাধান কে করিয়া দিবে!

যেদিন হারছড়াটি অদৃশ্য হয় সেইদিন অপরাহ্ণে বেগম করিমোন্নেসা উক্ত বিমান-বাগিচায় বসিয়া প্রসাধনে মগ্ন ছিলেন। দুইজন সুন্দরী বাঁদি এই প্রসাধন ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিতেছিল। বেগম সাহেবা হারছড়াটি গলদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া নিজের পাশেই রাখিয়াছিলেন। জনৈক সুযন্ত্রী বাঁদির পুরবী রাগিণীর আলাপে যেন সুরের জাল রচিত হইতেছিল। সুতরাং স্থান কাল ও পাত্রের মণিকাঞ্চনের

* গত কার্ত্তিক সংখ্যা "পঞ্চ পুষ্পে" এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়।

সংযোগে সকলের মনোযোগ যে এই সুরের জালে আবদ্ধ না হইবে তাহা আর বিচিত্র কি! তারপর কখন প্রসাধন শেষ হইয়া গিয়াছে—সুর থামিয়া গিয়াছে—তাহারাও বিমান-বাগিচা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু বেগম সাহেবা কিংবা তাঁহার পার্শ্বচারিণীগণের কাহারও হার সম্বন্ধে কোনই খেয়াল হয় নাই। পরিশেষে যখন হারের খোঁজ পড়িল তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। তবুও রাত্রিতেই বিমানবাগিচা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বেগম মহল তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইয়াছে কিন্তু হার পাওয়া যায় নাই।...

পরদিন প্রাতে নবাব নাজিম মুরশিদকুলি খাঁ দরবারে আসিয়া হুকুম দিলেন, যে এই হারের সন্ধান দিতে পারিবে তাহাকে একশত আসরফি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।...

এই আশ্চর্য্য রকম হার চুরির সংবাদ ও নবাবের পুরস্কার ঘোষণা অচিরে রাজধানী মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। সহরময় সকলের মুখেই খালি ঐ বিষয়েরই আলোচনা। কত লোক কত ভাবে অতিরঞ্জিত করিয়া এই চুরির ব্যাপারটাকে যারপর নাই বিস্ময়কর করিয়া তুলিতেছে। কাহার চাচী নাকি দেখিয়াছে, কাল রাত্রে বেগম মহলের বিমান-বাগিচায় একটা হুরির আবির্ভাব। সে না কি তাহার পাখার ঝাপ্‌টা পর্য্যন্ত স্বকর্ণে শুনিয়াছে ইত্যাদি···কোতোয়ালীর লোক সহরের আটঘাট বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছে যেন কেও সহর হইতে বাহির হইয়া না যায়। গোয়েন্দা-বিভাগ গোপনে নানা স্থানে ও নানা জনে অনুসন্ধান চালাইতেছে। কিন্তু চোরও ধরা পড়িতেছে না, বামালও পাওয়া যাইতেছে না।

সেই দিনই সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে তারাবাই কোনো কার্য্য উপলক্ষ্যে ছাদের উপর গিয়া দেখিতে পাইলেন তথায় একছড়া হার পড়িয়া আছে, কিন্তু মোতিলাল কর্ত্তৃক রক্ষিত সেই মৃত সর্পটি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। হারছড়াটি কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন ইহা নিশ্চয়ই সেই হার যাহা গত কল্য বেগম মহল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কেমন করিয়া এই হার এখানে আসিয়া পড়িল। কিন্তু সাপটিকে দেখিতে না পাইয়া তাহার চিন্তার ধারা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি যেন ইহার খেই ধরিতে পারিয়াছেন—যেন ইহার কারণ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন! হঠাৎ এক ঝলক্ রক্ত তাহার চোখ ও মুখের উপর যেন লীলায়িত হইয়া উঠিল—হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন যেন দ্রুততর বলিয়া মনে হইল। তিনি আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন।

হীরালাল ও মোতিলাল তখন দোকানে ছিলেন। তারাবাই তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন, যেন সত্বর তাঁহারা দোকানপাট বন্ধ করিয়া বাড়ি চলিয়া আসেন—বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

তারাবাই তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় হারছড়াটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময়ে দুই ভাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মোতিলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি বৌদি?"

তারাবাই হারগাছটি তাহাদের সামনে ধরিয়া বলিলেন, "সাপের বদলে এই হার পাওয়া গিয়েছে, ঠাকুর পো, যে হার গত কল্য বেগম মহলের বিমান-বাগিচা থেকে চুরি গিয়েছিল।"

হীরালাল সর্পঘটিত ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না। তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন! কিন্তু মোতিলাল বৌদির মুখে হাসির আভাষ দেখিতে পাইয়া একেবারে দমিয়া গেলেন না। তবুও ভাবিলেন, কি জানি বাবা—নবাব মহলের ব্যাপার—আগুন লইয়াই খেলা—কথায় কথায় গর্দ্দানাও যাইতে পারে—আবার শিরোপাও মিলিতে পারে! সুতরাং সে তখন আনন্দ করিবে কি চোখের জল ফেলিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বৌদির মুখের পানে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

তারাবাই বলিলেন, "এখন কার্য্যকারণ সংযোগে উপস্থিত যা দেখতে পাচ্ছি তাতে ঠাকুর পো, তোমারই জিৎ আর তুমি উপলক্ষ্য মাত্র হয়ে যা করেছিলে তাতে নিশ্চয়ই আমাদের সুদিন ফিরে আসবে—ভীত বা বিস্মিত হবার কোনই কারণ নেই।"

এই বলিয়া তারাবাই তাহার ও মোতিলালের সহিত সর্পসংশ্লিষ্ট ব্যাপার লইয়া যাহা ঘটিয়াছিল তাহা হীরালালকে বলিলেন, আর কি রকম আশ্চর্য্যজনক ঘটনা পরম্পরায় বেগম সাহেবার হার তাহাদের বাড়ির ছাদের উপর আসিয়া

পতিত হইল সমস্ত বিষয়টা দুই ভাইকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়া পরে কি করিতে হইবে তাহার হদিশ বাতলাইয়া দিলেন।

হীরালাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন, আর মোতিলাল বলিলেন, "বৌদি, এতদিন তোমায় চিন্‌তে পারিনি—তুমি কে? তোমায় নানা রকমে অসম্মান করে আসছি,—তোমার যোগ্য মর্য্যাদা তোমাকে কোনো দিনই দিতে পারিনি, তবুও তুমি শুভাকাঙ্খিনী জননীর ন্যায় তোমার স্নেহ-সম্পুটে এই উচ্ছৃঙ্খল দেবরটিকে রক্ষা ক'রে আসছো—তুমি কে? এই বলিয়া মোতিলাল তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার রুদ্ধ আবেগ তাহার হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়া অশ্রুরূপে ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল তারাবাইয়ের চরণের উপরে!...

৩

নবাব বাহাদুর মুরশিদকুলি খাঁ দরবারে বসিয়াছেন। আমীর, ওমরাহ, দেওয়ান্, উকীল, কানুনগো, কারকুন, উচ্চপদস্থ হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারীবৃন্দ, অভাব-অভিযোগকারী ও শান্তি রক্ষক সান্ত্রীগণের উপস্থিতিতে দরবার চত্বর যেন গিস্ গিস্ করিতেছে। নবাব বাহাদুর দেখিলেন দরবারের এক পার্শ্বে যেখানে তাহার বেশ নজর পড়ে এ রকম স্থানে দুই জন মাড়োয়ারী বেশধারী ভদ্র যুবক তাঁহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এই অপরিচিত লোক দুটি কে জানিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি তাহাদিগকে তাঁহার নিকট আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

তখন হীরালাল ও মোতিলাল দুই ভাই নিজামতি কায়দায় কুর্ণিশ করিতে করিতে নবাবের মসনদ্ সান্নিধ্যে সমুপস্থিত হইয়া হারছড়াটি নবাবের হস্তে প্রদান করিলেন। তারপর নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া হীরালাল বলিলেন, "জাঁহাপনা, এই হার কিরূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছে জানিলে হুজুরের বিস্ময়ের অবধি থাকিবে না। আমার ভাই এই মোতিলাল এই হার প্রাপ্তির বিষয় সম্যক অবগত আছে। এক্ষণে নিজামতের অনুমতি হইলে ইহার প্রকৃত তথ্য বর্ণিত হইবে।"...

এই সময়ে এই হারের বিষয় লইয়া দরবারে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল এবং দরবারস্থ যাবতীয় লোক এই ব্যাপার জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন।

মোতিলাল তাহার বৌদির আদেশ পালন করিতে গিয়া তাঁহার সহিত রহস্য করিবার জন্য কিরূপে মরা সাপ আনিয়াছিল আবার তাঁহারই আদেশে কি কারণে তাহা ছাদের উপর রাখিয়া দিয়াছিল তাহা সমস্তই সুন্দরভাবে বর্ণনা করিল।

তারপর বলিল, "এক্ষণে হার প্রাপ্তির সম্বন্ধে যাহা বলিব, জনাব, তাহা আমার চাক্ষুষ নহে, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমাকে বলিতে হইবে। সুতরাং ইহার সত্যাসত্য জাঁহাপনার বিবেচনাধীন।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"যে দিন পূর্ব্বাহ্নে এই মরা সাপটি আমি ছাদের উপর রাখিয়া দিই—সেই দিনই অপরাহ্নে বিরামবাগিচা হইতে এই হার অন্তর্হিত হয়। হারছড়াটি নিশ্চয়ই বেগম সাহেবা বিরামবাগিচার কোনো স্থানে খুলিয়া রাখিয়া পার্শ্বচারিণীগণের সহিত আলাপ আপ্যায়নে কিম্বা অন্য কোনো কারণে অন্যমনস্কা ছিলেন। সেই অবসরে কোনো শিকারী পাখী সম্ভবতঃ বাজপাখী আহার মনে করিয়া হারগাছটি ছোঁ দিয়া লইয়া উধাও হয়। পাখীরা আহার পাইলে তাহা কোনো স্থানে না বসিয়া খায় না। কোনো স্থানে বসিয়া খাইবার জন্য স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে ঘটনাক্রমে আমাদের ছাদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার কালে প্রকৃত খাদ্য মৃত সর্পটি দেখিতে পায়। তখন এটা খাই কি ওটা খাই এই দ্বন্দ্ব পাখীর মনের মধ্যে উদয় হইলে ছাদের উপরিস্থ খাদ্যই তাহাকে বেশী প্রলুব্ধ করে। কারণ কৃত্রিম খাদ্যের চেয়ে প্রকৃত খাদ্যের প্রতি আকর্ষণটাই স্বাভাবিক। সুতরাং সে সেই অপ্রাকৃত খাদ্যটি সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া সেই প্রকৃত খাদ্য সাপটিকে লইয়াই যে চলিয়া যাইবে তাহার আর বিচিত্র কি?"...

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই মুরশিদকুলি খাঁ "শোভান আল্লা" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং দরবারস্থ যাবতীয় সভাসদবর্গ যাহারা এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া মোতিলালের বর্ণনা শুনিতেছিলেন তাহারাও সকলে নবাব সাহেবের সারে সায় দিয়া পুনরায় "শোভান আল্লা"—বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে দরবারে এই ব্যাপার লইয়া বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল এবং চারিদিক হইতে আনন্দের গুঞ্জন উঠিতে লাগিল।

মুরশিদকুলি খাঁ হীরালালকে বলিলেন, "এই ব্যাপারের জন্ম আপনাদিগকে বহুৎ বহুৎ ধন্যবাদ দেওয়া আমার উচিত, কিন্তু আপনাদের চেয়েও ধন্যবাদের পাত্রী আপনার বুদ্ধিমতী স্ত্রী। তাহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বিষয় যতই ভাবিতেছি, ততই যেন আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আমার শির সেই মহিয়সী মহিলার চরণতলে অবনমিত হইয়া পড়িতেছে। সর্ব্বপ্রথম সেই মাতৃস্বরূপিণীর চরণতলে আমার বহুৎ বহুৎ সেলাম জানাইবেন। আর আমার ঘোষণা অনুযায়ী যে একশত আসরফি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে তাহা আপনারাই পাইবেন। আর একশত আসরফি আমার মাতৃচরণে সেলামীস্বরূপ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। যদিও আজ আমি মুসলমান কিন্তু একদিন আমি হিন্দুই ছিলাম। হিন্দু পিতার ঔরসে ও হিন্দু মাতার গর্ভে আমার জন্ম। হিন্দু পিতামাতার রক্ত আমার ধমনীতে প্রবাহিত। সেই হিন্দুমাতার সমধর্ম্মী এই নারীরত্নের সহিত মাতৃসম্পর্ক পাতাইয়া আবার মা বলিয়া ডাকিতে মা-হারা অভাগার এই বুভুক্ষু হৃদয় আজ হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। আজ গর্ব্ব, লজ্জা, অনুশোচনা এক সঙ্গে জোট বাঁধিয়া এই মুরশিদাবাদের মসনদকে যেন তুচ্ছ করিয়া দিতেছে। মাতৃ-স্নেহের কাঙ্গাল এই সন্তানের সামান্য দান মা কি আমার গ্রহণ করিবেন না?"

হীরালাল বলিলেন, "কেন করিবেন না, জনাব, নিশ্চয়ই করিবেন। তবে হুজুরের এই মা-টি যখন শুনিবেন যে, বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যার অধীশ্বর আজ তাহার সন্তান—তাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে, তখন নির্ধনের ধনপ্রাপ্তির মত আনন্দাতিশয্যে সে যেন পাগল হইয়া না যায়—এই ভয়।"

এই কথায় মুরশিদকুলি খাঁ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরে, খাজাঞ্চিকে আদেশ দিলেন দুইটি তোড়ায় প্রত্যেকটিতে একশত আসরফি পূর্ণ করিয়া আনিবার জন্য। খাজাঞ্চি দুইটি তোড়া আনিয়া হীরালালকে প্রদান করিল। হীরালাল একটি তোড়া গ্রহণ করিলেন ও অন্যটি নবাবের পদতলে স্থাপন করিয়া বলিলেন :—

"আপনার মায়ের জন্য প্রদত্ত এই তোড়াটি গ্রহণ করিলাম, জাঁহাপনা, ইহা প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু অপর তোড়াটি যাহা হারের জন্য পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইতেছে তাহা কোনো মতেই লইতে পারিব না, জনাব। কর্ত্তব্যের বিনিময়ে এই যে অর্থগ্রহণ ইহা আমাদের শাস্ত্র-বিধানের বাহিরে। অর্থ দিয়া কাহাকেও তুষ্ট করিতে পারা যায় না, যতই দিবেন ততই তাহার লালসা বৃদ্ধি পাইবে। আমরা জাঁহাপনার গরীব প্রজা, একসঙ্গে এতগুলি অর্থ পাইলে হয়তো এই মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিতে পারে। সুতরাং এই পুরস্কার জাঁহাপনার কাছেই গচ্ছিত রহিল। যদি কখনো কুদিন আসে—সংসারের আপদে বিপদে নিষ্পেষিত হইয়া যদি কখনো জাঁহাপনার সাহায্যপ্রার্থী হই, সেই দিন যেন নবাব নাজিমের নজর এই গরীব বান্দাদের উপর আপতিত হয়।

তারপর হীরালাল তাহার হস্তধৃত তোড়াটি দেখাইয়া বলিলেন, "এই অনর্থগুলি ছাড়া জাঁহাপনার ভাণ্ডারে কি কোনো অর্থই নাই? যদি থাকেতো দিন, সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া আজকার মত গৃহে ফিরিয়া যাই।"

মুরশিদকুলি খাঁ হীরালালের এই ইঙ্গিত বাক্য বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মসনদ্ ত্যাগ করিলেন এবং হীরালালকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "জ্ঞানদাতা গুরু, আমার এই হৃদয় ভাণ্ডার উজাড় করিয়া তোমায় দান করিলাম। আজ হইতে তোমার জন্য আমার অন্তর ও বাহিরের দ্বার চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত রহিল।"

হীরালাল এই আশাতিরিক্ত পুরস্কার লাভ করিয়া আনন্দে ও গৌরবে তাহার বুকখানা যেন ফুলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "যে হৃদয়দুর্গে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার আপামরসাধারণ আশ্রয় লাভ করিয়া পরম শান্তি উপভোগ

করিতেছে সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ আজ আমার অধিকারে। আমার স্থায় সৌভাগ্যবান জগতে আজ কে? এসো মোতিলাল, আজ যে অমূল্যনিধি পাইলাম ইহার দ্বারা হয়তো একদিন আমরা কুবেরের ভাণ্ডার রচনা করিতেও সক্ষম হইতে পারিব।"

এই বলিয়া যথারীতি নিজামতি কায়দায় কুর্ণিশ করিতে করিতে দুই ভাই পশ্চাদপসরণে দরবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দরবারস্থ যাবতীয় লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত এই মহিমময় দৃশ্য দেখিতেছিলেন। দুই ভ্রাতা চলিয়া যাইতেই মুরশিদ কুলি খাঁ সেদিনকার মত দরবার ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার জীবননাট্যের মর্ম্মপটখানি যে আলোক সম্পাতে আজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তাহা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো দিনই ম্লান হইয়া যায় নাই।

৪

প্রকৃতিদেবী সবে মাত্র প্রাবৃটের সিক্তবাস পরিত্যাগ করিয়া ও সদ্যস্নাতা মুক্তকেশী কিশোরীর মত তাহার ভুবনভরা রূপ চারিদিকে সুপ্রকাশ করিয়া যখন স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে একাকার করিয়া দিয়াছে, এমন এক শরতের সুন্দর প্রভাতে, ভাগীরথীর দুইকূল প্লাবিত করিয়া শঙ্খ ঘণ্টা ও নানাবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মুরশিদকুলি খাঁ তখন দরবারে বসিয়াছেন। প্রধান কানুনগো রায় রায়ান হরিনারায়ণ রায়কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমাদের কোন পর্ব্বের দিন রায় রায়ান্!"

রায় রায়ান্ বলিলেন, "আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা জাঁহাপনা! পূজারদিন প্রাতঃকালে বাদ্যভাণ্ডসহ পূজার প্রধান অঙ্গ গঙ্গাজলে ঘটপূর্ণ করিতে হয়। সেই উৎসব উপলক্ষ্যে এই বাদ্যধ্বনি শোনা যাইতেছে জনাব।"

এই কথা শুনিয়া মুরশিদকুলি খাঁ একটু চিন্তিত হইলেন; তারপর বলিলেন "ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিলেও পূর্ব্বের সংস্কার ভোলা যায় না, রায় রায়ান্! যখন হিন্দু ছিলাম এই উৎসব উপলক্ষ্যে কত আমোদপ্রমোদ করিয়াছি—সমস্ত বিনিদ্র রজনী ক্রীড়া কৌতুকে কাটাইয়াছি—শৈশব ও কৈশোরের সেই উদ্দাম আনন্দ আজ বেশ মনে পড়িতেছে, রায় রায়ান্, দেখ, এক কাজ করিলে হয় না?"

"কী জাঁহাপনা!"

"না—থাক্—একটু ভাবিয়া দেখি—" এই বলিয়া তিনি পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন।

এইখানে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া রাখা প্রয়োজন। মুরশিদকুলি খাঁ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও হিন্দু ধর্ম্মের উপর বীতস্পৃহ ছিলেন না। হিন্দুদের কোনো ধর্ম্মকর্ম্মে তিনি কখনো হস্তক্ষেপ করিতেন না। অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে তিনি উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বড় বড় কর্ম্মচারীদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাহার শাসনগুণে হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া তাহার শাসনকাল পরম শান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল। দিল্লীর বাদশাহ তাহার ঔদার্য্যে, বীরত্বে ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রথমতঃ ঢাকার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। নদীবহুল পূর্ব্ব বাঙ্গালা তখন জলদস্যুর অত্যাচারে কেহ নিরাপদে কালাতিপাত করিতে পারিত না। অনেকে ধন, প্রাণ ও মানের ভয়ে প্রিয় জন্মভূমি পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। মুরশিদকুলি খাঁ অল্পদিনের মধ্যেই এই সমস্ত ভীষণ জলদস্যুদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তথায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এদিকে পশ্চিম বাঙ্গালাও তখন নিরাপদ ছিল না। অদূরদর্শী, স্বার্থপর রাজকর্ম্মচারীদের যথেচ্ছাচারে ও চোর ডাকাতের ভীষণ অত্যাচারে পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসীরাও তখন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় শান্তি স্থাপিত হইলে দিল্লীর বাদশাহ মুরশিদকুলি খাঁর কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাহাকে বাঙ্গালার সুবেদারী পদে নিয়োগ করেন এবং ঢাকা হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া পশ্চিম বাঙ্গালার মুকশিদাবাদ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই মুরশিদকুলি খাঁর নামানুসারেই এই মুকশিদাবাদ শেষে মুরশিদাবাদে পরিণত হয়। তাহার শাসন কৌশলে অল্পদিনের মধ্যেই

সমস্ত সুবা বাঙ্গালায় শান্তির বিমল হাওয়া বহিতে আরম্ভ হয়।

এইরূপে তিনি কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই সম্মিলিত সদিচ্ছার উপর মুরশিদাবাদের মসনদ্ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেন।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করার পর মুরশিদকুলি খাঁ রায় রায়ান্‌কে বলিলেন, "আমার আদেশ, অদ্য রাত্রিকালে কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারো গৃহে আলো প্রজ্বলিত হইবে না। সমস্ত হিন্দুগৃহের উৎসব বন্ধ করিতে হইবে। নগরীর মধ্যে কেহ কোথাও আমোদপ্রমোদ, বাদ্যনিনাদ কিংবা খেলা ধূলায় রাত্রিযাপন করিতে পাইবে না। তাহার পরিবর্ত্তে নবাবপ্রাসাদ আলোকমালায় ও সাজসজ্জায় সুশোভিত হউক। প্রধান রাজপথের তোরণ দ্বারগুলি পুষ্পপল্লব পতাকায় ও দীপালোকে সজ্জিত হইয়া তদুপরি ঘন ঘন নহবতের বাদ্যনিনাদ উত্থিত হউক। ভাগীরথীর প্রধান সোপান চত্বর হইতে 'এমামবারার' বিস্তীর্ণ ময়দান পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান মণিমুক্তাখচিত নীলচন্দ্রাতপতলে পারসিক ও চৈনিক শিল্পীদ্বারা অমরাবতী সমতুল পারস্থানের দ্বিতীয় গুলবাগ রচিত হউক। এমন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা হউক যাহার মধুর আকর্ষণে নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা আপন হারা হইয়া সেই মধুচক্রতলে সমবেত হয়। হিন্দুগণ তাহাদের উৎসব আনন্দ ভুলিয়া, সন্তান মাতৃঅঙ্ক ত্যাগ করিয়া, মাতা সন্তান স্নেহ ভুলিয়া, যুবতী স্বামীর গঞ্জনায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া যেন এই আনন্দ মেলায় যোগদান করিতে পারে।"

"এস ভাই হিন্দু ও মুসলমান কে কোথায় আছ, আজ সমস্ত ভেদাভেদ দ্বেষাদ্বেষ ভুলিয়া এই মহামিলনী সার্থক করিয়া তোল। শত্রু মিত্র আত্মপর ভুলিয়া এস, একটা রাত্রি আজ আমরা আনন্দ উৎসবে কাটাইয়া দিই। যেখানে দশজনে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া বিমলানন্দে আত্মহারা হইয়া যায়, সেইখানেই সদানন্দময় আল্লাতলা, সচ্চিদানন্দময় বিরাট পুরুষের আবির্ভাব অসম্ভব নয়।" এই বলিয়া নবাব তখনকার মত দরবার হইতে প্রস্থান করিলেন। নবাবের আদেশ অনুযায়ী এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যাহাতে এই উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারা যায় সেজন্য নবাবের শুভাকাঙ্ক্ষী যাবতীয় কর্ম্মচারী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন আমীর ওমরাহ সকলেই এই অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিল।...

প্রবাদ এই যে, পর বৎসরও মুরশিদকুলি খাঁ এই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে এই উৎসবের পুনরাভিনয় করিতে ইচ্ছুক হইলে হিন্দুগণ বিশেষ আপত্তি করে। নবাব বাহাদুর সেইজন্য এই বৎসরের সমস্ত খরচা "বেড়াভাসা" নামক মুসলমানদের যে উৎসব প্রচলিত ছিল, সেই উৎসবের খরচার সহিত সংযোগ ঘটাইয়া, ঐ জাতীয় উৎসবটিকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। সেই "বেড়াভাসা" উৎসব অদ্যাবধি মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুর কর্ত্তৃক মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অবশ্য, পূর্ব্বে যে উৎসব হয়তো পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয়ে সুসম্পন্ন হইত, এক্ষণে তাহা পাঁচ হাজারে পরিণত হইয়াছে কি তাহারও কম, সে বিষয়ের সঠিক সংবাদ দিতে পারিলাম না।

৫

এদিকে তারাবাই নবাবের এই খামখেয়ালী আদেশ যখন হইতে শুনিয়াছেন তখন হইতেই মনে মনে ভাবিতেছেন কি উপায়ে আজ গৃহকুট্টিমে আলো জ্বালিতে সক্ষম হইবেন। বিধর্ম্মীর মুখে এই অকল্যাণের বাণী তাহার বক্ষে যেন শেলের মত বিঁধিতেছিল। আজ কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রি—এমন শুভরাত্রি গৃহস্থের কল্যাণের জন্য বৎসরে একদিন মাত্র আসিয়া থাকে। সেই শুভরাত্রিতেই নির্ব্বোধ নবাব এমন বাদ সাধিলেন যে, গৃহ কোণে একটিমাত্রও সুগন্ধ দীপ জ্বালিয়া গৃহীর আরাধ্যা দেবীর পাদপীঠ আলোকিত করিতে পারিব না। ঐ যে নীল আকাশের তলে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা' আজ গৃহীর আরাধ্যা দেবীর অব্যর্থ আগমন সূচনা করিতেছে। ঐ যে বিপিনে কান্তারে তাহারই সবুজ অঞ্চলের ঢেউ উঠিয়া সেই ঢেউয়ের খেলা আমাদের হৃদয় তটে আসিয়া লীলায়িত হইতেছে। ঐ যে অতসী, অপরাজিতা, চম্পক চামেলী, কুন্দ কুরুবক প্রভৃতি পুষ্পবালারা ভিড় করিয়া আসিয়াছে তাহারই চরণের অঞ্জলীর উপচার হইবার জন্য—এমন দিনে তাঁহাকে বরণ করিয়া ঘরে লইতে

পাইব না। সারা বছরের সঞ্চিত অর্ঘ্য হৃদয়পরতে সাজানোই রহিল। "স্বামী পুত্রের ঘর ধনধান্তে পূর্ণ করিয়া দাও মা!" বলিয়া সে অর্ঘ্য আজ আর কোজাগরী লক্ষ্মী-মাতার রাঙা পায়ে ঢালিয়া দিতে পারিব না! হায়রে, দাসের দেশের লোক, তোমার ইষ্ট দেবীর অর্চনাতেও কি তোমার স্বাধীনতা নাই?

তারাবাই এই রকম কত কি আকাশপাতাল ভাবিতেছেন। ঘটনাক্রমে সেইদিনই অপরাহ্ণে সন্তানসম্ভবা ললিতাবাইয়ের প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তারাবাই যেন ইহাতে অকূলে কূল পাইলেন। অকস্মাৎ ললিতা বাইয়ের এই প্রসব বেদনা যেন শাপে বর হইয়া দেখা দিল......

তিনি হীরালালকে নবাবের নিকট গিয়া অদ্য রাত্রির জন্ত একটি মাত্র দীপ জ্বালিবার আদেশ আনিতে বলিলেন। আর বলিয়া দিলেন, যদি নবাব কোনো আপত্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই হারানো হারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিবে যে, এই বিপদের দিনে আমরা সেই পুরস্কারের প্রার্থী স্বরূপ অদ্য রাত্রে একটি মাত্র দীপ জ্বালিবার আদেশ ভিক্ষা চাই।

হীরালাল নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় বিশেষ চিন্তিত হইয়াই গিয়াছিলেন, কিন্তু হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, একটি মাত্র দীপ প্রসূতির গৃহে জ্বালিয়া রাখিবার আদেশ পাইয়াছেন। তখন তারাবাই পুলকিত হইয়া বলিলেন, "ললিতাবাই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, তাহার প্রসব-বেদনা না উঠিলে লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে আজ ঘরে আলো জ্বলিত না।" এই বলিয়া তিনি তাহাদের প্রাঙ্গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুলসীর মূলে গলায় অঞ্চল জড়াইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ললিতাবাই একটি সুন্দর সন্তান প্রসব করিলেন। এই একটুখানি পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্র সংসারে দারুণ অশান্তি ও নৈরাশ্যের ছায়াপাত ঘটিয়াছিল, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় তাহা অপসৃত হইয়া আবার বাড়িখানি আনন্দমুখর হইয়া উঠিল।

তারাবাইয়ের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল ভিন্নমুখী। তিনি ধাত্রীর উপর প্রসূতি ও সন্তানের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া পূজাগৃহে গমন করিলেন। পূজার উপকরণগুলি যথারীতি সুসজ্জিত করিয়া দীপদানে সুগন্ধি দীপ জ্বালিয়া দিলেন। ধূপ ধুনার গন্ধে বাড়িখানি আমোদিত হইয়া উঠিল।

তখন তিনি একটি তাম্রকুম্ভ কক্ষে তুলিয়া লইয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। তারপর, মনে মনে কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা মাখানো স্বপ্নের জাল বুনিতে বুনিতে ধীর মন্থর গতিতে গঙ্গাতীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন পূজার গঙ্গোদক আনিবার জন্ত।

এই স্থানে বলা প্রয়োজন যে, ইহাদের এই ক্ষুদ্র বাস ভবনের অদূরেই ভাগীরথী কুলকুল রবে প্রবাহিতা ছিলেন। শেঠদের গৃহস্থালী ঘরখানি—যে গৃহে আজ রাত্রিতে কোজাগরী লক্ষ্মীমাতার পূজা হইবে সেই ঘরখানির নাম ছিল "গঙ্গা দুয়ারী" ঘর। এই গৃহখানি এমন ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে এই ঘরের ভিতর ও বারান্দা হইতে ভাগীরথীর পবিত্র সলিল স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইত। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া চোখ মেলিতেই 'সদ্যপাতক সংহন্ত্রী পরমাগতি' ভাগীরথীর দর্শনলাভ হইত ও দিবসের প্রথমেই প্রাণে যেন একটা নব চেতনার উল্লাস জাগাইয়া দিত। গৃহদেবতার উদ্দেশে এই গৃহে দীপ জ্বালিলে সেই দীপের শিখা জাহ্নবীর গর্ভ সলিলে প্রতিভাত হইয়া চঞ্চলা বীচিমালার উপর যেন আলোর ঝর্ণার মত দেখাইত।

তারাবাই ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইবা মাত্র একখানি খেয়া নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। এই ঘাটটি "চকের খেয়াঘাট" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। নৌকা হইতে অধিকাংশ লোকজন নামিয়া যাওয়ার পর তারাবাই দেখিলেন, একটি সুন্দরী যুবতী নৌকা হইতে অবতরণ করিতেছে। তাহার সধবার বেশ—পরণে লালপাড় শাড়ী—প্রকোষ্ঠে শঙ্খ বলয়—সীমন্তে সিন্দুর রাগ—পদতল অলক্তক রঞ্জিত—হস্তে ঝাঁপি। সেই পূর্ণাঙ্গী তন্বীর অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্য হইতে যেন রূপসায়রের রূপের কণা ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। তারাবাই রত্ন চেনেন—তিনি চিনিয়া ফেলিলেন। নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা? দেখিতেছি গৃহস্থ ঘরের বউ—এই ভরা সন্ধ্যায় একলা কোথায় যাবে মা?"

মূহূর্তেই রতন চেনে। তিনি একগাল হাসিয়া বলিলেন, "আমিও তোমাকে চিনতে পেরেছি মা—তুমিতো আমার বড় কম মেয়ে নও—তোমাতে যে আমি আছি—নইলে আমি ছাড়া তুমি কি কখনো আমায় চিনতে পারতে মা! এই তো কত লোক এখনি না থেকে নেমে গেল—কেউতো চিনতে পারেনি মা! এখন পথ ছাড় লক্ষ্মী মা-টি আমার।

"কোথায় যাবি, না বললে তো পথ ছাড়বো না।"

"আমায় একবার নবাবের বাড়ী যেতে হবে।"

"বিধর্ম্মী মুসলমানের বাড়ী যেতে তোর মন সরবে তো মা?"

"পাগলী মেয়ের কথা শোনো,—হিন্দুও মানুষ মুসলমানও মানুষ—মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করতে গেলে কি আমার চলে? আমাকে যে ডাকার মত ডাকবে আমি যে তারই মা! শুধু আচার নিয়ে তো কথা? তা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করলেও, নবাব তার পূর্ব্বের সংস্কার এখনো ভুলে যায়নি। সে তো আগে হিন্দুই ছিল মা!...এখন পথটি ছেড়ে দাও লক্ষ্মী, আমার বড্ডো ত্বরা আছে।"

তারাবাই পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার চক্ষে ভক্তি অশ্রুরূপে দেখা দিল। তিনি দুই হাতে তাঁহার রাঙা পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া সেই শিশিরনিষিক্ত পদ্মপলাশের ন্যায় চোখ দুটি তুলিয়া স্থাপন করিলেন তাঁহার অতুলনীয় মুখের উপর। স্থান কাল ও পাত্রের মণিকাঞ্চন সংযোগ দেখিয়া অস্তগামী সূর্য্যের শেষ লালিমাটুকু সেই অতসী কুসুমাভ যুগল বয়ানে লীলায়িত হইয়া উঠিল!

তারাবাই চোখে জল ও মুখে হাসি লইয়া বলিলেন, "একবার মেয়ের ঘর হ'য়ে যাবিনে মা,—আমি যে আজ বড় আশা করে' তোরই পথ চেয়ে বসে আছি জননি!"

তিনি পদতল হইতে তারাবাইকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "নগর প্রবেশের পূর্ব্বেই যখন তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে তখন তোর ঘরেই আগে যাবো—কিন্তু মা—দেখছি, নবাব প্রাসাদ ছাড়া সমস্ত নগরী আজ অন্ধকারময়! এই এত বড় নগরে দীপান্বিত দানে কেহই তো আমার সম্বর্দ্ধনা করেনি মা! কেবল একটি মাত্র গৃহে একটি মাত্র ক্ষীণালোক দেখা যাচ্ছে,—এমন কেন হ'ল মা!"

"যে গৃহে ঐ ক্ষীণালোক দেখা যাচ্ছে ঐটিই এই সৌভাগ্যবতীর ঘর"—এই বলিয়া তারাবাই নবাবের আদেশের কথা ও তিনি কেমন করিয়া একটিমাত্র দীপ জ্বালিবার অনুমতি পাইয়াছেন তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন।

দেবী বলিলেন, "এ যে সমস্তই আমারি রচনা তারা!"

"তবে কি এতক্ষণ তারার মন পরীক্ষা করছিলি মা! তবে যাও মা দয়াময়ি,—আমি ঐ ঘরের মধ্যে আসন পেতে রেখে এসেছি তোমারই উদ্দেশে; যাও মা—এই সৌভাগ্যবতীর ঘর আলো করে' বসো গিয়ে। আমি গঙ্গাজল নিয়ে গঙ্গাজলে সায়ংকৃত্য শেষ করে' তোমার পশ্চাৎ যাইতেছি। কিন্তু মা একটি কথা—আমি ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত তুমি আমাদের বাড়ি ত্যাগ করতে পাবে না—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।" এই বলিয়া তারাবাই পথ ছাড়িয়া দিলেন।

"তথাস্তু" বলিয়া দেবী সেই ক্ষীণালোকটি লক্ষ্য করিয়া শেঠদের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তারাবাই অপলকনেত্রে দেবীর গমন পথপানে চাহিয়া রহিলেন। যখন দেখিলেন যে, দেবী তাহাদের সেই পূজা গৃহে গিয়া অধিষ্ঠিতা হইলেন তখন তিনি এক পা এক পা করিয়া জাহ্নবীর গর্ভসলিলে নামিয়া পড়িলেন,—সেই কতদিনের সুখস্মৃতিবিজড়িত, কামনা ও বাসনার লীলা-নিকেতন—ইহলোকের নন্দন কাননের দিকে মুখ রাখিয়া এক পা এক পা করিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া জলে নামিতে লাগিলেন। ক্রমে হাটু, কোমর, বক্ষ ছাপাইয়া জল গলদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িল। তখনো তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ সেই ঘরখানির দিকে। কী মহিমময় দৃশ্য—যেন একটি প্রস্ফুটিত কাঞ্চন-কমল ভাগীরথীর বক্ষ আলো করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। নিমেষের মধ্যে দেখা গেল, সে কাঞ্চন-কমল আর নাই। জাহ্নবী কুল কুল রবে বহিয়া চলিয়াছেন।...নবাবপ্রাসাদ ও এমাম্বারার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যখন নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা উৎসবানন্দে মত্ত সেই সময় একটি মহৎপ্রাণ আত্মত্যাগের অক্ষয় ধ্বজা উড়াইয়া ও শাশ্বত আনন্দের অধিকারিণী হইয়া যে চিদানন্দধামে প্রস্থান করিলেন তাহা কেহ জানিতে পারিল না।......

এদিকে কোজাগরী লক্ষ্মীমাতা—অন্ধ রাত্রির উৎসবানন্দ-দায়িনী জননী, হীরালাল ও মোতিলাল শেঠের গৃহে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া বাঁধা পড়িয়া গেলেন—চঞ্চলা অচলা হইয়া তাহাদের গৃহে অধিষ্ঠিতা হইয়া রহিলেন। নবাবের সুনজরে পড়িয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের গৃহ ধনধান্যে উথলিয়া উঠিল। নবাব একদিন মহা সমারোহে ভ্রাতৃযুগলের গলদেশে স্বহস্তে বিজয়মাল্য পরাইয়া দিয়া "জগৎশেঠ" বা ধনকুবের উপাধিতে ভূষিত করিলেন ও ভারতের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনশালী ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহারাও তাঁহাদের বংশাবলী পুরুষানুক্রমে জগৎশেঠ উপাধিতে সর্ব্বসাধারণে সুপরিচিত হইয়া আসিতেছিলেন। তারপর এই বংশেরই শেষ জগৎশেঠ, পলাশীর প্রাঙ্গণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া, যে বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার ফলে লক্ষ্মী অতিষ্ঠা হইয়া উঠিলেন। স্বতঃসিদ্ধ চাঞ্চল্যবশতঃ জগৎশেঠ বংশের গৃহলক্ষ্মী বহুদিন পরে শেঠ-ভবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন রাত্রিকালে ভাদরের ভরা গাঙ্ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রাসাদতুল্য "শেঠ ভবনের" প্রধান চত্বর ও তদুপরি নিদ্রিত শেঠবংশের বংশাবলী সকলকেই নিজের গর্ভে টানিয়া লইলেন। বংশে বাতি দিবার জন্য একটি প্রাণীও অবশিষ্ট রহিল না।

বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যে ভীষণ অভিশাপ, আর তাহা যে এতটা আকস্মিক, তাহা বোধ হয় বিধাতাও জানিতেন না।

শ্রীপিণাকীলাল রায়

চরণ-সিঁদুর

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

ওরে মন, তার লাগি' অহর্নিশ কেন বৃথা শোক?
এখনো অন্তর তোর পেতে দিস্ আকুল আতুর
তাহার চরণ লাগি'! এখনো দেখিস্, তুই, মূঢ়,
তাহার চলার পথে তা'র শুভ্র পায়ের আলোক!

আকাঙ্ক্ষা-আকাশে তোর নিত্য জ্বলে জ্যোতিষ্ক পাবক
ঊষার সবিতা সম সেই দুটি চরণ-সিঁদুর,—
মুদিত পদ্মের মত হোক্ তাহা সায়াহ্ন-বিধুর,
ব্যর্থতা-ব্যথায় তাহা প্রশান্তির অন্ধকার হোক্!

অন্তরে নিরত তোর চরণ-পল্লব-অভিসার!
গোলাপ শুকালো তবু, আবীরে রাঙাস্ তোর দিন!
ভরঙ্গ তুলিয়া চলে বক্ষে তোর পদযুগ্ম যা'র,
সেজন মিটায় আজি পুরুষের কামনা মলিন
নিজেরে নিঃশেষ করি'! তবু তুই, আসঙ্গ-বিভোর!
সে-দুটি চরণ স্মরে দেহ কাঁপে মন কাঁপে তোর!

কেন?

শ্রীসুনির্ম্মল পুরকায়স্থ

জানিতে চাহিছ প্রিয়া কেন ভালবাসি?
যাহা হেরি মুগ্ধ আমি—সেত নহে কভু
পূর্ণশশী ম্লান-করা ঐ মধু-মুখ,
নবীন পল্লব সম আতাম্র কপোল,
মাধুরী মাখান নীল নলিনী নয়ন,
প্রবাল মলিন-করা দুটী ওষ্ঠপুট,—
ছন্দোময়ী গতিভঙ্গী, সুললিত গ্রীবা,
চম্পক অঙ্গুলি কিম্বা কৃষ্ণ কেশরাজি।

তব মুগ্ধ আঁখি দিয়া চিনেছি আমারে
অপূর্ব্ব সে নবরূপ; তাই মুগ্ধ আমি।
যে গন্ধ লুকায়ে ছিল আমার কোরকে
পেয়েছি আভাস তার তোমার আঘ্রাণে।
আত্ম-আবিষ্কার সুখ সমুদ্র মন্থনে
উছলিল প্রেমসুধা;—তাই ভালবাসি,

রাজা রামমোহন রায়

শ্রীমতী শান্তি ঘোষ বি-এ

যে মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিছু শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা, তিনি মাত্র একশত বৎসর—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু ইহারই মধ্যে আমরা তাঁহাকে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছিলাম। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের বা ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার দানের মূল্য যে কতখানি, তাহা আমরা কোনও দিনই বুঝি নাই। বহুদিন পরে গত বৎসরে জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার পবিত্র স্মৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এই উদ্যোগ হইয়াছিল ইহা বড়ই সুখের বিষয়।

রামমোহন রায় যে যুগে বাঙ্গলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে এক ভয়াবহ যুগ। ভারতবর্ষের নিজস্ব ও শাশ্বত যে ধর্ম্ম, সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি, তাহা তখন লুপ্ত হইয়াছে। বহুদিনের পরাধীনতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে দেশ একেবারে সমাচ্ছন্ন। সেই অন্ধকারে রামমোহনের অলৌকিক প্রতিভা যে দীপ জ্বালিয়াছিল, তাহারই রশ্মি আমরা আজও ভোগ করিতেছি। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ধারাকে তিনি আপনার চিন্তার দ্বারা, প্রাণশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ আমাদের জাতীয় জীবন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে। তাই শিল্পে ও সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, রাজনীতিতে আজ বিশ্বের চিন্তাধারায় আমরাও কিছু দিতে পারি; আমাদের এই গৌরব রামমোহনেরই প্রাপ্য। বস্তুত আজকের এই বাঙ্গলাদেশ সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বোতোভাবে তাঁহারই সৃষ্টি। তাই মনে হয় সেই আঁধারে রামমোহনের জন্ম যেমন অসম্ভব, তেমনি অবশ্যম্ভাবী।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে যে মাসে রাধানগরে ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কুলকর্ম্ম না করিয়া রাজসরকারে চাকরী করিতেন। রামমোহন অতি মেধাবী ছিলেন; সে কালের প্রথামত বাল্যকালেই আরবী ও পার্শী শিখিয়া তিনি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। মুসলমান সুফী দার্শনিকদের একেশ্বরবাদ ও উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বাল্যকালেই তাঁহার মনে এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করে। ষোল বৎসর বয়সে তিনি প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সে যুগে ইহা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। পিতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। বালক রামমোহন ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভারতবর্ষের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিব্বতে উপস্থিত হইলেন, ইচ্ছা সে দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবেন। তিব্বতে লামাদের ধর্ম্মাচরণের প্রতিবাদ করাতে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল। তিব্বতীয় নারীদের দয়ায় কোনক্রমে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। কিন্তু কোন বিপদেই বিচলিত হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না। উপনিষদের ঋষিদের নিকট হইতে যে সত্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন, সকল অবস্থাতেই সেই সত্য প্রচার করা তাঁহার জীবনের মন্ত্র ছিল।

তিব্বত হইতে আসিয়া তিনি কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কাজ করেন। কার্য্যোপলক্ষ্যে তাঁহাকে রামগড়, ভাগলপুর, রংপুর প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইয়াছিল। যখনই অবসর পাইতেন তখনই নানা লোকের সহিত তাঁহার ধর্ম্মমত আলোচনা করিতেন। এই সময় তিনি প্রথম ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন ও অতি অল্পকালের মধ্যেই অতি সুন্দর ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছিলেন।

১৮১৪ সালে রামমোহন চাকরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনের প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হয়। সে

সময় দেশ হইতে বেদ উপনিষদের চর্চা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। তিনিই নূতন করিয়া বেদ উপনিষদের আলোচনা প্রবর্ত্তন করেন। যাহাতে জনসাধারণ উপনিষদ্ পড়িতে ও বুঝিতে পারে এবং তাহার ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে, এইজন্য তিনি বাঙ্গালা ভাষায় উপনিষদ্ অনুবাদ করেন এবং তাহার ভাষ্য লেখেন। এই সময় তাঁহার বাটিতে "আত্মীয় সভা" নামে একটি সভা বসিত। এখানে রামমোহন তাঁহার ব্রহ্মবাদ প্রচার করিতেন এবং পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতেন। অনেক গণ্যমান্য লোক এই সভায় যোগ দিতেন; প্রায়ই নানামতাবলম্বী পণ্ডিতগণের সহিত এই সভায় তাঁহার তর্ক হইত। অতি উদারতা ও যুক্তির সহিত তিনি সকলকে পরাস্ত করিতেন। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান, এই তিনটি বিশিষ্ট ধর্ম্মভাবের মূল সুরগুলি তাঁহার নিজের ধর্ম্মজীবনে অতি সুন্দর ভাবে মিলিয়া গিয়াছিল। সকল ধর্ম্ম, সকল অনুষ্ঠান যে পরম-পুরুষকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তিনি তাঁহারই পূজা করিতে বলিতেন সকলকে। তাঁহার এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মোপসনার জন্য ব্রহ্মসমাজ নামে এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য সে সময় ছিলনা বলিলেই হয়। তখন ফার্সী ভাষার যুগ, শিক্ষিত লোক আরবী, ফার্সী পড়িতেন। বাঙ্গালা পদ্য সাহিত্যের কিছু আদর ছিল। গদ্যে দুই একখানি পুস্তক থাকিলেও সে ভাষা কোন সুচিন্তিত গ্রন্থ প্রকাশের একেবারে অনুপযোগী ছিল। রামমোহন সেই বাঙ্গলাভাষার সংস্কার করিয়া বাঙ্গালায় উপনিষদ্ অনুবাদ করেন। ইহা ব্যতীত ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি বাঙ্গালা গদ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি, বাঙ্গলা সঙ্গীতে নবযুগ আনিয়াছিল। বাঙ্গালায় ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতিও তিনি লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সংবাদ পত্রও তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। সংবাদ কৌমুদী, ব্রাহ্মণ সেবধি বলিয়া দুইখানি পত্র তিনি পরিচালনা করিতেন।

তিনি নিজে ফারসী, আরবী ও সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু নবযুগের উদ্বোধনের দিনে যে শুধু প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবীতে চলিবে না, উহাদের সহিত পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সম্মিলন যে একান্ত আবশ্যক, একথা তাঁহার দূরদর্শী প্রতিভা সেই যুগেই বুঝিয়াছিল। তাই ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজে একটা বেদান্ত ও একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন।

সমাজে সে সময় সতীদাহ পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত। বিধবা নারীগণকে স্বামীর সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিতে বাধ্য করা হইত। কিছুদিন হইতে এই প্রথা উঠাইয়া দবার জন্য চেষ্টা চলিতেছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু হয় নাই। রামমোহন এই নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, এমন কি তাঁহার প্রাণেরও আশঙ্কা ঘটিয়াছিল। রামমোহন কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ করিলেন যে সতীদাহ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সহমরণের প্রতিবাদ করিয়া পুস্তক লিখিয়া বিনামূল্যে সর্ব্বত্র বিতরণ করেন। এই আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে গভর্ণমেণ্ট আইন করিয়া সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দেন। এক প্রকাশ্য সভায় তখনকার গভর্ণর উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে রামমোহন অভিনন্দন প্রদান করেন।

নারী জাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। সহমরণ, বহুবিবাহ, কন্যাবিক্রয় প্রভৃতি অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য কোনও পরিশ্রমকেই কোন কষ্টকেই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার সহমরণ সম্বন্ধীয় "প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক সম্বাদ" গ্রন্থে তিনি যেরূপ উদারতা ও সুযুক্তির সহিত নারীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন, সেরূপ উদার মনোভাব আজও অনেক পুরুষের নাই। পুরুষ যে জোর করিয়া নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অধুনাতন কালে, তাঁহার পূর্ব্বে নারীকে সমাজে তাহার যথার্থ স্থান দিবার জন্য কেহই চেষ্টা করেন নাই। আজ এই নারী প্রগতির যুগে, সংবাদ পত্রের ও মাসিক পত্রের স্তবকে স্তবকে প্রায়ই সমাজে নারীর স্থান, নারীর শক্তি সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা দেখিতে পাই, সে সকলই তিনি বলিয়া গিয়াছেন, একশত বৎসরেরও আগে যখন এ দেশের

নারী নিজের সম্বন্ধে নিজেই সচেতন হয় নাই। প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক সম্বাদের এক জায়গায় রামমোহন বলিতেছেন—"স্ত্রীলোকেরা পুরুষ হইতে শারীরিক পরাক্রমে প্রায়ই ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহাদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উঁহাদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন; পরে কহেন যে স্বভাবতঃ তাহারা সেই পদপ্রাপ্তির যোগ্যা নহেন। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনও কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি গ্রহণ ও অনুভব করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় একথা কিরূপে নিশ্চয় করেন?"

বিশ্বজনীন ধর্ম্মে তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, কাজেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে যে তিনি আন্দোলন করিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক।

বস্তুত বর্ত্তমান কালের যে সকল সমস্যার কিছুতেই সমাধান হইতেছে না, রামমোহন বহু পূর্ব্বেই সে সকল সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার ধর্ম্মভাবের দ্বারা আজকের দিনে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত হরিজন আন্দোলন সফল হইলে, এ সম্বন্ধে রামমোহনের দান আমরা যেন না ভুলি। যুগে যুগে কবীর, নানক প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষকে একীকরণের চেষ্টা করিয়াছেন, রামমোহন তাঁহাদেরই একজন।

যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা আজ এমন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—রামমোহনের সময় ইহা এমন জটিল আকার ধারণ করে নাই। সেইজন্য কোনও দেশীয় রাষ্ট্রনেতা এ বিষয়ে চিন্তাও করেন নাই। কিন্তু রামমোহন এ সম্বন্ধেও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান ব্যবহার, সকল সম্প্রদায়ের উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে সমান ভাবে উৎসাহিত করাই রাজসরকারের কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের ন্যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ছিলেন তিনি অদ্বিতীয় নেতা। এ দেশের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য প্রায়ই তিনি সংবাদপত্রে আলোচনা করিতেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন। এই সময় দিল্লীর বাদশাহকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোন কোন বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে বাদশাহ ইংলণ্ডের কর্ম্মচারিদিগের নিকট আবেদন করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন ও তাঁহাকে রাজা উপাধি দেন। বহুদিনই তাঁহার বিলাত যাইবার ইচ্ছা ছিল, এই কার্য্য তাঁহার সুবিধা করিয়া দিল। ১৮৩০ খৃঃ অঃ তিনি বিলাত যান। সেখানেও তাঁহার দেশবাসীর রাজনৈতিক ও বৈষয়িক কল্যাণের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া ছিলেন। সে সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পার্লামেণ্ট হইতে এক কমিটি নিযুক্ত হয়, রামমোহন সেই কমিটিতে গবর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগ রাজস্ব বিভাগ ও দেশের লোকের অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন। যাহাতে দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগের ন্যায় উচ্চপদ লাভ করিতে পারে তাহার জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিলাত গমনের বহু পূর্ব্বেই তাঁহার সুখ্যাতি সে দেশে পৌঁছিয়াছিল। তাঁর যশ, বিদ্যা, বিনয়নম্র ব্যবহার, তাঁহার তর্ক করিবার সুন্দর প্রণালী সে দেশেও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত নরনারী তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অনেক স্থান এবং ফ্রান্সে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ফরাসী হিব্রু প্রভৃতি ভাষা শিখিতে ছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার জ্বর হয়। বিদেশী বন্ধুরা তাঁহার চিকিৎসার ও সেবার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিলে না জানি তিনি আরও কত কাজ করিতেন। নবযুগের হোতা তিনি আমাদের পথ প্রদর্শক। সে যুগে বোধ হয় মাত্র তিনিই বুঝিয়াছিলেন যে আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীরমধ্যে বসিয়া থাকিবার দিন আর নাই। প্রাচ্যের যাহা নিত্য, যাহা শাশ্বত তাহার সহিত পাশ্চাত্যের শিক্ষার সংস্কৃতির মিলন হউক ইহাই তিনি চাহিয়াছিলেন। এদেশে সংস্কৃতের সহিত ইংরাজী শিক্ষার যোগদান করাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সাম্যবাদই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। কি ধর্ম্মে, কি সমাজ ব্যবস্থায়, কি রাজনীতিতে সর্ব্বত্রই তিনি ইহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বিদেশীর নিকট কিছু সম্মান পাইলেও তাঁহার দেশবাসী তখন তাঁহার দানের মূল্য বুঝে নাই তাই তিনি বড় দুঃখে বলিয়া গিয়াছিলেন "একদিন আসিবে যে দিন দেশবাসী আমার এই সকল শুভ চেষ্টাকে সুভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।" আজ সে শুভদিন আসিয়াছে আমরা যেন আজ তাঁর প্রদর্শিত পথে চলিতে আর ভুল না করি।

শ্রীমতী শান্তি ঘোষ

বিস্ময়

প্রবোধকুমার সান্যাল

দুপুরের রৌদ্রে কলিকাতার পথের কোলাহল তখন কিছু স্তিমিত। যান-বাহনের গতি মন্থর। এমন সময় একটি কিশোর বালক আসছিল উত্তর দিকে। গায়ে তার একটা মোটা কোট, হাতে একখানা খবরের কাগজ। সম্ভবতঃ অনেক দূর পথ তাকে হেঁটে আসতে হয়েছে,—কপালে তার ফুটেছে ঘামের রেখা। উত্তর দিকের রাজপথ ধ'রে কিছুদূর এসে সে একবার থমকে দাঁড়াল, খবরের কাগজখানা খুলে কি যেন একবার দেখে নিল, বোধ হয় কোনো একটা বিশেষ বাড়ীর ঠিকানা, কিন্তু ঠিকানাটা মিলিয়ে সে যেখানে এসে থাম্‌ল, সে একটা দোকান। হ্যাঁ এই দোকানই বটে। এখানে ফটো তোলা হয়।

দোকানের দেয়ালে নানা লোকের ফটো, নানারূপ ছবির জটলা। যিনি মালিক তিনি বেরিয়ে এলেন। বললেন, কি চাই, ছবি তুল্‌তে হবে?

ছেলেটি সলজ্জভাবে বললে, না, আমি চাই জয়ন্তবাবুকে। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল—তাই দেখে—

ও, হ্যাঁ। আমিই জয়ন্ত। ফটোগ্রাফি শেখবার জন্যে একটা ট্রেনিং ক্লাস খুলেছি। শিখবে কে? তুমি?

আজ্ঞে হাঁ।—ব'লে ছেলেটি নিজেই দোকানের ভিতরে উঠে এসে দাঁড়াল। একখানা চেয়ার তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, তুমি কাজ কিছু জানো, না নতুন ক'রে শিখবে?

ছেলেটি হেসে সবিনয়ে মাথা হেঁট ক'রে বললে, কিছুই আমি জানিনে, সবই নতুন ক'রে শিখতে হবে।

বেশ, তাতে লজ্জার কিছু নেই, গোড়া থেকেই শিখবে। এই আমার ষ্টুডিও, এর পেছনে ডার্ক রুম্‌। তোমার নাম কি ভাই?

সুকুমার।

জয়ন্ত বললে, ওপাশে ট্রেনিং ক্লাস, তিনটি ছাত্র সপ্তাহে দিন চারেক কাজ শিখতে আসে।

সুকুমার দোকানের ভিতরে একবার চোখ বুলিয়ে বললে, কখন্‌ আসেন তাঁরা?

সন্ধ্যের দিকেই সাধারণত আসে। ঘণ্টা দুই ক'রে শিখলেই মাস ছয়েকের মধ্যে—

সুকুমার বললে, আমার কিন্তু দুপুরবেলা আসাই সুবিধে। যদি কিছু না মনে করেন তাহলে—

কিন্তু আলাদা হয়ে কাজ শেখা কি তোমার পক্ষে সুবিধে হবে?

আপনি একটু মনোযোগ দিলেই হবে।—সুকুমার হেসে বললে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ হয়ে গেল। ভদ্রতা ও বিনয়ে ছেলেটি সর্ব্বদাই আনত। বয়স তার বোলো কি সতেরো। স্বাস্থ্যে ও রূপে সে যেন রাজপুত্র। মাথায় ঝাঁপা ঝাঁপা ঘনকালো চুল। জয়ন্ত বললে, প্রথম থেকেই তোমাকে 'তুমি' বলতে সুরু করেছি, কিছু মনে করো না, তুমি আমার ছোট ভায়ের মতন। কিন্তু হ্যাঁ, একটা কথা। তুমি সখের জন্য কাজ শিখতে এসেছ, আমি কি তোমার সখ মেটাবার জন্য মেহনত করব?

না, না, তা নয়—সুকুমার ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল, এমন কথা ভাবছেন কেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমি এলুম, কাজ শিখে আমি উপার্জ্জন করব মাষ্টার মশাই।

জয়ন্ত সোজা তার দিকে তাকাল। ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, এতে আর সংশয় নেই। বললে, উপার্জ্জন করবে তুমি? তোমারও অভাব আছে নাকি সুকুমার?—তার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিল।

সুকুমার নিশ্চল হয়ে কিয়ৎক্ষণ বসে রইল, আকাশ-পাতাল একান্তমনে ভাবতে লাগল, তারপর এক সময় নিশ্বাস ফেলে বললে, অনেক আশা নিয়ে এসেছি আপনার এখানে। আপনি বিমুখ করলে আমি··· আমার আর কোনো উপায় নেই।

আশ্চর্য্য তার কণ্ঠ, এবং তারও চেয়ে আশ্চর্য্য, এই সামান্য কারণে তার চোখের কোণে জলের রেখা এসে দাঁড়াল। এমন স্পর্শাতুর ছেলে কেবল বাংলা দেশেই সম্ভব। দয়া—দয়ায় জয়ন্তর মন স্নেহকোমল হয়ে এল। কতখানি অভাব এবং প্রয়োজন ঘটলে তবে এই কিশোর বালককে জীবন সংগ্রামে নামতে হয় তাই কেবল তার বার বার মনে হতে লাগল।

ভিতরে এনে জয়ন্ত তাকে ষ্টুডিও দেখাল। পাশেই তার রান্নাঘর, নিজের হাতে সে রাঁধে। এদিকের বারান্দায় ট্রেনিং ক্লাস বসে। এপাশে ডার্ক্‌রুম্‌।

এ ঘরে কি হয় মাষ্টার মশাই?

এ ঘরটা অন্ধকার। দেখবে ভেতরটা? এসো, দেখলে তোমার ভয় করবে।

দুজনে ভিতরে ঢুকল। সত্যই ঘুটঘুটি অন্ধকার। কোথাও বিন্দুমাত্র আলো বাতাসের ছিদ্র নেই। দরজাটা জয়ন্ত বন্ধ ক'রে দিল। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, কলিকাতা শহর কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সত্যই ভয় করে। নানা ঔষধ ও য্যাসিডের সংমিশ্রিত গন্ধ। অন্ধকারে কোথায় ছপছপ ক'রে জলের শব্দ হচ্ছে।

সুইচ্ টিপে জয়ন্ত আলোটা জ্বাল্‌ল। আলোটা লাল, গভীর লাল। লাল আলোর দেখা গেল সুকুমারের ভীত চোখ, ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি। ভয়ার্ত্ত অথচ সচকিত, ঈষৎ কৌতুহলোদ্দীপ্ত। চুলের গোছার নীচে তার কপালে ঘামের ফোঁটা। সে যেন কথা বলবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

এই ঘরে হয় নেগেটিভ্ প্লেটের কাজ, বাইরের আলোয় এসব হয় না। সবই শিখবে তুমি একে একে। তুমি কাঁপছ কেন সুকুমার? শরীর ভালো লাগছে না বুঝি? হাঁা, এই ঘরে বেশিক্ষণ থাকলে শরীর অবশ্য একটু খারাপ হয়। এসো বাইরে যাই।

আলোটা নিবিয়ে দুজনে বাইরে এল। আঃ বাঁচ্‌ল সুকুমার। আলো দেখে বাঁচ্‌লে। মুখে তার হাসি ফুটল। কোথায় যেন তার একটি নারী-সুলভ অসহায়তা আছে। একটু উত্তাপেই সে ঝাঁউরে যায়, একটু আলো বাতাসেই সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে বললে, আমি তবে কাল থেকে আসব মাষ্টার মশাই? কিন্তু এমনি দুপুর বেলায় আসব, কেমন?

জয়ন্ত বললে, সকলের সঙ্গে তুমি তবে কাজ শিখতে চাও না?

তাঁরা আসেন বিকেলে, কিন্তু আমার সুবিধে দুপুরবেলা। দয়া ক'রে দুপুর বেলাতেই আমার ব্যবস্থা করুন মাষ্টার মশাই।

কিশোর কিন্নরকণ্ঠ। তার কথায়, গলার আওয়াজে একটি গভীর লাবণ্য ফুটে ওঠে। তার অনুরোধ এড়ানো বড় কঠিন। সুন্দর দুটি চোখে অদ্ভুত সারল্য। অনভিজ্ঞ, নির্ব্বোধ তার ব্যবহার। এমন ছেলে বাংলা দেশেই সম্ভব।

জয়ন্ত বললে, বেশ, তাই হবে। কাল থেকেই এসো।

সুকুমার নমস্কার ক'রে সেদিনের মতো বিদায় নিল। জয়ন্ত চেয়ে রইল তার পথের দিকে। এমন ছেলে জীবনে কেমন ক'রে উন্নতি করবে তাই সে ভাবতে লাগল। যেন কোনো শাপভ্রষ্ট শিশুদেবতা, বস্তুজগতে ওর উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়। পৃথিবীর ধূলায় ও মলিন হবে ধীরে ধীরে। আঘাতে হবে জর্জ্জরিত, সংঘাতে হবে চুরমার। ডার্করুম্ দেখে যে ভয় পায়, মুখ তুলে কথা বলতে যে হয় সন্ত্রস্ত, তার সম্বন্ধে কি কোনো আশা করা চলে? নারীজনোচিত আনম্র কমনীয়তায় যার চরিত্র গড়া, সে অর্ব্বাচীন আজন্ম অকর্ম্মণ্য। জয়ন্ত মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। সে সুকুমারকে আসতে বারণ ক'রে দেবে। পণ্ডশ্রম করবার মতো সময় তার নেই। এই সব দুর্ব্বল ছেলের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা দরকার।

পরদিন যথাসময়ে সুকুমার এসে দাঁড়াল। জয়ন্ত হেসে জিজ্ঞাসা করল, এই গরমে তুমি কোট গায়ে দাও সুকুমার? তার ওপর উড়ুনী?

সুকুমার সলজ্জভাবে বললে, এই আমার অভ্যেস মাষ্টার মশাই।

কিন্তু পথে হাঁটা নিশ্চয় তোমার অভ্যেস নেই, তোমাকে দেখে তাই মনে হয়। আচ্ছা, তুমি কল্‌কাতার পথ ঘাট চেনো? তোমার ত হারিয়ে যাবার কথা।

কেন বলুন ত?

আমার তাই মনে হয় ভাই। তোমার জীবনে কীই বা অভিজ্ঞতা আছে বলো, কোন্ পথই বা তুমি চেনো?

সচকিত চোখে সুকুমার একবার তাকাল। পরে নত মস্তকে বললে, কিছু কিছু পথঘাট ত আমি চিনি।

না, তুমি কিছুই চেনো না। তোমার মা বাবা কেমন ক'রে তোমাকে একা ছেড়ে দেন্ বুঝিনে। আর এই ধরো, ভবিষ্যতে তুমি কিই বা করবে। ফটোগ্রাফির ব্যবসা? সবাই ত তোমাকে ঠকাবে, সব কারবারেই তোমাকে দিতে হবে লোকসান। মানে, তোমাকে আমি নিরুৎসাহ করছিনে ভাই, ভুল বুঝো না।

আবার সুকুমারের চোখ উঠ্‌ল কেঁপে। চোখের পল্লবগুলি ভারাক্রান্ত হয়ে এল। এমন নির্ভরশীল দৃষ্টি জয়ন্ত কখনো দেখেনি। সে তার বক্তৃতা থামিয়ে বললে, যাক্ গে, কাজ যখন শিখতেই চাও তখন শেখাব। আমার আর কি বলো, এই ত আমার কাজ। একটু বসো, আমি কিছু খেয়ে নিই।

জয়ন্তর পিছনে পিছনে সে ভিতরে এল। বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে, আপনার এখনো খাওয়া হয়নি? নিজে রাঁধেন আপনি?

জয়ন্ত হেসে বললে, হাঁ, নিজেই রাঁধি ভাই। তুমি ততক্ষণ এই অ্যাল্‌বামটা ভাখো। আমি খুব তাড়াতাড়ি সেরে নেবো।

অ্যাল্‌বামটা হাতে নিয়ে সুকুমার বললে, আপনি কি দোকানেই থাকেন মাষ্টার মশাই?

হ্যাঁ, ভাই। আর কোথায় যাবো বলো। এই দোকানটাই আমার সব, আমার সংসার।

ছবির বইখানা নিয়ে সুকুমার নাড়াচাড়া করতে লাগল। ঘরখানা বিশৃঙ্খল, আসবাবপত্রের বিন্দুমাত্রও বিন্যাস নেই। গতদিনকার উচ্ছিষ্ট খাদ্যবস্তু একধারে জমা করা, অপরিচ্ছন্ন কতকগুলি বাসন। জয়ন্ত জল এনে সেগুলি নিজেই পরিষ্কার করতে লাগল। তক্তার উপরে কতকগুলো বই কাগজ এবং কাপড়চোপড় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, জয়ন্তর অলক্ষ্যে একহাতে সুকুমার সেগুলি পরিপাটি ক'রে গুছিয়ে রাখল।

—সকালবেলা একটা লোক আসে সে-ই জলটল তুলে দিয়ে যায়, বাসনও মাজে। আজ কিন্তু সে আসেনি। —জয়ন্ত বললে।

সুকুমার বললে, আপনি একা থাকেন এখানে?

হ্যাঁ, একাই থাকি। সংসারে বহু জায়গায় মাথা ঠুকে গেছে; একদিন বহু উচ্চ আশা ছিল ভাই। হ্যাঁ, এখন একাই থাকি। একাই এখন ভালো লাগে।—একটু শীর্ণ হাসি ফুটে উঠল জয়ন্তর মুখে।

আপনার মা বাবা নেই?

সকলের মা বাপ থাকে না সুকুমার।

সুকুমারের কৌতূহলী মন আরো কিছু প্রশ্ন করতে গিয়েও চুপ ক'রে গেল। আহারাদির পর জয়ন্ত বললে, গোড়া থেকেই তুমি শিখবে, কেমন? আজ তোমার কাছে লেন্‌স্ সম্বন্ধে আলোচনা করব। কালকে ফোকাস্ কেমন ক'রে ফেলতে হয় দেখাবো। তুমি কখনো ফটো তোলা দেখেছ?

দেখেছি, কিন্তু বুঝিনে কিছু।

জয়ন্ত বললে, ফটো তোলা সহজ কিন্তু আলোর মাত্রা-জ্ঞানটা বিশেষভাবে থাকা দরকার। আলো-ছায়ার আন্দাজটা যে যত নিখুঁৎভাবে ধরতে পারবে সে তত বড় আর্টিষ্ট। আলোই এর প্রাণ, এর নামই তাই আলোকচিত্র। লেন্‌স্ কা'কে বলে জানো ত?

সুকুমার বললে, না।

লেন্‌স্ হচ্ছে পাথুরে কাঁচ। ছবির কৃতিত্ব নির্ভর ক'রে

এই কাঁচের ওপর। একে একে তোমাকে সব দেখাব। ফটো তোলার রহস্যটা একবার ভেদ করতে পারলেই দেখবে সব জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে।

সুকুমার বললে, তাহলে অল্পদিনেই শিখতে পারব বলুন?

জয়ন্ত বললে, যন্ত্রের দিকটা শিখতে পারবে অল্পদিনেই, কিন্তু ফটোকে জীবন্ত করতে হ'লে যে সূক্ষ্ম জ্ঞানের দরকার, সে বস্তু আহরণ করতে কিছু বেশি সময় লাগবে তাই। দাঁড়াও, আগে ক্যামেরাটা বার করি। ক্যামেরা দিয়ে তোমাকে বোঝান সহজ হবে।

জয়ন্ত ভিতরে গিয়ে একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে এল। অধ্যবসায় ও আগ্রহ তার কম নয়। মনে হয় সে যেন আলোকচিত্র-বিদ্যাকে নিজ জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে মিলিয়ে নিয়েছে। সুকুমার যেন তার কাছে উপলক্ষ্য মাত্র, আপনাকে প্রকাশ করাই যেন তার কাজ। কথা বলছে, কিন্তু নিজের কথা সে নিজেই শুন্‌ছে। সুকুমারের চোখে জ্ঞানপিপাসার চেয়ে কৌতূহল বেশি। সরল ও আয়ত চোখ তুলে সে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে ছিল।

ক্যামেরাটা বার ক'রে জয়ন্ত একটা চাবি টিপ্‌ল। বললে, এই কাঁচটার ভিতর দিয়ে দ্যাখো, এর নাম লেন্‌স্। সামনে ওই যে বারান্দার ওপারে আকাশ, এই দ্যাখো তার ছায়া পড়েছে এর মধ্যে। আর ওই যে দেখছ বড় রাস্তায় লোক চলাচল করছে......তুমি মাথার চুলগুলো সরাও সুকুমার—

সুকুমার লজ্জিত হয়ে মাথার চুলের গোছা উপর দিকে সরিয়ে দিল। জয়ন্ত হেসে বললে, আর্টিষ্ট হবার আগেই তোমার মাথায় আর্টিষ্টের মতো বড় বড় চুল। তুমি ছোট ক'রে চুল কাটো না কেন সুকুমার?

সুকুমারও হেসে উত্তর দিয়ে বললে, একেবারে পুঁছিয়ে কাটতে মায়া হয়। আর কেটেও ছিলুম মাষ্টার মশাই, কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি চুল বেড়ে ওঠে।

জয়ন্ত তার দিকে চেয়ে বললে, তুমি বুঝি মাথায় কোনো সুগন্ধ তেল মাখো? আমরা ভাই গরীব, কিছুই মাখতে পারিনে।

সুকুমার নতমস্তকে হেসে বললে, আমি কিছুই মাথায় দিইনে মাষ্টার মশাই।

এমনি স্বাভাবিক গন্ধ? আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্য কেন? সুকুমার মুখ তুলে তাকাল।

তু'ম ঐশ্বর্য্যের ঘরে লালিত, এ হচ্ছে তারই আভাস।—ব'লে জয়ন্ত আবার ক্যামেরার কাঁচ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু ক'রে দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দোকানের দরজায় কলিং বেল্ বাজ্‌ল। নূতন খরিদ্দার এসেছে। জয়ন্ত বাইরে এল।

সেদিনকার শিক্ষা সেইখানেই সমাপ্ত। ফটো তোলাবার জন্য কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ এসে উপস্থিত হলেন। এবং তাঁদের কাজ শেষ হতে না হতেই বিকালে জয়ন্তর ছাত্রের দল এসে ট্রেনিং ক্লাসে ঢুকল। সুকুমার এক সময় বিদায় নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই সুকুমারের হাত এক রকম পাকা হয়ে উঠ্‌ল। এখন সে বেশ ছবি তুলতে পারে। জয়ন্তর একটা ফটো সে তুলেছে। ফটো রিটাচ্ করার কাজও সে কিছু শিখেছে। নেগেটিভ প্রিন্টিংটা সে এখনও ভালো জানতে পারেনি। কিন্তু শিক্ষক ইতিমধ্যেই খুসি হয়েছেন তার কাজে। সুকুমারের শিল্পীসুলভ সূক্ষ্ম হাত জয়ন্তকে আশান্বিত করেছে।

সেদিন সুকুমার বললে, আপনি যে কেমন ক'রে অতক্ষণ ডার্ক রুমে কাজ করেন মাষ্টার মশাই......আমি ত পাঁচ মিনিট থাকলেই ঘেমে নেয়ে উঠি। বড় কষ্ট।

জয়ন্ত বললে, অভ্যেস হয়ে গেছে হে। খালি গা নৈলে কাজ করা যায় না। তুমিও তাই ক'রো, জামা খুলে কাজ ক'রো......তুমি যে কেমন ক'রে ওই মোটা কোট গায়ে দিয়ে থাকো বুঝিনে। গরম লাগে না?

সুকুমার বললে, না, আমারো অভ্যেস হয়েছে।

কিন্তু ঘামে জামাটা নষ্ট হয়ে যায়, তার চেয়ে আমি বলি—

ওই যা, ছবিগুলো শুকোতে দেওয়া হয়নি।—ব'লে সুকুমার ডার্ক রুমের দিকে দৌড়ে গেল। জলে ধুয়ে

ছবিগুলো ক্লিপে এঁটে হাওয়ায় মেলে দেওয়া তার একটা মস্ত কাজ।

ফিরে এসে সে আবার ক্যামেরা নিয়ে ব'সে গেল।

জয়ন্ত বললে, এসো, আজ তোমার একটা ছবি তুলি সুকুমার।

আমার? না, না, মাষ্টার মশাই, ক্ষমা করুন,—সুকুমার ব্যস্ত হয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, আমার ছবি তুলে কাজ নেই, ওটা আমার কিছুতেই ভালো লাগে না। আমি পছন্দ করিনে।

তার ব্যস্ততা ও প্রত্যাখ্যানের চেহারা দেখে জয়ন্ত সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। কোথাও কোথাও এই কিশোর বালকটি যে তার কাছে দুর্বোধ্য এ কথাটা সে অস্বীকার করতে পারে না।

আমার ছবি তুলে আপনাকে লোসকান করতে দেবো না মাষ্টার মশাই।

জয়ন্ত হেসে বললে, যারা চাল-ডাল বিক্রি করে তারাও ত সময়ে ডাল ভাত খায় সুকুমার।

বুদ্ধির দীপ্তিতে এই রূপবান তরুণটির চোখ অকস্মাৎ ঝলমল ক'রে উঠল। সেও হেসে উত্তর দিল, তারা কিন্তু অকারণে চাল ডাল নষ্ট করে না মাষ্টার মশাই। কই, আজ ত আপনি খেতে গেলেন না? চান্ করবেন ত?

না ভাই, আজ গা টা গরম হয়েছে।

গা গরম? জ্বর? তবে উঠেছেন কেন?—সুকুমার আবার ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

জয়ন্ত বললে, এমন হয়। গত বছরে শরৎকালে একবার দেশে গিয়েছিলুম, সেই থেকে ম্যালেরিয়াটা আর ছাড়ছে না।

থাক্, আজ আমি আর আপনাকে বিরক্ত করব না। প্লেটগুলো তুলে রেখে দিই।—ব'লে সুকুমার ভিতরে চ'লে গেল।

কিছু রিটাচিংয়ের কাজ জয়ন্তর হাতে ছিল। আজ সেটা শেষ করতেই হবে। ঘণ্টাখানেক কাজ ক'রে সে উঠ্‌ল, বাকিটুকু কাল সকালের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। যত্ন ক'রে ছবিগুলি গুছিয়ে রেখে সে তার নিজের ঘরে এল। এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে ত অবাক। মাইনে করা চাকরে যা করে না, সুকুমার এমনি করেই তার ঘরের পরিচর্য্যায় লেগেছে।

এ সব কি সুকুমার?

সুকুমার হেসে বললে, একটিও কথা বলবেন না মাষ্টার মশাই, এসব গুরুসেবা।—ব'লে জলন্ত ষ্টোভের উপর সে দুধের বাটি চাপিয়ে দিল।

ঘরটা গুছিয়েছ ভালো, কিন্তু বিছানায় অমন ধবধবে চাদর তুমি পেলে কোথা?

আপনার বাক্সে ছিল।

মিথ্যে কথা, বাক্সে আমার যা আছে ভদ্রসমাজে সে সব বার করা যায় না। চাদর তুমি নিশ্চয় কিনে এনেছ।

যদি এনেই থাকি, সে ত আপনার প্রণামী। আমি কি অন্যায় করেছি?

দুধ আন্‌লে কখন? আর এই লেবু আর শশা?

এই মাত্র এনেছি।—ব'লে সুকুমার একপাশে স'রে নিঃশব্দে ব'সে রইল। জয়ন্তর কণ্ঠস্বরে সে ভীত হয়ে উঠেছিল।

জয়ন্ত কিন্তু স্পষ্টকণ্ঠে পুনরায় বললে, বাধ্যবাধকতা আমি এড়িয়ে চলি এটা তোমাকে জানানো দরকার ভাই। অতি-আত্মীয়তায় আমার মন উৎপীড়িত হয়ে ওঠে সুকুমার।

সুকুমার স্তব্ধ হয়ে তার দিকে তাকাল। এবং তারপর খালি হাতেই গরম দুধের বাটিটা নামিয়ে রেখে ষ্টোভটা নিবিয়ে সে বাইরে এল। সত্যই এবার তার আত্মসম্মান আহত হয়েছে। অনুতাপে লজ্জায় চিত্তগ্লানিতে তার চোখে উত্তপ্ত অশ্রু জমে উঠ্‌ল। অফিস ঘরের টেবিলের সুমুখে দাঁড়িয়ে কপালের চুল সরিয়ে কোঁচার খুঁটে সে চোখ মুছতে লাগল।

তার ফিরে যাওয়াই সঙ্গত। ছাত্রের জীবন ছাড়া আর কোনো জীবনযাপনের যোগ্য সে নয়। তার মনের ফুল এখনো ফল হয়ে ওঠেনি। পুরুষের প্রথম যে-বয়সটায় স্নেহকোমলতা ও স্পর্শ-কাতরতার আতিশয্য, সেই চিত্তবৃত্তি থেকে সুকুমার আজো উত্তীর্ণ হয়নি। এখনো আসেনি দৃঢ়তা, বলিষ্ঠ তেজস্বীতা,—চরিত্রের নিষ্ঠুর স্বাতন্ত্র্যে পুরুষ-

সুলভ কাঠিন্ত আজো তার জন্মায়নি। তার পক্ষে এখনো কিছুকাল অন্দরমহলে থাকাই যুক্তিযুক্ত।

একজন এসে দোকানের সুমুখে দাঁড়াল। বললে, আমরা ফটো তুলতে চাই।

সুকুমার সহজ হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, দয়া ক'রে কালকে আসবেন। আজ ছবি তোলা হবে না।

কেন? অনেক দূর থেকে এসেছি যে। দেখুন না যদি সম্ভব হয়।

আজ্ঞে না, আজ দোকান বন্ধ।—ব'লে সুকুমার তাড়াতাড়ি ভিতরে এল। বুকের ভিতরটা তার ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে উঠেছে। লোকটার মুখ চোখের চেহারা ভারি পীড়াদায়ক, যেন গোয়েন্দার মতো। বোধ হয় এই লোকটাকেই সে একদিন বাড়ীর দরজায় দেখেছিল। মিনিট দুই পরে সুকুমার একবার উঁকি মেরে দেখ্‌ল, যাক্, লোকটা চ'লে গেছে। ছবি তোলা হবে না এই কথা শুনে তার আগেই চ'লে যাওয়া উচিৎ ছিল। আজ সবাইকে সে দেবে ফিরিয়ে, কিছুতেই সে জয়ন্তকে আজ কাজ করতে দেবে না। হোক না হয় কিছু লোকসান, শরীরের দাম অনেক। ছাত্রদেরও সে আজ ফিরে যেতে ব'লে দেবে। দোকানের দরজাটা ও জান্‌লা দুটো সুকুমার বন্ধ ক'রে দিল।

ভিতরে এসে দেখ্‌ল দুধ খেয়ে জয়ন্ত বিছানায় উঠে চোখ বুজে পড়ে রয়েছে। বোধ হয় জ্বর বাড়ল। কিন্তু সে কী করতে পারে? একটু আগেকার আঘাত ও অপমান এখনো তার মুখে চোখে মাখানো। আর সে মাষ্টার মশায়ের বিরক্তির কারণ ঘটাবে না। অতি-আত্মীয়তায় করবে না তাকে উৎপীড়িত।

কিন্তু তবু এই অসুস্থ লোকটির সম্বন্ধে উদ্বেগ সে সামলাতে পারল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে সে অতি ধীরে জয়ন্তর কপালে হাত রেখে দেখ্‌ল, বেহুঁস জ্বর। ভীত দৃষ্টিতে সে তাকাল। সে একা। একা মনে হতেই সে দ্রুতপদে গিয়ে আবার সব দরজা জান্‌লাগুলো খুলে দিয়ে এল। তার দ্রুত নিশ্বাস পড়্‌ছে, পা কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

সুকুমার?

কি মাষ্টার মশাই?

ব্যস্ত হোয়ো না, এমন আমার হয়। কপালে একটা জলপটি দিতে পারো ভাই?

ছুটে সুকুমার রাস্তায় গেল, পাশের পানের দোকান থেকে বরফ এনে কোঁচার খুঁটে বেঁধে জয়ন্তর কপালে বসাল।

জয়ন্ত বললে, আঃ এইবার জ্বরটা নেমে যাবে। কেউ ডাকতে আসেনি?

এসেছিল, ফিরিয়ে দিয়েছি।

ভালো করেছ, আজ আর কিছু পেরে উঠ্‌ব না। ব'লে জয়ন্ত একটু থাম্‌ল। পুনরায় বললে, আমি একটু অন্যায় করেছি ভাই, তুমি আমার ছোট ভায়ের মতন, দোষ নিয়োনা আমার। আঃ, বেশ ঠাণ্ডা।

সুকুমার বললে, যদি কোথাও আপনার আত্মীয়ের কাছে খবর দিতে হয়, বলুন, আমি খবর দিই।

জয়ন্ত হেসে বললে, আত্মীয় আছে কিন্তু অসুখের খবর পেলে তাদের কেউ ছুটে আসবে না সুকুমার।

অনেকক্ষণ ধ'রে সুকুমার তার কপালে বরফ দিল। দেখতে দেখতে জ্বর নেমে গেল, আর বরফের দরকার হোলো না। এতক্ষণ শীত করছিল, এবার জয়ন্তর গরম বোধ হতে লাগল।

রাত্রের দিকে যদি আপনার আবার জ্বর বাড়ে?

যদি বাড়ে কি আর করব বলো।

কিন্তু কাছে কেউ থাকবে না……এই অসুখ—

হ্যাঁ, সে সমস্যা ত আছেই। তুমি কি আজ থাকতে চাও সুকুমার?

না, না, আমি সে কথা বলিনে—সুকুমার ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পানওলার কাছ থেকে বরফ আনিয়ে আপনার মাথার কাছে রেখে যাবো। আর আমি কাল ভোরেই উঠে আসব আপনার কাছে। ওষুধ আন্‌ব কি সঙ্গে?

জয়ন্ত বললে, কুইনিনের বড়ি আমার এখানেই আছে।

সেদিন প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থেকে সুকুমার এক সময় বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

কলিং বেল্ বাজ্‌ল ঘন ঘন। এত সকালেই খরিদ্দার। জয়ন্ত বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ল। সুকুমার যখন আসে কলিং বেল্ বাজায় না, দরজায় শব্দ ক'রে ডাকে।

আবার ঝন্ ঝন্ ক'রে বেল্ বাজ্‌ল। গলার সাড়া দিয়ে জয়ন্ত বললে, যাই, দাঁড়ান্।

বিছানাটা তাড়াতাড়ি তুলে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে মুখে একটু জল দিয়ে সে বেরিয়ে এল। জ্বর এখনো তার সম্পূর্ণ ছাড়েনি। দরজা খুলে সে বললে, কে?

কিন্তু উত্তর শোনবার আগেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পুলিশ সার্জেন্ট, পাহারাওয়ালা ও অন্যান্য অফিসার তার দোকান ঘেরাও করেছে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য।

একজন দেশী অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম জয়ন্ত সেন?

ঘাড় নেড়ে জয়ন্ত সম্মতি জানাল। তৎক্ষণাৎ একখানা ওয়ারেণ্ট দেখিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হোলো। দ্বিতীয় অফিসার বললেন, দোকান খানাতল্লাসী করব।

জয়ন্ত থতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, অর্থাৎ—?

ততক্ষণে ক্ষিপ্রগতিতে পুলিশের দল দোকানের ভিতরে ঢুকে কর্ত্তব্য সুরু ক'রে দিয়েছে।

এর পরে যা সাধারণতঃ ঘটে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ঘণ্টা তিনেক খানাতল্লাসীর পর জয়ন্তকে মোটরে চড়িয়ে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আড্ডার দিকে নিয়ে যাওয়া হোলো। দোকান রইল পুলিশের তত্ত্বাবধানে। জয়ন্তর মনে হচ্ছিল, তার ঘুম এখনো ভাঙেনি, এ একটা নিষ্ঠুর স্বপ্ন, ভয়ানক মায়া!

যথা স্থানে গাড়ী থামিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতরে তাকে নিয়ে যাওয়া হোলো, সমস্ত বাড়ীটা যেন একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র। জয়ন্তকে বিপন্ন হয়ে দাঁড়াতে দেখে কয়েকজন ভদ্র ও বিনয়ী ব্যক্তি তাকে অভ্যর্থনা ক'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন। একটি ভদ্রলোক কিছু খাবার ও চা আনতে পাঠিয়ে দিলেন।

একটা বড় ঘরে একখানা চেয়ারে এসে জয়ন্ত বসল। একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, আপনি বিবাহ করেননি, না জয়ন্তবাবু?

আজ্ঞে না।

মিষ্ট কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন হোলো, ইচ্ছে করে না বিবাহ করতে? আপনার এই বয়েস—

এ কি উদ্ভট প্রশ্ন! জয়ন্ত বিব্রত হয়ে বললে, এটা নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা!

হেসে ভদ্রলোক পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কখনো 'লাভ্ ম্যাকেয়ার' হয়েছিল জয়ন্তবাবু?

না।

হঠাৎ পিছনের লোহার দরজাটা গেল খুলে। জয়ন্ত সেইদিকে তাকাতেই আর একজন অফিসার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, একে আপনি চেনেন?

জয়ন্ত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। উন্মাদের মতো বললে, এ-এত' সুকুমার—

না, ওটা মিথ্যে নাম। এ মেয়েটির নাম আনন্দময়ী। আপনি তবে চেনেন, কেমন?

চিনি, চিনি, খুব ভালো ক'রে চিনি।—জয়ন্ত হাঁপাতে লাগল। মাথাটা তার ঘুরতে লাগল, দুলতে লাগল পায়ের তলাকার মাটি।

সুকুমার কখন যে নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে কে জানে। পরণে তার সাড়ী, গায়ে ব্লাউস, হাতে দুগাছি চিকচিকে চুড়ি,—এবং সে স্ত্রীলোক। আনন্দময়ী একবার জয়ন্তর দিকে চেয়ে মাথা হেঁট করল, অশ্রুতে তার মুখখানা প্লাবিত।

জামিন আপনি পাবেন না জয়ন্তবাবু। সিরিয়স চার্জ্জ। এই মেয়েটি ডাকাতির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত,—আপনি একে আশ্রয় দিয়েছিলেন। জানেন আপনি, আনন্দময়ী পলাতক আসামী? ওকে দেখে মেয়ে ব'লে আপনার মনে হয়নি?

জয়ন্ত বললে, মেয়ের মতন মনে হোতো কিন্তু মেয়ে ব'লে ত মনে হয়নি।

রূপে, লাবণ্যে, দেহের গৌরবে আনন্দময়ী সমস্ত ঘরটাকে যেন আলোকিত ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চেয়ে অফিসার বললেন, আজ ভোর রাত্রে রাস্তায় ওকে পুরুষের পোষাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আপনি জানতেন না ও ডাকাতের দলের মেয়ে?

জয়ন্ত এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে কেমন ক'রে জানব, কেমন ক'রে বুঝবো যা অকল্পিত, যা অভাবনীয়। দেবতার দূত ব'লে যাকে মনে করেছিলুম, দানবের প্রহরী ব'লে তাকে সন্দেহ করব কেমন ক'রে? শুধু কেবল রূপই দেখেছি রহস্যের খোঁজ পাইনি। আপনারা—আপনারা আমাকে যে কোনো শাস্তি দিন, আমি দোষ করেছি, কিন্তু—কিন্তু আমাকে দয়া ক'রে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না…

জয়ন্ত আনন্দময়ীর দিকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

প্রবোধকুমার সান্যাল

এক টুক্‌রো হাসি

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

আমি জানি, তুমি আসছ, আমার কাছেই আসছ। ঐ আম-বাগানের ভিতর দিয়ে যে লাল কাঁকরের ছোট্ট পথ, সেখানে শিউলী ফুল কুড়োতে কুড়োতে আসছ। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে আর তুমি চমকে উঠছ, ভাবছ, চারদিকে মুচকি হাসি আর ফিসফিসানি চলছে তোমাকেই লক্ষ্য করে—ওগো, জানি, তুমি কোথায় চলেছ, সবই জানি আমরা।' অমনি তোমার গাল দুটি টুকটুকে হয়ে উঠল। সখি বলছে—"ওলো, চল্, তোর আজ হল কি?' তার অপাঙ্গেও দুষ্টু হাসি। বিশ্বপ্রকৃতিতে সবাই যেন কাজকর্ম ভুলে একটি কৌতুক-ষড়যন্ত্রে উৎকর্ণ হয়ে আছে, সহস্র উৎসুক দৃষ্টি আজ তোমার দিকে কেন্দ্রীভূত। তুমি চলতে পারছ না, থামতে পারছ না। আমি এখানে বসে বসেই সব দেখছি, সব বুঝতে পারছি।

আমিও কখন বেরিয়ে পড়েছি ঘর থেকে, পায়চারি করছি পথের পাশে, যেন আনমনে। ঐ দেখছি শাড়ীর প্রান্ত, ঐ সেই কতকালের চেনা চরণচিহ্ন পড়ছে পথের বুকে। চোখে চোখ পড়ল, যেন কেউ কিছুই জানি না, তবু মন জানল সবই।

সখি বুঝি আমার দিকে তাকিয়ে ইসারায় কিছু বলল তোমাকে, তুমি রাগ করে গম্ভীর হয়ে চললে ওদিকে। যাচ্ছ, যাও কিন্তু আবার ত আসতেই হবে এখানে, তাই ত বলে গেল তোমার না-বলা বাণী।

ঐ আসছ ফিরে। সংসারে বুঝি সবই দেখতে পাও, শুধু আমাকেই চোখে পড়ছে না তোমার। আমি কি করি, কথা বলি কি বলি না। সখিকে বললাম—কি সখি, তোমরা যে হঠাৎ এদিকে।

'এদিকে নয়, ওদিকে যাচ্ছি বেড়াতে।'

এবার বুঝি আমাকে আর অস্বীকার করতে পারলে না, অত্যন্ত সাধারণভাবে নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরেই যেন জিজ্ঞেস করলে—এই যে! তুমি দেখছি এখানে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, আমিই ত, সখি বুঝি যাচ্ছ ঐ ফুলটি তুলে আনতে। সত্যি করে বল ত সখি, তুমি পুষ্পপ্রিয়, না, রঙ্গপ্রিয় তার চেয়েও বেশি। সখি চলে গেল, তুমি রইলে।

এবার শুধু তুমি আর আমি। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি। তুমি পায়ের আঙুল দিয়ে কাঁকড় নাড়ছ, আমি গাছের পাতা ছিঁড়ছি। কারো বুঝি কিছু বলবার মত কথা নেই।

হঠাৎ মুখ তুলে তুমি তাকালে, আমিও তাকালাম তোমার চোখে। এক সঙ্গেই হেসে উঠলাম দুজনে। আর কিছুই নয়, শুধু একটুখানি হাসি। তার কোন মূল্য নেই বলেই সে অমূল্য,—সেই ছোট্ট হাসিটি।

খেয়াল

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

জ্যোৎস্নাছায়ে অরণ্যেতে ঘুরে ফিরি আপনার অদম্য খেয়ালে—
কেজানে ভাল কি মন্দ—সুখী কিম্বা দুঃখী আমি—আত্মস্থ, উন্মাদ-
সে মোর অজ্ঞাত।

আমি শুধু জানি—
নব নব খেয়ালের সাথে গ'ড়ে ওঠে জীবন আমার,
জীবনের চলা পথে কাব্য উঠে ফুটি' নিত্য নব তানে ;—
তাই কি যথেষ্ট নহে ?............

তোল সুর—ছন্দ নৃত্যে উঠুক রণিয়া ;
জানি আমি, ওগো কবি, সামান্য জীবের মত কভু তুমি উঠ মাতি
তর্কে বিতণ্ডাতে—নিজমত প্রতিষ্ঠার তরে।
কিবা ক্ষতি তায় ?
কণ্ঠ তব পরক্ষণে উঠে না কি বাজি' নব সুরে নব ছন্দে দ্বিগুণ আবেগে

চিন্তা মহীয়সী ; তারো চেয়ে মহীয়ান কবির খেয়াল।
খেয়াল = পরশহীন শুষ্ক চিন্তা—সদ্যোজাত মৃত শিশু সম
আকৃতি সুন্দর—প্রাণের স্পন্দন হীন।.........

খেয়ালেরি প্রেরণায় মূর্ত্ত হ'ল দেব দেবী সৃষ্টির প্রাক্কালে
প্রাণ লভি' বনচ্ছায়ে, স্রোতস্বিনী তীরে।
খেয়ালেরি সজল ইঙ্গিতে ছুটে মেঘ, বর্ষে বারি।

সে খেয়াল—গতিপথ রুদ্ধ যেন নাহি হয় কভু,
দাও তারে চ'লে যেতে আপনার অনির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরি'

চিরন্তন খেয়ালের পূর্ণতার সাথে
মিশে আছে আশা আর কামনার সুতীব্র আবেগ—
সে যে বিধাতার দান।

ভুলিও না, ওগো কবি, খেয়াল তোমার ইষ্ট, সর্ব্বস্ব তোমার ;
খেয়ালের বেদীতলে দাও সর্ব্বাহুতি—
নারী, সুরা, গীতিছন্দ, পুষ্পগন্ধ, বিহঙ্গের কলকণ্ঠরব—
খেয়ালের হোমশিখা উঠুক জ্বলিয়া।

['India and the World'এর জন্ম লিখিত জাপানী কবি ইয়োন্ নোগুচি-র ইংরাজী কবিতা 'Moods' হইতে]





বিচিত্রা
কার্ত্তিক, ১৩৪১

হর-পার্ব্বতী

শিল্পী—
শ্রীমহিতোষ বিশ্বাস

মোটরে রাঁচি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৩৪ সালের মে মাসের শেষ।

অসহ্য গরম পড়েছে। কয়েকদিন ধরে বায়ুমান যন্ত্রে তাপের রেখা ক্রমাগতই উর্দ্ধে উঠ্‌ছে—সারা শহর রীতিমতো শঙ্কিত।

আখ্যা দিলে—Unholy Three! বাইরে আমাদের তিন জনের প্রকৃতি ভিন্ন, কিন্তু ভিতরে ছিল অখণ্ড সামঞ্জস্য; কাজেই কোন অবস্থাতেই ছন্দপতনের কোন অবকাশ ঘটেনি।



মোরাবাদি পর্ব্বতের উপর হইতে রাঁচি সহরের দৃশ্য

সেই সময় মোটর যোগে আমাদের রাঁচি যাবার সঙ্কল্প শুনে বন্ধুবর্গ আমাদের মস্তিষ্কের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ সন্দিহান হ'য়ে উঠ্‌লো; তবে তারা একটা কথা ভেবে আশ্বস্ত হ'ল যে, যদি অবস্থা একান্তই খারাপ হয় তা'হলে, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে নাকি তার দস্তুরমতো ব্যবস্থাও আছে। এইটেই যা ভরসার কথা।

দুতিন দিন ধ'রে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে অবশেষে একদিন ভোর নাগাদ সত্যিই আমরা মোটরে রাঁচি যাত্রা করলাম। ত্রয়ী, অর্থাৎ দলে ছিলাম, তিনজন; বন্ধুরা

বন্ধুবর শ—এ-সব কাজে বিশেষ পটু। বাড়ীর অনুমতি না পেয়েও সে একবার বিলাত-যাত্রার সব আয়োজন সম্পন্ন করেছিল এবং এমন কি করাচী পর্য্যন্ত পাড়ীও দিয়েছিল; কাজে কাজেই রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত বাজার-হাট করেও ভোর তিনটের সময় জ—র বাড়ীতে এসে তাকে ঘুমে থেকে টেনে তোলা তার পক্ষে বিশেষ শক্ত হ'ল না।

জ—কবি-মানুষ; একটু বেশী ঘুমোয়। সুতরাং তাকে যখন সময়মতো ওঠানো গেল তখন বোঝা গেল ঠিক সময়েই রওনা হ'তে পারবো।

সকাল পাঁচটা পনেরো মিনিটের সময় জ—র বিশ্বস্ত শেভ্‌রলেটে পাঁচজন যাত্রী (ত্রয়ী, সহিস, ড্রাইভার) এবং মন দেড়েকে মাল নিয়ে যাত্রা সুরু করল। পথে নানারকম বিপদ-আপদের বারতা জানিয়ে বন্ধুরা আমাদের শুভ যাত্রা কামনা করলে।

পাঁচটা পয়ত্রাল্লিশ নাগাদ বালি ব্রিজ পার হয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে ঘণ্টাখানেক পরে চন্দননগরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

থারমোফ্লাস্ক-এর ভিতর থেকে চা ঢেলে নিয়ে তা পান ক'রে শ—সবে মাত্র মার্লেন ডিয়েট্রিকের জার্ম্মান গান "Johnny"র প্রথম লাইনটি আরম্ভ করেছে এমন সময় সশব্দে মোটর থেমে গেল।

পথের প্রথম দুর্ব্বিপাক!

ড্রাইভার কালীপদ লোকটিও ভালো, ড্রাইভারও ভালো। বিশ মিনিটের মধ্যে গাড়ী ঠিক হ'য়ে গেল। চন্দননগরের অসংস্কৃত ও ইট-কাঁকর-পরিকীর্ণ রাস্তা পেরিয়ে আমরা যখন সিম্‌লাগড়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম তখন ন'টা বেজে গিয়েছে।

জ—বল্লে, শ—গান ধর।

বল্লাম—ওর ও গানটা অপয়া! আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ।

শ—বল্লে, রাইটো! তার চেয়ে জ—তুমি সেই কবিতাটা আবৃত্তি কর?

—কোনটা?

—সেই যে—তোমার ফিয়ান্সের কাছে প্রথম প্রেম নিবেদন করবার দিন যে কবিতাটা দিয়ে তোমার কথা আরম্ভ করবে ঠিক ক'রে রেখেছো—সেইটে!

জ—সনিঃশ্বাসে বল্লে—সেদিন কি আমার আর আসবে!

তারপর আরম্ভ করলে:

"আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলেনা
গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে···

আবৃত্তি চলেছে এমন সময় আবার!

গাড়ী থামতে শ—লাফিয়ে উঠ্‌লো:

—ব্যাপার কি হে কালীপদ?

কালীপদ নির্ব্বাক মুখে বল্লে—আজ্ঞে, কিছু না।

অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থাতেও কালীপদর মুখের ভাবান্তর হয় না; তাই চিন্তিত স্বরে বল্লাম—"কিছু না," মানে? আবার বোধ হয় কারবুরেটার···

কালীপদ বল্লে—আজ্ঞে না; সে জন্যে নয়। গাড়ী এমনি থামালাম।

বাঁচা গেল। কিন্তু হঠাৎ রাস্তার মাঝে এমনি গাড়ী থামানোই বা কেন?



পথে বেগুনিয়া গ্রামের মন্দির

শীঘ্রই কালীপদ আমাদের সংশয় দূর করলে। অদূরবর্ত্তী একটি ভগ্নপ্রায় কুটিরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বল্লে—ওইটে হ'ল, বাবু, কালীমন্দির।

ঘরের সামনে যূপকাষ্ঠ দেখে বুঝলাম, তাই বটে।

কালীপদ গাড়ী থেকে নেমে বল্লে—ও কালী যে-সে নয়, বাবু—ও হ'ল একেবারে জাগ্রত কালী। ওনার নাম হচ্ছে—"ডাকাতে কালী।"

নামটি জবর বটে। বল্লাম—অনেক দিন আগে বোধ হয় ডাকাতেরা ওই কালী নিয়মিত পূজো করত, তাই···

আমার কথা শেষ না করতে দিয়েই মাথা নেড়ে কালীপদ ব'লে উঠ্‌লো—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালীপদর "আজ্ঞে হ্যাঁ", কতকটা চলচ্চিত্র Excuse me Sir-এর চিত্রগুপ্তের "আজ্ঞে হ্যাঁ"র মতো,—অত্যন্ত non-committal! কাজে কাজেই প্রশ্ন করতে হ'ল—আজ্ঞে হ্যাঁ মানে? তুমি কিছু জানো নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি শুনি?



আসানসোল হইতে ধানবাদের পথে সূর্য্যাস্ত

তিনজনেই তখন মোটর পৃষ্ঠ থেকে ভূতলে নেমে দাঁড়িয়েছি। আমাদের অদূরে কালীপদ দাঁড়িয়ে। তার পিছনে সহিস্ সিরাজ। হঠাৎ শুন্‌লাম গম্ভীরকণ্ঠে কালীপদ বলছে—এই মন্দির আমার পূর্ব্বপুরুষেরা তৈরী করেছিল। কালীমূর্ত্তিও তাঁদের। এ তল্লাটে তাঁদের মতো বড়ো দল আর ছিল না।

দল? কিসের দল? ডাকাতের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ব্লেস্ মাই সোল!

শেষ কথাটা শ—র।

কালীপদ তখন রীতিমতো অনুপ্রাণিত:—

—এই দেব্‌তার সম্বন্ধে আমাদের একটা সংস্কার আছে বাবু; তাই তো, দাঁড়ালাম। যাঁরা এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, যখনই তাঁরা কাজে বেরুবেন তখনই যাত্রা করবার সময় এই মন্দিরে এসে প্রণাম ক'রে যাবেন। অনেকদিন অবধি এই নিয়ম তাঁরা মেনেছিলেন; ততদিন কোন কাজেই তাঁদের বিঘ্ন ঘটেনি—প্রত্যেকদিন তাঁরা জয়লাভ ক'রে ফিরে আসতেন। পুরণো সর্দ্দার মারা যাবার পর নতুন সর্দ্দার লোকটা ছিল ভারী অহঙ্কারী; একদিন সে যাত্রার সময় কালী মন্দিরে প্রণাম না ক'রেই চ'লে গেল। ফল ফল্‌লো হাতে হাতে। সর্দ্দার মারা পড়ল; দল গেল ভেঙে। যে ক'জন অবশিষ্ট রৈল, তাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখলো, যেন মা-কালী তাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, খবরদার, সে যেন কখনো কোন কাজ করবার আগে এই মন্দিরে এসে মা-কে প্রণাম করতে না ভোলে। সেই থেকে, বাবু, আমাদের বংশের সবাই যে যখন কোন কাজে বেরুই তখনই উদ্দেশে এই কালীকে প্রণাম করি। আজ যখন পাশ দিয়েই যাচ্ছি তখন একবার সাক্ষাতেই প্রণাম নিবেদন ক'রে যাব—এই ভেবে গাড়ী থামালাম। এও তো আমাদের একটা যাত্রা বাবু?

শ—কাহিনী শুনে ব'লে উঠ্‌লো—যাত্রা বৈকি! মহা-যাত্রা। চলো সবাই মিলে প্রণাম ক'রে আসি।

সিমলাগড় থেকে বর্দ্ধমান অবধি পথটুকু অতি সুন্দর। ঋজু পথরেখা; দু'পাশে ছোট বড় গাছের সারি। মাঝে মাঝে পথের পাশে পুকুরের বুকে অজস্র পদ্মফুল ফুটে রয়েছে।

এমনি একটি পদ্ম-দীঘির কাছে আমাদের গাড়ী কয়েক মিনিটের জন্যে দাঁড়িয়েছিল। পুষ্করিণীর দিকে তাকিয়ে জ—ব'লে উঠ্‌লো—দেখ, দেখ কি সুন্দর!

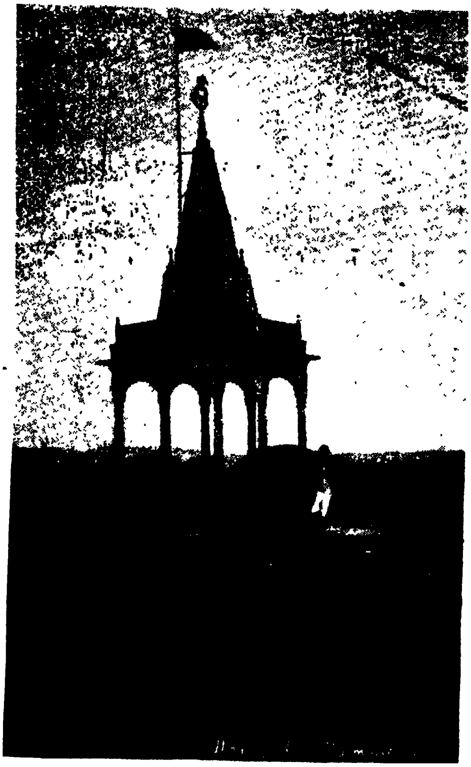
সহসা শ—ব'লে উঠ্‌লো—ঠিক্! এই পুকুরের পদ্ম দেখেই জ্যোতিষ কেঁদে ফেলেছিল।

জ্যোতিষ হ'ল শ—র জ্যাঠতুতো ভাই, বয়সে বুঝি সামান্য বড় (যদিও দেখে তা বোঝা যায় না) এবং আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু।

বল্লাম—জ্যোতিস যে ভাবপ্রবণ তা জানি ; কিন্তু এতটা তো জানতাম না,—একেবারে কেঁদেই ফেল্লে ?

শ—বল্লে—একদম। সেইজন্যে তো সেবার ওর বিয়ে ভেঙে গেল। আর সেই জন্যেই তো আজো লাইন্ ক্লিয়ার না পেয়ে আমি শান্টিংএ প'ড়ে আছি।

জ—বল্লে, অহো দুর্দ্দৈব। কিন্তু ব্যাপারটা কি শুনি ?



মোরাবাদি পর্ব্বতের উপর ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাধনা-মন্দির

শ—মুখখানা বেঁকিয়ে বল্লে—ব্যাপার আর কি ? হেবু সম্বন্ধীর সঙ্গে ভায়া যাচ্ছিলেন হাজারীবাগ। সারা পথ সম্বন্ধী বোধ হয় বোনের কথা ব'লে ওকে তাতিয়েছিলো ; এইখানে এসে গাড়ী থামবার পর ভায়া আর সাম্‌লাতে পারলেন না—পদ্ম দেখে কেঁদে ফেল্লেন। সম্বন্ধী লোকটা অত্যন্ত খলিফা। তখন মুখে কিছু বলে নি, কিন্তু বাড়ী গিয়েই বোনকে গল্পটা রঙীন করে বল্লে। তাই না শুনে, বোনেরও কান্না ! "মাগো মা ! পদ্ম দেখে যে লোক কেঁদে ফেলে তাকে আবার কখনো কেউ বিয়ে করে,—সারা জীবন তাহলে লোকটা কেঁদে কেঁদেই হাড়-মাস ভাজা ভাজা করবে" ; ইত্যাদি।

—তারপর ?

—তারপর আর কি। ওইখানেই গল্প শেষ। বিয়ে ব্রোকেন ; my brother's heart too !

বল্লাম—শীয়ার ট্রাজেডি ! কালীপদ ! গাড়ী চালিয়ে দাও।

বর্দ্ধমানে যখন পৌছনো গেল তখন শ—র মণিবন্ধে দশটা দশ। আমার কব্জিতে দশ মিনিট বেশী। ঘড়ি দুটো মিলিয়ে এক ক'রে নিলাম।

বর্দ্ধমানে গাড়ীতে এবং নিজেদের উদরে রসদ ভর্ত্তি ক'রে যখন আসানসোলের পথে এগুলাম তখন সাড়ে এগারোটা বেলা। সূর্য্যের তাপ রীতিমতো দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে, বাতাসে আগুনের হল্কা ! কিন্তু উপায় নেই, দুপুরে আসান্‌সোল পৌছুতেই হবে, তা না হোলে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ধানবাদ পৌছনো যাবে না এবং আজকের মধ্যে ধানবাদ আমাদের ধরা চাই।

বর্দ্ধমান থেকে আসানসোলের রাস্তা পশ্চিমাভিমুখে তির্য্যক-রেখায় চ'লে গেছে—কোথাও একটু বাঁকা চোরা নেই। সেই পথের ওপর দিয়ে গাড়ী যখন ঘণ্টায় ষাট্ মাইল বেগে ছুট্‌তে লাগলো তখন মনে হ'ল যেন অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করছি।

ঘূর্ণিবাত্যা এতদিন বই-এ পড়েছিলাম, সেদিন প্রত্যক্ষ করলাম,—পথের ধারে দিগন্ত-বিস্তারিত মাঠের স্থানে স্থানে হঠাৎ যেন ঝড় উঠ্‌ছে—সে ঝড়ের পরিধি খুব বেশী নয়, হাত পঞ্চাশেক জায়গা জুড়ে সেই প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ চক্রাকারে ক্রমাগত ওপরদিকে উঠ্‌ছে এবং তারই সঙ্গে উঠ্‌ছে শুকনো গাছ-পালা এবং রুক্ষ বালি। তার মধ্যে মানুষ যদি পড়ে তাহলে হয়ত শ্বাসরোধেই তার মৃত্যু ঘটে।

ক্রমশঃ শেভ্‌রেল্যের সীডান্‌-সৌধ তেতে উঠ্‌লো এবং তারই সঙ্গে আগুন হয়ে উঠ্‌লো আমাদের ব্রহ্মতালু। থার্মো'র মধ্যে বরফ জল ছিল, রুমালে সেই জল ঢেলে তার

সঙ্গে ল্যাভেণ্ডার মিশিয়ে কপালে গালে বুলোতে লাগলাম—দুই চোখ মেল্‌বার উপায় নেই।

এ-হেন অবস্থার মাঝেও শ—রৈল অবিচল। ওর কণ্ঠ দিয়ে তালে এবং বেতালে গানের সুর নির্গত হচ্ছে। ওর আনন্দ-উচ্ছল মনের অব্যাহত স্ফূর্ত্তির কাছে প্রকৃতির এই অসহনীয় রুক্ষতা যেন মার খেয়ে ফিরে গেছে।

শ—গেয়ে চল্ল:

"Native Hills are calling
To them we belong
And we cheer each other
With Pagan Love Song"

আসানসোল! তখন দু'জনের ঘড়িতেই দুটো।



রাঁচি পুষ্করিণী, পিছনে রাঁচি-পাহাড়

কিছুক্ষণ পরে শ—বল্লে, অমর, গরমে কষ্ট পাচ্ছো। আচ্ছা, আমি গান গেয়ে অন্য রকম atmosphere সৃষ্টি করছি, তোমরা চোখ বুজে ভাবো।

এই ব'লে সে গান ধরলে!

"Come with me where moon beams
Light Tahitan skies
And the starlit waters
Linger in your eyes..."

চোখের ওপর ভিজে রুমাল চাপা দিয়ে ওর গান শুনতে লাগলাম। মন্দ লাগছিল না। কিন্তু তবুও কি চোখের সামনে পূর্ণিমা রজনীর মায়ামোহ প্রত্যক্ষ করতে পারলাম? সম্ভব নয়।

ষ্টেশনের প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুম দখল ক'রে আমরা পরম আরামে স্নানাহার সমাপন করলাম। আমরা রেলওয়ে যাত্রী নই ব'লে প্রথমে ওয়েটিং রুম পাওয়া যায় নি; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শ—সে বাধা দূর করলে—দেখলাম, এক রেল-কর্ম্মচারীর সঙ্গে সে এর মধ্যেই দিব্য আলাপ জমিয়েছে এবং মুহুর্মুহুঃ তার সামনে 'কালো-শাদার' টিন খুলে ধ'রে তাকে করায়ত্ত করেছে।

গরম জলে স্নান (যে ট্যাঙ্ক থেকে স্নানাগারে জল সরবরাহ হয়, সূর্য্যের তাপে সে ট্যাঙ্ক আগুন হয়ে উঠেছিল) এবং পক্ষীমাংস সংযোগে অন্নাহার ক'রে বিশ্রামান্তে যখন ধানবাদ অভিমুখে রওনা হলাম তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। সূর্য্যের তেজ কমেছে বটে কিন্তু আবহের তাপ তখনো সমান। যাই

হোক, আর বিলম্ব করা শ্রেয়ঃ নয় স্থির ক'রে বেরিয়ে পড়লাম।

ধানবাদের পথে অপরাহ্ন বেলার এই পথ চলাটি ভারী উপভোগের বস্তু হয়েছিল। দুইধারে গাছের সারি দেওয়া পথ সুদূর দিকচক্রবালে গিয়ে মিশেছে—কোথাও বা তার ঢল নেমেছে, কোথাও বা যেন সে পথ আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে,—সেই পথের উপর দিয়ে আমাদের মোটর ছুটেছে ঘণ্টায় চৌষট্টি মাইল; দেহ-মনে রীতিমতো thrill অনুভব করছি।

বরাকর পার হলাম ছ'টা নাগাদ।



রামগড় উপত্যকা; দূরে ছোটনাগপুর পর্ব্বত শ্রেণী

বরাকরের পাশেই পথের ধারে দুটি তিনটি প্রাচীনকালের দেব-মন্দির দেখে গাড়ী থামালাম। গ্রামের নাম শুনলাম, বেগুনিয়া।

সরু পথের শেষে বিস্তৃত জমি। তারই মাঝখানে জোড়া-মন্দির। অদূরে আরও একটি মন্দির আছে। কিন্তু স্থাপত্যশিল্প হিসাবে জোড়া-মন্দির দুটিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বেশী। মন্দির দুটী প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন বলেই মনে হল—ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গঠন-পদ্ধতির সঙ্গে মন্দির দুটীর কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করলাম। মন্দির-গাত্রে অসংখ্য নৃত্যরতা রমণীর মূর্ত্তি খোদিত; দুই পাশে দুই বেগবান অশ্ব যেন কোন সম্রাটের জয়যাত্রা ঘোষণা করছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই মন্দির দুটীর ভিতর থেকে গবেষণার অনেক রসদ পাবেন।

মিনিট পনেরো পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ধানবাদের নিকটবর্ত্তী হলাম। এই স্থানের পথ আগের মতো নয়—আঁকা-বাঁকা এবং উঁচু-নীচু; দুই পাশে অনতি-উচ্চ পাহাড়ের সার দেখা যাচ্ছে।

এক স্থানে এসে পথ ঠিক করতে না পেরে এক পথিককে জিজ্ঞাসা করলাম। পথিক পথ বাৎলে দিলে; তারপর গম্ভীরভাবে বল্লে—সন্ধ্যের আগেই ধানবাদ পৌঁছতে পারলে ভাল করতেন।

অর্থপূর্ণ বাক্য!

শুধালাম—কেন বলুন তো ও-কথা বলছেন?

নিস্পৃহকণ্ঠে জবাব এলো—মাইল খানেক আগে পাহাড়ের তলা থেকে সেদিন বাঘ বেরিয়েছিল রাত্রে। তাই বলছি।

এই ব'লে সে পা চালিয়ে দিলে।

গাড়ী চলতে লাগলো। গাছের মাথায় সন্ধ্যা নেমেছে। নিস্তব্ধ জনহীন পথ। সাবধানে কালীপদ পথের বাঁকগুলি পার হ'য়ে চলেছে। আরোহীদের কারুর মুখেই কথা নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হ'ল। তখন পৃথিবীর বুকে রাত্রি নেমেছে।

শ—বল্লে—কালীপদ, তোমার ডাকাতে-কালীকে স্মরণ কর হে; গাড়ী যেন...

কথা শেষ হল না। এতক্ষণ সবাই মিলে যে-ভয় করছিলাম, তাই ঘট্‌ল। গাড়ী থাম্‌লো। কালীপদ বল্লে—বনেট্ খুলতে হবে।

গাড়ী থাম্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই শ—টর্চ্চ জেলে পথের ধারে তার আলো নিক্ষেপ করলে। ঘন বন রাত্রের অন্ধকারে আরও দুর্গম ও ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে। গাড়ী থেকে নাম্‌তে যে ভয় করে নি, সে কথা বল্লে মিথ্যা বলা হবে।

কালীপদ গাড়ীর ইন্‌জিন ঠিক করতে লাগলো; আমরা তাকে ঘিরে দাঁড়ালাম।

শ—কে বল্লাম একটা গান ধর না হে! বড্ড নিঝুম লাগছে যে।

শ—কি বলতে যাচ্ছে এমন সময় অদূরে বনের মাঝখান থেকে হঠাৎ একপ্রকার শব্দ ভেসে এলো। চকিত এবং উৎকর্ণ হ'য়ে শুন্‌লাম—অনবরত ঘড় ঘড় শব্দের সঙ্গে কাতর গোঙানি, যেন কোন বন্য পশু আহত বা অসুস্থ হ'য়ে আর্ত্তনাদ করছে!

জ—বল্লে, কিসের শব্দ বলতো! ওই লোকটা যা বলেছিল, তাই নয় তো?

—অসম্ভব কি?

শ—বল্লে, হয়ত "দক্ষিণ রায়?"

বল্লাম, "দক্ষিণ রায়" এখন আলিপুরে, তবে তাঁর সম্পর্কীয় কেউ হ'তে পারেন।



চুটাপালু পাহাড়ের উপর হইতে রাঁচির উপত্যকা

জ—র "পরশুরাম" পড়া ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, "দক্ষিণ রায়" আবার কে?

বল্লাম, নিরাপদে আবার যাত্রা সুরু করি, তখন সে গল্প বল্‌ব।

কালীপদ বল্লে, হয়েছে। উঠুন।

—বাঁচালে!

গাড়ী ছাড়লো। তখনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিছুদূর যাবার পর শ—তারস্বরে গান ধরলে:

"আজ কি তাহার বারতা পেল রে কিশলয়
ওরা কার কথা কয়, বনময়।"

জ—প্রশ্ন করলে, এইবার বল "দক্ষিণ রায়" কে?

তখন "দক্ষিণ রায়" সেই চলন্ত আসর মাৎ করলেন। সাড়ে সাতটার কিছু পরে ধানবাদ পৌঁছলাম।

ধানবাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনব্যবসায়ী গ—মহাশয়কে আমাদের আগমনবার্ত্তা আগেই জানানো হয়েছিল। তিনি আমাদের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আতিথেয়তার মধ্যে গ—বাবুর বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করলাম।

প্রাতঃকালে গুরু জলযোগের পর গ—বাবুর বাড়ী থেকে যখন মুরি অভিমুখে রওনা হলাম, তখন সাতটা বেলা। অদেখা পথের শোভা সকালবেলার সূর্য্যকিরণে অধিকতর নয়নলোভা হয়ে উঠেছে। দামোদর সেতু পার হয়ে ফাঁকা রাস্তায় প'ড়ে কালীপদ গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিলে।

সাড়ে আটটার সময় আমরা যখন তালগড়িয়া গ্রাম পার হচ্ছি, সেই সময় সেখানে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতে হ'ল। শুন্‌লাম একটি মোটর-সাইক্লযাত্রী গুরুতররূপে আহত হয়েছে; একটি পথিক, তাই, হাত তুলে আমাদের আসতে অনুরোধ করলে, যদি তাকে আমরা কোনরূপ সাহায্য করতে পারি—এই আশায়।

গাড়ী থামিয়ে তিনজনেই নেমে পড়লাম। পথের পাশে একটি দোকান ঘরের মধ্যে লোকটিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, আঘাত তেমন গুরুতর নয়। ভাগ্যক্রমে আমাদের সঙ্গে first aidএর জিনিষ-পত্র ছিল। সেগুলি বিশেষ কাজে লাগলো। ক্ষতস্থানগুলি ধুয়ে মুছে বেঁধে দেওয়াতে লোকটি অনেকখানি আরাম পেলে। শুনলাম, সে একজন স্থানীয় উকিলের চাপরাশী; বাবুর সঙ্গে গাড়ী ক'রে যাচ্ছিল, হঠাৎ বেসামাল হয়ে গাড়ী থেকে প'ড়ে যায়। উকিল বাবুর মামলায় তাগাদা ছিল ব'লে তিনি তাকে পথে ফেলে রেখে চ'লে গেছেন।

কাহিনী শুনে শ—উকিল বাবুটির উপর এক কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করলে।

জয়পুরের রাস্তায় পথের পাশেই যে বড় পুষ্করিণীটি আছে, তার শোভা নিতান্ত মন্দ নয়। পুষ্করিণীতে বহু

নর-নারী স্নান করছে দেখা গেল। মেয়ে পুরুষের আলাদা কোন ঘাট নেই। স্নান-নিরতা মেয়েদের মধ্যে শালীনতা বোধের অভাব দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলাম।

মুরি ষ্টেশনের মধ্যে যখন আমাদের গাড়ী প্রবেশ করল তখন এগারোটা। আর ঘণ্টা দেড়েক চালাতে পারলেই রাঁচি পৌছতে পারি, কিন্তু দুপুরের অসহ্য রোদের মধ্যে সাহস করলাম না। ঠিক হ'ল, দুপুরে এখানে বিশ্রাম ক'রে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখানে পৌছলেই চলবে।

এখানেও ওয়েটিং রুম্-এ আস্তানা স্থাপন করা গেল। বি, এন, রেলওয়ে রিফ্রেস্‌মেণ্ট-রুমে প্রথমে কোন আহার্য্য দ্রব্যের ব্যবস্থা না দেখে অত্যন্ত মুস্কিল বোধ করেছিলাম। অবশেষে ভাগ্যক্রমে সেই হোটেলের এক বাবুর্চ্চি এসে আমাদের মুস্কিল আসান করলে। পরমামৃতের মতো তার শ্রীহস্ত-রঞ্জিত অন্ন-ব্যঞ্জন উপভোগ করলাম।

আহারান্তে ওয়েটিং-রুমের দরজা জানালা বন্ধ ক'রে বিশ্রাম গ্রহণ করছি এমন সময় বাইরে ষ্টেশন প্রাঙ্গণে মোটর গাড়ীর আওয়াজ শোনা গেল।

—আমাদের গাড়ীটা নিয়ে কেউ ভাগ্‌লো নাকি?

এই ব'লে শ—লাফিয়ে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। আমরা ভিতরেই রইলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর অপরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আপনি বুঝি এই ঘরটায় বিশ্রাম করেছেন?

শ—সবিনয়ে উত্তর দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা তিনজন আছি। ডিরেক্‌ট্‌ মোটরে কলকাতা থেকে আসছি।

—ও, তাই নাকি; তা বেশ। তা, ও-ঘরটা (মানে দ্বিতীয় ওয়েটিংরুমটা) দেখছি তো বন্ধ। চাবিটা যে কোথায়…! আমরা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করব ব'লেই এখানে এলাম। তা…হোটেলের দরজাও তো বন্ধ দেখছি।

শ—ব্যস্তভাবে বল্লে, এইমাত্র তো সবাই ছিল—এদিক ওদিক কোথায় গেছে আর কি? আচ্ছা, দেখছি আমি।

তারপরেই শ—র মহা হাঁকডাক সুরু হ'ল;—বোয় বোয়! এই, ইধার দাও। ও কামরাকা চাবী কিস্‌কো পাস…যাও, জলদি করো…

কৌতূহল হ'ল। আরাম কেদারা ছেড়ে বাইরে এলাম। জ—আমার পিছনে। দেখলাম, শ—মহা অভ্যর্থনা সহকারে এক ভদ্রলোককে দ্বিতীয় বিশ্রামকক্ষে নিয়ে যাচ্ছে; ভদ্রলোকের পিছনে রয়েছেন একটি তরুণী। আবার ভিতরে ফিরে গিয়ে বসা গেল।

যাক্, ঘণ্টাখানেক পরে শ—ফিরে এলো। বল্লে—ভদ্রলোকরা পুরুলিয়া থেকে আসচেন, রাঁচি যাবেন, কলকাতার লোক। মোটরে ক'রে পুরুলিয়ায় এসেচেন… ভারী মুস্কিলে পড়েছিলেন। যাক্, সব ব্যবস্থা ক'রে এসেছি।

বল্লাম, নিজেরও?

এর পরের আলোচনার সঙ্গে এ যাত্রা-বিবরণীর কোন সম্বন্ধ নেই।

অপরাহ্ণ পাঁচটায় মুরি পরিত্যাগ করলাম। যাত্রার সময় উল্লিখিত ভদ্রলোক এগিয়ে এসে শ—কে ধন্যবাদ জানালেন। শ— যেভাবে গদগদমুখে তাঁর ধন্যবাদের উত্তরে তাঁকে নমস্কার জ্ঞাপন করলে তা দেখে আমাদের হাসি চেপে রাখা দায় হ'ল। লক্ষ্য কিন্তু তখন অলক্ষ্যে!

গাড়ীতে শ—কে সে কথা বল্লাম। শ—বল্লে, কুছ পরোয়া নেই; better luck next time! এই ব'লে গান ধরলে:—

"Pretty Little Baby
I am in love with you;
You are an angel from your head
Down to your toes
Everybody knows
I am in love with you…!

সন্ধ্যা সাতটায় গন্তব্যস্থানে উপনীত হলাম।

রাঁচিতে ছিলাম দিন দশেক। সাব্‌জজ শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসখানেক আগে মতিহারি থেকে রাঁচিতে বদ্‌লি হয়েছিলেন। তাঁরই বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম।

অনন্তবাবুর বাড়ীতে সারাক্ষণ একটি গম্ভীর বিষাদের ছায়া সঞ্চারিত—ভূমিকম্পে তাঁর অতিপ্রিয় দৌহিত্রীটিকে নিজের বুকের মধ্যে রেখেও অনন্তবাবু শেষ পর্য্যন্ত তাকে বাঁচাতে পারেন নি। ভূমিকম্প তাঁদের সবাইকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেছে; সে শক্ তাঁরা এখনো সামলে উঠ্তে পারেন নি। অনন্তবাবুর বড় ছেলে অমর আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। তার কাছ থেকে এবং তাদের বাড়ী থেকে যে প্রীতি ও সহৃদয়তা পেয়েছি, তা চিরকাল মনে থাকবে।

রঁাচিতে প্রাকৃতিক শোভাবিশিষ্ট যে সব দ্রষ্টব্য স্থান ছিল দুদিনেই তাদের দেখা হ'য়ে গেল—একমাত্র হুড্রু



স্বর্গীয় স্যর আলি ইমামের অসমাপ্ত দুর্গ-সদৃশ বাস-ভবন

প্রপাত ছাড়া। শুন্‌লাম, এ সময়ে জলাভাবে প্রপাত এমনই শীর্ণকায় হয় যে তা দেখতে চৌদ্দ মাইল পথ ভেঙ্গে যাওয়া সার্থক হবে না। কাজেই যাওয়া হয় নি।

মোরাবাদি পাহাড়ের উপরিস্থিত ঠাকুরবাড়ীর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাধনা-মন্দির থেকে রঁাচি শহরটি ঠিক যেন ছবির মতো দেখায়। রঁাচি পুষ্করিণী ও তৎসংলগ্ন পাহাড়টিও নয়নানন্দকর।

রঁাচি থেকে হাজারিবাগের পথটি দুর্গমতার জন্য প্রসিদ্ধ। সব পথটি নয়—রঁাচি থেকে রামগড় পর্য্যন্ত ত্রিশ মাইল পথ মোটর চালকের পক্ষে বিশেষ সাবধানতাসাপেক্ষ। একদিন সদলবলে রামগড় পর্য্যন্ত ঘুরে আসা গেল। চুটাপালু নামক স্থানে যে খর্ব্বকায় পাহাড়টি আছে তার উপর থেকে উপত্যকাটি অতি চমৎকার দেখায়। এই পথে চলবার সময় দার্জ্জিলিঙের রাস্তা মনে পড়ছিল।

রঁাচির আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য বস্তু হচ্ছে, শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত বাতুলাশ্রম। ভারতবর্ষের মধ্যে এত বড় প্রতিষ্ঠান আর একটিও নেই। একদিন বহুক্ষণ হাঁসপাতালের ভিতর অতিবাহিত করেছিলাম। এখানকার ব্যবস্থা খুবই ভালো। তবে ইয়োরোপীয়ান বিভাগ ও ভারতীয় বিভাগের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করলাম, তা উপেক্ষণীয় নয়। ইয়োরোপীয়ান বিভাগে রোগী থাকে মোট আড়াই শো। ভারতীয় ওয়ার্ডে তেরশো। তা সত্ত্বেও ইউরোপীয় বিভাগের খরচই বেশী।

ভারতীয় বিভাগে কত বিচিত্র ধরণের মস্তিষ্ক বিকৃতির নিদর্শন যে দেখলাম, তা লিখে শেষ করা যায় না। আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সেখানকার এক ডাক্তার; তিনি আমাদের এক একটি কেস্ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেই সম্মুখে দেখলাম, এক পাকা-চুল দাড়ী-ওয়ালা পণ্ডিত গোছের লোক। শুন্‌লাম্ পূর্ব্ববঙ্গে এক সময় তাঁর মতো শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত নাকি আর একজনও ছিল না। পণ্ডিতমশাই আমাদের দেখেই সহসা অন্য কথা না ব'লে অত্যন্ত অশ্লীল-ভাষায় আমাদের গালাগালি দিতে লাগলেন। রাগ করব কি; অত্যন্ত দুঃখ বোধ হল। দেখলাম, একজন ওয়ার্ডার এসে তাঁর হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে তাঁকে ঘরে নিয়ে গেল।

দ্বিতলে উঠে হঠাৎ এক পরিচিত ছাত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল। ছাত্রটি বছর দুই আগে কলকাতার এক নামকরা কলেজে অধ্যয়ন করত। তখন একজন মেধাবী ছাত্র ব'লে তার নাম অনেকদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। শুন্‌লাম, তার সহপাঠিনী একটি ছাত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করবার জন্য অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার ফলেই তাকে এখানে আসতে হয়েছে। তার অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখ লাগলো। প্রথমে ভেবেছিলাম, সে ইতিমধ্যে আরোগ্য লাভ করেছে, কিন্তু আমরা চ'লে আসবার-সময় সে যে ভাবে

উচ্চকণ্ঠে গীতার শ্লোক আওড়াতে লাগলো, তা শুনে বুঝলাম, এখনো কিছু দেরী আছে।

আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। আগেকার দিনে ফুটবল খেলে নাম করেছিলেন। ভদ্রলোক সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে এখনো কিছুদিন সেখানে থাকতে হবে, কারণ পাগল অবস্থায় তিনি একটি বিশেষ রকম বীভৎস কাজ করেছিলেন—অর্থাৎ নিজের ছেলেকে মা-কালীর কাছে সহস্তে বলিদান দিয়েছিলেন !!

রাঁচির বাতুলাশ্রম সেদিন আমাদের জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছিল।

দিন দশেক পরে রাঁচি এবং সেখানকার নবলব্ধ পরিচিত বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে বিকালবেলা কলকাতা অভিমুখী ট্রেণের কামরায় উঠে বসলাম। শ—আজ ক'দিন থেকে অত্যন্ত ম্রিয়মান হ'য়ে পড়েছে—তার আগ্রহ-ব্যাকুল দুটী চোখ অনুক্ষণ যেন কার ব্যর্থ-অনুসন্ধানে ভারী হ'য়ে উঠেছে।

গাড়ী ছাড়বার পর আমার ডায়েরীখানি খুলে গোটা-কয়েক কথা নোট করতে গিয়ে দেখলাম, খাতার পাতায় বড় বড় হরফে ২৯৭ প্রভৃতি ছ'টি সংখ্যা পর-পর সাজানো রয়েছে। বিস্মিত হলাম। কে এ নম্বর লিখলো ? কিসের নম্বরই বা ?

আমার বিস্ময় দেখে জ—আমার কানে কানে বল্লে, পাছে ভুলে যায়, সেই জন্যে শ—নম্বরটা তোমার খাতায় লিখে রেখেছে। বলা তো যায় না, এখানে দেখা গেল না ; কিন্তু কলকাতায় হয়ত···

এই ব'লে জ—আমার কানে কানে বল্লে, নম্বরটা কিসের ; বুঝেছো ? ঘাড় নেড়ে জানালাম—বুঝেছি। কলকাতায় আস্‌বার পর শ—

কিন্তু সে হ'ল অন্য গল্প।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



বিব্রতা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সব কথা কি পড়বে তোমার মনে ?
সেদিন যে সেই চলে যেতে
হঠাৎ ফিরে চাইলে অকারণে !
যেমন তুমি আমিও তেমন একা,
চকিতে হোলো চারিটি চোখে দেখা,
কিশোর মনের সে কোন্ গোপন লেখা
বলতে পারো, কী ভেবে সেই খনে
কপোলতলে টোল খেলায়ে গেল
গোলাপী রঞ্জনে ?

শুভ্রভালে ছিল সিঁদুর টিপ
শুক তারা সে উষার অর্ঘ্যদীপ ।
মেঘের মতো পিঠ-ছাপানো চুলে
দূর প্রদোষের পট রেখাটি ভুলে,
সেদিন আমার মনের সিন্ধুকূলে
কে দাঁড়ালে তুমি সুরাঙ্গনে,
নয়ন তোমার পথ দেখাল মোরে
অলকা নন্দনে ।

একটু যেন এদিক সেদিক উঁকি
একটু থেমে অম্‌নি গমনমুখী ।
আসবে কাছে তিলেক তর না সয়,
আবার কোথায় কে দেখে, সেই ভয়,
এই ভাবনায় সকল দেহময়
লাগল শিহর মর্ম্ম নিপীড়নে,
মুখ ফিরায়ে ঢাকিলে সেই ব্যথা
নীল বসন কোণে ॥

আগমনী

শ্রীবিভু কীর্ত্তি

সহসা শুনিনু ধ্বনি —
আগমনী ! আগমনী !

দীর্ঘ রাতের দুঃস্বপনের মত
দিন দিনান্তে গ্লানি জমেছিল যত
অন্ধকারের কালো অন্তরতলে
আলোকের জাগরণী—
আগমনী. আগমনী !

দুটি কর যুড়ি, ভক্তিনম্র চিতে
পুষ্পের মত ও-চরণে পারি দিতে
যাহা কিছু মোর আছে বক্ষের মাঝে
ব্যথার পরশমণি—
আগমনী, আগমনী !

ধূপের মতন জ্বেলে দিতে পারি তারে
নিস্ফল ব্যথা নির্ব্বাক বেদনারে,
দীপের মতন জ্বালাইতে পারি মোর
চিত্তের আবাহনী—
আগমনী, আগমনী !

হোক এইবার রাত্রি অবসান—
ভেদিয়া তিমির আলোকের অভিযান—
সুরু হয়ে যাক উদয়াচলের পথে
প্রভাতের জয়ধ্বনি—
আগমনী—আগমনী !—



বিসর্জ্জন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

বিদায়ের তবু ব্যথা জাগে ;
দিয়ে যায় প্রিয়জন গাঢ় অনুরাগে
মধুস্পর্শ আলিঙ্গনের,
ওই ম্লান আলিম্পন গৃহ-প্রাঙ্গণের,
তবু কাঁদে
অসহ বিষাদে,
অনাদরে পড়িয়া অঞ্জন ;
আজ নিরঞ্জন !

কনকাঞ্জলি ধরি' শিরে
মনোদুখে ভাসে বধূ নয়নের নীরে,
আনন্দের ব্রত সমাপন,
যে মিলন-মহোৎসব করিতে যাপন
জাগরুক
ছিল ভরা বুক,
আয়ু তার, হায়রে কপাল,
তিনদিন কাল !

জুড়াবার বেদনা এ নয়,
যেই চিরবঞ্চিতের কাঙাল হৃদয়
চাহে পথ সারাটি বরষ,
শঙ্কাহরা শঙ্করীর লভিবে দরশ,
আশা তার
মিটে কই আর ?
তাই আজি ভূমে সে লুটায়,
মা'র যে বিদায়।

চিত্রশিল্পী—শ্রীসুশীল সেন

সমাজ সংস্কারক রাজেন্দ্রনাথ

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, সি-এ-আই-বি,

বাংলাভাষায় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। বহুদিন হইতে তাঁহার একটি জীবনীর প্রয়োজন ছিল। জীবনীটি খুবই সংক্ষিপ্ত হইলেও সুলিখিত ও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। পুস্তকটী শ্রীঅভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, সি,ই, কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও আর্ট প্রেসের মিঃ এন মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম এক টাকা। গ্রন্থকারের নিবেদনে উল্লিখিত হইয়াছে যে পুস্তিকাখানি মিঃ কে, সি, মল্লীন্দ্র প্রণীত ইংরাজি ভাষায় স্যার রাজেন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনালেখ্য অবলম্বন করিয়া লেখা। স্যার রাজেন্দ্রনাথের মত মহাকর্ম্মীর জীবন কথা যতই প্রচারিত হয় দেশের যুবকগণের পক্ষে ততই মঙ্গল। বহু যুবক তাঁহার জীবনী হইতে প্রেরণা লইয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারেন। রাজেন্দ্রনাথ শৈশবেই পিতৃহীন হন, কেমন করিয়া বিধবা মাতা বহু বাধা বিঘ্নের মধ্যে পড়িয়াও তাঁহাকে মানুষ করিয়া তোলেন, সে করুণ কাহিনীর ইতিহাস মনোজ্ঞ-ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তারপর যৌবনের প্রারম্ভে কেমন করিয়া স্বাধীন-চেতা স্বাবলম্বী যুবকের ঘটনাচক্রে ব্রাড্‌ফোর্ড লেসলির সহিত পরিচয়, কেমন করিয়া তাঁহার সৌজন্যে পলতা জলকলের কণ্ট্রাক্ট লাভ করিয়া সাফল্যের পর সাফল্যলাভ করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মার্টিন কোম্পানী গঠন, ও তাহার পর আজ পর্য্যন্ত কত মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন তাহার বিবরণ ও তালিকা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।



রাজেন্দ্রনাথের কর্ম্ম-জীবন উপন্যাসের মত বিস্ময়কর; তিনি যে কত বড় কর্ম্মী এই জীবনীতে তাহা বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু শুধু ব্যবসায়ী, এবং স্বাবলম্বী কর্ম্মী বলিয়া এই মহামানবটীকে চিত্রিত করিলে তাঁহার চরিত্রের মস্ত বড় একটী দিক চাপা পড়িয়া থাকে। সেটি তাঁহার সংস্কার-স্পৃহা।

রাজেন্দ্রনাথ সংস্কারক,—কি ব্যবসায় ক্ষেত্রে, কি দৈনন্দিন জীবনে, কি সামাজিক ব্যাপারে তিনি চিরদিন সংস্কার করিয়াছেন। যা কিছু পুরাতন, যা কিছু গতানুগতিক, যা-কিছু "যেনাস্ত পিতরো যাতাঃ" পন্থার অনুসারী তিনি তাহা মাজিয়া ঘসিয়া, নূতনরূপে সাজাইয়া নব যুগের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। এই সংস্কারের নেশায় বিভোর তিনি নিজের জীবনাদর্শের ভিতর দিয়া একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন; বক্তৃতায় বলেন নাই, লেখায় লেখেন নাই, শুধু চরিত্রচিত্রে আঁকিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এই সংস্কারের ভিতরও পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম, এবং তাঁহাদের সমাজের মূল সূত্রগুলি, যাহা হিন্দুদের ভিতর বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিতেছে তাহাও হারাইয়া ফেলেন নাই। এই জন্য মনে হয় নবজাগ্রত হিন্দু সমাজ, যে সমাজ ধীরে ধীরে বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিতেছে, পর্দ্দা-প্রথা দূর করিতেছে, নারী জাতিকে পুরুষের সমকক্ষ শিক্ষা দিতেছে, সেই সমাজ তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত।

রাজেন্দ্রনাথের তরুণ জীবন কাটিয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে; তখন বাংলা দেশের Religious Renaissanceএর যুগ চলিয়াছে, ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কার-এর বিরাট বন্যা আসিয়াছে। এ সেই যুগ যখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অগ্নিময়ী বাণী দলে দলে যুবকগণকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিল। তখন হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটা অভিযান চলিতেছে, চতুর্দ্দিকে সংশয়,—লোকে পিতৃ পিতামহের ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছে। অবশ্য এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হিন্দু-ধর্ম্মের উপর শিক্ষিত লোকের আস্থা ফিরাইয়া আনিলেও দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের উপর ব্রহ্মানন্দের প্রভাব অতি নিগূঢ় ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই সময় রাজেন্দ্রনাথ ও মতিলাল নামে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া পড়িতেন। এই সময় স্যার রাজেন্দ্রনাথের জীবনের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার মধ্যে ভ্যাবলা নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে স্যার রাজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহের নাম ৺রামনিধি মুখোপাধ্যায়; রামনিধি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চার পুত্র, যথাক্রমে ৺আনন্দচন্দ্র, ৺মহেশচন্দ্র, ৺ভগবানচন্দ্র ও ৺গোবিন্দচন্দ্র। রাজেন্দ্রনাথ ৺রামনিধি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ভগবানচন্দ্রের পুত্র। রাজেন্দ্রনাথের জীবনের সহিত আনন্দচন্দ্রের পৌত্র ৺মতিলাল ও ৺মহেশচন্দ্রের পৌত্র ৺যোগেন্দ্রনাথের জীবন বিশেষভাবে জড়িত। মতিলাল তাঁহার সমবয়স্ক ও আবাল্য সুহৃদ্। যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার অপেক্ষা দশ বৎসরের বড়, মুখোপাধ্যায় পরিবারের ভিতর তৎকালে একজন কৃতী ব্যক্তি ও রাজেন্দ্রনাথের কৈশোরের ও প্রথম যৌবনের অভিভাবক। যোগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাকিয়া চাকুরী করিতেন এবং তাঁহার ভবানীপুরের বেলতলার বাসায় থাকিয়া মতিলাল ও রাজেন্দ্রনাথ পড়াশুনা করিতেন। যথাসময়ে লণ্ডন মিশনরী স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মতিলাল মেডিকেল কলেজে ও রাজেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মবিপ্লবের বন্যা এই সময়ে এই ছুটি তরুণের মনোজগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া দিতেছিল। মতিলাল এ বন্যার আবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইনিই পরবর্ত্তী কালের স্বনামখ্যাত সিভিল সার্জ্জন স্বর্গীয় ডাঃ রায় বাহাদুর মতিলাল মুখোপাধ্যায়। শুনিয়াছি মতিলালের ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মুখোপাধ্যায় বংশের উপর একটা গভীর ক্ষোভের ও বেদনার ছায়া পড়িয়াছিল। রাজেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন না; কিন্তু তিনি এই আলোক-প্রাপ্ত নব সমাজের সংস্কারপদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নীতিগুলি সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন ইহাই প্রতিপন্ন করে যে তিনি ব্রাহ্ম না হইয়া, এবং হিন্দুধর্ম্মের নীতি ও অনুষ্ঠান বজায় রাখিয়া পুরাপুরি নূতন আদর্শের ধারা রক্ষা করিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করিলেন; অযথা হাস্যাস্পদ অবগুণ্ঠন প্রথা এবং নারী জাতিকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখার প্রথা দূর করিলেন, গৌরীদান বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি প্রথার দিক দিয়াও গেলেন না; অথচ হিন্দুধর্ম্মের আচার ও নীতির শাসন মানিয়া,

মানুষ, বাংলা ভালো জানে না। আমি চাইলুম দশ-দশ কুড়ি টাকা ছুটো গানের জন্যে। তাই আদায় করে নিলুম। খানিকটা মনে আছে, প্রথমে একদল ছেলে সুরু করলে—

গাহ গান গাহ গান এসেছেন শক্তিমান্
এ জেলার জজ বাহাদুর।

সঙ্গে সঙ্গেই সেই সুরে আর একদল

Sing song sing song The judge who is very strong
Has come here on his tour

এই ভাবে—

ছেলেরাও উপনীত নহে তারা নহে ভীত
দীর্ঘ জীবন মাগে যে

The boys too have come here No fear, No fear—
All for his long life pray.

আবার হো-হো হাসি।

অবশেষে ক্ষুদ্র দলবল লইয়া দা-ঠাউর শনিবারের বারবেলায় ছোট রেলের ছোট ষ্টেশনে হাজির।

আসিয়াই দা-ঠাউর এক ভদ্রলোককে পিছন হইতে ডাক দিলেন, মাষ্টার মশাই মাষ্টার মশাই, আপনি কি মাষ্টার মশাই?

লোকটি ফিরিয়া বলিলেন, আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে? গলায় গলাবন্ধ, মাথায় টুপি, লম্বা কোঁচা, কালো কোট, পায়ে ইষ্টাকিং,—ষ্টেশন মাষ্টার ছাড়া এমন অদ্ভুত জীব আপনি কোথায় দেখ্‌তে পাবেন?

দা-ঠাউর বলিলেন,—বল্‌ছিলাম, বিষ্টি বাদ্‌লার দিন, গাড়ীর মাথায় কি ছেঁদা আছে, খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার হতে হবে?

—ছাতি এনেছেন ত! খুলে বস্‌বেন।

—বল্‌ছিলাম বেঞ্চিতে বড় ধুলো, আর মাছের গন্ধ, আর ভাই নেটিভদের গায়ের গন্ধ—

ধুলো না হয় আমার এই গলাবন্ধটা দিয়ে ঝাড়তে পারেন, গন্ধ নিবারণ করবার জন্তে খানিকটা মবিল অয়েল কি পেট্রোল যোগাড় করে দিতে পারি, গায়ে মেখে বসে থাকুন—

দা-ঠাউর বলিলেন—আপনার পদরজ দিন্ ভায়, এরকম রসিক চূড়ামণি টরে-টক্কায় বন্দী হয়ে আছেন—

ছুজনেই খানিকটা ভক্তিগদ্‌গদ নমস্কারের আদানপ্রদান হইয়া গেল। ষ্টেশন মাষ্টারের চশমা নাক হইতে মুখে নামিয়া আসিতেছিল, তিনি তুলিয়া বসাইতে বসাইতে অগ্রসর হইলেন, বলিয়া গেলেন, আপনাদেরই জিনিষ, দেখে শুনে ক'রে কর্ম্মে নিন—আমি আর কি বলব…

গাড়ীতে Mill handsই বেশী; একজন বলিয়া বসিল শালাদের টাইম্ হল গাড়ী ছাড়্‌বার?

পোনা মাছের ছানা-ভরা হাঁড়ি লইয়া জেলেরা ক্রমাগত ছলাৎ-ছল শব্দে নাড়িতে লাগিল, দা-ঠাউর যে ছেঁড়া খবরের কাগজখানা বাড়ী হইতে বগলে করিয়া আনিয়াছিলেন পাতিয়া বসিলেন।

মাছের 'আঁসটে'-গন্ধ ভুলিবার জন্ত দা-ঠাউর তখন গান ধরিয়াছেন—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী চরণ সার।
শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী
ভোজনে কিশোরী আগে।

এক খিট্‌খিটে চেহারার ভদ্রলোক চীৎকার করিয়া বলিলেন, মশাই ভুল গাইবেন না, ওপদ নয়—পদ হচ্ছে

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়ন তারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হারা।

দা-ঠাউর বলিলেন, ছুরকমই আছে। আমারটার সুর হচ্ছে সুইট, আপনারটা হচ্ছে কল্যাণী। ছুই চণ্ডীদাসের।

—বলেন কি মশায়? পদাবলী আমার কণ্ঠস্থ।

—কণ্ঠস্থ? বলুন ত এটা কার—

এত কি মধুরা এত কি চতুরা
এত কি পরের বশে।
এত কি নিদান এত কি পাষাণ
এত কি ছাড়িব বাসে।

—ও আপনার বানানো।

দা-ঠাউর বলিলেন বানানো কি মশায়—শেষ লাইনটা শুনুন:—

এত কি বঞ্চিত করব সকল
চণ্ডীদাস বুকে ধারা।

সুর নটনারায়ণ, 'ছত্রিশ অক্ষরের করুণা' চণ্ডীদাসের। বলুন ত এটা কার—

"তোমায় বিদ্যেবুদ্ধি শিখিয়েছিল কোন গুরুমশায়?" ভদ্রলোক ফিরিয়া বসিলেন।

গার্ড কলা খাইতেছিল, দা-ঠাউর বলিলেন, গার্ডবাবু একবার শ্যামের বাঁশী বাজাও।

এই যে—বলিয়া গার্ড বাঁশী বাহির করিয়া কলা গিলিতে লাগিল।

বাঁশী বাজিল—দা-ঠাউর বলিলেন—হ'লনা শব্দ, হল পুঁ হবে পুর্‌র্—ওর মটর বেরিয়ে গেছে, একটা শুক্‌নো ছোলা পোর, নয় ত' নিদেনপক্ষে একটা কাঁকর।

গার্ড হাত নাড়িয়া দিল—বেহারী বলিল, নীলনিশেন কই মশায়।

—নেই।

একটা কলাপাতা কেটে নিন না—দা-ঠাউরের কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল, কিন্তু গার্ড সাহেবের মুখ হইল গম্ভীর।

সারা পথ দা-ঠাউর আসর জমাইয়া চলিলেন। হঠাৎ গাড়ী থামিয়া গেল। লাইনের উপর গরু উঠিয়াছে, ড্রাইভারকে 'খেঁটে' লইয়া নামিতে হইল, গরু 'হু' শুনিয়া পলায় নাই।

দা-ঠাউর ইত্যবসরে চট্ করিয়া নামিয়া পড়িয়া কয়েকটা থানকুনি পাতা সংগ্রহ করিয়া লইলেন। বলিলেন, আমেশার ভারি ভালো ওষুধ। আর তোমরা রাস্তার দিকে লক্ষ্য রেখো, যদি কোনো গাছে ভাল 'প্যায়রা' ফলে গাড়ী থামিয়ে দিতে হবে। গার্ডবাবু চটেছেন।

গার্ড বলিল, চটব না ত' কি আপনাকে চুমু খাব? এতই যদি হেনস্তা ত এ গাড়ী চড়েছেন কেন?

দা-ঠাউর বলিলেন—আপনার পায়ে জুতো নেই কেন? কি রকম গার্ড আপনি!

চলন্ত গাড়ীতে চেকার আসিল, এতক্ষণে ধরা পড়িল, দা-ঠাউর হাফ্ টিকেট করিয়াছেন।

চেকার বলিল আপনার কি বারো বছর বয়স হয়নি?

দা-ঠাউর বলিলেন—অন্ততঃ গাড়ীতে যখন চড়েছিলাম তখন বোধ হয় ছিল না। আজন্মকাল ধ'রে ত চলেছি, মরণকালে হয়ত destination এ পৌঁছব।

যাই হোক, ইয়ার্কি চলিল না, destination এ নামিতে সেখানকার মাষ্টারবাবু বলিলেন, গাড়ী ছোট হতে পারে আইন ছোট নয়—

দা-ঠাউর বলিলেন আমার পয়সাটাও আশা করি আর কারুর চেয়ে ছোট নয়।

মাষ্টার বলিলেন, এক্‌সেস্ ফেয়ার দেবেন, না চার্জ্জ লিখে নোব?

দা-ঠাউর বলিলেন এই চব্বিশ জনকে আটকাতে আপনার বেয়াল্লিশটা লোকের দরকার, আছেন ত মাত্র দুজন,—লাইন্‌স্‌ম্যান সিগ্‌নালার বুকিংক্লার্ক এস্-এম, এ-এস্-এম, দরকার হ'লে কুলী সব একাধারে—

শ্রাবণের আকাশে মেঘ করিয়াই ছিল। হঠাৎ এই সময় চড়্‌চড়্ শব্দে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, কে কোন্‌দিকে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল, দেখিতে পাওয়া গেল না, সকলের আগেই ষ্টেশনমাষ্টার পলাইলেন, তাঁহার সর্দ্দির ধাত, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই—

বরের বাড়ী বেশী দূর নয়। সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় যাত্রার কথা, প্রজাপতি মার্কা লাল কাগজের নিমন্ত্রণপত্রে উল্লেখ ছিল। বর বাহির হইতে হইল—৯টা।

দা-ঠাউরদের ছাঁপোষা ক্লাব যে বাসটা দখল করিল সেটা পথের মধ্যে গেল তিনবার বিগ্‌ড়াইয়া, বল হরি হরি-বোল ধ্বনি করিয়া ছাঁপোষা ক্লাবের মেম্বারদের তিনবারই ঠেলা মারিতে হইল।

যে রকম হাসি এবং হল্লোড় গাড়ীর মধ্যে চলিতে লাগিল,

তাহাতে পথ-চল্‌তি চাষালোক বলাবলি করিতে লাগিল বাবুরা তাড়ি খেয়েছে নিশ্চয়।

কেহ ডাকাত-দল ডাকাতি করিতে চলিয়াছে মনে করিয়া দরজায় সজোরে 'হুড়কো' লাগাইয়া দিল।

বাস্ এক্‌জায়গায় গিয়া একেবারে থামিয়া গেল।

এইবারে হাঁটিবার পালা।

বরকে নাপিত এবং পুরোহিতকে বরকর্ত্তা ধরিয়া সরু পিছল-পথে সাবধানে অগ্রসর হইল।

দা-ঠাউরকে বেহারী এবং বেহারীকে কালো শরৎ, কালো শরৎকে বুড়ো জগৎ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

বিষ্টু মুখুয্যে দুর্গাপদর কাছা ধরিয়া চলিল। সে প্রোসেশন দেখিবার বস্তু।

ভারতবর্ষে রাজা আসার কথা এবং কলিকাতায় কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের প্রোসেশন যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহারাও জানিয়া রাখুন এ মিছিলের তুলনা নাই—দুই পাশে পচাপুকুর, খানাখন্দ, ঝোপঝাড়, পায়ের নীচে চোরাবালির মত অবিশ্রান্ত কাদা, মাথার উপরে নিষ্ঠুর শ্রাবণের আকাশ—ধরণীর কোনখানে যেন মায়া নাই মমতা নাই, একটি এসিটিলিন ছাড়া আলো নাই—আছে শুধু ধপাধপ্ আছাড় এবং গরম দুখানা লুচি খাইবার দুর্নিবার লোভ।

ভয়চকিত ত্রস্ত মহাপ্রস্থানের যাত্রীদলের মত সব চলিয়াছে, অমন যে দা-ঠাউর, তাঁহারও মুখে হাসি নাই, রসিকতা নাই, অমন যে ভুতো তার মুখে গান নাই, সুধাই নীহার এবং গণ্‌শার অমন যে ঝগড়া করা স্বভাব তাহারাও চুপ মারিয়া গেছে,—মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণের আভাস যেন পাওয়া যায়—জুতা শিরোধার্য্য, ছাতা সিন্ধবাদ নাবিকের বুড়োর মত স্কন্ধারূঢ়, মুখে 'আস্তিকস্য মুনের্মাতা', পরণে আণ্ডারওয়ার এবং মাথায় পরণের কাপড় পাগড়ীর আকারে।

কাদার চিহ্ন পেটে পশ্চাতে পৃষ্ঠদেশে এবং কনুইয়ে—নাই এমন লোকই নাই এ দলে।

মাঝে মাঝে শুধু ধপ্‌ধপাস ধ্বনি এবং 'গেছি রে'র সঙ্গে সম্মিলিত কঠোর বুকফাটা কান্নার মত হাসি।

এমনি করিয়া দীর্ঘ দুই ক্রোশ,—ছাঁপোষা ক্লাবের সে কি বীভৎস ভীতিপ্রদ নিমন্ত্রণ যাত্রা!

কাশিমোল্লা ও বাবলার বেড়া দেওয়া কলাবাগানের ধার ঘেঁসিয়া শৃগালের কুশলপ্রশ্ন শুনিতে শুনিতে সহসা যখন খানিকটা হোগ্‌লার চাল এবং বেবি পেট্রোম্যাক্সের আলো দেখা গেল, তখন সকলের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল, পেটে যেন ক্ষুধা নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল।

বরের চন্দনশোভা মিলাইয়া গিয়া নাসিকা ও কপালে কর্দ্দমতিলক উঠিয়াছে, পুরোহিতের হরিহর মিলনের দশা হইয়াছে—ছাঁপোষা ক্লাবের কথা নাই তুলিলাম, দুটি পায়ে অ্যাশ-কলারের কাদার মোজা, থুৎনীতে কাদার 'নুর'।

পল্লীগ্রাম। ব্রাহ্মণদেরই আগে ডাক পড়িল। দা-ঠাউর সোজা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ছাদের দরজার কাছে গিয়া মুরুব্বির মত প্রশ্ন করিলেন—ব্রাহ্মণদের কোন্‌দিকে?

একজন বৃদ্ধা দরজা আটকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মশায়ের নাম?

—শ্রীযুক্ত দা-ঠাকুর।

—কি গোত্র?

—স্বগোত্র!

—কি শ্রেণী?

—প্রথম শ্রেণী!

—কি মেল?

—পাঞ্জাব মেল!

—কার সন্তান?

—বাপের সন্তান—বলিয়া হাত ছাড়াইয়া দা-ঠাউর ভিতরে গিয়া বসিলেন।

ছাত্র ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল, লুচিটা আনিলেই হয়—দ্বাররক্ষক বৃদ্ধটি আসিয়া বলিল, মশায় আমার সন্দেহ হচ্ছে ঐ ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ কিনা—

দা-ঠাকুর আসলে দাস-ঘোষ, সম্প্রতি পৈতা লইয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছেন—তবে রে পামর, বলিয়া তিনি উঠিলেন, কোটের বোতামগুলা ফট্‌ফট্ শব্দে ছিঁড়িয়া পৈতা বাহির করিয়া বলিলেন, দেখ্ বেল্লিক আজ এ উপবীত ছিঁড়ে আমি অভিশাপ—

হাঁ হাঁ হাঁ করেন কি করেন কি, কি ব্যাপার, হয়েছে কি, বলিতে বলিতে কেহ দা-ঠাউরের হাত ধরিল কেহ ঠ্যাং

জড়াইয়া ধরিল, কন্যাকর্ত্তা নির্ব্বংশ হইবার ভয়ে, রক্ষা করুন রক্ষা করুন, বলিয়া ধপাস্ করিয়া পায়ে আসিয়া পড়িল—

দা-ঠাউর বলিতে লাগিলেন—এতবড় ভূমিকুষ্মাণ্ড, ফিজি-আইল্যাণ্ডের অধিবাসী, আমাকে কিনা প্রশ্ন করে, সন্দেহ করে—দুখানা লুচির জন্তেই ত? আগে ওকে দুই লাথি মেরে দূর করে দাও তবে আমি শান্ত হব।

লোকটিকে প্রায় অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া নীচে নামাইয়া দেওয়া হইল।

দা-ঠাউর বলিলেন—আমাদের দলবলকে স্পেশ্যাল জায়গা করে আগে খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা কর, তবে আমি শান্ত হব—

তাই হইল। পাড়ার চেনা লোকদের উঠাইয়া দিয়া ছাঁপোষা ক্লাবের সভ্যদের উপরে বসানো হইল। একজন—সে দা-ঠাউরের পাশেই বসিয়াছিল—বলিল—এঁয়ারা সব ব্রাহ্মণ ত?

সব ব্রাহ্মণ, একধার থেকে। বিশ্বামিত্রের জাত আমরা, আমাদের কিনা প্রশ্ন করতে সাহস করে!

কেহ কোন কথা বলিল না, গ্রামশুদ্ধ লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে করিল, কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের মানপ্রাণ দুইই আজ দৈববলে বাঁচিয়া গেছে!

পাশের লোকটির ঔদ্ধত্যের পুরস্কার স্বরূপ দা-ঠাউর ও উমেশ দুইপাশ হইতে অলক্ষিতে তার দুই পকেটে ছোলার ডাল ও ধোঁকার ডালনা পুরিতে লাগিল।

বাঁধাকপির তরকারী ও কুমড়োর ছোঁকা বেশী করিয়া চাহিয়া লইয়া দা-ঠাউর ভাও চালান করিলেন।

দই একখুরি চালাইবার সময় জিনের কোটের বৃহৎ পকেট ছাপাইয়া খানিকটা গড়াইয়া পড়িল এবং ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—একি কাণ্ড মশায়?

দা-ঠাউর বলিলেন,—ছাঁদা বাঁধছেন বাঁধুন, চেঁচামেচি ক'রে লোক হাসাবেন না।

তবু লোকটি চেঁচাইতে ছাড়িল না, কিন্তু কেহই বিশ্বাস করিল না কাজটা তার স্বকৃত নয়।

চিংড়িমাছের মালাইকারী ও আধখানা দোরমা যখন পকেট হইতে উপচাইয়া পড়িল তখন হাস্তরসেরও কম সৃষ্টি হইল না।

দরবেশ পরিবেশনের সময় দা-ঠাউর উমেশকে বলিলেন, খাস্‌নি ওটা। কেন, সকলের খাওয়া হয়ে যাক্, পরে বলব।

প্রায় যখন খাওয়া হইয়া গেছে, তখন সকলের শ্রুতি-গোচর করিয়া দা-ঠাউর বলিলেন, যে লোকটা পাকাচ্ছিল তার হাতে ছিল কোঁচ-দাদ। রস গড়াচ্ছিল—

ততক্ষণ গলায় আঙুল দিয়া বমি সুরু হইয়া গেছে।

সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় দা-ঠাউর বলিলেন সিঁড়ির কোণে ঐটে ভেন্-ঘর, চিনে রাখো রাত্তিরে কিদেটিদে পেলে—

রাত তখন অনেক, দুই একজনকে জাগাইয়া দা-ঠাউর বলিলেন, ওরে গণ্‌শা লেডিগেনিটা করেছিল ভালো, কি ক'রে যোগাড় করা যায় বল্ দিকি? দাঁড়া ভাবি।

খানিকটা ভাবিয়া তিনি শশধরের খদ্দরের চাদরটা মেয়েদের মতন করিয়া পরিলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিতে পিঠ বাহির হইয়া পড়ে। হাঁটুও ঢাকা পড়িল না। না হোক্।

বাস্তবিকই সে রকম হিন্দু বিধবা পথে ঘাটে দেখিলে ভয় পাইবার কথা।

'ভেন'ঘরে যে লোকটা সব গুছাইয়া রাখিয়া নিদ্রাজড়িত চোখে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল তাহার সামনে গিয়া দা-ঠাউর বলিলেন, একটা সরায় ক'রে গোটাকতক লেডিগেনি দাও.ত ছেলে!

স্ত্রীজনসুলভ কণ্ঠ অনুসরণ করিতে গিয়া দাদার বাজখাঁই আওয়াজ হইয়া গেল সানুনাসিক, তাহার উপর উদরের পাশ দিয়া পৈতার গোছা দেখা যাইতেছে, অবগুন্ঠিতা দা-ঠাউরের হাতে লেডিগেনির সরা তুলিয়া দিবার সময় লোকটার হাত থরথর কাঁপিতেছিল।

দা-ঠাউর বাহিরে যাইতে পথ ভুল করিয়া কয়লার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন, ততক্ষণে লোকটা গোঁ গোঁ করিতে করিতে ছুটিয়া গিয়া খিড়কির দরজার কাছে আছাড় খাইয়াই অজ্ঞান।

দা-ঠাউর পথ খুঁজিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া খিল দিলে সারা বাড়ীতে মহাগোলোযোগ—কেউ বলে চোর, কেউ বলে শাঁখচুন্নী, কিন্তু লোকটা বলে বেহ্মদত্যি নিয্যস্। আখাম্বা লম্বা, চন্দ্রবিন্দুযুক্ত কথা, কয়লার ঘরে অদৃশ্য—স্বচক্ষে ভূত দেখা আর কাহাকে বলে।

দা-ঠাউর তখন,—সেই মাঝরাত্রে, ছাঁপোষা ক্লাবকে লেডিগেনি ভোজন করাইতেছেন!

সকালে উঠিয়া বরকর্ত্তাকে ডাকিয়া দাঠাউর বলিলেন—একটা বাস্ রিজার্ভ করে দাও, সোজা কলকাতা, যত ভাড়া লাগে, ক্লাব দেবে। যদিও স্বয়ং জানিতেন ক্লাবের ভাণ্ডারে পাঁচ পয়সার বেশী উদ্বৃত্ত নাই।

খবর আসিল, ভাড়া ঠিক হইয়াছে, ষোল টাকা।

দা-ঠাউর বরকর্ত্তাকে বলিলেন কুছ্ পরোয়া নাই, এখন তুমি ভায়া আমাদের দলকে বড়রাস্তা অবধি উঠিয়ে দিয়ে বাসের সঙ্গে মোকাবেলা ক'রে দাও।

চলুন।

সেই দুর্গম পথ।

তবে সকালের রোদে ততটা কষ্টকর এবং ভীতিসঙ্কুল বোধ হইতেছে না।

একটা ছোট্ট স্লিপে পেন্সিল দিয়া দা-ঠাউর লিখিলেন, রাম, তুমি যে জমির কথা বলিয়াছিলে, তাহার সম্বন্ধে খবরাখবর করিও, আমার লইবার ইচ্ছা আছে। ইতি দা-ঠাউর।

সেই চিরকুটটি বরকর্ত্তার হাতে দিয়া বলিলেন, রাম, তোমার ভাইপো গো—বোংনগরে গেছে, ফিরলে এই চিঠিটা দিয়ে দেবে, বলবে দা-ঠাউর দিয়েছে।

বাসের কাছে আসিয়া দা-ঠাউর বলিলেন কত ভাড়া হয়েছে, ষোলটাকা ত? আচ্ছা, ওঠো সব।

সকলে উঠিলে গাড়ী ষ্টার্ট দিলে দা-ঠাউর চেঁচাইয়া বলিলেন—আচ্ছা, ফিরে এলে তুমি দিয়ে দিয়ো, যেমন বললুম।

বরকর্ত্তা বলিলেন—নিশ্চয়। সে কি কথা? বিলক্ষণ।

আর কিছু শোনা গেল না।

গাড়ী খানিকটা অগ্রসর হইলে দা-ঠাউর বলিলেন—ড্রাইভার, তুমি এখানে এসে ভাড়া নিয়ো, বলে দিলাম, শুনলে ত?

ড্রাইভার বলিল বটে—'আজ্ঞে আচ্ছা', কিন্তু তার কেমন সন্দেহ হইল, এই বরকর্ত্তাটির মত দুঁদে লোক কম আছে, সে যে দম্কা ষোলটাকা খরচ করিবে বিশ্বাস হয় না, তবে বলা যায় না, ছেলের বিয়ে······অথচ 'ফিরে এলে দিয়ে দিয়ো' স্পষ্টই বলা হইল, সে শুনিয়াছে, এবং অপর পক্ষও বলিল 'নিশ্চয়।'

পথে গাড়ী হঠাৎ অচল হইয়া গেল। ড্রাইভার ও তার এসিষ্ট্যাণ্ট নামিয়া পরীক্ষা করিয়া জানাইল mobil oil এর অভাবে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, অথচ কাছাকাছি কোথাও ওসবের দোকান নাই।

বিপদ!

আছে মুদীর দোকান, সর্ষের তেল হইলেও নাকি কাজ হইতে পারে, কিন্তু আধসের তেলের দাম...

দা-ঠাউর বলিলেন—তুমিই কিনে আনোনা, সঙ্গে ত কারুর পয়সা নেই, বুঝতেই পাচ্ছো নেমন্তন্ন খেতে আসা—সামান্য পয়সার জন্যে কি আর আট্‌কাবে, বাড়ীতে নেবেই ফেলে দোব—

তাই হইল, বেচারা নিজের পয়সাতে কিনিল।

কলিকাতায় ঢুকিয়া ডাইনে-বাঁয়ে ডাইনে-বাঁয়ে করিতে করিতে দা-ঠাউর তাহাকে কলুটোলা ষ্ট্রীটে আনিয়া ফেলিলেন এবং যে বৃহৎ বাড়ীটার সামনে দাঁড় করাইলেন সেটা হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল।

দলবল সমেত সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দ্বারভাঙ্গা হাউসের ছাতে পড়িয়া সেখান হইতে সেনেট্ হাউসের পাশের গলিতে নামিয়া হ্যারিসন রোড—কলেজ ষ্ট্রীট জংশনে ছাঁ-পোষা ক্লাবের মেম্বারদের তিনি বিদায় দিলেন, দিয়া দক্ষিণমুখো একটা ট্রামে চড়িয়া বসিলেন। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌছাইয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন ড্রাইভার বেচারা তেলের পয়সার জন্য তখনো ঊর্দ্ধমুখী দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার এসিষ্ট্যাণ্ট ঘন ঘন হর্ণ দিতেছে ক্যক্য়...পিঁ পিঁ।

মেডিকেল কলেজের মোটামোটা থামগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দা-ঠাউর হিসাব করিতে লাগিলেন—এক্স-মেম্বারটি ছাঁ-পোষা ক্লাবের সাত বছরের চাঁদা বাকী ফেলিয়াছিল, সেই টাকাটা সুদশুদ্ধ কত হয়! চক্রবৃদ্ধি হারে ষোল টাকার বেশী হয়।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

উর্ম্মিলা

শ্রীবীণা দেবী

নিভিয়া গিয়াছে সোনার দেউটি—আঁধার ঘিরেছে আসি,
ঝরিয়া পড়েছে কুসুমের মালা, শুকায়ে গিয়াছে হাসি।
উৎসব শেষ নাহি সুখলেশ ছিন্ন বীণার মত—
সুরখানি তার বেদনায় ভার লুটিছে মর্ম্মাহত।
নহে চঞ্চল সরযূর জল নীল অঞ্চল টানি
চাপিয়া রাখিছে ক্ষুব্ধ হিয়ার রুদ্ধ রোদন বাণী।

ফুরায়েছে সুখ ভেঙে গেছে বুক, তপ্ত অশ্রুনীরে
ঘিরিয়া নগরী ব্যথার বাঁশরী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে।

বিজন কক্ষে বেদনা বক্ষে লুটিছে বৃদ্ধ রাজা,
হায় ভগবান একি বজ্রবাণ একি নিদারুণ সাজা।

আজি ক্ষণে ক্ষণে জাগিতেছে মনে অন্ধমুনির শাপ
জীর্ণ বক্ষ শীর্ণ করিছে তীব্র সে অনুতাপ।

ওগো মহামুনি কত দুখে জানি হানিয়াছিলে সে বাণ,
কত যুগ পরে তীক্ষ্ণ সে শরে বিদ্ধ করিল প্রাণ।

পার্শ্বে মহিষী শোকাকুলা বসি কাঁদিছে মায়ের প্রাণ,
হৃদয়ের নিধি নয়নের মণি কোথায় সে সন্তান।

অঞ্চলে ঘিরে বক্ষ মাঝারে চাপিয়া দিবস নিশি
মেটে নাই সাধ, হৃদয়ের চাঁদ কোথায় পড়েছে খসি।

আর কি আসিবে আর কি হাসিবে দেখিবে সে চাঁদমুখ,
মায়ের বক্ষে সন্তান সে যে সকলের বাড়া সুখ।

কে দিবে কাহারে সান্ত্বনা হায় কে চাহিবে কার পানে,
বিষাদের স্মৃতি রহিয়া রহিয়া বজ্র বেদনা হানে।

কোন সে কক্ষে চক্ষের জলে বধূ-উর্ম্মিলা লুটে,
তার জীবনের সোনার স্বপন সবি কি যায়নি টুটে।

ত্যাজিল এ পুরী হাতে হাত ধরি কিশোর দুইটি ভাই,
অশ্রুজলের বন্যা বহিল শোকের তুলনা নাই।

অনুরক্তা বাহিরিল রাজপথে,
করিয়া চলিল স্বামীর সাথে।

হাহাকার করি কাঁদে পুরনারী ; শিরে করাঘাত হানে
সত্যবদ্ধ রাজা দশরথ বৃদ্ধা মহিষী সনে।
বিশ্ব-জগৎ সহসা আঁধার বক্ষে বিপুল ব্যথা,
সহকারচ্যুত ব্রততীর মত লুটিল স্বর্ণলতা।
সে মুখের পানে চাহিল না কেহ কহিল না কোন বাণী
নয়ন তুলিয়া হেরিল না কেহ মলিন প্রতিমা খানি।
লুণ্ঠিত বালা বধূ উর্ম্মিলা, বন্ধনহীন মন
কোন্ বনপথে দয়িতের সাথে ফিরিছে অনুক্ষণ।
আজি মনোমাঝে বেদনা জাগায় মধুর স্মৃতিটি তার
পদ্মের পাশে ভ্রমরের মত গুঞ্জরে অনিবার।
কবে কোনদিন দয়িত তাহার বলেছিল কোন কথা
লাজে অবনত সরমে জড়িত কেঁপেছিল দেহলতা।
কোন জোছনায় শারদ নিশায় মালতী বিতানে বসি,
সুখ আলাপনে নিশি জাগরণে সরমে জড়িত হাসি।
কতখানি আশা কত ভালবাসা কত প্রেম নিবেদন,
কুসুমের কানে গোপনে গোপনে জানায় যা সমীরণ।
কবে কোনদিন হয়েছিল দেখা প্রভাতে বকুল তলে
কম্পিত করে দিয়াছিল তুলি মালাখানি তার গলে।
অমলধবল কুসুম সকল স্নিগ্ধ দখিণা বায়
ঝুরু ঝুরু করি পড়েছিল ঝরি চমকিত দু'জনায়।
অতীত দিনের গত জীবনের ছোট বড় কথাগুলি
বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়েছে আজ মনের কপাট খুলি।
ওগো নিরমম, ওগো প্রিয়তম উর্ম্মিলা হৃদয়েশ,
মেঘ আবরিত সূর্য্যের মত তোমার তাপস বেশ।
ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ তুমি বীর ওগো মহীয়ান্,
দেশের করেছ মুখ উজ্জ্বল মায়ের সুসন্তান।
ওগো অকরুণ দীপ্ত অরুণ, শুভ্র যশের রথে
তুমি চলে যাও কেহ দাঁড়াবে না বিঘ্ন তোমার পথে।
শুধু গৃহ কোণে আপনার মনে শুকা'বে এ ক্ষীণা লতা,
শুধু আঁখিজল হ'বে সম্বল লুটাবে বেদনাহতা।

স্বরাজের আমলে

(ভোম্বলদাসের ডায়েরি হইতে)

১
কলিকাতায় আগমন

১৯—ইংরাজির শীতকালে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমাকে একবার কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। তখন ভারতবর্ষে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত "পূর্ণ স্বরাজ" সবেমাত্র স্থাপিত হইয়াছে। বাক্য নামক মহাযুদ্ধে বারবার নাস্তানাবুদ হইয়া ইংরাজগণ তল্পীতল্পা বাঁধিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া গিয়াছেন।

চারিদিকে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবাসিগণ স্বরাজের সুফল লাভ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। স্বরাজ স্থাপনের এক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষের তিন হাজার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছ' হাজার প্রতিনিধি করাচীর সমুদ্রতীরে সম্মিলিত হইলেন। তারপর পূর্ব্বকৃত রক্তারক্তির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুই সপ্তাহ কাল ধরিয়া প্রায়োপবেশন করিলেন। পরে সমুদ্র জলে স্নান করিয়া শুদ্ধচিত্তে এবং ভক্তিভরে Fraternity Pactএ দস্তখত দিলেন। ফলে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ হেতু দেশে যে রক্তগঙ্গা বহিতেছিল, তাহা যাদুমন্ত্রের ন্যায় থামিয়া গেল। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান কাহারও মনে বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র রহিল না। দেশের নেতাগণ সকল সম্প্রদায়ের লোককে একাকার করিয়া ভারতবর্ষে এক জাতি, এক ধর্ম্ম, এক ভাষা স্থাপনের জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেলেন।

কিন্তু দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য এক বিষয়ে মস্ত একটা non-violent কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়া গেল। একদল বলিলেন—ইংরাজগণ দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া পাশ্চাত্য যা' কিছু আমাদের দেশে ঢুকাইয়া গিয়াছে, তা' সব গঙ্গার অতল জলে ডুবাইয়া দিতে হইবে। অন্যদল বলিলেন—পাশ্চাত্যের কিছুই নষ্ট করা হইবে না—বরঞ্চ, সেগুলি তা দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। দেশের ছোটবড় সব পত্রিকা এক এক পক্ষ লইলেন। পত্রিকার পরিচালকগণ ভাল ভাল গালি জোগাইবার জন্য মেছোহাটা হইতে মোটা মাহিনায় লোক নিযুক্ত করিলেন। গালাগালির রকম এবং পরিমাণ অনুসারে পত্রিকার কাটুতি বাড়িতে কমিতে লাগিল। সভাসমিতিতেও উৎসাহের কোনরূপ অল্পতা দেখা গেল না। গালাগালি, চেঁচামেচি, ঢিল-ছোঁড়া জুতা-ছোঁড়া ইত্যাদি সভার প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। যিনি যত সভা ভাঙ্গিতে পারিলেন, পত্রিকাস্তম্ভে তিনি তত বেশী বাহবা পাইতে লাগিলেন তবে আনন্দের বিষয় এই যে উভয় দলই অহিংস্র মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া, কেহই কাহারও মাথার উপরে লাঠি চালাইলেন না।

উল্টাপাল্টা জনমতের চাপে পড়িয়া স্বরাজ গভর্ণমেন্ট সুতিকাগারেই মারা যাইবার পথে পড়িলেন। সাতদিন সাত রাত্রি ধরিয়া মন্ত্রীসভার emergent meeting চলিল। তারপর অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে, গভর্ণমেন্ট উভয় মতের মাঝামাঝি পথ ধরিয়া চলিবেন। পর দিনই সরকারী ইস্তাহারে ঘোষিত হইল যে, পাশ্চাত্য যা' কিছু ভাল সবই বজায় থাকিবে—তবে সেগুলি ভারতবর্ষের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা ও আদর্শ অনুসারে শোধন করিয়া লওয়া হইবে।

চলা-ফেরার জন্য রেলগাড়ী তুলিয়া গরুর গাড়ীর প্রচলন করার জন্য জোর আন্দোলন চলিয়াছিল। হাজার হাজার লোকের সভায় গৃহীত প্রস্তাব, লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাক্ষরিত Memorial, হোমরাচোমরা লোকের Deputation স্বরাজ গভর্ণমেন্টকে এ... ...ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু গভর্ণমেন্ট তাহাদের ... পথে

চলিবার policy হইতে বিচ্যুত হইলেন না। ফলে, রেলগাড়ী বজায় রহিল বটে—কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের সাধনা অনুযায়ী অভাবনীয় সংস্কার সাধিত হইল।

কলিকাতায় আসিবার জন্য গোয়ালন্দ আসিয়া গাড়ী ধরিলাম। একটা জিনিষ প্রথমেই চোখে পড়িল। ইংরাজের আমলে গাড়ীতে চড়িবার জন্য যে তাড়াহুড়া, ধাক্কাধাক্কি, এমন কি হাতাহাতি পর্য্যন্ত লাগিয়া যাইত, তাহার চিহ্নমাত্র কোথাও দেখিলাম না। তা'ছাড়া, গাড়ীতে "শ্রেণী" বিভাগ একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধনী-গরীব, জমিদার-প্রজা, মহাজন-খাতক, সকলেরই একসঙ্গে Third classএ চড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সহযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধীরে সুস্থিরে, গদাইলস্করী চালে একখানি কামরায় উঠিয়া পড়িলাম। উঠিয়াই দেখিলাম, পূর্ব্বে যে বসিবার বেঞ্চগুলি ছিল, সেইগুলি একেবারে উধাও হইয়া গিয়াছে। বসিবার জন্য মেঝেতে প্রকাণ্ড সতরঞ্চ বিছানো—তার উপরে Dead Letter Officeএর ছাপের মত যাত্রীদের পদচিহ্নের শতসহস্র ছাপ দেওয়া একখানা চাদর পাতা রহিয়াছে। আমি বসিবার জন্য একটু জায়গা খুঁজিতেছিলাম। এমন সময় একজন ভদ্রলোক দয়া করিয়া দরজার পাশে একটু জায়গা ছাড়িয়া দিলেন। আমি কোণ্-ঠেসা হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়া গেল, কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার নাম নাই। পাশের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মশাই, গাড়ী কখন ছাড়্বে?" তিনি অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন—"তার কিছু ঠিক নেই। সন্ধ্যে নাগাদ ছাড়তে পারে।" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"বলেন কি মশাই? গাড়ী ছাড়বার কি একটা বাঁধা সময় নেই?" ভদ্রলোকটি আমার আপাদমস্তক ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া বিদ্রূপস্বরে বলিলেন—"পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন বুঝি? এদিকের কিছুই খোঁজ রাখেন না!" আমি অপরাধীর মত নতশিরে বলিলাম—"আজ্ঞে, ঠিক ঠাওরেছেন। সদ্য পাড়াগাঁ থেকে বেরিয়েছি। গাড়ীর বাঁধা সময় তা'হলে উঠে গেছে?" ভদ্রলোকটি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"সব উঠে গেছে, মশাই, সব উঠে গেছে। একি আর ইংরেজ রাজত্ব, এ যে স্বরাজ্য!" ভদ্রলোকটির হাসি দেখিয়া একটু সাহস হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে থেকে উঠে গেল?" তিনি বলিলেন—"এইত সেদিন বঙ্গীয় পঞ্চায়েত সভায় আইন পাশ হয়েছে।" আমি অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আইন পাশ হয়েছে! বলেন কি মশাই? ট্রেনের চলা-ফেরার কোন বাঁধা সময় থাক্বে না? ভারি মুস্কিল হবে ত!" ভদ্রলোকটি তখন একটু সোজা হইয়া আমার দিকে ফিরিয়া বসিলেন। তাঁহার "যুদ্ধং দেহি" ভাব দেখিয়া আমি আড়ষ্ট হইয়া পড়িলাম। তারপর হাত-পা নাড়িয়া, দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন—"কেন, মশাই, অন্যায়টা কি হয়েছে? বাঁধা-ধরা নিয়মের ভেতরে না থা কাই হচ্ছে এ দেশের প্রাচীন নিয়ম—ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ। দেখুন, ইংরেজের আমলে ট্রেনে চড়ার সবচেয়ে অসু বিধে ছিল এই যে, ট্রেনগুলো বাঁধা সময়ে আস্ত-যেত। একটু দেরী হয়েছে, ত অমনি ট্রেন ফেল! সেই অবস্থাটা ছিল এ দেশের সাধনার ঠিক বিপরীত। স্বরাজের দিনে একি চল্তে পারে, মশাই?" তারপর ভদ্রলোকটি ভারতবর্ষের সাধনা ও আদর্শ সম্বন্ধে এমন একটা Speech ঝাড়িয়া দিলেন যে, আমি একেবারে বেকুব হইয়া বসিয়া রহিলাম।

গাড়ীতে উঠা অবধি বাহিরে ফেরিওয়ালার ডাক শুনিতেছিলাম—'পাঁচ টান্ এক পয়সা", "পাঁচ টান্ এক পয়সা"! ব্যাপারখানা কি, তাহা দেখিবার জন্য জানালায় গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম প্রকাণ্ড গুড়গুড়িতে তামাক সাজাইয়া ফেরিওয়ালা ছোকরারা platformএ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং যাত্রিগণ নগদ এক একটী পয়সা ফেলিয়া দিয়া সেই গুড়গুড়ির নলে পাঁচ-পাঁচ-টান তামাক খাইয়া লইতেছে। এক টান বেশী হইলেই বিপদ। অবশ্য, সেই বিপদ non-violent ধরণের, ফেরিওয়ালা গালিগালাজ করিয়া অপরাধীর বাপান্ত করিতেছে মাত্র। আমার সহযাত্রী ভদ্রলোকটি পরে আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, সিগারেট্ ও উহার অনুকরণ বিড়ি পাশ্চাত্য সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া, স্বরাজ গভর্ণমেণ্ট বিশেষ আইন দ্বারা উহাদের প্রচলন এদেশে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং গুড়গুড়ির ব্যবহার প্রত্যেক ধূম্রপায়ীর পক্ষে compulsory করিয়া দিয়াছেন। তা' ছাড়া,

cosmopolitan গুড়গুড়ি দেশ হইতে "অস্পৃশ্যতা" দূর করিবার একটা প্রধান উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক, অবশেষে ৩।৪ ঘণ্টা পর গাড়ী ছাড়িল। আমরা যে গাড়ীতে চড়িয়াছিলাম, উহা দ্রুতগামী ডাক-গাড়ী। কিন্তু উহার গতি গরুর গাড়ীর গতি অপেক্ষা একটুও দ্রুত ছিল না। আমার সহযাত্রী ভদ্রলোকটি আমাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন যে গরুর গাড়ীর ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষের সাধনা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, সেজন্য স্বরাজের দিনে পুনরায় গরুর গাড়ীর আদর বাড়িয়াছে।

আমাদের সেই ডাক-গাড়ী প্রত্যেক ষ্টেশনে এক ঘণ্টা, আধ ঘণ্টা করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। এক ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড় করাইয়া engine-driver পাশের বাজারে যাত্রাগান শুনিতে চলিয়া গেল। কলিকাতায় আমার একটু জরুরি কাজ ছিল। সুতরাং গাড়ীর অবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলাম। আমার সেই ভাব দেখিয়া সহযাত্রীটি ত চটিয়া লাল! তিনি বলিলেন—"আপনি সব কাজে ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন, আপনার লজ্জা হচ্ছে না? মনে রাখ্‌বেন—আপনি সেই দেশের লোক যে দেশের নবাব জুতো-পরিয়ে-দেবার লোকের অভাবে যুদ্ধে পর্য্যন্ত যেতে পারলেন না। মশাই, জীবনটা কি শুধু তাড়াহুড়ো, ধাক্কা-ধাক্কির ব্যাপার? ইত্যাদি ইত্যাদি।" সহযাত্রীটির দ্বিতীয় Speech এর চোটে আমি একেবারে মুসড়িয়া গেলাম।

যাহা হউক, দুই রাত্রি এবং দুই দিনে কোনমতে পৈত্রিক প্রাণটি রক্ষা করিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

২
বঙ্গীয় পঞ্চায়েত সভা

কলিকাতায় আসিয়া যে বন্ধুবরের বাড়ীতে উঠিলাম, তিনি আপনাদের নিকট সুপরিচিত। বাঙ্গালা দেশে এমন হতভাগ্য কে আছে যে—বাবুর নাম শুনে নাই? দেশের জন্য তিনি কি না করিয়াছেন, কি না দিয়াছেন? প্রাণটা যে অনেক চেষ্টা করিয়াও দিতে পারেন নাই, সেটা দেশেরই সৌভাগ্য। অবশ্য, কু-লোকে বলে যে, তিনি Central Asia Relief Fund এর অনেকগুলি টাকা বেমালুম হজম করিয়া কলিকাতায় বাড়ী তুলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ঈর্ষামূলক। প্রকৃত ব্যাপারটি এই তিনি একবার ঐ Fund এ ২০,০০০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন এবং সেই টাকার হিসাব-পত্রে চাঁদা তোলার খরচ বাবদ নিজের মোটর-ভাড়া ১৬,৫৭৫৷৴১০ ধরিয়া দিয়াছিলেন। সেই হিসাবপত্র Chartered Accountant দ্বারা দস্তুরমত পরীক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং কোনপ্রকারেই আমার বন্ধুবরকে সেই বিষয়ে দোষী করা যায় না।

স্বরাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের চারিদিকে বিভিন্ন দল গজাইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে "পেছনফেরা", "এগিয়ে-চলা" এবং "দুমুখো" এই তিনটি দলই রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য সব-কিছু ছাড়িয়া দিয়া যে দল মান্ধাতার আমলে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেন, তাঁহাদের নাম ছিল, "পেছনফেরা।" যাঁহারা পাশ্চাত্যের অনুকরণে দেশটাকে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেন, তাঁহাদের নাম ছিল "এগিয়ে চলা।" আর যাঁহারা দুই দিক বজায় রাখিয়া চলিতে চাহিতেন, তাঁহাদের নাম ছিল "দুমুখো"।

আমার কলিকাতায় আগমনের মাসেক পূর্ব্বে বঙ্গীয় পঞ্চায়েত সভার সভ্য-নির্ব্বাচন হইয়াছিল। সেই নির্ব্বাচনে "পেছনফেরা" এবং "এগিয়েচলা" দলে ভয়ানক লড়াই হয় এবং সেই সুযোগে "দুমুখো" দলের সভ্যগণ অধিক সংখ্যায় পঞ্চায়েত সভায় ঢুকিয়া পড়েন। Majority Party বলিয়া "দুমুখো" দলই শাসন যন্ত্র পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। "পেছনফেরা" এবং "এগিয়েচলা"র দল কখনও গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগ দিতেন এবং কখনও কখনও গভর্ণমেণ্টের opposition করিতেন। তাহা ছাড়া, একদল হইতে অন্যদলে মধ্যে মধ্যে সভ্য ভাগাইয়া নেওয়া হইত। সভ্য ভাগাইবার জন্য অশিক্ষিত লোকে যাহাকে মিথ্যা কথা, জাল, জুয়াচুরি বা ঘুসপ্রদান ইত্যাদি বলে—সেইগুলির সাহায্য লইতে কোন দলই সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।

আমি কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই "বঙ্গীয় পঞ্চায়েত সভা"র বৈঠক বসিল। বন্ধুবরের কৃপায় আমার ভাগ্যে

একদিন সেই বৈঠক দেখিবার সুযোগ ঘটিল। সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মেঝের উপর বহু মূল্যবান কার্পেট পাতা রহিয়াছে এবং উহার উপর প্রকাণ্ড তাকিয়ায় ভর দিয়া সভাপতি মহাশয় বসিয়া আছেন। তাঁহার ডান ও বাম পাশে "দুমুখো" দলের Government memberগণ বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পাঁচটি সারিতে "পেছনফেরা" এবং "এগিয়েচলা" দলের সভ্যগণ বসিয়া আছেন। সভ্যগণের মাথা নেড়া এবং সেই নেড়া মাথার পেছনে লম্বা টিকি। তাঁহাদের গোঁফ কামানো এবং চিবুকে Uncle Samএর মত এক গোছ দাড়ি। পরিধানে বিচিত্র পোষাক—এক পায়ে ঢিলা প্যাণ্টালুন, অন্য পায়ে সরু মুখের পায়জামা, সম্মুখে লম্বা কোঁচা। গায়ের জামাগুলি অর্দ্ধেক চাপকানের মত, অর্দ্ধেক মেরজাইয়ের মত। বলা বাহুল্য যে, সকল সম্প্রদায়ের মিলনের চিহ্ন-স্বরূপই সভ্যগণ এই সমন্বয়ী চেহারা ও পোষাক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভায় ক্ষণেক বসিবার পরই "পেছনফেরা দলের দলপতি শ্রীযুক্ত মহম্মদ স্যামুয়েল বেঁটেরাম প্রস্তাব করিলেন—"পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং প্রভাব যাহাতে এ দেশে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে বাংলা দেশের চারিদিকে পনর হাত উঁচু বাঁশের বেড়া তোলা হউক।" প্রস্তাবক মহাশয় তাঁহার প্রকাণ্ড খাতা হইতে বক্তৃতা পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতার এমনই মোহিনী শক্তি যে, শুনিলেই চোখ আপনা হইতে বুজিয়া আসে। বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সভ্যগণ নাক ডাকাইয়া সটান ঘুমাইয়া পড়িলেন। সভাপতি মহাশয়ও তাঁহার আসনে ঢুলিতে লাগিলেন। বেঁটেরাম মহাশয় সেই নিস্তব্ধ সভাগৃহে পনর মিনিট ধরিয়া অনর্গল বক্তৃতা দিলেন। সর্ব্বশেষে দাঁতে দাঁত ঘসিয়া, হাত মুঠা করিয়া সজোরে বলিলেন—"যদি আপনারা এই প্রস্তাবে রাজি না হন, তবে চিরকালের জন্য জাহান্নমে যাবেন। দেশে আবার সেই গোলামীর ভাব জেগে উঠ্‌বে—কোথাও একটা স্বাধীনচেতা লোক খুঁজে পাবেন না।"

শ্রীযুক্ত বেঁটেরাম বসামাত্র সভাপতি মহাশয় ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং সজোরে ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। দশ মিনিটকালব্যাপী ঘণ্টাধ্বনির পর সভ্যগণের ঘুম ভাঙ্গিল। তাঁহারা ঘন ঘন চোখ রগ্‌ড়াইতে এবং হাই তুলিতে লাগিলেন।

"এগিয়েচলা" দলের নেতা শ্রীযুক্ত আলম নাহাপিট্ট চোট্টারাম তখন বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। তাঁহার ভুঁড়িটি ছিল একটু বেসামাল। সেজন্য তিনি বসিয়া বসিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য সভাপতির অনুমতি চাহিলেন। সভাপতি মহাশয় অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু সভ্যগণকে জানাইয়া দিলেন যে, সেই অনুমতি Precedent বলিয়া গণ্য হইবে না।

বক্তা হিসাবে চোট্টারাম মহাশয়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার আওয়াজ এমন চড়া ছিল যে, পঞ্চাশ হাজার লোকের সামনে বক্তৃতা দিলেও, প্রত্যেকে তাঁহার কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইত। প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে তিনি পনর মিনিট ধরিয়া গরম গরম বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতার চোটে সভাগৃহ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সভ্যগণ কানে তালা লাগিবার ভয়ে কান ঢাকিলেন। উপসংহারে চোট্টারাম বলিলেন—"যদি আপনারা এরূপ প্রস্তাব করে ভারতমাতাকে অন্য জাতির একাসনে বস্‌তে না দেন, তবে ভারতমাতা নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবেন। সাবধান—আপনারা জেনেশুনে এই বিপদ ডেকে আনবেন না।"

তারপর উভয় দলের চার পাঁচজন সভ্য প্রস্তাবটির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বক্তৃতা করিলেন। অবশেষে রাষ্ট্রসচিব গভর্ণমেণ্টের মতামত জ্ঞাপন করিবার জন্য স্মিতহাস্যে বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তিনি প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে কয়েকটি যুক্তিরই অবতারণা করিলেন—প্রথমতঃ, বাঁশের বেড়া বেশী দিন স্থায়ী হইবে না, বছর বছর নূতন বেড়ার জন্য টাকা খরচ করা গভর্ণমেণ্টের অসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য প্রভাব এবং সভ্যতার প্রবেশপথ একেবারে রুদ্ধ করা গভর্ণমেণ্টের Policy নয়, যদি বেড়া তুলিতেই হয়, তবে তাহাতে এমন ভাবে ফাঁক রাখিতে হইবে যেন পাশ্চাত্যের অন্ততঃ ভাল জিনিষগুলি চুঁয়াইয়া এদেশে ঢুকিতে পারে। তৃতীয়তঃ, আলোচ্য বিষয়টি All-India Question, ভারত

বর্ষের চারিদিকে দেওয়াল তোলার জন্য Federal মহাসভায় একটী প্রস্তাব আনা হইয়াছে, সেই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হইবে। পরিশেষে রাষ্ট্রসচিব প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যদি বেঁটেরাম মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবটী Press না করেন, তবে সভার কার্য্যবিবরণী তিনি Federal মহাসভায় পাঠাইয়া দিবেন।

অমনি একদল চেঁচাইতে লাগিলেন "তুলিয়া লউন" "তুলিয়া লউন"। অন্যদল চেঁচাইতে লাগিলেন—"কখনো না," "কখনো না,"। আর একদল চেঁচাইতে লাগিলেন—"সাধু," সাধু"। কেহ শিয়ালের ডাক, কেহ কুকুরের ডাক ডাকিতে লাগিলেন। মিনিট দশেক সভায় ভয়ানক গোলমাল চলিতে লাগিল। সভাপতি মহাশয় গোলমাল থামাইবার জন্য ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিলেন। গোলমাল থামিলে পর, প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইল এবং প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বেশী ভোট হওয়ায় উহা নামঞ্জুর হইয়া গেল।

৩

শিক্ষা মহামণ্ডল

কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সংবাদপত্রের মারফতে জানিয়াছিলাম যে স্বরাজপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের গোলামখানাগুলি একেবারে ধূলিসাৎ করা হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে "শিক্ষা মহামণ্ডল" স্থাপিত হইয়াছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বন্ধুবরের নিকট সেই মহামণ্ডল দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। বন্ধুবর আহ্লাদে গদগদ হইয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"হাঁ ভাই, একবার দেখে এসো। কি ছিল আর কি হয়েছে! তোমাদের সেই ধামাধরা বিশ্ববিদ্যালয় বছর বছর মাছিমারা কেরাণীর দল আর চার আনা ফিসের উকীল মোক্তার প্রসব করত। আর আমাদের "মহামণ্ডল" কী সব নির্ভীক, বীর, বেপরোয়া দল তৈরী করেছে।"

মহামণ্ডলে গিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বেকার Law College. Hardinge Hostel, Ashutosh Buildings, Senate House প্রভৃতির চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে দেওয়াল-ঘেরা প্রকাণ্ড মাঠে মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সারা মাঠ জুড়িয়া যত্ন-সেবিত কচি দূর্ব্বাদল গজাইয়া উঠিয়াছে এবং মাঝে মাঝে নানাজাতীয় বৃক্ষ সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের প্রান্তদেশে ছোট ছোট অগণিত পর্ণকুটীর। বন্ধুবর মহা উৎসাহে আমাকে বুঝাইয়া দিলেন—মহামণ্ডলের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে ইঁট পাথরের তৈরি দালান-কোঠার বা টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতির বালাই নাই। ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ রক্ষা করিয়া সেই কুটিরগুলিতে অধ্যাপকগণ শিষ্যগণসহ বাস করেন এবং বৃক্ষরাজির শীতল ছায়ায় বসিয়া শিক্ষা প্রদান করেন। শিশুদিগের জন্য বৃক্ষের শাখায়ও ক্লাস করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। স্থানটি দেখিয়া আমার বড়ই লোভ হইল। আমি বলিয়া ফেলিলাম—"ভায়া এমন একটী জায়গা পেলে ভাল একটী Dairy করতে পারতুম।" বন্ধুবর আমার প্রতি ভ্রূকুটী করিলেন, কোনও জবাব দিলেন না।

মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠার সময়ে co-education এর বিষয় লইয়া মহা গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। একদল বলিলেন যে উহা পাশ্চাত্যের অনুকরণ—সুতরাং মহামণ্ডলের ত্রিসীমানায় ঢুকিতে দেওয়া হইবে না। অন্যদল প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে ভূরি ভূরি নজির দেখাইয়া প্রমাণ করিলেন যে, হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে co-education এর ব্যবস্থা ছিল। গোলমাল বাড়িতে বাড়িতে যখন non-violent দাঙ্গাহাঙ্গামায় পরিণত হইবার উপক্রম হইল, তখন গভর্ণমেণ্ট মাঝে পড়িলেন। তাঁহারা আইন করিয়া দিলেন যে, তরুণ-তরুণী এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিবে বটে, কিন্তু প্রত্যেক তরুণীর মুখ ও শরীর বোরখা দ্বারা আবৃত থাকিবে।

পূর্ব্বের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব অধ্যাপক খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও সেখানে দেখিতে পাইলাম না। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ইংরাজের আমলে তাঁহারা দেশের যুবকদের মনে গোলামীর বীজাণু inject করিয়া দিতেন—সেই অপরাধে ঘোড়া নামক চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাঁহাদিগকে পল্লীগ্রামে intern করা হইয়াছে। দুই একটী অধ্যাপক

পেটের দায়ে কর্তৃপক্ষের হাতে পায়ে ধরিয়া মহামণ্ডলে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারাও তরুণদলের হাতে বেইজ্জত হইয়া স্বেচ্ছায় সরিয়া পড়িয়াছেন।

মহামণ্ডলসংশ্লিষ্ট লাইব্রেরির খ্যাতি পূর্ব্বেই কানে পৌঁছিয়াছিল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, দুনিয়ার sex-appeal সম্পর্কীয় যাবতীয় পুস্তক সারিবদ্ধ ভাবে রাখা হইয়াছে।

আমার দুরদৃষ্টবশতঃ অধ্যাপকগণের শিক্ষাদান-প্রণালী study করিবার আমার সুযোগ ঘটিল না। কারণ স্বরাজ স্থাপন উপলক্ষে হৈহৈ-রৈরৈ করিবার জন্য মহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ এক বৎসরের জন্য ছাত্রদের অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ছাত্রগণ তাহাদের পুঁথি-পুস্তক তোরঙ্গে বন্ধ করিয়া Meeting-ভাঙ্গন, procession-করা, election এ চেঁচানো প্রভৃতি দেশের কাজে লাগিয়া গিয়াছিল।

৪
জাতীয় সৈন্যদল

বলা বাহুল্য যে, স্বরাজ স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশ রক্ষার জন্য জাতীয় সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। আমার কলিকাতায় থাকা কালীন কোন এক মহাপুরুষের জন্মতিথি উপলক্ষে একবার সেই সৈন্যদলের Review হয়। বন্ধুবরের কৃপায় আমিও সেই Review দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হই।

ইংরাজের আমলে যেখানে Fort ছিল, ঠিক তার উত্তরের মাঠে Review হইবার কথা ছিল। আমি ও আমার বন্ধুবর নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিটিংকা কাপ্‌ড়ায় সজ্জিত হইয়া সেখানে রওয়ানা হইলাম।

পথে দেখিলাম, পূর্ব্বেকার চৌরঙ্গীর চেহারা সম্পূর্ণ বদ্‌লিয়া গিয়াছে। যেখানে Whiteaway Laidlaw-র দোকান ছিল, সেখানে মুড়িমুড়কির প্রকাণ্ড দোকান বসিয়াছে। Army and Navy Stores-এর দোকানে খদ্দর বেচাকেনা হইতেছে। গড়ের মাঠের অবস্থা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল! রাস্তা, গাছ, ঘর, Fort ইত্যাদি সব তুলিয়া দিয়া সারা মাঠে গাঁজার চাষ করা হইয়াছে। তদ্দারা স্বরাজ গভর্ণমেণ্টের অনেক টাকার আয় বাড়িবার সম্ভাবনা। অথচ, ইংরাজগণ শুধু সখের জন্য এতখানি জমি অকেজো অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম! মাঠে ধানের চাষ কিম্বা পাটের চাষ হইবে, ইহা লইয়া কলিকাতায় হরিজনদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছিল। শেষে নেতৃবর্গ মাঝে পড়িয়া সেই ঝগড়া মিটাইয়া দেন এবং মাঠে গাঁজার চাষের ব্যবস্থা করেন!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শুধু Fort-এর উত্তর দিকে কতক জায়গা খোলা রাখা হইয়াছিল। সেখানে যুবকগণ হাডু-ডুডু, ডাংগুলি, বুড়ী-ছোঁয়া প্রভৃতি National games খেলা করিত। Cricket, tennis, football প্রভৃতি পাশ্চাত্য খেলা Games Ordinance দ্বারা একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

Review দেখিবার জন্য সহরের প্রায় সব গণ্যমান্য লোকই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাহাকেও পূর্ব্বের ন্যায় মোটর বা জুড়ি গাড়ি হাঁকাইয়া সেখানে যাইতে দেখিলাম না। সকলেই পাল্কী চড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বরাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্কী-চড়াই fashionable এবং aristocratic হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমরা Reviewর জায়গায় গিয়া দেখিলাম, সৈন্যগণ সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পরণে খদ্দরের কৌপিন, গায় খদ্দরের মেরজাই, মাথায় Gandhi-cap এবং পায় Sandal। কিন্তু তাহাদের হাতে বা শরীরে কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র দেখিলাম না। আমি বিস্মিত হইয়া বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এদের বন্দুক নেই, কামান নেই—এরা যুদ্ধ করবে কি হে?" বন্ধুবর কানে আঙ্গুল দিয়া, জিভ কাটিয়া বলিলেন—"ছি ছি! ওমন পাপ কথা বলতে নেই। আমাদের যুদ্ধ যে non-violent, অস্ত্রশস্ত্রের দরকার কি?"

এমন সময় সৈন্যাধ্যক্ষ হুকুম দিলেন—"চর্‌কা।" অমনি প্রত্যেক সৈন্য নিজ নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে এক একটী folded চর্‌কা বাহির করিয়া সুতা কাটিতে কাটিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি অধিকতর বিস্মিত হইয়া বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"একি হে?"

বন্ধুবর হাসিয়া বলিলেন—"এই সামান্য কথাটা বুঝ্‌লে না? সৈন্যদল চরকায় সুতো কাটতে কাটতে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হচ্ছে। চরকা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চিহ্ন। চরকা-কাটা সৈন্য দেখ্‌লেই শত্রুপক্ষ বুঝ্‌তে পারবে যে, স্বাধীন ভারতের সৈন্যদল তাদের আক্রমণ করেছে।"

ক্ষণেক পরে সৈন্যাধ্যক্ষ হুকুম দিলেন—"চরকা-বন্ধ।" অমনি সৈন্যগণ চরকা ভাঁজ করিয়া পকেটে পুরিয়া নিশ্চল-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ সৈন্যাধ্যক্ষ হুকুম দিলেন—"আবেদন।" অমনি সৈন্যদল সমস্বরে একটী স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল। স্তোত্রটিতে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, পারসী, আরবি প্রভৃতি সকল প্রকার শব্দই ছিল। আমার মত মূর্খের পক্ষে সেই স্তোত্রের ভাষা বুঝা অসম্ভব ছিল। স্তোত্রটির অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য বন্ধুবরকে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভারতীয় সৈন্যগণ অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া প্রথমে শত্রুগণকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিবে, বলিবে—"কেন তোমরা এ দেশ জয় করতে এসেছ? তোমাদের এত লোভ কেন? তোমরাও মানুষ, আমরাও মানুষ। আমাদের বধ করে কি লাভ হবে?" এমন সময় সৈন্যাধ্যক্ষ হুকুম দিলেন—"পদ-ধারণ।" অমনি সৈন্যগণ হাত দুইটী সম্মুখের দিকে বাড়াইয়া দিয়া, হাটু গাড়িয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটী স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল। ছেলেবেলায় চোরবাগানের পটে দেখিয়াছিলাম, কৃষ্ণ রাধিকার পায় ধরিয়া মান-ভঞ্জন করিতেছেন। সৈন্যগণের বসিবার ভঙ্গী দেখিয়া সেই পটের কথা মনে পড়িয়া গেল। বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইহার অর্থ কি?" বন্ধুবর বুঝাইয়া দিলেন যে, সৈন্যগণের কাকুতি-মিনতিতে যদি শত্রুহৃদয় নরম না হয়, তবে সৈন্যগণ তাহাদের পায়ে ধরিয়া বলিবে—"তোমাদের পায়ে পড়ি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।"

তারপর সৈন্যাধ্যক্ষ হুকুম দিলেন—"ধর্ণা"। অমনি সৈন্যগণ সটান মাটীতে শুইয়া পড়িল। ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য বন্ধুবরের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক হইল না। শত্রু-পক্ষকে কাবু করিতে ধর্ণা কিরূপ অব্যর্থ, তাহা কোন্ ভারতবাসী না জানে? সর্ব্বশেষে সৈন্যাধ্যক্ষ হুকুম দিলেন—"পলায়ন।" অমনি সৈন্যগণ দৌড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, তখন আর তাহাদের সারি বা শৃঙ্খলা রহিল না। একেবারে 'যঃ পলায়তি স জীবতি'। বন্ধুবর বুঝাইয়া দিলেন যে, ধর্ণা দিয়াও যদি শত্রুদলকে ফিরাইতে না পারা যায়, তবে সৈন্যগণকে ঘর-মুখো পালাইতে হইবে। দেশ রক্ষা করিতে গিয়া পৈত্রিক প্রাণটি হারাইবে, জাতীয় সৈন্যদল নিশ্চয়ই এমন আহাম্মক নয়।

এভাবে জাতীয় সৈন্যদলের review শেষ হইল। দেশ-রক্ষা সম্বন্ধে আমার মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা ছিল। উহার এরূপ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে দেখিয়া সেই রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিলাম।

একটি মেয়েকে লইয়া

শ্রীবিমল মিত্র

গ্রামে গ্রামে বসন্ত হইতেছে। টিকে দিবার জন্ত সরকারী ডাক্তার আসিয়াছে। নল-গাড়ীর মাঠের উপর একটি তাঁবু পড়িয়াছে—ছোকরা ডাক্তার তাহার সাজসরঞ্জাম লইয়া সেইখানেই থাকে।

গ্রামেই মানুষ—তবু সহরে কাটাইয়া ভূপেন ততটা সহরভক্ত হইতে পারে নাই। সমস্ত সকালটা কাজের ব্যস্ততায় কাটিয়া যায়। দলে দলে লোক আসিয়া টিকে লইবার জন্ত ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পর্য্যন্ত থাকে না তাহার। তারপর দুপুরের প্রারম্ভে পাৎলা হইতে সুরু হয়।···তখন দেখা যায় সকলে এক একখানা হাত উঁচু করিয়া ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া সার বাঁধিয়া গ্রামের দিকে চলিতেছে।

দুপুর বেলা তাহার মনে পড়ে বাড়ীর কথা! বাড়ীর কথা, সুষমার কথা! একশো মাইল দূরে একটি গৃহের অন্দরে একটি বধূর অস্তিত্ব ভূপেনের সারা মন অধিকার করিয়া বসে। সে এখন কী করিতেছে কে বলিতে পারে! বই পড়িতে পড়িতে হয়ত কখন শিথিল হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—ঘুমে অচেতন; তবু ঠোঁটের উপরটিতে যেন হাসি মাখানো! সুষমার হাসি মনে পড়িলে ভূপেন নিজেও হাসিয়া ওঠে! কারণে অকারণে সুষমার সে হাসি ভূপেন জীবনে ভুলিতে পারিবে না। চোখে চোখ পড়িলেই হাসি! আসিবার সময় ভাল করিয়া কথা হয় নাই। মুখের কাছে মুখ আনিয়া ভূপেন মাত্র ঠোঁট স্পর্শ করিবে এমন সময় নীচে হইতে ডাক আসিয়াছিল—বৌমা।

শেষ চুম্বনটা হইতে পায় নাই; তবু সেইটুকু সময়ের মধ্যে সুষমা ভূপেনের হাত দু'টি নিজের হাতের মুঠার ভিতর ধরিয়া বলিয়াছিল—হপ্তার একখানা ক'রে চিঠি দিও—কেমন?

এখানে আসিয়া অবধি ভূপেন তাহার কথা রাখিয়াছে। সপ্তাহে একখানা তো বটেই, কোনও সপ্তাহে দু'খানাও দিয়াছে! কিন্তু এই ক'দিন হইল ভূপেন একখানা চিঠিও দিতে পারে নাই। সুষমা কী মনে করিতেছে কে জানে। আর কী লইয়াই বা সে লিখিবে! সেই একঘেয়ে কাহিনী—সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। নিশীথের নিস্তব্ধতায় করুণ আর্ত্তনাদে কতবার তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়—সেই আকাশ-ভেদী চীৎকার—শববাহকদের সমবেত হরি-ধ্বনি শুনিয়া রাত্রির স্তব্ধ আবহাওয়া থম্ থম্ করিতে থাকে!

বিকাল বেলা বাড়ী বাড়ী টিকা দিয়া আসিতে হয়। অসূর্য্যম্পশ্যা মেয়েরা তাঁবুতে আসিতে পারে না। কিন্তু সময়টা বড় অসময়। সেই বিকাল বেলা মেয়েরা বধূরা ঘাটে যায় জল আনিতে—নানান্ সাংসারিক কাজে তাহারা তখন ব্যস্ত থাকে—সুতরাং একই বাড়ীতে অনেকবার করিয়া ভূপেনকে যাইতে হয়। কাহারো মুখের দিকে ভূপেন চাহিয়া দেখে না—আর দেখিতে চেষ্টা করিলেও দেখা পাওয়া অসম্ভব। বধূরা এই একগলা ঘোম্‌টা দিয়া একটি সচল পুঁটুলি হইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়...দাঁড়াইয়া হাতটি বাড়াইয়া দেয়। সেই হাতের স্বাস্থ্য ও গড়ন দেখিয়া মানুষটিকে কল্পনা করিয়া লইতে হয়। গোলগাল নিটোল একটি হাতের কব্জির উপর কয়েকগাছা কাচের অথবা সোনার চুড়ী; হাত বাড়াইতে গিয়া চুড়ীগুলি ঠুন্ ঠুন্ করিয়া বাজিয়া ওঠে; সেই হাতের চাঁপার কলির মতো পাঁচটা আঙুল বাঁ হাত দিয়া ধরিয়া ভূপেন ডান্ হাত দিয়া ছুরি উঁচাইয়া ধরে। ছুরি দেখিয়াই সারা হাতখানি ও আঙুল কয়টি শির শির করিয়া ওঠে; মেয়েরা ভয় পায়। ভূপেন হাতের আঙুল কয়টিকে আরো জোরে চাপিয়া ধরে; অসূর্য্যম্পশ্যা বধূ সেই পর-পুরুষের হাতের চাপে হয়ত লজ্জিত

্য়, সঙ্কুচিত হয়—কিন্তু ভূপেন ততক্ষণে কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। কব্জির উপরে প্রশস্ত জায়গাটাতে রক্তের াগ ঘন হইয়া উঠে! ছাড়া পাইয়া বধূ পলাইয়া বাঁচে।

সরঞ্জামের বাক্সটি কাঁধে লইয়া গোবিন্দ এ-বাড়ী হইতে ও-বাড়ী ভূপেনের পিছন পিছন ঘুরিয়া বেড়ায়। অল্প ়য়সের মেয়েরা—যাহাদের তখনও বিবাহ হয় নাই—কিছুতেই কাছে আসিবে না। ভয় এবং লজ্জা দুই-ই তাঁহাদের বেশী!…

ভূপেন বলে—কিছ্ছু ভয় নেই—লাগ্‌বেও না—এই দেখ, জানতেও পাবে না তুমি—দেখি দেখি এগিয়ে এস—

প্রথমে তাহারা পলাইয়া যায়; এক দৌড়ে খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া কোথায় গিয়া লুকাইয়া থাকে। অনেক করিয়া যখন তাহাদের ধরিয়া আনা হয়, তখন লজ্জায় অথবা ভয়ে আঁচলের কাপড়ে তাহারা মুখ চোখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।…সেই অনাবৃত হাতটিকে লইয়া নাড়া চাড়া করিতে ভূপেনের বেশ লাগে—আরো ভালো লাগে সেই ভীরু লাজুক কিশোরীদের সঙ্কোচ আর শঙ্কা-মিশ্রিত মিটি-মিটি দৃষ্টি! আর ছুরি তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সারা শরীরে কেমন করিয়া শিহরণ খেলিয়া যায়—তাহা ভূপেন অন্তর দিয়া অনুভব করে।

রাত্রে তাঁবুর ভিতর বসিয়া ভূপেন সুষমাকে চিঠি লিখিতে বসে। ওসব কথা কিছুই লেখেনা—লেখে—কোন বাড়ীতে কী দেখিয়াছ, সুষমার মতো দেখিতে একটি বধূ কেমন করিয়া টিকা লইবার সময় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, কোন বাড়ী হইতে তাহাকে কাহারা খাবার পাঠাইয়া দিয়াছে—তাহাদের বাড়ীতে একটি ময়না পাখী কেমন পড়িতে পারে—কাহার বাড়ীতে এক সঙ্গে সব কয়জনের বসন্ত হইয়াছে—খোকা একটি ছেলে কিছুতেই টিকা লইবে না বলিয়া কেমন করিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছিল—এই সব অতি অবান্তর, অতি অনাবশ্যক কথা।

তাঁবুটা খাটানো হইয়াছে গ্রামের বাহিরে। গ্রাম যেখানেই শেষ হইয়াছে। মাঠ আর মাঠ চারিদিকে—অন্ধকার রাত্রে বন-তুলসীর গন্ধ ভাসিয়া আসে; বিছানার উপর শুইয়া ভূপেন এপাশ ওপাশ করে—এ-সময়ে যদি সুষমা কাছে থাকিত, তাহার পাশটিতে একান্ত নিঃসঙ্কোচে আর নির্ভয়ে! এই বিরহ-স্পন্দিত দিনগুলি সেই ভাবনায় মর্ম্মরিত হইয়া উঠে! কোনও কোনও রাতে হঠাৎ ভূপেন উঠিয়া বসিয়া আলো জ্বালিয়া বাক্স খোলে; বাক্স খুলিয়া সুষমার ফোটোখানি বাহির করে। এক একরাতে ভূপেন মাঠে বাহির হইয়া পড়ে…দুই হাতের কঠোর আলিঙ্গন দিয়া মাঠের শূন্যতাকে সে পিষিয়া ফেলিতে চায়; তিনটি অক্ষরের 'সুষমা' নামটিকে বারবার মুখ দিয়া উচ্চারণ করিয়া ফেরে—তিনটি অক্ষরের ওই নামটি যে এত মধুর তা' আগে কে জানিত! কিন্তু সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া আমার যেমনকে-তেমন। দলে দলে লোক আসিতে থাকে…আবার যাইবার সময় হাত আড়ষ্ট করিয়া সার বাঁধিয়া চলিয়া যায়। নিত্যই সেই এক দৃশ্য! দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকায় সেই একঘেয়ে আবর্ত্তন!

ইচ্ছামতী নদীটা গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তাহারই তীরের উপর প্রকাণ্ড জুট্-মিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাথা তুলিয়া কলের চিম্‌নীগুলি আকাশের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। আর অবিরাম অনর্গল নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশখানিকে ধূমাঙ্কিত করিয়া দেয়। কিন্তু তাহার নীচে যাহারা কাজ করে তাহাদের জীবন আরো কলঙ্কিত!

ছোট ছোট এক মাপের সারি সারি ঘর—সাম্যবাদের প্রমাণ স্বরূপ—কোম্পানী সৃষ্টি করিয়াছে! সংখ্যায় যতগুলি ঘর তাহার তিনগুণ মানুষ উহারই ভিতর মাথা গুঁজিয়া থাকে। বসন্তের প্রকোপটা ওই অঞ্চলেই কিছু বেশী! কিন্তু তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে কোম্পানী! কোম্পানীর লোকের মৃত্যু হইতেছে কি না দেখিবার জন্য কোম্পানীর ডাক্তার আছে। তাহাদের এলাকার ভিতরে টিকা দিতেছে কোম্পানীর ডাক্তার।

কিন্তু সেই এলাকার অনতিদূরেই যাহারা থাকে তাহাদের দেখিতে হইবে ভূপেনকে!

কতকগুলি খোলার ঘরের সমষ্টি! তাহার ভিতর যে নীচ স্তরের মেয়েমানুষগুলি থাকে তাহারা ভদ্র-সমাজের

বাহিরে। প্রতিদিন গিল্‌টি-করা রূপের ফাঁদ পাতিয়া ওই কলেরই কুলিদের ধরে—আর তাহাদেরই পয়সায় জীবন নির্ব্বাহ করে। কদর্য্য আবহাওয়ায় তাহাদের যৌবন কখন আসিয়া চলিয়া যায় তাহারা টের পায় না। গ্রামের মানুষ তাহাদের ঠেলিয়া একপাশে সরাইয়া রাখিয়াছে—আবার কোম্পানীর এলাকার ভিতরে যাইবার অধিকারও নাই! মানুষের পীড়িত আত্মা ওখানে অপমানে লজ্জায় মুমূর্ষু হইয়া আছে—যৌবনের দেবতা ওখানে অসংযম আর অমানুষিক অত্যাচারে কলুষিত—প্রেম লইয়া ওখানে দর কষাকষি চলে; ওই অশ্লীল প্রতিবেশই শয়তানের পীঠস্থান; ঈশ্বরকে ওখানে খুঁজিলে পাইবে না—মানুষের মূর্ত্তি লইয়া ওখানে থাকে প্রেতিনীরা—রক্ত-লোভী প্রেতিনী—মৃত মানুষের জীবিত কঙ্কাল—

তবু ভূপেনকে ওইখানে যাইতে হইল।···

সেই বিকাল বেলা—আকাশের গায়ে বাদুড়ের মত অন্ধকার ঝুলিতেছে। সব কিছু মিলিয়া ভূপেনের দম বন্ধ হইবার যোগাড় হইল। কাদায় আর জলে জায়গাটি অগম্য। তবু উনানের ছাই ফেলিয়া ও থান্ ইঁট পাতিয়া ঘরগুলির সামনে পথ করা হইয়াছে!

সব ব্যবস্থা গোবিন্দ করিয়া দিল।

প্রথমে কেহই টিকা লইতে চায়না; শেষে ভয় দেখাইতেই সকলে এক এক করিয়া হাত বাড়াইয়া দিল। প্রথমে হরিমতী, কামিনী তারপর শতদল তারপর সৌরভী—শীর্ণ রোগা হাতগুলি বাড়াইয়া দিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে; তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার প্রবৃত্তি ভূপেনের হয় না। বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া হয়ত তাহারা তাহাদের স্বভাব-সুলভ বিকৃত হাসি হাসে—রঙ্গ আর রসিকতার চেষ্টা করিয়া হয়ত এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়ে; তাহারা যে বাঁচিয়া আছে, বাঁচিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে—কঙ্কালের মত দেখিতে হইলেও তাহারা মৃত নয়—তাহারই প্রমাণ দিতে গিয়া হয়ত তাহারা সশব্দে কথা বলে—কিন্তু ভূপেনের সে দিকে লক্ষ্য করিবার কী দরকার? ভূপেন তাহাদের চেনে! মানুষের প্রেতায়িত আত্মা উহাদের আশ্রয় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

কিন্তু একদিনে সমস্ত শেষ হইবার নয়। তারপর দিনও আসিতে হইল। এবং তাহার পরের দিনও তাহাকে আসিতে হইল। ঘটনাটা—ঘটিল তৃতীয় দিনের মাথায়···

নিত্যকার মত ভূপেন কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

এক একজন করিয়া হাত বাড়াইয়া দিতেছে এবং কাজ সমাপ্ত হইলেই চলিয়া যাইতেছে।

কিন্তু একখানি হাত আসিতেই ভূপেন যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। হাতের উপর চামড়া ফুটাইয়া কালো রঙে ফুল পাতা লতা আঁকা হইয়াছে এবং তাহারই ভিতর স্পষ্ট করিয়া লেখা রহিয়াছে 'রাধা'—ওই মেয়েটিরই নাম।

অননুভূত এক বিস্ময় এবং কৌতূহল আসিয়া ভূপেনের সারা মনটি অধিকার করিয়া ফেলিল। কোথায় অনেক দিন আগে এমনি যেন সে দেখিয়াছে! শীতের সন্ধ্যার মত ধূসর অস্পষ্ট অতীতের তীরে তীরে ভূপেন খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল। কোথায় যেন সে এমনি একজনকে দেখিয়াছে—এমনি একজন। তাহার সহিত যেন ভূপেনের পরিচয় হইয়াছিল; দূরে—বহুদূরে মাঠের অপর প্রান্তে ক্ষীণাতিক্ষীণ আকৃতি লইয়া যেন কে একজন দাঁড়াইয়া আছে—তাহার মুখ চেনা যায় না; অস্পষ্ট আকৃতি—সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভূপেন চুপ করিয়া রহিল—কে সে? সে কে? একদিন যেন সে তাহার জীবনে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল—এবং হঠাৎ তাহাকে ভুলিতে হইয়াছিল!··· হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—মনে পড়িল অনেক দিনের ভুলিয়া যাওয়া একটি কথা। সমস্ত মনে পড়িয়া গেল তাহার—সমস্ত এক নিমেষে···

অকস্মাৎ গোবিন্দ কথা বলিল···বলিল—বাবু কোন্‌টা দেব?

কি যে হইল, ভূপেন বলিয়া বসিল—ঝিঙুরগাছি···

কথাটা বলিয়াই ভূপেন বুঝিল ভুল হইয়াছে; শোধ্‌রাইয়া লইয়া বলিল—না না, তুলোটা দে—

কী আশ্চর্য্য! তুলোর নাম করিতে গিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিল ঝিঙুরগাছি।···ভূপেন মুখ তুলিয়া মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—সেই মুখ কিন্তু এখন যেন কত বিকৃত!

ঝিঙুরগাছি! সে-প্রায় পাঁচ ছয় বছর পূর্ব্বের কথা।

ঝিঙুরগাছিতে রথের মেলা বসিত। প্রকাণ্ড মেলা। বহু দূর দূরান্তের গ্রাম হইতে লোক আসিয়া মেলাটিকে ঘিরিয়া ফেলিত! একখানি নৌকা করিয়া একদল লোক পার হইতেছিল। তখন ভূপেন কলেজে পড়ে; গ্রামের সকলকে চিনিতও না। মেয়ে পুরুষ মিলিয়া তা' দশ বারো জন লোক হইবে। বর্ষাকাল; সারা দেশ ভাসিয়া জলে জলময়, নৌকা যাইবে ঝিঙুরগাছি রথের মেলায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার। তবু ইহারই মধ্যে যেন নিশুতি। নৌকা মাঝ নদী দিয়া চলিতেছে। প্রকাণ্ড পরিধি—দুই তীর দেখা যায় না। মাঝে মাঝে এক একটা চর আসে—ভাঁটায় জাগিয়া-ওঠা চর—কিন্তু কয়েকটা চর অক্ষয় হইয়া উঠিয়াছে; গাছপালা বনজঙ্গল জন্মাইয়া রীতিমত মানুষের বাসোপযোগী দ্বীপ হইয়া উঠিয়াছে—এই রকম কত চর ছাড়াইয়া কত মোড় ঘুরিয়া নৌকা চলিয়াছে। দশ বারো জন লোক—যে যাহার সমবয়সী পাইয়া দল পাকাইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। এই হাবি-জাবি গল্প: পাটের বাজার মন্দা হওয়ার কারণ—কাহার ছেলে বাবাকে অশ্রদ্ধা করে—কাহার গাছে সুন্দর সুন্দর বাতাবী লেবু হইয়াছিল। কিন্তু পাড়ার অখাদ্য ছোঁড়াদের জ্বালায় একটাও থাকে নাই—এবার কলিকাতায় গান্ধীমহারাজের খবর—এমন কি ভূমিকম্পের কথাটাও উঠিয়া পড়িল।...

এদিকটায় বসিয়াছিল মেয়েরা।

তাহাদের কথাবার্ত্তায় ভূপেন কান দেয় নাই। হঠাৎ কে যেন পিছন হইতে বলিল—ওগো ছেলে, শুনছো বাছা—

ছেলে পিছন ফিরিল—তাহারই দিকে একটি বৃদ্ধা চাহিয়া আছে।

বৃদ্ধা বলিল—বাছা, একটু সরো তো—দেখি, ওলো ও খুকি, কোথায় ফেললি চাবিটা—? কোথায় লো—ও খুকি?

খুকি কাছেই ছিল; বলিল—এই এখেনটায়—

ভূপেন যেখানে বসিয়াছিল খুকি সেইখানটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

ভূপেন বলিল—কী? হারিয়েছে কী?

—চাবি বাছা চাবি! চাবি নিয়ে কেউ খেলে—কেউ শুনেছ তোমরা?' এখন যদি না মেলে তা'লেই চিত্তির—সর্ব্বস্য ওই আমার চাবিতে; তোমার কপালে অনেক দ্যুখ্যু আছে মা, অনেক দ্যুখ্যু—বাপ্‌কে খেলে মাকে খেলে, এখন আমাকে খাও—আবার হাস্‌ছে—দেখ্‌ছো গা ছেলে—আবার হাস্‌ছে......সরম-ভরম কিছ্‌ছু নেই গা, ঝাঁটা খেয়ে মরবেন শশুর বাড়ীতে—দিন দিন গা-ভরা বয়েস হচ্ছে···আর···

গা-ভরা বয়স হইয়াছে কিনা তাহাই দেখিবার জন্য ভূপেন খুকিটির দিকে চাহিল; কিন্তু মেয়েটি তখন হাসিয়া কুটিকুটি হইবার জোগাড়—যেন এমন হাসির কথা সে জীবনে শোনে নাই।

বৃদ্ধা বলিল—অতো হাসি কিসের লা—অকম্মো করবে আবার হাসবে! মা নেই কিনা, তাই বিচ্ছি হয়েছে—থাক্‌তো সে, দিতো গুম্ গুম্ করে' কিল লাগিয়ে—অমন বয়েসে আমার বড় মেয়ে চারু হয়েছে—বল্ কোথায় ফেল্‌লি চাবি—জলে ফেলিস্ নি তো?···

জলে সে ফেলে নাই বলিল।

চারুর মা বলিল—ওগো ছেলে, তুমি একটু খোঁজ না বাছা, তোমাদের কাঁচা বয়েস, চোখ আছে, আমাদের চোখ গেছে তো ত্রিভুবন গেছে—ভোলার মা বলতো—ও চারুর মা, যা'র দাঁত নেই আর চোখ নেই তা'র বেঁচে থাকাই দুর্ভোগ,—ভোলার মা সগ্যে গেছে সিঁতের সিঁদুর হাতের হাতের নোয়া নিয়ে—আমার যেমন···ওই পোড়াকপালী...

পোড়াকপালীর কিন্তু তা'তে কিছু আসে যায় না।

লম্পটা একপাশে জ্বলিতেছিল; সেটা আনিয়া ভূপেন আশে পাশে খুঁজিতে লাগিল। পাটাতনের উপর গোটা কয়েক ফাঁক আছে তাহার ভিতর দিয়া নীচে পড়িতে পারে! কাছাকাছি যখন কোথাও পাওয়া গেল না—তখন নীচেই পাওয়া যাইবে। খোলের ভিতর ঢুকিবার যে-সামান্য একটু পথ ছিল—ভূপেন লম্পটা লইয়া তাহারই ভিতর নামিল। উপরে মেয়েটা তখনও খিল্ খিল করিয়া হাসিতেছে—নীচে হইতে সে-হাসির শব্দ ভূপেন শুনিতে পাইল! কিন্তু কোথায় চাবি! ভিতরে কাদা, ময়লা জল ছিল তাহাতে তাহার জামা কাপড় একাকার হইয়া গেল।···তাহার সারা দেহ গন্ধে ঘিন্ ঘিন্ করিতেছে—

উপর হইতে মুখ বাড়াইয়া চারুর মা বলিল—পেলে বাবা? পেলে?

কথা শুনিয়া ভূপেনের গা জ্বলিয়া গেল। কোথাকার কে একটা মেয়ে তাহার জন্ম এই মিথ্যা কর্ম্মভোগ! নাঃ—আর নয়। লম্প লইয়া ভূপেন উঠিয়া আসিল। বলিল—নাঃ পেলাম না—

চারুর মা শুনিয়া বলিল—আমি জানি ও মেয়ে আমাকে খাবে,...বাপকে খেয়েছে মা'কে খেয়েছে এখন আমাকে খাবে—না মা ছেলেপিলেতে কাজ নেই, পরম শত্তুরেরও যেন ছেলে না হয়—আমাদের গাঁয়ের হরিমতী বেশ আছে—কাচ্চাবাচ্চা নেই, তিথি করে' করে' বেড়াচ্ছে—আজ বিন্দাবন, কাল রামেশ্বর—উঃ চারু আমার কম শত্তুর ছিল?—নিজে মোল', মরে' আমায় মাল্লে গা—

ভূপেন বলিল—হাস্‌ছ যে?

মেয়েটি হাসিতে হাসিতে বলিল—তুমি যে ভূত সেজেছ!...

চারুর মা বাধা দিয়া বলিল—ওমা কোথায় যাবো—ভালো মানুষের ছেলেকে তুই ওই কথা বললি? বললি তুই ওই কথা?...এ মেয়ে বাপের ধারা পেয়েছে—ভদ্দর লোকের মুখ রেখে কথা কইতে শিখ্‌লিনি? আর কবে শিখবি? য়্যাদ্দিনে বিয়ে হ'লে যে...তা' তুমি কিছু মনে করনি বাছা—ও ওই ওম্‌নি ধারা—

মেয়েটি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—মিছি মিছি কেমন খাটালুম—জামা কাপড়ে জল-কাদা মাখালুম—চাবিতো হারাইওনি—ফেলেও দিইনি—এই দেখ লুকিয়ে রেখেছিলুম, এই দেখ—হি হি হি।

বলিয়া পেট-কাপড় হইতে মেয়েটি চাবি বাহির করিল। বলিল—এই দেখ, দেখ্‌লে—দেখ্‌লে তো?

দেখিয়া চারুর মা তো হতভম্ব হইয়া গিয়াছে—হ্যাঁলা, এই তোর পেটে এত বুদ্ধি? আমার চারু তো ও বয়েসে এত দুষ্টু ছিল না, এক-কথার মানুষ ছিল সে, যেটি বলিছি সেটি করেছে—বুঝলে বাছা—আমার আর কী বল না—আমি তো, দু'দিন বাদেই...বুঝবে ঠেলা শশুড়বাড়ী গিয়ে—

যা' হোক—চাবি পাওয়া গিয়াছে; চারুর মা নিশ্চিন্ত হইল।

বলিল—কোথায় বাড়ী বাছা তোমাদের?

—বাবুইঘাটা।

—বাবুইঘাটা, তবে তো আমাদেরই কাছে। এই বাবুইঘাটার কাছে নলডাঙা', ওখেনেই এক পাত্তরের সঙ্গে সম্মোন্দ হ'চ্ছে এই মেয়ের—তা' এ মেয়ে বলে কী শুনবে বাছা?—বলে বিয়ে কোরবোনি; বিয়ে করবিনে তো তবে কি হয়ে হ'বে—

মেয়েটি এবার রাগিয়া উঠিল। ধমক্ দিয়া বলিল—বলিল—তুমি থামো তো দিদ্‌মা—

তারপর ভূপেনের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার বাপু অতো খপরে দরকার কী—তুমি তো বেশ লোক—পরের ঘরের—

ভূপেন হয়ত ইহার একটা উত্তর দিত—কিন্তু ওদিকে তখন সকলে হঠাৎ 'সাপ' 'সাপ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। সাপ! আশ্চর্য্য কাণ্ড। এখন বর্ষাকাল—এখন স্রোতের টানে কত কী ভাসিয়া আসে—সাপ বিছা কত কী!

সাপের কথা শুনিয়া সকলেই সচকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। মেয়েদের দলে একটা বিষম গণ্ডগোল উঠিল। সকলেই সকলকে ঠেলিয়া পিছনের নিরাপদ স্থানে আসিতে চায়। সাপ সকলে দেখিতেও পাইল না—কিন্তু তা হোক্ সাপ যে নৌকায় উঠিয়া পড়িয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আশঙ্কায় মেয়ের দল তখন চঞ্চল। সমস্ত লোক নৌকার একদিকে আসিয়া জুটিল—

নৌকা সেই ভারে কাৎ হইয়া গেল—

কাৎ হইতেই জল উঠিল নৌকাতে এবং দেখিতে দেখিতে নৌকা ডুবিয়া গেল!...

কোথায় গেল চারুর মা—আর কোথায় গেল কে—চীৎকার কান্না মিলিয়া একটা সোর-গোল উঠিল—এবং দেখিতে দেখিতে তাহা মিলাইয়াও গেল। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার—আর সীমাহীন জল—চারিপাশে ঝপ্ ঝপ্ শব্দ হইতেছে —কিছুই দেখা যায় না। চোখের সম্মুখে কে যেন

একবার ভাসিয়া উঠিল—কাহার যেন মাথার চুল দেখা গেল—জলের তলায় তাহার পায়ে যেন কে স্পর্শ করিল।···দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির একটি কোণে কয়েকটি প্রাণী একটু নিশ্বাস ফেলিতে পাইবার আশায় জলের উপর প্রাণপণে দুই হাত বাড়াইয়া কোন্ অদৃশ্য শক্তির কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল। অস্পষ্ট আর ধূসর কয়েকটি মানুষের আকৃতি হাত ছুড়িয়া পা ছুড়িয়া এদিক ওদিক করিতেছে। সমস্তই বয়স্কর দল—সাঁতার জানিলেও সকলের শক্তিতে কুলায় না। মাঝি দু'টা কোথায় কোন দিকে গেল কে জানে—ভূপেন নিঃশব্দে তীর লক্ষ্য করিয়া সাঁতার কাটিতে লাগিল; কোন দিকে তীর কাছাকাছি তাহার ঠিক ছিল না—তবু গায়ে ছিল তা'র শক্তি—নিজেকে বাঁচাইবার প্রখর আগ্রহে ভূপেন জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে চলিল—

হঠাৎ কে যেন তাহাকে পিছন হইতে টানে। ভূপেনকে সে জোর করিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছে। প্রবল শক্তি দিয়া ভূপেন তাহাকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। দুই হাতে চুল ধরিয়া টানিতেই তাহার হাত ছাড়িয়া গেল; মুখের কাছে মুখ আনিতেই ভূপেন দেখিল সেই মেয়েটি!···

একবার মনে হইল তাহাকে দেয় ডুবাইয়া। যাক্ ডুবিয়া! কিন্তু কী যে হইল—ভূপেন তাহাকে ছাড়িল না—পরম রক্ষাকর্ত্তার মত অত্যন্ত সন্তর্পনে টানিয়া লইয়া চলিল।

সেদিনের সে ক্লান্তিকর পরিশ্রমের কথা আজ আর ভূপেনের স্পষ্ট মনে নাই। শুধু মনে আছে—জলের উপর জীবন-মরণের অমন দ্বন্দ্ব আর কখনও সে অনুভব করে নাই। একটু নিশ্বাস ফেলিবার জন্য সে কী ব্যাকুলতা—একটু ডাঙা পাইবার জন্য সে কী সুতীক্ষ্ণ আগ্রহ!

তারপর কখন তাহারা কোন এক চরে উঠিয়াছিল সে তাহারা জানে না!

প্রখর সূর্য্যের আলোতে যখন ভূপেনের জ্ঞান হইল তখন সে দেখিয়াছিল তাহারই পাশে ক্লান্তিতে অচৈতন্য একখানি অনাবৃত দেহ তাহার সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে। প্রথম প্রেমের মত সে দৃশ্য রোমাঞ্চকর। সেই সকাল বেলার শান্ত মন্থর মুহূর্ত্তগুলির ধীর পদক্ষেপের আবহাওয়ায়—দুটি মানুষের সেই পরম নিভৃততম অবসরে, সেই লোকালয়বর্জ্জিত প্রশান্ত আবেষ্টনীতে মেয়েটির সান্নিধ্যের নিবিড়তায় ভূপেনের সমস্ত ক্লান্তি সমস্ত ক্লেদ ধুইয়া মুছিয়া গেল! তাহার একান্ত কাছে একটি সম্পূর্ণাঙ্গ দেহ তাহারই চোখের উপর বিলম্বিত—মেয়েটিকে স্পর্শ করিয়া ভূপেন সেইদিকে চাহিয়া রহিল—

সত্য সত্যই তাহার বয়স হইয়াছে; বয়স যে হইয়াছে তাহা আর অস্বীকার করা যায় না!

কী জানি ভূপেনের সেদিন কী হইল! সেই পরিত্যক্ত চরে বসিয়া মেয়েটিকে তাহার বড় ভাল লাগিয়া গেল। বড় ভাল লাগিল তাহার মাথা-ভরা কালো চুলের সমারোহ—আর ভাল লাগিল সমস্ত অবয়বের সুগঠিত সম্পূর্ণতা—আর ভাল লাগিল দু'টি নিমীলিত চোখের অসঙ্কোচ নির্ভরশীলতা! এই মুহূর্ত্তে সে যেন তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে; তাহাকে দিয়া যেন তার এতটুকু ক্ষতি হইতে পারে না! কোথায় গেল ক্লান্তি—গত রাত্রের শ্রান্তিহীন পরিশ্রমের বেদনা—ভূপেনের দুই চোখ ভরিয়া অনপনেয় ক্ষুধা! ক্ষুধা-জর্জ্জর দুই চোখ দিয়া মেয়েটিকে দেখিতে লাগিল; তারপর কখন নিজেরই অজ্ঞাতে ভূপেনের মুখ নীচু হইয়া আসিল—নীচু হইয়া আসিল—আরো নীচু—

হটাৎ মেয়েটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে।

তবে এতক্ষণ ভাণ করিয়া ঘুমাইয়া ছিল নাকি! বিস্ময়ে ভূপেন হতবাক্ হইয়া গেল!···কাল রাত্রের ওই বিপদ, ওই অপমৃত্যুর সম্ভাব্যতা তাহাকে এতটুকু বিমর্ষ করিতে পারে নাই! নৌকার উপর দিদিমার স্নেহচ্ছায়ার আড়ালে কাল সে যেমন চঞ্চল মুখরা ছিল—আজ এখন এই পরিত্যক্ত অবস্থায় তাহার এতটুকু কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই।

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। সেদিন যতক্ষণ সেই চরে ভূপেন ছিল নিজেকে আর সে প্রশ্রয় দেয় নাই। নিজেকে সেদিন সে সংযত করিয়াছিল। যাহাকে সে নিজের শক্তিতে বাঁচাইয়াছে—নদীর কবল হইতে যাহাকে সে উদ্ধার করিয়াছে, তাহাকে সে আবার নিজেই গ্রাস করিতে পারিবে না।

সন্ধ্যাবেলার দিকে এক নৌকা আসিয়া তাহাদের উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল। সেদিন মেয়েটির হাতের উপর নজর

পড়িতেই ভূপেন দেখিয়াছিল কব্জির ঠিক উপরে ছুঁচ ফুটাইয়া চামড়ার উপর কালো রঙে নানা ফুল পাতা লতা আঁকা এবং তাহারই ভিতর লেখা রহিয়াছে 'রাধা।'

আজ এই কদর্য্য পল্লীর ভিতর আবার তাহাকেই যে দেখিবে এ-কল্পনা ভূপেন করিতে পারে নাই! চোখ তুলিয়া ভূপেন আর একবার মেয়েটির মুখের দিকে চাহিল; চাহিতেই মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছে!

সেই মুহূর্ত্তে ভূপেন চোখ ফিরাইয়া লইল। সেই মুখই অবিকল—কিন্তু অবিরত রাত্রি জাগরণ আর অমানুষিক অত্যাচারে বিকৃত। কলঙ্কময় দেহখানিতে সেদিনকার সেই সুগঠন ও সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহা একবার ভূপেনের দেখিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু আর নয়—! ভূপেন উঠিয়া পড়িয়া বলিল—গোবিন্দ চল—

রাত্রিতে আলো জ্বালিয়া ভূপেন সুষমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছে।···আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা জানাইয়া লিখিল :—

...সেদিন সে মেয়েটিকে উদ্ধার করে চারিদিক থেকে পেয়েছিলাম প্রশংসা আর বাহবা। আমাদের গ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট আমায় কত টাকার পুরস্কারও দিয়েছিলেন; নিজেরও আমার গর্ব্ব ছিল; অন্ততঃ একটা জীবন রক্ষা করার পুরস্কার পাবার যোগ্য আমি। আমি তা'কে বাঁচিয়েছিলাম—বাঁচিয়েছিলাম তা'র সম্মান, তার লজ্জা, তার নারীত্ব! কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সত্যি কি আমি শেষ পর্য্যন্ত তা'কে বাঁচাতে পেরেছি? কেন তা'কে সে দিন বাঁচালুম? আজ তো সে আর বেঁচে নেই—এ যে বাঁচাও নয়, মৃত্যুও নয়—অপমৃত্যু! সেদিন যা'কে আমি দিয়েছিলাম পরিপূর্ণ মর্য্যাদা—সে-মর্য্যাদার সে আজ অপমান করেছে! তাই ভাবি, মানুষের গর্ব্ব কত মিথ্যা! আজ সমস্তক্ষণ ধরে' এই ভাবনাই ভেবেছি—কেন সেদিন তা'কে বাঁচিয়েছিলাম? সেদিন তা'কে বাঁচিয়েছিলাম জল থেকে—আজ আবার বাঁচাতে এসেছি রোগ থেকে। বল তো সুষমা—এ আমার কত স্পর্দ্ধা। আমার এ স্পর্দ্ধা দেখে আমিই হাসি আজ! সত্যিই তো, আমি বাঁচাবার কে? আমি বাঁচাবার কে, বল তো সুষমা।

শ্রীবিমল মিত্র

আজি শরতের প্রাতে

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

আজি শরতের প্রাতে—
বৃষ্টিসিক্ত বসুন্ধরা—বাদল নেমেছে কাল রাতে।
আর্দ্র বায়ু বহে যায়—বুকে আনে শীত-শিহরণ
কি যেন রহস্য-ভরা—মনে হয় সকল ভুবন ;
মেঘে ঢাকা নীলাকাশ তার সেই ম্লান মৌন ছায়া
ছেয়েছে ধরার বুক, স্তব্ধতার সুগম্ভীর মায়া
ধীরে ধীরে ঘিরে আসে।
নাই আর পাখীর কাকলি
কোথা সে সোনার রোদ ? নিমেষে যে মিলাল সকলি,
কে জানে পরশ কার—মুছিয়া সে উজ্জ্বল মধুর
প্রকৃতির দৃশ্যপট, করে দিল করুণ বিধুর,
শরতের প্রাতে—
বরষা দাঁড়াল এসে—আর্দ্র-পুষ্প ভরি' দুটি' হাতে !

আমি ভালবাসি—
এই আলো—এই ছায়া, হাসি অশ্রু দু'টি পাশাপাশি,
কাল ভালো লেগেছিল ধরণীর আনন্দ বারতা
ফুলে ফুলে কোলাকুলি—বাতাসের চুপি চুপি কথা—
আলোকের নৃত্যলীলা, প্রকৃতির হরষ বিলাস
মাথার উপরে সেই—উদার উন্মুক্ত নীলাকাশ
কাল ভালো লেগেছিল।
আজ এই বিরাম বিহীন—
বাতাসের তালে তালে টিপি টিপি বৃষ্টি সারাদিন,
ধরা যেন নিদ্রাতুরা—নাই আর কল কলরব
সহসা থামিয়া গেছে জগতের আনন্দ উৎসব
এও আজ ভালো লাগে ,—
এ যেন রে উৎসবের শেষে
পরিশ্রান্ত বসুন্ধরা এলাইয়া পড়েছে আলসে !

মধুপর্ক

শ্রীআশীষগুপ্ত

সাতফুট দীর্ঘ এক্স্-রে চিত্র

বহু পরীক্ষার পর এ্যামেরিকার ফীল্ড মিউজিয়াম অভ্ ন্যাচার‍্যাল হিষ্ট্রীতে যে এক্স-রে চিত্র গ্রহণ করা হ'য়েছে,



পৃথিবীর বৃহত্তম এক্স্-রে চিত্র

তাকে পৃথিবীর এই ধরণের বৃহত্তম চিত্র বলা যেতে পারে। এই বৃহৎ আকারের চিত্রের বিষয়বস্তু মিউজিয়মে রক্ষিত একটি পূর্ণবয়স্ক মামি এবং যে ফিল্মের উপরে এই ছবি তোলা হ'য়েছে তার আয়তন দৈর্ঘ্যে সাত ফুট এবং প্রস্থে

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

দু' ফুট। একটিমাত্র ফিল্মের উপরে একবারমাত্র এক্স্পোজার দিয়ে এত বড় ছবি তোলার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে এই প্রথম। ছবির সমস্ত রেখাই অতিশয় পরিষ্কার উঠেছে এবং আবয়বিক ও অন্যান্য বিষয়ে চিত্রের সকল অংশই স্পষ্ট,—এর দ্বারা রোগীদের রোগনির্ণয়ে এবং চিকিৎসাকার্য্যে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য হ'বে ব'লে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এ পর্য্যন্ত মামির এক্স-রে ছবি তুলতে গেলে, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে তুলতে হ'ত, ১৪″×১৭″ সাইজের ফিল্মের উপরে। তারপরে এই ফিল্মগুলো জুড়ে গোটা মূর্ত্তিটা পাওয়া যেত এবং যথারীতি বিচারকার্য্য চল্‌ত। এতবড় একটা ফিল্মের উপরে একবারেই ছবি তুল্‌তে পারার সুবিধা হচ্ছে এই যে কাজ ঢের বেশী নির্ভুল হয় এবং পরিশ্রমও অনেক কমে।

রসায়নাগারে প্রস্তুত বায়ু

লাভোয়াজিয়ের সময় থেকেই বায়ুর অন্তর্গত অক্সিজেন আমাদের জীবনধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান বলে পরিগণিত হ'য়ে আস্‌ছে। অক্সিজেন ব্যতীত বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য গ্যাসগুলির পরিমাণ হচ্ছে একশ ভাগের মধ্যে ৭৯ ভাগ। এই সব ভাগের কিছু কিছু তারতম্য করলে প্রাণীজগতের উপর তার ফল কিরকম দাঁড়ায় তা দেখ্‌বার জন্য অনেক দিন ধরে পরীক্ষাকার্য্য চল্‌ছিল,—অবশেষে রসায়নাগারে নানা প্রকারের বায়ু প্রস্তুত ক'রে জীবজন্তুর উপরে তাদের প্রভাবের ফলাফল এতদিন জান্‌তে পারা গিয়েছে।

বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তুর উপরে গুটি ত্রিশেক পরীক্ষার ফলে প্রতিপন্ন হ'য়েছে যে অন্যান্য সকল. অবস্থা স্বাভাবিক

থাকলে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের আবহাওয়ায় দুইদিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যেই জীবনধারণ অসম্ভব হয়।—যদি কোনও জন্তুজানোয়ারকে শুধু অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন সমন্বিত বায়ুমণ্ডলের ভিতর রাখা যায়, অর্থাৎ যে বায়ুর মধ্যে কার্ব্বন ডায়ক্সাইড হেলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপ্‌টন জিনন প্রভৃতি নেই তেমনিতর বায়ুর মধ্যে পুরে রাখা যায়, তা'হলে অত্যল্প



অক্সিজেন এবং অন্যান্য গ্যাসের সাহায্যে
রসায়নাগারে প্রস্তুত বায়ুপূর্ণ কাঁচের বোতলের ভিতরে হৃষ্টপুষ্ট বিড়াল ছানা

কালের ভিতরেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হ'বে। অপর পক্ষে দেখা গিয়েছে যে শতকরা ৭৯ ভাগ হেলিয়াম এবং ২১ ভাগ অক্সিজেন সহযোগে প্রস্তুত বায়ুর মধ্যে জীবজন্তু স্বাভাবিকভাবে এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে উৎকৃষ্টতর ভাবে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু হেলিয়ামের পরিবর্ত্তে আর্গন ব্যবহার ক'রে এবং ভাগের অনুপাত ঠিক রেখে দেখা গিয়েছে যে জন্তুগুলো এর মধ্যে জীবিত থাকতে পারে না।

নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বিভিন্ন অনুপাতে সংমিশ্রিত করে প্রমাণিত হ'য়েছে যে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৫০ থেকে ৬০ ভাগ অক্সিজেন থাকলে তার ভিতরে জীবজন্তু স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বসবাস করার চেয়ে বেশী আরামে থাকে।

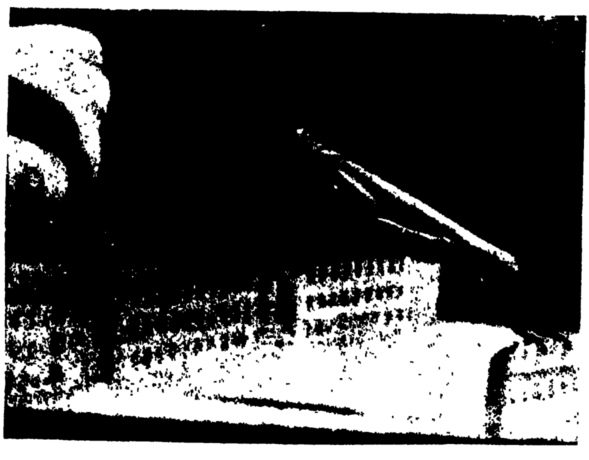
এই সব পরীক্ষাকার্য্যের দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ ব্যবহারিক জীবনের সুখসুবিধার সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত হ'ল। ডুবুরি, সাবমেরিণের নাবিক, খনির শ্রমিক, কল কারখানার কর্ম্মচারী, এরোপ্লেনের আরোহী প্রত্যেকের যে এতে কত উপকার হ'বে তা ব'লে শেষ করা যায় না। বিশেষ ক'রে চিকিৎসাশাস্ত্রে এই সব পরীক্ষাকার্য্যের ফল প্রথম শ্রেণীর বলে পরিগণিত হ'বে।

ষট্‌পদ-সার্কাস

হাতী-ঘোড়ার সার্কাস্ সবাই দেখেছেন, কিন্তু পোকার সার্কাস্ কেউ কখনও দেখেছেন কি? ফড়িং আর গুবরে



ষট্‌পদ সার্কাসের মালিক ও শিক্ষক। পৃথিবীতে একমাত্র ইনিই এমন অদ্ভুত খেলা দেখাতে পারেন। ছবিতে দেখুন তিনি একটি প্রজাপতিকে খেলা শেখাচ্ছেন

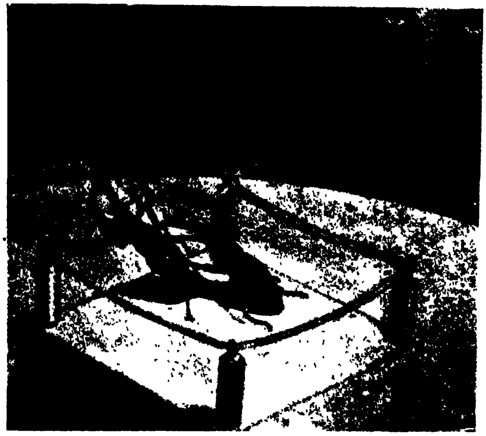


ঘাস-ফড়িং শুধু লাফাতেই জানে। তাই সে রেসের ঘোড়ার মত বেড়া লাফিয়ে যাওয়াই শিখেছে

পোকা-এরা যে সার্কাস্ করতে পারে, এ কথা কে জানত? কিন্তু স্পেনদেশবাসী একটি লোক সার্কাস্ দেখিয়ে সকলকে



গুব্‌রে পোকার মল্লযুদ্ধ। এত জোরে এরা পরস্পরকে কামড়ে ধরে যে ছাড়াতে রীতিমত বেগ পেতে হয়



ফড়িং-ঘোড়ায় গুব্‌রে সওয়ার। গুব্‌রেকে পিঠে নিয়ে ফড়িং লাফিয়ে চলে আর গুব্‌রে সোজা হ'য়ে বসে থাকে পাকা সওয়ারের মতন

অবাক্ করে দিয়েছেন। পৃথিবীতে পোকার সার্কাস্ এই একটিমাত্র ও এই লোকটি ছাড়া কেউ আর এ খেলা দেখাতে পারে না।

জলে সোণা

মহাসাগর গুলির জলে যত সোণার কণিকা মেশান আছে, সব যদি উদ্ধার করে ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে পৃথিবীর প্রত্যেক অধিবাসীর ভাগে সাতশ' আউন্স করে পড়বে আর তার দাম হবে প্রায় ৬০ হাজার টাকা—রাতারাতি বড়লোক আর কি! এ কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয় কারণ বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে সমুদ্রগুলির জল থেকে একশ' চল্লিশ কোটি আউন্স সোণা পাওয়া যেতে পারে।

এখন পর্য্যন্ত কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই করা হয় নি কারণ কোটি কোটি ও আরও কটি কটি মণ জল থেকে মাত্র এতটুকু সোণার গুঁড়ো পাওয়া যাবে যে তাকে দেখতে হলে অণুবীক্ষণের সাহায্য নিতে হবে। যদিও রত্নাকরের জলে সোণার গুঁড়ো মেশান আছে সত্যি কিন্তু তাকে উদ্ধার করতে এত খরচ হবে যে পণ্ডিতেরা হিসাব করে সাফল্যের বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

স্বজাতি-ভোজন

মাত্র কিছুদিন হল লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় কুড়িটী হল্‌দে-কালো-ডোরা কাটা বিষধর সাপ আনান হয়েছে। প্রত্যেকটির দাম ৭৫৲ টাকা। এ খবরে অবশ্য অবাক হবার কিছুই নাই কিন্তু সাপগুলি কেন আনান হয়েছে শুনলে অবাক হতেই হবে। মালয় দেশের ১২ ফুট দীর্ঘ "কেউটে সম্রাট্" খাবেন বলে এই সাপগুলির আমদানী। বলা বাহুল্য যে "কেউটে-সম্রাট্" অতীব বিষধর। স্বজাতি ছাড়া তিনি অন্য কিছুই ভোজন করেন না এবং তা-ও আবার যত বিষধর স্বজাতি হয় ততই সুস্বাদু। ছয়টি সাধারণ কেউটে গলাধঃকরণ করলে কিছুদিনের মতন তাঁর জঠরানলের শান্তি হয়।

ন্যায্য বিচার

রামবাবুর ধারণা শ্যামবাবুর বিরুদ্ধে নালিশ করলেই ডিক্রী হবে। কিন্তু উকীল বন্ধুটি সব কথা শুনে পরামর্শ দিলেন যে নালিশ না করাই বোধ হয় ভালো। জয় হবে কি না সন্দেহ, হয় ত উল্টা বিপত্তিও ঘটতে পারে।

রামবাবু সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, "জজ্ সাহেবকে একটা ডালি পাঠিয়ে দেবো?"

উত্তর হল, "সর্ব্বনাশ! তা'হলে ত হেরে যাবেই।"

একটু ভেবে রামবাবু বললেন যে ফলাফল যা-ই হোক্ তিনি মোকদ্দমা করবেনই।

হাকিমের রায়ে শ্যামবাবুর হার হল। বিস্মিত হয়ে উকীল বন্ধু রামবাবুকে বললেন, "তুমি জজ্ সাহেবকে ডালি পাঠিয়েছিলে নাকি?"

শান্তস্বরে উত্তর হল, "হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু আমার নামে নয়, শ্যামবাবুর নামে।"

কত দেরী?

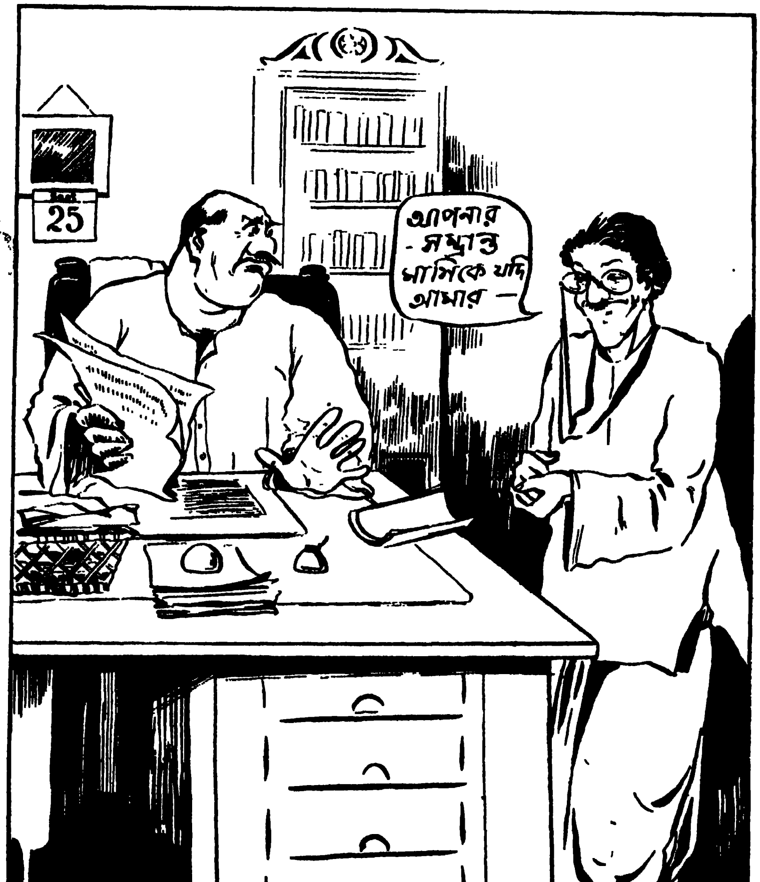
প্রৌঢ় প্রোফেসার—খোকা, তোর মাকে জিজ্ঞেস্ কর তৈরী হতে আর কত দেরী। ওদিকে দেরী হয়ে যাবে যে।

তরুণী গৃহিণী (মুখে হিমানীর প্রলেপ দিতে দিতে, সঝঙ্কারে)—আধঘণ্টা ধরে বলছি আর দু' মিনিটেই যাচ্ছি তা' বাবুর আর তর্ সইছে না।

কল নয়, কান

একজন মোটর গাড়ীর আরোহী গাড়ীখানির তলদেশ হ'তে বের হ'য়ে হাঁপাতে লাগ্‌লেন। তাঁর বন্ধুটি একটি তেলের ডিবে হাতে নিয়ে কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি তার মুখখানি সুপ্রসন্ন করে' বল্‌লেন, "আমি কলে খুব তেল দিয়ে দিয়েছি।"

আরোহী মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে বলে' উঠ্‌লেন, "কলেই তেল দিয়েছ বটে! যেটা কল মনে করেছ, সেটা কল নয়, আমার কান।"



সম্পাদক ও লেখক

হাতে-হাতে প্রমাণ

স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তা বক্তৃতা করছিলেন, "জিম্‌ন্যাষ্টিক করলে স্বাস্থ্য যেমন ভালো থাকে এমন আর কিছুতেই থাকে না, ওতে লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, আয়ু বাড়ে, আর—"

একজন শ্রোতা, বক্তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ত জিম্‌ন্যাষ্টিক করতেন না, তবু—"

বাধা দিয়ে বক্তা বললেন, "হ্যাঁ, তা সত্যি, আর তার ফলে কি হ'য়েছে ? তাঁরা মারা পড়েছেন, একজনও বেঁচে নেই !"

কুকুর এবং তার লাইসেন্স

বিচারক—তুমি তাহ'লে কিছুতেই তোমার কুকুরের লাইসেন্স্ নূতন করে' করাবে না ?

প্রতিবাদী—না, করাব না।

বিচারক—আচ্ছা, দাঁড়াও—দেখ্‌ছি—

প্রতিবাদী—আপনি কি মনে করেন, আমি—

বিচারক—সাবধান, আমাকে সম্বোধন করে' তুমি কিছু বলবে না,—কেবল আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। কুকুরের লাইসেন্সের তারিখ যে শেষ হ'য়ে গিয়েছে, তা কি তুমি অস্বীকার কর ?

প্রতিবাদী—না হুজুর, কিন্তু কুকুরটাও যে এদিকে আজ তিন মাস হ'ল শেষ হ'য়েছে।—



দুই বৎসর পরে—লেখক ও সম্পাদক

শিল্পী শ্রীনির্ম্মল গুহ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



শ্রীনির্ম্মল গুহ

আজ যে চিত্র-শিল্পীর পরিচয় আমাদের পাঠকবর্গের নিকট দিতে আমরা উদ্যত হয়েচি বাঙলা দেশের শিল্প-আসরে তিনি এখনও তেমন সুপরিচিত নন। এর প্রধান কারণ, লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে এবং নিজের শিল্প-সৃষ্টিকে লুকিয়ে রাখবার ক্ষমতা তাঁর বিশেষ ভাবে আছে। জনৈক হিতকামী শিল্পীবন্ধু (শ্রীযুক্ত চৈৎন্যদেব চট্টোপাধ্যায়) যদি নির্ম্মল বাবুকে তাঁর নিভৃত গুহা থেকে টেনে বার না করতেন তা হ'লে অন্তত মাসিক পত্রিকা দিয়ে তাঁর শিল্প সৃষ্টির প্রচারে আরও বিলম্ব ঘটত। শিল্পীদের মধ্যে নির্ম্মল বাবু অপরিচিত নন, কিন্তু সাধারণে তাঁর পরিচয়ের যথেষ্ট অভাব আছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

নির্ম্মল গুহর বয়ক্রম বছর ত্রিশের বেশী নয়। ইনি শ্যামবাজারের সুবিখ্যাত গুহ বংশ জাত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে নির্ম্মল বাবু শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিণ্টাল আর্টে প্রসিদ্ধ শিল্পী



অপ্সরা নৃত্য



হর-পার্ব্বতী

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট কয়েক বৎসর শিক্ষালাভ করেন। এখন তিনি স্বাধীন ভাবে শিল্প-সাধনায় নিরত আছেন।

বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক ডাঃ কাজিন্স্ (Dr. Cousins) নির্ম্মল বাবুর চিত্রের এবং প্রতিভার পৃষ্ঠপোষক। ইনি ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় নির্ম্মল বাবুর অঙ্কিত অনেক গুলি চিত্র বিক্রয় করে দিয়েছেন। বহু ভারতীয় নৃপতি তাঁদের চিত্র শালায় নির্ম্মল বাবুর চিত্র সমাদরে রক্ষা করেছেন।

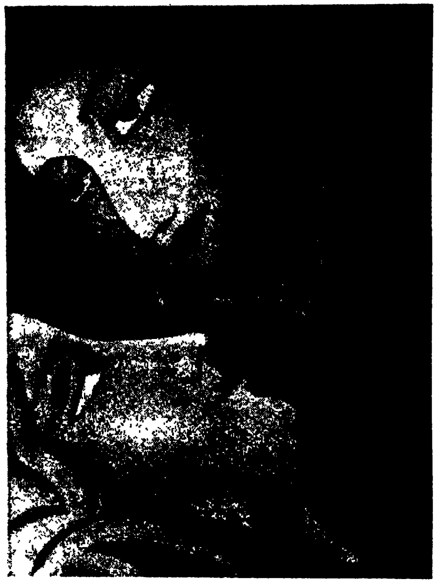
নির্ম্মল বাবুর অঙ্কন পদ্ধতির মধ্যে তাঁর স্বকীয়তা বহুল পরিমাণে আছে নিঃসন্দেহে তা বলা যেতে পারে। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রভাব তাঁর চিত্রের মধ্যে নেই, একথা বলা ভুল; কিন্তু ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রভাব তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি, একথা বলা আরও বেশী ভুল। তাঁর মূল চিত্রগুলি যাঁরা ভাল ক'রে পর্য্যবেক্ষণ করবেন তাঁরা সেগুলির মধ্যে একটি আত্মসমাহিত সাধকের নিষ্ঠার পরিচয় নিশ্চয় পাবেন। গত আশ্বিন মাসের বিচিত্রায় দিবাস্বপ্ন নামে নির্ম্মল বাবুর একটি রঙিন ছবি আমরা প্রকাশিত করেছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় বিচিত্রায় তাঁর আর একটি রঙিন এবং আট খানি একবর্ণ প্রতিলিপি-চিত্র প্রকাশিত হ'ল। মূল এবং প্রতিলিপি-চিত্র মিলিয়ে দেখবার যাঁদের সুযোগ হয়েচে তাঁরা জানেন প্রতিলিপি-চিত্রে মূলের কতখানি মূল্য কমে গিয়ে থাকে। তথাপি এ ছবিগুলি দেখে বিচিত্রার



জন্ম ও মৃত্যু



নটরাজ (স্থির)



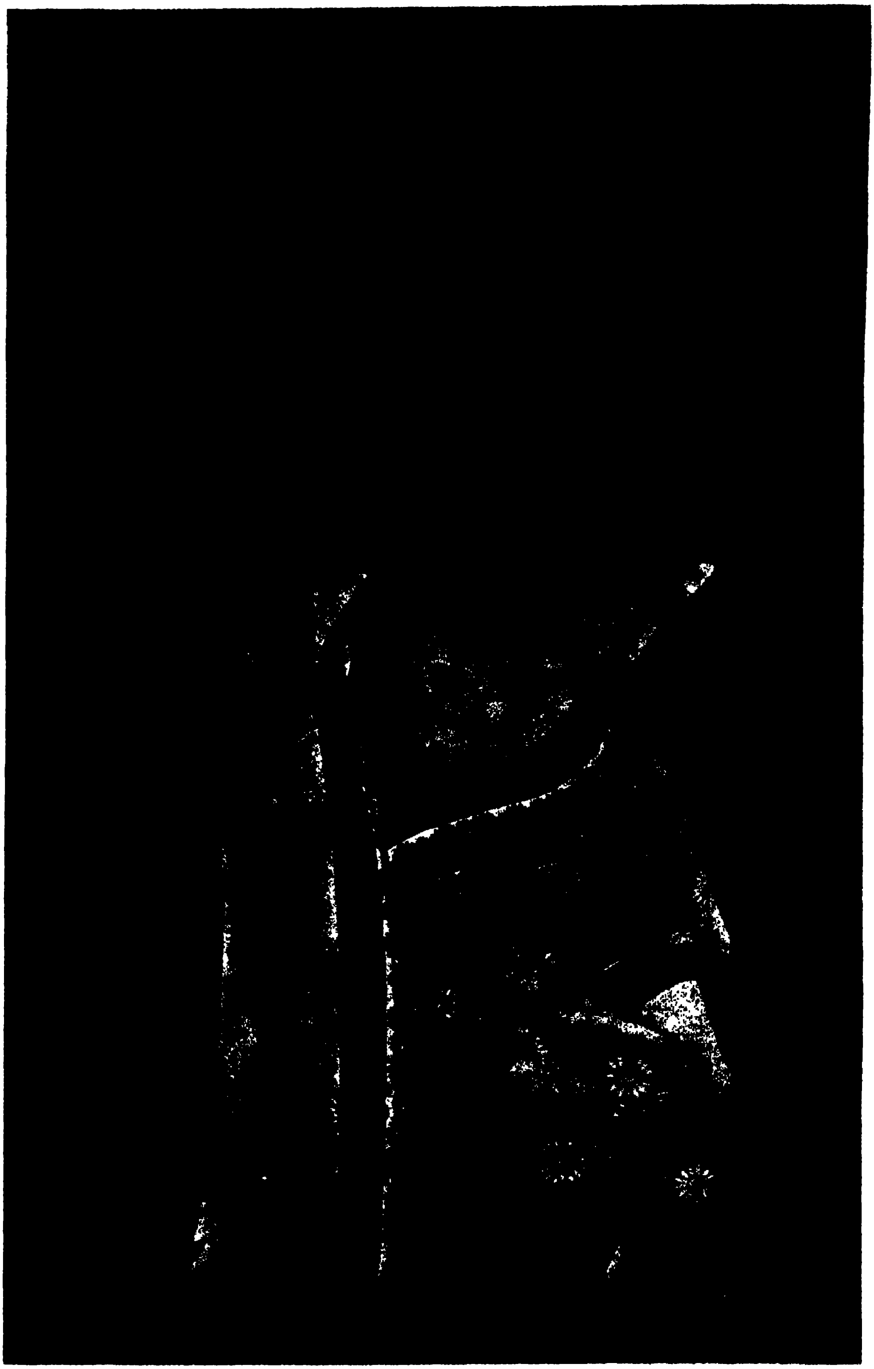
পুরুষ-প্রকৃতি



চিত্রাঙ্গদা

পাঠকেরা নির্ম্মল বাবুর শিল্পী-প্রতিভার অনেকটা পরিচয় পাবেন, তা' আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

নির্ম্মল বাবু যে অনতিবিলম্বে আমাদের দেশের চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবেন, এ ভবিষ্যৎ-বাণী ক'রে রাখলাম। এই স্থির ধীর শান্ত মিষ্ট-প্রকৃতি লোকটির মধ্যে যে অবিচল শিল্প-নিষ্ঠা আছে, তা কখনই অসফল হবে না।



বিচিত্রা
কার্ত্তিক, ১৩৪১

চিন্তাবগাহন

শিল্পী
শ্রীনির্ম্মল গুহ

শর-সন্ধান

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

বৌদি ঠাট্টা করিয়া বলে, এমন টুকটুকে রাঙা বৌটি আনবো তোর জন্যে……

পুলক জবাব দেয়, হ্যাঁ বৌদি, খুব রাঙা দেখে কিন্তু, তোমার চাইতেও যেন ·····

দূর হতভাগা! বৌয়ের কথা উঠলে অমন ক'রে কথা কয় বুঝি?—বলিয়া অসীমা হাসিতে থাকে। পুলক সবিস্ময়ে অসীমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। বউ জিনিষটা যে কিরূপ পদার্থ তাহা এখনও সম্যক বুঝিয়া ওঠার বয়স পুলকের হয় নাই। কিন্তু লোভনীয় বস্তু যে সে ধারণা বৌদির ঠাট্টায় অল্প দিনেই তাহার জন্মিয়াছে।

অসীমা তাহার বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চাহিয়া শেষে বলে, এমন ক'রে চেয়ে আছিল্ যে! বাপ্‌রে তোর বউ এলে যে তুই কি হ'বি পুলক, আমি কেবল তাই ভাবি।

বাহিরের দরজাটা একটা আচম্‌কা ধাক্কায় খুলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর কচি ছোট মুখ দেখা যায়। মুখে সে কি উচ্ছ্বাস দুষ্টামি! যেন মূর্ত্তিমতী কালবৈশাখী! ফিক করিয়া একটু হাসিয়া আসিয়া অসীমার পায়ের কাছ হইতে এক ধাক্কায় পুলককে দূরে সরাইয়া দিয়া তাঁহার স্থানটি দখল করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে, যাও, ভাগ' এখান থেকে, তুমি যে পুরুষ। তারপরে কোচড়ের ভিতর হইতে একটা চুল-বাঁধার কাল ফিতা ও একটি 'পতি পরম গুরু' মার্কা চিরুণি বাহির করিয়া বলে, এইবার চুল বেঁধে দাও দিকি বৌদি।

পুলক দিনে এমন বহুবার শোভার কাছে পরাজয় স্বীকার করে। কারণ, ও মেয়েটার কথাবার্ত্তাই কেমন নূতন ধরণের। পাড়ায় শিপ্রা আছে, বনানী আছে, আরতি আছে, লেখা আছে,—তাহারা তাহার সমবয়সী হইলেও কথা বলায় অমন নূতন ধরণ তাহাদের কাহারও জানা নাই। অত কথা ও শেখেই বা কোথা হইতে? এই সামান্য একটি প্রশ্নে সে পুলকের কাছে সর্ব্বদা জয়ী হইয়া আছে।

কাজে কাজেই পুলক নিশ্চুপ হইয়া যেখানটিতে শোভা তাহাকে ঠেলিয়া বসাইয়া দেয় সেখানেই বসিয়া থাকে।

অসীমা বলে, হ্যাঁ, পুলকতো পুরুষ। কিন্তু তুই যে ওকে গায়ের জোরে সরাতে যাস্; তুই কি পারিস্ ওর সঙ্গে জোরে?

পারি না আবার!—বলিয়া শোভা কালবৈশাখীর মত বিজয়ী হাসি হাসে। তারপরে বলে, বৌদি, নারী পারে না আবার!...না থাক, পুলকদার কি রকম মুখ চোখ শুকিয়ে গেচে বৌদি। শেষে, কেঁদে ফেলুক আর কি!

অসীমা শোভার কথার ধরণে না হাসিয়া পারে না। পুলক কিন্তু লজ্জায় তখন কি এক রকম হইয়া যায়। শোভা অসীমাকে হাসিতে দেখিয়া বলে, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বৌদি? এই তো সেদিন পুলক-দা' তোমাদের কাঁচা-মিঠে আমগাছটা থেকে আম পাড়ছিল। ভাল কথায় বল্লাম, আমাকে দুটো আম দাও পুলক-দা'। উত্তরে বল্লে, যা, ভাগ্, ভাগ্! ব্যস, যেই না গাছ থেকে নামা আর অমনি দু'গালে দুই চড় মেরে সব আম কেড়ে নিয়ে চ'লে গেলাম সোজা বাড়ী। তখন একটি কথাও বীরপুরুষের মুখ দিয়ে বেরুলো না।···কেমন পুলক-দা'? সেদিন বাড়ী ফিরে খুব কেঁদে ছিলে তো তারপর?

পুলক তৎক্ষণে উঠিয়া যায়।

শোভা বলে, এম্‌নি 'পুরুষ' পুলক-দা' আমাদের।

অসীমা শোভার দুই গাল সাহ্লাদে টিপিয়া দিয়া বলে, তুই তো আচ্ছা নারী বটে!

কিন্তু এই শোভাকেই পুলকের বউ করা চাই। অসীমার হৃদয়ের একান্ত বাসনা তাই।

শোভা অত্যন্ত ক্লান্ত। তবু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলে, বৌদি, পুলক-দা' কোথায়? এখনও বাড়ী আসেনি বুঝি?

—না, কেন?

শোভা দম লইয়া বলে, একটা ভীষণ মজা হয়েচে বৌদি। তারপরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে থাকে। যেন বলার—চাইতে হাসিয়া তাহা বোঝান' যায় আরও ভাল।

অসীমা বলে, তুই যে হেসেই কুটপাট্। বলি, ব্যাপারটা কি শুনি আগে?

শোভা অতি কষ্টে হাসি সংবরণ করিয়া বলে, কি জান' বৌদি। আজ খুব ভোরে তোমাদের বাগানে ফুল তুলতে এসে দেখি, পুলক-দা' সেখানে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে। একটা, কি দু'টো ফুল সবে তুলেচি এমন সময় এসে বল্লে, সেদিন বৌদির কাছে আমাকে কেন অপমান করা হ'য়েছিল? আমি বল্লাম, বেশ ক'রেচি। অমনি খাপ্পা হ'য়ে গিয়ে বল্লে, এখন যদি ধ'রে মারি? আমিও বল্লাম, মেরেই দেখনা! গায়ে হাতটি ঠেকিয়েই একবার দেখ' না! বল্লে, না, তোকে মারতে কেমন যেন মায়া হয়। তুই ভারী সুন্দরী কিনা। আমি বল্লাম, তার চেয়ে বল' যে সাহসে কুলোচ্ছে না। কি?—ব'লে তো খুব বীর দর্পে এগিয়ে এলেন, ব্যস্ তারপরেই ঠাণ্ডা একেবারে। কুস্তীতে পর্য্যন্ত পারলে না। সেই লজ্জায় হয়তো এখনও বাড়ী ফেরেনি।

অসীমা বলে, বলিস্ কি শোভা?

শোভা উত্তরে কিছু না বলিয়া মল্লক্রীড়া কালে সে যেমন করিয়া কাপড় কোমরে জড়াইয়াছিল ঠিক তেমন করিয়া জড়াইয়া বলে, এই তো এমন ক'রে ধরেই দিলাম এক ল্যাং মেরে চিৎ ক'রে ফেলে। এক মিনিটও লাগে নি। আহা! বেচারার মুখ চুপ একেবারে!

—বা-প্-রে কি মেয়ে তুই শোভা।

পুলক সেদিন বাড়ী ফেরে অনেক বেলায়। অসীমা তাহার মুখের চেহারাটা একবার তাহার অলক্ষিতে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া শোভার আগমন-বার্ত্তা ও জয়-ঘোষণা কিছুমাত্র বুঝিতে না দিয়া স্নানাহার শেষ হইলে পর বলে, পুলক, তোর রাঙাবৌ যদি ভয়ানক ডাংপিটে হয় তো তুই কি করিস্, শুনি?

পুলক বৌদির ইঙ্গিতটা যত প্রচ্ছন্নই হউক না কেন, কিছু যেন তাহার তবু বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহাই যদি হয় তবে সে সত্যই সেক্ষেত্রে কি করে? আজ সমস্ত দিন তো সে শোভার কাছে এই যে পরাজয়ের গ্লানি তাহা কেমন করিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে তাহাই ভাবিয়াছে। শুধু ভাবিয়াছেই, কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। শোভা কথায়, শক্তিতে, রূপে…প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে অপরাজেয়। কিন্তু তাহাকে পরাজয়ের গ্লানিতে দগ্ধ করিতে না পারিলে পুলকের জীবনধারণেরই যেন কোন অর্থ হয় না।

অসীমার প্রশ্নের উত্তর কিছুই সে কিন্তু দিতে পারে না।

পাশের ঘর হইতে শোভা সহসা চীৎকার করিয়া ডাকে, ও বৌদি, শুনচো? আমি যে অনেকক্ষণ থেকে তোমার জন্তে এসে ব'সে আছি। শীগ্‌গির এসো একবার এদিকে।

অসীমা বলে, তা মুখপুড়ি, এখানে আসতে তোমার হয়েচে কি? এ ঘরে তোমার কোন্ ভাসুরটা আছে শুনি?

—তা না থাক্, তবু আমি ওখানে যেতে পারবো না। এসো শীগ্‌গির।

পুলক হঠাৎ যেন শোভাকে জব্দ করার একটা উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া বলে, তুমি যেওনা বৌদি। আমার পড়াটা তোমাকে এখুনি ব'লে দিতে হবে।

শোভা তাহা শুনিতে পাইয়া তেমনি চীৎকার করিয়া আবার বলে, বৌদি, তার চেয়ে পুলকদা'কে একটু ডাম্বেল ভাজতে শেখাও। গায়ে ওর একেবারে জোর নেই, পাড়ার মেয়েরা পর্য্যন্ত ধ'রে ধ'রে ঠেঙায় ওকে।

তারপরে একটু চাপা হাসি উচু করিয়াই হাসে।

অসীমাও হাসে। পুলক এতবড় অপমান তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া সহ্য করে, কিন্তু বিচলিত না হইয়াও কেন জানি পারো না।

অসীমা শোভাকে উদ্দেশ করিয়া বলে, এই মুখপুড়ি! থাম্ এখন। তারপরে পুলককে বলে, তুইও কি বলতো পুলক, ঐ একরত্তি মেয়েটার মুখ বন্ধ ক'রে দিতে পারিস্ না?

হয়তো পারে।—মনে হয়। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও সে পথ আবিষ্কার করিতে পারে না। একবার মনে হয়,……ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! পুরুষ আর নারী…… শোভাইতো সেদিন তাহাকে জয়টীকা কপালে পরাইয়া গেছে। সমস্তা একরকম মেটে, কিন্তু সঙ্কোচ কাটে না যে।

শোভা আচম্কা আসিয়া বলে, বৌদি কোথায় পুলকদা' ?

তার আমি কি জানি!—বলিয়া পুলক রঙীন্ ছুরিটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া হাতের আমটা কাটিতেই অতি-বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

শোভা তাহা লক্ষ্য করিয়াই বলে, যাক্‌গে,' যেথায়—খুশী তার মরুক্‌গে'! পুলকদা', অত আম তুমি একলা খাবে?

—হুঁ, তা খাব' বৈ কি!

—আমি যদি ভাগ বসাই?

পুলক হঠাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া বলে, রোজ রোজ ইয়ারকি! একবার ছুঁয়ে দেখ্ দিকি। আজ আর কিছু কেয়ার করবো না, এই ছুরি দিয়ে আজ রক্তগঙ্গা বইয়ে না দি' তো আমার নাম নেই। তোমার সুন্দুরীপনা আজ ঘুচিয়ে তবে আমার নাম।

পুলকের 'সুন্দুরীপনা' কথাটার কি যে অর্থ তা শোভা ঠিক না বুঝিলেও তাহার হাসির পক্ষে ঐ কথাটাই যথেষ্ট। পুলকের দুর্ব্বলতা হয়তো ওখানেই। কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই তাই সে কেমন যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়ে। সে লজ্জা ঢাকিবার জন্যই যেন আমগুলি হইতে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলে, হাসি তোমার আমি একেবারে জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব', একবার ছুঁয়েই দেখ' না।

শোভা আমগুলির আরও কাছে আসিয়া বলে, সত্যি? আচ্ছা, এইতো ছুঁলাম।—বলিয়াই সে গোটা দুই আম সত্যই তুলিয়া নেয়।

পুলক ভীষণভাবে চীৎকার করিয়া আগাইয়া আসিয়া বলে, এখনও ভাল'য় ভাল'য় রাখ্ বলছি। এখনও রাখ্।

নইলে খেয়ে ফেল্‌বে নাকি?—বলিয়া ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া শোভা আম দুইটি হাতে একছুটে পলাইয়া যায়।

বাহিরে মধ্যাহ্ন তখন ঝিমাইয়া আসিয়াছে। আর সে পূর্ব্বের অগ্নিচাহনি তাহার নাই। পুলক সেই হারা-চাহনি চোখে তুলিয়া লইয়া শোভার পিছু পিছু তাহাকে ধাওয়া করে।

শোভা ছুটিতে ছুটিতে বাগানের একটা বেড়ার কাছে আসিয়া আটকা পড়িয়া যায়। পুলক এক ছুটে আসিয়া তাহার একটা হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলে, আজ তোকে খুন ক'রে তবে আমার তৃপ্তি।

সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা উঁচাইয়া ধরে। শোভা কিন্তু তথাপি তেমনি দুষ্টামির হাসি হাসে। পুলকের সহসা কেমন মনে হয়, সে যেন অভিনয় করিতেছে। ভুলিয়া যাওয়া পার্টটা মনে পড়িয়া যাইতেই যেন সে বলিয়া ওঠে, শয়তানি! ভগবানের নাম স্মরণ কর'।……

পুলক তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে একরকম বেড়াটার উপরেই নিয়া ফেলে। শোভা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দিব্য হাসিতে হাসিতেই বলে, আমি কেন স্মরণ করব। তুমি বীরত্ব করতে যাচ্ছ, তুমি দুর্গা নাম স্মরণ কর।

পুলক কেমন বিব্রত হইয়া পড়ে। তারপরে একটা হেঁচ্‌কা টানে তাহাকে কাছে টানিয়া নিয়া বলে, আচ্ছা, আজ তোকে তবে ক্ষমা করলাম, শুধু তুই সুন্দর………

শোভার নিশ্বাস পুলকের আবেষ্টনে রুদ্ধ হইয়া আসে। পুলক হঠাৎ পাখীর বুকের মত কোমল নরম তাজা দুইটি গোলাপী ঠোঁটের উপর নিজের কম্পমান ঠোঁট চক্ষু করিয়া চাপিয়া ধরিয়া তুলিয়া নিয়াই বলে, কেমন, এইবার জব্দ তো?

ধোৎ!—বলিয়া শোভা আম দুইটি সেখানে ফেলিয়াই ছুটিয়া পালায়।

পুলক হাসিতে থাকে। এতদিনে—এত সহজে তবে জয়ী হওয়া যায় পুলক বিস্ময়ে ডুবিয়া যায়।

বৌদি ডাকিয়া বলে, শোভা, দুয়ো, হেরে গেলি শেষটায়?

শোভা আর ফিরিয়াও চাহে না।

অসীমা পুলকের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলে, যাক্, আমার একটা দুর্ভাবনা তবু ঘুচ্‌লো এতদিনে। রাঙা বৌ হাজার ডাংপিটে হ'লেও তুই তাকে ঠিক ঢিট্ করতে পারবি।

পুলক লজ্জয়ে ভাবী রাঙা-বৌয়ের মুখের রঙের সঙ্গে পাল্লা দিতে প্রায় সক্ষম হয়।

দূরে পথের বুকে কালবৈশাখীর রুদ্র করাল মাতামাতি হয়তো তখন থামিয়া গিয়াছে।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

দেবদাসী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

দূরে রাখি সংসারের সুখ দুঃখ কবে
পাষাণ দেবতাপদে পুষ্প-চিত্ত দিয়া প্রথম প্রভাতে,
তুমি এলে শ্রীমন্দিরে প্রভুর সেবায়
গৈরিক বসন পরি স্বপ্ন অর্ঘ্য নিয়া পরম শোভাতে—
অতীতের কালস্রোতে হারায়েছে তাহা ;
শুধু বাজে স্মরণের আলো-অন্ধকারে মাধুরী বিলায়ে
অনন্তের মৌনতটে, গীতিকার প্রায়
হৃদি মোর উচ্ছ্বসিয়া মধুছন্দ হারে দীপিকা মিলায়ে।

আপনারে নিবেদিত মন্ত্রপূত করি,
অর্চ্চনায় সঁপিয়াছ দিব্য সৌম্যপ্রাণ বিতরি পুলক
প্রণয়ের সাধনায় পাষাণ দেবতা
কেঁপে ওঠে লভি তব শুদ্ধ সত্ত্ব গান, সুষমা-তিলক।
বাসনার বসুধারা সমুল্লাসে তুমি
ঢালিয়াছ দেবতার স্বর্গ-শুভ্র মনে, আবেগ ঝলকে,
জীবনের যত আশা সমুজ্জ্বল তব
অকুণ্ঠিত মরমের স্পর্শ-সঙ্গোপনে আঁখির পলকে।

তুমি এলে যৌবনের কুসুম কুড়ায়ে,
দোলে তব মুক্তবেণী ঘনবীথি সম উতলা পবনে
অধরের প্রান্তভাগে শতদল-দ্যুতি,
গণ্ডে রহে গোলাপের আভা নিরুপমো বিলোল স্বপনে ;
আধফোটা অনাহত ঈষৎ উন্নত,
আবরণে দুটী কুঁড়ি বক্ষে তব ঢাকা কনক বরণে,
রূপের অমিয়ধারা বহে অঙ্গ দিয়ে
হৃদয়-প্রাঙ্গণে প্রেম-আলিম্পন আঁকা বঁধুর স্মরণে।

ধরণীর হোমানলে পূর্ণাহুতি দিয়া
বরণের মালাখানি পুণ্যকাম্য জপে লভিলে প্রভুর
শয়ন-আরতি ক'র গভীর নিশীথে
অন্তরালে হাসে বঁধু জ্যোতির্ম্ময়রূপে বাজায়ে নুপুর।
দেবতার সঙ্গসুখে বিভোলা রূপসী
প্রতিক্ষণে প্রতিচ্ছায়া মত্ত নৃত্য করে, সেবার সৌরভে
অসীম-সসীমে হ'ল একাত্ম মিলন,
ত্রিদিবের পারিজাত ফুটেছে অন্তরে প্রেমের গৌরবে।

শীত-কাতুরী

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

লেপ্-মুড়ী ! সুড়্-সুড়ী জানা-হাতে !
হিম-বাতে !
খবর-ত নিলে যত এই লম্বা শীত-রাতে !
খেয়ালী-কে, হেঁয়ালীকে নমস্কার,
কল্পনায় প্রাণটায় অভিসার !
নাই-দেখা, একা-একা রাত কাটে,
ভুন দরে ঘুণ ধরে গুন খাটে !
আঁকড়ে' চুমে ভাঙ্গা-ঘুমে আবেষ্টন,
ও কি তার ইসারার আবেদন ?
শিথানের বালিশের চুপ-ঘ্রাণ
চাদরের আদরের রূপটান
বিছানায় সে-খোপায় ঝরা-ফুল—
এতটা যে, সব বাজে ? সব ভুল !
ছাপ-মারা চাপ-হারা হাত কার !
হাত্ড়াই, পেতে চাই মন তার !
আব্ছায় ঝাপ্সায় চরাচর,
কোন্ ঘোরে মন প'ড়ে কার পর !
রাত বিষ, ফিস্-ফিস্ !—এইবার !
বিজলীরে টিপি ধীরে !—নাই আর !
ওগো ফেরো,—ভাব ! ভাব !
আড়ি ! আড়ি !—কি জবাব !
শীত-কাতুরী, জিত্ চাতুরী !
কুরঙ্গিনীর চেনা-সুরই
শরাহত আচম্বিত !
বড় শীত ! বড় শীত !

ফিরি পাশ,—উষ্ণশ্বাস শাল টানি
তার জানি !
গা'র আঁচ ? সে ছোঁয়াচ শীত-রাতে
কি-না মানি !
গায়ে ছ্যাঁৎ,—হিম-হাত ! মন-মায়া !
ধরা-ছোঁয়া সব ধোঁয়া, ছল-ছায়া !
সে যে ভীতু, শীত ঋতু, হিম-রুল !
মৌমাছি এলে বাঁচি, ভীমরুল !
হুল গুণ, গুণ্-গুণ্ মশা ধরে।
প্রিয়া-অস্ত যে বসন্ত,—গোসা ঘরে !
ও-দখিণা, তুই কি-না দিলি দোর ?
প্রেমে ধিক্ ! মূক পিক মানে ভোর ?
ফুলধনু ভুল-তনু দিয়ে বাঁধা
ফাঁকতালে টাকশালে নামজাদা !
থমথমা হিম-জমা শিহরণ,
চায়-না সে, কেন, আসে অকারণ ?
রাত বিষ ! কে আসিস্ ঘরে রোজ্ ?
খস্-খস্—সাড়ী—ব্যস্ ! খোঁজ্-খোঁজ্ !
সোফা নড়ে, ও কে পড়ে ?—এইবার !
বিজলীরে টিপি ধীরে !—নাই আর !
ওগো ফেরো ! ভাব ! ভাব !
আড়ি ! আড়ি ! কি জবাব !
শীত-কাতুরী, জিত্ চাতুরী !
কুরঙ্গিনীর চেনা-সুরই
শরাহত আচম্বিত !
বড় শীত ! বড় শীত !



দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

পূজা ও স্বদেশী

কাপড়, জামা ও অন্যান্য পরিচ্ছদ এবং সৌখীন দ্রব্যাদি সারা বৎসরে যাহা আমরা ক্রয় করি, তাহার অনেক জিনিষ, অনেক পরিমাণে আমরা অনেকেই এই সময় কিনিয়া থাকি। কাজেই, সারা বৎসর এই সকল সম্বন্ধে যে সব কথা আমাদের মনে রাখা দরকার, পূজার সময় সে কথাগুলি বিশেষভাবে মনে করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

বাজার করিবার সময় যে, দেশে প্রস্তুত জিনিষের কথা মনে রাখিতে হইবে, সেকথা 'বিচিত্রা'র পাঠকদের মনে করাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। তাহা হইলেও, কয়েকটি কথা ভাবিবার আছে।

কাপড়ের জন্যই বিদেশকে আমরা সব চেয়ে বেশী টাকা দিই। ইহা ধনী দরিদ্র সকলেরই নিত্য-ব্যবহার্য্য এবং সকলের পক্ষেই অপরিহার্য্য। প্রয়োজনীয় বস্ত্র দেশে উৎপন্ন হইলে, আমাদের অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে এবং আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা অনেক পরিমাণে কমিবে; এই জন্য, আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সাধারণের মধ্যে দেশী কাপড়ের ব্যবহার বাড়াইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ বেশীর ভাগ কাপড় বিলাত হইতে আমদানী করে; কাজেই, ভারতবর্ষ নিজের কাপড় উৎপাদন করিতে পারিলে বিলাতের বস্ত্র-ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে রাষ্ট্রিক সুবিধার আকারে দেখা দিবে, এই আশাতেও নেতাগণ কাপড়ের উপরে এত জোর দিয়াছিলেন। বস্ত্রের ন্যায় অপরিহার্য্য ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে না পারিলে, অনেক সময় তাহা বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা গত যুদ্ধের সময় আমরা বুঝিয়াছিলাম।

এই সকল এবং আরও অন্যান্য নানা কারণে কাপড়ের উপরই আমরা বিশেষ জোর দিতে বাধ্য হইয়াছি এবং দেশী জিনিষের ব্যবহার বলিতে প্রধানতঃ দেশী কাপড়ের ব্যবহারই বুঝিয়া আসিয়াছি। বিদেশী বণিক জাতিগুলি আমাদের এই দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বিলাসের নানাপ্রকার সৌখীন জিনিস, ছোটখাট প্রয়োজনের জিনিস, নানারকমের খেলনা প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক আকারে সস্তায় দিয়া, আমাদের নিকট হইতে পয়সা লইবার পথ যাহাতে বন্ধ না হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এদিকে আমাদের সাবধান হইবার আছে।

আমাদের জীবন-যাত্রার মান বাড়িয়া গিয়া, প্রয়োজন বর্দ্ধিত হইলে, অথবা লোকের বিলাসিতা বাড়িয়া গেলে, সমাজের পক্ষে কোন ক্ষতির কারণ নাই; বরং অনেক দিক দিয়া লাভের সম্ভাবনা আছে। ইহাতে ধনবণ্টনের এবং বেকার লোকদের কাজ পাইবার সুবিধা হয়। কিন্তু, এই সকল জিনিস যদি দেশে উৎপন্ন না হয়, এবং বিদেশীর নিকট হইতে কিনিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাতে দেশের লাভ কিছু মাত্রই হয় না; বরং যে অর্থ দেশে থাকিলে, নানাপ্রকারে সমাজের উপকারে আসিতে পারিত, তাহা চিরতরে আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া দেশের দারিদ্র্যের কারণ হয়। এইজন্য প্রতিটি খুচরা জিনিস কিনিবার সময় আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে, জানিয়া শুনিয়া অথবা প্রতারিত

হইয়া আমরা বিদেশকে কোন প্রকারে টাকা না দিই। দেশে বিশেষভাবে কর্ম্মাভাব ঘটায়, অনেক শিক্ষিত বেকার নানা ছোট খাট শ্রমশিল্পে আত্ম-নিয়োগের চেষ্টায় আছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় দেশের নানাস্থানে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়োজনের এবং বিলাসের কিছু কিছু জিনিস বিচ্ছিন্নভাবে উৎপন্ন হইতেছে। ইঁহাদের পশ্চাতে যথেষ্ট অর্থবল না থাকায় এবং খরিদ্দারের মন আকর্ষণ করিবার কৌশলাদি তাঁহাদের আজও ভালভাবে আয়ত্ত না হওয়ায়, এই সকল জিনিস আজও জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করিয়া মফঃস্বলে ভালভাবে প্রচারিত হয় নাই। কাজেই, কোন বিদেশী জিনিস কিনিবার পূর্ব্বে আমাদের খুব ভাল করিয়া খোঁজ করিয়া দেখা উচিত যে, সেই জিনিস অথবা সেই প্রকারের কাজ চলিবার মত কোন দেশী জিনিস পাওয়া যায় কিনা। কারিগরেরা এখনও ভাল নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া এবং অনেক ক্ষেত্রেই ইঁহাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সস্তা ও খারাপ বলিয়া, দেশী জিনিসের জৌলস সব সময় ভাল হয় না; এবং অনেক সময় মূল্যও অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। কিন্তু, এদিক দিয়া অল্প ক্ষতি স্বীকার করা ব্যতীত, দেশের শিশু, ও আত্ম-রক্ষায় বিব্রত, শ্রমশিল্পকে বাঁচাইবার আর পথ নাই।

হাতের কাছে দেশী জিনিস না পাইলে, সামান্য জিনিসের জন্য দেশের বিশেষ ক্ষতি হইবে না মনে করিয়া, বিদেশী জিনিস অনেক সময় কিনিয়া থাকি। কিন্তু, বহুলোকেই এইরূপ মনে করিয়া থাকেন বলিয়া, সকলের এইভাবে কেনা জিনিষের সমষ্টি-মূল্য শেষ পর্য্যন্ত কম দাঁড়ায় না। কাজেই, সর্ব্বপ্রকার জিনিসই দেশী কিনিবার জন্য আমাদিগকে যেমন দৃঢ়পণ হইতে হইবে; তেমনই আক্ষরিকভাবে তাহা প্রতিপালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

আরও একটা কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের বর্দ্ধিত প্রয়োজন এবং বিলাসিতার চর্চ্চা সমাজে ধন-বণ্টনের সুবিধা করিয়া দিয়া, বেকার লোকদের কাজ দিতে পারে। পূজার সময় সাধারণতঃ আমরা একটু বেশী খরচ করিয়া থাকি; কাজেই, এ সময় দেশী কোন বিলাসের জিনিস, যে কোন প্রকারের কাজে লাগাইতে পারা যায় এমন জিনিস, অথবা, যাহা দ্বারা গৃহাদির শোভা বর্দ্ধন করিতে পারা যায়, আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতিকে উপহার দিয়া প্রীত করিতে পারা যায়, এমন সব জিনিস, যেন আমরা ইচ্ছা করিয়া ক্রয় করি। বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের দিনে, এই উপায়ে অনেক দরিদ্র লোককে, তাহাদের আত্ম-মর্য্যাদায় আঘাত না দিয়া সাহায্য করা হইবে।

সর্ব্বশেষে কাপড় সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। পরিবার কাপড় কিনিবার সময়, বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা দেশী কাপড়ই কিনিয়া থাকেন; সে বিষয়ে তাঁহাদের সতর্কতা আছে। যাঁহারা এখনও বিদেশী কাপড় কেনেন, তাঁহাদের নিকট 'বিচিত্রা' পৌছিবে বলিয়া আশা করি না। যাঁহারা এখন বিদেশী কাপড় কিনিতেছেন, তাঁহারা যাহাতে ইহার অপকারিতা বুঝিতে পারেন তাহার জন্য চেষ্টা করিবার দায়িত্ব সকল লোকেরই আছে। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালীরা, যাঁহারা শুধুমাত্র দেশী কাপড় ব্যবহার করেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাঁহাদেরও অনেকে, পরিবার কাপড় ব্যতীত অন্যান্য কাপড়, যেমন জামা গেঞ্জী বিছানাপত্র প্রভৃতি কিনিবার সময় সময় ততটা সতর্ক থাকেন না। এ সকল দিকেও সমানই সজাগ থাকা দরকার।

বাঙ্গালীদের স্বাদেশিকতার সুযোগ বাঙ্গালীরা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বাংলায় কাপড় বিক্রয় করিয়া বম্বের কলওয়ালারা ধনী হইয়াছেন। যে অর্থ দেশের বাহিরে যাইত, তাহা দেশে থাকিয়া যাওয়ায়, ভারতের অবশ্য লাভ হইল। এবং সেইজন্য পরোক্ষভাবে বাংলার কিছু লাভ হইল। কিন্তু, তদপেক্ষা অধিক লাভ বাংলার আর কিছু হয় নাই।

স্বদেশী কাপড় ও বাংলা প্রদেশ

বম্বে ও বাংলা উভয় প্রদেশই ভারতের অন্তর্গত। কাজেই এক প্রদেশের অর্থ ও সম্পদ সময় সময় অপর প্রদেশের কাজে লাগিতে পারে। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন বা অন্য কোন প্রকার ব্যাপক বিপৎপাতের সময় বম্বে বা ভারতের অন্য কোন ধনী প্রদেশের নিকট হইতে আমরা সহায়তা আশা করিতে পারি। সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থ

যেখানে বিপন্ন হয় এবং যাহা রক্ষার জন্য আর্থিক শক্তির প্রয়োজন হয়, এমন স্থলে অন্য প্রদেশের শক্তির দ্বারা আমরা তাহাদের ন্যায় সমানই লাভবান হইতে পারি। আমাদের রাষ্ট্রিক প্রগতি ও জাতীয় উন্নতির জন্য যে সকল ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন হইবে, বা লোকের আর্থিক শক্তি থাকিলে যে সকল ক্ষেত্রে লোকে অধিক কাজ করিতে পারিবে এমন সব ক্ষেত্রেও, বম্বে বা ভারতের অন্য কোন প্রদেশের অর্থেও, ভারতবর্ষের অংশ বলিয়া বাংলারও লাভ হইবে। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের লোকেরা ধনী হইলে তাঁহাদের জীবন-যাত্রার আদর্শ বাড়িয়া যাইবে এবং তাঁহাদের নিকট নানা রকমের জিনিস বিক্রয় করিবার সুযোগ সম্ভবতঃ ভিন্ন দেশের লোক অপেক্ষা অন্যান্য প্রদেশের ভারতীয়দেরই অধিক থাকিবে। কাজেই, বম্বে ধনী হইলে, এই সকল দিক দিয়া বাংলার লাভের সম্ভাবনা থাকিবে।

কিন্তু এ সকলই হইতেছে পরোক্ষ লাভ। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে বম্বের অর্থে, আমাদের কিছুমাত্র লাভ হইবে না ; বরং লোকসান এই যে, বিদেশীয় শোষণের বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিকার পন্থা অবলম্বন করা যায়, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের শোষণের বিরুদ্ধে সে সকল প্রতিকার পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। বিদেশী জিনিস বর্জ্জন করিবার জন্য যে প্রকার আন্দোলন চালান যাইতে পারে, ভিন্ন প্রদেশীয় জিনিস বর্জ্জন করিবার জন্য সে প্রকার আন্দোলন চালাইতে গেলে, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে তাহা বিদ্বেষের সৃষ্টি করিবে এবং সমগ্র ভারতবর্ষের কল্যাণের পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিবে।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশী বর্জ্জনের যে চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহাতে তাঁতের কাপড় অনেকটা চলিয়া গিয়াছিল। ইহার মূল্য কিছু বেশী হইলেও অথবা স্থায়িত্ব কিছু কম হইলেও, লোকে ইহা কিনিত। বিদেশী জিনিস ত্যাগ করিবার জন্য লোকে এতটা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল যে, অল্প অসুবিধার জন্য কখনই বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিত না। এই সুযোগে তাঁত শিল্প দেশে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। বর্ত্তমানেও বাংলার মিলগুলির দ্বারা বাংলার কাপড়ের অভাব দূর হয় না এবং লোকের স্বদেশী ব্যবহারের সঙ্কল্প পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় হইয়াছে এবং ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। বাংলাদেশের এক কোটি লোক যদি এই প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে, জনপ্রতি বৎসরে দু'জোড়া হিসাবে তাহাদের দুই কোটী জোড়া কাপড় লাগিত। খুব কম করিয়াও যদি জোড়াপিছু আট আনা মজুরি ধরা যায়, তাহা হইলেও বৎসরে দেশে এক কোটী টাকা থাকিয়া যাইত। পরিবার কাপড় ব্যতীত অন্য রকম কাপড়েও আরও কিছু টাকা থাকিত। যে সকল লোকের মধ্যবর্ত্তিতায় এই কাপড় বাজারে যাইত তাহারাও নিশ্চয়ই বাঙ্গালী হইতেন। অন্য প্রদেশের কাপড় বাঙ্গালীদের মধ্যবর্ত্তিতায় বাজারে আসে না ; কাজেই, এদিক দিয়াও কিছু টাকা বাঙ্গালীদের হাতে আসিত। এই প্রকারে লব্ধ মোট অর্থের পরিমাণ যদি এক কোটী পঁচিশ লক্ষ টাকা ধরা যায়, (ইহা অবশ্য খুব কম করিয়া ধরা) এবং যদি ধরা যায়, পাঁচ পাঁচ জনের এক একটি পরিবার এই ব্যবসা হইতে মাসিক ৩০৲ টাকা পাইতেন তবে ৩৫ হাজার পরিবার অর্থাৎ পৌনে দুই লক্ষ লোক ইহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারিতেন। বাংলায় মধ্যবিত্তদের মধ্যে এমন পরিবার অধিক নাই, যাঁহাদের জনপ্রতি মাসিক আয় ৬৲ টাকা। জনপ্রতি মাসিক আয় আরও কম ধরিলে, আরও অনেক বেশী লোকের এই টাকায় পেটের ভাত হইত।

কিন্তু বম্বের মিলের কাপড়কে আমরা সহজেই এবং অসঙ্কোচে স্বদেশী বলিয়া গ্রহণ করিলাম। ইহার প্রতিযোগিতায় তাঁত ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না, যেগুলি ছিল তাহাও টিকিতে পারিল না। এমন কথাও আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বলা হইল যে, তাঁতিরা বিলাতি সূতা ব্যবহার করে কাজেই, তাঁতের কাপড় পুরাপুরি স্বদেশী নহে। কিন্তু ইহাতে পূর্ব্বকথিত মত পরিমাণ টাকা বাংলার লাভ থাকিয়া যাইতে পারিত ; আর বম্বের মিলের কাপড় কিনিয়া এই সব টাকাটা আমরা অন্য প্রদেশবাসীর হাতে তুলিয়া দিলাম।

বাংলায় মিল প্রতিষ্ঠার সহিত মিলগুলি সূতা প্রস্তুতের কাজে অধিক মন দিতে পারিতেন। ফলে সূতার পয়সাও আর বাহিরে যাইত না। এমনও হইতে পারিত, তাঁত ভালভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, উন্নত ধরণের তাঁত প্রচলনের

সহিত, ইহা লাভজনক গৃহশিল্পে দাঁড়াইতে পারিত এবং সূতা প্রস্তুত করা ব্যতীত, বস্ত্র বয়নের জন্য মিল প্রতিষ্ঠার দরকারই হইত না। ইহাতে বড় বড় মিল হইবার কুফল হইতে আমরা অনেকটা বাঁচিতে পারিতাম। অবশ্য বাংলার অর্থে স্থাপিত এবং বাংলার অর্থে ও শ্রমে পরিচালিত মিলের প্রতিযোগিতায় শেষ পর্য্যন্ত তাঁত দাঁড়াইতে না পারিলেও, বিশেষ ক্ষতির কারণ ছিল না।

কাপড় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বদেশী অন্যান্য অনেক জিনিসের ব্যবহার সম্বন্ধেই তাহা সত্য। আমরা দেশী জুতা ব্যবহার করি, দেশী চিনি খাই, কিন্তু তাহার কয়টা পয়সা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে থাকে এবং তাহার দ্বারা কয়টি নিরন্ন পরিবারের অভাব মোচন হয়, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না।

আর্থিক সংগ্রামে বাঁচিতে হইলে, আমাদিগকে বাংলা-দেশেই এই সকল জিনিষের উৎপাদনে মন দিতে হইবে এবং নিজ প্রদেশে উৎপন্ন জিনিস কিনিবার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে হইবে। স্বদেশী জিনিস বলিতে যাহাতে আমরা বাংলায় প্রস্তুত জিনিস বুঝি, অন্ততঃ প্রথমতঃ তাহাই বুঝি, এইরূপ জনমত গঠনের জন্য আমাদের অবিলম্বে চেষ্টা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য প্রদেশের জিনিস আমরা আর এক সর্ত্তে কিনিতে পারিতাম। আমাদের বাড়তি অনেক জিনিস ভিন্ন প্রদেশে চালান দিবার প্রয়োজন হয়; কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের বাড়তি জিনিসও আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্ত কিনিতে পারি। কিন্তু বম্বে সম্পর্কে আমরা একথাও বলিতে পারি না। অল্প কিছু বেশী টাকা দিতে হয় বলিয়া, বম্বের কাপড়ের কলের মালিকেরা বাংলার কয়লা না কিনিয়া বিদেশী কয়লা ক্রয় করেন। বাংলাতেই যে কাপড় বিক্রয় হইবে, সেই কাপড় তৈয়ারী করিবার জন্য যে কয়লার প্রয়োজন হয়, কৃতজ্ঞতা হিসাবেও সে কয়লা বাংলা হইতে কেনা উচিত ছিল।

বাংলার প্রতি বম্বের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন আরও ২।১টী ছোট খাট ব্যাপারে আমরা পাইয়াছি। পাট রপ্তানি শুল্কের অর্দ্ধেকটা বাংলাকে দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধা আসিয়াছিল বম্বের নিকট হইতে। বম্বের অনেক প্রধান ব্যক্তি ইহার প্রতিবাদে সরকারের উপর জনমতের চাপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কাজেই, আমাদেরও সাবধান ও সচেষ্ট হইবার সময় আসিয়াছে।

পূজায় আমাদের অন্য একটি কর্ত্তব্য

পূজার সময় বর্ণ হিন্দুদের আরও একটি কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিবার আছে। সে কর্ত্তব্য, অনুন্নত হিন্দুদের প্রতি এতদিনকার কৃত—অবিচারের প্রতিকারের চেষ্টা করা। সে কর্ত্তব্য অবশ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এবং তাহাই যথাযথ পালন করিতে পারিলে প্রকৃত পক্ষে কিছু প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারিবে। তাহা হইলেও, একটা বিশেষ সময়কে উপলক্ষ করিয়া আমরা ইহাকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারি এবং ভবিষ্যতে অগ্রসর হইবার মত গতি দান করিতে পারি।

দুর্গাপূজা বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে জাতীয় ধর্ম্মোৎসব। সমাজের সর্ব্বস্তরে ইহাতে যে উৎসব ও আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়, অন্য কোন উপলক্ষেই তাহা দেখা যায় না। কিন্তু, যে কারণেই হউক, বর্ণ হিন্দুদের মধ্যেই এই পূজার প্রচলন অপেক্ষাকৃত অধিক। এই সকল পূজায়, অনুন্নত হিন্দুদের অপমানজনক অনেক ব্যাপার ঘটায়, ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হয়। এই প্রকারের ঘটনা যাহাতে কোথায়ও না ঘটে এবং প্রীতি ও ব্যবহার সাম্যের দ্বারা সকলকে সমান অধিকার প্রদানের দ্বারা হিন্দুসমাজের সর্ব্বস্তরে যাহাতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে তাহার জন্য সকলেরই সজাগ এবং সচেষ্ট থাকা উচিত।

বাংলা দেশে অস্পৃশ্যদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়া অথবা প্রকৃত অস্পৃশ্যতা বাংলাদেশে নাই বলিয়া যেন আমরা নিশ্চিন্ত না থাকি।

বাংলাদেশে প্রকৃত অস্পৃশ্য কাহারা

আমরা মনে করিয়া থাকি বাংলাদেশে অস্পৃশ্যদিগের সংখ্যা খুব অধিক নহে। যাহাদিগকে স্পর্শ করিলে বর্ণ

হিন্দুদের পুনঃ পবিত্র হইতে হয়, তাহাদের সংখ্যা এখানে অধিক না হইতে পারে। অন্যান্য প্রদেশে ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায়, এবং তাহাদের উপর অত্যাচার কোন কোনও প্রদেশে অত্যন্ত অমানুষিক ও উগ্র হওয়ায়, সর্ব্বপ্রথম এই দিকে দৃষ্টি পতিত হইয়াছে এবং ইহাদের যে সকল অধিকার খর্ব্বতা আছে, তাহাই দূর করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতাদূরীকরণ আন্দোলনের ক্ষেত্র খুব বেশী প্রশস্ত নহে। সমগ্র দেশের অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে, বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে প্রতিকারের প্রাথমিক ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে মাত্র। কাজেই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার যাহাদের উপর হইতেছিল, প্রথমে তাহাদের কথা মনে করিতে হইয়াছে। বাংলাদেশে ইহাদের সংখ্যা খুব অধিক নাই বলিয়া আমরা যেন নিশ্চিন্ত না হই।

যেখানে বৈষম্য এবং অবিচার আছে, যেখানে অধিকার ও সম্মান নাই, সেখানে অসম্মান ও বিক্ষোভ থাকিবেই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার যে সকল ক্ষেত্রে হয় তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলায় অত্যাচারের মাত্রা এবং এই প্রকার অত্যাচারিতের সংখ্যা অধিক হইলে, হয়ত, যাহাদিগকে স্পর্শই করা যায় না, তাহাদিগকেই মাত্র অস্পৃশ্য বলা যাইত। কিন্তু বাংলাদেশে ঠিক এই প্রকার অস্পৃশ্য অধিক নাই বলিয়া, অন্য কোন কোন প্রদেশের তুলনায়, এখানকার অবস্থা কিছু ভাল বলিয়া, যাহারা নানাবিধ অবিচার ও অসম্মান ভোগ করিতেছে তাহারা যে, নিজেদের আপেক্ষিক সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে ভাল বলিয়া মানিয়া লইবে, এরূপ আশা করা অন্যায়।

বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেরই কিছু না কিছু অধিকারখর্ব্বতা আছে। ইহার প্রকৃতি ও আকার অবশ্য বিভিন্ন প্রকারের। কাহারও অন্ন অচল, কাহারও জল অচল এবং কাহারও বা স্পর্শ অচল। ব্রাহ্মণের সহিত কাহার কি সম্পর্ক তাহা ধরিয়াই প্রত্যেকের মর্য্যাদা নিরূপিত হয়। ব্রাহ্মণ যাহার জলগ্রহণ করেন না, অন্য কেহই তাহার জল গ্রহণ করেন না, ব্রাহ্মণ যাহাকে স্পর্শ করেন না সকলের নিকট সে অশুচি। সংজ্ঞানুসারে অস্পৃশ্যতা বিশেষ না থাকিলেও, যে কারণে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়াছে এবং যে কারণে ইহা দূরীভূত হওয়া উচিত, সেই কারণেই এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগা স্বাভাবিক এবং ইহা দূরীভূত হওয়াও উচিত। এই বৈষম্য যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট, অসন্তোষও সেখানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ যাহারা জলাচরণীয়দিগের গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না, হোটেলে স্থান পায় না, খাবারের দোকানে ঢুকিতে পারে না, একান্ত সাধারণ স্থান ব্যতীত সমান আসনে বসিতে পায় না তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ বিশেষ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। সকল প্রকারের বৈষম্যই দূর হওয়া দরকার, কিন্তু উপরি-উক্তদের মধ্যের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ যাহাতে শীঘ্র নষ্ট হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়।

কিন্তু, অনুন্নতদের উন্নয়নের জন্য যাঁহারা কাজ করিতেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারা এই কথাটিকে উপেক্ষা করিতেছেন। সংজ্ঞানুসারে যাহারা অস্পৃশ্য শুধুমাত্র তাহাদের উপরই জোর দিতেছেন। ইহাদের দিকে যে মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। হিন্দু সমাজের মধ্যে যে অসন্তোষ ও অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে, এই জন্যই রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে নূতন সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে, সে সকল দূর করা যদি বর্ত্তমান আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হয় তবে, বাংলাদেশে অস্পৃশ্যতার সংজ্ঞাকে প্রসারিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র বাড়াইতে হইবে। ঠিক অস্পৃশ্য নহেন, অথচ, নানাপ্রকারে হীন হইয়া আছেন, বাংলায় এই প্রকার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যাই অধিক এবং ইহাদের মধ্যে কতক পরিমাণে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হওয়ায় ও সংঘবদ্ধতা গড়িয়া উঠায়, রাজনীতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কাজেই এদিকে বিশেষ মনোযোগ প্রদান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য কি করিতে হইবে

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য যদি অস্পৃশ্যদিগকে শুধুমাত্র রাস্তায় চলিবার কূপ হইতে জল তুলিবার, স্কুল কলেজে

পড়িবার অধিকার দান বুঝায়, তাহা হইলে বাংলাদেশে কিছুই করিবার নাই। যদি ইহাদিগকে জলাচরণীয় করা বুঝায়, তাহা হইলেও, খুব বেশী কিছু করিবার থাকিবে না। কারণ কার্য্যতঃ জলগ্রহণ করিবার বাধা খুব বেশী স্থানে নাই। তদ্ব্যতীত, অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইবার অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে, ইঁহাদের মনে অনেক দিন ধরিয়া যে ব্যথা জমিয়াছে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা। এদিক দিয়া শুধুমাত্র জলগ্রহণের দ্বারা বাংলায় বিশেষ কিছু ফল হইবে না। বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে পরস্পরের অন্নগ্রহণের বাধা দূর হইলে, আমাদের ঐক্য বিধানের কাজ অনেকটা সহজ হইবে। আমাদের দুর্ব্বলতা ও দৈন্য, সকলের অন্তরকে আজও প্রকৃতপক্ষে স্পর্শ করে নাই, এই জন্য এতটা অগ্রসর হইতে অনেকেই সম্মত হইবেন না। কিন্তু, যাঁহারা কাজ করিতে ও হিন্দু সমাজকে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে চান, তাঁহাদিগকে, ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং দলবদ্ধ ভাবে ইহার অনুষ্ঠানের দ্বারা সমাজকে আঘাত দিতে হইবে।

যাঁহারা মনে করেন, ইহাতে বর্ণ হিন্দুদের শুচিতা নষ্ট হইবে এবং যাঁহারা এখনও সব দিক দিয়া ভালভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাদের অন্নগ্রহণে স্বাস্থ্য মন প্রভৃতির ক্ষতি হইতে পারে, তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে পূর্ব্বের ন্যায়, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত গৃহের চতুঃপ্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া জীবনযাপনের সম্ভাবনা আর নাই; এই প্রতিযোগিতা এবং ছুটাছুটি আমাদের ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে; ইহার মধ্যে আমাদের শাস্ত্র ও লোকাচার-নির্দ্দিষ্ট বিধানসমূহ মানিয়া চলা সম্ভব হইতেছে না; সর্ব্বত্র যখন এই সকল নিয়ম মানিয়া চলা সম্ভব হইতেছে না তখন, যেখানে তাহা না মানিলে কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে সেখানে মানিবার জন্য জেদ করিয়া লাভ কি?

যাঁহারা মনে করিয়া থাকেন, ইঁহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলে ইঁহাদের অন্ন গ্রহণের কথা উঠিতে পারিবে, তাঁহারা একথাটা ভুলিয়া যান যে, বর্ত্তমানে যাঁহারা সমাজের উচ্চস্তরে আছেন, তাঁহাদের সংস্পর্শ ও সহযোগিতা ব্যতীত, ইঁহাদের উন্নয়নের পথ নাই। ইঁহারা যদি বুঝিতে পারেন, আচার ব্যবহার ভাল হইলে, পরিচ্ছন্নতা বাড়িলে, ইঁহাদের অন্ন গ্রহণে কাহারও বাধা নাই, তাহা হইলে, তাহাই ইঁহাদিগকে উন্নত হইতে প্রেরণা দিবে। তাঁহাদের সাহচর্য্যেই তাঁহাদের আদর্শ ইঁহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে।

বর্ণ হিন্দুদের যদি গৌরব করিবার মত শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা ও কৃষ্টি থাকে, তবে দেশের জনসাধারণের সেবাতেই নিযুক্ত হইয়া মাত্র তাহা সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে।

মহাত্মাজীর বিবৃতি

কংগ্রেসের সহিত মহাত্মাজীর ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হইবে, এবং ইহা নির্ণয়েরই বা সহসা কি প্রয়োজন হইল সে সম্বন্ধে মহাত্মাজী একটি দীর্ঘ বিবৃতি দান করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী বিবৃতির ন্যায় এটিও বক্তব্যের স্পষ্টতায়, সারল্যে, আন্তরিকতায় ও দৃঢ়তায় বিশেষ ভাবে সমুজ্জ্বল। মহাত্মাজী দেশের জন্য আক্ষরিক অর্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ; তাঁহার সমগ্র শক্তি, বিত্ত, চিন্তা, এমন কি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। আবার কংগ্রেসই তাঁহার সকল কর্ম্মের প্রধান ক্ষেত্রস্বরূপ হইয়াছে এবং সাহচর্য্য, চিন্তার ঐক্য ও কর্ম্মের ঐক্যের মধ্য দিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীরাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছেন। এই সহকর্ম্মীদের অনেকে তাঁহাকে চাহিতেছেন না, তাঁহাকে হয়ত বাধাস্বরূপ মনে করিতেছেন, এবং এই জন্যই কংগ্রেসের সহিত সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে; এই বিশ্বাস হইতেই আলোচ্য বিবৃতিটির উদ্ভব বলিয়া, ইহার দৃঢ়তার পশ্চাতে যে কারুণ্য আছে, তাহা মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

মহাত্মাজীর সম্পর্কে এই প্রকার অভিযোগ আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি; এবং ইহাও জানি, বর্ত্তমানের কংগ্রেস তাঁহারই চিন্তা ও ভাবের বাহিরের রূপ মাত্র। কিন্তু, তাহাতে এপর্য্যন্ত দেশ বা কংগ্রেস কাহারও কোন ক্ষতির কারণ হয় নাই। কংগ্রেস যে এতটা জনপ্রিয় হইয়াছে, সমগ্র দেশের লোককে সে যে এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক চেতনা

জাগাইয়াছে, অন্য প্রকার উন্নতির জন্য প্রেরণা দিয়াছে, দেশের ভিতরে ও বাহিরে সে যে এতটা মর্য্যাদা পাইয়াছে তাহার পশ্চাতে মহাত্মার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের শক্তি, তাঁহার সাধু চরিত্র ও ঐকান্তিক সাধনা এবং নিষ্ঠার প্রভাব রহিয়াছে। কংগ্রেসের মধ্য দিয়া মহাত্মাজী সরকারের সহিত কয়েকবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অনুরূপ অবস্থায় অন্য কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। শুধু মাত্র নিজ শক্তি ও নীতির প্রতি সংশয়াতীত বিশ্বাসের ফলেই মহাত্মাজীর পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসের ফলেই লোকে ইহাতে আশাতীতভাবে সাড়া দিয়াছিল। শক্তির পরীক্ষায় কংগ্রেস যে কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়াছে, প্রধান ও সাধারণ বহুসংখ্যক কর্ম্মীর বীরত্ব, ত্যাগ ও সাধনার বলে এবং অনেক বেশী দেশবাসীর সহানুভূতির সাহায্যে তাহা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু, ইঁহাদের সকলকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন মহাত্মাজী। কাজেই, মহাত্মার ব্যক্তিত্ব অন্য সকলকে যে কতকটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক।

গণতান্ত্রিকতা কোথায়ও ব্যক্তিপ্রাধান্যকে নষ্ট করিতে পারে নাই। ইহা শুধু কয়েকজন শক্তিশালী ব্যক্তির মধ্য হইতে একজনকে বাছিয়া লইবার অধিকার দিয়েছে মাত্র। এই ব্যবস্থায়, নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুক্তিতর্ক ও কৌশলের আশ্রয় করিতে হয় বটে, কিন্তু, শক্তিশালী ব্যক্তির প্রভাব ইহাতে প্রতিহত হয় না। কোন প্রতিষ্ঠানে যখন এইরূপ কোন শক্তিশালী ব্যক্তি থাকেন, তখন, তাঁহার শক্তিতেই সেই প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হইয়া উঠে।

সকল বড়লোকের ব্যক্তিত্বই চারিপাশের সকলকে কিছু পরিমাণে আবৃত করিয়া রাখে। ইহা দুই প্রকারে হইতে পারে। ইঁহারা অপরের স্বাধীন অবাধ বৃদ্ধিকে বাধা দিতে পারেন অথবা অপর সকলকে ছাড়াইয়া অনেক দূরে উঠিতে পারেন। প্রথম অবস্থাটা সকলের পক্ষে নিশ্চয়ই ক্ষতিকর। কিন্তু, দ্বিতীয় অবস্থায়, যদিও সকলে কতকটা আড়ালে থাকিয়া যান, তবুও, এই প্রকার শক্তিশালী লোকের নিকট হইতে তাঁহারা উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি পান, মনের অসাড়, নিরুদ্যম অবস্থা দূর হয়, এবং তাঁহাদের নানাদিক দিয়া নানা কথা ভাবিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও শক্তি এই প্রকারে আমাদিগকে নূতন শক্তি, উৎসাহ ও প্রাণ দান করিয়াছে। তাঁহার বলিষ্ঠ চিন্তা ও অভিনব মতবাদ আমাদের চিন্তা ও মনকে সজোরে আঘাত করিয়াছে।

কিন্তু, আর একটা ভাবিবার কথাও আছে। মহাত্মাজী আমাদের মনকে অনেকখানি জাগ্রত করিয়াছেন, একথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আমাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ ভাগ্য ও কর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিবেন অথবা ইচ্ছা বা মত-প্রকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়া থাকিবেন, ইহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। মহাত্মাজীও একথা বলিয়াছেন যে, সময় সময় একজনের জন্য অপর সকলের মত চাপিয়া যাইবার প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু ইহাই যখন দৈনন্দিন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়, তখন ইহা অত্যাচারে পরিণত হইয়া দাঁড়ায়। ব্যাপার যদি প্রকৃতপক্ষে এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলে, শীঘ্রই সেই অবস্থার অবসান হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকিলে তাহা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে বলিতে হইবে। এই অবস্থা দূর করিবার জন্য যদি মহাত্মাজীকে সরিয়া দাঁড়াইতেও হয়, তাহা হইলেও এইজন্য তাহা বাঞ্ছনীয় হইবে যে, মহাত্মা বড় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ ও কংগ্রেসের সম্ভাব্যতা আরও বেশী।

এই অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন

স্বাধীনভাবে কাজ করিবার, কথা বলিবার বা চিন্তা করিবার সুযোগ কাহারও নষ্ট নয়, ইহা আমরা চাহি না। এই জন্য চাহি না যে, যত শ্রেষ্ঠ কাজ হ'ক, নীতি হ'ক, আদর্শ হ'ক মানব-প্রগতির তাহা কখনই শেষ কথা হইতে পারে না, আরও অগ্রসর হইবার, ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রয়োজন সব সময়েই থাকে। কোনও স্বাধীনচেতা সাধু চরিত্রের লোক এই সম্ভাব্যতা বিনা চেষ্টায় নষ্ট হইতে দিতে পারেন না। আরও এইজন্য এই অবস্থা আমরা চাহিনা যে, মানবপ্রকৃতির একটা গোড়ার কথাই হইতেছে,

সর্ব্বপ্রকারের স্বাধীনতা, তাহার নিকট অন্য যে কোনও বস্তু অপেক্ষা—ভাল নিরাপদ অবস্থা, এমনকি জীবন অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়। কোনও বস্তুর বিনিময়ে কোনও প্রকার আশাতেই আমরা ইহা নষ্ট হইতে দিতে পারি না।

অবস্থা যদি এমন হইয়া থাকে যে, মহাত্মাজীর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাবশতঃ কংগ্রেসের অধিকাংশ বা বহুসংখ্যক সদস্য নিজেদের মতানুসারে কাজ করিবার বা কথা বলিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহা হইলে, এমন কথা কেহ অবশ্য বলিতে পারিবেন না যে, এই অবস্থা চলিতে থাকুক। কংগ্রেস হইতে মহাত্মাজীর সরিয়া দাঁড়ান ব্যতীত এই অবস্থা অবসানের অন্য উপায় না থাকিলে, তাঁহাকেও সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যদিও একথা মনে না করিয়া পারিতেছি না যে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরীক্ষার সময় তাহার চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার আর কিছুই হইবে না।

এই অবস্থার জন্য দায়ী কাহারা

কোনও কাজে সাফল্য লাভ করিবার জন্য নেতার প্রতি আনুগত্য খুবই প্রয়োজনীয়; সাধারণ সময় অপেক্ষা ঠিক কাজ করিবার সময় ইহার প্রয়োজন আরও বেশী। কিন্তু, নীতি বা কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণের সময় এই আনুগত্য, বিরুদ্ধ মতপ্রকাশের বাধাস্বরূপ বিবেচিত হওয়া উচিত নহে। মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু, মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যদি কেহ স্বাধীন মত প্রকাশে বিরত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি নিজের প্রতি, দেশের প্রতি এবং মহাত্মাজীরও প্রতি অবিচার করিয়াছেন। মহাত্মাজীর প্রতি দেশবাসীর অটুট শ্রদ্ধা আছে, কংগ্রেসের মধ্য দিয়া না আসিলেও, দেশের অনেক লোক তাঁহার কথা সমানই মূল্যবান মনে করিয়া শুনিত এবং তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার মতানুসারে কাজ করিত। কিন্তু, কংগ্রেস দেশের প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান; কাজেই ইহার মতকেও লোকে দেশের প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্রিক মত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহা প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের মত নহে, মহাত্মাজীর এমন কোন মত, প্রতিনিধি বা সদস্যদের দোষে যদি কংগ্রেসের মত বলিয়া দেশের লোকের নিকট আসিয়া থাকে তাহা হইলে, যাঁহারা লোকমতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা, শুধু মহাত্মাকে নয়, সমগ্র দেশকেই প্রতারিত করিয়াছেন।

মহাত্মা এবং কংগ্রেসের মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে এবং কোথায়, কোন বিষয়ে, কেন মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল তাহা জানিতে পারিলে, দেশের জনসাধারণ তাহাদের কর্ত্তব্য ও পথ স্থির করিতে পারিত।

যাঁহারা মহাত্মাজীর মুখ চাহিয়া, নিজেরা যাহা সত্য মনে করিয়াছেন তাহা বলেন নাই বা বলিতে পারেন নাই, বর্ত্তমান অবস্থাসঙ্কটের এবং মহাত্মাজীকে আকস্মিক বিদায় দিবার পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাদেরই।

কংগ্রেস ও মহাত্মাজীর নীতি

কংগ্রেসের আদর্শে মহাত্মাজী যে সকল পরিবর্ত্তন চাহিয়াছেন, তাহার মধ্যে বর্ত্তমানের 'শান্তিপূর্ণ' ও 'বৈধ' কথা দু'টির পরিবর্ত্তে "সত্যানুগামী" ও 'অহিংস' কথা দু'টি বসাইতে চাহিতেছেন। এই দুই প্রকার কথার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ পার্থক্য দেখা না গেলেও, প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে, প্রকৃতপক্ষে, কংগ্রেসের আদর্শ এবং সম্ভবতঃ উদ্দেশ্যও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

'শান্তিপূর্ণ' ও 'বৈধ' কথা দু'টি শুধুমাত্র আমাদের বাহিরের কার্য্য ও অনুসৃত নীতি সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। স্বরাজ-সংগ্রামে আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া কি ভাবে কার্য্য করিব, ইহা দ্বারা তাহাই মাত্র সূচিত হয়। যে কোনও মতের লোক, বাহির হইতে শৃঙ্খলা হিসাবেই এই নীতি মানিতে পারিলে, কংগ্রেসান্তর্ভুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন।

কিন্তু, প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে কংগ্রেসপন্থীদের, মনেপ্রাণে একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও মতের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভের সাধনায় সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা খুব বেশী লোকের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

সত্যাগ্রহকে মহাত্মাজী জীবনের মূলনীতি বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং অহিংসা প্রতিরোধকে ইহার অংশস্বরূপই ধরিয়া লইয়াছেন। তিনি এই সত্যের সন্ধানের জন্যই রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, রাজনীতি তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।

কিন্তু, কংগ্রেস সকল অর্থে এবং সর্ব্বপ্রকারে, ইহার মুখ্য ও গৌণ সর্ব্ববিধ উদ্দেশ্যে, রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান! ইহা কখনই কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক সত্য-সাধনার বা সত্যপ্রচারের ক্ষেত্র হইতে পারে না। রাজনীতিক উদ্দেশ্যেই মাত্র, সুবিধা বুঝিয়া ইহা কোনও বিশেষ পথ ও মতকে সিদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। মহাত্মাজীর অহিংস প্রতিরোধকেও ইহা এই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে।

মহাত্মা হয়ত তাঁহার আবিষ্কৃত সত্যের মধ্য দিয়া মানব-সভ্যতাকে এমন বহু মূল্যবান নূতন জিনিস দিতে পারিবেন, যাহার প্রভাব পৃথিবীর সমগ্র ভবিষ্য ইতিহাসের উপর রহিয়া যাইবে। কিন্তু, এই সত্যের সাধনা ও ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে অন্য উপায়ে এবং এই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

রাজার কুমারী

জসীমউদ্দীন

সোনার বরণ রাজার কুমারী, হাজার যুগের ঘুম লেখা তার চোখে মুখে আর গায়,
মলয় পাখির ডানায় চড়িয়া স্বপন-পরীরা সে ঘুমের দেশে নিতি আসে আর যায়।
রাজার কুমারী সোনার খাটেতে শয়ন করিয়া রূপার খাটেতে ছড়ায় চরণ দুটি,
চোখে আর মুখে আর হাতে পায়ে সারা গায়ে ফুল ফুটিয়া ফুটিয়া হেসে হয় কুটি-কুটি।
রাজার বাড়ীতে গড়াগড়ি যায় হীরা জহরত মণি-কাঞ্চন পথের ধূলায় প'ড়ে,
অভিযোগ করে পুরললনারা, ব্যথা পায় তারা চরণ রাখিয়া চলিতে তাহার পরে।
রাজার বাড়ীতে রাজকনে থাকে সন্ধ্যা সকাল আসিতে সেথায় লজ্জায় মরে যায়,
যদিও বা আসে রাজকুমারীর রূপ দেখে তারা দুইটি আকাশে মিশে যায় মূর্চ্ছায়।
রাজার বাড়ীতে চাঁদ ওঠে নাক, যদি ওরা ওঠে কেউ তার পানে ফিরিয়া চাহি না দেখে
রাজার বাড়ীতে রাজ কনে থাকে কোটী কোটী চাঁদ হাতে পায়ে আর চোখে মুখে তার মেখে
রাজার বাড়ীতে পরিচারিকারা গোলাপ জলের নহরে নাহিয়া কোন সুখ নাহি পায়,
রাজকুমারীর চুলের গন্ধে পাগল বাতাস আলসে হেলিয়া মূরছে তাদের গায়।
হয়রাণ হ'ল যত দাস দাসী কস্তুরীদল রৌদ্রে শুখাতে সারাটি দিবস ভরি,
কত যে পাষাণ ক্ষয় করে ছিল চন্দন ঘসি মলয় গিরির বুকখানি খালি করি।

রাজার বাড়ীতে রাজার কুমারী মুখ হ'তে তার এতটুকু হাসি বৃথা না গড়ায়ে পড়ে
চাহনি তাহার বৃথা নাহি হয় শিল্পীরা তাহা নানা কারুকাজে রেখেছে নকল করে।
রঙীন শাড়ীর আঁচল ধরিয়া রাজকুমারীর রঙীন মুখের সোনার হাসির লতা
প্রতি ঘরে ঘরে কুলবধূদের অঙ্গের সাথে সোহাগে জড়ায়ে ফিরিছে কহিয়া কথা।
রাজার বাড়ীতে রাজার কুমারী, ফুলের বিছানে শয়ন করিতে ফুলরেণু বেঁধে গায়
ময়ুর পাখায় বাতাস লইতে অঞ্চল ওড়ে সিঁথি ভেঙে যায়, বড় ব্যথা তার হায়।

সোনার বরণ রাজার কুমারী অঙ্গ হইতে স্থির বিদ্যুত গলিয়া গলিয়া পড়ে
রাঙা হ'য়ে পথ মাটিতে গড়ায় আলতা ছোপান চরণ দু'খানি ধরে।

চাঁপার বরণ দুটি বাহু বেড়ি প্রেম ভালবাসা গড়াগড়ি করি সোহাগেতে দোল খায়,
অধরের মায়া বাঁধন ছিঁড়িয়া কুন্দ-ধবল দন্তের মালা হাসিতে যে ঠিকরায়।
মোহের মতন ছায়ায় কায়ায় স্বপন জড়ান সাঁঝ কমলের মেঘ-রাঙা ফুলদল
সোনার অঙ্গে অঙ্গ মিলায়ে আলোতে নাহিয়া হাসিয়া খেলিয়া হেলে দোলে চঞ্চল।
হেরিলে তাহারে ভালবাসা হয়ে পথের ধূলায় অন্তরখানি বিছাইতে সাধ যায়,
হাজার বরষ কাটে অবহেলে বাঁশীতে পুরিয়া ভালকথা তারে শুনাবার সাধনায়।
আঁখিরে মাজিয়া শত ফুলদলে রামধনুকের রঙেতে ধুইয়া তবুও যে জাগে মনে
বহু অপরাধ করিয়া ফেলেছি সে সুমেরু পানে অযোগ্য মোর মেলি এই দুনয়নে।
সোনার বরণ রাজার কুমারী তাহারি লাগিয়া দূরগ্রহ হ'তে রাতের আঁধারে ভাসি,
শুক তারকার আলোককুমার তরণী ডুবায় সিঁদূর-মাখান ঊষার আকাশে আসি।
তাহারি লাগিয়া আসিতে আসিতে বিজলীর পরী চরণ ভাঙিয়া আকাশের কিনারায়,
রহিয়া রহিয়া শিহরিয়া উঠে, গুমরিয়া কাঁদে কাজল বরণ আষাঢ় মেঘের গায়।
সোনার বরণ রাজার কুমারী, হায় হায় আমি মাঠের বাঁশীতে গাহিলাম তারি সুর,
আকাশে র'য়েছে আকাশের চাঁদ, বেউর বাঁশের বাঁশী যে আমার যেতে নারে তত দূর।
দুগ্ধ ধবল রাজার প্রাসাদ, আটমহলার একটি মহলে সুগন্ধী আলো জ্বলে,
রাখাল ছেলের মেঠো বাঁশী কাঁদে অন্ত-বিহীন নিঠুর রাতের আঁধারের ছায়া তলে।

জসীমউদ্দীন



বীমা ও বাণিজ্য

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বসু

আজ এ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-যুগে একটা কথা প্রত্যক্ষ সত্যের মত সব মানুষের মনেই জেগে উঠেছে যে, মানুষের জগতে বাঁচতে হ'লে, সব মানুষকে সব মানুষের জন্যেই বাঁচতে হবে; সমানভাবে ভুগ্‌তে হবে, সমানভাবে সকলের জন্যে ভাবতে বুঝতে শিখতে হবে। এ যুগে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, জেলায় জেলায় এত কাছাকাছি আর এত নিবিড় একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছে যে প্রত্যেকের গোটা জীবনটাই নির্ভর কচ্ছে অপর অনেকের চিন্তা—চেষ্টার উপর। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে তো সব যুগে সব মানুষই আপনার হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আজ যে সকলকে সকলের দুয়ারে যেতে হ'চ্ছে শুধু জ্ঞানের জন্যে তত' নয়, যত বাঁচবার জন্যে, বাঁচাবার জন্যে। ব্যবসা নিয়ে জাপান হ'ল ভারতের অতিথি। ব্যবসায়, অর্থাৎ, দেবার আর নেবার জিনিষের দেয়া-নেয়া'র ভেতর দিয়ে, দেশ দেশের, জাতি জাতির—শত্রু, বন্ধু, আপন, পর হ'য়ে উঠলো সবই। কারণ, বাঁচবার প্রয়োজন সকলেরই আছে। আর সেই প্রয়োজনে সকলকে সকলের কাছে আস্‌তে হবে; হচ্ছেও।

মানুষের বেলায় যা সত্য, জাতির বেলায় সেটি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে—শুধু সত্য নয়—বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক জাতিরই—জগতে সমান দাবী আছে যেমন জাতি হিসেবে নিজের গৌরবে বাঁচবার—তেমি পরিপূর্ণ শ্রী ও সম্ভ্রমে বড় হ'বার।

মানুষের পক্ষে যা বাঁচবার গোড়ার কথা, জাতির পক্ষেও তাই। বাস্তব সম্পদ হোলো ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে মানুষের প্রথম অবলম্বন। জাতির সম্পদ হোলো তার বাণিজ্যে, তার ব্যবসায়; অন্য দেশ ও জাতির সঙ্গে বস্তুর আদান প্রদানের বিশেষ বিশেষ ধারা আশ্রয় করে জাতিগত—আত্মীয়তায়।

এ বৈশ্যযুগে সেই দেশই অপর সকলকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে, যে পেরেছে, নিজের অন্তর সম্পদের চেয়ে, বাস্তব সম্পদকে সৃষ্টি করে তার পুষ্টিসাধন করতে। আজ ভারতের বড়ো দৈন্য বাণিজ্য জগতে। এত বড়ো দেশে গোটাকতক অন্ততঃ নিজস্ব বড়ো ব্যবসা আছে বলে ভারতের গর্ব্বের কিছু নেই। তা নেই বলে, ফলে হয়েছে যে বেকার-সমস্যাটা এ দেশে—বিশেষ করে বাংলায়—যে রকম ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তা ভাবতে গেলেও গা' শিউরে ওঠে। এ কথা নিয়ে প্রচুর আন্দোলন আলোচনা হ'য়ে গেছে যে আজ যদি ভারতের নিজের বড়ো ব্যবসা থাক্‌তো তাহ'লে দেশের (বিশেষতঃ শিক্ষিত) যুবক সম্প্রদায় এ ভাবে কর্ম্মহীন ও জীবন্মৃত হ'য়ে থাক্‌তো না। দেশের শক্তি,—যুবশক্তি। দেশের শক্তি অর্থশক্তি। আর যুবশক্তি আর অর্থশক্তি হোলো সৃজনীশক্তি। এই সৃজনীশক্তি সৃষ্টি করে সম্পদ,—দেশের, জগতের, জাতির, ব্যক্তির! বাণিজ্য জগতে এ শক্তির স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি—শক্তিক্ষয় নয়, নতুন শক্তির সৃষ্টি। যে শক্তি সৃষ্টি হ'বে সেই শক্তিই জাতির ও জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের জীবনীশক্তি।

ভারত যদি কোনো দিন তীব্র জীবনীশক্তির প্রয়োজন অনুভব করে থাকে তো সেটা করছে আজ, এই বর্ত্তমান যুগে। তাই বাণিজ্যের প্রয়োজন, যুগের প্রয়োজন—সমাজ, ব্যক্তি জাতীয় জীবনের প্রয়োজন—তীব্র ও দুর্দ্দমনীয় প্রয়োজন।

একটা কথা হ'চ্ছে, যেটা বাস্তবিক প্রয়োজন, তার কোনো আইন নেই,—কেন সেটা প্রয়োজন! আর, সত্যি প্রয়োজন বলে পূর্ণও হয় সত্যি! যেমন হ'চ্ছে আজ ভারতে। সমবায় নীতিকে অবলম্বন করে কত প্রতিষ্ঠান

গড়ে উঠেছে তো! এর কারণ? কারণ হ'চ্ছে—এর বড়ো তীব্র প্রয়োজন ছিল!

কী ক'রে এ চেষ্টা এল? আচ্ছা, আজ যে ভারত বাণিজ্য জগতে পেছিয়ে আছে বলে অন্য সকলের সঙ্গে সমানে পা' ফেলে চল্‌তে পারছে না,—এ কথাটা কী এখনো দিনের আলোর মত সত্য হয়ে ওঠেনি?

উঠেছে। তাই চাঞ্চল্যও দেখা দিয়েছে। নিজের দুর্ব্বলতা কোথায়, এই বোধ, এই ধারণা—সমাজদেহে রাষ্ট্রনীতির অন্য সমস্ত সত্যার মত বিদ্যুৎগতিতে জীবনের প্রেরণা এনে দিয়েছে। এই প্রেরণাই সম্পদ-সৃজনের প্রেরণা—যেটা সকলের চেয়ে তীব্র প্রয়োজন।

সম্পদ-সৃষ্টি একটা কঠিন সমস্যা। এই কঠিন সমস্যার সমাধান আগে চাই, পরে অন্য কথা।

সব দিক থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সম্পদ-সৃষ্টি মানে শুধু ব্যক্তিগত অর্থ-সম্পদ সৃষ্টি নয়। জাতির সমূহ সম্ভাবনাকে সফল করা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির বিক্ষিপ্ত চেষ্টার কোনো মূল্য নেই। কাজ করতে হ'লে করতে হবে সহযোগে। সহযোগিতা বা সমবায় বাণিজ্যনীতির মূল কথা। আর যে কোনো বিরাট প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা ভিন্ন গড়ে ওঠে না। সত্যিই এমন কোনো বড়ো প্রতিষ্ঠান হ'তে পারে না যা' সহযোগিতা দ্বারা গড়া অসম্ভব।

প্রমাণ—য়ুরোপ, এমেরিকার জলন্ত, জীয়ন্ত বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলো!

সমবায়ের কেন প্রয়োজন? সমাজ-সমস্যা আর বাণিজ্য-সমস্যা প্রায় একই প্রশ্নের এ দিক ও দিক। অর্থাৎ, এখন জীবন যেমন জটিল হয়ে উঠেছে, নীতিও তেমনি জটিল,—কী বাণিজ্যনীতি, কী সমাজ ব্যবস্থা, আর কী রাষ্ট্রনীতি। এই জটিলতাকে স্বীকার করে সঙ্গতভাবে সকলের সঙ্গে সকলে কাজ করবার প্রেরণা হ'লো সমবায়ের আসল কথা।

সমবায় সম্পদ-সৃষ্টির যেমন সম্পদ বণ্টন ও রক্ষণেও তেমনি সমান প্রয়োজন। দেখ্‌তে হবে, ভারতে সমবায় নীতিকে অবলম্বন ক'রে কী ভাবে এর বাণিজ্য প্রচেষ্টা গড়ে উঠ্‌তে পারে। আর তার ফলে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি না ক'রে, কী ক'রে গঠন-মূলক কাজ সুশৃঙ্খলায় অগ্রসর হ'তে পারে।

সমবায় বা কো-অপারেটিভ-নীতি অবলম্বন ক'রে আজ দেশে তবু অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন ব্যাঙ্ক,—জেলায়, সহরে; যেমন বীমা-কোম্পানি; যেমন মিল,—কাপড়ের, কাগজের; যেমন ফ্যাক্টরী—সাবানের, ছুরি-কাঁচির; ইত্যাদি। এই সব বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে দেশের ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তি জড়িত আছেন। কেউ ডিরেক্টর, কেউ পরিচালক, কেউ পৃষ্ঠপোষক! তাঁরা জড়িত আছেন বলেই দেশের সর্ব্বসাধারণের আস্থাও আছে। বীমার কথা ছেড়ে দিয়ে, অন্য সব প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা ধরলে বুঝ্‌তে পারা যায়, একটু দেশের ওপর ও দেশবাসীর ওপর অনুরাগ থাক্‌লেই এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সাধারণ যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। যেমন, দেশী মিলের কাপড় কিনে স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করা। সেই রকম দেশের শিল্পজাত অন্য সমস্ত জিনিষ কিনে ও ব্যবহার করে সমানভাবে অন্য সমস্ত প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া যায়। এর জন্যে বেশী কিছু প্রয়োজন হয় না শুধু অন্তরে একটু সত্যকারের দেশপ্রীতি ছাড়া। সুখের বিষয় সে চেতনা ক্রমশই আস্‌ছে। যত আস্‌বে "সম্পদ-সৃষ্টি" বলে যে বড়ো প্রশ্নের অবতারণা করা গেছে তার সমাধানও সরল হয়ে আসবে।

কিন্তু সব কিছুর গোড়াতেই চাই আত্ম-চৈতন্য। অর্থাৎ চাই জাতি হিসেবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের চেতনা। তার গোড়ায় শিক্ষা। শুধু শিক্ষা নয়, প্রচার-মূলক যত রকম চেষ্টা হতে পারে সমস্তই। এই প্রচার-মূলক চেষ্টা হোলো তাঁদের কাজ যাঁরা দালালী করেন। বিশেষ ক'রে যাঁরা জীবন-বীমার এজেন্ট। তাঁদের কাজ সত্যিই খুব গভীর ও ব্যাপক। দেশের ধনশক্তি বৃদ্ধি করায় তাঁদের কাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মূল্য কতটা, পরে আলোচনা করা যাবে। আগেই বলা হ'য়েছে, বীমার কথা ছেড়ে অন্য অন্য সমস্ত বাণিজ্য প্রচেষ্টার সফলতা নির্ভর করে সর্ব্ব-সাধারণের দেশপ্রীতির ওপর। এইবারে বীমার কথা। বীমার আসল ওজন কতটা? অর্থাৎ, এর কাজের মূল্য কতটুকু?

শুধু এই জীবন-বীমার ক্ষেত্রেই দেখা যায় একটা গভীর ও গূঢ় প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা।

প্রশ্নটা হ'চ্ছে—সম্পদ-সৃষ্টি বা বাণিজ্যপ্রসারের প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে মানুষের জীবনের সঙ্গে কী কোরে জাগতিক অবস্থার বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তির আপোষ হ'তে পারে? সমাধান করার চেষ্টা হ'য়েছে যথেষ্ট—সে চেষ্টার ফল হ'ল—জীবন-বীমা! অদৃশ্য শক্তির হাত থেকে মানুষ মুক্তি কোনো দিন পাবে না। কিন্তু অন্তরে মানুষ জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারে একটা বিরাট মৈত্রী ও কল্যাণবুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে জগতের যাবৎ বিরোধ ও বিক্ষেপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কথা হ'চ্ছে, বাহ্যিক জীবনে কী কোরে প্রত্যক্ষ বিরোধের সঙ্গে সাম্য স্থাপন করা যায়? যে জিনিষটার ধ্বংসমূলক প্রভাব জীবনে অনিবার্য্য তাকে অতিক্রম না করা গেলেও—কী কোরে অন্ততঃ তার প্রভাবকে নমিত করা যায় তার চেষ্টা বিজ্ঞান অশেষভাবে করেও সঙ্গত কোনো উপায় নির্দ্ধারণ করতে পারে নি। যে বিজ্ঞান বাস্তবিক পেরেছে সেই বিজ্ঞানই হ'চ্ছে এই জীবন-বীমার ভিত্তি। সেটাকে অর্থ বিজ্ঞানের একটা দিক বলা যায়।

যাই হোক্, জীবন-বীমা যে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়িয়ে আছে, তা সকলেই স্বীকার করবেন। কারণ, ব্যবসা ছেড়ে ব্যবসাদারের জীবনকে এ যেমন একধারে আবৃত করে রেখেছে, তেমনি রেখেছে অন্য সমস্ত ব্যবসাকে বাঁচিয়ে।

এখন বিবেচনা করতে হবে, কী কোরে জীবন-বীমা সূক্ষ্মভাবে সমস্ত রকম সম্পদ-সৃষ্টির চেষ্টাকে সফল করেছে, করছে, আর ভবিষ্যতে কতদূর করতে পারবে—যে করার ওপর দেশের ও জাতির আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর কোরবে!

এখন দেখতে হ'বে, জীবন-বীমা কী ভাবে আমাদের অন্য সমস্ত ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ চাঁদা হিসেবে বীমা কোম্পানি যে টাকা পায় সেটা জড়ো হ'য়ে একসঙ্গে একটা বড়ো অঙ্ক হয়; বীমা সেটা নিজের ঘরে রাখতে পারে না; টাকা তাকে খাটাতেই হবে। এই খানেই কথা আসে, সব চেয়ে কোন্ রকম ভাবে টাকা রাখলে বেশী টাকা পাওয়া যাবে, অথচ সে টাকা মারা যাবার বা কোনো রকমে নষ্ট হবার ভয় থাকবে না। এ কথাটা বীমা কোম্পানিকে সব চেয়ে আগে ভাবতে হবে যে টাকা গচ্ছিত রাখা, বা, টাকা খাটানোর ব্যাপারে তাকে, অন্য যত রকম ব্যবসা হতে পারে সবাইকার চেয়ে, বেশী সাবধান হতে হবে। তার কারণ, বীমার টাকা তো কারো একলার টাকা নয়। এ সর্ব্বসাধারণের, দেশের, সকলের। যে কেরানী, সেও হাজার টাকার পলিসি কিনেছে, আবার ব্যবসাদার,—যার জীবনের দাম হয়ত খুব কম ক'রে লাখ টাকা,—সেও পঞ্চাশ হাজার টাকার পলিসি কিনেছে। সকলের পয়সা খাটছে। সকলেই তার পরিবর্ত্তে,—বীমার মাত্র একটা দিক দিয়ে বিবেচনা করে বললে, বলতে হ'বে,—আশা, আশ্বাস পাচ্ছে, যদি জীবন-হানি হয়—বীমা তার জীবনের মূল্য (অবশ্য টাকা দিয়ে যা ধরা যায় সেই) তার অসহায় পরিবারকে দেবে। জীবনে এটা ছোটো আশ্বাস নয়, এর মূল্য—বিশেষ ক'রে আমাদের এই গরীব দেশে—কতটা তা আজ ভারতে ইনসিওরেন্স চলছে বলে, বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আরো বোঝা আর বোঝানো দরকার। প্রত্যক্ষ ভাবে দরকার কেন-না,—শুধু কাগজে কলমে ইনসিওরেন্স সম্বন্ধে লিখলে যা, সেই ভাবে প্রচারের চেষ্টা করলে যা না হ'বে, সাধারণ শিক্ষিত অশিক্ষিত, সহর পল্লী-বাসীর চোখের ওপর এর প্রত্যক্ষ কাজ দেখালে তার চতুর্গুণ ফল পাওয়া যাবে। আর বীমা জনপ্রিয় হ'তে পারবে, শুধু এই পথেই। এ পথে কাজও আরম্ভ হয়েছে ফলও যা পাওয়া যাচ্ছে,—যদিও, এর চেয়ে ঢের বেশী কাজ করে অনেক বেশী ফল পাওয়া উচিৎ ছিল,—তবুও আমাদের গৌরব করবার যথেষ্ট কারণ আছে এই হিসেবে যে বাস্তবিক ইনসিওরেন্সটা আমাদের দেশে ক্রমে সত্যিই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে—এই ভেবে।

বীমার প্রধান গৌরব সে দেশের শিল্পকে বাঁচাবার জন্যে, দেশের বিভিন্ন ব্যবসার ভিতর নতুন প্রাণের সাড়া জাগাবার জন্যে যথেষ্ট—যদিও ঠিক আজ পর্য্যন্ত না করে থাকে, অন্ততঃ করবার চেষ্টা করছে।

একটা কথা শোনা যায়—ভারতের টাকা মরে আছে। সত্যি যাঁদের হাতে টাকা আছে তাঁরা টাকাকে মেরেই রেখেছেন বা রেখেছিলেন। সোনার গয়না, গিনি, কোম্পানির কাগজ (আরো দিন কতক আগে,—এবং এখনো) টাকা মাটীতে পুঁতে রাখা, ইত্যাদি আমাদের দেশের সব চেয়ে সোজা পথ ছিল টাকা জমাবার। টাকা বাইরে রাখতে কেউ রাজী নন। এমন কী দেশী ব্যাঙ্কে পর্য্যন্ত টাকা জমা রাখা নিরাপদ মনে করেন না অনেকে। তার কারণ যাই হোক, ইনসিওরেন্স এ মনোবৃত্তিকে ক্রমে দূর করছে। তাও সেটা পারছে শুধু এর গভীর, ব্যাপক ও নিগূঢ় সার্থকতার জন্যেই।

ইনসিওরেন্স ব্যাঙ্কের মত শতকরা সুদ দোবো বলে টাকা চাইছে না; টাকা চাইছে বটে; কিন্তু সে টাকার বদলে—টাকার শুক্‌নো সুদ দেবার চেয়ে, একটা আরো অনেক বড়ো দায়িত্ব মাথা পেতে নিচ্ছে। তাই ইনসিওরেন্সে যাঁরা টাকা জমা দিচ্ছেন তাঁরা—টাকা জমা রাখছি—এই কথাটা যত না ভাবেন, জীবনের বিনিময়ে টাকা জমা রাখছি—এই কথাটা তার চেয়ে আরো বড়ো ক'রে দেখেন।

এতে সুবিধে, ধনীর কাছে থেকে টাকা নিয়ে একত্র করার জন্যে বেগ পেতে হবে না। কারণ, টাকা জমা রাখাটাতেই ধনীর স্বার্থ। গোড়ার কথা বলতে গেলে বলতে হ'বে বীমা হ'চ্ছে—স্বার্থের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য। সকলেই উপকৃত হচ্ছেন। কারু বেশী কারু কম নয়। যিনি টাকা রাখছেন, তাঁর কথা তো ছেড়েই দিলুম; যেখানে টাকা জমা হ'চ্ছে,—একটা একটা আফিস গড়ে উঠছে; সেখানে কেরাণী-কর্ম্মচারী, ম্যানেজার ইত্যাদি অনেক অভিজ্ঞ লোকের কাজের সুবিধে হচ্ছে। যাঁরা বীমাপত্র বিক্রয় করেন, অর্থাৎ এজেন্ট,—তাঁরাও পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। টাকা জমা হ'বার পথেই এত কাজ হয়ে গেল। কোম্পানি টাকা পাওয়ার পর কী কোরবে?

সে টাকায় না হ'তে পারে এমন জিনিষ নেই। চলন্ত কারবারকে সাহায্য করা, বা নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সবই সম্ভব।

অবশ্য অত বড়ো কিছু আমাদের দেশে এখনো হ'য়ে ওঠেনি। তবে বলা হ'চ্ছে, হওয়া সম্ভব বা ভবিষ্যতে হ'বে। বলার উদ্দেশ্য যে আমাদের দেশে মূলধনের প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে বড়ো ও জটিল, ইনসিওরেন্স সেই প্রশ্নকেই সহজ ও সরল করে আনছে।

টাকা ধনীর কাছেই ছিল ও আছে। কিন্তু সেটাকে ব্যবসার ক্ষেত্রে এনে খাটানোর কোনো ব্যবস্থা এ যাবৎ হয়নি। যদিও হ'য়ে থাকে, সেটা হয়েছে ব্যক্তিগত ভাবে, খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর। তাতে ফলও যেমন সন্তোষজনক হয়নি বা হয় না, সমাজের আর জাতির স্বার্থ দিয়ে বিচার করলে তা তেম্নি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র চেষ্টা হ'য়েছে।

এখন সেই ব্যক্তিগত ভাবে কর্জ্জ নেওয়া রীতিটাকেই বড়ো ক'রে কাজে লাগালে আমরা এসে পড়বো বীমার আসল বিজ্ঞানের গোড়ায়।

আর একটা কথা, বীমা সমস্ত বাণিজ্যের স্তরে স্তরে জড়িয়ে আছে। কী কোরে? বেশী কথা নয়, বীমা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হয় দেখলেই বোঝা যাবে এর প্রসার কতটা।

বীমা হয়—মানুষের জীবনের ওপর। হয়, মোটরকার, বাড়ী, মাল-বোঝাই চল্‌তি জাহাজ—চল্‌তি কারবারের ওপর। ওদেশে হেন জিনিষ নেই যা বীমার দ্বারা সুরক্ষিত নয়। মজার কথা ইংলণ্ড, আমেরিকায় ফিল্ম অভিনেতার চোখের চশমা অবধি বীমা করা হয় হাজার হাজার টাকার; অভিনেত্রীর মধুর হাসিকে পর্য্যন্ত বীমা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের দেশে বীমা হ'তে পারে স্থাবর অস্থাবর জিনিষের ওপর,—জল, আগুন, আকস্মিক ও অনিবার্য্য আরো বহুতর বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। এই ত গেল এক দিক্। অন্যদিকে, সমাজের কল্যাণ, দেশের আর্থিক উন্নতি, বা সম্পদ সৃষ্টি।

এখন এই সম্পদ-সৃষ্টি করার ব্যাপারে বীমার টাকা লগ্নি করা একটা প্রধান কথা। লগ্নি করে শুধু টাকা বাঁচিয়ে রাখলে বা তা থেকে নামমাত্র সুদ পেলে বীমার চলবে না। অবশ্য তাতে বীমা বেঁচে থাকতে পারবে বটে, কিন্তু তার সম্পদ-সৃষ্টি করার কাজ একেবারে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেশের লোক দেখতে চায়, দেশের ও দশের টাকা, দেশের

জন্মে খাটছে। বীমা দেশের কথা ভাবলে, দেশ বীমার কথা ভাব্‌বে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'বীমা' বলে এত বড় একটা ব্যবসা রয়েছে একথাটা মোটামুটি শিক্ষিত ও সহর-বাসী ছাড়া প্রায় সকলেই জানেন না। জানাবার উপায় ইঙ্গিত করা গেছে... দেশের লোককে এর প্রত্যক্ষ স্পর্শ দিতে হ'বে। আজ না হোক্ ক্রমে এ চেষ্টা বেশ ভালো ক'রেই করতে হ'বে। কারণ, বাণিজ্য-জগতে যত আমরা পিছিয়ে পড়্‌বো, তত' আমরা জান্‌তে ও বুঝ্‌তে চেষ্টা কোরবো—সমবায়-নীতির ওপর ভিত্তি করে ব্যবসার ক্ষেত্রে কী এমন করা যেতে পারে যাতে ব্যক্তিগত-লাভ ছাড়াও—সমাজ ও দেশকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। তার উপায়ই হ'চ্ছে, শুধু বীমার প্রচার নয়—উপযুক্ত বিবেচনা ক'রে বীমার টাকা লগ্নি করা।

এই টাকা কী ভাবে লগ্নি ক'রে দেশের আর্থিক উন্নতি করা যায়, পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন বলে রাখা ভাল, ইনসিওরেন্সের যা কিছু দাবী দেশের কাছে, তা সমস্তই দেশের হিতে। কিন্তু একটা মজা এই 'ইনসিওরেন্স' বলে যে একটা আলাদা ব্যবসার ধারণা আছে আমাদের মূলে সেটা মোটেই একটা বিভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তু নয়! প্রত্যেক বীমা প্রতিষ্ঠান একটা কেন্দ্র মাত্র। সেখানে মূলধন আসে; সেখান থেকে মূলধন নিয়োজিত হয় উপযুক্ত ক্ষেত্রে। ইনসিওরেন্স বলে আলাদা কিছু নেই। ইনসিওরেন্স-ম্যানেজার ইনসিওরেন্স নয়; আপিসটা নয়; কর্ম্মচারীরা নন; ডিরেক্টাররাও নন; আবার যাঁরা চাঁদা দিচ্ছেন, তাঁরাও কেউ ব্যক্তিগত ভাবে দাবী করতে পারেন না; যদিও, মজা, সকলেই উপকার পাবেন।

এটা সকলের; অথচ কারু নয়। এটা দেশের; অথচ, প্রত্যেকের। প্রত্যেকের আলাদা ছোটো ছোটো, ছাড়া-ছাড়া স্বার্থ, একত্র হ'য়ে, দেশের ও সমাজের একটা গভীর স্বার্থে বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠেছে। সেই বিবর্ত্তনের ফল, ইনসিওরেন্স।

আজ বিজ্ঞানের যুগ, তাই ইনসিওরেন্সের কথাটা আশ্চর্য্য ঠেক্‌ছে না। কিন্তু যখন এদিন ছিল না—কথাটা তখন হয়ত স্বপ্নের কোঠায় ছিল, সে স্বপ্ন সফল হ'য়ে সৃষ্টি করেছে—কিছু বাস্তব, বিশাল, গভীর জিনিষ।

এ সৃষ্টি সম্পূর্ণ হ'তে সময় লাগ্‌বে। কারণ, একটা বিরাট জিনিষ কোনো দিন কখনো হঠাৎ গড়ে ওঠেনি। যদিই উঠে থাকে, সে তেমি হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেছে। আজ ইনসিওরেন্স আমাদের দেশে এখনো সমাজের সব শ্রেণীর অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করেনি বলে দুঃখ ক'রবার কিছু নেই। আজ বিলেতে না হয় মাথাপিছু ১৩০০ টাকা বা এমেরিকায় ২০০০৲ টাকার ইনসিওর করা আছে, যখন ভারতে, মাত্র মাথা পিছু ৩।৪৲ টাকা! তা বলে একথা কোনো দিন ভাবা উচিৎ নয় যে, এমন একদিন আস্‌বে না যখন দেখ্‌বো প্রত্যেকে সত্যিকারের দরদ দিয়ে জিনিষটার গুরুত্ব বুঝে, দেশের, সমাজ ও সাধারণের কল্যাণে এর নিবিড় প্রচেষ্টাকে সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে!

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বসু।

শরৎ প্রশস্তি

শ্রীরাধারাণী দেবী

বেদনা-কাতর অন্তর-তলে ছিলো
যে ব্যথা-মুকুতা শুক্তির বন্ধনে
চুনি চুনি সেই দুর্লভ মোতি দিলো
কে গো মালা রচি' অনুভূতি-চন্দনে ?

গভীর গহনে যে ফুল গাহিয়া গান
বিকায়েছে তার সুন্দরতর প্রাণ,
লোক-লোচনের ছিলো যারা অগোচরে—
কোন্ সন্ধানী তাদের এনেছে ঘরে ?

চির-অনাদৃত ঘৃণিত জনারে ডেকে
সবাকার মাঝে যে দিলো সহজ-ঠাঁই,
ঝরে আঁখি যার আর্ত্ত পশুরে দেখে
কোনো মানুষেরে ক্ষুদ্র যে মানে নাই।

পতিতেরও মাঝে প্রাণের ঠাকুর জাগে
সবারে এ বাণী শুনালো যে অনুরাগে,—
দলিত মানবে যে দিল নিবিড় স্নেহ,—
তারি প্রেম-দীপে দীপ্ত বাণীর গেহ।

বুকে তুলে নেছে ধূলায় ধূসর যারা,
স্খলিত মণিরে কুড়ায়ে গেঁথেছে হারে—
পাপের পঙ্কে প্রোথিত দেবতা তারা
প্রেমের আলোকে দেখালো যে বারেবারে !

রূপ-যৌবন বিদ্যা-বিভব-মান
চিত্ত-নিকষে সবি হয়ে গেল ম্লান,
অন্তর-ধনে ধনি যারা প্রাণবান্
সকল শ্রদ্ধা তাদেরি যে দিলে দান !

নারী-হৃদয়ের নবীন শিল্পী সে যে
জানে সে তাদের বিচিত্রতর মন ;
সমাজ-সীমার শীর্ণ পরিধি ত্যজে
উদার সত্যে করেছে সে আবাহন !

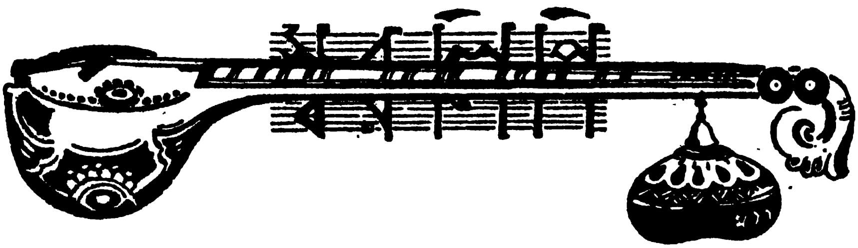
জঞ্জাল বলি দিনু যা জলাঞ্জলি,
নিখিল যাহারে গেল চলি পায়ে দলি,
মূল্য তাদের কেবা প্রকাশিল আজি ?
পথের ধূলায় লুটায় রত্নরাজি !!

প্রাণের পূজারি ! তোমার দৃষ্টি-পাতে
উজল হয়েছে ছিলো যা আঁধার দিক্,
বন্ধুর পথে নিবিড় তামসী রাতে
যাত্রা তোমার অচপল, নির্ভীক !

অগ্নি-অশনি উদ্যত তব শিরে
কূট-কণ্টক বেড়িছে চরণ ঘিরে
ব্যথিত-কণ্ঠ, সত্যদ্রষ্টা, তবু—
সত্য ভাষণে কুণ্ঠিত নহ কভু !

কাশ-পুষ্পিত আকাশে আকাশে আজি
ভাসিছে রূপালী ভাদ্র চন্দ্রালোক ;
শুভ্র মেঘেতে শঙ্খ উঠিছে বাজি
সোম-সুষমায় স্বপ্ন-সরস চোখ !

শিল্পী শরৎ ! সবার পূজিত দেশে,—
তবু আনিয়াছি তোমারেই ভালবেসে—
শারদ শেফালী হাস্তে রচিয়া মালা,—
চরণ-কমলে পূজার বরণ ডালা ॥



দাদ্‌রা (শারদীয়া)

এস শারদ প্রাতের পথিক
এস শিউলী বিছানো পথে।
এস ধুইয়া চরণ শিশিরে
এস অরুণ কিরণ রথে॥
দলি শাপলা শালুক শতদল
এস রাঙ্গায়ে তোমার পদতল
নীল লাবণী ঝরায়ে ঢল ঢল
এস অরণ্য পর্ব্বতে।

এস ভাদরে ভরা নদীতে ভাসায়ে কেতকী পাতার তরণী
এস বলাকায় ঝরা পালক কুড়ায়ে বাহি ছায়া-পথ শরণি।
এস শস্তে কুসুমে হাসিয়া—
এস হিমেল হাওয়ায় ভাসিয়া—
এস ধরণীরে ভালবাসিয়া—
দূর নন্দন তীর হ'তে॥

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

স্বরলিপি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

+ • + •
পা ধা II মপা পা জ্ঞা । রজ্ঞা রা সা । ন্‌সা রজ্ঞা রা । রা সা সা ।
এ স শা॰ র দ প্রা॰ তে র প॰ ॰॰ থি ক এ স

গা গা গা । গা গমা পধপা I গা মা -া । -া (পা ধা) II
শি উ লী বি ছা॰ নো॰॰ প থে ॰ ॰ এ স

পা পা II পা ধা পধপা । মা গা মা I পা ধা পধা । ণর্সা ণা ণধপা I
এ স ধু ই য়া॰॰ চ র ণ শি শি রে॰ ॰॰ এ স॰॰

পা ধা পধপা । মা গা গা গা মা -া । -া (পা পা) II
অ রু ণ॰॰ কি র ণ র থে ॰ ॰ (এ স)

মা মা II গা মা মা । পা ধা না I না র্সা র্সা । র্সা না র্সা I
দ লি শা প্‌ লা শা লু ক শ ত দ ল এ স
এ স শ ॰ স্তে কু সু মে হা সি য়া ॰ এ স

র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা । র্রা র্সা র্রা I র্সর্রা র্সর্রর্সা ণা । ধপা (-া -া) II
রা॰ ঙা য়ে॰ তো মা র প॰ হ॰॰ ত ল॰ ॰ ॰
হি॰ মে ল॰ হাও য়া র ভা॰ সি॰॰ য়া ॰॰ ॰ ॰

II গা মা । গা মা মা । গা মা মা । পা ধা ণা । র্সা ণা ণধপা ।
নী ল লা ব ণী ঝ রা রে চ ল চ ল এ স॰॰
এ স ধ র ণী রে ভা ল বা সি য়া ॰ দু র॰॰

পা -া পধা । পধপা মা গা । গা মা মা । -া (গা মা) II
অ ॰ র॰ প্যা॰॰ প র ব ॰ তে ॰ (নী ল)
ন ন্ দ॰ ন॰॰ তী র হ ॰ তে ॰ (এ স)

সা সা । সা সধা ধা । ণা ধা -া । পা ধা পমা । মা ধা পা ।
এ স ভা দ॰ রে ভ রা ॰ ন দী তে॰ ভা সা য়ে

পা ধা না । র্সর্রা র্সনর্সা র্সা । ধা ণা পা । -া পা পা ।
কে ত কী পা॰ ভা॰॰ র ত র ণী ॰ এ স

পজ্ঞা পা মগা । মা ধা পা । মা গমা রা । ন্া রা সা ।
ব॰ লা কার ঝ ॰ রা পা ল॰ ক ফু ড়া য়ে

সা রা মা । পা না র্সা । র্রা র্জ্ঞা র্সা । -া (সা সা) II II
বা হি ছা য়া প থ শ র ণি ॰ এ স

উক্ত গানখানি হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্ রেকর্ডে মিস্ অণিমা কর্ত্তৃক গীত হইয়াছে।

বাউল—দাদ্‌রা

আমায় ডাক্ দিল কে দিন শেষে
সুদূর পারে।
যেন চিনি গো চিনি সে মুখখানি
যেন দেখেছি তারে।
তার অশ্রু ছাওয়া করুণ আঁখি
ডাকে ইশারায় থাকি থাকি—
সে যে আমারি তরে চির বিরহী আন্‌মনা রে।

স্বপন পারে ডুবিছে রবি
পথিক হাওয়া চল্‌ছে গেয়ে
ব্যথার পূরবী।
হিয়ায় আমার তাইত আজি
গানখানি তার উঠ্‌লো বাজি
বুঝি বা তায় পাব দেখা
একলা পথের ধারে।

কথা—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

+ ২
মগা -মা II পা -না না । ধা পা -া I -া -া -া । -া মগা -মা I
আ॰ মার্ ডা ক্ দি ল কে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ আ॰ মার্

পা -না না । ধা পা -ধা I পা -মপা -দপা । মা গা -মা I
ডা ক্ দি ল কে ॰ দি ন॰ ॰॰ শে ষে ॰

পা পা -দা । র্সা -না দা I পা -া -া । -া পমগা -মা I
সু দূ ॰ র ॰ পা রে ॰ ॰ ॰ আ॰ মার্

পা -না না । ধা পা -া I -া -া -া । -া পনা না I
ডা ক্ দি ল কে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ যে ন

না র্সা -া । নর্সা -র্রা সনা I র্সা -া -া । -া -া -া I
চি নি ॰ গো॰ ॰ চি নি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

না ধনা -র্সনা । -ধপা -া ধা I মা -া -া । -া -মা -পা I
সে মু॰ ॰॰ ॰খ ॰ খা নি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

-গা -া -া । -া গা গা I পা পা -দা । পদা -ণা দা I
॰ ॰ ॰ ॰ যে ন দে খে ॰ ছি॰ ॰ তা

পা -া পপা । -মগা পমগা -মা II
রে ॰ ॰॰ ॰॰ আ মার্

+ ২
পা -া II সা -া -রা । পা -া মা I পা -া -া । -া -া -া I
তা র্ অ ॰ শ্ রু ॰ ছাও য়া ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

পা মপা -পদা । মা -গা মা পা -া -া । -দা -া -া I
ক রু॰ ॰॰ ণ ॰ আঁ খি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

দা দা -া । দা দা -া I পদা -পদা -পা । -মা -া -া I
ডা কে ॰ ই শা ॰ রা॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ য়

মা পা -া । মপা -দপা -মপা I গা -া -া । -া না না I
থা কি ॰ থা॰ ॰॰ ॰ কি ॰ ॰ ॰ সে যে

না না -র্সা । র্সা -র্রা র্সনা I র্সা -া -া । -া -া -া
আ মা • রি • ত রে • • • • •

র্সনা নধা -ধপা । মপা -ধপা মা I জ্ঞা -মা -া । -া -া -া I
চি র • বি• •• র হী • • • • •

[ধনা র্সর্ণা ধা]
পা -া পনা । ধা -না র্ধা I পা -া -ধপা । -মগা মগা -মা II
আ • ন্ ম • না রে • •• •• আ• মায়্

\+ ২
II { সা -পা -া । পা পা -া I পা দা -া । পা -া পা I
স্ব প ন্ পা রে • ডু বি • ছে • র

জ্ঞপা -দপা -জ্ঞগা । -জ্ঞা -গা -া I (গা জ্ঞা -া । পা -া ধা I
বি• •• • • • • প থি ক্ হা ও য়া

জ্ঞা -ধা পা । জ্ঞা গা -া I গা গজ্ঞা -পা । -গজ্ঞা গা জ্ঞা I
চ ল্ ছে গে রে • ব্য থা• • •র্ পূ র

সা -া -া । -া -া -া) } I { গা গা -া । জ্ঞা ধা -া I
বী • • • • • হি য়া - য়্ আ মা র্

না -া র্সা । নর্সা র্রর্সা না I র্সা -া -া । -া -া -া I
তা ই ত আ• •• • জি • • • • •

র্সা -র্গা র্গা । র্রা র্সা -া I র্সা র্রা র্সা । র্সনা -ধা না I
গা ন্ খা নি তা র্ উ ঠ্ লো বা• • জি

(র্সা -া -া । -না -ধা -পা) } I র্সা -া -া । -া -া -া I
রে • • • • • রে • • • • •

না না র্সা । না ধা -পা I ধা পা -া । মা গা -মা I
বু ঝি • বা তা র্ পা ব • দে খা •

[ধনা র্সর্ণা ধা]
পা -া পনা । ধা না -ধা I পা পা -ধপা । -মগা মগা -মা II II
এ • ক্ লা প থে র ধা রে •• •• আ• মায়্

শত্রুপক্ষের মেয়ে

শ্রীমনোজ বসু

বর্ষাকাল। নরহরি চৌধুরী সদরের মাঠে শ'খানেক খড়ের চালা তুলিলেন; আবার তার পাশের উলুক্ষেতটাও সাফ করিতে লোক লাগাইয়া দিলেন। ঢালি ও লাঠিয়ালের যে কয়টা দল ছিল, তারা সব সড়কি-লাঠি ফেলিয়া আপাততঃ ঘর বাঁধিতে লাগিয়াছে। অবাক হইয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—দুটো জায়গা কি হবে, চৌধুরী মশাই?

চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন—একটায় থাকবে মানুষ, আর একটায় ছাতি। বাবাজীবন কি আর দলের মানুষ একটাও ছেড়ে আসবেন? তোরাও কিন্তু তৈরী থাক্‌বি, বাছারা।

আর যাইবে কোথায়! বিয়ের দিন দশেক বাকী, কিন্তু লাঠিয়ালেরা উৎসাহের প্রাবল্যে এখন হইতে লাফাইতে সুরু করিল। তিন-চার জেলা জুড়িয়া কীর্ত্তিনারায়ণের দলের নাম-ডাক, এবারে সেই-দলের সঙ্গে মোকাবিলার সুযোগ মিলিয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল, একটা লোক আর নরহরি খুঁজিয়া পান না। কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া সকলে নদীর ধারে গিয়া লাঠি ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া হাত চোস্ত করিতেছে।

বর কীর্ত্তিনারায়ণ স্বয়ং। কীর্ত্তিনারায়ণ একলা লাঠি ধরিয়া একশ' লোকের মহড়া লইতে পারে; গায়ে অসুরের বল; আজ পর্য্যন্ত কোন দিন কোন জায়গায় হঠিয়া আসে নাই। এ হেন পাত্রের জোগাড় করিতে নরহরিকে বিস্তর যোগাড়-যন্ত্র করিতে হইয়াছে; আজ পাঁচ বৎসর তাক করিয়া বসিয়া আছেন—অবশেষে আকাশের চাঁদ ধরা দিল। মেয়ের বিয়ে দিতে বসিয়া নরহরি চৌধুরী মনের আনন্দে তাই দু'হাতে খরচ করিতেছেন।

সেদিন পূর্ণিমা রাত। আর, এমনি দৈবচক্র, বর্ষাকালের আকাশে একখানিও মেঘ নাই, ফুটফুটে জ্যোৎস্না হাসিতেছে। মশাল জ্বালিয়া বাজনা বাজাইয়া মুহুর্মুহু তোপ দাগিতে দাগিতে বরপক্ষ ফটকের সামনে আসিল। আগে-পিছে কীর্ত্তিনারায়ণের লাঠিয়াল লাঠি উঁচাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া চলিয়াছে। এমনি সময়ে বজ্রকণ্ঠের হুকুম আসিল—জকার থামাও—এটা চৌধুরী বাড়ি।

সর্দ্দার লাঠিয়াল বরের পাল্কীর মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করব, ছোট হুজুর?

কীর্ত্তিনারায়ণ চোখ পাকাইয়া বলিল—খোকা হ'য়ে গেলে সর্দ্দার? আমরা কবে কার হুকুম মেনে চলি?

—মানে, বিয়ে কিনা?...ওঁরা হলেন শ্বশুর। অপ্রতিভ-মুখে সর্দ্দার আমতা আমতা করিয়া সরিয়া গেল। আরও শতগুণ চীৎকার উঠিল।

চৌধুরীর লাঠিয়ালেরা তখন বুক ফুলাইয়া ফটক আটকাইয়া দাঁড়াইয়াছে—খবরদার!

কথাবার্ত্তা আর কিছু নয়,—লাঠির পরে লাঠি। তেল-চকচকে পাঁচ-হাতি লাঠি—লোহা বাঁধানো। লোহায় লোহায় আগুন ছুটিতেছে। মরদ-জোয়ানের তাজা রক্তে বাঁশের লাঠি সব লাল হইয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ, বাবাগো—! কীর্ত্তিনারায়ণের সর্দ্দার লাঠিয়াল ভূমি লইয়াছে। চৌধুরী পক্ষের ক'জনে ছোঁ মারিয়া আহত সর্দ্দারকে তুলিয়া চলিল, সদর মাঠের খড়ের চালার একটাতে। সহসা দৈববাণীর মতো উপর হইতে গম্ভীর কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—ওগো কুটুম্বের দল, কেন মারামারি করছ? পারবে না। তার চেয়ে চুপচাপ ঢুকে পড়,—চৌধুরী বাড়িতে জকার দিয়ে কেউ ঢুকতে পায় না—

মাথা তুলিয়া সকলে দেখিল, স্বয়ং নরহরি চৌধুরী অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বরপক্ষ পিছাইতে পিছাইতে প্রায় এক রশি পিছাইয়া আসিয়াছে। কণ্ঠ নিস্তেজ। সর্দ্দার নাই, কাহারও আর বুকে বল নাই। একজনে আবার পাল্কীর কাছে হুকুম লইতে গেল—কি হবে?

—কাপুরুষ! বলিয়া বর রুখিয়া উঠিল। চোখ দিয়া আগুন ছুটিতেছে। দাঙ্গা-ক্ষেত্রের একধারে ষোল বেহারা পাল্কী লইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল। কীর্তিনারায়ণ স্থান-কাল ভুলিয়া গেল; এক জনের লাঠি ছিনাইয়া লইয়া হুঙ্কার দিয়া সে পাল্কীর মধ্যে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। পাল্কীর ছাউনী চড়-চড় করিয়া মাথার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠিল। লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক লাফে সে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আবার আকাশ-ফাটানো জয়ধ্বনি। সিংহ গর্জ্জন করিতে করিতে ডাহিনে বামে সামনে তীরগতিতে পালট মারিয়া বেড়াইতেছে। নরহরির নিজের হাতে বড় যত্ন-করিয়া-গড়া ভাল ভাল ওস্তাদ—সকলে ধুলায় লুটোপুটি খাইতে লাগিল। দুঃখে কি আনন্দে বুড়া চৌধুরীর চোখের কোণ চকচক করিয়া উঠিল, আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। অন্তঃপুরে কনে-চন্দন পরিয়া নানা অলঙ্কারে সাজিয়া মেয়ে রাজরাজ্যেশ্বরী হইয়া বসিয়াছিল, গিয়া তার হাত ধরিয়া ডাকিলেন—সুবর্ণ, দেখসে মা,—তোর বাবার বাবা এসেছে। একটা খেলোয়াড় বটে,—দেখে যা—

সুবর্ণলতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে চৌধুরী আবার অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বর তখন দলবল লইয়া ফটকের মধ্যে ঢুকিয়াছে। কপাল কাটিয়া রক্ত দরদর করিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি; সদরবাড়ির বড় বড় হাঙর-মুখো থাম, চক-মিলানো উঠান, বিপুলায়তন কক্ষগুলি·· জয়ধ্বনি তার মধ্যে গমগম করিয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রহত হইয়া ফিরিতে লাগিল। বিমুগ্ধ দৃষ্টি প্রাণপণে বিস্ফারিত করিয়া নরহরি বলিলেন—যদি বয়স থাকত মা, আজ জামায়ের সঙ্গে একহাত লড়ে দেখ্‌তাম। সার্থক লাঠি ধরা শিখেছে—

কিন্তু সুবর্ণলতার সোনার মতো মুখখানি অন্ধকার। সহসা মেয়ের চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল। বলিল—তুমি লড়লে না বাবা, চৌধুরী-উঠোনে তাই আজ অমন করে জকার দিয়ে বেড়াচ্ছে।

—তা হোক্, তা হোক্—আমার জামাই আজ আমায় হারিয়ে দিল। বলিতে বলিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া বুড়ার উচ্ছ্বাস থামিয়া গেল। বলিলেন—তোর বুঝি অপমান হল? আ আমার কপাল!

মেয়ের চোখ মুছাইতে গিয়া চৌধুরী হি-হি করিয়া হাসিয়াই আকুল।

সদর মাঠের সেই একশ' চালায় দু'পক্ষের লাঠিয়ালের বাসা। আর উলু-ক্ষেত মারিয়া তাদের ছাতা রাখিবার জায়গা হইয়াছে। তালপাতার ছাতা, বন্ধ হয় না,—মানুষের যা জায়গা লাগে ছাতারও তাই। বরপক্ষের যারা আহত, চৌধুরীর লাঠিয়ালেরা তাদের রক্ত ধুইয়া দিতেছে, আবার চৌধুরীর দলে যারা হাত পা ভাঙিয়াছে তাদেরও সেবা দুদ'লে মিলিয়া মিশিয়া হইতেছে। এখন লাঠালাঠি শেষ হইয়াছে, একই ঘরে এ-দলের-ওদলের একত্র বিছানা।

কিন্তু মুস্কিল হইল বরের। মাথায় কাপড়ের পটি বাঁধিয়া বিয়ে হইয়া গেছে, তখন জয়ের আনন্দে মাথার চোট একটুও বাজে নাই। বাসর হইয়াছিল, কত কত মেয়েরা আসিয়াছিল, লাবণ্যমতীরা প্রশংসমান চোখে বার বার তার দিকে তাকাইতেছিল, এ বাসরে আজ লঘু হাসি-পরিহাস জমিতে পারে নাই—ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল ঐ একই কথা, সবাই বলে—কি চমৎকার! এত সব ব্যাপারের মধ্যে কখন যে মাথা কাটিয়া সামান্য ক'ফোঁটা রক্ত পড়িয়াছে—সে কথা মনে পড়িবার ফুরসৎ কোথায়? কিন্তু এখনকার অবস্থা আর এক রকম। সে সব মানুষ জন চলিয়া গেছে। কোণের দিকে মিটিমিটি একটি প্রদীপ। কীর্তিনারায়ণের মাথার রগ কাটিয়া যেন ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল, অথচ মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবার জো নাই,—শত্রুপক্ষের মেয়েটি খাটের কোণে।

নিস্তব্ধ রাত্রি। দারুণ যন্ত্রণায় কপাল চাপিয়া ধরিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্না হাসিতেছে। ঝুপসি ঝুপসি গাছগুলার মাথার উপরে জোনাকী উড়িয়া বেড়াইতেছে। তার উপরে—অনেক উপরে অনন্ত তারকাশ্রেণী। একটুও হাওয়া নাই। ঝিঁঝি ডাকিতেছে, একটা কুয়োপাখী একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে।…কীর্ত্তিনারায়ণ সন্তর্পণে তাকাইয়া দেখিল, শত্রু-পক্ষের মেয়েটির একদম সাড়া-শব্দ নাই, জড়সড় হইয়া একই ভাবে পড়িয়া আছে। ঘুমাইয়াছে বোধ হয়।

—দুত্তোর! দেয় বলে, দিকগে—। বিরক্ত হইয়া কীর্ত্তিনারায়ণ আসিয়া শুইয়া পড়িল। এক হাতে রগ চাপিয়া আর এক হাতে পাখা লইয়া জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

তারপর কখন এক সময়ে তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে, হাতের পাখা খসিয়া পড়িয়াছে। ঘুমের মধ্যে যেন কীর্ত্তিনারায়ণের নাকে আসিল, অতি স্নিগ্ধ একটা গন্ধ, যেন ঝিনঝিন করিয়া ভারী মিষ্ট সুরে কঙ্কণ বাজিতেছে, বাজনার তালে তালে পাখীর পালক দিয়া বুঝি কে কোমল হাওয়া করিতেছে, কপালের ক্ষত জায়গায় অনেকগুলা গন্ধ-ভরা ফুল রাখিয়া দিয়াছে···খপ করিয়া সবল মুঠিতে সে ধরিয়া ফেলিল—ফুল নয়—একখানি হাত। চোখ খুলিতে না খুলিতে শত্রুপক্ষের মেয়ে অতি অবহেলায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ এক মুহূর্ত্তে সকল ব্যথা ভুলিয়া খাড়া হইয়া বসিল। বিস্ময়ে ক্ষণকাল কথা ফুটিল না। বলিল—আমার হাত থেকে তুমি হাত ছাড়িয়ে নিলে?

সুবর্ণলতা কথা কহে না।

কপালে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল—এখানে চন্দন লাগিয়েছ তুমি?

শত্রু-পক্ষের মেয়ে তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কীর্ত্তিনারায়ণ বাধা দিয়া বলিল—যেও না। পরীক্ষা হোক। হাত দাও—আবার ধরি। আমি ঘুমচোখে ধরে-ছিলাম, তাই ছাড়াতে পেরেছ।

সে ধরিতে গেলে মেয়েটি ছোট্ট পাখীটির মতো
উড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শেষরাতে অস্তগামী চাঁদের আলো বিছানায় লুটাই
পড়িয়াছে। হঠাৎ বরের ঘুম ভাঙ্গিল। দেখে, সুবর্ণল
ইতিমধ্যে আবার কখন আসিয়া ঘুমাইয়া আছে। পর
মেয়ে—অজানা, অচেনা—বিপক্ষ দলের লোক—গায়ে অ
হাতটা দিল না। ডাকিল—ওগো কন্তে, শোনো—শোনো-

হাঁকাহাঁকিতে সুবর্ণ জাগিয়া চোখ মেলিল। কি বু
স্বপ্ন দেখিতেছিল, ক্ষীণ মধুর একটু হাসি মুখে লাগিয়া আছে
সন্ধ্যায় চৌধুরী-বাড়ির অপমানের ছায়ামাত্র আর মুখে নাই
কীর্ত্তিনারায়ণ কহিল—দেখ, একটা পরীক্ষা হওয়া দরকার—

বধূ এই প্রথম কথা কহিল। মৃদুস্বরে কহিল—আ
একদিন—

—ভয় পেয়ে গেলে? হো-হো করিয়া কক্ষ কাটাই
পালোয়ান বর হাসিতে লাগিল। বলিল—এই যে শুনি,
চৌধুরী মশায় নিজে তোমায় কুস্তি-কসরৎ শেখান। খালি
হাত, লাঠি, সড়কি—যা তোমার খুসী; আমার কিছু
আপত্তি নেই। আমার হাত যখন ছাড়িয়ে গেলে—ঘুমই
হোক, যা-ই হোক একটু কিছু আছে নিশ্চয়। এসো—
পরীক্ষা হয়ে যাক্—

বধূ মধুর হাসিয়া বলিল—বেশ তো লোক। আমি
ঘুমুব না বুঝি, আমার ঘুম পাচ্ছে—

—তা হলে হার স্বীকার কর। বল, যে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম বলে হাত ছাড়াতে পেরেছ, নইলে পারতে না—বল—

—তা-ই, তা-ই। বলিয়া স্বচ্ছন্দে পরাজয় মানিয়া বধূ ঘুমাইতে লাগিল।

এরকম আপোষে জিতিয়া কিন্তু কীর্ত্তিনারায়ণের মনের মধ্যে কাঁটা বিঁধিতে লাগিল। ঘুম হোক, যা-ই হোক—তবু কীর্ত্তিনারায়ণের হাতের মুঠি। বড় বড় মরদে হিমসিম খাইয়া যায়, আর মেয়ে মানুষ হইয়া সে-হাত ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল!

বর ও বধূ বাড়ি গিয়াছে। কীর্ত্তিনারায়ণ দিন রাত পরীক্ষার সুযোগ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু বধূর পাত্তা পাওয়া ভার। সারাদিন কুটুম্ব-মেয়েদের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া শুনিয়া কাজ-কর্ম্ম করিয়া বেড়ায়, গভীর রাত্রে নিদ্রা-কাতর চোখে ঘরে আসে। আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে, তখন আর জাগাইতে মায়া হয়। এমনি করিয়া দিন কাটিয়া যায়, পরীক্ষা আর ঘটিয়া উঠে না।

একদিন ফাঁক পাইয়া কীর্ত্তিনারায়ণ বধূর হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল—আজ আর ছাড়ছি নে। ধরিয়াই তখনি ছাড়িয়া দিল। ছি—ছি, এই তাহার প্রতিপক্ষ! হাত ত নয়, যেন এক মুঠা তুলা। যেখানটায় ধরিয়াছে, কাঁচা হলুদের মতো রং একেবারে লাল টকটকে হইয়া উঠিয়াছে। হাসিয়া বলিল—আচ্ছা কুস্তিগীর ত! বাপের কাছে শিখে শিখে বুঝি এই এই শরীর বানিয়েছ!

কীর্ত্তিনারায়ণ এতদিনে নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিল।

আশ্বিন মাস, বাড়িতে পূজা; আবার বধূ আসিল। কীর্ত্তিনারায়ণের বিধবা মা'র শুচি-ব্যাধি বড় উদ্ভট রকমের। লোক-জনের অভাব নাই, মুখের কথা মুখে থাকিতেই পরম শুদ্ধাচারে বাড়িতে সর্ব্ব রকম উদ্যোগ-আয়োজন হইতে পারে। কিন্তু মায়ের তৃপ্তি হয় না, ঘাটে বসিয়া ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া যান। চাতালে বসিয়াও বুড়ীর শান্তি নাই, সেখানে কত লোকের আসা যাওয়া, কত কি অনাচার; জলের ধারে একদিকে একটি প্রকাণ্ড তেঁতুল-গুঁড়ি; ঐটি তাঁহার একান্ত নিজস্ব। ধুইতে ধুইতে কাঠখানা একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে।

পূজামণ্ডপে ঢাক বাজিতেছে, অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যাইবার কথা। সকাল সকাল বধূ ঘাটে আসিয়াছে, শাশুড়ী আসিয়াছেন, এবাড়ি ওবাড়ির আরও কয়টি মেয়ে আসিয়াছে। পুকুর কিছু শুকাইয়া গিয়া তেঁতুল গুঁড়ি হইতে অনেকটা দূরে জল সরিয়া গিয়াছে। বধূ তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল, দূর হইতে জল আনিয়া আনিয়া গুঁড়ি ধুইতে মা'র বড় কষ্ট হইতেছে। মাথার উপর খররৌদ্র, এত বেলা পর্য্যন্ত এখনো তিনি জল গ্রহণ করেন নাই।...সাঁতার দিয়া তীরবেগে সে সেইখানে গিয়া গুঁড়িটা দু'হাতে বেড়িয়া ধরিল!

মা হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন—ছুঁয়ে দিলি পাগলী মেয়ে?

—নেয়েছি যে। হাসিয়া ফেলিয়া সুবর্ণ বলিল—কাঠটা জলের দিকে একটু সরিয়ে দিই—দেব মা?

—হুঁ, হাত-পা ভেঙে কাণ্ড কর একখানা।...ওকি? ওকি? ওকি?—

সকলের চক্ষু কপালে উঠিয়া গিয়াছে। বধূ স্বচ্ছন্দে গুঁড়িটা তুলিয়া জলের ধারে ফেলিয়া দিল।

আর-আর মেয়েরা ছুটিয়া কাছে চলিয়া আসিল। সকলের মধ্যে পড়িয়া সুবর্ণ লজ্জারক্ত মুখে আঙুলের নখ খুঁটিতে লাগিয়াছে। মা আহ্নিক ভুলিয়া একেবারে তাকে কোলে জড়াইয়া ধরিলেন। আনন্দ-দীপ্ত মুখে পরম স্নেহে বধূর চিবুক তুলিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—সুখে থাকো, মা লক্ষ্মী। আমার কীর্ত্তিনারায়ণের জোড়া হয়ে চিরদিন বেঁচে বর্ত্তে থাকো।

মুখ তুলিয়া বধূ আস্তে আস্তে কহিল—কেউ যেন বলে দেয় না মা, তা হলে অনর্থ হবে।

তাহা সকলেই জানে। হাসিমুখে মা সকলকে শাসন করিয়া দিলেন—কেউ তোরা বল্‌বিনে কিন্তু—খবরদার!

মায়ের অসুবিধাটা কীর্ত্তিনারায়ণেরও নজরে পড়িয়াছে। পূজা-বাড়ির নানা কাজৎকর্ম্মের মধ্যে করি—করি—করিয়াও এ কয় দিন হইয়া ওঠে নাই, আজ তেল মাখিয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া একেবারে সে পুকুরের সেই দিক দিয়া নামিল।

সর্দ্দারও নাহিতে আসিয়াছিল, কীর্ত্তিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল—যাত্রা শুনে সব ত তোমরা বেঁহুস হয়ে ঘুমুচ্ছিলে, আবার এদিকে এলে কখন?

সর্দ্দার ঘাড় নাড়িল,—আসে নাই।

গুড়িটা দেখাইয়া মহা বিস্ময়ে কীর্ত্তিনারায়ণ তাকাইয়া পড়িল।—তবে?

স্নান ঐ পর্য্যন্ত। মনের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো একটা কথা জাগিল, কীর্ত্তিনারায়ণ ভিজা কাপড়ে অন্তঃপুরে ছুটিল। মা মহাভারত পড়িতেছিলেন; খালি চোখে দিব্য পড়িতে পারেন। আর কপালে হোমের ফোঁটা পরিয়া স্নিগ্ধ তদ্গত মুখে বধূ বসিয়া বসিয়া পাঠ শুনিতেছিল। ঝড়ের মতো ছুটিয়া গিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ প্রশ্ন করিল—গুঁড়ি কে সরিয়েছে মা?

এক নজর চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া মা পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন।

বধূর সঙ্গে কীর্ত্তিনারায়ণের একবার চোখোচোখি হইল, বধূ মুখ নামাইল। অধীর কণ্ঠে কীর্ত্তিনারায়ণ কহিতে লাগিল—আমার সর্দ্দারও ওটা একা নাড়াতে পারে না। আজকে লোক-জন যাত্রা শুনে ঘুমুচ্ছে; তুমি কোথায় লোক-জন পেলে, কারা সরিয়ে দিল? ও ত এক-আধটা লোকের কাজ নয়—

পড়া থামাইয়া মা বলিলেন—একটা লোকের কাজ। তুই এখন নাইতে যা দিকি—

—কে লোক? বল, বল, নইলে মাথা খুঁড়ে মরব। কীর্ত্তিনারায়ণ যেন ক্ষেপিয়া উঠিল, বুকের উপর থাবা মারিয়া বলিতে লাগিল—আমি,—আমি,—এ অঞ্চলের মধ্যে একটা মাত্র লোক আছে, যে একলা ঐ কাঠ তুলতে পারে—সে তোমার ছেলে। আর পারত নরহরি চৌধুরী, জোয়ান বয়সে। নরহরি চৌধুরীর মেয়ে করেছে কি না,—সেই কথাটা তুমি আমায় বল, মা। আমি একবার ওর সঙ্গে লড়ে দেখব তা হলে—

বলিয়া সুবর্ণের দিকে এমন তাকাইতে লাগিল, যে ভয় পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। চেঁচামেচিতে মেয়েরা যে যেখানে ছিল, আসিয়া ভিড় করিয়াছে। রঙ্গিণী বধূর হাত ধরিল। ফিস-ফিস করিয়া বলিল—পালিয়ে এস বৌদি, দাদা রেগে গিয়েছে। মারবে।

রোখ প্রায় সেই রকমই। রঙ্গিণী ঘাটে ছিল না; কাজেই সবটা জানে না। বৃত্তান্তটা ভাল করিয়া শুনিতে বধূকে লইয়া সে দরজা দিল। দরজার উপর দমাদম লাথি পড়িতেছে। কীর্ত্তিনারায়ণের চীৎকারে চারিদিক চৌচির হইয়া যাইতেছে। বলিতেছে—দুয়োর খোলো, চৌধুরীর মেয়ে। ফাঁকে ফাঁকে জিতে গেলে হবে না। আজ আমি কিছুতে ছাড়ব না।

লাথির পরে লাথি। খিল ভাঙিয়া দরজা খুলিয়া গেল। দুই হাত কোমরে দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে বধূর মুখে চাহিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ প্রশ্ন করিল—তুমি গুঁড়ি সরিয়েছ?

বধূর এত যে ভয়, কোথায় যেন চলিয়া গেল। মৃদু হাসিয়া বলিল—আমি কি পারি?

কীর্ত্তিনারায়ণ বলিল—খুব পারো। তোমরা বাপ মেয়েয় কি পার আর কি না পার কিছু বলবার জো নেই। শোন কন্তে, তোমায় না হারিয়ে আজকে আমি জলস্পর্শ করব না, এই আমার শপথ।

বধূ বলিল—আমি ত কত বার হেরে গেছি।

—ছাই হেরেছ। সব মিছামিছি। নরহরি চৌধুরীর মেয়ে তুমি···হারতে যে পারো না, তা নয়—তবে অত সহজে নয়—

পিতৃগর্ব্বে বধূর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল—আমার বাবার হাতে লাঠি দেখেছ তুমি? অদ্ভুত। তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তবু ত তুমি আমাদের হারিয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ডঙ্কার দিয়ে এসেছ।

কীর্ত্তিনারায়ণ চোখ ঘুরাইয়া রীতিমত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—হার না ছাই। বুড়ো চৌধুরী লাঠি ধরলে আমার বাবাও পারত না। তারপর বলিল—শোন চৌধুরীর মেয়ে, ঐ খিল-ভাঙা দুয়োর তুমি চেপে ধর; বাইরে থেকে আমি ধাক্কা দিয়ে খুলব। তোমার বাপের দোহাই—ইচ্ছে করে হারতে পারবে না—

রঙ্গিণী কানে কানে কহিল—ধর ভাই। জয় হোক। পুরুষগুলোর বড্ড আস্পর্দ্ধা—

তখন পিতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সুবর্ণলতা দরজা চাপিয়া দাঁড়াইল। ঐরাবতের বেগে কীর্ত্তিনারায়ণ ধাক্কার পর ধাক্কা দিতেছে, কবাট একবিন্দু নড়ে না। কখন বা মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যেন শক্তি সঞ্চয় করিয়া অন্য আবার দ্বিগুণ বিক্রমে ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়ে; বদ্ধ কবাট

এতটুকু ফাঁক হয় না। মা এতক্ষণ ইহাদের পাগলামীতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন; তিনি পূজার দালানে চলিয়া গেলেন। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। কীর্ত্তি-নারায়ণের সমুদয় রক্ত যেন ঘাম হইয়া ঝরিয়া আসিতেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, পরিশ্রান্ত সারাদিনের অভুক্ত পালোয়ান অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মেজের উপর বসিয়া পড়িল। অমনি দুয়ার খুলিয়া বধূ পাখা লইয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিল।

কীর্ত্তি বলিল—থাক্ পাখা—

—কেন? বধূর মুখের উপর অভিমানের মেঘ।

কীর্ত্তিনারায়ণ বলিল—আমি হারিনি এখনো। তুমি ঘরে যাও, আমি আবার দেখব।

বধূ বলিল—আমি হেরেছি। আমি আর পেরে উঠছিনে। আমি ঘরে যাব না—

খবরদার! বলিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—তোমার গুরুর দোহাই, কক্‌খনো হারতে পারবে না।

বধূ জেদ ধরিল—হারবো-ই। এক্ষুণি যদি তুমি নেয়ে এসে খাওয়া দাওয়া না কর—এই আমি বসে রইলাম, উঠব না—হেরে যাব।

বলিয়া পরম নির্ভয়ে স্বামীর সামনে সে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিল।

কীর্ত্তিনারায়ণ নরম হইয়া কহিল—শপথ করেছি যে—

—হোক্ গে শপথ। নড়িয়া চড়িয়া বধূ আরো ভাল হইয়া বসিল।

বলপরীক্ষা মুলতুবী রাখিয়া অগত্যা কীর্ত্তিনারায়ণকে স্নানে যাইতে হইল। তারপর কোন গতিকে গোগ্রাসে ভোজন সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—চলো এইবার—

বধূ বলিল—ঠিক তুমি জিতবে। তোমার সঙ্গে কি পারি! সকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া করো নি কেবল খেটে বেড়িয়েছ,—তাই অতক্ষণ লড়তে পেরেছিলাম—

স্বামী কিন্তু বিশেষ ভরসা পাইল না। চিন্তিত মুখে বলিল—দেখি তো—

জয় সত্যসত্যই অতি অভাবনীয় ভাবে হইয়া গেল। দু'টা কি তিনটা ধাক্কা দিয়েছে, দড়াম করিয়া দরজা খুলিল, টাল সামলাইতে না পারিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ মেজের উপর পড়িয়া গেল।

বধূ খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। বলিল—হেরে গেলাম।

কিন্তু হারিয়া যে রকম মুখভাব হইবার কথা মোটেই তাহা নয়। বরঞ্চ যেন সন্দেহ হয়, সে টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

কীর্ত্তিনারায়ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল; তারপর গর্জ্জিয়া উঠিল—বিশ্বাসঘাতক। যা বল্লে, তা-ই করলাম। শপথ ভাঙলাম, চান করলাম, খেলাম আর শেষ কালে কিনা···

চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। বলিল—এটা কি তোমার উচিত হল, সুবর্ণলতা?—আশা দিয়ে নিরাশ করা? ফাঁকে ফাঁকে জিতবার মতলব!···আচ্ছা তুমি না হয় বাইরে যাও, আমি দুয়োর চাপি—

—না, দুয়োর দেব। সুবর্ণলতা দরজা ভেজাইয়া দিয়া আদেশের ভঙ্গিতে কহিল—উঠে এসো। ধুলোয় থেকো না, বলছি—

কীর্ত্তিনারায়ণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। বলিল—না—

—এসো—বলিয়া বধূ হাত ধরিতেই এক ঝটকায় সে হাত ছাড়াইয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে হো হো করিয়া হাসি। রাগ-অভিমান কোথায় চলিয়া গেল, বিপুল উল্লাসে কীর্ত্তি-নারায়ণ হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। বলিল—এইবার তুমি সত্যি সত্যি হেরেছ, সুবর্ণলতা। দেখ, হাত ছাড়িয়ে নিলাম—রাখতে পারলে না।

সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। কোথায় শিউলি ফুল ফুটিয়াছে, তার গন্ধ আসিতেছে। পূজা-বাড়িতে ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিল। অমনি নাটমণ্ডপের দিক দিয়া শত শত কণ্ঠের কোলাহল—

ছোট হুজুর! ছোট হুজুর!

কীর্ত্তিনারায়ণ চমকিয়া উঠিল—আমি যাই।

—কোথায়?

—আজ বীরাষ্টমী। আজকের দিনে বরাবর আমি একটু লাঠি নিয়ে বেরুই। তিন জেলা ভেঙে হাজার হাজার লোক দেখতে আসে। ঐ তারা সব ডাক দিচ্ছে।

মহা উৎসাহে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বধূ বলিল—বাঃরে। সবাই পূজোর দালানে গেছে, একলা এই পুরীর মধ্যে···আমার ভয় করবে না বুঝি—

মুখ ফিরাইয়া কীর্ত্তিনারায়ণ হাসিল। বলিল—ছি—ছি। এই? আর এক দফা হার হয়ে গেল কিন্তু।

তখন সুবর্ণ ঝাঁপাইয়া আসিয়া স্বামীর বুকে পড়িয়া সজল চক্ষে কহিল—সবাই আসুক, তারপর যেও। এখন আমি যেতে দেব না—যাও দিকি, কেমন—

হাজার লোকে অধৈর্য্য হইয়া মুহুর্মুহু বাহিরে ডাকাডাকি করিতেছে। বাহু-বেষ্টনে বন্দী পালোয়ান কি আর করিবে—ধীরে ধীরে খাটের উপর আসিয়া বসিল। জল-ভরা মুখের উপর মধুর হাসি হাসিয়া সুবর্ণলতা কহিল—ও বীর পুরুষ, হার হল কার -

চিন্তিত মুখে কীর্ত্তিনারায়ণও তাই ভাবিতেছে, তাই ত এ হইল কি! শত্রুপক্ষের মেয়ের কাছে সত্য সত্যই যে হার হইয়া গেল।

আমারে করিয়ো ক্ষমা

শ্রীনীলিমা দাস

তুমি মোরে পাঠায়েছো পৃথিবীতে, হে বিধাতা, চারুকণ্ঠে ভরি' সুমহান্
সঙ্গীত-আসব, আর অর্কসম নেত্রপটে দিবাদৃষ্টি প্রখর উজ্জ্বল ;
মুক্তপক্ষ সিন্ধুবিহঙ্গমসম স্বচ্ছন্দবিহারী করি' সৃজিয়াছো প্রাণ
শঙ্কাহীন নিরঙ্কুশ,—শতমৃত্যু মৃত্যু লভে যেন হেরি' নয়নকজ্জল !
আমি কবি,—হারায়েছি সে-কণ্ঠের ছন্দোবদ্ধ সুরমন্ত্র ; তব অফুরান্
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য হেরি' মম দিব্যদৃষ্টি ভরি' জাগে তব সৃষ্টিশতদল,—
আবেশে মুদিয়া আসে যুগ্মচক্ষুপক্ষ্মজাল, ভাষা কণ্ঠতটে অন্তর্দ্ধান ;
শতমৃত্যুজেতা-প্রাণ মৃত্যু মাগে হেরি রক্ত-অলক্তক-রাঙা পদতল।
আমারে করিয়ো ক্ষমা, হে বিধাতা, তব অনবদ্য-বাণী ভুলিলো যে কবি ;
কণ্ঠে তার জ্বালিলো না মহাব্যোমস্পর্শী সেই প্রদীপ্ত সঙ্গীত-হোমশিখা,
অক্ষিপাতে নামিলো না কাব্যলক্ষ্মী, রহিলো সে নীহারিকাসম সুদূরিকা।
আজি সুধু রুদ্ধবাক্, মুগ্ধ-আঁখি, সুন্দরের সমারোহ হেরি চারিভিতে ;
তোমার ভুবনশোভা ভাষা-ভোলা কবিতার হেমপদ্ম রচে মোর চিতে,—
মৃগনাভিলুব্ধ মত্ত মৃগসম খুঁজে ফিরি বাণীহীন সে-কাব্যসুরভি।

করুণাময়

শ্রীআশীষ গুপ্ত

চোখের মণি দুইটা যেন একেবারেই নষ্ট হইয়া গেছে, অথচ একশ' নয়, দেড়শ' নয়, মাত্র পঁয়তাল্লিশ, এই ত তাহার বয়স! ভবানীর বুকের কত রক্ত যে অশ্রুরূপে ওই আঁখি-প্রান্ত হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আজ তাহার দৃষ্টি নিষ্প্রভ, দেহ শ্রীহীন, লালিত্যশূন্য, ভবানী আজ লোলচর্ম্মা বৃদ্ধা। ওর জীবনের নির্দ্দিষ্ট দিনগুলি যে বহুপূর্ব্বে নিঃশেষ হইয়া গেছে সে বিষয়ে সংশয় নাই, অথচ এ পুনশ্চের যে কি প্রয়োজন ছিল সে কথাও বুঝিয়া ওঠা শক্ত!

এতদিনে ইহার হেতুটা স্বচ্ছ হইয়া গেল। সর্ব্বশক্তিমান পরম করুণাময় জগদীশ্বরের অশেষ করুণার জন্ম ভবানী যে কেমন করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারে না। সে যেন ভক্তিতে, আনন্দে, উত্তেজনায় দিশাহারা হইয়া গেছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে মাথা ঠুকিয়া বারংবার সে বলে, ভগবান, ইহারই জন্ম তুমি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে! অভাগীর অদৃষ্টে এত সুখও তুমি লিখিয়াছিলে ঠাকুর! এতকাল পরে আমার হারানিধি এই শূন্য বুকে ফিরিয়া আসিতেছে, কত তার যশ, কত তার মান, কত তার গৌরব! এত আনন্দ আমি কেমন করিয়া সহ্য করিব!

দুখিনীর ধন।—গগনের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন ভবানী বিধবা হইল। বিধবা না হইলেও গগন এমনতর ছেলে এবং ভবানী এরূপ ধরণের মা, যে পুত্রের প্রতি তাহার স্নেহের পরিসীমা থাকিত না। পতিবিয়োগের পর তাহার সেই সন্তানস্নেহ সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। সংসারে বহু উপন্যাস নিত্যনিয়ত রচিত হইতেছে,—আমাদের জীবনে, আমাদের কার্য্যে, আমাদের প্রতি পদক্ষেপে কত অসত্যই যে প্রবেশ করিল! মাতৃস্নেহের মহিমা প্রচার সারা পৃথিবীর বুকে চিরকাল ধরিয়া এক জগদ্দল পাথরের মত বসিয়া আছে,—অথচ কত স্নেহহীন, প্রীতিহীন, ক্ষমাহীন, অসহিষ্ণু জননীর দৃষ্টান্তই না সংসারে প্রতিনিয়ত চোখের সম্মুখে দেখিতেছি!

কিন্তু ভবানী সেরূপ জননী নহে,—মাতৃস্নেহের ঢক্কা-নিনাদের মর্য্যাদা সে রাখিয়াছে। তাহার কথা বলিতে বসিলে সেইজন্যই ভালো লাগে এবং যে অসংখ্য দুর্ভাগ্য নরনারী জননী বর্ত্তমানেও মাতৃস্নেহ লাভ করিল না, অথচ সেই চির-অলব্ধ প্রীতি সম্বন্ধে রাশি রাশি অসত্য উক্তি গলাধঃকরণ করিয়া মরিল, তাহাদের কথা স্মরণ করিয়া বেদনা অনুভব করিতে থাকি!

গগনের প্রতি ভবানীর বাস্তবিকই অতিপ্রচারিত সন্তান-বাৎসল্য ছিল।—স্বামীর মৃত্যুর পরে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সকলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল,—সহানুভূতি প্রদর্শনের সুযোগে পুলকিত হওয়ার জন্য! মাত্র একজনের অভাবে পৃথিবীতে যে কতখানি অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, একবার মাত্র চোখ মেলিয়া সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া সন্ত্রস্তা ভবানী চোখ বুজিয়া গগনকে তাহার কোলের কাছে টানিয়া লইল।

কিন্তু ভবানী নয়ন মুদিত করিলেও মারাত্মক শুভকামনার অঙ্কুশতাড়নায় তাহার হিতাকাঙ্ক্ষীরা চোখ মেলিয়া রাখিতে ক্রটি করিল না। ফলে, অসংখ্য হিতৈষণায় জর্জ্জরিতা ভবানী কিছুদিনের মধ্যেই গগনকে লইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল।—পিতামাতা বহুদিন পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে ভাইয়েরাই কর্ত্তৃপক্ষ,—ভগিনীর আবির্ভাবে তাঁহাদের আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ না পাইলেও আনন্দ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল না। নির্ম্মম ঔদাসীন্যের মধ্যে

ভবানী ভাইয়েদের সংসারে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিল। এই আনন্দবিরাগশূন্য অভ্যর্থনা কিন্তু গগনের সহ্য হইল না। ঘটনাটা যে তাহাকে কত আহত করিয়াছে সে কথা বুঝিতে পারা গেল সেদিন যেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠিয়া আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

ভবানীর চোখের জল আর সেই মুহূর্ত্ত হইতে সময় অসময়, বাধানিষেধ মানে না,—কত দেবতার দুয়ারে দুয়ারে প্রণিপাত, কত ছোট বড় মাঝারি মেজ সেজ ঠাকুরের নামে মানত, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

গগন সেই যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহার পর পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্তেও আর তাহার অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হইল না! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, সর্ব্বদুঃখহর কাল যে ভবানীর চোখের জলের কাছে কোন্‌দিন কেমন করিয়া পরাজয় স্বীকার করিল তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

বৃদ্ধা ভবানী আজ কয়েক বৎসর হইল তাহার ভাঙ্গা ভিটায় ফিরিয়াছে।—ঘনবিন্যস্ত জঙ্গলে এখনও সেই কুটির আবৃত, উঠানে কাঁটাগাছের ঝোপ, এপাশে লতা, ওপাশে লতা, প্রাঙ্গণে উলুবনের উৎসব। শুধু কেবল গরু ভেড়া ছাগলই নয়, দিবা দ্বিপ্রহরে শৃগাল এবং সর্পকুল অবধি সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চতুর্দ্দিককার বেড়া গলিয়া পচিয়া গেছে—বারান্দার খুঁটিতে ঘুণ ধরিয়া কবে যে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা কেহ জানে না,—ঘরের চাল নেই, দেয়াল নেই, কেবল কতকগুলা মাটি এবং কয়েক টুক্‌রা ভাঙ্গা কাঠ ইতস্ততঃ ছড়ানো।

ইহারই মধ্যে সন্তানবিচ্ছেদকাতর ভবানী আসিয়া বহুকাল পরে স্থান গ্রহণ করিল।

গগনের শৈশবের কথা এই কুড়ি বৎসরের প্রতি মুহূর্ত্তটিতে ভবানীর মনে পড়িয়াছে,—তাহার শিশুজীবনের সেই অদ্ভুত উজ্জল বর্ণগন্ধময় দিবসগুলি,—সে কথা কি ভুলিবার? তাহার সেই অপূর্ব্বসুন্দর মুখ, হরিণশিশুর ন্যায় দীর্ঘায়ত গভীর কৃষ্ণ ভীরু চোখ,—ভগবান যে কত দীর্ঘ সময় লইয়া কত উল্লসিত আয়াসেই গগনকে গড়িয়াছিলেন! সেই শিশু ধীরে ধীরে বড় হইল, তাহার মুখে অল্প অল্প কথা ফুটিল,—সে যেন মনের সমস্ত চেতনা দিয়া, সকল ইন্দ্রিয়বোধ দিয়া গ্রহণ করিয়াও তৃপ্তি হয় না,—গগনের ভাষা যেন মধুক্ষরা! সে সকল কথা মনে করিতেও ভবানীর সর্ব্বদেহে যেন কাঁটা দিয়া ওঠে!

তারপর একদা ভীরু শশকের ন্যায় সদাচকিত গগন তাহার অতিসন্ত্রস্ত দৃষ্টি লইয়া পৃথিবীর অনির্দ্দিষ্ট পথে বিলুপ্ত হইয়া গেল,—বিশাল ভূমণ্ডলের কৃষ্ণবর্ণের কষ্টিপাথরের উপর হইতে একটি তুচ্ছ সূক্ষ্ম স্বর্ণরেখা চিরতরে মিলাইয়া গেল কিনা কেহ জানিল না। কেবলমাত্র ভবানীর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লোল-জিহ্ব শোকাগ্নি অনির্ব্বাপিত আয়োজন ষোড়শোপচারে সজ্জিত করিয়া রাখিল। লেলিহান রসনা মেলিয়া ভবানীর হৃদয়ের গভীরতম কোণে সেই যে সে কঠিন নিশ্চয়তার সহিত স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিল কিছুতেই আর তাহাকে সেখান হইতে নড়ান গেল না।

গগনের পত্র ভবানীর পিতৃগৃহ হইতে ঘুরিয়া অবশেষে তাহার নিকট আসিয়া পৌছিল,—সেখানে যে চিঠিখানা খোলা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে প্রমাণ আছে। ভাইয়েরা পত্র পড়িয়া, আর একখানি কাগজে বোনের কাছে চিঠি লিখিয়া গগনের লেখা খামের মধ্যে ভরিয়াই ঠিকানা কাটিয়া ভবানীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

গগন লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

মা, কুড়ি বছর পরে তোমার হারানো ছেলে তোমাকে তার সংবাদ দিতে বসেছে। জানিনে তুমি এখন কোথায় কি অবস্থায় আছ, যদিও আমায় হারিয়ে তোমার যে কি হ'য়েছে তা আমি নিজের অন্তর দিয়ে বুঝি। কিন্তু তুমি বেঁচে নেই একথা আমি ভাব্‌তে পারিনে,—আমার হৃদয়ের সকল একাগ্রতা দিয়ে এই বিশ বছরের প্রতিমুহূর্ত্তে আমি অনুভব করেছি, তুমি বেঁচে আছ এবং ভাষাহীন বেদনায় দিবারাত্র তোমার অভাগা সন্তানের মঙ্গল কামনা করছ।—এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি,—পৃথিবীতে কোনও বিপদ আপদ গ্রাহ্য করিনি,

সংসারে কোথাও আমার লেশমাত্র ভয়ের কিছু ছিল না, যেহেতু মনে মনে জানতাম, সুদূর বাংলাদেশের এক নগণ্য পল্লীগ্রামে আমার জন্ম কবচকুণ্ডল রক্ষিত আছে, আশঙ্কার আর আমার কিছু নেই। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তোমাকে আমার কাহিনীটা বলা হয়নি।—দেশে ফিরেছি সবেমাত্র আজ সকালে। এতদিন ছিলাম প্রধানত ইয়ুরোপে, তোমরা যাকে বল বিলেত, সেখানে। আমেরিকায়ও গিয়েছি, আফ্রিকাতেও গিয়েছি, গিয়েছি আরও অনেক জায়গায়,—মোটের উপর যায়নি কোথায়?

কিন্তু কেমন করে' এসব হ'ল? কি করে' যে হ'ল সেকথা যদি বিস্তারিত ভাবে বলতে যাই তা যে এই কুড়ি বছরের প্রতি মুহূর্ত্তের সহস্র কাহিনী হ'য়ে উঠ্‌বে,—সে আমি বল্‌ব তোমার পায়ের তলায় বসে' জীবনের বাকী বছরগুলো ধরে'। সে সব কথা বল্‌বার জন্যই ত আমার মন উচ্ছলিত হ'য়ে উঠেছে।

মোটের উপর ব্যাপারটা ঘট্‌ল এই যে মামাবাড়ীর অসঙ্কুচিত অবহেলায় আমার ছোটবেলাকার প্রবল অনুভূতিশীল মন তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। ভিতরে ভিতরে যেন দিবারাত্র অনুভব করতে লাগ্‌লাম, পৃথিবীর যেখানে হ'ক, বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, গুহায় গহ্বরে, পথে ঘাটে, মরুভূমির দেশে, দুর্ভিক্ষের রাজ্যে,—যেখানে হ'ক আমাকে চলে' যেতে হ'বে, এবাড়ীতে আর কিছুতেই নয়। এ আকর্ষণ আমার অনিবার্য্য হ'য়ে উঠ্‌ল, তার উপর গৃহের কুৎসিত ঔদাসীন্য হ'ল আমার অসহ্য—অবশেষে একদিন পথে বেরিয়ে পড়লাম। একবার মনে হ'ল আমার দুঃখিনী মা রইল, তাঁকে কে দেখ্‌বে? কিন্তু তখনই মনের মধ্যে একথাও স্থির হ'য়ে গেল যে মা'র অপদার্থ ছেলে হ'য়ে আমি থাক্‌ব না। সম্মুখের দিগন্তবিস্তৃত অজ্ঞাত পথের দুর্নিবার আকর্ষণে সেই যে আমার ঘরছাড়া, সেই ঘরছাড়াই এই বিশ বছর ধ'রে নিয়ত আমায় টেনেছে ঘরের পানে, কিন্তু সে টান ঘরের নয়, তোমার। প্রতি দিবসের, প্রতি কর্ম্মের মাঝে এ আকর্ষণ ছিল দুর্ব্বার, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের ঘূর্ণিপাকে পড়ে আমার স্বাধীন ইচ্ছার আর অবকাশ রইল না।

কিন্তু সে সকল কথা তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশায় তোলা রইল। বাড়ী ছেড়ে কল্‌কাতা চলে' এলাম, কয়েক দিন পথে পথে কাট্‌ল,—ফুটপাথের পরে শুয়ে কেটে যায় রাত, এর বাড়ী ওর বাড়ী চেয়ে চিন্তে-পাতকুড়োন খেয়ে কেটে যায় দিন। এম্‌নি করে সাত দিন অতিবাহিত হ'য়ে গেল। কল্‌কাতার লক্ষ লক্ষ লোক, বিশাল প্রাসাদপুঞ্জ, বিপুল ঐশ্বর্য্য সমস্ত মিলিয়ে গিয়ে এই সহরটা যেন আমার কাছে মরুভূমির মত হ'য়ে উঠ্‌ল। তোমার জন্য দিবারাত্র মন-কেমন-করার আর আমার শেষ রইল না। চৌরঙ্গীর উপরে এক দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি,—সহায় নেই, সম্বল নেই, আশাভরসা কিছু নেই,—পৃথিবী তখন আমার কাছে এক ভয়াবহ শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে রূপান্তরিত হ'য়েছে, এম্‌নি সময়ে এসে দাঁড়াল এক প্রকাণ্ড মোটর, নাম্‌লেন তার ভিতর থেকে এক বুড়া সাহেব, ষাট বছরের কম তাঁর বয়স হ'বে না। আমার পানে চেয়ে কি ভেবে থমকে দাঁড়ালেন, কাছে এসে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন, কি চাও?"

ভয়ে আমার বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু তবুও বাংলা হিন্দী এবং ইংরেজী মিশিয়ে বল্‌লাম, "সাহেব, আমি কিছুই চাইনে, এম্‌নি দাঁড়িয়ে আছি—"

তারপর তিনি আমাকে ডেকে সাম্‌নের দোকানে নিয়ে গেলেন। সেটা সোনা, রূপো, হীরে জহরতের দোকান, জেনার সাহেবই সেই কারবারের মালিক। এই কুড়ি বছরে আমি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি, কত লোকের সংস্পর্শে যে এসেছি তার আর ইয়ত্তা নেই, কিন্তু মিঃ জেনারের দ্বিধাহীন অকৃপণ মহত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করার মত আর কিছু আমার চোখে পড়্‌ল না। সেই দোকানে বসে' আধঘণ্টার মধ্যেই সাহেব আমার সমস্ত কথা শুনে নিলেন, এবং সেই আধঘণ্টা পরে আমি সেই দোকানে ছোটখাট কাজ করবার জন্য নিযুক্ত হ'লাম ও আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হ'ল সাহেবের বাড়ীতে।

জেনার সাহেব অপুত্রক। এই দীর্ঘ বিশ বৎসর মিঃ ও মিসেস জেনার আমাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করেছেন, আমার হাতে তাঁদের বৃহৎ কারবারের পূর্ণ দায়িত্ব

সমর্পণ করেছেন, আমি ইয়ুরোপ, আমেরিকাতে সেই দায়িত্ব বহন করে' জেনার কোম্পানীর ব্যবসা পরিদর্শন করে' বেড়িয়েছি, অবশেষে সেই কারবারের অংশীদাররূপে ফিরেছি আজ সকালের বোম্বাই মেলে কল্‌কাতায় সতেরো লক্ষ টাকার মালিক হ'য়ে!—সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে এই হ'ল আমার ইতিহাস। মনে হ'বে এ যেন আবুহোসেনী স্বপ্ন,—সময়ে সময়ে আমারও তাই ধারণা হয় বটে।

কিন্তু আমার আর্থিক সচ্ছলতা এবং অচিন্তনীয় উন্নতি এ কাহিনীর সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ অংশ। এই সকলের অন্তরালে যে মহানুভব অন্তঃকরণটি সদাজাগ্রত আন্তরিকতার সহিত কাজ করছে, তার ইতিহাসই আমার জীবনের একমাত্র ইতিহাস, আমার এই বিংশবর্ষের কাহিনী কেবলমাত্র সেই কাহিনী। ভাষায় তাকে ব্যক্ত করতে পারিনে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা তাকে করতে পারিনে অসম্মান।

কিন্তু, সব কথাই দেখা হ'লে বল্‌ব। কল্‌কাতার কারবারে আমার আরও দু'দিন উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, অতএব তরশুদিন রওনা হ'ব এখান থেকে, তার পরদিন পৌঁছোব মামাবাড়ী। তুমি এখনও ওখানে আছ এই ভেবে ওই ঠিকানাতেই পত্র লিখ্‌লাম। মামিমাদের এবং মামাদের প্রণাম দিয়ো, ছোটদের দিয়ো স্নেহ।

এই তিনদিনের বিলম্ব আর আমার সইছে না,—মনে হচ্ছে, কোন রকমে দু'হাতে ঠেলা দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে যদি এই দিন তিনটেকে পার ক'রে দিতে পারতাম!

কতকাল পরে যে তোমায় দেখ্‌তে পাব!—তুমি কিন্তু দেখ্‌বে তোমার গগনের বাহিরের চেহারাতেই যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, ভিতরে ভিতরে সে ঠিক তোমার চিরকালের খুনুই আছে। আমার প্রণাম নিয়ো।

গগন

চিঠি মামার বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়াছে, সেখানে পত্র খোলা হইয়াছিল,—কিন্তু সতেরো লক্ষ টাকার মালিক জেনার কোম্পানীর অংশীদার মিঃ জি, সি, রয় এবং পনেরো বছর পূর্ব্বেকার বিধবা ভবানীর অনাথ, অসহায় শিশুপুত্র খুনুর মধ্যে স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যবধান, অতএব মামা-মামিমাদের তরফে বড় মামা চিঠি লিখিয়াছেন। গগনের জন্ম তাঁহাদের দুশ্চিন্তা যে কত গভীর, কত আন্তরিক, গগনের সহিত তাঁহাদের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদ যে কত মর্ম্মান্তিক সে সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। গগনের প্রতি তাঁহাদের যে-স্নেহ ফল্গুধারার ন্যায় অন্তঃসলিলা, তাহাকে যে কেমন করিয়া সে ভুল বুঝিল, বুঝিয়া নিজেও সুখী হইল না, তাঁহাদিগকেও ব্যথিত করিয়া রাখিল, সে বিষয়ে অনুযোগ আছে। পরিশেষে আছে তাহার এরূপ অসামান্য উন্নতিতে গভীর উল্লাসের অভিব্যক্তি এবং তৎসঙ্গে এই নিবেদনটিও জ্ঞাপন করা আছে যে গগন যেন আজ ধনী হইয়াছে বলিয়াই তাহার দরিদ্র মামাদের না বিস্মৃত হয়।—সর্ব্বশেষে বড় মামা জানাইয়াছেন যে পৃথক পত্রে বিস্তৃতভাবে সকল সংবাদ লিখিতেছেন।

চিঠি পড়িয়া ভবানী যেন দিশাহারা হইয়া গেল! গগন বড়লোক হইয়াছে, গগন গণ্যমান্য হইয়াছে এসকল ঘটনা তাহার কাছে অতিশয় তুচ্ছ হইয়া দেখা দিল, সর্ব্বচেতনা অবলুপ্ত করিয়া যে কথাটি অচঞ্চল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া রহিল তাহা এই যে তাহার গগন জীবিত আছে এবং সে আসিতেছে!

মিঃ জেনার বলিলেন, "গগন, তুমি তোমার মামার বাড়ীতে উঠ্‌লেও জিনিষপত্রগুলো গ্রামের জমিদারের ওখানে রেখো,—আমি তোমাদের জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে পরিচয়পত্র আনিয়ে দিচ্ছি, তোমার কিছু অসুবিধে হ'বে না।"

গগনের সঙ্গে প্রায় তিরিশ হাজার টাকার দ্রব্যসামগ্রী ছিল। মামাত ভাই, বোন এবং ভ্রাতৃবধূদের ঘড়ি আংটি এবং গহনার উপহার হইতে আর কিছু বাকী রাখে নাই। ছিন্নবস্ত্রপরিহিত দীনহীন যে গগন একদিন নগ্নপদে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল সে যে আজ তাহার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে সকলকে চমক লাগাইয়া দিতে চায় তাহা নহে, প্রকৃতই সে তাহার সৌভাগ্যের অংশ আত্মীয়স্বজনবর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার জন্য উৎসুক,—এইদিক দিয়া তাহার ঔদার্য্যের যেন আর পরিসীমা নাই।

—গগনের মাতুলালয়ের গ্রামের জমিদার তিনটা গ্রাম জুড়ে অবস্থান করেন। জমিদার যে খুব বড় তা নয়, কিন্তু তাই

বলিয়া একেবারে চুনোপুঁটিও নন্। ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্র জেনার সাহেব সংগ্রহ করিয়া দিলেন। স্থির হইল জিনিষপত্র মৌরীগঞ্জের জমিদার বিমলচন্দ্রের মালখানায় জমা দিয়া গগন মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কারণ, তাহার মাতুলেরা যে সম্পন্ন তাহাতে সংশয় না থাকিলেও তাঁহাদের গৃহ যে খুব বেশী সুরক্ষিত নহে তদ্‌বিষয়েও সন্দেহ নাই। অতএব সাবধানী জেনার গগনকে পরামর্শ দিলেন যে, আবশ্যকমত দ্রব্যসামগ্রী সে যেন জমিদার বাড়ী হইতে লইয়া যায়, অথবা অন্য কোথাও পাঠাইবার প্রয়োজন হইলেও যেন তাহাই করে।

বিংশবর্ষের ব্যবধানে গগন তাহার মাতুলালয়ের দিকে রওনা হইল।

জমিদার অত্যন্ত সমাদর করিয়া গগনকে অভ্যর্থনা করিলেন, জিনিষপত্র বুঝিয়া লইয়া যত্নসহকারে মালখানায় জমা রাখলেন, গগনকে তাঁহার গৃহে অতিথি হওয়ার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন, কিন্তু সব কিছু অগ্রাহ্য করিয়া সে তাহার মাতুলালয়ে চলিয়া গেল,—সেখানে মা রহিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক।

মামার বাড়ীতে অভ্যর্থনা যা মিলিল তাহা দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া চোখে দেখিবার কানে শুনিবার মতই বটে! কিন্তু মা সেখানে নাই জানিয়া গগন শুধু বলিল, "বাড়ী যাচ্ছি মামা,—দাদা, বৌদি এবং ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু জিনিষপত্র এনেছিলাম, কিন্তু মাকে না দেখিয়ে ত কিছু দিতে পারব না,—দেশ থেকে ফিরে হয়ত আবার আসব। বড়দি, মেজদি, বুলুদি, অঞ্জলি, কুসুম ওদের ঠিকানা কি বড় মামা?—বড় বৌদি একখানা কাগজে লিখে দাও ত—"

মাতুল গৃহে একদিন কাটাইয়া যাওয়ার জন্য ছত্রিশ জন লোকের শত অনুরোধেও কোন ফল হইল না, গগন শুধু বলিল, "মা'র সঙ্গে দেখা করে' এসে থাকব'খন—"

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জেনার সাহেবের নাম উল্লেখ করিয়া তার করিয়া বন্দোবস্ত করিল যাহাতে তিনি টেলিগ্রাম করিয়া তাহাদের গ্রামের জমিদারকে তাহার জিনিষপত্র রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে সাহায্য করিতে উপদেশ দেন।

বিমলচন্দ্র গগনকে আরও দু'একদিন থাকিয়া যাওয়ার জন্য বারংবার উপরোধ করিতে লাগিলেন, কহিলেন, "বহু পুণ্যফলে যদি-বা আপনার মত এমন একজন কৃতী বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, ত আমার সামান্য শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী যদি তাঁকে অভ্যর্থনা না করি তাহ'লে লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে' রায় মশাই?"

গগন হাসিয়া বলিল, "আপনি আমার জন্যে যা করলেন তাতেই আমি কৃতার্থ হ'য়েছি, বিমলবাবু। আর আতিথ্য গ্রহণ? সে না হয় ফিরে এসেই হ'বে,—কিন্তু এখনও আমার মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ বাকী, সে ত আর ফেলে রাখ্‌তে পারিনে—"

অবশেষে বিমলচন্দ্র রাজী হইলেন, কিন্তু সর্ত্ত হইল যে আগামীবারে অন্ততঃ সপ্তাহখানেকের জন্যও গগনকে তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিমলচন্দ্রের অমায়িকতায় গগন মুগ্ধ হইয়া গেল!

দেশে যাইতে হইলে নৌকা করিয়া যাইতে হইবে,—মাঝে বড় নদী পার হইতে হইবে বটে কিন্তু খালের পথে ষ্টীমার চলে না, কচুরীপানার বেড়াজাল কাটাইয়া পুরা দেড়দিন পরে দেশে পৌঁছান যাইবে।

বিমলচন্দ্র নিজে দাঁড়াইয়া লোকজন ঠিক করিয়া দিলেন, পাইক লাঠিয়াল সঙ্গে দিয়া দিলেন, নির্জ্জন কক্ষে গগনকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া সুটকেসের জিনিষপত্র বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু লাঠিয়ালদের যে সর্দ্দারকে যত্ন করিয়া গগনের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, তাহার সহিত ঘণ্টা দুই ধরিয়া নিজের শয়নকক্ষে যে কত আলোচনা হইল তাহা কাকপক্ষীতেও জানিল না। কেহ যদি কান পাতিয়া থাকিত তবে হয়ত "সরকারের রাজস্ব," "প্রজাদের দুরবস্থা", "জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট", "থানা", "পুলিশ" "আর্থিক দুর্গতি" এমনিতর বহু টুক্‌রা টুক্‌রা কথা শুনিতে পাইত। মোটের উপর বুঝিতে পারা যাইত যে আর যা-ই হ'ক বলাই সর্দ্দারের চেষ্টা যত্নে ত্রুটি এবং প্রভুভক্তিতে গাফিলতি হইবে না।

গগন আজ ফিরিয়া আসিতেছে!—পৃথিবীতে জ্ঞাত অজ্ঞাত কোনও বস্তুর সহিতই ইহার লেশমাত্র তুলনা চলে

না। অন্ধ তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে, মূক ব্যক্তি তাহার ভাষা ফিরিয়া পাইয়াছে, বধির তাহার শ্রবণশক্তি লাভ করিয়াছে, দীন ভিখারী পথের ধূলায় লক্ষ মুদ্রার মাণিক কুড়াইয়া পাইয়াছে, এমনিতর সহস্র অর্থহীন উক্তি সজ্জিত করিয়া ভবানীর মনোভাব ব্যক্ত করার প্রয়াস অপেক্ষা তাহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করা সহজ।—যে ভবানী এই বিংশ বর্ষের প্রতি মুহূর্ত্তটিতে এক নির্ম্মম নিষ্ঠুর দেবতার পায়ে নিজের হৃৎপিণ্ড উপ্ড়াইয়া উৎসর্গ করিয়াছে তাহার জীবনের দুঃসহ বেদনাকে যে একটি পুণ্য কর্ত্তব্যের ন্যায় নতমস্তকে বহন করিয়াছে, সেই ভবানীর নাড়ীছেঁড়া ধন আজ ফিরিতেছে,—এ আনন্দ কি সহিবার! সে যে এখনও কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে, সে কথা চিন্তা করিয়া তাহার নিজেরই আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না।—গগন জীবিত আছে, সংসারের নিকট আজ আর তাহার সম্মানের অবধি নাই,—বিশাল জনতার শ্রদ্ধাবিস্ফারিত নয়নের সম্মুখে উন্নত মস্তকে সে তাহার জীর্ণ কুটিরে আসিয়া প্রবেশ করিবে।—ভবানীর মনের মধ্যে যেন সব গোলযোগ বাধিয়া যাইতে লাগিল। —মাটিতে মাথা ঠুকিয়া সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল, "ঠাকুর, এতদিন আমায় কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে তাহা এইবার বুঝিয়াছি,—যে আঘাত মনকে এমন করিয়া অসাড় পঙ্গু করিয়া দেয়, সেই নিদারুণ আঘাতের পরেও এই জীর্ণ খোলসটাকে এতদিন ধরিয়া বহিয়া বেড়াইবার কি যে প্রয়োজন ছিল এইবার বুঝিয়াছি!—তুমি সর্ব্বমঙ্গলের উৎস, সকল কল্যাণের আধার।—তোমার সম্বন্ধে একদিন অভিযোগ করিয়াছিলাম, একদিন মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার ন্যায়বিচারে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য তোমার ভাণ্ডারের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শাস্তি আমাকে প্রদান করিয়ো, প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিব না। কিন্তু রহিল, রহিল তোমার জন্য লক্ষ কোটি প্রণাম রহিল!" আনন্দে, বেদনায়, কৃতজ্ঞতায়, বিরামহীন অশ্রুবর্ষণে ভবানী যেন পাগল হইয়া গেল!

বড় নদীতে যখন নৌকা পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে,—নদী পার হইলেই নৌকা রামপুরের খালে প্রবেশ করিবে।—পশ্চিমদিকে বিস্তীর্ণ চর পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই চর বাঁদিকে রাখিয়া সোজা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে।—অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় নদীর জল, তীরপ্রান্তবর্ত্তী তালপুঞ্জ রাত্রিশেষের সার্থক স্বপ্নের মত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, পশ্চিমদিকের নির্জ্জন চরে একখানি নৌকা পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করিয়া আছে।

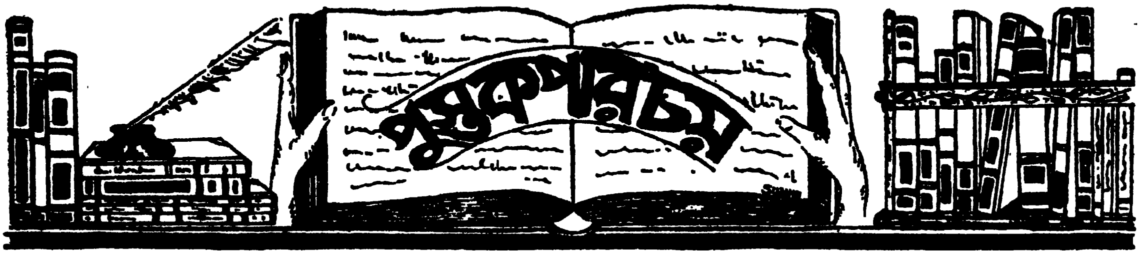
যেই চরে আসিয়া গগনের নৌকা ঠেকিল। বিশ বৎসরের অদর্শন,—কিন্তু এই দেশ, এই নদীর সহিত তাহার নাড়ীর যোগ,—ইহার পথঘাট, বালুকণাটিকে অবধি কি সে কোনদিন ভুলিতে পারে?—পাটাতনের 'পরে বসিয়া সে এতক্ষণ নদীর জলে হাত ডুবাইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছিল, মুখ তুলিয়া এইবার জিজ্ঞাসা করিল, "মাঝি, এখানে নৌকো ভিড়োলে কেন?"

প্রত্যুত্তরে বলাই সর্দ্দার সম্মুখে আসিয়া লাঠি তুলিল, বিস্মিত গগন কিছু বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই লাঠির আঘাতে চেতনা হারাইয়া পাটাতনের 'পরে পড়িয়া গেল!—যে নৌকাখানা এতক্ষণ চরে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার ভিতর হইতে এইবার আট-দশজন লাঠিয়াল বাহির হইয়া আসিল। বলাই সর্দ্দার এবং তাহার সঙ্গীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গগনের মৃতদেহটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া চরের বালিতে পুঁতিয়া ফেলিতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগিল না। তারপর আগন্তুক লাঠিয়ালেরা বলাই সর্দ্দার এবং তাহার দলের লোকদের দুই একটা ছুরি এবং লাঠির আঁচড় দিয়া তীরপ্রান্তের তালবৃক্ষের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিল, পরে গগনের জিনিষপত্র লইয়া অন্তর্হিত হইল।

বলাই সর্দ্দারের প্রভুভক্তির তুলনা হয় না, এবং বিমল চন্দ্রের ত্রুটিহীন আয়োজনের বাস্তবিকই প্রশংসা করিতে হয়।

ভবানীর সন্তান তখন পথে, মামাবাড়ী হইতে চিঠি পৌঁছিতে তিন দিন বিলম্ব হইয়া গেছে, অতএব মাতুলালয় ঘুরিয়া এতক্ষণে গগন মায়ের কাছে আসিয়া পড়িল বলিয়া! তাহার সাত রাজার ধন মাণিক আসিতেছে,—গ্রামে গ্রামান্তরে খবর রটিয়া গেছে,—ভবানীর জীর্ণ কুটিরে, অপরিচ্ছন্ন উঠানে লোক আর ধরে না! ঘর এবং বাহির, বাহির এবং ঘর করিয়া সময় কাটিতে লাগিল,—পাড়ার লোকের কলকোলাহলে কান পাতা দায়!—ভবানীর সকল হৃদয়, সমস্ত সত্তা চোখে এবং কানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে,—চোখ দিয়া সে তাহার গগনকে দেখিবে, কান দিয়া তাহার মধুবর্ষী কথা শুনিবে, নিজের অন্তরের অন্তরে তাহাকে ধারণ করিবে! ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া সে বলিতে লাগিল, "ইহারই জন্য আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে দয়াময়,—এতদিনে তাহা বুঝিলাম!—অভাগী ভবানীর লক্ষ কোটি প্রণাম লইয়ো!—"

শ্রীআশীষ গুপ্ত



স্পর্শের প্রভাব—(উপন্যাস)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। প্রকাশক শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, ৫নং কার্ত্তিক বসুর লেন, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

রোগের (বোধ হয়—অন্তিম) শয্যায় পড়িয়া "স্পর্শের প্রভাব গল্পটি পড়িলাম।

আজকালকার বাঙ্গলা-গল্পে প্রেমই একমাত্র মুখরোচক বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ বাঙ্গালীর বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্র যতই সঙ্কুচিত হইতেছে, ততই সে কোণ-ঠাসা হইয়া গৃহকে নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। গৃহই যৌন-সম্বন্ধের পরম অবলম্বন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রেমের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। প্রাচ্য প্রেম আত্মদান, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, জীবনব্যাপী দুঃখ ও ধৈর্য্যকে বরণ করিয়া লইয়া শতদল পদ্মের ন্যায় বিকাশ পায়। এই প্রেমকে তপস্যা বলা যায়। রামায়ণের সীতা হইতে কালিদাসের শকুন্তলা, এবং মহাভারতের সাবিত্রী-দময়ন্তী হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর—এই প্রেমের দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য প্রেম উপভোগের নামান্তর, ইহাতে মানুষ রস-সন্ধানী, এই প্রেম নিষ্ঠা বা চিত্তশুদ্ধিকে ততটা গণ্য করে না, ইহাতে তপস্যা নাই, কিন্তু চিত্ত-রঞ্জনের উপকরণ বাহুল্য আছে। ইহা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের কারুকার্য্য লইয়া সুরের মূর্চ্ছনা দ্বারা মন ভুলায়—টলষ্টয়ের অ্যানাকারনিনা, মেটারলিঙ্কের মিরেলেণ্ডা, টেনিসনের গুইনিভিয়র—এই প্রেমের দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের প্রেম দেবমন্দিরের পত্তন, জড়বাদী য়ুরোপীয় আদর্শ রঙ্গমঞ্চের লীলা ও চাতুর্য্য প্রদর্শন।

'স্পর্শের প্রভাবে'র জ্যোৎস্না অনেকটা প্রাচ্য আদর্শের অনুযায়ী। নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচ ও দ্বিধায় ভাব এদেশের রমণীচিত্তের একটা স্বাভাবিক লক্ষণ। একদিকে পিতৃভক্তির দুর্লংঘ্য বাধা, অপরদিকে দাম্পত্যের ফল্গুনদী—তাহা গুপ্ত হইলেও দুর্জ্জয় শক্তিশালিনী। দুইটি প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে বালিকার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিল। শেষ পর্য্যন্ত সে পিতার উপদেশ আদেশ শুনিল, কিন্তু প্রতিবাদ করিতে পারিল না। তাহার স্বামী-প্রেম একদিনের স্পর্শে অঙ্কুরিত হইয়া বিকশিত হইয়া প্রগাঢ় দাম্পত্যে পরিণত হইল। কিন্তু বাহ্যিক কঠোরতা অবলম্বন করিয়া সে তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। ভিতরে অতি কোমল ও সূক্ষ্মভাবরাশি দ্বারা আহত-প্রহত হইয়া বাহিরে সে পাষাণ-প্রতিমা সাজিল, তাহার অপূর্ব্ব দাম্পত্য ও অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি শেষ পর্য্যন্ত অব্যক্ত রহিয়া গেল। উৎকট সংযম ও নীরবতা দ্বারা তাহার মনের প্রলয় লুকাইয়া রাখিয়া শেষে মৃত্যু দ্বারা সে চণ্ডীদাসের উক্তি প্রমাণ করিয়া গেল,—"চণ্ডীদাস কহে পীরিতি না কহে কথা, পীরিতি লাগিয়া, পরাণ ত্যজিলে,—পীরিতি মিলয়ে তথা।"—জ্যোৎস্নার প্রেম কত নিবিড় ও তাহার অনুতাপ কত তীব্র—তাহা সে বুঝাইতে চেষ্টা করিল না, লেখক তাহার বিষাদান্ত জীবন-নাট্যের উপর যবনিকা-পাত করিয়া সে কথার ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। এই পুস্তকের লেখায় বাক্য-পল্লবের বাহুল্য নাই, বক্তৃতা নাই, পাপ-পুণ্য বুঝাইবার জন্য ব্যস্ততা নাই, তথাপি লেখক এই পুস্তকে চিররহস্যাবৃত রমণী-হৃদয়ের যে ব্যথা ও ত্যাগের কথা বুঝাইয়াছেন—তাহাতে সমজ্‌দার পাঠকের কাছে এই পুস্তক নিশ্চয়ই আদর পাইবে।

রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন
বি-এ ডি-লিট্

নূতন পথে—শ্রীকনকলতা ঘোষ প্রণীত। জ্ঞান পাব্লিশিং হাউস্, ৪৪ নং বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৬২। দাম দেড় টাকা।

ছোট গল্পের বই। অনেকগুলি ইতঃপূর্ব্বে নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলি পড়িয়া প্রথমেই চোখে পড়ে নিপুণ বর্ণনাভঙ্গী, আড়ম্বরহীন আখ্যানবস্তু ও লেখিকার অপূর্ব্ব একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ। ছোট গল্পকে ছোট গল্প করিয়াই বিভিন্ন চিত্র তিনি বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে আঁকিয়াছেন। ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরের মধ্যে তিনি অযথা ও অবান্তর সামাজিক সমস্যা ও নিশ্বাসরোধী তর্ক-বিতর্কের অবতারণা করিয়া ছোট গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট করেন নাই। আধুনিক কেতা-দুরস্ত লেখিকাদের মত কোথাও তিনি বিদ্যার চটক বাহির করার চেষ্টা করেন নাই। গল্পগুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক;—পড়িবার পর অনেকক্ষণ একটি করুণ সুর মনের মধ্যে লাগিয়া থাকে। গতানুগতিক গল্প উপন্যাসের যুগে—যেখানে প্রাণের চেয়ে কথার সমারোহই বেশী, যে কথার কঠিন ব্যূহজাল ভেদ করিয়া গল্পের নাগাল পাওয়াই দুষ্কর—লেখিকার এই গ্রন্থখানি আদর পাইবে বলিয়া মনে হয়। ছাপা, কাগজ বাঁধাই সমস্তই প্রশংসনীয়।

পত্রলেখা—শ্রীকনকলতা ঘোষ প্রণীত। জ্ঞান পাব্লিশিং হাউস, ৪৪ নং বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কতকগুলি পত্রের ভিতর দিয়া লেখিকা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত চিত্তের অবস্থাবৈপর্য্য ও মনোরাজ্যের বর্ণনা দিয়াছেন। এ-রকম বইএর সমালোচনা করিতে আমি সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি, তাই তাঁহার "নিবেদন" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন মর্ম্মভেদী শোকের তীব্র আঘাতে একেবারে স্তব্ধ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন কিছুদিন পরে যখন আত্মসংবিৎ ফিরিয়া আসিল, সেই সময় কয়েকটি সহানুভূতিভরা দরদী হৃদয়ের পরিচয় নূতন করিয়া পাইয়াছিলাম। তখন বেশী কথা বলিয়া লোকের কাছে অন্তর্বেদনা ব্যক্ত করার সামর্থ্য আমার ছিল না, এখনো নাই। মনের তখনকার নানা চিন্তার সূত্র লইয়া মাঝে মাঝে খাতার পাতা পূর্ণ করিতাম। যদি কয়েকটি ভাগ্যহতা নারীর চিত্তে ইহা সমব্যথিতার সহানুভূতির স্নিগ্ধধারা ঢালিয়া দিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে 'পত্রলেখা' প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হইবে।"

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

জাতক চন্দ্রিকা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ। দাম ১৷৷৹। প্রাপ্তিস্থান—The Stellar Message Office, ২।২ উড়েপাড়া লেন, ইটালী পোঃ আঃ, কলিকাতা।

গ্রন্থকার একজন বাংলাদেশের খ্যাতনামা জ্যোতিষী এবং প্রবীন অধ্যাপক। তাঁর গণনার সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে,—এমন কি ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও বহুলোক তাঁর সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে থাকেন,—একথা আমাদের জানা আছে। আলোচ্য পুস্তকে পাশ্চাত্য ও দেশীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য অধিকার এবং অভিজ্ঞতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। বইখানিতে সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্রের একটী Bird's eye view ত আছেই,—তদুপরি যেভাবে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে মিল রেখে লেখক তাঁর বক্তব্য আলোচনা করেছেন, তাতে করে পাঠকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হ'বে, যে জ্যোতিষের সাহায্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই কথাটা প্রমাণ করবার জন্য লেখককে পরিশ্রম করতে হয়েছে অনেক। বহু গ্রন্থ থেকে তিনি উদাহরণ সঙ্কলন করেছেন, কোথাও উগ্রভাবে নিজের মত বা dogma জাহির করবার চেষ্টা করেননি। তিনি ভালো করেই জানেন যে বিজ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় করতে হ'লে facts বা statistics প্রয়োজন।

বইখানির ভাষা চমৎকার, যেমন প্রাঞ্জল তেমনি সুখপাঠ্য। বেশি technical করে ফেললে পাছে সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে পড়ে, এই ভয়ে তিনি মূল সূত্রগুলিরই আলোচনা করেছেন, সরল অথচ গভীর ও ব্যাপকভাবে। নবগ্রহের প্রকৃতি ও কারকতা বর্ণনা অতি বিশদ ও প্রাঞ্জল হ'য়েছে। গ্রহগণের কারকতা বর্ণনায় যে গভীর পাণ্ডিত্য ও বিস্তীর্ণ গবেষণার পরিচয় আছে,—তা' সত্যই দুর্লভ। শুধু এই অংশটি পাঠ করলেই জ্যোতিষশাস্ত্রের একটা প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। রাশির কারকতা বর্ণনায় তিনি যে সব অভিনব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, তা' অতীব সুপাঠ্য এবং চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। আমরা আশা

করি ভবিষ্যতে তিনি technical অংশগুলিরও বিস্তারিত আলোচনা করবেন এবং তাঁর শেষ জীবনের পূর্ণ অভিজ্ঞতালব্ধ অমূল্য রত্নরাজি দিয়ে এই সুবিস্তৃত জ্ঞান-ভাণ্ডারের গৌরব বৃদ্ধি করবেন।

আমরা বাংলা ভাষায় এমন পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। যাঁদের দৃষ্টি জ্যোতিষ বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হ'য়েছে, তাঁরা এ বই পড়লে নিজেদের গবেষণা-শক্তির উন্মেষের সাহায্য করবেন,—একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি; যাঁদের দৃষ্টি এদিকে এখনো আকৃষ্ট হয়নি,—তাঁরা এ বই পড়লে বুঝ্‌বেন, কত প্রয়োজনীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দুয়ার তাঁদের নিকট এখনো রুদ্ধ আছে।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

চম্পাদ্বীপ—শ্রীরমেশচন্দ্র দাস এম-এ, বি-এল প্রণীত ও শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

বহুল ঘটনা বিশিষ্ট ছেলেদের উপযোগী বড় উপন্যাস বাঙ্গলা ভাষায় যদিও থাকে ত' সংখ্যায় অতি অল্প সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রমেশবাবুর চম্পাদ্বীপ ছেলেদের সে অভাব অনেকটা পূরণ করবে। বইখানির পাতায় পাতায় আছে বনজঙ্গলের কথা, পশুপক্ষীর কথা, সমুদ্রের কথা,—যা শুধু ছেলেদেরই নয়, ছেলেদের অভিভাবকদের মনকেও আবিষ্ট ক'রে রাখে। বইখানি পড়লে ছেলেরা শিক্ষা এবং আনন্দ ত' একত্রে পাবেই, তদ্ভিন্ন তাদের কল্পনাবৃত্তি প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। একটি ধনী বাঙ্গালী পরিবার অষ্ট্রেলিয়ায় যাত্রা করেছিল স্বাস্থ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে, পথে জলঝড়ে জাহাজডুবি হ'য়ে প্রশান্তমহাসাগরের এক দ্বীপে উঠে তারা মাসের পর মাস কেমন ক'রে কত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করেছিল, তারই কৌতূহলময় বর্ণনায় বইখানি পূর্ণ। রমেশবাবুর "সাগরিকা" স্কুলের ও কলেজের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের নিকট খুব সমাদর লাভ করেছে। এ বইখানিও ছেলেদের তেমনি প্রিয় হবে ব'লে মনে হয়।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গীত-লহরী—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য তিন টাকা মাত্র। কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের একজন প্রথম শ্রেণীর গায়ক। সুতরাং তিনি স্বরলিপির যে পুস্তক রচিত এবং প্রকাশিত করবেন গীত নির্ব্বাচনের দিক দিয়ে এবং গানগুলির রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষণ এবং বিশুদ্ধ লিপিকরণের দিক দিয়ে তা যে উৎকৃষ্ট এবং নির্দ্দোষ হবে এ পুস্তকখানি তার অন্যতম প্রমাণ। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল মিশ্র নামে ভাগলপুর নিবাসী আমার জনৈক বিহারী বন্ধু আমার নিকট হ'তে গোপেশ্বরবাবুর সঙ্গীত-চন্দ্রিকা ১ম ও ২য় ভাগ গ্রহণ এবং পাঠ ক'রে প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, একজন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তকে হিন্দি গানের পাঠের বিশুদ্ধতা দেখে আমি বিস্মিত হ'য়েচি। তখনি বুঝেছিলাম, শিক্ষার মূলে সঙ্গীতের আভিজাত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা না থাক্‌লে ওরূপ হয় না। আলোচ্য পুস্তকখানি পরীক্ষা ক'রে এবং পুস্তকের অন্তর্গত কতকগুলি গানের ঔৎকর্ষ্য অনুভব ক'রে গোপেশ্বরবাবুর স্বরলিপি পুস্তক সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বের ধারণা দৃঢ়তর হয়েচে।

সঙ্গীত লহরী পুস্তকে ৯৮ খানি উচ্চাঙ্গের হিন্দি খেয়াল টপ্‌পা ঠুংরি গানের এবং তান বাঁটের স্বরলিপি আছে। গানগুলি সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, অচপল, সুরখাঁ, নিয়ামৎখাঁ, শোরী, হমদম, সনদ, কদর, কৃপাসখী, সাঁবরীসখী প্রভৃতি বিখ্যাত গায়কগণ রচিত। গ্রন্থকার-বিরচিত কয়েকটি হিন্দি গানও আছে। যিনি ধৈর্য্যধারণ ক'রে সঙ্গীত লহরীর গানগুলি আয়ত্ত করবেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মহাসাগরে তিনি প্রবেশ লাভ করবেন তা নিশ্চয়।

পুস্তকখানিতে স্বরলিপির দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েচে। দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতির মুদ্রণ উপকরণ সব ছাপাখানায় থাকে না ব'লে আকারমাত্রিক পদ্ধতির চেয়ে দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি কিছু ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু যে পদ্ধতিতে সুরের graphic representation যত বেশি, সে পদ্ধতি শিক্ষার পক্ষে তত বেশি সুবিধাজনক। সে হিসাবে আকারমাত্রিক পদ্ধতি অপেক্ষা দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি বাঞ্ছনীয়।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১২

সেদিন সন্ধ্যা কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করলে না, জলস্পর্শ করলে না; বৈকাল থেকে সেই যে শয্যা গ্রহণ ক'রেছিল তারপর সে-রাত্রি তাকে কেউ একবারও ঘরের বাইরে আসতে পর্য্যন্ত দেখেনি। যতবারই সবিতা তাকে ওঠাবার খাওয়াবার চেষ্টায় গেছে, প্রতিবারই একই সংক্ষিপ্ত উত্তর পেয়ে ফিরেছে—'আজ আমাকে ছেড়ে দাও ভাই সবিদিদি, একেবারে একলা। কিছু ভালো লাগ্‌চে না, ভারি ক্লান্ত!' সবিতা তাকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারে কথাটা উত্থাপিত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সন্ধ্যা সে কথায় কোনো দিক দিয়েই যোগ দেয়নি, না অনুযোগ অভিযোগের দিক দিয়ে, না দুঃখ অভিমানের দিক দিয়ে। কান্নাকাটির ত' ধার দিয়েও যায়নি।

রাত্রি দশটার সময়ে সবিতা গিয়ে যখন দেখ্‌লে ভিতর থেকে সন্ধ্যার ঘরের দ্বার রুদ্ধ, তখন প্রকাশ বল্‌লে, "আর ডাকাডাকি কোরো না সবু, একরাত্রি আহার না করলে কোনো অনিষ্ট হবে না, কিন্তু একটু যদি ঘুমিয়ে পড়ে তাহ'লে ওর দেহ মন দুই-ই কিছু সুস্থ হ'তে পারবে।"

কিন্তু কোনো উপায়ে প্রকাশ যদি অবরুদ্ধ দ্বারের ভিতরকার অবস্থা একটুখানি দেখ্‌তে পেত তাহ'লে বুঝ্‌তে পারত যে-দুটি চক্ষের মধ্যে অশ্রুর পরিবর্ত্তে অগ্নির রুদ্রলীলা চলেছিল সেখানে ঘুমের কোনো সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। যে বস্তুর উপর বৃষ্টিপাত হ'ল না, শুধু বজ্রপাতই হ'ল, সে জলবে না ত' আর কি হবে?

তিরোবিয়া থেকে দবীপুর এবং দবীপুর থেকে টাটানগর সে এই সুনিশ্চিত ধারণা বহন ক'রে ছুটে এসেছিল যে, ডাকাতদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছে শোনবামাত্র তার পিতা মাতা, শ্বশুর, স্বামী সকলেই বাহু প্রসারিত ক'রে ছুটে আসবে;—বল্‌বে, 'ওরে আয়, আয়, আমাদের হারানো ধন, আমাদের হারানো মাণিক, আমাদের ঘরে ফিরে আয়, আমাদের বুকে ফিরে আয়! তোকে হারিয়ে আমরা জীবন্মৃত হ'য়েছিলাম, ফিরে পেয়ে মৃতদেহে প্রাণ পেলাম! কিন্তু কোথায় বা ছুটে আসা, কোথায়ই বা বাহু প্রসারণ! স্বপ্ন-মরীচিকা চক্ষের পলকে অন্তর্হিত হ'ল। যা এল, তা জড় নিশ্চল, তার মধ্যে পাষাণের স্থাবরতা! তার মধ্যে স্নেহ নেই, প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, দুঃখ নেই, সমবেদনা নেই; আছে শুধু শুভবুদ্ধি। পিতৃপক্ষ এবং শ্বশুরপক্ষ, উভয়পক্ষের মুখে একই বাক্য—অন্যত্র, অন্যত্র!

কিন্তু উভয় পক্ষই যদি অন্যত্র বলে, তা হ'লে সে 'অন্যত্র' কোথায়? পথে কি? না নদীগর্ভে, না অগ্নিকুণ্ডে? সবিতা বলে তাদের গৃহে। কিন্তু কিছুতেই নয়! কুটুম্ববাড়িতে আশ্রিতা হয়ে করুণার উপর নির্ভর ক'রে জীবন-যাপন কোনোমতেই পারা যাবে না। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠে সবিতা এবং প্রকাশের মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে সেই সুরে সুর মিলিয়ে দিন আরম্ভ করতে হবে, তার চেয়ে ভিক্ষা ভাল, দাসীবৃত্তি ভাল। ঘর ঝাঁট দিয়ে, উঠান পরিষ্কার ক'রে, বাসন মেজে জীবিকা অর্জ্জনের মধ্যে দৈন্য থাকতে পারে, কিন্তু হীনতা নেই। কিন্তু গলগ্রহ হয়ে থাকা?—না, কিছুতেই নয়!

আচ্ছা, স্কুলে মেয়েদের গান শিখিয়ে কোনো প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয় না কি? সে ত স্কুলের মধ্যে তার সময়ে গানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী ছিল। সভাসমিতি, পুরস্কার-বিতরণ, অভিনয়, সব তাতেই গানের প্রধান ভার পড়ত তার উপর।

মনে পড়ল তার সঙ্গীত শিক্ষক যতীন চাটুয্যের কথা। গান শেখাতে শেখাতে যতীন চাটুয্যে একদিন তাকে ব'লে-

ছিলেন, সন্ধ্যা, তোমার গলায় মালকোশের কোমল গান্ধার শুনে আমার মনে হয়, এমন কোনো রাগিণীই নেই যা তুমি ডাক্‌লে তোমার কাছে সম্পূর্ণ মূর্ত্তিতে এসে ধরা না দেয়। সেদিন যতীনবাবু সন্ধ্যাকে অদারঙ্গের বিখ্যাত খেয়াল 'আজু মোরে ঘর আইলা সুমত প্যারে' শেখাচ্ছিলেন। গান শেখানো শেষ হ'লে তিনি বলেছিলেন, শুনছি তোমার খুব বড় বনেদী ঘরে বিয়ের কথা হচ্চে, আশীর্ব্বাদ করি তাই যেন হয়। সে ভারি আনন্দের কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এই ভয় হচ্চে মা, বনেদী বংশের ঘেরাটোপের মধ্যে ঢুকে শেষ পর্য্যন্ত তোমার গলায় না ছিপি পড়ে। তা যদি হয়, তা হ'লে আমি বুঝ্‌ব বাঙলা দেশের একটি সুরেলা পাপিয়ার কণ্ঠরোধ করা হলো। সে, অন্ততঃ আমার পক্ষে, ভারি পরিতাপের কথা হবে। আর যদি দুটো বৎসর তোমাকে শেখাতে পারতাম সন্ধ্যা, তা হ'লে তোমাকে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্ণৌ দিল্লীর মুখে চুণকালি দিয়ে আস্‌তে পার্‌তাম। বাঙলা দেশের একটা অপবাদ দূর হোত।

ওস্তাদের মুখে এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাণী শুনে সেদিন সন্ধ্যারও মনে তার বিবাহ প্রস্তাবের উপর একটা সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়েছিল। সঙ্গীতের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ বশতঃ মনে হয়েছিল বিবাহটা আরও দুটো বৎসর পেছিয়ে গেলে সত্যই মন্দ হোত না; তা'তে দিল্লী লক্ষ্ণৌর মুখে চুণকালি দেওয়া না হোক, যে জিনিস থেকে চিরদিনের মতো বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে, তার মেয়াদ আরও দুটো বৎসর বেড়ে যেত। আজ তার মনে হ'ল হয়ত' গুরু শিষ্যার মনের গোপনতম যুক্ত কামনার প্রভাবেই তার বিবাহ বন্ধনে এত বড় একটা চোট এসে পৌঁচেছে,—হয়ত যতীন চাটুয্যের শরণাপন্ন হয়েই গানবাজনার সাহায্যে গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থার জন্ত চেষ্টা করতে হবে।

হঠাৎ সন্ধ্যা চকিত হয়ে তার দুশ্চিন্তার তন্দ্রা থেকে জেগে উঠ্‌ল। ছি, ছি, এমন সব অশুভ কথা কেন সে এমন ক'রে চিন্তা ক'রে দুঃখ ভোগ করছে। কী এমন হয়েচে যে, চরম দুর্দ্দশার কথা ভেবে নিয়ে তার জন্তে প্রস্তুত হ'তে হবে? নিদ্রাভঙ্গে দুঃস্বপ্নের মতো হয় ত' কালই এ সবই অলীক হ'য়ে যাবে। তবে সে কেন মিছিমিছি এমন ক'রে আত্ম-নিপীড়ন করে!

কিন্তু এ ক্ষণজাগ্রত সান্ত্বনা পাঁচ মিনিটের জন্তও সন্ধ্যার মনের মধ্যে অবস্থান করলে না। নিষ্প্রভ রামধনুর মত এক মুহূর্ত্তের জন্ত ফুটে উঠে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিলিয়ে গেল। যে বিপুল প্রত্যাশা প্রথমেই এই নির্জীব অভ্যর্থনা লাভ করলে তার মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যু-কীট বাসা বেঁধেছে। কোনো রকমেই তাকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে না।

পুনরায় সন্ধ্যার মন দুশ্চিন্তার চিতানলে পুড়ে পুড়ে ছাই হ'তে লাগ্‌ল।

ধীরে ধীরে সমস্ত রাত্রি গেল কেটে। ঘুম হওয়া ত' দূরের কথা, চোখের পাতাও একবার মুদিত হ'ল না। এক সময়ে জানলার ভিতর দিয়ে দেখা গেল আকাশের ঘন তমিস্রের মধ্যে হঠাৎ কখন অতিক্ষীণ আলোকের নিষ্প্রভ প্রলেপ পড়েছে। উঃ, দুশ্চিন্তার দীর্ঘ রাত্রি কোনো রকমে কাটল তা হ'লে! শয্যাত্যাগ ক'রে সন্ধ্যা দ্বার খুলে বাহিরে বারান্দায় এসে তার অবসন্ন দেহ একটা ইজিচেয়ারের মধ্যে এলিয়ে দিলে।

তখন বাড়িতে কেউতো জাগেইনি, রাজপথেও লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি। উষার শীতল বাতাস লেগে তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যেন একটু স্নিগ্ধ হ'ল। বিশ্বপ্রকৃতির চারিদিকে চেয়ে চেয়ে মনের অসহায় ভাবটা একটু তরল হ'য়ে গেল,—মনে হ'ল একেবারেই হয়ত সে নিঃসহায় নয়, এত বড় জগতের মাঝে কোনো এক কোণে তার জন্তও হয়ত' একটু স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু সে স্থানের কোনো সীমানা আপাতত দেখা যাচ্ছে না,—একেবারে অজ্ঞাত, অনিশ্চিত।

খস্‌খস্‌ শব্দে সন্ধ্যা চেয়ে দেখ্‌লে সবিতা আস্‌ছে।

সবিতা কাছে এসে সন্ধ্যার মাথায় হাত রেখে বল্‌লে, "কি রে সন্ধ্যা, কখন এখেনে উঠে এসেছিস্? ঘুম ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি তোর ঘরের দোর খোলা। তখনি বুঝ্‌লাম এখানে এসে বসেছিস।"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "বেশিক্ষণ নয় সবিদি, আধঘণ্টাটাক হবে।"

সন্ধ্যার চোখের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে সবিতা বল্‌লে, "তোর চোখ অত লাল কেন রে? সমস্ত রাত কেঁদেছিস বুঝি?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না, কাঁদিনি ত।"

"তবে অত লাল হ'ল কেন?"

"ঘুম হয়নি, বোধ হয় সেইজন্যে।"

"সমস্ত রাত ঘুমোসনি বুঝি?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না"।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সন্ধ্যার পাশে উপবেশন ক'রে সবিতা স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, "এর মধ্যে এমনই কি হয়েচে সন্ধ্যা, যে, তুই এতটা উতলা হ'য়ে পড়লি? কাল জলস্পর্শ করলিনে, সারারাত ভেবে ভেবে জেগে কাটালি। এতটা ব্যস্ত হ'য়ে পড়বার মত কী হয়েচে?"

দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "কি হয়েচে তা কি তুমিই বুঝ্তে পারচ না সবিদি? তুমিই কি নিশ্চিন্ত আছ? তোমার মুখ দেখেও ত' মনে হয় তোমার মনে ভাবনা কম নেই।"

সবিতা বললে, "কিন্তু ব্যবস্থাও ত' সবই হচ্ছে ভাই। তোর মুখুয্যে মশাই কাল রাত বারোটা পর্য্যন্ত জেগে মেসো-মশাইকে আর তোর শ্বশুরকে বড় বড় চিঠি লিখেচেন। তিনিও কাল কিছু খাননি, শুধু এক পেয়ালা চা আর দুখানা বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।"

"আর তুমি?"

"তুই খেলিনে, তোর মুখুয্যে মশাই খেলেন না,—আর আমার গলা দিয়ে খাবার পেটে নাম্ত?"

সন্ধ্যার মুখে বেদনার চিহ্ন দেখা দিলে; বললে "কত কষ্টই তোমাদের দিচ্ছি সবিদি। কত পাপই পূর্ব্বজন্মে করেছিলাম যার জন্যে এই সব অপরাধ করতে হচ্চে।"

সবিতা সন্ধ্যাকে একটা ধমক দিয়ে বললে, "তুই চুপ কর্ সন্ধ্যা, তোকে আর ভদ্রতা প্রকাশ করতে হবে না! যে কষ্ট তুই নিজে ভোগ করছিস, যেদিন তোকে হাসিমুখে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারব সেদিন এ দুঃখ যাবে।"

"সেদিন কি কোনো দিন হবে সবিদি?"

"হবে, হবে, নিশ্চয় হবে। তুই মনের জোর একেবারেই হারিয়েছিস দেখ্চি!" তারপর সবিতা অন্যদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ঐ উনি আস্ছেন।"

প্রকাশ নিকটে আসতেই সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল। বললে, "আপনি এইটেতে বসুন মুখুয্যেমশাই।"

প্রকাশ বললে, "ক্ষেপেচ? আমার বাড়িতে শ্যালিকার আসন সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমি আসনচ্যুত হয়ো না। আমি এইটেতে বস্ছি।" ব'লে একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়ল। তারপর স্মিতমুখে বল্লে, "কাল রাত থেকে তপস্যা আরম্ভ করলে নাকি সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা প্রকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্লে, "আপনারাও ত' করেচেন।"

"কি করি বল? একজন আরম্ভ করলে যোগ না দিতে লজ্জা বোধ করে। তবে আমি প্রায়োপবেশন করেছিলাম প্রায়, সম্পূর্ণ নয়। তোমার দিদি বোধ হয় সম্পূর্ণই করেছিলেন। সেই প্রয়োপবেশনের শুভলগ্নে দুখানি লম্বা চিঠি লিখেচি, একখানি তোমার শ্বশুরকে আর একখানি মেসোমশাইকে। তুমি দেখবে?"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "না। যা লিখেচেন, ভালই লিখেচেন, আমার দেখ্বার কোনো দরকার নেই।"

"মন্দ লিখেচি, তা বলছিনে, কিন্তু ভাল জিনিষ দেখাও মন্দ নয়।"

সন্ধ্যা পুনরায় ঘাড় নেড়ে বললে, "না।"

প্রকাশ বললে, "আচ্ছা তা হ'লে আমাদের বাগানে সন্ধ্যার কুঁড়িগুলি সকালের ফুলে কি রকম পরিণত হয়েচে দেখে আসা যাক্ চল। আশা করি তা'তে কোনো আপত্তি নেই।"

সন্ধ্যা বললে, "তা নেই, চলুন।"

"বেশ কথা। তারপর সাতটার সময় চা ইত্যাদির দ্বারা ভাল ক'রে প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করা যাবে,—কেমন?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "তাই হবে।"

প্রসন্নমুখে প্রকাশ বললে, "চল সবু, কাঁচি আর সাজিটা নিয়ে একবার তা হ'লে বাগানটা ঘুরে আসা যাক্।"

উপকরণ দুটি সংগ্রহ ক'রে তিনজনে বাগানের দিকে অগ্রসর হ'ল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন

বিগত ২রা অক্টোবর নিখিল ভারতে মহাত্মা গান্ধীর ছয়ষট্টিতম জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় জগতের জটিল ঘটনা পরম্পরায় মহাত্মা গান্ধীর এখন কংগ্রেস থেকে বিদায় নেবার কথা হচ্ছে। যদিও দেশের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে মহাত্মা আজ বিদায় নিতে উদ্যত, তথাপি তাঁর জনপ্রিয়তা এবং জন-মনের উপর প্রভাব যে এখনও অক্ষত আছে এবং চিরকাল থাকবে তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাঁর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে। বাস্তবিক তাঁর প্রবর্ত্তিত অহিংসনীতি বা অসহযোগ আন্দোলনের ফলাফল যাই হোক, একটা সমগ্র ঘুমন্তদেশ ও জাতিকে যে তিনি জাগিয়াছেন একথা কোনদিন কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কংগ্রেস থেকে তিনি বিদায় গ্রহণ করুন, বা নাই করুন, তিনি এখনও দীর্ঘজীবি হয়ে আমাদের দেশকে সত্য কল্যাণের পথে পরিচালনা করুন, এই কামনা ক'রে আমরা আজ তাঁর চরণে প্রণিপাত করি।

বাসন্তী কটন্ মিলস্ লিঃ

গত ২৩:শ সেপ্টেম্বর তারিখে এই মিলের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। দেশের বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হলে শুধুই যে দেশের আর্থিক উন্নতি হয় তা নয়, দেশের শ্রীবৃদ্ধিও হয়। এইদিক দিয়ে বাসন্তী মিলের পরিচালকগণ দেশের কবিকে দিয়ে তাঁদের কারখানার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়ে সুবিবেচনার কাজ করেছিলেন।

এই মিলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেন না, এর পেছনে দেশের অর্থশক্তিও যেমন আছে ধীশক্তি ও শ্রমশক্তিও তেম্‌নি আছে। যাঁদের মনে এই মিলের পরিকল্পনা জেগেছিল মাত্র এক বছরের মধ্যে তাঁরা তাঁদের কল্পনাকে একটা বিরাট অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ দিতে পেরেছেন এটা বড় কম কথা নয়। সমগ্র দেশের কল্যাণ কামনা এঁদের পেছনে আছে, এবং তাকেই বাণী দিয়েছিলেন কবি সেদিন তাঁর অভিভাষণের মধ্যে। আমরা সাগ্রহে এই মিলের প্রগতি লক্ষ্য করব।

পরলোকগত স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ

স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ বহুদিন কলিকাতা হাইকোর্টের জজিয়তি করেছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকবারই তিনি প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন। জজিয়তি হ'তে তিনি অবসর গ্রহণও করেন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি রূপে। জজিয়তি হ'তে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি স্যর প্রভাসচন্দ্রের স্থানে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদে সদস্য পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যবশতঃ সে পদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। নির্ভীক সুবিচারক ব'লে স্যর চারুচন্দ্রের যশ যথেষ্ট ছিল।

পরলোকগত কুমার মন্মথনাথ মিত্র

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬৮ বৎসর বয়সে কুমার মন্মথনাথ মিত্রের মৃত্যু ঘটেছে। মন্মথনাথ কলিকাতা ঝামাপুকুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্র ছিলেন। এঁর পিতার নাম ছিল গিরিশচন্দ্র মিত্র। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং

অনুষ্ঠানের সহিত মন্মথনাথের যোগ ছিল। হিন্দু অনাথাশ্রমের জন্য তিনি পনেরো হাজার টাকা মূল্যের ভূমি দান করেন। জাতীয় ধনভাণ্ডারে তিনি বহু অর্থ দান করেন এবং নিজের চেষ্টার দ্বারাও অনেক অর্থ তুলিয়া দেন। কুমার মন্মথনাথ মিত্রের ঝামাপুকুরের রাজবাটীতে দরিদ্র ছাত্র এবং সাধারণ ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে আহার ও ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে। মন্মথনাথ মিত্রের মৃত্যুতে কলিকাতা একজন বিশিষ্ট নাগরিক থেকে বঞ্চিত হ'ল।

বনকুসুম কেশ তৈল

বনকুসুম পারফিউমারী ওয়ার্কসের প্রস্তুত "বনকুসুম কেশ তৈলে"র নমুনা উপহার পেয়ে ব্যবহার ক'রে আমরা সন্তুষ্ট হয়েচি। তৈলটির সুমিষ্ট সৌরভ তৃপ্তিদায়ক, এবং স্নানের পর ব্যবহারে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখে ব'লে মনে হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল কি তা জানিনে, কিন্তু নির্ম্মলতা দেখে মনে হয় তেলটি বিশুদ্ধ উপকরণে প্রস্তুত।

মিত্র মুখার্জ্জী এণ্ড কোং

৩৫ নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড ভবানীপুর কলিকাতার মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড্ কোম্পানী সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার ব্যবসায়ী। প্রতিষ্ঠানটি ইং ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্ত্তমান বৎসরে ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় স্বত্বাধিকারীগণ সম্প্রতি জুবিলী উৎসব করছেন এবং তদুপলক্ষে জুবিলী উপহার বিতরিত হচ্ছে। এত দীর্ঘকাল ধ'রে একটি সোনা রূপা মণি মাণিক্যের কারবার পরিচালিত হ'য়ে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া ব্যবসাগত সততার পরিচায়ক। আমরা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীগণকে তাঁদের জুবিলী উৎসব উপলক্ষে আমাদের সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সাধারণ সম্পাদকের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত পত্রখানি আমরা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করলাম।

"বারো বৎসর পূর্ব্বে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে কাশীধামে কবিবর রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়, তাহার পর এই কয়েক বৎসর যাবৎ উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান শহরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। গোরক্ষপুরে উক্ত সম্মিলনের একাদশ অধিবেশনে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশিত হয় যে, উহার অধিবেশন একবার কলিকাতায় হইলে ভাল হয়। কলিকাতায় অধিবেশনে বঙ্গের বাহিরের নানা প্রদেশ হইতে আগত বাঙ্গালী এবং বঙ্গের বাঙ্গালীদিগের মিলনের সুযোগ হইবে।

কয়েক বৎসর যাবৎ কি বঙ্গে, কি বঙ্গের বাহিরে, সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী জীবনে বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, এই সম্মিলনের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় আলাপ আলোচনা নানা কারণে অসমীচীন হইলেও সাহিত্যিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা এইরূপ সম্মিলনেই সাধিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত এইরূপ সম্মিলন বাঙ্গালীজাতির মধ্যে সংহতি ও ঘনিষ্টতা বৃদ্ধির সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই।

বঙ্গের বাঙ্গালী ও প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে যাহাতে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক জন্মিতে পারে, এতদুদ্দেশ্যে এবার বড় দিনের অবকাশে কলকাতায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের দ্বাদশ-বার্ষিক অধিবেশন আহূত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার এস, সি, রায় মহাশয়দিগকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচন করিয়া উহার অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

ব্রিটীশ রাজত্বের প্রথম হইতেই কলিকাতা সহর বাঙ্গালী সভ্যতা ও সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালীকৃষ্টির কেন্দ্রস্থল হইয়া আছে, কাজেই সম্মিলনের কলিকাতায় অধিবেশন যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক সার্থক হয় তাহা কলিকাতাবাসী প্রত্যেক বাঙ্গালী, বাঙ্গালীজাতি ও বাংলার সভ্যতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কলিকাতাস্থ প্রত্যেক ভারতেরই বিশেষ কর্ত্তব্য। বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীগণ এই সম্মিলন উপলক্ষে এইবার তাঁহাদের নিজের প্রদেশেই আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, এমতাবস্থায় প্রবাসী বাঙ্গালীগণের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনায় ভার বাঙ্গালী

জনসাধারণের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। স্বগৃহে প্রবাসী বঙ্গভাষীগণের সর্ব্বপ্রকার প্রীতি ও আনন্দবর্দ্ধনের আয়োজন সুষ্ঠুরূপে সমাধা করা আজ প্রত্যেক বাঙ্গালীরই কর্ত্তব্য। এই কারণে অভ্যর্থনা সমিতি সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রেমিক বাঙ্গালীকেই এই সম্মিলনের কাজে যোগ দিতে সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে তাঁহারা সমিতির সভ্য হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। সু-লিখিত প্রবন্ধ পাঠ এবং সম্মিলন সম্পর্কে অন্যান্য কার্য্যেও সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আপনাদের কার্য্যতঃ সহানুভূতি না পাইলে সম্মিলনের অধিবেশন যদি আশানুরূপ সফল না হয়, তবে এই বিফলতার দায়িত্ব প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই বহন করিতে হইবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার সহিত পত্র ব্যবহার করিলে অনুগৃহীত হইব।

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়
৪৪।১, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ শরৎচন্দ্র ঘোষের প্রতি উচ্চ সম্মাননা অর্পণ

কলিকাতা ভবানীপুরের সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার শরৎচন্দ্র ঘোষ শুধু আমাদের দেশেই সুপরিচিত নন, ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতেও তিনি হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক মহলে সুপরিচিত। এতদ্দেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক যশ লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

লণ্ডনের The Royal Society of Literature of the United Kingdom সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সাহিত্য সম্বন্ধে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ইংলণ্ডেশ্বর এ প্রতিষ্ঠানের patron, এবং মারকুইস্ অফ্ ক্রু প্রেসিডেণ্ট্। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ প্রাপ্তি যে-কোনো সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। Royal Society of Literature ডাক্তার ঘোষকে জীবের প্রতিষ্ঠানের সদস্য ক'রে নেওয়ায় ডাক্তার ঘোষই শুধু গৌরবান্বিত হন নি, তাঁর সহিত সমস্ত ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সম্প্রদায় গৌরবান্বিত হয়েচে। আমরা যতদূর অবগত আছি ডাক্তার ঘোষের পূর্ব্বে একাধিক ভারতীয়ের প্রতি এই অসাধারণ সম্মাননা অর্পিত হয়নি। আমরা ডাক্তার ঘোষকে আমাদের সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

মুখার্জ্জির সুপার ক্যাষ্টর অয়েল

পি ৩৬২ নং রসা রোড কলিকাতার মুখার্জ্জি কোম্পানীর প্রস্তুত "মুখার্জ্জির সুপার ক্যাষ্টর অয়েলে"র নমুনা ব্যবহার ক'রে আমরা সুখী হয়েছি। তেলটির মৃদু সৌরভ সুমিষ্ট, এবং ক্যাষ্টর অয়েলের স্বাভাবিক দুর্গন্ধ প্রায় বর্জ্জিত বল্‌লে চলে।

৺জীবরাম নাথ বলাইচাঁদ নাথ

৯৫নং মনোহর দাস ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতায় এঁদের দেশী তাঁতের কাপড়ের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই কারবারটি বঙ্গাব্দ ১২৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং বয়ক্রম শতবর্ষেরও অধিক হ'ল। বিদেশী বণিকদের পল্লীতে এই বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠানটি এত দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হ'য়ে এসেছে, এ সত্যই আনন্দের কথা। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

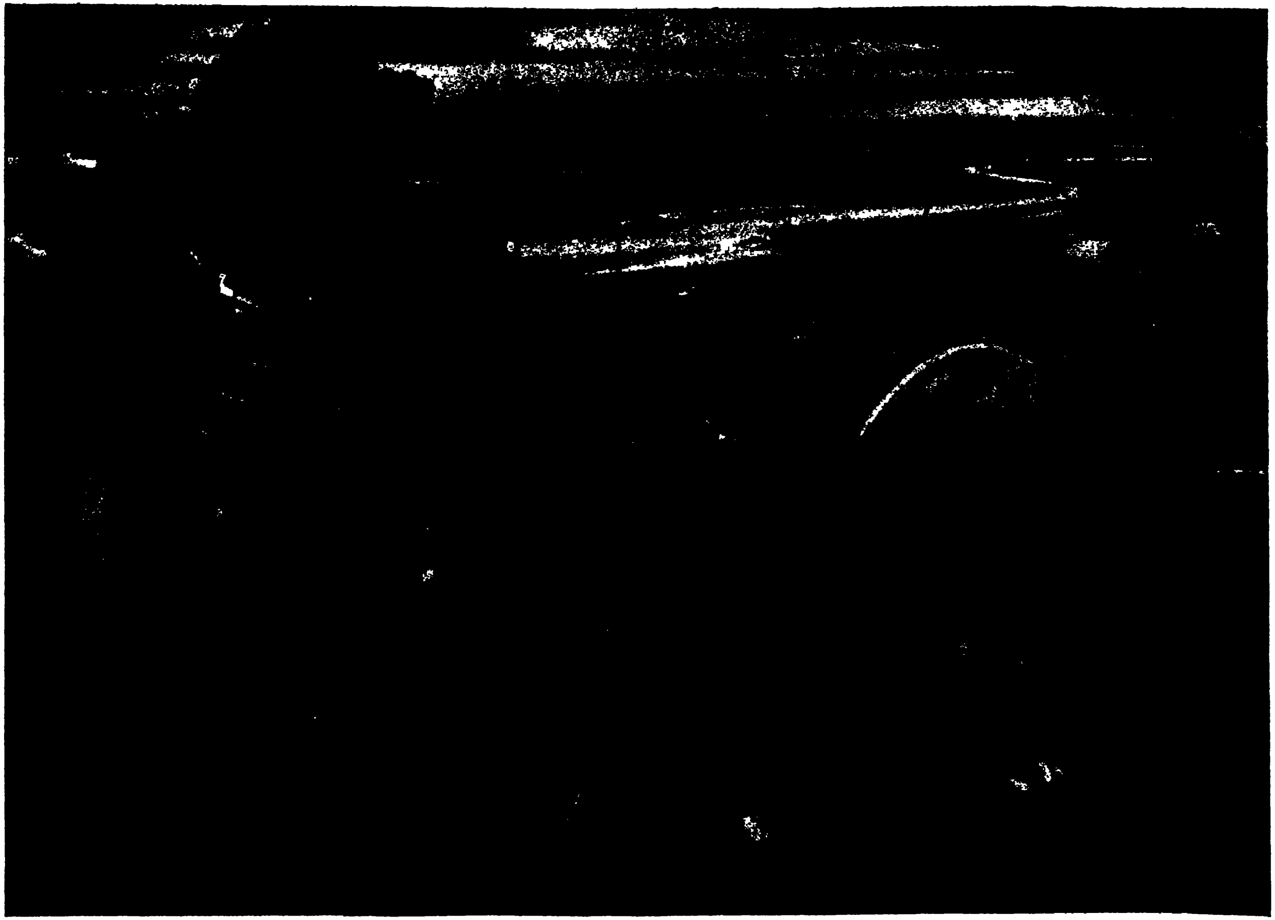
আমাদের নিবেদন

কার্ত্তিকের সংখ্যায় আয়তন কিছু বর্দ্ধিত ক'রেও "বিতর্কিকা" প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ এবার স্থানাভাবে বাদ দিতে হ'ল। বহু খ্যাতনামা গল্পলেখক এবার বিচিত্রায় গল্প দিয়েছেন। আমরা আশা করি সেগুলি পূজার অবকাশ দিনে পাঠকগণের চিত্ত বিনোদন করবে।

আগামী ২৬শে আশ্বিন থেকে ১২ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বিচিত্রা কার্য্যালয় বন্ধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত চিঠি পত্রের ব্যবস্থা ছুটির পর করা হবে।

বিচিত্রার লেখক, পাঠক, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণকে আমাদের পূজার অভিবাদন জানিয়ে উপস্থিত আমরা কয়েকদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works



বিচিত্রা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

হেমন্ত

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার

বিচিত্রা

অষ্টম বর্ষ, ১ম খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩৪১	৫ম সংখ্যা

অন্তরতম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপন মনে যে কামনার চলেছি পিছু পিছু
নহে সে বেশি কিছু।
মরুভূমিতে করেছি আনাগোনা,
তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা,
পর্ণপুটে একটু শুধু জল,
উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল।
সেইটুকুতে বিরোধ ঘোচে জীবন মরণের,
বিরাম জোটে শ্রান্ত চরণের।
হাটের হাওয়া ধুলায় ভরপুর
তাহার কোলাহলের তলে একটুখানি সুর—
সকল হতে দুর্লভ তা তবু সে নহে বেশি ;—
বৈশাখের তাপের শেষাশেষি
আকাশ-চাওয়া শুষ্ক মাটিপরে
হঠাৎ ভেসে-আসা মেঘের ক্ষণকালের তরে
এক-পসলা বৃষ্টি বরিষণ ,
দুস্বপন বক্ষে যবে শ্বাস নিরোধ করে
জাগিয়ে দেওয়া করুণ পরশন ;
এইটুকুরই অভাব গুরুভার,
না-জেনে তবু ইহারই লাগি হৃদয়ে হাহাকার।

অনেক দুরাশারে
সাধনা ক'রে পেয়েছি তবু ফেলিয়া গেছি তারে।
যে-পাওয়া শুধু রক্তে নাচে, স্বপ্নে যাহা গাঁথা,
ছন্দে যার হোলো আসন পাতা,
খ্যাতি-স্মৃতির পাষাণপটে রাখে না যাহা রেখা,
ফাল্গুনের সাঁঝতারায় কাহিনী যার লেখা,
সে ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে,—
এই যা দান গিয়েছে মিশে গভীরতর প্রাণে,
করিনি যার আশা,
যাহার লাগি বাঁধিনি কোনো বাসা,
বাহিরে যার নাইকো ভার যায় না দেখা যারে
ব্যাপিয়া আছে সে যে আমার নিখিল আপনারে।

শান্তিনিকেতন
৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

বিপ্রদাস

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৪

মেজদিদিকে জোর করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া বন্দনা তাহার পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছিল। এই মঙ্গলাচারটুকু অন্নদা তাহাকে শিখাইয়া দিয়া নিজে আত্মগোপন করিয়াছে। তাহার চোখ রাঙা, অবিরত অশ্রুবর্ষণে চোখের পাতা ফুলিয়াছে—বন্দনার প্রশ্নের উত্তরে সে সংক্ষেপে বলিয়াছিল বৌকে মুখ দেখাতে আমি পারবো না।

—তুমি পারবে না কেন অনুদি, তোমার লজ্জা কিসের?

—আমার লজ্জা এই জন্যে যে এর আগে মরিনি কেন? শুধু দ্বিজুকেই ত মানুষ করিনি বন্দনা দিদি, বিপিনকেও করেছিলুম। ওর মা যখন মারা গেল কার হাতে দিয়েছিল তার ছ মাসের ছেলেকে? আমার হাতে। সেদিন কোথায় ছিলেন দয়ামরী? কোথায় ছিল তাঁর মেয়ে-জামাই? বলিতে বলিতে সে মুখে আঁচল চাপিয়া দ্রুতপদে অন্যত্র সরিয়া গেল। মেঝেয় বসিয়া নিজের জানুর উপর দিদির পা দুটি রাখিয়া বন্দনার আলতা পরানো যেন আর শেষ হইতে চাহে না।

টপ্ করিয়া এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু সতীর পায়ের উপর পড়িল। হেঁট হইয়াও সে বন্দনার মুখ দেখিতে পাইল না। কিন্তু হাত বাড়াইয়া তাহার চোখ মুছাইয়া বলিল, তুই কেন কাঁদচিস্ বল্‌তো বন্দনা?

বন্দনা তেমনি নত মুখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, কাঁদচে ত সবাই মেজদি। আমিই ত একা নয়।

—সবাই কাঁদছে বলে তোকেও কাঁদতে হবে, এত লেখা-পড়া শিখে এই বুঝি তোর যুক্তি হলো?

দিদির কথা শুনিয়া বন্দনা মুহূর্তের জন্য মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, যুক্তি দেখিয়ে কাঁদতে হবে নইলে মানুষে কাঁদবে না, তোমার যুক্তিটা বুঝি এই মেজদি?

সতী হাত দিয়া তাহার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া সস্নেহে কহিল, তর্কবাগীশের সঙ্গে তর্কে পারবার জো নেই। তা' বলিনি রে, তা আমি বলিনি। ওরা ভেবেছে আমার সব বুঝি গেলো তাই ওদের কান্না, কিন্তু সত্যি ত তা' নয়। আমার এক দিকে রয়েছেন স্বামী, অন্য দিকে ছেলে,—সংসারে কোন ক্ষতিই আমার হয়নি ভাই, আমার জন্যে তুই শোক করিসনে। দুঃখ আমার নেই।

বন্দনা বলিল, দুঃখ যেন তোমার না-ই থাকে মেজদি। কিন্তু তোমার দুঃখটাই সংসারে সব নয়। তোমার কতখানি গেলো সে তুমি জানো, কিন্তু কেঁদে-কেঁদে যারা চোখ অন্ধ করলে তাদের লোকসান কে পুরোবে বলো ত?

একটু থামিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই পুরুষমানুষ যা খুসি উনি বলুন, কিন্তু যাবার ক্ষণে আজ শুক্‌নো চোখে যেন তুমি বিদায় নিওনা দিদি। সে ওদের বড় বিঁধবে।

—কাদের বিঁধবে রে বন্দনা?

—কাদের? জানোনা তুমি তাদের? তোমার ন'বছর বয়সে এসেছিলে এই পরের বাড়ীতে, সেই বাড়ীকে বছরের পর বছর ধ'রে তোমার আপনার করে দিলে যারা আজকের একটা ধাক্কাতেই তাদের ভুলে গেলে মেজদি? তোমার শাশুড়ী, তোমার দেওর, তোমার সংসারের দাস দাসী, আশ্রিত পরিজন, ঠাকুরবাড়ী, অতিথিশালা গুরু-পুরুত—এদের অভাব পূর্ণ হবে শুধু স্বামি-পুত্র দিয়ে? আর কেউ নেই জীবনে— শুধু এই?

বন্দনা বলিতে লাগিল, এ কাদের মুখের কথা জানো মেজদি, যে-সমাজে আমরা মানুষ হয়েছি তাদের। তুমি ভেবেছো স্বামী-ভক্তির এই শেষ কথা? স্ত্রীর এর বড়ো ভাববার কিছু নেই? এ তোমার ভুল। কলকাতায় চলো আমার মাসীর বাড়ীতে, দেখবে এ-কথা সেখানে পুরণো হয়ে আছে,—এর বেশী তারা ভাবেও না, করেও না। অথচ,—কথার মাঝখানে সে থামিয়া গেল। তাহার হঠাৎ মনে হইল কে-যেন পিছনে দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া দেখিল দ্বিজদাস। কখন যে সে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে উভয়ের কেহই টের পায় নাই। লজ্জা পাইয়া বন্দনা কি-যেন বলিতে গেল, দ্বিজদাস থামাইয়া দিয়া কহিল, ভয় নেই, মাসীকেও চিনিনে তাঁর দলের কাউকেও জানিনে,—আপনার কথা তাঁদের কাছে প্রকাশ পাবে না। কিন্তু আসলে আপনার ভুল হচ্চে। পৃথিবীতে জন্তু-জানোয়ারের দল আছে, তাদের আচরণ ফরমুলায় বাঁধা যায়, কিন্তু মানুষের দল নেই। এক জোটে এমন গড়-পড়তা বিচার তাদের চলে না। সকাল থেকে আজ এই কথাটাই ভাবছিলুম। মাসীর দল থেকে টেনে এনে অনায়াসে আপনাকে দাদার দলে ভর্ত্তি করা যায়, আবার দয়াময়ীর দল থেকে বার করে স্বচ্ছন্দে ঐ মৈত্রেয়ীকে আপনার মাসীর দলে চালান্‌ করা চলে। বাজি রেখে বলতে পারি কোথাও একতিল বিভ্রাট বাধবে না। বাঃ-রে মানুষের মন! বাঃ-রে তার প্রকৃতি!

সতী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এ-কথার মানে ঠাকুরপো?

দ্বিজদাস ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, তোমার কাছেও মানে? দ্বিজুর কাজ, দ্বিজুর কথার মানেই যদি থাক্‌বে বৌদি, এতকাল দয়াময়ী-বিপ্রদাসের দরবারে না গিয়ে তোমার কাছেই তার সব আর্জি পেশ হতো কেন? মানে বোঝার গরজ তোমার নেই বলেই ত? আজ যাবার দিনেও সেইটুকুই থাক বৌদি, ঠিক-বেঠিকের চুলচেরা বিচারে কাজ নেই। এই বলিয়া সুমুখে আসিয়া সে তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। এমন সে করে না। পায়ের কাঁচা আলতার রঙ তাহার কপালে লাগিয়াছে, সতী ব্যস্ত হইয়া আঁচলে মুছাইয়া দিতে গেল। সে ঘাড় নাড়িয়া মাথা সরাইয়া লইয়া বলিল, দাগ আপনিই মুছে যাবে বৌদি, একটা দিন থাকে থাক্‌। কথাটা কিছুই

নয়, দ্বিজু হাসিয়াই বলিল, কিন্তু শুনিয়া বন্দনার দু' চোখ জলে ভরিয়া গেল। লুকাইতে গিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিলনা।

দ্বিজদাস বলিল, আমি এসেছিলুম তাগাদা দিতে। সময় হয়ে আসছে দাদা ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। জিনিষপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাসুকে জামা কাপড় পরিয়ে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়েছি, মাঙ্গলিকের আয়োজন কে করে দিলে জানিনে, কিন্তু তা-ও হাতের কাছে পেয়ে গেলুম। ভয় হয়েছিল অন্নুদি হয়ত ডুবে মরেছেন কিন্তু সন্দেহ হচ্চে কোথাও বেঁচেই আছেন। নইলে ও-গুলো এলো কি করে? কিন্তু খুঁজে পাওয়া যখন তাঁকে যাবে না তখন খুঁজেও কাজ নেই। ওদিকে দয়াময়ীর মহল অর্গলবদ্ধ। সঙ্কট উত্তরণের যে পন্থা তিনি অবলম্বন করেছেন তাতে করবার কিছু নেই। তবে শ্রীমতী মৈত্রেয়ীকে বলে যেতে পারো যথা সময়ে মার কানে তা পৌঁছবে। কিন্তু আমি বলি প্রয়োজন নেই। এবার তুমি একটু তৎপর হয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসবে চলো বৌদি, তোমাদের ট্রেণে তুলে দিয়ে এসে আমি নিস্তার পাই, একটু কাজে মন দিতে পারি।

সতী ম্লান হাসিয়া কহিল, আমাকে বিদায় করতে ঠাকুরপোর ভারি তাড়া।

—আমার কাজ পড়ে রয়েছে যে।

—কি কাজ শুনি?

—এর আগে কখনো ত শুনতে চাওনি বৌদি। যখন যা চেয়েছি জিজ্ঞাসা না করেই চিরকাল দিয়ে এসেছো। এ তোমার শোনার যোগ্য নয়।

সতী এবং বন্দনা উভয়েই ক্ষণকাল নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে সতী বলিল, তুমি যাও ঠাকুরপো, আর আমার দেরি হবে না। বন্দনাকে কহিল, তুইও এখানে দেরি করিস্‌নে বোন,—যত শীঘ্র পারিস্‌ বোম্বায়ে ফিরে যা। কলকাতায় যাবার দরকার নেই, কাকা সেখানে একলা রয়েছেন মনে রাখিস্‌।

বন্দনা দ্বিজুর মতো পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল; বলিল, না মেজদি, মাসীর বাড়ীতে আর না। সে দিকের পাঠ উঠিয়ে দিয়েই বেরিয়েছিলুম এ কখনো ভুলবো না। এই বলিয়া সে আঁচলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, হয়ত কালই বোম্বায়ে ফিরবো, কিন্তু তুমিও যাবার আগে এই ভরসা দিয়ে যাও মেজদি আবার যেন শীঘ্র তোমাদের দেখতে পাই।

সতী মনে মনে কি আশীর্ব্বাদ করিল সে-ই জানে, হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল, হাসিমুখে বলিল, সে তো তোর নিজের হাতে বন্দনা। কাকাকে বলিস্‌ বিয়ের নেমন্তন্ন পত্র দিতে, যেখানে থাকি গিয়ে হাজির হবোই। একটুখানি থামিয়া বোধ হয় মনে মনে চিন্তা করিল বলা উচিত কিনা, তারপরে বলিল, ভারি সাধ ছিল এ-বাড়ীতে তুই পড়বি। ঠাকুরপোর হাতে তোকে সঁপে দিয়ে তোর হাতে সংসারের ভার বাসুর ভার সব তুলে দিয়ে মায়ের সঙ্গে কৈলাস দর্শনে যাবো, ফিরতে না পারি না-ই পারলুম,—কিন্তু, মানুষ ভাবে এক হয় আর। এই বলিয়া সে চুপ করিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিল, এ বাড়ীতে আমি যা পেয়েছিলুম জগতে কেউ তা

পায় না। আবার সব চেয়ে বেশী ক'রে পেয়েছিলুম আমার শ্বাশুড়ীকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘট্‌লো সব চেয়ে বেশি। যাবার আগে প্রণাম করতে পেলুম না দোর বন্ধ, চৌকাটের ধূলো মাথায় তুলে নিয়ে বললুম, মা, এই কাঠের ওপরে তোমার পায়ের ধূলো লেগে আছে, এই আমার—কথা শেষ করিতে পারিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া এইবার সে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার দু' চোখ বাহিয়া দর-দরধারে অশ্রু নামিয়া আসিল। মিনিট দুই-তিন গেল সামলাইতে, আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, আর পেলুম না খুঁজে আমার অনুদি'কে। সে আমার মায়েরও বড় বন্দনা। আমরা চলে গেলে তাকে বলিস্ ত রে, আমি রাগ করে গেছি। আবার দু' চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিল, আবার সে আঁচলে মুছিয়া ফেলিল। একটা বিড়াল পুষিয়াছিল, নাম নিমু। কাজ-কর্ম্মের বাড়ীতে সেটা যে কোথায় গিয়াছে ঠিকানা নাই। সকাল হইতে কয়েকবার মনে পড়িয়াছে এখনও তাহাকে মনে পড়িল। বলিল, নিমুটা যে কোথায় ডুব মারলে দেখে যেতে পেলুম না। অনুদি'কে বলিস্ ত বন্দনা। অথচ, একটু পূর্ব্বেই জোর করিয়া বলিয়াছিল, তাহার একদিকে রহিলেন স্বামী, অন্যদিকে সন্তান,—সংসারে কোন ক্ষতিই তাহার হয় নাই! কথাটা কতবড়ই না মিথ্যা!

—বৌদি করচো কি? বাহির হইতে দ্বিজদাসের আর এক দফা তাগাদা আসিল।

—যাচ্চি ভাই হ'য়েছে—বলিয়া সতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

* * * *

ষ্টেসন হইতে দ্বিজদাস যখন একাকী ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে তেমনি আলো জ্বলিয়াছে, তেমনি ভাবেই লোক-জন আপন-আপন কাজে ব্যস্ত, এই বৃহৎ পরিবারে কোথায় কি বিপ্লব ঘটিয়াছে কেহ জানেও না। বাহিরের মহলে উপরে বিপ্রদাসের বসিবার ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ,—ওদিকটা অন্ধকার। এমন কত দিনই আলো জ্বলে না, বিপ্রদাস থাকেন কলিকাতায়, অভাবনীয় কিছুই নয়। সিঁড়ির বাঁ দিকের ঘরটায় থাকে অশোক, জানালা দিয়া চোখে পড়িল ইজি-চেয়ারে পা ছড়াইয়া বাতির আলোকে সে নিবিষ্ট চিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছে। কলেজ কামাই করিয়া অক্ষয়বাবু আজও আছেন, তাঁর ঘরটা শেষের দিকে, তিনি ঘরে আছেন কিম্বা বায়ু-সেবনে বহির্গত হইয়াছেন জানা গেল না। মোটর হইতে প্রাঙ্গণে পা দিয়াই দ্বিজদাসের চোখে পড়িয়াছিল ত্রিতলের লাইব্রেরি ঘরটা। সন্ধ্যার পরে এ ঘরটা প্রায় থাকে অন্ধকার, আজ কিন্তু খোলা জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। তাহার সন্দেহ রহিল না এখানে আছে বন্দনা। বই পড়িতে নয়, চোখ মুছিতে। লোকের সংস্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সে এই নির্জ্জনে আশ্রয় লইয়াছে। আজ রাত্রিটা কোনমতে কাটাইয়া সে কাল চলিয়া যাইবে, সুদূর বোম্বাই অঞ্চলে,—যেখানে মানুষ হইয়া সে এতবড় হইয়াছে—যেখানে আছে তাহার পিতা, আত্মীয়-স্বজন, তাহার কতদিনের কত বন্ধু এবং বান্ধবী। কোনদিন কোন ছলে কখনো যে এ গ্রামে তাহার আবার আসা সম্ভব ভাবাও যায় না। না আসুক কিন্তু এ বাড়ী সে সহজে ভুলিবে না। বিচিত্র এ দুনিয়া,—কত অদ্ভুত অভাবিত ব্যাপারই না এখানে নিমিষে ঘটে। একটা একটা করিয়া সেই প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল কথাই দ্বিজুর মনে পড়িল। সেই হঠাৎ আসা আবার তেমনি হঠাৎ

রাগ করিয়া যাওয়া। মধ্যে শুধু ঘন্টা খানেকের আলাপ-আলোচনা। সেদিন বন্দনা সহাস্যে বলিয়াছিল, শুধু চোখের পরিচয়টাই নেই দ্বিজুবাবু, নইলে দেওরের গুণাগুণ লিখে পাঠাতে মেজদি কখনো আলস্য করেননি। আমি সমস্ত জানি, আপনার সম্বন্ধে আমার কিছু অজানা নেই। যতদিন যত জ্বালিয়েছেন বাড়ীশুদ্ধ লোককে তার সমস্ত খবর পৌঁচেছে আমার কাছে। দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা কেউ কারুকে চিনিনে, তবু আপনার কাছে আমার দুর্নাম প্রচার করার সার্থকতা ছিল কি? বন্দনা হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, বোধ করি আসলে মেজদি আপনাকে দেখতে পারতেন না,—এ তারই প্রতিশোধ।

তারপরে দুজনেই হাসিয়া কথাটাকে পরিহাসে রূপান্তরিত করিয়াছিল, কিন্তু সেদিন উভয়ের কেহই ভাবে নাই এ ছিল সতীর দ্বিজুর প্রতি বন্দনার চিত্ত আকর্ষণের কৌশল। যদি কখনো বোন্‌টিকে কাছে আনা যায়, যদি কখনো তাহার হাতে দিয়া অশান্ত দেবরটিকে শাসন মানানো চলে। কিন্তু সে ঘটিল না, তাহার গোপন বাসনা গোপনেই রহিয়া গেল,—আজও দুজনের কেহই সে সব চিঠির অর্থ খুঁজিয়া পাইল না।

দ্বিজদাস সোজা উপরে উঠিয়া গেল। পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বন্দনার কোলের উপর বই খোলা কিন্তু সে জানালার বাহিরে চাহিয়া স্থির হইয়া আছে। একটা ছত্রও পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ, বুঝিয়াও শুধু কথা আরম্ভ করিবার জন্যই সে প্রশ্ন করিল, কি বই পড়ছিলেন?

বন্দনা বই মুড়িয়া টেবিলে রাখিল, দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ফিরতে এত দেরি হলো যে? কলকাতার গাড়ী ত গেছে কোন্‌কালে।

দ্বিজদাস বলিল, দেরি হোক্ তবু ত ফিরেচি। না ফিরলেও ত পারতুম।

বন্দনা বলিল, অনায়াসে।

দ্বিজদাস এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, ঠিক এই কথাটাই আমার প্রথমে মনে হয়েছিল। গাড়ী ছেড়ে দিলে, জানালায় গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসু হাত নাড়তে লাগলো, ক্রমশঃ তার ছোট্ট হাতখানি গেল বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে। প্রথমে মনে হলো গেলেই হতো ওদের সঙ্গে—

বন্দনা কহিল, আপনি বাসুকে ভারি ভালোবাসেন, না?

দ্বিজদাস একটু ভাবিয়া বলিল, দেখুন জবাব দেবো কি, এ-সব জিনিসের আমি বোধ হয় স্বরূপই জানিনে। প্রকৃতিটা এত রুক্ষ, এমন নীরস যে, দু'দণ্ডেই সমস্ত উবে গিয়ে শুক্‌নো বালি আবার তেমনি ধু-ধু করে। প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে চোখে একবার জল এলো, কিন্তু তখনি আবার আপনিই শুকলো,—বাষ্পের চিহ্নও রইলো না।

বন্দনা কহিল, এ একপ্রকার ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

দ্বিজদাস বলিতে লাগিল, কি জানি, হতেও পারে। অথচ, এই বাসুর ভয়েই মা কাল থেকে ঘরে দোর দিয়ে আছেন। নইলে দাদার জন্যেও না, বৌদিদির জন্যেও না। মা ভাবেন বাসুকে বুঝি তিনি মানুষ করেছেন, কিন্তু হিসেব করলে দেখতে পাবেন ওর বয়সের অর্দ্ধেক কাল কেটেছে ওঁর তীর্থবাসে। তখন কার কাছে থাক্‌তো ও? আমার কাছে। টাইফয়েড জ্বরে কে জেগেছে বাট দিন? আমি। আজ যাবার সময় কে দিলে সাজিয়ে? আমি। ওর জামা-কাপড় থাকে আমার আলমারিতে, ওর বই-শ্লেটের

জায়গা হ'লো আমার টেবিল, ওর শোবার বিছানা আমার খাটে। মা টানাটানি করে নিয়ে যান—কিন্তু কত রাতে ঘুম ভেঙে ও পালিয়ে এসেছে আমার ঘরে।

বন্দনা নির্নিমেষে চাহিয়াছিল, বলিল, তবুত চোখের জল শুকিয়ে যেতে এক মুহূর্ত্তের বেশি লাগেনা।

দ্বিজদাস কহিল, না। এ-ই আমার স্বভাব। ওকে নিয়ে আমার ভাব্‌না শুধু এই যে, সে পড়বে গিয়ে তার বাপ মায়ের হাতে। আপনি বলবেন, জগতে এই ত স্বাভাবিক, এতে ভয়ের কি আছে? কিন্তু স্বাভাবিক বলেই বিপদ হয়েছে এই যে এত বড় উল্টো কথাটা মানুষকে আমি বোঝাবো কি ক'রে!

বন্দনা এ কথা বলিলনা যে, বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি! অন্যপক্ষে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে এতবড় অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাও তাহার কঠিন, বিশেষতঃ, বিপ্রদাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোন তর্ক না করিয়া সে নীরব হইয়াই রহিল।

পরক্ষণে বক্তব্য স্পষ্টতর করিতে দ্বিজদাস নিজেই কহিল, একটা সান্ত্বনা বৌদি' রইলেন কাছে, নইলে দাদার হাতে দিয়ে আমার তিলার্দ্ধ শান্তি থাকতোনা।

বন্দনা কহিল, আপনি ত নির্ব্বিকার, বাসুর ভালোমন্দ নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কিসের? যা হয় তা হোক্‌না।

শুনিয়া দ্বিজদাসের মুখের উপর সুতীক্ষ্ণ বেদনার ছায়া পড়িল কিন্তু সে মৌন হইয়া রহিল।

বন্দনা কহিল, দাদার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কথা একদিন আপনার নিজের মুখেই শুনেছিলুম। সে-ও কি ওই চোখের জলের মতো এক নিমিষে শুকিয়ে গেল? কিম্বা যে-লোক নিজের দোষে সর্ব্বস্বান্ত হয় তাকে বিশ্বাস করা চলে না এ-ই কি অবশেষে বলতে চান?

দ্বিজদাস বিস্ময় ও ব্যথায় অভিভূত চক্ষে ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পরে দুই হাত এক করিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না সে আমি বলিনি। আমি বলছিলুম তৃষ্ণার জলের জন্যে মানুষে সমুদ্রের কাছে গিয়ে যেন হাত না পাতে। কিন্তু দাদার সম্বন্ধে আর আলোচনা নয়, বাইরের লোকে তা বুঝবেনা।

এ কথায় বন্দনা অন্তরে অত্যন্ত আহত হইল, কিন্তু প্রতিবাদেরও কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দ্বিজদাস একেবারে অন্যকথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কালই বোম্বায়ে যাবেন?

বন্দনা বলিল, হাঁ।

—অশোকবাবুই নিয়ে যাবেন?

—হাঁ, তিনিই।

দ্বিজদাস বলিল, বোম্বাই-মেল এখান থেকে বেশি রাতে যায়। কাল আপনাদের আমি ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবো। কিন্তু দিনের বেলায় থাকতে পারবোনা একটু কাজ আছে।

—বাবাকে একটা তার করে দেবেন।

—আচ্ছা।

মিনিট দুই নীরব থাকিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিজদাস কহিল, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করবো প্রায় ভাবি, কিন্তু নানাকারণে দিন বয়ে যায় জিজ্ঞেসা করা আর হয় না। কাল চলে যাবেন সময় আর পাবোনা। যদি রাগ না করেন বলি।

—বলুন।

দেরি হইতে লাগিল।

বন্দনা কহিল, রাগ করবোনা, আপনি নির্ভয়ে বলুন।

দ্বিজদাস বলিল, কলকাতার বাড়ী থেকে মা একদিন রাগ করে বৌদিদিকে নিয়ে হঠাৎ চলে এলেন আপনার মনে পড়ে?

—পড়ে।

—কারণ না জেনে আপনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। মন খুব খারাপ ছিল, আমার ঘরে এসে সেদিন একটা কথা বলেছিলেন যে আমাকে আপনার ভালো লাগে। মনে পড়ে।

—পড়ে। কিন্তু খুব লজ্জার সঙ্গেই মনে পড়ে।

—সে কথার মূল্য কিছু নেই?

—না।

দ্বিজদাস ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, আমিও তাই ভাবি। ওর মূল্য কিছু নেই।

একটু পরে কহিল, বৌদি বলেছিলেন আপনার মাসীর ইচ্ছে অশোকের সঙ্গে আপনার বিবাহ হয়। সে কি স্থির হয়ে গেছে?

বন্দনা বলিল, এ আমাদের পারিবারিক কথা। বাইরের লোকের সঙ্গে এ আলোচনা চলেনা।

দ্বিজদাস বলিল, আলোচনা ত নয়, শুধু একটা খবর।

বন্দনা তিক্তকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে এমন কোন আত্মীয় সম্বন্ধ নেই যাতে এ প্রশ্ন আপনি করতে পারেন। দ্বিজুবাবু, আপনি শিক্ষিত লোক, এ কৌতূহল আপনার লজ্জাকর। শুনিয়া দ্বিজদাস সত্যই লজ্জা পাইল, তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। বলিল, আমার ভুল হয়েছে বন্দনা। স্বভাবতঃ আমি কৌতূহলী নই, পরের কথা জানবার লোভ আমার খুব কম। কিন্তু কি করে জানিনে আমার মনে হতো যে-কথা সংসারে কাউকে বলতে পারিনে আপনাকে পারি। যে-বিপদে কাউকে ডাকা চলেনা, আপনাকে চলে। আপনি—

তাহার কথার মাঝখানেই বন্দনা হাসিয়া বলিল, কিন্তু এই যে বললেন দাদার আলোচনা বাইরের লোকের সঙ্গে করতে আপনি চান না। আমি ত পর, একেবারে বাইরের লোক।

দ্বিজদাস কহিল, তাই যদি হয়, তবু আপনিই বা কেন তাঁর সম্বন্ধে আমাকে অশ্রদ্ধার খোঁটা দিলেন? জানেননা কি হচ্চে আমার? দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের কোণ দু'টা অশ্রুবাষ্পে ছলছল করিয়া আসিয়াছে।

মৈত্রেয়ী ঘরে ঢুকিল। বলিল, দ্বিজুবাবু আপনি কখন বাড়ী এলেন আমরা ত কেউ জানতে পারিনি।

দ্বিজদাস ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, জানবার খুব দরকার হয়েছিল নাকি?

মৈত্রেয়ী কহিল, বেশ কথা। আপনি কাল খাননি, আজ খাননি,—এ আর কেউ না জানুক আমি জানি। চলুন মার ঘরে।

—কিন্তু মা'র দরজা ত বন্ধ।

মৈত্রেয়ী বলিল, বন্ধই ছিল, কিন্তু আমি ছাড়িনি। মাথা খোঁড়া-খুড়ি করে দোর খুলিয়েছি, তাঁকে স্নান করিয়েছি, আহ্নিক করিয়েছি, জোর করে দুটো ফল মুখে গুঁজে দিয়ে খাইয়ে তবে ছেড়েচি। বলছিলেন দ্বিজু না খেলে খাবেন না। বললাম সে হবেনা মা, আপনার এ আদেশ আমি মানতে পারবোনা। কিন্তু তখন থেকে সবাই আমরা আপনার পথ চেয়ে আছি। চলুন, আপনার খাবার রেখে এসেছি মার ঘরে।

দ্বিজদাস অবাক হইয়া রহিল। ইহার এতকথা সে পূর্ব্বে শোনে নাই। বলিল, চলুন।

মৈত্রেয়ী বন্দনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আপনিও আসুন। মা আপনাকে ডাকছেন। এই বলিয়া সে দ্বিজদাসকে একপ্রকার গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। সকলের পিছনে গেল বন্দনা।

দয়াময়ীর ঘরে তিনি বিছানায় শুইয়া। অনুজ্জ্বল দীপালোকে তাঁহার শোকাচ্ছন্ন মুখের প্রতি চাহিলে ক্লেশ বোধ হয়। পরিস্ফীত দুই চক্ষু আরক্ত, সদ্যস্নাত আর্দ্র কেশগুলি আলুথালু বিপর্য্যস্ত। শিয়রে বসিয়া কল্যাণী হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অন্যদিকে একটা চেয়ারে শশধর, দূরে আর একটা চেয়ারে বসিয়া অক্ষয়বাবু। দ্বিজদাস ঘরে ঢুকিতেই দয়াময়ী মুখ ফিরিয়া শুইলেন, এবং পরক্ষণেই একটা অস্ফুট ক্রন্দনের অবরুদ্ধ আক্ষেপে তাঁহার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বন্দনা নীরবে ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল, এতবড় ব্যথার দৃশ্য বোধ করি সে কখনো কল্পনা করিতেও পারিত না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই নির্ব্বাক, এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথমে কথা কহিল শশধর। বলিল, কাল থেকে শুনচি না খেয়েই আছো,—যাহোক দু'টো মুখে দাও।

দ্বিজদাস বলিল, হাঁ।

মেঝের উপর ঠাঁই করিয়া মৈত্রেয়ী সযত্নে খাবার গুছাইয়া দিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া শশধর পুনশ্চ কহিল, তোমার ফিরতে এত দেরি হলো যে! তাঁরা গেলেন ত সেই আড়াইটার গাড়ীতে?

—হাঁ।

শশধর একটুখানি হাসির ভান করিয়া বলিল, অথচ, কলকাতার বাড়ীটা ত শুনেচি তোমার।

দ্বিজদাস কহিল, আমার বাড়ীতে দাদার প্রবেশ নিষেধ নাকি?

শশধর কহিল, তা' বলিনি। বরঞ্চ তিনিই যেন এই ভাবটা দেখিয়ে গেলেন। এ বাড়ী ছেড়েও ত তাঁর যাবার দরকার ছিল না, একটা মিটমাট করে নিলেই ত পারতেন।

দ্বিজদাস বলিল, মিটমাটের পথ যদি খোলা ছিল আপনি করে নিলেননা কেন?

—আমি করে নেবো? শশধর অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, এ কি রকম প্রস্তাব? আমাকে অপমান করলেন তিনি আর মিটমাট করবো আমি? মন্দ যুক্তি নয়! এই বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে দ্বিজদাস বলিল, যুক্তি মন্দ দিইনি শশধর বাবু। মেয়েরা কথায় বলে পর্ব্বতের আড়ালে থাকা। দাদা ছিলেন সেই পর্ব্বত আপনি ছিলেন তাঁর আড়ালে। এখন মুখোমুখি

দাঁড়ালুম আমি আর আপনি। মান-অপমানের পালা সাঙ্গ হয়ে ত যায় নি,—মাত্র সুরু হলো।

—তার মানে?

—মানে এই যে, আমি আপনার বাল্যবন্ধু বিপ্রদাস নই,—আমি দ্বিজদাস।

শশধরের মুখের হাসি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল, ভয়ানক গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার কথার অর্থ কি বেশ খুলে বলো দিকি।

দাদার বন্ধু বলিয়া শশধর 'তুমি' বলিয়া ডাকিলেও দ্বিজদাস তাহাকে 'আপনি' বলিয়াই সম্বোধন করিত, বলিল, আপনার একথা মানি যে অর্থ আজ স্পষ্ট হওয়াই ভালো। আমার দাদা সেই জাতের মানুষ যারা সত্য রক্ষার জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আশ্রিতের জন্যে গায়ের মাংস কেটে দেয়, ওদের আদর্শ বলে কি-এক অদ্ভুত বস্তু আছে যার জন্যে পারে না এমন কাজ নেই,—ওরা একধরণের পাগল,—তাই এই দুর্দ্দশা। কিন্তু আমি নিতান্ত সাধারণ মানুষ, আপনার সঙ্গে বেশি প্রভেদ নেই। ঠিক আপনার মতোই আমার হিংসে আছে, ঘৃণা আছে, প্রতিশোধ নেবার শয়তানি বুদ্ধি আছে, সুতরাং দাদাকে ঠকিয়ে থাকলে আপনাকেও ঠকাবো, তাঁর নাম জাল করে থাকলে স্বচ্ছন্দে আপনাকে জেলে পাঠাবো,—অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটি হবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দুপক্ষই একদিন পথের ভিখিরি হয়ে দাঁড়াই। বিজ্ঞ-জনের মুখে শুনি এম্‌নিই নাকি এর পরিণতি। তাই হোক্।

শশধর উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, মা, শুনচেন আপনার দ্বিজুর কথা? ওর যা মুখে আসে বলতে ওকে বারণ করে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, মাকে নালিশ জানিয়ে লাভ নেই শশধর বাবু। উনি জানেন আমি বিপিন নই,—মাতৃ-বাক্য দ্বিজুর বেদবাক্য নয়। দ্বিজু তাল ঠুকে স্পর্দ্ধার অভিনয় করে না একথা মা বোঝেন।

কাহারো মুখে কথা নাই, উভয়ের অকস্মাৎ এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ যেন সম্পূর্ণ অভাবিত। বিস্ময়ে ও ভয়ে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। শশধর বুঝিল ইহা পরিহাস নয় অতিশয় কঠোর সংকল্প। উত্তর দিতে গিয়া আর তাহার কণ্ঠস্বরে পূর্ব্বের প্রবলতা ছিল না, তথাপি জোর দিয়াই বলিয়া উঠিল, এই শেষ। এখানে আর আমি জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করবোনা।

দ্বিজদাস বলিল, কি করে করছিলেন এতক্ষণ এই ত আশ্চর্য্য শশধরবাবু।

কল্যাণী কাঁদিয়া বলিল, ছোড়দা, অবশেষে তুমিই কি আমাদের মারতে চাও? মায়ের পেটের ভাই তুমি, তুমিই করবে আমাদের সর্ব্বনাশ?

দ্বিজদাস বলিল, তুই ভাবিস্ চোখের জল ফেলে বার বার এড়ানো যায় সর্ব্বনাশ? কোথাও বিচার হবে না, তোদেরই হবে বারংবার জিৎ? দাদা নেই বটে, তবুও খেতে যখন পাবিনে আসিস্ আমার কাছে, তখন তোর কান্না শুনবো,—এখন নয়।

দয়াময়ী নিঃশব্দে অনেক সহিয়াছিলেন আর পারিলেন না, চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দ্বিজু তুই যা এখানে থেকে। এম্‌নি ক'রে গালি-গালাজ করতে কি বিপিন তোরে শিখিয়ে দিয়ে গেল?

—কে শিখিয়ে দিয়ে গেল বলচো? বিপিন?

—হাঁ, সে-ই। নিশ্চয় সে।

দ্বিজদাসের ওষ্ঠাধর মুহূর্ত্তের জন্য কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিল, আমি যাচ্চি। কিন্তু মা, নিজেকে অনেক ছোট করেচো, আর ছোট করোনা। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

নিজের ঘরে আসিয়া দ্বিজদাস চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ঘণ্টা দুই পরে মৈত্রেয়ী আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে খাবারের পাত্র, বলিল, খাবার সব নতুন ক'রে তৈরি করে নিয়ে এলুম, খেতে বসুন। এই ঘরেই ঠাঁই করে দিই।

—এ আপনাকে কে বলে দিলে?

—কেউ না। কাল থেকে আপনি খান নি সে কি আমি জানিনে?

—এত লোকের মধ্যে আপনার জানার প্রয়োজন?

মৈত্রেয়ী মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব না পাইয়া দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা, ঐখানে রেখে যান। এখন ক্ষিদে নেই, যদি হয় পরে খাবো।

মৈত্রেয়ী ঘরের একধারে আসন পাতিয়া, খাবার রাখিয়া সমস্ত সযত্নে ঢাকা দিয়া চলিয়া গেল। পীড়াপীড়ি করিল না, বলিল না যে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে খাওয়ার অসুবিধা ঘটিবে।

রাত্রি বোধকরি তখন বারোটা বাজিয়াছে, দ্বিজদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। সামান্য কিছু খাইয়া শুইয়া পড়িবে এই মনে করিয়া হাত-মুখ ধুইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল দ্বারের বাহিরে কে-একজন বসিয়া আছে। বারান্দার স্বল্প আলোকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

—আমি মৈত্রেয়ী।

দ্বিজদাসের বিস্ময়ের সীমা নাই, কহিল, এত রাতে আপনি এখানে কেন?

— খেতে বসে যদি কিছু দরকার হয় তাই বসে আছি।

—এ আপনার ভারি অন্যায়। একে ত প্রয়োজন নেই, আর যদিই বা হয় বাড়ীতে আর কি কেউ নেই?

মৈত্রেয়ী মৃদু কণ্ঠে বলিল, ক'দিনের নিরন্তর পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত। কেউ জেগে নেই সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি নিজেও ত কম খাটেন নি, তবে ঘুমোলেন না কেন?

মৈত্রেয়ী উত্তর দিল না চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিজদাসের অপেক্ষাকৃত রুক্ষ স্বর এবার অনেকটা নরম হইয়া আসিল, বলিল, এ-ভাবে বসে থাকাটা বিশ্রী দেখতে। আপনি ভেতরে এসে বসুন, যতক্ষণ খাই তদারক করুন। এই বলিয়া সে মুখ-হাত ধুইতে জলের ঘরে চলিয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে মৈত্রেয়ীর সহিত দ্বিজদাস কম কথাই কহিয়াছে। প্রয়োজনও হয় নাই, ইচ্ছাও করে নাই। এখন আলাপটা কি ভাবে চালাইবে ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে না আছে খাবারের পাত্র না আছে মৈত্রেয়ী নিজে। ব্যাপারটা ইতিমধ্যে কি ঘটিল অনুমান করিবার পূর্ব্বে কিন্তু সে

ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ঢাকা খুলে দেখি সমস্ত শুকিয়ে শক্ত হ'য়ে উঠেছে, তাই আবার আনতে গিয়েছিলুম। বসুন।

দ্বিজদাস কহিল, ধুঁয়া উঠ্‌ছে দেখচি। এতরাত্রে ও-সব আবার পেলেন কোথায় ?

মৈত্রেয়ী বলিল, ঠিক ক'রে রেখে এসেছিলুম। যখনি বললেন, খেতে দেরি হবে, তখনি জানি এ-সব না রাখলে হয়ত খাওয়াই হবে না।

দ্বিজদাস ভোজনে বসিয়া প্রথমে রন্ধন নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া জানিল ইহার কতকগুলি মৈত্রেয়ীর স্বহস্তের তৈরি। সেগুলি বারংবার অনুরোধ করিয়া সে দ্বিজদাসকে বেশি করিয়া খাওয়াইল। এ বিদ্যায় সে ব্যুৎপন্ন,—জানে কি করিয়া খাওয়াইতে হয়।

দ্বিজদাস হাসিয়া কহিল, বেশি খেলে অসুখ করবে যে।

—না, করবে না। কাল থেকে উপোস করে আছেন, এ-কে বেশী খাওয়া বলেনা।

—কিন্তু আমিই ত কেবল না খেয়ে নেই, এ বাড়িতে বোধকরি অনেকেই আছেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, অনেকের কথা জানিনে, কিন্তু মাকে যে কি করে দুটো খাওয়াতে পেরেচি সে শুধু আমিই জানি। আমি না থাকলে কতদিন যে তিনি দোর বন্ধ করে অনাহারে থাকতেন আমার ভাবলে ভয় হয়। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলবেন না, শুনলে বড় লজ্জা করে। আমি কত ছোট।

দ্বিজদাস কহিল, সেই ভালো, তোমাকে আর 'আপনি' বলবো না। কিন্তু তুমি অন্নদা দিদির খবর নিয়েছিলে ?

মৈত্রেয়ী কহিল, তার আবার কি হলো ? সেও কি না খেয়ে আছে নাকি ?

এতক্ষণ মৈত্রেয়ীর কথাগুলি তাহার বেশ লাগিতেছিল, একটা প্রসন্নতার বাতাস এই দুঃখের মধ্যেও যেন তাহার মনটাকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু এই শেষ কথাটায় চিত্ত তাহার মুহূর্ত্তে বিরূপ হইয়া উঠিল, কহিল, অনুদির সম্বন্ধে এ-ভাবে কথা বলতে নেই। হয়ত শুনেচো সে আমাদের দাসী, কিন্তু এ-বাড়ীতে তাঁর চেয়ে বড় আমার কেউ নেই। আমাদের মানুষ করেচেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, তা শুনেচি। কিন্তু কত বাড়ীতেই ত পুরণো দাস-দাসী ছেলেপুলে মানুষ করে। তাতে নতুন কি আছে ? আচ্ছা, আপনার খাওয়া হয়ে গেলে তাঁর খবর নেবো।

দ্বিজদাস নিরুত্তরে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ মনে হইল, সত্যইত, এমন কত পরিবারেই ঘটিয়া থাকে, যে ভিতরের কথা জানেন না, তাহার কাছে শুধু বাহিরের ঘটনায় একান্ত বিস্ময়কর ইহাতে কি আছে। কঠোর বিচার হাল্কা হইয়া আসিল, কহিল, অনুদি না খেয়ে থাকলেও এত রাত্রে আর খাবেন না। তাঁর জন্যে আজকে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

আবার কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিলে দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, মৈত্রেয়ী, পরকে এমন সেবা করতে শিখলে তুমি কার কাছে ? তোমার মা'র কাছে কি ?

মৈত্রেয়ী বলিল, না, আমার দিদির কাছে। তাঁর মতো স্বামীকে যত্ন করতে আমি কাউকে দেখিনি।

দ্বিজদাস হাসিয়া বলিল, স্বামী কি পর ? আমি পরকে যত্ন করার কথা জিজ্ঞেসা করেছিলুম।

—ওঃ—পর? বলিয়াই মৈত্রেয়ী হাসিয়া সলজ্জে মুখ নীচু করিল।

দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা, বলো তোমার দিদির কথা।

মৈত্রেয়ী বলিল, দিদি কিন্তু বেঁচে নেই। তিন বছর হলো একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে রেখে মারা গেছেন। চৌধুরী মশাই কিন্তু একটা বছরও অপেক্ষা করলেন না আবার বিয়ে করলেন। কত বড় অন্যায় বলুন ত!

দ্বিজদাস বলিল, পুরুষমানুষে তাই করে। ওরা অন্যায় মানে না।

—আপনিও কি তাই করবেন না ক?

—আগে একটাই ত করি তারপরে অন্যটার কথা ভাববো।

মৈত্রেয়ী বলিল, এমন করে বললে ত চলবে না। তখন আপনার বৌদিদি ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নেই। মাকে দেখবে কে?

দ্বিজদাস বলিল, কে দেখবে জানিনে মৈত্রেয়ী, হয় ত মেয়ে-জামাই দেখবে, হয় ত আর কেউ এসে তাঁর ভার নেবে,—সংসারে কত অসম্ভবই যে সম্ভব হয় কেউ নির্দ্দেশ করতে পারে না। আমাদের কথা থাক্, তোমার নিজের কথা বলো।

—কিন্তু আমার নিজের কথা ত কিছু নেই।

—কিছুই নেই? একেবারে কিচ্ছু নেই?

মৈত্রেয়ী প্রথমে একটু জড়সড়ো হইয়া পড়িল, তারপরে অল্প একটু হাসিয়া বলিল, ও—আমি বুঝেচি। আপনি চৌধুরী মহাশয়ের কথা কারো কাছে শুনেছেন বুঝি? ছি ছি কি নির্লজ্জ মানুষ, দিদি মর্‌তে প্রস্তাব করে পাঠালেন আমাকে বিয়ে করবেন।

—তার পরে?

মৈত্রেয়ী বলিল, চৌধুরী মশায়ের অনেক টাকা, বাবা-মা দুজনেই রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, আর কিছু না হোক লীলার ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হবে। যেন সংসারে আমার আর কিছু কাজ নেই দিদির ছেলে মানুষ করা ছাড়া। বললুম, ও-কথা তোমরা মুখে আনলে আমি গলায় দড়ি দেবো।

—কেন, এত আপত্তি তোমার কিসের?

—আপত্তি হবে না? জগতে এত বড় অশান্তি আর কিছু আছে নাকি?

দ্বিজদাস বলিল, এ কথা তোমার সত্যি নয়। জগতে সকল ক্ষেত্রেই অশান্তি আসে না মৈত্রেয়ী। আমার মা দাদাকে মানুষ করেছিলেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার ফল হলো কি? আজকের মতো দুঃখের ব্যাপার এ বাড়ীতে আর কখনো এসেছে কি?

দ্বিজদাস স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইহার কথা মিথ্যা নয় কিন্তু সত্যও কিছুতে নয়। মিনিট দুই তিন অভিভূতের মতো বসিয়া অকস্মাৎ যেন তাহার চমক ভাঙিয়া গেল, বলিল, মৈত্রেয়ী, প্রতিবাদ আমি করবোনা। এ পরিবারে মহাদুঃখ এলো সত্যি তবু জানি, তোমার এ-কথা সাধারণ মেয়েদের অতি তুচ্ছ সাংসারিক হিসেবের চেয়ে বড় নয়। বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল।

পরদিন সমস্ত দুপুর বেলা সে বাড়ী ছিলনা, কি কাজে কোথায় গিয়াছিল সে-ই জানে। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিয়া সোজা গিয়া দাঁড়াইল বন্দনাব গৃহের সম্মুখে, ডাকিল, আস্‌তে পারি?

—কে, দ্বিজুবাবু? আসুন।

দ্বিজদাস ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বন্দনার বাক্স গুছানো শেষ হইয়াছে যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। কহিল, সত্যিই চললেন তাহলে? একটা দিনও বেশি রাখা গেলোনা?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বন্দনার ইচ্ছা হইলনা বলে, তবু বলিতেই হইল,—যেতেই ত হবে, একটা দিন বেশি রেখে আমাকে লাভ কি বলুন? দ্বিজদাস বলিল, লাভের কথাত ভাবিনি, শুধু ভেবেচি সবাই গেলো—এত বড় বাড়ীতে বন্ধু কেউ আর রইলোনা।

বন্দনা কহিল, পুরানো বন্ধু যায়, নতুন বন্ধু আসে এম্‌নিই জগত দ্বিজুবাবু। সেই আশায় ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে হয়,—চঞ্চল হলে চলেনা।

দ্বিজদাস উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা বলিল, সময় বেশি নেই, কাজের কথা দুটো বলে নিই। শুনেছেন বোধ হয় শশধর বাবু কল্যাণীকে নিয়ে চলে গেছেন?

—না শুনিনি, কিন্তু অনুমান করেছিলুম।

—যাবার পূর্ব্বে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত তাঁদের খাওয়াতে পারা গেল না। দুজনে এসে মাকে প্রণাম করে বললেন, আমরা চল্‌লুম। মা বললেন, এসো। তারপরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। এই বলিয়া বন্দনা নীরব হইল। যে কারণে তাহার যাওয়া, যে সকল কথা মায়ের সম্মুখে দ্বিজু গত রাত্রে বলিয়াছিল তাহার উল্লেখ মাত্র করিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, মা ভারি ভেঙে পড়েছেন। দেখলে মায়া হয়,—লজ্জায় কারো কাছে যেন মুখ দেখাতে পারেন না। মৈত্রেয়ী ওঁর যে-সেবা করছে বোধ হয় আপন মেয়েতে তা পারে না। মা সুস্থ হয়ে যদি ওঠেন সে শুধু ওর যত্নে। মেয়েটি বেশ ভালো, কিছু দিন ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন এই আমার অনুরোধ।

—তাই হবে।

—দ্বিজু বাবু, যাবার আগে আর একটি অনুরোধ করে যাবো?

—করুন।

—আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

—কেন?

বন্দনা বলিল, এই বৃহৎ পরিবার নইলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। আপনাদের অনেক ক্ষতি হলো জানি, কিন্তু যা রইলো সেও অনেক। আপনাদের কত দান, কত সৎ কাজ, কত আশ্রিত পরিজন, কত দীন দরিদ্রের অবলম্বন আপনারা,—আর সে কি শুধু আজ? কত দীর্ঘ কাল ধরে এই ধারা রয়ে চলেচে আপনাদের পরিবারে···কোন দিন বাধা পায়নি সে কি এখন বন্ধ হবে? দাদার ভুলে যা গেলো সে ছিল

বাহুল্য, সে ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। যাক্ সে। যা রেখে গেলেন শান্ত মনে তাকেই যথেষ্ট বলে নিন। সেই অবশিষ্ট আপনার অক্ষয় অজস্র হোক, প্রতিদিনের প্রয়োজনে ভগবান অভাব না রাখুন, আজ বিদায় নেবার পূর্ব্বে তাঁর কাছে এই প্রার্থনা জানাই। দ্বিজদাসের চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনার বাবা অখণ্ড ভরসায় দাদার ওপর সর্ব্বস্ব রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু তা রইলো না। পিতার কাছে অপরাধী হয়ে রইলেন। কিন্তু সেই ত্রুটি যদি দৈন্য এনে তাঁদের পুণ্য কর্ম্ম বাধাগ্রস্ত করে, কোন দিন মুখুয্যেমশাই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন না। এই অশান্তি থেকে তাঁকে আপনার বাঁচাতে হবে।

দ্বিজদাস অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল, দাদার কথা এমন ক'রে কেউ ভাবেনি বন্দনা, আমিও না। এ কি আশ্চর্য্য!

ভাগ্য ভালো যে, বাতিদানের ছায়ার আড়ালে সে বন্দনার মুখের চেহারা দেখিতে পাইল না। বলিল, দাদার জন্যে সকল দুঃখই নিতে পারি, কিন্তু তাঁর কাজের বোঝা বইবো কি ক'রে—সাহস পাইনে যে! সেই সব দেখতেই আজ বেরিয়েছিলুম। তাঁর ইস্কুল, পাঠাশালা, টোল, মুসলমান ছেলেদের জন্যে মক্তব,—আর সেই কি দু-একটা? অনেক গুলো। প্রজাদের জল নিকাশের একটা খাল কাটা হচ্ছে, বহু দিন ধরে তার টাকা জোগাতে হবে। কাগজ পত্রের সঙ্গে একটা দীর্ঘ তালিকা পেয়েছি—শুধু দানের অঙ্ক। তারা চাইতে এলে কি যে বলবো জানিনে।

বন্দনা কহিল, বলবেন তারা পাবে। তাদের দিতেই হবে। কিন্তু জিজ্ঞেসা করি, এতকাল তিনি কিছুই কি কাউকে জানাননি।

— না।

—এর কারণ?

দ্বিজদাস বলিল, সুকৃত গোপন করার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু জানাবেন কাকে? সংসারে তাঁর বন্ধু কেউ ত ছিল না। দুঃখ যখন এসেছে একাকী বহন করেছেন, আনন্দ যখন এসেছে তাকেও উপভোগ করেছেন একা। কিম্বা, জানিয়ে থাকবেন হয় ত তাঁর ঐ একটি মাত্র বন্ধুকে—এই বলিয়া সে উপরের দিকে চাহিয়া কহিল, কিন্তু সে খবর আত্মীয় স্বজন জানবে কি ক'রে? জানেন শুধু তিনি আর তাঁর ঐ অন্তর্য্যামী।

বন্দনা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা দ্বিজু বাবু, আপনার কি মনে হয় মুখুয্যেমশাই কাউকে কোনদিন ভালোবাসেননি? কোন মানুষকেই না?

দ্বিজদাস বলিল, না, সে তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। মানুষের সংসারে এতবড় নিঃসঙ্গ একলা মানুষ আর নেই। তারপরে বহুক্ষণ অবধি উভয়েই নীরব হইয়া রহিল।

বন্দনা জোর করিয়া একটা ভার যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, বলিল, তা' হোক্‌গে দ্বিজুবাবু। তাঁর সমস্ত কাজ আপনাকে তুলে নিতে হবে,—একটিও ফেলতে পারবেন না।

—কিন্তু আমি ত দাদা নই, একলা পারবো কেন বন্দনা?

—একলা ত নয়, দুজনে নেবেন। তাইত বলেছি আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

—কিন্তু ভালো না বাসলে আমি বিয়ে করবো কি করে?

বন্দনা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, এ কি বলচেন দ্বিজুবাবু? এ কথা ত আমাদের সমাজে শুধু আমরাই বলে থাকি। কিন্তু আপনাদের পরিবারে কে কবে ভালোবেসে বিয়ে করেছে যে আপনার না হলে নয়? এ ছলনা ছেড়ে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, এ বিধি আমাদের বাড়ীর নয় বটে, কিন্তু সেই নজিরই কি চিরদিন মানতে হবে? তাতেই কি সুখী হবো?

বন্দনা বলিল, সুখের জামিন দিতে পারবোনা দ্বিজুবাবু, সে ধন যাঁর হাতে তাঁর ঠিকানা জানিনে, অদ্ভুত তাঁর বিচারপদ্ধতি,—তত্ত্ব অন্বেষণ বৃথা। বিয়ের আগে নয়ন-মন-রঞ্জন পূর্ব্বরাগের খেলা দেখলুম অনেক, আবার একদিন সে অনুরাগ দৌড় দিলে যে কোন্ গহনে সে প্রহসনও দেখতে পেলুম অনেক। ও-ফাঁদে পা দিয়ে কাজ নেই দ্বিজুবাবু, সোনার মায়া-মৃগ যে-বনে চরে বেড়াচ্চে বেড়াক, এ বাড়ীতে সমাদরে আহ্বান করে এনে কাজ নেই।

দ্বিজদাস মৃদু হাসিয়া কহিল, তার মানে সুধীরবাবু দিয়েছে আপনার মন ভয়ানক বিগ্‌ড়ে।

বন্দনাও হাসিয়া বলিল, হাঁ। কিন্তু মনের তখনও যে-টুকু বাকি ছিল বিগড়ে দিলেন আপনি, আবার তার পরে এলেন অশোক! এখন পোড়া অদৃষ্টে উনি টিকে থাকলে বাঁচি।

—উনিটি কে? অশোক? তাঁকে আপনার ভয়টা কিসের?

—ভয়টা এই যে তিনিও হঠাৎ ভালোবাসতে সুরু করেছেন।

—কেউ ভালোবাসার ধার দিয়েও যাবে না এই বুঝি আপনার সঙ্কল্প?

—হাঁ, এই আমার প্রতিজ্ঞা। বিয়ে যদি কখনো করি, মস্ত সুখের আশায় যেন মস্ত বিড়ম্বনায় না পা দিই। তাই অশোকবাবুকে কাল সতর্ক করে দিয়েছি আমাকে ভালোবাসলেই আমি ছুটে পালাবো।

—শুনে তিনি কি বললেন?

—বললেননা কিছুই, শুধু দু'চোখ মেলে চেয়ে রইলেন। দেখে বড় দুঃখ হলো দ্বিজুবাবু।

—দুঃখ যদি সত্যিই হয়ে থাকে ত আজো আশা আছে। কিন্তু জানবেন এ সব শুধু মাসীর বাড়ীর ঘোরতর প্রতিক্রিয়া,—শুধু সাময়িক।

বন্দনা বলিল, অসম্ভব নয় হতেও পারে। কিন্তু শিখলুম অনেক। ভাবি, ভাগ্যে এসেছিলুম কলকাতায় নইলে কত জিনিষ ত অজানা থেকে যেতো।

দ্বিজদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশি সময় আর নেই, এবার শেষ উপদেশ আমাকে দিয়ে যান কি আমাকে করতে হবে।

বন্দনা পরিহাসের ভঙ্গীতে মাথাটা বার কয়েক নাড়িয়া বলিল, উপদেশ চাই? সত্যিই চাই না কি?

দ্বিজদাস বলিল, হাঁ। সত্যিই চাই। আমি দাদা নই, আমার বন্ধুর প্রয়োজন, উপদেশের প্রয়োজন। বিবাহ করতে আমাকে বলে গেলেন, আমি তাই করবো। কিন্তু ভালোবাসা না পাই, বন্ধুত্ব না পেলে যত ভার দিয়ে গেলেন, আমি বইবো কি করে?

দ্বিজুর মুখে পরিহাসের আভাস মাত্র নাই, এ কণ্ঠস্বর বন্দনাকে বিচলিত করিল, কহিল, ভয় নেই দ্বিজুবাবু, বন্ধু আসবে, সত্যিকার প্রয়োজনে ভগবান তাকে আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন। এ বিশ্বাস রাখবেন।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু কি একটা বলিতে গেল কিন্তু বাধা পড়িল। বাহির হইতে মৈত্রেয়ীর সাড়া পাওয়া গেল—দ্বিজুবাবু আছেন এ ঘরে? মা আপনাকে একবার ডাকচেন।

দ্বিজু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, বারোটায় গাড়ী, সাড়ে এগারোটায় বার হতে হবে। ঠিক সময়ে এসে ডাক দেবো। মনে থাকে যেন। এই বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

গণিতের ভিত্তি

অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্‌-এ, বি-এল

মনে পড়ে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের চারুপাঠ তৃতীয় ভাগে বিদ্যাবিষয়ক স্বপ্নদর্শনে পড়িয়াছিলাম যে স্বপ্নদ্রষ্টা বিদ্যারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যে বৃক্ষটী দেখিয়া নিরতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন সে বৃক্ষটী অক্ষয় গণিত-বৃক্ষ। তাহার মূল মাটি ভেদ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; আবার তাহার শাখাপ্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া প্রায় সমুদায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; আর সেই বৃক্ষের সুদৃঢ় কাণ্ডের আশ্রয়ে নানাবিধ লতাগুল্ম-বল্লরী বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা যখন উহা পড়িয়াছিলাম তখন গণিতের এই বিবরণ খুব সুন্দর ও যথার্থ বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

আমরা সাধারণতঃ সকলেই বিশ্বাস করি যে গণিত যে সমস্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে সব সত্য অবিসংবাদিত সত্য, চিরন্তন সত্য, তাহার অপলাপ করা অসম্ভব, কারণ মানবমনই এই রূপে গঠিত যে সে সত্যগুলিকে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। এই সত্যগুলিকে আমরা বলিয়া থাকি স্বতঃসিদ্ধ, কারণ উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। গণিতের কায এই সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ হইতে যুক্তিযুক্ত অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হওয়া। এই যুক্তির কোথাও ফাঁক থাকিবে না; ইহার কোনও একটী অথবা কয়েকটী সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে পরবর্ত্তী সমস্ত সিদ্ধান্ত তাহা হইতে অনুমান করা যাইবে। এই যুক্তিবদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া গণিত প্রকৃতির নানা রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে প্রয়াসী। এই গণিতের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক জগতের সূক্ষ্মতম কার্য্যকলাপ ও গতিবিধি নিরূপণ করিয়া থাকেন। গণিতই বৈজ্ঞানিকদিগের মহাস্ত্র; যে-কোন বিজ্ঞান প্রকৃতির ঘটনাপুঞ্জের কোনরূপ ব্যাখ্যা দিতে চায় গণিত ছাড়া তাহার চলেই না।

গণিতের যে এই সমস্ত উপকারিতা আছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন, সে সম্বন্ধে আজকালও কাহারও মত ভেদ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু আজকাল এই অক্ষয় গণিতবৃক্ষের মূলটা ধরিয়া একটু বেশ বিধিমত নাড়াচাড়া চলিতেছে। অনেকে আজ কাল যেরূপ মত পোষণ করিতেছেন তাহাতে মনে হয় যে বৃক্ষটীর মূল আদৌ নাই, অন্ততঃ সেই মূলের সঙ্গে আমাদের বাস্তব মাটির কোন সম্পর্কই নাই। গণিত বৃক্ষটী বায়ুভূত নিরাশ্রয় ভাবেই ঝুলিতেছে, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম আশ্চর্য্য ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের ন্যায় শূন্যেই দোদুল্যমান। হেঁয়ালির বা রূপকের ভাষা ছাড়িয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যে তথ্যগুলির উপরে সমস্ত গণিত-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত সে তথ্যগুলির কোন বাস্তবতা নাই; বাস্তব জগৎ যে এই তথ্যগুলির সাহায্যেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে, অন্য কোন তথ্য অবলম্বনে পারে না, তাহা নয়। বস্তুতঃ কোন্ তথ্যগুলিকে আমরা মূল তথ্য বলিয়া ধরিব সেটা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। একবার কতগুলি তথ্যকে মূল তথ্য বলিয়া ধরিয়া লইলে অবশ্য গণিতের সমস্ত সিদ্ধান্ত তাহারই উপর দাঁড় করাইতে হইবে, কিন্তু ভিত্তিটী সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন বা arbitrary।

এই মতটী গণিতবৃক্ষের গোড়া ধরিয়া এমনি একটা ঝাঁকানি দিয়াছে যে, গণিতের ভিত্তি সম্বন্ধে কোন পাকা-পাকি রকম বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে এই ঝাঁকানিকে কতকটা পরিমাণে শান্ত করা আবশ্যক। এই নূতন Nominalistদিগের মতবাদ যে বহুলপরিমাণে সত্য তাহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে; এবং সেই পরিমাণে এই ঝাঁকানিতে যে গোড়ার গলদ কতকটা কাটিয়া যাইবে তাহাও স্থির নিশ্চিত।

আমরা সকলেই সহজে বুঝিতে পারি যে, যদি কতিপয়

তথ্য হইতে অন্যান্য তথ্যপরম্পরা বেশ যুক্তিবদ্ধভাবে অনুমিত হয় তবে সেই কতিপয় তথ্যের সত্যতাকে তো আমাদের ধরিয়া লইতেই হইবে। যদি আমরা সেই তথ্যগুলিকে প্রমাণ করিতে চাই তবে আমাদিগকে তদপেক্ষা গভীরতর ও সরলতর তথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপে আমরা বহুদূর অগ্রসর হইতে পারি; কিন্তু যতদূরই আমরা যাই না কেন কতগুলি তথ্য এমন থাকিবেই যাহা আমাদের মানিয়া লইতে হইবে। সেগুলির সত্যতা প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং আমাদের সকল প্রমাণ প্রয়োগের গোড়ায় আমাদের সকল যুক্তিপরম্পরার তলদেশে কতগুলি অপ্রমাণিত তথ্য থাকিয়া যাইবে।

আর একদিক হইতে ব্যাপারটাকে দেখা যাক্। আমরা যে সকল বাক্য ব্যবহার করি, যে সকল ধারণা মনে পোষণ করি সবই কতকগুলি শব্দের সমষ্টি। এই সমস্ত শব্দের মোটামুটি একটা অর্থ আমাদের মনে সদা সর্ব্বদাই থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমরা যদি একটু তলাইয়া দেখি তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারি যে যখনই কোন শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করি তখনই আমরা ইহা অপেক্ষা সহজ আর কতকগুলি শব্দ বা ভাবের সাহায্য গ্রহণ করি। বস্তুতঃ সংজ্ঞার অর্থই এই, কোন অপেক্ষাকৃত জটিল ভাবকে অপেক্ষাকৃত সরল ভাবের সমবায়ে পরিণত করা; এইরূপ যদি আমরা করিতেই থাকি তাহা হইলে আমরা অবশেষে এমন অবস্থায় উপনীত হইব যেখানে আর সরলতর ভাব পাওয়া অসম্ভব; সুতরাং সেখানে আমাদের থামিতে হইবে। তাহা হইলে সেই যে শেষ শব্দ বা তদন্তর্নিহিত ভাবগুলি আমরা বুঝাইব কি করিয়া? বুঝাইতে হইলেই তো সরলতর ভাবের আশ্রয় লইতে হইবে, কিন্তু আর ত তাহা পাওয়া যায় না; সুতরাং এই আদিম বা অন্তিম ভাবগুলির বা শব্দগুলির সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব; এগুলিকে অসংজ্ঞিত রাখিতেই হইবে। অন্যান্য যে সমস্ত ভাব বা conceptএর ব্যবহার করিব সেগুলি এই আদিম ভাবগুলির সাহায্যে সংজ্ঞিত করিব। তাহা হইলেই মোটের উপরে দাঁড়াইল এই যে সমস্ত গণিতশাস্ত্র (তথা সমস্ত যুক্তিশাস্ত্র) কতগুলি অপ্রমাণিত তত্ত্বের উপরে ও কতগুলি অসংজ্ঞিত ভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

এ পর্য্যন্ত কাহারও মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। আসল মতভেদ ও মারামারি হইল এই আদিমতত্ত্ব ও ভাবগুলি লইয়া। কোন্ তত্ত্বগুলিকে আমরা আদিম ও অপ্রমাণীয় বলিয়া ধরিব? প্রশ্নটী অবশ্য আধুনিক যুগেই বিশেষরূপে জাগিয়াছে, কিন্তু এ প্রশ্নের মোটামুটি রকম সমাধান না করিলেও কোন যুক্তি অগ্রসরই হইতে পারে না, সুতরাং প্রশ্নটীর এক প্রকার উত্তর বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং সেই অনুসারে তাহার উপরে গণিতশাস্ত্রও দাঁড় করান হইয়াছে। স্বতঃই আমাদের মনে হয় যে সেই তথ্যগুলিকেই আদিম বলিয়া দাঁড় করান উচিত যাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা কখনও সন্দেহ করি না এবং যাহা প্রমাণ করা আমরা কখনও আবশ্যক বলিয়া মনে করি না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক্ ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্যগুলি। সেই তথ্যগুলি এইরকম যে দেখিয়াই মনে হয় যে ইহারা তো সত্য হইবেই। এমন কি এই স্বতঃ প্রতীতির ভাবটী এমনই প্রবল যে আমরা ভাবিতেই পারি না যে ইহার অন্যথা কিরূপে সম্ভব। আমাদের মনে হয় যে মানবমনই এমনভাবে গঠিত যে তাহা ইহার ব্যত্যয় কল্পনা করিতে পারে না। এই জন্য দার্শনিক কাণ্ট ইহাদের নাম দিয়াছেন a´priori categories of the human mind। এইগুলি যে দেশকালনিরপেক্ষ, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে যে এইরূপই হইতে বাধ্য ইহা আমাদের মনে খুব দৃঢ়রূপেই নিবদ্ধ আছে; ইহার দৃঢ়তা কিরূপ তাহা এই দৃষ্টেই বুঝা যাইবে যে ইউক্লিডের জন্মের পর দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ইহার সম্বন্ধে প্রায় কোন প্রশ্নই ওঠে নাই।

স্বতঃসিদ্ধগুলির এই যে a priori বা নিরপেক্ষ ধর্ম্ম, এই যে inconceivability of the opposite—ইহা লইয়া আজকাল তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। এই আন্দোলনটীর সূত্রপাত অতি নিরীহভাবেই হইয়াছিল। ইউক্লিডের বিখ্যাত পঞ্চম স্বীকার্য্য (Parallel Postulate) লইয়া কথাটা উঠে। ইহা আমাদের সকলেরই মানিতে হইবে যে ইউক্লিডের অন্যান্য স্বীকার্য্য বা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায়,

এইটী তত স্বতঃপ্রতীত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং অনেকেরই মনে এই স্বতঃসিদ্ধটীকে প্রমাণ করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। অনেকেই এই চেষ্টায় লাগিলেন, কেহ কেহ মনেও করিলেন যে তিনি ইহা প্রমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; কিন্তু বস্তুতঃ ইহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয় নাই; পরন্তু তদপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহা যে প্রমাণ হইতে পারে না তাহাও প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এখন পঞ্চম স্বীকার্য্য সম্বন্ধে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে উহা অন্যান্য স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্য্য হইতে স্বতন্ত্র বা independent; সুতরাং তাহাদিগের সাহায্যে উহার প্রমাণ হইতেই পারে না। ইহা হইতে আরও একটী সিদ্ধান্ত এই হইতে পারে যে, আমরা যদি পঞ্চম স্বীকার্য্য ছাড়িয়াও দিই অথবা না মানি, তাহা হইলে অন্যান্য স্বতঃসিদ্ধগুলির সঙ্গে কোন বিরোধ বা contradiction হইতেই পারে না। উহা না হয় তাহা হইলে ছাড়িয়াই দিলাম, দেখা যাউক তাহাতে কতদূর দাঁড়ায়।

এইভাবে লোবাচেভ্স্কি (Lobaczewsky), বলিয়াই (Bolyai), রীমান (Riemaun), গাউস (Gauss) প্রভৃতি মনীষিগণ Non-Euclidean জ্যামিতি খাড়া করিলেন। সে জ্যামিতির যে দেশ বা space তাহা ইউক্লিডের আর সব নিয়মই মানে, খালি তাহার ঐ সমান্তরাল রেখার স্বীকার্য্য মানিতে চায় না। পঞ্চম স্বীকার্য্য না মানিয়া চলিলে ইউক্লিডের বিরোধী অনেক প্রতিজ্ঞা পাওয়া যায়, তবে সেই সব প্রতিজ্ঞাপরম্পরায় নিজেদের মধ্যে যুক্তির কোন অভাব বা ফাঁক বা বিরোধ কোথাও পাওয়া যায় না। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি; লোবাচেভ্স্কি-বলিয়াইর অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি অনুসারে কোন ত্রিভুজের তিনটী কোণের সমবায় দুই সমকোণের কম হইবে; রীমানের জ্যামিতিতে সমবায় দুই সমকোণ অপেক্ষা বেশী হইবে। কোন বিন্দুর ভিতর দিয়া ইউক্লিডের মতে অন্য রেখার সমান্তরাল একটী মাত্র রেখা টানা যাইতে পারে; লোভাচেভ্স্কি-বলিয়াইর মতে অনেক রেখা টানা যাইতে পারে। রীমানের মতে রেখা কখনও অনন্ত হইতে পারে না।

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত আজগুবি বলিয়া আমাদের মনে হইতে পারে; আমাদের মনে হয় যে আমরা দেখি যে একটীমাত্র সমান্তরাল টানা যাইতে পারে, অনেকগুলি টানা যায় কি করিয়া; geometrical intuitionই আমাদের বলে যে ইহার অন্যথা হইতে পারে না। এই intuition-বাদ আজকালকার দার্শনিক বৈজ্ঞানিকেরা উড়াইয়া দিতে চাহেন। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পোয়ঁাকারে (Poincaré) এই intuitionটা যে কিছুই নয় তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত কাল্পনিক হইলেও অতিশয় মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ।

মনে করা যাউক, আমরা এমন একটী জগতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে জগৎটী গোলাকার। সেই গোলাকার জগতের গোলাকার স্তরগুলি সব ভিন্ন ভিন্ন temperature-এ অবস্থিত; কোন একস্তর কেন্দ্র হইতে যতদূরে অবস্থিত তাহার temperature তত কম এবং কোনও জড়বস্তু কেন্দ্র হইতে কোন সরল রেখা ধরিয়া যাইতে থাকিলে temperature যত কম হইতে থাকিবে তত তাহার আয়তনও সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকিবে। সেই গোলাকার জগৎটী বাহির হইতে সীমাবদ্ধ মনে হইলেও সেই জগতের অধিবাসিগণের নিকট তাহা অসীম বলিয়া মনে হইবে। কারণ কোন ব্যক্তি যদি কেন্দ্র হইতে সীমায় পৌঁছিবে বলিয়া যাত্রা করে, সে যতই কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবে ততই তাহার শরীরের আয়তন ক্ষুদ্র হইতে থাকিবে, হাত পাগুলি ছোট হইয়া আসিবে, সুতরাং অগ্রগতি ক্রমেই কমিয়া আসিবে; সীমায় কাছাকাছি পৌঁছিলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়া দাঁড়াইবে, একেবারে সীমায় গিয়া পৌঁছিতে সে কখনও পারিবে না। এখন কথা এই যে লোকটা যে ক্রমেই ছোট হইয়া যাইতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিবে কিনা; মজা এই যে সে পারিবে না। সে যদি সঙ্গে মাপকাঠি লইয়া রওনা হয় মাপকাঠিও তো সেই অনুপাতে ছোট হইতেছে সুতরাং আমরা যাহাকে measure বা পরিমাণ বলি তাহাতো একই থাকিয়া যাইবে; অতএব ভদ্রলোকটী নিজের দুর্দ্দশার কথা নিজেই কিছু অবগত হইতে পারিবেন না; আরও এককথা তিনি যদি নিজের বাড়ী হইতে প্রতিবেশীর বাড়ীতে বেড়াইতে যান, তাহা হইলে আমরা যাহাকে সোজা রাস্তা বলিয়া থাকি তাহা ধরিয়া গেলে তাঁহার বেশী ঘুরিতে

হইবে; তিনি যদি বিশেষ একটী বৃত্তাকার পথ অবলম্বন করিয়া চলেন তবেই তাড়াতাড়ি পৌঁছিতে পারিবেন। সেই বৃত্তাকার পথটী গোল বিশ্বের পরিধিকে সমকোণে (orthogonally) কাটে। আরও এই কল্পিত জগতে ধরিয়া লওয়া যাউক যে আলোক রশ্মি উক্তরূপ বৃত্তাকার পথেই ভ্রমণ করে; তাহা যদি হয় তাহা হইলে ঐ বৃত্তই সেই জগতের অধিবাসীদিগের নিকট সরলরূপে প্রতীয়মান হইবে। এবং ইহাও খুব সহজে প্রতিপন্ন করা যায় যে কোন বিন্দু দিয়া এমন দুইটী বৃত্তাকার রেখা টানা যায় যাহা অপর কোন একটী বৃত্তাকার রেখাকে অসীম দূরে (অর্থাৎ সেই বৃত্তের পরিধিতে) গিয়া কাটে; এবং সেই দুইটী রেখার অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন বৃত্তাকার রেখা উক্ত অপর রেখাকে অসীম দূরে গিয়া কাটে। সুতরাং আমরা সেই সব রেখাকেই উক্ত রেখার সমান্তরাল বলিতে পারি এবং আমাদের কল্পিত জগতে এই সমস্ত বৃত্তাকার রেখাই সরল। ব্যাপার তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে, কোন এক বিন্দুর মধ্য দিয়া অন্য একটী "সরল" রেখার সমান্তরাল "সরল" রেখা অসংখ্য টানা যাইতে পারে। অনিউক্লিডীয় জগতের ইহাই বিশেষত্ব।

তবে এখন কথা উঠিবে যে এই আজগুবি জগতের আজগুবি বৃত্তান্ত দিয়া আমাদের লাভ কি; আমাদের জগৎ তো ও প্রকার নয়, ও সব বাজে কথায় কি হইবে? কিন্তু আসল কথা এই যে ঐ সব আজগুবি ব্যাপার আমাদের জগতে যে ঘটেই না তাহাও বলা যায় না, এমন কি আমাদের জগৎ ঐ আজগুবি জগতের অংশবিশেষ হইতেও পারে। ঐ কল্পিত জগতের কেন্দ্রদেশের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। কেন্দ্রদেশে উপর্যুক্ত সমস্ত বৃত্তরেখা সরল হয়; এবং কেন্দ্রের অনতিদূরেও বৃত্তরেখা প্রায় সরল থাকে বক্রতা এত কম যে ধরা শক্ত। ইহা কি হইতে পারে না আমাদের পৃথিবী (অথবা এই সৌরজগৎ) সেই কল্পিত জগতের কেন্দ্র প্রদেশে অবস্থিত; তাহা হইলে তো ঐ যে অসংখ্য সমান্তরাল রেখা টানা গিয়াছে তাহা প্রায় একই হইয়া যায়। আমাদের যন্ত্রপাতি এত সূক্ষ্ম হয় নাই যাহাতে তাহাদের ভিতরের সেই অতি ক্ষুদ্র কোণ মাপা কিম্বা তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

পোয়াঁকারে যখন এই দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে আমরা যেন কেবল space-intuition অবলম্বন করিয়াই কোন মতবাদকে তাড়াইয়া না দিই। আমরা যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ বা intuition বলি তাহার অন্যথা যে অকল্পনীয় এমন নয়; তাহা কল্পনা করিতে আমাদের মনে বা যুক্তিতে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। অবশ্য বাস্তব জগৎ ইউক্লিডীয় কি অনিউক্লিডীয় তাহার বিচার চলিতে পারে কিন্তু সে বিষয় পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ। আমরা যদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখি যে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমবায় দুই সমকোণের প্রায় তুল্য (প্রায় বলিলাম এই জন্য কারণ সমস্ত মাপজোক করার মধ্যেই কতকটা অনির্দ্দিষ্টতা থাকিবেই) তবে দুই মতই চলিতে পারে; এবং যদি বহু সংখ্যক বাস্তব ত্রিভুজ মাপিয়া তাহার একটা mean নিয়া দেখি দুই সমকোণের সমানই হইয়া দাঁড়ায় তবে হয়ত সম্ভাব্যতা বা probability ইউক্লিডের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মতের মধ্যে কোন্‌টা সত্য তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা নক্ষত্রের parallax'র সাহায্যে করা হইয়াছে। লোবাচেভ্‌স্কি-বলিয়াইর মতে parallax কোন নির্দ্দিষ্ট রাশির অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইতে পারে না; ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মতে ক্ষুদ্রতার কোন সীমা নাই; রীমানের মতে parallax negativeও হইতে পারে। হয়ত খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটা মীমাংসা হইতেও পারে। মোটের উপর এ বিষয়ে মতামত খুব উদার ও খোলা রাখা দরকার; কোন চিরপোষিত সংস্কারের খাতিরে অন্য মতকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

কিন্তু শুধু ইহাতেই দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ নিরস্ত হন নাই। তাঁহারা বলেন যে ধারণা নূতন হইলেই তাহা যেমন অসম্ভব বা অলীক বলিয়া মনে করা ভুল, সেইরূপ কোন ধারণা আমরা পোষণ করিয়া আসিয়াছি বলিয়াই তাহার একটা বিশেষ মাহাত্ম্য আছে এরূপ মনে করাও একরকম ভুল। মোটের উপর সব ধারণাই সমান সত্য বা সমান অলীক, কারণ সত্যতা বা অসত্যতা উহাতে আরোপ করাই যায় না। গজের মাপ সত্য এবং ইঞ্চির মাপ অলীক ইহা বলিলে যেমন কোন অর্থ হয় না, সেইরূপ এই তথ্যগুলি সত্য

বা মিথ্যা তাহা বলিলেও কোন অর্থ হয় না। আমরা স্বেচ্ছায় কতগুলি তথ্যকে মৌলিক বলিয়া মনে করি এবং কতকগুলিকে তাহা হইতে অনুমেয় বলিয়া মনে করি। আমরা ইচ্ছা করিলে অপর কতগুলিকে মৌলিক ও তদ্ভিন্ন অপরগুলিকে অনুমিত বলিয়া মনে করিতে পারিতাম। ব্যাপারটা এমন নয় যে প্রথমোক্তগুলির বিশেষ একটা মাহাত্ম্য আছে যাহার দরুণ তাহাদের না হইলে আমাদের চলে না; বা তাহাদের অন্যথা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। একজন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক ভাইলাতি (Vailati) রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে আগে যেমন রাজাদিগকে লোকে দেবাংশসম্ভূত বলিয়া মনে করিত কিন্তু এখন কালক্রমে সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রতার দিন আসিয়াছে, রাজার মাহাত্ম্য এখন আর সকলে স্বীকার করিতে চায় না, বিজ্ঞানেও সেইরূপ এককালে স্বতঃসিদ্ধ inconceivabilty of the opposite মন্ত্রের প্রভাবে অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন, এখন তাহাদের সে মন্ত্রের নেশা ছুটিয়া গিয়াছে; তাহাদিগকে উচ্চবেদী হইতে নামিয়া ভিড়ের মধ্যে মিলিতে হইতেছে।

আমরা এতক্ষণ গণিতের মূল তথ্য এবং মূল ভাব বা concept সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, এবং এটুকু আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা আছে তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার; এবং আমরা সচরাচর যে সকল তথ্যকে ও ভাবকে মৌলিক বলিয়া মনে করি তাহা ভিন্ন অন্য তথ্য ও ভাবকে মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াও গণিতশাস্ত্র চলিতে পারে। এখন আমরা এই বিষয়টাকেই একটু আর একদিক হইতে দেখিতে চেষ্টা করিব।

পাটীগণিতে ও বীজগণিতে গোড়াতেই আমরা একটা শব্দ বা conecpt এর সাক্ষাৎ পাই, সে conceptটী হইল সংখ্যা। পাটীগণিত ও বীজ গণিত এই সংখ্যারই নানা রকম সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যস্ত, নানারকম প্রক্রিয়া বা operation দ্বারা এক সংখ্যাকে অন্য সংখ্যাতে পরিণত করা যাইতে পারে; এবং সংখ্যাগুলির মধ্যে নানাবিধ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। যেমন আমরা পূর্ব্বে স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধে দেখিয়াছি যে আমাদের এ বিষয় সম্বন্ধে গোড়া হইতেই মোটামুটি একটা ধারণা আছে এবং আমরা অন্য ধারণা সহজে পোষণ করিতে রাজী হই না, সেইরূপ এই ক্ষেত্রেও সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের সবারই মোটামুটি একটা ধারণা আছে এবং তাহা আমরা সহজে পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত নই।

বোধ হয় ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে যাহাকে আমরা integer বা সমস্ত রাশি বলি তাহাকেই প্রথমে সংখ্যা বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল সমস্ত রাশির উপর যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি প্রক্রিয়া করায় ভগ্নাংশ প্রভৃতি যে সকল রাশির উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে সমস্ত রাশির কোটায় ফেলিতে পারা যায় নাই। সুতরাং তাহাদের অর্থ কি তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক। সংখ্যার সংজ্ঞাকে একটু বড় ও বিস্তৃত না করিলে ঐ নূতন রাশিগুলিকে সংখ্যা নামে অভিহিত করা যায় না। বাধ্য হইয়া সংখ্যার সংজ্ঞাকে বাড়াইতে হইল; কিন্তু এই বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একটী কায যে হইল সেটীর দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সমস্ত রাশির বেলায় গুণ যে অর্থে ব্যবহৃত হইত অসমস্ত রাশির বেলায় গুণের সে অর্থ রহিল না। গুণ প্রক্রিয়াটীরই অর্থ অন্য রকম হইয়া দাঁড়াইল। Increase and multiply—এই যে দুইটী কথা সমস্ত রাশির বেলায় প্রায় একার্থকই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে দুইটী কথার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

যাহা হউক কিয়দ্দিন ত এরূপ অর্থ প্রসারণেরই কায চলিতে লাগিল, কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক বিপদ্ উপস্থিত। সমস্ত ও অসমস্ত উভয় রাশির উপরেই গুণ ভাগ ইত্যাদি প্রক্রিয়া করিতে করিতে এমত একটী রাশির উদয় হইল যাহা অত্যন্ত অদ্ভুত, প্রচলিত মতে যাহার কোন অর্থই হয় না, সেটী চির কৌতূহলপ্রদ $\sqrt{-1}$ (বিযুক্ত একের বর্গফল)। এটীকে সংখ্যাকলভুক্ত করিতে লোকে এতই নারাজ ছিল যে তাহারা ইহাকে প্রকৃত সংখ্যা বলিতে সাহস করিল না, ইহাকে imaginary বা কাল্পনিক সংখ্যা নাম দিয়া নিস্তার পাইল। আধুনিক গণিতজ্ঞগণ ইহাকে "কাল্পনিক" বলিয়া মনে না করিয়া ইহার একটী বেশ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা

দিয়াছেন। এক একটী কাল্পনিক সংখ্যা দ্বারা সমতলের উপরিস্থ এক একটী বিন্দুকে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এই কাল্পনিক সংখ্যার প্রকৃত অংশ ও কাল্পনিক অংশ বিন্দুটীর দুইটী co-ordinates নির্দ্দেশ করে। ইহাই বিখ্যাত Argand representation of complex quantities। আমরা প্রকৃত সংখ্যা বা real numberকে একটী সরল রেখার উপরে অবস্থিত বিন্দুর স্থাননির্দ্দেশক বলিয়া মনে করিতে পারি এবং কাল্পনিক সংখ্যা বা complex numberকে সমতলে অবস্থিত বিন্দুর স্থাননির্দ্দেশক বলিয়া মনে করিতে পারি। এইভাবে দেখিলে বীজগণিতকে one-dimensional জ্যামিতি বলিয়া মনে করিতে পারি। হ্যামিল্টন (Hamilton) এই অর্থেই বীজগণিতকে Science of pure time বলিয়াছিলেন। তারপর এই কাল্পনিক সংখ্যার উৎপত্তির দরুণ আমাদের যে সনাতন প্রক্রিয়া বা operationগুলি চলিয়া আসিতেছে তাহারও অর্থের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ভাগ ও বর্গফলনির্ণয় প্রভৃতি পদ্ধতির অর্থের প্রসার আবশ্যক।

তা ছাড়া এই কাল্পনিক সংখ্যার দ্বারা যেমন সমতলস্থ বিন্দুর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় তেমন যে কোন বিন্দুর স্থান three dimensional spaceএ নির্দ্দেশ করা সম্ভব কিনা স্বতঃই এই কৌতূহল হয়। এই কৌতূহল নিবৃত্তির প্রয়াস হইতেই Hamiltonএর Quaternions, গ্রাসমান (Grassmann)এর Ausdehnungslehre, মোবিয়ুস্ (Moebius)এর Barycentrische Calcul প্রভৃতির উৎপত্তি। একটী বিন্দুর অবস্থান নির্দ্দেশ যেমন তিনটী সংখ্যার দ্বারা করিতে হয় তেমনি প্রত্যেক সংখ্যাকে তিনটী ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, সেই তিনটীর মধ্যে একটীর সঙ্গে অন্যটীর কোন সম্পর্কই নাই অর্থাৎ তাহার একটীকে অন্য কোনটীতে পরিণত করিতে পারা যায় না। এই তিনটী দিকনির্দ্দেশক রাশির বা vector quantityর সাহায্যে যে কোন রাশিকে প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত স্বতন্ত্র বা independent রাশির সংখ্যা তিন না হইয়া যদি আরও বেশী হয়, তাহা হইলেও তাহাদের একটী বীজগণিত খাড়া করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই সময়ে একটী বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এই সমস্ত রাশির উপর প্রচলিত মতে গুণ ভাগ প্রভৃতি প্রক্রিয়া ঘটাইলে যে সকল রাশির উদ্ভব হয় সেগুলি এ সকল রাশির ন্যায় নহে অর্থাৎ তাহারা আমাদের সেই স্বতন্ত্ররাশি কয়টীর সাহায্যে ব্যক্ত হইতে পারে না; সুতরাং গুণ ভাগ প্রভৃতির অর্থ বদলাইতে হয়। এই হিড়িকে পড়িয়া গুণ প্রক্রিয়ার যে সব ধর্ম্ম স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া মনে করি যথা associative law ও commutative law, ইহাদের কোন কোনটীকে পরিত্যাগ করিতে আমরা বাধ্য হই। গুণের অর্থের প্রসারও গুণের প্রক্রিয়াটীর সঙ্কোচ করিয়া আজকালকার linear associative algebraগুলি খাড়া হইয়াছে।

জ্যামিতির analogyতে পড়িয়া সংখ্যা ও তাহাদের প্রক্রিয়ার তো এইরূপ বিচিত্র মূর্ত্তি হইয়াছে। অপরদিকে সরল রেখার উপরিস্থিত বিন্দু ও প্রকৃত সংখ্যা (real number) এই দুইটীর তুলনা হইতে সংখ্যার সংজ্ঞাটী ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে। বিখ্যাত জার্ম্মাণ গণিতজ্ঞ ডেডেকিণ্ট (Dedekind) ও ক্যাণ্টর (Cantor)এর হাতে পড়িয়া সংখ্যার ধারণাটী যে কি রকম সূক্ষ্ম হইয়া পড়িয়াছে, class concept-এর ধাক্কায় পড়িয়া cardinal ordinal ভেদে, finite. transfinite ভেদে সংখ্যা যে কত বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। সংখ্যা জিনিষটা যে কি তাহার ধারণা ক্রমেই ধোঁয়াটে হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সংখ্যা এবং তৎসংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত মোটামুটি হইয়াছে তাহা এই যে সংখ্যা কতগুলা symbol বা চিহ্নমাত্র যাহার কতগুলা বিশিষ্ট লক্ষণ আছে এবং সংখ্যা-সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলি এমত হইবে যে সে প্রক্রিয়ার ফলে যে সব সংখ্যার উৎপত্তি হইবে তাহাও যেন সেই লক্ষণাক্রান্ত হয়। ইংরাজীতে ভাবটী এইভাবে প্রকাশিত হয়। "Any system of symbols which forms a group with reference to a certain system of operations may be regarded as a number system."

আমরা গণিতের নানা বিভাগের আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইলাম যে কি axiom, কি concept,

কি operations সব বিষয়েতেই আধুনিক যুগে একটা generalisationএর দিকে গতি পরিস্ফুট। কিন্তু সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বোপরি consistency জিনিষটী দরকার। কোন তথ্যকে মৌলিক বা কোন ধারণাকে আদিম বলিয়া ধরিয়া লওয়া আমাদের ইচ্ছা, কিন্তু কিছুতেই উহাকে a priori, absolute বা নিরপেক্ষ বলিয়া ধরিতে পারি না। যে পর্য্যন্ত আমাদের নির্ব্বাচিত ধারণাগুলি হইতে যুক্তিবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত-পরম্পরা আমরা করিতে পারিতেছি ততক্ষণ আমরা গণিতের চর্চ্চাই করিতেছি। বস্তুতঃ সেই সিদ্ধান্তগুলি এবং সেই মৌলিক তত্ত্বগুলি বাস্তবিক কিনা তাহা বিচার করিবার ভার pure methematies বা বিশুদ্ধ গণিতের নহে; যদি তাহা একান্ত গণিতের মধ্যে আনিতেই হয় তবে তাহাকে আমরা ফলিত গণিত বা applied mathematics বলিব। আরও মজা এই, যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের চিন্তা-পরম্পরা কতকগুলি অপ্রমাণীয় তথ্য ও অসংজ্ঞিত ভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং আমরা যাহা সিদ্ধান্ত করিতেছি তাহা সত্য বা বাস্তব কিনা জানিবার উপায় নাই এবং আমরা কিসের বিষয় চিন্তা করিতেছি তাহাও নিরূপণ করিবার উপায় নাই, কারণ গোড়ার তথ্যগুলি আমাদের মনগড়া বা arbitrary এবং গোড়ার ভাবগুলি অনির্দ্দিষ্ট বা undefined; ইহা লক্ষ্য করিয়াই প্রসিদ্ধ মনীবী Bertrand Russell বলিয়াছেন "Mathematics is the Science in which we never know what we are talking about, nor whether what we say is true." কথাটা অবশ্য একটু কৌতুক করিয়াই বলিয়াছেন, কিন্তু কথাটা একেবারে অযথার্থ নহে। বাস্তবসত্য গণিতশাস্ত্রের পক্ষে ততটা আবশ্যক নহে যতটা আবশ্যক আভ্যন্তরীণ যুক্তিসিদ্ধতা। সমস্ত গণিত জিনিষটাই Russellএর মতে বলিতেছে "যদি 'ক' সত্য হয়, তবে 'খ' সত্য হইবে"—কিন্তু বাস্তবিক 'ক' সত্য কিনা এবং তৎসঙ্গে 'খ'ও সত্য কিনা তাহা জানিবার জন্ত গণিতের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই।

গণিতের সম্বন্ধে এই যে মতবাদ দাঁড়াইয়াছে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইহা নিরতিশয় abstract। গণিত কতগুলা সিদ্ধান্ত খাড়া করিতেছে যাহা পরস্পরের মধ্যে অখণ্ড যুক্তিসূত্রে আবদ্ধ, কিন্তু তাহা বাস্তব জগতের কোন তোয়াক্কা রাখে না এবং রাখা আবশ্যকও মনে করে না; গণিতজ্ঞ আত্মতৃপ্ত হইয়া নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে লক্ষ লক্ষ উর্ণনাভপ্রতিম সূক্ষ্ম তন্তুজাল সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাই গণিতের চরম পরিণতি। এই উৎকট abstractবাদ আমাদের মনকে কিছুতেই শান্তি দিতে পারে না। এই abstract-বাদিদিগকে অধ্যাপক টোমি (Thomae) বলিয়াছেন "thoughtless thinkers"। তাহাদের চিন্তার কোন উপাদান নাই অথচ যুক্তিযুক্তভাবে, formalভাবে চিন্তাসূত্র গ্রথিত করিয়া যাইতেছেন। বিখ্যাত জর্ম্মাণ অধ্যাপক ক্লাইন (Klein) এই উৎকটতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে যদি গণিতশাস্ত্র শুধু স্বেচ্ছাধৃত arbitrary কতগুলি সূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত চিন্তাপরম্পরাই হয় তাহা হইলে তো গণিত কার্য্যতঃ নিরর্থক; বাস্তবিক তো উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সময় কাটানোর জন্ত গণিত সৃষ্ট হয় নাই; ইহার একটা ব্যবহারিক মূল্য, একটা pragmatic worth থাকা দরকার, এবং ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, মানুষের একটা অতি প্রকৃত অভাব পূরণ করিবার জন্তই যে গণিতের উদ্ভব তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। যে সমস্ত মৌলিক সূত্র আমরা ধরিব সেগুলি বাস্তবিকই সত্য হওয়া চাই, তাহা না হইলে সে রকম সূত্র অবলম্বনে যুক্তি খাড়া করা অনাবশ্যক।

এই কথা প্রসঙ্গে আমরা আর একটী কথায় উপনীত হইলাম সে কথাটী বড় গুরুতর। আমরা যখন কোন যুক্তিপরম্পরা বাস্তবিক যুক্তিসিদ্ধ কিনা, consistent কিনা তাহা স্থির করিতে চাই তখন আমরা কার্য্যতঃ কি করিয়া থাকি? আমরা একটা বাহ্য দৃষ্টান্ত, একটা concrete representation লইয়া থাকি যে দৃষ্টান্তটী আমাদের মূল-সূত্রগুলি মানিয়া থাকে; তারপরে আমরা দেখি যে আমাদের অনুমিত সিদ্ধান্তগুলি তাহাদের পক্ষে খাটে কিনা; যদি খাটে তবে আমাদের সিদ্ধান্তকে বিশুদ্ধ মনে করি যদি না খাটে তবে ইহাকে অশুদ্ধ মনে করিয়া থাকি। এই

প্রকারে বাহ্য দৃষ্টান্তের উপমায় ভিন্ন যুক্তির বিশুদ্ধতা স্থির করিবার কি উপায় আছে? এ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ formal test of consistency কিছু বাহির হয় নাই। সুতরাং concrete representation যে একটা বাজে কাজ, একটা অবান্তর বিষয়, একটা luxury তাহা নয়, ইহা যুক্তিশাস্ত্রের একটা অতি আসল জিনিষ, একটা কঠোর necessity। যে formal consistencyর উপরে abstractবাদিগণ এতটা ভক্তি ও আস্থা স্থাপন করেন, সেই consistencyই স্থির করিতে হইলে বাস্তবকে লইতে হইবে, ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। নিবাতনিস্পন্দ আকাশে কল্পনার ঘুড়িও উড়িবে না।

একথা আমরা অবশ্য স্বীকার করিতে বাধ্য এই abstractবাদিগণ, এই nominalistগণ গণিতবৃক্ষের গোড়ায় যে নাড়া দিয়াছেন তাহাতে অনেক পরিমাণে উপকারই হইয়াছে; বৃক্ষের গোড়াতে সঙ্কীর্ণসূত্র স্বতঃসিদ্ধ ও ধারণাগুলি যে পাষাণ রচনা করিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া ভালই হইয়াছে; বৃক্ষের মূল এখন জীবন্ত প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া বৃক্ষকে অধিকতর সঞ্জীবিতই করিবে; কিন্তু পাষাণ ভাঙ্গিতে বসিয়া যেন বৃক্ষকে শুদ্ধ উৎপাটিত উন্মূলিত না করিয়া বসি। সেই ভ্রম যদি আমরা না করি তাহা হইলে পাষাণবিমুক্ত গণিতবৃক্ষ বাস্তবের সরস বৃক্ষ হইতে রস গ্রহণ করিয়া ফলে ফুলে স্তবকে মুঞ্জরিত হইয়া আপনার অক্ষয় জীবনধারাকে আপনার বিপুল প্রাণস্পন্দনে উচ্ছ্বসিত করিতে থাকিবে।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

গান

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

নৌকোয় চড়ে যাচ্ছি দুজনে ভরা নদীতে, কূলে কূলে ছল ছল করছে জল। তুমি বসে আছ, আমি তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে। উপরে যতদূর তাকাই নীল আকাশ, চিল সেখানে উড়তে উড়তে একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে কোন্ সুদূরে।

আমাদের নৌকো ভেসে চলেছে। তুমি আপন মনে আমার মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছ। আমি জেগে আছি কি নেই। আস্তে আস্তে বললাম—"একটা গান গাওনা নীরু।"

ক্লান্ত সূর্য্য দিনের যাত্রা শেষ করে বিদায় নিচ্ছে, দুই তীরে গ্রামের পর গ্রাম পিছনে সরে যাচ্ছে। নৌকো চলেছে, নদীর জলে মাঝিদের দাঁড়ের শব্দ উঠছে—ছপাছপ। তুমি গান ধরলে।

গানের কথা তোমার মুখে ছাড়া পেয়ে সুরের স্পন্দন জাগিয়ে তুলল চারদিকে। গান যেন ডানা মেলে উড়ে চলল আকাশে বাতাসে, মনও চলল উড়ে। আমার চোখ বুজে এল।

তুমি থামতে চাইলেই আমি বলি,—থামিয়ো না। আবার গাও, আর একবার। গান চলে, নৌকোও চলে আর দাঁড় চলছে অবিশ্রাম ছপাছপ। আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছি।

একটি দুটি করে তারা জাগছে আকাশে। শান্ত সন্ধ্যা। তোমার গান থামল। কিন্তু তার শেষ গুঞ্জন এখনো যেন শেষ হয়নি আকাশের ঐ দূরে আর আমার মনের কোণে।

আমি চুপ করে শুয়ে আছি, কানে আসছে শুধু দাঁড়ের শব্দ—ছপাছপ, ছপাছপ।

সাপুড়ের গান

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আমার বাঁশীর সুর ওঠে পড়ে,
শির দোলে তার সুরের তালে,
ঢুলে পড়ে ঘুমে, জেগে ওঠে ঘুমে,
ঘুমের সুরের অন্তরালে।
ঘুম ভেঙে জাগে সর্পরাণী,
চোখে অপরূপ দীপ্তিখানি,
সুরের পরশে নুয়ে পড়ে ভুঁয়ে,
লতায়ে লুটায় চরণতলে,
জড়ায় আঙুলে, জড়ায় দু'করে,
জড়ায় উরসে, জড়ায় গলে।
আমিও যে বাঁশী বাজাতে জানি,
সুরবিমুগ্ধা নাগিনীরাণী!
গুহার কুহরে সে সুর পশে,
ঘুরে মরে সুর রভস-রসে,
ঘুমায়ে লুকায়ে রহিতে পারে না,
সহিতে পারে না, বাহিরে আসে।
অসহ্য সুখে টেনে নেয় বুকে
প্রতি নিঃশ্বাসে সুরের বাসে।
নীলাকাশে ওঠে বাঁশীর সুর,
নেমে আসে নীচে ক্ষীণ মধুর,
আসে নীল ছুঁয়ে, লুটে পড়ে ভুঁয়ে,
আসে কাছে আর যায় সুদূর।

বাঁশী যে শ্বসিয়া শ্বসিয়া ওঠে,
গুমরিয়া বাঁশী গুমরি মরে,
বাজে সে কড়িতে, কোমলে বাজে,
বাঁশী কাঁদে মোর অঝোর ঝোরে।
আসে সুর, সুর ফাটিয়া পড়ে,
ফোটে আর ঝরে সুরের ফুল,
সুরের লহর ছুটিয়া চলে,
গতি উন্মাদ, বেগ আকুল।
বাজে আনন্দে, হরষে বাজে,
সুরের পরশে বুলায় মায়া,
মনের আকাশে খেলে বেড়ায়
সুরের আলো ও সুরের ছায়া।
ফণিনীর ফণা দুলিয়া ওঠে,
বাঁশী তারে সাধি' সাধিয়া তোষে,
তবু তার রাগ ভাঙেনা যেন,
গরজি ওঠে সে গরজি রোষে।
সুর চলে স্রোতে, বাজাই বাঁশী,
বাঁশীর তানের ঠিকানা নাই,
বাঁশীর গানের মানে কি, তাহা
নিজেই বাজায়ে ভুলিয়া যাই।
ফণা তুলে ধরে নাগিনীবালা,
মুঠিতে চাপিয়া রাখিতে নারি,
আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরে পলায়,
ধরা দিলে তবে ধরিতে পারি।

সাগর-কন্যা, নগরে এলে
নয়নে নূতন দীপ্তি জ্বেলে !
সুরের আঘাতে আগুন লাগে,
সুরের পরশে আলোক জাগে,
সুরের বিলাসে উল্লসি আলসে
নুয়ে শুয়ে পড়ে সু-রঙ্গিনী,
ভুজের শিথিল বন্ধন-খসা
মণি-বিভূষণা ভুজঙ্গিনী।
ভালবাসি তারে, তাহারে ডরি,
প্রকোষ্ঠে তারে বলয় করি,

করতলে চাপি, চরণে চাপি,
মুকুট করিয়া মাথায় পরি,
জ্বলন্ত হার, মণির মালা,
নাগপাশ করি কণ্ঠে ধরি।
নীল-রাঙা ঠোঁঠে ঠোঁঠ মিলাই,
রক্তে মিশায় বিষের নেশা,
ঘুরে পড়ি আর বাঁশী বাজাই,
সুধা-ভেজা বিষ, অমৃত-মেশা।
অপলক আঁখি নাগরাণীর,
পলক পড়ে না পুলক-ত্রাসে,
চুম্বন করি চাপিয়া ধরি
অনিমেষ চোখ মুদিয়া আসে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কবি ও ভাস্করের লড়াই

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভার প্রতি চারণী দেবীর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল। রূপ কাকে বলে জানার পর থেকেই সে জানত তার এমন একটি সুদুর্লভ পেলব রূপ আছে যা প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। অল্প বয়স থেকে এই ধরণের একটা জ্ঞান মনের মধ্যে পুষে রাখার ফলে চারণীর ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে একটি বিশেষ বৃহৎ প্রতিভাকে বৃহত্তর প্রতিভায় পরিবর্ত্তিত করার জন্য সে পৃথিবীতে এসেছে; তার নারী-জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সার্থকতা সন্তান-পালনের মত প্রতিভার প্রতিপালনে। অবিকল এই উদ্দেশ্যের উপযুক্ত করে চারণী নিজেকে গড়ে তুলেছিল। কবি, চিত্রকর, ভাস্কর অথবা নিছক গদ্য-সাহিত্যিক ঠিক কোন ধরণের প্রতিভার বিকাশের ভারটা তাকে গ্রহণ করতে হবে জানা না থাকায়, সব দিক বজায় রাখার জন্য, এই চার রকম প্রতিভার উপযুক্ত করেই নিজেকে সে তৈরী করেছিল। স্কুল কলেজে এরকম ব্যাপক ও অবাস্তব শিক্ষার ব্যবস্থা নেই; স্কুল কলেজ প্রতিভাকে মানে না। স্কুল ছাড়িয়ে চারণী তাই আর কলেজে ঢোকে নি। বাড়ীতে নিজেরই তত্ত্বাবধানে সে চারটি ক্লাস করত। সকালে কবিতার, দুপুরে ছবি ও খোদাই-এর, রাত্রে গদ্য সাহিত্যের।

এমনি ভাবে পুস্তক ও এ্যালবামের মধ্যস্থতায় চারণী জগতের বড় প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল কিন্তু রক্ত-মাংসের প্রতিভার খোঁজ সে পেলে না। দু'চারজন কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক যাদের সঙ্গে তার আলাপ হ'ল তারা এত গরীব যে তাদের প্রতিভাকে চারণী মেনে নিতে পারলে না। তা ছাড়া, এরকম প্রতিভার বিকাশের ভার নেবার সাধ চারণীর কোন দিনই ছিল না। টাকা পয়সার গোলমাল সে অত্যন্ত অপছন্দ করত। প্রতিভার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সে সর্ব্বদাই রাজী ছিল কিন্তু আজ আলো আজ খাও কালকে উপোস দাও যে প্রতিভা তার জন্য দু'চার ঘণ্টা সময় ও দুচার কাপ চায়ের বেশী আর কিছু উৎসর্গ করা তার কাছে ছিল নষ্ট করার সামিল। জীবন অমূল্য। দুটো পাঁচটা ফালতু জীবনও মানুষের থাকে না যে নষ্ট করা চলে। চারণী তাই তার পরিচিত গরীব প্রতিভাগুলির পাশ কাটিয়ে চলত। সুতরাং পাশে পাশে চলবার মত প্রতিভাও সে আবিষ্কার করতে পারত না।

বেড়ে বেড়ে চারণীর বয়স যখন হল একুশ এবং তার ক্ষীণ আর্টিষ্টিক দেহটি একটু স্থূল হয়ে উঠবার উপক্রম করলে তখন ভয় পেয়ে ও হতাশ হ'য়ে প্রতিভা-চিনির বোঝাবাহী এক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া সে প্রায় স্থির করে ফেললে। এমন সময় প্রায় এক সঙ্গে দুজন ধনবান রূপবান বলবান প্রতিভার আবির্ভাবে চারণীর জীবনে একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেল। প্রথম এল অরবিন্দ,—উদীয়মান ভাস্কর। তারপর, অরবিন্দের সঙ্গে চারণীর বিয়ের কথা যখন পাকা হয়ে এসেছে, তখন এল মহাব্রত,—উদীয়মান কবি।

দুজনেই প্রতিভা। মরবার আগে সাগর পারে দু'চার জন ভক্ত না রেখে ওরা কেউ মরবে না, এটুকু নিঃসন্দেহ। চারণীর ভারি বিপদ হল। দুটি প্রতিভা-স্রোতের সম্পর্কে যে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি হল তাতে পাক খেয়ে খেয়ে তার মাথা এমনি গুলিয়ে গেল যে সে কোন মতেই ঠিক করে উঠতে পারলে না কোন স্রোতে ভেসে যাবে। আসলে চারণীর একেবারেই মনের জোর ছিল না। যখন যে প্রতিভাটি তার কাছে থাকত তার মনে হত তাকেই সে ভালবাসে। দুজনের দুরকম কিন্তু প্রায় সমান জোরালো ব্যক্তিত্ব দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশবার তাকে পেণ্ডুলামের মত এদিক ওদিক দোলাত আর বাকী সময়টা দুজনের সমান আকর্ষণ অনুভব

করে তার মনে হত নিজেকে চুলচেরা দুভাগে ভাগ না করে ফেললে এ টানাটানি সমস্যার আর মীমাংসা নেই।

আগে এসেছিল বলে অরবিন্দের কিছু কিছু দখলী স্বত্ব জন্মেছিল কিন্তু মহাব্রত এক রকম কথা বলেই তা বাতিল করে দিলে। এদিক দিয়ে অরবিন্দের চেয়ে সে ছিল বেশী শক্তিমান। আশ্চর্য্য ছিল তার কথা বলার ক্ষমতা। তার বক্তব্য রূপ নিত বক্তৃতায়, এবং তাতে যেখানে অখণ্ডনীয় যুক্তি থাকত না সেখানে থাকত বেগবতী আবেগ, আর যেখানে বেগবতী আবেগ থাকত না সেখানে থাকত অখণ্ডনীয় যুক্তি। দশ মিনিট তার কথা শুনে চারণী ভেসে যেত। তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত না যে তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সার্থকতা এই বিস্ময়কর মুখর কবি-প্রতিভাকে সন্তানের মত প্রতিপালন করা। মহাব্রত চলে যাবার পর অরবিন্দের আবির্ভাব ঘটা পর্য্যন্ত চারণী উত্তেজিত হয়ে থাকত। অরবিন্দ এসে বেশী কথা বলত না, যা বলত তাও মৃদু স্বরে, যার প্রধান সুরটা হত আদরের। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকিয়ে সে ম্লান ভাবে একটু হাসত। দেখে চারণীর মন যেত গলে। তার মনে হত মহাব্রতের মুখর প্রেমের চেয়ে অরবিন্দের নিঃশব্দ ভালবাসা ঢের বেশী কাব্যময়। মহাব্রতের উপস্থিতি অস্বাভাবিক, উন্মাদনাকর, অরবিন্দের কাছে বসে থাকার চেয়ে স্বাভাবিক কিছু নেই। চারণী টের পেত মহাব্রতকে সে ভয় করে। ভাল-বাসা দিয়ে যত নয় এই ভয় দিয়ে মহাব্রত তাকে বশ করেছে। মহাব্রতের প্রচণ্ড অস্থির জীবনী শক্তি তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দেয়, তাই তার কাছে বসে থাকার সময় জগতে আর কোন মানুষ আছে বলে সে ভাবতে পারে না; আসলে অরবিন্দকেই সে ভালবাসে।

চারণীর এই দ্বিধা ও সন্দেহের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হল তা এমনি জটিল যে বিশদ বর্ণনা ও ব্যখ্যা দিতে গেলে মনস্তত্ত্বের গবেষণার মত শোনাবে। ঘটনাচক্রে প্রতিভা দুজনের একজন যদি কয়েকটা দিনের জন্য দূরে সরে যেত তাহলে সব গোলমালের অবসান হতে পারত, কিন্তু যেহেতু চারণীর কাছে একা থাকার সময় তাদের প্রত্যেকে টের পেত চারণী তাকেই ভালবাসে, কোন ঘটনাচক্রই তাদের একটি দিনের জন্য তফাতে নিয়ে যেতে পারত না, লুকোচুরি খেলার মত চারণীকে নিয়ে তারা জয়পরাজয়ের খেলা খেলত। সকালে চারণীকে জয় করে যেত মহাব্রত, বিকালে বিজয়ী হত অরবিন্দ। যেদিন চারণীর হৃদয়-দুয়ারে তাদের আবির্ভাব ঘটত একসঙ্গে সেদিন ঠিক কে যে জয়ী হল বুঝতে না পেরে দুজনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বাড়ী ফিরত, আর দুর্ব্বলচেতা চারণী দ্বিধাসন্দেহের পীড়নে ছটফট করে রাত কাটাত।

মোটা হতে আরম্ভ করে চারণী ভয় পেয়ে রোগা হবার জন্য খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করেছিল, পেট ভরে খেত না, পুষ্টিকর খাবার এড়িয়ে চলত। ফলে, এই সময় মোটা হওয়া স্থগিত হলেও তার মনের মত তার শরীরটাও খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। তার ওপরে তার অদ্ভুত সমস্যার অবিরাম পীড়ন সে সহ্য করতে পারলে না। তার অনিদ্রা অজীর্ণ ও অম্বলের ব্যারাম হল। তারপর হল নার্ভাস ব্রেকডাউন। একদিন মহাব্রত ও অরবিন্দ দেখা করতে এলে দুজনকেই সে তাড়িয়ে দিলে এবং আশ্রয় নিলে শয্যায়। তার অসুখের সংবাদে ব্যাকুল হয়ে মহাব্রত ও অরবিন্দ বার বার তাকে দেখতে ছুটে গেল কিন্তু চারণী খবর পেয়ে চেঁচামেচি করে বাইরে থেকেই তাদের বিদেয় করে দিলে।

তারপর একদিন বাড়ীর সকলে সহরের অন্য প্রান্তে বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে গেছে, খালি বাড়ীতে চারণী অনেক রাত অবধি ঘুমোবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মরিয়া হয়ে একরাশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেললে। এক রাত্রির ঘুম অথবা চিরনিদ্রা কোন্‌টা তার কাম্য ছিল জানবার উপায় নেই, পরদিন অনেক বেলায় তার ঘরের দরজা ভেঙ্গে দেখা গেল সে মরে গেছে। মরবার সময় বুকে বোধ হয় খুব যন্ত্রণা হয়েছিল, জামা ছিঁড়ে আঁচড়ে আঁচড়ে নিজের বুক সে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলেছে।

খবর পেয়ে প্রতিভা দুজন দেখতে গেল।

চারণীর একটি বৌদি ছিল, অল্প বয়সে চারণীর অত্যন্ত বিদ্বান ও অত্যন্ত নীরস দাদার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। চোখের সামনে চারণীকে দুটি প্রতিভার পূজো পেতে দেখে তার

বোধহয় খুব হিংসা হত। সেই দুজনকে চারণীর ক্ষত-বিক্ষত বুকটা দেখালে।

কেঁদে বললে, 'বুকে কত যাতনাই না জানি হয়েছিল।'

চারণীর মৃত্যু অথবা অপমৃত্যুর আগে একথা অনায়াসেই মনে করা চলত যে তার প্রেমিক প্রতিভা দুটির মধ্যে লড়াই বাধিয়ে সে কৌতুক উপভোগ করছে। সাধ করে যে মেয়ে নিজেকে প্রতিভার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পাগলামীকে প্রশ্রয় দিতে পারে সে এরকম কৌতুক উপভোগ করবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে। চারণীর মৃত্যুর পর এও খুব সহজে অনুমান করা গিয়েছিল যে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিভা দুটি এবার তাদের মৃতা প্রিয়াকে অতি দ্রুত বিস্মৃত হবে। দুটি মেয়ের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে যে মেয়ে মজা ছাখে তাকে মনে রাখবে এমন প্রেমিক জগতে কে আছে? আসলে এ রকম মেয়ের প্রেমেই কেউ পড়ে না। জয় করার জেদটাকে মনে হয় প্রেম। মরে গেলে অথবা সরে গেলে এরকম মেয়েকে মনে রাখার বিশেষ কোন কারণ থাকে না। যে রাজ্য রসাতলে গেছে তার অধিকার নিয়ে মামলাবাজ দুটি রাজা হয়ত মারামারি করে মরে, হৃদয়সংক্রান্ত জয়পরাজয়ের সমস্যা হৃদয়ের সঙ্গে অন্তর্হিত হয়, জেদ যায় জুড়িয়ে, মৃতার স্মৃতির প্রতি একটু দয়ার্দ্র কোমলতা ছাড়া প্রেমের চিহ্নটুকু থাকে না। মহাব্রত ও অরবিন্দের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রথম টের পাওয়া গেল নিছক রেষারেষি তাদের প্রেমের ভিত্তি ছিল না, চারণী তাদের নিয়ে কৌতুক করে নি। প্রতিভা দুটির শোকের মাপকাটিতে আবার মাপজোঁক করে চারণীর হৃদয়ৈশ্বর্য্যের নূতন পরিমাণটা আবিষ্কার করে আমাদের অবাক হতে হল। ওরা দুজনে প্রমাণ করে দিলে দু ফোঁটা চোখের জল নিয়ে মরবার মত সাধারণ মেয়ে সে ছিল না। হৃদয়-জয়ের বিপুল প্রতিভাই তার ছিল।

অরবিন্দ মানুষের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ষ্টুডিওতে আশ্রয় নিলে, মহাব্রত চীনা আর ফিরিঙ্গি হোটেলে রকম রকম পানীয় চেখে বেড়াতে লাগল। একজন শুকিয়ে যেতে লাগল ঘরের কোণে নীরবে, আর একজন শুকিয়ে যেতে লাগল বাইরে হৈ চৈ করে। লড়াই যেন তাদের থামেনি। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তারা যেন চারণীর জন্ত পাল্লা দিয়ে শোক করতে লাগল। তাদের প্রতিভায় যারা সন্দেহ করত এবার তাদের সন্দেহ দূর হ'ল। অল্পবিস্তর উন্মত্ততা প্রতিভার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

তাদের এই অসামাজিক অস্বাভাবিক জীবন যাপনে আত্মীয়স্বজন ব্যথিত হল, প্রতিবাদ করলে; বন্ধুবান্ধব হাসিগল্পের আড্ডায় টানবার চেষ্টা করলে কিন্তু তাদের নির্লিপ্ত ভাব অব্যাহত রইল। হাসতে না জানলে এ জগতে বন্ধু টেঁকেনা, দুজনের মনোবিকার সহ্য করতে না পেরে বন্ধুরা তাদের রেহাই দিলে। ব্যর্থ হয়ে হাল ছাড়লে আত্মীয়-স্বজন। সহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। কেবল একজন, পরের সুখদুঃখ নিয়ে নাড়াচাড়া করার প্রবৃত্তি যার মজ্জাগত, সেই জোঁকের মত দুজনের পেছনে লেগে রইল। সে চারণীর ঈর্ষাতুরা বৌদি প্রিয়ম্বদা। কানাঘুষায় এদের ব্যাপার শুনে সে যেদিন জানতে পারল ভালবাসার চোটে তার ননদটিকে মেরে শোকের চোটে এবার এরা নিজেদের মারছে, সেই দিন দারোয়ান পাঠিয়ে দুজনকে সে করলে নেমন্তন্ন। কিন্তু এরা কেউ গেল না। তাতে অপমান বোধ করে প্রিয়ম্বদা দিন পনের আর উচ্চবাচ্য করলে না। কিন্তু পরের সুখদুঃখের কারবার আরম্ভ করার কৌতুহল প্রিয়ম্বদার বড় তীব্র। পনের দিন উঠতে বসতে যতবার তার মনে হল একটি লয়লা ও দুটি মজনুর আবির্ভাবের মত বিস্ময়কর ব্যাপার তার আশেপাশেই ঘটেছে অথচ সময়মত ব্যাপারটা সে ভাল করে অধ্যয়ন করেনি ততবারই তার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠতে লাগল। সে আবার দরোয়ান পাঠালে। এবার এরা দুজনেই নেমন্তন্ন গ্রহণ করলে কিন্তু নেমন্তন্ন রাখতে ভুলে গেল। তৃতীয়বার প্রিয়ম্বদা দরোয়ানের হাতে দুজনকে কড়া মিঠে এমনি একটা অদ্ভুত চিঠি পাঠালে যে সেদিন বিকেল হবার আগেই দুজনে তাদের বাড়ী গেল।

চারণীর মৃত্যুর পর চারণীর বাড়ীরই বসবার ঘরে, যেখানে দেয়ালের গায়ে চারণীর ফটো ছিল আর চারণীর হাতে

আঁকা ছবি ছিল আর অর্গানে চারণীর গান শুরু হয়েছিল আর আবহাওয়ায় চারণীর হাসির রেশ ছিল, সেইখানে প্রিয়ম্বদার মধ্যস্থতায় কবি ও ভাস্করের দেখা হল। পরস্পরকে দেখে প্রথমে তারা স্ত্রীলোকের মত হিংসা ও বিদ্বেষ অনুভব করলে, দুজনেরই মনে হল গলাটিপে একটা মানুষকে হত্যা করতে পারলে তাদের সুখের সীমা থাকত না। তারপর এই পাশবিক ইচ্ছার জন্য লজ্জায় তারা খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে রইল। তারও পরে তাদের দুজনের প্রত্যেকে স্থির করে নিলে যে, না, বাস্তবজগতে তাদের শত্রুতা নেই; চারণীর দেহটা অদৃশ্য হয়েছে সত্য কিন্তু চারণীর প্রেম সে পেয়েছিল, সুতরাং আধ্যাত্মিক পরাজয়ের গ্লানিতে দগ্ধ হয়ে যে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে তার সঙ্গে আর বিবাদ কিসের? প্রত্যেকে এই রকম ভেবে পরস্পরকে তারা ক্ষমা করলে।

অরবিন্দ বললে, 'নতুন কবিতা কিছু লিখলেন? মরু-নন্দিনীর কবিতাগুলি বড় ভাল লেগেছিল। মিছরির মত জমাট বাঁধা রস—তবে ঝাঁঝটা একটু বেশী,—এ্যামোনিয়ার মত। বড় বেশী অভিভূত করে দেয়।'

মহাব্রত বললে, 'অল্প বয়সের লেখা। ঝাঁঝটাই তখন বেশী ছিল। নতুন কিছু লিখিনি। আপনি নতুন কিছুতে হাত দিয়েছেন? গতবার বোম্বের একজিবিসনে আপনার উর্ব্বশী দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

এই ভাসা ভাসা ভদ্রতার আলাপ গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যায় আলো জ্বালবার সময় এতদূর এগিয়ে গেল যে উপেক্ষিতা প্রিয়ম্বদা দেখে শুনে থ' বনে গেল। কেবল এদের দুজনকে নেমন্তন্ন করলে খারাপ দেখাবে বলে সে আরও দুচার জনকে বলেছিল, সকলের হাসিগল্প গানের মাঝখানে এই দুই মহাশত্রু যে পরস্পরের মধ্যে এমন করে ডুবে যাবে প্রিয়ম্বদার তা কল্পনাতেও আসে নি। ওরা কি পাগল? চেহারা অবশ্য দুজনেরি অনেকটা পাগলের মত তবু ঘরে যতগুলি লোক আছে তাদের সকলের চেয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ওরাই যে শ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ নেই। খণ্ড খণ্ড ঝাপসা জগত নিয়ে যাদের কারবার ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে সূর্য্যালোকের চেয়ে তীব্র আলোর ঝলসান সম্পূর্ণ এক একটা জগত দেখে তাদের ভয়ই করে। তবু ওরাই এরকম খাপছাড়া কাণ্ডগুলি ঘটায় কেন? তাছাড়া, আলাপ করবে বলে ওদের সে নেমন্তন্ন করেছে। অথচ কথা কইলে জবাব পর্য্যন্ত দেয় না। খাওয়ার পর তার কাছে বিদায় না নিয়েই আলাপ করতে করতে ওরা যখন চলে গেল প্রিয়ম্বদার মনে হল সকলের সামনেই সে কেঁদে ফেলবে।

তাদের ছাড়াছাড়ি হল পথে। দুজনের মনের পরিচয় পেয়ে দুজনেই তারা তখন অবাধ হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা মিশতে পারে না, তাদের মনের গড়ন স্বতন্ত্র, তারা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। আজ আলাপ আলোচনার উপযোগী একটি সঙ্গী লাভ ক'রে দুজনেই যেন তারা ধন্য হয়ে গেল। কথা রইল, পরদিন মহাব্রত অরবিন্দের ষ্টুডিও দেখতে আসবে। সঙ্গে আনবে তার অপ্রকাশিত কবিতা। অরবিন্দ কবিতা শুনবে, মহাব্রত দেখবে মর্ম্মর-মূর্ত্তি।

মহাব্রত সকালেই এল। কথা ছিল বিকালে আসবার। চাকর প্রথমে সোজা জবাব দিলে যে দেখা হবে না। তারপর মহাব্রতের প্রচণ্ড এক ধমক খেয়ে সে অরবিন্দের বোন পদ্মাকে ডেকে আনলে। পদ্মা বললে যে সকালে তার দাদা কাজে ব্যস্ত থাকে কারো সঙ্গে দেখা করে না।

মহাব্রত রেগে আগুন হয়ে বললে 'আমায় নিজে আসতে বলেছিল। দেখা করবে কি করবে না সে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে দয়া করে খবরটা দিন যে মহাব্রত এসেছে।'

পদ্মা বললে, 'আসতে বলেছিল তো আসুন। খবর দেবার আমার সময় নেই।"

চাকরের সঙ্গে মহাব্রতকে সে চারতলায় অরবিন্দের ষ্টুডিওতে পাঠিয়ে দিলে। ষ্টুডিওটা ধরলে বাড়ীটাকে চারতলা বলা চলে, আসলে তিনতলা বাড়ীর খোলা ছাদে অরবিন্দ ষ্টুডিও বানিয়েছে। দেয়াল ইঁটবালির চেয়ে কাঁচেরই বেশীর ভাগ, মাথার উপরে স্কাই লাইটও আছে। আলোয় ষ্টুডিওর ভেতরটা ঝলমল করছিল। ভেতরে ঢুকে হঠাৎ যেন আহত হয়ে মহাব্রত দাঁড়িয়ে পড়ল। অরবিন্দ নিবিষ্টচিত্তে চারণীকে রূপ দিচ্ছে, পাশে হাসিমুখে

দাঁড়িয়ে আছে আর একটি চারণী। সমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ কয়েকটি মাটি ও পাথরের দর্শক ষ্টুডিওর এক কোণে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে।

অরবিন্দ তার দিকে পিছন ফিরেছিল, তার আবির্ভাব সে টের পেল না। মহাব্রত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্যমুখী মর্ম্মরশুভ্রা চারণীকে দেখলে। মহাব্রতের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ক'দিনের মধ্যেই চারণীর জীবন সমস্যার ভারে পীড়িত হয়ে উঠেছিল, চারণীর অবাধ নির্ম্মল হাসি ও চোখের সকৌতুক চাহনি দেখবার সুযোগ তার কখনো হয় নি। এই চারণীকে তার অচেনা মনে হল। তার অগোচরে চারণীর এই অভিব্যঞ্জনা ও ভঙ্গিমার সঙ্গে অরবিন্দের এতদূর ঘনিষ্টতা হয়েছিল যে পাথরে সে তা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে এ কথা মনে করে মহাব্রতের হৃদয় ঈর্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠল। চারণীর এই প্রতিমূর্ত্তিতে অনেক খুঁত ছিল। সেই খুঁতগুলিকে পর্য্যন্ত মহাব্রত চারণীর অদেখা রূপের বৈশিষ্ট্য বলে ভেবে নিলে। তার কষ্টের সীমা রইল না।

অরবিন্দ যখন তাকে দেখতে পেলে সে হাঁ করে চারণীর দিকে তাকিয়ে আছে, গত রাত্রির নিবিড় অন্তরঙ্গতা ভুলে গিয়ে অরবিন্দ প্রথমে খুব বিরক্ত হল। এমন কি খবর না দিয়ে একেবারে ষ্টুডিওতে উঠে আমার জন্য কয়েকটা রূঢ় কথা তার ঠোঁটের কাছে এগিয়েও এল। কথাগুলি চেপে নিয়ে সে বললে, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

মহাব্রত বললে 'এই খানিকক্ষণ। দুটো মূর্ত্তি করছেন কেন?'

এ প্রশ্নের জন্য একটু ভণিতার প্রয়োজন ছিল। অন্ততঃ কিছুক্ষণ অন্য কথা বলে প্রশ্নটা উচ্চারণ করলেও আকস্মিকতা একটু কমত। কাল তারা ইঙ্গিতেও চারণীর সম্বন্ধে কোন কথা বলে নি।

অরবিন্দ বললে, 'এ মূর্ত্তিটা ভাল হয় নি। মন শান্ত হবার আগেই কাজ আরম্ভ করেছিলাম, অনেক খুঁত থেকে গেছে। হাসিটা বড় স্পষ্ট আর—'

মহাব্রত ছেলেমানুষের মত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে 'আপনার মন শান্ত হয়েছে?'

অরবিন্দ বললে 'হ্যাঁ।'

সেইদিন থেকে মহাব্রত প্রতি সন্ধ্যায় হোটেলে হোটেলে মদ চেখে বেড়ানো বন্ধ করলে। দিবারাত্রি একটা অস্থির আবেগে সে চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রইল। কাব্যের যে প্রেরণা তার মদের নেশার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল আবার তাকে পৃথক্ করে আয়ত্ত করার জন্য সে পাগল হয়ে উঠল। জগতের সমস্ত কবির দুয়ারে সে স্মরণ নিলে, কবিতার পর কবিতা পাঠ করলে। নিজের পূর্ব্বকৃত রচনা পড়ে পড়ে সে নিজেকে খুঁজলে। বড় কষ্টে মহাব্রতের দিন ও রাত্রি কাটতে লাগল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে সে শিথিল হতে দিলে না। পাথরে চারণীকে অমর করার তপস্যায় অরবিন্দ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। কবিতায় চারণীকে অমর করতে হলে তার তপস্যা আরও উগ্র হওয়া চাই।

মহাব্রতের শরীর অল্পে অল্পে ভাল হল। তার শূন্য মনে ধীরে ধীরে ভাব ও আবেগের আবির্ভাব হতে লাগল। ফাল্গুনের গোড়ায় অনেক রাত্রে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে সাগর-ভেজা বাতাসের আর্দ্র স্পর্শ অনুভব করতে করতে মাঝে মাঝে সে যেন সুর ছন্দ ধ্বনি ভাব গন্ধ বেদনা প্রভৃতির সমন্বয় করা তার হারানো কাব্যজগতের সন্ধান পেতে লাগল। সব অস্পষ্ট, ঝাপ্সা। তবু আশা জাগাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। লেখার তাগিদও যেন সে অনুভব করলে। ক্ষীণ, ভীরু সে তাগিদ। মহাব্রত তাতেই খুসী হল। তারপর চৈত্রমাসে একদিন রাতে সে চারণীকে স্মরণ করে লিখতে বসল স্মৃতি কাব্য, ইনমেমোরিয়মের মত যার অমরত্ব চারণীকে অমর করবে। পুরোনো দিনের মত কাগজপত্র ছড়িয়ে, বিদ্যুতের আলো নিভিয়ে, রূপার দীপাধারে মোমবাতি জ্বালিয়ে সে লিখতে বসল। পাশের ফুলদানি থেকে সোনা রংএর স্বর্ণ চাঁপা আর সবুজ রঙের কাঁঠালি চাঁপা ফুল পুরানো দিনের মত তাকে তীব্র মিশ্রিত গন্ধ সরবরাহ করতে লাগল। গভীর রাত্রির নিজস্ব ছাড়া ছাড়া শব্দ দিয়ে ভাগ করা যে স্তব্ধতার আগে সে কবিতা লিখত আজও সেই স্তব্ধতাই তাকে ঘিরে রইল। কিন্তু একলাইন কবিতা সে লিখতে পারলে না। কলম হাতে করে যতক্ষণ সে ঈষৎ নীলাভ কাগজের দিকে চেয়ে রইল

তার সবটুকু সময় ব্যেপে তার মনে জেগে রইল চারণীকে অমরতা দেবার জন্য সে কবিতা লিখতে বসেছে। এই জ্ঞানকে মগ্নচেতনায় তলিয়ে দিয়ে আসল কবিতাকে সে মনে আনতে পারলে না। মহাব্রতর ভয় হল। পরদিন সে আবার লিখবার চেষ্টা করলে। যে অবস্থায় সে তার শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করেছে তেমনি অনুকূল অবস্থাতেও আজ এক লাইন কবিতা তার মনে এল না। কতগুলি জোড় বিজোড় শব্দ শুধু তার মনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

মহাব্রতর সমস্ত শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। ভয়ে সে যেন মরার মত হয়ে গেল। এ কোন অদৃশ্য দুর্ব্বোধ্য শক্তি তার প্রকাশের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, তার কাব্যের উৎস-মুখে শিলার মত চেপে বসেছে? তার আত্মাকে অবরোধ করেছে কিসে? মহাব্রতর ঘুম এল না। ঘুম এল না বলে তার মদ খাবার ইচ্ছা হল। বাড়ী থেকে মদের গন্ধটুকুও বিতাড়িত করে দিয়েছিল বলে হঠাৎ সবদিক দিয়ে নিজেকে ব্যর্থ ও অসহায় মনে করে সে কাঁদলে। সেদিন সকালে অরবিন্দের ষ্টুডিওতে চারণীকে দেখে সে টের পেয়েছিল চারণী অরবিন্দকেই ভালবাসত। তা না হলে অরবিন্দের জন্য সে অমন করে হাসবে কেন, অমন করে চাইবে কেন? সেদিন থেকে মহাব্রতের একটা স্বর্গ ভেঙ্গে ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। চারণীর অমর স্মৃতিকাব্যটিও যদি সে লিখতে না পারে সেই পরাজয় সে সহ্য করবে কি করে? বেঁচে থাকবে সে কিসের জন্য?

বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য অবশ্য জগতে সংখ্যাতীত, খুঁজলেও মেলে, না খুঁজলেও মেলে, কিন্তু মহাব্রত প্রতিভাবান কবি বলে চারণীর স্মৃতিকে অবলম্বন করে এক অমর ব্যথাকাব্য রচনা করা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্যই দেখতে পেলে না। এও সে ভুলে গেল যে উত্তেজিত অশান্ত মন নিয়ে অমর কাব্য রচনা করা যায় না। হ্যালামের মৃত্যুর সতর বছর পরে টেনিসনের ইনমেমোরিয়ম প্রকাশিত হয়, বন্ধুকে যখন কবি ভুলে গেছে, সুদূর অতীতে নিয়তির রূঢ় আঘাতে প্রাপ্ত ভাবতরঙ্গের স্মৃতিটুকু মাত্র যখন কবির অবলম্বন, বন্ধুবিয়োগ বেদনা নয়। আর সে তো শুধু বন্ধু। নিজের মরণ ঘনিয়ে না এলে সুদূর অতীতে হৃদয়ে বিপর্য্যয় আনা শোকের স্মৃতিটুকু মাত্র মনে রেখে মৃতা প্রিয়াকে কে ভুলতে পারে যে অমর স্মৃতিকাব্য লিখতে পারবে? করুণ রসে টইটুম্বুর কবিতা লেখা যায়, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের সেই আবেগ উগ্র কাব্য নিয়ে মানুষ হৈ চৈও করে, কিন্তু সোনা রাসায়নিক চোখের জলের মত সে বাঁচবে কেন, সে উপে যায়,—সে তো মড়াকান্না। প্রতিভাবান কবি হয়েও মহাব্রত এ সব কথা যেন ভুলে গেল। জবরদস্তি করে পর পর কয়েক রাত্রি সে কাব্য লিখলে আর সকালে উঠে না পড়েই ছিঁড়ে ফেললে।

তারপর সে সহর ছেড়ে গেল পালিয়ে।

নানা দেশ ঘুরে মন একটু ঠাণ্ডা হয়ে এলে হঠাৎ এক দিন তার মনে হল চারণীকে নিয়ে যে কারণে সে কবিতা লিখতে পারে নি তা হয় ত এই যে তার কবিমন কাব্য রচনার অনুপযোগী স্মৃতিকেই শুধু গ্রহণ করেছে। চারণীর জীবনে যে আবহাওয়া ছিল, যেটুকু বাস্তবতা সমস্ত কবিকল্পনার ভিত্তি, হয় ত সে তা হারিয়ে ফেলেছে। যে সব বস্তু ও বাস্তবতা চারণীকে ঘিরে ছিল তাদের মাঝখানে বসে লিখলে সে লিখতে পারবে। চারণীর অনুশীলন কক্ষটির কথা মহাব্রতের মনে এল। সে ঘরে দীর্ঘ কাল ধরে সে নিজেকে প্রতিভার উপযোগী করে গড়ে তুলেছিল। সেই ঘরে বসে সে ছবি আঁকত, কবিতা পড়ত, ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা করত, সাহিত্যের পরিচয় নিত। চারণীর আঁকা ছবি ও খোদাই করা মূর্ত্তি, তার পড়া অসংখ্য বই, তার ব্যবহার করা অসংখ্য বস্তু সে ঘরে চারণীর স্বকীয়তাকে আজও ধরে রেখেছে। ওই ঘরে দুদণ্ড বসলে স্মৃতি-কাব্যের আরম্ভটা হয় ত সে আয়ত্ত করতে পারবে।

আশান্বিত হৃদয়ে মহাব্রত কলকাতায় ফিরলে। কোন বিষয়ে তাড়াহুড়ো করতে আজকাল তার ভয় করে। প্রথমে দুদিন বিশ্রাম করে দেহ মন সে সুস্থ করে নিলে। পরের দিন সকালে সে গেল চারণীদের বাড়ী। শুনলে চারণীর সেই ঘরখানা সাফ করে তিন দিন আগে প্রিয়ম্বদা একটি মেয়ে প্রসব করেছে। চারণীর ছবি বই প্রভৃতি জিনিষ-পত্র খানিক এ ঘরে খানিক ও ঘরে খানিক সে ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

চারণীর শোবার ঘর?

সে ঘরে চারণীর পিসীমা শোন।

মহাব্রত অনেক ভেবে একদিন অরবিন্দের ষ্টুডিওতে গেল। সেখানে চারণীকে একবার অনেকক্ষণ ধরে দেখে এসে শেষ চেষ্টা করে দেখবে। এতে তার লজ্জা, চারণীকে অমর করার গৌরব এতে তার ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু উপায় কি? যেখান থেকে হোক স্মৃতি-কাব্য আরম্ভ করার প্রেরণাটুকু সংগ্রহ করতে না পারলে তার যে একেবারেই পরাজয়।

অরবিন্দ তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললে, 'আসুন।'

মহাব্রত চেয়ে দেখলে, চারণীর দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি সমাপ্ত হয়েছে। আগেকার হাস্যমুখী মূর্ত্তির চেয়ে এ মূর্ত্তি বহুদিক দিয়ে ভিন্ন—সব দিক দিয়ে। সে মূর্ত্তির খুঁত ও অসম্পূর্ণতা আজ এ মূর্ত্তির সঙ্গে তুলনা করে সে ধরতে পারলে। চোখের পলকে এও সে বুঝতে পারলে এবারও অরবিন্দের কাছে তার হার হয়েছে। অরবিন্দ সৃষ্টি করেছে চারণীকে, ঈষৎ স্থূলকায়া, ভীরু চোখ, শ্রান্ত বিপন্ন হাসি, দ্বিধা সন্দেহ ভয়ে লেপা মুখ, নিখুঁত ও আসল চারণী। অরবিন্দ তাকে অমরতা দেয়নি, পরের কাছে এ মূর্ত্তি হয়ত প্রশংসার বেশী কিছু পাবে না, কিন্তু কি দাম অমরতার? অরবিন্দ যতকাল বাঁচবে চারণী তার সঙ্গে থাকবে। মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে এনে চারণীকে সে জীবনসঙ্গিনী করেছে। এরপর তাকে স্মৃতিকাব্যের অমরতা দিতে চাওয়া হাস্যকর।

মহাব্রতের মাথার ভেতরে কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অরবিন্দের হাতুড়ি আর বাটালিটা তুলে নিয়ে চারণীর মুখখানা সে ক্ষত বিক্ষত করে দিলে। সে যেন অসতী স্ত্রীকে সাজা দিচ্ছে। অরবিন্দ সবটুকু জীবনীশক্তি ব্যয় করে এই মূর্ত্তি গড়েছিল। চামড়া দিয়ে হাড়ঢাকা শরীরে তার একটুও শক্তি ছিল না। এবারও সে তার চারণীকে বাঁচাতে পারলে না।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখ কোথা ভাই?—অগ্নি-গর্ভ ধরা!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম-এ

সারা নিসর্গে হেরিছে যাহারা সুখ,
গীত বলি' যা'রা বিলাপের করে মানে,
মাকালে, শিমুলে হেরে যা'রা হাসিমুখ,
তা'রা প্রকৃতির অর্থ কিছু না জানে।
তটিনী গাহে না,—কুলু কুলু কাঁদি বহে,
বাতাস কাঁদিয়া করিতেছে 'হায়! হায়!'
পাখীটি শাখীরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে,—
"বিদায় বন্ধু, সময় বহিয়া যায়।"
হারা'য়ে, হারিয়া দুঃখের খেলা খেলি'—
একদা বিদায় সবারে লইতে হ'বে,
ধরণীর শত বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলি'—
মুক্তি মিলিবে। বিলাপ কিসের তবে?
তবু দুখ! হেথা মুক্তি, অনলে গড়া!
সুখ কোথা ভাই?—অগ্নি-গর্ভ ধরা!

অপরাজিতা

শ্রীসুনির্ম্মল পুরকায়স্থ

কোমল কমলজিনি স্নিগ্ধ তনুতট,—
পুষ্পিত লতিকা সম রূপ মোহময়,—
নাই বা থাকিল প্রিয়া;—তাহে কিবা ক্ষতি?
—তব আভরণ হ'তে তুমি সত্য জানি।
বাসনা-পঙ্কিল আঁখি—রুদ্ধপথ তার
তোমার মন্দিরে;—তার বহু ঊর্দ্ধে তুমি,
মনের নয়নে তোমা হেরি ধন্য আমি।
তোমার অন্তর—সেথা তব দীপ্ত আভা
রবিসম বিচ্ছুরিছে প্রদীপ্ত মহিমা।
দীপ্তা তুমি সেথা দেবী;—তাই নাহি চাহ
সহস্রতারকাখচা বসনঅঞ্চলে
লুকাইতে হৃদয়ের দীন অমানিশা।
তোমার দেহের দৈন্য পটভূমি সম
করিল উজ্জ্বলতর তোমার অন্তরে।

জেনারেল ক্ল্যদ মার্টিন

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর-এস্

বক্সার যুদ্ধে (২৩।১০।১৭৬৪) পরাজয়ের পর সুজাউদ্দৌলা আবার শক্তি-পরীক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলে ইংরাজরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ফয়জাবাদ, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ নগর অধিকার করিয়া লইলেন। পর বৎসর মার্চ্চ মাসে মার্টিনকে একদল সিপাহীসেনার অধিনায়করূপে বিজিত রাজ্য হইতে রাজস্বসংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। ইহার পর আর ইংরাজদিগকে বাধাদানের চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া নবাব তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। তখন মার্টিনের সিপাহীগণ মুঙ্গের দুর্গে প্রেরিত হইল (আগষ্ট ১৭৬৫)। জেনারেল সার রবার্ট ফ্লেচার তখন এখানকার সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয়ের ফল মার্টিনের পক্ষে পরিণামে কিরূপ বিষময় হইয়াছিল সে কথা যথাস্থানে বলা যাইবে।

এই সময় ক্লাইভ পুনরায় বঙ্গদেশে গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিয়া মোগলসম্রাট সাহআলমের নিকট হইতে কোম্পানীর নামে দেওয়ানী গ্রহণ করেন। এ যাবৎ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ইংরাজদিগের কোন প্রকৃত জ্ঞান ছিল না, তাহার বিশেষ কোন প্রয়োজনও এতকাল অনুভূত হয় নাই। কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে সর্ভে ব্যতিরেকে উক্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। তখন সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে সর্ভে কার্য্য আরম্ভ হইল।* মেজর জেমস্ রেণেলের নাম বঙ্গদেশে সর্ভের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁহার সহকারীগণের সকলকার নাম জানা যায় না। কোম্পানী বিলাত হইতে সুদক্ষ সর্ভেয়ার ও এঞ্জিনিয়ার পাঠাইবার জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে অনুরোধ করায় তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে ইংলণ্ড হইতে এ কার্য্যের জন্য শিক্ষিত লোক পাঠান সম্ভব নয়, সামরিক কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে যাহাদের এ বিষয়ে ক্ষমতা দেখা যাইবে তাহাদের যেন নিযুক্ত করা হয়। ইংরাজ কোম্পানীর কর্ম্মগ্রহণের অনতিকাল পর হইতে ক্ল্যদ মার্টিন সর্ভের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ সর্ভেয়ার-জেনারেলের অফিসে ১৭৬৪ সালে তাঁহার অঙ্কিত কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী জনপদের একটি মানচিত্র রক্ষিত আছে। ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সিলেক্ট কমিটি কর্ণেল রিচার্ড স্মিথকে লিখিয়াছিলেন, "কিছুকাল পূর্ব্বে বিহার প্রদেশের পথঘাটের যথাযথ সর্ভে করিবার যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তদনুসারে আমরা কাপ্তেন দু গ্লোসকে (Du Gloss)* আপনার নিকট পাঠাইয়াছি। এক্ষণে আমরা জানিলাম যে ক্ল্যদ মার্টিনেরও এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং আপনি তাঁহাকেও এ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন।"

ক্লাইভ শাসনবিভাগেও বহুতর সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কর্ম্মচারীগণের উৎকোচ বা উপঢৌকন গ্রহণ নিষেধ, কর্ম্মদ্দশায় ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত না হইবার

---

* পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর ইংরাজদিগকে ২৪ পরগণা জেলা জমিদারী দিয়াছিলেন। সে জন্য ঐ অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বেই সর্ভে আরম্ভ হইয়াছিল।

* লুই দু গ্লোস জাতিতে ফরাসী ছিলেন। ইংরাজ সেনাবিভাগে বিশবৎসরেরও অধিককাল কাটাইবার পর তিনি ১৭৭২ সালে মেজরপদ লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। স্বদেশে কিঞ্চিৎ খাতির পাইবার জন্য তিনি লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল পদ-প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে কোম্পানী তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্ম্মদক্ষতার প্রশংসা করিয়া "নিতান্ত দুঃখের সহিত তাঁহাকে জানাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে বিদেশীকে উহাপেক্ষা উচ্চতর পদ দানে তাঁহারা অশক্ত।

অঙ্গীকার-প্রথা প্রবর্ত্তন এবং মীরজাফর প্রবর্ত্তিত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকগণকে প্রদত্ত "ডবলভাতা"র উচ্ছেদ এই কয়টিই সমধিক উল্লেখযোগ্য। যতদিন নবাবের তহবিল হইতে টাকা আসিতেছিল ততদিন ডবলভাতায় কোম্পানীর আপত্তি ছিল না। কিন্তু দেওয়ানী লাভের পর উহা বৃথা অপব্যয় বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল। ইংলণ্ড হইতে ডিরেক্টরসভা গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন কোম্পানী যখন দেশের প্রকৃত ভার স্বহস্তে লইয়াছেন তখন আর তাঁহাদের সৈন্যদল নবাবের রাজ্যরক্ষায় ব্যাপৃত কোনমতে বলা চলে না; সুতরাং ইউরোপীয়সৈনিকগণ আর "ডবলভাতা"লাভে অধিকারী হইতে পারে না। ঊর্দ্ধতন সৈনিকপুরুষগণের বেতন বর্দ্ধিত হওয়ায় এবং বাণিজ্যবন্ধজনিত আর্থিক ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা অন্যভাবে হওয়াতে ইহাতে তাহাদের কোন আপত্তি হইল না। কিন্তু অধস্তন অফিসরগণের জন্য কোন ব্যবস্থা হইল না এবং তাহাদের আয় অর্দ্ধেক কমিয়া যাওয়াতে তাহাদের অসন্তোষের সীমা রহিল না। পাটনা এবং মুঙ্গেরের সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইল, প্রায় দুইশত সামরিক কর্ম্মচারী একযোগে কর্ম্মত্যাগ করিল। ইহাই এদেশের দ্বিতীয় "হোয়াইট মিউটিনি।"

ক্লাইভ শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করিলেন। সার রবার্ট ফ্লেচার অবাধ্য সৈনিকগণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ষড়যন্ত্রের পূর্ব্বাভাষ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্তৃপক্ষকে কোন কথা জ্ঞাপন করেন নাই অথবা অসন্তোষ প্রশমনের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন নাই। এ কারণ কোর্টমার্শালের বিচারে তিনি কর্ম্মচ্যুত হইলেন।* সঙ্গে সঙ্গে বহু নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও তিনি সর্ব্বনাশ করিয়া গেলেন। অধস্তন কয়েকজন অফিসরকে দিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন দেওয়াইলেন যে কোর্টমার্শালে তাঁহার সুবিচার হয় নাই। স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে কাপ্তেন ক্লাদ মার্টিনের নামই সর্ব্বপ্রথম ছিল। উঁহারা অবশ্য কোন অসদভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া এ কার্য্য করেন নাই। কিন্তু সামরিক বাধ্যতার অভাবের এ নিদর্শনে ক্লাইভ বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উহাদের সকলকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও উহাদের পুনর্গ্রহণ করা হইবে না আদেশ প্রচারিত হইল (৬।১।১৭৬৭)। নিঃসম্বল ব্যক্তিগণকে দয়া করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্বব্যয়ে ইউরোপে পাঠাইয়া দিতে সম্মত আছেন জানাইলেন। মার্টিনের প্রতি "Anson" নামক জাহাজযোগে দেশত্যাগের আদেশ প্রদত্ত হইল। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষেই ছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত আর এ দেশ হইতে যান নাই। তবে কলিকাতায় কি অন্য কোথাও ছিলেন এবং এই সময়টা কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। কয়েকমাস পরে অপরাধীদিগকে মার্জ্জনা করিয়া কর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করা হইলেও তৎকালে মার্টিন উক্ত সৌভাগ্যলাভের অধিকারী বিবেচিত হন নাই। দীর্ঘ আড়াই বৎসর পরে ১লা আগষ্ট ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার নিজ পদে পুনরধিষ্ঠিত হইলেন। তবে গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিলেন যে তাঁহার ঐ কাপ্তেনপদের অতিরিক্ত আর পদোন্নতি হইবে না। তাঁহার প্রতি এ বিশেষ ব্যবহারের কারণ জানা যায় না। সম্ভবতঃ ফ্লেচারের জন্য আবেদনপ্রেরণে এবং স্বাক্ষরসংগ্রহকার্য্যে তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; সহায়হীন বিদেশী সৈনিকের মুরুব্বির অভাবও তাহার অপর কারণ হইতে পারে। অতঃপর মার্টিন প্রধানতঃ সর্ভে কার্য্য অথবা সিপাহীরেজিমেণ্টে নিযুক্ত থাকিতেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে নূতন বন্দোবস্ত মতে অযোধ্যাধিপতি কোম্পানীকে কতকগুলি জনপদ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথায় সর্ভে আরম্ভ হইলে মার্টিনকে তজ্জন্য প্রেরণ করা হয়। কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে প্রায়ই লক্ষ্ণৌ যাইতে হইত। এইরূপে সুজাউদ্দৌলা ও আসফউদ্দৌলার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। মার্টিনের মধুর ব্যবহারে এবং

* কিছুকাল পরে তাঁহাকে এবং অপরাপর বিদ্রোহীগণকে মার্জ্জনা করিয়া নিজ নিজ পদে পুনর্নিয়োগ করা হইয়াছিল। সার রবার্ট ফ্লেচারের বন্দুকের গুলিতে প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত ছিল। দীর্ঘকাল পরে মাদ্রাজের কমাণ্ডার-ইন-চিফ অবস্থায় তিনি গভর্ণর লর্ড পিগটের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের নেতা ছিলেন। তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া পিগটকে বন্দী করিয়াছিলেন। কারাগারে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এবারেও ফ্লেচারের কোন শাস্তি হয় নাই।

নানাবিধ শিল্প ও যন্ত্রবিজ্ঞানে নৈপুণ্য দেখিয়া নবাব-উজীর সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে স্বকর্ম্মে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষতা করিবার জন্য কোম্পানীর নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু অনেকে বলেন নবাব গভর্ণমেণ্টের নিকট মার্টিনকে নাম করিয়া চাহেন নাই। অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষতা করিবার উপযুক্ত একজন লোক চাহিলে প্রধান সেনাপতির সুপারিসে তাঁহারা মার্টিনকে এ জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন (২০।৭।১৭৭৬)। এইরূপে লক্ষ্ণৌ দরবারে মার্টিনের প্রথম কার্য্য আরম্ভ হইল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বরাবরের মত নবাবের কর্ম্মে প্রবেশে ইচ্ছুক হইয়া কোম্পানীর নিকট তজ্জন্য অনুমতি চাহিলেন। ঐ বৎসর ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি "মেজর"পদে উন্নীত হন। ইংরাজ সেনাবিভাগে আর পদোন্নতি বা আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মার্টিন হয়ত স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে ইচ্ছুক হইয়া তৎপূর্ব্বে কিছু অর্থ-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে নবাবের কর্ম্ম গ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। অন্ততঃ-পক্ষে ২৪।৯।১৭৭৯ তারিখে তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মার্থ ঐরূপ। নানাকারণে এই আবেদনটী উল্লেখযোগ্য। মার্টিন জানাইয়াছিলেন যে প্রয়োজন হইলে তিনি সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইতে দ্বিধা বোধ করিবেন না; কিন্তু দীর্ঘকাল এদেশে বাস করার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে; এজন্য তিনি দেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন; তৎপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অর্থার্জ্জনে বাসনা থাকায় এবং লক্ষ্ণৌয়ে থাকিতে অনুমতি পাইবেন এই ভরসায় তিনি প্রভূত আয়াস এবং অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল কারণে তিনি তাঁহার বর্ত্তমানপদে থাকিবার অনুমতি পাইতে ইচ্ছুক; ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইবে এবং অপর কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। উক্ত কর্ম্মে থাকিতে পাইবার জন্য তিনি মেজর পদের অর্দ্ধেক বেতনে এমন কি বেতন না লইয়াও থাকিতে স্বীকৃত আছেন। একান্তই যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে কর্ত্তৃপক্ষ যেন দয়া করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ হইতে স্থানান্তরিত না করেন; যেহেতু তাহাতে তাঁহার সমূহ ক্ষতি এবং দীর্ঘকালের মতই তাঁহার অর্থার্জ্জনের সকল আশা বিনষ্ট হইবে। অতঃপর গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মেজর পদের সহিত কাপ্তেনের বেতন দিয়া নবাব দরবারে থাকিবার অনুমতি দিলেন। রেজিমেণ্ট হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে ১৭৭৯ সাল হইতে মার্টিনের সরাসরিভাবে কোম্পানীর কার্য্য করা শেষ হইল। কিন্তু সেজন্য তাঁহাদের সেনাবিভাগের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছিন্ন হইল না। নামতঃ তিনি তখনও তাঁহাদের কর্ম্মচারী রহিলেন। চেতসিংহের বিদ্রোহকালে অযোধ্যারাজ্যে ঘোর উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। অনেকেই তাঁহার প্রতি নিতান্ত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। এই সময়ে মার্টিন সবিশেষ আয়াসসহকারে নবাব আসফউদ্দৌলাকে পূর্ব্ববৎ ইংরাজের প্রতি অনুকূল রাখিয়াছিলেন। তাহার পুরস্কারস্বরূপ কোম্পানী তাঁহাকে লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল (৪।৩।১৭৮২) পদ দিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে টিপুর সহিত যুদ্ধে (১৭৯০-৯২) সাহায্য জন্য কর্ণেল (৩০।১।১৭৯৩) এবং দুই বৎসর পরে মেজর-জেনারেল (২৬।২।১৭৯৫) পদ মার্টিন পাইয়াছিলেন। উক্ত পদসমূহ তাঁহাকে সম্মানার্হ-ভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল, কারণ পদোচিত বেতন তিনি কখন পান নাই; বরং প্রত্যেকবারই তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে জানান হইয়াছিল যে বেতন বা ভাতা হিসাবে তিনি অতিরিক্ত কিছু পাইবেন না অথবা ইহাতে তাঁহার সেনাদলের অধিনায়কত্ব বিষয়ে কোন দাবী দাওয়া জন্মিল না। মার্টিন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কাপ্তেনপদের বেতনের অতিরিক্ত কখনও পান নাই। চেতসিংহের বিদ্রোহদমনের পর একবার কি জন্য বলা যায় না গভর্ণমেণ্ট হঠাৎ উদার হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ ৫৬৪০৲ টাকা দিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ঐ টাকা আসলে তাঁহার পাইবার কথা নহে, ভুলক্রমে দেওয়া হইয়াছে অজুহাতে তাঁহারা মার্টিনের নিকট হইতে ফেরৎ লইয়াছিলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর জন্য মার্টিনের আয় আরও কমিয়া গিয়াছিল। দেশীয় দরবারে নিযুক্ত তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণ সুপ্রচুর অর্থার্জ্জন করিতেছে দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট

সকলকার বেতন ও ভাতা কমাইয়া দিয়াছিলেন। মার্টিন সম্বন্ধে স্থির হইল তিনি ডবলভাতাসমেত লেফটেনাণ্ট-কর্ণেলের বেতন পাইবেন, তন্মধ্যে কাপ্তেনপদের বেতন কোম্পানী দিবেন, বক্রী অংশ নবাবের তহবিল হইতে দেওয়া হইবে। অস্ত্রাগারের আবশ্যকীয় সকল ব্যয় নবাব বহন করিবেন। পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট কমিয়া গেলেও মার্টিন এখন যাহা পাইতে লাগিলেন তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। বেতন ও ভাতা বাবদ তিনি প্রতিমাসে ১৪৪০৲ টাকা এবং অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষতা জন্য ৩৭৩০৲ টাকা অর্থাৎ সর্ব্বসমেত মাসিক ৫১৭০৲ টাকা পাইতেন। পর বৎসর হইতে কোম্পানী তাঁহাদের দেয় অর্থ অর্দ্ধেক করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজসরকারে কার্য্য করিলে তখনকার দিনে অনেক রকম অর্থার্জ্জনের ব্যবস্থা ছিল; দেশীয় দরবারের ত কথাই ছিল না। তাঁহার হাত দিয়া নবাব সরকারের জন্য যে সকল মাল কেনা হইত তাহাতে তিনি একটা মোটা মুনাফা পাইতেন। এতদ্ভিন্ন রেশম, চিকণ, ছিট, জরী, আতর, গুলাবের ব্যবসা, নীলের চাষ, তেজারতী বন্ধকী কারবারও তাঁহার ছিল। নবাব-দরবারে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল থাকিয়া মার্টিন সুপ্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নিজ উইলে মার্টিনকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের ধনসম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে দেখা যায়। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে লর্ড ভ্যালেন্সিয়া নামক একজন ইংরাজ একজন ইংরাজ এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে আধুনিক সর্ব্বাভিজ্ঞ ভূপর্য্যটকদের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। তিনি স্বীয় গ্রন্থে মার্টিন সম্বন্ধে অনেক অযথা কুৎসাকলঙ্ক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন মার্টিন নিতান্ত কৃপণস্বভাব ও অর্থগৃধ্নু ছিলেন এবং নিতান্ত নির্লজ্জের মত নানা অবৈধ উপায়ে অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। এ সকল কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। মার্টিন যে সকল উপায়ে অর্থার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার সব কয়টিই তৎকালে বৈধভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল। অযোধ্যা দরবারে থাকিয়া তখনকার দিনে অনেকে তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কর্ণেল গডার্ড নামক যে ব্যক্তি তিন বৎসরকাল ৪০ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া গোরখপুর ও বস্তি জেলায় ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন তিনি লর্ড মহোদয়েরই স্বদেশবাসী।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে টিপুর সহিত যুদ্ধকালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ মার্টিনকে হিন্দুস্থান হইতে ঘোড়া কিনিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ঘোড়া ক্রয় করা ছাড়া মার্টিন নিজ অর্থে ১০৬টী ঘোড়া কোম্পানীকে উপহার দিয়াছিলেন। কোম্পানী সামান্য টাকা লইয়া তাঁহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তে মার্টিনের এই দান কত উদারতার পরিচায়ক তাহা না বলিলেও চলে। ১৭৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। কিং নামক অপর একজন ইংরাজের সহকর্ম্মীরূপে তাঁহাকে কমিসেরিয়েট বিভাগের ভার দেওয়া হয়। ইংরেজ সেনাদলে এই সময় রসদ-বিভাগের ঘোর বেবন্দোবস্ত ঘটিয়াছিল। শত্রুরাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেও কর্ণওয়ালিশকে ঐ জন্য পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছিল। রসদ বিভাগে কতকটা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মার্টিন গভর্ণর-জেনারেলের পার্শ্বচর (A. D. C.) রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপুর শিবিরে নৈশ আক্রমণে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে স্বয়ং বড়লাট আহত হইয়াছিলেন। উদ্ভিদ-বিদ্যায় মার্টিনের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সমর-কোলাহলের অবসরে তিনি তখনকার দিনে অজ্ঞাত মহিশুর দেশ হইতে বহুপ্রকার বৃক্ষলতা গুল্মাদির বীজ ও নমুনা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতে ইহাদের মধ্যে কয়েকটীর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গঠিত হইয়াছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের তৎকালীন অধ্যক্ষ Dr. Roxburgh প্রণীত "Flora Indica" গ্রন্থে উহার বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কাবুলাধিপতি জমান সাহ পুনরায় হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন। এই ঘটনায় ভারতের সর্ব্বত্র ভীতির সঞ্চার হইল। সকলেই নিজ নিজ রাজ্যরক্ষায় সচেষ্ট হইলেন। ইংরাজদের ভয় হইল বুঝি বা তিনি পঞ্জাব ও হিন্দুস্থান অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের আশ্রিত অযোধ্যারাজ্য মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহারাও আমীরকে বাধা দিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে তাঁহাদের সেনাদল সীমান্ত প্রদেশে পাঠাইতে বলিয়া

রোহিলখণ্ডে অবস্থিত নবাবী ফৌজের অধিনায়কত্বে মার্টিনকে নিযুক্ত করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেন্ট সাদাৎ আলিকে বলিলেও মহাভয়ে ভীত নবাব নিজে নিরাপদে থাকিবার অভিপ্রায়ে দুইটির একটি কাজ ও করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু তাঁহার এত ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না, যেহেতু ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জমানসাহ লাহোর হইতে নিজরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর মার্টিন যে কয়েক মাস জীবিত ছিলেন তাহা লক্ষ্ণৌ নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী তাঁহার কনষ্টান্সিয়া (Constantia) নামক সুবিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণে অতিবাহিত হইয়াছিল।

তখনকার দিনে ভ্রমণ অথবা বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে যাঁহারা লক্ষ্ণৌ নগরে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মার্টিনের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। ইহাঁদের রচনা মধ্যে নবাবদরবার এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায়। সকল গুলির উল্লেখ এ স্থানে সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ সুধু টমাস টুইনিং নামক জনৈক ইংরাজ সিভিলিয়ানের গ্রন্থ হইতে একাংশ উদ্ধৃত করা গেল। ঐ ব্যক্তি ১৭৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌ সহরে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"বৈকালে আমরা কর্ণেল মার্টিনের সহিত পরিচিত হইলাম। এতদঞ্চলে তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মার্টিন ফ্রান্সের লিয়ঁ নগরের অধিবাসী। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে বাস করিতেছেন। নবাবের সেনাবিভাগে তিনি একজন অধিনায়ক। আমার ধারণা প্রকাশ্যভাবে না হইলেও অপ্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে নবাবের সামরিক ও রাজনৈতিক সকল ব্যাপারে প্রধান পরামর্শদাতা বলা চলে। লক্ষ্ণৌয়ের প্রান্তবাহিনী গোমতী নদীতীরে সুন্দর ও মনোরম একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বাস করিতেছেন। অট্টালিকাটী একটী দুর্গ বিশেষ; আত্মরক্ষার উপযোগী করিয়া উহা বিনির্ম্মিত; আনুসঙ্গিক টানাপুল, প্রাচীর গাত্রে বন্দুকের গুলি চালাইবার জন্য ছিদ্র, অট্টালক, জলপূর্ণ পরিখা সবই আছে। কর্ণেল মার্টিন ভদ্রতা ও সৌজন্যের আধার, সাতিশয় যত্ন-সহকারে তিনি আমাদের বাড়ীঘর দেখাইলেন। নদীর ঠিক উপরে নির্ম্মিত কক্ষটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, গোমতী বক্ষ হইতে উত্থিত স্তম্ভসমূহের উপর উহার বহিপ্রাচীর-ভার ন্যস্ত। সুতরাং কক্ষের ঠিক তলা দিয়া গোমতীস্রোত প্রবাহিত।* কর্ণেল মহাশয় নানারূপ শিল্পবিদ্যায় সুপটু এবং তাঁহার দেশবাসীগণের মত লোকরঞ্জনক্ষমতাশীল। এ কারণ তিনি অযোধ্যাধিপতিগণের দীর্ঘকাল হইতেই সাতিশয় প্রিয়পাত্র। মার্টিন তাঁহার প্রতিবেশী জেনারেল দি বইনের মত যোদ্ধা ও বিজয়ী বীর না হইলেও তাঁহার ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী শুনা যায় তাহা অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় না। লক্ষ্ণৌ হইতে কয়েক মাইল দূরে তাঁহার আরও একটী বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। উহা দেখিবার জন্য তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন "কনষ্টান্সিয়া"। ইহা একটি সুবিশাল প্রাসাদ, কর্ণেল মহোদয়ের রুচি ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ইহাতে সুপরিস্ফুট। ইহাতে তিনি এখনও বাস করেন নাই, কারণ উপরিদেশের নির্ম্মাণকার্য্য এখনও সমাধা হয় নাই। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারের জন্য প্রধান কক্ষটীর অধোদেশে ভূগর্ভ মধ্যে কয়েকটী কক্ষ আছে। কতকটা পরীক্ষাধীন ভাবে ইহা হইয়াছে। আমার মনে হয় এজন্য অত অর্থব্যয় করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অন্ধকার পথ ও কক্ষ আলোকিত করার জন্য আবশ্যকীয় দীপগুলি হইতে যে পরিমাণ তাপ, ধূম ও দুর্গন্ধ বাহির হইবে তাহাতে উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া কতদূর সম্ভব সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অন্ধকার কক্ষগুলির মধ্যে বৃহত্তমটীর মধ্যভাগে কর্ণেল মহাশয় ইতোমধ্যে নিজ কবর নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বাড়ীটীর খেয়ালী নির্ম্মাণ-কর্ত্তা যখন নিচেকার অপরিসর কক্ষ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন তখন উপরকার বিশাল হর্ম্মের অবস্থা কি দাঁড়াইবে সেইটিই সুধু এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।" †

---

* এই বাড়ীটার কতকাংশ এখনও আছে। উহা এখন "ফরহাদ বক্স" নামে অভিহিত। নদীর উপরে নির্ম্মিত গৃহাংশ অনেক দিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে।

† "Travels in India a hundred years ago"

মার্টিন কি জন্য "কনষ্টান্সিয়া" মধ্যে নিজ সমাধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে একটি সরস কাহিনীর প্রচলন দেখা যায়। কথিত হইয়া থাকে যে প্রাসাদটী নবাবের বড় পছন্দ হইয়াছিল এবং তিনি উহা মার্টিনের নিকট হইতে কিনিতে চাহেন। নবাব উহার জন্য দেড় ক্রোর টাকা দিতে চাহিলেও মার্টিন কোন মতেই উহা বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার নিকট হইতে উহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সাহসী না হইয়া নবাব বলিলেন এককালে উহা তাঁহার করায়ত্ত হইবেই। নবাবের কথার অর্থ বুঝিয়া মার্টিন তাঁহার প্রতি-বিধানের উদ্দেশ্যে নিজ দেহান্তের পর অট্টালিকা মধ্যে সমাহিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জন্য উহা দান করিয়াছিলেন। বিধর্ম্মী খৃষ্টানের সমাধি ও দানের বস্তু পরিগ্রহণ করা মুসলমান নবাবের পক্ষে সম্ভব হইবে না এ কথা তিনি জানিতেন। কাহিনীটী বেশ মনোরম হইলেও সত্য নহে। মার্টিনের জীবদ্দশায় কনষ্টান্সিয়ার নির্ম্মাণ ব্যাপার সমাধা হয় নাই। তা ছাড়া টুইনিংয়ের লেখা হইতে প্রকাশ যে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দেই তিনি উহার মধ্যে নিজ সমাধির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং স্বল্পনির্ম্মিত প্রাসাদ দেখিয়া নবাবের মুগ্ধ হওয়া অথবা মার্টিনের তাঁহাকে ফাঁকি দিবার কথা সত্য হইতে পারে না। কাহিনী মধ্যে সত্য যদি কিছু থাকে তাহা "কনষ্টান্সিয়া" নহে, নগর মধ্যে অবস্থিত মার্টিনের বাসগৃহ "ফরহাদ-বক্স" সম্বন্ধে তাহা প্রযুজ্য। মার্টিনের মৃত্যুর পর সাদাৎ আলি এই বাড়ীটী কিনিয়াছিলেন।

সিপাহীবিদ্রোহ কালে গুলিগোলাতে কনষ্টান্সিয়ার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। বিদ্রোহীগণ অথবা নগরের বদমায়েসের দল গুপ্তধনের লোভে মার্টিনের সমাধি উন্মোচনপূর্ব্বক তাঁহার দেহাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধাবসানে লক্ষ্ণৌয়ের কমিশনার কর্ণেল এবট খণ্ডসমূহ যতখানি সম্ভব সংগ্রহ করিয়া পুনঃসমাহিত করিয়াছিলেন। 'কনষ্টান্সিয়া' ভবনে এক্ষণে "লা মার্টিনিয়ার" কলেজ অবস্থিত। এখানে প্রতিষ্ঠাতা মহাশয়ের বহু স্মৃতিচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত দেখা যায়। প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যু তারিখে মহাসমারোহে তাঁহার স্মারক শোক-প্রকাশ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সৌধভবনটীর পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে মার্টিনের নিজস্ব।

শিল্পবিদ্যাতে মার্টিনের প্রগাঢ় অনুরাগের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"কর্ণেল মার্টিন এমন একটী লোক যাঁহাকে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক বলা যায়। সম্পূর্ণভাবে নিজ পরিশ্রমলব্ধ অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হইলেও ঘড়িনির্ম্মাণ অথবা বন্দুক-মিস্ত্রির কার্য্য প্রভৃতিতে তিনি যে ভাবে পরিশ্রম করেন যে দেখিলেই মনে হয় বুঝিবা উহাই তাঁহার জীবিকা। লক্ষ্ণৌ সহরে তিনি একটি সুদৃঢ় মনোরম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার যাহা কিছু সবই তাঁহার নির্ম্মিত। ইহাতে কড়ি অথবা গোলাকৃতি ছাদ কিছুই নাই। বাড়ীটী এরূপভাবে নির্ম্মিত যে আবশ্যক হইলে একজন লোক বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইহা রক্ষা করিতে পারে। * * * * * লক্ষ্ণৌ নগরে তাঁহার কারখানায় তিনি যে সকল বন্দুক পিস্তল নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তাহা কলকব্জা ও নল সকল বিষয়েই ইউরোপ হইতে আমদানী অস্ত্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সার এলাইজা ইম্পে ইউরোপ যাত্রাকালে এক জোড়া পিস্তল লইয়া গিয়াছেন।" * সুধু বন্দুক পিস্তল কেন, মার্টিন তাঁহার কারখানায় সুবৃহৎ তোপ ও বড় বড় ঘণ্টাও ঢালাই করিতেন। লা মার্টিনিয়ার কলেজে তাঁহার ঢালাই করা কামান ও ঘণ্টা রক্ষিত আছে। যাঁহারা লক্ষ্ণৌ সহরে গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লা মার্টিনিয়ার কলেজ দেখিয়া থাকিবেন। এ দেশে সর্ব্বপ্রথম বেলুন বা ফানুষ মার্টিনই উড়াইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ১৭৮২ সালে ফরাসী দেশে মন্তগলফিয়ে ভ্রাতৃযুগল কর্ত্তৃক গরম হাওয়া-ভরা ফানুষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল সে কথা অনেকেই অবগত আছেন। তাহার তিন বৎসর পরে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মার্টিন লক্ষ্ণৌয়ে ফানুষ উড়ান। ঐ দৃশ্যে নবাব ও সাহজাদা উভয়েই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কথিত আছে নবাব তাঁহাকে কুড়ি জন আরোহী-বহনোযোগী সুবৃহৎ একটি ব্যোম-

* বুৎকরিয়েৎ অনুবাদক মসিয়ে রেমণ্ড বা হাজি মুস্তাফা; vol. II, p. 185.

যান নির্ম্মাণে আদেশ দিয়াছিলেন। মার্টিন তাহাতে বলেন যে সে কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে কিছু মাত্র কঠিন না হইলেও আরোহীগণের প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে। তাহাতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন সে জন্ম তাঁহার ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই! লেখাপড়ায় মার্টিনের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতায় প্রকাশ্য নীলামে তাঁহার সমুদয় অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছিল। বিক্রেয় দ্রব্যের তালিকায় দেখা যায় যে লাটিন, ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় লিখিত চারি হাজারেরও অধিক পুস্তক, বহুসংখ্যক হস্তলিখিত ফারসী ও সংস্কৃত পুঁথি; প্রসিদ্ধনামা শিল্পীগণের অঙ্কিত প্রায় দুই শত তৈলচিত্র এবং বহুসংখ্যক মোগল ও রাজপুত চিত্র তাঁহার সংগ্রহ মধ্যে ছিল।

১লা জানুয়ারী ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ দরবারের তাৎকালীন ইংরাজ রেসিডেণ্ট কর্ণেল উইলিয়ম স্কট, কাপ্তেন ডেভিড লামসডেন এবং সার্জ্জন জন রীডের সমক্ষে মার্টিন নিজ উইলে স্বাক্ষর করেন। দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। উহার কয়েক মাস পরে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। নানা কারণে মার্টিনের উইলটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী ভাষায় বিশেষ দখল না থাকা সত্ত্বেও তিনি যে ঐ ভাষায় উইল রচনা করিয়াছিলেন তাহার কারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ নহে। কোম্পানীর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া এবং তাঁহাদের আশ্রিত রাজ্য মধ্যে অর্থার্জ্জন করিয়া প্রধানতঃ ইংরাজদের অথবা ঐ রাজ্য মধ্যে সৎকার্য্যে অর্থরাশি দানকালে তিনি ইংরাজী ভাষাতে উইল লেখা বাঞ্ছনীয় বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাষা ইংরাজী হয় নাই, বরং উহাকে ফরাসী-ইংরাজী বলা যাইতে পারে। মার্টিনের উইল হইতে তাঁহার পরিজনবর্গ, তাঁহার ধর্ম্মমত বিশ্বাস, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী ইত্যাদি অনেক কথা জানা যায়। এখানে উইলের সকল ধারা সম্বন্ধে বলিবার স্থান নাই; মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ সামান্য কিছু বলা যাইতে পারে। মার্টিন প্রথম ধারায় নিজ ক্রীতদাসদাসী, খোজা পরিচারকবর্গকে স্বাধীনতা দিয়া সকলকার জন্ম যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাহাকেও নগদ অর্থ, কাহাকেও যাবজ্জীবন পেন্সন, পরম বিশ্বস্ত পরিচারকমণ্ডলীকে বংশানুক্রমে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। এখনও উহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণকে তাঁহার প্রদত্ত বৃত্তিভোগ করিতে দেখা যায়। তাঁহার স্বদেশে অবস্থিত আত্মীয়কুটুম্বগণকে, এমন কি নিতান্ত দূরসম্পর্কিত ব্যক্তিগণ যাহাদের তিনি কখন চোখেও দেখেন নাই তাহাদেরও, তিনি সুপ্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা ও চন্দননগরে হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টান জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দীনদুঃখীদের সাহায্য জন্ম তিনি দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই টাকা এডমিনিষ্ট্রেটর-জেনারেল অব বেঙ্গল অফিসে জমা আছে। চন্দননগরের গির্জ্জায় যখন যিনি পাদ্রি থাকেন তখন তিনি উল্লিখিত টাকার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদ ঐ অফিস হইতে পাইয়া থাকেন এবং গীর্জ্জার সামনে প্রতি রবিবার দীনদরিদ্রদিগকে উহা দান করা হইয়া থাকে। গীর্জ্জার দেওয়ালে এক প্রস্তরফলকে ঐ দানের কথা লেখা আছে। চন্দননগরে Rue General Martin নামে একটি রাজপথ আছে। লিয়ঁনগরেও অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত চারি সহরেই দেনার দায়ে অথবা অর্থদণ্ডপ্রদানে অক্ষমতা জন্ম কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণের মুক্তিকল্পে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। এই সকল বিভিন্ন দানের পর সঞ্চিত অর্থের প্রধানাংশ মার্টিন লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা ও লিয়ঁনগরে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বালকবালিকাগণের জন্ম শিক্ষা-নিকেতন প্রতিষ্ঠার জন্ম দান করেন। বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠাতার নামে "লা মার্টিনিয়ার" নামে পরিচিত। তন্মধ্যে লক্ষ্ণৌয়ের বিদ্যালয়টিই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার "কনষ্টা-ন্সিয়া"-ভবনে মার্টিন উহা প্রতিষ্ঠিত হইবার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কলিকাতার "লা মার্টিনিয়ার" ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। লিয়ঁনগরের বিদ্যালয়টিতে কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়। তথায় অপরাপর স্কুলের অভাব না থাকায় মার্টিন ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মার্টিনের উইল লইয়া বহু গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। The Mayor of Lyons V. The East India

Company* এবং The Mayor of Lyons V. The Advocate-General of Bengal † নামে তাঁহার উইল-ঘটিত মোকদ্দমা আইনজীবীগণের নিকট সুপরিচিত। অবশ্য তাঁহারা আইনের কূটপ্রশ্ন লইয়া সন্তুষ্ট, ক্লদ মার্টিনের ইতিহাস জানিবার জন্য ব্যস্ত নহেন। এই দুই মোকদ্দমার বিবরণ কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাবেন। উহাতে মার্টিনের উইলের অনেকাংশ এবং তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা-ভগিনীগণের অনেকের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। মামলা মোকদ্দমার ফল এক হিসাবে ভালই হইয়াছিল বলিতে হয়, কারণ দীর্ঘকাল ধরিয়া মূলধন সুদে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে দাতার উদ্দেশ্য সুচারুভাবে সাধন করা সম্ভব হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরাতন সংবাদ-পত্র হইতে অনেক প্রাচীন তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহ হইতে তৎকালীন ভাষার নমুনারূপে ৪ঠা এপ্রিল ১৮২৯ বা ২৩শে চৈত্র ১২৩৫ সালের "সমাচারদর্পণ" প্রকাশিত নিবন্ধের কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল,—"৬০।৭০ বৎসর হইল জেনরল মার্টিন নামক এক ব্যক্তি আট টাকা করিয়া বেতন পাইয়া সিপাহীর বেশে এদেশে আইল তাহার কিছু ধন কিম্বা কৌলিন্য ছিল না। কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ছিল কোন যোগে তিনি নীচের সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে একটু জো পাইয়া তিনি টাকা কুড়াইতে লাগিলেন কিছুকালের পর তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার টাকার রাশি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত উদ্যোগ করত তিনি ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলেন। অপর লক্ষ্ণৌর নিকটস্থ আপন উদ্যানে রাজবাটীর ন্যায় বড় এক কবর গ্রন্থন করাইলেন এবং তিনি এখন সেখানে শায়িত আছেন মরণের পূর্ব্বে তিনি এক দানপত্র লিখিয়া যান তাহাতে তিনি নানা ধর্ম্মার্থে কতক ধন ফ্রান্সদেশে আপন জন্মস্থানের দরিদ্র লোককে দিয়াছেন এবং তিনি আরো এই হুকুম করেন যে কলিকাতার মধ্যে আট লক্ষ ব্যয় করিয়া বিনা মূল্যে বিদ্যার্থিরদের পাঠার্থে এক পাঠশালা স্থাপিত হয় অপর সেই দানপত্র ও সেই টাকা কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে আসিয়া মগ্ন হইল এবং তদ্বিষয়ে সুতরাং নানাপ্রকার বাদানুবাদ উপস্থিত হইল অদ্যাবধি সেই বাদানুবাদ মিটে নাই এখন আমরা শুনিতেছি যে কোন কোন উকীল কহেন যে তাঁহার দানপত্র করণের শক্তি ছিল না যেহেতুক তাঁহারা কহেন যে তিনি মুসলমানের রাজ্যের মধ্যে মরেন অতএব যেস্থানে তিনি মরিলেন সেই স্থানের রীত্যনুসারে তাঁহার মরণের পর সেই টাকা বিতরণ করা যাইবে। আমরা ইহার পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে ঐ সঙ্গে দেশস্থ একব্যক্তি কহিয়াছে যে যতলোক আস্তাবলে জন্মে তাহারা ঘোড়া কিন্তু আমরা ইহার পূর্ব্বে কখন শুনি নাই যে মুসলমানের রাজ্যে যত লোক মরে তাহারা তন্নিমিত্তে মুসলমান জেনরল মার্টিন সাহেব ফ্রান্সদেশে জন্মেন ইংলণ্ডের অধিকারে টাকা সঞ্চয় করেন এবং মুসলমানের অধিকারে মরেন অতএব ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে তিন জাতির মধ্যে কোন জাতির ব্যবস্থানুসারে তাহার দানপত্র করিলে সিদ্ধ হয়।"

ইহার পর পুনর্ব্বার ৩০শে চৈত্র তারিখে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—"আমরা শুনিতেছি যে তাহার (মার্টিনের দান পত্রের) নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং তিনি যে পাঠশালার কারণ টাকা দান করিয়া মরেন সেই পাঠশালা সম্প্রতি স্থাপিত হইবে। গত ১২ই মার্চ্চ তারিখে সুপ্রিমকোর্টের জজ-সাহেবরা তাহা আপনারদের ডিক্রী ক্রমে স্থাপন করিতে হুকুম করিলেন অতএব ৪ এপ্রিল তারিখে সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত জর্জ্জ মণিসাহেব এই ইশতেহার দিয়াছেন যে চৌরঙ্গীর যাইট বাজারের যে ভূমি ক্রীত হইয়াছে তাহাতে ত্রিশজন বালক ও ত্রিশজন বালিকা ও একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষাকারিণী ও চাকর প্রভৃতির বাসের নিমিত্তে এক গৃহ গ্রন্থনের বরাওর্দ্দ করিবেন সেই গৃহ প্রভৃতি ১৮৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহাতে এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না। অতএব এতকালের পর জেনারল মার্টিন সাহেবের ইষ্টসিদ্ধি হইবে।" *

মার্টিন যে শুধু মৃত্যুকালে দান করিয়াছিলেন তাহা নহে, জীবদ্দশাতেও বহু বিভিন্ন সদনুষ্ঠানে তিনি প্রচুর অর্থ দান করিতেন। প্রধানতঃ অনাথালয়, বিদ্যালয়গুলিই তাঁহার নিকট সাহায্য লাভ করিত। তিনি বহুসংখ্যক পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্ত অনাথ বালকবালিকার সকল ভার লইয়াছিলেন। এমন কি একজনকে উচ্চশিক্ষার্থ স্বব্যয়ে ইংলণ্ডেও প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিতান্ত শৈশবে মাতৃহীন এই বৃদ্ধ বিদেশী সমরব্যবসায়ীর পক্ষে, যিনি ষোড়শবর্ষ বয়সের পর নিজ পিতাকে আর দেখেন নাই অথবা যাঁহার নিজ কোন পুত্রকন্যা ছিল না, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বালকবালিকাগণের শিক্ষাকল্পে নিজ সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থের লক্ষ লক্ষ টাকা দান কত উদারতা ও মহানুভবতার পরিচায়ক তাহা না বলিলেও চলে। তাঁহার জন্য কত সহস্র সহস্র ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে আজ কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* 1 Moore's Indian Appeals, p. 175.

† 3 Indian Appeals, p. 32; I Cal. p. 303.

* "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ১ম খণ্ড, পৃঃ৩০-৩২।

ওভার ডোজ্

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ

১

সন্ধ্যাবেলা বৈঠকখানার ঘরে তাপস বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল, প্রদ্যোত টেবিলের কোণায় পা তুলিয়া ধূমপান করিতে করিতে শুনিতেছিল।

টেবিলের উপর য়্যাশ্‌ট্রেটা শূন্য পড়িয়া। সিগারেট্ ছাড়িয়া ওরা ধরিয়াছে গড়গড়া। কিছুদিন হইল বসুমতীতে তামাকে নিকোটিনের অপকারিতা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই পরিবর্ত্তনটি সাধিত হইয়াছে।

তাপস আনে মিঠা তামাক, প্রদ্যোত তাহা ঢালিয়া ফেলিয়া অম্বুরী তামাক ভরে।

কৃত্রিম কোপ সহকারে তাপস বলে, "ড্যামেজ দাও। মাইনে পাই পঁচাত্তরটি টাকা, পাঁচ পয়সা বাজে খরচও ক্রিমিন্যাল।"

একমুখ নীল ধোঁয়া ধীরে সুস্থে ছাড়িতে ছাড়িতে প্রদ্যোত বলে, "তবু ত ফ্যামিলি নেই, থাক্‌লে বাড়ীতে টে কা যেত না।"

"তোমার কি, মাস গেলে দুশো টাকা বাক্সে তোল, ভাবনা চিন্তে ত আর নেই কিছুর।"

"তোমারই বা কি ভাবনা চিন্তে?"

"গরীবের ভাবনা কি আর বড়লোকে বোঝে!" বলিয়া তাপস অন্য কথা পাড়ে।

কিন্তু আজ ওরা মনোযোগ দিয়া ভূকম্পনে বিধ্বস্ত বিহারের অবস্থা অনুধাবন করিতেছিল। মুঙ্গের, মজঃফরপুর, সীতামারী, মতিহারী রুদ্রের পদচাপে গুঁড়াইয়া ধূলিসাৎ হইয়াছে, সমৃদ্ধ জনপদ আজ শবাকীর্ণ শ্মশান; শস্যক্ষেত্র বালুকাময় সাহারায় পরিণত হইয়াছে, মাটি ফাটিয়া গভীর গহ্বর মুখব্যাদন করিয়াছে। নিরাশ্রয় নরনারী উন্মুক্ত প্রান্তরে অনশনে বৃষ্টি ও করকাপাতে নিশাতিপাত করিতেছে। ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে প্রোথিতের আর্ত্তনাদ উঠিতেছে।

পড়িতে পড়িতে কাগজ রাখিয়া দিয়া তাপস বলে, "থাক্ গে, আর ও পড়া যায় না।"

আরেক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া প্রদ্যোত বলে, "পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এ সময়েই ঠিক্ বোঝা যায়। চোখের পলকে বিহার যে এ রকম বিধ্বস্ত হয়ে গেল—তা কেন গেল, এর উত্তর কোন্ খেতাবওয়ালা দিতে পারে? ভূতাত্ত্বিক গবেষণা করে বল্‌বে, পৃথিবীর গর্ভে অগ্নিপ্রবাহের ফলে ভূকম্পন ঘটে থাকে। কিন্তু জীবের বাসভূমি বসুন্ধরা গর্ভে অগ্নিধারণ কেন করেন? এই যে নিমেষের মধ্যে লক্ষ লোকের ধন জন প্রাণ গেল—এই অবর্ণনীয় দুঃখের সংঘটক হেতুটা কি? জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা বল্লেন, মকর রাশিতে সপ্তগ্রহের সঞ্চার হওয়ার ফলে পৃথিবীতে মহামারী, বন্যা, বাত্যা, ভূকম্পন, যুদ্ধ ইত্যাদি অশেষ দৈব দুর্ঘটনা ঘটবে। কিন্তু এই গ্রহগুলি স্বস্থানে অধিষ্ঠান না করে ষড়যন্ত্র করে সবাই মিলে মকর রাশিতে সমবেত হ'লেন কেন, এ কথার জবাব কে দিচ্ছে?"

তাপস বলে, "তোমার কথাগুলো কিন্তু কান্ত কবির মত হোল। সেই যে

"ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে,
"দেখ্‌বো সে উপাধি নিলে

*　*　*　*

ক'টা 'কেন'র জবাব শিখে।
চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বৃষ্টি মাগে,
চকোরে চায় চন্দ্রমাকে, কমল কেন চায় রবিকে।

*　*　*　*

কান্ত বলে আছে জেনো, কেন'র কেন তস্য কেন;
যাও নিখিল কেন'র মূল কারণে সে রেখেছে
—কালের খাতায় লিখে।"

টেবিলে টোকা মারিয়া প্রদ্যোত বলে, "জীবন এক দুজ্ঞের্য় প্রহেলিকা, সৃষ্টির বুকে সার দিয়ে চলেছি আমরা পিঁপড়ের দল। মাঝে মাঝে কালপুরুষের চমক ভাঙে, এক ফুঁয়ে আঙ্গাল দেয় শূন্যে উড়িয়ে।"

ছোটখাট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাপস বলে, "মীয়ার য়্যাটম্—তার বেশী আর কি আমরা। এই মুহূর্ত্তে আছি, পর মুহূর্ত্তে হয়ত থাক্‌ব না। এই গ্রিম্ রিয়ালিটিকে ঢাকি আমরা দম্ভের ধ্বজা উড়িয়ে।"

ওদের এই দার্শনিক বিচার ও মনের অন্তর্মুখী অবস্থা কতক্ষণ স্থায়ী হইত বলা যায় না, কিন্তু আশু ব্যাঘাত ঘটাইল ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আকস্মিক অভ্যুদয়।

লোকটি অচেনা এবং মাথায় পটি বাঁধা। কাহারও কথার অপেক্ষা না করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "আজকার রাতের মত আমাদের একটু আশ্রয় দিতে পারেন কি ?"

পেগাসাসের পিঠ হইতে দুই বন্ধু হঠাৎ পৃথিবীর কঠিন মাটির উপরে অবতীর্ণ হইল। প্রদ্যোত ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চাহিল, তাপস তাহার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ভদ্রলোক বলিলেন, "আমরা মুঙ্গের থেকে আস্‌ছি। আমার নিজের বাড়ী ছিল পাঁচখানা, আজ তার একখানা ইটও খাড়া নেই, পরিবার পরিজন তারি তলায় চাপা পড়ে মরেছে। আমার সঙ্গে আছে"—বলিয়া ভদ্রলোক পিছন ফিরিয়া তাকাইলেন।

কিন্তু যাহার তল্লাসে তাকাইলেন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া দুই পা পিছনে হটিয়া ডাকিলেন, "মাধুরী, এস মা, এখানে এস।"

প্রদ্যোত এবং তাপস বিস্মিত নয়নে দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সের একটি মেয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠা-বিজড়িত পদে দৃষ্টির অন্তরাল হইতে দৃষ্টির সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল। তন্বী তরুণী, সুডৌল সুশ্রী গঠন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, খঞ্জন-গঞ্জন চক্ষু, কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, মুখখানি মাধুরী-ললাম বলিয়া বাপ মা নাম রাখিয়াছিল মাধুরী।

মাধুরীকে দেখাইয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এর অবস্থাও আমারই মত। ছিল ওর সবই, আজ ওর কিছু নেই। ভূমিকম্পের দিন আমার মেয়ের কাছে ও এসেছিল—ওদের বাড়ী ওর মা বাপ ভাই বোন্‌দের কোনো চিহ্নই আর পাওয়া গেল না খুঁজে। ওর-ও পায়ে কাঁধে চোট লেগেছে, হাঁটতে পার্‌ছে না। আজকের রাতের মত যদি আশ্রয় পাই তবে কাল পি সি রায় কিম্বা রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে যেতে ইচ্ছা করি।

প্রদ্যোত একবার তাপসের মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু যে জন্য তাকায় তাহার কোনো হদিস পায় না। ও যেন কানেই শোনে নাই কিছু, এমন একটা নির্লিপ্ততার আভাস ওর মুখে জাগে।

সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝুঁকিটা নিজের কাঁধে নিয়া প্রদ্যোত বলে, "তা থাকতে পারেন। তবে আপনাদের কিছু অসুবিধা হবে, আমরা দুজনা মেসিং করে থাকি, মেয়ে-লোক কেউ নেই এখানে।"

ভদ্রলোক বলেন "ময়দানে গাছতলায় কাটিয়ে এসেছি তিন দিন, মেথর মুদ্দফরাসের সঙ্গে। সামাজিক ভব্যতা বিচারের কাল আমাদের নেই। রাত্তিরটার মত একটু মাথা গুঁজে পড়ে থাক্‌তে পার্‌লেই ধন্য হয়ে যাব।"

প্রদ্যোত ওয়েল্‌কাম্ কথাটার একটা সহজ বাঙ্গলা চলতি কথায় যা মানায়, খচ্ করিয়া কানে বেঁধে না—তাহার শব্দ-ভাণ্ডার খুঁজিয়া না পাইয়া সোজা বলিল, "আচ্ছা থাকুন। বসুন আপনারা, দেখি কি বন্দোবস্ত করতে পারি।"

প্রদ্যোত ও তাপস আগন্তুকদের বসিতে দিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

২

প্রদ্যোত বলিল, "বেশ লোক! আপৎ কালে মুখ দিয়ে তোমার একটি কথা বেরুল না! কাজেই দুর্গা বলে ঝুলে পড়লুম, যা থাকে শেষে কপালে!"

তাপস হাসে; বলে, "এতই ঘাব্‌ড়েছো ?"

উষ্মার সহিত প্রদ্যোত বলে, "ঘাব্‌ড়াবো না? দু দুজন অচেনা লোককে ঘরে ঠাঁই দেওয়া কি মুখের কথা! কত রকম হাজামা হুজ্জুৎ পোয়াতে হতে পারে।"

"বিধ্বস্ত বিহারের জন্য এত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে এতক্ষণ, গাঁটের কড়ি না হয় খসালেই দু'টো! ব্যাঙ্কে এ মাসে দু'টাকা কমই জমা হয় যদি কী আস্‌বে যাবে তোমার তাতে?"

"পেয়েছো ঐ এক কথা, ব্যাঙ্কের খাতা! আরে ষ্টুপিড্, এইটে দেখছো না যে সঙ্গে আবার একটি মেয়ে রয়েছে। ওকে নিয়ে একটা অঘটন হবে না? বাড়ীতে কোনো মেয়ে-লোক নেই, প্রয়োজনের খাতিরে ওকে কোনো কথা বল্‌তে বাধবে, আবার কিছু না বল্লেও হয় ত ভদ্রতার হানি হবে।"

"একটা রাত্রির ওয়াস্তা, তার জন্যে এত ভাবনা!" বলিয়া তাপস হাই তোলে।

প্রদ্যোত বলে, "শুধু তাই না কি! শেষ মাস খরচা আছে হাতে মুখজোখা। অথচ—এ রকম বিপদে পড়ে এসেছে, না-ই বা কি করে বলা যায়! আচ্ছা ল্যাঠায় পড়া গেল যা হোক্।"

"তুমি সব খরচা দিতে যাবে কেন? কো-শেয়ারার যখন, তখন আধা খরচা ত আমার। তোমার হাতে খরচা না থাকে, আমিই চালিয়ে নেব।"

"তা যেন চালালে। কিন্তু এসব স্থলে ক্যাল্‌কুলেশন্ মত সব চলে না। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে যে রকম ঘায়েল দেখা যাচ্ছে, তাতে কাল যে হেঁটে চলে অন্যত্র যেতে পার্কে তা মনে হচ্ছে না। আবার মেয়েটা ত খোঁড়াচ্ছেই, হাতও রয়েছে ওর ঝুলানো। রাত পোয়াতেই ডাকো ডাক্তার, আনো ওষুধ, ছোটো এখানে ছোটো সেখানে—যত রকমের হাঙ্গামা জুটবে। উদিকে আফিসে দশটায় হাজিরে চাই। আমাদের ইন্‌স্‌পেক্টার আবার কাল আস্‌বেন,—আফিস শুদ্ধ লোক তটস্থ হয়ে আছে, দু-মিনিট এদিক ওদিক হয় যদি চোখরাঙানি দেখতে হবে, নয়ত "Services required no longer" চিঠি আস্‌বে।"

"রাখো ওসব বাজে চিন্তা। তোমার কাজ থাকে তুমি যেয়ো। আমার ইন্‌স্‌পেক্টার ত আসছেন না—কালকার দিন ছুটি নেব এখন। যা কিছু কর্ত্তে হয় করা যাবে। তা বলে একজন ভদ্রলোক এ অবস্থায় দ্বারস্থ হলে চামারের মত তাকে বলা যায় না এখানে হবে না মশাই অন্যত্র যান্। ওরা যদি কাল হেঁটে চলে না-ই যেতে পারে, আমি ওদের বাস্‌এ চড়িয়ে পি সি রায়ের কাছে নয়ত কোনো সমিতি টমিতিতে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব—কথা দিচ্ছি।"

"তুমি যদি দায় নেও তবে হতে পারে বটে। এখন এরা শোবে কে কোথায়?"

"তুমি আর আমি বাইরের ঘরে মাটিতে শোব এখন। ওরা আমাদের ঘরে শুতে পার্ব্বে।"

"প্রকাশটা এবেলা এসেছে ত কাজে?"

"সম্ভবত না। রান্নাঘরের দিক্ থেকে কোনও আওয়াজই ত আস্‌ছে না।"

"এই স্থাখ আরেক হাঙ্গামায় পড়া গেল! প্রকাশ না এসে থাক্‌লে খাওয়া দাওয়ার কি হবে?"

"কি আর হবে, আমাদের আছে পাঞ্জাবী দোকান, মাংস চাপাটি আনা যাবে; আর আছে পাইস্ হোটেল,—রুচি বুঝে যে যা খায় তার ব্যবস্থা হবে। আমাদের কোশেয়ারার হয় যদি—তবে ত রাস্তার মোড়ও ছাড়াতে হবে না। নেহাৎ বার্লি সাগু খায় যদি কেউ—ষ্টোভ আছে।"

পরামর্শ ঠিক্ করিয়া দুজনে নামিয়া আসিল। মাধুরী দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া প্রস্তর প্রতিমার মত বসিয়াছিল। ভদ্রলোক হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া কোঁকাইতেছিলেন।

প্রদ্যোত গলা খাঁক্‌রাইয়া বলিল, "আসুন আপনাদের শোবার জায়গা দেখিয়ে দি। একটু বিশ্রাম করুন এখন, পরে খাওয়া দাওয়া হবে। রাতে ভাত খান কি? রুটি চাপাটিও খেতে পারেন ইচ্ছা কর্লে। দুধ ত সেই সকাল বেলা ছাড়া পাওয়া যাবে না।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "না না, আমাদের জন্য আপনাদের এত ব্যস্ত হতে হবে না। তিন দিন ধরে উপোসী আছি, হঠাৎ ভাত খেলে অসুখ হতে পারে। একটু বার্লি কার্লি কিছু থাকে আমায় দেবেন, মাধুরীকে অল্প চারটি ভাত দেবেন—ছেলেমানুষ কত আর না খেয়ে থাক্‌বে। বেশী কিছু দেবেন না। (মাধুরীর দিকে ফিরিয়া) এস মা এস, শুয়ে একটু জিরুবে চল। মালগাড়ীতে গাদা-বন্দী হয়ে এসেছি—তার আগে সারারাত মাঠে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজেছি—হাড়গোড় আস্ত নেই শরীরের।"

মাধুরী কিছু না কহিয়া উঠিয়া প্রদ্যোতের অনুগমন করিল। প্রদ্যোত তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল। বাতি জ্বালিয়া বন্ধ জানালাগুলি দিল খুলিয়া। বিছানার উপর হইতে বেড্-কভারটা তুলিয়া নিল, ড্রেসিং টেবিল হইতে হাত ঘড়ি, দেশলাই, সিগার কেস্ ও ব্রাশটা পকেটে ভরিল, তাহার পর বলিল, "এখন শুয়ে থাকুন, খাবার তৈরি হ'লে ডাক দেব। মুখ টুখ ধোন্ যদি পেছনে বাথ্‌রুম আছে। কিছু ঘাবড়াবেন না, কোনো ভয় নেই আপনার।"

প্রদ্যোত কপাট ভিড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বেলা আটটার আগে প্রদ্যোতের ঘুম ভাঙ্গে না। তাপস ওঠে সূর্য্যোদয়ের আগে। ছাদের উপর জিম্‌ন্যাষ্টিক করে, মুগুর ভাঁজে। কিছুক্ষণ বায়ুসেবন করে, তাহার পর প্রাতরাশ নিষ্পন্ন করে।

তাপস এগুলি বাদ দিয়া গেল অতিথির তত্ত্বাবধান করিতে। ভদ্রলোক ওঠেন নাই, কিন্তু কোঁকানি শোনা গেল দরজার বাহির হইতেই। চৌকাঠের কাছ হইতে মাথা বাড়াইয়া তাপস জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুম ভেঙেছে আপনার?"

"হুঁ" বলিয়া ভদ্রলোক উঠিতে গেলেন, কিন্তু উঠিতে পারিলেন না।

তাপস জানালা দরজা সব খুলিয়া দিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মুখ ধোবেন ত এখন? চা খান্ বোধ হয়? কিন্তু—আপনার জ্বর হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে যেন!"

তাপস কপালে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, "বেশ জ্বর হয়েছে ত। বেদনা বেড়েছে?"

বুকে হাত দিয়া ভদ্রলোক বলিল, "খানিকটা। বুড়ো শরীর, সারা রাত জলে ভিজেছি—জ্বর ত হবেই। মরে গেলেই বেঁচে যেতুম—...ভগবান বাঁচিয়ে মেরেছেন। মাধুরী কেমন আছে জানি নে। ও আমার মেয়ের সই। সেও এতবড়টি ছিল।" ভদ্রলোক বুকভাঙ্গা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

"দেখে আসছি কেমন আছেন" বলিয়া তাপস বারান্দা ঘুরিয়া পাশের ঘরের দিকে গেল।

মাধুরী উঠিয়া বসিয়া ছিল। দরজা যে নিজেই খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাপস অর্দ্ধেক ঘরে ও অর্দ্ধেক বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ভাল আছেন ত? ওঁর ত জ্বর হয়েছে।"

মাধুরী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র, কিছু বলিল না।

তাপস বলিল, "ভাবনা করবেন না। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরটা হয়েছে, ওষুধ পত্র দিলেই সেরে যাবে। তবে উনি ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাদের এখানে থাকা দরকার।"

মাধুরী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, এক রাত্রির আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া দীর্ঘকালের জন্য হয়ত তাহাদিগকে ইঁহাদের কৃপাশ্রিত হইয়া থাকিতে হইবে। ইঁহারা হয়ত মনে করিবেন জানিয়া শুনিয়াই তাহারা এক রাত্রির ছুতা করিয়াছে!

মাধুরী মাথা হেঁট করিয়া থাকে। খাটের দিকে চাহিয়া তাপস বলে, "একি, রাত্রে শোন্ নি আপনি? বিছানা যেমন তেমনি রয়েছে যে!"

মাধুরী মাথা কাৎ করিয়া জানাইল যে, সে শুইয়াছিল।

তাপস ঘরের চারিদিকে চাহিয়া অন্যত্র বিছানার কোথাও কিছু দেখিল না। বলিল, "মাটিতে শুয়েছিলেন?"

মাধুরী আবার মাথা কাৎ করিল।

"এ আপনি ভারি অন্যায় কোরেছেন। এ অবস্থায় মাটিতে শোয়া উচিত কাজ হয় নি। আপনারও জ্বর হ'তে পারে এতে।"

এবার মাধুরী উত্তর দিল; বলিল, "বিছানায় শুলে আপনাদের বিছানা নষ্ট হোত। এম্‌নিতেই—"

বাকি কথাটা বলিল না।

তাপস অন্য দিকে চাহিয়া কথা বলিতেছিল, মাধুরীর এ কথায় মাধুরীর দিকে তাকাইল।

ও যা বলিল তাহা সত্য বটে। কাপড় জামা ওর ময়লা, রক্তলিপ্ত, খানিকটা ছেঁড়াও। এখানে সেখানে এখনো কাদা লাগিয়া আছে। এ কাপড়ে পালঙ্কে শয়ন করিতে দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক।

হাতের ব্যাণ্ডেজএর দিকে লক্ষ্য করিয়া তাপস কহিল, "খুব বেশী চোট পেয়েছিলেন কি?"

"একটা থামের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলাম।" মাধুরী সংক্ষেপে উত্তর দিল।

তাপস ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এখানে ত সাহায্য কর্ব্বার আর কেউ নেই,—ব্যাণ্ডেজ্‌টা খুলে ওষুধ পত্র কিছু দিলে ভাল হোত। আপত্তি না করেন যদি—"

বাকি কথাটা তাপসেরও ঘুলাইয়া গেল।

মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতে যাওয়া কি ফ্যাসাদ! কেবলই ভয় হয় এই বুঝি কি বেঠিক্ হইয়া গেল। এর চেয়ে পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দেওয়াও সোজা। এ না যায় এগুনো, না যায় পেছুনো!

শেষের দিকে সাম্‌লাইয়া লইয়া তাপস বলিল, "আমি গরম জল নিয়ে আস্‌ছি।"

খানিক পরে তাপস বোরিক্ কটন্, বেন্‌জয়েন, একটা তোয়ালে ইত্যাদি লইয়া আসিয়া ব্যাণ্ডেজ্ খুলিতে বসিল।

বাঁধন খুলিতে খুলিতে তাপস জিজ্ঞাসা করে, "উনি আপনার কে হন্।"

"হন্ না কেউ; বাবার আলাপি লোক।"

"নাম কি ওঁর?"

"গোকুল গাঙ্গুলী।"

"আপনারাও কি ব্রাহ্মণ?"

"না, আমার বাবার নাম ৺সমরেন্দ্র সরকার।"

"কন্‌ট্র্যাক্টর ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"শ্রীনগর বাড়ী?"

"হ্যাঁ। আপনি চিন্‌তেন?"

"ঠিক্ চিন্‌তুম যে তা নয়। নাম শুনেছি।"

"এখন আপনারা কোথায় যাবেন?"

শ্যামলা মেয়েটীর মুখে অসীম দুঃখের ছায়া ফুটিয়া ওঠে, পুকুরের কালো জলে কালো মেঘের ছায়ার মত। ধীরে ধীরে বলে, "জানি নে।"

"দেশে কে আছে আপনাদের?"

"এক জ্যেঠা আছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মাম্‌লা চল্‌ছিল বাবার।"

হতাশ হইয়া তাপস বলিয়া ওঠে, "I see!"

ব্যাণ্ডেজ্ খোলা হইয়া যায়। তাপস গরম জলে বোরিক তুলা ভিজাইয়া স্ফীত ক্ষত স্থানে সেঁক দেয়। বলে, "হাড় ভেঙেছে কিনা তা ত আমি বল্‌তে পারব না। শুধু মাস্‌ল্ যদি থেঁৎলে গিয়ে থাকে, এতেই খানিকটা উপকার পাবেন।"

সেঁকের শেষে বেন্‌জয়েন দিয়া তাপস নূতন ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দেয়; বলে, "এখন চা টা খেয়ে নিন্ পরে দেখা যাবে কি করা যায়।"

তাপস বাহির হইয়া গিয়া এক জোড়া ধোলাই ধুতি ও এক জোড়া সাড়ী, এক জোড়া সেমিজ ও একটা ব্লাউস্ কিনিয়া আনে।

সিঁড়ীর মুখে প্রদ্যোতের সঙ্গে দেখা হয়। প্রদ্যোত জিজ্ঞাসা করে, "কি কিন্‌লে?"

"ওদের জন্য কিছু কাপড়। মেয়েটির কাপড় নোংরা ব'লে ভয়ে সে তোমার বিছানায় শোয় নি, মাটিতে শুয়ে কাটিয়েছে।"

"বটে? কাপড়-চোপড়ের কথা কারুর মাথায় ত তখন আসে নি। কেই বা তখন ওর দিকে চেয়ে দেখেছে!"

দুজনে এসে ঘরে বসে। প্রদ্যোত বলে, "দেখি কি এনেছো। প্রকাশ বল্লে ঘাটা ধুইয়ে ব্যাণ্ডেজ্‌ও করে দিয়েছো। আমার কি যে বদভ্যাস, সাড়ে সাতটার আগে ঘুমই ভাঙে না।"

জীবনে প্রথম প্রদ্যোত দেরীতে ওঠার জন্য পরিতাপ করিল। সে যখন ঘুমাইতেছিল, তাপস তখন উঠিয়া ইহাদের সেবা-পরিচর্য্যাদি ত করিয়াছে-ই, তাহার উপর আবার তাহাদের প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়ও সব কিনিয়া আনিয়াছে। বড় হুড়াহুড়ি করিয়া কাজ করে। দুমিনিট পরে করিলে কী এমন ভেস্তাইয়া যাইত; এক বাড়ীতে দুজন যেখানে এক পোজিশনে আছে, সেখানে একজন যদি আতিথেয়তার চূড়ান্ত করে এবং আরেকজন বেলা আটটা পর্য্যন্ত নাক ডাকাইয়া ঘুম দেয় তবে তাহাকে লোকে কী মনে করে?

মনের উষ্মায় প্রদ্যোত ভুলিয়া গেল যে গোকুলবাবু ও মাধুরীকে নিতান্ত অনিচ্ছায় সে স্থান দান করিয়াছিল, গত রাত্রিতে শয়ন করিতে যাওয়ার পূর্ব্বেও এই দুজন

অবাঞ্ছিত অতিথিকে লইয়া তাহার ভাবনার ও বিরক্তির সীমা ছিল না।

মনের অসন্তোষ চাপিয়া প্রদ্যোত তাপসের ক্রীত জিনিষগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, "তা ভালই কোরেছো এ গুলো কিনে।"

তাপস একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "গোকুলবাবুর ত জ্বর হয়েছে—আজই কি দিয়ে আসব ওদের পি সি রায়ের কাছে?"

প্রদ্যোত এবার ফাটিয়া পড়িল—বলিল, "কী যে বল তুমি? জ্বর শুদ্ধ, ভদ্রলোককে সেখানে দিয়ে আসব, তারা আমাদের কী বলবে বল ত! সায়েন্স কলেজে পি সি রায়ের কাছে পড়েছি এই সেদিন পর্য্যন্ত, গাল যখন দেবেন, তখন একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পার্ব্ব না। জ্বর হয়েছে ভদ্রলোকের—সেপ্‌টিক্ হ'বার পর্য্যন্ত চান্স আছে—এ সময় কুকুর বেড়ালের মত পার করে কোনো ভদ্রলোকে দিতে পারে? সব কাজেই তোমার তড়্‌বড়ি! আফিস যাওয়ার পথে আমি ভুবন বাগ্‌চিকে পাঠিয়ে দেব, ওঁদের দেখে যাবে এখন।"

তাপস অপ্রস্তুতভাবে উত্তর দেয়, "কাল তুমি বলছিলে কিনা ইয়ে কর্ত্তে—তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লু'ম।"

প্রদ্যোত বলে "কাল যা বলেছি, আজও তাই বলব এমন কি কথা আছে?"

৩

সন্ধ্যার পরে ঘরে বসিয়া গল্প করিতে করিতে তাপস বলিল, "একটা ইন্‌টারেষ্টিং নিউজ্ আছে।"

প্রদ্যোত খবরের কাগজ পড়িতেছিল, কাগজখানা নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

"এই মেয়েটি কে জান?"

"কে, শুনি?"

"সমরেন্দ্র সরকারের মেয়ে।"

"সমরেন্দ্র সরকার? চিনি বলে ত মনে হচ্ছে না!"

"মুঙ্গেরে যিনি কন্‌ট্রাক্টর ছিলেন এবং যাঁর কন্যার সঙ্গে তোমার উদ্বাহ সম্বন্ধ এসেছিল একবার।"

প্রদ্যোত লাফাইয়া উঠিয়া বলে—"বল কি, এই সেই মেয়ে?"

"আজ্ঞে মশায়। কালো বলে প্রত্যাখ্যান কোরেছিলেন।"

"কি অকোয়ার্ড অবস্থা! ওরা আমায় চিনেছে?"

"আজ না চিন্‌লেও কাল চিন্‌বে নিশ্চয়। নাম ত আর ছাপাতে পার্ব্বে না।"

"এই দ্যাখো আরেক ফ্যাঁসাদে পড়া গেল!"

"মেয়েটি শ্যামবর্ণ, কিন্তু দেখ্‌তে মন্দ নয় ত! চেহারায় লাবণ্য আছে, চোখ দুটি সুন্দর। ওকে নিলে যে ঠক্‌তে বিশেষ তা কিন্তু মনে হয় না।"

"আমি কিন্তু স্রেফ্ ভুলে গেছি হে! বিয়ের সম্বন্ধ কত আসে কত যায় কে আর তা মনে রাখে? ট্রেণে যেতে ছোট ছোট ষ্টেশনগুলোর মত তাদের নাম ধাম চোখে পড়্‌তে পড়্‌তেই যায় মিলিয়ে। তা ওরা না-ও জান্‌তে পারে এ কথাটা। কি বল? তুমি ত বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছো এর ভিতরে, কি কথা হয় ওর সঙ্গে?"

"বিশেষ কিছুই না। যা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দেয়। নিজের থেকে কিছুই বলে না। শোকাচ্ছন্ন অবস্থা। খাওয়াতে হয় খোসামুদী করে। এ সময় ওর ও কথা খেয়াল না থাকতেও পারে।"

প্রদ্যোত আশ্বস্ত হয়। ওর একটু অনবধানতায় তাপস এমনিতেই খানিকটা জিতিয়া গিয়াছে, এখন যদি মাধুরী এই পূর্ব্বকথার জের টানে তবে সোনায় সোহাগা মিশিবে। তাপস কি রকম সহজে আলাপ করিয়া লইয়াছে! সেও আলাপের চেষ্টা করে কিন্তু পথ পায় না। কেমন আছেন, এই জিজ্ঞাসাটা ত দিনের মধ্যে পাঁচবার করা যায় না! যা কিছু ওদের করা দরকার, তাহার আগে তাপস তাহা করে, সে মাথা গলায় কোন্‌খান্ দিয়া! প্রথম দিন অচেনাকে অনবধানে সে কি বলিয়াছিল, তাহা ধরিয়া বসিয়া থাকার তাহার কি দরকার? কি আহম্মক এই তাপসটা! একটা কথার সুযোগ লইয়া ও চায় ওদের মনোপলাইজ্ করিয়া নিতে! কিন্তু সে-ই বা তাহার হুকুমে হটিয়া যাইবে কেন! "এল যে এল আমার আগল টুটে খোলা দ্বার দিয়ে"—সেই খোলা দ্বার দিয়ে বাহির হইয়া

যাইতে যদি সে না দিতে চায়—তবে তাপস তাহার মাঝখানে থাকিয়া বাধা জন্মাইবার কে? বাস্তবিক, মেয়েটি শ্যামাঙ্গিনী—কিন্তু চেহারাটি মাধুর্য্যময়, মাধুরী নামটি ওকে মানাইয়াছে ভালো! ওর সঙ্গে সম্বন্ধ কবে কে আনিয়াছিল তাহা মনে নাই, বিবরণ-পত্র থাকিলে একবার পড়িয়া দেখা যাইত। তাপসকে বার বার এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেও বাধে।

প্রদ্যোত যতই ভাবে ততই অস্বস্তিতে মন ভারী হইয়া ওঠে। তাপসের বদান্যতা ও সহানুভূতি কি উপায়ে সে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে এই ভাবনা ওর মনে অহর্নিশি ঘুরিতে থাকে। স্পষ্ট করিয়া ত মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করা চলে না ওর কি চাই, কি পাইলে ও খুসী হয়, কিসে ওর দুঃখকাতর চক্ষে একটুখানি হর্ষের আলো ফোটে! ও দিকে পথ আগ্‌লাইয়া আছে সেন্সলেস্ ঐ ফুলটা।

হঠাৎ মনে হইল, মাধুরী ত এখানে বাক্স পেঁটুরা লইয়া বেড়াইতে আসে নাই, আসিয়াছে সর্ব্বহারা হইয়া। দুখানি কাপড় ও একটি জামাতেই ওর সব অভাব কিছু মিটিয়া যায় নাই। প্রসাধনের জিনিষ মেয়েদের কাছে অতি বড় জিনিস, টয়লেট্ সেট্ একটা ওর জন্যে কিনিয়া আনিলে একেবারে ফ্যাল্‌না হইবে না। সঙ্গে তার খান্ দুই সাড়ীও কেনা যাইবে। গোটা দুই চার ব্লাউস্ পেটিকোট্ কিনিলেই বা ক্ষতি কি! ও জিনিস কখনই বেশী হয় না। দুখানা কাপড়ে ধোবাবাড়ী কাপড় দিবে ও কি করিয়া!

প্রদ্যোত ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল সাতটা বাজে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় বদ্‌লাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। হাওড়া হইতে কলিকাতায় গিয়া জিনিষ কিনিয়া ফিরিতে এখনো যথেষ্ট সময় আছে হিসাব করিয়া দেখিয়া লইল।

ইহার একটু পরে তাপস আসিল। গোটা দুই বালিশ ও সুজনি সে কিনিয়া আনিয়াছে। মাধুরীর কাছে তাহা উপস্থিত করিতেই মাধুরী বলিল, "এ সব আবার কেন এনেছেন?"

"মাটিতে মাদুর বিছিয়ে অমনি শুয়ে থাকেন—তাই আন্‌লুম। বিছানাটা নিজের না হ'লে বাস্তবিক ভাল লাগে না। আপনার পক্ষে বোধ হয় আরো খারাপ লাগে।"

অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে মাধুরী বলে, "এত বেশী বেশী কেন কর্চ্ছেন? আপনাদের এ ঋণ কি করে আমরা পরিশোধ কর্ব্ব!"

"ঋণ কেন মনে করেন এবং পরিশোধের কথাই বা কেন ভাবেন। কজ্ অফ্ হিউম্যানিটি কি সবার বাড়া কজ্ নয়? নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য ত আমরা কত করি; কিন্তু তার কোন মূল্যও নেই মাহাত্ম্যও নেই; ও ত পশুরাও করে। অন্যের জন্য যখন আমরা কিছু করি, তখনই আমরা মানুষের পদবীতে উঠি। বেহারের দুর্গতদের জন্য কি আমরা কোরেছি বা কর্ত্তে পার্ত্তুম! আপনারা সাম্‌নে এসে পড়েছেন—আপনাদের যৎসামান্য যদি কিছু করা যায়—তাতে আমরাই কৃতার্থ হব!"

তাপসের কথায় মাধুরী সান্ত্বনা না পাক্ পরের প্রসাদ বহনের দুর্ভর দীনতা হয় ত একটু লঘুতর হইল, মাথা গুঁজিয়া সে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলিল।

তাপস তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য এ কথা সে কথা পাড়ে—নানা আলাপ আলোচনার অবতারণা করে, উঁচু তটের তল ঘেঁষিয়া প্রবাহিত নদীধারার ক্ষীণ কল্লোলের মত তাহার কথার ধারা ওর বিয়োগদুঃখাতুর বিচ্ছিন্ন মনের তলদেশ দিয়া বহিয়া যায়, ওর জীবনের উপ্‌চে পড়া সোনার ফসল শীষ্ মেলিয়া দোল খাইতে খাইতে যেখানে আগুনে পুড়িয়া সমূলে ভস্ম হইয়া গিয়াছে, সেখানে তাহার কণামাত্রও পৌঁছায় না।

ফল হয় ওতে বিপরীত। তূণের মুখ হইতে অপসৃয়মানা হরিণীকে ধরিবার জন্য ওর মনের আদিম শিকারীটি সচেতন হইয়া ওঠে। দুর্দ্দান্তের মোহ ওর চোখে মায়া বিস্তার করে। শ্যামা, অখ্যাতকুলশীলা, সাধারণ এই মেয়েটি,—পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রদ্যোত এবং তদনুবর্ত্তী হইয়া সে একদিন যাহাকে অবজ্ঞায় ফিরাইয়া দিয়াছিল,—নিংত্রিশয় অসাধারণত্বে মণ্ডিত হইয়া আজ সে তাহার দৃষ্টির দিগন্তে উদিত হয়।

মাধুরীকে ও কথা বলাইয়া ছাড়ে। এতখানি সেবা যত্নের বিনিময়ে যে শুধু দুইটা মুখের কথা শুনিতে অভিলাষী, তাহাকে কতক্ষণ এড়াইয়া চলা যায়, শোক চাপা দিয়া

মাধুরী হাসিবার চেষ্টা করে, নিজের জীবনের কথা বলে, লজ্জাবিজড়িত স্বরে তাপসদা বলিয়া ডাকেও।

লোকে বলে শাদা মনে কাদা নাই। প্রদ্যোত মাধুরীর জন্য জিনিষগুলি কিনিয়া আনিয়া তাহাকে দিতে গিয়া গেল ঠেকিয়া। কেবলই ওর মনে হইতে লাগিল, তাপস তাহার এই উপহার দেখিয়া মনে মনে হাসিবেনা ত, ভাবিবেনা ত তাহাকে নিষ্প্রভ করিয়া দেওয়ার জন্য এই চেষ্টা!

কিন্তু জিনিসগুলি টাকা দিয়া কিনিয়া আনিয়া এখন করেই বা কি! মেয়েদের প্রসাধন দ্রব্য, শাড়ী ব্লাউজ তাহার ত কোনো কাজে লাগিবে না। মিছিমিছি বাক্সে পুরিয়া রাখিয়া দিয়া কি লাভ, মাধুরীকে দিলে মাধুরীর উপকার হইতে পারে বরঞ্চ। তাপসের ভয়ে সে কেঁচো হইয়াই বা থাকিতে যায় কেন! ওরা ত কেউ তাপসের সম্পর্কিত কোনো লোক নয়!

সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রদ্যোত একটা য়্যাটাচি কেস্-এ জিনিসগুলি ভরিয়া মাধুরীর কাছে দিয়া বলে, "একটা সেল্ হচ্ছিল, তার থেকে এগুলি আন্‌লুম। টুকিটাকি এসব জিনিস ছড়ানো থাক্‌লে হারিয়েও যেতে পারে, ওগুলো সব এটাতেই রাখ্‌বেন। আপনার পায়ের ব্যথা সেরে গেছে ত একেবারে?

মাধুরীর মুখ লজ্জায় উত্তপ্ত হইয়া ওঠে, কোনো মতে বলে, "পা সেরে গেছে।"

"হাতের ঘা শুকিয়েছে?"

"শুখিয়েছে।"

এর পর কি বলা যায় প্রদ্যোত ভাবিয়া পায় না। মাধুরীর বিছানার ধারে একখানা ফিল্ম সিরিজের বই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কার বই আপনার ভালো লাগে বেশী?"

"দু চারখানা বইই মাত্র পড়েছি, বেশী পড়ি নি।"

"জেরোম কে জেরোমের থ্রি মেন ইন্ এ বোট্ পড়েছেন?"

"না"

"লাইব্রেরী থেকে এনে দেব বইটা, দেখ্‌বেন পড়ে। বেশ লেখা।"

প্রদ্যোত আবার চড়ায় ঠেকিয়া যায়, কুশল জিজ্ঞাসা ছাড়া যাহার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কোনো আলাপ চলে নাই, হঠাৎ তাহার সঙ্গে সাহিত্য সমালোচনা জুড়িয়া দেওয়া যায় কি করিয়া। ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করে, "চশ্‌মা ছাড়া পড়্‌তে পারেন ত? কি যে হয়েছে এখন, ছোট্ট ছোট মেয়েদের নাকে পর্য্যন্ত চশ্‌মা! ওটা কি অলঙ্কার হিসেবে আপনারা ব্যবহার করেন, না চোখের দোষের জন্য করেন?"

"আমি চশ্‌মা নিই নি"। মাধুরী নিতান্ত সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

একটু অপ্রস্তুত ভাবে প্রদ্যোত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া যায়। নিজের অকৃতকার্য্যতায় মনে মনে ও তাপসের উপর তাতিয়া ওঠে। আগে ভাগে ও যদি জায়গা জুড়িয়া না বসিত তবে ব্যাক্‌বেঞ্চে বসার বিড়ম্বনা তাহার কখনই ঘটিত না। তাহার সম্মুখের সিধা রাস্তা ওরই একাধিপত্যের প্রস্তর-প্রাচীরের গায় ঠেকিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে এখন বন্ধ গলি। না পারে সে তাহার ভিতর হইতে বাহির হইতে, না পারে অগ্রসর হইতে!

প্রদ্যোত চলিয়া গেলে মাধুরী একে একে জিনিসগুলি সব তুলিয়া দেখিয়া যেমনটি ছিল আবার তেমনটি করিয়া সাজাইয়া রাখে। দুদিক্ হইতে দুজনের এই অবিরাম উপহার প্রদান এবং তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা ওর মনকে করিয়া তোলে শঙ্কাকুল। ওদের পরস্পরের দিকে পরস্পরের যে ভাবাধারা ওদের নিজেদের কাছে রহিয়াছে প্রচ্ছন্ন, তাহা ওর চিত্তমুকুরে হইয়াছে সুপরিস্ফুট। সাগরে নৌকা ভাসাইয়া যে নেয়ে আকাশ প্রান্তে মেঘ সন্নিবেশ দেখিতে পায়, তাহার মত ওর মন অশুভ সূচনার ছায়াপাতে চঞ্চল হইয়া ওঠে। উচ্চকিত ভীত দৃষ্টিতে ও চারিদিকে তাকায়।

নীচে পিয়ন কড়া নাড়া দেয়, প্রকাশ কয়েকখানা চিঠি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া যায়। মাধুরী অন্যমনস্ক ভাবে চিঠিগুলি নাড়িয়া দেখে, দুখানা চিঠি প্রদ্যোতের, একখানা তাপসের।

সহসা ওর বিস্মৃতির ঘোর কাটিয়া বিদ্যুৎবৎ এই নাম

দুইটি ওর মনে ছাপিয়া ওঠে। পাঁচ ছয় মাস আগে এদের নাম করিয়া ঘটকের চিঠি গিয়াছিল ওর বাবার কাছে। কালো মেয়ে এবং অকুলীন বলিয়া ওরা দুজনেই সম্বন্ধ দিয়াছিল ফিরাইয়া। তাপস দস্তিদার ও প্রদ্যোতকুমার গুহ ঠাকুরতা—নির্ঘাৎ এরা সেই দুই জন। আজই সকালে তাপস বলিতেছিল ওদের বাড়ী বরিশাল।

নিমেষে মাধুরীর মনের তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবশতা কাটিয়া যায়। ভীত উচ্চকিত চক্ষে তাহাকে ঘেরিয়া নিঃশব্দে বিস্তীর্ণায়মান ব্যাধের বাগুরার দিকে ও তাকায়।

সন্ধ্যা হয়। তাপস ও প্রদ্যোত দুইজনেই বেড়াইতে বাহির হইয়া যায়। প্রকাশ রান্নাঘরে উনান ধরাইতে বসে।

মাধুরী ডাকে, "কাকা।"

গোকুল বাবু বিছানায় বসিয়া ছিলেন, মাধুরীর ডাকে উত্তর দিলেন, "কি রে বুড়ি?"

"কতদিন হোল আমরা এখানে এসেছি?"

"পনেরো দিন হয়েছে।"

"আর কত দিন এখানে থাকব?"

গোকুল বাবু নীরব। থাকিয়া থাকিয়া এ প্রশ্নটা তাঁহার মনেও ধ্বনিত হইয়াছে, কিন্তু তীর ছাড়িয়া নীরে ঝাঁপ দিবার সাহস হয় নাই। মাধুরীর মুখামুখী হইয়া একটা জবাব তাঁহাকে দিতে হইল। বলিলেন, "তাই ত বটে, আর কত দিন এখানে থাকা যায়!"

গোকুল বাবুর কাঁধে হাত রাখিয়া মাধুরী বলে "কাকা"!

"কি মা?"

"তিলার্দ্ধ আর দেরী না ক'রে, চলুন এখুনি আমরা বেড়িয়ে পড়ি।"

"কোথায় যাবি মা?"

"শত শত নির্ব্বান্ধব গৃহহীন যেখানে গেছে, আমরাও সেখানে যাব: কিন্তু এখানে আর নয়। আমরা এখন হাঁটতে পারি,—এখান থেকে ট্রামের শব্দ পাই যখন, ট্রাম লাইন খুব দূরে হবে না। চলুন, এই সময় বেরিয়ে পড়ি।"

গোকুল বাবু ইতস্ততঃ করেন, বলেন, "ওরা এত করলে—আর যাবার বেলা ওদের সঙ্গে দেখা না করে না বলে চলে যাব? এ কি ভাল হবে মা?"

"ওঁদের কাছে একখানা চিঠি বরঞ্চ লিখে রেখে যাই। ওঁরা এলে পর কখনই যাওয়া হবে না।"

"তোর সঙ্গে ব্যবহারে ওরা কি কিছু অন্যায় কোরেছে? ভাখ্ মা, ছেলেমানুষ তুই—নির্ব্বান্ধবের এবং অর্থহীনের জগতে মানের ষ্ট্যাণ্ডার্ড নামাতে হয় এই কথাটা এখন থেকে জেনে রাখ্। তোর মনের মত যদি কিছু না হয়ে থাকে—ওভারলুক্ করে যা। আমরা এখন পথের ভিখিরী, আমাদের কি এখন অত ফাইন্ ডিষ্টিংশন্ অব অনার চলে মা? ওরা দুজনাই খুব ভদ্রলোক, কী রকম যত্ন আত্তিটা কচ্ছে আমাদের বল্ দেখি! এই যে এত জিনিস—কিছুই কি আমরা চেয়েছি? না চাইতে ওরা সব পরিপূরণ করে দিচ্ছে। কার কাছে যাব, কার কাছে হাত পাত্‌ব, কোথায় দাঁড়াব তার কি কিছু ঠিক্ আছে?"

ক্ষুণ্ণ স্বরে মাধুরী বলে, "আপনি বরঞ্চ এখানে থাকুন, আমাকে দিয়ে আসুন রিলিফ কমিটির কারো কাছে। কোনো বাড়ীতে নেই বা রইলুম, অনাথা বলে যদি কোনো বোর্ডিং-এ ফ্রি করে কেউ দিতে পারেন আমি পড়াশুনা কর্ব্ব। আপনি কেন মিছে আমার সঙ্গে ঘুরে মরতে যাবেন?"

গোকুল বাবু মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলেন, "চল্ মা। নিজের পায়ে দাঁড়াবার জোর যদি তোর থাকে, সাহস থাকে, তবে চল্। পরের অনুগ্রহের ভাত—এও কিছু মিষ্টি নয়।"

মাধুরীর মনের বোঝা নামিয়া যায়। বারান্দা হইতে গলা বাড়াইয়া প্রকাশকে ডাক দেয়। বলে, "সকলের অসাক্ষাতে বাড়ী ছেড়ে চলা যাওয়াটা ঠিক নয়, প্রকাশ এসে দাঁড়াক্ এখানে।"

"জিনিস পত্র সব নিবিনি মা?" গোকুল বাবু জিজ্ঞাসা করেন।

ছোট একটা বাণ্ডিল আনিয়া দেখাইয়া মাধুরী বলে, "নেহাৎ যা নইলে নয়, তা নিয়েছি। যার খেতে নেই, তার শুতে রাজাপাটিতে কি দরকার! আপনার যা ইচ্ছা আপনি নিন্।"

দুজনে দুখানা চিঠি লেখে। মাধুরীর নিবেদনে বাজে মার্জ্জনার সুর, গোকুল বাবুর কথায় মেশে অকারণে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার ক্ষোভ। চিঠি দুখানা টেবিলের উপর রাখিয়া মাধুরী বলে, "প্রকাশ, আমরা যাচ্ছি, তুমি কিন্তু বাসায় থেকো।"

প্রকাশ অত শত বোঝেনা, "যে আজ্ঞে" বলিয়া দরজার কাছে দাঁড়ায়। ওরা বাহির হইয়া পড়ে।

পথে চলিতে চলিতে গোকুল বাবু একবার মাধুরীর মনের কথাটা জানিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মাধুরী কথার জবাব দেয় না। দুই চক্ষে ওর একবার জল উপচিয়া ওঠে, ঝরিয়া পড়িবার আগেই আঁচলে তাহা মুছিয়া ও সাম্‌নের দিকে চলিতে থাকে।

* * * *

প্রদ্যোত চিঠি পড়িয়া তাপসের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকায়। ওর মনের ধূমায়িত বহ্নি শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। চিঠিটা তাপসের কোলে ফেলিয়া দিয়া বলে, "এর মানে কি ?"

"মানে কি তা বুঝবার ক্ষমতাও কি তোমার লোপ পেয়েছে ?" বলিয়া তাপস হেলান ছাড়িয়া উঠিয়া বসে।

"Adding insult to injury" বলিয়া প্রদ্যোত হাসিবার চেষ্টা করে কিন্তু হাসিটা ভাল করিয়া ফোটে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাপস বলে, "সোজা কথা হচ্ছে এই যে, আমরা দুজন দুটি গর্দ্দভ।"

"কিসে ?"

"আমাদের হাতের রুগীকে ওভারডোজ দিয়ে আমরা মার্ডার কোরেছি।"

"ওভারডোজ ?"

"চোটো না, আমি ওকে যুগিয়েছি ওর প্রত্যহের প্রয়োজন, তুমি এনোছো চিত্তবিলাসের উপকরণ—ও ঘাব্‌ড়ে গেছে।"

"এ তোমার ভার্সন্। ভারী ত কয়টা জিনিস,—ওতেই ঘাব্‌ড়াল ?"

"জিনিস কটা ভারী না হতে পারে, কিন্তু ওর পেছনে যে ইন্‌টেন্‌শন্ ছিল তা খুব লঘু বলে মনে করা চলে কি ?

"ইন্‌টেন্‌শন আমারই ছিল, আর তোমার ছিল না ?"

"থাক্‌লেও তার উগ্রতার ঝাঁঝে ওকে যে আমি ঘাব্‌ড়ে দিইনি, এ ঠিক্। পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের ওপর আবর্ত্তিত হয়ে কক্ষা-পথে ঘোরে। চেতন জগৎটা ওরি মত একটা প্রিন্সিপলে চলেছে, তার ম্যাক্‌সিস্ হচ্ছে স্বার্থ-বুদ্ধি। মানুষ যা কিছু করে কোনো না কোনো রকম স্বার্থ দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হয়, এইটে হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা। এই প্রেজেন্ট তুমি তাকে দিচ্ছ কেন এর উত্তরে ও যা বুঝেছে, তাতে হয়ত ভরসার চেয়ে ভয়ের উদ্রেক হয়েছে বেশি।"

প্রদ্যোত এবার চটিয়া ওঠে। "বেশী বেশী সাবাসি কোরো না। ওদের চলে যাওয়ার ভিতরে তোমার হাত কি নেই কিছু ?"

"থাকলে উপকৃত হ'তাম সন্দেহ নেই ; কিন্তু অতখানি ভণ্ডামী মাথায় আসে নি। যাক্ কথাটা বলে ফেলে ভালই কোরেছো, এর পর আর আমার এখানে থাকা চলে না।"

তাপস উঠিয়া নিজের ঘরে যায়। আকাশ ভরা অগণিত তারকার মধ্য হইতে দীপ্তিহীন ক্ষুদ্র একটি তারা ওর চোখের তারা আবিষ্ট করিয়া রাখে। ঘরের টুকিটাকি জিনিস-পত্র সব ব্যাগে ভরিয়া উন্মনা ভাবে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে থাকে।

মাঝখানে প্রদ্যোত আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "খুঁজ্‌তে বেরুনো হচ্ছে ?"

"সরকারী রাস্তা সবাকার জন্যেই তৈরি। খুসী হয় বেরোও তুমিও।"

প্রদ্যোত মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

শরীর রক্ষায় প্রকৃতির প্রভাব

ডাঃ অতুল রক্ষিত বি-এস সি, এম-বি

আমাদের শরীর একটি ইঞ্জিন বিশেষ। ইঞ্জিনের কলকব্জা যেমন পরিষ্কার থাকা দরকার তেমনি শরীরের কলকব্জা পরিষ্কার রাখা দরকার নতুবা দেহ ইঞ্জিনও ঠিক চলে না। আমাদের শরীরের কলকব্জা কেমন করিয়া পরিষ্কার থাকে তাহাই এ প্রবন্ধে কিছু বলিব। শরীরের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাহা রক্ত হইতেই তৈয়ারী হয়। মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গই এই রক্তের সাহায্যে বৃদ্ধি পায়। রক্তের মধ্যেই আমাদের শরীর রক্ষার যাবতীয় উপাদান আছে। এই রক্তের সৃষ্টি হয় আমাদের খাদ্য হইতে। খাদ্য দ্রব্য সম্পূর্ণ জীর্ণ হইলে পরিপাক রসের সহিত মিলিয়া তাহার এক-প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। ক্রমশঃ উহাই রূপান্তরিত হইয়া রক্তে পরিণত হয়। রক্ত যতক্ষণ আমাদের শরীরে নির্ম্মলভাবে সঞ্চালিত হয় ততক্ষণ কোন রোগ দেখা যায় না। কিন্তু যখন অনেক আবর্জ্জনা রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হয় তখন শরীরে রোগ দেখা দেয়। অতএব রক্ত পরিষ্কার রাখাই শরীর রক্ষার প্রধান উপায়।



প্রবন্ধ লেখক

আমাদের খাদ্য সামগ্রী থেকেই রক্ত তৈয়ারি হয়। অতএব এই খাদ্য খুব সরল ও সহজ উপায়ে জীর্ণ হওয়া চাই। মুখরোচক ঝাল মশলা দেওয়া খাদ্য সহজে জীর্ণ হয় না; তাহা অনেক খাওয়া যায় বটে কিন্তু অপকার বেশী। একথা ভুল যে, প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিলে তদনুপাতে আমাদের শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। প্রচুর খাদ্য দ্রব্য গ্রহণে পেট ভারি হয়, অম্ল উদ্গার হইয়া শরীরে অবসাদ আনে এবং শরীর রক্ষার উপযোগী কোন উপাদানই রক্তে তৈয়ারি হয় না। ইহাতে রক্ত বিকৃত হইয়া শরীর খারাপ হয় ও পরিশ্রমের শক্তি কমিয়া যায়।

আমাদের জীর্ণ করিবার শক্তি অনুসারেই খাওয়া উচিত। অল্প খাওয়া দরকার, পেটে যেন একটু ক্ষুধা থাকে এবং ঝাল মশলা তেল দিয়া যেন খাদ্যকে গুরুপাক না করা হয়। গরীবদের ছেলের গুরুপাক দ্রব্য খাওয়ার সুযোগ পয়সার অভাবে হয় না বলিয়া তাদের ছেলে বড়-লোকের ছেলের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়, বরং ভালই।

খাদ্যের জীর্ণতার সহয়াতার জন্য আমাদের দাঁত দরকার। এই দাঁত দিয়া ভাল রকম চিবাইয়া আমাদের খাদ্য শরীরের গ্রহণপোযোগী করিয়া তোলা হয়। অনেক কাজের লোক তাড়াতাড়ি কাজে যাইবার জন্য কোন রকমে উদর পূর্ত্তি করিয়া লইবার চেষ্টা করেন, খাদ্য চর্ব্বণের অবকাশ থাকে না। ভাল রকমে খাদ্য দ্রব্য চিবাইলে লালার সহিত খাদ্য

মিশ্রিত হইয়া একটু নরম হয় এবং তাহা পাকস্থলীতে গিয়া নানারূপ পরিবর্ত্তনের দ্বারা জীর্ণ হয়। যদি পাকস্থলীতে কঠিন খাদ্য গিয়া উপস্থিত হয় তাহা জীর্ণ হয় না, সেই জন্য কঠিনকে নরম করিবার জন্য আমাদের ভাল করিয়া চর্ব্বণের দরকার। বাঙালীরা অনেকেই অজীর্ণতায় কষ্ট পান। তাহার কারণ শুধুই উপযুক্ত খাদ্যের অভাব নয়, অন্যান্য যথেষ্ট কারণও আছে। তন্মধ্যে উপযুক্ত চর্ব্বণের অভাব অন্যতম।

আমরা খাদ্য ঠিক মত গ্রহণ করি না। কাঁচা ফল মূল ও শাক সব্জীতে বিশেষভাবে ভাইটামিন আছে এবং তাহার যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহারে শরীর সবল হয়, কিন্তু আমরা তার ব্যবহার মোটেই করিনা। ইংরাজেরা কর্ম্মঠ জাতি, তাঁহারা এই সকল খাদ্য প্রচুর ব্যবহার করেন তাই তাঁহারা যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেও পারেন। কাঁচা বিলাতী বেগুণ, গাজর, শালগম, বাঁধাকপি, শশা, পিঁয়াজ, বিট, সিম, কড়াইসুটি, পালংশাক, পাণিফল, শতমূলী, লেটুস, সিলেরি প্রভৃতি লেবুর রসে ও লবণে মিশ্রিত করিয়া খাইলে উপাদেয় ও সহজে জীর্ণ হয়। আমরা শৈশব হইতে এ সব খাওয়া অভ্যাস করি না বলিয়া পরে খাইতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু এগুলি যে কত উপকারী তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের পিতা মাতারা যদি শৈশব হইতেই ছেলেদের খাওয়ানো অভ্যাস করান তাহা হইলে তাহাদের ঔষধের খরচ অনেকাংশে কমিয়া আসে। আমরা শাকসব্জী সিদ্ধ করিয়া খাই, কিন্তু ইহাতেও অনেক সারাংশ বর্জ্জিত হয়, কারণ সিদ্ধর ফলে অনেক শরীরোপযোগী খাদ্য জলে চলিয়া আসে, সে গুলি আমরা ফেলিয়া দিই এবং তাহাতে যথেষ্ট অপকার হয়। সিদ্ধ জিনিসে তেল ঝাল দেওয়া ঠিক নয়, কারণ তেল ঝালে শরীরের বিশেষ অপকার হয়। তরকারি জলে সিদ্ধ করা অপেক্ষা যদি বাষ্পে তৈয়ারি হয় তাহাতে সিদ্ধ খাওয়ার চেয়ে বেশী উপকার হয়; সেই জন্য অজীর্ণগ্রস্ত রোগীদের বাষ্পে খাওয়া প্রয়োজন।

আমাদের প্রধান খাদ্য চাউল। আমরা কলে ছাঁটা মিহি চাউল খাই কিন্তু তাহাতে ভাইটামিন নষ্ট হয়; তাহারপর রান্না করিয়া ভাতের মাড়ে যৎকিঞ্চিৎ যে সার থাকে তাহাও বর্জ্জন করি। ফলে আমাদের যা ভাত হয় তাহার খাদ্য-মূল্য কিছুই থাকেনা। এই ভাত আমরা পেট ভর্ত্তি করিয়া খাই। প্রচুর খাওয়ার ফলে পেট ভারি হয়, পেটে বায়ু হয় ও একটা অলস ভাব আনিয়া খাটিবার শক্তি একেবারে কমিয়া যায়। ভাতের ভাইটামিন নষ্ট হয় বলিয়া লোকে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়।

আমরা মাছ খুব অল্পই খাই। মাছ পচিয়া গেলে খাওয়া কখন উচিত নয়। বাসি মাছ শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর।* ডিম খাইতে হইলে কাঁচা বা অর্দ্ধসিদ্ধ হইলে ভাল হয়। ইহা সহজে জীর্ণ হয় ও ইহার সারাংশ নষ্ট হয় না। পূর্ণসিদ্ধ ডিমের সারাংশ অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। মাংস একেবারে অনেক খাওয়া ভাল নয়। ইহাতে বেশি মসলা দিলে জিহ্বার পক্ষে ভাল লাগে বলিয়া আমরা প্রচুর অপব্যয় করি কিন্তু ইহা শরীরের পক্ষে বড় হানিকর। তৈল কিংবা ঘৃতে আজকাল প্রচুর ভেজাল দেওয়া হয়। এই ভেজাল দেওয়া জিনিসের অতিব্যবহারে শরীর খারাপ হয়। অজীর্ণ অম্ল আসিয়া দেখা দেয়। এইসব বিষ খাইয়া শরীরের জীবনীশক্তি কমিয়া যায়। আমরা সাদা ময়দা ব্যবহার করি কিন্তু সাদা ময়দায় খাদ্যের সারাংশ অতিশয় অল্প। ইহা soap stone দিয়া সাদা করা হয় এবং এই stone পেটের মধ্যে গিয়া প্রভূত অপকার করে। আমরা কিন্তু সাদা দেখিতে ভাল বলিয়া তাহাই ব্যবহার করি। আসলে কিন্তু ভুলই হয়, কেননা লাল ময়দায় ভিটামিন থাকে আর ইহার ব্যবহারে উদর অপরিষ্কার হয় না। উদর পরিষ্কার রাখিতে হইলে খানিকটা কর্কশ জিনিষ পেটে যাওয়া দরকার। সেইজন্য তরকারির খোসা, আলুর খোসা, বেগুনের খোসা, পটলের খোসা প্রভৃতি গ্রহণ করিলে শরীরের হানিকর হয় না।

আমাদের বেশি পরিমাণে ফল ব্যবহার করা দরকার। ফল সহজে জীর্ণ হয়, ফলে কোনরূপ ভেজাল থাকে না, উহাতে মাটির ও সূর্য্যের তেজ সঞ্চিত থাকে, ও সেই তেজ শরীরে একটা স্ফূর্ত্তি আনে,—ভাইটামিনও

* বাসি হইয়া মাছ যদি ঈষৎ দুর্গন্ধযুক্ত হয় ত' তাহা পোটাশ পারম্যাঙ্গানেট অথবা বোরাসিক অ্যাসিডের ফিকা জলে (weak solution) কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে মাছের দূষিত অংশ নষ্ট হইয়া গিয়া তাহা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং উপকারী হইবে। বিঃ সঃ।

পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে, কিছুই নষ্ট হয় না। সকল প্রকার ফলই ভাল। তন্মধ্যে কমলালেবু, আপেল, আনারস, আতা, পেঁপে, বেদানা, আক ইত্যাদি বহু উপকারী। রৌদ্রে শুষ্ক ফল অর্থাৎ মেওয়া জিনিষ কিসমিস্, খেজুর, ডুমুর, খুবানি স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং পেট খুব পরিষ্কার রাখে। ডাবের জল ঘোল কিংবা বার্লি'র জল খাইলে শরীরের ময়লা অনেকটা ধুইয়া যায়। তজ্জন্য সুস্থ কিংবা অসুস্থ শরীরে এসব জিনিস ব্যবহার করিলে কোন অপকার হয় না। এ কথা ভুল যে ডাবের জলে বা ঘোলে রোগীর ঠাণ্ডা লাগিবে। রোগীর ঠাণ্ডা লাগে, যদি পেট খারাপ থাকে, যদি তার রক্তের তেজ কমিয়া আসে এবং যদি খুব গরম হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডায় বাহির হয়। শীতের সময় মায়েরা ছেলেকে বদ্ধ ঘরের মধ্যে জামা গায়ে দিয়া ও লেপ ঢাকা দিয়া শোয়াইয়া রাখেন এবং হঠাৎ প্রস্রাবের সময় তাহাকে বাহিরে শীতের কনকনে হাওয়ায় নগ্নগাত্রে বাহির করিয়া দেন ;—ইহাতে নিশ্চয় ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা।

রোগের সময় মিছরির সরবৎ খাওয়া উপকারী। ইহাতে আহার ঔষধ দুই হয়। একদিকে প্রস্রাব খুব পরিষ্কার হইয়া যায় ও অপরদিকে শরীরের উত্তাপ রক্ষা করে ও হৃৎপিণ্ড সবল করে। সুস্থ শরীরে দুগ্ধপান বিশেষ প্রয়োজন। যে রোগী জ্বরে ভুগিতেছেন তাহাকে দুধ না দেওয়াই ভাল। দুগ্ধ খাওয়ার একটা নিয়ম থাকা চাই। যেমন করিয়া চা খাওয়া হয় তেমনি করিয়া দুধ আস্তে আস্তে খাওয়া দরকার এবং দুগ্ধ খুব গরম করিয়া খাওয়া উচিত নয় কারণ তাহাতে দুগ্ধের ভাইটামিন ও সারাংশ নষ্ট হয়। সেইজন্য খুব গরম জলের মধ্যে দুগ্ধ রাখিয়া তাহাতে দুগ্ধ যতটা গরম হইতে পারে সেই দুগ্ধ খাইলে শরীরের পক্ষে হিতকর হয়। আর একটা কথা, খুব ভরা পেটে খাইলে দুগ্ধ হজম হয় না। এই অবস্থায় দুগ্ধ অনেকে খান বলিয়া দুগ্ধের দোষ দেন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসায় আমরা রক্তের ময়লা চারিটি উপায়ে বাহির করিয়া দেবার চেষ্টা করি। প্রথমত দাস্তের দ্বারা শরীরের ময়লা নির্গত হয়, তাহারপর প্রস্রাব দ্বারা, ঘর্ম্ম দ্বারা ও নিঃশ্বাসের দ্বারা অনেক ময়লা বাহিরে আসে। স্ত্রীলোকদিগের এছাড়া আরও একটি ময়লা নিঃসরণের উপায় আছে। দাস্তের দ্বারা এত ময়লা চলিয়া যায় যে আমরা যদি দুই দিন ভাল করিয়া দাস্ত পরিষ্কার না করিতে পারি তবে আমাদের শরীর মন দুইই খারাপ হয়। শরীর খুব ভারী ঠেকে, কাজ করিতে ইচ্ছা যায় না এবং মনের স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়। দাস্তের ময়লা শরীরে জমিয়া থাকিলে রক্ত খারাপ হইয়া রোগের কারণ হয়। একজন আমেরিকান ডাঃ বুসার, সপ্তাহকাল ধরিয়া ভাল দাস্ত পরিষ্কার হইতেছিল না, এমন এক রোগীর পেট হইতে পিচকারী করিয়া একটু রস বাহির করিয়া লইয়া সেই রস সাতটা কুকুরকে ইঞ্জেকসন দিয়াছিলেন; ফলে কিছুক্ষণ পরে কুকুরগুলি মরিয়া যায়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে পেট পরিষ্কার না থাকিলে দেহের মধ্যে এত বিষাক্ত পদার্থ প্রস্তুত হয় যে তাহাতে মানুষের রোগ উপস্থিত হয় ও শরীর নিস্তেজ করিয়া তোলে। সুতরাং প্রাকৃতিক চিকিৎসায় দাস্ত পরিষ্কার করা একান্ত আবশ্যক। উষ্ণ জলের দ্বারা অন্ত্র ধৌত করিলে পেট পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমাদের ঘর্ম্মের দ্বারা অনেক ময়লা নির্গত হয়। শরীরের লোমকূপ যাহাতে পরিষ্কার থাকে এবং ঘর্ম্মের মধ্য দিয়া আবর্জ্জনা চলিয়া যায় প্রাকৃতিক চিকিৎসায় তাহার জন্য চেষ্টা করা হয়। চর্ম্মের মধ্য দিয়া অবিরাম অদৃশ্যভাবে শরীর মধ্যস্থ ময়লা বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। এই চামড়া যদি পরিষ্কার না থাকে এবং অনেক ময়লা জমিয়া যদি তাহাদের পথ বন্ধ হইয়া যায় তবে সেই ময়লা শরীরের সঙ্গে মিলিয়া মানুষের দেহ অসুস্থ করে। একজন লোকের সমস্ত ভিতরকার জিনিষ যদি ঠিক থাকে অথচ চামড়ার অনেকটা পুড়িয়া যায় তাহা হইলে সে লোককে বাঁচাইতে পারা যায় না, কারণ চামড়ার মধ্য দিয়া যে ময়লা প্রকৃতির সাহায্যে বাহির হইয়া যাইত তাহা বাহির হইবার উপায় থাকে না। এইজন্য প্রাকৃতিক মতে রোগীর দেহ সুস্থ করিবার জন্য তাহাকে বাষ্পস্নান দেওয়া হয়। বাষ্পঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ বসাইয়া তাহার শরীরের রক্তের ময়লা সমস্ত নিংড়াইয়া ঘামের দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে তাহার মাথা ঠাণ্ডা থাকে।

প্রস্রাবের দ্বারা অনেক ময়লা চলিয়া যায়। যে রোগীর শুনা যায় ২৪ ঘণ্টা প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেছে তাহাকে বাঁচান ভারি দুষ্কর। প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে সেই ময়লা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া রোগীকে শীঘ্রই জ্ঞানশূন্য করিয়া দেয়। প্রস্রাব সব সময়ে পরিষ্কার রাখা উচিত। তাহাতে দেহের অনেকটা হাল্কা ভাব আসে ও শরীর ঠাণ্ডা থাকে। এই জন্য মিছরির জল, ডাবের জল, বার্লীর সরবৎ খাওয়া শরীরের পক্ষে হিতকারী।

নিঃশ্বাস দিয়া অনেক ময়লা বাহির হয়। আমরা প্রত্যেক-বারে নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্ব্বলিক এসিড ফেলিয়া দিই এবং শরীরের মধ্যে অক্সিজেন টানিয়া লই। অক্সিজেনের দ্বারা খাদ্য পুড়ান হয়, পুড়িয়া শরীরের তেজ বৃদ্ধি হয়; তাহাতে আমাদের শক্তি আসে ও অবশিষ্ট ছাই যাহা থাকে তাহা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া যায়। এই কার্ব্বনিক এসিড বাহিরে না আসিতে পারিলে সমস্ত শরীর বিষে ভর্ত্তি হয় এবং রক্ত দূষিত হয়। ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া শয়ন করিলে পরদিন উঠিলে মাথা ভারী ঠেকে ও শরীর বড় দুর্ব্বল হয়। ইহার কারণ, ঘরে ভাল হাওয়া আসিতে না পারায় অক্সিজেন শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না পরন্তু বিষাক্ত কার্ব্বনিক গ্যাস যাহা নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায় তাহাই শরীর আবার গ্রহণ করে। এই পুনঃ পুনঃ গ্রহণের পরে শরীর বিষে ভরিয়া উঠে। এই জন্য রাত্রিতে আমাদের গাছতলায় শোয়া নিষিদ্ধ। গাছেরা রাত্রে কার্ব্বনিক এসিড নিক্ষেপ করে এবং যাঁহারা গাছতলায় শয়ন করেন তাঁহারা অক্সিজেনের পরিবর্ত্তে কার্ব্বনিক এসিড গ্রহণ করেন যাহা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী। প্রাকৃতিক শক্তিতে শরীরের এই নিঃশ্বাসক্রিয়া ভাল করিবার জন্য আমাদের ব্যায়ামের বন্দোবস্ত আছে। এই ব্যায়ামের ফলে অক্সিজেন ভাল রকমে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্ত পরিষ্কার করে এবং কার্ব্বনিক এসিডরূপে শরীরের অনেক ময়লা বাহিরে চলিয়া আসে। উপযুক্ত ব্যায়ামের ফলে শরীরের মাংসপেশী সবল হয়, ভিতরকার যন্ত্রপাতি যাহা শিথিল থাকে তাহাও শক্ত হইয়া যায়।

আমরা রোগের কারণ স্বরূপ দেখি যে, রক্ত বিষের দ্বারা দূষিত হইয়াছে এবং সে বিষ সম্পূর্ণরূপে না বাহির হইলে রক্ত পরিষ্কার হইবে না ও রোগও সারিবে না। এই বিষ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জমিয়া যায় ও তদনুসারে রোগের বিভিন্ন নামকরণ হয়, যেমন ফুস্‌ফুসে নিউমোনিয়া, পেটে টাইফয়েড, মূত্রাশয়ে nephritis, স্নায়ুরোগ হইলে neuritis ইত্যাদি; কিন্তু এই রোগ সারাইবার সেই একই পন্থা। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের মাংসপেশী সবল করা হয়। তারপর মালিশ দ্বারা রক্তসঞ্চালনের সহায়তায় পুরানো ময়লা চলিয়া গিয়া নূতন রক্ত আসে। ইহার পর পেটের উপর একটা আলো দেওয়া হয় যাহাতে যকৃতের কাজ পরিষ্কার থাকে, কেননা যকৃত ভাল থাকিলে তাহার নিঃসৃত রস হইতে আমাদের খাদ্য হজম হইবে ও সেই খাদ্য হজম হইলে আমাদের শরীরের রক্তবৃদ্ধি হইয়া শরীর সবল হইবে। তারপর রোগীকে বাষ্পঘরে লইয়া গিয়া সমস্ত দেহ বাষ্পে আবৃত করা হয়, সদ্যপ্রসূত গরম বাষ্পে শরীরের লোমকূপ খুলিয়া যায় ও তাহা হইতে রক্তের ময়লা চলিয়া যায়। এই সময় ঠাণ্ডা জল দিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। পরে বৈদ্যুতিক স্নান করান হয়। এই বৈদ্যুতিক স্নানে শরীরের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয় ও স্নায়বিক শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া রক্তের পুরানো ময়লা শরীর হইতে বাহির হইবার সুযোগ পায়। সব চেয়ে বেশী খাদ্যের নিয়ম পালন করা দরকার। অন্ততঃ ন্যূনপক্ষে মাসে দুইটা উপবাস প্রয়োজন। এই উপবাসের সময় শুধু জল খাওয়া দরকার। শুধু জল খাইয়া থাকিতে না পারিলে ডাবের জল এবং ফলের রস ছাড়া আর কিছু বেশী দেওয়া যাইতে পারে না। উপবাসের সময় আমাদের পেট পরিষ্কার হওয়া দরকার, তাহাতে উপবাসের উপকারিতা আরও যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। উপবাসকালীন আমাদের দেহের যন্ত্রপাতি খানিকটা বিরাম পায়, তাহাদের মাঝে মাঝে কাজ না বন্ধ থাকিলে ঠিক কাজ করিবে না—তাই বিশ্রামের জন্য উপবাস প্রয়োজন।

পুরানো রোগীরা একেবারে উপবাসে অসমর্থ হইলে একবেলা অন্ততঃ ফলমূল শাকপাতা খাইয়া থাকিলেও

চলিতে পারে। সেইজন্য তাহাদের পক্ষে সকালবেলা স্বাভাবিক খাদ্য ও সন্ধ্যাবেলা ফল ও সব্জী কিছু খাইয়া থাকা প্রশস্ত। যাঁহারা এ নিয়মেও থাকিতে চাহেন না তাঁহাদের পক্ষে দুইবেলা স্বাভাবিক ভাত রুটী খুব অল্প পরিমাণে খাওয়া চলিতে পারে অর্থাৎ পেট খুব খালি রাখিয়াই খাইতে হইবে এবং বাকী ফলমূল দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। এ রকম নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলেও রোগ নিশ্চয় সারিবে কিন্তু সময় একটু বেশি লাগিবে। রক্তের ময়লা আমাদের খাদ্যের অনিয়মেই বাড়ে, সুতরাং শরীরের পক্ষে এমন খাদ্যের প্রয়োজন যাহা সহজে জীর্ণ হয় ও রক্ত বৃদ্ধি করে।

এই প্রাকৃতিক চিকিৎসায় কতকগুলি প্রতিক্রিয়া আছে। চিকিৎসার সময়ে সেগুলিতে প্রত্যেক মানুষে ভুগিয়া থাকেন। প্রকৃতি শরীর হইতে আবর্জ্জনা ত্যাগ যে কোন নিঃসরণের পথ দিয়া চেষ্টা করেন সুতরাং এই চিকিৎসার সময় কখন হয়ত কোন লোকের খুব সর্দ্দি হয়; তাহার অর্থ সেই সময় ফুসফুস হইতে যত কিছু ময়লা সব ধুইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। এটা খুব ভাল লক্ষণ। কিন্তু সর্দ্দি দেখা দিলে অনেকে ভয় পান এবং সর্দ্দিকে চাপা দিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন। আমাদের ঘরের ভিতর ময়লা জমিলে যেমন জল দিয়া ধুইয়া আমরা পরিষ্কার করি তেমনি আমাদের দেহের ময়লা ঐ রকম সর্দ্দি জল ইত্যাদি দ্বারা ধুইয়া বাহির হইয়া যায়।

প্রকৃতি আমাদের শরীরকে আরও একটা শুভ উপায়ে রোগের হাত হইতে রক্ষা করেন—দাস্তরূপে ময়লা বাহির করিয়া দিয়া। যখন অতিরিক্ত ময়লা শরীরে জমিয়া যায় তখন বহুবার দাস্ত হইয়া রক্ত একেবারে পরিষ্কার হয় কারণ শরীর হইতে সে ময়লা একেবারে বাহির না হইয়া গেলে শরীর বাঁচিতে পারে না।

প্রকৃতি আমাদের চামড়ার মধ্য দিয়াও অনেক ময়লা ত্যাগের সহায়তা করেন। চামড়া দিয়া ঘর্ম্মরূপে অনেক দূষিত জিনিষ শরীর হইতে বাহির হয়। এতদ্ভিন্ন যখন বেশী পরিমাণে রক্ত দূষিত হইয়া যায় তখন শরীরকে বাঁচাইবার জন্য প্রকৃতি নানারূপ চর্ম্মরোগ দ্বারা ভিতরকার বিষ বাহিরে আনিয়া দিবার সহায়তা করেন।

প্রকৃতি আমাদের সব সময়েই মঙ্গল করিতেছেন—আমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তাহার কুফল ভোগ করিব। তিনি সব সময়েই আমাদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু যখন বিষের শক্তি খুব বাড়িয়া যায় তখন প্রকৃতির হাতের বাহিরে চলিয়া যায়। মানুষ তখন কিছুই করিতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মে কোন জিনিষ সহজসাধ্য নয়, খুব শীঘ্র ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায় না। তাহার জন্য আপনাকে পরিশ্রম করিতে হইবে, চোখের জল ফেলিতে হইবে—কাজেই স্বাস্থ্যরক্ষা একটা অবহেলার জিনিষ নয়। আপনি কোন ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে যেমন তার পিছনে দিনরাত খাটেন, তার জন্য খরচ করেন, তেমনি শরীরের উন্নতির জন্য আপনাকে খাটিতে হইবে, স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিতে হইবে। আমরা বলি, রোগ সারে কিন্তু রোগী সারে না; তাহার কারণ প্রথম সংযম ও দ্বিতীয় ধৈর্য্যের অভাব। যদি আমরা রসনা সংযত করিয়া শরীর গঠনোপযোগী খাদ্য সেবন করি ও যদি মনস্থির করিয়া একাগ্রচিত্তে কামনা করি, নিশ্চয়ই আমরা সুস্থ শরীর লাভ করিতে পারি।

শ্রীঅতুল রক্ষিত

মৃত্যু

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

"হু-হম্!" একটা বিকৃত রকমের শব্দ করে খুড়ো গলাটা পরিষ্কার করে নিলে,—সেই সঙ্গে মুখে একটু মৃদু হাসির আভাস দেখা গেল।

আমরা দুজনে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বৈকালের রৌদ্রে বারান্দার ধারে বসেছিলাম। খুড়োকে বলছিলাম আমার ভাইটির কথা, যে ঐ সমুদ্রের জলে ডুবে গিয়ে সমুদ্রতলেই আশ্রয় নিয়েছে।

শেষে একটা নিশ্বাস ফেলে আমি বল্লাম—"ওঃ খুড়ো, মরবার সময় মানুষের কত কষ্টই হয়,—ভয়ানক যন্ত্রণা পায়, না?"

"হু-হম্-হম্! মৃত্যুকে তোমার বড় ভয় লাগে বুঝি?"

খুড়োর চেহারাটা ভারী রোগা ছিল, এত গরমেও মোটা কোট সোয়েটার চড়িয়ে দোলা-চেয়ারটার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকতো। শুনেছি খুড়ো ছেলেবয়সে খুব দুর্দ্দান্ত ছিল, ত্রিসীমানার মধ্যে তার সমান কেউ ছিল না। জীবনে অনেক অত্যাচার করেছে, এখন আর সে মানুষই নেই, তার ছায়াটুকু আছে মাত্র। মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে, হাড় বেরিয়ে পড়েছে; বড় বড় চোখ দুটি দীপ্তিহীন, ঘন ভুরুর আড়াল থেকে ক্লান্তভাবে তারা দুটি নড়ে মাত্র; মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি; সপ্তাহে একবার করে প্রত্যেক শনিবার তার দাড়িকামানো অভ্যাস।

একটা শক্ত অসুখে তাকে এতটা কাবু করে ফেলেছিল; সে বছর সমস্ত শীতকালটা বেচারা শয্যাগত ছিল। তার পর হাওয়া খেয়ে স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্ত এখানে আমাদের বাড়ীতে উঠেছিল। এখানে তার অনেক আত্মীয়স্বজন আছে, অনেকের সঙ্গে জানাশোনাও আছে, তবু কখন কি হয় বলা যায় না ভেবে ডাক্তারের বাড়ীটাই থাকবার জন্ত বেছে নিয়েছিল।

আমি সর্ব্বদাই তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরতাম। লোকটিকে আমার বেশ ভাল লাগতো, বোধ হয় খুড়োও আমায় পেয়ে অসন্তুষ্ট ছিল না। যে সব গল্প-গুজব আমি চাকর-দের কাছে বা আস্তাবলের সহিসদের কাছে শুনতাম তাই এসে তাকে শোনাতাম, তখন মনে হোতো আমার গল্প শুনেই বুঝি তার সময় কাটে। আমার বয়স তখন বারো পনেরো কিংবা তার কাছাকাছি হবে।

অধিকাংশ সময়ই খুড়ো চুপ করে থাকতো, আমি যা বলে যেতাম তাই চুপ করে শুনতো; বেশী কথা বলা যেন তার পক্ষে কঠিন ছিল। কথা বলতে গেলেই কেমন হাঁফ ধরতো; জড়িয়ে-জড়িয়ে অতি কষ্টে কথাগুলো উচ্চারণ করতো। আর কিছু বলতে হলেই বার বার গলাটা পরিষ্কার করবার দরকার হোতো, কিন্তু তাতেও যেন সুবিধা হোতো না। এক একবার মনে করতাম জিভটা বুঝি জড়িয়ে যাচ্ছে,—এমনি অসাড় ও অস্পষ্টভাবে কথাগুলো বলতো। 'স' অক্ষর যাতে আছে সে কথা কিছুতেই স্পষ্ট বেরুতো না। তবে অনেকদিন অন্তর এক একবার খুড়ো হঠাৎ যেন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠতো, তখন তার কথাগুলোও সহজ হয়ে আসতো। আমি তখন খুবই খুসী হতাম, মনে করতাম এইবার বুঝি খুড়ো সেরে উঠলো।

"তা বটে। কাঁচা বয়স, মৃত্যুকে ভয়ানক বলেই মনে হতে পারে।"

"সে কি খুড়ো, তুমি কি মনে কর না যে মরতে ভয়ানক কষ্ট হয়?"

"মোটেই না।"

এমন জোরের সঙ্গে বল্লে যেন নিজে সেটা বেশ পরখ করেই বলছে। আশ্চর্য্য হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

"মৃত্যু,—হম্"—গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে—

"মৃত্যু মাঝে মাঝে এক একবার আমাদের খুব কাছে এসে উপস্থিত হয়। হু-হম্‌! আমি—আমি তা ভাল করেই জেনেছি। ব্যাপারটা এমন কিছু—ভয়ানক নয়।"

"বল না খুড়ো,—যদি বিশেষ কষ্ট না হয় তা হলে বল না কি করে জানলে!"

"হম্‌! বলবার এমন কিছু নেই। হম্‌! জীবনে অনেকবার আমার—মরার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু—সে কথা বলছি না। হম্‌! মরণ যখন খুব কাছে—এসে দাঁড়ায়, যখন তার সঙ্গে চোখোচোখি হয়, তখন মানুষ সব ভুলে যায়—ভয় পাওয়ার কথা একেবারে ভুলে যায়।"

"অ-হম্‌! প্রথম আমি দেখি যখন বয়স চার পাঁচ বছর। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে,—তখন আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকতাম—জলের মধ্যে ঢিল ছুড়ছিলাম। জলের ধারে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছের গাঁদি লেগেছে—মাছগুলো ডব্‌ডবে চোখ বের করে মুখ হাঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের ঢিল মেরে তাড়া দিতে খুব আমোদ হচ্ছিল। কেমন করে জানি না—হম্‌—একটু পরেই দেখি আমি জলের তলায় ডুবে গেছি। দেখলাম—এখানে শুয়ে থাকতে তো বেশ মজা! হম্‌! আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চাইলাম,—হম্‌—যেন নীল পর্দ্দার ভিতর দিয়ে বেশ আলো দেখছি। চারিদিকেই কেমন পরিষ্কার, চারিদিকেই নীল রং। আমার তখন কেবল মনে হোলো—হম্‌—বাঃ এখানে কি সুন্দর আলো!

"ক্রমে আমি যেন হাল্কা হতে লাগলাম—শুয়ে শুয়ে যত হাল্কা হয়ে উঠি—চারিদিকের আলো আরো তত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কি সে স্নিগ্ধতা! কেমন স্বচ্ছ জ্যোতি! আর কিছুমাত্র ভারবোধ নেই,—আমি যেন হাওয়াতে ভাসছি, হাওয়ার উপর চড়েছি,—হাওয়াটা খুব হাল্কা খুব মোলায়েম,—খুব শান্তি, নির্ম্মল, মৃদু—ভারী চমৎকার! আমার তখন মনে হোলো আর আমি কিছু চাই না, কেবল যেন ঐখানেই চুপ করে শুয়ে পড়ে থাকি। হম্‌!"

"কি আশ্চর্য্যের কথা!"

"হু-হম্‌! কোনো দিকেই সীমা পরিসীমা নেই—ওপর নীচে—এপাশে ওপাশে—চারিদিকেই স্ফটিকের মত স্বচ্ছ আকাশ—উজ্জ্বল আলোতে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। হম্‌! সাদা আলোর চারিদিক ঝলমল্‌ করছে—আলোটা এমন ঘন—সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘন আলোর একটা বিরাট কুয়াশায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। একটা অনন্ত সমুদ্র—কেবল মেঘের—আর হাওয়ার—আর আলোর সমুদ্র। সেই মেঘসমুদ্রের মাঝখানে আমি চুপ করে একা শুয়ে আছি। ভারী আরাম!"

খুড়ো গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে টেবিলের গেলাস থেকে এক ঢোঁক জল খেয়ে নিলে; আমি তখন পাশে বসে উৎকণ্ঠায় কাঁপছি; খুড়োর চোখ দেখে বুঝতে পারলাম যেন জল খেয়ে আবার কতকটা প্রাণের সঞ্চার হোলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা, নিশ্বাস নিতে পারছ না বলেও কি কোনো কষ্ট হচ্ছিল না?"

খুড়ো মাথা নাড়লে।

"মোটেই না,—একটুও না। আমি তা বুঝতেই পারি নি। কেবল মনে হচ্ছিল আমি হাল্কা, একেবারে যেন হাওয়ার মত ছাড়া পেয়ে গেছি। হম্‌! কিন্তু এই আলো-কুয়াশার মাঝে মাঝে সবুজ আর লাল রঙের লম্বা লম্বা ছায়া ভেসে বেড়াতে লাগলো—আবছায়ার মত—এখানে ওখানে সবুজের ছোপ ধরা—মাঝে মাঝে অনেক ডাল-পালাও আছে—হম্‌—কোথায় যেন একটা তালগাছের বন—গায়ে গায়ে অনেক লতা বেয়ে উঠেছে—তাতে অনেক ফুল—এক একটা ছায়ার ফুল যেন চাঁদের মত বড়—অদ্ভুত রকমের ফুলে একেবারে বন হয়ে আছে—ডালে আর ফুলে যেন জড়িয়ে গেছে—হম্‌! পুকুরের জলে যে সব লতার দাম জন্মায় আমি বোধ হয় তারই মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম।"

জোরে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে খুড়ো থামলো।

"তোমার তখন জ্ঞান ছিল?"

"হম্‌—না, জ্ঞান বোধ হয় পুরো ছিল না। কি জানো,—একটা অস্পষ্ট ছবি চোখের পর্দ্দায় এসে লাগছিল—সেটা যেন কুহেলিকার ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে প্রতি-ফলিত হচ্ছিল। হম্‌!

"তবে ঐ পর্য্যন্তই আমি জানতে পেরেছিলাম, তার পর

জেগে উঠে দেখি আমি নার্সের কোলে। সে একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে—অ-হম্! আমি তাতে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। আমার বরং দুঃখ হচ্ছিল যে তেমন আরাম আর ভোগ করতে পেলাম না।··· নার্সের যে এক ভালবাসার বন্ধু ছিল, তাকে মনে মনে কতদিন অভিসম্পাত দিয়েছি। সে কেন আরো মিনিট তিন চার গল্প করে নার্সকে অন্যমনস্ক রাখলে না! তা হলেই সব শেষ হয়ে যেতো!"

এই কথাটাতে আমার মনে বড় কষ্ট হোলো,—একটু সান্ত্বনা দেবার জন্য বল্লাম—

"তা কেন খুড়ো, জীবনে সুখও তো অনেক পেয়েছ!"

"পেয়েছি!"—খুড়ো একটু দুঃখের হাসি হাসলে। হাসিটা একপেশে, মুখের একটা পাশেও সবটা ফুটে ওঠে না। রুগ্ন মুখের বড় কাতর হাসি।

"পেয়েছি···র অতীতের সঙ্গে 'পাবো'র ভবিষ্যতের কখনো তুলনা হতে পারে না। হম্! কিন্তু এসব কথা এখনও তুমি বুঝবে না।"

আহা বেচারা! রোগ হলে মানুষের কি অবস্থাই হয়!

খুড়ো আবার এক চুমুক জল খেয়ে বলতে সুরু করলে। এতটা তাকে না বকালেই বোধ হয় ভাল ছিল···

"অ-হম্! দ্বিতীয়বারে আমার বয়স তখন তোমারি মতন হবে। যে দিনের কথা বলছি তখনো বসন্তকাল পড়ে নি। নদীর জল তখনো বরফে ঢাকা, দুপুরবেলা একটু একটু করে বরফ গলতে সুরু হয়েছে। নদীতে জলের খুব স্রোত—জলের তোড়ে জায়গায় জায়গায় বরফ ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

"গোলাবাড়ী থেকে খড় বোঝাই করে আনবার জন্য বাবা আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন অন্য ছেলেদের সঙ্গে: আমাদের সেই গোলাবাড়ীর কথা তোমার মনে আছে তো,—হম্! তখন আর বরফের ওপর দিয়ে যাবার রাস্তা নেই, কাজেই পুল পার হয়ে যেতে হবে। পুলটা ছিল বহুদিনের পুরানো; তাকে পুল বলা চলে না, একটা লম্বা সাঁকো মাত্র, তাতে না আছে রেলিং না আছে কিছু—কেবল লোহার বরগার ওপর সারি সারি তক্তা পাতা,—হম্! পুলটা খুব উঁচু—তাই স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। চওড়া দশ ফুটের বেশী হবে কি না সন্দেহ—একটা ঘোড়ার গাড়ী কোনো রকমে পার হতে পারে।

"ঢেউয়ের ছাট লেগে লেগে পুলের তক্তাগুলো ভুবড়ে গিয়েছে, পিছলও হয়েছে। আমাদের গাড়ীর চাকা তার ওপর দিয়ে হড়কে যেতে লাগলো—মধ্যে মধ্যে চাকাগুলো একেবারে ধার ঘেঁসে আসতে লাগলো। পুলের নীচেই নদীর প্রচণ্ড স্রোত ফুলে ফুলে গর্জ্জাচ্ছে—বরফের গায়ে ধাক্কা লেগে সাদা ফেণার ঝাপটা এক একবার ওপর পর্য্যন্ত উঠে আসছে,—ভরা নদীতে বান হলে কি রকম এলোমেলো ঢেউ হয় দেখেছ তো? মাঝে মাঝে ঘূর্ণী ঘুরছে,—আর বড় বড় বরফের চাঙড় বিপুল শব্দে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে আবর্ত্তের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। আমি গাড়ীর ওপর বসে নীচের দিকে চাইতে সাহস পাচ্ছি না। চাইলেই মনে হয়—কি অতলস্পর্শ গভীর!"

"ইস্—!"

"হম্! অ-হম্-হম্! ফেরবার সময় অন্য সব ছেলেরা আগের গাড়ীতে পার হয়ে চলে গেল। পিছনের খড় বোঝাই গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছি আমি আর ব্লাকেন্। পুল পার হবার সময় আমার বোঝার ওপর উঠে বসতে ভরসা হয় নি—সেইজন্য পাশে পাশে চলেছি—আগে ব্লাকেন, পিছনে আমি—তবে সে সময় আমি ভয় পাই নি। সারাপথ বেশ এসেছি, আর একটু গেলেই বাড়ী পৌঁছে যাব। ব্লাকেন খুব হুঁসিয়ার; কিছু গোলমাল হলে একাই সে সাম্‌লে নিতে পারে।

পুলের প্রথম অংশটাই ছিল খারাপ, সেখানটা বেশ পার হয়ে গেলাম; মনে করলাম আর কোনো ভয় নেই। ব্লাকেনের খুব কাছ ঘেঁষে যেতে যেতে সাহস পরীক্ষা করবার জন্য নীচে জলের দিকে একবার চেয়েও দেখলাম; দেখতে খুবই সুন্দর—আমার তো মনে হোলো অতি চমৎকার। মস্ত একটা ঘূর্ণী ঘুরছে—তার ওপর দিকটা গেরুয়া রঙের—ভিতর দিকটা গভীর কালো। বরফের টুক্‌রোগুলো তার মধ্যে পড়ে ঠোকাঠুকি করছে। পুলের কিনারাটা তখন আমার থেকে প্রায় দু ফুট মাত্র তফাৎ।

"কেমন করে জানি না—হঠাৎ গাড়ীর খড়ের বোঝাটা আমার দিকে কাৎ হয়ে পড়লো,—একেবারে আমার গায়ের উপর ঝুঁকে এলো—কাজেই কিনারা থেকে দু ফুট ব্যবধানটা এখন এক ফুটে এসে দাঁড়ালো—" একটু থেমে খুড়ো হাই তুল্লে।

"নিজেকে বাঁচাবার জন্ম আমি তাড়াতাড়ি খানিকটা এগিয়ে ব্লাকেনের আরো কাছে গেলাম। কিন্তু এই সময় বোঝার সুমুখ দিকটাও একেবারে আমার কাছে হেলে পড়লো—"

"কি সর্ব্বনাশ!"

"কিনারা থেকে তখন আর অল্পই ব্যবধান, সুতরাং আমি আর এগোতে পারলাম না। 'এই ব্লাকেন' বলে একবার চেঁচিয়ে উঠে আমি থেমে গেলাম, মনে করলাম একটু দাঁড়াই। গাড়ীটা পাশ কাটিয়ে কোনো মতে চলে যাক্। কিন্তু বোঝার পিছন দিকটাও আবার খানিকটা ঝুঁকে এলো—"

"কি ভয়ানক!" বলে আমি ভয়ে খুড়োর চেয়ারের হাতলটা চেপে ধরলাম।

"সমস্ত বোঝাটা এইবার একসঙ্গে কাৎ হয়ে এলো,—এক ইঞ্চি—আরো এক ইঞ্চি—তার পর থেমে গেল।"

খুড়ো প্রকাণ্ড হাই তুল্লে। আমি তখন সজোরে চেয়ারের হাতলটা চেপে ধরে আছি।

"অ-হম্-হম্! রক্ষা পাবার তখন আর কোনো উপায় নেই। এদিকে বোঝা, ওদিকে পুলের শেষ সীমা,—মাঝে এতটুকু সামান্য ব্যবধান যে আমার জুতোর খানিকটা পুলের ধার থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, কিনারার উপর ভর করে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছি। নদীর দিকে আমার মুখ, পিঠ কুঁজো করে সাম্‌নের দিকে একটু ঝুঁকে রয়েছি—নীচে বরফের ঘূর্ণী—কখন পড়ি কখন পড়ি অবস্থা—শূন্যে দুহাত বাড়িয়ে কোনো রকমে শরীরের সামঞ্জস্য রাখছি।"

"ইস্ খুড়ো,—আর বলতে হবে না।"

"বোঝাটাও যে ধরবো তার কোনো উপায় নেই। যদি একটু নড়ি বা একটা হাত তুলি—তা হলেই জলে পড়ে যাব।"

আবার খুড়ো হাই তুল্লে; এক চুমুক জল খেয়ে নিলে।

"তখন দেখলাম মৃত্যুকে একেবারে মুখোমুখি! হ-মম্! বেশ জানলাম আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বরফের ভিতর ডুবে যাব। ঐখানে—ঠিক ঐ জায়গাটিকে লক্ষ্য করে পড়বো,—ঘূর্ণীর মধ্যে না পড়ে তার একটু পাশে পড়াই ভাল—ঐখানে জীবনের শেষ নিশ্বাস ফেলবো—আর পা ঠিক রেখে দাঁড়ানো যায় না।

"ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার উদ্বিগ্ন মন হঠাৎ একেবারে শান্ত হয়ে গেল। যেখানটায় পড়তে হবে একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে রইলাম; জায়গাটাকে ভাল করে দেখে নিলাম; মনে হোলো সেখানটা খুব চেনা জায়গা, ভয়ের কিছু নেই। নদী যেন ঐখানে হঠাৎ এক জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করে উঠলো, অতি প্রশান্ত সে মুখখানি। একটি মাত্র চোখ দিয়ে যেন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে—দেখছে কেমন ভাবে আমি বাঁচবার চেষ্টা করছি। যেন আমায় সে বলছে—'ভয় পেও না,—যা দেখছো এত নিষ্ঠুর আমি নই।' আমি যেন শান্তি পেলাম; হঠাৎ দেখতে পেলাম পৃথিবীটা আমার কাছে কিছুই না; সব শেষ হয়ে গেল। এইবার ওখানে যাব। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে আশ্চর্য্যরকমে নিরাপদ বোধ করলাম।

"যখন একেবারে পড়বো পড়বো হয়েছি—ঠিক সেই সময় টের পেলাম আমার বাঁ হাতে মুঠোর মধ্যে কি যেন ধরেছি,—একগাছি খড়।"

"আ—হ্!"

"সামান্য একটা খড়। কেমন করে যে সেটা হাতের কাছে এলো তা কিছুই জানি না; আর কেমন করে যে এমন সম্ভব হোলো তাও জানি না—তবে ঐ খড় থেকেই একটা ধরবার জিনিষ পেলাম—সেইটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম—ঘুরে গিয়ে বোঝাটার গা ঘেঁষে আশ্রয় নিলাম।

"এইটুকু কেবল মনে আছে যে দলের ছেলেরা তখন দৌড়ে এসেছে আমাকে ধরতে। কিন্তু তার আগেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছি।"

আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লাম। খুড়ো গ্লাসের জলটুকু শেষ করে অল্প একটু হাসলো,—হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে বসলো।

"হম্! এই সব কাণ্ড হয়ে যাবার পর তখন আমার প্রাণে ভয় এলো,—ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম···তা হোক্, কিন্তু মৃত্যুকে একেবারে সুমুখে দেখা যায় তখন তো কিছু ভয় থাকে না—তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। মরা তাই খুব বেশী কষ্টকর হয় না।"

আমার এতক্ষণে বিবেচনা হোলো যে খুড়োকে কেবল এই কথার আলোচনা করতে দেওয়া আর উচিত নয়, তাই আমি অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করলাম।

"ভাল কথা মনে পড়েছে খুড়ো,—বাবা যে গাড়ীর জন্য নতুন ঘোড়াটা কিনেছে, তুমি দেখেছ কি? ঘোড়াটা ভারী সুন্দর, জানো?"

ঘোড়ার কথা হলেই খুড়ো একেবারে মেতে ওঠে সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য মরার কথা ভুলে গেল, ঘোড়ার বিষয়ই নানা রকম আলোচনা চলতে লাগলো। খুড়োর নিজের কেমন একটা ঘোড়া ছিল, কথায় কথায় সেই কথা এসে পড়লো। আবার যে ঘুরে ফিরে সেই মরার কথাই এসে পড়বে তা আমার মনে হয় নি।

"আহা, আমার সেই বোর্কেন! হম্! বেচারা এখন বুড়ো হয়ে গেছে,—এখন মাঠে লাঙ্গল টানে। কিন্তু জোয়ান বয়সে তার ভারী তেজ ছিল—অ-হম্—হম্—তার জন্যেও আমি আর একবার মৃত্যুকে দেখতে পাই।"

"ও, যে সময় সেই থিয়েটারের মেয়েটি মারা যায়? সে কত বছর হবে?"

"না না,—হম্—সে তোমার জন্মাবার আগে। বোর্কেনকে আমি ডেনমার্ক থেকে কিনি,—খুব উঁচুদরের জানোয়ার ছিল। হম্! অমন সুন্দর মুখশ্রী আমি আর কোনো ঘোড়ার দেখিনি,—আর কি সুন্দর তার পা, কি সুন্দর দাঁড়াবার ভঙ্গী; কিন্তু এ সব কথা তুমি এখনও ভাল বুঝবে না। কান দুটি কি সুন্দর,—সর্ব্বদাই যেন সচকিত,—আহা! এখনও বোর্কেনের কথা মনে পড়লেই আমার কত আনন্দ হয়! বেচারা বুড়ো হয়ে গেছে! এখন আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে, তারও দিন ফুরিয়েছে আর কি!

"অ-হম্! কেনার পর থেকেই তাকে রোজ গাড়ীতে জুতে বেড়ানো হোতো। সকলেরই তার ওপর নজর পড়ে ছিল। সেই যে লিজি—সে ঘোড়াটাকে দেখে এমনি মুগ্ধ হয়ে গেল যে কেবল এই জন্যেই সে যেচে আমার সঙ্গে ভাব করলে—যাতে তাকে আমি একটু গাড়ীতে নিয়ে বেড়াই। হম্—হম্! কিন্তু—যাক্, এটা তুমি দেখে নিও হান্স, যেখানেই স্ত্রীলোক সেখানেই বিপদ। অ-হম্! আবার সেই স্ত্রীলোক যদি একটু অসাধারণ হয় তবে তার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান,—সকল বিষয়েই!

"যাক্, একদিন বোর্কেন হঠাৎ ক্ষেপে ভড়কে উঠলো, দুর্ভাগ্যক্রমে লিজি তখন তার লাগাম ধরে চালাচ্ছিল। এক নিমেষে একটা কাণ্ড হয়ে গেল। লাগামটা আমার হাতে নিয়ে কায়দা করবার আগেই গাড়ীর একটা চাকা খানায় মধ্যে পড়ে গেল। সেই খানে একটা দেয়ালের গায়ে ধাক্কা লেগে গাড়ীখানা চক্ষের পলকে চুরমার হয়ে গেল। লিজি একেবারে ছটকে পড়ে দেয়ালের সঙ্গে পিষে গেল, মাথাটা দুফাঁক হয়ে গেল। আমি একটু দূরে গিয়ে পড়লাম। আমার যদিও তেমন লাগে নি, কিন্তু আমিও তখন এ পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছিলাম; কেবল তফাৎ এই যে আমাকে আবার ফিরে আসতে হোলো, তাই এখনো বেঁচে আছি। এখন কেবল আমার মনে পড়ে সেই ঘোড়া ছুটছে—সেই প্রচণ্ড ধাক্কা—গাড়ীটা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চাকা উল্টে পথের ধারে পড়ে রইলো······হম্! আমি একটুও ব্যথা টের পাই নি। লিজিও কোনো ব্যথা পায় নি; তার মুখ দেখেই তা বুঝতে পারলাম। চোখে শুধু উদ্বিগ্ন দৃষ্টি—ঘোড়াটা ভড়কে ওঠার সময় ঠিক যে দৃষ্টি তার দেখেছি। যেন সে তখনো তেমনি ঘোড়ার রাস টেনে ধরে আছে। মুখে চোখে একটা নির্ভয় ভাব—যেন এখনি ঘোড়াটাকে থামিয়ে ফেলবে। হম্! বেচারা বেঘোরে মারা গেল। কিন্তু মরতে তারও কোনো কষ্ট হয় নি।"

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। আমি রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে

মেঘের দিকে চেয়ে রইলাম। খুড়োও এক দৃষ্টে চেয়ে আছে,—চোখে তার প্রাণহীন দৃষ্টি,—বাইরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে কি নিজের ভিতরের দিকে চেয়ে আছে বলা যায় না।

"......আর এইবার অসুখের সময় মৃত্যুকে আর একবার দেখে নিয়েছি। হম্! সেদিন সকালে নিয়মমত বিছানা থেকে উঠেছি। পোষাক পরে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি,—হঠাৎ মনে হোলো পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।...যত পা শক্ত করে দাঁড়াবার চেষ্টা করি, কিছুতেই পারি না। হাত পা অবশ হয়ে যেন নেতিয়ে পড়লো, একটা অদৃশ্য শক্তি যেন জোর করে আমাকে মাটিতে টেনে ফেলে দিলে—তাকে নিবারণ করে কার সাধ্য! আমি ভয় পাওয়ার চেয়ে আশ্চর্য্যই বেশী হলাম। হম্! ঐ যে অনিবার্য্য শক্তি—যখন তার ধারণা করা যায় তখন নির্ব্বাক হয়ে যেতে হয়।

"যখন আবার জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি একটা জড়পিণ্ড মাত্র,—যেন ভারী সীসার মত অতল অন্ধকারের মধ্যে কেবলই ডুবে তলিয়ে যাচ্ছি,—আর নিজেকে দারুণ নিঃসহায় বোধ করছি। সমস্ত অঙ্গে দারুণ ব্যথা—চারিদিক যেন ঘুরছে। বিছানাটা সমেত কে যেন আমাকে নিয়ে কোথায় উড়ে চলেছে!......হম্! আমার তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নি। যেন গভীর তন্দ্রার মধ্যে আচ্ছন্ন ছিলাম। চোখের পাতা খুলে চাওয়া বা আঙুলটি নাড়ানো পর্য্যন্ত আমার পক্ষে অসম্ভব। তখন কেবল একটিমাত্র জিনিষ কামনা করেছি—পরিপূর্ণ বিশ্রাম। আমার প্রতি রক্তবিন্দু, প্রত্যেক অণুপরমাণু, প্রত্যেক জৈবকণা কেবল চেয়েছে বিশ্রামের মধ্যে ডুবে যেতে,—যাকে বলে একেবারে সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ লাভ করতে। গভীর অনন্ত নিদ্রা,—যেন নিশুতি রাত্রি ছাড়া আর কিছুই না থাকে। হম্-হম্! আমি জানতাম যা আমি কামনা করছি তাই মৃত্যু—কিন্তু তাই তখন আমার একমাত্র প্রেয়। পরম তৃপ্তির সঙ্গে আমি তাই চেয়েছিলাম; কামনাবিহীন অনুভূতি নিয়ে আমি তারই প্রতীক্ষা করছিলাম, মনে করেছিলাম মৃত্যু এবার নিশ্চয় আসছে। সজ্ঞানে থাকতেও তখন কষ্ট হচ্ছিল,—মনে হচ্ছিল হাত পা এলায়িত করে দিয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে মরা—সে কি আরাম, কি গভীর সান্ত্বনা! মৃত্যুর এতটা কাছে এসে যখন দাঁড়ায় তখন কি আর মানুষ তাকে ভয় করে? হম্!"

"এখনো এক এক সময় মনে হয় এই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বসেই অনায়াসে মরে যেতে পারি। কথাটা মনে করতেও আরাম লাগে।

"লোকে মৃত্যুর ছবি আঁকে—তলোয়ার হাতে এক কঙ্কাল,—এর চেয়ে ভুল ধারণা আর নেই। গোঁড়া ধার্ম্মিকদের মাথা থেকেই এ আজগুবি কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। তারা নিজে কখনো মৃত্যুকে চোখেই দেখে নি। কঙ্কালমূর্ত্তি হতেই পারে না—মৃত্যুর সুন্দর দেবমূর্ত্তি, করুণায় ভরা। পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক্—তার দৃষ্টি একাগ্র ও গম্ভীর—দূর থেকে মনে হয় বড় কঠোর! কিন্তু কাছে এলে কোনো বিভীষিকা থাকে না,—তখন দেখা যায় অতি শান্ত, স্নেহার্দ্র। চোখ দুটি বড় বিশাল,—গভীর সহানুভূতিতে ছল্‌ছল্ করছে! হম্!—হাঁ, সহানুভূতিই তাতে দেখতে পাওয়া যায়।

"মৃত্যু কখনই আমাদের অমঙ্গলকামী নয়। নরম হাতে বুকে টেনে নেয়, সমস্ত কষ্ট দূর করে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। স্বপ্ন দেখায়। আমাদের চারিদিকে স্বপ্নের জাল রচনা করে,—স্বপ্নের ঢেউ খেলে যায়,—সে ঢেউ কাঁপতে থাকে। এই স্বপ্নের মধ্যে তখন আলো ফুটে ওঠে—ভোরবেলাকার কুয়াশাঘেরা আলোর মত। তখন থেকে আর এক জীবন।"

আমি রেলিংয়ে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। চাইতে চাইতে দেখলাম মেঘগুলো ক্রমে ক্রমে মানুষের মত এক বিরাট আকার গড়ে তুল্লো। সে মূর্ত্তি যেন দৈত্যের মত কালো, ভীতিব্যঞ্জক—ক্রমে দেখতে দেখতে কঠোর ভাব খসে যেতে লাগলো,—যতই দেখি মেঘ মূর্ত্তি ততই নরম হয়ে যেতে থাকে।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

Arne Garborg এর Death নামক গল্প হইতে। ইনি নরওয়ে দেশের লেখক, নিজ ভাষায় গল্প লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। জন্ম ১৮৫১, মৃত্যু ১৯২৪।

রবীন্দ্র-জীবনী

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্‌-এ

শান্তি-নিকেতন হইতে যে রবীন্দ্র-জীবনী প্রকাশিত হইতেছে এবং যে গ্রন্থের লেখক বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে বলিয়াই সকলে আশা করে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই জীবনচরিতের প্রথম খণ্ড পড়িয়া আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। জীবনচরিত বলিতে যদি একটি বিস্তারিত বর্ষপঞ্জী বুঝায়—তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইয়াছে। কারণ তিনি যথেষ্ট যত্নপূর্ব্বক কবির জীবনের ঘটনাবলীর ও সাহিত্য-সাধনার কালানুক্রমিক ধারা অনুসরণ করিয়া আমাদিগের নিকট প্রকটিত করিয়াছেন। ইহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিশালত্ব বুঝিতে হইলে শুধু তাঁহার অজস্র সৃষ্টির অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য কালবিভাগ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে চলিবে না। বর্ষে বর্ষে তিনি কিরূপ অক্লান্তভাবে কাব্যে, গানে, নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে ও প্রহসনে বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছিলেন; ভারতী, সাধনা, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া স্বতঃই কিরূপে তাঁহার একটির পর একটি সাহিত্যিক যুগ সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছিল, তাহার যথাযথ ইতিহাসে আমাদের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাইব না। কবির এই বিপুল সৃষ্টিরাজ্য হইতে তাঁহার মানসলোকে আমাদিগকে পৌঁছিতে হইবে। তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভার এক একটা দিক সমগ্রভাবে বিচার করা চাই। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি আরও অনেক কিছু। আমরা যেমন 'কবি' রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য বুঝিতে ইচ্ছা করি, তেমনই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, গদ্য-লেখক রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকেও চিনিতে চাই। এ সব ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত-রচয়িতা, হাস্যরসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ্, স্বদেশ-প্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক, ভক্ত ও কর্ম্মী। এই যে বিচিত্র রশ্মির সমন্বয়ে রবি-প্রতিভার শুভ্র আলোক তাঁহার সৃষ্টিরাজ্যের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে কবির জীবনীকার যদি তাহাই একটি একটি করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখান তবেই তাঁহার জীবনী রচনা সার্থক হইবে।

গ্রন্থের ভূমিকায় প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন,—'রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ও কাব্যগত জীবনের এই বৃহৎ সম্মিলিত রূপ সংহত করিয়া দেখানোই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।' লেখক কিন্তু কবির কাব্যগত জীবনের যে সামান্য আভাস আমাদিগকে দিয়াছেন তাহাতে আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। উপরে আমরা কবিপ্রতিভার যে সকল বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করিয়াছি সেগুলির উপরে সমালোচকের সূক্ষ্ম ও বিচারনিপুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নাই; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কবির রচনাবলী (বিশেষতঃ গদ্য প্রবন্ধাবলী) হইতে বহুলাংশ উদ্ধৃত করিয়া কবি-মনের ক্রমাভিব্যক্তির সহিত পাঠকের পরিচয় সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার ফলে গ্রন্থকলেবর যেরূপ অনাবশ্যকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে তদনুরূপ ফললাভ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। দ্বিতীয় খণ্ডে যদি পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া এক একটি স্বতন্ত্র আলোচনা সন্নিবেশিত হয় তাহা হইলে অবশ্য আমাদের অনুযোগের কোন কারণ থাকিবে না। কিন্তু আপাততঃ আমরা দেখিতেছি যে 'বনফুল' প্রভৃতি কবির অত্যন্ত কাঁচা বাল্যরচনাগুলি এমনই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে যে সেগুলি তাঁহার পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠ রচনার মর্য্যাদালাভ

করিয়াছে। যাহা দুই চারি পৃষ্ঠায় শেষ করিলেই বেশ সুশোভন হইত তাহা পুস্তকের প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা জুড়িয়া বসিয়াছে। ইহাতে কবির প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে এগুলি কোন সাহায্যই করিবে না। তারপরে লেখক যেমন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন তেমনই কবির রচনাগুলির উল্লেখের সঙ্গে বড় বড় অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাব্যাদি রচনার ইতিহাস ও সেই সকল রচনার আলোচনা একই সঙ্গে এইরূপে সারিয়া না ফেলিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ আরও গুরুতর। বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াই যখন পদে পদে প্রতি পৃষ্ঠায় নানারূপ বর্ণাশুদ্ধি চোখে পড়িতে থাকে তখন মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে, কারণ বিশ্বভারতীর ছাপমারা পুস্তকে ইহা একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একই প্রকার বানান ভুল বহুবার দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া গেলে মনে হইতে থাকে যে এ গুলি হয় ত অনিচ্ছাকৃত মুদ্রাকরপ্রমাদ নয়, কিন্তু প্রচলিত বানানের বিরুদ্ধে লেখকের একটা বিরাট বিদ্রোহ। আমরা ধর্ম, কর্ম, পূর্ব, সর্ব প্রভৃতি রেফযুক্ত শব্দগুলির ভারতের পশ্চিম প্রান্তে প্রচলিত দ্বিত্বহীন বানানের কথা বলিতেছি না। কারণ এরূপ বানান বাঙ্গলায় অপ্রচলিত হইলেও অশুদ্ধ নয়। অথবা রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে ফলতঃ, বস্তুতঃ প্রভৃতি তস্ ভাগান্ত শব্দগুলির বিসর্গ-ত্যাগও বাঙ্গলায় খুব দুষনীয় না হইতে পারে। কিন্তু যখন দেখি এক দিকে ঘনিষ্ট, একনিষ্ট, বহুনিষ্ট, গোষ্টগৃহ, চতুষ্পাটি এবং অপর দিকে যথেষ্ঠ, বৈশিষ্ঠ প্রভৃতি বহু শব্দে সংস্কৃতানুযায়ী বানানের ঠিক বিপরীত রূপ মুদ্রিত হইয়াছে তখন এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে লেখক ইচ্ছা করিয়াই ট ও ঠ এর স্থান বিনিময় করিয়াছেন। তারপরে যদিও তিনি 'ইতঃ পূর্ব্বে' লিখিয়া নিজেকে সংস্কৃতপন্থী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তথাপি 'মনহর' 'যশলাভ' লিখিয়া অতি আধুনিক লেখকদেরও হারাইয়াছেন। কিন্তু তখনই আবার 'পুনর্প্রতিষ্ঠা'র (৩৬৮ পৃ) দেখি বিসর্গ with a vengeance। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে তিনি নিজের নিয়ম ব্যতীত অন্য কোন নিয়ম মানেন না, না সংস্কৃতর, না বাঙ্গালার। নিম্নে ইহার আরও কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি, যথা—শশঙ্কিত, বিষদভাবে, নিরাশক্তি, শ্বাশত, অপারক, সত্ত্বা, কৃতি, অনোপযোগী ইত্যাদি। উদীপ্তকর, উদ্ধৃতযোগ্য প্রভৃতি প্রয়োগও বোধ হয় তিনি ব্যাকরণ-দোষদুষ্ট বলিয়া ধরেন না।

বানান ছাড়িয়া এইবার লেখকের ভাষার কিছু নমুনা দিব। 'বিশ বৎসর বয়স, না কিশোর না যৌবন।' ১১১ পৃষ্ঠা। 'কর্ণের যে যুক্তি তাহার উপর কেহই বলিতে পারেন না যে **কর্ণের পক্ষে পাণ্ডব পক্ষে** আশা (?) উচিত ছিল।' ৩১৯ পৃষ্ঠা। 'সাহিত্যে দ্বন্দ্ব (?) চিরন্তন। * * কিন্তু তিনি **কখনো** শীলতা ও শ্লীলতার সীমানা ছাড়াইয়া **কখনো** ব্যক্তিগত শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।' ৪৭৩ পৃষ্ঠা।

কয়েকটি তথ্যের ভুল দৃষ্টিগোচর হইল। ৩১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ১৩০৩ সালের শেষে—১৮৯৬ এর এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের বিখ্যাত ভূমিকম্প হয়। ইহা ঠিক নয়। ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে, ১৮৯৭, জুন মাসে ভূমিকম্প হইয়াছিল। এক স্থলে দেখি পেড্‌লার সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে। পেডলার সাহেব শেষ পর্য্যন্ত ডিরেক্‌টর অব্ পাব্‌লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সান ছিলেন, ভাইস্ চ্যান্সেলার হন নাই। সখারাম গণেশ দেউস্করের নাম সর্ব্বত্র (সূচীপত্র ছাড়া) দেউষ্কর লেখা হইয়াছে। আর ক্ষীরোদপ্রসাদ রূপান্তরিত হইয়াছেন ক্ষীরদপ্রসাদে।

পরিশেষে লেখকের একটি মন্তব্য কতদূর বিচারসহ তাহার আলোচনা করিয়া এই ক্ষুদ্র সমালোচনার উপসংহার করিব। প্রভাত বাবু লিখিতেছেন,—'বিবেকানন্দের সকল মহত্ব (?) সত্বেও তিনি বঙ্গের যুব-মনকে বহুলপরিমাণে যুক্তির পথ হইতে লইয়া গিয়া বিশ্বাসের পথে চালনা করিয়া মনের চলিষ্ণুতা ও প্রগতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়।'

এরূপ উক্তি লেখকের অজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি যদি স্বামী বিবেকানন্দকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে জানিতে পারিতেন বাঙ্গলার আধুনিক নব

জাগরণের মূলে এই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব ও বাণীর প্রেরণা কতদূর ব্যাপ্ত ছিল। বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্ম্ম-প্রচারক। ধর্ম্ম যুক্তিসর্ব্বস্ব ও বিশ্বাসনিরপেক্ষ হওয়া চলে কিনা সে তর্ক আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াও একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে বিবেকানন্দ 'অন্ধ'বিশ্বাসের প্রশ্রয় দিয়া বাঙ্গালীর মন পঙ্গু করিয়া দেন নাই। সাধনার যে ধারা ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে মূর্ত্তি পূজা অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, আমাদের দেশের অসংখ্য সাধক যে পন্থা অনুসরণ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন রবীন্দ্রনাথ যদি সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকেন,—তবে সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু সেই জন্য তাঁহার কোন চরিত-লেখক যদি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে বিবেকানন্দ বঙ্গ যুবকের মনের 'চলিষ্ণুতা ও প্রগতিকে আচ্ছন্ন করিয়া-ছিলেন' তাহা হইলে আমরা সেই লেখককে ক্ষমা করিব না।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

অন্ধকার আর আলো

অজিত মুখোপাধ্যায়

সবাই বলে ঘুমোও এখন, রাত হয়েছে বেশী,
রাত জেগে আর কে হয়েছে বড় ?
শিরার শোণিত শীতল হ'ল, শিথিল হ'ল পেশী
শয্যাপরে লুটিয়ে শুয়ে পড়ো।
আমার আঁখির তন্দ্রাহরণ করে'—
আকাশ হ'তে খস্‌লো তারা পড়লো দিগন্তরে ॥
শব্দহারা স্তব্ধ-বায়ু রাতের তারাগুলি।
ঘুমিয়ে-পড়া-পৃথ্বী-গ্রহের বুকের ধ্বনি শুনি ॥

দিনের বেলা আমার ঘরে লক্ষজনের ভীড়
দ্বন্দ্ব বাঁচা মরা।
রাতের হাওয়া বার্ত্তা আনে লক্ষ শতাব্দীর ;
নিহারিকার বিপুল বেগে সৃষ্টি ছিল ভরা,
শব্দ এলো, এলো বাতাস, পৃথ্বী হ'ল জড়ো।
মগজভরা বুদ্ধি নিয়ে মানুষ হ'ল বড়ো ॥
কে যেন এ অমানিশার নিকট-আঁধিয়ারে
সৃষ্টি করার দৃষ্টি দিল তারে ॥

এমন রাতে কতো কথাই ভাবি।
ভুবন জুড়ি' ছড়িয়ে দিছি আমার স্নেহের দাবী ॥
মনের ঘরে দুয়ার ছিল আঁটা।
চলা'র ভয়ে অলস-পায়ে বিঁধতো শুধু কাঁটা ॥
কাজলমাখা-নিশীথিনী,—আগল গেল খুলে।
চিহ্নহারা অসীমপথে ভরলো বনফুলে ॥
নাচ্‌লো তোমার শাড়ীর আঁচল রাতের পুবে বায়ে।
মন মেতেছে চলার নেশায় মিলিয়ে পায়ে পায়ে ॥
কাঁদছে মানুষ,—কাঁদছে গভীর রাতি।
অন্ধকারে চক্ষু বুজে নিভিয়ে দিয়ে বাতি ॥

খেয়াল আছে এই পলকে রিক্ত হ'ল কা'রা ?
স্বামীর শোকে পত্নী কাঁদে, শিশু মাতৃহারা ;
বৃদ্ধা মায়ের জোয়ান ছেলে যক্ষ্মা রোগে মরে,
আলো, বাতাস, ভাতের অভাব সবার ঘরে ঘরে ?
নৃত্য ছেড়ে ভৃত্য হ'ল, কলম ছেড়ে কুলী।
এমন রাতে তা'দের বলো কেমন করে ভুলি ?

জীবনজোড়া যুদ্ধে যাদের ফুরিয়ে গেল আশা
তাদের দিও সান্ত্বনা আর একটু ভালবাসা ॥

পথ চেয়ে কে চম্‌কে ওঠে পায়না পায়ের সাড়া
মনের দুয়ার রুদ্ধ যে তার কেউ দিলেনা নাড়া
শুকতারা তা'র দুঃখ বোঝে, একলা জেগে থাকে
রাতের পারে যাবার বেলায় স্বপ্ন দিয়ে ঢাকে ॥
ভোরের আলোয় কালো মেয়ে ফুল তুলিতে ছুটে
মুখ শুকিয়ে ফিরলো পায়ে কুলের কাঁটা ফুটে ॥
অলস-চরণ অবশ দেহ বাড়লো বুকের জ্বালা।
পুষ্পশরের পাপ্‌ড়ী খসে,—হয়না গাঁথা মালা ॥
সিঁদুর মোছে সীমন্তিনী, সজ্জা ছাড়ে সতী।
পতিহীনার তনুর পাশে কাঁদলো বুঝি রতি ॥
নীল সায়রের জল শুকালো—পঙ্কজিনী মরে।
ফল্‌লো নাকো সোনার ফসল বন্ধ্যা বালুর চরে ॥
আজকে আমায় ক্ষমো।
অন্ধকারে হারা'তে মন লাগছে মনোরম ॥
কোথায় যেন তন্বী মেয়ে বাঁধন অবহেলি।
নাম্‌লো ধরায় আকাশ হ'তে অঙ্গে রাঙা চেলী ॥
আঁচলভরা ফোটা কুসুম, হয়নি গাঁথা মালা।
প্রিয়র বাহু এড়িয়ে চলে,—বাঁধন বড়ো জ্বালা ॥
দীপ্ত-অরুণ আলোর রথে আকাশ পথে ছুটে',
তন্বী উষার পায়না নাগাল ;—ধরা'র বুকে লুটে'—
খানিক কাঁদে, খানিক দুঃখে জ্বলে।
গলারূপোর গঙ্গা তখন ঝল্‌মলিয়ে চলে ॥

* * *

রাত কেটেছে অন্ধকারে ব্যথার মালা গেঁথে।
প্রিয়তমের বন্ধদ্বারে ছিন্ন-আঁচল পেতে ॥
ভোরের আলোর সোয়গোলেতে দোল্‌ লেগেছে মনে
মাণিক আমার হারিয়েছিল, পেলাম এতক্ষণে ॥
এখন ভাবি রৌদ্রভরা প্রাঙ্গণেতে আসি'—
নদী, আকাশ, আলো, বাতাস সবই ভালবাসি ॥
দিনের আলোয় তোমায় মনে পড়ে।
মনের কাঁদা, রাতের আঁধার টুটলো আলোর ঝড়ে ॥

ব্যোমযানেতে উড়্‌লো মানুষ, করতে মেরু জয়।
সাগর জলে বন্যা আলোর করবে কা'রে ভয় ?
উষার আলোয় উত্তরিল তুষার-ছাওয়া চূড়া।
নদীর তানে পাখীর গানে সুর হয়েছে সুরা ॥
তোমায় নিয়ে আমার ঘরে সুখের সমারোহ।
মূর্খে বলে মরুর মাঝে মরীচিকার মোহ ॥

তোমার ঘরে নিত্যদিনের সুরে
অভিমান আর অবহেলার কান্না মরে ঘুরে ?
কল্‌তলাতে জল্‌ ভরে কে, বাল্‌তী বকেই চলে
"শুনছো ওগো, জঙ্‌ ধরেছে আমার বুকের তলে ॥
"যত্ন করা দূরের কথা, ছোঁয়না মোরে কেহ
"এমন করে ক'দিন থাকে পাতলা টিনের দেহ ?
"দুদিন বাদে দেখবে গায়ে ফুটো।
"আঁস্তাকুড়ে কাঁদবো বসে মাথায় ছায়ের মুঠো।"
ষ্টোভ্‌ জ্বলেছে,—ফোঁস্‌ ফোসিয়ে রোষে—
"মুখ দিয়ে যে তেল উঠেছে—সেকি আমার দোষে ?
"এমন করে আর পারি না কণ্ঠ বুজে আসে—
"পিন্‌ ঘরে নেই ? তাকের ওপর, রেকাবগুলোর পাশে
"জানি আমার এমন দশা হ'বে।
"ভাঁড়ার ঘরে খাটের তলায় ঠেলবে আমায় কবে ?"
রেকাব্‌ বাটী শিউরে বলে, "সাবধানে ভাই ওরে
"যে ক'টা দিন ঠুন্‌কো দেহ রাখতে পারি ধরে।
"কানায় কানায় চা ভরে দাও, বক্ষ থাকুক ভরা
"লক্ষ্য আমার লক্ষ লোকের অধর পরশ করা ॥"

একটু ভেবো খেয়াল রেখো এরাও কাঁদে হাসে।
আমার মতো তোমায় বুঝি এরাও ভালবাসে ॥
সবাই যেন বুঝতে পারে তোমার অবহেলা
যত্নভরা দৃষ্টি নাহি চোখে।
অকারণেই কৃচ্ছ্রসাধন করছো নিজের বেলা
হচ্ছ রোগা মন্‌গড়া কোন শোকে ?
ফিতে, কাঁটা, চিরুণী আর তেলের শিশি তাকে—
রুক্ষ তোমার কেশের পানে তাকিয়ে পড়ে থাকে।

চিরুণ বলে, "চুল বেঁধোনা, মুখ শুকিয়ে ভেবো—
"এবার আমায় ছুঁলে মাথায় দাঁত বসিয়ে দেবো ॥
"দুদিন বাদে খেয়াল হ'ল,—জট্ ধরেছে চুলে ?
"দীর্ঘশ্বাসে যাচ্ছি নাকো ভুলে ॥"
প্রসাধনের উপকরণ উপুড় হয়ে কাঁদে
পড়েছে কোন সৃষ্টিছাড়া পাগ্‌লী মেয়ের ফাঁদে ?
বাক্সভরা রঙীন শাড়ী বন্দী হয়েই আছে !
বৃথাই তোমার তন্বী তনুর কোমল পরশ যাচে।
ডাক্‌ছে আলো ভালবাসার, আমার কথা রাখো
দুঃখভরা চিন্তাগুলি একটু ভুলে থাকো ॥

ভয় পেয়োনা গত রাতের কল্পকথা শুনে।
মানুষ শুধু বেঁচে আছে স্বপ্ন দেখার গুণে ॥
রাতের বুকে স্বপ্ন-সুখে স্বর্ণ-প্রাসাদ গড়ি।
অভাগা আর দুঃখী নিয়ে সুখের গেহ ভরি ॥
দিনে আমার জীর্ণ কুঁড়েই ভালো।
তুমি আছ মরম-সাথী, আছে অরুণ আলো ॥
ভোরের হাওয়ায় উচ্চ শাখে অশথ্ পাতা নাচে,
রোদ লেগে তায় সোনার মতো হলো।

নিমের ডালে কচিপাতা ঘুরছে কাছে কাছে
পরশ পাবার লোভেই যেন মলো ॥
স্নানার্থীরা ভীড় করেছে নদীর কূলে কূলে
চীল উড়েছে আলোয় মেলে পাখা।
দখিন হাওয়ায় খেয়াতরী পাল দিয়েছে তুলে
ছায়ার ছবি জল-স্রোতে আঁকা ॥
জলের পথে জাহাজ মরে ঘুরে
পারাবারের মায়াবিনী ডাক্ দিয়েছে দূরে ॥

আজকে আমি প্রিয় তোমার, থাকবো প্রিয় কালও,
গভীর হয়ে ভালবাসা জম্‌বে আরো ভালো ॥
মনটা হারাও ক্ষতি কি তায় ? দেহের অবহেলা
সইতে আমি পারবো নাকো এমন সকাল বেলা ॥
সন্ধ্যা হ'লে বুকে আমার লুটিয়ে দিয়ে মাথা
গভীর রাতের কান্না শুনো, শুনো তারার গাথা,
স্তব্ধ-রাতে জলস্রোতে বলবে ছলছলি'—
'মনের আশা মিট্‌লোনাকো শুধুই গেয়ে চলি ॥'
দুখের বোঝা তোলা থাকুক অন্ধকারের পরে।
দিনের আলো সুখ এনেছে—তোমার আমার তরে ॥

অজিত মুখোপাধ্যায়



শিল্পী পরশুরাম

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

একজন সাহিত্যরসিক বন্ধু সেদিন কথাচ্ছলে মন্তব্য করেছিলেন,—যাই বল, পরশুরামের সৃষ্টির মধ্যে কিন্তু অট্টহাসি নেই। উত্তরে আমি শুধু অট্টহাসি হেসে কথাটাকে এড়িয়ে গেছলুম। কারণ, তা ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না। অট্টহাসির প্রাচুর্য্য যেমন হাস্যরসের উৎকর্ষের প্রধান পরিচয় নয়, তেমনি অট্টহাসির অভাব কোন শিল্পীর দুর্ব্বলতা প্রমাণ করে না। রঙ্গরসের (fun) মধ্যে আছে ফাঁকা অট্টহাসি। কিন্তু যে হাসি আমাদের কল্পনায় সাড়া জাগায় অথবা যে হাসি নাড়া দিয়ে চঞ্চল করে তোলে আমাদের মস্তিষ্ককে, তা' নিছক রঙ্গও নয়—আমোদও নয়। যে হাস্যরস নিছক জৈবপ্রাণের আনন্দ-প্রবণতা (animal spirits) থেকে জেগে ওঠে, শুধু তারই প্রকাশ সশব্দ অট্টহাসিতে। কিন্তু হাস্যরস যতই হতে থাকে সূক্ষ্ম, তার প্রকাশ ততই হয়ে পড়ে শান্ত, সুন্দর ও সঙ্কেতময়। পরশুরামের "গড্ডলিকা" ও "কজ্জলী"তে হাস্যরসের যে মূর্ত্তি প্রধানভাবে রূপায়িত হয়েচে তা রঙ্গও নয়, হিউমারও নয়,—ব্যঙ্গ (satire)। ব্যঙ্গ দুরকমের,—ব্যক্তিগত এবং শ্রেণীগত। কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনে অপসঙ্গতি, বিকৃতি বা উদ্‌ভ্রান্তি নিয়ে রসাত্মক উপহাস করার রীতি আজকাল আর নেই। কিন্তু শ্রেণীগত অপসামঞ্জস্য, অবুদ্ধি বা দুর্‌বুদ্ধিকে ভিত্তি করে পরশুরাম যে ক'টি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেচেন, মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। সূক্ষ্ম, সরস এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-শিল্পে পরশুরাম অদ্বিতীয়। সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যে "বাবু" কিংবা "Bransonism" অথবা কমলাকান্তের "পলিটিক্‌স্", "জোবানবন্দী" প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্রে আছে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভাশালী চিন্তকের (thinker) পরিচয়, কিন্তু শিল্প হিসাবে পরশুরামের "চিকিৎসা সঙ্কট," "ভুশণ্ডীর মাঠ," "কচি-সংসদ" প্রভৃতি মনে হয় অনেক উঁচুস্তরের। রস-শিল্পী কেদারবাবুর ব্যঙ্গচিত্র ত' পুরোপুরি অন্য জাতের।

শিল্পী পরশুরামের বৈশিষ্ট্য অনন্যসাধারণ, অতি-অদ্ভুত চরিত্র-সৃষ্টির জন্য নয়, হাসির বহুমুখী এবং বহুমূল্য মালমসলার জন্যও নয় কিংবা গভীর বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন অথবা অপূর্ব্ব শব্দসম্পদ রচনার জন্যও নয়। তাঁর ব্যঙ্গ-চিত্রের বিষয়বস্তু সাধারণ; ভাষা গভীর সঙ্কেতময় কিন্তু আড়ম্বরহীন, তা' কেদারবাবুর ভাষার মত অলঙ্কারবহুল এবং বহুমুখী শব্দঐশ্বর্য্যে অপরূপ নয়। ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ অথবা গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া, রায় বংশলোচন ব্যানার্জি অথবা ব্যাণ্ডমাষ্টার লাটুবাবু, বিরিঞ্চিবাবা অথবা নকুড়মামা—সকলেরই গতিবিধি সাধারণ জীবনের গণ্ডীর মধ্যে। তাদের চরিত্রে অতি অদ্ভুত বা অসাধারণত্বের কোন পরিচয় নেই। আমাদের পরিচিত, পারিপার্শ্বিক জীবনের সাধারণ ধারণাকে ভিত্তি করে সাধারণ ভাষার সাহায্যে কত সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ এবং অনবদ্য হাস্যরস রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে, শিল্পী পরশুরামের সৃষ্টির পাতায় পাতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। লম্বকর্ণের কাহিনী থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :—

"লম্বকর্ণ ফিরিয়াছে শুনিয়া টেঁপী ছুটিয়া আসিল। বিনোদ বলিলেন,—ও টেঁপুরাণী, শীগ্‌গির গিয়ে তোমার মাকে বলো, কাল আমরা এখানে খাবো,—লুচি, পোলাও, মাংস—"

টেঁপী। বাবা আর মাংস খায় না।

বিনোদ। বলো কি! হ্যাঁ হে বংশু, প্রেমটা এক পাঁঠা থেকে বিশ্ব-পাঁঠায় পৌচেছে না কি? আচ্ছা, তুমি না খাও, আমরা আছি। যাও ত টেঁপু, মাকে বলো সব যোগাড় করতে।

টেঁপী। সে এখন হচ্ছে না। মা-বাবার ঝগড়া চলেচে, কথাটি নেই।

বংশলোচন ধমক দিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ—কথাটি নেই,—তুই সব জানিস্। যা যাঃ, ভারি জ্যাঠা হয়েচিস্।

টেঁপী। বা-রে, আমি বুঝি কিছু টের পাই না? তবে কেন মা খালি-খালি আমাকে বলে—টেঁপী, পাখাটা

মেরামত করাতে হবে,—টেঁপী, এমাসে আরও দু-শ টাকা চাই। তোমাকে বলে না কেন?

বংশলোচন। থাম্ থাম্, বকিস্‌নি।

বিনোদ। হে রায়বাহাদুর, কন্যাকে বেশী ঘাঁটিও না, অনেক কথা ফাঁস করে দেবে। অবস্থাটা সঙ্গিন হয়েচে বলো?

বংশলোচন। আরে এতদিন ত সব মিটে যেত, ঐ ছাগলটাই মুস্কিল বাধালে।

বিনোদ। ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষণ। তোমারই বা অত মায়া কেন? খেতে না পার বিদেয় করে দাও। জলে বাস কর, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ কোরো না।"

পরশুরাম-সাহিত্যে অট্টহাস্যের অবসর কম আছে স্বীকার করি কিন্তু আমাদের সংসার জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এমন সরস, সংযত, অত্যুক্তিহীন ব্যঙ্গচিত্র বাংলা হাস্য-সাহিত্যে যে একান্ত বিরল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরশুরামের লিখন-ভঙ্গীর বিশেষত্ব হচ্ছে, Art that conceals art। অনাড়ম্বর আবেষ্টন, সুপরিচিত, সাধারণ বিষয়বস্তুনির্ব্বাচন এবং সৌখীন অথচ জড়োয়া অলঙ্কারহীন শব্দ ব্যবহার দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরশুরামের লিখন-ভঙ্গীর মধ্যে artistic চমৎকারিত্বের জন্য প্রেরণা নেই। কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, চমৎকারিত্বের প্রতি এই বাহ্য নিরাশক্তির মধ্যে এমন কি প্রতিটি শব্দনির্ব্বাচনে পর্য্যন্ত শিল্পীর কতই না চেষ্টা—কতই না সতর্কতা, তুলির প্রতিটি রেখায় কি প্রাণপণ যত্ন!

পরশুরামের শিল্পদৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি সজাগ। জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রতিভার আছে নিবিড় পরিচয়। অতল জীবন-সিন্ধু থেকে বিচিত্র শ্রেণীগত চারিত্রিকতা আহরণ করার কাজে তিনি পাকা জহুরী। এই জন্যই অল্প দু-একটি সঙ্কেতে তিনি এমন প্রাণবন্ত চরিত্রের পর চরিত্র সৃষ্টি করে তোলেন যে মনে হয়, তারা যেন আমাদের অনেক দিনের পরিচিত লোক। আপন আপন শ্রেণীর প্রতিনিধি বলে তাদের গ্রহণ করতে আমরা আদৌ দ্বিধা করি না। সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই 'বাস্তবতার মায়া' (illusion of reality) খুব উচ্চস্তরের পরিচয় দেয়। সাধারণতঃ, যে সব হাস্যশিল্পী কেবল হাস্যরসপ্রধান সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তাঁদের অনেকেরই অসাধারণ আবহাওয়া এবং অতি অদ্ভুত চরিত্ররচনার দিকে ঝোঁক যায়। অন্ততঃ, পাঠকের হাস্যোদ্রেক করা প্রধান উদ্দেশ্য থাকার জন্য তাঁরা এমন সব কথা বলেন এবং এমন একটা কৃত্রিমতার আবেষ্টন সৃষ্টি করে তোলেন, যাতে সাবলীল বাস্তবতার মায়া মোটেই আমাদের চিত্তকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। কিন্তু পরশুরামের সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন অবসর নেই যেখানে এই অনবদ্য বাস্তবতার মায়া পাঠকের চিত্ত অভিভূত করে না। এই মায়াই পরশুরামের ব্যঙ্গ-চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের মধ্যেও এই কথাটার আভাস পাওয়া যায়:—"বইখানি (অর্থাৎ গড্‌ডলিকা) চরিত্রচিত্রশালা। মূর্ত্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙাচোরাই তার কাজ তবে সে ধারণাটা ছেলে মানুষের মতো হয়,—ঠিক ভাবে দেখিলে বুঝা যায়, গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা। মানুষের অবুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কিনা, সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।" *

হাস্য-শিল্পীরা সময়ে সময়ে রসাত্মক কথার আড়ম্বরের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেন। পরশুরামের ব্যঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে এ দুর্ব্বলতা কোথাও নেই। আবেষ্টন-সৃষ্টি অথবা চরিত্র-সৃষ্টির জন্য নিছক শব্দের ওপর তিনি কোথাও নির্ভর করেন নি। তাই দেখা যায়, তাঁর শব্দব্যবহারের মধ্যে আছে সব সময়েই গভীরতর সঙ্কেত। তাঁর নর-নারীর কথাবার্ত্তা যেমন সংযত, তেমনি রসাল ও আত্মপ্রকাশক (Self-revealing) কথানুকথনের মধ্যে তাদের অন্তঃপ্রকৃতি যেন স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে।

"তারিণী। নেপাল? সে আবার কেডা?

নন্দ। জানেন না? চোরবাগানের নেপালচন্দ্র রায় M. B., F. T. S.—মস্ত হোমিওপ্যাথ।

তারিণী। অঃ, ন্যাপলা, তাই কও। সেডা আবার

* প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

ডাগদর হ'ল কবে? বলি, পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাকৃতি ছেলে ছোকরার কাছে যাও কেন?

নন্দ। আজ্ঞে, বন্ধু-বান্ধবরা বললে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদিই অস্ত্র-চিকিৎসা করতে হয়।

তারিণী। ষষ্ঠিবাবুরি চেন? খুলনের উকিল ষষ্ঠিবাবু?

নন্দ ঘাড় নাড়িলেন।

তারিণী। তাঁর মামার হয় উরুস্তম্ভ। সিবিল সার্জ্জন পা কাটলে। তিনদিন অচৈতন্তি। জ্ঞান হলি পর কইলেন, আমার ঠ্যাং কই? ডাক্ তারিণী স্যানরে। দেখলাম ঠুকে এক দলা চ্যবনপ্রাশ। তারপর কি হ'ল কও দিকি?

নন্দ। আবার পা গজিয়েচে বুঝি?

'ওরে অ ক্যাব্লা, দেখ্ দেখ্ বিড়েলে সব্ডা ছাগলাদ্য ঘ্রেত খেয়ে গেল'—বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় পাশের ঘরে ছুটিলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিয়া বলিলেন,—'দ্যাও নাড়ীডা একবার দেখি। হঃ, যা ভাবছিলাম তাই। ভারি ব্যামো হয়েছিলো কখনো?'

নন্দ। অনেকদিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল।

তারিণী। ঠিক ঠাউরেচি পাচ বছর আগে?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হ'ল।

তারিণী। একই কথা, পাচ দেরা সারে সাত। প্রাতিক্কালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। হয়, zান্তি পার না। নিদ্রা হয়?

নন্দ। ভাল হয় না।

তারিণী। হবেই না ত। উদ্দু হয়েচে কি না। দাঁত কন্কন্ করে?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। করে, zান্তি পারনা। যা হোক্, তুমি চিন্তা কোরোনি বাবা। আরাম হয়ে যাবানে। আমি ওষুধ দিচ্চি।"

"zান্তি পারনা" শুধু ইংরেজী z-এ আকার দেয়নি,—কব্রেজী অবুদ্ধিকে অপরূপভাবে আকার দিয়েচে—এই ক'টি অনবদ্য সঙ্কেতময় শব্দে তা' যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেচে। শিল্পীর তুলি যেমন সূক্ষ্ম, তা পরিচালনে শিল্পীর আছে তেমনি সংযম। কব্রেজ মশায়ের প্রতিটি কথায় শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেচে। ব্যঙ্গচিত্রের চরিত্রদের কথানুকথন এত বাস্তববৎ, জীবন্ত এবং যথোপযুক্ত বাংলাসাহিত্যে আর কোথাও দেখা যায় না। এমন কি যেখানে অস্বাভাবিক আবেষ্টনেব সৃষ্টি করা হয়েচে, সেখানেও চরিত্রগুলোর কথাবার্ত্তা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েনি। কুশণ্ডীর মাঠে শিবু যখন প্রথম নৃত্যকালীকে চিন্তে পারলে, তখন তাদের স্থূলদেহ বদলে যতই সূক্ষ্মতর আকার ধারণ করুক না কেন, তাদের কথানুকথন অশরীরী কণ্ঠের বলে কোন ক্রমেই ভুল হয় না:—

"নৃত্যকালী বলিল—হ্যাঁরে মিন্সে। মনে করেছিলে ম'রে আমার কবল থেকে বাঁচবে। পেত্নী শাঁকচুন্নীর পিছু পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?

শিবু। এলে কি করে? ওলাউঠোয় নাকি?

নৃত্যকালী। ওলাউঠো শত্তুরের হোক্। কেন, ঘরে কি কেরোসিন ছিল না?

শিবু। তাই চেহারাটা করসাপানা দেখাচ্চে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে। ধাতটাও একটু নরম হয়েচে নাকি?"

কোন ইংরেজ লেখকের উপন্যাস সম্বন্ধে বলা হয়েচে:—
"In certain respects, the conversations are unequalled; the most familiar tones, those of artless comedy or of expressive self-revelation, have in the mouths of his characters a frankness, an appropriateness reaching to perfection."

পরশুরাম-সাহিত্যের কথানুকথন সম্বন্ধে এই বাক্যগুলি হুবহু মিলে যায়। অবশ্য, আমাদের জীবনের সঙ্গে লেখকের নিবিড় পরিচয়ই এই বাস্তববৎ কথানুকথনের একমাত্র কারণ নয়। এর আর একটি বিশিষ্ট কারণ, পরশুরামের শিল্পীজনোচিত নির্ব্যক্তিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র বা কেদারবাবুর ব্যঙ্গচিত্র পড়তে পড়তে অনেক সময় মনে হয় আমরা লেখকের দৃষ্টি দিয়েই সব কিছু দেখচি। কেদার-সাহিত্যে অনেক চরিত্রই ত' লেখকের ব্যক্তিত্বে সমাচ্ছন্ন। বিশেষতঃ, সব সময়ে রঙ্গপ্রবণতা এবং যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি প্রভৃতি শব্দালঙ্কারবহুল কথানুকথনের জন্যে মনে হয় কেদারবাবুর নরনারীরা এমন একটা কৃত্রিমকণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করে, যার মধ্যে সহজেই ধরা পড়ে লেখকের আপন কণ্ঠের আবছায়া প্রতিধ্বনি। কিন্তু পরশুরাম—শিল্পীর যতদূর সাধ্য—নিজেকে তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে গোপন রেখেচেন। কোথাও আমাদের চিত্তে এ বোধ জাগে না যে আমরা যেন লেখকের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জগত এবং জীবনকে দেখচি। অবশ্য, প্রকৃতপক্ষে, পরশুরামের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই যে আমরা তমসুকদাদা থেকে সুরু করে 'স্বয়ম্বরা'র চাটুয্যে মশায়কে পর্য্যন্ত দেখচি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, সকল সাহিত্য-সৃষ্টিই মূলতঃ আপন আপন শিল্পীর ব্যক্তিত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে প্রভাবান্বিত। সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়,—শিল্পীর দেখা জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু পরশুরাম সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন ব্যঙ্গচিত্রের মাঝখানে সে বোধ জেগে আমাদের রসানুভূতিকে পীড়িত করে তোলে না।

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

শিশু-দন্ত

ডাঃ ডি, এস্, দাসগুপ্ত, ডি-ই-এফ্ (প্যারি)

শিশুদের প্রথম দাঁত উঠিবার সময় যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাদের মধ্যে অনিদ্রা, অনবরত ক্রন্দন ও শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়া প্রভৃতি প্রধান। ঐ সময় শিশুরা নানাপ্রকার শক্ত জিনিষ মুখে দেয় ও অঙ্গুলী চিবাইতে আরম্ভ করে—ইহাতে অনেক সময়ই মুখের ভিতর নানাপ্রকার ক্ষত হয় ও জিহ্বা স্ফীত হইতে দেখা যায়। শিশুদের যথেষ্ট সাবধানে না রাখিলে উক্ত লক্ষণসমূহ নানাপ্রকার অশান্তি আনয়ন করে। শিশু অসহ্য যন্ত্রনায় কাঁদিয়া পরিবারের সকলকেই অস্থির করে—ক্রন্দনের কোন কারণ ও তাহার প্রতিকার নির্ণয় করিতে না পারিয়া শিশুর পিতা অধীর হইয়া থাকেন এবং শিশুর মা অসুস্থ হইয়া পড়েন।

শিশুর যখন ভূমিষ্ট হয় তখন তাহার কোন দাঁত থাকে না। সাধারণতঃ ছয় মাস বয়সে প্রথম দাঁত উঠিতে দেখা যায় এবং যথাক্রমে তিন বৎসর মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ২০টী দাঁত উঠিয়া থাকে। এই সকল দাঁত অল্প দিনের জন্য আবির্ভাব হয় সেজন্য ইহাদের ক্ষণস্থায়ী দাঁত বলা হয়। মাতৃস্তন পান্ করিবার সাহায্য হয় বলিয়া ইহাদের দুধের দাঁতও বলা হয়। এই সকল দুধের দাঁত বাঁধা নিয়ম অনুসারে উঠিয়া থাকে—এবং সেই অনুযায়ী ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। শিশুর মা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন কি ভাবে যথাক্রমে ইহারা উঠিয়া থাকে এবং কত রাত যে ক্রন্দনরত শিশুর পাশে বসিয়া অনিদ্রায় কাটাইয়াছেন তাহাও ভাল করিয়া জানেন। এই সকল ক্ষণস্থায়ী দাঁত উঠিবার সময় সাধারণতঃ ভারতীয় শিশুরা ইউরোপীয় শিশুদের চেয়ে বেশী কষ্ট পাইয়া থাকে। ইহার কারণও আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি—প্রথম কারণ দারিদ্র্য। ভাল দুধ ও অন্যান্য বলকারী খাদ্য দ্বারা যাহাতে শরীর পুষ্টি করে সেই প্রকার উপায় অনেকেই অবলম্বন করিতে পারেন না।

দাঁত উঠিবার সময় শিশুদের শরীরের অস্থিসমূহ গঠিত হয়। কোন কারণ বশতঃ এই গড়ন ভাল রকম হইতে না পারিলেই নানাপ্রকার অসুখ হইতে থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় কারণ, অনভিজ্ঞতা। যাহাতে শিশু দাঁতের যন্ত্রণা ভোগ না করে সেই বিষয়ে আমাদের পিতা মাতা কোন সতর্কতা অবলম্বন করেন না এবং কোন অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের উপদেশও যথাসময়ে গ্রহণ করেন না। কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে স্থায়ী দাঁতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী দাঁতের যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না—দুধের দাঁত পড়িয়া গেলে সেই স্থানেই স্থায়ী দাঁত উঠিয়া থাকে এবং দুধের দাঁত চিরস্থায়ী দাঁতের ভিত্তি এবং শিশুদের ভবিষ্যত স্বাস্থ্যের প্রধান কারণগুলির মধ্যে দাঁত একটী। কাজেই দুধের দাঁত অবহেলা করা কোন প্রকারেরই উচিৎ নহে।

এই সকল দুধে দাঁত সাধারণতঃ ছয় বৎসর বয়স হইতেই পড়িতে আরম্ভ করে এবং ২৫ বৎসর মধ্যেই স্থায়ী দাঁত ৩২টী ক্ষণস্থায়ী দাঁতের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। কখন কখনও ২।১টী দাঁত কমও হইতে দেখা যায়—আক্কেল দাঁত (wisdom teeth) অনেক সময় উঠে না এবং ইহা বংশানুগত দেখা যায়। সাধারণতঃ ১৬।১৭ বৎসর বয়সের বালকবালিকাদের আক্কেল দাঁত (wisdom teeth) উঠিয়া থাকে। ঐ সময়ও ইহারা অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে এবং নানাপ্রকার অস্থিরতা ও শারীরিক মানসিক তেজোহীনতা প্রভৃতি দেখা যায়। ঐ সময়ও খুব সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য।

দাঁতের উপযুক্ত যত্ন ও মর্য্যাদা করিলে উহারা চিরদিন স্থায়ী হয়—পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে। আমাদের দেশে চলিত কথা আছে—দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝ নাই। বস্তুতঃ উক্ত কথা হইতে দাঁতের

গুরুত্ব যথেষ্টই প্রতীয়মান হয়। দাঁতের গুরুত্ব সম্বন্ধে ইউরোপীয় বালকবালিকারা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে—দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ঐ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ ও সুবিধা কমই পাইয়া থাকে। বরং অনেক সময় ভুল শিক্ষা পাইয়া থাকে।

কি প্রকারে দাঁত পরিষ্কার রাখিতে হয় সেই সম্বন্ধে প্রত্যেক মাতারই শিক্ষা দেওয়া উচিৎ। প্রত্যেক বার আহারের পর কুলি করিয়া সংশোধিত দাঁতের ব্রুস্ দিয়া উত্তমরূপে দাঁত পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। শিশুগণ যাহাতে দাঁত দিয়া হাতের নখ না কাটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। অধিকাংশ রোগের বীজাণু মুখ দিয়াই শরীরে প্রবেশ করে। মুখ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। মুখে একবার বীজাণু প্রবিষ্ট হইয়া স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে সক্ষম হয় এবং তথা হইতে Intestine, stomach, liver, kidney ইত্যাদি শরীরের প্রায় সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও নানা রোগের উৎপত্তি হয়।

ডি, এস, দাসগুপ্ত

কাব্যরেণু

(উর্দ্দু কবিতা হইতে)

নূর আহ্‌মদ

এক যবে দুই হয় তখন সে দুই,
একত্বের স্বাদ বাকী থাকে না যে আর ;
মনে মনে ভাবি ইহা ভাসি আঁখি নীরে
বিদায় দিনেও ছবি তুলিনি প্রিয়ার।



বিচিত্রা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

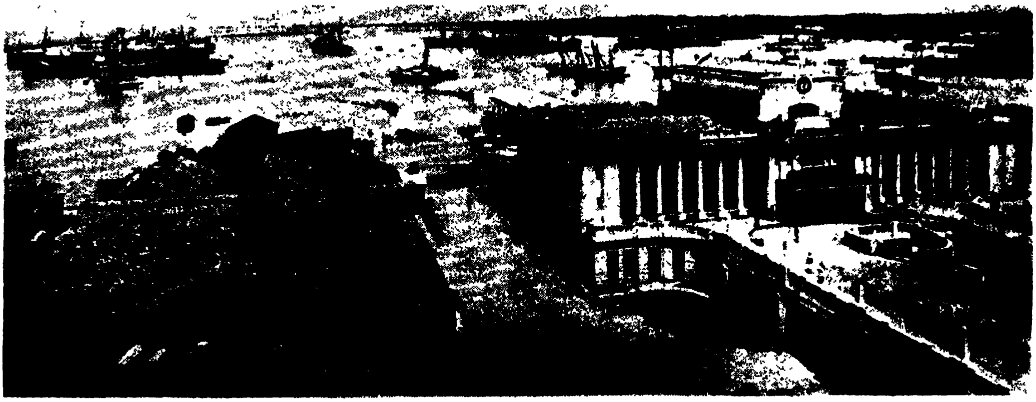
গোয়ালিনী

শিল্পী—
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

সিংহলে রবীন্দ্রনাথ

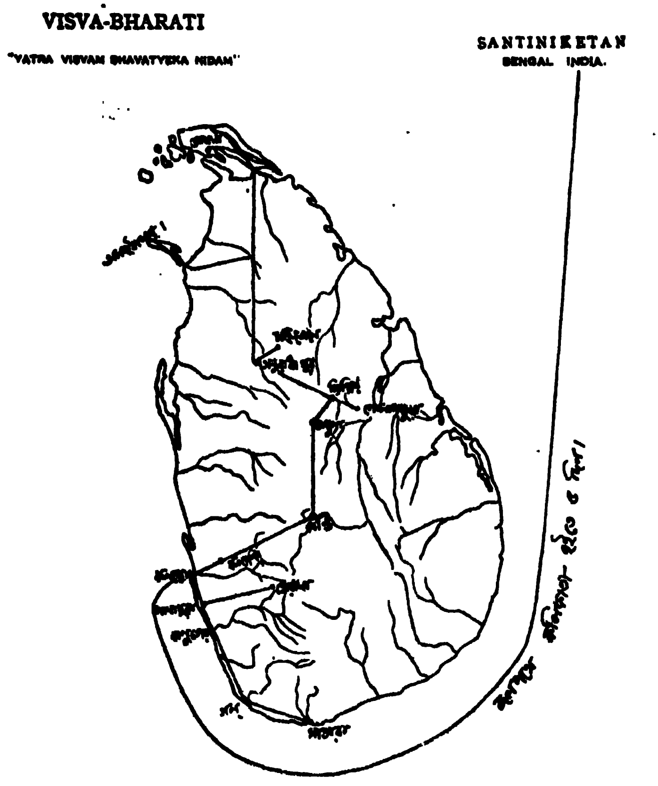
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

যাত্রা করা গেল আয়োজন সমাধা করে কলিকাতার গঙ্গার ঘাট থেকে, জাহাজে। আমাদের কয়েক জন অধ্যাপক চলে গেলেন পূর্ব্বেই। যাত্রার দিন ছিল ৪ঠা মে। এই জাহাজটীতে আমরাই এক মাত্র যাত্রী, কারণ এই সময় এদকে



কলম্বো বন্দর

যাত্রী বেশী থাকেনা। নানা প্রকার দুঃখকষ্টের মধ্যে ৯ই মে রাত্রি ৯টার সময় পৌছলাম কলম্বো বন্দরে। সকলেরই হয়ত জানা আছে সমুদ্রে নূতন যাত্রীদের কী অবস্থা হয়, আমরাও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইনি। কলম্বো পৌছে শুনি বন্দরের ঘাটে বেলা চারটা হতে লোকে লোকারণ্য, কারণ জাহাজ পৌছবার কথা ছিল পাঁচটায়। সেই সহরের মন্ত্রী, মেয়র, অন্যান্য খ্যাতনামা বাসীন্দা ও অভ্যর্থনাসমিতির সভ্যবৃন্দ গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। তাঁর বাসস্থান হলো সমুদ্রের ধারে এক সংবাদপত্রসেবীর বাসায়। মেয়েদের স্থান হলো একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড বাড়ীতে। ছাত্র অধ্যাপকদের স্থান হলো একজন ধনী ডাক্তারের বাসায়। এরা সকলেই স্বেচ্ছায় আমাদের ভার গ্রহণ করেছেন নিজ ব্যয়ে। চমৎকার সহরটী চারিদিক সবুজ, সহরের বেশীর ভাগ জায়গা বড় বড় বিচিত্র ফুলফলের গাছে ঢাকা, তার ফাঁকে ফাঁকে সহরের বাড়ী দেখা যায়। ভারতের বড় বড় সহরগুলির মত বাড়ীর পর বাড়ী নয়, চারিদিক সাজানো গোছান। এখানে মানুষরা চলে, ফেরে, হাসে, গায় ও কথা বলে বেশীর ভাগ বিদেশী ছাঁদে, এটাই যেন এদেশের একটা ভদ্রতার পরিচয়। কথায় কথায় বিলাতী পানীয় গিলতে এরা পটু, সেটাও যেন জনসাধারণের অত্যন্ত



সিংহল

রোটারি ক্লাব অভ্যর্থনা জানালো, সেখানে তিনি একটী লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। ১১ই মে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো ভারতীয় বণিক সমিতি তাদের সভা-গৃহে। তারা ঠিক করলো গুরুদেবের হাতে বিশ্বভারতীর জন্ম কিছু টাকা চাঁদা তুলে দেবে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, বিশ্ব-ভারতীর জন্ম চাঁদা তুলে অর্থ সাহায্য করার দিকে প্রবাসী ভারতীয়রাই ছিল অগ্রণী। সিংহলবাসীরা এ বিষয় প্রথমে উৎসাহ দেখায়নি, তারা সাহায্য করেছিল টাকা দিয়ে অভিনয় দেখে। ভারতের প্রতি তাদের ভালবাসা খুব যে আছে তা মনে হয়না। যদিও তারা সব দিকে ভারতের কাছে নানা রকমের ঋণী। এরা ট্যাক্স্ বসিয়ে ভারতের নানা প্রকার মাল তাদের দেশে যাওয়া বন্ধ করছে। সেইসব জিনিষ তারা অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশ থেকে বিনা বিচারে আনছে, মনে একটুও দ্বিধা করেনা। নিজেদের দেশেও

নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ। সেখানে পৌঁছবার পর কবির কাজ আরম্ভ হলো, নিত্য ত্বুবেলা দর্শনকারীদের আশা মেটানো, বক্তৃতা পার্টি বা রিসেপসান্। ১০ই মে তাঁকে

কোন প্রকার শিল্পের উন্নতির চেষ্টা তাদের নেই। সমস্ত দেশ বিদেশী মালে ভর্তি।

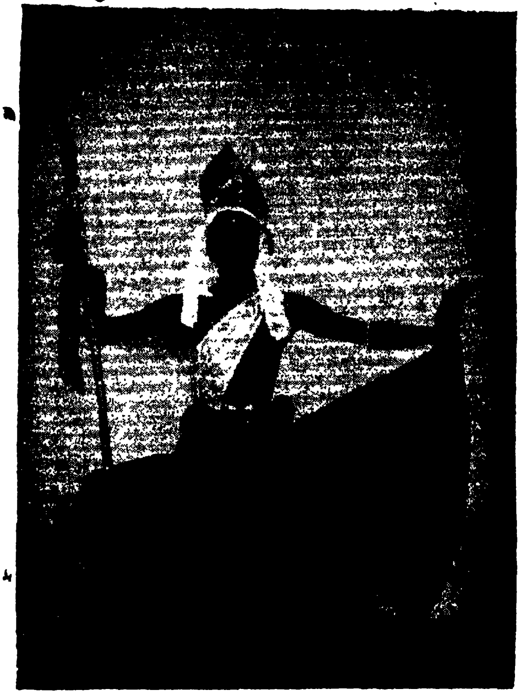
১২ই মে আরম্ভ হলো আমাদের অভিনয়ের পালা; প্রথমে



শাপমোচন_একটি দৃশ্য

সকলেই ভেবেছিলাম এদের কাছে ভারতীয় নৃত্যের যে রূপটী রবীন্দ্রনাথ শাপমোচন গীত-অভিনয়ে প্রকাশ করতে চান সেটা হয় তো তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবেনা সুতরাং প্রথম অভিনয়-রজনীর আরম্ভে গুরুদেব দর্শকদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলেন।

পূর্ব্বেই বলেছি এরা সাহেবীভাবাপন্ন। ইউরোপের ভালটা এরা পায়নি, কিন্তু যেটা বর্জ্জনীয় সেটাই তারা গ্রহণ করেছে। তারা ভারতের ও নিজেদের কাল্‌চারকে সব সময়



শান্তিদেব ঘোষ

বিদেশীয় চশমায় দেখে। নিজের সাধারণ চোখে দেখবার সামর্থ্য তাদের নেই বল্লেই হয় কিন্তু শাপমোচন অভিনয় দেখে তারা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছে। কাগজে পত্রে ও মুখে সর্ব্বদাই বলেছে এ ভাবে নৃত্য-অভিনয় দেখবে এরা কখন কল্পনা করতে পারেনি। ভারতের ও পৃথিবীর নানা জায়গার নর্ত্তক নর্ত্তকীরা সেদেশে গেছে কিন্তু এই নৃত্যাভিনয়ের মত আনন্দ তারা পূর্ব্বে কখনও পায়নি। এই নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের রূপটি কি ভাবে প্রকাশ করেছেন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার মনে করি। শাপমোচন হয়েছে একটী প্রাচীন বৌদ্ধ উপাখ্যান। প্রাচীন



শাপমোচন— শ্রীমতী যমুনা দেবী ও শ্রীমতী নন্দিতা দেবী



শ্রীযুক্ত নবকুমার সিং

ভারতের নৃত্যের আদর্শ ছিল, দর্শকের মনে উচ্চভাব-রসের সৃষ্টি করা, তখন ছিল মনের খোরাক প্রধান, মদের নেশার মত ক্ষণিক উন্মত্ততা নয়। এই গল্পটির ভাবকে গান ও

নাচের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টাই রবীন্দ্রনাথ করেছেন এবং এই ছিল প্রাচীন ভারতীয় অভিনয় পদ্ধতি। তিনি



ছবির বাম দিক থেকে
বসে—নন্দিতা দেবী, অমলা দেবী, যমুনা দেবী
দাঁড়িয়ে—উমা দেবী ও নিবেদিতা দেবী

একাধারে কবি ও সঙ্গীতস্রষ্টা, সুতরাং তাঁর চেষ্টায় শাপ-মোচন অভিনয়ের দর্শকের মনে মধুর রসের সঞ্চার করবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

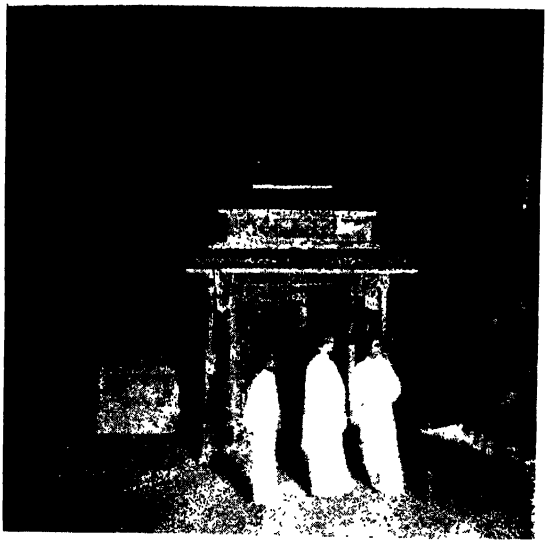
অভিনয়ের প্রথম পর্ব শেষ হতে আরম্ভ হলো ছবির প্রদর্শনীর পালা। রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু এবং তার ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্র এদেশে ভীষণ আলোড়ন এনেছিল। এ দেশের শিল্পীদের হাতে আঁকা ছবির ধারণা খুব সেকেলে। পাশ্চাত্য ছবি তাদের আদর্শ, কিন্তু আজ কালের নয়। একশো বৎসরের ইউরোপকে নাক চোখ বুজে নকল করে করে চলেছে। এ সব ছবি তাদের ভাললাগবেনা বা বুঝতে পারবে না, একথা আমাদের প্রথম থেকে মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ছবি থেকে আরম্ভ করে নন্দলাল বাবুর ও তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বিচিত্র পদ্ধতির ছবি দেখে এদের চক্ষু স্থির। কাগজে কাগজে ছবির বিষয় লিখলো খুব, কিন্তু অর্থ খরচ করে এই সব ছবি নিজের কাছে রাখতে রাজি ছিল না। হয়তো তারা ভেবে ছিল টাকা খরচ করে ঠকবে কেন। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম। তাদের এই ছবি অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে, তারা ভাবছে এই ছবির পদ্ধতি কি? কোথা থেকে এর আরম্ভ এবং কেন এরা সাহস করে এ সব ছবি আঁকছে? প্রদর্শনীর দিক থেকে সে দেশে এটাই খুব বড় কাজ বলে মনে হয়।

কলম্বো সহরের কাছাকাছি দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিলাম, তার ভিতর কল্যাণী নামে বৌদ্ধ-মন্দিরটী উল্লেখযোগ্য। এটি সে দেশে অতি প্রাচীন মন্দির। কলম্বো সহর থেকে দশ মাইল পূর্ব্বে। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের একটী ছোট আশ্রম আছে। অনেক হাতে-লেখা পুরাতন পালি পুঁথি এস্থানে দেখা গেল। সাধুরা সযত্নে সেগুলিকে রক্ষা করছেন। এ মন্দিরের গায়ে ২০০।৩০০ বৎসরের প্রাচীন দেয়াল-চিত্র দেখলাম। ছবির গল্প অধিকাংশ বৌদ্ধ উপাখ্যান থেকে নেওয়া; তখনকার রাজাদের ছবিও আছে। টাকা-পয়সার দিক দিয়ে এটি একটী ধনী মন্দির। মন্দিরের কর্ম্মকর্ত্তারা



শাপমোচন—শান্তিদেব

এ মন্দিরটীকে বহু টাকা ব্যয়ে বিস্তার করছেন। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পী আনিয়েছেন, পাথরের কারুকার্য্যে ও মূর্ত্তিতে



কল্যাণী মন্দিরের ভিতর

মন্দিরটীকে নূতন আকার দান করবার চেষ্টায়। তাঁদের ইচ্ছা ছিল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর সাহায্যে মন্দিরের নূতন অংশকে দেয়াল-চিত্রে চিত্রিত করবেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা এখনও সম্ভব হয়নি।

১২ই মে থেকে ১৮ মে পর্য্যন্ত কলম্বোতে নৃত্য, গীত, প্রদর্শনী, কবির বক্তৃতা ইত্যাদি সব এক দফা শেষ করে, আমাদের রওনা হতে হলো দক্ষিণে। এবার আমাদের সিংহলের অন্যান্য স্থানে বেড়ান ও অভিনয় দেখবার পালা।

১৯ শে মে কলম্বোর ১৮ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রের ধারে পানাডুরা নামে একটী সহরে আমরা থামলাম। এখানে যাঁর অতিথি, তিনি এদেশের একজন জমিদার। তাঁর রবারের ও চায়ের বাগান আছে। প্রকাণ্ড বাড়ী, সমুদ্রের ধারে নারকেল গাছে ঢাকা। দিন রাত সমুদ্রের গর্জ্জন ও নারকেল গাছের পাতার সোঁ সোঁ শব্দ, যে দিকে তাকাই কোথাও একটু মাটী খালি দেখা যায় না। কেবল নারকেল গাছ, ও চারিদিকে সবুজ রং। এই ভদ্রলোকটি আমাদের স্কুলে চার পাঁচ মাস ছিলেন। তখন থেকে তাঁদের সাথে আমাদের পরিচয়। তাঁর বিষয় একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে এই যে, ভারতভ্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভদ্রলোকটি অত্যন্ত বিলাসী ও সাহেবীভাবাপন্ন ছিলেন। এখানে থাকার পর তার মনে পরিবর্ত্তন আসে। দেশাত্মবোধ খুব তীব্রভাবে দেখা দেয়। সেই থেকে তিনি বিজাতীয় সাজপোষাক ত্যাগ করেছেন, এবং আজকাল স্বজাতীয় সাজপোষাকে আনন্দ পান। তাঁকে তাঁর আত্মীয়স্বজন বলে, তিনি ভারতে গিয়ে সাধু হয়ে ফিরেছেন। ইউরোপের চালচলন এদেশে শিক্ষিত সমাজে কতদুর পাকা রকমে আসন গেড়েছে তার একটু নমুনা দি। এদেশে কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, কি হিন্দু সব যুবতীরা বিবাহের সময় খৃষ্টান-বিবাহের মত সাজপোষাক করে থাকে। তারা মনে করে, এই পোষাকটা বিবাহের পক্ষে শুভ। জাতীয় কাপড়ে বিবাহ তাদের দেশে ভয়ানক অমঙ্গলের চিহ্ন। এ দেশে এখনও বাপ মায়েরা তাদের সন্তানদের নামকরণ করেন, ইউরোপীয়দের অনুকরণে, যদিও তারা বৌদ্ধধর্ম্ম-অবলম্বী। পানাডুরা থেকে এ ভদ্রলোকের জমিদারী দশ মাইল পূর্ব্বে। সেখানে তিনি



কাণ্ডির নাচ

বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনের আদর্শে একটী প্রতিষ্ঠান করবার আয়োজন করেছেন। এবং কবিকে অনুরোধ

করলেন সেই বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করতে। জায়গাটির নাম হোরানা। ২০শে মে সেখানে সেই উপলক্ষ্যে



কাণ্ডির নাচ

বিরাট আয়োজন হয়েছিল। রবার গাছের বাগানে সুসজ্জিত মঞ্চে কবির আসন। তিনি উপস্থিত হতে, সেখানে ছোট ছোট বালকেরা তাদের দেশী প্রথায় অভ্যর্থনা করলো। সে দেশের অন্যান্য বক্তাদের বলা শেষ হলে, গুরুদেব সংক্ষেপে তার উত্তর দেন, ও প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করলেন "শ্রীপল্লী"। এ সঙ্গে সেখানে বৃক্ষরোপণ-উৎসবও সমাধা হয়। একটী গাছ রবীন্দ্রনাথ নিজে রোপণ করেছিলেন। অন্যটী করেন শ্রীযুক্ত নন্দলালবাবু। এইখানে আমরা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত—"জনগণ মন অধিনায়ক" গানটী গেয়ে সভা ভঙ্গ করি। এই গানটি এদেশে একটী খুব সুপরিচিত গান। যখনই যেখানে গেছি বা যখন যেখানে অভিনয় হয়েছে, সর্ব্বত্রই তাদের অনুরোধে আমরা গেয়েছি। তারা সিংহল নামটাও এই গানের সঙ্গে যোগ করে নিয়েছে। তারা যখনই এই গানটি গায়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সিংহল নামও তাতে শুন্‌তে পেতাম।

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য জিনিষ হয়েছিল। সিংহলের কাণ্ডি প্রদেশের নাচ। কবিকে দেখাবার জন্য এই নাচিয়েদের আনানো হয়। নাচিয়েরা আমাদের সকলকে আনন্দ দিয়েছিল। এ নাচের ভিতর একটা পৌরুষ ছিল, যা দেখে নির্জীব লোকের মনেও তেজের সঞ্চার হতে পারে। এদের গায়ে কোন জামা নেই। নানারঙের পুঁতি দিয়ে এরা গহনা তৈরী ক'রে দেহে ব্যবহার করে। মাথায় ছিল তাদের ছোট কাপড়ের পাগড়ী। পরণে ছিল সাদা কাপড়ের লুঙ্গি। তারা কয়েকটি নাচ নাচলো, এদেশের ভাষায় সে গুলিকে বলে—কানডারু, উড্রেক্কি ও কাংকেরী। কানডারুর নাচে হাতে থাকে একটা গোল পিতলের চ্যাপ্টা একইঞ্চি চওড়া রিং। তাতে চার জায়গায় ছোট ছোট দুইটী করে পিতলের চাকৃতি বাঁধা থাকে। নাচের সময় হাতের ঝাকানিতে ঝম্ ঝম্ শব্দ হয়। উড্রেক্কি নাচে হাতে থাকে



পাহাড়ে নদীতে স্নান

ডমরু। কাংকেরী নাচ খালি হাতে হয়। সেদিন সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় ঠিক হলো পরের দিন পানাদুরাতে এরা

দিনের বেলায় আমাদের নাচ দেখিয়ে যাবে। এখানে এক দিন বিশ্রামের পর, ২২শে মে আমরা রওনা হলাম আরো



মুখোস-নৃত্য

দক্ষিণে। সহরটীর নাম "গল্"। এই জায়গাটীতে এক সময়ে একটী বড় বন্দর ছিল। তখন ডাচ, পর্ত্তুগীজদের আড্ডা ছিল এদেশে। এখনও বন্দরটী মন্দ নয়। মাঝে মাঝে জাহাজও আসে। নারকেল, দড়ি, চাল ও রবার ইত্যাদি নেবার জন্যে। পুরানো দুর্গটীর ভিতরে বড় বড় ব্যাঙ্ক, গভর্ণমেণ্ট অফিস, বাড়ীর ঘর-দোর সবই আছে। কলম্বো থেকে এই রাস্তাটী বরাবর চলে এসেছে। রাস্তাটী পরিষ্কার পিচ্ ঢালা। মোটরে যেতে কোন কষ্টই নেই। সমুদ্রের ধার দিয়ে দু'পাশে ঘন নারকেল গাছের ছায়ায় ঢাকা এই রাস্তাটী। রেলের রাস্তাও এ রাস্তাটির পাশে পাশে চলে গিয়েছে। আমরা কিন্তু বরাবর মোটরে চলেছি। "গলে" এসে পৌছতে দুপুর হয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় সেই সহরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নাচ-গানের আয়োজন আমাদের করতে হয়েছিল। এখানে কবি ও ছাত্রীরা ছিলেন এক জমিদারের বাড়ীতে, আর আমরা ছিলাম একটী পুরাতন ডাক-বাংলায়। এখানে কবিকে অভ্যর্থনা করবার আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু সেদিনের এত মাইল মোটরে ভ্রমণে শরীর একটু ক্লান্ত থাকায় সহরবাসীরা তাঁকে অভ্যর্থনার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিল। পরের দিন ২৩শে মে দিনের বেলায় আমরা সব সহর ও দুর্গ ইত্যাদি দেখে বেড়ালাম। রাত্রে "শাপমোচন" অভিনয় হলো। অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান কবিকে সহরের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। ২৪শে মে সকালে মোটরে রওনা হলাম। সিংহলের দক্ষিণ প্রান্তের শেষে এই সহরটীর নাম মাতারা। এটি কলম্বো থেকে ১০০ মাইল দূরে। আমাদের থাকার জায়গা হয়েছিল, সমুদ্রের ধারে পুরাতন দুর্গের Rest house এ। বাড়ীর নিকটেই সমুদ্র। এই সহরটিও এক সময়ে ডাচ্ পর্ত্তুগীজদের লীলাভূমি ছিল। কবি এ বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি প্রায় সমস্তদিনই সমুদ্রের ধারে বারাণ্ডায় বসে থাক্‌তেন। জায়গাটিও বড় সুন্দর। এখানে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা



মুখোস-নৃত্য

জানালো। সেই উপলক্ষ্যে এরা এদেশে ডেবিল ড্যান্স বা মুখোস-নৃত্যের আয়োজন করেছিল। অন্ধকারে মশালের

আলোর নানা প্রকার কিম্ভূতকিমাকার মুখোসও সাজ করে নর্ত্তকরা দর্শকদের সম্মুখীন হলো। তখন ছোটদের সময় কাটাই। পরদিন ২৫শে আমাদের "শাপ মোচন" অভিনয় হলো। ২৬শে আমরা আবার কলম্বোতে ফিরলাম।



ভারতীয় ক্লাবে মঞ্চের উপর রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গান করিতেছেন

মনে রীতিমত ভয়ের সঞ্চার হয়। নাচের দিক থেকে এ নাচ কিছুই নয়, তবে সাজ-গোজে, মুখোসের ভীষণতায়, ও লাফ ঝাঁপে বেশ মজা লাগে। শব্দে বাজতে থাকে সে দেশীয় চার পাঁচটা ঢোলক। এখানেও আমরা প্রথমদিন দশ মাইল দূরে এক পাহাড়ে নদীতে স্নান করে, বেড়িয়ে

৫০ মাইল এসে আমাদের একটা ছোট সহরে থামতে হলো। এই সহরের অধিবাসীরা আগে থেকে, কবিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তৈরী হয়ে ছিল। এবং সেই প্রদেশের যত প্রকার লোকনৃত্য ও মুখোসনৃত্য আছে তার আয়োজনও হয়েছিল। সহরের একটা ভদ্রলোক এই মুখোসনৃত্যের



ক্যাণ্ডির দৃশ্য—ছবির ডান কোণে লেকের উপর বাড়িটির পিছনের ছোট বাড়িটি দন্ত-মন্দির

মুখোশ বহু সংখ্যক সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। এই নর্ত্তকরা আমাদের বিদায়ের পূর্ব্বে সব দেখালো। তাতে প্রাচীন ও আধুনিক কাঠের উপর রং-করা বহুপ্রকার মুখোস আমরা দেখলাম। সেখান থেকে কবি ও নন্দবাবুকে অনেকগুলি মুখোস উপহার দিয়েছিল। সেইদিনই আবার আমরা পানাদুরায় এসে পৌছলাম। এখান থেকে কলম্বোতে গিয়ে আমাদের আরো তিন রাত্রি অভিনয় করতে হয়। ২৭শে মে কবিকে Indian Club নিমন্ত্রণ করলো। কবিকে তারা অনুরোধ করলো কিছু বাংলা ইংরাজী কবিতা পাঠ করতে।



বোটানিক্যাল গার্ডেন—কান্ডি

আমাদের কয়েকটি বাংলা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হয়। কবি সব কয়টি গানের ইংরাজী তর্জ্জমা পাঠ করেন। এই সিংহলপ্রবাসী ভারতীয়রা চাঁদা তুলে যা সংগ্রহ করতে পেরেছিল, সে টাকা কবিকে উপহার দিল।

সিংহল প্রবেশের আগে থেকেই সেখানকার অভ্যর্থনা-সমিতি কবি ও তাঁর সহযাত্রীদের সিংহল ভ্রমণের কার্য্য-সূচী ঠিক্ করে ফেলেছিল। তা সত্ত্বেও দর্শকদের অত্যাধিক আগ্রহে আমাদের কার্য্য-সূচীর অদল-বদল করতে হয়। কলম্বোতে আরো কয়েক রাত্রি অভিনয় হলো। মাঝে মাঝে নৃত্য-গীতের জলসার আয়োজন করতে হয়েছিল। এইদিন অর্দ্ধেক সময় প্রায়ই থাকৃত গুরুদেবের কবিতা পাঠ, বাংলা ইংরাজী দুই মিশিয়ে। খুব মুগ্ধ হতো দর্শকরা।



ডাম্‌বুলা মন্দিরের ভিতরের একটি মূর্ত্তি



ডাম্‌বুলায় আরোহণ

বিশেষতঃ তাঁর বাংলা কবিতা পাঠে অবাঙ্গালী শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়ত। সেই কবিতা পাঠের সময় তিনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন যে তাঁর স্মরণই থাকত না,

তাঁর বয়সের কথা। দর্শকের মঞ্চের শেষ পর্য্যন্ত স্পষ্ট শোনা যেতো তাঁর কণ্ঠস্বর। কবিতা পাঠের ভিতরই যেন কবিতার ভাবটি শ্রোতারা আপনা হতে উপলব্ধি করতো।



সিগ্রিয়ার ছবি দেখতে এই লোহার সিঁড়ি ব্যবহার করতে হয়

দক্ষিণ সিংহলের পালা শেষ করে ৩রা জুন সকালে রওনা হলাম কাণ্ডি প্রদেশের দিকে। সেখানে পৌছতে দুপুর হয়ে গেল। সহরটী কলম্বো থেকে প্রায় ৮০ মাইল পূবে। এই রাস্তাটি অতি সুন্দর। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের নানা প্রকার সৌন্দর্য্য দেখতে বেশ লাগছিল। কাণ্ডি সহর সিংহলের একটি প্রাচীন রাজধানী। বর্ত্তমানে এটি সিংহল দেশের শাসনকর্ত্তার গ্রীষ্মাবাস ও সে দেশের অনেক রাজাদের বাসস্থান। সহরটি একটী ছোট উপত্যকার মধ্যে। তার মাঝে একটি সরোবর, এটির শোভাবর্দ্ধন করছে। বৌদ্ধদের বিখ্যাত দন্ত-মন্দিরটী এই স্থানে। শোনা যায় বুদ্ধদেবের দাঁত সযত্নে রক্ষিত আছে। এই দাঁতকে উপলক্ষ্য করে অনেক রাজা এক সময় তলিয়ে গেছে। কত কাটাকাটি হানাহানি হয়ে গেছে। সিংহলের ভিতর এই প্রদেশের পেরহরা উৎসব ও নাচ বিখ্যাত। তার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়েছি। এই দ্বীপে আসার পর একটি জিনিষ চির কাল মনে থাকবে, সেটি হচ্ছে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা ভীষণ আলোড়ন। গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে মাইলের পর মাইল সদর রাস্তা, নানা রকমের নারকেলের কচি পাতা, বাঁশ, রঙীন, কাগজ, ডাব, আনারসে পথ সাজিয়ে ছিল; এবং প্রত্যেক বৌদ্ধ তাদের বাড়ীটি যথাসাধ্য সুন্দর করে সাজিয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল। বাড়ীর সামনে বৌদ্ধ উপাখ্যানের মূর্ত্তি বিচিত্র আলোকে ও রঙ্গে সাজিয়ে রাখতে দেখে ছিলাম। অনেকে এই দুই দিন জনসাধারণকে নানা প্রকার খাদ্য ও পানীয়ে তৃপ্ত করবার চেষ্টা করেছিল পূণ্য অর্জ্জনের আশায়। রাস্তায় রাস্তায় দলে দলে লোক বিকাল হলে নানা রকম সং সেজে গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ে। থিয়েটার বায়স্কোপ ও মদে অজস্র টাকা ব্যয় করে। কাণ্ডিতে এসময় বড় হাতীর মিছিল ও নাচগানের আয়োজন হয়। এখানকার মিউজিয়মটী দেখবার মত। যদিও কলম্বো মিউজিয়মটির মত অত বড় নয় তবুও এখানে এসে এ প্রদেশের প্রাচীন শিল্পের পরিচয় পাওয়া গেল। এই সহরটিতে এসে আমরা সে দেশীয় নানা প্রকার পিতল, রূপা ও কাঁসা ইত্যাদির গহনা, থালা ও বাসন অর্থ দিয়ে সংগ্রহ করলাম। সে গুলি খুব



পাহাড়ের গায়ে পুরাতন দেওয়ালের অংশ—উপরে উঠবার সিঁড়ি

সুন্দর ও অপেক্ষাকৃত সস্তা। এখানে বোটানিকেল গার্ডেনটি অত্যন্ত সুন্দর। লোকে বলে এটি পৃথিবীর মধ্যে একটি

বিখ্যাত বাগান। এখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সহরের পাশে পাহাড়ের মাথায়। এখানে একটি কলেজ আছে। পাহাড়টার মাটী সমান করে, বহু টাকা ব্যয়ে ঘর



সিগ্রিয়ার একটি ছবি

বাড়ী ও খেলার মাঠ তৈরী হয়েছে। রাত্রিতে বেশ শীত করতো। অন্ধকারের মধ্যে নীচে সহরটি দেখতে বেশ লাগতো। এখানে এক রাত্রি নাচগানের জলসা করে ৬ই জুন আমরা বেরিয়ে পড়লাম ডাম্বুলা, সিগ্রীয়া ও পোলা নাড়ুয়ার পথে। গুরুদেব কাণ্ডিতে রয়ে গেলেন। জায়গাটা ভাল, তাঁর শরীরের পক্ষে বিশ্রামের দরকার হয়ে ছিল। বেলা ১২টার সময় আমরা একে একে ডামবুলায় পৌঁছিলাম। এখান থেকেই দক্ষিণ সিংহলের সঙ্গে উত্তর সিংহলের বড় একটা পরিবর্ত্তন বোঝা গেল। উত্তর সিংহল অপেক্ষাকৃত গরম ও এ অঞ্চলে কাণ্ডি বা দক্ষিণ সিংহলের মত উর্ব্বরা ভূমি বা বড় বড় পাহাড় নেই। ডাম্বুলা একটা ছোট পাহাড়ে কাটা বৌদ্ধমন্দির। চারিদিকে প্রকাণ্ড ঘন জঙ্গলে ভরা সমতল জমি। তার উপর থেকে তাকালে পাঁচ মাইল, দশ মাইল দূরে অনেক ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। এই মন্দিরটি অতি প্রাচীন। এখানে পাহাড়ের গা কেটে পাঁচটি বড় বড় ঘর করা হয়েছে। তার ভিতর একটিতে অনায়াসে ৪০০।৫০০ লোকের স্থান হতে পারে। সমস্ত গুহাগুলির দেয়ালেই রঙিন প্রাচীন চিত্র দেখা গেল। প্রথম গুহাটিতে একটা প্রকাণ্ড শায়িত বৌদ্ধ মূর্ত্তি, ভিতরটা অন্ধকার, টর্চ্চ ও দেশলাই জ্বেলে এক এক অংশ এক এক বারে দেখতে হয়। শোনা যায় তখনকার রাজা, আদেশ করেছিলেন তাহাদের দৃষ্টিতে যত খানি জমি চোখে পড়বে সবটাই মন্দিরের সম্পত্তি। এখনও এর অনেকটা জমি-জমা আছে, তবে সেই কালের কিনা তা জানি না। ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর বাইরে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে, মাইল দশেক উত্তরে একটা লাল রঙের পাহাড় দেখিতে পেলাম। আমাদের পথ-প্রদর্শক বল্লেন—ওটি সিগ্রীয়া পাহাড়, যার দেয়াল-চিত্র ভারতীয় শিল্পের গৌরব। সেই পথে যেতে ক্রমাগত দুপাশে জঙ্গল দেখতে পেলাম। আগের মত রবারের গাছ ও চায়ের ক্ষেত বা পাহাড়ের দৃশ্য কিছুই চোখে পড়লো না। এখন যাচ্ছি সমতল জমির উপর দিয়ে। বেলা তিনটা আন্দাজ সিগ্রীয়ায় পৌঁছান গেল। পাহাড়টি ছোট, আয়তনে বড় নয়। এই পাহাড়টি এক সময় দুর্গরূপে



পোলানাড়ুয়ার একটি ভাঙ্গা বৌদ্ধস্তূপের সামে

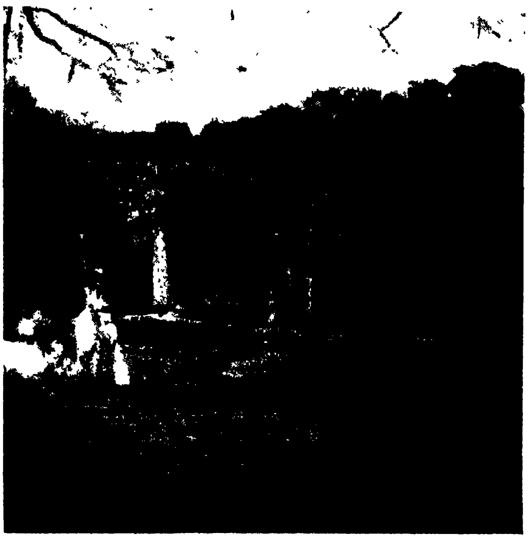
ব্যবহৃত হতো। পাহাড়ের নীচ থেকে মাথা পর্য্যন্ত উঠবার দেয়াল-দেওয়া সুন্দর সিঁড়ি আছে। পাহাড়ের গায় যেখানে

ছবি আছে, সে জায়গাটা অত্যন্ত উচ্চ। ১০০ ফুট তারের জালে ঘেরা, খাড়া পাহাড়ের গায়ে বসানো লোহার



পোলানাড়ুয়ার একটি পাথরের কাজ

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। উপরেও লোহার রড্ দিয়ে বারাণ্ডার মত করা হয়েছে, যাতে দর্শকরা নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে দেখতে পায়। তাও তারের জালে ঘেরা পাখীর খাঁচার মত। এখানে গোটা পাঁচেক স্ত্রীমূর্ত্তি আছে, কোন মূর্ত্তির সঙ্গে কোন মূর্ত্তির যোগ নেই। ছবিগুলি দেখে মনে হলো শিল্পীরা যেন ছবি শেষ করে উঠ্তে পারেন নি। প্রায় ছবিতে দুটি তিনটী করে রেখা। মনে হয় ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পীরা ভঙ্গী অদল বদল করতে চেয়ে ছিলেন। রাজবাড়ী যে স্থানে ছিল, সেখানে ভাঙ্গা ইটপাথরের দেয়াল ছাড়া আর কিছুই নেই। পাহাড়টির গায়ে মানুষের হাতে কাটা ছোট জলাশয় আছে। তাতে পদ্মফুল দেখা গেল। বিশেষ উৎপাত এখানে বড় বড় মোমাছির। তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সরকার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে রেখেছেন। এখান থেকে বেরিয়ে সেদিনই সন্ধ্যার আগে পোলানাড়ুয়ার পৌঁছবার কথা। সুতরাং তাড়াতাড়ি গন্তব্য স্থানে রওনা হলাম। এখন আমরা যে পথে যাচ্ছি, সেই পথে ভয়ের কারণ ছিল। এখানে নানা প্রকার বন্যজন্তু ও হাতীর বিশেষ উপদ্রব আছে। রাস্তার দুপার্শ্বে ঘন বন। তার ভিতর দিয়ে ২৫ মাইল রাস্তা পেরিয়ে তবে আমরা পৌঁছবো। পথে দেখলাম সে দেশের গরীব লোকেরা দল বেঁধে সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, প্রায় প্রত্যেকের হাতেই একটা করে বন্দুক। আমরা পৌঁছলাম সন্ধ্যার সময়। এই জায়গাটি সিংহলের একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান। পূর্ব্বে এ জায়গাটিতে সিংহলের বড় একটি রাজধানী ছিল। আমাদের বাসস্থান হলো সেখানকার পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারীর বাসায়, একটা বড় হ্রদের ধারে। ৭ই জুন ভোরে উঠে মোটরে বেরিয়ে পড়া গেল, প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংশাবশেষ দেখতে। যে দিকে তাকাই, সে দিকেই দেখি ভাঙ্গা ইট পাথরের দেয়াল বা মন্দির। কোথাও ভগ্ন বৌদ্ধ-মন্দির। চারিদিকে অসংখ্য ছোট বড় নানা রকমের মূর্ত্তি ; এখানেও বুদ্ধের দন্ত স্থাপনের জন্য দুই চারটি মন্দির স্থাপন করা হয়েছিল। কোন মন্দিরে অতি প্রাচীন চিত্র দেখা গেল। সেগুলি অযত্নে দিনে দিনে ধ্বংশ হয়ে যাচ্ছে। এ সব দেয়াল-চিত্রের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন ভারতীয় দেয়াল-চিত্রের



পোলানাড়ুয়ার শায়িত বুদ্ধ

বিশেষ পার্থক্য আছে বলে মনে হলো না। এখানেও দুই একটি বড় বড় বৌদ্ধস্তূপ আছে। দুই একটি অতিকায়

বুদ্ধমূর্ত্তিও দেখতে পেলাম। কোনটা ধ্যানী মূর্ত্তি, কোনটি বুদ্ধের নির্ব্বাণ মূর্ত্তি। বেলা বারটার মধ্যে সব



পোলানারুয়া

শেষ করে আমরা রওনা হয়ে পড়লাম, অনুরাধাপুরের দিকে। এখান থেকে প্রায় ৬০।৭০ মাইল পশ্চিমে, পৌছতে বিকেল ৪টা হয়ে গেল।

অনুরাধাপুরের নাম শুনেছি অনেক বার। এটি সিংহলের অতি প্রাচীন রাজধানী। সহরটিতে ঢুকেই যে দিকেই তাকাই, কেবল পুরাতন পাথরের থাম দেখতে পাওয়া যায়। এই সহরের ভিতরে ও কাছে অনেকগুলি পুরাতন বৌদ্ধ



অনুরাধাপুরের একটি স্তূপের অংশ—এটিকে সারানর চেষ্টা হচ্ছে

স্তূপ আছে। মাত্র একটীকে বৌদ্ধরা সারিয়ে নূতন করে তুলেছে। আর সব এমনিই পড়ে আছে। এখানে আমরা আছি বৌদ্ধদের একটী আধুনিক ধর্ম্মশালায়, এটির বন্দোবস্ত বড় হোটেলের মত। ৮ই জুন সকালে মোটরে বেরিয়ে পড়লাম, প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখতে। এ জায়গাটি এত প্রকাণ্ড যে তার সিকি অংশও সরকারী পুর্ত্তবিভাগ পরিষ্কার করে উঠতে পারে নি। চারিদিক জঙ্গলে ঢাকা, যেটুকু পরিষ্কার আছে, সে সব জায়গায় রাস্তা করা হয়েছে, এবং কোথায় কি আছে তাও নির্দ্দেশ করা আছে। এই বনটির ভিতরে পরিষ্কার বড় বড় গাছের ছায়ায় ঘেরা বাগানের মধ্যে বিখ্যাত পাথরের ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি দেখা গেল, তার চারি দিকে কোথাও কিছুই নাই।



ধ্যানী বুদ্ধ—অনুরাধাপুর

মূর্ত্তিটী উঁচুতে প্রায় দুই মানুষ। মূর্ত্তিটির ধ্যানমগ্ন ভাবটী দেখে সকলেরই ভাল লেগেছিল। দুপুরে "মহীনতালে" নামে একটী ছোট পাহাড়ে গেলাম। এই পাহাড়টীর চারিদিকে সমতল জমি ও বন। নীচের থেকে প্রশস্ত পাথরের সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। শোনা যায় সম্রাট অশোকের পুত্র প্রথম সিংহলে এসে, এই পাহারের তাঁর আশ্রম স্থাপনা করেন। এই পাহাড়টির মাথায় একটি বড় পুরাতন ইটের স্তূপ আছে। এবং এক সময় এটি একটি বৌদ্ধসাধুর বড় আস্তানা ছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে "অনুরাধাপুর" সহরের মধ্যে বিখ্যাত বোধিবৃক্ষের ডাল দেখতে গেলাম। আমাদের সকলেরই ধারণা ছিল, এই প্রাচীন গাছটী নিশ্চয়ই খুব

বড়। কিন্তু গিয়ে দেখি গাছটা অনেক ছোট। প্রকাণ্ড প্রায় দেড়তলা উঁচু বেদির মাঝে, গাছটী দাঁড়িয়ে আছে। নানাভাবে বাঁশ, সোনা, রূপা, বাঁধান লোহা, বা কাঠের



মহিন্‌তালে



মহিন্‌তালের মাথায়

ডাণ্ডায় ঠেকা দেওয়া হয়েছে। চারিদিকে প্রাচীর, লোহার গেটে চাবি মারা। প্রহরী আমাদের ঢুকতে দিলে না। তাকে অনেক অনুনয় করার পর, গালার কাজ করা একটি বল্লম হাতে করে ও তকমা লাগিয়ে বেরিয়ে এলো, এবং বুঝিয়ে দিল, তার ক্ষমতা অসীম, বেশী গোলমাল করলে, বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে দেবে। সহরের পাশে একটি প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদের ধারে বিখ্যাত ইশ্রুমনীয়া মন্দির। এই মন্দিরের পাথরের গায়ে কপিল মুনির মূর্ত্তিটী দেখা গেল। এখানে একটি বৌদ্ধদের ছোট আশ্রম আছে।

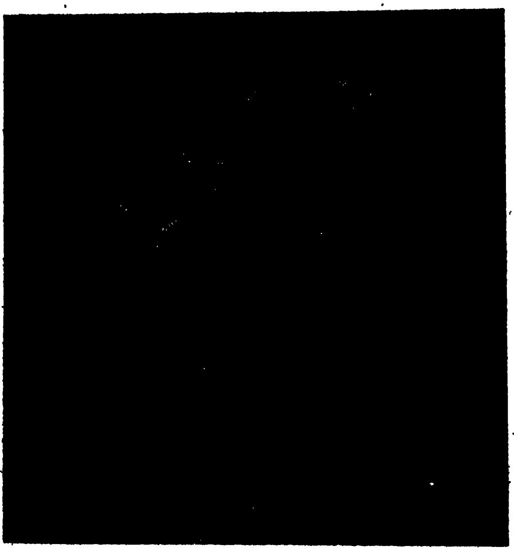
৯ই জুন "অনুরাধাপুর" ত্যাগ করে আমাদের ট্রেনে জাফ্‌নায় যাওয়ার পালা। দুপুরবেলা কবি মোটরে কাণ্ডি থেকে এখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি একদিন এখানে বিশ্রাম নেবেন ঠিক করলেন। এইখানে আমরা সিংহলী



ইশ্রুমনিয়া—কপিল মুনি, সাধারণ মানুষের ন্যায় বড়

বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলাম। এখন থেকে আমরা সিংহলের তামিলদের অতিথি। আমরা ট্রেনে চড়ে জাফ্‌নার দিকে রওনা হয়েছি। যতই উত্তরে যাচ্ছি, ততই দেখছি তালগাছ খেজুরগাছ, আর শুকনো লালমাটী। এদেশের সমস্তটাই তামিলদের আড্ডা। এরাই হাজার দেড় হাজার বছর পূর্ব্বে ভারতীয় সভ্যতা এদেশে প্রচার করেছিল। সিংহলের তামিলদের সঙ্গে সিংহলীদের বিশেষ সদ্‌ভাব আছে বলে মনে হয়নি। তামিল অধিকাংশই হিঁদু ও খৃষ্টান। এদের মধ্যে বৌদ্ধের সংখ্যা খুব কম। দেশে বৌদ্ধ সাধু বা বৌদ্ধ মন্দির নেই। আর গ্রামে গ্রামে ভিক্ষুদের রঙীন কাপড় পরে

ভিক্ষায় বেরুতে দেখা যায় না। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিক্ষার পদ্ধতি বড় চমৎকার। ভিক্ষুরা একটী ভিক্ষাপাত্র হাতে গৃহস্থের বাড়ীর দরজায় চুপ করে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা আমাদের দেশের সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুকদের মত হাঁক ডাক ছাড়ে না। গৃহস্থ বাড়ীতে সেই সময় যা কিছু থাকে, তার ভিক্ষাপাত্রে দিয়ে যায় এবং ভিক্ষুরা কখনও সেই ভিক্ষার দ্রব্যের দিকে দৃষ্টি দেবে না। এভাবে প্রত্যেক বাড়ী ঘুরে নানারকম খাদ্যদ্রব্যে ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে আশ্রমে ফিরে আসবে। সেই খাদ্যদ্রব্যের ভিতর কোন বাচবিচার নেই। জাফ্‌নাতে আগে থেকেই কবিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য সমিতি গঠিত হয়েছিল। তারাই আমাদের জাফ্‌না ভ্রমণের আয়োজন করে, আমাদের আশ্রমের কয়েকটি পুরাতন ছাত্রী মেয়েদের সেবা যত্নের ভার নিয়েছিলেন। সেখানে তাদের থাকার বন্দোবস্ত করেছিল পুরাতন দুর্গে, জজ্জের বাসায়। আমরা রইলাম একটি ভদ্রলোকের বাগান-বাড়ীতে। কবি এলেন দ্বিতীয় দিন ভোরে। তাঁকে ষ্টেশনে



[illegible] মূর্তি

[illegible] গানকে বরণ করে নামালো। তাঁর বাসস্থান ঠিক করা হয়েছিল সেখানকার গভর্ণমেণ্ট এজেণ্টের বাসায়।

জাফ্‌না সহরে আমাদের তিন রাত্রি অভিনয় ও কবির বক্তৃতা ইত্যাদি ছিল। ১৫ই জুন সন্ধ্যায় জাফ্‌না ত্যাগ করে আমরা পরদিন বেলা ১২টার সময় ভারতে পা দিলাম, ধনুস্কুটীতে এসে।



জাফ্‌নার একটি তামিল পরিবার

এই ভ্রমণে আমাদেরও যেমন শিক্ষার বিষয় অনেক ছিল, সেই সঙ্গে সে দেশের পক্ষে কবির ভ্রমণও খুব কাজের হয়েছিল। তার পরিচয় স্বরূপ সে দেশের কয়েকটি মাসিক পত্রিকা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা গেল :—

"Here in Ceylon he has kindled a new enthusiasm, he has awakened a great yearning, he has held aloft a great idealism. It is not generation that will think him for his inspiration to Ceylon. Generation cannot measure the value of his services. It is not history that will record his achievements. Even history cannot give a niche to an impetus that has opened our eyes to a vision of the joy and grandeur of our song and our music, of our art and our culture."

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

এখানে ও সেখানে

শ্রীসোমদেব বর্ম্মণ

লণ্ডনের উত্তরাংশে উপন্যাস-প্রসিদ্ধ হাইগেট্ (Highgate)—এখন সহরতলীরই একটা অংশ। তারই মাজ্‌ল্ হিল্ (Mousell Hill) নামক উচ্চ-ভূম পল্লীতে প্রশস্ত উদ্যান-ঘেরা একটী নাতি-প্রশস্ত বাড়ী। বাড়ীটী ভিক্টোরীয় যুগের—বেশ পাকা পোক্ত গড়ন—সহরতলীর আজকালকার একছাঁচে ঢালা ভাগের বাড়ীগুলোর মত নয়। বাড়ীটীতে থাকেন একজন অবসর-প্রাপ্ত ইংরাজ আই-সি-এস্। অশীতিপর বৃদ্ধ—গত শতাব্দীর নবম শতকে কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে এখনো পর্য্যন্ত পেন্‌সন ভোগ ক'রছেন। তাঁর কর্ম্মজীবনের সমস্তটাই কেটেছিল পাঞ্জাবে। সেখানে তিনি ছিলেন জেলা জজ্ এবং পেন্সন নেবার কিছু আগে মাস কতকের জন্য লাহোর চীফ্ কোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন। তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছিল অক্স-ফোর্ডের ক্রাইস্‌ট্ চার্চ্চ কলেজে এবং চাকরী-পূর্ব্ব জীবনটা গ্ল্যাডষ্টোন-ব্রাইটের উদার মতবাদের আওতায়। সে সময় তিনি যে দীক্ষা পেয়েছিলেন, তা এ বয়সেও ভুলতে পারেন নি। তাঁর মত আর একজন—যাকে বলে Gladstonian Liberal—সারা ইংল্যাণ্ডে এখন খুঁজে পাওয়া শক্ত। রাজনীতিক মতবাদের জন্যই বোধ হয় কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সুবিধা ক'রতে পারেন নি। তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায়—যাকে এখন সিভিলিয়ানি ষ্টীল্ ফ্রেম্ নামে অভিহিত করা হয়—তারই ছাঁচ তৈরী হচ্ছিল Strachey ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিপত্তি-কারখানায়। সে যুগের ভারতীয় শাসন যন্ত্র পরিচালনে এই ভ্রাতৃযুগলের ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে কতটা ছিল, তা' নিশ্চয় একদিন সরকারী দপ্তরখানার অন্ধকারা থেকে মুক্ত হ'য়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত বা কলঙ্কিত ক'রবে, অতএব সে বিষয়ের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে সেকালের ভারতীয়, তথা অ্যাংলো-ভারতীয়, জীবনের গল্প যা' এই বৃদ্ধ ভদ্র-লোকের কাছে থেকে শুনিছি, তার কোন-কোনটা হয়ত 'বিচিত্রা'র পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্রেক ক'রতে পারে। এই আশায় সেগুলোকে আজ পত্রস্থ ক'রতে সাহস ক'রেছি।

যদিও তিনি এখন নামানামের অতীত, তবুও এখানে তাঁর পুরো নামটা উল্লেখ করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। তাঁকে Mr. C. নামেই অভিহিত করা যাক। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার মধ্যস্থতায়। এই মহিলাটী অবিবাহিতা, বয়সে প্রৌঢ়া, অশেষ গুণ সমন্বিতা এবং বিশেষ ক'রে ভারত-হিতৈষিণী। এঁর একটু বিশদ পরিচয় এখানে দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এ দেশের প্রথামত বয়স্ক সন্তান হিসাবে এঁর আলাদা গৃহস্থালী আছে। ইনি আগে থাকতেন হ্যাম্‌স্‌টেডের একটা পুরাতন বনিয়াদি পাড়ায়। যে বাড়ীটাতে থাকতেন, সেটা এক সময়ে শিল্পী কন্‌স্‌টেবলের (Constable) বাসভবন ছিল—সে কথা দেয়ালে উৎকীর্ণ আছে। এ পাড়ার অধিবাসীরা না কি বাইরের লোকের অর্থাৎ ভাড়াটিয়াদের এখানে থাকা পছন্দ করেন না—সে জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, Miss C হ্যাম্‌স্‌টেডের অন্য একটা আধুনিক পাড়ায় বাসস্থান বদলি করেন। এই নূতন গৃহস্থালীতে তাঁর পোষ্য এবং আশ্রিতের সংখ্যা বড় কম ছিল না। সেথায় ছিলেন তিনটী ভারতীয় ছাত্র, দুটী অপদার্থ ইংরাজ এবং ততোধিক অপদার্থ একটী ইংরাজী-ভাষী করাসী যুবক যার মানসিক গঠন ছিল ঠিক আমাদের দেশের ফিরিঙ্গিদের মত। আর ছিল একটী কাকাতুয়া—Miss C-রই সমবয়সী। Miss C-র বিশেষ

মেহের পাত্র ছিল ওই ফরাসী যুবকটী। তার নামটা যেমন আভিজাত্য জ্ঞাপক ছিল, অবস্থা এবং শিক্ষাদীক্ষায় তেমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যেত না। তাদেরি দেশে যাকে বলে plus royaliste que le roi—সে ছিল তাই। তার মত ইংরাজভক্ত ইংরাজদের মধ্যেও দেখা যায় না আর এমন স্বজাতি-বিদ্বেষী কোনও দেশে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। মাতৃভাষা প্রাণ গেলেও কইত না। তার জীবন-স্বপ্ন—যেন তাকে লোকে ইংরাজ ব'লে ভুল করে। অথচ উচ্চারণ ভঙ্গী এবং ভাষা প্রয়োগে তার ফরাসীত্ব প্রতি পদে ধরা প'ড়ে যেত। বন্ধুরা এই গৃহস্থালীকে Miss C-র Menagerie বা চিড়িয়াখানা নামে অভিহিত ক'রতেন। তিনি এতগুলি জীবের কারুর থাকার, খাওয়ার, কারুর পড়ার, কারুর বা সমস্ত খরচই বহন ক'রতেন। বিশেষতঃ ভারতীয়দের উপর তাঁর যেন একটা সংস্কারগত টান ছিল। তিনি জন্মেছিলেন লুধিয়ানায়, সেই সূত্রে নিজেকে ভারতীয় ব'লে পরিচয় দিতেন। তাঁর আট বৎসর বয়সের সময় তাঁর পিতা চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফেরেন। সেই থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্কই শেষ হ'য়ে যাবার কথা। কিন্তু তিনি তা' হ'তে দেননি। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন ভারতীয় ছাত্রকে তিনি একদিন সমূহ বিপদ থেকে বাঁচান। আর একজনকে তিনি এক সময় রোগ এবং ঋণ উভয়ের হাত থেকে মুক্ত করেন। আর একটী ভারতীয় ছাত্রের কথায় আমায় একদিন ব'ললেন —"ও যে সিভিল সার্ভিস পাশ করতে পারেনি, তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। কেন জান? কেম্বি্রজের সেই পেত্নীটা এইবার ওকে ছাড়বে।" দেখলুম, হ'লও তাই।

যাই হোক্, এ হেন Miss C-র আমন্ত্রণে এবং তাঁর মাতার নিমন্ত্রণে একদিন গেলুম তাঁর পিতার সঙ্গে আলাপ ক'রতে। আমি দেশে ফেরবার আগেই Mr. C-র জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। তাঁর সঙ্গে মাত্র আমার তিনটী দিন দেখা হয়েছিল। তার বেশী যে হয়নি সে দুঃখ চিরকাল থেকে যাবে—এমন সুন্দর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি।

প্রথম দিনের কথা ব'লছি। অভিবাদনের পর তাঁর প্রথম প্রশ্ন—How's India? উত্তরে ব'ললুম, যে ইণ্ডিয়াকে তিনি জানতেন, তার নাড়ী এখন বিশেষ চঞ্চল। তাঁকে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে হ'ল কেননা তাঁর প্রিয় পঞ্চনদের একটা বিশেষ দুর্ঘটনার দিন থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন সংবাদ তাঁকে বড় একটা রাখতে দেওয়া হয়নি—তাঁর ডাক্তার এবং তাঁর স্ত্রীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে। আমার কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন বটে, তবে সে বিষয়ে কিছু মন্তব্য প্রকাশ না ক'রেই নিজের যেন একটা পূর্ব্বেকার চিন্তাসূত্রের জের টেনে ব'ললেন—একটা জিনিষ তুমি লক্ষ্য ক'রেছ? আইরিশ আর ভারতীয়দের একটা বিষয়ে খুব মিল আছে। এই দু'জাতই নিজেদের অত্যাচারিত মনে করে, অথচ এরাই আবার ব্রিটিশ নামের দোহাই দিয়ে বিদেশে নেটিভদের উপর এমন অত্যাচার করে যা' একদিক দিয়ে দেখতে গেলে যেমন হাস্যকর অন্যদিকে তেমনি কল্পনাতীত নিষ্ঠুর ব'লে মনে হয়। ব্রিটীশ-চর্ম্মাবৃত আইরিশের সঙ্গে তো পাঞ্জাবীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে, অথচ এই পাঞ্জাবী শিখেরাই আবার হংকং-সিঙ্গাপুরে ব্রিটীশ-চর্ম্মাবৃত পাহারাওয়ালারূপে চীনাদের উপর কি অত্যাচারটাই না করে। অথচ তারা এটা বোঝেনা যে কলঙ্কটার সমস্ত ভার ব্রিটীশদের উপরেই পড়েনা, বেশীর ভাগটা পড়ে তাদের দেশবাসীদের উপরেই। প্রবাদ কথা যা' আছে, তা' ঠিক-ই—বান্দা আর জবরদস্ত, এক ধাতুতেই গড়া।

ব'ললুম—আশ্চর্য্য, আইরিশদের সম্বন্ধে এই ধারণা নিয়েও তো আপনি আগাগোড়াই হোমরুলের পক্ষপাতী ছিলেন!

জানা ছিল, Asquith মহোদয় তাঁর হোমরুল বিল পাশ করার ব্যাপারে যখন লর্ড সভা থেকে বাধা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি নিজের দলের যে ৪০০ জন লোককে পীয়রশ্রেণীভুক্ত ক'রে সেখানকার ভোট সংখ্যা নিজের আয়ত্তে আনবার উদ্যোগ ক'রেছিলেন, তার মধ্যে Mr. C ছিলেন একজন। এটা শুনেছিলুম Manchester Guardian সংশ্লিষ্ট একজন বিশিষ্ট সাংবাদিকের মুখে। তিনি আরও ব'লেছিলেন, Asquith বেছে নিয়েছিলেন এমন সব লোক যাঁদের পুরুষানুক্রমে

ছিল না, অর্থাৎ উপাধিগুলোর জের যেন এক পুরুষের বেশী না টানে।

আমার প্রশ্ন শুনে Mr. C হাসলেন, প্রতিপ্রশ্ন ক'রলেন—একমাত্র এই কারণটাই কি আয়র্ল্যাণ্ডে এবং ভারতে হোমরুল প্রবর্ত্তন করবার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিপ্রদ ছিল না?

সেদিন আরও অনেক কথা হ'ল, কিন্তু সেগুলোর উল্লেখ করা অবান্তর হবে। বিদায় নিয়ে ফেরবার সময় তিনি তাঁর লাইব্রেরীতে রক্ষিত গোখ্‌লের একখণ্ড বক্তৃতা-সংগ্রহ দেখালেন—তার পাতাগুলোর মার্জ্জিন Mr C-র স্বহস্ত লিখিত নোটে ভরা। তাঁর কথায় বুঝলুম, তিনি এক সময় গোখ্‌লের খুব অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনের শেষ অবস্থায়—সেটা গোখ্‌লের জীবনেরও শেষ অবস্থা—যখন তিনি বিলাতে ছিলেন, তখন এ বাড়ীতে কয়েকবার তাঁর শুভ পদার্পণ হ'য়েছে, সে কথাও ব'ললেন।

* * *

মাসখানেক বাইরে কাটাবার পর লণ্ডনে ফিরে C-পরিবারের ডিনারের নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে গেলুম। Mr C-র সঙ্গে এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। সেদিনই তাঁর সঙ্গে বেশী কথা হ'য়েছিল। Mrs C বয়সের দরুণ কানে শোনেন কম, তাই তিনি আমাদের কথাবার্ত্তায় বিশেষ যোগ দিতে পারেননি। শুনলুম, এই বধিরতার জন্য তিনি অধিকাংশ সময় একটা বোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং বাকী অবসরটা—যদি বৃষ্টি বাদল না হয়—তিনি কাটান্ সাউথ কেনসিংটন ম্যুসিয়মে কতকগুলো মনোমত ছবি নকল ক'রে।

Mr. C-র বাড়ীটাই যে শুধু ভিক্টোরীয় যুগের ছিল, তা' নয়। ভিতরের আসবাব পত্রও ছিল তাই—যতটা বাহুল্যে ভরা ততটা স্বস্তিপ্রদ নয়। আমার আহেল-বিলাতি চোখে নানারূপ টুকিটাকি শোভিত ম্যাণ্ট্‌লপিস, দেয়ালে টেবিলে ফটোগ্রাফের প্রাচুর্য্য, আরাম কেদারার শিরোদেশে অ্যান্টিম্যাকাসার প্রভৃতি একটু বিসদৃশ ব'লে ঠেকেছিল। ডিনারেও প্রাচুর্য্য ছিল প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশী। উপরন্ত, ভারতীয় অতিথির সম্মানার্থ পোলাও এবং কোর্মার আয়োজন ছিল। বলা বাহুল্য, এ দুটী ভোজ্য আসল জিনিষের কাছেও পৌঁছয়নি। তবে এটা মানতে হবে যে, বাঙ্গালী বাড়ীর উৎসবাদিতে যা' পোলাও এবং কোর্মা নামে পরিবেশিত হয়, তার চেয়ে এগুলো কোন অংশে খারাপ ছিল না।

শুনলুম, তাঁদের বৃদ্ধা পাচিকা বহু বৎসর আগে Veeraswamy নামধেয় ভোজনশালার এক পাচকের কাছ থেকে এগুলো শিখেছিলেন এবং ইদানীন্তন এঁদের অনুৎসাহে শিক্ষাটা প্রায় ভুলতে ব'সেছেন। এই সূত্রে আরও শুনলুম যে, লণ্ডনে সব রকম ভারতীয় মশলাই কিনতে পাওয়া যায়—পিক্যাডিলি অঞ্চলে Belati Bungalow ব'লে একটা দোকান আছে, সেইখানে। সেদিন এটাও জেনে নিলুম যে, Veeraswamy ছাড়া আরও দু'একটা ভাল দেশী ভোজনালয় লণ্ডনে আছে, যাতে এমন কি বিরিয়ানি জাতীয় পোলাওর দর্শনও সুদুর্লভ নয়। গৃহকর্ত্রী জিজ্ঞাসা ক'রলেন—ভারতীয় ছাত্রেরা বোধ হয় সেখানে খুব যায়?

তাঁর কন্যার ভারতীয় ছাত্রজীবনের সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার চেয়ে বেশী। তিনি ব'ললেন—উহুঁ, তারা যায় Gower Street-এ সেই যেখানে Y. M. C. A. দের যে ভোজনশালা আছে Indian Student Union-এর সম্পর্কে, সেইখানে। সেখানে খুব সস্তা। কিন্তু কী নোংরা! ব্রম্‌টন্ অঞ্চলে ওদের আর একটা আড্ডা আছে—তাকে ওরা Isca বলে—সেটা বরং কিছু ভাল।

আমার এগুলোর কোনটার সঙ্গেই তখন পর্য্যন্ত পরিচয় হয়নি, অতএব চুপ ক'রে থাকতে হ'ল।

সেদিন ডিনারের সঙ্গে পানীয় আয়োজনের মধ্যে একটা লক্ষ্য করবার জিনিস ছিল—হাঙ্গেরীর আসব টোকাই (Tokay)—যার ব্যবহার ইংল্যাণ্ডে খুব প্রচলন নেই। Mr. C ব'ললেন, বৃদ্ধদের উপর ওটার শক্তিপ্রদ প্রভাব অদ্ভুত। Mr. C-র বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও সেদিনকার স্ফূর্ত্তিভাব দেখে সেটা মেনে নিতে হ'ল। আমাকে সেদিন বেশী কথা কইতে হয়নি; তিনি নিজের আনন্দেই সেকালের অনেক কথা ব'ললেন। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের স্মৃতি-প্রদীপ নিভে যাবার আগে সেদিনই বোধ হয় শেষ জ্বলে উঠেছিল।

সেটা ওই Tokay-এর প্রভাবে কি তাঁর প্রিয় পঞ্চনদের সঙ্গে পরিচিত এক ভারতীয়ের সংস্পর্শনে, তা' বলা শক্ত। বোধ হয়, দুটোর সংমিশ্রনেই।

Mr. C ব'ল্লেন—আমাদের সময়টা ছিল গৌরব করবার মত। অ্যাংলো-ভারতে তখন প্রতিভার অভাব ছিলনা। আমাদের সার্ভিসেই তো ছিলেন Alfred Lyall. কবি ও সমালোচক হিসাবে লণ্ডনের সাহিত্য জগতে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন সার্ভিসে থাকতেই। তোমরা তাঁর কবিতা আর English Men of Letters সিরীজের Tennyson খানা তো প'ড়েছ। কিন্তু তখনকার দিনে Pioneerএ তাঁর অনেক ভাল দরের লেখা বেরিয়েছে—সেগুলো হয়ত তোমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। তিনি লিখতেন ব্যোমদেব শাস্ত্রী ছদ্মনামে। Edwin Arnold শিক্ষা বিভাগে ছিলেন, কিন্তু তিনিও আমাদের সময়কার লোক। Kipling এঁদের পরে।......Rudyard তো ছেলেমানুষ। তার প্রথম উচ্ছ্বাস আমার এখনো মনে আছে। সিভিল-মিলিটারিতে (Civil and Military Gazette) তার গল্পগুলো মন্দ লাগত না—ওর বয়সের অনুপাতে একটু ডেঁপোমি ব'লে মনে হ'ত যদিও। ওর প্রথম বইখানা কিনি আম্বালা ষ্টেশনে হুইলারের বুকষ্টল থেকে—বেশ মনে আছে, ব্রাউন-পেপারে মোড়া, এক টাকা দাম।......জানি হে জানি, সে বইখানা আজ থাকলে Sothebyর নিলামে অনেক টাকায় বিক্রী হ'ত।......ওর পিতা Lockwood Kipling-কে খুব ভাল ক'রেই জানতুম। লোকটা সত্যিকারের আর্টিস্ট্ ছিল হে! অর্থস্পৃহা মোটেই ছিল না। মুসিয়মের Curator হিসাবে আর কত মাহিয়ানাই বা পেত, কিন্তু ওই কাজেই সে জীবন উৎসর্গ ক'রেছিল। Rudyardকে বিলাতে বছর চার-পাঁচের বেশী পড়াতে পারেনি। তার ষোল-সতেরো বছর বয়সেই লেখাপড়া ছাড়িয়ে সিভিল-মিলিটারি গেজেটে একটা সাব-এডিটারি জোগাড় ক'রে তাকে নিজের কাছেই এনে রেখেছিল। ভারতীয় কারুশিল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় ওই Lockwood-ই। লোকটা উচুদরের সমঝদার ছিল। Mantelpiece এর দুধারে ওই যে দুটো কাঠের জালিকাজ করা ঝরোকো দেখ্‌ছ—ও দুটো আমাকে সে-ই বেছে কিনিয়ে দেয়—খুব পুরাতন হাতের কাজ। আমার স্ত্রীর অঙ্কন বিদ্যার গুরুও ছিল সে। আঁকতে এবং মডেলিং ক'রতে তখন পাঞ্জাবে ওর জোড়া কেউ ছিল না। তার ক্ষমতা ফুটে উঠ্‌ত atmosphere সৃষ্টি করায়। সেইটেই ছিল ওর আর্টের বিশেষত্ব। রাডিয়ার্ডের লেখাতে—বিশেষ ক'রে তার Kim বইখানাতে অনুরূপ ক্ষমতার যে পরিচয় পাও, সেটা জেনো তার পিতার কাছ থেকেই পাওয়া।

—কিন্তু ওঁর লেখাতে বাঙ্গালী বিদ্বেষের ভাবটা লক্ষ্য ক'রেছেন? উনি কখনো কোন বাঙ্গালীর সংশ্রবে এসেছিলেন ব'লে তো মনে হয় না।

—শুধুই কি বাঙ্গালী বিদ্বেষ? ও আমাদেরও ছেড়ে কথা কয়নি। অতিরঞ্জনই বোধ হয় ওর লেখার প্রাণ। অন্ততঃ আমি শপথ ক'রে ব'লতে পারি, আমাদের সময়-কার সিমলায় Kipling চিত্রিত Mrs Hawksbee-র অস্তিত্ব ছিল না একেবারেই। তখনকার সিমলা সমাজের প্রবেশবন্ধনী ছিল খুব শক্ত। এক অখ্যাতনামা সাংবাদিকের পক্ষে—তা' সে ইংরাজ হ'লেও—সে বন্ধন খোলা সহজ ছিল না। ওর আমাদের উপর ঝাল ঝাড়াটা ওই বন্ধ কবাটের উপর বৃথা মুষ্ট্যাঘাত ছাড়া কিছুই নয়।......

আর বাঙ্গালী বিদ্বেষের কথা যে ব'ললে, তার সাধারণ কারণ এই হ'তে পারে যে, ঠিক ওই সময়টাতেই ভারতীয়েরা প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টা সুরু ক'রেছিল—বাঙ্গালীদের নেতৃত্বে। কংগ্রেস, সিভিল সার্ভিসে, বার্-এ, সংবাদপত্রে—সবক্ষেত্রেই বাঙ্গালীরা ভারতের অন্যান্য জাতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'লছিল। সেটা আমাদের অনেকের মত Kipling-এরও জিনো চোখে ভাল ঠেকেনি।......তবে ও যে বাঙ্গালীর সংশ্রবে এসেছিল—মুখ্যভাবে না হ'লেও গৌণভাবে—তার প্রমাণ আমি দিতে পারি। তবে সেইটেই যে তার বাঙ্গালী বিদ্বেষের কারণ, তা' অবশ্য আমি শপথ ক'রে ব'লতে পারব না। যাই হোক, গল্পটা শোন।

সর্দার দয়াল সিং ছিলেন—জানই তো—শিখ রইসিয়া।

বংশের বড় ঘরওয়ানা। আমাদের মুরুব্বিয়ানা বন্ধুর তাঁর ভাল লাগল না—তিনি বাংলাদেশে গিয়ে কংগ্রেস ও ব্রাহ্ম-সমাজের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রলেন। তারপর দেশে ফিরে খুললেন Tribune পত্রিকা—কংগ্রেসের মুখপত্র রূপে। সম্পাদক ক'রে নিয়ে এলেন সুরেন বাঁড়ুয্যের এক চেলা—শীতলাকান্ত চ্যাটার্জ্জি নামে। চ্যাটার্জ্জি ছিল বয়সে ছোক্‌রা—বক্তৃতা দিতেও যেমন, লিখ্‌তেও তেমন, খুব তেজী—গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। গোড়া থেকেই ট্রিবিউনের সঙ্গে সিভিল-মিলিটারির বেধে গেল ঝগড়া। কিপলিং ছিল তখন সিভিল-মিলিটারির সহ-সম্পাদক—আর দু'জনেই ছিল যুবা। কিছুদিন যেতে না যেতে চ্যাটার্জ্জি তার কাগজে অমৃতসর না কোন্ জেলার পুলিস-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্-এর জবরদস্তির কাহিনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ ক'রতে আরম্ভ ক'রলে। সিভিল-মিলিটারি সে সময় ছিল সরকারী কর্ম্মচারীদের একরূপ মুখপত্রের মত। তার এটা সহ্য হ'ল না। বিতণ্ডা বেড়েই চ'লল। ব্যাপারটা ক্রমশঃ এমন দাঁড়ালো যে সেই পুলিস সাহেবটীকে Tribune-এর বিরুদ্ধে মামলা আনতে বাধ্য হ'তে হ'ল—নয় ত তার চাকরীতে ইস্তফা দিতে হয়। চীফ্ কোর্টের বিচারে Tribune-এর হল জয়। ফলে, সেই পুলিস সাহেবটী হ'ল বদলি আর তার পদোন্নতিও বুঝি বছরকয়েকের জন্য হ'ল বন্ধ। যতটা মনে পড়ে, এই মকদ্দমার পর পাঞ্জাব সরকার গেজেটে চ্যাটার্জ্জিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই পুলিস সাহেবটী ছিল Kipling-এর বিশেষ বন্ধু—Kipling সৃষ্ট Strickland Sahib-এর Original ছিল সে-ই। এর পিতা এবং পিতামহ উভয়েই সীমান্ত ফৌজের সেনানী হিসাবে এক সময়ে সুপরিচিত ছিলেন এবং এর পিতামহী ছিলেন একেবারে খাস্ আফ্‌গান রমণী……

Mr. C এই ব্যক্তিটীর নাম ক'রেছিলেন, এবং তার নামের সঙ্গে আমারও পরিচয় ছিল। কিন্তু ইনি এখনও জীবিত আছেন ব'লে সেটা এখানে উল্লেখ ক'রলুম না।……

Mr. C ব'লে যেতে লাগলেন—কী গুণে যে কিপলিং Nobel Prize পেলে, তা' আমি এখনও বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না। ওর লেখা যে একসময়ে ব্রিটিশ জিঙ্গো মনে আর নূতনত্ব-প্রিয় ইয়াঙ্কি মনে আধিপত্য বিস্তার ক'রেছিল, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তবুও মনে হয়, সেটা ওর ভাগ্যের ব্যাপার যতটা, প্রতিভার ব্যাপার ততটা নয়। অত কম বয়সে এক Byron ছাড়া আর কেউ অত নাম ক'রতে পারেনি।……

সে সময় Pioneer আর সিভিল-মিলিটারি একই সত্ত্বাধিকারীদ্বে পরিচালিত হ'ত। বছর কতক সিভিল-মিলিটারিতে কাজ করার পর Pioneer-এর খরচায় কিপ্‌লিং পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরোয়—যার মুখ্য ফল From Sea to Sea এবং গৌণ ফল ওর ভাগ্য পরিবর্ত্তন। প্রথমে অ্যামেরিকা, পরে ইংল্যাণ্ড—দুই-ই ও অধিকার ক'রে ব'সল। ওকে আর পিছন ফিরে চাইতে হ'ল না, হিন্দুস্থানে ফেরবার দরকারও ফুরিয়ে গেল। তারপর বুয়র যুদ্ধের তল্পিধারকত্ব, নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্তি, এবং তারপর—

বিস্মৃতি—আমি বাধা দিয়ে ব'ললুম। আরও ব'ললুম, কিপ্‌লিং-এর বিষয়ে Oscar Wilde-এর যাচাই সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক নির্ব্বিশেষে সকলেই এখন মেনে নিয়েছে ব'লে মনে হয়।

—ঠিকই অনুমান ক'রেছ! তবে ওর আসল যাচাইটা আরম্ভ হয় নোবেল প্রাইজ পাবার পর থেকে। নেশা কাটবার পর লোকে বুঝলে যে ওর প্রতিভার সঙ্গে কতটা পরিমাণে vulgarity-র খাদ মিশানো আছে।

ব'ললুম, ওর গোড়াকার লেখাগুলোর সঙ্গে Eha-র লেখার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়, তবে Eha-র লেখার মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, তা' Kipling-এর লেখায় পাওয়া যায় না।

—আর যা' পাওয়া যায়, তা' হ'চ্ছে malice, Mr. C ব'ললেন। এই খাদটা ওর প্রতিভার সঙ্গে না মিশলেও হয়ত বা Aberigh Mackay-র মত সকলেরই মনোরঞ্জন ক'রতে পারত।

ব'ললুম, হ্যাঁ, এবারি মেকাই-ও বাঙালীদের নিয়ে পরিহাস ক'রেছেন, কিন্তু তা' উপভোগ ক'রতে বাঙালীদেরও কোথাও বাধে না।

—তার কারণ তার লেখায় তিক্ত অভিজ্ঞতার

humour ছিল এবং malice জিনিষটা তার স্বভাবে একেবারেই ছিল না।……জান, Aberigh Mackay ছিল এক সময়ে আমাদের অ্যাংলো-ভারতীয়দের সাহিত্যিক hero? ওর কথা যখন উঠ্‌ল, ওর বিষয়ে একটা গল্প বলি শোন।

রাত্রি বেশ হ'য়েছিল, কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের পাশে ব'সে সেকালের গল্প শোনবার লোভও বড় কম ছিল না।

Mr. C ব'লে যেতে লাগলেন—তখনকার দিনে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁরা লিখতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই একটা ছদ্মনাম ব্যবহার ক'রতেন, সেইটেই ছিল ফ্যাশান। Eha-র আসল নাম ছিল E. H. Atkins—কাজ ক'রতেন বোম্বাই-এর কাষ্টম্‌স্ বিভাগে। নামের তিনটে আদ্যক্ষর নিয়ে তাঁর ছদ্মনাম হ'য়েছিল Eha। বড়লাট লিটন্ Owen Meredith নাম নিয়ে কবি খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছিলেন, তা তো জানই। আর Alfred Lyall-এর কথাতো আগেই বলেছি। Aberigh Mackay-এর ছদ্মনাম ছিল Sir Ali Baba.…গল্পটা লর্ড লিটনের সময়কার। তখন লণ্ডনে Vanity Fair নামে সাপ্তাহিক কাগজটার খুব প্রতিপত্তি ছিল। একদিন দেখা গেল Sir Ali Baba নামধেয় কে-একজনের লেখা ভারতীয় চিত্রকথা তাতে বেরিয়েছে। কী তার লিখন ভঙ্গী! সপ্তাহের পর সপ্তাহ এ-রকম বেরোতে লাগল। বিলাতের অধিকাংশ কাগজে সেগুলো উদ্ধৃত হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্'ল। সমালোচকরা একবাক্যে মত দিলেন, Dickens-এর পর এ রকম খাঁটি humour কারুর লেখনী থেকে আজ অবধি বেরোয়নি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোট কথা, একটা ভীষণ সাড়া প'ড়ে গেল এবং সে সাড়ার ঢেউ অ্যাংলো-ভারতের উপকূলে এসে পৌঁছতেও দেরী লাগেনি। অথচ কে যে এই Sir Ali Baba আর কিছুই নিষ্পত্তি হ'ল না। এটা বোঝা গেল, লেখক যিনিই হোন, তিনি ভারতীয় তথা অ্যাংলো-ভারতীয় সমাজের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। অনেকে অনেক রকম অনুমান ক'রলেন। আমাদের ক্ষুদ্র জগৎটীতে গোপনীয় ব'লে কিছু ছিলনা। সকলেই সকলকার গুহতম কথা অবধি জানতুম, আর সেইটেই ছিল আমাদের গর্ব্ব। কাজেই দেড় বৎসর ধ'রে Sir Ali Baba-র রহস্য ভেদ না ক'রতে পেরে আমরা যে নিষ্ফল আক্রোশে মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌ব, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু ছিল না।……তারপর হঠাৎ একদিন জানা গেল Sir Ali Baba আর কেউই নন—রাজওয়াড়ার কুমারদের জন্য আজমীরে যে Mayo College আছে তারই প্রিন্সিপ্যাল Aberigh Mackay। কি ক'রে যে রহস্য ফাঁস হ'ল, সেই গল্পই ব'লছি।

Aberigh Mackay ছিলেন অসম্ভব রকমের লাজুক প্রকৃতির লোক। কারুর সঙ্গেই মিশতেন না, নিজেকে একেবারে নিজের ভিতরেই লুকিয়ে রাখতেন। কাজেই কেউই কখনো সন্দেহ করেনি যে, ওঁর ভিতর অতটা রসসৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে পারে। …আমি তখন ছুটিতে সিমলায়। লাট বাড়ীতে একদিন বিরাট ভোজের আয়োজন, নিমন্ত্রিত হ'য়ে সেখানে গেছি। ডিনার টেবিলে দেখলুম, লাট সাহেবের ডানদিকে সম্মানের আসনে ব'সে আছেন এক ভদ্রলোক অতি সঙ্কুচিত ভাবে। তাঁকে এর আগে কখনো দেখেছি ব'লে মনে প'ড়ল না। কানাঘুষায় শুনলুম, তিনি মেয়ো কলেজের প্রিন্সিপাল, নাম Aberigh Mackay। আশ্চর্য্য হবার কথা, কেন না সিমলার সার্ভিস সম্প্রদায় বরাবরই একটু অতিরিক্ত পরিমাণে snobbish। তবে সেটা অবশ্য সরকারী ব্যাপার ছিল না, লাটপত্নীও অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন, এটিকেট্ ছিল শিথিল এবং লর্ড লিটনের খাম-খেয়ালি ছিল সর্ব্বজনবিদিত। তাই এক কলেজের প্রিন্সি-প্যালের এই সম্মানে যতটা বিরক্তি সৃষ্টি হবার কথা, ততটা হয়নি। Sir Ali Baba-র লেখা সমাজে কতটা চাঞ্চল্য সৃজন ক'রেছিল তা' এই থেকেই বোঝা যাবে যে, ডিনার টেবিলে সেই অজ্ঞাত লোকটাই ছিলেন প্রধান আলোচনার বিষয়। দু' একজন privileged মহিলা এরূপ ইঙ্গিতও ক'রলেন যে, Sir Ali Baba হয়ত কবি Owen Meredith-এরই গুপ্ত-রূপক নাম। লর্ড লিটন ইঙ্গিতটা সরব হাস্যে বেমালুম এড়িয়ে গেলেন।……কথার ফাঁকে লক্ষ্য ক'রলুম, Aberigh Mackay সুপের পাত্রটার দিকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে হাত বাড়িয়ে আবার হঠাৎ সেটা

গুটিয়ে নিলেন। এতটাই লজ্জা সঙ্কোচ ছিল তাঁর। পাত্রটা ছিল লাট সাহেবের প্লেটের কাছে। লর্ড লিটনের বামে ছিলেন Madame Henri—এক ভারতপর্য্যটনকারী ফরাসী মিনিস্টারের স্ত্রী। তাঁর সঙ্গেই তখন তিনি কথায় ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই তিনি তাঁর লাজুক অতিথির লবণ-আহরণের চেষ্টা লক্ষ্য করেন নি; কিন্তু সেটা মাদাম্ আঁরি-র চক্ষু এড়ায়নি। তিনি লবণদানিটা সরিয়ে দিতে লর্ড লিটনকে অনুরোধ করলেন। লর্ড লিটন যেন সদ্য ঘুম ভেঙে চকিত স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—Who shall I pass it to? তারপর Aberigh Mackayএর দিকে সস্মিত মুখে ফিরে—To Sir Ali Baba? সকলেরই চকিত দৃষ্টি তখন Aberigh Mackayএর উপর প'ড়েছে। লর্ড লিটনের ইচ্ছাও ছিল তাই, সেই জন্যেই কথাগুলো বলতে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বর ব্যবহার ক'রেছিলেন। বেচারা আলিবাবা তৎক্ষণ লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেছে—তোৎলামি ক'রেও If you please Sir ব'লতে একেবারে ঘেমে মৃতপ্রায় হ'য়ে উঠ্‌ল।............... ......ব্যাপারটা ছিল আগা-গোড়াই লর্ড লিটনের stage management। ও বিষয়ে তিনি একেবারে ওস্তাদ ছিলেন।.........শ্যাম্পেনের স্রোতে সে দিনকার ডিনার শেষ হ'ল। সকলের স্বাস্থ্য পানের জবাবে এক এক চুমুক পান ক'রেও আলিবাবার অবস্থা সজীব হ'য়ে উঠল। তারপর তাকে রিক্‌শতে চড়িয়ে For he's a jolly good fellowর তাণ্ডব সুরে লাট ভবনের কম্পাউণ্ড প্রদক্ষিণ হ'ল। এ সব বিষয়ে লর্ড লিটন খুব বেপরোয়া ছিলেন, তাই রক্ষা। আর এ ব্যাপারের সাক্ষী দেশী লোক কেউ ছিল না, চাকররা ছাড়া। নেশার ঘোরেও আমাদের প্রেষ্টিজ জ্ঞানের কম্‌তি হয় নি।........

কোথায় ছিল তখন Kipling? এবারি মেকাই-এর শেষ হয়ে গেল Twenty One Days in India লিখেই। স্বাস্থ্য তার আগা গোড়াই খারাপ ছিল। অত কম বয়সে না মারা গেলে, আজ কোথায় থাকত Kipling আর কোথায় থাকত তার মক্স করা কালিলেপিত ভারতীয় জীবনের চিত্র!.. ......

* * *

শীতের প্রারম্ভেই Mr. C.-র শরীর ভেঙে পড়বার লক্ষণ দেখা গেল। একটু ভাল থাকার খবর পেয়ে দেখা ক'রতে গেলুম। গিয়ে শুনলুম সেই দিনই অবস্থা হঠাৎ অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে পড়েছে। এখন তাঁর জ্ঞান নেই এবং জীবনের আশাও নেই।

মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বেহুঁস অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে বেরুলো বহুদিন-বিস্মৃত ফার্সী কবিতার একটা টুক্‌রো—শাম্-আ রওশন্ কর্‌ও—প্রদীপ জ্বালো।

সোম বর্ম্মা



বিতর্ক

১। ছন্দের গঠন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এম-এ

শ্রাবণমাসের 'বিচিত্রা'য় একটি ছন্দোবদ্ধ রচনা উদ্ধৃত ক'রে তাতে ছন্দোগত কোনো দোষ আছে কিনা, এবং যদি থাকে তবে তাকে দোষ বলা যাবে কেন, এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। ভাদ্র মাসের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয় আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর বিচারে আমার রচিত দৃষ্টান্তটি "কোনো নির্দ্দিষ্ট ছন্দে লেখা নয়" এবং রচনাটি "কোনো বিশেষ ছন্দের অশুদ্ধ সংস্করণ" মাত্র। কিন্তু তিনি যে যুক্তিতে উক্ত রচনাটির ছন্দকে "অশুদ্ধ" বলে রায় দিয়েছেন, সে যুক্তিগুলি আমার কাছে বিচারসহ মনে হ'লো না। আমি এস্থলে তাঁর যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করতে প্রবৃত্ত হব না। আমার রচনাটির সমর্থক কয়েকটি সুধীজনগ্রাহ্য নজির দেখিয়েই আমি নিবৃত্ত হব।

১। তা দেখিআঁ না ভুলিলী "আইহনের রাণী।

—চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

২। বঙ্গদেশে "প্রমাদ হইল" সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা "আইলা" গঙ্গাতীর॥

—কৃত্তিবাস, আত্মপরিচয়

৩। না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরো কি পরাণ কাঁদে
"তুইও" কি দুঃখিনী।

—মধুসূদন, ব্রজাঙ্গনা, ময়ূরী

৪। "ভেবেছিলাম" তুমি, ধনি! নাশিবে ব্রজ-রজনী
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া।

—ঐ, ঐ, উষা

৫। আমসত্ত্ব দুধে ফেলি' তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ, চারিদিক্ "নিস্তব্ধ"
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

—রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি (১৩৪০), পৃঃ ৫১

৬। ধীরে ধীরে "প্রভাত" হ'লো, আঁধার মিলায়ে গেল,
উষা হাসে কনক বরণী।

* * * *

রাঙা রাঙা "অধর" দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে কতো,
করতলে সকরুণ মুখ।

—ঐ, ছবি ও গান, বিরহ

৭। সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর "বর্ষার" মতো।

—ঐ, সোনার তরী, বর্ষাযাপন

৮। 'যুগান্তরের' ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল।

—ঐ, পূরবী, অতীতকাল

৯। মণি কেঁদে বলে, তবে
শুধু কি রইবে বাকি "কান্নার" খেলা?

—ঐ, পরিশেষ, খেলনার মুক্তি

১০। বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে
"পাল্কি"-যাটায়।

—ঐ, ঐ, খ্যাতি

১১। দিনেরে "মাভৈঃ" ব'লে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায়।
—ঐ, পূরবী, সমাপন

১২। মুক্তি সাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
"মাভৈঃ" বাজে নৈরাশ্য-নিশীথে।
—ঐ, পরিশেষ, দুয়ার

১৩। তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে "দাও" উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জ্জনা দূরে দূর হ'য়ে থাক্।

* * * *

রসের আবেশ-রাশি শুষ্ক করি "দাও" আসি'
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
—ঐ, নটরাজ (বনবাণী), বৈশাখ-আবাহন

এরকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বোধ করি আর প্রয়োজন নেই। উদ্ধৃত প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এগুলিতে বহু স্থলেই প্রচলিত ছন্দ-রীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। কিন্তু তা ব'লে ওসব স্থলে ছন্দ 'অশুদ্ধ' হয়েছে একথা বলা যায় কি? বরং ওসব ব্যতিক্রমের মধ্যে নবতর ছন্দরীতির প্রকাশসূচনা হয়েছে ব'লেই মনে করি। যাহোক্, আশুতোষ বাবু উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিকে 'অশুদ্ধ' ব'লে মনে করেন কিনা জানিনে। যদি তিনি এগুলিকে শুদ্ধ ব'লেই মনে করেন তাহ'লে আমার রচিত দৃষ্টান্তটিকেও ছন্দের দিক থেকে 'নির্ভুল' ব'লে স্বীকার করতেই হবে। আর, আমার রচিত দৃষ্টান্তটিতে ছন্দোগত ভুল রয়েছে বল্‌লে একথাও বল্‌তে হবে যে, ওরকম ছন্দোগত ভুল রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাসের রচনাতেও আছে।

২১ বানান-সমস্যা

শ্রীসরসীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম-এস্‌ সি, এম্‌-বি

সম্প্রতি বঙ্গভাষার বানান-পদ্ধতি ও তৎঘটিত সমস্যাগুলির প্রতি সাহিত্যামোদীগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিশেষতঃ 'বিচিত্রা'র পত্রান্তরালে তাহারা আত্মপ্রকাশ করিতেছে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। বলিতে কি বাঙ্গালা (?) ভাষার এই নিত্যনূতন বানান ও রচনা পদ্ধতি ইহাকে শুধু অবাঙ্গালী নহে, খাস বাঙ্গালীর নিকটও বিভীষিকা করিয়া রাখিয়াছে। অনেকটা এই কারণে শিক্ষিত সমাজ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আর পূর্ব্বের ন্যায় মনোযোগী হইতেছেন না। ইহাতে যদি সাহিত্যিকগণ মনে করেন যে তাঁহারা শিক্ষিত বাঙ্গালী নহেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করা হইতেছে, তবে বিনীত অনুরোধ যে তাঁহারা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি যেন দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন যে নিতান্ত ছাত্র ছাড়া উচ্চশিক্ষিত কয়জন সৎসাহিত্যের চর্চ্চা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মৃতকল্প অবস্থা ইহার অন্যতম প্রমাণ।

বঙ্গভাষার প্রসার বিশেষতঃ অবাঙ্গালীর নিকট ইহা আদরণীয় করিতে হইলে ইহার বানান-সমস্যা, অক্ষর সমস্যা, রচনা সমস্যা প্রভৃতির আশু প্রতিকার প্রয়োজন। অক্ষর সমস্যা আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া উল্লেখ করিব না, কিন্তু সে সমস্যাও কম নহে। "ঌ" প্রথম ভাগ হইতে দূর হইয়াছে বটে, তবে ৯, অন্তঃস্থ ব, এখনও সগর্ব্বে বর্ত্তমান। আরও অনেকে আছেন!

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় বানান-সমস্যার দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে বাক্যটীর উল্লেখ করিয়াছেন, দেখা যাইবে যে "সাধু" ভাষায় লিখিলে তাহাতে আর কোনও গোলমাল থাকে না। যে দিন হইতে বঙ্গীয় লেখকগণ ধ্বনি-নিষ্ঠার প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই দিন হইতেই এই সমস্যা বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে। প্রৌঢ় প্রতিষ্ঠাশালী লেখকগণ যেদিন আরাম কেদারায় শুইয়া "বীরবলী" ভাষার সৃষ্টি করিলেন, সে দিন তাঁহারা ভাবিলেন না যে তাঁহাদের ওস্তাদী হাতে তাঁহারা বেশ চালাইতে পারিবেন; কিন্তু রাশ আল্গা হইলে অনভিজ্ঞের পক্ষে ঘোড়া বশে রাখা শক্ত হইবে। ফলে হইল, কথিত ভাষার মানদণ্ড হইতে সাহিত্য দূরে সরিয়া

গেল, এবং এখনও পরিণাম কতদূর পর্য্যন্ত গড়াইবে বলা কঠিন। মৈমনসিংহবাসীরা তাঁহাদের জেলার ভাষায় একখানি পত্রিকা বাহির করিয়াছেন, এবং শীঘ্রই চট্টগ্রামের ভাইরা তাঁহাদের "বাঙ্গালা" ভাষায় পুস্তক বাহির করিবেন বোধ হয়। যদি করেন তবে তাঁহারা যেন পূর্ব্বে কলিকাতার বাবুদের জন্য একখানি অভিধান বাহির করেন, ইহাই প্রার্থনা। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও দেশবরেণ্য কবি ও প্রবন্ধ লেখকগণ চলতি ভাষার ফতোয়া দিলেন, প্রবীণেরা মাথায় হাত দিয়া "হায় হায়" করিতে লাগিলেন, তরুণেরা নূতনত্ব ও নির্ভীকতার জয়গান করিতে লাগিল—মাঝ হইতে মারা পরিলাম আমরা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনা কাহার হাতে পড়িবে, 'পণ্ডিতের' না 'নব্য যুবকের', উত্তর লিখিবার সময়ে এই প্রশ্নই মনে পড়িল আগে। অবশেষে লটারী খেলার মত "জয় মা কালী" বলিয়া কথিত বা সাধু ভাষার মধ্যে একটায় লিখিয়া দেওয়া গেল। স্কুলের শিক্ষকগণ অনেকেই শুনিয়াছেন যে ভাল ছাত্র আসিয়া বলিতেছে, "সংস্কৃত কলেজের অমুক পণ্ডিতের কাছে খাতা পড়িয়াছে, আমি কথিত ভাষায় রচনা লিখিয়াছি, আমার আর আশা নাই।" নামজাদা সম্পাদক যে ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, দেশের অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য যে ভাষায় রচিত হইয়াছে, সেই ভাষায় শিক্ষার্থী যদি লেখে তবে তাহা কি অপরাধ? আবার, যে ভাষায় রচনা-কৌশল, বাক্য-বিন্যাস (syntax), বানান, সকলই জটিল হইয়া উঠে, এক এক জনের হাতে এক এক রূপ ধারণ করে, তাহার অবাধ বিস্তারই কি সাহিত্যের স্বাস্থ্যের ও দীর্ঘ জীবনের অনুকূল?

বিষয়টী অতি গুরুতর সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ণধার বঙ্গভাষায় কৃতবিদ্য ও বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী। বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ ও মুস্‌লিম সাহিত্য-পরিষদ্ সকলে একত্র হইয়া বাঙ্গালা রচনার একটী নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ঠিক করিয়া দিন। অনুরূপ ব্যাকরণ প্রকাশ করুন। আর, কি ছাত্র, কি লেখক, কি সম্পাদক, সকলকে হিট্‌লারী নীতিতে সেই অনুশাসন মানিয়া চলিতে বাধ্য করুন। ইংরাজীতে যেমন অক্সফোর্ড প্রভৃতি প্রামাণ্য আছে, তাহার বানান ও ব্যাখ্যাই সাধারণের মান্য (Standard), তাঁহারা তেমন বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করুন। বলা বাহুল্য, সাহিত্য-সম্রাট্ হইতে সামান্য পদাতিক পর্য্যন্ত তাহা মানিয়া চলিতে থাকিবেন, বিদ্রোহ করিলে উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। নিয়মানুবর্ত্তিতা (Discipline) জড়ত্বের পরিচায়ক নহে, বরং উহাই প্রাণ। যে প্রাণশক্তির নামে অনেক সময় স্বেচ্ছা-চারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেই প্রাণশক্তি ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিয়মে চলিয়া থাকে, ব্যতিক্রম হইলেই রোগের উৎপত্তি হয়।

সরকারীভাবে কলিকাতা ও ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়, ও বেসরকারীভাবে সাহিত্য-পরিষদ্ ইঁহারাই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এমন প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগত সমালোচনা বা আন্দোলন কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় মেদিনীপুরী "করিবেক, যাইবেক" লিখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার প্রতি-ক্রিয়ায় যেমন চট্টগ্রামী প্রাদেশিকতা কেহ অনুমোদন করিবেন না সেইরূপ "বৃক্‌খে পোখ্‌খী ডানা নাড়লেও" আমরা সুখী হইব না।

২ক। বানান-সমস্যা

শিবপ্রসাদ মুস্তফী এম-এ

ভাদ্রমাসের 'বিচিত্রা'য় সম্পাদক মহাশয় শরৎবাবু, রাজশেখরবাবু প্রভৃতি সুবিখ্যাত সাহিত্যিকদের নিয়ে গঠিত একটি বানাননির্দ্ধারক সমিতির সংবাদ প্রকাশ ক'রে আমাদের মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করেছেন। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে বানানসমস্যা যে কিরূপ দুরূহ হ'য়ে উঠেছে এ যাঁরা লক্ষ্য ক'রেছেন, তাঁদের ক্রমবর্দ্ধমান দুঃখ এবং হতাশার এইবার হয়ত একটা কিনারা হ'তে পারবে।

বলা বাহুল্য বানান এবং অন্যান্য যা-কিছু সমস্যা সে সমস্তই তথাকথিত চলিত্ বা প্রাকৃত বাংলা নিয়ে।

প্রাকৃত বাংলা নিয়েই যখন বর্ত্তমানে সাহিত্য রচিত হচ্ছে তখন এদিকে সকলেরই নজর পড়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও অনেকে পূর্ব্বের সাধুভাষাকে ছেড়ে এদিকে মনোযোগ দিতে রাজী নন্। কতকগুলি বিশিষ্ট সাহিত্যিকের এই এক অদ্ভুত মনোবৃত্তি বাংলাসাহিত্যের যে কত ক্ষতি করছে তা'রও ইয়ত্তা নেই। অথচ এই উভয় ভাষার মধ্যে প্রধান এবং প্রায় একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে ক্রিয়াপদে।

পৃথিবীর আর কোথাও এরকম অদ্ভুত ভাষাগত বৈষম্য আছে ব'লে আমার জানা নেই। আমাদের সাহিত্যরথীদের চেষ্টাও নেই এই হাস্যকর বৈষম্য দূর ক'রে সাহিত্যসৃষ্টির সকল বিভাগে একই ভঙ্গীর ভাষা ব্যবহার করার। বাংলাদেশের নামজাদা মাসিকপত্রগুলির সম্পাদকীয় মন্তব্য রচনায় দেখ্‌তে পাই একমাত্র "বিচিত্রা"র সম্পাদক এবিষয়ে মনোযোগী। এই দিক্ দিয়ে "প্রবাসী"র মত রক্ষণশীল পত্রিকা আর দ্বিতীয় নেই।

"প্রবাসী" পত্রিকাতেই কয়েকমাস আগে রাজশেখরবাবু প্রাকৃত বাংলার সপক্ষে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছিলেন; কিন্তু সেই প্রবন্ধ "প্রবাসী"তেই স্থান পেয়েছিল, নামজাদা সাহিত্যিকদের অন্তরে পায়নি। সাধুভাষায় আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যপদবাচ্য যত কিছু সৃষ্টি হয়েছে সেগুলিকে অসম্মান করার কথা মোটেই হচ্ছে না কেননা সেরূপ কিছু করা অসম্ভব। কিন্তু এখন থেকে প্রাকৃত ভাষায় অর্থাৎ কথ্যক্রিয়াযুক্ত সাধুভাষায় সাহিত্য বা বাংলারচনা সুরু ক'রতে দোষ কি? একটা standardization ক'রলে ক্ষতি আছে কিছু? তা'তে কি সাহিত্যিকদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা মৌলিকতার হ্রাস হয়?

বানান-সমস্যা নিয়ে যখন কথা উঠেছে এবং সমিতি গঠিত হয়েছে তখন এটুকু মনে করা যেতে পারে যে এই প্রাকৃত বাংলাকেই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বাহন ব'লে ধরা হয়েছে। আশা করি শরৎবাবু স্বয়ং এবিষয়ে অবহিত হবেন। রাজশেখরবাবুও আশা করি ভবিষ্যতে পরশুরামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সময় নিজের উপদেশের মর্য্যাদা রাখ্‌বেন্। সম্প্রতি "প্রবাসী"তে দেখ্‌ছিলুম "পথের পাঁচালী"র বিখ্যাত বিভূতিবাবু তাঁর "দৃষ্টি-প্রদীপ" উপন্যাস একটি কৌশল অবলম্বন ক'রেছেন। উপন্যাসের নায়ক নিজের আত্মকথা ব'লে যাচ্ছে এইভাবে গল্পটিকে দাঁড় করানোর জন্যে বিভূতিবাবু সহজেই প্রাকৃত ক্রিয়ার ব্যবহার ক'রতে পেরেছেন্। এতে "প্রবাসী"র মর্য্যাদা এবং প্রতিভাশালী লেখকের অন্তরের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা (অন্ততঃ আমরা তাই মনে করছি) দুইই রক্ষিত হয়েছে।

যে সমিতি গঠিত হইয়াছে তা'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই কেন? যিনি এই প্রাকৃত ভঙ্গীকে প্রথম সাহিত্যে স্থান দিলেন, তা'কে চরম সৌন্দর্য্য দান ক'রলেন এবং অবশেষে যা'কে নিয়ে নানাভাবে লীলা করছেন, তাঁকে বাদ দেওয়ার কোন কারণ আমি কল্পনা ক'রতে পারি নে। তাছাড়া আরো দুটি কারণে তাঁকে প্রয়োজন আছে। একটি হচ্ছে তাঁর বর্ত্তমান প্রভাব। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের জন্‌সনের মত তিনি আজ একজন Dictator। তাঁর নির্দ্ধারণ সকলের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজসাধ্য। সমিতিই গঠিত হোক্ আর যাই হোক্ তা'কে কার্য্যকরী ক'রতে হ'লে এদিক্‌টা দেখা উচিত। বাংলা দেশের আজকালকার সাহিত্যিকরা, যাঁরা নিজের নিজের ঝোঁকে যা' তা' লিখে যাচ্ছেন্, তাঁদের বাগ্ মানাতে হ'লে রবীন্দ্রনাথের মত personality-র প্রয়োজন আছে। আর এক কথা, রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে অনেকদিন থেকে অনেক চেষ্টা ক'রে এসেছেন এবং তাঁর স্বরচিত গদ্য অথবা কাব্যপুস্তকে যে বানানের একটি নিয়ম অনুসরণ করা হয় তা' সকলেই জানেন। নানাদিক্ দিয়ে রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত এই নিয়মের বহু সুবিধা আছে, অন্ততঃ এই নিয়ম সৃষ্টির পিছনে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের যে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তা'র মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

আমার ব্যক্তিগত মত এই যে শ্রদ্ধেয় যোগেশ রায় বিদ্যানিধি এই দিক্ দিয়ে যা করেছেন তাই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সকলেই জানেন যোগেশবাবু যদিও সাধুভাষায় ক্রিয়া ব্যবহার করেন তবু তিনি বানানকে নানাদিক্ দিয়ে যুক্তিসঙ্গত এবং সরল করেছেন্। যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করা যে কোন্ বানান নির্দ্ধারক সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য হবে।

এই যুক্তাক্ষর জগদ্দলশিলার মত বাংলাভাষার বুকে চেপে রয়েছে এবং কতভাবে যে তা'র উন্নতি এবং প্রসারণকে বাধা দিচ্ছে তা'র ইয়ত্তা নেই। এই যুক্তাক্ষরের জন্তেই বাংলাভাষার মত সহজ ভাষাকে বিদেশীরা আয়ত্ত ক'রতে ভরসা পায় না। সাধুভাষা সম্বন্ধে যোগেশবাবুর দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে উক্ত সমিতিতে নেওয়া কর্ত্তব্য হবে।

অনেকে হয়ত জানেন্ না যে বানান সম্বন্ধে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের একটি পুস্তিকা আছে। এটির প্রতি উক্ত সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অবশেষে আমার একটি আশঙ্কার উল্লেখ ক'রতে চাই। প্রাকৃত ভাষায় কিছু লেখা মানে যে ক্রিয়াপদকে আগে, শেষে মাঝখানে যেখানে খুসী ব্যবহার করা নয়, এই কথাটি বার বার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে এইভাবে এতবেশী লিখছেন যে এই কথা ভুলে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। এর ফলে বাংলাভাষার নিজস্ব প্রকৃতিটিকেই দুমড়ে মুচড়ে কিম্ভূতকিমাকার ক'রে ফেলা হ'বে। রবীন্দ্রনাথ যা করেন তা'র নানা কারণ আছে এবং রবীন্দ্রনাথকেই তা' মানায়। দ্বিতীয় "শেষের কবিতা" লেখবার চেষ্টা করলে হাস্যাস্পদ হওয়া ছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয়। প্রবীণ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র প্রাকৃত ভাষার সাহায্য না নিয়েও আজকাল এই ধরণে লিখে আমাদের বিস্মিত এবং ব্যথিত করে তুলছেন্।

২খ। বানান সমস্যা

ব্রহ্মচারী সরলানন্দ

গত ভাদ্রের 'বিচিত্রা'র 'বিতর্কিকায়' শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা ভাষার বর্ত্তমান বানান সমস্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। আজ বাংলা সাহিত্য তথা ভাষার উন্নতির শুভলগ্ন। এই মুহূর্ত্তে তার ভিতরের সকল ক্রটী, দৈন্য এবং বাহিরের ভুলচুক্ ও সমস্যাদির যত আলোচনা ও দূরীকরণ সম্ভব হয়, ততই তার ভবিষ্যৎ হইবে সুমহিমান্বিত। অন্য প্রদেশীয়দের চিত্তকে আমাদের ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইলে ভাষার যেমন সৌষ্ঠব ও মনোহর বৃদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে, তেমনি ইহার বানানের জটিলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকেও একটা সহজ সরল নিয়মে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে, এই আলোচনা ইতিপূর্ব্বে কোনও কোনও সাহিত্য পত্রিকায় কয়েকবার যে না হইয়াছে, তা' নয়। 'বিতর্কিকা'য় উত্থাপিত শ্রীযুক্ত উপেনবাবুর এই প্রসঙ্গ যে এই দিক্ দিয়া বিলক্ষণ সময়োপযোগী হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

উপেনবাবু তাঁহার বানান সমস্যার প্রসঙ্গে 'করে' এই ক্রিয়াপদেরই পাঁচ প্রকার আধুনিক ও অত্যাধুনিক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করিয়াছেন। সম্প্রতি কার্ত্তিকের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'রাজা শ্রীরামচন্দ্র জয় দেও' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা উপেনবাবুর ৫ম উদাহরণে প্রদর্শিত 'কর্যে'র প্রত্যক্ষ লাভ করিলাম। উপেনবাবু লিখিয়াছেন,—"পঞ্চম উদাহরণের 'কর্যে' রূপটী অধুনা প্রায় অবলুপ্ত, কিন্তু বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।" আমরাও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু, প্রবাসীর এই প্রবন্ধে প্রায় অবলুপ্ত 'কর্যে'র পুনরাবির্ভাব দর্শনে বুঝিলাম, এখনও যোগেশবাবু এই উদ্ভট বানান প্রচলনের যথেষ্ট বাসনা রাখেন।

বাংলার প্রচলিত সাপ্তাহিক ও মাসিক সাহিত্য পত্রিকা গুলিতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং সাহিত্যসম্রাট্ শরৎচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া খ্যাত, অখ্যাত, উদীয়মান এবং প্রায়-উদিত অনেক শক্তিশালী ও পণ্ডিত লেখকই তাঁহাদের লেখনী পরিচালনা করেন। প্রবাসী প্রবন্ধ-লেখক রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ব্যতীত অপর কাহারও রচনায় 'কর্যে'র এই উদ্ভট্ ব্যবহারের অদমনীয় লোভ শীঘ্র অন্যত্র কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে শুধু 'কর্যে'ই নয়, আরও কয়েকটী ক্রিয়াপদও বর্ত্তমানে অনাদৃত অতিরিক্ত 'য' ফলা কর্ত্তৃক অনর্থক আক্রান্ত হইয়া কর্যের দুর্গতি পাইয়াছে। নিম্নে আমরা তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত করিলাম।—

(অ) তিনি লেখেন, তিনি বাড়ী বস্যে বি-এ পরীক্ষার জন্য প'ড়বার সংকল্প করো্যেছেন, বিজ্ঞানশাখা প'ড়বেন। (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪১, পৃঃ ১৯, ২য় কলম, ১৭শ পংক্তি)।

(আ) রাজা তাঁকে পত্র লেখেন, এবং মোহিনীবাবু কলেজের কর্ম ছেড়ে দিয়ে রাজার কাছে চল্যে যান।

(ঐ, পৃঃ ১৯, ২য় কলম, ২৮শ পংক্তি।

(ই) শাদা ছ-আনা গজের জিনের কোট, তারও স্থানে স্থানে সুতা বেরিয়ে পড়্যেছে। (ঐ পৃঃ ২১, ২য় কলম, ৮ম পংক্তি)।

(ঈ) অনেকবার বল্যেছি, হাঁর মেনেছি। (ঐ পৃঃ ২২, ১ম কলম ১৪শ পংক্তি)।

করে, বসে, চলে এবং পড়ে'র সঙ্গে য-ফলা যুক্ত করা ব্যতীতও যোগেশবাবুর রচনায় আরও কতিপয় শব্দের উদ্ভট্ বা অভিনব বানান দেখিলাম। পাঠক ঈ চিহ্নিত উদাহরণের বল্যেছি'র পরবর্ত্তী শব্দ 'হাঁর' কে কি পড়িবেন? উক্ত প্রবন্ধ হইতে এই শ্রেণীর আরও কয়েকটী শব্দের দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত করার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

(ক) একস্থানে চাঁর হাঁড়ী কাল গুঁড়া মাটি ছিল। (কার্ত্তিকের প্রবাসী, পৃঃ ২২, ২য় কলম, সর্ব্বশেষ পংক্তি)।

(খ) কিছু মাটি নিয়ে দেখালাম, সোনার আঁষ চিক্ চিক্ ক'রছে। (ঐ, পৃঃ ২৩, ১৮শ পংক্তি)।

আমরা যোগেশবাবু লিখিত এইরূপ বানানের উচ্চারণ কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, তাঁহার লেখনীতে 'া' আকারের মূর্ত্তি 'ঁ' এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার এইরূপ বানান লিখিবার স্পৃহার পশ্চাতে কোন্ প্রেরণা থাকিতে পারে, আমরা তাহা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। কৃপাপূর্ব্বক যদি শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু 'বিচিত্রা'র 'বিতর্কিকা'য় তাঁহার এই অভিনব বানান-প্রচলনের সার্থকতা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন, তবে, তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ রহিব।

এতদতিরিক্ত যোগেশবাবুর প্রবন্ধে আমরা বাংলা বানানের আরও কয়েকটী অভিনবরূপ দেখিলাম। 'য' এর সঙ্গে আমরা প্রয়োজন স্থলে সচরাচর '্য' য-ফলা ব্যবহার করি। কিন্তু, যোগেশবাবু তাঁহার উক্ত প্রবন্ধের কোথাও তাহা করেন নাই; আবার কোথাও বা করিয়াছেন।

"একবার রাজা দুঃখ করো্য আমায় লিখেছিলেন, (লিখেছিল্যেন হইল না কেন?) তাঁর অধিকাংশ সময় রাজকার্য্যে যাচ্ছে, পড়ার সময় হচ্ছে না।"

(প্রবাসী, কার্ত্তিক, পৃঃ ২০, ১ম কলম, ৮ম পংক্তি)।

আবার, ইহার পরই অন্যত্র 'য'তে '্য' য-ফলা ব্যবহার করিতেছেন,—"কিন্তু সে কোট পর্য্যাপ্ত নয়,..."

(ঐ পৃঃ ২১, প্রথম কলম, ৩৪শ পংক্তি)।

অন্যত্র তিনি লিখিতেছেন,—"ময়ূরভঞ্জ আক চাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না, কেমনে চীনি হবে?

চিনির এই অভিনব বানানও যোগেশ বাবুর প্রবন্ধেই নূতন দেখিলাম। যোগেশ বাবু 'া' আকারের যে অভিনব (ঁ) আকারে আবিষ্কৃত করিয়াছেন, ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, কেন তার প্রয়োগ মাত্র নির্দ্দিষ্ট দুই তিনটী শব্দেই সীমাবদ্ধ রহিল? (যথা, ক দৃষ্টান্তের চাঁর, ও খ দৃষ্টান্তের আঁষ)। ক দৃষ্টান্তের বাক্যটীতেও তিনি 'চাঁর' শব্দ ব্যতীত আকারান্ত 'এক স্থানে......হাঁড়ী কাল গুঁড়া মাটি' প্রভৃতি শব্দ গুলিতে তাঁহার অভিনব 'ঁ' আকার প্রয়োগ করিতে পারিতেন। তাহা না করার তাৎপর্য্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমরা শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে কোনও তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি না। সেই পাণ্ডিত্য বা অহঙ্কার আমাদের নাই। তাঁহার এই অদ্ভুত বানান-গুলির প্রয়োগ প্রচলনের ভিতর কি গূঢ় অর্থ রহিতে পারে, শুধু তাহাই তাঁহার নিকট শুনিতে আমরা লিপ্সু রহিলাম। আমাদের বিনীত অনুরোধ, বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার উল্লিখিত বানান প্রচলনের সর্ব্ববিধ উপকারিতা ও সার্থকতা সম্পর্কে আমাদিগকে সম্যক্ জ্ঞানের আলো প্রদান করুন। শ্রীযুক্ত উপেন বাবুর প্রায় অবলুপ্ত 'করে্য'ও আবার কেন মাথা তুলিতে চাহিতেছে, যোগেশবাবু তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলে, ভরসা হয়, ভবিষ্যতে উপেন বাবুও আর কদাপি ইহাকে "অধুনা প্রায় অবলুপ্ত" বলিয়া উপেক্ষার কোণঠেসা করিতে সাহস পাইবেন না।

৩। বাঙ্গালা ভাষার প্রশ্নপত্র

শ্রীসনৎকুমার সিংহ বি-এ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মাতৃভাষাকে সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন। সুধীবৃন্দ বঙ্গভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। প্রাদেশিক গণ্ডী ছাড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষা আজ বঙ্গদেশবাসীর শ্রদ্ধা পাইতেছে। সুদূর ইংলণ্ডের জ্ঞানপিপাসুগণও তাঁহাদের বিজিত দেশের সাহিত্যরস সম্ভোগের জন্য সাদরে বঙ্গভাষার চর্চ্চা করিতেছেন। বঙ্গভাষা এখন যথেষ্টই সমৃদ্ধশালিনী। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রবেশিকা, আই-এ, বি-এ, এবং এম-এ, পরীক্ষারও বাঙ্গালা ভাষার প্রশ্নপত্র ইংরাজি ভাষায় মুদ্রিত হয়। ইহার কোনই সঙ্গত কারণ পাই না। যাহারা বাঙ্গালা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা দিতে যাইতেছে তাহাদের ইংরাজি ভাষায় মুদ্রিত প্রশ্নপত্র দেওয়ার কী উদ্দেশ্য? বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্ন কি ইংরাজিভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে হয় না? ইহা কত বড় লজ্জার কথা যে বাঙ্গালা প্রশ্নপত্রে আগাগোড়াই ইংরাজী হরফ, কেবলমাত্র যে অংশ ব্যাখ্যা করিতে হইবে যাহা ইংরাজিতে দেওয়া অসম্ভব, সেই অংশটুকুই বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত। মনে হয় বাঙ্গালা ভাষা বলিয়াই এই অন্যায় অসঙ্গত ব্যাপার চলিতেছে। ইংরাজিভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্ন ফরাসী কি জার্ম্মাণ ভাষায় করিলে বিলাতী ইউনিভার্সিটির ছেলেরা নিশ্চয়ই তাহা সহ্য করিবে না। অনেক আছেন যাঁহারা ইংরাজিতে দেওয়া প্রশ্নের চাইতে মাতৃভাষায় দেওয়া প্রশ্নকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুচিন্তিত উত্তর প্রদান করিতে পারেন। বাঙ্গালা ভাষায় এম-এ পরীক্ষার প্রশ্নগুলিও তত সরল হয় না। তাহার উপর সেগুলি ইংরাজীতে মুদ্রিত থাকায় তাহাদের মাতৃভাষায় অর্থ করিয়া প্রাঞ্জল ও সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেই অনেকটা সময় নষ্ট হয়। এইরূপে স্বল্প ইংরাজি-শিক্ষিত ছাত্রদের প্রতি অবিচার করা হয়। ইংরাজি ভাষার অনাদর বা অবহেলা করিতেছি না, কিন্তু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্ন বঙ্গভাষাতে করাই শোভন ও সঙ্গত নহে কি? এ কথা মানিতেই হইবে যে যাঁহারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রশ্ন-কর্ত্তা তাঁহারা সকলেই সম্যকরূপে ভাষাটিকে আয়ত্ত করিয়া-ছেন। বঙ্গভাষায় তাঁহাদের জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াই তাঁহাদের প্রশ্নকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে তবে কেন তাঁহারা প্রশ্নগুলি করিবার সময় বিজাতীয় ভাষার সাহায্য লন? ইহা কি হাস্যকর ব্যাপার নহে, যে যে-ভাষায় উত্তর লিখিতে হইবে সেই ভাষায় সেই উত্তরের প্রশ্ন করা চলে না? একথা নিশ্চিত যে বঙ্গভাষার এতবড় দৈন্য ঘটে নাই যাহাতে প্রশ্নপত্র করিবার সময়ে শব্দের বা ভাবের অনটন পড়ে। বাঙ্গালা প্রশ্নপত্র ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষার উপর সম্পূর্ণ অনাস্থা দেখাইয়া বিদেশী ভাষার সাহায্যভিক্ষা করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। আশা করি বঙ্গভাষার অন্যতম পৃষ্টপোষক ৺আশুতোষের কৃতী পুত্র ও সিনেটের সদস্যবৃন্দ মাতৃভাষার এই কলঙ্কস্খালনে যত্নবান হইয়া আগামী বর্ষের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি যাহাতে নির্দ্দোষ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।

আলোচনা

জগতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষকে উপলক্ষ করিয়া ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ সুর পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার কোনটি এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তক সংখ্যা কত তাহা 'বিচিত্রা'য় আলোচনা দ্বারা স্থির করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

বহু ইংরাজের ধারণা ব্রিটিশ মিউজিয়ম জগতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার। ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রবন্ধ অথবা পুস্তক লিখিবার কালে ব্রিটিশ মিউজিয়মকে জগতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার বলিয়া উল্লেখ করেন। ঐ প্রকার প্রবন্ধ অথবা পুস্তক পাঠে এবং অন্যান্য গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির সংখ্যা সম্বলিত নির্ভরযোগ্য বিবরণের অভাবে প্রকৃত তথ্য আমাদের দেশের অনেকেরই অগোচর থাকিয়া যায়। আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নীতি অনুসারে কেবলমাত্র পুস্তক সংখ্যা দ্বারা কোন গ্রন্থাগারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না; তৎসহ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ ও পরিমাণ, গ্রন্থাগারের কার্য্যকারিতা, উহার পরিচালনা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ও বিবেচ্য। যাহা হউক কেবলমাত্র পুস্তক সংখ্যার দিক দিয়া পৃথিবীর কোন গ্রন্থাগার বৃহত্তম তাহা 'বিচিত্রা'র পাঠকপাঠিকাগণ যাহাতে নিজেরাই স্থির করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ইংরাজদের দেশ হইতেই প্রকাশিত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের 'লাইব্রেরী, মিউজিয়ম এবং আর্ট গ্যালারী' বার্ষিকী (The Libraries, Museums and Art Galleries Year Book. 1933) হইতে ব্রিটিশ মিউজিয়মের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর তিনটি বৃহৎ গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উক্ত পুস্তকে প্রদত্ত বিবরণ বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার-সমিতিসমূহের এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সহযোগে সংগৃহীত হয়। কাজেই উহা অন্যান্য স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রাপ্ত বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরী (British Museum Library):—পাশ্চাত্যদেশীয় পুস্তক সম্ভবতঃ ৩৩,০০,০০০ তেত্রিশ লক্ষের অনেক বেশী; প্রাচ্যদেশীয় পুস্তক ১,২০,০০০ একলক্ষ বিশ হাজার। পাশ্চাত্যদেশীয় পুঁথি ৫৪,০০০ চুয়ান্ন-হাজার; প্রাচ্যদেশীয় পুঁথি ১৬,০০০ ষোল হাজার। (২১ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত হিসাব অনুসারে ব্রিটিশ মিউজিয়মের মোট পুস্তক সংখ্যা চৌত্রিশ লক্ষ বিশ হাজারের উপর এবং মোট পুঁথির সংখ্যা ৭০,০০০ সত্তর হাজার। উক্ত পুস্তকে ব্রিটিশ মিউজিয়মকে পৃথিবীর দুইটি বৃহত্তম গ্রন্থাগারের একটি এবং প্যারিসের বিব্লিওথেক ন্যাশানেল্ (Bibliothèque Nationale)কে অপরটি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বিব্লিওথেক ন্যাশনেলের পুস্তকাদির নিম্নলিখিতরূপ হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

বিব্লিওথেক ন্যাশনেল (Bibliotheque Nationale)—পুস্তক ৪৫,০০,০০০ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। পুঁথি ১,২৫,০০০ একলক্ষ পঁচিশ হাজার এবং সাময়িক পত্র ৫,০০,০০০ পাঁচলক্ষ। (২০০ পৃষ্ঠা)

মজার কথা এই যে উক্ত পুস্তকে ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও বিব্লিওথেক ন্যাশনেলকে পৃথিবীর দুইটি বৃহত্তম গ্রন্থাগার বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও লেলিনগ্রাড পাবলিক লাইব্রেরী Leningrad Public Library)র পুস্তক সংখ্যা ৬০,০৮,২৭৭ ষাটলক্ষ আট হাজার দুইশত সাতাত্তর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (২০৫ পৃষ্ঠা)

আমেরিকার লাইব্রেরী অফ্ কংগ্রেস (Library of Congress) এর পুস্তকাদির নিম্নলিখিত সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে:—পুস্তক ৪৪,৭৭,৪৩১ চুয়াল্লিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার চারিশত একত্রিশ; মানচিত্র ও দৃশ্য (Maps and V,iews) ১২,৬৫,১১৬ বারলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার একশত ষোল, গীত (Music) ১০,৮৭,৬০৭ দশলক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শত সাত এবং ছাপা (Prints) ৫,২০,৮২৫ পাঁচলক্ষ বিশহাজার আটশত পঁচিশ। (১২০ পৃষ্ঠা)

আশা করি পুস্তকের সংখ্যার দিক দিয়া জগতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার কোনটি তাহা 'বিচিত্রা'র পাঠকপাঠিকাগণ এক্ষণে নিজেরাই স্থির করিতে পারিবেন।

সবিনয় নিবেদন

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

হাসছিল।

সর্ব্বস্ব খুইয়ে শুধু মানুষ তেমন ক'রে হাসতে পারে। আঘাত যার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না, তার কাছ থেকে যখন আঘাত এসে পড়ে তখন মানুষ কান্নার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে ছোট করতে পারে না,—তাই হয়তো হাসে। কাননও হাসছিল।

কাহিনী বললো, ছি কাননদা', তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে পারলে না।

কানন বললো, আমাকে বিশ্বাস করাই তোমার অপরাধ হয়েচে কাহিনী। তোমার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে গেলে যৌবন-ধর্ম্মকে আমার অস্বীকার করতে হয়। সে আমি পারিনি ব'লে নিজেকে অপরাধী মনে করতে পারি না;—এ আমার ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার অভিব্যক্তি মোটেই নয়, বরং সতেজ জীবন ও যৌবনের সহজ সুন্দর প্রকাশ আমার এইখানে। সবাই যা অস্বীকার করাকে জীবনের ব্রত ব'লে ধ'রে নেয় আমি তা ধরিনি ব'লে অপরাধ করেচি—এ আমি ভাবতেই পারি না।···কাহিনী, তুমিই কি জোর ক'রে বলতে পার আজ যে, এ তুমি চাওনি? তোমার শিক্ষায়, তোমার সংস্কারে যতই কেন না বাধুক, তবু এ তুমি চাইতে; সবাই চায়,—আর চাওয়ায় যদি কোন অপরাধ না থাকে তো পাওয়ায় কি অপরাধ থাকতে পারে তা আমাকে বোঝাতে পার কাহিনী?

কাহিনী অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, ছিঃ! তারপরে চ'লে যাওয়ার মুখে ব'লে গেল, তোমাকে তর্ক ক'রে বোঝাবার দুঃসাহস আমার নেই, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা ব'লে যেতে চাই,—জীবনে আর কখনও এমন ক'রে কোন নারীর বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করো না।

কানন বাধা দিতে গিয়ে কাহিনীর আরক্তিম মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। কাহিনীর পায়ের শব্দ কাননের বুকের ওপর মিলিয়ে গেল।

হাসি দিয়ে কানন আপনাকে আর বোঝাতে পারলো না।

পূবদিকের জানালাটা খুলে দিতেই বাইরের জ্যোৎস্না ঘরের মাঝে এসে লাফিয়ে পড়লো।

কানন জানালার পাশে একখানি আরাম কেদারা টেনে নিয়ে বাইরের নিবিড় নিস্তব্ধ শান্ত সুন্দর আকাশের পানে চেয়ে কাহিনীর কথা ভাবতে গিয়ে রাঙাদি'র কথাই ভাবতে লাগলো।

রাঙাদি'র থাইসিস্।

রাঙাদি'র স্বামী লিখেছে,···ভাইকানন, ওকে যে বাঁচাতে পারবো এমনতো মনে হয় না। তুমি জেনে হয়তো খুসি হবে না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি,—ওকে বাঁচাবার জন্তে আমার একটুও আগ্রহ নেই। ও যা এরই মধ্যে আমাকে দিয়েচে, তার আর তুলনা হয় না; এর বেশী আমি চাই না। ওকে চিতায় তুলে দিয়ে—ওর চিতা আমার বুকে চিরদিন জ্বালিয়ে রাখবো,—ও খুসিই হবে।···

রাঙাদি', রাঙাদি'র স্বামী আনন্দ, তাদের ছোট সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আশা-আনন্দ, দুঃখ-দারিদ্র্য নানা বিচিত্রবর্ণে চলচ্চিত্রের ছবির মত কাননের চোখের সামনে

একটির পর একটি ফুটে উঠলো। বিশেষ ক'রে রাঙাদি' ও তার শিক্ষা। রাঙাদি'র সঙ্গে কাননের বহুবার দেখা হয়েছে, রাঙাদি'র বহুকথাই সে বহুবার শুনেছে, কিন্তু প্রত্যেকবার বিদায়ের দিনে তার মনে হয়েছে,—কি যেন তবু শোনা হ'লো না। আবার কিছুদিন পরে সেই না-শোনা কথাই শুনতে গিয়ে তেম্‌নি না শুনেই ফিরে এসেছে। কাননের বিশ্বাস,—রাঙাদি'র জীবনে এমন একটা বাণী আছে যা তাকে শুনতেই হবে একদিন না একদিন, এবং সেই বাণীতে তার জীবনের চলার পথ হবে সুগম। রাঙাদি'র সে বাণী আশীর্ব্বাদের মত মাথায় তুলে আনতে গিয়ে সে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে এসেছে। আবার একদিন যাবে,—এই কথাই সে ব'সে ব'সে ভাবে।

চন্দ্রের পরিধি ক্রমেই ছোট হ'য়ে আসছিল এবং ওপরেও অনেকটা উঠে পড়েছিল।

পাশের বাড়ীর নূতন ভাড়াটেদের একটি নাম-না-জানা না-দেখা মেয়ে তখন গান ধরেছিল,—'…শুক্লা একাদশী'—

কানন মনে মনে বললো, বাঃ, মেয়েটিতো চমৎকার গায়!

কিন্তু শেষ পর্যান্ত শোনার আগ্রহে সে জেগে থাকতে পারলো না। কখন অপ্রয়োজনে চোখের পাতা তার জড়িয়ে গেল—সে জানতেই পারলো না।

কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন বড় একটা হয় না, কিন্তু হ'লে পরেই প্রলয়। তবে, রাঙাদি' যেখানে আছে সেখানে যেতে হ'লে কানন শুভমুহূর্তে শুভ্র মনে বেরিয়ে পড়তে একটুও ভয় পায় না।

তেমন ভাবেই বেরিয়ে পড়ছিল, হঠাৎ কাহিনীকে দরজার সামনে দেখে সে একটু থম্‌কে দাঁড়ালো। কাহিনী সামনে এগিয়ে এসে বললো, কাননদা', ঝর্ণার কাল জন্মোৎসব, মা আমাকে পাঠিয়ে দিলে তোমাকে নেমন্তন্ন করবার জন্তে। আমার জন্মোৎসবে তুমি যাওনি ব'লে মা ভারী দুঃখিত হয়েছিল, এবার না গেলেতো বুঝতেই পারচ'।

কানন হেসে বললো, সবই বুঝতে পারচি। কাকীমার চেয়ে তুমি ও ঝর্ণা যে আরও বেশী দুঃখিত হবে সেও আমি বুঝি, কিন্তু আমি যে রাঙাদি'কে দেখতে চলেচি আজ।

কবে ফিরবে শুনি?

আমার সামান্ত ব্যাপারও জানবার জন্তে তোমার যে আগ্রহের সীমা নেই কাহিনী, কিন্তু কিসের জন্ত এ আগ্রহ তা আমাকে বোঝাতে পার?

কাহিনী বিশুষ্ক ঠোঁটের পাতা দু'টো জিব্‌ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বললো, পরিচিতের জন্ত পরিচিতের কি কোন আগ্রহ থাকে না? আমারও তাই।

কানন কাহিনীর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো। তারপরে বললো, শুধু কি তাই কাহিনী?

হুঁ, তাই, তাই—খুব জোর দিয়ে ব'লে কাহিনী অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিদায় সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না জানিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল।

কানন কাহিনীর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে হাসলো একটু।

প্রদীপের পলতেটা উস্কে দিয়ে আনন্দ বললো, রাঙাবৌ, কানন এসেচে।

সত্যি!—রাঙাদি' পাশ ফিরে উঠে বসতে যাচ্ছিল, আনন্দ তাড়াতাড়ি তাকে ধ'রে ফেলে নিরস্ত ক'রে বললো, আঃ, কি যে করো! ওতো আর এখুনি চ'লে যাচ্ছে না যে অত ব্যস্ত হ'চ্ছ।

রাঙাদি'র পাণ্ডুর মুখে একটু ম্লানহাসি ফুটে উঠলো। সে বললো, তুমি এম্‌নি ক'রে অষ্টপ্রহর আমাকে আমার অসুখের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে যে আমি বাঁচি না বাপু। কানন এসেচে,—কোথায় প্রাণের আনন্দ দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাব, তা না, তুমি দেবে বাধা। এতকাল ডাক্তারী ক'রে রোগীতো আজও একটি মিললো না, এখন ডাক্তারী বুঝি আমার ওপর দিয়েই চরম ক'রে ঝালিয়ে নেবার মতলব? না, সে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। কানন যে-ক'দিন এখানে থাকবে সে-ক'দিন তোমাদের ডাক্তারী শাসন আমি কিছুতেই মেনে চলতে পারবো না।

কানন হেসে বললো, কবে কার শাসন তুমি মানলে রাঙাদি' যে, আজ ডাক্তারী শাসন মানবে না বলচ'?

কানন রাঙাদি'র শয্যার একপ্রান্তে এসে বসলো। রাঙাদি' তার শীর্ণ হাতখানা কাননের জানুর ওপর স্তস্ত

ক'রে বললো, না ভাই, সে কথা তোরা বলিসনে। কারও শাসন কোনদিন মানিনি বললে নিতান্তই মিথ্যে বলা হবে। নিজের শাসন আমার মত দুনিয়ায় কে আর মেনেচে শুনি? তা'পর ওঁকেই জিগোস্ ক'রে দেখ্, ওঁর শাসনও কোনদিন অমান্য করিনি।...কি, করেচি কোনদিন?

আনন্দ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কানন বাধা দিয়ে বললো, তবে কি জ্যেঠাইমা'ই শুধু মন্দ বরাত নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর শাসনটাই শুধু মানলে না?

রাঙাদি' মৃদু একটু হাসলো।

কিছুক্ষণ পরে আনন্দ এক কাপ চা হাতে ক'রে এনে কাননের হাতে তা তুলে দিয়ে বললো, খারাপ হ'লে কিন্তু নালিশ চলবে না। কারণ, এ কাজ আমার নয়, এ কাজ তোর রাঙাদি'র।

রাঙাদি' সামান্য একটু হেসে বললো, কানন, ওঁর কাজটা যে কি একবার জিগ্যেস ক'রে দেখ্ না,—ডাক্তারী, না অন্য কিছু?

আনন্দ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হ'য়ে বললো, ডাক্তারী ধরার আগেই যে নার্সিং-এ হাত পাকাতে হ'লো, কাজেই ওটা আর প্রফেশনের মধ্যে দাঁড়ালো না। এখন নার্স বললেই হয়তো ঠিক বলা হয়।

কানন হো হো ক'রে হেসে উঠলো। রাঙাদি' ও আনন্দ সে হাসিতে যোগ দিল।

কানন চা পান ক'রে বিস্মিত হ'য়ে গেল। কিন্তু আনন্দ পাছে লজ্জা পায় সে-কারণেই সে সে-বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলো না।

একটাই মোটে ঘর। আনন্দ তারই একপাশে কাননের ও নিজের জন্যে পাশাপাশি দু'টো শয্যা পেতে নিজের মনেই একটু হাসলো। রাঙাদি' চোখ পেতে আনন্দের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে বললো, কানন, ওঁর কাজের ছিম্‌ছাম্ দেখে আমিও মাঝে মাঝে বিস্ময়ে ডুবে যাই। আমরা মেয়েমানুষ—ওঁর কাছে হার মেনে যাই ভাই। কী ভাগ্যিস্ বিধাতা ওঁকে এম্‌নি ক'রেই গড়েছিল, নইলে কি যে হ'তো।

আনন্দ লজ্জা পেল, কিন্তু তা চেপে যাবার জন্যেই সে বললো, নইলে কি আর এমন হ'তো? বড় জোর আর একটা বিয়ে করতে হ'তো,—এই তো?

হুঁ, এই! পারতে?—রাঙাদি' বললো।

আনন্দ বললে, খু-উ-ব্, আজও তো মাঝে মাঝে তাই ভাবি।

রাঙাদি' কাননের মুখের দিকে চেয়ে বললো, সে কি আজও জানতে বাকি আছে?

কানন গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। রাঙাদি, ঘুমের ব্যর্থ চেষ্টায় বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকে। আর,—আনন্দ শিয়রের কাছে প্রদীপটা রেখে চোখের সামনে তার ডাক্তারী বইগুলো খুলে তান্ত্রিক-সাধকের মত অনিদ্র রজনী কাটায়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার কি এক সুতীব্র জ্বালা, কি যেন সে জেনেও জানতে পারছে না,—ধ'রেও ধরতে পারছে না,—কি যেন জগৎকে সে দিয়েও দিতে পারছে না। যে ব্যথা বুকে নিয়ে আনন্দ অনিদ্র দীর্ঘ-রজনী অতিবাহিত করে—সে ব্যথা একদিন তার মা'র বুকেও জেগেছিল—যেদিন সে তার গর্ভস্থ ছিল।...

রাঙাদি' পাশ ফিরে বলে, অনেক রাত হ'লো, এইবার আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়' লক্ষ্মীটি।

আনন্দ চম্‌কে উঠে বলে, আর এই তো!

ভোরবেলা আনন্দের দিকে আর চাওয়া যায় না।

তার স্বাস্থ্য, তার সৌন্দর্য্য একদিন বিস্ময়ের বস্তু ছিল, চোখ পেতে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করতো। কতদিন আনন্দ লোকের বিস্মিত-দৃষ্টির সামনে থেকে লজ্জায় মুখ সরিয়ে নিয়েছে। এখন তাকে দেখে অনাবৃষ্টির মাঝে বেড়ে ওঠা শস্যের কথাই মনে জাগে,—ঝল্‌সে গেছে, পূর্ণতা পায় নি।

আনন্দ কাননের ব্যথিত-দৃষ্টির পানে চেয়ে বলে, কি দেখ্‌চিস্ কানন? একদিন এমন ছিলাম না—এই তো?

কানন লজ্জিত হ'য়ে আনন্দের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে বলে, সত্যি, তোমার মুখে দুঃখের নিবিড়

কালো ছায়া পড়েচে। এত কাতরতা তোমার মুখেও ফুটে উঠতে পারে—এ যে আমি ভাবতেই পারি না।···আচ্ছা রাঙাদি', যে দিন জেঠাইমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় তুমি বিচ্ছেদ ঘটালে সে দিন আনন্দদা'কে যদি এমনিভাবে পেতে তবে কি তুমি তাঁকে সেদিনের মতই ভালবাসতে পারতে?

আনন্দ রাঙাদি'র দিকে ফিরে একটু হেসে বলে, তুই থাম্, কানন।

রাঙাদি' হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। বালিশটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথা তুলে বলে, না, থামবে কেন? ওদের প্রশ্ন করবার পথ আমরা নিজেরাই যখন ক'রে দিয়েচি, তখন ওদের মুখ চেপে থামানোর চেষ্টা যে সফল হবে না সে কি তুমি বোঝ' না?···কানন, ভাই, তোর প্রশ্নে আমার গত দিনের একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। মা একদিন জিগ্যেস্ করেছিল, আচ্ছা, আনন্দের মধ্যে তুই কি এমন দেখ্‌লি যে ওকেই তোর চাই? মা'কে সেদিন কি ব'লে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম তা আজ আর মনে নেই, কিন্তু এখন হ'লে কি বলতাম জানিস্? বলতাম,—ওঁর মধ্যে কিছুই আমি দেখি নি,—ওঁর রূপ, ওঁর স্বাস্থ্য, ওঁর বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই আমাকে সে দিন মুগ্ধ করে নি; কিন্তু মুগ্ধ যে হয়েছিলাম আমি তাও তো মিথ্যা নয়। ওঁর রূপ-গুণে আমি মুগ্ধ হইনি, ওঁর আগমনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। উনি যেদিন এলেন, সেদিন আমার সমস্ত হৃদয় মন যেন কার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে ছিল;—মনে হলো, তিনিই এতদিনে এলেন। সেই শুভ-মুহূর্তের প্রথম অতিথি উনি,—উনি যে কোন বেশেই তখন আসতেন, তাতেই আমাকে মুগ্ধ করতে পারতেন। ওঁর কাছেই নিজেকে তুলে ধরলাম, উনি ফিরে দিলেন সার্থকতা—অপমান নয়।

কানন রাঙাদি'কে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে, ও তোমার মনগড়া কথা, রাঙাদি'। এ হ'তেই পারে না যে এই সামান্য কারণে কোন নারী সমাজ সংসার থেকে নিজেকে এত সহজে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারে। আর তাই যদি হ'তো, তবে প্রথম অতিথির পরিবর্তে জেঠাইমা যাকে তোমার যোগ্য ব'লে দিচ্ছিল, তাকে তুমি সহজেই গ্রহণ করতে পারতে। না পারার তো আমি কোন কারণ দেখি না।

রাঙাদি' বলে, পারতাম না, কানন। আমার যা দেবার তা যে ওঁকে আগেই দিয়ে ফেলেছিলাম। কিছু হাতে রেখে কাজ করা আমার স্বভাব না। কাজেই অপর এক জনকে দেবার মত কিছুই তখন আর আমার ছিল না। মা'র কথা যদি তখন রাখতে যেতাম তো নিজের কাছে নিজেকে চিরদিন অপরাধী মনে করতে হ'তো। নিজেকে অতখানি ছোট করতে পারিনি।

আনন্দ একটু হেসে নিয়ে কাননকে লক্ষ্য ক'রে বলে, মানুষের দৈন্য ঢাকবার জন্যেই হয়েচে কথার সৃষ্টি, আর রাঙাবৌ তারই সদ্ব্যবহার করচে। ও নিজেও বোঝে না যে কেন ও এমন করেচে। আমাকে ভাল লেগেছিল—এও সত্যি, আমার জন্যে ও সমস্ত কিছু ত্যাগ ক'রে এসেচে—তাও সত্যি;······এবং এজন্যে কোনদিন ও অনুতাপ করেনি, করবেও না,—এর চেয়ে বড় সত্য বোধ করি জীবনে ওর আর কিছু নেই।

রাঙাদি' হাসতে চেষ্টা ক'রে বলে, য্-খাও তাই বুঝি?

জানালা দিয়ে ঘরে রোদ এসে পড়ে। কানন সেই রোদের পানে চেয়ে ব'সে থাকে। একপাশে আনন্দ, অপরপাশে রাঙাদি',—চোখের সামনে ওদের অতীত জীবনের টুক্‌রো টুক্‌রো কাহিনী—ঐ সামনেকার রোদটুকুর মতই তাজা, সুন্দর।

ওরা অনুতাপ করে নি—এ যেন বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়।

লাল মাটির পথ—

শহর সীমান্তে মাঠের মাঝের ছোট ষ্টেশনটির কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেচে। ষ্টেশনটি নিরালা নির্জ্জন, কিন্তু স্পন্দনযুক্ত,—প্রাণের পূর্ণতার তার অভাব নেই। শাখা লাইনের ষ্টেশন, কাজেই ট্রেণের গতায়াত দিবারাত্রের মধ্যে খুব বেশী নয়। কিন্তু ষ্টেশন-মাষ্টারবাবুটির কর্ত্তব্যপরায়ণতার দাপটে বেচারা 'পানি-পাড়ে' থেকে সুরু ক'রে স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টার পর্য্যন্ত সবাই সদা-বিব্রত, সদা চঞ্চল।

আনন্দ আর কানন ষ্টেশনের লালকাঁকরের প্ল্যাটফর্মের ওপর এসে দাঁড়াতেই ষ্টেশন-মাষ্টার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আনন্দ জিজ্ঞাসা করলো, ডাউন্ ট্রেণ আসতে কত বিলম্ব আছে গোপীবাবু ?

তা, তা,……এই উল্লুক রামভার্গব, আভি নি'কালো উস্‌কো, হাম্ নেহি মাঙতে ওহি চিজ,……হুঁ, কি তা বলছিলেন আনন্দবাবু ?……এই শুকুর, বেল্লিক কাঁহাকা, আভিতক্ মাল্‌ঠো ডাকবাবুকা পাশ ভেজ দিয়া নেহি ?… কামেখ্যা, ও কামেখ্যাচরণ, দোহাই দাদা, মালগুলোর একটা চট্‌পট্ খসড়া করে ফেল, আমি so very busy ; আর ওরে বেটা গোবৰ্দ্ধন,—না, বেটা বড় বাড় বেড়েচে, আজও গেল আর কালও গেল,—কইরে ?

গোবৰ্দ্ধন এক কলকে তামাক হাতে ছুটে এলো। গোপীবাবু সস্মিত আননে গোবৰ্দ্ধনের হাত থেকে কলকেটি নিজের হাতের হুঁকোর মাথায় তুলে নিয়ে হুঁকোটির মুখে একটি লোলুপ চুম্বন বসিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, ও, আনন্দবাবু যে। কোথায় দাদা, কলকাতা মুখো নাকি ? মথুরাপুরী পর্য্যন্ত ? হি, হি,……তা, তা,… আপনাকে যেন একটু অচেনা ঠেকচে, এর আগে কোনদিন দেখিনি বোধ হয় এখানে ?

আনন্দ বললো, অতটা লক্ষ্য করেন নি হয়তো, ও আরওতো এখানে এসেচে, আজ কলকাতা ফিরেচে।

গোপীবাবু আনন্দের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি তুলে বললেন, ইট……কেমন হে দাদা ?

আনন্দ বললো, না, আমার ভাই হয় সম্পর্কে।

হুঁ আমারই ভুল দাদা, মুখের ছাঁদ প্রায় একই রকম বটে। কাজের হুল্লোড়ে মাথা কি আর ঠিক্ আছে ছাই, নইলে এতবড় ভুলও হয়। এখন দেখছি বটে, মা'র পেটের ভাইয়েরও এত মিল বড় একটা থাকে না, কেমন না দাদা ?

প্রথম দর্শনেই কানন এই অসংযতবাক্ লোকটির উপর হতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল। ক্রমে তা রীতিমত ঘৃণায় রূপান্তরিত হ'তেও বেশী সময় লাগেনি। শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরে এতক্ষণ সে নীরব হ'য়ে ছিল। আর নীরব হ'য়ে থাকাকে সে অপরাধ মনে ক'রে বললো, আপনার নজরের প্রশংসা না ক'রে পারি না গোপীবাবু। আপনার সহোদর ব'লে যে আমাকে ভুল করেন নি—তা আমার পিতৃপুরুষের বহু পুণ্যের ফল।

গোপীবাবু তা'তেও অপ্রতিভ না হ'য়ে হে হে ক'রে খুব খানিক হেসে নিয়ে বল্‌লেন, না, না, আপনি আনন্দবাবুর চেয়ে একটু কাল তো বটেই, কিন্তু তা' হ'লেও…আর আমি ? অবশ্য এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যাও বা একটু শ্যামবর্ণ—

কানন বিশ্রীভাবে তার মুখের ওপরেই হেসে উঠলো।

দূরে একটা আগন্তুক ট্রেণের সিটিও সেই সঙ্গে বেজে উঠতে শোনা গেল। কানন ও গোপীবাবু দু'জনে একসঙ্গে মুক্তি পেয়ে বাঁচলো।

আচ্ছা, নমস্কার, আসি তা'লে—ব'লে গোপীবাবু ত্রস্তপদে তার অফিসের কামরায় গিয়ে ঢুকলেন।

আনন্দ এতক্ষণে স্বস্তি অনুভব ক'রে বললো, এমন ক'রে লোককে লাঞ্ছিত করা কেন বলতো ?

নইলে আপদ কি সহজে বিদেয় হ'তো ?—ব'লে কানন হাসতে লাগলো।

ট্রেণ এলেই তা বোঝা যেত। এই লোকটাকেই রাঙাবৌ একদিন nonsense বলেছিল, সে ভারী মজার ব্যাপার।

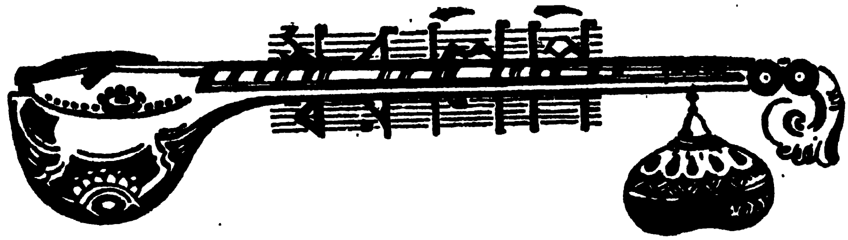
ট্রেণ এসে গেল। কানন তাড়াতাড়ি একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় উঠে ব'সে বললো, কেন, কি হয়েছিল ?

ওদিকে ট্রেণ ছাড়ার বাঁশী গেল বেজে।

আনন্দ বললো, সে আর একদিন শুনিস্। আবার শীগ্‌গিরই আসিস্ কিন্তু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়



হাসির গান

সোহিনীমিশ্র—তেতালা

ভ্যাবাকান্ত !
ক্ষান্ত দাও হে গানে ক্ষান্ত।
এ যে   সুর ও অসুরে রণ, এ নহে গান ত'।

তব   তান শুনে তানসেন লুঙ্গি ফেলে ভেগে যায়,
পড়শীরা বেঁকে যায় রাগে বঁড়শীর প্রায়।
ধরিয়া সুরের কাছা
করিছ গামছা-কাচা
বেচারী গানের যেন করিছ বাপান্ত।

তোমার পাড়ায় কেন লইলাম বাড়ী ভাড়া
সা রে গা মা সাধা শুনে প্রাণ হ'ল খাঁচা ছাড়া।
মনে হয় সন্দেহ
ধরিয়া টানিছে কেহ
যেন জীব-বিশেষের লাঙ্গুল-প্রান্ত।
সুরের ভাসুর তুমি, গানের আফগান,
সরস্বতীরে ধ'রে পরা'ইছ চাপকান।
দেখে বীণা ফেলে—দেয় নারদ পিঠ টান
বাহনের গান শুনে শিব উদ্‌ভ্রান্ত।

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইসলাম

স্বরলিপি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ১ + ৩

II সা ঋর্ণা না ধা। জ্ঞা গা জ্ঞা ধা। না না র্সা -া। -া -া র্সঋর্ণা র্সঋর্ণা।
ক্ষা ন্ ত দা ও হে গা নে ক্ষা ন্ ত • • • ভ্যা• বা•

না না র্সা -া। -া -া ধা না। না না র্সা -া। -া -া -া -া II
কা ন্ ত • • • দা ও ক্ষা ন্ ত • • • • •

গা II গা র্সা না ধা। না ধা জ্ঞা গা। গজ্ঞাধা গজ্ঞা গা গা। ঋা সা সা (-া) II
এযে সু র ও অ সু রে র ণ এ•• •• ন হে গা ন ত •

সা II সা গা গা গা। গজ্ঞা ধা জ্ঞা গা। জ্ঞা জ্ঞা ধা ধা। না র্সঋর্ণা সা (া)।
তব তা ন শু নে তা• ন সে ন লু ঙ্গি ফে লে ভে গে• যা য়

র্সা র্গা র্গা র্গা। ঋর্ণা ঋর্ণা র্সা র্সা। না না ধনঋর্সা া। না ধা জ্ঞা গা।
প ড় শী রা বেঁ কে যা য় রা গে বঁ••• ড় শী র প্রা য়

গা গা গা হ্মা। হ্মা ধহ্মা গা গা। ঋা গা গা ঋহ্মগা। হ্মা ঋা ঋা সা।
ধ রি য়া হু রে র • কা হা ক রি ছ গা • • ম হা কা চা

০ ১ + ৩
গা গা গা গা। হ্মাধ না ধা ধা। না না র্সা র্ঋা। না না র্সা -া ||
বে চা রী গা নে র বে ন ক রি ছ বা পা ন্ ত •

|| র্সা র্সা র্সা র্সা। না না ধা ধা। হ্মা হ্মা গা গা। হ্মা গা ঋা সা ||
তো মা র পা ড়া র কে ন ল ই লা ম বা ড়ী তা ড়া

সা ঋা গা হ্মা। সা ধা র্সা না। নর্সা ঋর্গা র্গা র্গা। র্গা ঋর্গহ্মর্গা র্ঋা র্সা।
সা রে গা মা সা ধা শু নে প্রা • ণ হ' ল খাঁ চা • • • ছা ড়া

সা সা সা মা। মা মা মা মা। সমা মা মহ্মা গা। হ্মা হ্মা হ্মা মগা।
ম নে হ য় স ন্ দে হ ধ রি য়া টা নি • ছে • কে হ

গা গা হ্মা হ্মা। ধা ধা ধা ধা। ধনা নর্সা র্সা র্ঋা। না না র্সা -া ||
যে ন জী ব বি শে ষে র লা • জু • ল • প্রা ন্ ত •

র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা। র্সর্ঋা -া র্সণা ণা। ণর্সা র্সণা র্সজ্ঞা র্ঋর্জ্ঞা। র্জ্ঞা র্সা র্সা (ণা)।
সু রে র জা দু র তু মি • গা • নে • র আ ক গা ন (তুমি)

র্সা র্ঋা র্ঋা র্ঋা। র্ঋা -া র্ঋা র্ঋা। র্সা র্ঋা র্জ্ঞা র্মা। ধা ণা র্ঋা -া।
স র স তী রে • ধ রে প রা ই ছ চা প কা ন্

া র্ঋা র্সা র্সা। না ধা হ্মা গা। হ্মা গা ঋা সা। র্ঋা র্ঋা না র্সা।
দে খে বী গা কে লে দে র মা • র দ পি ঠে টা ন

র্সা র্গা র্গা র্গা। র্হ্মা র্গা র্ঋা র্সা। না ধা হ্মা গা। ঋা ঋা সা সা ||
বা হ নে র গা ন শু নে পি ঘ উ ড় আ ন্ ত •

পট ও মঞ্চ

ছবির কথা

—আনন্দ—

আমাদের ছায়াশিল্প

সমালোচনায় উৎকর্ষ লাভ করতে হলে, আমাদের মনে হয়, ভালমন্দ বিচারবোধের সঙ্গে থাকা চাই রসগ্রহণের ক্ষমতা। অর্থাৎ সমালোচকের মনকে হতে হবে রসিকের মন। জিনিষকে সুন্দর করে দেখবার ক্ষমতা চাই সমালোচকের—ছোটখাট বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতাকে মনের রঙে সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হবে সমালোচকের। সমালোচনা করা অর্থে নিন্দা বা অজস্র অসত্য প্রসংসা করা নয়। কিন্তু বাংলা ছবির নিরপেক্ষ সমালোচনার বেলায় নিন্দাই এসে পড়ে; কারণ সমালোচনা করতে বসে জলো স্বাদেশিকতা পোষায় না।

অনেক বাংলা ছবিই আমাদের দেশে হলো কিন্তু সে সব ছবির কথা আজ কিছুই মনে পড়ে না। তাদের সম্বন্ধে কেবল এইটুকুই মনে আছে যে রসিক মনের খোরাক তারা মোটেই জোগাতে পারেনি। 'মহুয়া'ই বলুন, 'তরুণী'র কথাই পাড়ুন, আর 'দক্ষযজ্ঞে'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন—এদের মধ্যে কোন একটীও আমাদের গভীর আনন্দ বা উপলব্ধির কিছুই দিতে পারেনি। সাময়িক ঘণ্টা দুয়েকের মোটমাট আনন্দ ব্যতীত চিরন্তন বা স্থায়ী কিছুই আজ পর্য্যন্ত পেলাম না বাংলা ছবিতে। সেই কবে Sunrise, 7th Heaven প্রভৃতি (নামোল্লেখ করে বৃথা 'বিচিত্রা'র পাতা ভরাবো না) দেখেছি কিন্তু আজও সেই সব ছবির কথা মনে হলে সদ্য দেখার রোমাঞ্চ অনুভব করি। কেন আমাদের ছবি স্মরণীয় হয় না সেই কথাই এখন আমরা ভেবে দেখবো।

গল্পই হচ্ছে ছবির প্রাণ। বিদেশী ছবি হয় অসংখ্য, কিন্তু তাদের যে-কোন ছটীর মধ্যে গল্পের মিল ক্কচিৎ পাওয়া যায়। তারা বাইবেল, ইতিহাস, পুরাণ, সংবাদ, সাহিত্য, দস্যুবৃত্তি, কাহিনী প্রভৃতি থেকে অসংখ্য সুরের গল্প সংগ্রহ করে। তাদের ছবিতে হর্ষ, বিষাদ, সুর, সঙ্গীত, নৃত্য, সমর, রাজনীতি, বিশ্বমানবের কল্যাণ প্রচেষ্টা ইত্যাদি কম বেশী নানা হারে থাকে। সুতরাং তাদের ছবি দেখতে বিরক্তি বড় একটা ধরে না—একঘেয়ে বিশেষ ঠেকে না। কিন্তু আমরা সবগুলি বিষয়ই সমান চাই না। আমরা খুঁজি মানুষের এই দৈনন্দিন হানাহানি, কাড়াকাড়ি, তুচ্ছ সুখ-দুঃখের আর সংগ্রামের রূঢ় অথচ সুন্দর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আমরা খুঁজি জীবনের আসল সুর। জীবনের চরম সত্য যে ট্রাজিডি, তারই পিছনে আমরা করি ছোটাছুটি এবং যে ছবিতে পাই তার কিছু ইঙ্গিত সেই হয়ে পড়ে আমাদের প্রাণপ্রিয়। এই জন্যই চার্লি চ্যাপলিনের এত আদর, এত সে আমাদের আত্মীয়। বলা বাহুল্য একান্তভাবে দুঃখবাদের ধুয়াধরা দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠে এবং তাই আসে রূপকথার রাজকন্যা, সুর, সঙ্গীত, হাসি আর ইতিহাস।

বাংলার ছবির গল্পে আমরা পাই নিছক কাল্পনিক চিত্র, (Just Imagine শ্রেণীর কিছু নয় তা বলে) বাজে গল্পকথা, পতিতালয়সংক্রান্ত হীন জীবনের কদর্য্য রূপ, প্যানপেনে প্রেমের পানসে কাহিনী, না-হয় বড় জোর ধর্ম্মের ছেলেভোলানো কাঁদুনি। ফলে ছবি দেখতে গিয়ে বিচার করি খুঁটিনাটির—সমগ্র ছবিটীর সার্থকতা কোথায় বা কতখানি, বিজ্ঞাপনতৃপ্ত সাপ্তাহিকের কৃপায় তা ভুলে যেতে হয়। কিন্তু প্রেমের কাহিনীর আদর যে কমে গেছে;—নেমে গেছে Janet Gaynor-এর দাম, ম্লান হয়ে গেছে Mary Pickford-এর প্রভা, ডুবে গেছে Nancy Carol-এর গৌরবরবি। নায়ক নায়িকার মিলন আজ ভাল লাগে

না। আমাদের দেশের প্রেমের কাহিনীর শেষ আরো ভীষণ। টেনেবুনে উমাকে আনন্দ পাবেই, গীতাকে লাভ করবে প্রণব, নয়ত শিরিফরহাদের অনুকরণে নায়ক নায়িকার মিলন হবে এক সাথে মৃত্যুর পরে। 'চাষার মেয়ে' বা 'সহধর্ম্মিণীতে' বৃথাই জেগেছিল মনে আশা। নিজেদের কথাই যারা গুছিয়ে বলতে শিখলো না তারাই করবে বিশ্বমানবের কল্যাণের ইঙ্গিত, মানুষের সহজ ও সুন্দর হয়ে সুন্দর সাহিত্যের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু 'খরস্রোতা' এদেশে হবে না। এখানে হবে 'পাতালপুরী'—সেই silly sickly romanticism, সেই morbid sentimentalism। হায় শৈলজানন্দ, দুঃখ হয়। আধুনিক সাহিত্যিক, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধবাদী হয়ে 'পাতালপুরী'কে তুমি দম্ভভরে ছায়ারূপের উপযোগী বলেছ। প্রেমের ন্যাটুকেপনা আজ অচল। প্রেমের ছবিতে খোঁজ পড়ে



সৌন্দর্য্য-বিশেষজ্ঞদের মতে সিল্‌ভিয়া সিড্‌নিই নাকি ছায়া জগতের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। আমাদের মতে সিল্‌ভিয়ার মত নটকুশল অভিনেত্রী অল্পই আছে। শ্রীমতীর আগামী ছবির নাম 'গুড্ ডেম্'। মিস্ সিড্‌নি সম্প্রতি 'ওয়ান্ ওয়ে টিকেট্' শেষ করে 'রেড্ ওম্যান্' ছবির কাজে হাত দিয়েছেন

বেঁচে থাকার কথা তারাই বলবে! Arrowsmith, Symphony of Six Million, of Human Bondage, Humanity First, Abraham Lincoln, Uncle Tom's Cabin প্রভৃতি ছবি যাতে মানুষকে কল্যাণের পথে—বৃহত্তর জীবনের পথে নিয়ে যায় সে সব ছবি এদেশে হবে এ আশা অতি বড় স্বপ্নাতুরও করে না। পথ ভুলে শৈলজানন্দ 'খরস্রোতা'র সঙ্কীর্ণ জীবনের কলঙ্ক ছেড়ে Sylvia Sydney-র, ডাক আসে Miriam Hopkins-এর, অনুসন্ধান চলে Marlene Dietrich, Ruth Chatterton আর Katharine Hepburn-এর। ইতিহাস নিয়ে এখন গল্প, রূপকথার ঐশ্বর্য্যের আজ চাহিদা, ভৌতিক কাহিনীর বিশেষ আদর।

অন্যত্র ছবির আখ্যানভাগের জন্য সারাপৃথিবীর পুঁথি-পত্র নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। মঞ্চ থেকে আসে নাটক,

আসে বেতার থেকে, আসে সংবাদপত্রের গল্প আর আসে খ্যাত অখ্যাত লেখকদের গ্রন্থরাজি। আমাদের দেশে বেতার দীন, মঞ্চ প্রাচীন এবং সংবাদপত্র চিত্রোপযোগী, গল্পহীন। ওদেশে villain হয় Wallace Beery Clark Gable, Ricardo Cortez, Paul Muni, Edw. G. Robinson, Spencer Tracy এবং বিগত যৌবন John Barrymore, George Arliss, Lionel Barrymore, Chas. Laughton প্রভৃতি ভূমিকা পায় নটজগতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবার মত। ওদের ছবিতে পতিতা যেখানে অন্যতম প্রধান চরিত্র, সেখানে সে উদ্রেক করে করুণার—লালসার নয়, মনীষীর সে হয় চিন্তার বিষয়। কিন্তু আমাদের দেশে 'তরুণী' 'সন্দিগ্ধা' 'বিগ্রহ' 'অভিষেক' প্রভৃতি অসংখ্য ছবিতে villain বা পতিতার কোন সার্থকতা নেই, অথচ তারা সম্পূর্ণ condemnedও নয়। এদেশে পাপের পরাজয় আর পুণ্যের শত জয় জয়-কার—Sorrows of Satan এখানে নেই। দুর্বৃত্ত বা দুর্বৃত্তাদের মনোবৃত্তি একটাই, এবং সেটা দুষ্ট।

আমাদের নবীন সাহিত্যিকরা হানাহানি করতে এবং পরস্পরের কলঙ্ককে কাপড়চোপড় পরিয়ে প্রেমের কাহিনী লিখতে ওস্তাদ। সিনেমার উপযোগী কাহিনী রচনা করতে তাঁদের দেখা যায় না। চিত্রোপযোগী কাহিনীর নামে 'পাতালপুরী'! সেই দুর্বিষহ প্রেম! অবশ্য বর্ত্তমানে সিনেমার যে ঝোঁক তাতে 'পাতালপুরী' খুব ভাল 'বাংলা বই', কিন্তু সুন্দর একটা ছবি নয়। সাহিত্যের বেলাতেই তাঁরা গতানুগতিকতার ঊর্দ্ধে, কিন্তু সিনেমার বেলায় সেই mass-মনোরঞ্জন? লোকে যা চায় তাই দিতে গেলে আধুনিক সাহিত্য গড়ে উঠতো না এবং লোকে যা চায় তা দিতে গেলে কোন কালেই সুন্দর সিনেমা গড়ে উঠবে না। লোকমত এবং রুচিকে পরিবর্তন করার ভার তাঁদেরই উপর যাঁদের আছে প্রতিভা। হাতে কলমে না যুঝে শিখে এবং সাহিত্যে পসার ও প্রতিপত্তি না জমাতে পেরে কেউ কেউ সিনেমাপন্থী হয়ে তাঁদের সাহিত্যগত বিকৃত ও কদর্য্য উদ্দেশ্যমূলক জিনিষ চালাচ্ছেন—ধিক্কার তাঁদের দিই; কিন্তু সেই সঙ্গে সুষ্ঠু ও সুন্দর গল্পরচনা এবং গল্প-নির্ব্বাচনের উপরও জোর দিচ্ছি। স্বাভাবিক সুন্দর ও সঙ্গত গল্প ও ছবি আমাদের চাই।

আমাদের দেশের কবি ও সাহিত্যিকদের আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, বিশ্বাস করি তাঁদের শক্তিতে এবং প্রতিভায়। আমাদের সাহিত্য সুসমৃদ্ধ এবং আমাদের কারুকলার জ্ঞান ও শিল্পপরিচয়দ্যোতক। বম্বের ছবিওয়ালারা আমাদের গল্প এবং রসসৃষ্টি দেখে অবাক হয় কিন্তু সেটাই আমাদের চরম প্রশংসা ও পরম সার্থকতার কথা নয়। সারা পৃথিবীর সব মানুষের জীবনে যত কিছু ঘটনা ঘটতে পারে সবই বম্বের একটা ছবির গল্পে পাওয়া যায়—এমনই তাদের শিল্পজ্ঞান! সুতরাং তাদের প্রশংসার মূল্য খুব বেশী নয়। আমাদের আত্মোৎকর্ষের যথেষ্ট প্রয়োজন। কিন্তু সে কথা অনুগ্রহক্রীত সাপ্তাহিকের দ্বারা উত্থাপন করা সম্ভবপর নয় (ফলে কিছুদিন বাদে আমরা হয়ত 42nd Street, Flying Down to Rio, Wonder Bar প্রভৃতি তুলে বসে থাকতে পারি)। আমাদের প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকরা এদিকে অবহিত হোন্। তা বলে বর্ষার কবিকে আমি স্থূল সিনেমা বিষয়ে টেনে আনতে চাই না কারণ কোন রসিকই 'বিচিত্রা' বা 'প্রবাসী'র প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা ছেড়ে জগতের সেরা ছবি দেখাও বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কারণ কাব্য এবং সাহিত্যের স্থান সভ্য মানুষের মনে সবার উপরে।

ট্রেজার আয়ল্যাণ্ড

আজ অনেক বছর হল রবার্ট লুইস্ ষ্টিভেন্সন্ মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর গ্রন্থরাজি তাঁকে অমর করে রেখেছে। ছায়াপটে তাঁর Dr. Jekyll and Mr. Hyde-এর যে রূপ ফুটে উঠেছে তা অনবদ্য এবং আজ Treasure Island-ও তাঁর খ্যাতি বর্দ্ধিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ছবি জনপ্রিয়, কারণ তা সর্ব্বজনবোধ্য কিন্তু সাহিত্যের কথা আলাদা। আবার আমরা নতি জানাই Long John Silver ও Jim Hawkins-এর রচয়িতাকে এবং উভয়ের বিচিত্র কাহিনীর লেখককে। এই সঙ্গে আমরা Long John-রূপী Wallace Beery-কে এবং Jim Hawkins-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ Jackie Cooper-কে আন্তরিক সাধুবাদ

জানাচ্ছি। Jackie-র অভিনয়, কতকটা তার গুণে এবং কতকটা তার ভূমিকার গুণে সবচেয়ে ভাল লাগে। Beery-র অভিনয় Flesh ছবির চেয়ে আর কোথাও মনোজ্ঞ হতে দেখলাম না। অবশ্য Flesh-এ অভিনয়ের ক্ষেত্র বিশাল এবং বিস্তীর্ণ। Lionel Barrymore-এর ভূমিকা খুব ভাল হয়েছে। অপর সকলেই বিশিষ্ট নট কিন্তু এ ছবিতে তাঁদের অভিনয়ের সুযোগ বিশেষ নেই এবং যা আছে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিটী সকলেরই, বিশেষতঃ ছেলেদের দেখা উচিত।



দস্যি মেয়ে লুপে ভেলে-কে আর চেনবার জো নেই! কেমন ভাল মানুষের মত উঁকি মারছে।
লুপের দুটী আগামী ছবির নাম 'দি হাফনেকেড্ ট্রুথ্' এবং 'ষ্ট্রীক্‌টলি ডিনামাইট্'

সার্লি টেম্পল্

সার্লি টেম্পলের (শীর্‌লি বা সার্লে নয়) মত মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না, অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নি। পাঁচ বছর তার বয়স, সোনালি তার চুল—ঠিক যেন গোলগাল ছোট্ট একটী পুতুল। কালিফর্ণিয়ার স্যাণ্টা মনিকায় সার্লিদের বাড়ী। সার্লির বাবা লস্ এন্‌জেল্‌সের এক শাখা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, মা তার ঘরদোর আর মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। কোন পুরুষে এরা মঞ্চ বা পর্দ্দার ধার দিয়েও যায় নি; কিন্তু সার্লি একেবারে পাকা অভিনেত্রী—নাচতে গাইতে, মন চুরি করতে তার জোড়া মেলা ভার। Stand up and Cheer ছবিতে ছোট্ট একটী মেয়ের ভূমিকা আছে যে Dady Take a Bow বলে একটী গান গাইবে এবং নাচবে। ব্যস্, সার্লি ঐটুকু করেই জনদশেক নামজাদা নটনটীকে একেবারে ম্লান করে দিলে। তারপর Baby Take a Bow নাম দিয়ে হল সার্লির দ্বিতীয় ছবি। এর গোড়ার দিকে সার্লি একচ্ছত্র রাজত্ব করেছে, কিন্তু শেষে ছবিটী সীরিয়াস্ হয়ে দাঁড়ালে সার্লির বিশেষ কিছু দেখাবার মত নেই। James Dunn এই ছবিতে খুব সুন্দর অভিনয় করেছেন। ছবিটী আসলে হাস্যরসের এবং শ্রেষ্ঠ যে polished humour আছে তাতে আপনি প্রাণভরে হাসবেন। Shirley-কে Jackie Cooper-এর আবিষ্কর্ত্তা Lew Brown খুঁজে বার করেন। Fox Films-এর কর্ত্তারা Shirley-র জন্য অনেক কিছু ভাবছিলেন এমন সময়

Paramount Pictures Shirley-কে ছোঁ মেরে নিয়ে এসেছেন। Paramount-এর কারখানায় সার্লি Little Miss Marker ও Now and Forever তুলেছে। আমরা ছবিদুটী দেখবার জন্ম উদ্‌গ্রীব রইলাম।

এই 'দুষ্টু' মেয়েটীকে সকলেই ভাল না বেসে পারবেন না।

ক্লিওপেট্রা

Cecil. B. De Mille বিরাট ছবি করার জন্ম বিখ্যাত। আলোচ্য ছবি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলা যেতে পারে। কেবলমাত্র দৃশ্যপটাদির আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যই তিনি দেখান নি, তাঁর ছবি নাটকীয় রসঘনও হয়েছে। Claudette Colbert নামক ভূমিকাটীকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছেন।



ক্লডেট্ কলবার্ট

Claudette-এর অনেক অভিনয়ই দেখলাম কিন্তু এমনটী আর পূর্ব্বে দেখা যায় নি। Warren William-ও Julias Cæsar-এর চরিত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং Marc Anthony-রূপে Henry Wilcoxon নবাগত হলেও আমাদের সাধুবাদের উপর দাবী রাখেন। অন্যান্য প্রত্যেকটী চরিত্র সু-অভিনীত। Mob-scene-গুলির বিশেষ প্রশংসা করি। আমাদের মনে হয় Celcil. B. De Mille নিষ্ঠুরতা দেখাবার জন্ম বিশেষ যেন আগ্রহশীল।

কর্ম্ম

প্রতীচ্যে এই ছবিটী বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু আমরা জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা 'কর্ম্ম' দেখে যথেষ্ট আশাহত হয়েছি। সামান্য যা গল্প আছে তা মোটেই developed হয়নি, ফলে ছবিটীর কোথাও এতটুকু grip, এতটুকু suspense নেই। অভিনেতৃবর্গ সকলেই ইংরাজি ভাষায় কথা বলেছেন, কিন্তু দেবিকা রাণী এবং রাজগুরু ছাড়া কারও কণ্ঠস্বরে আবেগ ফুটে ওঠেনি এবং ভাব-ব্যঞ্জনায় একমাত্র দেবিকা রাণী ভিন্ন আর কেউ কিছুমাত্র সাফল্য লাভ করেন নি। নায়ক হিমাংশু রায় (প্রযোজকও) আমাদের অভিনয়ের দিক থেকে সম্পূর্ণ হতাশ করেছেন। প্রযোজনার ব্যাপারেও অসংখ্য ছোটখাট বিচ্যুতি থেকে গেছে। Mob-sceneগুলি ভালই কিন্তু পারম্পার্য্য রক্ষার অভাবে অনেকস্থলে সেগুলি হাসির উদ্রেক করে। ছবিটীর একমাত্র আকর্ষণ দেবিকা রাণীর অভিনয়। তাঁর প্রথম গানটী খুবই সুন্দর, কিন্তু দ্বিতীয়টার বাণী সমান স্পষ্ট নয়। এই সঙ্গে সুনলিনী দেবীর যে নাচ ও গানের ছবিটী দেখানো হয় সেটী ছায়া-চিত্রকরের কলাজ্ঞানের অভাবে অসম্ভব boring হয়েছিল।

অবশ্য জ্ঞাতব্য

৬-১১-৩৪ তারিখের কাগজে দেখা গেল এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা John Barrymore বম্বেতে এসেছেন। তিনি মাদ্রাজ, দার্জ্জিলিং, কলিকাতা এবং আগ্রাতেও আসবেন। ভারতের কাহিনী নিয়ে ভারতেই একটী ছবি তৈয়ারি করার তাঁর ইচ্ছা আছে। Barrymore-এর ঊর্দ্ধতন কয়েক পুরুষ আগ্রাতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

Rko. Radio Pictures এদেশেই নটনটী নিয়ে 'Akbar the Great' তুলবেন। বিদেশী চিত্রব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আমাদের দেশের পরে পড়েছে। হয়ত আমাদের 'সৌভাগ্য' বশতঃ বিলাতের মত এখানেও হলিউডের প্রত্যেক কোম্পানী একটী ষ্টুডিও পত্তন করবে। আর আমরা সেই সব ছবি দেখে গুণকীর্ত্তন করবো। বিদেশী চোখে আঙুল না দিলে কি আমরা প্রতীচ্যের বাজার সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হব না? 'কর্ম্ম' দেখে এটুকু অন্ততঃ আমাদের বুঝা উচিত যে ভারতের কাহিনীর International market আছে এবং সেটী capture করতে হলে ইংরাজি কথোপকথন দিয়ে ছবি তুললেই হবে—প্রযোজনা বা অভিনয়ের জন্ম বিশেষ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

সারা ভারতে চলতে পারে এমন একটী গল্পকে ইংরাজি কথোপকথন সাহায্যে আমাদের দেশের ছবি কারখানার মালিকরা রূপ দিন না। সে ছবি যে 'কর্ম্ম'র চেয়ে ভাল হবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

সম্পর্ক

শ্রীআশীষ গুপ্ত

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

মানুষ শিকার

বিজ্ঞানের জ্ঞান কারও একচেটে নয়। এর সাহায্য যেমন পুলিশও নিতে পারে তেমনই দস্যু তস্করদের পক্ষেও

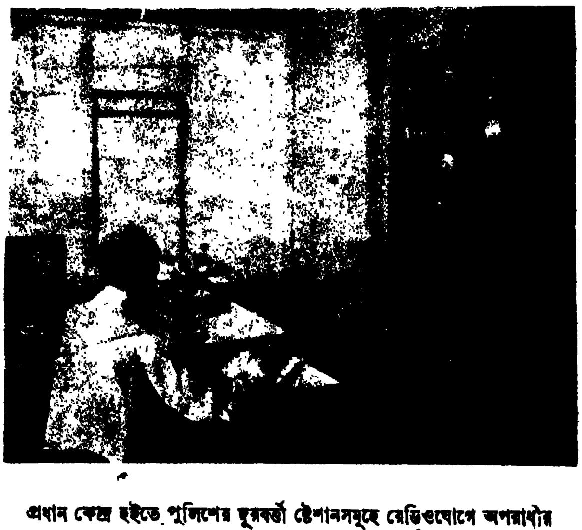


যে কোন অবস্থার উপযোগী পূর্ণসজ্জিত পুলিশ কার। প্রধান কেন্দ্রের রেডিও ট্র্যান্সমিটার এই গাড়ীর উপযোগিতা বহুগুণে বৃদ্ধি করে।

এ যে একেবারে নিষিদ্ধ ফল তা নয়। অবশ্য যদি সে সব দস্যুতস্করদের সে সাহায্য গ্রহণের উপযুক্ত মস্তিষ্ক থাকে।

কিন্তু এটা যখন এ্যামেরিকার কথা, আমাদের দেশের ছিচ্‌কে চোরের কাহিনী নয় তখন মস্তিষ্ক বিষয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। সাগর পারের ওই আশ্চর্য্য দেশটিতে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধবস্তুটা প্রায় শিল্পকার্য্যে পরিণত হ'য়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতেই বেড়েছে পুলিশের বাহাদুরী, বিস্ময়জনকরকমে প্রকাশ পেয়েছে তাদের কর্ম্মক্ষমতা। সেখানকার নবীনতম প্রচেষ্টা হচ্ছে রেডিওকে অপরাধী ধৃত করার কার্য্যে নিযুক্ত করা।

সাধারণতঃ এটা দেখা গিয়েছে যে অপরাধ যত নিখুঁত ভাবেই সম্পন্ন হ'ক না কেন, তার একজন না একজন সাক্ষী থাকেই। যার সম্বন্ধে সেই অপরাধ অনুষ্ঠিত হ'য়েছে ক্ষেত্রবিশেষে সে নিজেই সাক্ষীর কাজ করে,—যদি না তাকে একেবারে প্রাণে বধ করা অথবা অত্যন্ত গুরুতর রকমে আহত করা হ'য়ে থাকে তাহ'লে অপরাধীর পলায়নের পরে সে নিজেই কোন রকমে পুলিশকে সংবাদদানের চেষ্টা করে,—কখনও অপরাধীর চেহারা দেখ্‌বার সুযোগ তার ঘটে, কখনও বা গাড়ীর নম্বর অথবা চেহারা ও রংয়ের বর্ণনার দ্বারা সে পুলিশকে সাহায্য কর্‌তে চেষ্টা করে থাকে। পথচারী কোনও লোক যদি সেই অপরাধ অনুষ্ঠিত হ'তে দেখে থাকে তাহ'লে সেও পুলিশকে যথাসম্ভব শীঘ্র সংবাদ দেয়। আর কোনও ব্যাঙ্ক কিংবা ওই জাতীয় কোনও স্থলে যদি কিছু ঘটে তাহ'লেও পুলিশের প্রধান কার্য্যালয়ে অবিলম্বে খবর পৌছায়। মোটের উপর অধিকাংশ স্থলেই অপরাধ



প্রধান কেন্দ্র হইতে পুলিশের দূরবর্ত্তী ষ্টেশানসমূহে রেডিওযোগে অপরাধীর বর্ণনা প্রেরিত হইতেছে।

অনুষ্ঠানের কয়েক মিনিটের মধ্যেই সংবাদ আর পুলিশের অগোচর থাকে না। তখন পুলিশ অপরাধী ধর্‌বার জন্ম আঁটঘাট বাঁধ্‌বার এবং নানারকমে তার পলায়নের পথে বাধা সৃষ্টি কর্‌বার চেষ্টা করে। টেলিফোনযোগে সমস্ত পুলিশ অফিসে এবং ফাঁড়িতে সংবাদ দেওয়া হয়,—শুধু যে সহরটুকুতেই তা সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, চতুর্দ্দিকের কয়েক মাইলের মধ্যে যত ফাঁড়ি এবং পুলিশের আড্ডা আছে সর্ব্বত্রই সেই সংবাদ প্রেরণ করা হয় এবং পথেঘাটে প্রান্তরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

কিন্তু পুলিশের বড় অফিসে সাক্ষীর মুখ থেকে অথবা টেলিফোনযোগে অপরাধ অনুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়ার পর থেকে এই সব উদ্যোগ আয়োজন কর্‌তে কর্‌তে বেশ



ঈষ্ট্‌ ল্যান্‌সিং-এ মিচিগ্যান ষ্টেট পুলিশের প্রধান কেন্দ্র।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গিয়েছে এবং অনুসরণকার্য্য আরম্ভ হওয়ার বহুপূর্ব্বেই দ্রুতগামী ষ্টীমার, ট্রেন, মোটরগাড়ী অথবা এয়্‌রোপ্লেনযোগে অপরাধী অন্তর্হিত হ'য়েছে।—

সময়ের হেরফের এসব কাজে একটা মস্তবড় জিনিব,—অপরাধ অনুষ্ঠানের সংবাদ যারা জানে, তারা কত শীগ্‌গির সে সংবাদ পুলিশকে জানাতে পারে এবং পুলিশ কত দ্রুত সেই খবর তাদের বিভিন্ন অফিস ফাঁড়ি এবং পথের উপরে প্রহরায় নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের নিকটে পৌছে দিতে পারে এর উপরেই সব কিছু নির্ভর করে। অপরাধ অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরের প্রথম অর্দ্ধঘণ্টা অপরাধীর কাছে যত প্রয়োজনীয় তার পরবর্ত্তী দশঘণ্টাও তত নয়।

অতএব পুলিশ রেডিওর আশ্রয় নিয়েছে এবং তার ফলে অনেক সময় অপরাধী অকুস্থল পরিত্যাগ করার পূর্ব্বেই তার অনুসরণকার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব হ'য়েছে। পুলিশ রেডিও-পদ্ধতি যেমন সরল তেমনই কার্য্যকরী। ট্রান্‌স্‌মিটার, রিসিভার এবং পুলিশকার এই তিনের সহযোগিতায় অপরাধীর অনুসরণকার্য্য সম্পন্ন হয়। কতদুর অবধি সংবাদ প্রেরণ কর্‌তে হ'বে তারই 'পরে নির্ভর করে ট্রান্‌স্‌মিটারের শক্তি, যদি সহর ছোট হয় এবং সংবাদ প্রেরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় গ্রামের সংখ্যা অধিক না হয়, তাহ'লে ট্রান্‌স্‌মিটারের শক্তি খুব বেশী না হ'লেও চলে। রিসিভারের সংখ্যা নির্ভর করে পুলিশ ষ্টেশন, ফাঁড়ি এবং প্রহরায় নিযুক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীদের সংখ্যার 'পরে।

ট্রান্‌স্‌মিটার থাকে পুলিশের প্রধান আড্ডায়, ট্রান্‌স্‌মিটিং ভ্যাকিউয়াম টিউব্‌গুলোকে সব সময়েই প্রস্তুত অবস্থায় রাখা হয়, যাতে তিন চার সেকাণ্ডের মধ্যেই তাদের ব্যবহার করা যায়। ট্রান্‌স্‌মিটিং রুমে অপারেটার থাক্‌লে মাইক্রোফোনও সেখানেই থাকে। সাধারণতঃ পুলিশের প্রধান আড্ডায় আর একটা মাইক্রোফোন থাকে, যাতে করে' সাক্ষীদের নিকট হ'তে ফোনে সংবাদ এলে তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

রিসিভারগুলো রাখা হয়, নিকটবর্ত্তী সমস্ত পুলিশ অফিসে, ফাঁড়িতে এবং পুলিশকারেতে। শর্ট ওয়েভলেংথে ট্রান্‌স্‌মিটার ঠিক করে' নেওয়া হয়, যাতে বেতার ষ্টেশানের প্রেরিত সংবাদের সঙ্গে এর না গোলযোগ বাধে সেই জন্য।

বাড়ীর রিসিভারের সাহায্যে পুলিশের শর্ট ওয়েভলেংথ্‌ সিগ্‌ন্যাল গ্রহণ করা অসম্ভব, অতএব পুলিশের সকল সংবাদই গোপন থাকে। পুলিশের রিসিভারগুলো ট্রান্‌স্‌মিটারের ওয়েভলেংথ হিসেবে ঠিক করে নেওয়া হয়,—এবং দশ পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর হারানো মানুষ, অপহৃত গাড়ী, পলায়নপর অপরাধী ইত্যাদির সংবাদে ইথার তরঙ্গ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

পুলিশ রেডিওর সাহায্যে অপরাধ অনুষ্ঠানের পরবর্ত্তী অতি প্রয়োজনীয় অর্দ্ধঘণ্টার আশা অপরাধীর মনে ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে যায়

যে ক্ষেত্র বিশেষে পুলিশ গিয়ে অপরাধ অনুষ্ঠান কার্য্যে ব্যাপৃত অপরাধীকেও হাতে হাতে ধরে ফেলেছে।

বৈদ্যের অসাধ্য ব্যাধি

দিন দিন চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্রুত ও দ্রুততর উন্নতি হচ্ছে, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি প্রতিদিন এমন সব রোগের আমদানি হচ্ছে যে জগতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরাও তার কোনও কিনারা করতে পারছেন না—এ কথাটাও ঠিক সমান সত্য।

লণ্ডনের বিখ্যাত হাঁসপাতালগুলিতে সহস্র সহস্র রোগীর মাঝখানে সহসা এমন একটি রোগী বা রোগিনীর আবির্ভাব হয় যাকে উপলক্ষ্য করে পৃথিবীর ভিষগাচার্য্যদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সাড়া পড়ে যায়। সম্প্রতি একটি বিলাতী পত্রিকায় কয়েকটি রোগীর ইতিহাস ছাপা হয়েছে। সেই প্রবন্ধ থেকে সার সঙ্কলন করে "মধুপর্কের" পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিলাম।

মাত্র কিছুদিন আগে একটি রোগিনী লণ্ডনের চিকিৎসকমণ্ডলীকে একেবারে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। অন্যান্য সকল বিষয়ে সে সাধারণের মতই, কিন্তু প্রত্যহ দিনের বেলা প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর সে তীব্র চীৎকার করে উঠত। প্রায় দু'মাস এই অদ্ভুত ব্যাধিতে ভোগার পরে তাকে হাঁসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চোখের সামনে বিভীষিকা দেখে ভয়ে মরতে মরতে কেউ যদি আর্ত্তনাদ করে ওঠে—এ চীৎকার তেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি ভয়াবহ। ছয় সেকেণ্ড চীৎকার করেই আবার সে নীরব হয়ে যেত—আবার পাঁচ মিনিট পরে তেমনি তীব্র চীৎকার। আরও মজা যে রাত্রে তার এই ব্যাধি সম্পূর্ণ সেরে যেত।

মান্‌চেষ্টারবাসী এক বিশেষজ্ঞ বহুবিধ পরীক্ষা করে বললেন যে দিনমানে কল-কারখানা-সঞ্জাত বৈদ্যুতিক তরঙ্গে বায়ুস্তর আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ কোনও বিশেষ ভাবে এই রোগিনীর চীৎকারের কারণ। সন্ধ্যায় যখন সমস্ত কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, তখন বায়ুস্তরে আর সে পরিমাণে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ থাকে না বলে তার চীৎকারও থেমে যায়। কিছুদিন নির্জ্জন স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করলেই রোগিনী আরোগ্য লাভ করবে। বিশেষজ্ঞের এই অভিমত শুনেও কিন্তু অন্য ভিষকেরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি।



প্রত্যহ সারাদিন প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এই মেয়েটি তীব্র আর্ত্তনাদ করে উঠত;—কেন?

গত মহাযুদ্ধে "শেল-শকে"র (Shell-shock) ফলে এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়েছে যাদের নাম আগে কেউ কখনও জানত না। শুধু বিলাতেই লক্ষাধিক লোক এই "শেল-শকে" চিররুগ্ন ও অথর্ব্ব হয়ে পড়েছে। এমনি একজন রোগীর কথা লণ্ডনের হাঁসপাতালের খাতায় পাওয়া যায়।

যুদ্ধের আগে সে বেচারা সামান্য একজন চাষী ছিল। যুদ্ধে "শেলে"র শব্দে তার স্নায়ুমণ্ডলী বিকৃত হয়ে সে যখন ছুটি পেয়ে বাড়ী ফিরল, কেউ জানল না কি দুরারোগ্য অদ্ভুত ব্যাধি তার সর্ব্বনাশ করেছে। তারপর বারবার যখন সে চুরির অপরাধে ধরা পড়তে লাগল, তখন বিশেষজ্ঞেরা মত প্রকাশ করলেন যে চুরি করতে চায় বলে সে চুরি করে না, না চুরি করে পারে না তাই চুরি করে। এই যে অদ্ভুত ব্যাধি এর নাম ক্লেপটোম্যানিয়া (Kleptomania)। এ রোগের কোনও ঔষধ নাই, রোগী হাতের কাছে যা পায় তাই চুরি করে, কী যে করে নিজেই জানেনা। চোর

বলে অবশ্য বেচারার সাজা হল না, তাকে আবদ্ধ করে রাখা হল উন্মাদ বলে।

লণ্ডনের একটি মোটর চালকের ইতিহাস আরও বিচিত্র। তিন বছর আগে "কোলিশনে" জখম হয়ে দিন কয়েক তাকে হাঁসপাতালে কাটাতে হয়েছিল। তারপর যখন সে বাড়ী ফিরে গেল সকলে ভাবল আর কোনও গণ্ডগোল নাই। কিন্তু তারপর থেকেই সে বেশীর ভাগ শয্যাশায়ী হয়ে থাকল, কি যে ব্যাধি কেউ বুঝতে পারল না। তিন বছর পরে ওয়েষ্টমিনষ্টার হাঁসপাতালে যখন তাকে ভালো করে পরীক্ষা করা হল, চিকিৎসকেরা শিউরে উঠলেন—রোগীর পাকস্থলী খুঁজে পাওয়া যায় না। যাঁরা তাকে পরীক্ষা করেন নি, এ খবর শুনে ভাবলেন নিছক গাঁজাখুরি। শেষে "এক্সরে" করে যা দেখা গেল তা' আরও অবিশ্বাস্য। তিন বছর আগে ধাক্কার ফলে তার পাকস্থলী নিজের স্থান ছেড়ে সোজা উপরে উঠে বুকের কাছে গিয়ে ঠেকেছে আর তখনও সেখানেই আটকে আছে। বিশেষজ্ঞদের সযত্ন অপারেশনের ফলে (একটি ফুস্ফুস্ নষ্ট হয়ে গেলেও) রোগী নিরাময় হয়ে বেঁচে আছে।

কিংস্ কাউন্টি হাঁসপাতালের ডাক্তারেরা একদিন একটি রোগিনীর পাকস্থলী অপারেশন করে কি পেয়েছিলেন শুনলে অবাক্ হতে হয়।

৫৮৪টি সরু পেরেক (চেয়ার বা কৌচের গদি আঁটতে ব্যবহৃত হয়)।

১৪২টি পিন্ (কার্পেট আঁটতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে)।

২টি মোটা পেরেক।

১টি বড় পেরেক।

৪৬টি ছোট স্ক্রু।

৬টি মাঝারি স্ক্রু।

৩০টি ছোট বোল্ট।

৪৭টি বড় বোল্ট্।

৩টি চাক্তি (nut)।

১টি হুকের আকারের স্ক্রু।

৩টি ছবির ফ্রেমের হুক্

২টি বড় সেফ্টিপিন্

১টি ছোট সেফ্টিপিন্।

১টি পেরেকের মাথা।

৮৩টি আলপিন্।

৯টি মাথা-ভাঙ্গা আলপিন্।

৫৯টি রকমারী কাঠ ও পাথরের হার।

৪ টুকরা তার।

৮৯ টুকরা কাঁচ।

১টি ভাঙ্গা পেয়ালার হাতল।

একরাশ পিন্ ও স্ক্রু বেঁধা বিনুনী পাকান এক গোছা চুলের দড়ি।

মোট ১২০৩টি জিনিষ।

রোগিনীর বয়স ৪০। তিনি স্বীকার করেছেন যে পাঁচ বছর আগে মাত্র সাতটি দিনের মধ্যে তিনি এই জিনিষগুলি গলাধঃকরণ করেছিলেন।

"কেন ?"—এর উত্তরে তিনি বলেছেন, "এম্নি"!!

আর একটি রোগিনীর কথা বলেই এ অদ্ভুত কাহিনী শেষ করব। এই রোগিনীর নাম "জ্যোতির্ম্ময়ী নারী" (Luminous woman)। Trieste-এ বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসকেরা এঁকে দেখেছেন। বিলাতী পত্রিকায় তাঁর বর্ণনা যেমন দেওয়া আছে, অবিকল তার অনুবাদ দিলাম —

"রোগিনী নিদ্রিতা, দেখে মনে হয় কোনই অসুখ নাই। মাথার কাছে ঝোলান চার্টে লেখা আছে বয়স ৪২, পুত্রকন্যা ১৬টি, এমন কি একটি নাতিও হয়েছে।

একঘণ্টা কিছুই হল না। তারপরেই রোগিনী অস্ফুট শব্দ করে উঠল। চিকিৎসকেরা উৎসুক হয়ে ঝুঁকে পড়লেন। হঠাৎ একটা আলোর রশ্মি তার হৃৎপিণ্ডের কাছ থেকে বিচ্ছুরিত হল। এ আলোয় তার মুখমণ্ডল আলোকিত হয়ে উঠল। ঘরের আধ-অন্ধকারের মধ্যেও এই আলোয় তার মুখ চোখ স্পষ্ট দেখা গেল। ঠিক একটি সেকেণ্ড তারপরই আলো অদৃশ্য হল। রোগিনী ছট্ফট্ করতে লাগল, ঘামে তার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হয়ে উঠল কিন্তু তবু ঘুম ভাঙ্গল না। আগে তার নাড়ীর গতি ছিল ৭০, এখন হল ১৪০। সারা ইটালীতে এখন মুখে মুখে এরই কথা। এর

শরীর থেকে আলোর ছটা বার হয়; এর মধ্যে কোনও বুজরুকী বা ভণ্ডামী নাই। বহুলোকে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছে, তিনজন চিকিৎসক খুব সাবধানে এ ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। রোগিনীর আর কোনও ব্যাধি নাই, শুধু হাঁপানিতে ভোগে। দিন-রাতে এই আলোর ছটা কয়েকবার বিচ্ছুরিত হয়। ছটা মাত্র ক্ষণকালস্থায়ী হয় ও আলো অন্তর্হিত হলেই রোগিনী কাতর শব্দ করে ওঠে। শুধু ঘুমন্ত অবস্থাতেই এই জ্যোতির আবির্ভাব হয় ও সময়ে সময়ে জ্যোতি এত তীব্র হয় যে ঘুম ভেঙ্গে রোগিনী বলে তার চোখ দুটো যেন অতি উজ্জ্বল আলোতে কে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।”

জাতি গঠনের উপদেশ

চীন দেশের প্রধান সেনাপতি চাং কাইসেক নানচাংএ তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে চীনাজাতির উন্নতি করতে হলে প্রত্যেক চীনার চরিত্র সুগঠিত করে তুলতে হবে। কি কি নিয়ম পালন করলে চরিত্র গঠনে সহায়তা হবে তার একটি তালিকা ছাপা হয়েছে। সেই পুস্তিকায় ৯৬টি নিয়ম আছে, এখানে মাত্র কয়েকটি দেওয়া হল।

১। ভদ্র-ভাবে বস্ত্র পরিধান করতে হবে।

২। ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে দৃষ্টিপাত করবে।

৩। খাবার সময় অসভ্যের মতন খেয়ো না।

৪। আপন আপন গৃহ ও ঘরগুলি পরিষ্কার রেখো।

৫। পথে চলতে চলতে সশব্দে আহার, ধূমপান বা গল্পগুজব কোরো না।

৬। মরণের সম্মুখীন হয়ে হেসো না।

৭। বাস্, ট্রেন বা ষ্টিমারে উঠবার সময় কখনও তাড়াতাড়ি করে ধস্তাধস্তি কোরো না।

৮। জুয়া খেলো না, আফিম সেবা কোরো না।

৯। বৃদ্ধ ও স্ত্রীজাতিকে সম্মানের চোখে দেখো।

১০। মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা কোরো, ভ্রাতা-ভগ্নীদের ভালোবেসো।

১১। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ কোরো ও বেশী রাত না করে শয্যায় আশ্রয় নিয়ো।

১২। মুখ ও হাত, মাজা ধুয়ে পরিষ্কার রেখো।

১৩। প্রত্যহ অবশ্য স্নান কোরো।

১৪। পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার রেখো ও ছিঁড়ে গেলে কালবিলম্ব না করে সেলাই করে নিয়ো।

১৫। মশা ও ইঁদুর দেখলেই সংহার কোরো।

১৬। রাজপথে নোংরা জিনিষ বা বাজে কাগজ-পত্র ফেলো না।

১৭। নিজের সদর দরজার কাছে বিশেষ করে পরিষ্কার রেখো।

১৮। যদি কাউকে কথা দাও কোনও বিশেষ সময়ে তার সঙ্গে দেখা করবে, যেমন করে পারো যথাসময়ে হাজির হতে ভুলো না।

গ্রামোফোন ডাক্তার

বিখ্যাত ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ভাসে (Vachet) গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে রোগীকে চিকিৎসা করার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেছেন। কি ভাবে এই অদ্ভুত আবিষ্কার হল তার কাহিনী অতীব কৌতুকপ্রদ। ডাক্তার ভাসের একটি রোগী গভীর মানসিক দৌর্ব্বল্য ও অকারণ আশঙ্কার জন্য তাঁর দ্বারা কিছুদিন চিকিৎসিত হয়ে রোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে দূরদেশে চলে যায়। বছরখানেক পরে ডাক্তার তার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলেন। রোগীটি লিখেছে যে যদিও সময়ে সময়ে তার মন বড়ই অবসন্ন হয়ে যায় ও চিত্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে তবুও তাঁর কথা ভেবে ও তাঁর উপদেশ স্মরণ করে সে নিজেকে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করে এবং পারেও।

তার কিছুদিন পরেই আর একখানি চিঠি এল। রোগীটি লিখেছে যে তার স্ত্রী পলায়িতা, সে রোগশয্যায় শয়ান—আর তার জীবনের কোনই আশা নাই। ডাক্তার ভাসের আশ্বাসপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে হয়তো বা এ যাত্রা তার প্রাণরক্ষা হতে পারে।

ডাক্তার ভেবে আকুল হলেন কেমন করে তাঁর রোগীকে আশ্বাস দেবেন। শেষে বহুচিন্তার পর কতকগুলি উপদেশপূর্ণ একটি গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরী করে তাকে পাঠিয়ে দিলেন। এইভাবে রেকর্ড পাঠান চলল, যতদিন না রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

এইভাবে যে চিকিৎসা-পদ্ধতির জন্ম হল তার নাম ফনোসাইকোথেরাপি (Phonopsychotherapy)

আর একজন বিখ্যাত চিকিৎসক (Dr. Casimir Radwan) পরীক্ষা করে বলেছেন যে গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে তিনি চিকিৎসায় বিশেষ সুফল পেয়েছেন। মত্তাসক্ত বা কুক্রিয়াপর রোগীকে একটি রেকর্ড-তৈরী-করার কলের সামনে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে যে মাদক দ্রব্য স্পর্শ করতে তার আর ইচ্ছা হয় না, কখনও হবে না—কোনও দিন সে আর নেশা করবে না—কু-অভ্যাস তার আর নাই, ইত্যাদি। তার এই কথাগুলি নিয়ে একটি রেকর্ড তৈরী হয়; যখনই তার চিত্ত বিকল হয়ে ওঠে ও নিষিদ্ধ আচরণ করতে প্রবল বাসনা হয় তখনই সে এই রেকর্ড বাজাতে আরম্ভ করে। নিজের গলার স্বরে এই প্রতিজ্ঞা নিজের কানে শুনে তার মন দৃঢ় হয়ে ওঠে, অসৎকর্ম্মে আর প্রবৃত্তি হয় না।

কারণ ছিল

ব্যারিষ্টার (প্রতিপক্ষের বুদ্ধিমান সাক্ষীকে জেরা করছেন)—"তুমি ঠিক বলতে পার যে এই লোকের সঙ্গে তোমার রাত্রি পৌনে ন'টার সময় সাক্ষাৎ হ'য়েছিল ?"

"হ্যাঁ—"

"তোমার মনে আছে রাত্রিটা ছিল গভীর অন্ধকার, রাস্তায় একটি লোক ছিল না, নিকটে কোনও ঘড়ি ছিল না, অথচ তোমার বেশ মনে আছে যে রাত্রি তখন পৌনে ন'টা! চমৎকার স্মরণশক্তি তোমার কিন্তু!—তুমি কি এই লোকের সঙ্গে কথা ক'য়েছিলে ?"

"হ্যাঁ—"

"কি কথা ক'য়েছিলে, তা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

"আমি বলেছিলাম, 'অনুগ্রহ করে' বলতে পারেন, ক'টা বেজেছে ?—"

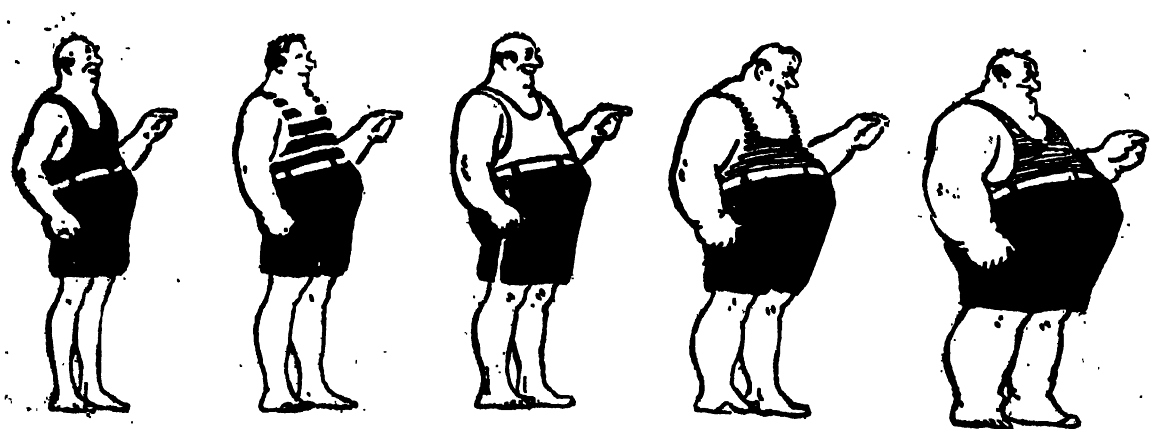
মুখের মতন

কোনও খুনী মোকদ্দমার আসামীর উকীল মৃতদেহ-পরীক্ষক ডাক্তারকে জেরা করছিলেন। বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টিতে চিকিৎসকের দিকে তাকিয়ে উকীল বললেন, "ডাক্তারদের কখনও কখনও ভুল হয়, নয় কি ?"

"হয় বৈকি! যেমন উকীলদেরও হয়।"

"কিন্তু ডাক্তারদের ভুলে নামতে হয় ছ'ফুট মাটির তলায়!—"

"হ্যাঁ, আর উকীলদের ভুলে ঝুলতে হয় ছ' ফুট মাটির উপরে।"



লোকটা ☞ কি-রকম মোটা দেখেচ ?

শ্রীআশীষ গুপ্ত

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ



দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বিদেশে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

বর্ত্তমান কালে কোন জাতিই, বাহিরের জনমতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া তাঁহাদের জাতীয়তার কোন দিকই গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন না। জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য এবং সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনুকূল বিশ্ব-জনমত অপরিহার্য্য। পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহ বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে, আত্ম-প্রচারের কার্য্য চালাইতেছেন, নিজদোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং নিজেদের কৃত নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের সমর্থনে বহু অদ্ভুত যুক্তি জগৎবাসীকে শুনাইতেছেন।

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানের অধিকার কয়েকটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী জাতি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। যে সকল স্থান কোন না কোন কারণে ইঁহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইতে পারে নাই, হয় যে সকল স্থানের বাণিজ্যিক স্বার্থ লইয়াই হউক, অথবা যে সকল স্থানের কোন রাজনীতিক বা অন্যবিধ প্রচেষ্টা ইঁহাদের সাম্রাজ্য বা প্রভুত্বের কোনপ্রকার ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, এই আশঙ্কাতেই হউক, যেই সকল স্থানের উপর ইঁহাদের পরোক্ষ প্রভুত্ব বা তাহাদের প্রতি ইঁহাদের ব্যবহার সম্বন্ধেও, এই সকল প্রভুস্থানীয় জাতিদের মধ্যে একটা রফা-নিষ্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। ইঁহাদের প্রত্যেকেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা-সচেষ্ট আছেন বলিয়া বুদ্ধি বা শক্তির বলে অপরের-প্রাপ্ত অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিতে কেহই পশ্চাৎপদ হন না। পরস্পরের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করা সব সময় সম্ভব হয় না। এই জন্য অপরকে কোন অসুবিধাজনক কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে সকলকেই মুখে ন্যায় ও ধর্ম্মের কথা বলিতে হয় এবং নিজেরাও এইপ্রকার কোন অন্যায় কার্য্য করেন না এইরূপ দেখাইতে হয়। ইঁহাদের আত্মপ্রচারের ইহাই একটা প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষের অবস্থা এবং ভারতবাসীদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য যাহাতে বিশ্বের সর্ব্বত্র লোকে জানিতে পারে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার বর্দ্ধিত দায়িত্ব আমাদের আছে। স্বাধীন জাতিদের বিরুদ্ধে কাহারও নিন্দা রটাইবার সুবিধা নাই, কাজেই, মিথ্যা নিন্দার প্রতিকারের চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হয় না। কিন্তু, আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিলে লোকে আমাদের সম্বন্ধে যে শুধু কিছু জানিবে না, তাহা নয়, নানাপ্রকার অদ্ভুত মিথ্যা ধারণা করিবে।

বাহিরে ভারতবর্ষের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইলে, বিদেশে ভারতবাসীরা অধিকতর সম্মান ও মর্য্যাদা পাইবেন, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির সমাদর হইবার পথ অধিকতর সুগম হইবে।

ইহাত গেল আমাদের জাগতিক লাভের কথা। অন্যদিকে, ব্যক্তিহিসাবে আমরা যেমন জনসমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা চাই, জাতিহিসাবেও তেমনই আমরা পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে সম্মান ও গৌরব চাই। মানুষের এই নিতান্ত স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার কথাও আমরা ভুলিতে পারি না; এবং অন্য কোনও লাভের আশা না থাকিলেও শুধু এইজন্যও আমরা বাহিরে ভারতবর্ষের প্রচার চাহিতাম।

বিদেশে ভারতের কথা প্রচারের জন্য পরলোকগত প্যাটেলের দান

পরলোকগত শ্রদ্ধেয় বিঠলভাই প্যাটেল তাঁহার উইলে, ভারতবর্ষের রাজনীতিক উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবার জন্য, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর হস্তে একলক্ষ পনের হাজার টাকা সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই অর্থ, শ্রীযুক্ত বসু অথবা তাঁহার মনোনীত কোন ব্যক্তির দ্বারা, শ্রীযুক্ত বসুর পরামর্শানুসারে, ভারতের রাষ্ট্রিক উন্নতির জন্য, বিশেষভাবে, ভারতের কথা বিদেশে প্রচারের জন্য ব্যয়িত হইবে।

যাঁহারা হট্টগোলের পশ্চাতে থাকিয়া দেশের জন্য অনেক করিয়াছেন ও অনেক ভাবিয়াছেন, নিজেদের অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভার বলে জাতীয় মর্য্যাদাকে অনেকখানি বাড়াইয়া গিয়াছেন, শ্রদ্ধেয় প্যাটেলের নাম তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে করা যাইতে পারে। যে সময় ইনি আইন-পরিষদের সভাপতি ছিলেন, সে সময় দেশের কাজের জন্য মহাত্মার হাতে অনেক টাকা দিয়াছেন। দেশের জন্য তাঁহার বর্ত্তমান ও শেষ দান দেশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতির পরিচয় দিতেছে।

জীবনের শেষ কয়দিন, নিতান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া বিদেশে থাকিবার সময়, বিদেশে ভারতের কথা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই সময়। যদিও, সুভাষবাবু দেশে থাকিবার সময়, নানাকারণে, বাংলার বাহিরে তাঁহার যোগ্যতা ও ত্যাগের প্রকৃত আদর হয় নাই, তবুও, তাঁহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে প্যাটেলের বিলম্ব হয় নাই।

প্যাটেল মহাশয় আমেরিকায় ভারতের কথা প্রচার করিবার জন্য যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বিভিন্ন প্রতিপত্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট নাগরিকগণের নিকট হইতে যে সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কৌতূহল জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ভারতহিতৈষী বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত জে, টি, সাণ্ডারল্যাণ্ডের এই সম্পর্কীয় উক্তি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা চিরদিন গৌরবের সহিত স্মরণ করিবেন। ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি এখানে অন্যূন আশিটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সার জন সাইমন, মিঃ চার্চ্চহিল, লর্ড মেষ্টন প্রভৃতি ব্রিটীস রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃগণ আমেরিকায় ভারতবিষয়ক বক্তৃতা করিবার পর প্যাটেলের কার্য্য ফলপ্রসূ হইয়াছিল এবং তাহার মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত নরিম্যানের মারাত্মক ভুল

বোম্বাই কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কে, এফ, নরিম্যান তাঁহার অভিভাষণে লর্ড সিংহকে বিহারের সন্তান বলিয়াছেন। তাঁহার এই ভুল অনিচ্ছাকৃত ও অজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি, বিহারের প্রশংসা করিতে গিয়া, বাংলাকে ছোট করিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। কিন্তু তবু তাঁহার এই ভ্রমাত্মক উক্তির জন্য সুনামের দিক দিয়া বাংলার ক্ষতি হইল। শ্রীযুক্ত নরিম্যানের মত লোক যখন জানেন না যে, লর্ড সিংহ বাঙ্গালী ছিলেন, তখন তাঁহার বক্তৃতার বহু সহস্র শ্রোতা এবং তদপেক্ষা অনেকগুণ অধিক সংখ্যক পাঠকের অনেকেই যে তাহা জানেন না, এ কথা মনে করা যাইতে পারে। তাঁহারা একজন প্রামাণ্য লোকের নিকট হইতে লর্ড সিংহকে বিহারের লোক বলিয়া জানিলেন। এই ভুল সহসা তাঁহাদের ভাঙ্গিবার সুযোগ হইবে না। কোন কোন কাগজে হয়ত ইহার প্রতিবাদ বাহির হইবে; কিন্তু, অনেকের কাছে ইহার একখানিও পৌঁছিবে না এবং যাঁহাদের নিকট পৌঁছিবে তাঁহারাও, এই অভিভাষণ যত আগ্রহের সহিত শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন, তাহা তত আগ্রহের সহিত নিশ্চয় পড়িবেন না।

বাঙ্গালীদের অগ্রবর্ত্তিতা, ভারতীয় জাতিগঠনে তাঁহাদের অসামান্য দান, এবং অন্যান্য প্রদেশের ও গণজীবন গঠনের উপর তাঁহাদের অবিলোপনীয় প্রভাব, তাঁহাদের বিরুদ্ধে ঈর্ষার উদ্ভব করিয়াছে। বাঙ্গালীদের এই দানের কথা বঙ্গেতর ভারত সম্পূর্ণভাবে ভুলিতে চাহিতেছে। বাংলার বর্ত্তমান সমস্যা ও নেতৃবর্গ সম্পর্কেও এই উপেক্ষা নানা ব্যাপারের মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের অভিভাষণেও, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রতি সঙ্গত সহানুভূতি প্রকাশ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের নাম সামান্য মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে; যদিও কোন নেতা অপেক্ষাই তাঁহার দেশ-প্রেম, দেশ-সেবার অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস, দেশের জন্য ত্যাগ ও বহুবিধ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার যোগ্যতা ও রাজনীতিক দূরদর্শিতা কিছুমাত্র কম নহে।

যাহা হউক, যে সকল পরলোকগত বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নামের সহিত আমাদের জাতীয়তার ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত রহিয়াছে, কাহারও ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তাঁহাদের বাঙ্গালীত্ব যাহাতে না মুছিয়া যায়, তাহার প্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বাংলার সংবাদপত্র ও বাংলা

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বাঙ্গালীর স্থান যে কতটা নগণ্য হইয়া পড়িয়াছে, নিখিল ভারতীয় কোন অনুষ্ঠানের সময় তাহা বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। কংগ্রেসের অধিবেশন আমাদের সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যত শিক্ষিত লোকের একত্র সমাবেশ হয়, এই সময়ের ঘটনাবলী যত লোকে আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকেন, এখানে গৃহীত প্রস্তাব, মত, নীতি বা কর্ম্মপন্থা প্রতি প্রদেশের উপর যতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, অন্য কোন ঘটনা বা ব্যাপারে তাহার সামান্য অংশমাত্রও সম্ভব হয় না। অথচ, এই যে কংগ্রেস হইয়া গেল, ইহার কার্য্য-বিবরণী হইতে কেহ বুঝিতে পারিবেন না যে, সমগ্র ব্রিটীশ ভারতের মোট জনসংখ্যার সার্দ্ধ পঞ্চমাংশ লোক অধ্যুষিত বাংলা বলিয়া একটা প্রদেশ আছে, বাংলার যুবকদের মধ্যে বিপ্লববাদের প্রসার ব্যতীত বাংলার আর কোন সমস্যা আছে বা পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর প্রতিনিধিদের এখানে বলিবার মত কোন কথা আছে। এজন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য প্রদেশের নেতাদের আমরা দায়ী করি না, সুযোগ্য শক্তিশালী নেতার অভাব এবং আমাদের শোচনীয় গৃহবিবাদই ইহার জন্য দায়ী।

কিন্তু, বাংলার সংবাদপত্রগুলিও এসম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না। বাঙ্গালী প্রতিনিধিরা সামান্য যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহার বিবরণ বাংলার কাগজগুলিতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। অন্য প্রদেশের নেতাদের বহু প্রকারের চিত্র বহুভাবে বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে। আর বাঙ্গালীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ব্যতীত আর কাহারও চিত্র চোখে পড়িল না। তাহাও অন্যান্য নেতার চিত্রের ন্যায় প্রাধান্য পায় নাই। সম্ভবতঃ বাঙ্গালী প্রতিনিধিদের ভালভাবে ছবি লইবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বাংলার পরলোকগত কংগ্রেসনেতাদের ছবি এবং তাঁহাদের বক্তৃতা ও লেখা হইতে সময়োপযোগী অংশ সমূহ তুলিয়া দিয়া বাংলার গৌরবের কথা ইঁহারা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারিতেন।

রাজনীতিক গণ্ডীর বাহিরে হইলেও, রবীন্দ্রনাথের মাদ্রাজ গমনের মূল্য বাংলা বা মাদ্রাজ কোন প্রদেশের পক্ষেই উপেক্ষনীয় নহে। কিন্তু, তিনিও যে বাংলার কাগজে উপযুক্ত প্রাধান্য পাইয়াছেন, এমন মনে হইল না।

কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক না থাকিলেও, এই সময় অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বিরোধী বৈঠকের সভাপতি তবু একজন বাঙ্গালী হইয়াছিলেন। কিন্তু, রামানন্দ বাবুর বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ অনেক কাগজেই ঠিক সময়ে বাহির হয় নাই। ইঁহার বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিয়া ও ইঁহার কতকটা দীর্ঘ আলোচনা করিয়া ইঁহাকে আর গুরুত্ব ও গৌরব দিলে ভাল হইত। সর্ব্বক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা কোণঠাসা হইতেছেন বলিয়াই সকল দিকে আত্ম-রক্ষার জন্য সজাগ হইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

কংগ্রেস সোসালিষ্ট সম্মিলন

কংগ্রেস সোসালিষ্ট দলের জন্ম অধিক দিন না হইলেও তাঁহারা যে বিশেষ শক্তি ও প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্পর্কে কংগ্রেস মহলে যে উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা হইতেই তাহা বুঝা গিয়াছে। তাঁহাদের নিখিল ভারতীয় সম্মিলনও তাঁহাদের শক্তির পরিচায়ক এবং এখানে

গৃহীত প্রস্তাবাবলী তাঁহাদের সঙ্কল্পের স্পষ্টতার প্রমাণ ও কর্ম্মপন্থার গতি নির্দ্দেশক। অবশ্য ইঁহাদের বর্ত্তমানের সাফল্যই ইঁহাদের শক্তির একমাত্র পরিচয় নয়। কারণ, আমাদের রাষ্ট্রিক চিন্তার ইহাই বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সর্ব্বশেষ ধাপ ও উগ্রতম মত। ইহার সমর্থকেরা অধিকাংশই তরুণ এবং রাজনৈতিক মনোভাববিশিষ্ট তরুণদের মধ্যে এই মত দ্রুত ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে। কাজেই, সম্ভবতঃ এই দলই ভবিষ্যতে দেশের সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হইবেন।

মানুষে মানুষে গুণ ও শক্তির পার্থক্য চিরদিনই থাকিবে কিন্তু, সেজন্য সুখ সুবিধা পাইবার পক্ষে বৈষম্যমূলক কোনও পদ্ধতি ন্যায় ও সভ্যতানুমোদিত নহে। সমাজের আদিম অবস্থায়, জগতে দুর্ব্বলের স্থান ছিল না; যে দেশে রাষ্ট্র সুব্যবস্থিত নহে, সেখানে মানুষ গায়ের জোরের সুযোগে দুর্ব্বলকে বঞ্চিত করে তাহার উপর লুণ্ঠন চালায়। এ অবস্থায় যোগ্যতমই মাত্র প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু, সমাজের আদর্শ হইতেছে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা; কাহারও গায়ে বেশী জোর আছে বলিয়া, দুর্ব্বলের উপর যাহাতে সে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারে তাহার উপায় বিধান করা। গায়ের জোরের অভাবে যাহাতে কেহ বিপন্ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা সব সভ্যসমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ। কাহারও অন্যপ্রকার দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণও সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। কিন্তু, বিদ্যার বলে, বুদ্ধির বলে বা কোনও প্রকার শিক্ষা বা সুযোগের বলে অন্য দশজন অপেক্ষা যখন আমরা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করি, অন্যান্য লোকের উপর প্রভুত্ব করিতে পারি, তখন সমাজ তাহা নিন্দার চক্ষে দেখে না। যদিও, ইহাও লোকের কোন না কোন দুর্ব্বলতার সুযোগ করা, এবং কোন আদর্শ রাষ্ট্রে এই সুযোগ গ্রহণ করিবার সুবিধা না থাকাই উচিত।

কিন্তু, এই অবস্থাসাম্য কি করিয়া লাভ করা যাইবে। জনসাধারণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের যে বৈষম্য রহিয়াছে অন্য কোন প্রকারে তাহার সমন্বয় সাধন সম্ভব না হইলে, বিরোধ অবশ্যই অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে পারে এবং এই সম্মিলনের অভিমতে সেই বিরোধ রোধ করিবার উপায় নাই। কিন্তু, আমরা পূর্ব্ব আলোচনায় দেখাইয়াছি, এই প্রকার বিরোধের মধ্যে না যাইয়াও এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। পল্লী অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা দ্বারা মহাজন ও জমিদারদিগের হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করা অসম্ভব নহে। যদি তাহা অসম্ভব না হয় তাহা হইলে, অকারণ ক্ষতি ও অপব্যয়ের ঝুঁকি লইয়া শ্রেণী-বিরোধ জাগ্রত করা অথবা যাহাতে শ্রেণী-বিরোধ জাগ্রত হয় এমন কোন কার্য্য করা উচিত হইবে কিনা, সর্ব্বপ্রকার ধৈর্য্যহীনতা ও কোন মতের প্রতি অন্ধ গোঁড়ামির কথা বাদ দিয়া তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার।

দ্বিতীয় কথা, আমরা এখনও ধর্ম্মগত দল হিসাবেই রাজনীতিকে দেখিতেছি। অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোকেই জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবিতে পারিতেছেন না, হিন্দুর স্বার্থ কিসে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, মুসলমানের স্বার্থ কিসে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা লইয়াই কাড়াকাড়ি চলিতেছে। কোন কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে, ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে জনসাধারণকে উত্তেজিত করা সম্ভব হইলেও, এই জনসাধারণকে কোন রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাওয়া যাইবে না। জনসাধারণের অধিকাংশই সম্ভবতঃ নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক নেতাদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িবেন।

জনসাধারণের উন্নতির জন্য ইঁহারা যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই, কার্য্যে পরিণত হইলে, দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহা সব কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে, জনসাধারণেরও সহযোগিতা চাই এবং সহযোগিতা লাভ করিতে হইলে, শুধু আর্থিক দুঃখ নহে, অজ্ঞতার দুঃখ, অসম্মানের দুঃখ, স্বাস্থ্যহীনতার দুঃখ, বিচ্ছিন্নতার দুঃখ দূর করিতে হইবে। কোন একটা রাজনৈতিক আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া, ইঁহাদের মধ্যে কাজ করিয়া সফলতা লাভ করা যাইবে কিনা, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। মহাত্মার উপর সোস্যালিষ্টদের সম্ভবতঃ বিশ্বাস নাই, যদিও জনসাধারণের জন্য তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারের দুঃখ

দূর করিবার জন্ত তাঁহার স্তায় এতটা কাজ, এতটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি আর কেহ করিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও, মহাত্মার একটি উক্তিকে আমরা এই প্রসঙ্গে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। তিনি গত কংগ্রেস অধিবেশনের সময় প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছেন, "দরিদ্র পল্লীবাসীদের মানুষ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে রাষ্ট্রনীতিবিদ্ করিয়া তুলিবার চেষ্টা খুবই ভুল হইবে।"

আমরা যখনই পল্লীবাসীদের কথা ভাবিতেছি, তখনই আমাদের সম্মুখে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত থাকিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা 'মানুষ' হইয়া উঠিতে পারিলে, যদিও তাহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্তই সাধিত হইবে এবং ইঁহারা মানুষ হইয়া উঠিতে না পারিলে যে আমাদের মুক্তি সম্ভব হইবে না, সে-কথা সত্য হইলেও, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যদি তাঁহাদের বিশেষ আদর্শ ও মতের জন্ত ইঁহাদের লইয়া টানাটানি আরম্ভ করেন তবে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্তের অভিমুখে ইঁহাদের লইয়া যাওয়া হইলেও, 'মানুষ' হইয়া উঠিবার পথ তাহাতে প্রশস্ত হইবে না।

দেশে আজ এমন একদল দৃঢ়চিত্ত সেবাপরায়ণ যুবক দরকার, যাঁহারা অন্ত সব স্বার্থ বা গৌণ উদ্দেশ্ত বাদ দিয়া জনসাধারণের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে পারেন।

কংগ্রেসে হিন্দীর অত্যাচার

নিখিল ভারতীয় কোন ব্যাপারের জন্ত যখন সময় ও অর্থ নষ্ট করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কোন স্থানে বহু লোকের সমাগম হয় তখন, উদ্দিষ্ট কার্য্য যাহাতে ভালভাবে সম্পন্ন হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। কিন্তু, মূল কার্য্যের ক্ষতি হইতে পারে এমন ভাবে কোন গৌণ উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত যদি একদল লোক জবরদস্তি করিতে থাকেন তবে তাহা বিশেষভাবে নিন্দনীয়। ভারতের সকল প্রদেশ হইতে নেতারা বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্ত সমবেত হইয়াছিলেন। এখানে সকল প্রদেশের লোকেরই বলিবার মত কথা ছিল, অন্ততঃ থাকা উচিত ছিল, এবং সকলেরই সে সব শুনিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন ছিল। এখানে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই, না হইলেও অধিকাংশই, ইংরাজী জানিতেন, এবং অহিন্দী-ভাষী খুব কম লোকই সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিবার মত, মত প্রকাশ করিবার মত, তর্ক আলোচনাদি চালাইবার মত হিন্দী জানিতেন। কংগ্রেসের কাজ-কর্ম্ম বক্তৃতাদি হিন্দীতে চালান উচিত এই নীতি মানিয়া লইয়াও (যদিও এই নীতি সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি না) ইংরাজীতে কাজ চালান যাইতে পারিত। হিন্দী অত্যাবশ্তক বলিয়া বিবেচিত হইলে, ইংরাজী বক্তৃতার হিন্দী অনুবাদের ব্যবস্থা রাখা যাইত। হিন্দীভাষা কংগ্রেসে ভারতের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও অন্ত ভাষায় বক্তৃতাদি করিবার আইনগত বাধা নাই। কিন্তু, হিন্দী ব্যতীত অন্ত কোন ভাষায় কেহ বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করিলে, দর্শকেরা হিন্দী হিন্দী বলিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অন্তান্ত বারের কংগ্রেসেও এই প্রকারের ঘটনা ঘটিয়াছে। হিন্দীভাষীরা যদি মনে করিয়া থাকেন গলার জোরেই হিন্দীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, তাহা হইলে, তাঁহারা খুব ভদ্রোচিত ভাল পথ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ জবরদস্তি লোকের শুধু বিরক্তি এবং বিতৃষ্ণাই উৎপাদন করিবে।

কংগ্রেস সভ্যদিগের আবেদনপত্রে হিন্দীতে নাম স্বাক্ষরের যে নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাকেও আমরা এক প্রকারের অন্তায় জবরদস্তি বলিয়া মনে করি। প্রথম কথা হিন্দী ভারতের সাধারণ ভাষার স্থান পাইবার দাবী আছে কিনা, তাহা গুরুতর সন্দেহের বিষয়। ইংরাজী আমাদের শিখিতে হইতেছে এবং হইবে। বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিবার কাজ হিন্দীর দ্বারা হইবে না। এ অবস্থায় এবং অন্ত নানা কারণে (যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে) ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হিসাবেও ইংরাজীর ব্যবহার ত্যাগ করিতে যাওয়া সমীচীন হইবে কিনা, তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য।

হিন্দীগ্রহণ যদি ভালও হয়, তাহা হইলেও, শুধুমাত্র যাঁহারা নিখিল ভারতীয় ব্যাপার সমূহ লইয়া কারবার করিবেন, তাঁহাদের পক্ষেই ইহা অবশ্ত শিক্ষণীয় হইতে

পারে। আর কাহারও উপর জোর করিয়া চাপাইতে যাওয়া ঠিক হইবে না।

তদ্ব্যতীত, হিন্দী না শিখিয়া, হিন্দী জানার প্রমাণ স্বরূপে আবেদনপত্রে হিন্দীতে নাম লিখিয়া দিলে, তাহাতে কতকটা প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইহাতে যে লোকের হিন্দী শিখিবার আগ্রহ বাড়িবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। হিন্দী কথা বলিবার এবং হিন্দী কথা বুঝিবার এবং হিন্দী কথা বলিবার মত হিন্দীর জ্ঞান না থাকিলে, তাহা কিছুমাত্র কাজে লাগিবে না—শুধু কিছুদিন পরে, ভারতবর্ষের সব প্রদেশের বহু লোকই অল্পবিস্তর হিন্দী জানেন এবং ফলে সহজেই ইহা ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে আর কোন বাধা নাই, তাহারই প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে।

নিখিল ভারত পল্লী শিল্প সঙ্ঘ

কংগ্রেসের গত অধিবেশনে পল্লী অঞ্চলের লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধারের ও ম্রিয়মাণ শিল্পসমূহকে দানের নিমিত্ত 'নিখিল ভারত পল্লী শ্রমশিল্প সংঘ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই সংঘ পল্লীর অধিবাসীদের শারীরিক উন্নতি বিধানের জন্যও চেষ্টা করিবেন।

উক্ত পল্লী শিল্প সংঘের কার্য্য কংগ্রেসের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইলেও, প্রস্তাবানুযায়ী কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যের সহিত ইহার কার্য্যের কোন সম্পর্ক থাকিবে না, এবং সংঘের আইন কানুন সংঘ নিজেই প্রণয়ন করিবেন। মহাত্মাজীর উপদেশানুযায়ী শ্রীযুক্ত জে, সি, কুমারাপ্পা এই সংঘ গঠন করিবেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয় মূল প্রস্তাব হইতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না এই অংশটুকু উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত এবং এই সংঘের উপর কংগ্রেসের কর্তৃত্ব থাকিবে এই মর্ম্মানুযায়ী একটি সংশোধক প্রস্তাব বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে ও কংগ্রেসের পূর্ণ প্রকাশ্য অধিবেশনে আনয়ন করেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার বলেন, অন্যান্য দেশের শিল্পসমূহের উন্নতি রাজনীতির আওতায় হইয়াছে। সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত মজুমদার ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, যে-সকল দেশের শিল্পের উন্নতি রাজনীতির আওতায় হইয়াছে সে সকল দেশ স্বাধীন এবং সে সকল দেশের রাজনীতির অর্থ স্বদেশী গবর্ণমেণ্টের উন্নতি সাধন। কিন্তু, আমাদের দেশে রাজনীতিক আন্দোলনের কালে পদে পদে গবর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধিতায় নিযুক্ত হইতে হয়। ফলে, কংগ্রেসের রাজনীতির সহিত এই সংঘের সম্পর্ক থাকিলে, যখনই কংগ্রেসের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন বিরোধ উপস্থিত হইবে তখন, এই সংঘের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে,—এমন কি যদি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংঘ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না। কিন্তু, এদিকে পল্লীবাসীদের আর্থিক দুরবস্থা এতদূর চরমে পৌঁছিয়াছে যে, দেশ স্বাধীন হউক, বা না হউক, আর্থিক স্বচ্ছলতা যাহাতে অচিরেই ফিরিয়া আসে, তাহার চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে।

সোসালিষ্ট দলের শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ সংঘ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের রাজনীতি ব্যতীত আর কোন দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত নহে; দেশ স্বাধীন হইলেই সকল দিকে দৃষ্টি দিবার সময় কংগ্রেস পাইবে। কিন্তু, দেশ স্বাধীন কিরূপে হইবে তাহা জয়প্রকাশ নারায়ণ বোধ হয় চিন্তা করেন নাই। গত আন্দোলনের বিফলতার একটি মূল কারণ (যাহা আমরা বহুবার বলিয়াছি)—আন্দোলনের সহিত জনসাধারণের কোন সম্পর্ক না থাকা। স্বাধীনতার জন্য যে জাতীয় আন্দোলনই হউক না কেন, তাহার সহিত দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের যোগ আবশ্যক। কিন্তু, নানাপ্রকার অভাব ও দৈন্যের দ্বারা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের জীবন এত পীড়িত যে, তাঁহাদের ঐ সকল অভাব ও দৈন্য মোচনের চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ করিতে হয়;—স্বাধীনতার কথা ভাবিবার বা স্বাধীনতা আইনের চেষ্টা করিবার সময় তাঁহাদের কোথায়। এতদ্ভিন্ন দেশের শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় তাঁহাদের যাবতীয় দুঃখদৈন্যের জন্য গবর্ণমেণ্টকে দায়ী না করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে দায়ী করেন। অথচ, এই সকল শ্রেণীর সহিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কোন যোগ না থাকায়, তাঁহাদের স্বপক্ষীয় কথা ঐ সকল শ্রেণীকে

বলিতে পারেন না। যদি বর্ত্তমানে শুধুমাত্র স্বাধীনতা অর্জ্জনই কংগ্রেসের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলেও দেশের জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের জন্য, দেশের চারিত্রিক, মানসিক ও আর্থিক দৈন্য মোচনের আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা, সর্ব্বশ্রেণীর বিশ্বাস অর্জ্জনের চেষ্টা করাই কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইবে। বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল মূল প্রস্তাব হইতে 'লুপ্ত ও ম্রিয়মাণ শিল্পসমূহ' এই অংশটুকু উঠাইয়া দিবার জন্য, একটি প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। ডাঃ সান্যাল প্রস্তাব কেন আনিয়াছিলেন, তাহা খবরের কাগজের প্রকাশিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় না। তবে, ডাক্তার সান্যালের প্রস্তাব যে খুব সমীচীন হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য পল্লীবাসীগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন, এবং উন্নতি সাধনের একমাত্র পথ পল্লীসমূহে শ্রমশিল্পের প্রবর্ত্তন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু, যে সকল শিল্প আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল বা মৃতপ্রায় অবস্থায় চলমান আছে, কেবলমাত্র তাহাদের পুনরুদ্ধার ও উৎসাহ প্রদান দ্বারাই যে এ অবস্থার প্রতিকার হইবে, ইহা আমরা মনে করি না। স্থান ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া, নূতন নূতন শিল্প প্রবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা সংঘের থাকা উচিত। যে সকল শিল্প লুপ্ত হইয়াছে তাহাদের লুপ্ত হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হইতেছে, ঐ সকল শিল্প দ্রব্যাদির যথেষ্ট চাহিদা না থাকা। পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের রুচির, জীবনযাত্রা প্রণালীর ও আদর্শের পরিবর্ত্তন যথেষ্ট ঘটিয়াছে। কাজেই বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিল্পের পরিবর্ত্তে শুধুমাত্র পুরাতন শিল্পের পুনরুদ্ধার করিলে, তাহার সকলগুলির কাটতি নাও হইতে পারে।

শিল্পজাত পণ্যাদির চাহিদা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা, বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা, ও একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে সংঘ সচেষ্ট হইবেন কিনা, তাহা প্রস্তাবে বলা হয় নাই। তবে, প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে, সংঘের এ সকল দিকেও দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন হইবে। বস্তুতঃ এ সকল দিক অবহেলা করিলে, সমস্ত সাধু উদ্দেশ্য বিফল হইবে।

কংগ্রেস যে সকল প্রতিনিধি ব্যবস্থা পরিষদ প্রভৃতিতে প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যদি গবর্ণমেণ্টকে সংঘের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য চাপ দিতে পারেন, তাহা হইলে, কার্য্যে খুব সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

মুর্শিদাবাদের পক্ষ হইতে ডাঃ সান্যাল প্রভৃতি যে সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার সদুত্তর বা প্রতিকারের সন্তোষজনক আশ্বাস পাওয়া যায় নাই।

মহাত্মাজীর কংগ্রেস ত্যাগ

কংগ্রেসের বর্ত্তমান অধিবেশনের পূর্ব্বেই মহাত্মাজী কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার সংকল্প করিলেও অন্যান্য নেতার অনুরোধে আলোচ্য অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত ছিলেন। বর্ত্তমান অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের সহিত মহাত্মাজীর সংযোগ ছিন্ন হইল।

গত ১৫ বৎসর কংগ্রেসের ভিতর থাকিয়া মহাত্মাজী রাজনৈতিক অগ্রগতি ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে দেশকে এতটা আগাইয়া দিয়াছেন যে, তাহার তুলনা ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি যে তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে দেশের সেবা করিয়া এতটা সাফল্য লাভ করিতে পারেন, তাহা মহাত্মাজীর দেশ সেবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অচিন্ত্যনীয় ছিল। সুতরাং কংগ্রেসের সহিত মহাত্মাজীর বিচ্ছেদ গভীর দুঃখের। কিন্তু, কতটা ক্ষতিকর তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার।

মহাত্মাজীর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কংগ্রেস তাহার বর্ত্তমান গুরুত্ব অনেক পরিমাণে হারাইতে পারে এবং বিদেশে ইহার যাহা কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহারও হানি হইতে পারে।

তবুও, মহাত্মাজীর কংগ্রেস ত্যাগের ফলে, কংগ্রেসের যে পরিমাণ ক্ষতি হইবে অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে ক্ষতি হয়ত তদপেক্ষা অনেক কম হইবে। গত দেশব্যাপি আন্দোলনের ফলে দেশের ভিতর যে নির্জীবতা ও অবসাদ আসিয়াছে, তাহাতে গত আন্দোলনের মত বা তাহা অপেক্ষা ব্যাপক কোন আন্দোলন শীঘ্র সম্ভব হইবে না।

এদিকে এক কাউন্সিল প্রবেশ ভিন্ন অপর কোন কার্য্য

কংগ্রেস করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই। বস্তুতঃ ব্যবস্থাপক সভাগুলির ভিতর দিয়া গত আন্দোলনের পূর্ব্বে স্বরাজ্যদল যে কার্য্য করিতেছিলেন, বর্ত্তমান কংগ্রেসও পার্লামেন্টারি বোর্ডের ভিতর দিয়া তাহাই করিবেন। এতদতিরিক্ত রাজনীতিক আন্দোলনের দিক দিয়া কিছু করিবেন বলিয়া কংগ্রেস ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং মহাত্মাজী কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া যাহা করিবেন, কংগ্রেসের ভিতর থাকিলেও তাঁহাকে তাহাই (হরিজন উন্নয়ন এবং দেশের লুপ্ত শিল্পের উদ্ধারের চেষ্টা) করিতে হইত। বরং রাজনীতিক উত্তেজনার বাহিরে থাকিয়া তাঁহার কাজ করিবার সুবিধা হইবে। কাজেই, প্রকৃত কাজের কোন ক্ষতি হইবে না তবে, নামের দিক দিয়া কংগ্রেসের কিছু ক্ষতি হইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, কংগ্রেসের ভিতর থাকিলে হয়ত মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ অনুসারে কংগ্রেস কোন নূতন রাজনীতিক কার্য্যধারা অবলম্বন করিতে পারিতেন। কিন্তু, মহাত্মাজীর আদর্শ ও বিশ্বাস অনুসারে কোন অন্যায়ের প্রতিকারের সত্যাগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন পথ, তাঁহার পক্ষে অবলম্বন করা অসম্ভব। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সত্যাগ্রহ যে অচল তাহা মহাত্মা নিজেই বলিয়াছেন।

যখন দেখা গেল মহাত্মাজীর কংগ্রেস ত্যাগে কংগ্রেসের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ কংগ্রেসের ভিতরের অনেকে মনে করিতেছেন, মহাত্মাজী তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি, বিচার শক্তি ও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার শক্তিকে পঙ্গু করিতেছেন, তখন মহাত্মাজীর পক্ষে কংগ্রেস ত্যাগ সমীচীন হইয়াছে। কারণ, মহাত্মাজী দেশের সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব জাগরণ আনিয়া দিলেও, দেশকে যথেষ্ট অগ্রবর্ত্তী করিলেও, তিনি সকলের বিচার শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া, নিজের ইচ্ছানুযায়ী যাহা করিবেন, একমাত্র তাহাতেই দেশের মঙ্গল হইবে একথা বলা চলে না। মহাত্মাজীর কংগ্রেস ত্যাগে দেশের প্রতি ও ন্যায়ের প্রতি মহাত্মাজীর নিষ্ঠা আরও উজ্জ্বলতর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

পুনরায় যখন কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন, তখন যে মহাত্মাজীর পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাইবে, এ আশ্বাস মহাত্মাজী নিজেই দিয়াছেন। কংগ্রেসের কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিয়াও কংগ্রেসকে সাহায্য করিতে মহাত্মাজী স্বীকৃত হইয়াছেন।

বঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

কংগ্রেসের পরিবর্ত্তিত নিয়মানুসারে বঙ্গে নগরের, জনসংখ্যানুপাতে প্রাপ্য সংখ্যা অপেক্ষা, ১১ জন অধিক সদস্য প্রেরণের অধিকার রহিল। অর্থাৎ বঙ্গে তাহার প্রাপ্যের দ্বিগুণের অধিক পাইল। এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজী বলিয়াছেন, "বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির সভ্যেরা বঙ্গের প্রতি যতটা সম্ভব বদান্যতা দেখাইয়াছিলেন। সকল সদস্যই মনে করিয়াছিলেন যে, শুধুমাত্র জনসংখ্যার অনুপাতে বিচার করিলে বঙ্গের প্রতি নিশ্চিত অবিচার করা হইবে। ভারতবর্ষের সকল সাধারণ কাজে বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে রাজনীতিক চেতনা জাগ্রত করিবার পক্ষেও বঙ্গের দান খুবই বিরাট।"

এই সব কথা সত্য হইলেও এই সব সদস্যদের মনে রাখা উচিত ছিল, যে, জাতির সকলের প্রতি, সকল প্রদেশের প্রতি ন্যায় বিচার করিবার জন্য তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের উপর পুরস্কার বিতরণের ভার ন্যস্ত ছিল না। অনুগ্রহ কাহাকেও করিতে হইলে, যাহারা দুর্ব্বল এবং অযোগ্য তাহাদিগকেই করা উচিত ছিল। বঙ্গের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব দেখান নেতাদের পক্ষে যেমন অন্যায়, তেমনই চিত্তের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হইয়াছে।

কোন প্রদেশে জাতীয়তার প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল, সারা ভারতবর্ষ যখন অসাড় ছিল তখন, সমগ্র ভারতের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম কাহারা লড়িয়াছিল, আজ ভারতবর্ষ তাহা ভুলিয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে একজনও বাঙ্গালী গৃহীত হন নাই। বাংলার প্রতি অবিচার নূতন কথা নহে। তবে সেটা যত স্পষ্টভাবে ও যত বেশী হয়, ততই তাহা আমাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিবে।

ছাত্রদের স্বাস্থ্য

আমাদের সকল প্রকার কাজকর্ম, ও উন্নতির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। আমাদের স্বাস্থ্যের গতি যে কোন দিকে ছাত্রদের স্বাস্থ্য হইতে তাহার কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ছাত্রদের স্বাস্থ্য যে খারাপ হইতে আরও খারাপের দিকে যাইতেছে, তাহা চোখে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, তাহা হইলেও, এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য সঠিক হিসাবের প্রয়োজন। ইহার জন্য ব্যাপকভাবে কোন একটি বিশেষ সুব্যবস্থিত পদ্ধতির মধ্য দিয়া যে ভাবে কাজ করা প্রয়োজন, বর্ত্তমানে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। তবুও, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এদিকে যে সামান্য চেষ্টা হইতেছে, তাহা হইতেও প্রকৃত অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের একটি প্রেসনোটে প্রকাশ, সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের উদ্যোগে গত কয়েক বৎসরে ১৬,৭০০ বালকের এবং ৫২৪টি বালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে, পরীক্ষিত বালকদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৩ জন সুপুষ্ট, ৫৩ জনের পুষ্টি মাঝারি রকমের এবং ২৪ জন নিতান্তই অপুষ্ট। মোট পরীক্ষিতদের মধ্যে শতকরা ৬৭ জনের কোন না কোন ন্যূনতা আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষিত ২৬,২৯২ জন ছাত্রের মধ্যে শতকরা ৫৯ জনের এই প্রকার ন্যূনতা দেখা গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমঙ্গল সমিতির মেডিক্যাল বোর্ডও ৩২।৩৩ সালে পরীক্ষার ফলে অপুষ্টদের সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছেন। কলিকাতার উচ্চ এবং মধ্য বিদ্যালয় সমূহের পাঁচ হাজার ছাত্রকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যেও শতকরা ৩৫ জনকে অপুষ্ট দেখা গিয়াছে।

কিন্তু, ইহাও আমাদের স্বাস্থ্যের সঠিক পরিমাপ নয়। আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব; তাহারও কারণ আমাদের দারিদ্র্য। অপুষ্টদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ, ক্রমবর্দ্ধিত দারিদ্র্য ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। স্কুল কলেজে যাঁহারা ছেলেমেয়ে পড়াইতে পারেন, তাঁহারা দেশের সাধারণ লোকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। কাজেই, ইহা খুবই সম্ভব যে, স্কুল কলেজের বাহিরে অল্পবয়স্কদের মধ্যে পুষ্টির অভাবে হীনস্বাস্থ্য লোকের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। সহর অপেক্ষা পল্লীতে দারিদ্র্য ও রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী, কাজেই এখানকার ছাত্রদের স্বাস্থ্য আরও শোচনীয় হওয়াই সম্ভব।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের যাহাতে উন্নতি হয়, এজন্য সরকার ছাত্রদের শরীর চর্চ্চার ব্যবস্থার দিকে অধিক মনোযোগ প্রদান করিতেছেন। দেশের হিতকামী ব্যক্তিদের চেষ্টায়ও যুবকদের মধ্যে শরীর চর্চ্চার প্রসার লাভ করিয়াছে। চর্চ্চার দ্বারা স্বাস্থ্যের কতকটা উন্নতি হইতে পারে, তাহা খুবই সম্ভব। এজন্য যাহাতে প্রত্যেক কিশোর কিশোরী ও যুবক যুবতী স্বাস্থ্যরক্ষার এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার জন্য পালনীয় নিয়মসমূহের সহিত পরিচিত থাকেন এবং তাহা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন, ভালভাবে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে, এ চেষ্টা স্কুলের বাহিরেও করিতে হইবে। দেশের সর্ব্বত্র খেলাধূলার প্রচলনের চেষ্টা করা, সকল ঋতুতেই, বিশেষ করিয়া শীতকালে ছেলেমেয়েরা যাহাতে কোন না কোন শ্রমসাধ্য খেলায় যোগদান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, নিতান্তই প্রয়োজন। ইহার দ্বারা কিছু ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, উৎসাহ, কর্ম্মশক্তি ও শারীরিক দৃঢ়তা নিঃসন্দেহ বাড়িবে।

কিন্তু, প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করিবে, যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির উপর। ইহা সম্ভব করিতে হইলে, অনেক বেশী কষ্ট ও অর্থসাধ্য চেষ্টা, যাহার দ্বারা আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, প্রয়োজন হইবে।

আমাদের খাদ্যে মাংসপেশী বর্দ্ধনের উপযোগী উপাদান এবং স্নেহজাতীয় উপাদান প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা মাছ, দুধ, এবং দুগ্ধজাত নানাবিধ খাদ্য হইতে ইহা পাইতেন। বর্ত্তমানে ইহা অপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে এবং এই জন্যই আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের এত অবনতি ঘটিয়াছে। এখনও বাংলার যে সকল সম্প্রদায় নদী খাল ও বিলের ধারে বাস করেন এবং প্রচুর পরিমাণে মাছ খাইতে পান, তাঁহাদের স্বাস্থ্য তুলনায় অনেক ভাল, শরীর পুষ্ট ও বড়

এবং তাঁহাদের মধ্যে ম্যালেরিয়া, কালা-আ-জ্বর প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব অনেক কম। কিন্তু, বাংলাদেশের সকল লোককে উপযুক্ত পরিমাণ মাছ দুধ দিবার ব্যবস্থা করা যাইবে না। দেশের লোকের সহযোগিতায় সরকার চেষ্টা করিলে যে, কোনক্রমেই ইহা সম্ভব হয় না, তাহা আমরা মনে করি না। কিন্তু, এরূপ চেষ্টায় যে দেশের লোক বা সরকার সহসা রত হইবেন, এরূপ সম্ভাবনা নাই।

আমাদের অজ্ঞতাও অবশ্য এজন্য নিতান্ত কম দায়ী নহে। বাঙ্গালীদের মধ্যে পেশীপুষ্ট লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। একদিকে মেদবিশিষ্ট অত্যন্ত স্থূলদেহীর দল, আর অন্যপ্রান্তে ক্ষীণ অস্থিচর্ম্মসার, সর্ব্বপ্রকার শারীরিক সামর্থ্যহীন লোকের সংখ্যা বাহুল্য; ইহাই সাধারণ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য। ইহার জন্য প্রধানতঃ আমাদের খাদ্যই দায়ী।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতেও, খাদ্যের কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের দ্বারা কতকটা সুফল পাওয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের উদ্যোগী হওয়া দরকার। বাঙ্গালীরা অপেক্ষাকৃত কম ডা'ল খান, অথচ, ইহা হইতে সস্তায় আমরা পেশীগঠনের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি। হিন্দুস্থানীরা বেশী পরিমাণে ডা'ল খাইয়া থাকেন, এবং ইহাই তাঁহাদের ভাল শরীরের অন্যতম প্রধান কারণ। ঝুনা নারিকেল ও চীনাবাদাম হইতে আমরা সস্তায় স্নেহজাতীয় উপাদান পাইতে পারি।

আগামী বর্ষে সরকারী স্কুলে ছেলেদের জলখাবার দিবার ব্যবস্থা হইবে; ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হইলে, ইহা ব্যাপকতর ভাবে চালাইবার চেষ্টা হইবে। কিন্তু, সরকারী স্কুলে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেরা পড়িয়া থাকেন এবং তাঁহারা বাড়ীতেও কতকটা ভাল খাবার খাইয়া থাকেন। কিন্তু, যাহাদের পুষ্টির খাদ্যের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। সকল স্কুলে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলে, ইহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কে দিবে? যদি ইহা ছেলেদের নিকট হইতে লওয়া হয়, তাহা হইলে, তাহাদের উপর অনেক চাপ পড়িবে এবং অনেকের পড়াই বন্ধ হইবে।

কিন্তু, মেয়েদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা আরও ভাল এবং সুব্যবস্থিত ভাবে হওয়া আবশ্যক। নানাকারণে সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারে তাঁহাদের খাদ্যে পুষ্টিকর জিনিসের অভাব পুরুষদের অপেক্ষা বেশী থাকে। অন্যান্য দেশে এবং আমাদের দেশেরও কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বাস্থ্যের পার্থক্য, বাঙ্গালীদের বিশেষ করিয়া, মধ্যবিত্তদের স্ত্রী ও পুরুষের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যের পার্থক্য অপেক্ষা অনেক কম। অন্য নানাকারণ ইহার জন্য দায়ী হইলেও, অত্যন্ত অপকৃষ্ট খাদ্যও ইহার জন্য কতকাংশে দায়ী বলিয়া মনে হয়।

কবির মাদ্রাজ ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী হইলেও, শুধুমাত্র বাংলার নহেন। সমগ্র ভারতেরই সাধনা মর্ম্মবাণী তাঁহার কাব্যও রচনার মধ্য দিয়া বিশ্ববাসীর নিকট পৌছিয়াছে। তাঁহার কাব্যের মূলে যে গভীর সত্যোপলব্ধি আছে, ভবিষ্যতের যে পথ নির্দ্দেশ আছে, আমাদের বহির্জীবনের চঞ্চলতার অন্তরালে থাকিয়া তাহা অনেক দিন আমাদিগকে প্রেরণা যোগাইবে।

কিন্তু, রাজনীতি তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র নহে বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের তাঁহাকে যতটা আপনার করিয়া নেওয়া উচিত ছিল, ততটা তাঁহাকে সে নিতে পারে নাই। ভারতের বাহিরের কথা বাদ দিলে তিনি অনেকটা বাংলার কবিই রহিয়া গেলেন।

মাদ্রাজের সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাঁহাকে যে ভাবে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তিনি সেখানে যে অভ্যর্থনা পাইয়াছেন শুধু বিপুলতাই তাহার বৈশিষ্ট্য নয়, ইহা বাংলা ও মাদ্রাজের সম্পর্ককে ঘনিষ্টতর করিয়া তুলিবে।

কবি বিশেষভাবে এখানকার মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া মাতৃভাষা চর্চ্চার জন্য যে আবেদন জানাইয়াছেন, তাহা বিফল না হইলে সুখের হইবে। আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির উন্নতির উপর আমাদের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মিলন

সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতাবিহীন জাতীয়তাই আমাদের রাষ্ট্রিক আদর্শ হওয়া যে উচিত, সে কথাটা ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে অনেকেই আমরা ভুলিয়াছি। কিন্তু, তবুও বহুলোকে যে তাহা ভুলেন নাই, সে কথাও দেশের লোকের জানা দরকার। কংগ্রেস অধিবেশনের ঠিক পূর্ব্বেই নিখিল ভারতীয় বাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মিলন এই জন্য বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউএর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

তাঁহার অভিভাষণ পাণ্ডিত্য, যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ হইয়াছিল। এখানে গৃহীত প্রস্তাবাবলী পরিপূর্ণ জাতীয় আদর্শের বিশেষ অনুকূল হইলেও, সম্ভবতঃ বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা বেশী লোকের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হইবে না।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

শত্রুপক্ষের মেয়ে

শ্রীমনোজ বসু

২

অন্দর ও সদর বাড়ির মধ্যে যে উঠানটি, বিশ কুড়ি জন সেই অবধি ধাওয়া করিয়া আসিল। একেবারে কীর্ত্তিনারায়ণের জানলার নীচে আসিয়া ডাকাডাকি লাগাইল —ছোট হুজুর! ছোট হুজুর!

সে এমনি কাণ্ড, মরা মানুষও নড়িয়া চড়িয়া ওঠে। কিন্তু নিরুপায় কীর্ত্তিনারায়ণ বিপন্ন চোখে বধূর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বধূ পরম নির্ব্বিকার। এত যে চীৎকার তার যেন কিছুই কানে যাইতেছে না। নরহরি চৌধুরীর মেয়ে সে; লোকে বলিত, নরহরি নয়—বাবাহরি। বাঘে গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াইয়া ছাড়িতেন তিনি; সদরের জজ ম্যাজিষ্টেট অবধি করিয়া চৌধুরীকে সমীহ করিয়া চলিতে হইত। সেই চৌধুরীর সকল ইজ্জত এরা ডুবাইয়া দিয়াছে, একেবারে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া ছাড়িয়াছে। মা ও ছেলে কেউ-ই কম যান না। আজ সুবর্ণলতা যেন হাসিমুখে সেই শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে বসিয়াছে।

শেষকালে কীর্ত্তিনারায়ণ বিরক্ত হইয়া কহিল—ওগো শুনছ?

নিতান্ত ভালমানুষের মতো বধূ বলিল—ইচ্ছে যদি হয়, যাও—

কীর্ত্তিনারায়ণ রাগিয়া উঠিল। স্বরের অনুকৃতি করিয়া কহিল—ইচ্ছে যদি হয়···। মুখে ত দিব্যি বলে দেওয়া হ'ল, কিন্তু হাত দিয়ে বেড়া দেওয়া, ইচ্ছে হয় কি করে?

কালো কৌতুকচঞ্চল চোখ দুটি না চাইয়া সুবর্ণ বলিল—হাত ছাড়িয়ে যাও। পার না? এই জোরের বড়াই করে বেড়াও? ও বীরপুরুষ, এই মুরোদ?

কীর্ত্তিনারায়ণের শিরার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল। ভাবিয়াছে কি মেয়েটা? চলিয়া যাওয়া যায় কিনা, একটু দেখাইয়া দিবে নাকি? তবু তা পারিয়া উঠিল না। কথায় কথায় এত খোঁচাইয়া জ্বালাইয়া মারে, তবু মুখখানার দিকে তাকাইলে মায়া হয় বড়। শুভ্র নিটোল সুকোমল অঙ্গ—একটা আঙুলের ভর সহেনা, রক্ত যেন ফাটিয়া পড়ে। এমন অবোধ অসহায় যে মানুষ কি করিয়া তার উপর শোধ লওয়া যায়, ভাবিতে গিয়া পালোয়ান বর দিশাহারা হইয়া উঠিল। ভাবিল, দূর হোক্‌গে ছাই,—কি-ই বা বোঝে, আর কি-ই বা বলে! আর হাত সে স্বচ্ছন্দে ছাড়াইয়া লইতে পারে, তাহা ত আগেও দেখিয়াছে। হারিয়া যে হার স্বীকার করে না তার কথায় রাগ করা বৃথা। জানলায় মুখ বাড়াইয়া নীচের লোকদের বলিয়া দিল—আমি যাবনা তোমরা যাও।

সুবর্ণলতা তখন স্বামীকে ছাড়িয়া একটু দূরে জলচৌকীর উপর গিয়া বসিল। আলতা-পরা পা দু'খানি আপন মনে দোলাইতে লাগিল, আর টিপিটিপি হাসি। অর্থাৎ, পারিলে না ত?

রাগ আর কত সামলান যায়? এক লাফে কীর্ত্তিনারায়ণ একদম সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখের দিকে চাহিয়া রুক্ষ স্বরে কহিল—হাস্‌ছ যে?

—আমার রোগ।

—রোগ সেরে দিতে পারি, বুঝলে? কীর্ত্তিনারায়ণ গর্জ্জিয়া উঠিল—চাঁদমুখ থেকে হাসি নিঙড়ে মুছে দিতে পারি। এমন করতে পারি, কান্নার পথ দেখতে পাবে না।

—মেরে? তা তুমি পার। তখন এমন করলে, রঙ্গিনী কেঁপেই খুন। বাবা গো বাবা এত ভয় রঙ্গিনীর? তোমার বোন কিনা—

বলিবার ভঙ্গিটি এমন, রাগিয়া থাকাও মুস্কিল। কীর্ত্তিনারায়ণ বলিল—আশ্চর্য্য! তোমার কিন্তু এক ফোঁটা ভয় নেই। মস্ত বীরের মেয়ে কি না। কিন্তু আমি মারব টারব না—এখান থেকে শুধু চলে যাচ্ছি—তুমি একলা একলা বসে ঢোলের বাজনা শোনো আর হাসো—

বলিল বটে, কিন্তু যাইবার ভাব নয়। এক মুহূর্ত্ত নীরবে বধূর মুখে চাহিয়া আবার আরম্ভ করিল—শুনি, চৌধুরী মশায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে মেয়ে নিয়ে আছেন; কুস্তি-কসরৎ শিখিয়ে বীর কন্তে তৈরী হয়েছে। নাট-মণ্ডপে হাজার মানুষ হল্লা করছে আর একটু খানি একলা থাকা যায় না? এখানে সাপ না বাঘ?

সুবর্ণ বলিল—ভূত।

সদম্ভে কীর্ত্তিনারায়ণ বলিতে লাগিল—ভূতের বাবার সাধ্য নেই বরণডাঙার দেউড়ী পার হবে। ভূত-টুত পিশে গুঁড়ো করে দেব না? পরের মেয়ে, নতুন এসেছে—খবর রাখো না ত—

সুবর্ণের কণ্ঠস্বরে ভয় যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। বলিল—আমি যে দেখেছি, সত্যি,—নিজের চোখে,—

—চোখে নয়, মনে। বাপের বাড়ি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ।···দেখাতে পার?

—পারি, এসো। দেয়ালে বিলম্বিত আয়নার কাছে বধূ তৎক্ষণাৎ স্বামীকে ভূত দেখাইয়া দিল। তারপর হাসিয়া লুটোপুটি।

তখনই আবার হাসি থামাইল। তাকাইয়া দেখে, কীর্ত্তিনারায়ণের মুখ কি রকম হইয়া গেছে, চোখে জল আসিবার মতো। ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেল, ভয়ও হইল একটু। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া মুখের নীচে মুখটি নামাইয়া বলিতে লাগিল—রাগ করলে? ঠাট্টা বোঝ না—একটা ঠাট্টা গো। ভূত কাকে বলে জানো, মশায়?

অভিমানে অপমানে কীর্ত্তিনারায়ণের ওষ্ঠ দু'টি স্ফুরিত হইতে লাগিল। বলিল—না—জানিনে। কিন্তু এইটি জানি, হ'ক-না-হ'ক তুমি আমার মান-মর্য্যাদা নষ্ট করে আমোদ পাও। নরহরি চৌধুরী আর বরণডাঙার ঘোষে চিরশত্রুতা, সবাই জানে। কেউ কাউকে কোনদিন কসুর করিনি। এতকাল ছিল মরদে মরদে লাঠালাঠি, এবার চৌধুরীমশায় মেয়ে লেলিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তিনিই আগে এসেছিলেন, আমরা নই। রাগ তুমি কার উপর দেখাও, সুবর্ণলতা?

কিসে কি আসিয়া গেল, সুবর্ণ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। কীর্ত্তিনারায়ণ বলিতে লাগিল—আমি ভূত কি আর কিছু—এক ফোঁটা মেয়ে—তুমি তার জানবে কি? জিজ্ঞাসা করে দেখো তোমার বাবাকে এ অঞ্চলের মধ্যে সত্যিকার মরদ যিনি একটা; জিজ্ঞাসা করো তিনটা জেলার যে যেখানে আছে; আর জিজ্ঞাসা করে এসো ঐ বাহিরে যারা হল্লা করে মরছে—

কিন্তু বেশীক্ষণ দমিয়া থাকার মেয়ে সুবর্ণ নয়। আ—হা বলিয়া সে মুখ ঘুরাইয়া লইল। আবার চাপা হাসিভরা উচ্ছল মুখে স্বামীর দিকে তাকাইল। বলিল—পুরুষের একেবারে মান গিয়েছে। আর নিজে যে আমায় যা-তা এক ঝুড়ি অপমান করছেন—আমি যদি রাগ করি?

বিস্মিত হইয়া কীর্ত্তিনারায়ণ প্রশ্ন করিল—আমি অপমান করেছি তোমায়? কি বলেছি—বলো?

সুবর্ণ দস্তুরমতো ঝগড়া আরম্ভ করিল—আর কি বলবে, শুনি? আমি একফোঁটা মেয়ে;—তার মানে কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—একদম গাধা। আর, বাবা আমায় লেলিয়ে দিচ্ছেন, মানে আমি কুকুর। আর আমার ভয় বড্ড বেশী—মানে, আমি বাবার নাম ডোবাচ্ছি। আর কোনটা বলতে বাকী রাখলে?

—এ সব আমি বলেছি?

গম্ভীর মুখে সুবর্ণ বলিল—না বলো, মানে ত ওই—খুব মানে বোধ হয়েছে। না—না - ওর হয়ত আবার মানে হয়ে যাবে, আমি নির্ব্বোধ বললাম। মহা মুস্কিল দেখছি। এই রকম উল্টো মানে করলে, কথা বলাই দায়—

বিব্রত মুখে কীর্ত্তিনারায়ণ চুপ করিল।

সুবর্ণলতা কহিল—আর নিজে বড্ড সোজা মানে ধরেন কিনা। শোন তবে, ভূত বল্লাম কেন। ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া এক মুহূর্ত্ত বোধ করি গল্পটি ভাল করিয়া রচিয়া লইল। বলিল—বিয়ের দিন সমস্ত বেলা না খেয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছি,

বাবা চুলের মুঠো ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন—দেখ, হারামজাদী, তোর বরের কাণ্ড। উঠোনে দেখলাম, অগুন্তি মাথা—চেঁচিয়ে বাড়ী ফাটাচ্ছে। আমি বল্লাম—কই, বাবা, ও ত ভূতপ্রেতের দল। ঠাস করে গালে এক চড় বসিয়ে বাবা বল্লেন—ওরে কানি, ঐ দেখ—। আমি তা বুঝব কি করে? মানুষে বিয়ে করতে যায় চেলী-টোপর পরে দিব্যি কার্ত্তিক ঠাকুরটির মতো। লাঠি হাতে মালকোঁচা মেরে হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করতে করতে যাওয়া—ওসব ত ভূতের কাণ্ড।

বলিয়া নিতান্ত ভালমানুষের মতো মুখ করিয়া রহিল।

নিজের বীরত্বের কথায় মেঘ কাটিয়া কীর্ত্তিনারায়ণের মুখ প্রসন্ন হইল। তাছাড়া একটু আগেই নাকি মনের ঝাল ছাড়িয়া অনেক কিছু কহিয়া ফেলিয়াছে—বধূ তা কিছুই গায়ে লয় নাই—সেই শ্লেষের বাক্যগুলি এখন ফিরিয়া আসিয়া তাহাকেই মনে মনে লজ্জা দিতে লাগিল। ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ বলিল—তা হলে একা আমারই কপাল ফাটে নি? চুলের উপর, গালের উপর তোমারও কিছু কিছু ঘটেছিল? অত রাগ তাই আমার পরে?

—রাগ অনেক রকম। এক নম্বর—বলিতে বলিতে হাস্যমুখী তরুণীর চোখে এতক্ষণে দুই বিন্দু অশ্রু ঝকমক করিয়া উঠিল। বলিল—এক নম্বর তোমরা আমরা বাবাকে জেলে দিয়েছিল, সে তাঁর মরার বাড়া। সেই থেকে—কেবল ঐ আমার বিয়ের দিনটি ছাড়া—কেউ কোন দিন তাঁকে হাসতে দেখেনি।

গম্ভীর স্বরে কীর্ত্তিনারায়ণ বলিল—কিন্তু তার আগে, আমার চিন্তামণি গুরুকে ঘায়েল করেছিলেন তোমার বাবা—সেটা ভুলো না। স্বর্গগত ওস্তাদের উদ্দেশে দুই হাত জোড় করিয়া সে প্রণাম করিল।

যেন কি হইয়াছে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি পাক উঠিয়া পড়ে। যেন আদালতে দুই পক্ষে সওয়াল জবাব চলিয়াছে। সুবর্ণলতা চুপ করিল। কিন্তু নীরবতা আর বিশ্রী। হাসিয়া জোর করিয়া কণ্ঠে তরলতা আনিয়া বধূ আরম্ভ করিল—আর দুই নম্বর, চৌধুরী উঠোনে জবাব দিয়ে এলে। ঠাকুরদাদার বাপের আমলে নবাবের লোক হাতীঘোড়া নিয়ে এসে, ফিরে গিয়েছিল—ঢুকতে পারেনি। তুমি তাই করে এলে, সহজ লোক তুমি?…আর, তিন নম্বর, কথায় কথায় তুমি চোটে ওঠ, যা চুকে বুকে গেছে তাই নিয়ে খোঁটা দেও, হার মানলেও আমার সঙ্গে লড়তে এসো—

হঠাৎ কৃত্রিম ক্রোধে তর্জ্জনের ভাবে সুবর্ণলতা বলিয়া উঠিল—দেখ, মানা করে দিচ্ছি; আর ফের যদি ঐ রকম করবে কোন দিন তা হলে—তা হলে—তাহা হইলে কি যে করিবে চারিদিক তাকাইয়া সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিল; বলিল—তা হলে এই তোমার গলায় ঝুলে পড়ে চোখ বুজে মরে থাকব।

সমস্ত ঝগড়া দ্বন্দ্ব মিটাইয়া একমুহূর্ত্তে নিবিড় বাহুবেষ্টনে বধূ প্রিয়তমের কণ্ঠ বাঁধিয়া চোখ বুজিল।

লোকেরা গিয়া খবর দিল, ছোট হুজুর আসিবেন না? কেন? সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে তাদের কুলায় নাই। দলের সর্দ্দার ভানু, বাল্যবয়সে নরহরির সাকরেদি করিয়া আসিয়াছে, ইদানীং কীর্ত্তিনারায়ণের ডান হাত। সে নাছোড়বান্দা লোক। দেশবিদেশের মানুষ আসিয়াছে, ছোট হুজুর বুক ফুলাইয়া সকলের মধ্যে না দাঁড়াইলে কিছুতে সে শান্তি পাইতেছিল না। একাকী সে পুনরায় তত্ত্ব লইতে আসিল। শরীর গতিক ভাল আছে ত, ছোট হুজুর?

কীর্ত্তিনারায়ণ উত্তর দিল—তোমরা যা পার, কর গিয়ে, ভানু। আমার যাওয়া হবে না—মাথা ধরেছে।

বলিয়া খাটের উপর চুপচাপ শুইয়া পড়িল।

এই বীরাষ্টমীর দিনটা বিশেষ একটা দিন। শুইয়া শুইয়া কীর্ত্তিনারায়ণের কত কথা মনে হইতে লাগিল। চোদ্দ পনের বছর আগে, সখীসোনার চক লইয়া প্রথম যখন নরহরির সঙ্গে রক্ত বাধিয়া উঠে, আদালতে মিথ্যার জিত হইল—মায়ের মুখে দীপ্যমান অপমানের সে অগ্নিশিখা এখনো সে মনে করিতে পারে। মা আজ ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া মাতিয়া আছেন, দেবতা-গোঁসাই ছাড়া সংসারের কুটাগাছির খবর

রাখেন না; আজিকার ভক্তিস্নিগ্ধ তদ্গত মুখখানি দেখিয়া কিছুতে প্রত্যয় হইবে না, সেই সে-আমলের সৌদামিনী ঠাকরুণ। কীর্ত্তিনারায়ণের বয়স তখন আর কতটুকুই বা। বীরাষ্টমীর দিন—সেদিন আবার ঝড়বৃষ্টি বড় চাপিয়া পড়িয়াছে—তাহারই মধ্যে সৌদামিনী এক ফোঁটা ছেলেকে চিন্তামণি ওস্তাদের সঙ্গে ঠেলিয়া নাটমণ্ডপে পাঠাইয়া দিলেন। পিছে পিছে নিজে চলিলেন। চিন্তামণি সস্নেহে কহিল—কান্না কেন, দাদামণি? লাঠি ধর—এই···এমনি করে। লাঠি সে ধরিতে গেল। মা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—আগে গুরুবন্দনা করো। গুরুবন্দনা করিতে গেলে ফুটফুটে কোমল অতি সুন্দর বালকটিকে চিন্তামণি তার লোহার দেহে জড়াইয়া ধরিল। সে গুরু নাই, সে-সব আমলের নাম-করা লাঠিয়ালেরা প্রায় কেহ নাই। কিন্তু প্রথম দিনের সে লাঠিখানা আজও তোলা আছে। আর প্রতি বৎসর এই দিনটিতে চণ্ডী-কোঠার সামনে নাটমণ্ডপে দাঁড়াইয়া দেবী-প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর নামে জকার দিয়া তারপর লাঠি উঁচা করিয়া তুলে। দেশ বিদেশের লোক কীর্ত্তিনারায়ণের লাঠিখেলা দেখিতে আসে, বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তারা তাকাইয়া রয়। এবং যে-লোকে আজ গুরু চিন্তামণি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া লাঠিবাজি করিয়া বেড়াইতেছে, আকাশ ভেদ করিয়া বোধ করি সেই অবধিও সে জকার পৌঁছিয়া যায়। ছত্রিশ সালে এই পূজার সময়টায় প্রবল বান ডাকে, রাস্তার উপর হাঁটুজল; রোয়াকে বসিয়া ছিপ ফেলিয়া লোকে পুঁটিমাছ ধরিতে সুরু করিয়াছিল। সেবারেও বাদ যায় নাই, লাঠি মাথায় করিয়া জল ঝাঁপাইয়া আসিয়া কীর্ত্তি-নারায়ণ জনহীন নাটমণ্ডপে গুরুবন্দনা সারিয়া গিয়াছিল।··· কিন্তু ভীরু মেয়েটা এমন গণ্ডগোল বাধাইল আজ, যে কি করিবে কীর্ত্তিনারায়ণ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। মাথাধরার ছুতা করিয়া অন্ধকার মুখে সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

ইহাতেও নিস্তার নাই। সুবর্ণ বলিল—তাহা মিথ্যে কথাটা বল্লে?

ও পক্ষ নিরুত্তর। সুবর্ণ বলিতে লাগিল—মাথা ত ধরিনি, গলার ঐখানটা ধরেছিলাম শুধু। তারপর খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

গুড়্ গুড়্ করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল। লাঠির ঠকাঠক্ ও সহস্রের বাহবা ধ্বনি একটা মহল পার হইয়া আসিয়া কীর্ত্তিনারায়ণের বুকের মধ্যে মুগুর মারিতে লাগিল। উঠিয়া বসিয়া অধীর হইয়া বলিল—আমার মাথা ধরেছে, তেষ্টা পাচ্ছে, বুক কাঁপছে, হাত দুটো কামড়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সব হচ্ছে। আর ইচ্ছে হচ্ছে, জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করি। দোহাই তোমার—তুমি হেসো না অমন করে।

বালাই! হাত কামড়ে খায় কখনো? জল আনছি।

বলিয়া দুষ্ট চাহনি চাহিতে চাহিতে সুবর্ণলতা বাহির হইয়া গেল। গেল ত গেল—আর আসিবার নাম নাই।

বাহিরে অবিরত আনন্দ কোলাহল। কান আর পাতা যায় না। দুত্তোর—বলিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ জোরে জোরে পায়চারী করিতে লাগিল। তারপর আরো খানিকক্ষণ পরে এক পা দু' পা করিয়া সিঁড়ি বহিয়া নামিতে লাগিল। উঠান পার হইয়া সদর মহল পার হইয়া ধীরে ধীরে একেবারে নাটমণ্ডপের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোজ বসু



বীমা ও বাণিজ্য

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার বসু

আলোচনার চেষ্টা করা গেছে, বীমা কী ভাবে টাকা লগ্নি করলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে সাহায্য করতে পারে, আর, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির সহায়ক হ'তে পারে। কিন্তু গোড়াতেই আর একটা কথা ভাবতে হ'বে। কথাটা গোড়াতেই উঠ্‌ছে কারণ, এটা বীমার অস্তিত্বের প্রথম কথা।

দেখতে হ'বে ইনসিওরেন্স আমাদের দেশে গঠনমূলক কাজে কতটা অগ্রসর হ'তে পেরেছে। গঠনমূলক কাজ বল্‌তে বুঝে সেই সব কাজ যা নাকি নিজের সফলতা ছাড়াও নবতর ভবিষ্যৎ সৃষ্টির পথ সুগম করে। সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানেই—বিশেষতঃ, ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স, ইত্যাদিতে প্রধান লক্ষ্য হ'বে নিজেদের আভ্যন্তরিক শক্তি সঞ্চয় করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বাণিজ্য-কেন্দ্র সৃষ্টি করা। তবেই হ'বে তারা সার্থক। এভাবে আজো ইনসিওরেন্স আমাদের দেশে সার্থক হয়ে উঠ্‌তে পারেনি।

ভারতের বাণিজ্য-সম্পদের কথা ভাবতে গেলেই তার দৈন্যের কথা বড় কঠোর ভাবে আঘাত করে। হোক্, তবু ভাবা ও জানা দরকার।

কোথায় দৈন্য জান্‌তে পার্‌লে, সে বিষয়ে সমবেত চেষ্টার ফলে অনেকটা অগ্রসর হ'বার সম্ভাবনা থাকে।

বাণিজ্য-জগতে দৈন্য—ভারতের,—প্রতিভার তত নয়, যত,—প্রচেষ্টার ও প্রেরণার। কারণ আমরা বুঝি কোন পথে গেলে সুফল পাওয়া যাবে, কোন পথে গেলে অনিষ্ট হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠিক ভাবে কাজ কত্তে পারি না। ভারতের কথা ছেড়ে দিয়ে বিশেষ করে বাংলার অবস্থা চিন্তা করলে দেখা যায় বাংলা ভারতের সমস্ত প্রদেশের চেয়ে পেছনে। বাস্তবিক পেছনে আছে কর্ম্মজগতে। ভাববিলাসী বলে কুখ্যাতি আছে। কিন্তু ভাববিলাসী হোক, তার বোঝবার শক্তি আছে, দেখবার দৃষ্টি আছে। তা হ'লে কী হবে, কাজ কিন্তু বড় শ্লথ, বিবেচনাহীন।

এত কথা বলার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু ইনসিওরেন্সের ক্ষেত্রে এত কথা বলার দরকার হোলো কেন,—তার কারণ আছে।

কারণ হচ্ছে, ইনসিওরেন্স আজো সম্পূর্ণতা লাভ করেনি কী ভারতে, কী বাংলায়! এইতো সেদিন থেকে লোক বুঝতে শিখেছে এর উপকারিতা। এখনো এর কার্য্য ক্ষেত্র যতটা ব্যাপক হওয়া আবশ্যক তা হ'য়ে ওঠেনি। বল্‌তে গেলে, মাত্র শিশু অবস্থা। এর মধ্যেই এমন একটা কদর্য্য আবহাওয়া এসে পড়েছে যেটা আমাদের অনেকটা আগের জিনিষকে পেছিয়ে দিচ্ছে। এখনো বীমার দিকে দেশের সার্ব্বজনীন সহানুভূতি গড়ে তোলার কাজ কত বাকী! এখনো কত প্রচার ও প্রসারের দিকে চেষ্টা করার বাকী। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেশে কতো প্রভিডেণ্ট ইন্‌শিওরেন্স গড়ে উঠ্‌লো। তাদের কাজ খুব দরকারী। স্বীকার্য্য কিন্তু যে ভাবে হচ্ছে, এ ভাবে নয়। প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্সের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে আমাদের দেশে। শতকরা, বড় জোর, চার-পাঁচজন, একহাজার বা তার বেশী টাকার ইনসিওরেন্স করতে পারেন। প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্সে কিন্তু মাসে একটাকা কোরে দিয়ে অনেকে দশ, চোদ্দ, কুড়ি বছর পরে, ২৫০৲, ৩০০৲ বা ৫০০৲ টাকা অবধি পাবার সহজ সুযোগ পায়। এটা সম্ভব। কারণ, এটা সব দিক দিয়ে আমাদের আর্থিক অবস্থার উপযোগী। সেই জন্যে প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্সের ক্ষেত্র আমাদের দেশে উর্ব্বর।

এখনো দেশে কত জায়গায় বীমার বাণী আদৌ পৌঁছয়নি। সুদূর মফঃস্বলে বীমার কথা শুনলে অশিক্ষিত কৃষক হেসে ওঠে।…"যদি দশটাকা জমা দিয়ে মারা যাই,

হাজার টাকা দেবে কোম্পানি? কী বলেন, মশাই? আমার ছেলেরা সে টাকা পাবে? হ'তেই পারে না। অসম্ভব!" তারা ধারণায় আন্‌তে পারে না—দশ, বিশ, পঞ্চাশ টাকা জমা দিয়ে মারা গেলে কোম্পানি ইনসিওরেন্সের পূর্ণ টাকা দিতে পারে। মনে করে ফাঁকি। এসব জায়গায় চোখের ওপরে বীমার উপকারিতা দেখান ভিন্ন, তাদের বিশ্বাস আন্‌বার অন্য কোন উপায় নেই। সে রকম ভাবে উপকারিতা দেখিয়ে বিশ্বাস আনা হয়েছে অনেকের এবং তা হয়েছে বলে ক্ষেত্রও প্রসারিত হ'য়েছে। কিন্তু গোটাকতক বাজে প্রভিডেন্ট কোম্পানি দেশের নিরক্ষর, নির্বোধ, সরল কৃষক কুলের পয়সা আত্মসাৎ করে বীমার ওপর একটা নিবিড় কলঙ্ক এনে দিয়েছে।

আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মফঃস্বলে বীমার উর্ব্বর ক্ষেত্রে এমন একটা বিষময় আবহাওয়া এসে গেছে যে লোকে প্রথমেই যে কোনো লোন আফিসের বা ইনসিওরেন্সের এজেন্টকে দেখ্‌লেই প্রতারক বলে সন্দেহ করে। সে সব স্থানে ভবিষ্যতে বীমার কাজ পাওয়া যে কত শক্ত, তা বলে বোঝান যায় না।

দেখা যাচ্ছে, ইনসিওরেন্স গড়ে ওঠবার পথেই কী প্রচণ্ডভাবে আঘাত পাচ্ছে। আমাদের যদি বীমার কাজ সুশৃঙ্খলায় চালাতে হয়, প্রথমেই চেষ্টা করতে হ'বে এই অনিষ্টকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিপক্ষে দাঁড়াতে। কিন্তু দেশের লোক কী কর্‌তে পারে? এ বিষয়ে শেষ নিষ্পত্তি নির্ভর কচ্ছে, আইনের হাতে।

প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্সের মূল ভিত্তিই ভঙ্গুর। জীবন-বীমাকে যেমন গভর্ণমেণ্টের সিকিউরিটী জমা দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ কর্‌তে হয়, প্রভিডেন্ট কোম্পানিকে তা করতে হয় না। সেই কারণেই যত সহজে এসব গড়ে উঠ্‌তে পারে, তত সহজেই আবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

দেশের লোক,—বিশেষ, মফঃস্বলের লোক বীমা কোম্পানিকে জানে না; জানে তারা স্থানীয় প্রতিনিধিকে। টাকা জমা দেয় তারা স্থানীয় প্রতিনিধিকে দেখে। বিশ্বাস করে তারা প্রতিনিধির মর্য্যাদায়। অতএব কোম্পানির চেয়ে বীমাকারীর কাছে প্রতিনিধির মূল্য বেশী। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির মর্য্যাদার ওপর নির্ভর কচ্ছে কোম্পানির যশ বা খ্যাতি। বাস্তব কাজও তাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল ইনসিওরেন্সের এজেন্ট যে-সে হয়ে পড়ছে বা পড়েছে। বেকারের সংখ্যা অসহ্য রকম বেড়ে গেছে। শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রযুবক কোনো কাজ না পেয়ে কাগজে ইনসিওরেন্সের দালালীর বিজ্ঞাপন পড়ে একটা আবেদন করে দিচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠ্‌ছে এক একটী কোম্পানীর প্রতিনিধি। তারা কত বড় দায়িত্ব মাথায় নিচ্ছে, তা বোধহয় অধিকাংশ দালালই ভাবে না। মানুষের বিশ্বাস আর সহানুভূতি নিয়ে ছেলে খেলা করা কেউ বল্‌বে না সঙ্গত। এতো গেল একদিকের কথা। আবার কোম্পানির প্রতিনিধি হওয়ার ব্যাপারে এজেন্টদেরও বিপদ। অনেক প্রকৃত কর্ম্মী উজ্জ্বল বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হয়ে কোনো বিশেষ কোম্পানির এজেন্ট হ'য়ে পড়লেন। তিনি কর্ম্মী; প্রথম প্রথম কাজ আদায় করতে তাঁর বেগ পেতে হোলো না। কিন্তু কোম্পানি নির্ব্বাচনে হয়ত তার প্রথমেই একটী মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে। শেষে, দুর্ভাগ্যবশতঃ হয়ত তাঁর কোম্পানি ফেল হ'য়ে গেল। কোম্পানির বদ্‌ নাম তো হোলোই। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা নিন্দা করতে লাগ্‌লো, স্থানীয় প্রতিনিধিকে। ..."কী রকম ব্যাপার হে! তুমি আগে জান্‌তে তো কেন অত জোর করে করালে!"......"বাবু, আমরা গরীব। কেন মিছে আমাদের টাকাগুলি নষ্ট কর্‌লে বাবু?" ইত্যাদি।

অন্যদিকে আবার ভাল কোম্পানির সুনাম অপটু প্রতিনিধির দ্বারায় কী ভাবে কলুষিত হয়, তারও দৃষ্টান্ত আছে। লোকে বিশ্বাস করে ভাল কোম্পানির কাজ দেখে, তারপর পাঁচটা ভালোর সঙ্গে দুটো মন্দ মিলিয়ে গিয়ে কাজ কর্‌তে থাকে। তারপর সর্ব্বসাধারণ ভিত্তিহীন কোম্পানিগুলোর কার্য্য দেখে ভাল কোম্পানিকেও সেই আলোয় বিবেচনা করে। শেষে প্রতারিত হয়ে ভাল মন্দ দু'রকম প্রতিষ্ঠানের ওপরই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। যে জায়গায় একজন লোকও ঠকেছে সেখানকার প্রত্যেকে এ গভীর ঘৃণা আর সন্দেহ নিয়ে বসে আছে। সেখানে

সমস্ত ভবিষ্যৎ কর্ম্মীর পথ রুদ্ধ। এই ভাবে বীমার ক্ষেত্র প্রচুর নষ্ট হ'য়েছে, আরও হচ্ছে।

গঠনমূলক কাজে এই আমাদের প্রধান বাধা। এটা দূর না করতে পারলে বীমার কাজ অগ্রসর হওয়া শক্ত। এ বিষয়ে, (ভিত্তিহীন প্রতিষ্ঠান গড়ে, দু'দিন নির্ব্বিবাদে কাজ চালিয়ে, বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাওয়ায়) গবর্ণমেন্ট না দায়িত্ব নিলে সাধারণের অসাধ্য এই ধ্বংসকেন্দ্রগুলি নষ্ট করা। গভর্ণমেণ্ট নজর দিলে প্রথম কর্ত্তব্য হবে আইন করা :—

কোনো প্রতিষ্ঠানই বিনা সিকিউরিটীতে কাজ আরম্ভ করতে পারবে না।

তিন কী পাঁচ বছর অন্তর ভ্যালুয়েসান করতে হ'বে।

বছর বছর আয়-ব্যয়ের হিসেব দিতে হ'বে।

এ সব হিসেব সরকারী অডিটার দেখবে। কোথায় টাকা লগ্নি করা হ'য়েছে, তা থেকে কি আয়, তার বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ করতে হ'বে।

সব প্রতিষ্ঠানকেই নতুন আরম্ভ হ'বার সময় প্রাথমিক খরচ বাবদ যথেষ্ট ব্যয় করতে হয়। তা হোক; কিন্তু তারপর যেন প্রতিষ্ঠানের আয় আর ব্যয়ের ভেতর একটা সামঞ্জস্য থাকে তা দেখবার জন্যেই বছর বছর আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখা।

তারপর কাজ চালানো নিয়ে অনেক গলদ আছে। সে গলদগুলো আবার বেশী দেখা যায় সেই সব প্রতিষ্ঠানে যে গুলো খালি জল বুদ্বুদের মত দুদিনের জন্যে ওঠে, দেশের কিছু অর্থ নিয়ে, বীমার কলঙ্ক সৃষ্টি করে আবার মিলিয়ে যায়। প্রত্যেক নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রথম কথাই হওয়া চাই নিঃস্বার্থ সমাজ-সেবা। তবেই সেই সৎ-প্রেরণার ফলে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ব্যবসা-কেন্দ্র গড়ে উঠ্‌বে। কিন্তু প্রভিডেন্ট-ইনসিওরেন্সের ক্ষেত্রে তা মোটেই হয় না। উল্টে মনে হয়, পাঁচ বছর প্রচার-কার্য্য করে যতটা সাধারণের ধারণাকে গঠন করা যায়, সেই সমস্তটুকু ফল গোটাকতক প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স কোম্পানি দিন কতকের ভেতর জ্বলে উঠে আর নিভে গিয়ে তা সমস্ত নষ্ট করে ফেলে।

এতে দেশের লোকের টাকা নষ্ট হয় সত্যি; সেটা একটা ক্ষতি সত্যি। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে, সকলেই জানেন টাকার চেয়ে বিশ্বাসের মূল্য বেশী। নাম ও প্রতিষ্ঠা সব চেয়ে বড় মূলধন। আপ্রাণ পরিশ্রম করে অসংখ্য কর্ম্মী দেশে যে বিশ্বাস আর সহানুভূতি গড়ে তুলেছেন সেটাই হচ্ছে বীমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সার্ব্বজনীন সহানুভূতির ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে প্রচুর বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রসারিত করাই বীমার আসল কাজ। কিন্তু সেই কাজের মূলেই এই স্খলন। প্রথম পাপ। লোকের বিশ্বাস আর সহানুভূতি নিয়ে এই নীচ, নির্ব্বোধ, স্বার্থপর খেলা।

আমার মনে হয়, বীমা গড়ে ওঠবার পথে যত রকম অন্তরায় আছে তার মধ্যে এই ছোটো ছোটো প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্সের উৎপাত সব চেয়ে মারাত্মক।

আমাদের আর একটা মুস্কিল আছে। লোকে বীমা কোম্পানির সঙ্গে লোন আফিসের সঙ্গে ডিভাইডিং প্ল্যানের কাজ গোলমাল করে ফেলে। একের দোষে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মহৎ প্রেরণা,—সন্দেহ, ঘৃণা ও অবিশ্বাসের বস্তু হ'য়ে উঠেছে। অবশ্য এ রকম হ'য়ে উঠেছে শুধু তাঁদের কাছেই যাঁরা ওগুলোর তফাৎ বোঝেন না। অর্থাৎ, মফঃস্বলবাসীদের কাছে; এবং মফঃস্বলবাসী অশিক্ষিতের কাছে। স্পষ্ট বল্‌তে,—তারা মনে করে সহর বাসী শিক্ষিত বাবুদের-লোক-ঠকাবার অভিনব উপায় হচ্ছে, ইনসিওরেন্স ও লোন আফিস। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু যখন দেখা যায়, আশপাশের গ্রামে কোনো বীমাকারীর মৃত্যু হোলো, আর কোম্পানি তার দায়িত্বের পূর্ণ টাকা দিয়ে দিলে, তখন সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুদূর অবধি একটা অদ্ভুত আন্দোলন সৃষ্ট হয়। দেখা যায়, ঠিক সেই সময় কোনো লোন আফিসের এজেন্ট গিয়ে যথা ইচ্ছা সেই উন্মুখ জনসঙ্ঘকে বুঝিয়ে কিছু টাকা বার করে নেয়। বলা বাহুল্য, তারপর সে টাকা পৃথিবীর কোন ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, বা লোন আফিসের জমার খাতায় উঠ্‌লো না। এবং বাষ্পের মত সে এজেন্টও কোথায় মিলিয়ে গেলেন। এখানে দেখা যায় লোন আফিসের দালাল টাকা আদায় করতে পার্‌লেন তার কারণ, জীবন-

বীমার প্রত্যক্ষ উপকারিতা দেশবাসীর চোখের সাম্‌নে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো বোলে। সরল গ্রামবাসীরা দেখ্‌ছে অমুক তিন্‌শো টাকা জমা দিয়ে, দু'হাজার টাকা পেয়েছে। এবং অমুক মারা যাবার পর সত্যি সত্যি তার ছেলেরা টাকা পেয়েছে। অতএব যে কোনো এজেন্ট এসে বলবে,—কলকাতায় আমাদের আফিস আছে; তুমি যত টাকা ধার দেবে, তার চতুর্গুণ টাকা তোমাকে বিনা বন্ধকে ধার দেওয়া হ'বে। তাকে বিশ্বাস করে কৃষক টাকা দেবে। তার কারণ, সকলেই চায় উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার হই। মরে গেলে কী হ'বে না হবে ভাবা পোষায় তারি, যার অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হ'লেও বেশ ভদ্রভাবে চলার পরেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। যারা এ জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় আহার বা পোষাক পায় না, যারা ঋণের জালে জড়িয়ে আছে, যারা পরিশ্রম করে উপার্জ্জন করবার কাজ পায় না, তারা কখনই মরণের পর তাদের ছেলেপুলেদের কী হ'বে এ ভাবনা ভাব্‌তে রাজী হয় না। কারই বা এমন অবস্থায় ভাব্‌তে ইচ্ছে করে? তারা জানে শরীর ভাল থাক্‌লে তার ছেলেরা পরিশ্রম করে খাবে।

লোন অফিসের কাজ এই জন্যে মফঃস্বলে বেশী জনপ্রিয়। তারা বোঝে সামান্য কিছু টাকা জমা রেখে যদি বেশী টাকা কর্জ্জ পাই, তা হ'লে মহাজনের দেনা মিটিয়ে নিজের মতে একটু চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারা যায়, কেমন ফসল ফলান যেতে পারে। এই আশায় নিশ্চিন্ত হয়ে লোন আফিসের এজেন্টকে তারা বিশ্বাস করে। তাও কিন্তু একটা জীবন-বীমার প্রত্যক্ষ কাজের ওপর বিশ্বাস রেখে। তারা বোঝে না বীমা ও লোন আফিস আলাদা।

সরল বিশ্বাসে যে একবার টাকা দিয়ে ঠকেছে, সে ছেড়ে তার গ্রামের আর কেউ কী কখনো বাইরে টাকা জমা রাখতে সাহসী হবে? একে তো তারা বলে, লেখা পড়া জানি না, আমাদের ও কাগজ-পত্তোর নিয়ে কী হবে? মরে গেলে কে লেখালেখি করে টাকা বার করবে, বাবু? তাদের মস্ত ভাবনা একটা চিঠি লিখ্‌তে হ'লে দশজনের শরণাপন্ন হ'তে হয়। এই ক্ষেত্রে তাদের কাছে কাজ আদায় করা কতো কঠিন, প্রকৃত কর্ম্মী তা জানেন। এবং যে সব কর্ম্মীরা এইরকম ক্ষেত্রে গিয়ে বীমার বাণী অক্ষুণ্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে আস্‌ছেন, প্রকৃত কর্ম্মী তাঁরাই। এঁদের কাছে লোকের নিরর্থক ঘৃণা, সন্দেহ, অবিশ্বাস মর্ম্মান্তিক,—অসহ্য। তবু তাঁরা সমস্ত সহ্য করে চেষ্টা করে চলেছেন বীমার বাণী প্রতিষ্ঠিত করতে। হয়ত তাঁরা কাজ আদায় করতে পারলেন না, কিন্তু যদি দু'জন লোককেও মিষ্টি কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারেন, তাহ'লে আরো বিশজনের কাজ পাবার পথ পরিষ্কার করে রাখলেন।

কিন্তু, তাঁদের এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা সমস্ত বিফল হয়ে যাচ্ছে, শুধু ওই গোটাকতক অর্থহীন প্রতিষ্ঠানের হীন আবহাওয়ায়। এর প্রতিকারের উপায় দু' দিক থেকে চেষ্টা করা দরকার।

প্রথম, গবর্ণমেণ্টের আইন। আইন—কোম্পানির গঠন আর কাজের ওপর নজর রাখ্‌বে। ডিরেক্টাররা দেখ্‌বেন, তাঁদের নাম আর প্রতিষ্ঠার আড়ালে কত স্বার্থান্বেষী দেশে একটা সার্ব্বজনীন জিনিষের ওপর সর্ব্বসাধারণের বিরাগ এনে দিচ্ছে। এ দেখে, তাঁরা তৎপর হবেন এর প্রতিকার করতে।

সরকারী হিসাব-পরীক্ষক নিখুঁতভাবে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখ্‌বে। এবং বিচক্ষণ একচুয়ারী নির্দ্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক হারে চাঁদা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

এই ত গেল বাহিরের কথা। ভেতরের কথা হচ্ছে, উপযুক্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করা। প্রতিনিধি হবে নিঃস্বার্থ, বাস্তবিক সমাজ-সেবক ও কর্ম্মী। প্রতিনিধিরা হাতে করে টাকা আদায় করতে পারবে না। টাকা সোজাসুজি কোম্পানির কাছে পাঠাবে বীমাকারী। অসম্ভব কাজ পাবার আশায় প্রতিনিধি কমিশন অসম্ভব রকম বেশী হওয়া উচিত নয়। কাজ সংগ্রহ করার খরচের হারের (Expense Ratio) ওপর কোম্পানির সারবত্তা নির্ভর করে। বীমা বা লোন কোম্পানির প্রতিনিধি বীমা বা লোন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ তিনি তাঁর কোম্পানির সমস্ত খুঁটিনাটী জেনে রাখ্‌বেন। যথা ডিরেক্টার কারা; তাঁদের পরিচয়। কোথায় টাকা লগ্নি করা হয়েছে।

কোম্পানি দেশের কী বিশেষ উপকার করেছে, বাণিজ্য বা শিল্প-জগতে। কত মূলধন; কত আদায় হয়েছে। কারা অংশীদার। ইত্যাদি বিষয় জলের মত তৈরী করে রাখ্‌তে হবে। তবেই তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করতে সমর্থ হবেন। আর যাঁদের উদ্দেশ্য নির্ম্মল বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি না করে যে কোনো রকমে হোক কিছু টাকা আত্মসাৎ করা, তাদের কথা আলাদা। তাঁরা যদি ইচ্ছে কোরে, এবং ইচ্ছে কোরে মিথ্যে কোরে নিজের প্রতিষ্ঠানকে দেশের অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বড়ো প্রমাণ করেন, তাহ'লে কার আর কী বলবার আছে বা থাকে ?

এ রকম প্রতিনিধি যেন ভবিষ্যতে আর না হয়, সে বিষয় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নজর রাখ্‌বে। প্রত্যেক প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে থাকা কর্ত্তব্য। অবশ্য যাঁরা দূরে বসে কাজ কচ্ছেন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখা। বলার উদ্দেশ্য, যতটা হয় ততটা ভালো। লোকেরও বিশ্বাস আসে তাহ'লে। দেখা যায় যে-এজেন্ট আফিসের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ, সাধারণের কাছে তার সম্মান একটু বেশী। তার কাজও স্বভাবতঃই ভালো হবে আশা করা যায়।

এইভাবে ভেতরে বাইরে সাবধান হ'লেই সুফল পাবার আশা করা যায়। এবং আমাদের মূল অভিযোগ যা, অসার জল বুদ্বুদের ন্যায় অসংখ্য প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্সের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আর এ উৎপাত শান্ত হলে বীমা কী কোরে প্রকৃত পথে অগ্রসর হয়ে প্রকৃত সৃষ্টির পথ সুগম করতে পারে, বাস্তবিক দেশের ও সমাজের উপকারে আস্‌তে পারে, ইত্যাদি কথা চিন্তা করতে ইচ্ছে করে।

তাই কথা হচ্ছে, ইন্সিওরেন্স আজো পুষ্ট হোলো না, জীবনেও হোলো না,...তার বাণী ছড়িয়ে পড়লো না দেশে, গ্রামে, জনপদে,...এরি মধ্যে ধ্বংসের করাল ছায়া ঘনিয়ে এল এর শিশু ললাটে! এমনি ভাগ্য বাংলার!

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার বসু

গ্রাম্যগীতি

রূপালী-গাঙ-নাইয়া

শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ও আমার রূপালী-গাঙ-নাইয়া!
তোমার আশায় ছিলাম বইস্যা দেখা নারে পাইয়া।
সোনালী পার বাইয়া তুমি কতই দেশে যাও
কতশত গেরাম বধূর দেখা যে তুমি পাও,
জল ভরতে আইস্যা ঘাটে থাকে কি পথ চাইয়া।
একটা গাঁয়ের কাছাকাছি বকুল গাছের সারি,
তার কাছে কি নাচে ও ভাই রক্ত জবার শাড়ী,
আমার হইয়া কইয়ো তুমি পরাণ খুইল্যা গাইয়া;
ঢেউয়ের তালে গাইয়ো তুমি বাতাস লাগ্‌লে পালে
খাঁটি হইয়া বইস্‌বে যখন বৈঠা লইয়া হালে,
কইয়ো শুধুই একটা কথা যাওরে যখন বাইয়া!
সেই কথাটাই কইতে আমি চাইয়াছিলাম তারে,
আর ত আমি যাইমু না ভাই বুড়ী গঙ্গার পারে,
বুক যে আমার ভাইঙ্গ্যা গেছে চোখের জলে বাইয়া



বোম্বাই কংগ্রেস

গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে বিহারের সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে সমারোহের সহিত কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেছে। সীমান্ত গান্ধীর নামানুসরণে কংগ্রেসপুরীর নাম আবদুল গফ্‌ফর নগর রাখা হয়েছিল। এবারকার অধিবেশনের প্রধান ঘটনা—কংগ্রেসের মূল নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন, পল্লী-শিল্প-সংঘ স্থাপন, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বিষয়ে 'না গ্রহণ না বর্জ্জন' নীতি কায়েম রাখা এবং লিখিত পদত্যাগপত্রের দ্বারা মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ।

'না গ্রহণ না বর্জ্জন' নীতি অবলম্বনের দ্বারা কংগ্রেস অধিকাংশ দেশবাসীর অসন্তোষ অর্জ্জন করেছেন। অসাম্প্রদায়িকতা কংগ্রেসের মূলমন্ত্র,—সর্ব্ব বিষয়ে কংগ্রেসের সকল সিদ্ধান্ত তদানুগ হওয়া উচিত। সুতরাং স্পষ্টোক্তির যেখানে প্রয়োজন আছে মৌনাবলম্বন সেখানে অপরাধ।

নিজ ব্যক্তিত্বের চাপ থেকে মুক্ত ক'রে কংগ্রেসকে স্বাধীন পথ ও মত অবলম্বন করবার সুযোগ দেবার অভিপ্রায়ে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস পরিত্যাগ করলেন। এ ঘটনা কংগ্রেসের পক্ষে শুভ হ'ল কি অশুভ হ'ল তা পরীক্ষা-সাপেক্ষ, অর্থাৎ সময়সাপেক্ষ। সুতরাং এখনই এ বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করা সমীচীন হবে না।

এবারকার কংগ্রেসের নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নেই। কুল গিয়ে বাঙ্গলাদেশ অকূলে ত ভেসেইছে, এবার শ্যামও যায় না কি?

নোবেল প্রাইজ—

এ বৎসর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ইটালীর নাট্যকার লুইসি পিরানডেলো। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম। ১৮ বৎসর বয়স থেকে সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করে প্রথম পাঁচ বছর কয়েকটি কবিতার বই ছাপিয়েছিলেন, তারপর পঁচিশ বৎসর ধরে কুড়ি খণ্ড ছোট গল্পের বই ও তিনটি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন। নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে। তাঁর প্রথম তিন অঙ্কের নাটক প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। তাঁর কয়েকখানি বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

শোক সংবাদ

বিগত ৬ই অক্টোবর ১৯৩৪ কলিকাতার স্বনামপ্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক মৃগেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েচেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৭ বৎসর হয়েছিল। অস্ত্রচিকিৎসায়, বিশেষত অস্থি চিকিৎসায়, মৃগেন্দ্রলাল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি এবং সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। কারমাইকেল মেডিকাল কলেজে তিনি অস্ত্র বিষয়ে প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। মৃগেন্দ্রলালের মৃত্যুতে শুধু কলিকাতার নয়, সমগ্র বাঙলা দেশের অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ে সমূহ ক্ষতি হ'ল।

গত ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৪ বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসেউটিক্যাল ওয়ার্কসের সুযোগ্য ম্যানেজার সুরেন্দ্রভূষণ সেন মহাশয় গিরিডিতে অবস্থিতি কালে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হয়েছিল। এই অল্পবয়সেই তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের মতো একটী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে উক্ত প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

আমরা উল্লিখিত দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শ্রীভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য পি-এচ্ ডি (লণ্ডন)

বিচিত্রার নিয়মিত পাঠকগণের নিকট শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্যের নাম অপরিচিত নয়। কিছুকাল পূর্ব্বে বিচিত্রায় তাঁর লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে অন্যান্য প্রসঙ্গেও তিনি বিচিত্রায় উল্লিখিত হয়েচেন। সম্প্রতি ভবানীচরণ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে পি-এচ্ ডি ডিগ্রি লাভ ক'রে গৌরবান্বিত হয়েচেন, এ কথা অবগত হ'য়ে বিচিত্রার পাঠকমাত্রেই সুখী হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।



শ্রীভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য

ভবানীচরণ বিহার-উড়িষ্যা সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেশন্‌স্ জজ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র। পাটনা কলেজ হ'তে ইংরাজি ভাষায় অনার্সের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে গত ১৯২৮ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, এবং তথায় ইতিহাসে অনার্সের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উচ্চতর শিক্ষা লাভের বাসনায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যোগ ছিন্ন না ক'রে তিনি সমধিক উৎসাহের সহিত আধুনিক ইতিহাস বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় রত হ'ন এবং যথাসময়ে উক্ত বিষয়ে একটি থীসিস্ প্রণয়ন ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমিতির হস্তে অর্পিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থীসিস্‌টি মনোনীত ক'রে গত ২৯শে অক্টোবর (১৯৩৪) ভবানীচরণকে পি-এচ্ ডি উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

ইংলণ্ডে ছয় বৎসর অবস্থিতিকালে তদ্দেশীয় কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকায়, যথা, স্পেক্টেটর্, ম্যাঞ্চেষ্টার-গার্ডেন, ইংলিশ রিভিউ প্রভৃতিতে, ভবানীচরণের লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েচে। ইংরাজি ভাষার একজন সুলেখক ব'লে তিনি ইংলণ্ডে স্বীকৃত। ১৯৩২ সালে তিনি তাঁর ইংরাজি ভাষায় প্রথম পুস্তক The Golden Boat রচিত করেন। লণ্ডনের সুবিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক জর্জ্জ অ্যালেন এণ্ড্ আন্‌উইন্ লিমিটেড্ উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ ক'রে সেই বৎসরই উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। বিলাতের সাহিত্যিক মহলে গোল্ডেন্ বোটের যথেষ্ট সমাদর হয়েচে।

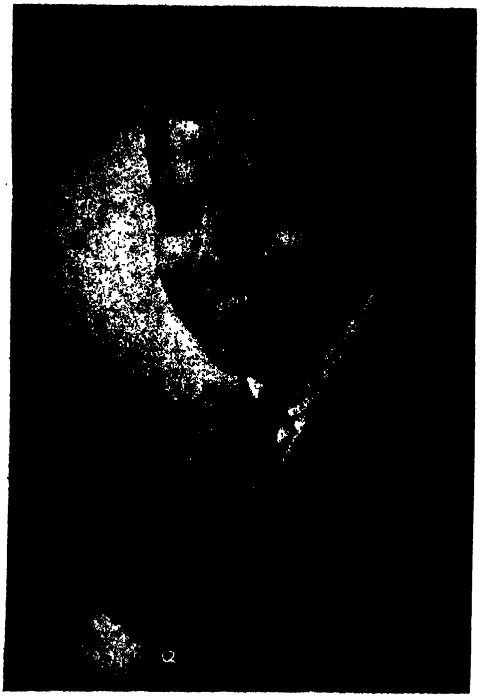
১৯৩০ সালে ভবানীচরণ ইয়োরোপের প্রধান স্থানগুলি পর্য্যটন করেন। উক্ত ভ্রমণ-কাহিনী বহুলভাবে চিত্রিত হ'য়ে মাদ্রাসের বিখ্যাত সংবাদপত্র "হিন্দু"তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার "ষ্টেট্‌সম্যান" এবং "বিচিত্রা" পত্রিকাতেও ভবানীচরণের অনেকগুলি লেখা প্রকাশিত হয়েচে। উপস্থিত তিনি মাসখানেক পরে দেশে প্রত্যাগমন ক'রে "England as I find her to-day" নামে একটি বই লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হবেন।

কিছুদিন হ'তে ভবানীচরণ লণ্ডনের P. E. N. ক্লাবের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বি এস-সি, এ এস এ-এ (লণ্ডন)

সম্মানের সহিত Incorporated Accountantship পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে পৌঁছেচেন। বোম্বাইয়ে কে এস্ আয়ারের ফার্মে তিন বৎসর শিক্ষানবীশী ক'রে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি বিলাত গমন করেন। ধীরেন্দ্রনাথের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাটী গ্রামে। তাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বম্বের টাটা কন্‌ষ্ট্রাক্‌শন্ কোম্পানী লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রনাথের খুল্লতাত।



শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধীরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ কর্ম্মময় জীবন উজ্জ্বল হোক্, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

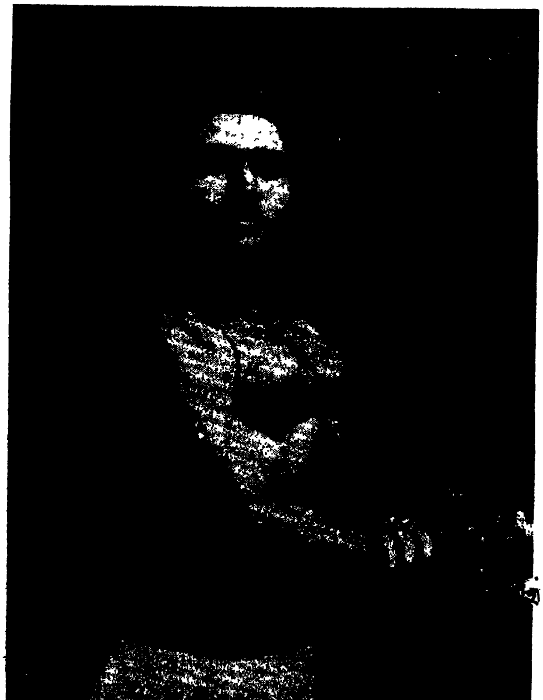
ব্যায়ামবীর ললিত রায়

বাঙ্গলাদেশে ব্যায়াম-চর্চ্চার উন্নতির উচ্চ স্তরে যাঁরা আরোহণ করেছেন ললিত রায় তাঁদের মধ্যে একজন। ইনি বাঙ্গলাদেশে এবং বাঙ্গলার বাহিরে, বহু স্থানে শারীরিক ক্রীড়া কৌশলাদি দেখিয়ে দেশবাসীকে চমৎকৃত করেছেন। তিনি ৪।৫ টন ওজনের রোলার অবলীলাক্রমে বুকের উপর দিয়ে পার করতে পারেন। লৌহশিকল ছিঁড়ে ফেলতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু তাঁর কৌশল তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন রিং খেলার মধ্যে। শৈশবকাল হ'তে তিনি এই খেলাই বিশেষ ভালবাসতেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর বিষ্ণুবাবুর নাম ইনি অনেকদিন হ'তে শুনতে পান ও সৌভাগ্যক্রমে ক্রমশঃ তাঁর সহিত পরিচিত হন ও শরীর চর্চ্চার নানারকম কৌশলাদি শিক্ষা করেন। পরে ইনি তাঁরই শরীর শিক্ষা কলেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন।

ইনি ৫।৬ মাস পূর্ব্বে সন্তোষের রাজবাটীতে নিমন্ত্রিত হন ও বাঙ্গালার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনের সম্মুখে লৌহ গোলকের ক্রীড়া প্রদর্শন করে সকলকে চমৎকৃত করেন। ললিতবাবু বিষ্ণুবাবুর সহিত গত বৎসর রেঙ্গুনে যান ও সেখানে তাঁর নানাবিধ শারীরিক শক্তির কৌশলাদি প্রদর্শন করেন। সেখানকার প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর মিঃ চিন্তুন ও লিভারম্যানের ছাত্র মিঃ সাইমন জেডিয়ার্ড, তাঁর রিংয়ের খেলা দেখে বলেছেন যে ললিত রায় সত্য সত্যই রিং খেলায় যাদুকর। সাইমন আরও বলেছেন যে এব্রাষ্টির পরে ইনি এ রকম অদ্ভুত রিংয়ের খেলা আর কখনও দেখেননি। ইনি রেঙ্গুন "All Sports Magazine"এর পক্ষ থেকে রৌপ্য-পদক এবং সেখানকার বিখ্যাত ব্যায়ামবীর রবার্টসনের কাছ থেকে স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

গত ২৫শে জুলাই নবাব খাঁ বাহাদুর কাজী গোলাম মহীউদ্দীন ফরুকি ললিতবাবুকে তাঁর ক্রীড়া দেখাবার জন্য তাঁর বাটীতে নিমন্ত্রণ করেন। তথায় তিনি মহামান্য বাঙ্গলার গভর্ণরের সম্মুখে লৌহ-কণ্টক-শয্যায় শয়ন ক'রে বুকের উপর ১৫ মণ ওজনের ভার ধারণ ক'রে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।



শ্রীললিতমোহন রায়

উপস্থিত ললিতবাবু স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কার বাটীতে শরীর-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works



বিচিত্রা
পৌষ, ১৩৩৪

পৌষ পার্ব্বণ

শ্রীইন্দু রক্ষিত

বিচিত্রা

অষ্টম বর্ষ, ১ম খণ্ড	পৌষ, ১৩৪১	৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিপ্রদাস

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৫

বন্দনার নির্ব্বিঘ্নে বোম্বায়ে পৌঁছানো-সংবাদের উত্তরে দিনকয়েক পরে দ্বিজদাসের নিকট হইতে জবাব আসিয়াছিল যে, সে নানাকাজে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে চিঠি লিখিতে পারে নাই। বন্দনা নিজের চোখে যেমন দেখিয়া গেছে সমস্ত তেমনি চলিতেছে। বিশেষ করিয়া জানাইবার কিছু নাই। মৈত্রেয়ীর পিতা কলিকাতায় ফিরিয়া গেছেন কিন্তু সে নিজে এখনও এ বাড়ীতেই আছে। মায়ের সেবা-যত্নে তাহার ত্রুটি ধরিবার কিছু নাই, সংসারের ভারও তাহারি উপরে পড়িয়াছে। ভালোই চালাইতেছে। বাড়ীর সকলেই তাহার প্রতি খুসি। দ্বিজদাসের নিজের পক্ষ হইতেও আজিও অভিযোগের কারণ ঘটে নাই। পরিশেষে, বন্দনা ও তাহার পিতার শুভকামনা করিয়া ও যথাবিধি নমস্কারাদি জানাইয়া সে পত্র সমাপ্ত করিয়াছে।

ইহার পরে তিনমাসেরও অধিক সময় কাটিয়াছে কিন্তু কোন পক্ষ হইতেই আর পত্রাদির আদান-প্রদান হয় নাই। বিপ্রদাসের, মেজদিদির, বাসুর সংবাদ জানিতে মাঝে মাঝে বন্দনার মন উতলা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জানিবার উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। নিজে হইতে তাঁহারা আজও খবর দেন নাই,— কোথায় আছেন, কেমন আছেন সমস্তই অপরিজ্ঞাত। ইহারই সুপারিশ করিতে দ্বিজদাসকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিবার লজ্জা এত বড় যে, শত ইচ্ছা সত্ত্বেও একাজ তাহার কাছে অসাধ্য ঠেকিয়াছে। এখন বলরামপুরের স্মৃতির তীক্ষ্ণতা ও বেদনার তীব্রতা দুই-ই অনেক লঘু হইয়া গেছে কিন্তু সেখান হইতে চলিয়া আসার পরে সে প্রায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দিনের পর দিন করিয়া ব্যথাতুর বিক্ষুব্ধ চিত্ত-তল ধীরে ধীরে যতই শান্ত হইয়া আসিয়াছে ততই উপলব্ধি করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধ কোন সত্যকার সম্বন্ধ নহে। একত্র-বাসের সেই দুঃখে-সুখে ভরা অনির্ব্বচনীয় দিনগুলি বিচিত্র ঘনিষ্ঠতায় মনের মধ্যে যতই কেননা নিবিড়তার মোহ সঞ্চার করিয়া থাক আয়ু তার ক্ষণস্থায়ী। একথা বুঝিতে তাহার বাকী নাই যে, এই আচার-নিষ্ঠ প্রাচীন-পন্থী মুখুয্যে পরিবারের কাছে সে আবশ্যকও

নয়, আপনারও নয়। উভয় পক্ষের শিক্ষা সংস্কার ও সামাজিক পরিবেষ্টন যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যেমন সত্য, তেমনি কঠিন।

ইতিমধ্যে স্বামীর কর্ম্মস্থল পঞ্জাব হইতে মাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শরীর ভালো নয়। পঞ্জাবের চেয়ে বোম্বায়ের জল-বাতাস ভালো এবুদ্ধি তাঁহাকে কোন্ ডাক্তার দিয়াছে সে তিনিই জানেন। কিন্তু আসিয়াছেন স্বাস্থ্যের অজুহাতে। বোম্বাই আসিবার পূর্ব্বে বন্দনা দেখা করিয়া আসে নাই এ অভিযোগ তাঁহার মনের মধ্যে ছিল, কিন্তু বোন্-ঝির মেজাজের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন তাহাতে ভগিনী-পতি রে-সাহেবের দরবারে প্রকাশ্য নালিশ রুজু করিবার সাহস ছিল না, তথাপি খাবার টেবিলে বসিয়া কথাটা তিনি ইঙ্গিতে পাড়িলেন। বলিলেন, মিষ্টার রে, এটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনে, কিন্তু আমি অনেক দেখেচি বাপ মায়ের এক ছেলে কিম্বা এক মেয়ে এমনি একগুঁয়ে হয়ে ওঠে যে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না।

সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং দেখা গেল দৃষ্টান্ত তাঁহার হাতের কাছেই মজুত আছে। সানন্দে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এই যেমন আমার বুড়ী। একবার না বল্‌লে হাঁ বলায় সাধ্য কার? ওর ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি—

বন্দনা কহিল, তাই বুঝি তোমার অবাধ্য মেয়েকে ভালোবাসোনা বাবা?

সাহেব সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, তুমি আমার অবাধ্য মেয়ে? কোনদিন না। কেউ বলতে পারেনা।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল,—এইমাত্র যে তুমিই বললে বাবা।

—আমি? কখনো না।

শুনিয়া মাসী পর্য্যন্ত না হাসিয়া পারিলনা।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবা, তোমার মতো আমার মা-ও কি আমাকে দেখতে পারতেননা?

সাহেব বলিলেন, তোমার মা? এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কতবার ঝগড়া হয়েছে। ছেলেবেলা তুমি একবার আমার ঘড়ি ভেঙেছিলে। তোমার মা রাগ করে কান মলে দিলেন, তুমি কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে এলে আমার কাছে। আমি বুকে তুলে নিলাম। সেদিন তোমার মার সঙ্গে আমি সারাদিন কথা কইনি। বলিতে বলিতে তিনি পূর্ব্বস্মৃতির আবেগে উঠিয়া আসিয়া মেয়ের মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিলেন।

বন্দনা বলিল, ছেলেবেলার মতো এখন কেন ভালোবাসোনা বাবা?

সাহেব মাসীকে আবেদন করিলেন,—শুনলেন মিসেস ঘোষাল, বুড়ির কথা?

বন্দনা কহিল, কেন তবে যখন্ তখন্ বলো আমার বিয়ে দিয়ে ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলতে চাও? আমি বুঝি তোমার চোখের বালি?

—শুনচেন মিসেস্ ঘোষাল, মেয়েটার কথা?

মাসি বলিলেন, সত্যি বন্দনা। মেয়ে বড় হলে বাপ-মায়ের কি যে বিষম দুশ্চিন্তা নিজের মেয়ে হলে একদিন বুঝবে।

—আমি বুঝতে চাইনে মাসিমা।

—কিন্তু পিতার কর্ত্তব্য রয়েছে যে মা। বাপ-মাতো চিরজীবী নয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ না ভাবলে তাঁদের অপরাধ হয়। কেন যে তোমার বাবা মনের মধ্যে শান্তি পাননা সে শুধু যারা নিজেরা বাপ-মা তারাই জানে। তোমার বোন্ প্রকৃতির যতদিন না আমি বিয়ে দিতে পেরেছি ততদিন খেতে পারিনি ঘুমোতে পারিনি। কত রাত্রি যে জেগে কেটেছে সে তুমি বুঝবেনা কিন্তু তোমার বাবা বুঝবেন। তোমার মা বেঁচে থাকলে আজ তাঁরও আমার দশাই হতো।

রে-সাহেব মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, খুব সত্যি মিসেস্ ঘোষাল।

মাসী তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ ওর মা বেঁচে থাকলে বন্দনার জন্যে আপনাকে তিনি অস্থির করে তুলতেন। আমি নিজেই কি কম করেছি ওঁকে। এখন মনে করলেও লজ্জা হয়।

সাহেব সায় দিয়া বলিলেন, দোষ নেই আপনার। ঠিক এমনিই হয় যে।

মাসী বলিতে লাগিলেন, তাইত জানি। কেবলি ভাবনা হয় নিজেদের বয়েস বাড়চে,—মানুষের বেঁচে থাকার ত স্থিরতা নেই—বেঁচে থাকতে মেয়েটার যদি না কোন উপায় করে যেতে পারি হঠাৎ কিছু একটা ঘট্‌লে কি হবে। ভয়ে উনি ত একরকম শুকিয়ে উঠেছিলেন।

বন্দনা আর সহিতে পারিল না, চাহিয়া দেখিল তাহার বাবার মুখও ভয়ে শুকাইয়া উঠিয়াছে, খাওয়া বন্ধ হইয়াছে, বলিল, তুমি মেসোমশাইকে অকারণে নানা ভয় দেখিয়েছো মাসিমা, আবার আমার বাবাকেও দেখাচ্ছো। কি-এমন হয়েছে বলো ত? বাবা এখনো অনেক অনেকদিন বাঁচবেন। তাঁর মেয়ের জন্যে যা' ভালো করে যাবার ঢের সময় পাবেন। তুমি মিথ্যে ভাবনা বাড়িয়ে দিও না বাবার।

মাসী দমিবার পাত্রী নহেন। বিশেষতঃ, রে-সাহেব তাঁহাকেই সমর্থন করিয়া বলিলেন, তোমার মাসিমা ঠিক কথাই বলেছেন বন্দনা। সত্যিই ত আমার শরীর ভালো নয়, সত্যিই ত এ দেহকে বেশি বিশ্বাস করা চলে না। উনি আত্মীয়, সময় থাকৃতে উনি যদি সতর্ক না করেন কে করবে বলো ত? এই বলিয়া তিনি উভয়ের প্রতিই চাহিলেন। মাসী কটাক্ষে চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখ ছায়াচ্ছন্ন হইয়াছে, অপ্রতিভ-কণ্ঠে ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, এ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত মিষ্টার-রে। আপনার একশ বছর পরমায়ু হোক্ আমরা সবাই প্রার্থনা করি, আমি শুধু বলতে চেয়েছিলুম—

সাহেব বাধা দিলেন—না, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যিই স্বাস্থ্য আমার ভালো না। সময়ে সাবধান না হওয়া, কর্ত্তব্যে অবহেলা করা আমার পক্ষে সত্যিই অন্যায়।

বন্দনা গূঢ় ক্রোধ দমন করিয়া বলিল, আজ বাবার খাওয়া হবে না মাসিমা।

মাসী বলিলেন, থাক্ এ সব আলোচনা মিষ্টার-রে। আপনার খাওয়া না হলে আমি ভারি কষ্ট পাবো।

সাহেবের আহারে রুচি চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি জোর করিয়া তিনি একটুক্‌রা মাংস কাটিয়া মুখে পুরিলেন। অতঃপর খাওয়ার কার্য্য কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবেই চলিল।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, জামাইয়ের প্র্যাক্‌টিস্ কি রকম হচ্চে মিসেস্ ঘোষাল?

মাসী জবাব দিলেন, এই ত আরম্ভ করেছেন। শুনতে পাই মন্দ না।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে তিনি মুখের গ্রাসটা গিলিয়া লইয়া কহিলেন, প্র্যাক্‌টিস্ যাই হোক মিষ্টার-রে, আমি এইটেই খুব বড় মনে করিনে। আমি বলি তার চেয়েও ঢের বড় মানুষের চরিত্র। সে নির্ম্মল না হলে কোন মেয়েই কোনদিন যথার্থ সুখী হতে পারে না।

তাতে আর সন্দেহ আছে কি!

মাসী বলিতে লাগিলেন, আমার মুস্কিল হয়েছে বাপের বাড়ীর শিক্ষা-সংস্কার, তাঁদের দৃষ্টান্ত আমার মনে গাঁথা। তার থেকে একতিল কোথাও কম দেখলে আর সইতে পারিনে। আমার অশোককে দেখলে সেই নৈতিক আব-হাওয়ার কথা মনে পড়ে ছেলে-বেলায় যার মধ্যে আমি মানুষ। আমার বাবা, আমার দাদা—এই অশোকও হয়েছে ঠিক তাঁদের মতো। তেমনি সরল তেমনি উদার তেমনি চরিত্রবান।

রে-সাহেব সম্পূর্ণ মানিয়া লইলেন, বলিলেন, আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছে মিসেস ঘোষাল। ছেলেটি অতি সৎ। ছ'-সাতদিন এখানে ছিল তার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে সাক্ষ্য মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিস বুড়ি, অশোককে আমাদের কি ভালোই লেগেছিল। যেদিন চলে গেল আমার ত সমস্ত দিন মন খারাপ হয়ে রইলো।

বন্দনা স্বীকার করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, চমৎকার মানুষ। যেমন বিনয়ী তেমনি ভদ্র। আমার ত কোন অনুরোধে কখনো না বলেননি। আমাকে বোম্বায়ে তিনি না পৌঁছে দিলে আমার বিপদ হতো।

মাসী বলিলেন, আর একটা জিনিষ বোধহয় লক্ষ্য করেছো বন্দনা, ওর স্নবরি নেই। যেটি আজকালকার দিনে দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয় যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই দেখতে পাওয়া যায়।

বন্দনা সহাস্যে কহিল, তোমার বাড়ীতে কোন স্নবের দেখা তো কোনোদিন পাইনি মাসিমা।

মাসী হাসিয়া বলিলেন, পেয়েছো বই কি মা। তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তোমাকে ঠকাবে তারা কি কোরে?

শুনিয়া রে-সাহেবও হাসিলেন, কথাটি তাঁহার ভারি ভালো লাগিল। বলিলেন, এত বুদ্ধি সচরাচর মেলে না মিসেস ঘোষাল। বাপের মুখে এ কথা গর্ব্বের মতো শুনতে, কিন্তু না বলেও পারিনে।

বন্দনা বলিল, এ প্রসঙ্গ তুমি বন্ধ করো মাসিমা, নইলে বাবাকে সাম্‌লানো যাবে না। তুমি এক-মেয়ের দোষগুলোই দেখেছো কিন্তু দেখোনি যে এক-মেয়ের বাপেদের মতো দাম্ভিক লোকও পৃথিবীতে কম। আমার বাবার ধারণা ওঁর মেয়ের মতো মেয়ে সংসারে আর দ্বিতীয় নেই।

মাসী বলিলেন, সে-ধারণার আমিও বড় অংশীদার বন্দনা। শাস্তি পেতে হলে আমারও পাওয়া উচিত।

পিতার মুখে অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তির মৃদু-হাসি, কহিলেন, আমি দাম্ভিক কি না জানিনে কিন্তু জানি কন্যা-রত্নে আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান। এমন মেয়ে কম বাপেই পায়।

বন্দনা বলিল, বাবা, কই আজ তো তুমি একটিও সন্দেশ খেলে না? ভালো হয়নি বুঝি?

সাহেব প্লেট হইতে আধখানা সন্দেশ ভাঙিয়া লইয়া মুখে দিলেন, বলিলেন, সমস্ত বুড়ির নিজের হাতের তৈরি। এবার কলকাতা থেকে ফিরে পর্য্যন্ত ও সমস্ত খাওয়া বদ্‌লে দিয়েছে। ডাল্‌না, সুক্ত, মাছের ঝোল, দই সন্দেশ আরও কত-কি। কার কাছে শুনে এসেছে জানিনে কিন্তু বাড়ীতে মাংস প্রায় আনতেই দেয় না। বলে বাবার ওতে অসুখ করে। দেখুন মিসেস ঘোষাল, এই সব বাঙ্‌লা খাওয়া খেয়ে মনে হয় যেন বুড়ো বয়সে আছি ভালো। বেশ যেন একটু ক্ষিদে বোধ করি।

বন্দনা বলিল, মাসিমার অভ্যেস নেই, হয়ত কষ্ট হয়।

মাসী এই গূঢ় বিদ্রূপ লক্ষ্য করিলেন না, কহিলেন, না-না, কষ্ট হবে কেন, এ আমার ভালোই লাগে। শুধু আব-হাওয়ার চেঞ্জই ত নয়, খাবার চেঞ্জও বড় দরকার। তাই বোধ করি শরীর আমার এত শীঘ্র ভালো হয়ে গেল।

—ভালো হয়েছে, না মাসিমা?

—নিশ্চয় হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই।

—তাহলে আর কিছুদিন থাকো। আরও ভালো হোক্।

—কিন্তু বেশীদিন থাক্‌বার যে জো নেই বন্দনা। অশোক লিখেচে এ মাসের শেষেই সে পঞ্জাবে চেঞ্জের জন্যে আসবে। তার আগে আমার তো ফিরে যাওয়া চাই।

ভোজন-পর্ব্ব সমাধা হইয়াছিল, সাহেব উঠি-উঠি করিতেছিলেন,—মাসী মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রস্তাব উত্থাপনের স্বপক্ষে যে অনুকূল আব-হাওয়া সৃষ্টি করিয়া আনিয়াছেন তাহা চক্ষু-লজ্জায় ভ্রষ্ট হইতে দিলে ফিরাইয়া আনা হয় ত দুরূহ হইবে। সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া বলিলেন, মিষ্টার-রে, একটা কথা ছিল যদি সময় না—

সাহেব তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, না না, সময় আছে বই কি। বলুন কি কথা।

মাসী বলিলেন, আমি শুনেচি বন্দনার অমত নেই। অশোক অর্থশালী নয় সত্যি, কিন্তু সুশিক্ষা ও চরিত্রবলে struggle করে একদিন ও উঠবেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি যদি ওকে আপনার মেয়ের অযোগ্য বিবেচনা না করেন ত—

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, কিন্তু সে কি ক'রে হতে পারে মিসেস ঘোষাল? অশোক আপনার ভাই-পো, সম্পর্কে সেও তো বন্দনার মামাতো ভাই।

মাসী বলিলেন, শুধু নামে, নইলে বহু দূরের সম্বন্ধ। আমার দিদিমা এবং বন্দনার মায়ের দিদিমা দুজনে বোন ছিলেন, সেই সম্পর্কেই বন্দনার আমি মাসী। এ বিবাহ নিষিদ্ধ হতে পারে না মিষ্টার-রে।

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ হয় মনে মনে কি-একটা হিসাব করিলেন, তারপরে বলিলেন, অশোককে যতটুকু আমি নিজে দেখেছি এবং যতটুকু বন্দনার মুখে শুনেছি তাতে অযোগ্য মনে করিনে। মেয়ের বিয়ে একদিন আমাকে দিতেই হবে, কিন্তু তার নিজের অভিমত তো জানা দরকার।

মাসী স্নেহের কণ্ঠে উৎসাহ দিয়া কহিলেন, লজ্জা কোরো না মা, বলো তোমার বাবাকে কি তোমার ইচ্ছে।

বন্দনার মুখ পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণে সুস্পষ্টস্বরে বলিল, আমার ইচ্ছেকে আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি মাসিমা। সে খোঁজ করার দরকার নেই।

সাহেব সভয়ে কহিলেন, এর মানে?

বন্দনা বলিল, মানে ঠিক তোমাদের আমি বুঝিয়ে বলতে পারবোনা বাবা। কিন্তু তাই বলে ভেবোনা যেন আমি বাধা দিচ্চি। একটু থামিয়া কহিল, আমার সতী দিদির বিয়ে হয়েছিল তাঁর ন'বছর বয়সে। বাপ-মা যাঁর হাতে তাঁকে সমর্পণ করলেন মেজদি তাঁকেই নিলেন, নিজের বুদ্ধিতে বেছে নেননি। তবু, ভাগ্যে যাঁকে পেলেন সে-স্বামী জগতে দুর্লভ। আমি সেই ভাগ্যকেই বিশ্বাস করবো বাবা। বিপ্রদাস বাবু সাধুপুরুষ, আসবার আগে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন যেখানে আমার কল্যাণ ভগবান সেখানেই আমাকে দেবেন! তাঁর সেই কথা কখনো মিথ্যে হবে না। তুমি আমাকে যা আদেশ করবে আমি তাই পালন করবো। মনের মধ্যে কোন সংশয় কোন ভয় রাখবোনা।

সাহেব বিস্ময়ে স্থির হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

মাসী বলিলেন, বিয়ের সময় তোমার মেজদি ছিলেন বালিকা, তাই তাঁর মতামতের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তুমি তা নও, বড় হয়েছো, নিজের ভালো-মন্দের দায়িত্ব তোমার নিজের, এমন চোখ বুজে ভাগ্যের খেলাত তোমার সাজে না বন্দনা।

—সাজে কি না জানিনে মাসি মা, কিন্তু তাঁর মতো তেমনি করেই ভাগ্যকে আমি প্রসন্ন মনে মেনে নেবো।

—কিন্তু এমন উদাসীনের মতো কথা বললে তোমার বাবা মনস্থির করবেন কি ক'রে?

—যেমন করে ওঁর দাদা করেছিলেন সতী দিদির সম্বন্ধে, যেমন ক'রে ওঁর সকল পূর্ব্ব পুরুষরাই দিয়েছিলেন তাঁদের ছেলে-মেয়ের বিবাহ আমার সম্বন্ধেও বাবা তেমনি করেই মনস্থির করুন।

—তুমি নিজে কিছুই দেখবে না কিছুই ভাববে না?

—ভাবা-ভাবি, দেখা-দেখি অনেক দেখলুম মাসি মা। আর না। এখন নির্ভর করবো বাবার আশীর্ব্বাদে আর সেই ভাগ্যের পরে যার শেষ কেউ আজও দেখতে পায় নি।

মাসী হতাশ হইয়া একটুখানি তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, ভাগ্যকে আমরাও মানি, কিন্তু তোমার সমাজ, শিক্ষা সংস্কার সব ডুবিয়ে দিয়ে মুখুয্যেদের এই ক'দিনের সংস্রব যে তোমাকে এতখানি আচ্ছন্ন করবে তা ভাবিনি। তোমার কথা শুনলে মনে হয় না যে তুমি আমাদের সেই বন্দনা। যেন একেবারে আমাদের থেকে পর হয়ে গেছো।

বন্দনা বলিল, না মাসি মা, আমি পর হয়ে যাই নি। তাঁদের আপনার করতে আমার কাউকে পর করতে হবেনা এ-কথা নিশ্চয় জেনে এসেছি। আমাকে নিয়ে তোমরা কোন শঙ্কা কোরোনা।

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, তা'হলে অশোককে আসতে একটা টেলিগ্রাম করে দিই?

—দাও। আমার কোন আপত্তি নেই। এই বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিষ্টার রে, আপনার নাম করেই তবে টেলিগ্রামটা পাঠাই—বলিয়া মাসী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে

দেখিলেন সাহেবের দুই চোখ অকস্মাৎ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না এবং সাহেব ধীরে ধীরে যখন বলিলেন, টেলিগ্রাম আজ থাক মিসেস ঘোষাল, তখনও হেতু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, থাকবে কেন মিষ্টার-রে, বন্দনা ত সম্মতি দিয়ে গেল।

না না, আজ থাক্, বলিয়া তিনি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। এই নীরবতা এবং ঐ অশ্রু-জল মাসীকে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করিল। একজন প্রবীণ পদস্থ লোকের এইরূপ সেন্টিমেণ্টালিটি তাঁহার অসহ্য। কিন্তু জিদ্ করিতেও সাহস করিলেন না। মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া সাহেব বলিলেন, ওর বাপের ভাবনা আমি ভেবেচি, কিন্তু ওর মা নেই তাঁর ভাবনাও আমাকেই ভাবতে হবে মিসেস ঘোষাল। একটু সময় চাই।

মাসী মনে মনে বলিলেন, আর একটা ষ্টুপিড সেন্টিমেণ্টালিটি। সাহেব অনুমান করিলেন কিনা জানি না, কিন্তু এবার জোর করিয়া একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মুস্কিল হয়েছে ওর কথা আমরা কেউ ভালো বুঝতে পারিনে। শুধু আজ নয়, বাংলা থেকে আসা পর্য্যন্তই মনে হয় ঠিক যেন ওকে বুঝতে পারিনে। ও সম্মতি দিলে বটে, কিন্তু সে—ও, না ওর নতুন-রিলিজন ভেবেই পেলুম না।

—নতুন রিলিজন? মানে?

—মানে আমিও জানিনে। কিন্তু বেশ দেখতে পাই বাঙ্লা থেকে ও কি-যেন একটা সঙ্গে করে এনেছে, সে রাত্রি-দিন থাকে ওকে ঘিরে। ওর খাওয়া গেছে বদলে, কথা গেছে বদলে, ওর চলা-ফেরা পর্য্যন্ত মনে হয় যেন আগেকার মতো নেই। ভোর বেলায় স্নান ক'রে আমার ঘরে গিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় নেয়। বলি বুড়ি, আগেত তুই এ সব করতিস্‌নে? তখন জানতুমনা বাবা। এখন তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে দিন আরম্ভ করি, বেশ বুঝতে পারি সে আমাকে সমস্ত দিন সমস্ত কাজে রক্ষে করে চলে। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু পুনরায় অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল।

মাসী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এ সব নতুন ধাঁচা শিখে এসেছে ও মুখুয্যেদের বাড়ীতে। জানেন ত তাঁরা কি রকম গোঁড়া? কিন্তু এ-কে রিলিজন বলে না, বলে কুসংস্কার। ও পুজো-টুজো করে নাকি?

সাহেব বলিলেন, জানিনে করে কি না। হয়ত করে না। কুসংস্কার বলে আমারও মনে হয়েছে, নিষেধ করতেও গেছি, কিন্তু বুড়ি আগেকার মতো আর ত তর্ক করে না, শুধু চুপ করে চেয়ে থাকে। আমারও মুখ যায় বন্ধ হয়ে—কিছুই বলতে পারিনে।

মাসী বলিলেন, এ আপনার দুর্ব্বলতা। কিন্তু নিশ্চিত জানবেন এ-কে রিলিজন বলেনা, বলে শুধু সুপারষ্টিশন। এ-কে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়! অপরাধ!

সাহেব দ্বিধাভরে আস্তে আস্তে বলিলেন, তাই হবে বোধ হয়। রিলিজন কথাটা মুখেই বলি, কখনো নিজেও চর্চ্চা করিনি, এর নেচার কি তা-ও জানিনে, শুধু মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি মেয়েটাকে এমন আগাগোড়া বদলে দিলে কিসে? সে হাসি নেই, আনন্দের চঞ্চলতা নেই, বর্ষাদিনের ফুটন্ত ফুলের মতো পাপড়িগুলি যেন জলে ভিজে। কখনো ডেকে বলি বুড়ি, আমাকে লুকোসনে মা, তোর ভেতরে

ভেতরে কোন অসুখ করেনি ত? অম্‌নি হেসে মাথা দুলিয়ে বলে, না বাবা, আমি ভালো আছি, আমার কোন অসুখ নেই। হাসিমুখে ঘরের কাজে চলে যায়, আমার কিন্তু বুকের পাঁজর ভেঙে পড়তে চায় মিসেস ঘোষাল। ঐ একটি মেয়ে, মা নেই নিজের হাতে মানুষ করে এত বড়টি করেছি,—সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি আমার সেই বন্দনাকে আবার তেম্‌নি ফিরে পাই—

মাসী জোর দিয়া বলিলেন, পাবেন। আমি কথা দিচ্চি পাবেন। এ শুধু একটা সাময়িক অবসাদ, ধর্ম্মের ঝোঁক হলেও হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অসার। কেবল ওঁদের সংসর্গে আসার ক্ষণিক বিকার, বিবাহ দিন সমস্ত দু'দিনে সেরে যাবে। চিরদিনের শিক্ষাই মানুষের থাকে মিষ্টার রে, দুদিনের বাতিক দুদিনেই ফুরোয়।

সাহেব আশ্বস্ত হইলেন তথাপি সন্দেহ ঘুচিলনা। বলিলেন, ও কোথায় কার কাছে কি প্রেরণা পেলে জানিনে, কিন্তু শুনেচি সে যদি আসে সত্যিকার মানুষ থেকে কিছুতে সে ঘোচে না। মানুষের চিরদিনের অভ্যাস দেয় একমুহূর্ত্তে বদ্‌লে। নেশা গিয়ে মেশে রক্তের ধারায়, সমস্ত জীবনে তার আর ঘোর কাটেনা। সেই আমার ভয় মিসেস ঘোষাল।

প্রত্যুত্তরে মাসী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন, বলিলেন, বাজে বাজে। আমি অনেক দেখেচি মিষ্টার রে—দুদিন পরে আর কিছুই থাকেনা। আবার যা'কে তাই হয়। কিন্তু বাড়তে দেওয়াও চলবেনা,—আজই অশোককে একটা তার করে দিই—সে এসে পড়ুক।

—আজই দেবেন?

—হাঁ আজই। এবং আপনার নামেই।

সাহেব মৃদুকণ্ঠে সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, যা ভালো হয় করুন। আমি জানি অশোক ভালো ছেলে। চরিত্রবান্, সৎ—তা নইলে ওকে সঙ্গে নিয়ে বন্দনা কিছুতে আসতে রাজি হতো না।

মাসী এই কথাটাকেই আর একবার ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া বলিতে গেলেন কিন্তু বাধা পড়িল। বন্দনা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবা আজ হাজি-সাহেবের মেয়েরা আমাকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছে। দুপুরবেলা যাবো,—বিকালে আফিসের ফেরৎ আমাকে বাড়ী নিয়ে এসো।

মাসী প্রশ্ন করিলেন, তাঁদের বাড়ীতে তুমি ত কিছু খাবেনা বন্দনা?

—না মাসিমা।

—কেন?

—আমার ইচ্ছে করে না। বাবা, তুমি ভুলে যাবে না তো?

—না মা, তোমাকে আনতে ভুলে যাবো এমন কখন হয়? এই বলিয়া সাহেব একটু হাসিলেন। বলিলেন, অশোক আসচেন। তাঁকে আজ একটা তার করে দেবো।

—বেশ ত বাবা, দাওনা।

মাসী বলিলেন, আমিই জোর করে তাকে আন্‌চি। দেখো, এলে যেননা অসম্মান হয়।

—তোমার ভয় নেই মাসিমা, আমরা কারো অসম্মান করিনে। অশোকবাবু নিজেই জানেন।

মেয়ের কথা শুনিয়া সাহেব প্রসন্ন মুখে বলিলেন, আফিসের পথে আজই তারে একটা টেলিগ্রাম করে দেবো বুড়ি। আজ শুক্রবার, সোমবারেই সে এসে পৌঁছতে পারবে যদিনা কোন ব্যাঘাত ঘটে।

দরওয়ান ডাক লইয়া হাজির হইল। অসংখ্য সংবাদ-পত্র নানাস্থানের। চিঠি-পত্রও কম নয়। কিছুদিন হইতে ডাকের প্রতি বন্দনার ঔৎসুক্য ছিল না। সে জানিত প্রতিদিন আশা করিয়া অপেক্ষা করা বৃথা। তাহাকে মনে করিয়া চিঠি লিখিবার কেহ নাই। চলিয়া যাইতেছিল, সাহেব ডাকিয়া বলিলেন, এই যে তোমার নামের দুখানা। আপনারও একখানা রয়েছে মিসেস ঘোষাল।

নিজের চেয়েও পরের চিঠিতে মাসীর কৌতূহল বেশি। মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিলেন, একখানা ত দেখচি অশোকের হাতের লেখা। ওটা কার?

এই অকারণ প্রশ্নের উত্তর বন্দনা দিল না, চিঠি দুটা হাতে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সাহেব মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, অশোকের সঙ্গে দেখচি চিঠি-পত্র চলে। তার করে দিই সে আসুক। ছেলেটি সত্যিই ভালো। তাকে বিশ্বাস না করলে বন্দনা কখনো চিঠি লিখতো না।

প্রত্যুত্তরে মাসিও সগর্ব্বে একটু হাসিলেন। অর্থাৎ জানি আমি অনেক কিছুই।

* * * * *

বিকালে আফিসের পথে হাজি-সাহেবের বাড়ী ঘুরিয়া রে-সাহেব একাকী ফিরিয়া আসিলেন। বন্দনা সেখানে যায় নাই। মাসী সুমুখেই ছিলেন, মুখভার করিয়া বলিলেন, বন্দনা চিঠি নিয়ে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকেছে আর বার হয়নি।

সাহেব উদ্বিগ্ন-মুখে প্রশ্ন করিলেন, খায়নি?

—না। সকালে সেই যে দুটো ফল খেয়েছিল আর কিছুনা।

সাহেব দ্রুতপদে কন্যার ঘরের দরজায় গিয়া ঘা দিলেন, বুড়ি?

বন্দনা কবাট খুলিয়া দিল। তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া পিতা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—কি হয়েছে রে?

বন্দনা কহিল, বাবা, আজ রাত্রের গাড়ীতে আমি বলরামপুরে যাবো।

—বলরামপুরে? কেন?

—দ্বিজদাসবাবু একখানা চিঠি লিখেছেন,—পড়বে বাবা?

—তুই পড়্ মা আমি শুনি, বলিয়া সাহেব চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। বন্দনা তাঁহাকে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া যে চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইল তাহা এইরূপ—

সুচরিতাসু,

আপনার যাবার দিনটি মনে পড়ে। উঠানে গাড়ী দাঁড়িয়ে, বললেন মাঝে মাঝে খবর দিতে। বললুম কুড়ে মানুষ আমি, চিঠি-পত্র লেখা সহজে আসেও না, ভালো লিখতেও জানিনে। এ ভার বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ে যান।

শুনে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, তারপরে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলেন দ্বিতীয় অনুরোধ করলেন না।

হয় ত ভাবলেন অসৌজন্য যাকে এমন সময়েও একটা ভালো কথা মুখে আনতে দেয় না তাকে আর বলবার কি আছে !

আমি এমনিই বটে। তবু আশা ছিল লিখতেই যদি হয় যেন এমন-কিছু লিখতে পারি যা খবরের চেয়ে বড়। সে-লেখা যেন অনায়াসে আমার সকল অপরাধের মার্জ্জনা চেয়ে নিতে পারে।

মনে ভাবতুম মানুষের জন্যে কি শুধু অভাবিত দুঃখই আছে, অভাবিত সুখ কি জগতে নেই ?

দাদার ইষ্ট-দেবতা শুধু চোখ বুজেই থাকবেন চেয়ে কখনো দেখবেন না ? অঘটন যা ঘট্‌লো সেই হবে চিরস্থায়ী, তাকে টলাবার শক্তি কোথাও নেই ?

দেখা গেল নেই,—সে শক্তি কোথাও নেই। না টললেন ভগবান, না টল্‌লো তাঁর ভক্ত। নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখা আজও তেমনি ঊর্দ্ধমুখে জ্বলচে জ্যোতিঃর কণামাত্র অপচয়ও ঘটেনি।

এ প্রসঙ্গ কেন তাই বলি। তিনদিন হলো দাদা বাড়ী ফিরে এসেছেন। সকালে যখন গাড়ী থেকে নামলেন তাঁর পিছনে নামলো বাসু। খালি পা, গলায় উত্তরীয়। গাড়ী ফিরে চলে গেলো আর কেউ নামল না। সকালের রোদে ছাদে দাঁড়িয়েছিলুম, চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবী হয়ে এলো অন্ধকার,—ঠিক অমাবস্যা রাত্রির মতো। বোধ করি মিনিট দুই হবে, তারপরে আবার সব দেখতে পেলুম, আবার সব স্পষ্ট হয়ে এলো। এমন যে হয় এর আগে আমি জানতুম না।

নীচে নেমে এলুম, দাদা বললেন, তোর বৌদি কাল সকালে মারা গেছেন দ্বিজু। হাতে টাকাকড়ি বিশেষ নেই, সামান্যভাবে তাঁর শ্রাদ্ধের আয়োজন করে দে। মা কোথায় ?

ঢাকায়। তাঁর মেয়ের বাড়ীতে।

ঢাকায় ? একটু চুপ করে থেকে বললেন, কি জানি, আসতে হয়ত পারবেননা কিন্তু মাতৃদায় জানিয়ে বাসু তাঁকে চিঠি দেয় যেন।

বললুম, দেবে বই কি।

বাসু ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে বুকে মুখ লুকলো। তারপরে কেঁদে উঠলো। সে-কান্নারও যেমন ভাষা নেই চিঠিতে সে প্রকাশ করারও তেমনি ভাষা নেই। শিকারের জন্তু মরার আগে তার শেষ নালিশ রেখে যায় যে ভাষায় অনেকটা তেমনি। তাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম নিজের ঘরে। সে তেমনি করেই কাঁদতে লাগলো বুকে মুখ রেখে—। মনে মনে বললুম ওরে বাসু, লোকসানের দিক দিয়ে তুই যে বেশি হারালি তা' নয়, আর একজনের ক্ষতির মাত্রা তোকেও ছাপিয়ে গেল। তবু তোকে বোঝবার লোক পাবি কিন্তু সে পাবেনা। শুধু একটা আশা বন্দনা যদি বোঝেন।

এমন কতক্ষণ গেল। শেষে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললুম, ভয় নেই রে, মা না থাক, বাপ না থাক কিন্তু রইলুম আমি। ঋণ তাঁদের শোধ দিতে পারবোনা কিন্তু অস্বীকার করবোনা কখনো। আজ সব চেয়ে ব্যথা সবচেয়ে ক্ষতির দিনে এই রইলো তোর কাকার শপথ।

কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াবো না, কথার আছেই বা কি। ছেলেবেলায় বাবা বলতেন গোঁয়ার, মা বলতেন চুয়াড়, কতবার রাগ করেছেন দাদা,—অনাদরে, অবহেলায় কতদিন এ বাড়ী হয়ে উঠেছে বিষ,

তখন বৌদিদি এসেছেন কাছে, বলেছেন ঠাকুরপো, কি চাই বলোত ভাই? রাগ করে জবাব দিয়েছি কিছুই চাইনে বৌদি, আমি চলে যাবো এখান থেকে।

কবে গো?

আজই।

শুনে হেসে বলেছেন, হুকুম নেই যাবার। যাওতো দেখি আমার অবাধ্য হয়ে।

আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু সেই যাবার দিন যখন সত্যি এলো তখন তিনিই গেলেন চলে। ভাবি, কেবল আমার জন্যেই হুকুম? তাঁকে হুকুম করবার কি কেউ ছিলনা জগতে?

দাদাকে জিজ্ঞাসা করলুম কি ক'রে ঘট্‌লো? বললেন, কলকাতাতেই শরীর খারাপ হলো—বোধ হয় মনে মনে খুবই ভাব্‌তো—নিয়ে গেলাম পশ্চিমে। কিন্তু সুবিধে কোথাও হলোনা। শেষে হরিদ্বারে পড়লেন জ্বরে, নিয়ে চলে এলাম কাশীতে। সেখানেই মারা গেলেন।

ব্যস্‌।

জিজ্ঞাসা করলুম, চিকিৎসা হয়েছিল দাদা?

বললেন, যথাসম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এই যথাটুকু যে কতটুকু সে দাদা নিজে ছাড়া আর কেউ জানেনা।

ইচ্ছে হলো বলি আমাকে এত বড় শাস্তি দিলেন কেন? কি করেছিলুম আমি? কিন্তু তাঁর মুখের পানে চেয়ে এ প্রশ্ন আর আমার মুখে এলোনা।

জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কাউকে কিছু বলে জাননি দাদা?

বললেন, হাঁ। মৃত্যুর ঘণ্টা দশেক পূর্ব্বে পর্য্যন্ত চেতনা ছিল, জিজ্ঞেসা করলুম, সতী মা'কে কিছু বলবে?

বললে, না।

আমাকে?

না।

দ্বিজুকে?

হাঁ। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। বোলো সব রইলো।

ছুটে পালিয়ে এলুম বৌদিদির শূন্য ঘরে। ছবি তোলাতে তাঁর ভারি লজ্জা ছিল, শুধু ছিল একখানি লুকনো তাঁর আলমারির আড়ালে। আমারি তোলা ছবি। সুমুখে দাঁড়িয়ে বললুম, ধন্য হয়ে গেছি বৌদি, বুঝেচি তোমার হুকুম। এত শীঘ্র চলে যাবে ভাবিনি, কিন্তু কোথাও যদি থাকো দেখতে পাবে তোমার আদেশ অবহেলা করিনি। শুধু এই শক্তি দিও, তোমার শোকে কারো কাছে আমার চোখের জল যেন না পড়ে। কিন্তু আজ এই পর্য্যন্তই থাক তাঁর কথা।

এবার আমি। যাবার সময় অনুরোধ করেছিলেন বিবাহ করতে। কারণ এত ভার একলা বইতে পারবোনা—সঙ্গীর দরকার। সেই সঙ্গী হবে মৈত্রেয়ী এই ছিল আপনার মনে। আপত্তি করিনি, ভেবে-

ছিলুম সংসারে পনেরো আনা আনন্দই যদি ঘুচলো, এক আনার জন্যে আর টানাটানি করবোনা। কিন্তু সে-ও আর হয়না,—বৌদিদির মৃত্যু এনে দিলে অলঙ্ঘ্য বাধা। বাধা কিসের? মৈত্রেয়ী ভার নিতে পারে, পারেনা সে বোঝা বইতে। এটা জানতে পেরেছি। কিন্তু আমার এবার সেই বোঝাই হলো ভারি। তবু বলবো বিপদের দিনে সে আমাদের অনেক করেছে, তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সময় যদি আসে তার ঋণ ভুলবোনা।

কাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে বাসু উঠলো কেঁদে। তারে ঘুম পাড়িয়ে গেলুম দাদার ঘরে। দেখি তখনো জেগে বসে বই পড়চেন। কি বই দাদা? দাদা বই মুড়ে রেখে হেসে বললেন, কি করতে এসেছিস বল্? তাঁর পানে চেয়ে যা' বলতে এসেছিলুম বলা হলো না। ভাবলুম, ঘুমের ঘোরে বাসু কেঁদেছে তাতে বিপ্রদাসের কি? অন্যকথা মনে এলো, বললুম শ্রাদ্ধের পরে আপনি কোথায় থাকবেন দাদা? কলকাতায়?

বললেন, না রে, যাবো তীর্থভ্রমণে।

ফিরবেন কবে?

দাদা আবার একটু হেসে বললেন, ফিরবোনা।

স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দেহ রইলোনা যে এ সঙ্কল্প টল্‌বেনা। দাদা সংসার ত্যাগ করলেন।

কিন্তু অনুনয়-বিনয়, কাঁদা-কাটা কার কাছে? এই নিষ্ঠুর সন্ন্যাসীর কাছে? তার চেয়ে অপমান আছে?

কিন্তু বাসু?

দাদা বললেন, হিমালয়ের কাছে একটা আশ্রমের খোঁজ পেয়েছি তারা ছোট ছেলেদের ভার নেয়। শিক্ষা দেয় তারাই।

তাদের হাতে তুলে দেবেন ওকে? আর আমি করলুম মানুষ?

তারপর দুই হাতে কান চেপে পালিয়ে এলুম ঘর থেকে। তিনি কি জবাব দিলেন শুনিনি।

বাসুর পাশে বসে সমস্ত রাত ভেবেচি। কোথায় যে এর কূল কিছুতে খুঁজে পাইনি। মনে পড়লো আপনাকে। বলে গিয়েছিলেন বন্ধুর যখন হবে সত্যিকার প্রয়োজন তখন ভগবান আপনি পৌঁছে দেবেন তাকে দোর গোড়ায়। বলেছিলেন এ কথা বিশ্বাস করতে। কে বন্ধু, কবে সে আসবে জানিনে, তবু বিশ্বাস করে আছি আমার এই একান্ত প্রয়োজনে একদিন সে আসবেই।

দ্বিজদাস

পড়া শেষ হইলে দেখা গেল সাহেবের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। রুমাল বাহির করিয়া মুছিয়া বলিলেন, আজই যাও মা আমি বাধা দেবোনা। দরওয়ান আর তোমার বুড়ো হিমুও সঙ্গে যাক্।

বন্দনা হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল, বলিল, যাবার উদ্যোগ করিগে বাবা, আমি উঠি।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

গ্রীক্‌-পঞ্চাশিকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্‌-এ কলিঃ এবং ক্যাণ্টাব)

মকরের খেদ

নিথর সাগরে ঢেউ দোলা তুলি' উঠিবনা ভাসি' আর,
মকরপঙ্খী নৌকায় মুখ হেরিবনা আপনার।
এ সঙ্কীর্ণ বালুকাকীর্ণ সৈকত-ভূমি পরে,
সুনীল সিন্ধু দিল মোরে ফেলি, শুধু মরিবার তরে।

Anyte.

জরা ও প্রেম

রূপসীরা কয়,—'হে কবি নাগর, বৃদ্ধ হয়েছ আজি,
হের আয়নায় টাক্‌পাক্‌ধরা সে কাজল কেশরাজি।'

'কি আছে মাথায় জানি না সে কথা;
চরম নিমেষে জানি,
এ বুড়া ভ্রমর পারে ফুলমধু নিঃশেষে নিতে টানি।'

Anacreon.

সাধ

তোমার দর্পণ হ'ব, অনিমিকে চেয়ে র'বে তুমি;
তোমার বসন হ'ব, র'ব তনু লতাটিরে চুমি;
হ'ব পুষ্করিণী তব, স্থির নীরে করিবে গাহন;
সুরভি পরাগ হ'ব, অঙ্গরাগে করিবে বহন;
বুকের নিচোল হ'ব, যৌবন হিল্লোল আবরিব;
হ'ব তব কণ্ঠহার, কম্বুগ্রীবা ঘেরিয়া রহিব;
কোমল পাদুকা হ'ব, পদভরে পীড়িবে আমারে,
চরণে মঞ্জীর হ'ব, মুখরিব মঞ্জুল ঝঙ্কারে।

Anacreon.

শস্ত্র

বৃষের রয়েছে শৃঙ্গ, ক্ষুর তুরঙ্গের,
শশকের ক্ষিপ্রগতি, দশন সিংহের,
উড়িতে কুশলী পাখী, সন্তরণে মীন,
বুদ্ধি ধরে নর, শুধু নারী শক্তি হীন।

কে বলে অবলা নারী? রূপ আছে যার,
অন্য বলে কিবা ফল সে সর্ব্বজয়ার?

Anacreon.

হেঁয়ালী

হাসি-খুসীতে উছল যবে হও,
দাও না চুমা, মুখ ফিরায়ে লও;
করুণা জাগে অশ্রু যবে ঝরে,
তখন চুমা লভি যে চুমা 'পরে।
কি অনুকূলা সদয়া তুমি দুখে,
মমতাহীনা পাষাণী হও সুখে!

হরষ মোর তোমার আঁখি জলে,
হাসিতে তব পুড়ি যে তুষানলে,
প্রেমের ফাঁদে পড়েছে ধরা যারা,
আশা ও ভয়ে বেঁধেছে নীড় তারা।

Bathylla.

বৃদ্ধ বলদ

কসাইখানায় পাঠাল না চাষী হাল-টানা গরুটিরে,
বহু বরষের জোয়ালের ভার তুলি নিল নতশিরে।

পেল নিষ্কৃতি বৃদ্ধ বলদ হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচে আজি,
হাম্বা রবে সে চরে মাঠে মাঠে রোমন্থি' তৃণরাজি।

Addaeus.

প্রার্থনা

নারায়ণ, রুদ্ধ কর বৈকুণ্ঠের দ্বার,
বজ্রপাণি সুরেশ্বর, রক্ষ সুরলোক ;
জলস্থল বলিষ্ঠের খড়্গাধীন হোক্,
ত্রিদিবের পথ যেন রুদ্ধ থাকে তার।

Alphcus.

বংশীধারী

হে মুরলীধর, সুরের নিঝর থামায়োনা বাঁশরিতে,
আমি প্রতিধ্বনি রৌদ্রবরণী শ্যামল মাঠের চিতে।

Cometas.

জয়-পরাজয়

জয়ী হও যদি, সখা সম সমাদরে
প্রার্থনা তব শুনিবে দেবতা নরে ;
ব্যর্থতা যদি লভ তবে জেনো ভবে
বন্ধু না রবে, হত-বিধি বাম হবে।

Lucianus.

'ন দন্ত্যাৎ ব্যাঘ্র ঝম্পনে'

ভূরি ভোজান্তে নিরেট যখন পেট,
মিছে কেন আর পাতে দাও কাট্‌লেট্ ?
বন্দরে যবে নোঙর-বন্দী তরী,
প্রসাদ পবনে কিবা হবে পাল ভরি' ?
পাকা ধানে সোনা ক্ষেতখানি হ'ল যবে,
চাষী কয় হাসি'—'বৃষ্টিতে কিবা হবে !'

Leonidas of Alexandria.

বজ্রাহত

গোঠ হ'তে বিনা ডাকে গাভীরা গোয়ালে ফিরে যায়,
বটমূলে বজ্রাঘাতে চিরঘুমে রাখাল ঘুমায়।

Leonidas of Tarentum.

'নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ'

আছে রূপ বটে, মাধুরীহীনা সে রূপসী,
টোপ্ গেলে মাছে, গলায় লাগে না বড়শী।

Capiton.

বিরহী

এপাশ ওপাশ করিছে বিরহী শূন্য বাসর-শয়নে,
ভুজ বন্ধনে বন্দিনী নাই, নিদ্রা নাহিক নয়নে।

Crinagoras.

চুম্বন

পরাণ আমার অধর-দেহলি 'পরে
এল যেন ছুটে গাঢ় চুম্বন ভরে,
অকুতোভয়ে সে পিছু রাখি মোর দেহ
প্রিয়ার তনুতে লভিবারে চায় গেহ।

Plato.

না-ছোড়্-বান্দা

হে নিরুপমা, বল না দয়া করি,'
ডাকি তোমারে কি মধু-নাম ধরি ?
কোথায় থাক ? কোথা বা পাব দেখা,
দিব যা' চাও, যেওনা চলি' একা।
বুঝিবা বাক্-দত্তা তুমি, বালা,
আসি, মানিনি ! মুখে দিয়েছ তালা ?
তথাপি জেনো, না-ছোড়্-বান্দা আমি,
পিছনে তব ফিরিব দিবাযামী।

বশী-করণী বিদ্যা আমি জানি,
কঠিন হিয়া কোমল ক'রে আনি।
বিদায় এবে দিনু তোমারে বটে,
ছাড়িব না যে, কহিনু অকপটে।

Philodemus.

কৃপণা

হে তরুণী, তব যৌবন নব পুঁজি করি' কেন রাখ ?
ফুরালে সময় কভু রসময় নাগর মিলিবে নাক !
প্রাণ-চঞ্চল যাহারা কেবল প্রণয় তাদেরি তরে,
মরণ-নিথর ভস্মবাসর চিতাশয্যার 'পরে।

Asclapiades.

মনাক্ প্রিয়

'আঁধার অথবা আলো, বলত কি ভাল তুলনায় ?'
'আঁধি ভাল ; নরকে যে আরো বেশী লভিব তোমায়।'

Callimachus.

প্রশ্ন

গোলাপী আভা রয়েছে গালে, গোলাপ ফুল হাতে।
বেচিবে ফুল ? বেচিবে মুখ ? দুটিরে এক সাথে ?

Dionysius.

দ্বিধান্বিতা

কেন নতমুখী, পথ ধূলি পরে আঁখি
দাঁড়ায়ে নীরবে নীবিপরে হাত রাখি' ?
লাজে অনুরাগে কেমনে মিলাবে সুর ?
মৌন না যদি করিবারে পার দূর,
শুধু ইসারায় এইটুকু দাও বলি ;
—প্রেমের প্রেরণা অনুসারি' যাবে চলি।'

Iranaeus Referen darius.

কৃপণ ও মূষিক

একদা মূষিক এক কৃপণের ঘরে
পশেছিল চুপি চুপি। করুণার্দ্র স্বরে
শুধায় কৃপণ তারে, 'হে প্রিয়-দর্শন,
কি লাগিয়া বল বৎস, হেথা আগমন ?'
মূষিক হাসিয়া কয়, 'বেশী কিছু নয়,
রব আমি অনাহারে, চাই পদাশ্রয়।'

Lucilius.

অন্তরতমা

সিকতায় তব বেঁধেছি আমার তরী,
শেষ-নিশ্বাসে তুমি লবে মোরে হরি'।
দীপ্তি-ঝরণা ঝরিছে তোমার ভালে ;
বধির শ্রবণে আঁখি তব বাণী ঢালে ;
ম্লান মুখখানি তুষার-বরষা আনে,
জাগে বসন্ত ফুল্ল-নয়ন বাণে।

Meleager.

হাসি

চলচঞ্চল পলাতক এ জীবন,
কুলটার সম নিয়তি চপল-মতি,
তবুও হাসির হয় যদি অনাটন,
অধমের সুখে হবে যে তিক্ত অতি !

Palladas.

প্রতীক্ষা

সলিতার পরে সলিতা নিভিল জ্বলি',
ধূম্রল শিখা মূরছি পড়িল ঢলি।
প্রিয়া তবু মোর এখনো এল না হায়,
নিভে না অনল জ্বলিছে যা' এ হিয়ায় !
করিল শপথ প্রেমের দোহাই দিয়া,
আসিবে নিশীথে, আসিল না নিরদিয়া।

Paulus Silentiarius.

যৌবনান্তে

সবাই যেমন প্রেমে পড়ে থাকে
তেমনি পড়েছি প্রেমে,
মদিরোৎসবে মাতিয়াছি যবে
স্বর্গ এসেছে নেমে।

এবার বিদায়! কালোয় সাদায়
দ্বন্দ্ব বেধেছে চুলে,
যমদূত কয়, 'ওগো মহাশয়,
চপলতা যাও ভুলে,
খেলা হল শেষ, গৈরিক বেশ
কর এবে পরিধান,
ভব প্রশান্ত, পড় বেদান্ত,
হও সাধু জ্ঞানবান্।'

Philodemus.

নক্ষত্রিকা

হে মোর নয়ন-তারা, চেয়ে আছ অনিমেষে
তারকার পানে?
হ'তাম আকাশ যদি, সহস্রাক্ষ রাখিতাম
তোমার নয়ানে!

Plato.

অদৃষ্ট

মাটিতে ফেলিয়া দড়ি, সোনা তুলি' নিল একজন,
সেই দড়ি দিয়া গলে অপরে লভিল উদ্বন্ধন!

Plato.

ভ্রষ্টলগ্না

তাড়াতাড়িতে বিলম্বে বা যাহার অভিসার,
আগল-পড়া দুয়ার শুধু কপালে আছে তার।

Rufinus.

মুষ্টিযোগ

প্রেমে পড় যদি, হোয়োনা নম্র অতি,
পিচ্ছিল পথে সংযত রেখো গতি।
ললাটে একটু ভ্রূকুটি রাখিও আঁকি'
লাজুক দৃষ্টি লভে যেন তব আঁখি।
গর্ব্বিত যুবা নারীরে বিমুখা করে,
হতাশ-প্রেমিকে ফিরায় সে হতাদরে।
কোমল কঠিন যে নাগর যুগপৎ,
নারী তারি পায় লিখে দেয় দাস-খৎ।

Agathias.

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সাবিত্র্যুপাখ্যান

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

১

সেকালের এখানে ওখানে ছড়ান বহু চল্‌তি গল্পকে মহাভারতের বিশাল শরীরে জুড়ে দিয়ে স্থায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সব গল্পের মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে প্রসিদ্ধ গল্প হচ্ছে বনপর্ব্বে সাবিত্রীসত্যবানের উপাখ্যান। রামায়ণের সীতা ও এই উপাখ্যানের সাবিত্রীর যুগ্ম নাম পতিব্রতা নারীর আদর্শরূপে সমস্ত হিন্দু ভারতবর্ষে কীর্ত্তিত। সীতার নামে মেয়েদের কোনও ব্রত-পূজা নেই, কিন্তু সাবিত্রী ব্রত তাদের একটা জমকাল অনুষ্ঠান। এর অবশ্য কারণ যে সীতার পাতিব্রত্য তাঁর সাংসারিক সুখ সৌভাগ্যের হেতু হয় নি, আর সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের সুফল ফলেছিল হাতে হাতে। কেবল মৃত পতির পুনর্জ্জীবন নয়,—বিনষ্ট-চক্ষু শ্বশুরের চক্ষুপ্রাপ্তি, হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার, বলবীর্য্যশালী বহু কীর্ত্তিমান পুত্র লাভ, অনপত্য পিতার শত পুত্রের জন্ম—এ সব-ই ঘটেছিল সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের জোরে। এই অতিফলা পাতিব্রত্য যে স্ত্রীজন ও তাদের উপদেষ্টাদের লোভাকৃষ্ট করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

সাবিত্রীর উপাখ্যান যে মহাভারতের গল্পে যেমন তেমন ক'রে জুড়ে দেওয়া তা হাল্‌কা বাঁধবার সুতোটির কথা গেয়ে দেখ্‌লেই বোঝা যায়। কাম্যকবন থেকে জয়দ্রথের দ্রৌপদীকে হরণের চেষ্টার পর যুধিষ্ঠির নিজের অবস্থা স্মরণ ক'রে মনে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করলেন। তিনি মুনি মার্কণ্ডেয়কে বল্‌লেন, 'ভগবন্, আপনি ত ভূত-ভবিষ্যৎবিদ্; আমার মত অল্পভাগ্য নৃপতি কি আপনি পূর্ব্বে কখনও দেখেছেন, কি কারও কথা শুনেছেন। মিথ্যাব্যবসায়ী জ্ঞাতিদের দ্বারা আমরা নির্ব্বাসিত; বনবাসী হয়েও বনচর মৃগদের হিংসা ক'রে মৃগয়ার কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করছি; এর মধ্যে আবার মূঢ়বুদ্ধি জয়দ্রথ অনিন্দিতকর্ম্মা পত্নী দ্রৌপদীকে হরণ করে, এবং তাকে সসৈন্য যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে পত্নীকে প্রত্যাহরণ করতে হয়'। উত্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে রামচন্দ্রের কাহিনী বল্‌লেন। রামচন্দ্রের অতুলনীয় দুঃখভোগ,—রাজ্যে অভিষেকের মুখে বনবাস, বনে ভার্য্যা সীতা হরণ, সুগ্রীবের সাহায্যে রাক্ষস বধ ও সীতা-উদ্ধার ইত্যাদি ব'লে যুধিষ্ঠিরকে এই ব'লে আশ্বাস দিলেন যে রামের মিত্র ছিল কেবলমাত্র শাখামৃগ বানর ও কালমুখ ভল্লুক কিন্তু তাঁর সহায় রয়েছে মহাধনুর্দ্ধর চার ভাই যাঁরা সমস্ত মরুদ্‌গণের সঙ্গে ইন্দ্রের সেনাও জয়ে সমর্থ, সুতরাং তাঁর শোকের কারণ নেই। যুধিষ্ঠির বল্‌লেন, 'মুনি, আমি নিজের জন্য শোক করি না, আমার ভাইদের জন্যও নয়, রাজ্য যে হারিয়েছি তার জন্যও নয়; আমার শোক হচ্ছে দ্রৌপদীর জন্য। দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদীর মত পতিব্রতা ও উদারহৃদয়া কোনও স্ত্রী কি আপনি ইতিপূর্ব্বে দেখেছেন বা শুনেছেন। তখন মার্কণ্ডেয় কুলস্ত্রীর পাতিব্রত্য ও পরম ঔদার্য্যের উদাহরণে যুধিষ্ঠিরকে সাবিত্রীর উপাখ্যান শোনালেন। এবং এই ব'লে শেষ ক'র্‌লেন যে কুলাঙ্গনা সাবিত্রী যেমন নিজেকে, পিতা মাতা শ্বশ্রূ শ্বশুর ও ভর্ত্তৃকুলকে সমস্ত রকম কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছিলেন কল্যাণী দ্রৌপদীও পাণ্ডবদের তেমনি সমুদ্ধার করবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, 'মহাত্মা মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বিশোক ও বিজ্বর হ'য়ে কাম্যক বনে বাস করতে লাগ্‌লেন। যে লোক ভক্তির সঙ্গে এই অত্যুত্তম সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ করে সে সুখী হয়, তাঁর সকল অর্থ সিদ্ধ হয়, এবং সে কোনও দুঃখ পায় না'।

ভারত-যুদ্ধ ও পাণ্ডবদের ইতিহাসের সঙ্গে এই সাবিত্রী প্রসঙ্গের যোগ স্পষ্টই অত্যন্ত ঢিলে রকমের। মহাভারতের মূল গল্প থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে যে এই আখ্যায়িকা পাঠ্য

ও শ্রোতব্য ওর স্বতন্ত্র ফলশ্রুতিই তার প্রমাণ। কিন্তু মহাভারতে বিবৃত এই সর্ব্বজন-পরিচিত উপাখ্যানটিতে কিছু কাব্য-গত ও ঐতিহাসিক রহস্য আছে; গল্পটিকে পরীক্ষা করলেই তা দেখা যায়।

২

মদ্রদেশে পরমধার্ম্মিক ও পৌরজানপদ সকল প্রজার প্রিয় অশ্বপতি নামে রাজা ছিলেন। বয়স অতিক্রান্ত হ'লেও অনপত্য থাকায় তিনি পুত্র কামনায় আঠার বৎসর কঠোর নিয়মে থেকে ব্রহ্মাপত্নী সবিতৃকন্যা সাবিত্রীদেবীর উদ্দেশে সাবিত্রীমন্ত্রে লক্ষ হোম সম্পন্ন করেন। তখন সাবিত্রীদেবী তুষ্ট হ'য়ে রূপপরিগ্রহ ক'রে রাজাকে দেখা দিয়ে বর দিলেন যে ব্রহ্মার প্রসাদে তাঁর একটি তেজস্বিনী কন্যাসন্তান লাভ হবে। এবং ব্রহ্মার এই নিয়োগের উপর তাঁকে কোনও কথা বলতে নিষেধ করলেন। কালে রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী মালব্যরাজদুহিতা একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। সাবিত্রীমন্ত্রে হোমের ফলে সাবিত্রীদেবী প্রীত হ'য়ে এই কন্যা দান করেছেন জন্য রাজা ও ব্রাহ্মণেরা তার নামকরণ করলেন "সাবিত্রী"। বিগ্রহবতী লক্ষ্মীর মত রাজকন্যা সাবিত্রী যথাকালে যৌবনে উপনীত হ'লেন। সুমধ্যা, পৃথুশ্রোণী, কাঞ্চন-প্রতিমার মত সেই কন্যাকে দেখে লোকে মনে ক'রতো রাজার গৃহে দেবকন্যাই আবির্ভূত হ'য়েছেন। কিন্তু

তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ॥

'পদ্মপলাশাক্ষী, তেজে যেন দীপ্যমান সেই কন্যাকে পত্নীত্বে বরণের জন্য কেউ প্রার্থনা ক'রলো না। কন্যার তেজস্বিতায় সকলে বিমুখ হ'লো।' অর্থাৎ আজকের মত সেকালের ক্ষত্রিয় সমাজেও তেজস্বিনী পত্নী পুরুষের কাম্য ছিল না। দ্রুপদ রাজা কন্যার স্বয়ম্বরকে পাণিপ্রার্থিদের শৌর্য্যের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ক'রে বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেছিলেন; নইলে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে ক্ষত্রিয় বীরেরা উপস্থিত হ'তেন কিনা বলা কঠিন।

রাজা অশ্বপতি নিজের দেবরূপিণী যৌবনস্থা কন্যাকে কোনও বর যাচ্ঞা ক'রে না দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, এবং সাবিত্রীকে বললেন, 'পুত্রি, তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত হ'য়েছে কিন্তু আমার কাছে তোমাকে কেউ প্রার্থনা ক'রছে না। সুতরাং

স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ।

তোমার সদৃশ-গুণ ভর্ত্তা তুমি নিজেই অন্বেষণ কর। তোমার ঈপ্সিত বরের কথা আমাকে জানালে আমি বিবেচনা ক'রে তোমায় তাঁকে সম্প্রদান ক'রবো। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বলে, যে পিতা উপযুক্ত কালে কন্যা-সম্প্রদান না করেন তিনি নিন্দনীয়। অতএব তুমি ভর্ত্তার অন্বেষণে সত্বর হও;

দেবতানাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু।

'দেবতাদের কাছে যাতে আমাকে নিন্দনীয় হ'তে না হয়।'

পিতার আজ্ঞায় ব্রীড়ান্বিতা মনস্বিনী সাবিত্রী বৃদ্ধ মন্ত্রীগণে পরিবৃত হ'য়ে স্বর্ণময় রথে আরোহণ ক'রে বহির্গত হ'লেন; এবং রাজর্ষিদের রম্য তপোবন, ও বহু বন ও তীর্থ পর্য্যটন ক'রলেন। ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজধানী যে তাঁর প্রার্থিত লাভের উপযুক্ত স্থান নয় বুদ্ধিমতী সাবিত্রী তা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন।

৩

কন্যা বের হ'য়েছেন বর অন্বেষণে; এই অবসরে বরের পরিচয় নেওয়া যাক্।

শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় নৃপতি ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি অন্ধ হন, এবং তাঁর যে এক পুত্র ছিল সে তখনও বালক। এই সুযোগে পূর্ব্বশত্রু এক প্রতিবেশী রাজা তাঁর রাজ্য অপহরণ ক'রেছিল। দ্যুমৎসেন ভার্য্যা ও বালক পুত্রের সঙ্গে বনে প্রস্থান ক'রলেন, এবং মহারণ্যে প্রবেশ ক'রে তপস্যায় রত হ'লেন। দ্যুমৎসেনের পুত্র, যাঁর জন্ম হ'য়েছিল রাজপুরে কিন্তু যিনি লালিত ও বর্দ্ধিত হ'য়েছিলেন তপোবনে—তাঁর নাম ছিল 'সত্যবান'।

সাবিত্রী তপোবনে এই সত্যবানকে দেখে ও তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকেই নিজের উপযুক্ত পতি স্থির ক'রলেন। এই মনোনয়নের মূলে যে অনেকখানি ছিল নির্ব্বাসিত রাজপুত্রের উপর অনুকম্পা, সরল মৃদু সেবাতুর পুরুষের

প্রতি সবল তেজস্বী প্রকৃতির নারীর আকর্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। ক্ষত্রিয় রাজপুত্রকে 'বলী' ও 'শূর' কবির অবশ্য ব'লতেই হ'য়েছে, কিন্তু সত্যবানের যে রূপগুণের পরিচয় সে হ'চ্ছে নির্ব্বিরোধি, কোমল-স্বভাব, সুকুমার-দর্শন পুরুষের বর্ণনা। (১) ভার্য্যা সাবিত্রীর তেজস্বী দৃঢ়তার পার্শ্বে স্বামী সত্যবান যে কত পেলব ও অসহায় কবি তা ক্রমে দেখিয়েছেন।

"সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ" বরের প্রতি "জ্বলন্তীমিব তেজসা" কন্যা আকৃষ্টা হলেন।

৪

পতির অন্বেষণে তীর্থ ও আশ্রম পরিভ্রমণ ক'রে সাবিত্রী যখন ফিরে এসে পৌঁছিলেন তখন অশ্বপতির সঙ্গে নারদ উপবিষ্ট ছিলেন। সাবিত্রী দুজনার পাদবন্দনা ক'রে পিতার জিজ্ঞাসার উত্তরে সত্যবানের পরিচয় দিলেন এবং জানালেন

সত্যবানমুরূপো মে ভর্ত্তেতি মনসা বৃতঃ।

'সত্যবানকে আমার অনুরূপ ভর্ত্তা বিবেচনা ক'রে তাঁকেই মনে বরণ করেছি'। শুনে নারদ চমকে উঠলেন এবং বল্লেন, 'না জেনে সাবিত্রী একি ভয়ানক কাজ করেছে'। অশ্বপতি জিজ্ঞাসা ক'রলেন 'কেন, এই রাজপুত্র সত্যবান কি গুণহীন ও অপ্রিয়দর্শন'। নারদ বল্লেন, 'তিনি পরম রূপবান ও গুণের তাঁর অন্ত নেই। কিন্তু এক দোষ তাঁর সমস্ত গুণকে অভিভূত ক'রেছে, এবং কোনও চেষ্টাতেই সে দোষের পরিবর্ত্তন নেই;

সোহস্ত প্রভৃতি সত্যবান।
সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি।

আজ থেকে ঠিক এক বৎসর পর ক্ষীণায়ু সত্যবান দেহত্যাগ ক'র্‌বেন।' অশ্বপতি কন্যাকে বল্লেন, 'সাবিত্রী, যাও তুমি অন্য পতি বরণ কর। সত্যবানের এক দোষ যে তার সমস্ত গুণকে বিফল ক'রেছে।' সাবিত্রী পিতাকে ব'ল্লেন, 'কন্যা ত একবারের বেশী দান করা যায় না!

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণোনির্গুণোহপি বা।
সকৃদ্ বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥

তিনি দীর্ঘায়ু হন বা অল্পায়ু হন, গুণবান বা নির্গুণ হন, —ভর্ত্তা আমি একবার বরণ করেছি, দ্বিতীয়বার কর্‌বো না।'

সাবিত্রীর পাতিব্রত্য যে মৃত্যুকে জয় ক'রেছিল সে অবশ্য এইখানে। যে একনিষ্ঠা 'মনসা বৃত' ভাবী পতির সংবৎসর পরমায়ুকে অগ্রাহ্য ক'রে তাকে বরণ ক'র্‌তে দ্বিধা করে না কবির কাব্য তা-রি জয় গান। সে নিষ্ঠার ফলে মৃত পতির জীবন লাভ ওর মহত্ত্বকে একটুও বাড়ায় না। কেবল ফললুব্ধ প্রাকৃত জনের কাছে তার নিজ মহিমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে।

নারদ অশ্বপতিকে বল্লেন, "তোমার কন্যা একবারে মনস্থির করেছে; এ ধর্ম্ম থেকে তাকে বিচলিত করা যাবে না। 'নৈষা বারয়িতুং শক্যা ধর্ম্মাদস্মাৎ কথঞ্চন'। অতএব আমার মতে সত্যবানকেই তোমার কন্যা সম্প্রদান করা উচিত।' অশ্বপতি বল্লেন, 'আপনি সত্য কথাই ব'লেছেন! আপনি আমার গুরু; আপনার যা আদেশ আমি তাই ক'র্‌বো।'

'সাবিত্রীর সম্প্রদান অবিঘ্ন হোক' এই আশীর্ব্বাদ ক'রে নারদ বিদায় হ'লেন।

৫

বিবাহ পর্ব্ব খুব সংক্ষেপ। বিবাহের উপকরণ ও দ্বিজ ঋত্বিক পুরোহিত সঙ্গে অশ্বপতি কন্যাকে নিয়ে শুভ দিনে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে যাত্রা ক'রলেন। সেখানে পৌঁছে

---

(১) যযাতিরিব চোদারঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
রূপেণান্যতমোঽশ্বিভ্যাং দ্যুমৎসেনসুতো বলী॥
স দান্তঃ স মৃদুঃ শূরঃ স সত্যঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
স মৈত্রঃ সোঽনসূয়শ্চ স হ্রীমান্ দ্যুতিমাংশ্চ সঃ॥
নিত্যশশ্চার্জবং তস্মিন্ স্থিতিস্তস্যৈব চ ধ্রুবা।
সংক্ষেপতস্তপোবৃদ্ধৈঃ শীলবৃদ্ধৈশ্চ কথ্যতে॥

'দ্যুমৎসেনের বলীপুত্র সত্যবান যযাতির মত উদার, সোমবৎ প্রিয়দর্শন, এবং রূপে যেন অশ্বিনীকুমারদের একজন। তিনি দান্ত, মৃদুস্বভাব, শূর, সত্যপরায়ণ ও সংযতেন্দ্রিয়। মিত্রজনের তিনি হিতৈষী; তিনি অসূয়াশূন্য, লজ্জাশীল ও কান্তিমান্। যাঁরা তপে বৃদ্ধ এবং শীলে যাঁরা বৃদ্ধ তাঁরা সত্যবানের কথা সংক্ষেপে এই বলেন যে সরলতা তাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, এবং সাধুজনের মর্য্যাদাবুদ্ধি তাঁর অচলা।'

দেখলেন এক শালবৃক্ষের তলায় কুশের আসনে অন্ধ দ্যুমৎসেন ব'সে আছেন। অশ্বপতি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিলেন, এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে কন্যা সাবিত্রীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ ক'রতে দ্যুমৎসেনকে অনুরোধ করলেন। দ্যুমৎসেন বললেন 'আমরা রাজ্যচ্যুত; তপস্বীর আচারে বনে বাস করছি। আপনার কন্যা অনভ্যস্ত বনবাসের ক্লেশ কেমন ক'রে সহ্য ক'রবে'। অশ্বপতি উত্তর দিলেন, 'সুখ ও দুঃখ যে আসে আর যায় আমার কন্যা তা ভাল ক'রেই জানে। আমার প্রস্তাব প্রত্যাখান ক'রবেন না জেনেই আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমার আশা ভঙ্গ ক'রবেন না; আমার কন্যা সাবিত্রীকে আপনার পুত্র সত্যবানের ভার্য্যারূপে স্বীকার করুন'। তখন দ্যুমৎসেন ব'ললেন যে এ সম্বন্ধ পূর্ব্ব থেকেই তাঁর অভিলষিত ছিল, কিন্তু তিনি এখন রাজ্য-ভ্রষ্ট এইজন্যই দ্বিধা ক'রছিলেন। তাঁর পূর্ব্বাকাঙ্ক্ষিত অভিপ্রায় তবে আজ-ই পূর্ণ হোক।

ততঃ সর্বান্ সমানায্য দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ।
যথাবিধি সমুদ্বাহং কারয়ামাসতুর্নৃপৌ॥

'তারপর আশ্রমবাসি সব ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ক'রে তাঁদের সমক্ষে সাবিত্রী ও সত্যবানের উদ্বাহক্রিয়া দুই নৃপতি যথাবিধি নিষ্পন্ন করালেন।' সত্যবান সেই সর্ব্বগুণান্বিতা ভার্য্যা লাভ করে আনন্দিত হ'লেন,

মুমুদে সা চ তং লব্ধা ভর্ত্তারং মনসেপ্সিতম।

এবং সাবিত্রী মনের ঈপ্সিত পতি লাভে মোদিতা হ'লেন। অশ্বপতি কন্যাকে যথাযোগ্য বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে নিজের গৃহে ফিরে গেলেন।

যথাসময়ে সাবিত্রীর যে বিবাহ না হওয়ায় তাঁর পিতা দুঃখিত ছিলেন, এবং সাবিত্রীর এই যে বিবাহ এদের মধ্যে তফাৎ এই যে বরপক্ষ যেয়ে কন্যাকে যাচ্ঞা না ক'রে কন্যাপক্ষের এসে বরকে প্রার্থনা ক'রতে হ'লো। অর্থাৎ আমাদের আজকের সমাজে সব সময় যা ঘটছে।

৬

পিতা গৃহে যাত্রা করলে সাবিত্রী অলঙ্কার আভরণ সব খুলে ফেলে বল্কল ও কাষায় বস্ত্র পরিধান ক'রলেন। তাঁর পরিচর্য্যায়, তাঁর স্নেহে, তাঁর সংযমে, প্রত্যেকের অভীষ্ট প্রিয়-কার্য্য সাধনে—সকলেই তুষ্টিলাভ ক'রলো। শ্বশ্রূকে নানা সেবা দিয়ে, শ্বশুরকে দেবপূজার আয়োজনে ও বাক্য সংযমে, এবং কর্ম্মনৈপুণ্যে ও একান্তে সেবা দিয়ে সাবিত্রী স্বামীকে পরিতুষ্ট ক'রতে লাগলেন। কিন্তু

সাবিত্র্যাস্তু শয়ানায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাশ্চ দিবানিশম্।
নারদেন যদুক্তং তদ্বাক্যং মনসি বর্ত্ততে॥

রাত্রি দিন কি শুয়ে কি উঠে সাবিত্রীর মনে জাগছে নারদের ভবিষ্যদ্বাণী। সে কথা স্বামী শ্বশ্রূ শ্বশুর কেউ জানে না; কাউকে বলাও যায় না। সেই ভীষণ সংবাদের দুর্ব্বহভার একলা নিজের মনে বহন ক'রে

গণয়ন্ত্যাশ্চ সাবিত্র্যাদিবসে দিবসে গতে।

দিনের পর দিন গুণতে গুণতে সকলের প্রিয়কার্য্য সাধন ক'রে বধূর দিন কাটতে লাগলো।

অবশেষে সেইদিন উপস্থিত হ'ল যখন নারদ যে দিনের কথা বলেছিলেন তার মধ্যে মাত্র তিনদিন অবশিষ্ট আছে। তখন সাবিত্রী ত্রিরাত্র উপবাস ব্রতের সঙ্কল্প ক'রে এক দিন-রাত্রি উপবাসী থাকলেন। এই সঙ্কল্পের কথা শুনে দ্যুমৎসেন অতি দুঃখিত হ'য়ে স্নেহবাক্যে সাবিত্রীকে ব'ললেন, 'তুমি এ অত্যন্ত তীব্র ব্রত আরম্ভ ক'রেছ। ত্রিরাত্র এ ব্রত পালন করা পরম দুষ্কর কাজ'। সাবিত্রী ব'ললেন, 'আপনি সন্তপ্ত হবেন না। এ ব্রত সমাপন ক'রতে আমি পারবো'। শুনে দ্যুমৎসেন বিরত হ'লেন, এবং সকলে দেখলো যে, সাবিত্রী যেন কাঠের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন। "তিষ্ঠন্তী চৈব সাবিত্রী কাষ্ঠভূতেব লক্ষ্যতে"।

উপবাসে তিন দিন-রাত্রি কেটে গেল। চতুর্থদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সাবিত্রী প্রদীপ্ত অগ্নিতে হোম ক'রে আশ্রমবাসি দ্বিজগণের ও শ্বশ্রূ শ্বশুরের পাদবন্দনা ক'রে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে দাঁড়ালেন। তপোবনবাসী তপস্বীরা তাঁকে অবৈধব্যের আশীর্ব্বাদ ক'রলে সাবিত্রী মনে মনে 'তাই হোক্' ব'লে সে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রলেন, এবং নারদ যে সময়ের কথা ব'লেছিলেন সেই কাল ও সেই মুহূর্ত্তের অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন। তাঁর শ্বশ্রূ-শ্বশুর

তাঁকে ব'ল্‌লেন যে তাঁর ব্রতপালন শেষ হ'য়েছে, এখন পারণার সময় উপস্থিত। সাবিত্রী ব'ল্‌লেন, 'আমি সঙ্কল্প ক'রেছি যে সূর্য্য অস্ত গেলে তবে পারণা ক'র্‌বো'।

এমন সময় মহাবন থেকে ফল-কাঠ আহরণের জন্য কুঠার স্কন্ধে নিয়ে সত্যবান প্রস্তুত হ'লেন। সাবিত্রী স্বামীকে বল্‌লেন, 'তুমি একা যেয়ো না, আমি তোমার সঙ্গে যাবো। তোমাকে ছেড়ে দিতে আজ আমার মন চাচ্চে না'। সত্যবান ব'ল্‌লেন, 'তুমি পূর্ব্বে কখনও বনে যাও নি, আর পথও দুর্গম। ব্রতোপবাসে তুমি দুর্ব্বল; হেঁটে কেমন ক'রে যাবে'। সাবিত্রী তাঁকে ব'ল্‌লেন, 'উপবাসে আমার ক্লেশ নেই, হাঁটতেও পরিশ্রম হবে না। আমার যাওয়ার ইচ্ছায় তুমি বাধা দিও না'। শুনে সত্যবান ব'ল্‌লেন, 'তবে শ্বশ্রূ-শ্বশুরের অনুমতি নেও'। সাবিত্রী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদন ক'রে তাঁদের ব'ল্‌লেন, 'স্বামী ফল-কাষ্ঠ আহরণের জন্য মহাবনে যাচ্ছেন; আমার ইচ্ছা আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে যাই। "ন মেহস্য বিরহঃ ক্ষমঃ"—তাঁর বিরহ আজ আমার সহ্য হবে না। তিনি গুরু ও অগ্নিহোত্রের জন্য ফল ও কাঠ সংগ্রহে যাচ্ছেন, তাঁকে বারণ করাও যায় না। প্রায় এক বৎসর হ'ল আমি আশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হই নি;

বনং কুসুমিতং দ্রষ্টুং পরং কৌতূহলং হি মে।

কুসুমিত বন দর্শনের জন্য আজ আমার পরম কৌতূহল হ'য়েছে'।

দ্যুমৎসেন ব'ল্‌লেন, 'যে অবধি সাবিত্রী আমাদের পুত্রবধূ হ'য়েছে সে পর্য্যন্ত সে যে নিজের কোনও অভীষ্ট প্রার্থনা ক'রেছে তা আমার স্মরণ হয় না। বধূর এ অভিলাষ পূর্ণ হোক'। এবং সাবিত্রীকে সম্বোধন ক'রে ব'ল্‌লেন,

অপ্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যঃ পুত্রি সত্যবতঃ পথি

'পুত্রি, সত্যবানের পথে যাতে কোনও প্রমাদ না হয় তা ক'রো'। পুত্রের উপর পুত্রবধূর ভার দিলেন না। তিন দিন উপবাসী বধূর উপর পুত্রের অপ্রমাদের ভার দিলেন। বৃদ্ধ, চক্ষুহীন পিতার একমাত্র পুত্রের সম্বন্ধে কেবল স্নেহান্ধত্ব নয়, কার ভার কাকে দেওয়া চলে এক বৎসরের পরিচয়ে দ্যুমৎসেন তা বুঝেছিলেন। অবশ্য গ্রীক আলঙ্কারিকেরা যাকে irony ব'লেছেন তা-ও এর মধ্যে রয়েছে।

উভয়ের অনুমতি পেয়ে

সা জগাম যশস্বিনী।
সহ ভর্ত্রা হসন্তীব হৃদয়েন বিদূয়তা॥

'যশস্বিনী সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে চল্‌লেন,—বিমর্দ্দিত হৃদয়ে মুখে হাসি টেনে'। যে কুসুমিত বন দিয়ে তাঁদের পথ তার উৎফুল্ল রমণীয়তার সঙ্গে সাবিত্রীর ক্লিষ্ট অন্ধকার মনের বিরোধের যে pathos কবির তা দৃষ্টি এড়ায় নি।

সা বনানি বিচিত্রাণি রমণীয়ানি সর্ব্বশঃ।
ময়ূরগণজুষ্টানি দদর্শ বিপুলেক্ষণা॥
নদীঃ পুণ্যবহাশ্চৈব পুষ্পিতাংশ্চ নগোত্তমান।
সত্যবানাহ পশ্যেতি সাবিত্রীং মধুরং বচঃ॥
নিরীক্ষমাণা ভর্ত্তারং সর্ব্বাবস্থমনিন্দিতা।
মৃতমেব হি তং মেনে কালে মুনিবচঃ স্মরন্॥
অনুব্রজন্তী ভর্ত্তারং জগাম মৃদুগামিনী।
দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তঞ্চ কালমবেক্ষতী॥

'আয়ত-লোচনা সাবিত্রী ময়ূরগণের আবাস বিচিত্র রমণীয় সব বন দেখ্‌তে পেলেন। পুণ্যবহা নদী ও পুষ্পিত গিরি-শিখর সত্যবান মধুর বাক্যে সাবিত্রীকে দেখালেন। অনিন্দিতা সাবিত্রী সর্ব্বক্ষণ স্বামীকে নিরীক্ষণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'ল্‌লেন, এবং নারদের বাক্য স্মরণ ক'রে তাঁকে তখন মৃত বলেই মনে ক'র্‌লেন। মৃদুগামিনী স্বামীর অনুগমন ক'রতে লাগ্‌লেন—দ্বিধাবিদীর্ণ হৃদয়ে, সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের আগমন প্রতীক্ষা ক'রে।'

৭

সত্যবান সাবিত্রীর সঙ্গে মহাবনে প্রবেশ ক'রে ফল পেড়ে থলী পূর্ণ ক'র্‌লেন, এবং কুঠার দিয়ে কাঠ সংগ্রহ আরম্ভ ক'র্‌লেন। হঠাৎ তাঁর সমস্ত শরীরে ঘাম দেখা দিল, এবং মাথার মধ্যে বেদনা বোধ হ'লো। তিনি সাবিত্রীকে ব'ল্‌লেন, 'এই পরিশ্রমেই আমার শিরঃপীড়া হ'য়েছে। আমার সমস্ত শরীর এবং হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে, মাথার মধ্যে যেন শূল বিদ্ধ হচ্ছে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না'। সাবিত্রী এসে স্বামীকে ধ'রে মাটিতে

শুইয়ে দিলেন, এবং তাঁর মাথা কোলে নিয়ে সেখানে উপবেশন ক'রলেন। নারদের বাক্য স্মরণ ক'রে

তং মুহূর্ত্তং ক্ষণং বেলাং দিবসঞ্চ যুযোজ হ।

গণনায় দেখ্‌লেন সেই বেলা, সেই ক্ষণ, সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'য়েছে। পর মুহূর্ত্তেই সাবিত্রী দেখ্‌লেন প্রকাণ্ড উজ্জ্বলবপু, নির্ম্মল শ্যামবর্ণ, বদ্ধ কেশ-কলাপ, রক্তাক্ষ, রক্তবস্ত্র পরিধান, পাশহস্ত এক ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি পুরুষ সত্যবানের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাকে নিরীক্ষণ ক'রছে।

দেখেই স্বামীর মাথাটি আস্তে মাটিতে রেখে সাবিত্রী উঠে দাঁড়ালেন এবং কৃতাঞ্জলি হ'য়ে কম্পিত হৃদয়ে আর্ত্ত বাক্যে বল্‌লেন, 'আপনার অমানুষ বপুতেই জেনেছি আপনি মানুষ নন দেবতা; দয়া ক'রে বলুন কে আপনি, কেনই বা এসেছেন'।

৮

এর পর যম ও সাবিত্রীর যে কথোপকথন যার ফলে যম সাবিত্রীকে পাঁচটী বর দিলেন, এবং সর্ব্বশেষ বরে সত্যবান মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠে চার-শ বছর পরমায়ু লাভ ক'রলেন—সেখানে গল্পের সুর স্পষ্টই নেমে গেছে। ওর কাব্যাংশ যে ব্যাহত হ'য়েছে সে কেবল অলৌকিকের স্থূল আবির্ভাবে পাঠকের প্রতীতি ভঙ্গের জন্য নয়, যে উপায়ে সত্যবান পুনর্জ্জীবন পেলেন সাবিত্রীর চরিত্র-মহিমার তুলনায় তার তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকরত্বে।

৯

যম সাবিত্রীকে নিজের পরিচয় দিলেন এবং জানালেন সত্যবানের আয়ুশেষ হ'য়েছে তাই তাঁকে নিতে এসেছেন। সত্যবান ধার্ম্মিক রূপবান ও মহাগুণবান ব'লে অনুচরদের না পাঠিয়ে নিজেই এয়েছেন। এই কথা ব'লে সত্যবানের শরীর থেকে পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র এক পুরুষকে বলে টেনে বের করলেন, এবং সত্যবানের গতপ্রাণ, শ্বাসহীন নিশ্চেষ্ট শরীর অপ্রিয়দর্শন হ'য়ে উঠলো। যম সেই বদ্ধ পুরুষকে নিয়ে দক্ষিণমুখে যাত্রা করলেন; নিয়মব্রত-সিদ্ধা দুঃখার্ত্তা সাবিত্রীও যমের অনুগমন ক'রতে লাগ্‌লেন।

যম তাঁকে ফিরে যেয়ে স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করতে ব'ল্‌লেন, এবং ব'ল্‌লেন ভর্ত্তার ঋণ তিনি শোধ করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে যতদূর যাবার তা গিয়েছেন। সাবিত্রী ব'ল্‌লেন যে তাঁর স্বামীকে নিয়ে যম যেখানে যাচ্ছেন তিনিও সেইখানেই যাবেন। তপস্যা, গুরুভক্তি, ভর্ত্তৃস্নেহ ও যমের প্রসাদে তাঁর গতি প্রতিহত হবে না। এই কথা ব'লে ব'ল্‌লেন, 'জ্ঞানীরা বলেন একসঙ্গে সাত পা গেলেই মিত্রতা হয়। সেই ভরসায় আপনাকে আমি কিছু ব'ল্‌বো, আপনি শুনুন'।

এই ভূমিকা ক'রে সাবিত্রী যমকে যে দুটি শ্লোক শোনালেন সে হ'চ্ছে দুটি ব্যাসকূট। তার ঠিক অর্থ বোঝা অসাধ্য, এবং শ্লোক দুটিতে কিছু পাঠান্তরও আছে,—বোধ হয় অর্থের এই অসৌকর্য্যের ফল। নীলকণ্ঠ যে পাঠের টীকা ক'রছেন (২) তার আক্ষরিক অনুবাদ নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা অনুসারে কতকটা এইরকম দাঁড়ায়। 'অনাত্মবন্ত লোকেরা বনে কি গ্রামে ধর্ম্ম আচরণ করে না; ব্রহ্মচর্য্যও নয় সন্ন্যাসও নয়। ধর্ম্মের ফল আত্মজ্ঞান, এইজন্য সাধুরা ধর্ম্মকেই প্রধান বলেন। একের সজ্জনসম্মত ধর্ম্মপথ দেখে সকলেই সেইপথ অবলম্বন করে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পথ বাঞ্ছা করে না,—সেইজন্য সাধুরা ধর্ম্মকেই প্রধান বলেন।' নীলকণ্ঠ এর টেনেবুনে অর্থ ক'রেছেন যে গৃহাশ্রমসাধ্য—তা গ্রামেই হোক আর বনেই হোক—যে ধর্ম্ম তাতেই আত্মজ্ঞানলাভ হয়, সুতরাং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ও পরিব্রজ্যা নিষ্প্রয়োজন! পাঠান্তর যা আছে তাতেও অর্থের বিশেষ কিছু উন্নতি হয় না।

যা হোক শ্লোক শুনে যম ভারি খুসি হ'লেন; তবে শ্লোকের অর্থ বুঝে, না সাবিত্রীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনে বলা শক্ত। যম সাবিত্রীকে ব'ল্‌লেন, 'তুমি নিবৃত্ত হও, 'তুষ্টোঽস্মি তবানয়া গিরা স্বরাক্ষরব্যঞ্জনহেতুযুক্তয়া'—তোমার বিশুদ্ধ ধ্বনি ও স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ যুক্ত

(২) নানাত্মবন্তস্তু বনে চরন্তি ধর্ম্মঞ্চ বাসঞ্চ পরিশ্রমঞ্চ।
বিজ্ঞানতো ধর্ম্মমুদাহরন্তি তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্॥
একস্য ধর্ম্মেণ সতাং মতেন সর্ব্বে স্ম তং মার্গমনুপ্রপন্নাঃ।
মা বৈ দ্বিতীয়াং মা তৃতীয়ঞ্চ বাঞ্ছে তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্॥

সুযুক্তি পূর্ণ বাক্য শুনে তুষ্ট হ'য়েছি। সত্যবানের জীবন ছাড়া আর যে বর তুমি চাও তাই দেবো'। সাবিত্রী অন্ধ শ্বশুরের চক্ষুপ্রাপ্তি কামনা ক'র্‌লেন। যম তাঁকে সেই বর দিয়ে ব'ল্‌লেন, 'তুমি ফিরে যাও; পথ চ'ল্‌তে তোমার কষ্ট হ'চ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি'। সাবিত্রী ব'ল্‌লেন স্বামীর সমীপে তাঁর কষ্ট কোথায়। এবং যমকে আবার তাঁর কথা শুন্‌তে ব'ল্‌লেন।

এবার সাবিত্রী যা ব'ল্‌লেন (৩) তার অর্থ সজ্জনের সংসর্গেই বাস করা উচিত, কারণ তাদের সঙ্গে মিত্রতা হয় সহজে, আর সে সঙ্গ নিষ্ফলও হয় না। নীলকণ্ঠ টীকা ক'রেছেন যে ওর ধ্বনি হচ্ছে যে যম সজ্জন ব্যক্তি, তাঁর সঙ্গে সাবিত্রীর এই পরিচয় বিফল হবে না। যম আবার খুসি হ'লেন এবং সত্যবানের জীবন ছাড়া দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর্‌তে বল্‌লে সাবিত্রী শ্বশুরের হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা ক'র্‌লেন। যম বর দিয়ে সাবিত্রীকে আবার ফিরে যেতে ব'ল্‌লেন।

সাবিত্রী সে কথায় কান না দিয়া যমকে ব'ল্‌লেন যে তিনি নিয়ম দিয়ে লোকদের সংযত রাখেন, আর নিজের ইচ্ছা অনুসারে নয় প্রত্যেকের কর্ম্ম অনুসারে তাদের নিয়ে যান এইজন্যই তাঁর নাম 'যম', এবং আবার তাঁর কথা শুন্‌তে যমকে অনুরোধ ক'র্‌লেন। সে কথা হচ্ছে (৪), 'কর্ম্ম মন ও বাক্যে সর্ব্বভূতে অদ্রোহ, দয়া ও দান সাধুদের সনাতন ধর্ম্ম। জগতে এই রকম-ই প্রায় দেখা যায় যে মানুষ শক্তিহীন দুর্ব্বল, সেইজন্য সজ্জনেরা শরণাগত শত্রুকে পর্য্যন্ত দয়া করেন'। নীলকণ্ঠের মতে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের উপরে যমের করুণার উদ্রেক করা।

যম শুনে ব'ল্‌লেন, 'তোমার এ বাক্য পিপাসিতের কাছে জলের মত হৃদ্য। সত্যবানের জীবন ছাড়া আর যে বর ইচ্ছা প্রার্থনা কর।' সাবিত্রী পুত্রহীন পিতার পুত্র লাভের বর নিলেন।

বর দিয়ে যম ব'ল্‌লেন, 'ফিরে যাও; তুমি বহু দূরের পথ এসেছ'। সাবিত্রী উত্তর ক'র্‌লেন, 'স্বামীর সান্নিধ্যে এ আমার কাছে দূর নয়; আমার মন আরও অনেক দূর যাচ্ছে,—'মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি'; আমি যে কথা আরম্ভ ক'রেছি আপনি যেতে যেতেই তা আবার শুনুন'।

সাবিত্রী ব'ল্‌লেন, 'আপনি নিরপেক্ষ ধর্ম্মে লোকদের রঞ্জন করেন এইজন্য আপনি ধর্ম্মরাজ। সজ্জনের উপর লোকের যে বিশ্বাস হয় নিজের উপরেও সে বিশ্বাস হয় না; সেইজন্য লোকে সজ্জনকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করে' (৫)। নীলকণ্ঠ বলেন এর উদ্দেশ্য এই কথা বলা যে লৌকিক সাধুদের বিশ্বাস ক'রেই ইষ্টসিদ্ধি হয়, আপনি ত ধর্ম্মরাজ!

যম ব'ল্‌লেন, 'কল্যাণি, তুমি যে কথা শোনালে এমন কথা আমি আর কোথাও শুনিনি। আমি তুষ্ট হ'য়েছি; সত্যবানের জীবন ছাড়া আর যে হয় চতুর্থ বর নিয়ে তুমি ফিরে যাও'।

তখন সাবিত্রী সত্যবানের ঔরসে তাঁর আত্মজ বলবীর্য্যশালী একশত পুত্রের বর প্রার্থনা ক'র্‌লেন। যম ব'ল্‌লেন তাই হবে, 'শতং সুতানাং বলবীর্য্যশালিনাং ভবিষ্যতি প্রীতিকরং তবানঘে'।

মহাভারতের একজন আধুনিক বাঙ্গালী ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে সাবিত্রী এখানে মহীয়সী চাতুরী দেখিয়েছেন; সত্যবানের জীবন সাক্ষাৎ যাচ্ঞা না ক'রে যমের কথাও রেখেছেন, অথচ প্রকারান্তরে তাই আবার আদায় ক'রেছেন (৬)। এই চাতুরী যদি 'মহীয়সী' হয় তবে এতে বিদ্যি

(৩) সতাং সকৃৎ সঙ্গতমীপ্সিতং পরং ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে।
ন চাফলং সৎপুরুষেণ সঙ্গতং ততঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে॥

'সজ্জনের সঙ্গে একবার মাত্র সম্মেলনও অতিশয় কাম্য; তাতেই তাঁরা পরম মিত্র হন। সৎপুরুষের সঙ্গ নিষ্ফল হয় না, সেজন্য সাধুলোকের সংসর্গে বাস করা উচিত'।

(৪) অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
এবম্প্রায়শ্চ লোকোঽয়ং মনুষ্যাঃ শক্তিপেশলাঃ।
সন্তস্ত্বেবাপ্যমিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেষু কুর্ব্বতে॥

(৫) আত্মন্যপি ন বিশ্বাসস্তথা ভবতি সৎসু যঃ।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ॥

(৬) "অহো! সাবিত্র্যা মহীয়সীয়ং চাতুরী কৃতা; যৎ যমবচন—মনুসরন্ত্যা সত্যবতো জীবনং সাক্ষান্ন যাচিতম্, অথ চ ভঙ্গ্যা তদেব সংগৃহীতমিতি।" (মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত 'ভারতকৌমুদী' টীকা—বনপর্ব্ব পৃঃ ২৪৪৩)।

তোলেন তার বুদ্ধির মাপকাঠির পরিমাণ খুব বড় নয়। অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তাতেই সাবিত্রী নিশ্চয়ই যমের বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছিলেন!

চতুর্থ বর দিয়ে যম সাবিত্রীকে আর পথশ্রম না ক'রে ফিরে যেতে ব'ল্লেন,—'নিবর্ত্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা'। তখন সাবিত্রী চারটি শ্লোকে (৭) সজ্জনের সত্য-ধর্ম্ম ও তার গুণ ও শক্তি কীর্ত্তন ক'র্লেন। 'সজ্জনের শাশ্বত-ধর্ম্মেই স্থিতি, তাঁরা অবসন্ন কি ব্যথিত হন না ; তাঁদের সঙ্গ নিষ্ফল হয় না, এবং সজ্জনের কাছে সজ্জনের কোনও ভয় নেই। তাঁদের সত্য-ধর্ম্মই সূর্য্যকে চালিত ক'র্ছে, তাঁদের তপস্যা ভূমিকে ধারণ ক'র্ছে ; ভূত ও ভবিষ্যতের তাঁরাই গতি, সজ্জনের মধ্যে সজ্জন অবসন্ন হন না। সজ্জনেরা প্রতিদানের অপেক্ষা না ক'রেই পরের উপকার করেন, কারণ এই বৃত্তিই শাশ্বত আর্য্যাচার। সৎপুরুষের প্রসাদ নিষ্ফল হয় না, তাঁদের কাছে কারও অর্থ ও মান নষ্ট হয় না ; তাঁরাই সর্ব্ব-লোকের রক্ষক'। নীলকণ্ঠ ব'লেছেন চতুর্থ বর দিয়ে যম যে সত্যবদ্ধ হ'য়েছেন এ শ্লোকগুলি সেই সত্য রক্ষার প্ররোচনা।

শ্লোক চারটি শুনে যম সাবিত্রীকে বল্লেন তিনি তাঁর ভাষায় মনোহর ও অর্থে মহৎ ধর্ম্ম-যুক্ত বাক্য যত শুন্‌ছেন, তাঁর ভক্তিও তত বৃদ্ধি হ'চ্ছে ; 'বরং বৃণীষ্বাপ্রতিমং পতিব্রতে—তুমি আমার কাছে অপ্রতিম অর্থাৎ অতুলনীয় একটি বর প্রার্থনা কর'। 'সত্যবানের জীবন ছাড়া'—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এ কথাটা আর ব'ল্লেন না। তখন সাবিত্রী সোজাসুজি বর চেলেন সত্যবানের পুনর্জ্জীবন।

বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং যথা মৃতা হ্যেবমহং বিনা পতিম্।

'সত্যবান বেঁচে উঠুন এই বর আমি চাই, কারণ পতির মৃত্যুতে আমাকে মৃতাই মনে ক'র্বেন।' এবং ব'ললেন স্বামীহীন হয়ে সুখ কি স্বর্গ তিনি চান না ; 'ন ভর্ত্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্,—ভর্ত্তৃবিহীন হ'য়ে বাঁচার শক্তি আমার নেই'। যমকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে সত্যবানের ঔরসে শতপুত্রের বর তাঁকে তিনিই দিয়েছেন, আবার তিনিই তাঁর পতিকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন।

বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি।

'সত্যবান বেঁচে উঠুন এই বর আমাকে দিন, আপনার বাক্য সত্য হোক।'

'তাই হোক' ব'লে যম সত্যবানকে পাশ থেকে মুক্ত ক'র্লেন, এবং প্রহৃষ্টাত্মা হ'য়ে সাবিত্রীকে ব'ল্লেন 'সত্যবান নিরোগ ও বলীয়ান হ'য়ে তোমার সঙ্গে চার-শ বছর পরমায়ু পাবেন'। তারপর বরগুলির আবার একটা ফর্দ্দ দিয়ে 'স্বমেব ভবনং যযৌ'—নিজের বাড়ী প্রস্থান ক'র্লেন।

১০

এই অতি-বাস্তব যমের অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের রস আবার গাঢ় হ'য়ে উঠেছে।

১১

সত্যবানের প্রাণহীন শরীর যেখানে প'ড়ে ছিল সাবিত্রী সেখানে ফিরে যেয়ে স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে ব'স্‌লেন। তখন সত্যবান সংজ্ঞা পেয়ে সপ্রেম দৃষ্টিতে সাবিত্রীকে পুনঃ পুনঃ দেখতে লাগ্‌লেন যেন বহুদিন পরে প্রবাস থেকে ফিরে এসেছেন,—'প্রোষ্যাগত ইব প্রেম্ণা পুনঃ পুনরুদীক্ষ্য বৈ'। সাবিত্রী স্বামীকে বল্লেন, 'তুমি বিশ্রান্ত হ'য়েছ, তোমার ঘুমও ভেঙেছে ; যদি উঠ্‌তে পার তবে এখন ওঠ, দেখ, রাত্রি গাঢ় হ'য়েছে'। সত্যবান সুপ্তোত্থিত লোকের মত চারিদিক বনান্ত নিরীক্ষণ ক'রে ব'ল্লেন, 'কাঠ কাট্‌তে কাট্‌তে অসুস্থ হ'য়ে আমি তোমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বেশ মনে আছে। তোমার আলিঙ্গনে ঘুমে যখন আমি অচেতন তখন যেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মহাতেজস্বী এক পুরুষকে দেখেছিলাম। সেটি কি ? সে কি স্বপ্ন না সত্য যদি জান তবে আমাকে বল,—'স্বপ্নো বদি বা দৃষ্টো যদি বা সত্যমেব তৎ।' সাবিত্রী তাঁকে ব'ল্লেন যে রাত্রি

(৭) সতাং সদা শাশ্বতধর্ম্মবৃত্তিঃ সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তে।
সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি সদ্ভ্যো ভয়ং নানুবর্ত্তন্তি সন্তঃ॥
সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি
সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্ সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ॥
আর্য্যজুষ্টমিদং বৃত্তমিতি বিজ্ঞায় শাশ্বতম্।
সন্তঃ পরার্থং কুর্ব্বাণা নাবেক্ষন্তে প্রতিক্রিয়াম্॥
ন চ প্রসাদঃ সৎপুরুষেষু মোঘো ন চাপ্যর্থো নশ্যতি নাপি মানঃ।
যস্মাদেতন্নিয়তং সৎসু নিত্যং তস্মাৎ সন্তো রক্ষিতারো ভবন্তি॥

অনেক হ'য়েছে, পরদিন প্রাতে তিনি সব ব'ল্‌বেন; 'এখন উঠে আশ্রমে তোমার পিতামাতার কাছে চল। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েছে, বনে গাঢ় অন্ধকার। রাত্রিচর প্রাণীরা বিকট শব্দ ক'রে বিচরণ ক'র্‌ছে, চঞ্চল মৃগদের পায়ে লেগে শুষ্ক পাতার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শৃগালের উগ্র ধ্বনিতে আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ছে'।

যমের সাম্‌নেও কম্পান্বিত মনকে যাঁর দৃঢ় রাখ্‌তে হ'য়েছিল অবলা-সুলভ এ ভয়ের বিলাস তাঁর ভাগ্যে সহ্য হবে কেন! সত্যবান উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ব'ল্‌লেন, 'ঘন অন্ধকারে আবৃত এই বন আমার কাছে ভয়ঙ্কর বোধ হচ্ছে। এ অন্ধকারে পথও চিন্‌তে পার্‌বে না চল্‌তেও পার্‌বে না'। সাবিত্রী তখনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ব'ল্‌লেন, 'তুমি উদ্বিগ্ন হ'ও না। আজ-ই এই বন দগ্ধ হ'য়েছে; একটা শুষ্ক বৃক্ষ এখনও জ্বল্‌ছে। আমি ওখান থেকে আগুন এনে এই যে কাঠ র'য়েছে এই দিয়ে চার দিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখ্‌বো। তোমাকে এখনও রোগীর মত দেখাচ্ছে; যদি চ'ল্‌তে কষ্ট হয় আর অন্ধকারে পথ না চেনো তবে কাল প্রাতেই আমরা যাবো, আজ এক রাত্রি এই বনেই থাকি'।

তখন সত্যবান ব'ললেন যে তাঁর মাথার বেদনা সেরেছে আর শরীরও সুস্থ বোধ হ'চ্ছে, কিন্তু পিতামাতাকে না দেখে তিনি এক রাত্রিও থাকৃতে পার্‌বেন না। তাঁর মা সন্ধ্যা হ'তেই আর তাঁকে আশ্রম থেকে বের হ'তে দেন না, এমন কি দিনের বেলা বের হ'লেও বাপ-মা দুজনেই উদ্বিগ্ন থাকেন। তাঁরা অনেকবার ব'লেছেন যে তাঁদের বৃদ্ধ বয়সের ও অন্ধ অবস্থার তিনিই যষ্টি, তাঁকে হারিয়ে তাঁরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচবেন না। আজ রাত্রে তাঁকে না দেখ্‌লে তাঁদের যে কি অবস্থা হবে কে জানে। এই রকম অনেক বিলাপ ক'রে

উচ্ছ্রিত্য বাহু দুঃখার্ত্তঃ সস্বরং প্ররুরোদ হ।

দুই হাত উর্দ্ধে তুলে সত্যবান উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগ্‌লেন।

সাবিত্রী স্বামীকে দুঃখার্ত্ত দেখে তাঁর দু চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে—'বিমৃজ্যাশ্রূণি নেত্রাভ্যাং'—ব'ললেন, 'তপস্যা যদি আমি করে থাকি তবে আজকের রাত্রি আমার শ্বশ্রূ-শ্বশুর-স্বামীর 'পুণ্যাহস্তু'—মঙ্গলময় হোক্‌। আমি স্বচ্ছন্দ আলাপেও কখনও মিথ্যা ব'লেছি মনে হয় না, সেই সত্য আজ আমার শ্বশ্রূ-শ্বশুরকে ধারণ ক'রে রাখুক'।

সত্যবান ব'ললেন, 'পিতামাতাকে না দেখে আর আমি থাকৃতে পার্‌ছি না; সাবিত্রী, চল আর দেরী ক'রো না। যদি পিতা বা মাতার কিছু বিপ্রিয় আমি দেখি তবে আমিও বাঁচবো না এ তোমাকে নিশ্চয় ব'ল্‌ছি। যদি আমাকে জীবিত রাখ্‌তে চাও, আমার প্রিয় যদি তোমার কর্ত্তব্য হয় এখান থেকে আশ্রমের দিকে চল'।

সাবিত্রী তত উত্থায় কেশান্ সংযম্য ভাবিনী।
পতিমুত্থাপয়ামাস বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য বৈ॥

তখন সাবিত্রী উঠে কেশ সংযম ক'রে দু বাহু দিয়ে স্বামীকে ধ'রে তুললেন। সত্যবান দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে অঙ্গ মার্জ্জনা ক'রলেন এবং চারদিকে তাকিয়ে ফলের থলিটির উপর চোখ রাখলেন। সাবিত্রী ব'ললেন 'ও ফল কাল এসে নিও, কেবল কুঠারখানা গৃহকাজের জন্য আমি এখন নিয়ো যাবো'। এই ব'লে ফলের থলিটি গাছের শাখায় ঝুলিয়ে রেখে কুঠারখানি নিয়ে স্বামীর কাছে এলেন।

বামে স্কন্ধে তু বামোরুর্ভর্তুর্বাহুং নিবেশ্য চ।
দক্ষিণেন পরিষ্বজ্য জগাম গজগামিনী॥

নিজের বাম স্কন্ধে সত্যবানের বাঁ হাতখানা রেখে, ডান হাত দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে ধ'রে চ'লতে আরম্ভ ক'র্‌লেন।

কিছুদূর যেয়ে সত্যবান ব'ললেন, 'বৃক্ষের অন্তরাল দিয়ে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে, আমার এ অভ্যস্ত পথ এখন আমি চিন্‌তে পার্‌ছি। ঐ যে একসার পলাশ গাছের কাছে পথটা দুভাগ হ'য়েছে ওর উত্তর দিকের পথ দিয়ে চল'। তখন ত্বরাযুক্ত হ'য়ে তাঁরা দুজনে আশ্রমের দিকে চ'ল্‌লেন।

সাবিত্র্যুপাখ্যানের লেখক কেবল একটা প্রাচীন উপাখ্যান ব'লে যান নি, সাবিত্রী-সত্যবান দুজন মানুষকে কল্পনার অন্তর্দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ক'রে কাব্যে তাদের গ'ড়ে তুলেছেন। সত্য ও ধৈর্য্যে ঋজু, তেজে দীপ্ত, স্নেহে কোমল, কর্ম্মে দৃঢ় স্ত্রীর পাশে শান্ত-মৃদু স্বভাব, নমনীয় মন, পর-নির্ভরশীল স্বামী। বৃদ্ধ বয়সের পিতা-মাতার দুলাল পুত্রটি বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে তপোবনে মানুষ হ'য়ে সেখানকার সদ্গুণ

কিছু হয়ত চরিত্রে পেয়েছিলেন, কিন্তু পৌরুষের কাঠিন্য কিছু পান নি। অবশ্য যদি পেতেন, সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প হ'তো না! শেষের কথাটি ব'লতে সত্যবান সাবিত্রীকে সম্বোধন ক'রেছেন 'ভীরু' ব'লে (৮)। সংস্কৃত সাহিত্যের স্বামীর স্ত্রীকে সম্বোধনের এই মামুলী পদটি দিয়ে কবি অনেকখানি করুণ-হাস্য রসের সৃষ্টি ক'রেছেন।

১২

গল্পের বাকী অংশ সমস্ত সুখ-সৌভাগ্যান্ত গল্পের পরিণামের মত গল্পের পাত্র-পাত্রীদের আনন্দের, পাঠকের কাছে স্বাদহীন।

সাবিত্রী ও সত্যবান রাত্রে আশ্রমে পৌঁছে দেখ্লেন যে দ্যুমৎসেন ও শৈব্যা তাঁদের অদর্শনে অতিমাত্রায় কাতর হ'য়ে পড়েছেন এবং ঋষিরা তাঁদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন; কিন্তু দ্যুমৎসেনের অন্ধত্ব দূর হ'য়ে তিনি প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ ক'রেছেন। তাঁদের দেখে তাঁরা বিগত শোক হ'লেন, এবং ঋষিদের প্রশ্নের উত্তরে সাবিত্রীর কাছে সব কথা শুনে সকলের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাক্‌লো না। পরদিন প্রভাতে শাল্বদেশ থেকে বহু প্রজা এসে জানালো যে মন্ত্রী শত্রু-রাজাটিকে বধ করেছেন এবং জন-সাধারণ একবাক্যে দ্যুমৎসেনকে রাজা স্থির ক'রে নগরে তাঁর জয়-ঘোষণা ক'রেছে এবং তাদের প্রতিনিধি হ'য়ে যান-বাহন চতুরঙ্গ বল নিয়ে তারা রাজাকে নিতে এসেছে। দ্যুমৎসেনকে চক্ষুষ্মন্ত দেখে সকলে বিস্ময়োৎফুল্ল হ'লো, এবং তিনি ঋষিদের অভিনন্দন নিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ সহ স্বরাজ্যে প্রস্থান ক'র্‌লেন। সেখানে দ্যুমৎসেন রাজ্যে অভিষিক্ত হ'লেন, এবং পুরোহিতেরা সত্যবানকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ক'র্‌লেন। কালে সাবিত্রী-সত্যবান কীর্তিবর্দ্ধন বহু পুত্র লাভ ক'র্‌লেন। 'যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা' ইত্যাদি।

১৩

সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পের জন-প্রসিদ্ধ মূল কথা হ'চ্ছে যমের কাছে থেকে সাবিত্রীর মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে আনা। ঐ ঘটনাটি-ই গল্পের climax, গল্পের আর যা কিছু সকলের পরিণতি। কিন্তু গল্পের এই অংশটাই যে কাব্যে হীন ও পূর্ব্ব-পরের রসবিরোধী কেবল তা নয়, ওর নিজের মধ্যেও কোনও সঙ্গতি ও ঘটনার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের বাঁধন নেই। সাবিত্রী যমকে যে সব কতক অবোধ্য ও বাকী সব অতি-পরিচিত মামুলী ধর্ম্ম-কথা শোনালেন তাতে যমের ওরকম অসম্ভব খুসি হ'য়ে ওঠার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। 'লোকে নিজের চেয়েও সজ্জনকে বেশী বিশ্বাস করে'—সাবিত্রীর মুখে এই কথা শুনেই যম ব'ল্‌লেন, এ যা শোনালে 'ন তাদৃক চ কুতো ময়া শ্রুতম্',—এর অর্থ কি? (৯) আর, সত্যবানের জীবন ছাড়া অন্য বর চাও—বার বার এ কথা ব'লে সত্যবানের ঔরসে শত-পুত্রের বর সাবিত্রীকে দিয়ে ব'স্‌লেন, যম এতটা নির্ব্বোধ হ'লেন কি ক'রে? সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের পুরস্কারে নিয়তিকে নাম-মাত্র বহাল রেখে সত্যবানকে বাঁচিয়ে দিতেই যম সংকল্প ক'রে

(৮) অত্যাগমন্নাতীর পত্থানো বিদিতা মম।
বৃক্ষান্তরালোকিতয়া জ্যোৎস্নয়া চাপি লক্ষয়ে।

(৯) জার্ম্মাণ পণ্ডিত M. Winternitz অনুমান ক'রেছেন যে মূল শ্লোকগুলির যথাযথ রূপ হয় ত আমাদের কাছে পৌঁছে নি ("Some of the verses may have been badly transmitted") কিন্তু ওদের ভাবার্থ তাঁর কাছে খুব পরিষ্কার মনে হ'চ্ছে; সে হচ্ছে মৈত্রী ও সাধুত্বের সঙ্গে প্রকৃত জ্ঞানের অভেদ তত্ত্ব ("Yet the fundamental thought of all the verses by means of which Savitri so greatly pleases the the god and vanguishes him, is sufficiently clear; it is the doctrine of wisdom that is one with love and goodness")। অধ্যাপক Winternitz সাবিত্র্যুপাখ্যানকে ব'লেছেন "the most magnificent of all brahmanical poems which the epic has peserved", এবং তার কবি সম্বন্ধে ব'লেছেন, "whoever it was who sang the song of Savitri, whether a suta or a a Brahman, he was certainly one of the greatest poets of all times" ['A History of Indian Literature'. (Eng. Translation) vol I pages 397-398]। এই রস-বিচারে বিরোধের কারণ দেখি নে। কিন্তু কাব্যটি অধ্যাপককে এমনি মুগ্ধ ক'রেছে যে ওর দুর্ব্বল অংশটারও তিনি যা হোক কিছু একটা plausible সুব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চান। আর পণ্ডিতের কাছে যে একাজ বিশেষ শক্ত নয় তা Winternitzএর বহুপূর্ব্বে নীলকণ্ঠ প্রমাণ করে গেছেন।

এসেছিলেন এ রকম ইঙ্গিতও গল্পের মধ্যে নেই। তাতে ওর কাব্যত্ব অবশ্য কিছু বাড়্‌তো না, তবে গল্পাংশটা অবোধ্য থাক্‌তো না।

এসব দেখে মনে হয় খুব সম্ভব মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান একটা প্রাচীন গল্পকে নূতন রূপ দিয়ে লেখা। সেই প্রাচীন কাহিনীর মর্ম্ম-কথা ছিল সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের মহিমা নয়, তাঁর বুদ্ধি-কৌশলের বাহাদুরী। যমকে কেমন ক'রে কথায় কথায় কথার ফাঁকিতে সত্য-বদ্ধ ক'রে মৃত স্বামীকে সাবিত্রী ফিরে পেয়েছিলেন গল্পের ছিল সেইটেই বক্তব্য। মানুষের আদিম সমাজের বহু গল্প বুদ্ধির চাতুরীতে অন্যকে ঠকিয়ে কি বোকা বানিয়ে বাহাদুরীর গল্প। আদিম মানুষের ওর উপর ভক্তি ও সে গল্পে তার আনন্দ আজও সব সমাজের শিশুদের ও অনেক বয়োবৃদ্ধের মধ্যে দেখা যায়। নখ-দন্তহীন মানুষ বুদ্ধির ফিকিরেই পৃথিবীতে টি'কে গেছে, ও তার সমস্ত সৃষ্টি ও মহত্ব সম্ভব হ'য়েছে। সেই অবস্থার মনোভাব অবস্থার পরিবর্ত্তনেও একবারে নিষ্ক্রিয় হয় না, বিশেষ ক'রে রুচির ভাল-মন্দ লাগার ক্ষেত্রে।

সাবিত্র্যুপাখ্যানে কবি যে রসের সৃষ্টি ক'রেছেন এই প্রাচীন গল্পকে তার মধ্যে সম্পূর্ণ মেশান অসম্ভব। গল্পের মূল কাঠামটা-ও অবশ্য বাদ দেওয়া চলে না। সেই জন্য এই কাব্যে যম-সাবিত্রীর প্রসঙ্গটি খাপছাড়া হ'য়ে আছে, এবং ওর কাব্যত্বের লাঘব ঘটাচ্ছে। সাবিত্রীর বুদ্ধি-কৌশলের অংশটা কবি অতি সন্তর্পণে ও সংক্ষেপে সেরেছেন, যাতে "অহো! সাবিত্র্যা মহীয়সীয়ং চাতুরী কৃতা" ব'লে কেউ উচ্ছ্বসিত আঙ্গুল না তোলে। যম ও সাবিত্রীর কথোপকথনে সাবিত্রীর বর-আদায়ী শ্লোকগুলির মূল মর্ম্ম বোধ হয় পূর্ব্বে থেকেই ধর্ম্মনীতি প্রচারকামী কথক পরম্পরার মুখে মুখে মোটামুটি একটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ব'লে ঐ গতানুগতিক হিতোপদেশের পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়নি।

এ-সব ছেঁটে ফেল্‌লেও যমের সশরীর আবির্ভাব ও বর-দান তার স্থূলত্বে কাব্যের রসকে আবিল না ক'রে পারে না। অথচ ওকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও গল্প আর এ গল্প থাকে না। ভবিষ্যতের কোনও কবি-প্রতিভা মহাভারতের 'সাবিত্র্যুপাখ্যানের' কবির মত 'সাবিত্র্যুপাখ্যানকে' আবার নূতন রূপ দিয়ে হয় ত এ কাব্য-সমস্যার মীমাংসা ক'র্‌বেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

অভিলাষ

জগদীশ ভট্টাচার্য্য

কৃষ্ণপক্ষ নিশি সুমধুর নীলিমার স্বপ্ন,
আমারে ঘিরিয়া থাক্ সিল্কের নীল সাড়ি—রাত্রি,
স্নিগ্ধ সুনীল তার আবরণে রহিব নিমগ্ন
স্বপ্নের সন্ধানী আমি চির-রাত্রির যাত্রী।

আসুক্ আকাশে মোর নীরন্ধ্র মধু অমাবস্যা,
আসুক্ নয়নে মোর অজস্র রজনীর তন্দ্রা,—
তুমি আছ তায় মিশে রূপসী অসূর্য্যম্পশ্যা।
অন্ধের অন্তরে আলোকের মঞ্জীর-মন্দ্রা।

জাগরণ আর নয় দিবসের উজ্জ্বল আলোকে,
তোমার মনের তলে যে নীলিমা মোর মন হরেছে
তাই দিয়ে ঘিরে রাখো মিলনের পুঞ্জিত পুলকে;
রাত্রি কি প্রেমময়ী?—তাই সে কি নীলবাস পরেছে?

ঘন নীল রাত্রিতে হেরি তব নীল সাড়ি চক্ষে,
তুমি আস মিশে তায় তৃষাতুর বিরহীর বক্ষে।

খুনী

শ্রীআশীষ গুপ্ত

আপনি যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংবাদ রাখেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুধাংশু ভাদুড়ীর নাম শুনিয়াছেন, আর যদি এ বিষয়ে আপনার জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয় তবে ত সকল গোলযোগ চুকিয়াই গেল। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনার পক্ষে জানিয়া রাখা ভালো যে সুধাংশু ভাদুড়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন,—সমস্ত পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া অবশেষে এ বছর সে এম-এ পাশের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

কিন্তু প্রথম হইবার আশা এইবার সমাপ্ত হইয়া গেল,—পরীক্ষার আর মাত্র দুইমাস বাকী, অথচ পড়িতে বসিলে সম্মুখের জানালা দিয়া চাহিয়া থাকা ছাড়া সুধাংশু আর কিই-বা করিতে পারে!

রাস্তার ওদিককার বাড়ীটা এতদিন খালি পড়িয়া ছিল, আজ সবেমাত্র তিন দিন হইল নূতন ভাড়াটে আসিয়াছে এবং ইহাদের আবির্ভাবই সুধাংশুর পক্ষে কাল হইয়াছে!

পড়িতে বসিলেই, নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহার দৃষ্টি যে কেমন করিয়া সম্মুখের ছাদে নিবদ্ধ হইয়া যায়, সেকথা সুধাংশু কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। সকাল সাড়ে সাতটার সময় পুস্তকের যে পৃষ্ঠা উন্মুক্ত ছিল চমক ভাঙিয়া সাড়ে ন'টার সময় দেখে যে সেই পৃষ্ঠা ঠিক তেমনিভাবেই খোলা আছে!—অবশেষে বিস্ময় লাগিতে থাকে, এক লাইন পড়া হইল না বলিয়া নয়, এত শীঘ্র, মাত্র দু' ঘণ্টার মধ্যে, সে যে কেমন করিয়া সম্মুখের ছাদের উপর হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া লইল তাহাই মনে করিয়া। বস্তুতঃ এমনতর মুস্কিলে মানুষ সচরাচর পড়ে না।

সুধাংশু রাগ করিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

সকালবেলা টেবিলের সামনে বসিয়া বন্ধ গবাক্ষের দিকে চাহিয়া নিরতিশয় লজ্জা করিতে থাকে। জানালা বন্ধ থাকায় ঘরটা অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে,—সমস্ত রাত্রির রুদ্ধ বাতাসে একটা অস্বচ্ছন্দ গুরুতা, পাখা চালাইয়াও যেন তাহাকে লঘু তরল করিয়া তুলিবার উপায় নাই। সুধাংশু উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিল এবং ছাদের দিকে চাহিয়া প্রাণহীন জড়বস্তুর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল!

পাঁচিলের কোনও বালাই নাই,—রাস্তার ওদিককার বাড়ীর ছাদের কথা বলিতেছি। অথচ নূতন ভাড়াটেরা এমনই কাণ্ডজ্ঞানহীন যে একদল ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে যে দিবারাত্র ছাদের 'পরে খেলা করে সে দিকে হুঁস নাই। তাহারই জন্য যেন সুধাংশু এমনই করিয়া অখণ্ড নিশ্ছিদ্র মনোযোগের সহিত সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে!

ছেলেমেয়েগুলা লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া কপাটি খেলিয়া মারামারি করিয়া স্কিপ্ করিয়া এক সুবিপুল কোলাহলের সৃষ্টি করে প্রভাতে, দ্বিপ্রহরে, অপরাহ্ণে, সন্ধ্যায়,—অথচ কোন সময়েই গৃহের বয়োজ্যেষ্ঠদের কোনও শাসন অথবা সতর্কতা কিছুই নাই! ভাবিতে বসিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না! অতএব সুধাংশু প্রথম দিন হইতেই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল!

—কিন্তু একদিন একটা পড়িবে, এবং সেইদিন কর্তৃপক্ষের চৈতন্য হইবে, এ সংবাদ সে খুব ভালো করিয়াই জানে। তখন যে দুঃখ অনুতাপের সীমা থাকিবে না, নিজেদের ভাগ্য এবং ভাগ্যাধিপ ভগবানের প্রতি দোষারোপের অবধি থাকিবে না, একথাও সুধাংশু ভালো করিয়াই অবগত আছে!—লোকগুলার 'পরে তাহার অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল, তাহারা যেন এই এতগুলি শিশুকে নিশ্চিত মৃত্যু অভিমুখে নিরন্তর ঠেলিয়া দিতেছে! এই শিশুহত্যার কথা মনে করিলে আত্মসংবরণ করা অসম্ভব। সুধাংশু অতিশয়

উত্তেজিত হইয়া উঠিল। দ্রুতগতিতে দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে স্থির করিল থানায় খবর দিয়া আসিবে, কলরব কোলাহল আন্দোলন করিয়া কলিকাতা সহরের লোক জড় করিবে, উচ্চ চীৎকারে তাহাদের সকলের নিকট এই নবাগতদের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ করিয়া দিয়া ইহার একটা প্রতিবিধান করিবেই করিবে!

কিন্তু ছাদের উপর হইতে ডিগ্‌বাজী খাইয়া মরা সুধাংশু কখনও দেখে নাই; ঘটনাটার মধ্যে নূতনত্ব আছে এবং এরূপ মৃত্যুর মধ্যে আছে একটা বিমুগ্ধকর সজীবতা। শিশু হউক, প্রাপ্তবয়স্ক হউক, শূন্য হইতে পড়িবার সময় তাহারা কিরূপভাবে হাত পা ছুড়িয়া জীবন রক্ষার প্রাণান্তকর নিষ্ফল প্রয়াস করে তাহা যে এক দর্শনীয় বস্তু সে বিষয়ে সংশয় নাই। জননী বসুন্ধরার যে দুর্ব্বার আকর্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে তাহার বক্ষের পানে টানিতেছে, তাহার পূর্ণ অমোঘ বিকাশ দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার জন্য সুধাংশুর আর আগ্রহের পরিসীমা রহিল না।—

সহসা তাহার একটি তুচ্ছ অঙ্ক কসিবার লোভ হয়। আচ্ছা ধরিয়া নেওয়া যাক ফুটপাথ হইতে ছাদটা পঁচিশ ফুট উচ্চে অবস্থিত, তাহার বেশী কিছুতেই হইবে না।—এতএব ফুটপাথের উপর পড়িতে এক এবং এক-চতুর্থাংশ কাণ্ডের বেশী কিছুতেই লাগা উচিত নয়। অর্থাৎ চোখের পলকে ব্যাপারটা সংঘটিত হইয়া যাইবে,—নিমেষমাত্র সময়ে একটা টাট্‌কা তাজা প্রাণবান সামগ্রীতে কত বড় বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! সামান্য অঙ্ক, কাগজ পেন্সিলের সাহায্য অবধি আবশ্যক হইল না!

সে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া ওঠে,—কিন্তু তাই বলিয়া তাহার রাগ কমে না,—ছেলের দলের কেহ যদি ছাদ হইতে না-ও পড়ে তাহা হইলেও যে পুলিসে সংবাদ দিতে হইবে ইহা সুনিশ্চিত। এরূপ বিচারবুদ্ধিহীন উন্মাদ অভিভাবকদের আদর্শ শাস্তি হওয়া আবশ্যক। সে বসিয়া বসিয়া পুলিসে খবর দেওয়ার জল্পনা করিতে থাকে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই! থানায় যাওয়া আর কিছুতেই ঘটিয়া ওঠে না,—আজ নয় কাল করিয়া দিন কাটে এবং ছাদের উপরকার নৃত্যরত শিশুগুলির চঞ্চল গতিচ্ছন্দ তাহার চিত্ত হরণ করিয়া লয়।

অথচ এমন করিয়া কোনও ভালো লোকের দিন চলা উচিত নয়!—ওই গৃহের কোন্ শিশু কবে তেতলা হইতে পড়িয়া মরিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে দিবস এবং মুহূর্ত্ত গণনা করা ভদ্রও নয়, সুন্দরও নয়, তবুও ত বেচারা সুধাংশুকে বাধ্য হইয়াই এই মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছে! কিন্তু থানায় যাওয়ার ইচ্ছাটা তাহার পুরামাত্রাতেই আছে, যদিও পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। যে বিস্মৃত উক্তি কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়াও জিহ্বাগ্রে পৌছিতে চায় না, তাহার জন্য যেমন অস্থিরতা এবং অধৈর্য্যের সীমা থাকে না, সুধাংশুর অবস্থাও তেমনই হইয়া ওঠে। ইতিমধ্যে ছেলে-মেয়ের দল যথানিয়মে ছাদের 'পরে নৃত্য করে এবং পরিপূর্ণ অসহায়তায় সুধাংশু সেইদিকে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় চাহিয়া থাকে।

নির্ব্বাণের পূর্ব্বে শুধু যে দীপশিখাই উজ্জ্বল হইয়া ওঠে তা-ই নয়, মানুষের সম্বন্ধেও একথা সমভাবেই প্রযোজ্য। ভাঙ্গিয়া পড়িবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে দেহমনে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়, কোনও অবস্থার সহিতই বোধ করি তাহার তুলনা চলে না। সুধাংশুও ক্রমে ক্রমে সেই অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে,—দেহমনের অস্বাভাবিক পরিণতি এবং তীব্র অস্থিরতা দেখিয়া তাহার আর বুঝিতে বাকী নাই যে অদূরবর্ত্তী সৌভাগ্যের সংবাদ এইবার আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে যেন মরিয়া হইয়াই আপন মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, ইহাদের মধ্যে একজন পড়িবে, নিশ্চয়ই পড়িবে, শীঘ্রই পড়িবে।

অবশেষে এই বিচিত্র ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের ফল ফলিল এবং ওই শিশুসঙ্ঘের একজন বেশ ঘটা করিয়াই একদিন ছাদ হইতে ফুটপাথের পরে অবতরণ করিল!

মাথাটা কাটিয়া গিয়া ভিতরকার খুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত ফুটপাথ রক্তে ভাসিয়া গেছে! চতুর্দ্দিকে জনতা।

সুধাংশুর দেহের চতুষ্পার্শ্বে যেন আগুন ধরিয়া গেছে, ভগবান যেন দাবানলে ওকে পোড়াইয়া মারিবেন, ওর চারিদিকে যেন সহস্র নাগিনী ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া।

এই শিশুহত্যার জন্য সুধাংশুর প্রাপ্য যেটুকু তাহা হইতে ভগবান যেন তাহাকে লেশমাত্র বঞ্চিত করিবেন না,—ইহার জন্য পৃথিবীতে কোথাও যেন করুণা নাই, ক্ষমা নাই।—জামার আস্তীন দিয়া সে কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল! ভয়ে সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বেদনায় বুকের ভিতরটা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে!

উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া সেই রক্তমাংসের পিণ্ডের ন্যায় শিশুকে সে কোলে তুলিয়া লইল এবং সম্মুখের জনতা ভেদ করিয়া নিরুদ্ধশ্বাসে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আত্মীয় স্বজন পিতামাতা ছুটিয়া আসিলেন,—দুইহাত প্রসারিত করিয়া মৃত সন্তানকে বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিয়া জননী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

নিদারুণ দুঃখে সুধাংশু হাত কচলাইতে লাগিল,—অশ্রুঅবরুদ্ধ কণ্ঠে নিজের মনেই বলিতে লাগিল, ভগবান, ভগবান, ফুলের মত কোমল এই নিষ্পাপ শিশু,—কি দরকার ছিল এর, কি দরকার ছিল!

সুধাংশু আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না,—দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিল।

নিজের পড়িবার ঘরে টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে ছাদের দিকে চাহিয়া থাকে। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা সব নামিয়া গেছে, বাড়ীটার মধ্য হইতে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের শব্দ কানে আসিতেছে, ফুটপাথের উপরে জনারণ্য।—সুধাংশুর অন্তঃকরণটা যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে,—সে আর কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারে না, তাহার চোখ দিয়া অশ্রান্তভাবে জল পড়িতে থাকে।

কিন্তু, কিন্তু,—নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে! পরীক্ষার এখনও একমাস বাকী, আজ হইতে মন দিয়া পড়িলে শেষ অবধি ফল সম্ভবত মন্দ হইবে না!

শ্রীআশীষ গুপ্ত

মৌনা

শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ

নবীন বসন্ত দিনে একদিন—আভাসে, ইঙ্গিতে,
নব নব ছন্দে, সুরে, অকস্মাৎ অধীর সঙ্গীতে
অন্তর দুলায়ে দিয়ে নির্জ্জনে ক'য়েছ তুমি কথা,—
এড়ায়ে সবার দিঠি। সেদিন তোমার ব্যাকুলতা,
তোমার চঞ্চল ব্যথা, আড়ালের দুঃসহ বেদন,
ক্ষুব্ধ করি' দিত কভু জ্যোৎস্না-স্নাত মাধবী কানন—
মর্ম্মরে নিঃশ্বাসে। নিত্য বাজিত কী চিত্তহরাবীণ
অঞ্চল-আভাসে তব, সুন্দর সঙ্কোচে সেই দিন!

আজি তুমি পরিচিতা, ঘনিষ্ঠা হয়েছে মোর, তাই
বিনম্র-সংযত সদা, সুখে-দুঃখে সে চাঞ্চল্য নাই;
স্মিতহাস্যখানি তব মুকুলিছে কভু যুঁথিবনে;
তপ্তভালে স্পর্শ কর মধুকরা নিশীথ পবনে।
আজি শুধু বাণী নাহি, বিস্ময়ী র'য়েছ তেমন—
কৈশোর চাপল্যহীন মোর গৃহলক্ষ্মীর মতন।

রাশ্যার সাহিত্য

(প্রতিবাদ)

শ্রীমৃণালকুমার ঘোষ

রাশিয়ান সাহিত্যের আলোচনা আজকাল দুই একটি সাময়িক পত্রিকায় হইতেছে। সম্প্রতি শ্রীসুনীল মজুমদার মহাশয় আপনার সম্পাদিত "বিচিত্রা"র আশ্বিন সংখ্যায় "রাশ্যার সাহিত্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জাগ্রত রাশিয়া আজ সর্ব্ববিষয়ে জগতের বিস্ময় উৎপন্ন করিয়াছে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানবের সুখ-দুঃখ, তা'র আনন্দ-বেদনা, তা'র আশা-আকাঙ্ক্ষা—তা'র সমগ্র কৃষ্টি সাহিত্যের ভিতর মূর্ত্ত হইয়া আছে। রাশিয়াকে বুঝিতে হইলে তা'র সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে সুনীল বাবুর এই যে প্রচেষ্টা—ইহা অতীব সাধু; ইহার জন্য তিনি বাঙালী পাঠকপাঠিকার নিকট বাস্তবিকই ধন্যবাদভাজন। কিন্তু পাছে সত্যের অপলাপ হ'য় তাই বলিতে বাধ্য হইলাম যে সুনীল বাবুর ঐ প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ অসঙ্গত উক্তি আছে।

'গোগল' (Gogol) আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন "মৃত আত্মা" বইখানা তিনি লিখেছিলেন রোমে। তাঁর মতলব ছিল বইখানাকে তিনখণ্ডে লেখার। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম খণ্ড লিখে দ্বিতীয় খণ্ড খানিকটা লেখার পরই তাঁর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়, বইখানা তাই শেষ হয়নি।"

সুনীল বাবুর এই "মৃত আত্মা" যদি গোগলের "Dead Souls" হয়, তাহা হইলে রাশিয়ান সাহিত্যের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সমালোচকেরা গোগল সম্পর্কীয় উপরের মতের সমর্থন করেন না। রাশিয়ান সাহিত্যের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন, গোগল শেষ জীবনে নীতিরোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া নিজের লেখাকে জীবনের পাপ বলিয়া ঘৃণার চোখে দেখিতে থাকেন। এই নীতিরোগের প্রাবল্যকালে Dead Souls এর দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি দুইবার করিয়া পুড়াইয়া ফেলেন। এ বিষয়ে Kropotkin তাঁহার Russian Literature, Ideals and Realities গ্রন্থে কি লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিলাম :—

"Towards the end of his life Gogol·········· began to consider all his writings as a sin of his life. Twice, in a paroxysm of religious self-accusation, he burned the manuscript of the second volume of "Dead Souls'"

প্রসিদ্ধ সমালোচক Lavrin গোগলের Dead Souls এর দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে এই কথাই বলিতেছেন—"The final draft of thls volume was burnt by him in a fit of semi-madness."

তাহা হইলে এখানে কাহার কথা সত্য, Kropotkin না মজুমদার মহাশয়ের? সুনীল বাবুর লেখায় বেশ ভাল বুঝা যায় যে গোগলের ইচ্ছা থাকিলেও মরণের ডাক আসিয়া যাওয়ায় Dead Souls এর দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু Kropotkin বলিতেছেন তিনি লিখিয়া তাঁহার Dead Souls এর দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পুড়াইয়া ফেলেন।

প্রবন্ধের প্রথম দিকে সুনীল বাবু লিখিয়াছেন—"পোলোটোস্কীই প্রথম রুশ ভাষায় পদ্য লেখবার পথ দেখান।" ইহার অর্থ মনে হইতেছে পোলোটোস্কীর আগে রাশিয়ান সাহিত্যে কবিতার বালাই ছিল না। কিন্তু আমরা অধ্যাপক Wiener-এর "Anthology of Russian Literature from the earliest period to the present time" নামধেয় গ্রন্থে রাশিয়ান সাহিত্যের এক আদিম কবিতার অনুবাদ Lay of Igor's Raid পড়িয়াছি যাহা পোলোটোস্কীর অভ্যুদয়ের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

Lermontov সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সুনীলবাবু বলিতেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে লারমনটোভ্ প্রবেশ করলেন সৈন্য বিভাগে, এ সময়েই তাঁর কাব্য The Demon প্রকাশিত হয়, তখন সমগ্র রাশ্যা যুগপৎ বিস্মিত নেত্রে এই কাব্যের কবির দিকে চেয়ে রইলো।"

কিন্তু রাশিয়ান সাহিত্যের সমালোচক ধুরন্ধরেরা বলেন যে লারমনটোভ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পর বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে জনৈক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিয়া তিনি পাততাড়ি গুটাইয়া সরাসরি ঘরমুখো হন। তাহার পর বিদ্যামন্দিরের পথে আর পা দেন নাই। কবি লারমনটোভের Demon কাব্য তিনি যখন সৈন্যবিভাগে চাকুরী লইলেন তখন প্রকাশিত হইয়াছে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। মনস্বী Lavrin তাঁহার Russian Literature পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "The posthumous Demon is regarded as Lermontov's best work."

ইহার পর লারমোনটোভ সংক্রান্ত আরও একটি ভ্রান্তিপূর্ণ উক্তি আছে। সুনীল বাবু লিখিতেছেন, "যখন লারমনটোভের বয়স বছর পনেরো তখন তিনি তাঁর ঠাকুরমার সাথে…ককেশাস পাহাড়ে বেড়াতে যান। সেখানে নিবিড় সৌন্দর্য্যের ভেতর বালকের কবি প্রতিভা বেড়ে উঠতে লাগলো।" এই প্রসঙ্গে Kropotkin বলিতেছেন :—"Lermontoff was already acquainted with the Caucasus, he had been taken as a child of ten, and had brought back from this sojourn an ineffaceable impressoin." এখানে পাঁচ বৎসরের কিছু অমিল দেখিতেছি।

পুস্কিন আলোচনা প্রসঙ্গে সুনীল বাবু বলিতেছেন, "পুস্কিনও বার বৎসর বয়সে রুশো, ভলটেয়ার, মেলোয়ারের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এবং সেই সময় বালক পুস্কিন মেলোয়ারের অনুকরণ করে ফরাসী-ভাষায় এক নাটক লিখে ভাইবোন পাড়াপড়শীদের নিয়ে তার অভিনয় করেন।" আমরা Rousseau (রুশো), Voltaire (ভলত্যার)এর সহিত পরিচিত, কিন্তু মজুমদার মহাশয়ের মেলোয়ারটিকে লইয়া ধাঁধাঁয় পড়িয়াছি। মেলোয়ার যদি Moliére (মলিএ্যার) হয় তবে চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হইতেছে মেলোয়ার Moliére, না আর কেহ?

আর একটি কথা, মজুমদার মহাশয় Ivan Turgénev (ইভান তুর্গেনেভের) আলোচনায় বলিতেছেন, "টুর্গেনিভের প্রথম লেখা "খেলোয়াড়ের নক্সা"। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা "পূর্ব্ব ও উত্তর পুরুষ" হলেও তিনি বিদেশে নাম কোরেছেন "ভদ্র ঘরণা" লিখে। তাঁর বুড়ো বয়সের "অক্ষত ক্ষেত্র" অন্যগুলোর তুলনায় তেমন ভাল হয় নি।"

সুনীলবাবুর এইখানকার পাণ্ডিত্যে আমরা সত্যসত্যই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। Sportsman's Sketches-এর বাঙ্গালা "খেলোয়াড়ের নক্সা" বলিয়া লিখিলেই চলিবে না। বইখানার মূল রাশিয়ান নাম অথবা ইহার ইংরাজী অনুবাদের নাম পাঠকদের সুবিধার জন্য ব্রাকেটের মধ্যে রাখা আবশ্যক। Tolstoy (টলষ্টয়)-এর বিশ্ববিখ্যাত "War and peace" এই ইংরেজী নামটি না লিখিয়া "সমর ও শান্তি" বা "বিগ্রহ ও শান্তি" বলা যাইতে পারে, কেন না সাময়িক পত্রে Tolstoy-এর এই War and Peace-এর উপরোক্ত দুই নামে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। "পূর্ব্ব ও উত্তর পুরুষ," "ভদ্র ঘরণা" ও "অক্ষত ক্ষেত্র" প্রভৃতি হাস্যোদ্দীপক বাঙ্গালা অনুবাদের পাশে ইংরেজী নাম বসাইয়া না দিলে আমরা কি করিয়া বুঝিব যে সুনীলবাবু "Fathers and Children"কে "পূর্ব্ব ও উত্তর পুরুষ" বলিতেছেন, "House of Gentle Folk"কে বুঝাইতেছেন "ভদ্র ঘরণা" বলিয়া আর "Virgin Soil"কে বলিতেছেন "অক্ষত ক্ষেত্র"। ইহার পরে যদি কোন পরিশীলনকামী "Fathers and Children" না লিখিয়া কেবল মাত্র লেখেন "বাবার দল আর ছেলেমেয়ের দল" "House of gentle Foik" না বলিয়া "ভদ্র পরিবারের ঘর" বলেন এবং Virgin Soilকে অনুবাদ করেন "অনূঢ়া মাটি" অথবা "কুমারী ক্ষেত্র," তাহা হইলেই বা সেই বিদ্যারথীর বিরুদ্ধে বেচারী পাঠককুল কি করিয়া পার পাইবে?

শ্রীমৃণালকুমার ঘোষ

মধুরেণ

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য এম্ এ

১

সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। গোলদীঘির স্থির জল প্রচণ্ড বৃষ্টির ঝাপটায় যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। পীচঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে একটানা জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

বাদলা হাওয়া বুঝি ক্লাসের মধ্যে ছেলেদের মনেও কী কান-ভাঙানি গান গেয়ে গেল। ক্লাসে প্রফেসর থাকা সত্ত্বেও একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

খোলা জানালা দিয়ে অরুণ তার উদাস দৃষ্টি মেঘে-ঢাকা ধূসর আকাশের দিকে মেলে দিয়েছিল। হঠাৎ প্রফেসরের মুখে নিজের নাম শুনে সে চমকে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। প্রফেসর রায় বল্লেন, "তুমিই অরুণ মিত্র? তোমার খাতাখানা ক্লাসের মধ্যে by far the best; এমন intelligent understanding আর original thinking আমি খুব কম দেখেছি। Keynes' এর theory যে তুমি বিনা তর্কে মেনে নাওনি, এতে আমি খুব খুসী হয়েছি।"

অরুণ ততক্ষণ রীতিমত ঘেমে উঠেছে। বেচারা অত্যন্ত বিব্রতভাবে এধার ওধার চাইতেই হঠাৎ—কী সর্ব্বনাশ! মিস্ আরতি রায়ের বড়ো বড়ো চোখদুটি যে তারই মুখের ওপর···! অরুণের পা আর তার শরীরের ভার বইতে পারলে না। সে ধপ্‌ করে বসে পড়ে রুমাল বার করে মুখ মুছতে সুরু করলে। কিন্তু তবু নিস্তার নেই, খাতাখানা প্রফেসরের কাছ থেকে আনবার জন্যে আরতি রায়ের সামনে দিয়েই তাকে যেতে হোলো, আর অকারণেই তার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে উঠ্‌লো। বেচারা নিজের সীটে ফিরে এসে আর মুখ তুলতে পারলে না, তার কেবলি মনে হতে লাগলো ক্লাস শুদ্ধ ছেলে তার nervousness দেখে হাসছে, যায় আরতি রায় পর্য্যন্ত। আর যতোই একথা মনে হোলো, ততোই তার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো আর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সে মাথা নীচু করে একটা পেন্সিল দিয়ে খাতায় আঁক কাটতে লাগলো। তার সমস্ত শরীর তখন যাকে বলে "বেতসপত্রের মতো" কাঁপছে।

কিন্তু তার দুর্ভোগের শেষ তখনো হয়নি। Seminar শেষ হতে সে ক্লাস থেকে বেরুচ্ছে হঠাৎ শুনলে, "শুনছেন!" কণ্ঠস্বর বেশ মিষ্টি, আর স্ত্রীসুলভ। চমকে ফিরে চেয়ে দেখে আরতি রায়! হতভম্বের মতো তার মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে গেল, "আমায় বলছেন?"

"হ্যাঁ। আপনার খাতাখানা একবার kindly দেবেন, পড়ে দেখবো?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বিনা বাক্যব্যয়ে অরুণ খাতাখানা বাড়িয়ে দিলে।

"ধন্যবাদ। কাল পড়ে ফিরিয়ে দেবো।" বড়ো বড়ো চোখদুটোয় হাসিভরা কোমল দৃষ্টি! অরুণ কখন যে আশুতোষ বিল্ডিং-এর তেতলা থেকে গোলদীঘির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সে নিজেই জানে না। বৃষ্টির জল তার জামা ভিজিয়ে গায়ের ভিতর দিয়ে নেমে আসতে তার সম্বিৎ ফিরে এলো, সে লাফিয়ে একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়লো। কী মিষ্টি করেই "ধন্যবাদ" কথাটা বল্লেন আরতি রায়! আর ছেলেগুলো কী অভদ্র, বলে উঠ্‌লো কি-না "Lucky dog!" একটু পরে বল্লে কি চল্‌তো না? উনি যদি শুনে ফেলে থাকেন? আরতি রায়ের চোখের তারা দুটো কালো নয়—বাদামি। কী সুন্দর! লোকে বলে কালো চোখ। হুঁ, বাদামি চোখের নাকি তুলনা আছে? আর ঠোঁটের পাশের ছোট্ট

তিলটা? Exquisite! হাস্‌লে ওঁকে কী চমৎকারই মানায়!

এ কি! সে যে হাজ্‌রা রোডের মোড়ে এসে পড়েছে! এই বৃষ্টিতে আবার রমেশ মিত্তির রোড অবধি ফিরে যেতে হবে। তা হোক্‌। আরতি রায়ের ফরসা মুখে সামান্য রুক্ষ চুলের রাশি কিন্তু চমৎকার......

২

পরদিন একটা মধুর অনুভূতি নিয়ে অরুণ ঘুম থেকে উঠ্‌লো। আজ আরতি রায় তার খাতা ফিরিয়ে দেবেন। আচ্ছা, কাল তার দু'একটা কথা বলা উচিত ছিল, না? কিন্তু কী কথাই বা বলা যেতো? "বিলক্ষণ! আপনি নেবেন, এতো সৌভাগ্যের কথা।" না, কেমন যেন নভেলি। যাক্‌গে। আচ্ছা, আজ কী বলা যায়? "কেমন পড়লেন বলুন তো? একদম বাজে, না?" হ্যাঁ, সেই বেশ হবে। বেশ সপ্রতিভ, অথচ বিনয় প্রকাশক।

কিন্তু কলেজ যাবার সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগলো অরুণের উৎসাহও ততই নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলো। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়ছে, কানে ডাকছে ঝিঁঝি পোকা, মুখের ভিতরটাও কেমন যেন শুকিয়ে উঠছে।......

ক্লাসে প্রফেসর এলেন। রোলকল্‌ও হয়ে গেল। কৈ আরতি রায়? না, তিনি আজ আসেন নি। আচ্ছা, নিরাশা আর আরাম দু'টো কি একসঙ্গে মানুষের মনে হওয়া সম্ভব? অরুণের মনের ভাব কিন্তু ঠিক তাই। আশা ভঙ্গের ব্যথার সঙ্গে একটু যেন গোপন স্বস্তির আভাস।

আচ্ছা, আরতি রায় কেমন নিঃসঙ্কোচে তার মুখের দিকে তাকায়, অরুণ তা পারে না কেন? চোখে চোখ ঠেকলেই তার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে যায়। ঐ উজ্জ্বল চোখ দু'টির বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি যেন বিদ্যুতের শিখা—অরুণের চোখ ঝলসে যায়, দৃষ্টি আপনি নত হয়ে আসে।

প্রফেসর নিত্যকার মতোই বক্তৃতা দিয়েই যাচ্ছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর মৌমাছির অর্থহীন গুঞ্জনের মতো অরুণের কানে এসে লাগছে—অর্থবোধ হচ্ছে না কিছু। অরুণ স্বপ্ন দেখছে,—জেগে জেগে—দিবাস্বপ্ন।

ঢং করে ঘণ্টা পড়লো। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই—"এই নিন্‌ আপনার খাতা। আসতে দেরী হয়ে গেল—প্রথম ক্লাস্‌টা মিস্‌ করলাম। দেখুন, আপনার লেখা কিন্তু একবর্ণও আমার মাথায় ঢুকলো না। একটা কথা বলছিলাম—আপনার যদি খুব বেশী অসুবিধা না হয়, একদিন যাবেন আমাদের বাড়ী? একটু বুঝে নিতাম তাহলে আপনার কাছ থেকে।"

"তা, তা, বে-বেশ তো! একদিন গেলেই হোলো।"

"একদিন কেন, আজই আসুন না? অবশ্য আপনার যদি বিশেষ কোন কাজ না থাকে।"

"না, কাজ আর কি, তা—"

"তবে আজ সাড়ে ছ'টা, সাতটার সময় কেমন? আমার ঠিকানা—নং গ্রোভ লেন। চেনেন তো?"

না চিনলেও অরুণ সবেগে মাথা হেলালে। ছোটো একটি নমস্কার করে আরতি মেয়েদের ঘরের দিকে চলে গেল।

তাইতো! গ্রোভ লেন—নামটিতো জবর। বালিগঞ্জের দিকেই হবে নিশ্চয়। আচ্ছা, বাড়ীটা কেমন? প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ী, সামে কেয়ারী-করা মর্শুমী ফুলের বাগান, জানালায় সুদৃশ্য পর্দ্দা, ভিতর থেকে পিয়ানোর মিষ্টি আওয়াজ আসছে। অরুণ প্রথমে যাবে ড্রইং রুমে মেঝেয় পুরু কার্পেট পাতা, চারিদিকে সোফা কৌচ, ছোটো ছোটো টিপয়ের উপর ফুলদানী, নানারকম পিতল আর চন্দনকাঠের কারুকার্য্যখচিত কিউরিও, মাথার ওপর ইলেক্‌ট্রিকের ঝাড়। ভাবতেও অরুণ আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল; তাই তো! সেখানে কি-রকম ভাবে বসতে হয়, হাসতে হয়, কাশতে হয়—সে তো কিছুই জানে না? আর এই আরতিজাতীয়া মেয়েদের সঙ্গে সে পড়ছে বটে, তবু এদের গার্হস্থ্য-জীবন সম্বন্ধে তার কোনোই সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এরা পার্টিতে যায়, পিয়ানো বাজায়, মার্কেটে ঘোরে, খিলখিল্‌ করে হেসে দিশেহারা করে দেয়—আরো কত কী-যে করে এবং না করে—তা

অরুণ কল্পনাও করতে পারে না।···ঘণ্টা পড়লো।···অরুণ আজ কলেজে না এলেও পারতো। আমি বাজী রেখে বলতে পারি আজ ক্লাসে কী পড়ানো হয়েছে back bencherদের সর্দ্দার বিমল যেটুকু বলতে পারে, প্রফেসর রায়ের প্রিয়পাত্র অরুণ সেটুকুও বলতে পারবে না। ভাগ্যিস্ আগে আরতি রায়ের সঙ্গে অরুণের পরিচয় হয়নি, হলে first class first হওয়া তো দূরের কথা অরুণ pass-course-এও পাশ করতে পারতো না, এটা ঠিক।

৩

বাড়ী ফিরে অরুণ পঞ্জিকা খুলে বসেছে। গ্রোভ লেন এই যে, হাজরা রোড থেকে বেরিয়েছে। তাহলে তো কাছেই! এখন না, মোটে পাঁচটা। আরো অন্ততঃ পাঁচ কোয়ার্টার বাদে বেরুতে হবে। সে একটা বাংলা মাসিকের পাতা ওল্টাতে লাগলো। দেহে মনে কী দুর্নিবার অস্থিরতা! সে বসে থাকতে পারলে না, মাসিকপত্রখানা ছুঁড়ে ফেলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো—হাজরা পার্কে গিয়ে বসে থাকা এর চেয়ে ঢের সহজ।

সূর্য্য ডুবে গেছে। গোলাপী আকাশের গায়ে নারকেল গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো যেন পটে-আঁকা ছবি, সাদা মেঘের গায়ে রং লেগেছে, ঐ যে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েগুলো ছুটোছুটি করে খেলা করছে ওদের মুখেও। আর অরুণের মনে? স্বপ্নজড়িত চোখ দুটিতে?

সময় হয়ে এলো। অরুণ উঠ্‌লো। পা কাঁপছে, বুকের ভেতরও। আচ্ছা, যদি সে না যায়? নাই বা গেল, এমন তো কিছু বাধ্যবাধকতা নেই? ভাবতে ভাবতে হাজরা রোড দিয়ে অরুণ গ্রোভ লেনের কাছে এসে পড়লো। এই তো—নং বাড়ী। কৈ, তার কল্পনার সঙ্গে তো কোনোখানে এতোটুকু মেলে না? ছোটো একতলা বাড়ী, রাস্তার দিকের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কড়ায় হাত দিয়ে অরুণ ভাবলে, এখনো সময় আছে ফিরে যাবার। এসে সে ভালো করেনি, যদি কোনো ঝাঁটার মতো গোঁফ-অলা, অপ্রিয়-দর্শন ভদ্রলোক দরজা খুলে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন, "কাকে চান?" কী উত্তর দেবে সে? "আজ্ঞে —শ্রীমতী আরতিদেবীকে" না, "মিস্ আরতি রায়কে"? ভদ্রলোকের স্থায়সঙ্গত অধিকার আছে, অন্ততঃ এই হতভাগ্য বাংলাদেশে—হুঙ্কার দিয়ে বলবার, "কে হে তুমি বেল্লিক ছোক্‌রা? অচেনা ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছো? কৈ—কখনো তো তোমায় দেখছি বলে মনে পড়ে না!"···কিন্তু সেরকম অঘটন না-ও ঘট্‌তে পারে, বিশেষ আরতি রায় যখন নিজেই অনুরোধ করেছেন আসতে। অতএব—খট্‌খট্ করে কড়া নাড়লে—যা-থাকে-বরাতে গোছের মরীয়া হয়ে।

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হোলো, "কে?"

"আমি, এই—অরুণ। শ্রীঅরুণকুমার মিত্র। আরতি দেবী আছেন?" এক নিঃশ্বাসে অরুণ বলে ফেল্‌লে।

হড়াৎ করে দরজা খুলে গেল। সামে দাঁড়িয়ে আরতি দেবী স্বয়ং। সাদাসিদে মিলের শাড়ী পরা, অরুণের নিজের বোন থাকলে এই রকমটিই হতে পারতো। অরুণের ভয়, মানে নার্ভাসনেস্, একটু কম্‌লো। অভ্যর্থনার মৃদুহাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে আরতি বল্লে, "আসুন, ভেতরে আসুন। বাবা এইমাত্র বেরুলেন, শীগ্‌গিরই ফিরবেন। আপনার সঙ্গে মিল্‌বে ভালো, বাবা যেমন বই-পাগল, আপনিও নিশ্চয় তাই।" বলতে বলতে তারা ঘরে এসে ঢুকলো। সবই সাদাসিদে—আড়ম্বর কোথাও নেই। তবু চারিদিকে একটা পরিচ্ছন্নতা, স্নিগ্ধ তৃপ্তির ভাব মনে জড়িয়ে আছে। বেশ বোঝা যায়, এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই এই তুচ্ছ জিনিষগুলো এমন নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে।

এগুলো অরুণ লক্ষ্য করছিল বল্লে ঠিক বলা হবে না; সে অনুভব করছিল। কারণ, লক্ষ্য করবার ক্ষমতা তার তখন ছিল না। আরতির এত কাছাকাছি, নির্জ্জন ঘর! সে তখন রীতিমত ঘেমে উঠেছে। আরতি লক্ষ্য করলে; দেয়াল থেকে হাতপাখাখানা পেড়ে অরুণের হাতে দিয়ে বল্লে, "এই নিন্, গরম হচ্ছে নিশ্চয়? চা খাবেন?" অরুণ লজ্জা পাবে বলে সে নিজে বাতাস করলে না।

"না, না, চা আমি খেয়ে বেরিয়েছি।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আরতিই আবার নিস্তব্ধতা ভাঙ্‌লে। বল্লে, "তবে পড়া আরম্ভ করা যাক্, কি বলেন?"

বলবার অপেক্ষা না রেখে সে অরুণের খাতাখানা নিয়ে এলো। অরুণ আসতে রাজী হওয়াতে সে আর খাতাখানা ফিরিয়ে দেয়নি।

এতক্ষণে অরুণ ধাতস্থ হোলো। খাতাটার খানিকটা চোখ বুলিয়ে সে বল্লে, "প্রথমদিকটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। ও তো শুধু Keynes-এর Theory summarise করে গেছি। ওঁর fundamental equationটা কিন্তু আমি মেনে নিতে রাজী নই, কারণ......" কতকগুলো দুর্ব্বোধ্য শব্দ সহযোগে অরুণ এক বিরাট বক্তৃতা ফেঁদে বসলো।

আরতি প্রথমটা সত্যিই বুঝতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই শুধু এইটুকু বুঝলে যে অরুণের argument-এর মর্ম্ম গ্রহণ করতে হলে যে পরিমাণ বিদ্যা দরকার তার শতাংশের একাংশও তার নেই। কাজেই সে হাল ছেড়ে দিয়ে টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে, আর হাতের ওপর মাথা রেখে হেলে বসে অরুণের উৎসাহ-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল। আরতির সঙ্গে অতি-সাধারণ কথাবার্ত্তা কইতে যে অরুণের কথা বেধে যায়, এ সে অরুণ নয়। এর চোখ বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, জ্ঞানে দীপ্ত এর ললাট। যে অনেক জানে, অনেক পড়েছে, কিন্তু নিজের বুদ্ধির কষ্টিপাথরে কষে না নিয়ে যে কোনো-কিছু মেনে নেয় না—এ সেই অরুণ। অরুণের ঘর্ম্মসিক্ত মুখখানার দিকে চেয়ে আরতির মুখে একটা দুর্ব্বোধ্য হাসি ফুটে উঠলো। পাখাখানা তুলে নিয়ে সে নিজে হাওয়া খাবার ছলে অরুণকে বাতাস করতে লাগলো।

উপসংহারে অরুণ বল্লে, "বুঝতে পারলেন কেন আমি Keynes-এর theory-কে without qualification মেনে নিতে চাই না?"

"হুঁ। আচ্ছা, অরুণ বাবু, আপনি বাড়ীতে থাকেন, না হস্টেলে?"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অরুণ গম্ভীর গলায় বল্লে, "তার মানে আপনি আমার argument গুলো মোটেই শুনছিলেন না?"

হেসে ফেলে আরতি বল্লে, "সত্যি কথা বলতে কি, অরুণবাবু, আপনার খাতা পড়ে যা বুঝেছিলাম তার চেয়ে আর এক ইঞ্চিও এগুইনি আপনার lecture শুনে।"

হতাশ হয়ে অরুণ বল্লে, "কী আশ্চর্য্য। আচ্ছা, আপনি Keynes-এর বইটা পড়েছেন তো?"

"হ্যাঁ। ঐ Tracts on Monetary Reform তো?"

অধিকতর হতাশ হয়ে অরুণ বল্লে, "ওটা তো B. A. pass course-এর বই। আমি বলছি Treatise on Money' খানার কথা।"

অম্লানবদনে আরতি বল্লে, "না, ওটা পড়িনি।"

"আচ্ছা, অন্ততঃ Hawtrey-র "Currency and Credit" থেকে "theory of unspent margin"টা পড়েছেন তো?"

"উঁহুঃ।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অরুণ বল্লে, "আপনার বি-এ, পাশ করা উচিত হয়নি। অন্ততঃ এম্-এ, পড়া তো নয়ই।"

"মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আপনি আমার ওপর রাগ করে চল্লেন কোথায়? বাবার সঙ্গে আলাপ করবেন না?"

লজ্জিত হয়ে অরুণ আবার বসে পড়লো। আরতি বল্লে, "দেখছেন তো আমি কি-রকম hopeless; আপনাকে কিন্তু ভার নিতে হবে আমায় তৈরী করে দেবার। কেমন, রাজী তো?"

হাসিমুখে অরুণ মুখ তুলে কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আরতির সহাস চোখদুটির দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে বলবার কথাটা ভুলে গেল। আরতি, মিস্ আরতি রায়, যার বাদামি চোখ দুটির তুলনা নেই, যার ঠোঁটের পাশের ছোট্ট তিলটি অপূর্ব্ব, হাসলে যাকে চমৎকার মানায়, সেই অতুলনীয়া আরতি রায় কি-না তাকে অনুরোধ করছে পড়াবার ভার নিতে! একি সত্যি, না স্বপ্ন?

ভাগ্যিস্ এই সময় আরতির বাবা কড়া নাড়লেন আর আরতি দরজা খুলে দিতে গেল, নৈলে College Queen আরতি রায় তারি সঙ্গে কথা বলছে এই নির্জ্জন ঘরে বসে এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে, অরুণের পক্ষে অচেতন হয়ে পড়াটা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য ছিল না।

সেদিন বাড়ী ফিরতে অরুণের বেশ একটু রাত হয়ে

গেল। আরতির বাবার কথা যতোই সে ভাবছিল (আরতির চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে) শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ততোই তার মন ভরে যাচ্ছিল। কী অগাধ পাণ্ডিত্য! সংস্কৃত, ইংরিজী আর বাংলা, তিনটে সাহিত্যে ভদ্রলোকের কী গভীর জ্ঞান!

আর আরতির বাবা অমর বাবু—তখন আরতিকে বলছিলেন, "বুঝলি, আরু, চমৎকার ছেলেটি! যেমন পড়াশুনো তেম্‌নি চিন্তা করবার ক্ষমতা। ও জীবনে উন্নতি করবেই, তুই দেখে নিস্।"

বাবাকে খাবার পরিবেশন করতে করতে আরতি মুখ টিপে হাসছিল। কেন, কে জানে।

৪

দু'টি মাস কেটে গেছে। আরতির বাড়ীর সামে গিয়ে অরুণের আজকাল আর পালিয়ে আসবার আকাঙ্ক্ষা জাগে না, সে নিঃসঙ্কোচে কড়া নাড়ে। আরতিরও পড়াশুনোর বেশ উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

কলেজে তারা আর কথাবার্ত্তা কয় না, এমন কি তারা যে পরস্পরকে চেনে এমন ভাবও কখনো দেখায় না। হঠাৎ চোখোচোখি হয়ে গেলে নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যারা অরুণকে 'লাকি ডগ্' বলে সম্ভাষিত করেছিল, তারা বেশ একটু আশ্চর্য্য আর নিরাশ হয়ে পড়েছে। অরুণের সারামন কিন্তু সমস্ত ক্ষণ ভরে থাকে আরতিরই চিন্তায়। তার হাসির ধ্বনি, চাউনির ভঙ্গী, কথার টুকরো আধভোলা গানের সুরের-মতো অরুণকে উন্মনা করে সারাক্ষণ।

সেদিন হঠাৎ একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। অরুণ খেতে বসেছে, মা আহার্য্য পরিবেশন সমাপ্ত করে সামে এসে বসেছেন। এ কথা সে কথার পর মা বল্লেন, "ভাখ্ রণু, ঘটক কাল তোর একটা খুব ভালো সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে। হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট বীরেশ্বর বসুর মেয়ে, দেখতে শুনতে মন্দ নয়। তাছাড়া বীরেশ্বরবাবুর অগাধ টাকা। তোকে বিলেত পাঠাতেও রাজী, যদি আই, সি, এস্ দিতে কিম্বা ব্যারিষ্টার হতে চাস্। কী বলিস্?"

এখানে বলে রাখা ভালো অরুণের সংসারে শুধু সে আর তার মা। একটি বোন ছিল, বিয়ের পর মারা গেছে; ভগ্নীপতি পুনর্ব্বার সংসার করে সুখেই আছেন। বাবা ছিলেন উকীল, কলিকাতায় একখানা বাড়ী আর নগদ সামান্য কিছু রেখে মারা যান। কাকারা কোনদিনই খোঁজ উদ্দেশ নেন্ না। কাজেই ছেলের বিয়ের সম্বন্ধে ছেলেরই সঙ্গে কথা বলা ছাড়া অরুণের মায়ের গত্যন্তর ছিল না।

অরুণ খাওয়া বন্ধ করে বল্লে, "নিজের ভবিষ্যৎ আমি নিজেই করে নিতে পারবো, মা, তার জন্যে শ্বশুরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবার দরকার নেই।"

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে মা বল্লেন, "তা-হোক, তবু এবার তুই বিয়ে না করলে চলে কি করে বল্ দেখি? চিরদিনই কি আমি একা একা খেটে মরবো?"

"তা তো বলিনি, মা। তবে ও বড়লোকের ঘরের মেয়ে এসে কি তোমায় সাহায্য করবে ভেবেছো? রামোঃ! তার চেয়ে আশীর্ব্বাদ করো যেন তোমার মনের মতো বউ এনে দিতে পারি।"

"তবে অন্য মেয়ে দেখতে বলি?"

"না, না। সে সব ঠিক হয়ে যাবে অখন। তুমি চুপটি করে বসে থাকো না।"

মা কিছু না বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাইলেন। অরুণ ততক্ষণ গভীর মনযোগে থালার ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আরতিদের বাড়ী গিয়ে অরুণ বাইরে থেকেই শুনতে পেলে আরতি রবীন্দ্রনাথের এক বহু পুরাতন গান গাইছে,—

"জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।"

অরুণ ঘরে ঢুকে দেখে অমরবাবু ইজি চেয়ারে লম্বমান হয়ে' নিমীলিত নেত্রে গান শুনছেন। আরতি আগে কখনো অরুণের সামনে গান গায় নি। অরুণকে দেখে সে গান বন্ধ করলে। অর্দ্ধ পথে গান থেমে যাওয়ায় অমরবাবু চোখ চাইলেন, এবং অরুণকে দেখতে পেয়ে বল্লেন, "এসো অরুণ, দু'দিন আসো নি যে?"

"একটু কাজ ছিল। কিন্তু আরতি দেবীর গান থেমে গেল কেন?"

আরতি বিনয় করে বল্লে, "আমাদের আবার গান! মনের আনন্দে গান গাই।"

"সে আনন্দের অন্তরায় হলাম আমি কী অপরাধে?"

অমরবাবু হেসে উঠলেন। আরতি আবার গান শুরু করলে।

গান শেষ হতে অরুণ বল্লে, "চমৎকার!" ছোট্ট কথাটি, কিন্তু হৃদয়ের উত্তাপে জীবন্ত অনাবিল আনন্দরসে আরতির সারামন অভিষিক্ত হয়ে গেল।

অরুণ হঠাৎ বলে উঠ্‌লো "এক পেয়েলা চা খাওয়াতে পারেন, আরতি দেবী। আজ বিকালে চা খেয়ে বেরুই নি।"

মৃদুহেসে আরতি বল্লে, "দেখি চেষ্টা করে।" তারপর অমরবাবুর দিকে ফিরে বল্লে, "তুমি খাবে, বাবা?"

"দিস্ এক পেয়ালা।"

আরতি চলে যেতে অরুণ একটু চুপ করে থেকে বল্লে, "আচ্ছা, আরতির বিবাহ দেবেন না?"

আর কোন ভদ্রলোকের সাথে অরুণ কখনোই এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করতে পারতো না। কিন্তু এই অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপকটির মন যে কি সরল, নির্ম্মল তা অরুণের অবিদিত ছিলনা; তাই সে নিঃসঙ্কোচে প্রশ্নটি উত্থাপন করলে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অমরবাবু বল্লেন, "দিতে তো হবেই, অরুণ। কিন্তু ও যে আমার কতোখানি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আটবছর বয়সে ওর মা মারা যায়, তারপর থেকে আমিই ওর বাবা, আমিই ওর মা। অন্ততঃ এই গর্ব্বই বহুদিন ছিল। কিন্তু এখন দেখছি ওই আমার মা হয়ে উঠেছে, আর আমাকে এমন অসহায় শিশু করে ফেলেছে যে ও ছাড়া আমার একদণ্ড চলে না। যাই হোক স্বার্থপরতারও তো একটা সীমা আছে; আর দেরী করা চলে না, এইবার ওর বিয়ের উদ্যোগ করতেই হবে।"

জমি প্রস্তুত। এইবার কথা পাড়তে হবে। অরুণের বুকের ভিতর ঢেঁকির পাড় পড়ছে। সে হাতের নখগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে মরীয়া হয়ে বলে উঠ্‌লো, "দেখুন, যোগ্যতা আমার কিছুই নেই, জানি। তবু বল্‌ছি, কারণ আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না এ বিশ্বাস আমার আছে। যদি, যদি আমাকে নিতান্ত অযোগ্য বলে মনে না করেন…"

"তুমি, তুমি অযোগ্য! অরুণ!" একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অমরবাবু বল্লেন, "কিন্তু তোমার বাবা মা'র মতামত…"

বিনীতস্বরে অরুণ বল্লে, "বাবা অনেকদিন গত হয়েছেন। আর মার'…যতদূর জানি তাঁর অমত হবে না।"

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি অরুণ। তোমার যে পরিচয় এক'দিনে পেয়েছি, তার চেয়ে বেশী পরিচয় দরকার মনে করিনে।"

অরুণ উঠে অমরবাবুকে প্রণাম করলে। অমরবাবু একটু চিন্তিতস্বরে বল্লেন, "কিন্তু আরুর মতটাও তো নেওয়া দরকার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ভার আপনার। আমি…আমি… আমি কাল এসে খবর নিয়ে যাবো। চল্লাম।"

"সে কি! চা খেয়ে যাবে না?"

"না, আজ আর" ইত্যাদি কী সব বলতে বলতে অরুণ দ্রুতপদে রাস্তায় এসে পড়লো। এরপর আরতির মুখের দিকে চাইবার ক্ষমতা অরুণের ছিলনা। যদি, যদি আরতি তার প্রস্তাব শুনে বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠে? যদি তার বিপুল স্পর্দ্ধা দেখে আরতি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে লেকের ধারে এসে দাঁড়ালো। তারপর সে অস্থিরভাবে লেক প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলে। কতোবার যে ঘুরলো তার আর ইয়ত্তা নেই। আরতির ব্যবহারে সে কখনো বিরূপতা লক্ষ্য করেনি সত্যি। কিন্তু কে জানে এ নিছক বন্ধুত্ব কি না? কিম্বা হয়তো দয়া অনুকম্পা, কে বলতে পারে? সে তো নিতান্ত অপদার্থ, গুছিয়ে একটা কথা বলতে পর্য্যন্ত সে পারে না; আরতি যদি তার প্রস্তাব শুনে হেসে ওঠে, তাতে আশ্চর্য্য হবার তো কিছুই নেই।

সেদিন যখন সে বাড়ী ফিরলো তখন রাত দশটা বেজে

গেছে। বহু প্রশ্নের উত্তরে মা সেদিন শুধু 'হ্যাঁ' 'না' ছাড়া কোনোই উত্তর পেলেন না। নামমাত্র আহার করে অরুণ শুয়ে পড়লো, কিন্তু মাথা তার তখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পুনঃপুনঃ মাথায় জল দেওয়া সত্ত্বেও সে রাত দেড়টা অবধি বাজতে শুনেছে, তারপর কখন যে সে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে তা সে নিজেই জানে না।

* * * *

ছ' বছর পরের কথা। অরুণ যে কলেজে বি,এ পড়তো সেই কলেজেরই প্রফেসর হয়েছে। যে Thesisটা সে Ph D degreeর জন্যে submit করেছে, তা যে মনোনীত হবেই সে সম্বন্ধে তার নিজের, আরতির, অমরবাবুর বা প্রফেসর রায়ের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

সেদিন আরতি বসে বসে একটা ছোট্টো মোজা বুনছিল, আর অরুণের সঙ্গে তর্ক করছিল। Keynes-এর থিওরী সম্বন্ধে নয়—কী সম্বন্ধে ঠিক জানি না। তবে কথাবার্ত্তাটা এই রকম :—

"'কিরণ' বিচ্ছিরি। 'প্রদীপ'। আরতির 'প্রদীপ', কেমন সুন্দর বলো দিকিন?"

"না, 'কিরণ' ভালো। অরুণের 'কিরণ';—চমৎকার!"

"না 'প্রদীপ'।"

"না 'কিরণ'।"

শেষটায় রফা হোলো "প্রদীপ কিরণ।"

অতএব কেউ যদি কখনো উক্ত অদ্ভুত নামধারী কোনো ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করেন তো এই আখ্যায়িকাটিকে স্মরণ করবেন, তা হলে হয় তো সেই সমস্যার সমাধান হবে।

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য



কবিতাপাঠ—(৩)

শ্রীনবেন্দু বসু এম-এ

(ছন্দ)

দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমরা শিল্প বা কাব্যে রূপের স্বরূপ কি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, অর্থাৎ রূপের ভেতরকার কথা জানবার বা প্রাণের পরিচয় গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছি। এইবার আমাদের বুঝতে হবে রূপের বাইরেকার প্রকাশ, কিম্বা বলতে পারি তার দৈহিক বিকাশ, পরিণতি আর বৈচিত্র্য।

রূপের বিকাশ আর পরিণতি ঘটে ছন্দ, অলঙ্কার, কথা নির্ব্বাচন আর ভাষাবিন্যাসের সাহায্যে, যেহেতু এই সকল উপায়েই ভাবের আবেগ আরো শক্তিমন্ত আর স্বতঃসঞ্চারিণী হয়। প্রথম প্রবন্ধেই এ কথার আভাস দেওয়া হয়েছিল। এখন এই সকল উপায়গুলিকে আরো বিস্তৃত ভাবে দেখতে হবে। প্রথমে ধরি ছন্দের কথা।

ছন্দ রূপের অঙ্গগঠন করে। কথাটা বুঝতে হ'লে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের "পুনশ্চ" থেকে গদ্যরীতিতে লেখা একটি কবিতার কয়েক ছত্র নেওয়া যাক—

এক মুহূর্ত্তে মেঘের দল
বুক ফুলিয়ে হু হু করে' ছুটে আসে
তাদের কোণ ছেড়ে।
বাঁধের জল হয়ে গেল কালো,
বটের তলায় নামলো থমথমে অন্ধকার।
দূর বনের পাতায় পাতায়
বেজে ওঠে ধারাপতনের ভূমিকা।
["দেখা"]

এইবার পদ্যকাব্য একটি মেঘ করার বর্ণনা নিই :—

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে' আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া
হানি দীর্ঘধারা।
["বর্ষশেষ"]

দুটি বর্ণনার মধ্যে মূল প্রভেদ এই যে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে ছন্দের দোলা যাকে বলে তা বেশী আছে। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তরে অন্তরে উচ্চারণ থামে, আর নির্দ্দিষ্ট স্থানে উচ্চারণের ঝোঁক পড়ে। ফলে, আবৃত্তি করবার সময়ে ঢেউয়ের আঘাতের মতন একটা দোলার সৃষ্টি হয় আর সেই দোলা সারা কবিতার মধ্যে ক্রমানুযায়ী ঘুরে ঘুরে এসে স্মৃতি আর অনুভূতিকে আন্দোলিত করতে থাকে। এইরকম কিছুক্ষণ হ'লে পর মনে হয় যেন কান আর স্মৃতিকে ঘিরে ধ্বনিতরঙ্গের একটা বেষ্টনী গড়ে' উঠেছে যার বাঁধের মধ্যে সে তরঙ্গ কেবলই আলোড়িত হচ্ছে। এখন এই বেষ্টনীর মধ্যে ধ্বনিতরঙ্গের আবর্ত্তিত হওয়ার সঠিক প্রভাব কি? একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। জলের একটা প্রবল স্রোতকে যদি অবাধে বয়ে যেতে দিই তা হ'লে সে ধারা এলিয়ে ছড়িয়ে ক্রমশঃ মিলিয়ে যাবে আর তার কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি থাকবে না, কিন্তু কোন বঙ্কিম বাঁধের মধ্যে যদি তাকে চালিত করি তাহ'লে সে কেবলই মুক্তিকামনায় গর্জ্জন করবে, অনুনয় করবে, শাদা ফেনার নৃত্য আর রামধনুর মায়াজাল রচনা করে' প্রলোভন দেখাবে, শক্তি আর সম্ভাবনার পরিচয় দেবে, আর বাঁধনের মধ্যে মুক্তির সংবাদ দেবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঁধ বঙ্কিমার আকৃতি গ্রহণ করবে। ছন্দের বেষ্টনীর মধ্যে ধ্বনিতরঙ্গের আবর্ত্তে পড়লে ভাবরসও এই রকম বেশী শক্তিমন্ত আর বেগবান হয় আর রেখাকৃতির ভ্রম উৎপাদন করে। কবির ভাষায় অল্পের মধ্যে বলতে গেলে—

কবির রচনা তব মন্দিরে
জ্বালে ছন্দের ধূপ।
সে মায়া-বাষ্পে আকার লভিল
তোমার ভাবের রূপ।
(রবীন্দ্রনাথ—"প্রত্যর্পণ")

উচ্চারণের নির্দ্দিষ্ট ধ্বনিতরঙ্গ যখন কানেতে নিয়মিত সময়ের অন্তরে অন্তরে এসে বাজে, সঙ্গীতে সম পড়ার মতন যথাস্থানে যতি পড়ে, আর সেই শৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি হ'তে থাকে, তখন রস উৎসুক স্মৃতি আর অন্তর্দৃষ্টি সে রসধারার প্রবাহে কোথায় কি বাঁক আছে, কোথায় কি উঁচু নীচু, ঘূর্ণি, কোথায় সঙ্কোচন প্রসারণ হচ্ছে, সেটা আশা করতে শেখে আর তখন অনেকটা অনুভব করে যেন একটা বাঁধাধরা পথরেখা চিনে সে চলেছে। ভাব আর ধ্বনির রাজ্যে যেন একটা চোখে দেখা আল্‌পনার মত আকার-বিন্যাস হচ্ছে। শিল্পরাজ্যে চোখে কানে এরকম আদান-প্রদান চলে। সুদূর স্বর্গে অবস্থিত Blessed Damozel সম্বন্ধে Rossetti লিখেছেন "I heard her tears"। রূপের এই রকম আকৃতিজ্ঞাপক একটা পরিমণ্ডল যখন অনুভূতির চারিদিকে ছেয়ে যায় তখনই সমগ্র সৃষ্টির অখণ্ডতা বা সামঞ্জস্য সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি হয়। কোন অংশ শেষ পর্য্যন্ত নিরলম্ব থেকে রচনাকে বেতালা করে না, দৃষ্টি যেন অভ্যস্ত আর প্রত্যাশিত ভাবে চলতে চলতে হঠাৎ কোথাও বৈষম্যের ধাক্কা খেয়ে থেমে যায় না, ভাবের আরোহণ অবরোহণ ক্রমশঃ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত একটা সুষ্ঠু সমাপ্তির মধ্যে অবসান হয়। এই অখণ্ডতার অনুভূতি সঞ্চার করাই হ'ল শিল্পের রূপকরণের ফল এবং সার্থকতা।

ধ্বনিতরঙ্গের তারতম্য অনুসারে অর্থাৎ ছন্দের কম বেশী সঞ্চারে রূপরেখা কি ভাবে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট হয় সেটা আগাগোড়া ব্যাখ্যার ব্যাপার নয় এটা স্বীকার করতে হয়। মূলতঃ সেটা ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফল আর তার পূর্ণ উপলব্ধি কম বেশী সেই পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার উপরই নির্ভর করে। কোন্ ছন্দ কি ভাবে নিজস্ব রূপের আল্‌পনা আঁকে সেটা একটা উদাহরণ মাত্র দিয়ে কতকটা দেখাতে পারা যায়। উপরে উদ্ধৃত "বর্ষশেষ" কবিতাটির প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক।

ঈশানের পুঞ্জমেঘ প্রথমটা খেয়ে চলে এসে আকাশময় ছেয়ে যায়। তৎক্ষণে কবিতার প্রথম ছত্রটি পড়া হ'ল। তারপর হঠাৎ যেন মন্দগতি হয়ে মেঘ থমথমে হয়ে এল। তাই ছন্দের দিক থেকে তার চলার গতি যেন একটু ভঙ্গ হ'ল, শুধু বল্লুম "বাঁধাবন্ধহারা," বলে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইলুম। তারপর ঝড়ো হাওয়ার আর এক তীব্র ঝোঁক। আবার মেঘ হু হু করে' এগিয়ে এল—"গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া"। এই ভাবে যখন সারা আকাশটা জুড়ে গেছে, খরবেগে অগ্রসর হওয়া আর নেই, চলা থেমে কাজ সুরু হ'ল, দীর্ঘধারা হানতে সুরু করে' মেঘ স্থির হয়ে রইল, তার নড়ে' বসবার জায়গা নেই, অথচ তার উদ্দামতার স্থান চাই, নিরুপায় হয়ে অন্নের মধ্যেই আলোড়ন হ'তে লাগলো, পুঞ্জীভূত ঘন মেঘ কেবলই গুমরে গুমরে ওলট-পালট হয়ে আকাশ মথিত করতে লাগলো তখন অন্ত ছন্দের সৃষ্টি হ'ল, বল্লুম—

আজ আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

["আবির্ভাব"]

কিম্বা আরো ঠাস ভরাট মেঘ হ'লে—

শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে।

["সোনার তরী"]

ক্রমশঃ যখন কতকটা বর্ষণ হয়ে মেঘের উদ্বেল ভাব একটু হাল্‌কা হয়ে এল, অথচ তখনও জলভারে পূর্ণ, আর কোন চাঞ্চল্য নেই, কেবল যন্ত্রের মত জল পড়েই চলেছে, তখনকার ছন্দ এই—

বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউসের ক্ষেত জলে ভর ভর
কালিমাখা মেঘ ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে।

["আষাঢ়"]

তারপর যখন বর্ষণ-শেষে আকাশ মুক্ত হয়ে গেল, চারিদিক সোনালী রোদে ভরে' গেল, নীল আকাশে খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াতে লাগলো, এতক্ষণ মূক পাখীর কলগানে, নদীনালার কলমর্ম্মরে, ছাড়া পাওয়া বালক বালিকার হাস্যমুখরতায় যখন চারিদিক সরব হয়ে উঠ্‌লো, তখন ধরলুম—

মেঘ ছুটে গেল নাইগো বাদল আর গো আর
আজিকে সকালে শিথিল কেবল বহিছে বায়।
["মেঘমুক্ত"]

পদ্যছন্দের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ইংরাজ সমালোচকের নীচে উদ্ধৃত কথাগুলি বেশ বিশদ—

"The reason why verse is necessary to the form of poetry is that the perfection of poetical spirit demands it,—that the circle of its enthusiasm, beauty and power, is incomplete without it,···verse is no more a clog·· than the roundness and order of the globe we live in is a clog to the freedom and variety that abounds within its sphere.·· It is the shutting up of his (the poet's) powers in 'measureful content', the answer of form to his spirit··· Verse, in short, is that finishing and rounding, and 'tuneful planetting' of the poet's creations, which is produced of necessity by the smooth tendencies of their energy or inward working, and the harmonious dance into which they are attracted round the orb of the beautiful. Poetry, in its complete symphathy with beauty, must, of necessity, leave no sense of the beautiful, and no power over its forms unmanifested; and verse flows as inevitably from this condition of its integrity as other laws of proportion do from any other kind of embodiment of beauty (say that of the human figure), however free and various the movements may be that play within their limits."

(Leigh Hunt—"What is Poetry?")

কয়েকটি বাঙলা ইংরাজী ছন্দের নমুনা দিয়ে, যা থেকে হয়ত ছন্দের এই "finishing" আর "rounding" আর "tuneful planetting"এর কথা উপলব্ধ হ'তে পারে, আমি ছন্দ প্রসঙ্গের উপসংহার করছি :—

(১) শরদ-চন্দ্র পবন মন্দ
বিপিনে বহল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লি মালতী যূথি
মত্ত মধুপ ভোরুণী।

(২) চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী বেশে দাসী। দেশদেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!'

(৩) দেখেছি তোমার আঁখি সুকুমার
নব জাগরিত বিশ্বে,
দেখিনু হিরণ হাসির কিরণ
প্রভাতোজ্জ্বল দৃশ্যে।

(৪) Is there ony room at your head, Saunders!
Is there ony room at your feet?
Is there ony room at your side, Saunders!
Where fain I wad sleep?

(৫) A gentle knight was pricking on the plain,
Yclad in mighty arms and silver shield,
Wherein old dirts of deep wounds did remain
The cruel marks of many a bloody field;

(৬) Stately Spanish galleon coming from the Isthmus,
Dipping through the Tropics by the palm-green shores,
With a cargo of diamonds, Emeralds, amethysts,
Topazes and cinnamon and gold moidores.

শ্রীনবেন্দু বসু

প্রথম বর্ষণ

শ্রীমতী লীলাকমল বসু

ব্যথিত ধরার তৃষিত হিয়ার পরে
পরাণ বন্ধু,—এলে উতরোল ঝড়ে।

*   *   *

খর-দৃষ্টির দামিনী-দলকখানি
কি হেরিছ মুখে—অবিরাম হানি হানি ?
ওগো গুরুগুরু বাজায়ে ডমরু-বাণী
প্রণয়-ভাষণ একি তব ক্ষণে ক্ষণে !
হেরি লীলা, হিয়া ভরি ওঠে শিহরণে।
পাগল হাওয়ার প্রবল বাহুর বাঁধে
শ্যামল-কাঁকালি বাঁধিছ গো এ কি ছাঁদে !
পরশ-পীড়ায় কাঁপে তনু, হিয়া কাঁদে ;
ওগো এস এস,—সুখ-শিহরণ-ভরে
নিঠুর সোহাগ-আঘাত সহিব লীলা-উতরোল ঝড়ে।

*   *   *

নব-ঘন নট বেণু-বন-পথে এস নর্ত্তন তুলে,—
ব্যথিত প্রিয়ার তৃষিত হিয়ার কূলে।

মাটীর বেদনা বন্ধু হে ছিল জানা,
কায়ার বাঁধনে বুঝি বাঁধা ছিল ডানা।

*   *   *

বন্দী বিরহী মুক্ত আজি কি ছলে
রুদ্ধ আর্ত্ত আবেগ উছসি চলে !
অশনি ঝলকে সোহাগ-দিঠির তলে
প্রণয়ের ভাষা—প্রলয়-ছন্দময়ী
উতরোল প্রেম এল অকরুণা বহি।
প্রলয়ঙ্কর,—ভুলিব না ছলনাতে,
লব তব প্রেম অযুত শাখার পাতে।
যদি ঝরে শাখা দহিয়া অশনি-ঘাতে,
নিথর অঙ্গ সঁপি অকরুণ করে
হৃদয়ে তুলিয়া ডমরু ধ্বনিয়ো লীলা উতরোল ঝড়ে।

*   *   *

রুদ্র বন্ধু, প্রথম দিনের বর্ষণ সমারোহে
বেপথুমানারে জিনে লহ বিদ্রোহে।

স্রোতের ফুল

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন আর কাটে না—

ছোট একটা খাটের ওপর বিছানা পাতা, তারই ওপরে মঞ্জুলা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে।...

সর্দ্দি বুকে বসে গেছে, বুকে পিঠে অসহ্য ব্যথা। সে এখন বেশ বোঝে যে এ যাত্রা আর বাঁচ্‌বে না, তাই সে বার বার করে সবিতার দিকে তাকায়, আর কাঁদে। ভাবে, পথের শেষ এইবার বুঝি হয়। নিজের সঞ্চিত ফুল বুঝি এইবার যায় শুকিয়ে।

চারিদিক অন্ধকার। মঞ্জুলার চারিদিক যেমন অন্ধকার, মনের মধ্যেও বুঝি তেমনি অন্ধকার।...

বৃথা উঠ্‌বার চেষ্টা করে, পারে না। পায়ের নীচে সবিতাকে দেখে সে। হেঁট হয়ে সে তার মায়ের ওষুধ ঢালে। মুখ যেন আরও মলিন।

রুদ্ধকণ্ঠে মঞ্জুলা বলে—

—অলককে একবার ডেকে দিলি না মা...

সবিতা ওষুধের পাত্র হাতে করে মা'র সাম্‌নে দাঁড়ায়। বেশ শান্তভাবেই বলে—

—মা—এ ওষুধটা—

—আঃ! আবার ওষুধ! ওষুধ দিয়ে কি আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবি মা? কখনই পারবি না—আমি তোকে কতবার বল্‌ছি, একবারটি তাকে ডেকে আন্...তা তুই তো যাবিনা...না, আমি আর ওষুধ খাবনা।

রাগের ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় মঞ্জুলা। খানিকক্ষণ কি যেন ভাবে সবিতা, পরে সে দৃপ্তকণ্ঠে বলে—

—আচ্ছা মা, তুমি এ ওষুধটা খেয়ে ফেলো; আমি ডাক্‌বার ব্যবস্থা করছি।

মা আশ্চর্য্য হয়ে তাকায় তার দিকে। হঠাৎ চোখ জ্বালা করে ওঠে সবিতার। চোখ দুটো রগড়ায়, বলে—খাও।

মঞ্জুলা এবার আপত্তি করে না—খায়, সবিতা বাইরে যায়।

সহায়হীনা তরুণী সবিতা মনকে দৃঢ় ক'রে এতদিন এত বড় বিপদকে অম্লানবদনে আলিঙ্গন ক'রে এসেছে।...সমাজের দেওয়া অপবাদকে সহ্য করে সে নীরবে, বুক যায় তার একেবারে ভেঙ্গে। ভাবে—এ জীবনের আহুতি হবে কিসে?...

নিজের জীবনকে চিরকাল কুমারী ব্রতে কাটাবে, মনের প্রবল বাসনাকে ছাই চাপা দিয়ে রেখে সে এই পিচ্ছিল পথে চল্‌বে, এই স্থির করে। কিন্তু দুর্ব্বলা অসহায়া নারী মাত্র সে—সে কি করতে পারে এই বিপদের মাঝখানে এসে। শুধু ভাবে,—আমার মনের আকাঙ্ক্ষাকে এখন চিতা বুকে তুলে দিয়ে এইভাবে কাটাব।...কিন্তু নিয়তি—কালের গতি তা'কে সে ভাবে চল্‌তে দেবে কেন?

বুকের বাঁধন যায় একেবারে ভেঙ্গে,—আরও বেশী করে ভাঙ্গে ওর মায়ের এই আকস্মিক অসুখে। এ অসুখ হ'তে পরিত্রাণ বুঝি আর পাবেনা মা!—ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। অপমানকে স্বেচ্ছায় ডেকে আনে শেষে, সমাজের শাসন মানে না—চিঠি লেখে,—

—যে ভাবে বিদায় দিয়েছিলাম, ঠিক্ সেই ভাবেই আবার ডাক্‌ছি তোমায়। ওগো, একবার এসো,...মা বুঝি...

শেষ হয় না, চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে, মনকে দৃঢ় কর্‌তে যায়, কিন্তু পারে না। হায়! দুর্ব্বলা নারী!

চিঠি পাঠিয়ে দেয় ঝির মারফত।

তখন প্রদোষের মলিন আলো ধীরে ধীরে দিন-শেষের শেষ খেয়ায় দুকূল-হারা আকাশ-দরিয়ার নিরুদ্দেশ যাত্রা শুরু করে—শেষে অদেখা কোন্ মেঘের চোরাবালিতে লেগে যেন জ্যোৎস্না তলে ডুবে যায়।

জ্যোৎস্নার আলো সে সময় নীলিমার বুকে, ভরা জোয়ারের মত উপ্‌ছে ওঠে···। উন্মনা সবিতা তার বিকশিত যৌবন, লীলাবলয়িত অঙ্গ, মাথায় তার দিনশেষের উতল হাওয়ায় আকুল হয়ে ওঠা এলোমেলো চুল,—দূর আকাশের প্রান্তে মিশে যাওয়া স্বপ্নময় আঁখি দু'টী তুলে সে সুদূর গগনের ভালে ফুটে ওঠা পরিপূর্ণ চাঁদের পানে চেয়ে থাকে—তার চাহনিতে কি এক অজানা ব্যথার রহস্য ঝিল্‌মিল্ করে যেন।

অতীতের সিংহাসনে বসে সবিতা তখন চিন্তার বাঁশী তুলে নিয়ে ফুঁ দেয়, আর সেই বাঁশীতে তার কত জন্মের বিরহভরা সুরে কান্নার রাগিণী বেজে উঠে। নিস্তব্ধ ঘরের প্রতি জিনিসকে শিহরণের সুরে জাগিয়ে তোলে, আর তা'র বাঁশীর মূর্চ্ছনার মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস সন্ধ্যার বাতাসকে কাঁপিয়ে তোলে···

সবিতা ভাবে—সেদিন, আর এ দিন!

জীবনের কত পরিবর্ত্তন—কত প্রভেদ—কত বৈচিত্র্য! সুখ কোথা দিয়ে কেমন ভাবে আসে আর কেমন ক'রেই বা চলে যায় তার না বলে যাওয়া ভাবার ইঙ্গিত দিয়ে!···

ভাবে—আরও ভাবে—ভাবনার সীমা দেখ্‌তে পায় না। এক এক ক'রে তার মানস-পটে অতীতের রঙীন চিত্রগুলি প্রতিফলিত হ'তে থাকে—খানিকক্ষণ ধরে তা'র দিকে অনিমেষ নয়নে তাকায়,—তৃপ্তি হয় না। তবুও ছাড়তে হয়; দ্বিতীয় ছবি আবার আসে।

এম্‌নি ক'রে ছবির পর ছবি কল্পনার রাজ্যে আসে নম্বর দিয়ে।

চিন্তায় বিভোর হ'য়ে এম্‌নি ভাবে সে যে কতক্ষণ ব'সে থাকে—জানে না!···

নিঝুম নিশীথিনী—রুদ্ধশ্বাস। অন্ধকারে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। আকাশেও কে যেন কাদা লেপে দেয়—এতটুকু ছিদ্র নেই।

বদ্ধ কারাগারে দমবন্ধ হ'য়ে আসে যেন··· ··

অনন্তের পথে বিশ্বের অভিসার,—ইতিহাস নেই—সাক্ষী নেই—কিছুই নেই।

অন্ধকারের নিবিড়তার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়ে ওঠে নির্জ্জনতা। মন আরও উদাস হয়।

মনে পড়ে তার প্রথম আলাপ। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে সকলকে যখন একটা আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছিল,—সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হয়েছিল অলক—তার প্রাণের অনুভূতি তখন সত্যই এক নতুন বার্ত্তা বহন করে এনেছিল, যে বার্ত্তা কেবল অফুরন্ত ভাষা বা ইঙ্গিত দিয়ে তৃপ্তি দিতে পারেনি, পেরেছিল কেবল মাত্র চোখ দিয়ে! ··

মনে পড়ে তার একটী দিনের কথা······

···শিউরে ওঠে, আবার তারই বিভোরে মগ্ন হ'য়ে যায়··· আনন্দের স্রোত ব'য়ে যায় তার মরমের ভেতর দিয়ে। —উল্‌টে পাল্‌টে আবার সেই অতীত চিত্রটী দেখতে চেষ্টা করে।···

···বারান্দার আব্‌ছা অন্ধকার হ'তে ঘরের ঘনান্ধকারে প্রবেশ ক'রেই বাইরের কোলাহল-মুখর জগতের সাথে হঠাৎ একটা বিচ্ছেদ ঘটে যায়—চকিতের জন্য মনে হয়, তারা সূচীভেদ্য অন্ধকারে জনশূন্য প্রান্তরে দাঁড়িয়ে।···

·· ···সবিতার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস তার বুকে লাগে।

অন্ধকারে মানুষের জন্মান্তরের স্মৃতি ফিরে আসে যেন। ·· স্মৃষ্টি আদিকালের—প্রথম মানব-মানবী আদম্ আর ইভ্ বুঝি অন্ধকারেই পরস্পরের পরিচয় পায়। ··

···সে দৃঢ় বলে সবিতাকে বুকের কাছে টেনে আনে, তার কম্পিত ওষ্ঠাধরে আপনার আবেগ-তপ্ত ওষ্ঠাধর চেপে ধ'রে—অন্ধকারে লেলিহান অগ্নিশিখা, পৃথিবীর উন্মাদ নৃত্য!

শান্ত-গম্ভীর মাধুর্য্যময়ী সবিতার গাম্ভীর্য্য নিমিষে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।···অন্তরের কোন্ গোপন প্রস্রবণে আঘাত লাগে কে জানে! পাষাণ প্রাচীর ভেদ ক'রে ফোয়ারা বইতে থাকে।

···অকারণে কেঁদে ওঠে সবিতা তার কাঁধে মাথা রেখে কাতরকণ্ঠে বলে ওঠে—

—কেন—কেন এমন কর্‌লে···তুমি আমায় অপমান কর্‌লে কেন?

—অপমান?

সবিতার চোখ জ্বালা করে।…লজ্জায় শিউরে তার বুক থেকে উঠ্‌বার চেষ্টা করে, অলকের মৃদু বাঁধন সে ছাড়াতে পারে না…অকারণে চোখ-মুখ-কান লাল হ'য়ে ওঠে—দেহ কাঁপে·· সবিতা মাথা নীচু করে···

*   *   *   *

সবিতা ভোবে। কিন্তু একি ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করে অলক !…এরই চারিদিকে পাক খেয়ে মরতে হবে তাকে !

লেখায় নেশা জমে না—

শান্ত অলস মধ্যাহ্নে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বই নিয়ে বসে অলক—অর্থহীন অক্ষরগুলো চোখের সাম্‌নে নাচে—আনমনে বলে ওঠে—

—সবি ! সবি !! সবি !!!…আমার মনের ছবি !

হঠাৎ চোখ দুটো বন্ধ হ'য়ে আসে কা'র কোমল হাতের চাপে ! ছাড়াবার চেষ্টা করে না সে ! হাসে একবার, বুকটা একবার নেচে ওঠে ··তারপর···

···দুর্ব্বল তরুণ দেহটী ঝুঁকে পড়ে তার কোলের 'পরে, হাল্কা চুলগুলো তার নাক-মুখ-কান ঘিরে উড়ে চলে হাসনুহানার মিষ্টি গন্ধ নিয়ে বড় মিষ্টি লাগে তাকে··· তার সবটুকুন ছবিটি জেগে ওঠে মনের কোণে !

এম্‌নি করে তাদের দুজনার ভালবাসা অবাধগতিতে চলে ঠিক্ নদীর স্রোতের মত।

যৌবনের উদ্দাম গতি বাধাহীন, ছন্দহীন ভাবে চলে—পথের কাঁটা পায় না দেখ্‌তে।···

কিন্তু একদিন তাদের এ চলার ছন্দ একেবারে বদ্‌লে যায়—অলকের পিসীমার আকস্মিক আগমনে।

সেদিন—

নিজের পড়ার ঘরে বসে কি যেন লেখে অলক। হঠাৎ টুপ্ করে বুকে এসে পড়ে একটী বকুল ফুল। জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নেয় একবার···কিছুই না ··! খানিক পরেই শোনা যায় চুড়ির রিণি-ঝিণি শব্দ !···

হঠাৎ কপাল ঘেমে ওঠে, বুকের রক্ত তোলপাড় করে। ছুটে বাইরে যায়। সবিতা মুখ ফিরিয়ে নেয়। কৌতুক-হাস্তে দেহ তার নাচে !

অলক ডাকে—

—সবি—

খুব আস্তেই ডাকে, তবু নিজের কাছেই নিজের স্বর যেন অস্বাভাবিক ঠেকে।

সবিতা উত্তর দেয় না। মুখটা আরও নীচু হয়, দেয়ালের গায়ে সে যেন মিশে যায় একেবারে !

কাছে গিয়ে অলক সবিতার হাত দুখানি চেপে ধরে। সবিতা বাধা দেয় না বটে, কাঁপে কিন্তু।

ঘরের ভেতর নিয়ে এসে তাকে বসায়।

চুপ্ চাপ।—

সবিতা বলে···

—তোমার লেখা পড় না—

ছাই লেখা ! অর্থহীন, সুরহীন, ছন্দহীন !

সবিতার মৃদু হাসিতে সুর, হাতের চুড়িতে ছন্দ, আর দেহের তরঙ্গে একটা অর্থ।

সবিতার হাতটা বুকে চেপে ধরে বলে অলক—

—সবি—

সবিতা ক্ষণকাল নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে থাকে, চোখ বুজে আসে যেন—কি একটা কথা বল্‌তে যায়,

বাধা পায়, ঠোঁট দুটো বন্ধ হয়ে যায় অলকের ঈষৎ ঠোঁটের চাপে।

মুহূর্ত্তেই পৃথিবী যায় একেবারে উল্‌টে—পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, অলকের পিসীমা, দাঁড়িয়ে রক্তবর্ণ চক্ষে।

মুখ ফেরাতেই, পিসীমা একবার পেছন ফেরেন। পরে কি ভেবে যেন হাতের খামটা তার দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেন—

—এই চিঠি এয়েছে তোমার। ডাকৃছি কতক্ষণ। হুঁসও ত হয় না,—তাই এখানে আস্‌তে হল আমাকে।

তিনি বেরিয়ে যান বেশ পদশব্দ করে।

সবিতা লজ্জায় খাটের সঙ্গে মিশে যায় যেন। তাদের সেই শেষ···এই স্থির করে সবিতা।

অপমান ও লোকলজ্জার খাতিরে অলককে সে তাদের বাড়ীতে আস্‌তে নিষেধ করে দেয় এবার। সেই থেকে·· কিন্তু আজ।···

অলক না এসে পারে না।

যার নির্ম্মম নিষেধ-বাণী একদিন চোখের জলে বিদায় দিয়েছিল তারই কাতর কাকুতি আজ ফিরিয়ে আনে ওকে।…

কত দিন পরে!…

ঘরে যেতে অলকের পা কাঁপে, বুক দুরু দুরু করে, দুয়ারে সে থমকে দাঁড়ায়।

সাঁঝের ঝিমিয়ে পড়া মলিন আলোয়, তার ছায়া দেখে রোগ শয্যাশায়িনী মঞ্জুলা থম্‌কে ওঠে—

—কে এলো সবি?

যে এলো তার পানে চকিতে তাকিয়ে সবিতার চোখের পাতা ভারি হয়ে নেমে পড়ে। আরক্ত মুখ আনত ক'রে, হেঁট হয়ে সে মা'র পিঠে মালিস করতে থাকে, কথা ফোটে না।

—দেখ্‌ না কে?

বলতে বলতে মা পাশ ফেরেন। সবিতা মৃদুস্বরে বলে—মালিসটা যে আর একটু…

—থাক্‌গে মালিস্‌!

ওইটুকু পাশ ফেরবার শ্রমেই নিঃশ্বাসে টান ধরে যায়, এত বেশী দুর্ব্বলতা।

অলকের দিকে ছল ছল চোখে চেয়ে মঞ্জুলা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—

—অলক! এসো বাবা—

তার রোগ-ক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখশ্রী, নিঃসহায় কাতরতা অনুতপ্ত চিত্তে ব্যথা জাগায় আবার নতুন ক'রে।

ধীরে ধীরে পাশে এসে পীড়িতার তপ্ত ললাটে হস্তার্পণ ক'রে ব্যথিত কণ্ঠে সে বলে—

এতটা বাড়াবাড়ি হয়েছে—অথচ—আমাকে একবার জানালে…

—কি ক'রে জানাই বাবা? মেয়ে যে আমার—

মেয়ের মুখপানে তাকিয়ে মা'র ক্ষীণকণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। কম্পিত জীর্ণ বক্ষপঞ্জর দুলে দুলে ওঠে মর্ম্মমথিত করা অতি-দীর্ঘশ্বাসে। সবিতা এসে বলে—

—চুপ করো মা!—এই জন্তেই তো আমি—

—চুপ্‌ তো করতেই হ'বে মা,—তার আগে বলে নিতে দে না,—দুটো কথা—যা বল্‌বার জন্তে প্রাণটা আমার ধড়্‌ফড়্‌ করছে।

সবিতা মালিসের শিশিটা রেখে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে, দাঁতে ঠোঁট চেপে সে কান্নার বেগ রোধ করে।

এই মা ভিন্ন এই বিপুল বিশ্বে আপন বলতে কেউ নেই যে তার!……বাবা গেছেন এই সেদিন—বছর ফেরেনি এখনো,—এরি মধ্যে আবার মা'ও যদি তাকে ছেড়ে…ওঃ! না, না!—তা'হলে কেবল নিজেকে নিয়ে এ সংসারে বেঁচে থাকবে সে কেমন ক'রে গো?—

আশা-আশ্বাসহীন লাঞ্ছিত জীবন তার একান্ত অন্ধকার… সে আঁধারে এতটুকু আলোক বুঝি…না, না,—এ আলো তা'র সহ্য হ'বে না। অন্ধকারের জীব সে অন্ধকারেই বেঁচে থাক্‌তে হবে ওকে…আলো সে পাবে না—

—মা'র বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও সবিতা!

অলকের ডাকে নিজেকে সংবরণ করে, বাতিটা ধরিয়ে দিয়ে, সবিতা মা'র পাশে এসে বসে।

দুজনে অতি কাছাকাছি…তবু কেউ কারুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না।…শিরায় শিরায় প্রতি রক্তকণিকা দ্রুত তালে নৃত্য বাধিয়ে দেয়…

মনে হয়—এ কত—কতদিন পরে!…

উচ্ছ্বসিত চিত্তাবেগ কষ্টে রোধ করে অলক বলে—একবার সিভিল সার্জ্জনকে ডেকে—

—না, না! সিভিল সার্জ্জন আর কি করবে বাবা? দিন আমার ফুরিয়েছে,—আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি—

কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই,—মঞ্জুলার রক্তহীন পাংশুমুখ, ভেঙ্গে পড়া চোখের কোলের ঘন কালিমা, শ্বাস প্রশ্বাসের অস্বাভাবিক গতি স্পষ্টই জানিয়ে দেয়,—দিন তার ফুরিয়েছে!

……কতক্ষণ—কারও মুখে আর কথা যোগায় না। নিবিড় বিষাদ-ব্যথায় ঘরখানা যেন নিঝুম হয়ে থাকে। আলো ছায়ায় বিচিত্র মায়া রচনা ক'রে গৃহকোণে মৌন-ম্লান দীপশিখা কেঁপে কেঁপে ওঠে—কি এক অজানা শঙ্কায়।

আর্দ্র কণ্ঠে, গাঢ়স্বরে মঞ্জুলা ডাকে—

—অলক!—

—কি বলছেন মা ?

—বলছি,—বাঁচতে আমি চাই না, মরণেই আমার মুক্তি,—কিন্তু সে মুক্তির পথে ও যে কাঁটা হয়ে আছে এই···

অশ্রু আবিল চোখের ঝাপ্‌সা দৃষ্টি সবিতার আর্ত্ত মুখের 'পরে নিবদ্ধ করে, কম্পিত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস টেনে টেনে নিয়ে মঞ্জুলা কাতর ভাবে বলে—

—নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ হ'লেও মা বাপের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সন্তানকে করতেই হ'বে—হয় তো সারাজীবন ভোর—তবু,—প্রায়শ্চিত্তটা যাতে লঘু হয়, এমন ব্যবস্থা যদি করতে পারো বাবা ! অভাগী যাতে একেবারে ভেসে না যায়······

মঞ্জুলার ছাপিয়ে পড়া চোখের জল এবার টস্ টস্ করে বেয়ে' পড়ে······ সবিতা মুখে আঁচল চাপা দেয়।

পীড়িতার বিশীর্ণ হাতখানা হাতে নিয়ে অলক সজল চোখে বলে—

—আপনি শান্ত হোন্ মা ! সবিতার ভার আমি নিলুম—

—আঃ ! তুমি আমাকে বাঁচালে বাবা ! ভগবান্ তোমায় দীর্ঘজীবি করুন।······অভাগীর জীবনটা যাতে ব্যর্থ না হয়—সেই চেষ্টাই······

গাঢ় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় মঞ্জুলার ভাবের আবেগে,—নিষ্প্রভ চোখেমুখে ঝিল্‌মিল্ করে একটুকু তৃপ্তির আভাস। আঃ ! তাই যদি হয়······অলক যদি সবিতাকে······

কিন্তু সে যেমন একজনের সুখের পথে কাঁটা হ'য়ে গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তার মাটী করেছিল, সবিতাও কি আবার তেমনি করে······উঃ ! না না,—তার চেয়ে···

······তার চেয়ে কী ?—ভাবতে গিয়ে মঞ্জুলার দুর্ব্বল চিন্তাশক্তি অসাড় হ'য়ে আসে, বুকের যন্ত্রণা বেড়ে যায় অসম্ভব—

চকিত, ত্রস্ত হয়ে সবিতা কান্না ভাঙ্গা সুরে বলে—ডাক্তারকে একবার ডাকো অলকদা ! মা'র বারণ শুনো না।—

ডাক্তার আসে।

ওষুধ খাওয়ায়, ইন্‌জেক্‌শন্ দেয় প্রহরে প্রহরে। কিন্তু রাত আর কাটে না।

ওদের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে, নিঃসহায়া, নিরলম্ব মেয়েটীকে অলকের হাতে হাতে সমর্পণ ক'রে অভাগিনী মঞ্জুলা এ জ্বালার জগত হ'তে বিদায় নিয়ে যায় চিরতরে।···

শান্তি সে পায় কিনা—কে জানে !

* * * *

খালি বাড়ীখানা যেন খাঁ খাঁ করে—বিরাট শূন্যতায়।

মায়ের পরিত্যক্ত শয্যায় এলিয়ে পড়ে সবিতা·····

চোখের জল তার শুকোয় না আর এক মুহূর্ত্ত। অলক ওকে কি বলে যে সান্ত্বনা দেবে তা ভেবে পায় না।······

ওর লুটিয়ে পড়া মাথাটা সযত্নে তুলে, চোখের জল আদরে মুছিয়ে দিয়ে বৃথা করুণ সুরে সে ডাকে—

—সবি !—

সবিতা সাড়া দেয় না, সজল ম্লান আঁখি দুটী তুলে চায় শুধু।······

—এমন করে তুমি ক'দিন বাঁচবে বলতো ?—

—বেঁচে কি হ'বে ?—

—তা'তো জানি না,······কিন্তু—

সবিতার শিথিল পেলব বাহুলতা—কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে অলক গাঢ়স্বরে বলে—

—আর কিছু না হোক—শুধু আমাকে বাঁচাবার জন্যেই তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে সবি !—নইলে আমরা······

সবিতা অন্তরে অন্তরে শিউরে হাতখানা টেনে নেয় ধীরে, তার বুক কাঁপিয়ে আস্তে আস্তে ঝরে পড়ে একটা ব্যথা-ক্ষুব্ধ আকুল দীর্ঘনিঃশ্বাস।

—হায় ! এ যে নাগপাশের অচ্ছেদ্য বাঁধন ! এ বাঁধন ছিন্ন করা যায় কেমন ক'রে ?—দুর্ব্বলা নারী সে !······না, এ দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না আর, বাঁধন তাকে ছিঁড়তে হবে জোর ক'রে।

নিজের জন্য নয়, সে তো ডুবেইছে······এই বিষম ঘূর্ণাবর্ত্তে শুধু হাবুডুবু খেয়ে মরতে হ'বে—জেনেও······ এখন এই ডোবাতেই সুখ যে তার !···

কিন্তু—অলক—

নারী তার প্রেমাস্পদকে সুখের আনন্দের ভাগ দিতে আত্মহারা হয়,—কিন্তু ব্যথা দিতে ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ে। প্রিয়তমের অগৌরব বুকে তার বাজেয় অধিক বাজে।

......সবিতা তার সব হারানো ভালবাসা নিঃশেষে ঢেলে দিয়েও অলকের জীবনের সকল ক্ষতি সকল অভাব পূর্ণ করতে পারবে কি ?

— না, অসম্ভব—

সবিতার পিতা শুধু সমাজের বিধি নিষেধ লঙ্ঘন ক'রেই নয়—পরিণয়ের বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলোও বাদ দিয়ে মঞ্জুলাকে গ্রহণ করেছিলেন জীবনের সাথী রূপে ···তাঁদের সেই নিষিদ্ধ, অসিদ্ধ মিলনের ফল এই সবিতা,—সুতরাং······

জীবনে চলার পরে ওকে চল্‌তে হবে একা, সাথী সে পাবে না······ভালবাসায় আছে ওর দারুণ অভিশাপ !

অশ্রু ভেজা চোখ দুটীর ব্যথাতুর দৃষ্টি অলকের মুখের ওপর স্থির করে সবিতা ধরাগলায় বলে—

—তোমার জন্যে বেঁচে থাকতে হ'বে আমায় ? তোমার পথের কাঁটা হ'য়ে ?—না, সে আমি পারব না—অলকদা ! যাকে আমি এত··· ··

কথাটা ঠোঁটের কাছে এসে বেধে যায় সবিতার। যে ব্যথা-পুলক-বিমিশ্র উদগ্র, মধুর অনুভূতি তার বুকের উষ্ণ শোণিতচ্ছ্বাসের প্রতি কণিকায় অনুভব করে সে গভীর ভাবে,···যে উন্মাদনাময় অদম্য আকাঙ্ক্ষা তার হৃৎপিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে আকুল হ'য়ে জেগে ওঠে প্রতিনিয়ত,—তা' ব্যক্ত করতে পারে না,—কিছুতে—লজ্জায় নয়,—

রবিবাবুর 'হৃদয় যমুনা'র মত লাজ ভয় মান অপমান সব ত্যাগ করেই সে যে ঝাঁপ দিয়েছে—এই দুকুলপ্লাবী ভরা যমুনার উচ্ছ্বসিত ফেনিল স্রোতে—তার নিতল-তলে তলিয়ে যেতে,—কিন্তু···

ওর সঙ্গে সঙ্গে অলক ডোবে কেন ?

সবিতার মৌনতায় অসহিষ্ণু হ'য়ে অলক তার সরিয়ে নেওয়া হাতখানা আবার টেনে নেয়,—আকুল হ'য়ে সে বলে —বলো, বলো সবি ! যা বল্‌তে চাইছিলে তা মুখ ফুটে বলো একবার—মনের কুয়াসা আমার কেটে যাক্‌, তারপর······তোমার এই হাত ধ'রে যে পথে আমি চলব,—সে পথের কাঁটা আমাকে ব্যথা দিতে পারবে না, কাঁটাকে আমি ফুল মনে ক'রে......

—তাই কি পারবে ? ওগো ! ভেবে দেখো, বেশ করে ভেবে দেখো······

—ঃঃ ! ঢের ভেবেছি সবি ! আর আমি পারি না ...ভাব্‌বার, বোঝবার শক্তি আমার লোপ হয়ে গেছে। এবার সত্যি, আমি পাগল হয়েছি সবি ! তুমি আমাকে নাও...আমি আর······

প্রমত্ত হিয়ার উচ্ছল আবেগে অলক সবিতাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় সবলে,······বাধা দিতে বৃথাই প্রয়াস পায় সবিতা······পাতলা ঠোঁট দু'খানির আকুল কাঁপন তার থেমে যায় অলকের আতপ্ত অধরের চাপে······শুধু দেহেই নয়, অন্তরেও তীব্র শিহরণ অনুভব করে সবিতা—সেই প্রথম দিনের মত······আজও তেমনি······না, তার চেয়েও নিবিড় অন্ধকার ; তখন একটুকু আলোর আভাস ছিল যেন······ এখন অতল···অশেষ···

স্রষ্টা ওদের মিলন রচনা করেছিলেন চির-রাতের তিমির তলেই বুঝি !···

সবিতা সেদিন কেঁদেছিল অপমানের বেদনায়,—আজ মান অভিমান বোধ তার ঘুচে গেছে, তবু······অলকের বুকে মুখ গুঁজে সে তেমনি করেই কাঁদে, কিসের একটা অসহ, অসম্বরণীয় উচ্ছ্বাসে ফুলে ফুলে······

··········· সে বাধা আর দেয় না,—বাধা দিতে চেষ্টাও পায় না, হাল ছেড়ে দিয়ে ভেসে চলে শুধু এলোমেলো স্রোতের মুখে। অমোঘ, অখণ্ডনীয় নিয়তির বিধান !

অলকের পিতা অনুকূল বাবু একজন সঙ্গতিপন্ন জমীদার। তাঁর সন্তান সন্ততির মধ্যেই অলকই জ্যেষ্ঠ এবং কৃতবিদ্যও বটে, সে কলিকাতায় থেকে 'ল' কলেজে পড়ে এইবার ফাইন্যাল দেবে। সুতরাং অলকের পরে তিনি আশা ভরসা রেখেছেন অনেকখানিই।

অলক সাধারণ ছাত্রদের মত 'মেস' কি হোষ্টেলে না থেকে বাসা করেছিল সবিতাদের খুব কাছে প্রায় পাশের বাড়ীতে। সবিতার পিতা ওকে স্নেহ করতেন অত্যন্ত, আর মা'র তো কথাই নেই।

জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্নেহের নিধিটীকে যার হাতে সমর্পণ করতে পেরেছিলেন তিনি অসংশয়ে পরম

নির্ভরতায়···তার প্রতি মমতা ও বিশ্বাসের পরিমাণ অনুমান করা যায় সহজেই।

তার সেই সমর্পণের প্রকৃত উদ্দেশ্য অলক হয়তো বোঝেনি, কি বুঝতে চেষ্টাই করে নি।···তবে এইটুকু সে বেশ বুঝেছে--কামনার ধন সবিতাকে এমন নিজস্বভাবে কাছে পেয়ে ওর অসংযমী অধীর চিত্তের দাবী ঠেকিয়ে রাখা শুধু কঠিন নয়—অসম্ভব।

আর ছেড়ে দিলেই বা সবিতা এখন যায় কোথায়? তার এই তরুণ বয়স, সারা দেহ মনে ছাপিয়ে পড়া ঢল ঢল রূপ যৌবন···কলঙ্কের ছাপে তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ মলিন হয়নি তো।······

তারপর নিতান্ত অসহায় আশ্রয়হীনা সে,—পিতার সারা জীবনের সামান্য সঞ্চয়—তা'র মৃত্যুর পরে প্রায় সমস্তই নিঃশেষিত হয়ে গেছে ধীরে ধীরে...

এখন সবিতার উপায়—

নাঃ, উপায় আর কিছুই নেই,—এম্‌নি করেই ··· ···অনাগত ভবিষ্যতের অপ্রিয় চিন্তাকে দূরে ঠেলে, শুধু বর্ত্তমানের মোহ-মদির-স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয় ওরা ······যৌবনের সমস্ত মাধুর্য্য রস নিংড়ে পান ক'রে —জীবনটাকে উপভোগ করতে যায় নিঃশেষে······

বাধাও পায় না, কোনো দিক্ থেকে। পিসীমা কি একটা পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে এসেছিলেন গঙ্গাস্নান করতে, অলকের বাসায় মাত্র তিনটী দিন থেকেই তিনি ফিরে গেছেন। কাজেই ওরা দুজনে চলে নিজের খেয়ালে, শাসন বারণ করতে কেউ নেই।

অলক সবিতার কাছে যখন খুসী আসে, যতক্ষণ খুসী থাকে······কেবল বাসা স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতাই কেবল ওদের অবাধ মিলনের মাঝখানে একটা সীমারেখা টেনে তফাৎ করে রাখে ঈষৎ······সেটুকু অতিক্রম করবার আগ্রহ থাক্‌লেও সাহস হয় না—কারও।

······যেদিন আসন্ন দুর্য্যোগের উপক্রম দেখে অলক সাহস ক'রে বলে—

—উঃ! কি রকম ঘোর ক'রে মেঘ উঠেছে সবি! বাতাসও তেমনি······একটা দুর্য্যোগ না হ'য়ে ছাড়ছে না আর।. যদি বলো···আজ রাত্তির বেলা আমি তোমার কাছে ······সবিতা বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—

—না না! সে কি হয়?

—যদি ভয় করে একলাটী ··তাই বলছি—

বাস্তবিক বর্ষার কাজল কালো অন্ধকার আকাশের পানে তাকিয়ে সবিতার বুক যেন কেঁপে ওঠে,······এই নিবিড় মেঘ-মেদুর,—গুরু গম্ভীর জলদমন্দ্রে, দীপ্ত বিজলী ছটায় ক্ষণে ক্ষণে সচকিত, দুর্য্যোগ রাতে শূন্য গৃহে নিজেকে একাকী কল্পনা ক'রে ভীরু-চিত্ত তার ত্রাসে শিউরে ব্যগ্র ব্যাকুল বাহু মেলে যেন বল্‌তে যায়—

—না গো! তুমি থাকো······তুমি যেও না আমাকে একলাটী ফেলে······

পলকে অবাধ্য মনকে শাসন করে দৃঢ়তার সহিত সে বলে—

—ভয় কিসের?—ঝি তো রয়েছে······

আবার অন্তরের গোপনতম প্রেরণায় সবিতা কোনো একছলে যদি হঠাৎ গিয়ে পড়ে আন্‌মনা অলককে চম্‌কে দেয়,—সেই অতীত দিনের মত······

অলক কাগজ কলম ছেড়ে তেমনি করেই ওর হাত দুখানি চেপে ধরে, কিন্তু···তা'র হাতের মুঠি আল্‌গা হয়ে যায় মুহূর্ত্তে······কৌতুকোজ্জ্বল বিহ্বল দৃষ্টি তার সবিতার মুখ থেকে নামিয়ে নেয় সে পলকে······কেমন এক বিব্রত ভাবে বলে ওঠে—

—কি সবি? এ সময় তুমি······ওরা যদি কেউ এসে পড়ে······ওরা—অর্থাৎ বন্ধু বান্ধব—

কিন্তু এ সম্ভাবনা এতদিন মনে পড়ে নিতো!······

ওদের ভালবাসার উদ্দাম গতি প্রতিহত হয় এইখানে। ······উদাস, ম্রিয়মান হয়ে পড়ে দুজনেই।

এভাব বৃদ্ধিই হয় দিনে দিনে। ওদের অবিচ্ছিন্ন মিলনানন্দের কোথায় যেন ফাঁক্ দেখা যায়······অলকের উচ্ছ্বসিত, অফুরন্ত সোহাগের বাণীতে একটু যেন ক্লান্তির সুর বাজে······বাহুর বাঁধন শিথিল···বুকের আবেগ শান্ত হয়ে আসে ক্রমশঃ—

হ'তে পারে—এ শুধু ভ্রান্তি,—কিন্তু সবিতার ব্যথিত

মরমের গোপন তলে অনেকগুলোই দীর্ঘনিঃশ্বাস জমে ওঠে নিঃশব্দে।···একটু একটু ক'রে, আলোছায়ার ফাঁকে ফাঁকে তার অচিরাগত ভবিষ্যতের নিষ্করুণ করাল রূপ চোখে পড়ে যেন অস্পষ্টভাবে···শিউরে ওঠে সবিতা, ভাবে ···একি?—একি মরীচিকার মায়া শুধু?·····হায়! সে না বুঝে কেন·····?

প্রশ্নটা তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে দিনরাত, জবাব পায় না কিন্তু।

·····উদাস চোখে, অসহায় ভাবে সে চেয়ে থাকে অলকের স্তব্ধ মুখের পানে,—অলক আদর ক'রে বলে —কি হ'ল সবি! তুমি অমন ক'রে কেন·····

এ 'কেন'র উত্তরও দিতে পারে না সবিতা,—চোখ তা'র ভরে ওঠে উদ্‌গত অশ্রুজলে,···অলকের বুকের 'পরে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে একটা গাঢ় দীর্ঘনিঃশ্বাস·····সে বুকে মাথা রেখে সবিতা আকুল হ'য়ে ভাবে—হায়! এ স্বপন যদি ভেঙ্গে যায়·····

···তাই হয়। স্বপ্ন তার ভেঙ্গে যায় অতর্কিতে একদিন —বাস্তবের এক প্রচণ্ড আঘাতে।

সবিতার হাতে পড়ে একখানি চিঠি; চিঠিখানা অলকের বোন্ নীতির। অন্য অবান্তর কথার মধ্যে সে বড় কাতর হয়ে লিখেছে

—"আচ্ছা, দাদা! তোমার কি হয়েছে বলতো? বাবাকে এমন ক'রে রাগাচ্ছ কেন? সেবার পিসীমার সঙ্গেই তোমাকে আস্‌তে লিখলেন,—তা এলে না, তা'র পরেও ক'খানা চিঠি দিলেন—তবু,—একটা না একটা ছুতো তুলে·····দুদিনের জন্যে চলে এলে কি এমন একজামিনের ক্ষতি হয় তোমার তাতো বুঝ্‌তে পারি না। ·····এদিকে পিসীমা বাবাকে কত কি বলেছেন তোমার নামে, জানো?—তুমি নাকি ওখানে কোন্ একটী মেয়েকে ···আমার তো বিশ্বাস হয় না,—কিন্তু বাবা শুনে পর্য্যন্তই ব্যস্ত হয়েছেন ভয়ানক,—রাগও করেছেন খুব।

কাল শুনলুম বাবা পিসীমাকে বলছেন—হতভাগাটা বাস্তবিক যদি আমার কথা না শোনে,—এম্‌নি করে অবাধ্য হয় তাহলে·····মনে করব সে আমার ছেলেই নয়·····

আরও কত কি বল্‌লেন,—শুনে আমার এত ভয় হয়েছে—সত্যি,—না, দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, বাবাকে তুমি রাগিয়ো না, তুমি এসো।

যে মেয়েটী তোমার জন্যে দেখা হয়েছে, সেও বেশ সুন্দরী, লেখাপড়াও জানে, তাকে দেখলে তুমি"—

সবিতা আর পড়তে পারে না, মাথাটা সজোরে ঘুরে ওঠে তা'র,·····পায়ের তলায় মাটী যেন টল্‌মল্ ক'রে সরে যায়.....দিনের সুস্পষ্ট আলো ঝাপ্‌সা দেখায় দু'চোখে·····

ওঃ! তাই···সেই জন্যেই বুঝি অলকের আজকাল অমন অনাগ্রহ উদাস ভাব!···কিন্তু লুকোবার দরকার কি ছিল?

এ চিঠি এসেছে আজ্‌কে নয়, চার পাঁচদিন আগে, সেই থেকেই, অলক পাশ কাটিয়ে বেড়ায় যেন,·····তার কারণ সবিতা বুঝ্‌তে পারে নি,—তাই না উন্মনা অলকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সে কত মতে প্রয়াস পেয়েছে নির্লজ্জা উপযাচিকার মত—ছিঃ!

সে সব কথা মনে করতেও সবিতা আজ মরমে মরে যায় যেন!··

ভালবাসার সমস্ত মাধুর্য্যই বিস্বাদ হ'য়ে ওঠে অপরাধের গ্লানিতে।

.....চিঠির কথা অলককে জানায় না সবিতা, নিজের মনেই বিচার করে,—কি করা যায়? এখন কি করা উচিত তার?—

আকাশ পানে শূন্য নয়নে তাকিয়ে আন্‌মনা হ'য়ে সে ভাবে —কেবলি ভাবে,—ভাবনায় কূলকিনারা পায়না কিন্তু। ·····ভারাক্রান্ত চিত্ত তা'র শ্রাবণের বাদল-ছাওয়া আকাশের মতই নিবিড় ব্যথা-ব্যাকুলতায় থম্ থম্ করে ·····মেঘের সজল ছায়া টন্ টন্ করে পলক-হারা উদাসী তার চোখ দুটীতে,—সে চোখের বেদনাব্যাকুল দৃষ্টি সেই সীমাহারা জমাট মেঘের তলে উধাও হয়ে যায় কোথায় কে জানে!·····

·····সবি!

সবিতা সুদূরে হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টি চকিতে ফিরিয়ে

এসে অলকের দিকে চায়। অলক চম্‌কে ওঠে সে মুখের কাতর ক্লিষ্ট ভাব দেখে।

—তোমার অসুখ করেছে নাকি ?—

শশব্যস্তে সবিতার অনাবৃত কণ্ঠে হাত রেখে তার দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করে অলক,—

—নাঃ, গা তো ভালই······

একটা চাপা উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ বাহুর পরে অনুভব ক'রে সে ত্রস্তে জিজ্ঞাসা করে—

—কি হ'ল সবি ?—বলবে না ?—

······ওঃ !—না, গো! না, সবি বল্‌বে না,—বল্‌তে সে পারবে না!·········বুক ফেটে মরে গেলেও······তার ভালবাসা এত হীন,—এত স্বার্থপর নয়!

উদ্বেলিত অশ্রুর বেগ রোধ করবার চেষ্টায় সবিতা মুখ ফিরিয়ে বলে—

—কি জানি ······মনটা বড় খারাপ—

—মনটা আমারও ভাল নেই সবি, আমি যে কি রকম—

কথাটা শেষ না করেই অলক নিঃশ্বাস ফেলে,—সহজ সরল জীবনটাকে তার এই জটিল সমস্যায় টেনে এনেছে সে নিজেই তো!······তবে এ অনুশোচনা কেন ?

······বলি বলি ক'রেও ওরা মনের কথা প্রাণের ব্যথা বল্‌তে পারে না কেউ কাউকে। মনে মনে অপরাধী হ'য়ে থাকে পরস্পরের কাছে। ······মেঘলা বেলার বিষণ্ণ সন্ধ্যা অসময়ে ঘনিয়ে আসে—বিশ্বের বুকে অকারণেই একটা উদাস ব্যাকুলতা জাগিয়ে।

······অলক যাবার জন্যে ওঠে,—সবিতা বলে—আর, একটু বসো,—এখোনো তো রাত হয়নি······

তার কণ্ঠস্বর কাঁপে······চোখ দুটীতে ব্যগ্র ব্যাকুল মিনতি—

বড় বিস্ময় লাগে অলকের,—সন্ধ্যে না হ'তেই যে বিদায় করতে ব্যস্ত হয় সে আজ কেন······সবিতাকে কাছে টেনে সে গাঢ় আবেগে ডাকে—সবি!

সবি সাড়া দেয় না, ওই ডাকটুকুন আবার শোন্‌বার জন্যেই বুঝি!······তার মন বলে—ডাকো...আবার ডাকো গো!—হারানো স্বপন জাগিয়ে······

—সবি, যদি বলো আমি আজ তোমার কাছে—

সবিতা বাধা দিয়ে বলে ওঠে—না, না! কেন মিছে আর······

কিন্তু অলক দরজার বাইরে পা দিতেই এগিয়ে গিয়ে ডাকে—শোনো—

ফিরে এসে অলক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে—কি সবি! কি বলছ ?

তবু ও সাড়া পায় না। অলক সবিতার কাঁধে হাত রেখে তার স্তব্ধ মুখের পানে যায়—সে মুখে কি অজানা এক গূঢ় রহস্যের আভাস ফোটে যেন,······আর ছল ছল আঁখির ব্যাকুল চাহনীতে তার ও কিসের মৌন গোপন ইঙ্গিত।·····

অলক শিউরে ওঠে...সবিতার মুখখানা দুহাতে ধ'রে তৃষিত বেপথু তার অধরে গাঢ় আবেগে একটী আদরের চিহ্ন এঁকে দিয়ে সে বলে—

—কি চাও সবি ?—

সবিতার কথা ফোটে না,······চোখের পাতা দুখানি কেঁপে বুজে আসে যেন ·····

সে যা চায় তাতো পেয়ে গেছে!······এইটুকুই সে তার সব-হারানো দীর্ঘ জীবনপথের পাথেয়!···তবু···কাঙাল প্রাণ যত পায়—তার পাওয়ার নেশা ততই বেড়ে যায় বুঝি ?

অলক চলে গেলে সবিতা বিছানায় লুটিয়ে পড়ে, অবরুদ্ধ অশ্রু আর বাধা মানে না—

খুব সকালেই অলকের ঘুম ভেঙে যায়, সবিতার ডাকে—

—বাবু! দিদিমণি কি এখানে ?

সে কি ?—

অলক চোখ রগ্‌ড়ে ধড়ফড়িয়ে······চকিত বিস্ময়ে ঝিয়ের মুখের পানে খানিক ফ্যাল্ ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলে—কই, না তো ?—সে কি বাড়ীতে—

—না গো! বাড়ীতে থাক্‌লে কি সাত সকালে ছুটে আসি ?

—বাড়ীতে নেই ?—অ্যাঁ ?—কোথায় গেল তবে······

······অলক খোঁজে···তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজে—কিন্তু সবিতার উদ্দেশ পায় না কোনোখানে। ঝি ঘুমিয়ে পড়বার

পরে সে যে কখন কত রাত্রে উঠে গেছে চুপি চুপি······ কোথায় গেল কা'র কাছেই বা গেল? সংসারে আপন বল্‌তে কেউ তো নেই তার—তবে এই আকস্মিক অনির্দ্দেশ যাত্রার কারণ—

······খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সবিতার বিছানায় পাওয়া যায় খামে আঁটা একখানি চিঠি,—সবিতার লেখা—চোখের জলের ফোঁটা তাতে তখনো শুকোয়নি যেন!—সবিতা লিখেছে—

"······আমি চল্‌লুম,—জান্‌লে তুমি যেতে দিতে না, তাই না বলেই যেতে হ'ল—নিতান্ত অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরের মত···তুমি আমাকে মাপ্‌ ক'রো অলকদা! তোমাকে ব্যথাই দিয়ে গেলুম শুধু······কি করব······এ জীবন আহুতি দিয়েও তোমাকে সুখী করতে পারতুম যদি!······সে আশা তো নেই······তবে তোমার জীবন-পথের কাঁটা হ'য়ে অপরাধের বোঝা কেন আর ভারি করি?

······তুমি না বল্‌লেও আমি সব জেনেছি অলকদা! আমার জন্যে তুমি যে কত······কিন্তু আর না······আমার ভালবাসার এত বড় অপমান আমি পারব না সইতে।··· কাঁটা কখনো ফুল হতে পারে না অলকদা!······তাই তোমার চলার পথ নিষ্কণ্টক ক'রে সরে যাওয়াই উচিত মনে করলুম।

জানি, তুমি আঘাত পাবে কত, কিন্তু যে বেদনা বুকে ব'য়ে আমি চলেছি তার তুলনায়······আঃ! থাক্‌—এই অতি-নিষ্ঠুর অতি-মধুর ব্যথাই আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী এখন······

তুমি বাবার অবাধ্য হ'য়ো না, বিয়ে ক'রো, বিয়ে করে সুখী হ'য়ো ···আমার জন্যে চিন্তা নেই। আজ দিশেহারা হ'য়ে চলেছি বটে, কিন্তু আমার পথ আমি বেছে নিতে পারব এতটা ভরসা মনে রাখি। তবে—যে পথেই যাই··· ···ভুল্‌তে আমি পারব না······ভুল্‌তে অনুরোধ করলেও পারব না তোমাকে কোনো দিন প্রাণ ধ'রে!······

··· তুমি থাক্‌বে আমার চোখের জলে····বুকের ব্যথায়······আমার মনের নিভৃত চিন্তা-স্মৃতি-কল্পনায় অটল হ'য়ে আমরণ········ ..আর তুমিও—তুমিও ভুলে যেও না যেন—

কখনো দিনান্তের অবকাশে, সাঁঝের আঁধারে তোমার 'সবি'কে মনে ক'রে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলো!······ কোনো নিরালা, অলস মুহূর্ত্তে একবারটী চুপি চুপি তেম্‌নি প্রাণ গলানো সুরে ডেকো—সবি! সবি! আমার মনের ছবি! সে ডাক্‌ আমি শুনতে পাব—যেখানেই থাকি······ আজ যাবার বেলায় এই অনুরোধ শুধু করে গেলুম— রাখ্‌বে কি?—এই শেষ······

এবার বিদায় দাও অলকদা! আর সময় নেই। আবার বল্‌ছি—তুমি ক্ষমা করো আমাকে······"

স্তম্ভিত বিমূঢ় অলক চিঠিখানা হাতে নিয়ে বসে থাকে— স্থাণুর মত।······

নিমেষ-হারা নয়নের বিহ্বল বিভ্রান্ত দৃষ্টি তার সাম্‌নে— দূর দিক্‌চক্রবালে মিশে যাওয়া পথের ওপর ছুটে যায়—

······সেই পলাতকার চরণ-চিহ্ন খোঁজে বুঝি?

লাঞ্ছিত নারীত্বের গোপন লজ্জা, বেদনা ও অপমানের বোঝা বহন করে যে নীরবে,—রাতের অন্ধকারে—হয় তো ওই পথ দিয়েই চলে গিয়েছে, চিরদিনের মত, ·····কোথায় কতদূরে সে ভেসে গেছে কে জানে!

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী
শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়



"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"

শ্রীঅনিলবরণ রায়

ভক্ত ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাহা হইলে জগতে কি ভগবানের ইচ্ছা এমনই পূর্ণ হইতেছে না? ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া কি ভক্তের ইচ্ছা বা প্রার্থনার উপর নির্ভর করে?

এই জগতের যদি একজন সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা থাকেন—এবং ভগবান বলিতে আমরা ইহাই বুঝি—তাহা হইলে বলিতেই হয় যে, এ-জগতে ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না, হইতে পারে না। অতএব ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এ-কথার কোন অর্থই থাকে না, কারণ যাহা আপনা হইতেই অব্যর্থ ভাবে হইতেছে বা হইবে, সে-সম্বন্ধে কেহ "হউক" শব্দ প্রয়োগ করে না। অথচ সকল ধর্ম্মেই এইরূপ প্রার্থনা আছে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, Let thy will be done।

বিশেষ করিয়া সংসারে যখন কেহ গুরুতর দুঃখ পায়, শোক পায়, তখনই এইরূপ কথা বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, ভগবান! তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এখানে এইরূপ কথার অর্থ, ভগবদ্ ইচ্ছায় যাহা হইয়াছে সেইটিই অবনত মস্তকে মানিয়া লওয়া। ইহাই ভক্তের লক্ষণ, এবং সংসারের চরম শোক দুঃখে ইহা অপেক্ষা বড় সান্ত্বনা আর কিছুই নাই। শোকার্ত্ত হৃদয়ে মানুষ ভগবানকে ডাকিয়া বলে—

তোমারি ইচ্ছা 'হোক পূর্ণ', করুণাময় স্বামী!
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।

কিন্তু যাঁহাকে করুণাময় বলিতেছি, যাঁহার প্রেম সর্ব্বদা আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে, যাঁহার চরণে আশা রাখিতে হইবে, তিনি আমাদিগকে দুঃখ তাপ দেন কেন? ইহার এক উত্তর হইতেছে—

আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভা সুখ পূর্ণ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা-অনুগামী।

এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মানবজীবনের অনেক দুঃখই মানুষের নিজহাতে গড়া, মানুষ আপনার দোষেই দুঃখ পায়। কিন্তু সব দুঃখ সম্বন্ধেই তাহা বলা চলে কি? আমরা কি প্রত্যহ দেখিতে পাই না নিরীহ, নির্দ্দোষীর উপর সংসারে কত অত্যাচার হইতেছে? পদে পদে মিথ্যা, পাপ, অধর্ম্মই জয়ী হইতেছে? আজ মানুষের যে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, একি তাহার নিজের দোষে? এই সবই ভগবানের ইচ্ছায় ঘটিতেছে বলিয়া আমরা যদি সায় দিই, সহিয়া থাকি, তাহা হইলে নিজেদের মধ্যে কতকটা সান্ত্বনা পাইতে পারি বটে, কিন্তু এই সব দুঃখের কোন প্রতিকারই হয় না। বস্তুতঃ এইরূপ ধর্ম্মভাবের বশে মানুষ যে সংসারের দুঃখকে মানিয়া লয়, এমন কি দুঃখভোগের মধ্যেই একটা রস পায়, আনন্দ পায়, এবং এই ভাবে দুঃখকে চিরস্থায়ী করিয়া তোলে, এই জন্যই আধুনিক সভ্যসমাজ অনেকেই ধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের যে অভিযোগ, Riligion is the opiate of the people, ধর্ম্ম মানুষকে তমোগ্রস্ত করিয়া তোলে, ইহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত জগতে কিছু ঘটিতে পারে না ইহা ঠিক। ভগবান নিজের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জগৎকে এবং মানুষকে এই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাই আজ জগতে এত দুঃখ, শোক, দ্বন্দ্ব, মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সংসারে মানুষ তীব্র দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করুক এইটিই করুণাময়, প্রেমময় আনন্দময় ভগবানের ইচ্ছা, একথাতে কিছুতেই আমাদের মন বুদ্ধি সায় দেয় না।—দুঃখ বিপদে পড়িয়া প্রতিকারের জন্য মানুষ ভগবানের

নিকট কাতর প্রার্থনা জানায়, ভগবান তাঁহাদের সেই প্রার্থনাতে সায় দেন—এইটিই আমাদের ভাল লাগে।

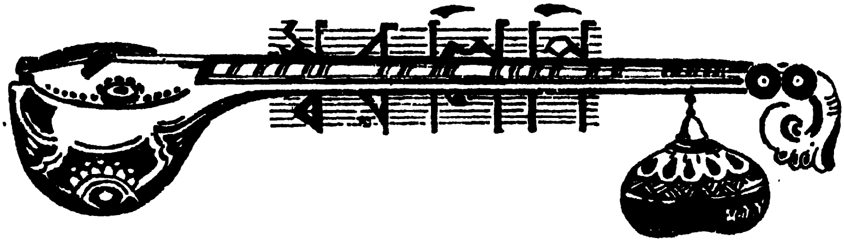
প্রভু বিশ্ববিপদ হন্তা
আসি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা—

ঐকান্তিক ভাবে ভগবানকে এই প্রার্থনা জানাইলে তিনি বিপদভঞ্জন করিয়া দেন, অমঙ্গলের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ান, যে ব্যক্তি কখনও ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়াছে এ বিষয়ে কিছুতেই সে সন্দেহ করিবে না। কিন্তু জগতে দুঃখ কেন? বিপদ কেন? মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে এই প্রশ্ন লইয়া যে আন্দোলন করিয়া আসিতেছে, তাহার সম্যক আলোচনা করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আর বিশ্ব-সৃষ্টির যে নিগূঢ় রহস্য তাহাও মানব বুদ্ধির অতীত—সাধারণভাবে প্রশ্নোত্তরে তাহার মীমাংসা হয় না। যাঁহারা সাধনা বলে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সমস্যার সমাধান পাইয়াছেন। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝা যায়, মানুষ যে দুঃখ কষ্ট পাইতেছে, এটা কখনই ভগবানের অভিপ্রেত হইতে পারে না। মানুষকে সকল দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্ত করিয়া অমৃতত্বের দিকে লইয়া যাওয়াই ভগবানের অভিপ্রায়, এবং সেই অভিপ্রায় যাহাতে জয়যুক্ত হয়, সেই জন্যই আমাদিগকে ঐকান্তিক ভাবে অনবরত প্রার্থনা করিতে হইবে—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ভগবান জগৎকে অন্য ভাবে সৃষ্টি করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ আমরা যে জগতে বাস করিতেছি, এইটিই একমাত্র জগৎ নহে, ভগবানের মধ্যে অসংখ্য জগৎ আছে, সে-সবের মধ্যে অসংখ্যভাবে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে। দুঃখ-লেশ-শূন্য চির-আনন্দময় জগৎও আছে। আমাদের যে জগৎ, অজ্ঞান ও দুঃখ লইয়াই ইহার আরম্ভ হইয়াছে, যেন এই অজ্ঞান ও দুঃখকে জয় করিয়া ইহাকেই এক অভূতপূর্ব্ব পরম আনন্দের উপাদানে পরিণত করিতে পারা যায়। এ-জগতে দুঃখ যন্ত্রণা চরম সীমায় উঠিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; এখন যাহাতে এই দুঃখের শেষ হয়, সকল দুঃখ অমৃতত্বে রূপান্তরিত হয়, এই বিশ্বলীলায় ভগবানের যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য তাহা সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়, আমাদিগকে অহরহ সেই প্রার্থনা করিয়াই বলিতে হইবে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। কারণ ভগবানের সেই ইচ্ছা পূরণে আমরাই বাধা। অজ্ঞানের বশে, আসক্তির বশে আমরা মিথ্যাকে, দুঃখকে মৃত্যুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি, তাই আমাদের মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণভাবে কার্য্য করিতে পারিতেছে না। আমাদের ভিতরের এই বাধা যাহাতে সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়া যায়, সেই জন্যই আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে হইবে, ভগবান! তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ।

আমরা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে পারি, পদে পদে তাঁহার ইচ্ছাকে প্রতিহত করিতে পারি, কারণ আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করিবার জন্য ভগবানই আমাদিগকে সে শক্তি সে স্বাধীনতা দিয়াছেন। আমাদের এই শক্তি ও স্বাধীনতা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করিয়া যখন আমরা তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলে প্রয়োগ করিব, তখনই সকল বাধা দূর হইবে, সকল দুঃখের অবসান হইবে। মানুষ অমৃতত্ব লাভ করিয়া ভগবানের মানবলীলাকে সার্থক করিবে।

শ্রীঅনিলবরণ রায়





সাহানা—ধমার

রঙ্গ রঙ্গ খেলত হোরী
নন্দরাজ ঘর সব দেব আয়ে।
সাত সপ্তক প্রগট সুর গাবে দেব হর
গণপত মধুর মৃদঙ্গ বজায়ে।
সুররাজ চতুরানন অগণিত সখিগণ
সুচঙ্গ নাচত অত আনন্দ পায়ে।
ছোড়ত পিচকারী ভিজ´ গয়ে সারী
গোপেশ সবকো অঙ্গ সাগ বনায়ে॥

সুর ও কথা সঙ্গীতনায়ক—
শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ৩ ১´ ০ ২
রজ্ঞা রা সা । রণ্‌ৃ সা রা পা । মা জ্ঞা -া ০। জ্ঞা মা । রা সা I
র ০ ০ ঙ্গ র ০ ০ ০ ঙ্গ খে ০ ০ ০ ০ ল ত

০ ৩ ১´ ০ ২
রজ্ঞা ণ্‌ৃ সা । রা -া -া -া । মজ্ঞা মা রা । মা -া । পা পা I
হো ০ ০ ০ রী ০ ০ ০ ন ০ ন্দ রা ০ জ

০ ৩ ১´ ০ ২
পমা পা পর্রা । র্সা ণা ধা পা । পধা মা পা । মজ্ঞা -া । -া -া II
ঘ র , স ব দে ০ ব আ ০ ০ ০ য়ে ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
{মা পা পা । ণা ধা । র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা । -াঃ র্সঃ র্সা র্সা I
সা ০ ত স ০ শু ক প্র গ ট ০ ০ সু র

১´ ০ ২ ০ ৩
র্সা -া র্সা । র্রা -া । র্রা -া । মর্জ্জা -া -া । র্জ্জা র্মা র্রা র্সা} I
গা ০ ০ বে ০ দে ০ ব ০ ০ ০ ০ হ র

১ ০ ২ ০ ৩
ণা র্সা -া । র্রা -া । র্সা -া । ণা পা -া । মা পা ণা ধা I
ম ধু ০ র ০ মৃ ০ দ ঙ্গ ০ গ ণ প ত

১ ০ ২
পা মা পা । মজ্জা -া । -া -া II
ব জা ০ য়ে ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
পা মজ্জা -া । জ্জা মা । রা -া । মা মা পা । -া -া পা পা I
সু র ০ রা ০ জ ০ চ তু রা ০ ০ ন ন

১´ ০ ২ ০ ৩
মা পা -া । ধা ণা । পা পা । মা পা মা । ণা পা মজ্জা -া I
অ গ ০ নি ত স খি ০ ০ ০ ০ গ ণ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
জ্জা জ্জা মা । রা া । সা -া । সরা ণ্‌া -া । সা -া রা রা I
সু ০ ০ চ ০ ন্দ ০ না ০ ০ ০ ০ চ ত

১´ ০ ২ ০ ৩
রা পা -া । মা পধা । মা পা । মা জ্জা -া । জ্জমা রা -া সা II
অ ন্ত ০ আ ০ ০ ঃ ০ ন ন্দ ০ পা ০ ০ ০ য়ে

১ ০ ২ ০ ৩
মা পা -া । ণা ধা । র্সা -া । র্সা র্সা -া । র্সা -া র্সা -া I
ছো • • ড় • ত • পি চ • কা • রী

১ ০ ২ ০ ৩
র্সণা -া র্সা । র্রা -া । র্রা -া । মর্জ্ঞা -াঃ র্মঃ । র্রা -া র্সা -া } I
ভি • • জ • গ • রে • • সা • রী •

১ ০ ২ ০ ৩
ণা র্সা -া । ণা ধা । ণা পা । ধা মা পা । পর্সা -া ণা পা I
গো পে • শ • স ব কো অ ঙ্গ লা • ল ব

১ ০ ২
পধা মা পা । মজ্ঞা -া । -া -া II
না • • ও রে • • •

বাঁট।

১ ০ ২ ০
১। ণ্সা রপা । মজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা জ্ঞমা । রঃ মা মঃ । পা পা । মপা র্রর্সা ণপা I
র ঙ্গ র ঙ্গ খে ল ত হো • রী ন ন্দ রা জ ঘ র স ব দে ব

৩ ১ ০ ২
মপা মজ্ঞা রসা রপা I মা জ্ঞা -া । জ্ঞা মা । রা সা II
আ • রে র ঙ্গ র ঙ্গ "খে • • • • ল ত"

১ ০ ২ ০ ৩
২। র্রর্রা র্সর্সা ণধা । ণধা পমা । পণা ধণা । পধা মঃ পা পঃ । মপা মজ্ঞা রসা রপা I
র ঙ্গ র ঙ্গ খে ল ত হো রী ন ন্দ রা জ ঘ র স ব দে ব আ • রে "র ঙ্গ র ঙ্গ"

এক বাদলা সন্ধ্যায়

শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী

ক্লাবঘরের ছোট্ট ঘড়িটা ক্রিং ক্রিং করে জানিয়ে দিলে রাত দশটা, বাড়ী ফিরতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা 'রাবার' হওয়ায় খেলাটাও বন্ধ করা গেল। কিন্তু শ্রাবণ রজনীর সেই বিরামহীন বর্ষণে বেরুনো সাধ্য ছিল না। কে একজন নূতন খেলা সুরু করবার প্রস্তাব করলেন কিন্তু আমাদের একাগ্রতা ও অসীম ধৈর্য্যের কথা মনে হতেই আমি বল্লুম, "থাক্, আরম্ভ করলে ত আর শেষ না করে কেউ উঠবে না; তার চাইতে একটা গল্প হোক।" ক্লাবের সর্ব্বাপেক্ষা জোয়ান সভ্য জ্ঞানদা বাইরের আবছা' অন্ধকারের দিকে চোখ বুলিয়ে চেয়ারখানা আমার পাশে আরো একটু টেনে এনে চাপাসুরে বল্লেন, "ভূতের গল্প নয় কিন্তু।" সুরেন সেন হেসে বল্লে, "আচ্ছা তাই হবে, বাহাদুরীর গল্পও বহুৎ হয়ে গেছে। আজ জীবনে কে কেমন অপ্রস্তুত হয়েছ তারই একখানা হোক।"

ভায়া এমন জায়গায় আঘাত করলে যে সকলেই ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। অগত্যা আমিই সুরু করলুম।

১

বি, এস, সি দেবার বছর জ্বরে আমাকে খুবই কাবু করে ফেলে,—এত বেশী যে হাওয়া বদল করা নেহাৎ দরকার হয়ে পড়ে। ডাক্তারের দল নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে স্বাস্থ্যকর স্থানের যে লিষ্ট দিলেন তার মধ্যে বেশী ভোট পেল 'শিলং'। ও সহরখানা এর আগে আর দেখাও হয়নি, কলকাতা বসেও কলেজ কামাই হচ্ছিল, তাই আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়া গেল।

যাবার দিন সকাল থেকে এমনি বৃষ্টি পড়ায় কলকাতার রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়েছে। চারগুণ দাম দিয়ে রিকসা চড়ে পথচারিদের হিংসা ও বিদ্রূপ কুড়ুতে কুড়ুতে শিয়ালদা' এসে গাড়ীতে চাপা গেল।

এ দুর্দ্দিনে সহজে কেউ বেরোয় না। মধ্যশ্রেণীর কামরায় আমিই একমাত্র যাত্রী। নিঃসঙ্গ বাদলা দিনে গাড়ীর ঝাঁকানিতে মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসছিল বেশ। এমনি একটা ঘুমের ঝোঁক কেটে গেল কোন এক ষ্টেশনে এসে। দেখলুম আমার গাড়ীতে সুটকেশ, বেডিং ও একটী কিশোরীকে নিয়ে একজন যুবক উঠেছেন। জিনিষ-গুলির উপর একবার চোখ বুলিয়ে "আমার ওয়াটার প্রুফ,—যাঃ বুঝি ষ্টেশনেই রইল" বলে নেমে যুবকটী যাত্রীঘরের দিকে ছুটলেন। উনি ফিরে আসবার আগেই গাড়ীখানা দুলে উঠল। পেছনের একটা কামরায় উঠতে যাবেন কে একজন খপ করে হাতখানা ধরে আটকে দিলে।

গাম্ভীর্য্যের বালাই আমার আজও নেই, তখনও ছিল না। কিন্তু তখন যে হাস্যলহরী না তোলাই শোভন হ'ত সে কথা বুঝলুম ঐ বেণী দোলানো চসমা চোখে মেয়েটীর ম্লান অথচ কঠোর দৃষ্টিপাতে। সে চাউনির সামনে লজ্জায় আমি এতটুকু হয়ে গেলুম। মনে পড়ল এখন আমাকেই ওর অভিভাবক হ'তে হবে। একটুখানি এগিয়ে এসে কোন রকম ভূমিকা না করেই বল্লুম, "দেখুন, ঐ ভদ্রলোকটী—" ঈষৎ আনত মুখে মেয়েটী বল্লে, "আমার দাদা।" "হ্যাঁ পরের ষ্টেশনে একটা তার করে দি' আর কোথায় যাচ্ছেন জানতে পারলে—" মেয়েটী তেমনি ভাবেই জবাব দিলে,"আমরা শিলং যাচ্ছিলুম।" আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে বললুম, "বটে, আমিও যে শিলং যাচ্ছি।" এবার মেয়েটীর সঙ্কোচ হঠাৎ টুটে গেল। মুখ তুলে সহজভাবেই বল্লে, "আমাদের বাড়ী লাবানে।" আমি তার সারল্যে মুগ্ধ হোয়ে বল্লুম, "আমি কিন্তু কখনো শিলং যাইনি।" বলে

আমার পরিচয় ও যাওয়ার উদ্দেশ্য তাকে বল্লুম। দাদাটির নাম জেনে নিয়ে পরের ষ্টেশনে নামতেই সুপ্রিয়ার নামে একটা তার পাওয়া গেল। আমিও ওর দাদাকে একখানা তার করে সব জানালুম। এবার এদের সব খবর নেওয়া গেল। সুপ্রিয়া সেবার ম্যাট্রিক পাশ করে বেথুনে ভর্ত্তি হয়েছে, তার দাদা সিটি থেকে বি, এ দিবেন। সরকারী হিসাব বিভাগে তার বাবা কি একটা কাজ করতেন, শরীর ভাল থাকে না বলে চাকরী ছাড়ার পর থেকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; শিলং-এর জল হাওয়া পছন্দ হওয়ায় ওখানেই আছেন। মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে দুজনে রাজসাহী এসেছিল, বন্ধের আর দিন কয়েক মাত্র বাকী তাই কলকাতা ফিরে না গিয়ে শিলংই যাচ্ছে।

সান্তাহারে গাড়ী বদল করে সুপ্রিয়াকে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে বলে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়লুম।

২

পাণ্ডু থেকে শিলং-এর পথ—প্রকৃতির মুক্ত লীলা-নিকেতন। দূরে ও নিকটে পাহাড় শ্রেণী; কোনও পাহাড় শরতের নির্ম্মেঘ আকাশের চেয়েও গাঢ়তর নীলিমায় আচ্ছন্ন, কোনটা সজীবতার সবুজ মূর্ত্তি, উদ্ভিদবিহীন কৃষ্ণ প্রস্তর-স্তূপেরও অভাব নেই। মাঝে মাঝে ছোট ছোট শ্যামল প্রান্তরও দেখা যেতে লাগল। দূরে দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে আসা ঝর্ণার জল বিরাটবপু কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণের অঙ্গে শুভ্র যজ্ঞোপবীতের মতই শোভা পাচ্ছিল। সুপ্রিয়া বার বার বলছিল, "দেখুন কী সুন্দর। বাঃ বাঃ।" এ আকাশের সঙ্গে কলিকাতার ধূমমলিন আকাশের তুলনাই হয় না—কেমন যেন বেশী বেশী নীল। সুদূরের পিয়াসী চঞ্চল আঁখিকে শাসিয়ে রাখবার জন্ম সৌধশ্রেণীর শাসন এখানে নেই, এক-ঘেয়ে ইট পাটকেলের পরিবর্ত্তে প্রকৃতির নব নব বৈচিত্র্যে মনটা এক অজানা খুসীতে ভরে উঠছিল।

চম্বক ভাঙল কপোলের উপর কোমল মাংসের স্পর্শে। পাহাড়ের মোড় ঘুরতে হঠাৎ সুপ্রিয়া আমার উপর এসে পড়েছিল। মুহূর্ত্তে সামলে নিয়ে বল্লে, "মাগো, কি বিশ্রী পথ।" একটু আগে যে এ পথেরই অজস্র প্রশংসাবাদ তার মুখে ধরছিল না সে যেন একটা বিরাট মিথ্যা।

দূর দিগন্তে আকাশের নীলিমার মাঝে সূর্য্যের লোহিতচ্ছটা বেশী করেই লাল দেখাচ্ছিল, তারই একটা রশ্মি এসে সাড়ীর লাল পাড়ে পড়ে সুপ্রিয়ার সুগৌর মুখে যেন সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়ে গেল। ক্ষণিক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে একটু সরে বসলুম।

মোটর ষ্টেশনে পৌঁছেই সুপ্রিয়া বল্লে, "এই যে বাবা"। কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমি যে আমার যা করা উচিত ছিল তাই করেছি, তা থেকে একটা চুলও বেশী করিনি, পনেরো মিনিট বক্তৃতা করে তাই বুঝিয়ে দিলেন। বিনয় দেখিয়ে বাহাদুরী নেবার সুযোগ না পেয়ে মনটা বুড়োর উপর বেজায় চটে রইল।

হিলটপ হোটেলে যাবার জন্ম একখানা ট্যাক্সিতে আমায় তুলে দিয়ে তাদের বাড়ীতে যাবার জন্ম নিমন্ত্রণ করে ভদ্রলোক মেয়েকে নিয়ে অন্ম এক ট্যাক্সিতে চলে গেলেন। সুপ্রিয়া মুখ বাড়িয়ে কি বল্লে মোটরের ধোঁয়া ও ঘস্‌ঘসের মাঝে হারিয়ে গেল।

৩

পরের দিন সকালবেলা। সুপ্রিয়াদের বাড়ীতে যাবার জন্ম উৎসুক মনকে সংযত করে বৌদি'র কাছে এ রহস্য-ভরা ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে বসেছি এমন সময় সুপ্রিয়ার বাবা অক্ষয়বাবু এসে তাঁ'দের বাড়ী নিয়ে গেলেন। চা পান করতে করতে গল্প চলতে লাগল। পরিচয়-প্রশ্নের উত্তরে বল্লাম, "দাদা সেক্রেটারিয়েটে বড় চাকুরী করেন—এবার বি-এস সি দেব—পাশ করতে পারলে বেলজিয়মে কাচ তৈরী করা শিখতে যাব—দেশে এসে তারই ব্যবসা কোরব—"

স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ না করলে বর্ত্তমান জগতে যে বাঙালীজাতি আর বেশীদিন টিকতে পারবে না এ-সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ও ইতিহাসের নজিরে ভরা এক ওজস্বিনী বক্তৃতা অক্ষয়বাবু সুরু করে দিলেন। মাঝে মাঝে টেবিলে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতও পড়তে লাগল। আমি "আজ্ঞে হাঁ"

"নিশ্চয়ই ত" "খুবই সত্যি" ইত্যাদি বলে তাল রাখতে লাগলুম। মুচকি হেসে সুপ্রিয়া বল্লে, "দেখছেন কি অমূল্যবাবু, দিন দুই সবুর করুন, বাবার বক্তৃতার জ্বালায় অস্থির হোয়ে উঠবেন এখন।"

কথাটা যে একটুও বাড়িয়ে বলা নয় দু'দিনেই তা' বুঝতে পেরেছিলুম।

বিকেল বেলা চা'এর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, আরো খানিক গল্প-গুজব করে বাড়ী ফিরে এসে বৌদি'র চিঠিখানি শেষ করে পাঠিয়ে দিলুম।

৪

দীর্ঘ রাস্তা ভ্রমণের ক্লান্তিতেই বোধ করি সেদিন বিকালের দিকে একটু জ্বরভাব বোধ হ'ল। চা'এর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেও পারিনি কোনও খবরও দেওয়া হয়নি। পরদিন সকাল বেলা বসে এ সব কথাই ভাবছিলুম। রূপ লাবণ্যে 'অলৌকিক' না হলেও কি সরল সপ্রতিভ এই মেয়েটী। সেদিন গাড়ীতে খুব কম বাঙ্গালী মেয়েই এত সহজে নিঃসঙ্কোচে একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে এ-ভাবে মিশতে পারত। তার কথাবার্ত্তায় কেমন একটা সহজ সংযত ভাব, কৃষ্ণায়ত চোখের চপল দৃষ্টি কী উজ্জ্বল সুষমা-মণ্ডিত। এই সুপ্রিয়াকে যদি—

"বাবু"। ফিরে দেখি অক্ষয়বাবুর চাকর, হাতে একখানি খাম, সুপ্রিয়ার চিঠি। কাল সন্ধ্যায় অনিলবাবু এসেছেন। কাল যাইনি বলে অনুযোগ করে লিখেছে, "এ আপনার বড় অকৃতজ্ঞতা, সেধে লোকের উপকার করেন, পরে নিমন্ত্রণ করলেও আসবেন না। একবার এক্ষুণি আসবেন, অনেক মজার খবর আছে। সুপ্রিয়া।"

অক্ষয়বাবুর উপর মনটা হঠাৎ চটে উঠল। মেয়ের এমনি নাম রেখেছেন, বিশ্বশুদ্ধ 'প্রিয়া' বলে ডাকবে!

চিঠিখানি সযত্নে বাক্সে লুকিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়লুম।

ঘরে ঢুকেই দেখি খোলা 'কাগজ' পাশে, চশমা হাতে অক্ষয়বাবু কি বক্তৃতা দিচ্ছেন। আমাকে "এস বাবা, বোস" বলেই—আজ কালকার যুবকেরা যে তাঁদের সময়কার যুবকদের তুলনায় কত অসাবধান তাই সদৃষ্টান্ত বুঝিয়ে চল্লেন। আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে সুপ্রিয়ার দিকে চাইতেই সরল হাস্যে বল্লে, "জানেন না বুঝি, দাদার সেই সাধের বর্ষাতিখানা গাড়ীতেই হারিয়ে গেছে। এই মজার খবর আপনাকে দেবার জন্য কাল থেকেই ছট্‌ফট্ করে মরছি।" এরপর না হেসে থাকা আমার অসাধ্য, অক্ষয়বাবুও হয়ত অসতর্কে হেসে ফেলেছিলেন। "এই যে আপনি এসেছেন" বলে নমস্কার করে অনিলবাবুও ঘরে ঢুকলেন। আরো খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করে বেরিয়ে পড়া গেল।

আমার যাওয়াতে সুপ্রিয়াকে আনন্দিতই মনে হোল, আবার জ্বর ছাড়া মাত্রই বেরিয়ে পড়ার জন্য মৃদু তিরস্কার করতেও ছাড়লে না। আশ্চর্য্য নারীর চরিত্র।

৫

আশ্চর্য্য শিলংএর হাওয়ার গুণ—শরীর ক্রমেই সেরে উঠতে লাগল। কিছুটা হয়ত হোটেলে না খাওয়ার গুণেও। ম্যানেজার বাবুর চার্জ্জ পুরোপুরি দিলেও মাসের অর্দ্ধেক দিন খাওয়া হয়েছে অক্ষয়বাবুর বাড়ীতেই। নিমন্ত্রণটা বাড়ীর সকলেই ভাগাভাগি করে করতেন। সুপ্রিয়ার মা আমাদের গল্প-গুজবে তেমন যোগ দিতেন না কিন্তু অসুখের জন্য হাওয়া বদ্‌লাতে এসেছি, বিশেষ আমার মা নেই জেনে অবধি তাঁর নিমন্ত্রণই হোত সব চেয়ে বেশী এবং এড়ানো হ'ত সব চেয়ে কঠিন।

চিঠির এবং শোবার ঠিকানা হিলটপ হোটেল হ'লেও দিনের বেশী ভাগই কাটত বাইরে। অনিলবাবু ও সুপ্রিয়াকে নিয়ে সারা সহরটা ঘুরে বেড়ানোই ছিল একমাত্র কাজ।

দক্ষিণের ক্রমোন্নত 'সরল'শ্রী মণ্ডিত পাহাড় শ্রেণী, শিলং সহরের ব্যারোমিটার লাবান পিক্, সুন্দরীর অঙ্গঘেরা সবুজ শাড়ীর লাল পাড়ের মত পাহাড়ের কোলে থাকে থাকে সাজানো রক্তিম রাজপথ, বায়স্কোপের ছবির মত 'লঙ্ রাউণ্ডে' চলন্ত মোটর শ্রেণী, একটুখানি ঝরণা থেকে ধরে নেওয়া জলের জোরে বিদ্যুৎ চালাবার কারখানা, কর্ম্মিষ্ঠা স্বচ্ছন্দচারিণী পাহাড়ী মেয়ে—সকলের মাঝেই নূতনত্বের একটা আভাষ, কবিত্বের একটা ইঙ্গিত উঁকি ঝুঁকি মারছে। পাহাড়ের কোলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৈদ্যুতিক

আলোকলহরী দেখে মনে হোত—ধরণীর কোলের কাছে একখানা ছোট্ট আকাশে সন্ধ্যার তারা ফুটে উঠেছে ; চুমকি ছাওয়া নীল শাড়ীর পরিকল্পনা বুঝি এরি কাছ থেকে ধার নেওয়া।

'হোল্ডারের বাগানে'র "পাতায় ঘেরা শীতল ছায়" আঁধার সন্ধ্যায় সুপ্রিয়ার তরুণ কণ্ঠের গুঞ্জরণ 'ওমরখৈয়ামের' লাইনগুলি শুধু মনে করিয়ে দিত।

চেরাপুঞ্জি বেড়ানোর দিনের স্মৃতি আজও মনে পড়ে। রাস্তার দু'পাশে উচ্চতা ও গভীরতার পাহাড় ও খাদের প্রতিযোগিতা, ক্ষণে ক্ষণে সামনে ও দু'পাশে মেঘের প্রাচীর, মুসমাই প্রপাতের পদতলে বারিচূর্ণের জাল এবং পথের পাশে পাথর থেকে রস আহরণ করে বেঁচে থাকার কচু গাছের রসিকতার পরিমাণ—সুপ্রিয়া দেখিয়ে না দিলে কোনটাই এমন মূর্ত্ত হ'য়ে চোখে ঠেকত না।

দুমাসে স্বাস্থ্যের ভাল উন্নতি হয়ে গেল। যাবার দিন ঠিক করে লিখা দাদার চিঠি আনন্দের একটানা স্রোতে বাধা দিল।

এক নিভৃত সন্ধ্যায় কুমড়োফালি চাঁদের ঝাপসা আলোয় ক্যাক্টেরেসের এক গাছের তলায় সুপ্রিয়ার কাছ থেকে চোখের ভাষায় আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে যা পেয়েছিলুম তাই পুঁজি করে কলিকাতায় পাড়ি মারলুম।

৬

কলেজ খোলার তখনও দিন কয়েক বাকী। একদিন বিকালের চা নিয়ে স্বয়ং বৌদি' এসে হাজির। ধীরে সুস্থে বসে বৌদি' বললেন "তোমার কাছে একটি অনুরোধ আছে ভাই, লক্ষীটি না করোনা যেন। অক্ষয়বাবু লিখেছেন সুপ্রিয়াকে যদি আমাদের বাড়ী রেখে পড়াতে পারা যায় তা'হলে তার বড় সুবিধা হয়। তোমার দাদা মত দেবার আগে তোমাকেও একবার জিজ্ঞেস করতে চান। বাড়ীত তার একার নয় কিনা।"

বৌদির ছিল হাসির ব্যামো। এরকম গুরু বিষয়ে কথা কয়টি বলে না হেসে থাকতে পারলেন না। বৌদি' ঘটকালির দাবী করলে তাঁকে কি দিলে যে ঠিক মনের মত হয় হঠাৎ খুঁজে না পেয়ে বলে বসলুম "এ জীবনটাই বৌদি', তোমার পায়ে বিকিয়ে দিলুম। "ধ্যেৎ" বলে বৌদি' উঠে চলে গেলেন। দাদা বুঝি আফিস থেকে এসেছিলেন। তার চার দিন পরে দুপুর বেলায় ঘুম ভাঙিয়ে বৌদি' একখানা চিঠি দিয়ে গেলেন। সব জেনে অক্ষয়বাবু লিখেছেন তিনি আমাদের নিকট আত্মীয়। আমার দাদা-মশায় ও তাঁর বাবা মাসতুতো ভাই। কাজেই এখানে—

* * * *

"ষ্টুপিড্, কলেজে পড়বার সময় তোর বৌদি' এল কোত্থেকেরে" শুনে পেছনে চেয়ে দেখি ছেলেবেলার বন্ধু নীরেন। দাবার কিস্তি থেকে কখন উঠে এসে জুটেছে জানলে এ গল্প ফাঁদতুম না।

বিষ্টি ততক্ষণ ধরে এসেছে। মেঘের আস্তরণ ভেদ করে বেরোবার জন্যে চাঁদের আলোর আকুলতা জানালা বেয়ে চোখে পড়ল। জুতো পরতে পরতে বল্লুম "তখন ছিল না সত্যি, কিন্তু এরকম এক বাদলা সন্ধ্যার জন্য একজন গড়িয়ে নিলে লাভ বৈ ক্ষতি ত নেই।"

শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী

অস্কারের বন্দী-জীবন *

অনুবাদক—শ্রীনীহাররঞ্জন ঘোষাল

—And with blood he cleansed the hand,
The hand that held the steel :
For only blood can wipe out blood,
And only tears can heal :
And the crimson stain that was of cain
Became Christ's snow-white seal.—
(Ballad of Reading Gaol)

এক

শেষ পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষ সবাই দেখতে পেলো অস্কার জেলে গেছে। কোন প্রতিবাদ নেই, কিছু বিক্ষোভ নেই, নিতান্তই পরাজিতের মতো সে আজকে বন্দী-জীবনের দীনতাকে অসীম আগ্রহে স্বীকার করে নিয়েছে। জেলের নোংরা খাদ্য, বিষাক্ত হাওয়া কিংবা সর্ব্বগ্রাসী পঙ্কিলতার জন্য অস্কারের কি কিছুই উদ্বেগ নেই ? সমস্ত দেহটার জন্য তার যে চার হাত জায়গার বন্দোবস্ত হ'লো, তাই নিয়ে অভিযোগ করা কিছুতেই চলবে না। অপরিসর ক্ষুদ্র কক্ষে, স্তিমিত আলোর নীচে, তার দৈহিক বন্দীত্বই শুধু তীব্র হ'য়ে উঠলো না, সঙ্গে সঙ্গে মানসিক মুক্তির অবিচ্ছেদ কামনা, সেও তো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে পড়লো! তবু অস্কারের এই অগ্নি পরীক্ষা। দু'টো বছরের প্রতিটি দিন তাকে থাকতে হবে নিরুত্তর মৌন মুখে, ভবিষ্যতের ক্ষীণ শব্দ-সঙ্গীতের জন্য। এই দু'বছরের কারাবাসকে অস্কার কি ভাবে গ্রহণ করবে ? তার প্রতিভা কি কারাপ্রাচীর গ্রাস ক'রে ফেল্‌বে ? তার প্রতিভাকে কি ব্যর্থ কৌতুহলে কারাকক্ষের প্রতি পদক্ষেপে যাবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ? তার যদি বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে 'The Picture of Dorian Gray'-র পৃষ্ঠা দিয়ে কারাকক্ষকে সজ্জিত করাই ভাল ; প্রতি পদক্ষেপে তার স্মরণ হবে যে 'Inferno'-তে বাস ক'রেও সে দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডকে জয় ক'রে নিয়েছে। তবু শেষ পর্য্যন্ত তার জয় না পরাজয় ?—

জয়ের নেশায় মানুষ যাবে এগিয়ে, তারা প্রস্তুত হবে বৃহত্তর যুদ্ধের জন্যে ; প্রতিটি জয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা উঠবে অধিকতর উচ্চভূমিতে, পথে জ্বলতে থাকবে দুঃখের আগুন। সত্যিই জয়ের এই ত একমাত্র পুরস্কার ; বিজয়ীকে দেখিয়ে দেবে কতো দূর দূরান্তের যুদ্ধক্ষেত্র— সমাধির প্রান্তে এসে তার হ'বে বিশ্রাম। কিন্তু পরাজিতের ?—

শান্তির তিক্ততায় মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় কি-ই-বা আছে! শান্তির হলাহলে আকণ্ঠ ভরে উঠলো, কিন্তু মানুষ ত নীলকণ্ঠ নয়। এই দু'বছরের ঘৃণায় লজ্জায় অস্কারের আকণ্ঠ পূর্ণ হ'য়ে উঠবে, কিন্তু নীলকণ্ঠ সে হ'তে পারবে

পরিচয়—* Frank Harris ছিলেন Oscar Wilde-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু। Oscar-এর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার সমস্ত জীবনের বিশদ বিবরণ লইয়া Oscar Wilde—Life and Confession বইখানি রচনা করিয়াছেন। ইহতে Lord Alfred Douglas-এর সম্পূর্ণ confession আছে। OscarWilde সম্বন্ধে ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

আমি সেই গ্রন্থ হইতে তাঁহার বন্দী-জীবনের ঘটনাগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছি। Oscar Wilde-এর মতো একটি প্রতিভার কি রূপে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার বিবরণ ইহাতে আছে।

Frank Harris ছিলেন The Saturday Review"-র সম্পাদক। লেখক

কি ? দুঃখের আগুনে পুড়ে সে কি সত্যিকারের সোনা হয়ে বেরুবে ?

এখানে কেউ তাকে অনুগ্রহ দেখাবে না। সভ্যতার জয়-ভেরী এখানে উন্মাদের প্রলাপ। ক্ষমার পাঞ্চজন্য এখানকার কোলাহলে স্তব্ধ হ'য়ে আছে। মানুষ চলেছে মৌনমুখে নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে। বিচারক তাঁর আইন তুলে ধরছেন আর বলছেন, এই হলো সভ্যতার সংক্ষিপ্ত সার। এবং সবাইকে তাই শিখতে হয়। অস্কারও হয়তো তাহ'লে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কারাকক্ষকে ক'রে তুলবে পবিত্র আশ্রম। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে তাই সে একবার হয়তো প্রকৃতি-দেবীকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবে। আর রজনীর স্তব্ধ মুহূর্ত্তগুলোকে, শয়ন-অবসরে ক'রে তুলবে নিতান্তই আনন্দমুখর, পাশে থাকবে স্বপ্ন-সঙ্গিনী। কারণ অস্কার বন্দী হলেও আর্টিষ্ট।

দুই

কয়েক মাস ধরে অস্কারের কোন খবর পাওয়া গেল না। তবে সে যখন আর্টিষ্ট, কবি ও সাহিত্যিক, তখন আমরা ভাবতে লাগলুম যে কারা প্রাচীরের সঙ্গে তার হবে সখ্যতা। নিজেকে মিশিয়ে দেবে প্রতিদিনকার সুখ দুঃখের সঙ্গে। ইংলণ্ডের প্রায় সবাই অস্কারের নাম শুনবা মাত্রই ঘৃণায় ও লজ্জায় নত হ'য়ে পড়ে। ইংরেজ প্রতিভার নিপীড়নে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। কিন্তু আমরা অস্কারের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনায় জেল-কক্ষকে মনে মনে নমস্কার জানাই।

এই সম্পর্কে আমার একটা ঘটনা মনে আছে। যেদিন অস্কারের জেল হয়ে গেল, তার পরদিন লণ্ডনের প্রায় চল্লিশজন স্বনামধন্য ব্যক্তি অস্কারের শাস্তিকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিলেন। বিধ্বস্ত ঝড়ের রাত্রিতে কাপালিকের হোমের আগুন জ্বলে উঠলো—মানুষের জীবন দিয়ে কাপালিকের সিদ্ধির পথ হলো তৈরি। সত্যি প্রতিভার শ্মশান-ভূমিতে একটা মাত্র নৈশ-ভোজ সবাই অসীম তৃপ্তিতে গ্রহণ করে গেল।

শুধু কি তাই ? অনেকে সে বিচারকের উপরে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। তাঁর আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেখে Miss Madeleine Stanley না হেসে আর থাকতে পারলেন না। কারণ এত বড় অপরাধের জন্য পৃথিবীর কোন মূর্খ বিচারকও চার বছরের কম শাস্তি না দিয়ে থাকতে পারতেন না। বাস্তবিক, ইংরেজ-আদালতে ইংরেজ বিচারকের কী মূর্খতাই না প্রকাশ পেল!

আমি Miss Stanleyকে বল্লাম: হ্যাঁ, খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হবার পর—Jerusalem-এ ঠিক এম্নি ধরণের আলোচনাই চল্‌তো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি ত অস্কারের বন্ধু ?

"শুধু বন্ধু নয়, তাঁর প্রতিভায় আমার অসীম শ্রদ্ধা আছে।"

ডান পাশের চেয়ার থেকে Lady Dorothy Nevile বল্লেন: সত্যি ? আমিও তাঁর একজন ভক্ত। তাঁর প্রতিভায় আমারও আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে।

বল্লাম: তা হলে অস্কারের মুক্তির পরদিন আমাদের নিশ্চয়ই নৈশ-ভোজে নেমন্তন্ন করছেন ?

Lady Dorothy অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে প্লেট থেকে একগুচ্ছ আঙ্গুর তুলে নিলেন।

* * * * *

এর মধ্যেই শোনা গেল অস্কারের শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। আমি একমাস ইংলণ্ডে ছিলুম না। কারণ বুয়ার যুদ্ধের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় আমায় যেতে হয়েছিল, Saturday Review-র সাংবাদিক হয়ে। তারপর ফিরে আসতেই অনেকে আমায় অস্কারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু বিশেষ কিছু উত্তর দিতে পারিনি। শেষে একদিন উদ্বিগ্ন হয়েই আমি জেল-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালুম, অস্কারের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা ক'রে।

আবেদন মঞ্জুর হলো। জেল-কর্ত্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী Sir Riggles Brise আমায় বল্লেন: বাস্তবিক জেল্ কি অস্কারের প্রতিভা বিকাশের প্রশস্ত জায়গা ? ইংরেজী সাহিত্যের যে এতে কত ক্ষতি হবে, সে কথা আমি ইংরেজী সাহিত্য না পড়েই বলতে পারি।



বিচিত্রা
পৌষ, ১৩৩৪

হিমাচ্ছন্ন

শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ঠিক এমি সময় Sir Riggles কি এক নিয়ম ভঙ্গ করবার জন্ম একজন কয়েদীর শাস্তি বিধান করছিলেন। কিছুপরে রাস্তায় বেরিয়ে মনে মনে ভাবলুম হয়তো অস্কারের জন্মই এই শাস্তির বিধান হলো। কি আর করবেন, ইংরেজ জাতি যে আইনকে খৃষ্টের বাণীর চাইতেও সত্যি ব'লে মানে। কি জানি Sir Riggles হয়তো একজন আর্টিষ্টের একটু ভুল ত্রুটিকে ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারেন নি।

*

* *

প্রায় পনরো মিনিট পর আমায় একটা নির্জ্জন কক্ষে আনা হলো। সেদিন প্রথম আমি প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝলুম, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের প্রকৃত অর্থ। উঃ! সে কি ভীষণ অন্ধকার, শ্মশানপুরীর ভয়াবহ চেহারা! দেখলুম সে দৃশ্যের সঙ্গে অস্কারের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য। নয়ন-পল্লবে জমে উঠেছে আষাঢ়ের মেঘ আর পায়ে চলার সঙ্গে বিজড়িত অসম্ভব আলস্য।

জিজ্ঞাসা করলুম: অস্কার, একদিনে তুমি এমন হ'য়ে গেছ?

"হাঁ—এটাত আর সুইজারল্যাণ্ডের স্বাস্থ্য-নিবাস নয়, কিংবা Palais de Royale—সত্যি ভাই ফ্রাঙ্ক, তোমাকে দেখে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে, সে আর বলবার নয়। ফ্রাঙ্ক তুমি আমায় ভুলে যাওনি?"

"না না অস্কার ভুলে যাই নি। কিন্তু তাড়াতাড়ি আমায় বলো, তোমার কি কি অভাব অভিযোগ আছে, হয়তো কিছু উপকার করতে পারবো।—"

অস্কারের মুখে একটু মুমূর্ষুর হাসি ভেসে উঠ্লো। অস্কার বল্লো: ফ্রাঙ্ক তুমি ত কোনদিন ভূত প্রেত বিশ্বেস করোনি, আমিও না। কিন্তু প্রথম যেদিন 'সেল্'-এর মধ্যে এসে উপস্থিত হলুম, সেদিন ঠিক মনে ভেবেছিলুম যে শেষ পর্য্যন্ত আমায় ভূতের হাতেই জীবন দিতে হবে, কারণ, 'The Picture of Dorian Gray-তে আমি ত আর ব্রিটিশ জেলের বর্ণনা দিতে পারিনি। উঃ! এমি নিঃসঙ্গতার মধ্যে অত অসচ্ছলতা, খাদ্য দ্রব্যের এত দারিদ্র্য, আমি কোনদিন কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারিনি। Dante-র মতো আমিও মনে করতুম যে আমার প্রতিটি মুহূর্ত্ত 'Inferno'র মধ্যেই কাটছে। Dante কিন্তু ব্রিটিশ জেলের মতো কোনো 'Inferno'-ই কল্পনা করতে পারেন নি।

তারপর দেখলুম মাথা নীচু ক'রে কাঁদতে আরম্ভ করেছে অস্কার। মনে পড়লো Dublin, Oxford-এ শৈশবের দিনগুলো শিক্ষকদের সর্ব্ববিধ প্রশংসার মধ্যে যে কাটিয়েছে, তার ভাগ্যে এত বিড়ম্বনাও ছিল! তার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠায় যারা অশেষ স্তুতি করেছে, তারা কি কখনো ভেবেছে যে Salome-এর রচয়িতা নির্জ্জন কারাকক্ষে বসে এমি ক'রে কাঁদবে?—

অস্কার বলে চলে: ফ্রাঙ্ক, জানো একদিন সকালবেলা কিছুতেই বিছানা থেকে উঠ্তে পারছিলুম না। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিল। সমস্ত শরীর যেন অবশ মনে হচ্ছিল। বুঝলুম ভয়ানক কিছু একটা অসুখ করেছে। Warderও কিছুতেই আমায় বিছানা থেকে তুলতে পারলে না। ফ্রাঙ্ক, আমি তখন একেবারে মরীয়া হ'য়ে উঠেছি। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে যে পা বাড়িয়ে দিয়েছে তার ত আর কোন কিছুতেই বিশ্বেস নেই। মরীয়া না হ'য়ে সে করবেই বা কি বল? তারপর এলেন ডাক্তার বাবু—কিন্তু ঘরে এলেন না। বাইরে থেকেই তিনি আদেশ করলেন, এক্ষুনি বিছানা ছেড়ে উঠ্তে হবে। নইলে—

একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করি: নইলে কি অস্কার?

"নইলে শাস্তির আর অবধি থাকতো না। একটু মাত্র ভুলের জন্ম, উঃ ফ্রাঙ্ক, আমায় কতো যে শাস্তি পেতে হয়েছে! মানুষ কি করে যে মানুষের উপর এত নিষ্ঠুর হতে পারে ফ্রাঙ্ক, ভেবে পাইনে—আর এরই নাম হলো দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড।"

তারপর আমার অত্যন্ত সন্নিকটে এসে বল্লো: জানো ফ্রাঙ্ক, ওরা মানুষকে পাগল পর্য্যন্ত ক'রে দেয়? হাঁ, হাঁ একেবারে উন্মাদ করে দেয়।

তারপর অদ্ভুতভাবে কাঁদতে কাঁদতে অস্কার বলে: ফ্রাঙ্ক আমি যদি পাগল হয়ে যাই, উঃ আমি যদি পাগল হয়ে যাই ফ্রাঙ্ক?—

* * * *

শেষে জিজ্ঞাসা করলাম: কই তোমার Warderদের কথা ত কিছুই বল্লে না অস্কার ?—

"সেই একই কাহিনী। কিন্তু একজনের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না। একদিন আমার সঙ্গে একটি কথা কয়েছিল বলে তার শাস্তি পেতে হয়েছিল। সে আশীর্ব্বাদ বলে সেই শাস্তিকে গ্রহণ ক'রে নিয়েছে। মুক্তির পর ওর জন্য কিছু একটা করবো বলে ভাবছি।" একটু উত্তেজিত হয়ে আবার বলে: নিশ্চয় কিছু একটা করতে হবে। অসীম দুঃখের মধ্যে, অসহায় মানুষকে একটু সহানুভূতি দেখান যে কত বড় মহৎ কাজ সে কথা তুমি বুঝতে পারবে না। কারণ দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সত্যিকার মানে তুমি জাননা। কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমায় ফ্রাঙ্ক। কোন কর্ত্তৃপক্ষের কাছেই এসব কথা তুমি জানাতে পারবে না। যদি জানাও তা হ'লে আমার আর রক্ষে নেই। একদিন আমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল ওরা। সেই থেকে কানে অনেক কম শুনি। কিন্তু ফ্রাঙ্ক, সেই Warderটি অতিমানুষ, আমার জন্য কাঁদতে পর্য্যন্ত পারে। জিজ্ঞাসা করলাম এখনো বোধ হয় তোমার সেই কানের যন্ত্রণাটা আছে, না অস্কার ?

"হ্যাঁ—মাঝে মাঝে রক্তও পড়ে।"

"বল কি, ডাক্তারকে কিছুই জানাও নি ?"

একটুখানি হেসে অস্কার বল্লো: কি যে বলো তুমি ফ্রাঙ্ক। ঐ ত মাত্র একটু কানের ব্যথা, সেই জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া যে কত হাস্যকর, সে কথা কেমন ক'রে তোমাকে আমি বোঝাব। আর বুঝেই বা কি হবে ? জেলের শিক্ষার সঙ্গে নিজেকে এখন পরিচিত ক'রে নিয়েছি। অবশ্যি, Trinity কিংবা Oxford-এর শিক্ষার চাইতে এ কিছু আলাদা ধরণের শিক্ষা।

"এ শিক্ষা আমি পরিবর্ত্তন করবো অস্কার।" একটু উত্তেজিত হয়েই কথাটা বল্লাম। "কিন্তু সাবধান কর্ত্তৃপক্ষ যদি কোনক্রমে আমার নাম জানতে পারেন, তা হ'লে শরীরের উপর দিয়ে আমার পরিবর্ত্তনের চূড়ান্ত ক'রে ছাড়বেন। আর তোমার চেষ্টা কতদূর সার্থক হবে, সে কথা ভাবতে পারিনে।" "সে যাই হোক অস্কার, তোমার জন্য কয়েকখানা বই আর কাগজ কলম দেব—এই বন্দী-জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস তোমায় লিখতেই হবে। আর লিখতে হবে সেই সমস্ত লোকদের নাম যারা তোমার একটু অনিচ্ছাকৃত অপরাধকে ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারে নি। Dante কিন্তু ঠিক এই রকম করতে ছাড়েন নি।"

"না, না, তা আমি কিছুতেই পারবো না। আমি আবার বাঁচতে চাই। আর Dante-এর মতো শক্তি আমার আছে ? সত্যি ফ্রাঙ্ক, আমি গ্রীক হয়ে জন্মেছি, কিন্তু দুঃখের এই যে, স্থান আর কালের পার্থক্য এত বেশী যে একটু কিছু সাদৃশ্য পর্য্যন্ত খুঁজে পাবে না।" যাক এতক্ষণ পরে অস্কার এমন একটি কথা বলেছে যার সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নেই। উঃ আমি যেন খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

শেষে বল্লাম: শুনলাম তোমার স্ত্রী নাকি এসেছিলেন তোমায় দেখতে ?

"হ্যাঁ এসেছিলেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ওঁর জন্য। কিন্তু ফ্রাঙ্ক, একজনের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না। সেই Warderটির কথা। জানো একদিন সে আমায় এক টুকরো রুটি বেশী দিয়েছিল ? সে নিশ্চয়ই অতি-মানুষ হবে।" একটু করুণার হাসি অস্কারের মুখে ভেসে উঠলো। এক টুকরো রুটির জন্য, একটি আর্টিষ্টের কাছে, একজন সাধারণ Warder অতি-মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভেবে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝলাম যে করুণায় ও সহানুভূতিতে আমার হৃদয়ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

তারপর অস্কার উঠে দাঁড়িয়ে আমায় নমস্কার করলো। মনে হলো একটা মুমূর্ষু Tragedy আমারই চোখের উপর সংঘটিত হচ্ছে, অথচ আমি যেন একেবারে নিরুপায় হ'য়েই বসে আছি। বাধা দেবার শক্তিও যেন নিঃশেষে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমি কি করবো ? যে Tragedy-র জন্য সমস্ত ইংরেজ জাতি একটু মাত্র বিবেচনা করলো না, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, আমার এই ক্ষুদ্র শক্তি এমন কি কাজেই বা লাগাতে পারি ! শেষে ধীরে ধীরে অস্কার Warder-এর সঙ্গে চলে গেল। আমি লক্ষ্য করলুম, তার সমস্ত দেহটা যেন অস্বাভাবিক ভাবে সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়েছে আর সর্ব্বাঙ্গে যেন অপরিসীম ক্লান্তি।

আমি আরো লক্ষ্য করলুম, অস্কারের নিস্তেজ চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম, আর দেখলুম Warderএর সঙ্গে ক্রমশঃই অস্কার দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে গেল *

* Oscar Wilde—The Life and Confession By Frank Harris হইতে।

সাঁতার

শ্রীশান্তি পাল

প্রফুল্লকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইংরাজী ১৯০১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কুমারটুলির বাটীতে শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমারের জন্ম। চার বৎসর বয়সে তার পিতৃবিয়োগ হয়। আর্থিক অসচ্ছলতা বশতঃ প্রফুল্লকুমার শৈশবে বিশেষ লেখাপড়া করিতে পারে নাই। প্রফুল্লকুমার ১১ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ মহাশয়ের সার্কাসে যোগদান করে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে পিরামিড, ট্রাপিজ, অশ্বপরিচালনা ও তৎপৃষ্ঠে নানারূপ ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করিয়া সার্কাসের কর্তৃপক্ষকে বিমুগ্ধ করে। সেই সময় হইতে প্রায় ৩.৪ বৎসরকাল সে উক্ত দলের সহিত ভারতের নানাস্থানে ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে থাকে। অশ্ব পরিচালনায় সে এমন পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল যে কর্তৃপক্ষ অনেক সময়ে নূতন অশ্বের সোয়ারের জন্য উহাকেই মনোনীত করিতেন।

১৯১৮ সালে প্রফুল্লকুমার সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে যোগদান করে। উহার সাঁতারের উন্নতির মূলে স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়েরও যথেষ্ট প্রেরণা আছে। সন্তরণ ব্যতীত অন্যান্য স্থল-ক্রীড়ায় প্রফুল্লকুমারের কৃতিত্বের পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। হাই-জ্যাম্প, পোল-জ্যাম্প, দৌড় ও হাঁটা পাল্লা, সাইকল, মোটর সাইকল, এমন কি মোটর পরিচালনাতেও নিজের গৌরব এতোটুকু ক্ষুণ্ণ করে নাই প্রফুল্লকুমার ওয়াটার-পোলোয় একজন দক্ষ খেলোয়াড় উচ্চ ঝম্পমঞ্চের একজন ওস্তাদ মঞ্চী। বোম্বায়ের ভিক্টোরি[illegible]



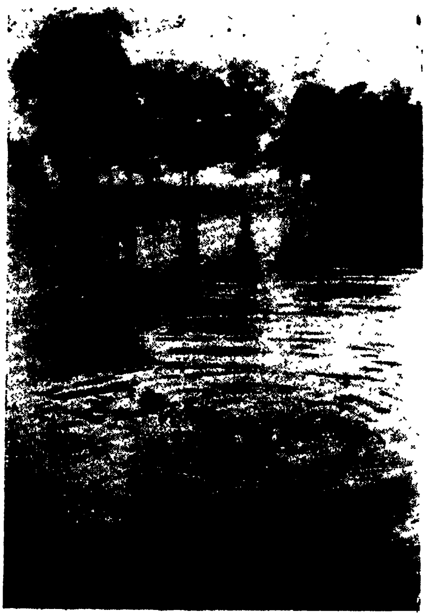
১। জলের মধ্যে দেহ স্থাপন

ক্যার্নিভ্যালে ১৭ দিবসের জ[illegible] সে ৬০ ফিট উচ্চ ঝম্পম[illegible] হইতে প্রত্যহ দুইবার করি[illegible] বহু দর্শকের সমক্ষে অগ্নিঝ[illegible] প্রদর্শন করিত। কিন্তু সে সময় প্রফুল্লকুমারের দেখাদে[illegible] কলিকাতার আহিরীটোলা সন্তর[illegible] সমিতির সভ্য স্বর্গীয় কার্ত্তিকচ[illegible] দত্ত (হাবা) কোন এ[illegible] কার্নিভ্যালে যোগ দিয়া এব[illegible] কতকগুলি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি[illegible] প্ররোচনায় ঐরূপ অগ্নিঝম্প করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন এই ঘটনায় চতুর্দ্দিকে একট হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। বম্বে কোম্পানী ভারতীয়দের এই অযোগ্যতা দেখিয়া ভয়ে প্রফুল্ল-কুমারকেও চাকুরী হইতে ইস্তফা দিল। অবশেষে প্রফুল্লকুমার বম্বে সুইমিং বাথে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইল।

প্রফুল্লকুমারের সন্তরণ শিক্ষা

১৯১৮ সালে প্রফুল্লকুমার সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে ভর্ত্তি হইল। উহার শিক্ষার ভার সমিতির কর্তৃপক্ষ আমারই হস্তে দিলেন। আমি একখানি ছোট গামছা উহার কোমরে

বাঁধিয়া দেশী প্রথা অনুসারে জলে নামাইয়া সাঁতার মঞ্চের সোজাসুজি বার দুই ঘুরাইলাম। অবশেষে পরীক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ছাড়িয়া দিলাম। প্রফুল্লকুমার আমার সাহায্য ব্যতীরেকে স্বয়ং সাঁতরাইয়া মঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি এই বিস্ময়কর ব্যাপারে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি নিশ্চয় অন্যত্র সাঁতার শিক্ষা করিয়াছ। শিক্ষার্থী কখনই শিক্ষকের বিনা সাহায্যে এতখানি পথ সাঁতরাইয়া আসিতে পারে না।"



২। জলের মধ্যে বিশ্রামের দেহ-ভঙ্গী

প্রফুল্লকুমার বলিল—"আমি অন্যত্র সাঁতার শিখি নাই। এই আপনার নিকট হাতে খড়ি। আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে ও বৈকালে রেলীংএর পার্শে দাঁড়াইয়া আপনাদের শিক্ষা-কৌশল দেখিতাম এবং মনে মনে ওইরূপ চিন্তা করিতাম।" স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্র দত্ত মহাশয়ও প্রফুল্লকুমারের ন্যায় একদিনেই একঘণ্টার মধ্যে সাঁতার শিক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রায় ৩।৪ মাস শিক্ষা দিবার পর প্রফুল্লকুমারকে কলিকাতা সুইমিং এসোসিয়েসনের বাৎসরিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১১০ গজের পাল্লায় অবতরণ করাইলাম। প্রফুল্লকুমার বড় বড় নামজাদা সাঁতারুদিগের সহিত পাল্লা দিয়া চতুর্থ স্থান কৃতিত্বের সহিত অধিকার করিল। আমিও উহাকে সারা বৎসর ধরিয়া ড্রিলের সাহায্যে শিক্ষা দিতে লাগিলাম।

১৯১৯ সালে প্রফুল্লকুমার এসোসিয়েসনে ৪৭০গজে পুনরায় অবতরণ করিল। আমাদের উভয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থান লইয়া একটা গণ্ডগোল হইল। আমি বলিলাম যে যদি তুমি তৃতীয় স্থান অধিকার কর তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমি তাহা করি নাই। আমি উহাকে আশা দিয়া বঞ্চিত করিলাম। এই ঘটনায় প্রফুল্লকুমার অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া সেই দিবস প্রতিজ্ঞা করিল যে আগামী বৎসরে সে সমস্ত পুরাতন সময় নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিয়া নূতন সময় স্থাপন করিবে। আমি উহার এই সৎসাহসে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম ও পুনরায় নূতন উদ্যমে শিক্ষা দিতে লাগিলাম। প্রফুল্লকুমার এই দিবস হইতে সাঁতারুদের লক্ষ্য না করিয়া তাহাদের সময়ের উপর লক্ষ্য করিল; কি করিয়া উহাদের সময় নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিবে এই চিন্তাই অহরহ করিতে লাগিল।

এই সময় আহিরীটোলা সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত মুরলীলাল মুখার্জ্জি (পোকা) দূর-পাল্লার, অর্থাৎ ৮৮০গজ ও ৪৪০গজ, সাঁতারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে ৪।৫ বৎসরকাল প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। উহাকে পরাজিত করিবার জন্য আমরা সকলেই বহু চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কোন রকমেই কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে প্রফুল্লকুমার ও যুগল গোস্বামীকে মুরলী বাবুকে পরাজিত করিবার জন্য উৎসাহিতকরিতে লাগিলাম। শেষোক্ত ব্যক্তি মুরলী বাবুকে ৮৮০গজে পরাজিত করিল বটে, কিন্তু সময় নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিতে পারিল না। প্রফুল্লকুমার অত্যন্ত ক্ষুণ্ণিত হইল। আমি উহার পাড়ি সামান্য পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া পুনরায় শিক্ষা দিতে লাগিলাম।

অতি অল্পদিনের মধ্যে সুফল ফলিল, কিন্তু ১৯২১সালে

কলিকাতা এসোসিয়েসনের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় আমাদের সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ উহাদের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন। আমাদের মনস্তুষ্টির জন্য স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অন্তর্সমিতির প্রথম বাৎসরিক জলক্রীড়া সংস্থাপন করিলেন। এই সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রফুল্লকুমার ১১০গজ ব্যতীত অধিকাংশ বাজীতে প্রথম স্থান কৃতিত্বের সহিত নূতন সময়-নির্দ্দেশ স্থাপন করিয়া অধিকার করিল। আমি অধিকাংশ বাজীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলাম বটে কিন্তু আমার অন্তর্দাহ হইল। মনে মনে ভাবিলাম যে, খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছি। আমি এই দিবস হইতেই প্রফুল্লকুমারকে একটু রাখিতে চেষ্টা করিলাম।



৩। বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল

১৯২১ ও ২২ সালে প্রফুল্লকুমার এসোসিয়েসনের মুক্ত প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় আমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল যে আমার শিক্ষায় সে ঈপ্সিত ফল পায় নাই। আমিও বুঝিলাম যে কথাটা যুক্তিহীন নয়। সক্ষম হইয়া ছাত্রের প্রতি এইরূপ অবিচার করা কোনও খেলয়াড়ের উচিত নয়। আমি সেই দিবস হইতে প্রত্যহ উহাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটাইতে অভ্যাস করাইতে লাগিলাম। প্রত্যহ গঙ্গা পারাপার হইতাম। এমন কি দারুণ পৌষের শীতে আমরা পারাপার হইতাম। এই সময় আহিরীটোলা ও ভারতীয় জীবনরক্ষক সমিতির দৌড়ে ১৩ মাইল ও ২২ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। আমিও নূতন সাঁতারুদের ওই প্রতিযোগিতায় অবতরণ করাইব লোভ দেখাইয়া প্রত্যহ গঙ্গা পারাপার ও গঙ্গা-ভীতি বিদূরিত ও দম্ করাইতে লাগিলাম।

১৯২৩ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি এইরূপ পরিশ্রম সত্ত্বেও যখন পাড়ির কোনরূপ উন্নতি হইল না তখন উভয়ে স্থির করিলাম যে আমি দূর-পাল্লা, অর্থাৎ ১৭৬০ গজ, ৮৮০ গজ ও ৪৪০ গজের জন্য প্রস্তুত হইব এবং প্রফুল্লকুমার স্বল্প পাল্লা অর্থাৎ ২২০ গজ ও ১১০ গজের জন্য প্রস্তুত হইবে। আমি দূর পাল্লার জন্য মামুলি কঁচি-লাথি-যুক্ত পাড়ি রাখিলাম এবং প্রফুল্লকুমারের মামুলি পাড়ি পরিবর্ত্তন করিয়া চার-পদী পাড়ি অর্থাৎ ৪টি করিয়া পায়ের আঘাত ও ২টি করিয়া হাত পাড়ির সহিত মিল রাখিয়া এক নূতন ধরণের হুন্ পাড়ির সৃষ্টি করিয়া উহাকে থামা-ঘড়ির সময়ের সহিত অভ্যাস করাইতে লাগিলাম।

এই নবাবিষ্কৃত পাড়িতে প্রফুল্লকুমার দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ পাল (সেণ্ট্রালের ভূতপূর্ব্ব সভ্য, বর্ত্তমান ন্যাশানাল) ও আপ্তাপ কুঠারীর (সেণ্ট্রাল) উপর ভার দিলাম যে উহারা যেন প্রত্যহ প্রফুল্লকুমারকে সঙ্গে লইয়া বেলা ৪ ঘটিকার সময় কলেজস্কোয়ারে গমন করিয়া গোপনে ঘড়ির সময়ের সঙ্গে তাহাকে চর্চ্চা করায় এবং সেই সাঁতারের সময় নির্দ্দেশের ফলাফলের সংবাদ আমাকে দেয়। যথাকালে উহাদের নিকট হইতে পৃথক সময় সংক্ষেপ আমি আদৌ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য আমি এক দিবস স্বয়ং বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রফুল্লকুমারকে সঙ্গে লইয়া কলেজস্কোয়ারে গিয়া ১১০ গজের সময় পাইয়া একেবারে বিস্মিত হইলাম। আমি সেই দিনস সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিলাম যে এই বৎসর বাঙলাদেশে এমন কোন সাঁতারু নাই যে সে প্রফুল্লকুমারকে সাঁতারে পরাস্ত করিতে পারে। তখন এসোসিয়েসনের প্রতিযোগিতার মাত্র ১৫ দিবস বাকী।

প্রফুল্লকুমারের এই আশাতিরিক্ত উন্নতি দেখিয়া এবং আমার এই নবাবিষ্কৃত পাড়ির চটক্ ও দ্রুততা দেখিয়া

আনন্দে আত্মহারা হইয়া আমিও উহার নকল করিয়া উভয়েই প্রত্যেক বাজীতে সেই বৎসর এসোসিয়েশনে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলাম। শুনিতে পাই এই পাড়ি বিলাতে আমাদের আবিষ্কারের বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যবহার হয়, কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রথম।

প্রফুল্লকুমার এই বৎসর প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেক বাজীতে পুরাতন সময় নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় প্রফুল্লকুমার কলিকাতার ষ্টার থিয়েটারে চাকরী করিত। রাত্রি জাগরণ ও নানারূপ অনিয়মের জন্য উহার সাঁতারের



৪। চিৎ সাঁতারের দ্বারা বিশ্রাম

অনেক ক্ষতি করিয়াছে। মনে আছে ২৩ সালে খড়দহ রিষ্‌ড়া "পূর্ণচন্দ্র মেমোরিয়াল কাপ" গঙ্গা সাঁতারের বাজীতে সে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া এত দ্রুত আসিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল যে কর্ত্তৃপক্ষ ও বিচারকেরা বিশেষভাবে প্রফুল্লকুমারের দেহ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। উঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, মানুষ এত দ্রুত সাঁতার কাটিতে পারে না।

অবিরাম সন্তরণের প্রণালী

দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণের জন্য অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলযুক্ত কোন পাড়ির আবশ্যক করে না। যে কোন তৃতীয় শ্রেণীর সাঁতারু অতি অল্পদিনের মধ্যে সামান্য অভ্যাসের দ্বারা ইহা আয়ত্ত করিতে পারে। এই অবিরাম সাঁতারের একমাত্র অবলম্বন মানসিক দৃঢ়তা ও সহনশীলতা। সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টা বা ৪৮ ঘণ্টা অবিরাম সন্তরণের জন্য ১ ঘণ্টাকাল নিয়মিত চর্চ্চা রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টাকাল জলে পড়িয়া থাকা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। অধিক্ষণ জলে থাকিলে শরীরের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে, ফলে মানসিক বল দৃঢ়তাও হারাইবে। শরীরে অবসাদ আসিলে কোন কার্য্যই ভাল লাগিবে না।

শিক্ষাকালে দৈনন্দিন আহার, বিহার ও নিদ্রার প্রতি সাঁতারুকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সাঁতার কাটিব বলিয়া অকস্মাৎ প্রাত্যহিক খাদ্যের পরিবর্ত্তন যেন না করা হয়। বাঙালী সাঁতারুর পক্ষে মাংস, ডিম, মৎস জাতীয় খাদ্য যতই অল্প ভক্ষণ করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। উহার পরিবর্ত্তে শাকসব্‌জী, দুগ্ধ, ঘৃত ফলফুলারি, মাখন, চিজ্‌ প্রভৃতি হজমের শক্তি অনুযায়ী গ্রহণ করা বিধেয়। প্রাত্যহিক খাদ্য এরূপ ভক্ষণ করা উচিত যাহা সহজেই হজম হয়। অবশ্য সাঁতারুর প্রাত্যহিক নিয়মিত খাদ্য যদি মাংস হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা, তবে পরিত্যাগ করিলেই ভাল হয়। এই কথা প্রত্যেক সাঁতারুর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শাকসব্‌জী ও ফলফুলারিতে সাঁতারের দম বৃদ্ধি করে এবং শরীর স্নিগ্ধ ও কোমল রাখে। সাঁতার কাটিব বলিয়া সেই দিবস প্রচুর মাংস ভক্ষণ করিয়া শরীরের শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে,—ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ইহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই যথেষ্ট হয়।

প্রত্যেক সাঁতারু প্রত্যহ সাঁতার কাটিবার পর দৈনিক নিয়ম ও মাপ অনুযায়ী যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া অন্ততপক্ষে অর্দ্ধঘণ্টাকাল সমস্ত শরীর—মস্তকের কেশ হইতে পদদ্বয়ের নখ পর্য্যন্ত—সম্পূর্ণরূপে এলাইয়া বিশ্রাম লইবে। নিদ্রা জয় করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রাত্রি জাগরণ আবশ্যক। প্রথমে ২৪ ঘণ্টা হইতে ৩৬ পরে ৪৮ এইরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে। সাঁতারের সময় পূর্ব্বকথিত তালিকাভুক্ত নির্দ্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয় সাঁতারুকে দিতে হইবে। কোনক্রমেই গুরুপাক

খাদ্য সাঁতারুকে যেন না দেওয়া হয়। যদি সাঁতারুর বমন ইচ্ছা বা অম্লজনিত কোনরূপ পেটের গোলমাল থাকে বা চুঁয়া ঢেকুর ওঠে, তৎক্ষণাৎ গুঁড়া সোডার সহিত সামান্য জল মিশ্রিত করিয়া কয়েক ফোঁটা পাতি নেবুর রস দিয়া পান করাইবে। বিনা কারণে কতকগুলি উগ্র ঔষধ পান করাইবে না। সাঁতারু যেন সর্ব্বদাই তাহার স্বভাবের সহিত মিল্ রাখিয়া কার্য্য করে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইন্‌জেক্‌শান বা অন্য কোন প্রকারে বিষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নির্য্যাতন করা কোনক্রমে যুক্তিযুক্ত নহে—অবশ্য সর্ব্বদাই ডাক্তার মোতায়ন রাখিবে।



৫। হস্তবদ্ধ অবস্থায় কাঁচি পাড়ি

ডাক্তারের কার্য্য কেবলমাত্র নাড়ী ও হৃদ্‌যন্ত্রের গতি পরীক্ষা করা। যদি সাঁতারুর চক্ষু জ্বালা করে বা পীড়িত হয়, তৎক্ষণাৎ ড্রপারের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে লোশন বা গোলাপ জল ব্যবহার করিবে এবং রঙীন চশমা পরাইয়া দিবে। রৌদ্রের সময় সর্ব্বদাই রঙীন চশমা ব্যবহার করিবে।

জলে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে সাঁতারুকে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া পরে খুব সাবধানতার সহিত পদদ্বয়ের নখ হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত, আবহাওয়ার অবস্থা বুঝিয়া সরু মোটা করিয়া চর্ব্বি মাখাইবে। এই চর্ব্বি সর্ষপ তৈলের সংমিশ্রণে ফেনাইয়া আঠাযুক্ত করিয়া নরম করিয়া লইবে। বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যে এই চর্ব্বি যেন কোনক্রমে মস্তকে বা মুখে না লাগে। হস্তের বা পদের তলদেশে সাদা ভেস্‌লিন ব্যবহার করা আবশ্যক। সাঁতারুকে কস্‌টিউমের পরিবর্ত্তে ঢিলা নরম রবার সংযুক্ত ছোট পায়জামা ব্যবহার করিতে দিবে। শরীর ও মস্তক সর্ব্বদাই অনাবৃত রাখিবে।

অধিকক্ষণ সাঁতারের পর সাঁতারু যদি মাথার যন্ত্রণা অনুভব করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বরফপূর্ণ থলি সাঁতারুর স্কন্ধে, ব্রহ্মতালুতে, মুখে এবং চক্ষে অন্ততপক্ষে ১০ মিনিট কাল লাগাইবে এবং সে যাহাতে ঘন ঘন জলের মধ্যে মস্তক রাখিয়া সাঁতার কাটিতে পারে সেইরূপে উপদেশ দিবে। সাঁতারু যেন সর্ব্বদাই পুষ্করিণীর ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে। এই সমস্ত কার্য্যের ভার জীবনরক্ষকদিগের; তাঁহারই সর্ব্বদা সাঁতারুর নিকটে থাকিয়া উপদেশ দিবেন। অবিরাম সাঁতারের সাফল্য অনেকটা জীবনরক্ষক সঙ্গীদের বিবেচনা ও কর্ম্মতৎপরতার উপর নির্ভর করে।

নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য আতসবাজী, কর্কশ শব্দযুক্ত যন্ত্র, খোস গল্প, ও উজ্জ্বল আলোকের বন্দোবস্ত রাখা আবশ্যক। সাঁতারুর মেজাজ বুঝিয়া এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবহার ভাল। রৌদ্রের তাপ হইতে সাঁতারুকে রক্ষা করিবার জন্য পুষ্করিণীর একাংশে চাঁদোয়া খাটাইবার ব্যবস্থা রাখা একান্ত আবশ্যক। যদি অসুবিধা থাকে তাহা হইলে এই ভার জীবনরক্ষকদিগকে লওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা রৌদ্রের সময় ছাতা দিয়া সাঁতারুর পাশে পাশে সাঁতারাইয়া তাপ হইতে সাঁতারুকে রক্ষা করিবে। জীবন রক্ষকদিগকে অবশ্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে যেন কোন ক্রমেই সাঁতারুর অঙ্গ স্পর্শ না হয়।

অবিরাম সন্তরণ শিক্ষা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই অবিরাম সন্তরণ যে-কোন তৃতীয় শ্রেণীর সাঁতারু কাটিতে পারে। উপুড় হইয়া দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদের এবং বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া ৩ নং চিত্রের ন্যায়, শরীরের নিম্ন অংশ

জলের মধ্যে ৪৫° ডিগ্রি নামাইয়া, সাঁতারুর সুবিধা অনুযায়ী, এবং সমস্ত শরীরকে সম্পূর্ণরূপে এলাইয়া দিয়া শিথিল



৬। হস্তবদ্ধ অবস্থায় মস্তকের নিম্নে হস্ত রাখিয়া বিশ্রাম

ভাবে ধীরে ধীরে সাঁতার দিবে। মধ্যে মধ্যে মাথা ১০।১৫ সেকেণ্ডের জন্য ডুবাইয়া রাখিবে। শরীরের উষ্ণতা সমভাবে রাখিতে হইবে।

কিছুক্ষণ সাঁতার কাটিবার পর যদি শরীরে কষ্টই অনুভূত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ চিৎ হইয়া ৪নং চিত্রের ন্যায় সামান্য শিথিলরূপে হস্ত সঞ্চালন করিয়া এবং সাইকেল চালানোর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে পা চালাইয়া থাকিতে হইবে। নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েক ঘণ্টা কাটাইবার পর পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ধরণে সাঁতার কাটিবে। সাঁতারের একঘেয়েমি কাটাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে ২।৪ মিনিটের জন্য একহাতি পাড়ি অর্থাৎ সাইড্-ষ্ট্রোকেরও সাহায্য লইতে পারা যায়। এইরূপ থাকিবার নিয়মগুলি সাঁতারের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে নিয়মিত অভ্যাস করিয়া লওয়া উচিত। হঠাৎ সাঁতারের কায়দা পরিবর্ত্তন করিলে ক্ষতি হইতে পারে।

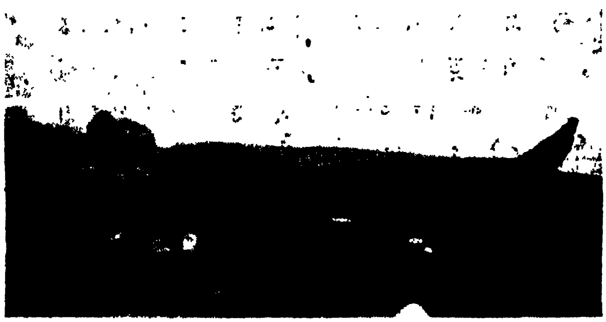
সাঁতারের প্রথম কয়েক ঘণ্টা সামান্য কষ্ট হইবে। সেই কষ্ট কোন রকমে সহ্য করিতে পারিলেই সাঁতার ক্রমশঃই সহজ হইয়া আসিবে। রাত্রি ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত এবং প্রত্যুষে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সাঁতারুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। মধ্যাহ্নে ১২টা হইতে ৩টার মধ্যে আর একটা টান আসে। এই সময় জীবনরক্ষীদলকে সঙ্গে থাকিয়া নানাপ্রকার খোস গল্প ইত্যাদি করিয়া সাঁতারুকে ভুলাইয়া রাখিতে হইবে।

জীবন রক্ষকদিগের কার্য্য

১। সন্তরণকালে সাঁতারু যদি আবহাওয়া বশতঃ অত্যন্ত শীত অনুভব করে এবং কাঁপিতে থাকে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পানীয়ের মাত্রা কিছু বাড়াইয়া দিবে; অর্থাৎ যে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর সাঁতারুকে পানীয় দেওয়া হইতেছিল সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্তত পক্ষে ২ বার পানীয় দিবে, এবং কিয়ৎক্ষণের জন্য সাঁতারুকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে উপদেশ দিবে। পানীয়ের মাত্রা খুব সামান্য হইবে।

২। শরীরের কোন অংশে খাল ধরিলে জীবন রক্ষক তৎক্ষণাৎ জলে অবতরণ করিয়া সেই পীড়িত অংশ খুব সাবধানতার সহিত মর্দ্দন করিয়া দিবে।

৩। শরীরে চর্ব্বি না থাকিলে চর্ব্বি মাখাইয়া দিবে। রৌদ্রের সময় প্রচুর চর্ব্বি মাখাইবে না। এই চর্ব্বি রৌদ্রের তাপে গলিয়া গিয়া সাঁতারুর দেহ জ্বালাইয়া



৭। হস্তপদবদ্ধাবস্থায় ঝাড়ির সাহায্যে সন্তরণ

দিবে। দেহে প্রচুর চর্ব্বি লাগাইয়া লোমকূপ বন্ধ করিবে না। আমাদের গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে ঘন চর্ব্বি মাখানর কোন

আবশ্যকতা নাই। এই ভার পাকা জীবন রক্ষকের লওয়া উচিত। সর্ব্বদাই আবহাওয়ার ও জলের তাপ ও শৈত্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়।

৪। অধিকক্ষণ জলে থাকিবার জন্য হস্ত ও পদের তলদেশ ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ স্থলে সামান্য মাত্র কলোডিয়াম ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু এই কার্য্যের ভার স্থানীয় ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে হইবে।

৫। চক্ষে চর্ব্বি বা তৈল লাগিলে লিকুইড্ প্যারাফাইন ব্যবহার করিবে। পরিষ্কার কাপড় বা তুলা দিয়া চোখ মুছিয়া দিবে। পুনরায় ওই কাপড় বা তুলা ব্যবহার করিবে না।

৬। নিদ্রার বেগ আসিলে কফি কিম্বা কোকো দিবে। অন্যান্য সময় সাঁতারুর পছন্দ অনুযায়ী তালিকা অন্তর্গত দ্রব্যগুলি দিবে। কোন অবস্থায় গুরুপাক বা কঠিন খাদ্য দিবে না।

৭। সাঁতারুকে জল হইতে ষ্ট্রেচারে তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে একখানি মোটা কম্বলের দ্বারা পদদ্বয় হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী কোন আলো বাতাসযুক্ত গৃহে লইয়া যাইবে। তাহার পরিধেয় বস্ত্র উন্মোচন করিয়া স্পিরিটসিক্ত তুলা দিয়া সতর্কতার সহিত গাত্রের চর্ব্বি উঠাইয়া অবশেষে সমস্ত দেহে পাউডার দিয়া অয়েল-ক্লথযুক্ত শয্যায় শয়ন করাইয়া পুনরায় কম্বলাবৃত করিয়া মস্তকে কিয়ৎক্ষণের জন্য বাতাস দিবে। যদি সাঁতারু জাগ্রত থাকে তাহা হইলে তাহাকে অল্প অল্প করিয়া গরম দুগ্ধ পান করিতে দিবে। সাঁতারু যদি নিদ্রা যায় তাহাকে কোনরূপ বিরক্ত করিবে না। সাঁতারুর গৃহে ২।১ জন লোক সর্ব্বদাই মোতায়েন থাকিবে। নিদ্রা হইতে উঠিলে পুনরায় দুগ্ধ, মোহনভোগ ইত্যাদি খাদ্য দিবে।

—হস্তবদ্ধ সন্তরণ—

হাতকড়া বদ্ধাবস্থায় দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণ পূর্ব্বের চিত্র দুইটির নিয়মের দ্বারায় কাটিলেই অধিকক্ষণ জলে থাকা সম্ভবপর হইবে। ৫ নং চিত্রের ন্যায় পার্শ্বে হেলিয়া দুই হস্তে কাঁচি পদের সহিত মিল্ রাখিয়া একত্রে টানিয়া সাঁতরাইবে। একঘেয়েমি এবং একদিকের অঙ্গের পেষণ দূর করিবার জন্য কখন দক্ষিণ কখন বা বামপার্শ্বে ফিরিয়া সাঁতার কাটিবে। বিশ্রামের জন্য ৬নং চিত্রের ন্যায় চিৎ হইয়া মস্তকের তলদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া অর্থাৎ হস্তের উপর মস্তকের সম্পূর্ণ ভার রাখিয়া পূর্ব্ব কথিত সাইকেল চালনার ন্যায় অতি ধীরে পদদ্বয় সঞ্চালন করিবে। এইরূপে অবিরাম সাঁতারে আইনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চলা শ্রেয়স্কর। এই দুই নিয়মে প্রত্যহ অন্ততঃ ২ঘণ্টাকাল অভ্যাস করিয়া পরে দীর্ঘকালের জন্য অবতরণ করিবে।

হস্তপদ বদ্ধাবস্থায় সন্তরণ

হস্তপদবদ্ধাবস্থায় সাঁতারে যথেষ্ট ধৈর্য্যের আবশ্যক। প্রথমতঃ সাঁতারুকে দীর্ঘকালের জন্য জলের উপর অবলীলা-ক্রমে ভাসা আয়ত্ত করিতে হইবে। এই অভ্যাসের পর হস্তপদ বদ্ধ করিয়া স্কালিংএর সাহায্যে অর্থাৎ লম্বা চিৎ হইয়া সমস্ত শরীর জলের উপর কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভাসাইয়া মস্তকের পশ্চাতে হস্ত রাখিয়া ৭ নং চিত্রের ন্যায় কেবল মাত্র দুই হস্তের কব্জী ঘুরাইয়া হস্তের তালুর দ্বারায় পদদ্বয়ের দিক দিয়া সাঁতার দিবে। এই সাঁতার দীর্ঘকাল কাটিতে হইলে সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অর্দ্ধেক সময় অভ্যাস করিতে পারিলেই ভাল হয়। একঘেয়েমি কাটাইবার জন্য কখন কখন উপুড় হইয়া কিছুক্ষণের জন্য থাকিতে পারা যায়—অবশ্য সে সাঁতারুর শিক্ষা বা নিজের ক্ষমতার উপর কতকটা নির্ভর করে। হস্তপদ বদ্ধাবস্থায় সন্তরণের সময় সর্ব্বদাই একজন করিয়া জীবন রক্ষী সাঁতারুর পার্শ্বে থাকিবে।

কলিকাতায় অবিরাম সন্তরণের বিবরণ

এতাবৎকাল কলিকাতা সহরে যতগুলি নিরবসর সন্তরণ হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ পাল, মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী (সেণ্ট্রাল সুইমি ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব সভ্য, বর্ত্তমান ভাগলপুর), শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস (কলেজ স্কোয়ার), সুকুমার [illegible] (সেণ্ট্রাল) নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই অবিরাম

সন্তরণে দোহাতি-পাড়ির প্রচলন সর্ব্বপ্রথম শ্রীমান প্রফুল্ল-কুমার প্রদর্শন করিয়াছে। উহার দেখাদেখি বীরেন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে ৩২ ঘণ্টাব্যাপী সন্তরণকালে প্রত্যুষ ৬ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিরাম দোহাতি-পাড়ি ব্যবহার করিয়া সমস্ত দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পর, সন্তরণের শেষ পর্য্যন্ত একহাতি পাড়ি অর্থাৎ পার্শ্বে শুইয়া ১ হাত জলের মধ্যে ও অপর হাত জলের উপরে টানিয়া ৩২ ঘণ্টাকাল সম্পূর্ণ করিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী ২৯ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত একহাতি-পাড়ি ব্যবহার করিয়াছিল।

আজকাল অবিরাম সন্তরণকারীরা এ-ধরণের সাঁতার কাটিতে আদৌ সাহস করে না। কোন রকমে সামান্য মাত্র নড়িয়া ও সাঁতারের আইন বাঁচাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় কাটাইতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করে।

মনে পড়ে ১৯৩০ সালে হেদুয়ার পুষ্করিণীতে ৬১ ঘণ্টা ১০ মিনিট অবিরাম সন্তরণের বার স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এবং চৈনিক কন্‌সল জেনারল হঠাৎ প্রফুল্লকুমারের পাড়ির দ্রুততা দেখিবার ইচ্ছা করেন। প্রফুল্লকুমার তৎক্ষণাৎ কলিকাতার বিখ্যাত সাঁতারুদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আহ্বান করিয়া পুষ্করিণীর দুই পাকে অর্থাৎ ৩৪০ গজ সাঁতারের পাল্লায় সকলকেই পরাস্ত করে। এই অলৌকিক ব্যাপারে সমস্ত দর্শকবৃন্দ একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তখন মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পূর্ণ হইয়াছিল।

১৯৩৩ সালে রেঙ্গুন রয়েল লেকে ৫০ ঘণ্টা সাঁতারের পর ৫০ গজের পাল্লায় মিঃ আগাস্থুর নামে একজন বর্ম্মার খ্যাতনামা সাঁতারুকে নির্ম্মমভাবে পরাস্ত করিয়াছিল। প্রফুল্লের এই অসাধারণ শক্তি ও সন্তরণের কৌশল দর্শনে লক্ষ লক্ষ দর্শক একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৯২৯ সালে হায়দ্রাবাদ নিবাসী মহম্মদ সফি ওয়েলেসলি পুষ্করিণীতে ২৪ ঘণ্টাকাল ও এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ছাত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চাটার্জ্জী ৫৪ ঘণ্টাকাল সাঁতারের মধ্যে কোন কৃতিত্ব দেখি নাই। উহারা অধিকাংশ সময়ই জলের উপর হস্ত ও পদ এলাইয়া দিয়া কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভাসমান ছিলেন।

১৯৩৩ সালে ভবানীপুর পদ্মপুকুরে মালাবার নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামীর ৫৩ ঘণ্টা অবিরাম সন্তরণও বিশেষ সন্তোষজনক নহে। তিনি অধিকাংশ সময়ই সাঁতার-মঞ্চের সম্মুখে বক্ষপ্রমাণ জলে সর্ব্বদাই ৩।৪ জন জীবনরক্ষকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সাঁতার দিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল অবিরাম সন্তরণের পথ প্রদর্শক আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় অগ্নিকুমার সেন। তিনি বাগবাজার সন্তরণ সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯২৭ সালে ৫০ বৎসর বয়সে কলেজস্কোয়ারে ১৪ ঘণ্টাকাল অবিরাম সাঁতার দিয়া আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অগ্নিবাবু একজন নিম্নমঞ্চের ভাসমান সাঁতারু ছিলেন। তিনি বহুবার এসোসিয়েসনের ওই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে ৩০ ও ২৩ মাইল প্রতিযোগিতায় তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। সারা পথ চিৎ সাঁতারে আসিয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালে কলেজস্কোয়ার ক্লাবের সন্তরণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস্ মহাশয় এক অভিনব কৌশলের দ্বারা সন্তরণ প্রদর্শন করিয়া আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি প্রফুল্লকুমারের হাতকড়া বদ্ধাবস্থায় সন্তরণের অব্যবহিত পরে হস্ত ও পদ লৌহ-শৃঙ্খলের দ্বারা বদ্ধ করিয়া ৩৩ ঘণ্টাকাল চিৎ হইয়া ভাসিয়া স্কালিংএর সাহায্যে সাঁতার দিয়া সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

কুমারী সাঁতারুদিগের মধ্যে মাইসোর নিবাসিনী বাইরামার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১৯৩৪ সালে বাইরামা প্রথমে ১২ ঘণ্টা সাঁতার দেন। সেন্ট্রাল সুইমিংএর সভ্যা কুমারী সাবিত্রী দেবী উক্ত রেকর্ড ভাঙ্গিয়া দেন। এই ঘটনার কয়েক দিবসের মধ্যেই বাইরামা পুনরায় ১৮ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া নূতন সময় নির্দ্দেশ স্থাপন করেন। ইঁহাদের উভয়ের বয়স ১০ ও ৮ বৎসর মাত্র।

শ্রীশান্তি পাল

সবিনয় নিবেদন

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

খ

ছাতাটা কোনরকমে মুড়ে নিয়ে কানন কাহিনীদের বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে প'ড়ে বললো, গুড্ লাক্ প্রদীপ, তোর যে দেখা মিলবে এমন আশা করিনি। তারপর ঝর্ণা, কাহিনী কোথায়?

কাননের এতখানি বিস্ময় প্রকাশ করার কিছুই ছিল না। কারণ, প্রদীপের আগমন কাহিনীদের বাড়ীতে এমন কিছু বিস্ময়ের বস্তু নয়। এমন সে রোজই আসে। বরং, কাননই সে বাড়ীর পক্ষে ইদানীং দুর্লভ হ'য়ে উঠেছে। প্রদীপ কি একটা জবাবদিহি করবার জন্য উৎসুক হ'য়ে উঠতেই ঝর্ণা বললো, প্রদীপদা'তো রোজই আসে, কিন্তু তুমি যে বৃষ্টি মাথায় ক'রে হঠাৎ এখানে এলে কি সুবুদ্ধিতে তা'তো ভেবে পাই না। রাঙাদি'কে দেখতে গিয়েছিলে শুনলাম, কোন দুঃসংবাদ সঙ্গে ক'রে আনোনিতো?

না, রাঙাদি' ভালই আছেন। আনন্দদা' তাকে কি মরতে দিতে পারে কখনও? এম্নি আঁকড়ে ধ'রে ব'সে আছে যে কার-সাধ্য রাঙাদি'কে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

সত্যি?

প্রশ্নটা ঝর্ণা এমনভাবে করলো যে কানন সহজেই বুঝতে পারলো, ঝর্ণা কথাটাকে একটুও অবিশ্বাস করেনি। করবার কথাও না। কারণ, আনন্দের চেয়ে রাঙাদি'র গৌরব এক্ষেত্রে বেশী। আর ঝর্ণা সে সুযোগ হাতছাড়া করতে মোটেই রাজী না। রাঙাদি'র গৌরবে ঝর্ণা নিজেকেও গৌরবান্বিত মনে করে। বিশেষ ক'রে পুরুষের সামনে।

কানন হাতের সিক্ত ছাতাটা এক পাশ ক'রে দেয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে প'ড়ে বললো, যাক্ ওসব কথা। এখন এক কাপ চা মিলবে কি না শুনি?

ঝর্ণা বললো, মিলবে বৈ কি! এত কষ্ট ক'রে যদি এখানে আসতেই পারলে তো আর এক কাপ চা'ও মিলবে না?

কানন মৃদু হেসে বললো, তবু শুনে সুখী হ'লাম।— তারপরে প্রদীপের দিকে ফিরে কি যেন বলবার চেষ্টা ক'রে থেমে গেল। আসলে, ঝর্ণার কাছ থেকে একটা উত্তরের আশায় সে অন্য কোন কথা তুললো না। কিন্তু ঝর্ণার কাছ থেকে যা সে শোনার প্রত্যাশা করছিল তা ঝর্ণা শোনাবার জন্যে মোটেই ব্যগ্র ছিল না, বরং নিজেকে সে চেষ্টা ক'রেই সে-বিষয়ে সংযত ক'রে রেখেছিল। তার জন্মোৎসবে অনুপস্থিত থেকে যে ত্রুটি সবার চোখে কানন ফুটিয়ে তুলেছে তারই জন্যে একটু অনুযোগ ঝর্ণার কাছ থেকে আশা করা তার পক্ষে অন্যায় নয়, কিন্তু ঝর্ণা তার অভাব সেদিন সবার চেয়ে বেশী ক'রে অনুভব করলেও তারই সামনে সে কথা স্বীকার ক'রে নিজেকে ছোট করতে পারে না।

প্রদীপ অনেকক্ষণ ধ'রে কি যেন বলবার চেষ্টা ক'রে কিছুতেই যখন তা বলতে পারলো না তখন তার নীরবতা নিজের পক্ষেই অত্যন্ত লজ্জাকর হ'য়ে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এখন তবে উঠি ঝর্ণা। কাননদা', চল্লাম। এসেছি অনেকক্ষণ, বাইরে 'কার'খানা ভিজচে ·····আসি, কেমন?

না, এরই মধ্যে? সে হবে না।—বলে কানন প্রদীপের একখানা হাত ধ'রে ফেলে বললো, ঠিক কথা, আমি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি প্রদীপ, এ 'কার'খানা কি নতুন কেনা হ'লো?

প্রদীপ আবার চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললো, হুঁ,

পুরানোখানা ওয়ার্কশপে সারতে গেছে, ওর একটা পার্ট সেদিনকার এ্যাক্সিডেণ্টে খারাপ হ'য়ে গেছে।

এ্যাক্সিডেণ্ট! কই, সে কথাতো এতদিন বল'নি আমাদের।—ব'লে ঝর্ণা বিস্ময় প্রকাশ ক'রে প্রদীপের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

প্রদীপ বললো, না, বলিনি। তোমার জন্মোৎসবের দিনেই ঘটনাটা ঘটেছিল। কাজেই আনন্দোৎসবের মধ্যে দুর্ঘটনার কথা বলে কারও আনন্দে বাধা জন্মাবার ইচ্ছে হয়নি। তারপরে আর বলতে মনেও ছিল না। নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে প'ড়েই আর একটা গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে গিয়ে সামনেকার মড্‌গার্ডগুলো বেঁকে-চুরে গেছে, ভেতরের একটা মেশিন্-পার্টও নষ্ট হ'য়েচে। বিশেষ তেমন ক্ষতি হয়নি।

ঝর্ণা ব্যাকুল হ'য়ে বললো, কেউ জখম হয়নি তো?

না।

যাক্, তবু ভাল। কিন্তু নতুন কার কিনেচ', কই, সে কথাতো একবারও আমাদের বল'নি।

প্রদীপ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কানন বাধা দিয়ে বললো, সত্যি, প্রদীপের মস্ত ভুল হয়ে গেছে। মোটর এ্যাক্সিডেণ্টের চেয়ে মোটর কেনা আরও বড় থ্রিল্ মেয়েদের কাছে। কাজেই এ্যাক্সিডেণ্টের কথা চেপে যাওয়াকে ওরা ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু অন্যটা কিছুতেই না।...

এমন সময় চায়ের ট্রে হাতে কাহিনী এসে ঘরে ঢুকলো। কাননের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে বিশেষ সে বিস্মিত হ'লো। কাহিনীর বিস্মিতদৃষ্টিকে লজ্জা দেবার জন্যে এবং ঝর্ণাকে বিব্রত ক'রে তোলার জন্যে কাহিনীর মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে নিজের অসমাপ্ত কথার সুর ধ'রে সে সকৌতুকে হাসতে লাগলো।

কাননের উদ্দেশ্য অতি সহজেই সফল হ'লো। কাহিনী কাননের হাসির অর্থ অন্যরকম বুঝে নিয়ে লজ্জিত হ'লো, আর ঝর্ণার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত অপ্রকাশ্য জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছিল। কাননকে অপ্রতিভ ক'রে তুলতে না পারা যে ঝর্ণার পক্ষে কতবড় অক্ষমতা তা সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, চীৎকার ক'রে কাননকে সকলের সামনে অত্যন্ত হীন প্রতিপন্ন ক'রে দিতে, কিন্তু কানন যে তার ক্ষমতার বাইরে তা সে জানে ব'লেই তেমন কোনো আচরণ তার দ্বারা সম্ভব হ'লো না।

ঝর্ণার রক্তিম মুখের দিকে চেয়ে কাননের হাসি পাচ্ছিল। সে অতি কষ্টে হাসি চেপে নিয়ে বললো, সত্যি প্রদীপ, এ তোর অন্যায়। আর ঝর্ণা, একি তোমারও অন্যায় না? প্রদীপ কেমন ক'রে এসে গায়ে প'ড়ে বলবে যে সে আজ একখানা নতুন কার কিনেচে? কথা উঠলেই তবে বলা চলে, নইলে প্রদীপের অনুপস্থিতিতে এ কথাওতো বলতে তোমারা ছাড়তে না যে, ভারী একখানা কার কিনেচে—যার বিষয়ে দশগণ্ডা কথা শুনিয়ে গেল, বড়লোকী ফলিয়ে গেল, হেন' করলো—তেন' করলো। কেমন, বলতে কি না? এই ভয়েই প্রদীপকে চুপ ক'রে থাকতে হ'য়েছে সেদিনটির জন্যে যেদিন আমরা আপনা থেকে খোঁজ নেব ওর নতুন 'কার'খানার। একি মানুষের সোজা দুঃখ,—যাদের দেখবার জন্যে কেনা তাদের ডেকে এনে স্পষ্টভাবে দেখানো যায় না, আকারে-ইঙ্গিতে পাকে-প্রকারে দেখাতে হয়।

প্রদীপ এতক্ষণ নীরবেই ছিল, কিন্তু কাননের কথার প্রতিবাদ না ক'রেও সে থাকতে পারলে না, বললো, এ হ'তেই পারে না যে, মানুষ সব সময় লোককে দেখাবার জন্যেই জিনিষ কেনে, তার প্রয়োজন হয় ব'লেই সে কেনে।

কানন কাহিনীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললো, প্রয়োজন—আর একটা জিনিষ, যার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ বা সংজ্ঞা নেই, কিন্তু জীবনে সব চেয়ে সক্রিয় এজিয়েণ্ট সেটাই।

কানন ও প্রদীপের সামনে দু'পেয়ালা চা ধ'রে দিয়ে কাহিনী বললো, খুব হ'য়েছে কাননদা'। ওসব প্রফেসরী কায়দায় সাইকোলজি সম্বন্ধে লেক্‌চার দেবার এটা উপযুক্ত স্থান নয়, সময়তো মোটেই নয়। বাইরের আকাশটা দেখছ' না? সাইকোলজি দিয়ে জীবনের ব্যাখ্যা চলে, কিন্তু জীবনের কাজ সাইকোলজি মেনে করা চলে না। এটা মানোতো?

খুব মানি।—ব'লে কানন হাসতে লাগলো।

ঝর্ণা হঠাৎ নিজের চেয়ার থেকে উঠে প্রদীপের চেয়ারের পাশে ঘুরে এসে দাঁড়িয়ে বললো, প্রদীপদা', তাড়াতাড়ি

চা টুকু শেষ ক'রে ফেল', তোমার সঙ্গে আমার একটু বেরুতে হবে। জ্যেঠাইমার সঙ্গে আজ দেখা করতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু বৃষ্টি দেখে আর ইচ্ছে হচ্ছিল না, তা তোমার 'কার'খানা যখন আছেই—

কাহিনী বললো, না, এই বৃষ্টিতে কাউকে আমি বেরুতে দেব না, বৃষ্টি ধরুক আগে।

ঝর্ণা বললো, বৃষ্টি ব'লেইতো বেরুবো, নইলে কিসের এত গরজ?

কানন হাসছিল। ঝর্ণা তা লক্ষ্য ক'রেই আবার বললো, কই, তাড়াতাড়ি শেষ কর' প্রদীপদা'।

কাহিনী প্রদীপের অপ্রতিভ মুখের দিকে চেয়ে বললো, আঃ, কি যে পাগলামি করিস্ ঝর্ণা।

ঝর্ণা আর কোন কথা না ব'লে ঘরের এক কোণের একটা আরাম কেদারায় গিয়ে নিস্পৃহভাবে এলিয়ে পড়লো। প্রদীপ চা পান শেষ ক'রে টেবিলের ওপরের ফুলদানির ফুলটা নিয়ে অকারণেই নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

ঝর্ণা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এসে প্রদীপের একটা হাত ধ'রে জোর ক'রেই একরকম তাকে টেনে তুলে নিয়ে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজেই মোটরে উঠলো। প্রদীপকে কিছুই বলার অবসর দেওয়া হয়নি, নইলে সে হয়তো বলতো, এই বৃষ্টিতে নাই বা আজ কোথাও গেলাম। কিন্তু কেন? সে কথা নিজেও সে কাউকে বোঝাতে পারে না।

মোটরের ষ্টার্টের সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণার মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। কাননকে শাস্তি দেবার এর চেয়ে ভাল কৌশল আর কিছু সে আবিষ্কার করতে পারেনি। কানন যে ক্ষুণ্ণ হবেই সে বিষয়ে ঝর্ণার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। মোটর গলির মোড় পার হ'তেই তার ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল কাননের মুখটা একবার দেখতে। তার এই সহসা-আবিষ্কৃত শাস্তিতে কানন কি পরিমাণ ব্যথিত হ'য়েছে তা মনে মনে ঠিক ক'রে নিয়ে ঝর্ণা ভারী খুসি হ'লো।

কাহিনী!

কেন?

ঝর্ণা ও প্রদীপ বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরে যে নীরবতা বিরাজ করছিল তা ভেঙে দিতে কাহিনী ও কাননের মধ্যে কারোই সাহস হচ্ছিল না। কাননই সে কাজ করলো, কিন্তু কণ্ঠ তার সুস্পষ্ট দুর্ব্বলতায় অস্বাভাবিক রূপে গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। কাহিনী তা ঠিক ধরতে পারেনি। কাহিনীর উত্তরও কাননের কথার প্রতিধ্বনির মতই শোনালো অনেকটা।

কানন কণ্ঠ যথাসম্ভব সহজ ক'রে তোলার চেষ্টা ক'রে বললো, সত্যি কাহিনী, সেদিন তোমার অপমান করার চেষ্টা আমি করিনি। করাটাকে বাহাদুরি ব'লেও আমি কোনদিন মনে করি না। আমাদের মেলামেশার মধ্যে ওরই যেন স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, কাজেই সেদিন জিনিষটা আমার চোখে এম্‌নি সহজ হ'য়ে উঠেছিল যে, আমার একটুও বাধেনি। সে-মুহূর্ত্তের অবস্থা দিয়ে যদি তুমি আমাকে বিচার ক'রে দেখতে তো আমার ওপর কিছুতেই রাগ করতে পারতে না। জীবনে এমন কতকগুলো মুহূর্ত্ত মানুষের আসে যে সেগুলো বাদ দিয়েই তাকে বিচার করতে হয়। নইলে, আজও তো তুমি তেম্‌নি আমার সাম্‌নেই আছ, কিন্তু আমি চেষ্টা ক'রেও সেদিনের অত সহজ ব্যাপারটাকে দ্বিতীয়বারের জন্যে রূপ দিতে পারি না। অথচ, অপরাধ যে কিছু এতে থাকতে পারে না সে বিশ্বাস আজও আমার আছে। তবু আমাকে রাঙাদি'র ওখানে যেতে হ'লো—দু'দিন তোমার চোখের আড়াল হবার জন্যেই। আর আজ এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে তোমার কাছে সে কথা বলতেও আবার এলাম।

কাহিনী ডা'ন পায়ের চেটো দিয়ে বাঁ-পায়ের ওপরটা চেপে ধ'রে নিজেকে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে বললো, দুঃসাহসী মানুষের ক্ষমা করা চলে, কিন্তু দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা না ক'রে পারি না।

কানন টেবিলের মাঝ থেকে ফুলদানিটা হাতের কাছে টেনে নিয়ে মাথা নীচু ক'রে বললো, অথচ, ঐ দু'টোর combined effect-এই মানুষ সুন্দর হ'য়ে ওঠে। এই যে ঝর্ণা জোর ক'রে প্রদীপকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বেড়াতে বেরুলো—একাজটাকে সুন্দর কেউ বলবে না, কিন্তু এর পরে ঝর্ণা যখন আমাদের সামনে থেকে দু'দিন একটু আড়ালে

থাকতে চেষ্টা করবে তখনই ওর কাজটা সুন্দর হয়ে উঠবে ও নিজেও সুন্দর হ'য়ে উঠিবে।

কাহিনী বললো, তোমার চোখে ঝর্ণা তখন সুন্দর হ'তে পারে, কিন্তু আমার চোখে হবে না। ও যদি ওর এই কাজের জন্যে পরে লজ্জিত হয় তবে ওকে আমি ভীরু বলবো, ওর এই কাজটাকে অন্যায় বলে ধরবো। যারা ক্ষণিকের উত্তেজনায় একটা কাজ ক'রে বসে এবং সেটাকে পরে support করতে পারে না তাকে ভীরু ছাড়া কি আর বলবো, তাকে ঘৃণা না ক'রে কি ক'রে ক্ষমা করবো?

কাননের মুখে হাসির একটা অস্পষ্ট চমক খেলে গেল। সে ফুলদানিটা হাতের মধ্যে চাপতে চাপতে বললো, আর যারা ক্ষণিকের জন্যেও নিজেদের অন্তরতম ইচ্ছাকে রূপ দিতে সাহসী হয় না তাদের কি বলবে? তাদের কি ক'রে ক্ষমা করবে?

কি জানি!—ব'লে কাহিনী উঠে রাস্তার দিকের খোলা জানালাটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

রাস্তায় জল জমে গেছে। তারই ওপর তখনও বৃষ্টি পড়ছিল,—ছপ্, ছপ্, ছপ্...একঘেয়ে, একটানা। কাহিনী জানালার গরাদ ধ'রে বিষণ্ণ শ্মশান ভৈরবীর ভস্মমাখা জটার মত মেদুর আকাশের দিকে চেয়ে কি এক ভুলে যাওয়া কাহিনী মনে আনতে চেষ্টা করছিল। সেদিনও যেন আকাশের অবস্থা ঠিক এম্নি ছিল, এম্নি ধরার গায়ে সে নেমে এসেছিল, এম্নি মানুষকে তার অতীতের প্রায়-বিস্মৃত কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। ক্রমে তার মনে পড়লো, এমনি এক দিনে রাঙাদি' তা'কে বলেছিল, বোকা মেয়ে, বিচার ক'রে কি কখনও ভালবাসা যায়? বিচারশক্তি লোপ পেলেই তবে ভালবাসার জন্ম হয়।

কাহিনীর হাসি পেল।

কানন কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে থেকে কাহিনীর পাশে উঠে এসে দাঁড়ালো। বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে বললো, আজকের আকাশটা কি চমৎকার! পথে জনপ্রাণী নেই, ভারী ভাল লাগছে। মনে হয়, আজও আবার তেম্নি জোর ক'রেই তোমার গালে একটা চুমু এঁকে দিতে পারি কাহিনী।

কাহিনী সভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ালো।

কানন কাহিনীর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

একখানা মোটর এসে দরজার সামনে থামার শব্দ পেয়ে কানন জানালার দিকে ফিরে দেখতে পেল, প্রদীপ মোটরের ষ্টীয়ারিং হুইল্ ধ'রে ব'সে আছে। জলের ঝাপটা লেগে তার মাথার চুল ভিজে উঠেছে। ঝর্ণা গাড়ী থেকে নেমে প্রদীপের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের গা থেকে প্রদীপের রেন কোট্টা খুলে প্রদীপের হাতে দিয়ে বললো, নামবে না?

না, কাল আবার আসবো। বৃষ্টি পড়ছে, ভিজে গেলে যে।

তা' হোক্, কাল আসবে তো? ঠিক?

ঠিক।

প্রদীপ বিশ্রী শব্দ তুলে মোটর হাঁকিয়ে চ'লে গেল। ঝর্ণা লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ঘরে উঠতেই কানন হো হো ক'রে হেসে উঠলো। ঝর্ণা কোনদিকে না চেয়ে, কিছুমাত্র বিব্রত না হ'য়ে সোজা ভেতরের দিকের দরজাটা টেনে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলো। স্প্রীং-এর কব্জা লাগানো দরজাটা বন্ধ দরজার ওপর বিশ্রীভাবে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা বিকট শব্দ হ'লো।

কাহিনী সেই শব্দে চমকে উঠে বললো, তুমি যাও কাননদা', বৃষ্টির মধ্যে যখন আসতে পেরেচ' তখন যেতেও পারবে।

তা পারবো। কিন্তু কাল আবার আসতে বললে না যে?—ব'লে কানন দে'য়ালে ঠেস্ দেওয়া সিল্ক ছাতাটা হাতে তুলে নিয়ে বললো; ঝর্ণা কিন্তু প্রদীপকে আসতে বলতে ভুল করেনি। আচ্ছা, আসি।

কানন দরজার কাছে গিয়ে ছাতা খুলে ধরতেই কাহিনী এগিয়ে গিয়ে তার একটা হাত ধ'রে ফেলে বললো, যেওনা কাননদা', এ বৃষ্টির মধ্যে যাওয়া যায় না। মা শুনলে পরে ভারী দুঃখিত হবে, এ জন্যে আমাকে কথাও শুনতে হবে। আর রাঙাদি'র খবর মা'কে শুনিয়ে দেও, নইলে, পরে এর জন্যে তোমাকেও কথা শুনতে হবে। মা রাঙাদি'র খবরের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে আছে।

কানন ফিরে দাঁড়ালো, কিন্তু না হেসেও পারলো না।

* * *

সীমা, তুই? আশ্চর্য্য, এখানে তুই কেমন ক'রে এলি?

মেজদা' তোমার চোখেও এত বিস্ময়? বাপের বাড়ী আসাটা মেয়েদের পক্ষে এমন কিছু অস্বাভাবিক কি? তবে, এত বিস্মিত হ'চ্ছ কেন? এর আগে কখনও আসিনি ব'লে?—ব'লে সীমা মৃদু একটু হাসতে চেষ্টা করলো, কিন্তু হাসির চেয়ে কান্নাটাই ফুটে উঠলো বেশী।

কানন একটা চেয়ারের হাতল চেপে ধ'রে বললো, না সীমা, তারা যে তোকে আসতে দিলে—আমি সেই কথাই বলছিলাম।

সীমা কাননের আরও কাছে এগিয়ে এসে বললো, তারা আবার কে মেজদা'? পশুরাজের কথা বলছো তো? হুঁ, পশুরাজ যে আমাকে আসতে দিতে পারেন না সে তো তুমি জানই। মা'র ক্ষমতা থাকলে হয়তো দিতেন। তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই।...উঃ, আর পারি না মেজদা'। মানুষের সহ্য করবার শক্তিরও একটা সীমা আছে। তাই আজ সকলের অজ্ঞাতে এখানে চ'লে এলাম। এর পরিণাম যে কি ভীষণ তা আমার চেয়ে ভাল ক'রে বোধ হয় কেউ জানে না, কিন্তু পরিণাম ভাববার মত মনের অবস্থা আর আমার নেই।

সীমা কথা থামিয়ে কাননের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কাননের মুখে ভয় ও ভাবনা এত স্পষ্ট রূপ নিল যে, সীমা উত্তেজিত হ'লেও তা অতি সহজেই ধরতে পারলো। কানন সীমার পরিণাম চিন্তা ক'রেই শিউরে উঠছিল।

সীমা কাননের একটা হাত টেনে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে জোর ক'রে একটু হেসে বললো, মেজদা', তোমার কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি। তোমাকে এত দুর্ব্বল দেখলে আমার সংকল্প থেকে হয়তো আমি বিচ্যুত হব। সমস্ত জগৎ আমাকে দুষবে সে আমি জানি, কিন্তু তুমি আমাকে সাহস দেবে ব'লেই তোমার কাছে এসেছি।

কানন কম্পিতকণ্ঠে বললো, সীমা, তোর সেখানে ফিরে যাবার পথ যে চিরদিনের মত রুদ্ধ হ'য়ে গেল—সেই কথাই আমি ভাবছি।

তুমি ভাবছ' কি মেজদা'? সে কথা কি আমিই না ভেবে বেরিয়েছি? সেখানে ফিরে যাবার সাধ থাকলে নিশ্চয় আমি বেরিয়ে আসতাম না। সেখানে ফিরে যাবার কথা আর ভাবতেও পারি না।

তারপর?

সীমা একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললো, আমি ভারী ক্লান্ত মেজদা'। তার পরে যে কি, সে আমি নিজেও জানি না। পরাগদা'কে চিঠি লিখে তোমার এখানে আসতে বলেছি আজ। তাকে জিগ্যেস্ ক'রে তবে তোমাকে জানাব',—পরে মৃত্যু, না জীবন।

কানন সীমার সংকল্প কতকটা অনুমান করতে পেরে আরও ভয় পেয়ে গেল।

সীমা হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মেজদা,' আমি আর বসতে পাচ্ছি না। তোমার ঘরে চল', সেখানেই সব কথা হবে। আমার সমস্ত দেহমন বিশ্রামের জন্য কাতর। আমি এ বাড়ী যেদিন থেকে ছেড়েছি সেদিন থেকে একটা রাতও আমার চোখের পাতা বুজতে পারিনি।

কানন সীমার একটা হাত ধ'রে ফেলে বললো, সে আমি জানি সীমা। আয়,...একি, তোর গা যে পুড়ে যাচ্ছে সীমা!

সীমার চোখে জল এসে পড়লো। সামান্য দরদ, সামান্য সহানুভূতিও আজ তাকে কাতর ক'রে তোলে, অভিভূত ক'রে ফেলে। সীমা কাননের বুকের ওপর এসে লুটিয়ে প'ড়ে বললো, মেজদা', আমার জ্বর—ভীষণ জ্বর! জ্বরের ঘোরেই চ'লে এসেছি, নইলে হয়তো পারতামও না।

কানন সভয়ে ছোট বোন সীমাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধ'রে চোখের জলে সীমার রুক্ষ অলক ভিজিয়ে দিল। আর সীমা কাননের বুকের মাঝে মাথা রেখে অভিমানে কাঁদছিল।

পরাগ এসে ঘরে ঢুকলো।

কানন তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। সীমা তখনও পরাগের উপস্থিতি টের পায়নি।

সীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছেলেমানুষের মত কাঁদছিল। কানন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, সীমা, পরাগ এসেছে।

* * *

একটা বিরাট ঝড় হ'য়ে গেছে, এইটুকুই তার মনে পড়ে। কিন্তু চোখের সামনে সে ঝড়ের কোন চিহ্নই তখন নেই।

সীমা চেয়ে দেখলো, পরাগ তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সীমা কিছুক্ষণ পরাগের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ তার বিস্তৃত জানুর ওপর একটা হাত রেখে বললো, মেজদা' কোথায় ?

পরাগ অতি আস্তে বললো, ডাক্তার ডাকতে গেছে।

ডাক্তার ?—সীমা একটু হাসলো। তার পরে পরাগের মুখের দিকে মুখ তুলে বললো, আমার কপালে হাত দিয়ে দেখোতো, সত্যি আমার জ্বর হয়েছে ?

পরাগ সীমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়তেই সীমা পরাগের গলা দুইহাতে সবলে বেষ্টন ক'রে ধ'রে বললো, ডাক্তার এসে কি করবে পরাগদা' ? আমার রোগ সে ধরতে পারবে না,—আমাকে এখন বাঁচাতে পার এক তুমি।

পরাগ সীমাকে চিনতো। কাজেই সে কিছুমাত্র বিস্মিত হ'লো না, বিচলিতও হ'লো না। অতি সংযতকণ্ঠে বললো, সীমা, সমাজ যে তোমাকে বাঁচাবার অধিকার আমাকে দেবে না, নইলে—

সীমা পরাগের কথায় বাধা দিয়ে বললো, সমাজ আমি মানব না পরাগদা', সমাজ আমার মুখ চায়নি। সমাজের বুকে এম্‌নি আমার মত কত হতভাগিনীর না জানি মৃত্যু হ'য়ে গেছে, সমাজ কি তার খোঁজ রাখে ? কিন্তু আমি নীরবে মৃত্যু বরণ করতে পারব না, আমি বিদ্রোহ জানাব।

পরাগ বললো, সে হয় না সীমা।

হয় না ? তুমি ভয় পাচ্ছ পরাগদা' ? তোমার যশ, তোমার সুনাম, তোমার দেশমাতৃকার সেবা—এসব বিসর্জ্জন দিতে হবে ব'লে ? কিন্তু একদিন এই দেশকে ভালবাসতে শিখেছিলে কার কাছে থেকে শুনি ? এই প্রেরণা তোমায় কে যোগাতো শুনি ? তার মৃত্যু তুমি সহ্য করতে পারবে ?—সীমা বললো।

পরাগ বললো, পারব না জানি।

সীমা খুব জোর দিয়ে হেসে উঠলো।

* * *

একবার এখানে আসতে পারবে ?

না।

কেন ? সন্ধ্যের পরেও একবার পারবে না ?

হয়তো পারতে পারি, কিন্তু ইচ্ছে বিশেষ নেই ; তবে যদি তেমন কিছু কাজ থাকে—

ধর', কাজ কিছু নেই, শুধু গল্প করবার জন্যে ডাকছি। আসতে পারবে ?

টেলিফোনে কানন ও বর্ণার মধ্যে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। কানন বর্ণার কথার ধরণে বিরক্ত হ'লো। উত্তর দেবার তার ইচ্ছা ছিল না, তবু কি ভেবে সে বললো, গল্প করবার মত সময় আমার সত্যি নেই। সীমা আজ দেওঘর যাচ্ছে, সে জন্যে একটু ব্যস্ত আছি। কাহিনীকে একবার এখানে আসতে বলতে পার' ? সীমা তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। দেরী হ'লে কিন্তু দেখা হবে না।

কে ? সীমাদি' এসেছ ? কই, সে-কথাতো এর আগে আমাদের জানাওনি। কবে এলো ? দেওঘর যাচ্ছে, কেন ? বাঃ, বেশ লোক তুমি যা' হোক্, দিদিকে আসতে বলতে পারলে, আর আমাকে—?

আচ্ছা তোমাকেও বলছি। ভুল হ'য়ে গেছ্‌লো। এলেই সব শুনতে পাবে। বিলম্ব হ'লে কিন্তু সীমার সঙ্গে দেখা হবে না।

বিলম্ব হবে না। প্রদীপদা'র কার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বেড়াতে বেরুচ্ছিলাম, বেড়ানো আজকের মত স্থগিত রইলো, তোমাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যেই এখন বেরুবো। মিনিট পাঁচ ছ'য়ের মধ্যেই আমাদের সদলবলে আশা করতে পার। আচ্ছা, নমস্কার !

বাড়ীর গেটে কানন প্রদীপের গাড়ীর আগমন প্রতীক্ষা ক'রে দাঁড়িয়েছিল, আর মনে মনে ভাবছিল, সীমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা। সীমার জীবনের ওপর এখন কাননের খুব বেশী অধিকার নেই সত্য, কিন্তু দায়িত্ব একটা আছে এবং

সে দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে একটু বিচলিত হ'য়ে উঠেছিল। সীমা অতি শৈশব থেকেই একটু অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ, কাজেই সীমাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলতে দেওয়ার মধ্যে বাধা অনেক। কানন সে কারণেই আরও বিচলিত হ'য়েছিল বেশী। জ্যেঠাইমার সঙ্গে পরামর্শের ফলে ঠিক হ'য়েছিল যে, সীমা কিছুদিনের জন্য আপাততঃ জ্যেঠাইমার সঙ্গে তার দেওঘরের বাড়ীতে গিয়ে থাকবে, তার পরে তার স্বাস্থ্য এবং মনের অবস্থা একটু পরিবর্ত্তিত হ'লে তখন যা হয় একটা ব্যবস্থা ঠিক করা যাবে। তার মনের এ অসুস্থ অবস্থায় তাকে স্বাধীন ইচ্ছার অনুশাসনে চলতে দিলে সুফল নিশ্চয়ই ফলবে না। হয়তো, এমন কোন বিপদের মধ্যে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে যে, সেখান থেকে সকলের আপ্রাণ চেষ্টাতেও তার মুক্তি সহজ হ'য়ে উঠবে না। কানন জ্যেঠাইমার এ পরামর্শে কতকটা আশ্বস্ত হ'য়েছিল সত্য, কিন্তু সীমার স্বামী পশুপতির কথা যতই সে ভাবতে যায় ততই সীমার সম্বন্ধে হতাশা তার হৃদয়-মনকে নিবিড়ভাবে নিপীড়ন করতে থাকে। পশুপতিকে সীমা পশুরাজ আখ্যা দিয়েছে এবং এর চেয়ে সত্য পরিচয় বোধ করি পশুপতির আর কিছু নেই। এই সামান্য একটা কথার ভেতর দিয়ে তার চরিত্র এমন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যে আর কিছুতে তা কখনও সম্ভব হ'তো না। কানন তা বিশ্বাস করে।

প্রদীপের সিত্রোঁয়া কারখানা কাননদের গেটে এসে থামতেই কাননের চমক্ ভাঙলো। এগিয়ে গিয়ে সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো, তোমাদের বেড়াতে যাবার আনন্দটা মাটি করতে আজ বাধ্য হ'লাম সীমার অনুরোধে। প্রদীপ সে জন্যে নিশ্চয়ই আমার ওপর চটেছে, কিন্তু এ ভিন্ন সীমার সঙ্গে তোমাদের কারো হয়তো দেখা হ'তো না।

প্রদীপ মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে বললো, সব সময়ে মানুষকে নিজের মন দিয়ে যাচাই করা ঠিক না কাননদা'।

ঝর্ণা গাড়ী থেকে নেমে গেটের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে বললো, মনের প্রসারতার যাদের অভাব তাদের পক্ষে এ অত্যন্ত অন্যায়।

কাহিনী কাননের কাছে এগিয়ে এসে বললো, সীমা হঠাৎ শ্বশুরবাড়ীর গারদ থেকে খালাস পেল কেমন ক'রে?

কানন সকলকে নিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'তেই কাহিনীর কথার উত্তরে বললো, খালাস পায়নি, গারদ ভেঙ্গে পালিয়ে আসতে বাধ্য হ'য়েছে।

বল' কি কাননদা'?

হুঁ, ওর মুখেই সব শুনতে পাবে। আমি সব কথা ওর শুনিনি এখনও।

সীমার কক্ষে কানন যখন সকলকে এনে হাজির করলো তখন সীমা জ্যেঠাইমার কোলে মাথা রেখে পশুরাজের হাতে যে লাঞ্ছনা এতকাল সে নীরবে সহ্য করতে বাধ্য হ'য়েছে তারই একটা যথাসম্ভব সবিস্তার বর্ণনা দিতে চেষ্টা করছিল। তাদের আগমনে সে নীরব হ'য়ে উঠে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু জ্যেঠাইমা তাকে উঠতে দিলেন না, বাধা দিয়ে বললেন, তুই একটুতেই বড় উত্তেজিত হ'য়ে উঠিস সীমা। ডাক্তারের নিষেধ তোর মোটেই মনে থাকে না। ওরা এসেছে ব'লেই কি তোর উঠে বসতে হবে না কি? কাহিনী, ঝর্ণা, প্রদীপ, তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ব'স্ না। কানন, ওদের বসতে দে'।

কাহিনী সীমার খাটের একপাশে ব'সে পড়ে সীমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে জ্যেঠাইমার মুখের দিকে চেয়ে বললো, তোমাকে এখানে যে আশাই করতে পারিনি জেঠাইমা। তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে?

জ্যেঠাইমা মৃদু একটু হেসে বললেন, কপালের লেখা ভাই, সবই কপালের লেখা! কপালে লেখা থাকলেই এসে জুটতে হয়। সীমার টানে আসতে বাধ্য হ'য়েছি।

কাননও মৃদু হেসে বললো, শুধু কি তাই জ্যেঠাইমা? মানুষের দুর্দ্দিনের গন্ধ তোমার নাকে পৌঁছয় সবার আগে, ফলে দুর্ভোগও ভুগতে হয় সবার চেয়ে তোমাকেই বেশী। শুধু রাঙাদি'র দুর্দ্দিনে তার মা হ'য়েও তুমি কোন সাহায্য তাকে করতে পারলে না—এর চেয়ে দুর্ভাগ্য মানুষের আর কি হ'তে পারে জ্যেঠাইমা?

জ্যেঠাইমা ইঙ্গিতে কাননকে ধমক দিয়ে বললেন, কি যে ছেলেমানুষি করিস্ কানন! তারপরে সীমার দিকে ফিরে বললেন, কাহিনী, ঝর্ণা, প্রদীপ, ওদের সঙ্গে তুই আর

ততক্ষণ—দেখি, ওদের এক কাপ চা খাওয়াতে পারি কিনা।

কাহিনী, ঝর্ণা ও প্রদীপ প্রায় একসঙ্গেই জ্যেঠাইমাকে বাধা দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু জ্যেঠাইমা সে দিকে কর্ণপাত না ক'রে উঠে চ'লে গেলেন।

কাহিনী কিছুক্ষণের জন্য সীমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে হঠাৎ একটু চমক খেয়ে প্রশ্ন ক'রে বসলো, ক'মাস তারা তোকে খেতে দেয়নি শুনি?

সীমা হাসতে চেষ্টা করলো। তার পরে অপ্রতিভের মত কাহিনীর একটা হাতের আঙুলগুলো নিজের হাতের আঙুলের মধ্যে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললো, মানুষের মনকে পা দিয়ে থেঁৎলে তার মুখে অন্ন দিলে সে অন্ন তার পাকস্থলী পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পায় না। না, থাক্ সে সব কথা। ঝর্ণা, কেমন আছিস ভাই? তোর মুখে যে কথা নেই আজ।

ঝর্ণা একটু চকিত হ'য়ে বললো, কথা ঘরে ঢোকার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও ঠোঁটের আগে এসেছিল, কিন্তু ঘরে ঢুকেই তা আবার নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। বাবা, বাবা, তোমার এ কি চেহারা হয়েছে সীমাদি'?

সীমা ঝর্ণার মুখের দিকে নিষ্প্রভ হাসিতে চেয়ে বললো, শরীরের তাগিদেই জ্যেঠাইমার সঙ্গে আজ দেওঘর যাচ্ছি। যাক্ সে কথা, তোর এবার কোন ইয়ার হ'লো? সেকণ্ড-ইয়ার বুঝি? কাহিনী, তোর এটা ফোর্থ-ইয়ারতো, না? আমি আজ পড়লে আমারও ফোর্থ-ইয়ার হ'তো। তোরা বেশ সুখী ভাই। বাবার যে কি পোড়া আমার বিয়ে দেবার জন্যে খেয়াল হ'য়েছিল।

কাহিনী ব'লে উঠলো, জ্যেঠাবাবু বেশীদিন বাঁচবেন না বুঝেই হয়তো এমন ক'রেছিলেন। তোর বিয়ে দিয়েইতো তিনি বিদায় নিলেন। ভাগ্যবান বলতে হয় বটে!

হুঁ, বাবা ভাগ্যবান বই কি!

আর দুর্ভাগ্য যত আমার।—ব'লে কানন প্রদীপের কাছে এগিয়ে এসে বললো, বেচারী প্রদীপ কথা কওয়ার লোক না পেয়ে নীরবে ব'সে আছে, সে দুর্ভাবনাও ভাবতে হয় আমাকেই। একে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলি বল'? চল্ প্রদীপ, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে না হয় একটু গল্পগুজব করি। মেয়েদের মোটেই বিশ্বাস করতে নেই ভাই, ওরা সব পারে। এই যেমন—তোমার গাড়ী ক'রে বেড়াতে যাবে অন্য বাড়ীতে, তারপরে তোমাকে পাশে বসিয়ে তোমার কথা একরকম ভুলেই এমন মেয়েলি সব গল্প ফেঁদে বসবে যে, তুমিতো অতিষ্ঠ হবেই, অধিকন্তু হবে বেকুব। তারপরে তোমার গাড়ী চ'ড়েই আবার ফিরবেন তাঁরা বাড়ী। এটা হ'লো মেয়েদের স্বভাবজ ধর্ম্ম।

কাহিনী উত্তরে বললো, পুরুষের ধর্ম্ম যে কি সে আর এখন ব'লে কাজ নেই। কাননদা', সেই বেশ, তোমরা দু'জনে ওঘরে ততক্ষণ একটু গল্পগুজব কর' গে'।

কানন ও প্রদীপ সে কক্ষ ত্যাগ ক'রে গেলে কাহিনী বললো, সত্যি ভাই সীমা, আমি তো কিছুই এর ভেবে ঠিক করতে পারছি না। তোর শরীরের হঠাৎ এমন হালই বা হ'লো কি ক'রে, আর জ্যেঠাইমাকে এনে হাজিরই বা করলি কেমন ক'রে? জ্যেঠাইমা তো কারও বাড়ী কোনদিন যান না ব'লেই জানি।

সীমা বললো, কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়, কিন্তু জ্যেঠাইমা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন ব'লেই হয়তো—

* * * *

ট্রেন ছাড়ার অল্পই বিলম্ব ছিল। পরাগ এক ঝুড়ি ফল নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে যে সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরার সামনে কানন, প্রদীপ, কাহিনী ও ঝর্ণা দাঁড়িয়েছিল সেখানে এসে উপস্থিত হ'লো। সবাই তার পরিশ্রান্ত ও ক্লান্তকাতর মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে সে একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললো, বাড়ীর ঘড়িটা যে এমন বেয়াড়া রকম স্লো যাচ্ছে তা কি জানতাম। আর একটু হ'লেই হয়তো ট্রেন ছেড়ে দিত। খুব সময়ে এসে পৌঁছনো গেছে যা' হোক্।

সীমা গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো, আমি ভাবলাম, বুঝি কোন পার্কের সভাসমিতিতে যোগ দিতে গেছ', যাবার আগে দেখাটাও আর হ'লো না। হাতে ও তোমার কিসের ঝুড়ি পরাগদা'?

না, ও এমন কিছু না, সামান্য ফল আছে ওতে— তোমাদের পথের জন্য।—ব'লে পরাগ গাড়ীর দরজাটা খুলে সেটা ভেতরে রাখতে গেল।

জ্যেঠাইমা বললেন, ওসবের কি দরকার ছিল পরাগ? আমি বিধবা মানুষ—এ যাবৎকাল পথে জলস্পর্শ করিনি, বাকী দিন ক'টাও করবো না, আর কানন যে ফল দিয়েছে সঙ্গে তা'তেই সীমার চ'লে যাবে, মিথ্যে কতকগুলো পয়সা নষ্ট করা হ'লো বইতো না।

সীমা পরাগের মুখের দিকে চেয়ে তার অপ্রতিভতা উপলব্ধি ক'রেই তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, পয়সা নষ্ট হবে কেন জ্যেঠাইমা? পরাগদা' দশের জন্যেই তো নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ব'সে আছে, তার কেনা ফলগুলো যা আমার ব্যবহারের পরেও বাড়্তি হবে তা পথের লোককে বিলিয়ে দিলে ওর পয়সা নষ্ট করা হবে না নিশ্চয়ই। কি বল' পরাগদা'?

পরাগ কিছুই উত্তরে বলার প্রয়োজন অনুভব করলো না। শুধু কথাটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যেই বললো, আমার না এলেও চলতো এখন দেখতে পাচ্ছি। এদের সব কোথা থেকে সঙ্গী করলে কাননদা'?

কানন কি যেন বলতে যাচ্ছিল সীমা বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো, এরা সঙ্গে না এলেও তো আমার যাওয়া হ'তো, তবে মিথ্যে তুমি তা জেনেও এলে কেন পরাগদা'?

কানন সীমাকে আস্তে একটা ধমক দিয়ে বললো, পরাগ বুদ্ধিমানের কাজই ক'রেছে বরং। বাবা, মেয়েরা ত্রুটি ধরতে যা ওস্তাদ—না এলে এর জন্যে পরাগকে আজীবন কথা শুনতে হ'তো। প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, কারণ-অকারণের মূল্য মেয়েদের কাছে নেই বললেই চলে। ঠিক কিনা জ্যেঠাইমা?

জ্যেঠাইমার উত্তরের পূর্ব্বেই ঝর্ণা রুখে উঠে বল্লো, না, কিছুতেই ঠিক না। বল' না সীমাদি'। কাননদা'কে বলবার সুযোগ দিয়ে দিয়ে আমরা ওর দুঃসাহস বড্ড বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন আর কিছুতেই ওর বাধে না।

কানন মৃদু একটু হেসে উঠে ঝর্ণার এই দাপটের আভ্যন্তরীণ গুরুত্ব লুপ্ত ক'রে দিয়ে ব্যাপারটাকে অত্যন্ত অর্থহীন হাল্কা ক'রে তুললো।

ঝর্ণা পুনর্ব্বার সে দিক দিয়ে কোন কথা তুলতে আর সাহসী হ'লো না।

ওদিকে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা গেল বেজে। সবাই চকিত হ'য়ে উঠলো।

এমন সময় সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ একজন লোক এ-পাশে ও-পাশে ছুটাছুটি ক'রে তাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত উগ্রকণ্ঠে কাননকে প্রশ্ন করলো, সীমা কোথায়? সীমা দেওঘর যাচ্ছে? কার সঙ্গে?

তার কণ্ঠের উগ্রতায় কানন পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হ'য়ে গেছলো, শুধু স্তম্ভিত হননি জ্যেঠাইমা। তিনি বললেন, কে, পশুপতি না? হুঁ, সীমাকে আমিই দেওঘর নিয়ে যাচ্ছি, আর যে পর্য্যন্ত না সীমার স্বাস্থ্য ভাল হয় সে পর্য্যন্ত ওকে আমি কল্কাতা আসতে দোবো না।

পশুপতি ততোধিক উগ্রকণ্ঠে বললো, না, ভাল হ'য়ে গেলেও কল্কাতা পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই। বরং পরাগবাবুকে একখানা চিঠি লিখে তাঁর কাছেই পাঠাবেন।

পরাগ ক্ষিপ্তের মত পশুপতির একখানা হাত ধ'রে তাকে আক্রমণের উদ্যোগ করতেই সীমা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো, ছিঃ পরাগদা', পশুরাজ আর যাই হোক্ আমার স্বামীতো!

থাক্, ও পরিচয় ভবিষ্যতে আর না দিলেই আমি সুখী হব'।—ব'লে পশুপতি অনায়াসেই পরাগের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

পশুপতির চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার মুখ একটা নীরব বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল। কারও মুখে ভাষা ছিল না। সেই উগ্র বিষণ্ণ ভয়াবহ মুহূর্ত্তে সহসা ট্রেন চলতে সুরু করলো। সকলে একটা পরম পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

কাহিনী বললো, গিয়ে চিঠি দিস্ কিন্তু সীমা।

সীমা উত্তরে কিছুই বললো না। কাহিনী ভাল ক'রে লক্ষ্য করেনি, নইলে দেখতে পেত সীমার চোখে দুই বিন্দু জল টল্মল্ করছে।

ট্রেনখানা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা অত্যন্ত ফাঁকা মনে হ'লো সেই ফাঁকা স্থানটা উপস্থিত সবার মনের প্রতীক ব'লে কাননের মনে হ'লো। কানন পরাগের কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বললো, প্রদীপের 'কার'-এ কাহিনী আর ঝর্ণা যাক্, আমরা বাসে যাই, কেমন?

কাহিনী বললো, না, সে হবে না। একসঙ্গেই সব যাব।

প্রদীপও বললো, না, সে হয় না কাননদা'।

কাননকে রাজী হ'তেই হ'লো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

বিতর্কিকা

১। আমাদের প্রাদেশিকতা

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

অনেকের মুখে শুনতে পাই, প্রাদেশিকতার ধুঁয়ো ধরে সঙ্কীর্ণ চিত্তবৃত্তির পরিচয় দেওয়া বাঙালীর স্বভাব নয়। অন্ন যদি নাই জোটে, না জুটুক। তবু প্রাদেশিকতা বোধের প্রেরণায় নিজের প্রদেশের অন্নের বাজারে ভিন্-প্রদেশী ভাইয়াদের সঙ্গে লাঠালাঠি করব, তা বাঙালীর জাতীয়তাবাদী চিত্ত কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। কিন্তু তাই বলে প্রাদেশিকতার ভেদবুদ্ধি আমাদের যে নেই,—এ কথা স্বীকার করতে পারি না। বস্তুতঃ আমাদের প্রাদেশিকতা বড় অদ্ভুত ধরণের।

প্রাদেশিকতা বোধের প্রেরণায় বেহারীরা যখন বলে, বেহার বেহারীদের জন্যে, তার মধ্যে অন্ততঃ একটা ন্যায়-সঙ্গতা আছে। অপর প্রদেশের লোক প্রায় বড় বড় সরকারী ও বেসরকারী চাকরীর পদ ভর্ত্তি ক'রে রাখার জন্যে যদি বেকার ভদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত বেহারীরা আন্দোলন তুলে অন্ন সংস্থানের চেষ্টা করে, জীব-ধর্ম্মের দিক থেকে তা কি অন্যায়? আমাদের প্রাদেশিকতা বোধ অবশ্য এরকম ভাবে নিজের প্রতিবেশী নিরন্নের মুখে অন্ন যোগাবার আন্দোলন করে না। ব্যবসাক্ষেত্রে অনগ্রসর বাঙালীর কোন গঠনমূলক কাজে এ প্রাদেশিকবোধ প্রেরণা দেয় না। এর উৎসমুখে আছে, আমাদের বাঙালীদের অস্বাভাবিক অভিমান। বাঙালীর মত ভদ্রজাতি আর নেই। আমাদের সংস্কৃতির কাছে অপর প্রদেশের উচ্চশ্রেণীও অতি নগণ্য—এই ধরণের একটা মিথ্যা ধারণা আমাদের আপামর জনসাধারণের মনে খুব প্রবল হয়ে আছে। তাই বাঙালীর উর্ব্বর মস্তিষ্ক আবিষ্কার করেছে এক একটি প্রাদেশিক জাতির জন্যে এক একটি আখ্যা। উৎকলী হচ্ছেন উড়ে, হিন্দুস্থানী খোট্টা, মাড়োয়ারী মেড়ো। এর মূলে যে দীর্ঘদিনের অকারণ ঘৃণা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, তার জন্যে উৎকলী হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারীর লজ্জা নেই, লজ্জা আমাদের। দাম্ভিক মেকলে সাহেব যখন কয়েক বছরের কয়েকটি বাঙালীর সংসর্গ-প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার জোরে সারা জাতটাকে গালি দিয়েছিল, "what the horns are to the buffalo, what the paw is to the tiger, what the sting is to the bee, what beauty, according to the old Greek song, is to woman, deceit is to the Bengalee. Large promises, smooth excuses, elaborate tissues of circumstantial falsehood, chicanery, perjury, forgery, are the weapons, offensive and defensive, of the people of the Lower Ganges." ("Warren Hastings.") তাতে আমাদের লজ্জার চেয়েও বেশী লজ্জা হবার কথা মেকলে সাহেবের নিজেরই, কারণ মস্তিষ্কের সাধারণ অবস্থায় মানুষ কখনও একটা সমগ্র মানুষ-গোষ্ঠির বিরুদ্ধে এরকম দাম্ভিকতা প্রকাশ করতে সাহস করে না। সভ্য মানুষের

মনে যত স্পষ্টবাদিতার দম্ভই থাক, অন্ততঃ ভদ্রতা বলে আরো একটা বস্তুও তার আছে। অপর প্রদেশের প্রাদেশিকতা যেন মৌমাছির হুল। তাতে যদি বাঙালীর বিরুদ্ধে হুল থাকে তবু নিজেদের নিয়ম ভাইদের জন্তে মধু সঞ্চয় চেষ্টার অভাব নেই। আমাদের প্রাদেশিকতায় আছে শুধু কাঁটা। তাতে শুধু অভিমানী ভিন্‌প্রদেশী ভাইয়ার অপমান-ক্ষুব্ধ বুক থেকে রক্তই ঝরে।

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের গোড়ার দিকে হয়ত বাঙালীর তুলনায় উৎকলী ছিলেন উড়ে, হিন্দুস্থানী খোট্টা, মাড়োয়ারী মেড়ো, কিন্তু আজ আর তা নেই। আজ সকলের ঘরেই শিক্ষা বিস্তার হয়েচে। এমন কি, কোন কোন প্রদেশ অনুপাতে আমাদের শিক্ষিত সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের মত বিস্তৃত না হোক, সকল প্রদেশেই শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে একটা মানুষ গোষ্ঠি গড়ে উঠেছে। আমাদের চেয়ে কোনদিকে তারা অনগ্রসর নন। স্বীকার করি, সারা ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসারের জন্তে বাঙলার মনীষীরা খুব চেষ্টা করেছেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গোড়াপত্তনও এই বাঙালীর কীর্ত্তি। কিন্তু তা বলে অপরের কৃতজ্ঞতা আদায় করার পন্থা হচ্ছে কি অকারণে তাদের গালাগালি দেওয়া,—স্থানে অস্থানে তাদের ওপর ঘৃণা প্রকাশ করা। 'ঘৃণা' বললে ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। মনে মনে যদি অবাঙালীর ওপর নির্জ্জলা ঘৃণা থাকত, তাহলে অন্ততঃ অশিক্ষিত, অপরিষ্কার হিন্দুস্থানী দোকানে খাবার খেতে আমাদের মনে সঙ্কোচ আসত। ফলে, কোলকাতার পাড়ায় পাড়ায় অগুণতি হিন্দুস্থানী-খাবারের দোকান গজিয়ে উঠত না, আর মাড়োয়ারীর ভেজাল ঘিয়ের কারবার ফেঁপে উঠত না। আমাদের অন্তঃপুরের অন্নপূর্ণার আসন বেরসিক উৎকলী বামুনদের একচেটে হতনা। সত্যিকার জাতি-অভিমান কোনজাতির লজ্জার কথা নয়। আত্ম-গরিমা বোধ থেকে এই অভিমান যেমন জেগে ওঠে, আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে এই অভিমান তেমনি উৎসাহ দেয়। আমাদের বাঙালীদের দাম্ভিকতা যদি সত্যিকার জাতি-অভিমান থেকে জাগত, তাহলে এর মূর্ত্তি হত অন্যরূপ। যে কলেজে পড়তুম, সেখানে বেহারী, পাঞ্জাবী, ইউ-পি, আসামী বর্ম্মণ সকল প্রদেশী ছাত্রদের আসা-যাওয়া ছিল। দেখতুম, আমরা বাঙালী যে সব ছাত্রেরা ভদ্র বিপ্রদেশী ছাত্রদের খোট্টা, মেড়ো, বর্ম্মী বলে কারণে অকারণে কটূক্তি করতুম, সেই আমরাই বা আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা আবার বড়বাজারে এসে বিপ্রদেশী ফেরিওয়ালার কাছে আম বা কপি অথবা মেওয়া কেনবার সময় বেশী পয়সা দিয়ে গুণতিতে কম মাল নিয়ে উপরন্ত 'যা যা বাঙালীবাবু' রূপ দাঁতখিঁচোন গালাগালি খেয়ে দিব্যি আরামে বাড়ী ফিরে যেতুম। বাঙালীদের অভিমান তখন আমাদের চিত্তে কোন শক্তি সঞ্চার করতে পারে না। খুব সূক্ষ্ম যাঁদের মন, তাঁরা হয়ত হাওড়ার পুলে উঠে মনে মনে দু-একবার আওড়ে নেন, 'খোট্টা ত' একেবারে খোট্টা! বেটারা কি বদমাস হয়ে উঠেছে!' কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই পরের দিন আবার সেই ফেরিওয়ালার কাছেই মিঠাবুলি দিয়ে কিছু বেশী মাল আদায়ের চেষ্টায় দেখেছি তাঁদের দাদা, বাছা, ভাই বলে সম্বোধন করতে। অন্য প্রদেশের ভদ্রলোক যাঁদের কাছে অকারণে পেলে 'খোট্টা' সম্বোধন, তাঁদের মুখেই যারা সত্যি হয়ে উঠেছে 'খোট্টা' বা বদমাস সেই সব বিপ্রদেশীয় নিম্নশ্রেণীর ফেরিওয়ালা আপ্যায়িত হয়ে শুনল, দাদা, বাছা, ভাই। মানুষের দাম্ভিকতা যখন তাকে অন্ধ করে ফেলে, তখন এমনি অভদ্র কাপুরুষের মতন আচরণ তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কোন জাত অপর এক জাতকে উপহাস করার জন্তে অপনাম সৃষ্টি করেছে, এমন দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নয়। আমেরিকার বদনাম আছে 'ইয়াঙ্কি'। ইউরোপীয়নরা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বলে 'চি-চি'। কোন ইংরেজ যখন কারো পরিচয় দিতে গিয়ে চুপি চুপি বলে, 'ও একজন স্কচ', তার মধ্যে আছে ঐ একই মনোভাব। কিন্তু তা বলে তারা কারণে অকারণে লোককে গায়ে পড়ে শোনায় না, ওহে তুমি স্কচ, তুমি ইয়াঙ্কি। আমরা কিন্তু স্থানে অস্থানে অকারণে বিপ্রদেশীয় ভদ্রলোকদের অপ-নাম ধরে ডাকতে কুণ্ঠিত হই না। যার নিজস্ব আত্ম-অভিমান আছে সে কখন অকারণে অপর লোকের আত্ম-অভিমানে আঘাত দিতে পারে না।

২। শিক্ষিত বাঙালী যুবকের বেকার সমস্যা

শ্রীনিখিলকৃষ্ণ মিত্র

কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা আছে অথচ কর্ম্মের অভাবে খাইতে পাইতেছি না ;—স্বাস্থ্য আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, কর্ম্মতৎপরতারও হয়ত অভাব নাই, অথচ শুধু সুযোগের অভাবে শিশুকাল হইতে যে সব বৃহৎ আশা ও উচ্চ লক্ষ্য ও আদর্শ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছি সে সবই ব্যর্থ হইতে চলিল, ইহার অপেক্ষা করুণ ও ট্রাজিক ব্যাপার আর কি আছে ? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শতকরা ৯০ জন যুবকের ইতিহাস এই ব্যর্থতার ইতিহাস।

প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বসিয়া দেশের নেতারা এই সমস্যার সমাধান সচেষ্টতার পরিচয় দিয়া তাঁহাদের নেতৃত্ব বজায় রাখিতে প্রয়াসী হইতেছেন। কেহ বলিতেছেন গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া কৃষি অবলম্বন কর, কেহ বলিতেছেন কুটীর-শিল্প ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বস্তুতঃ এই সকল নেতারা দেশকে জানিয়াছেন সহরে বসিয়া, দেশের কথা ভাবিয়াছেন বক্তৃতার নিখিল সভায় উপস্থিত হইয়া। তাই তাঁহারা এত বড় জটিল বিষয়ের মীমাংসা এত সহজে করিতে পারিয়াছেন।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে প্রচুর জমি রহিয়াছে ; তাঁহারা যদি ঐ সকল জমি নিজেরা চাষ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের আর চাকুরীর দিকে ঝুঁকিতে হয় না। কিন্তু প্রথম কথা, দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে এতটা খাস জমি নাই যাহা চাষ করিয়া তাঁহারা এমন কি সাধারণ কৃষকের মত করিয়া নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, খুব কম পতিত জমিই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হস্তে রহিয়াছে। যা' কিছু চাষ-যোগ্য জমি তাঁহাদের আছে, তাহা কৃষকদের দ্বারা চাষ করাইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ তাঁহারা গ্রহণ করেন। এখন এই সমস্ত জমি শিক্ষিত যুবকেরা যদি নিজেরাই চাষ করিতে আরম্ভ করেন, তবে অনেক কৃষকের আয় কমিয়া যাইবে, এমন কি অনেক কৃষক বেকারও হইতে পারে। ফলে, কৃষকদের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে মনোমালিন্যের ধোঁয়া আছে তাহা গাঢ়তর হইয়া উঠিবে।

কেহ কেহ বলিতেছেন, যদি পুরাতন প্রণালীতে চাষবাস না করিয়া আধুনিক প্রণালী অবলম্বন করা যায়,—যদি পুরাতন লাঙ্গল উঠাইয়া দিয়া কলের লাঙ্গল ব্যবহার করা যায়—তাহা হইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকেরা নিজেদের মত করিয়াই নিজেদের গ্রাসচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কথাটা শুনিতে খুব ভাল। কিন্তু এই প্রস্তাব বর্ত্তমানে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। আধুনিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে এক সঙ্গে অনেক জমি আবশ্যক ; নতুবা, ফসলের উৎপাদন খরচা পুরাতন প্রণালীতে উৎপন্ন ফসলের উৎপাদন-খরচা অপেক্ষা কম ত হইবেই না, বেশী হইবার খুব সম্ভাবনা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হস্তে এত অর্থ নাই যদ্বারা তাঁহারা নিজেরা চাষ করিবার মত অধিক জমি খরিদ করিতে পারেন। তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যাউক যে ধনিক শ্রেণীর বা গবর্ণমেণ্টের সহযোগে তাঁহারা আধুনিক উপায়ে চাষবাস করিবার উপযোগী বিস্তৃত জমি পাইবেন। এই সকল জমি তাঁহাদের কৃষকদের নিকট হইতে খরিদ করিতে হইবে। যে সকল কৃষকের নিকট হইতে এই সব জমি ক্রয় করিতে হইবে, তাহাদের অন্য কৃষকের নিকট বা জমি ক্রেতার নিকট নিজেদের শ্রমবিক্রয় করিয়া ভবিষ্যতের অন্ন সমস্যা পূরণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে, কৃষকেরা তাহাদের শ্রমের আধিক্য হেতু শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় না, তাহার পর আধুনিক উপায়ে চাষ বাস করিবার দরুণ কায়িক শ্রমের আবশ্যকতা কম পরিমাণে হ্রাস পাইলে, কৃষকদের মধ্যে বেকার সমস্যা ভীষণ ভাবে দেখা দিবে। এইজন্য আমাদের বোধ হয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যদি টাকা ধার করিয়াও—টাকা পাইবার সম্ভাবনা খুব কম—আধুনিক উপায়ে জমি চাষ করিতে আরম্ভ করেন, তবে গবর্ণমেণ্ট হয়ত তাঁহাদের এই কার্য্যে বাধা দিবেন। যদি একজন লোকও কোন স্থানে এই প্রণালীতে চাষ

আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সেই স্থানেও এই সমস্যা দেখা দিবে।

বর্ত্তমানে প্রায় সকল সভ্য দেশেই শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া দেশীয় শিল্প প্রভৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। সকল সভ্য দেশই ক্রয় অপেক্ষা বিক্রয় অধিক পরিমাণে করিতে চাহে। এদিকে আবার উৎপন্ন দ্রব্যাদি যথোপযুক্ত পরিমাণে বিক্রীত না হওয়ায় সকল সভ্যদেশেই অর্থকষ্ট ও বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। বলা বাহুল্য আমাদের দেশেও অর্থকষ্ট ও বেকার সমস্যা অন্যান্য সভ্যদেশ অপেক্ষা কিছুমাত্র কম তীব্র ভাবে দেখা দেয় নাই। উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে বিক্রীত না হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক হ্রাস পাইয়াছে; কিন্তু তবুও কৃষিজাত দ্রব্যের কাটতি আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য আমাদের আবশ্যক তাহা বর্ত্তমানেই আমাদের দেশে উৎপন্ন হইতেছে—বিদেশের সাহায্য ব্যতীতই আমাদের খাদ্যের অভাব পূরণ হইতে পারে। ইহার উপর আধুনিক উপায়ে যদি কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বিদেশে কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা না থাকায়, আমাদের দেশেই দেশজ খাদ্যশস্যের মূল্য অধিক হ্রাস পাইবে। ফলে, কৃষকের দুর্দ্দশার ত এক শেষ হইবেই, পরন্তু যাঁহারা আধুনিক প্রণালীতে চাষবাস করিবেন তাঁহারাও নিরাশ হইবেন। অনেকে হয়ত বলিবেন, কৃষিজাত দ্রব্যের এ দুরাবস্থা সাময়িক। কিন্তু বর্ত্তমানে সকল সভ্যদেশই স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করিতেছে; সুতরাং, ভবিষ্যতের দিকে চাহিলেও আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখা যায় না।

সাধারণতঃ, যে সকল জমি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে পতিত অবস্থায় থাকে তাহা ডাঙ্গা জমি। এই সকল জমিতে ফল-মূল গাছ বাদে শাক্-সব্জী উৎপাদন করিতে পারা যায়। কিন্তু এই সকল ফল মূলের কাটতি গ্রাম্য হাট বাজারে হওয়া মুস্কিল;—হইলেও আমদানী বেশি হওয়ায় মূল্য অত্যধিক কম হইবার সম্ভাবনা। এদিকে আবার মাল চালানের সুবিধা (Transport facility) না থাকায়, এই সকল জিনিষ সহরে ভাল অবস্থায় লওয়া ও উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলিতেছি, ফসলের প্রাচুর্য্য হেতু যখন পাঁজিয়ার (গ্রাম্য) বাজারে পয়সায় ২৫।২৬টি বেগুন বিক্রয় হইতেছিল, তখন যশোহরের বাজারে (২৫ মাইল দূরে) নিকটতম সহরের বাজারে—বেগুনের সের তিন পয়সা ও কলিকাতার বাজারে (১০০ মাইল দূরে) চারিপয়সা সের বিক্রয় হইয়াছে। কিন্তু, তথাপি কলিকাতা বা যশোহরের বাজারে পাঁজিয়া হইতে বেগুন লইয়া বিক্রয় করার সুবিধা হয় নাই। বস্তুতঃ, সহর হইতে দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শাকসব্জী প্রভৃতি আনিয়া সহরের বাজারে বিক্রয় করা অসম্ভব। অবশ্য কেহ কেহ হয়ত কোন বিশেষ জমিতে কোন ফসল করিয়া কিছু কিছু লাভ করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলা চলে যে, এ সকল জমিতে চাষ করিয়া লাভ করা যায় না বলিয়াই এ সকল জমি পতিত রহিয়াছে।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া এবং যে সকল ব্যক্তি চাষবাস আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয়, কৃষিদ্বারা শিক্ষিত যুবকের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না। উপরন্তু এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ, যাহা এখন ধূমায়িত, বৃদ্ধি পাইবে; ফলে হয়ত শ্রেণীগত বিবাদ বাধিয়া দেশে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে।

বেকার সমস্যা সমাধানের অন্য উপায়টী, অর্থাৎ কুটীর-শিল্পের কথা এখন আলোচনা করা যাউক। গবর্ণমেণ্ট এখন স্থানে স্থানে কেন্দ্র খুলিয়া কয়েকটী প্রধান, ও যাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যাইতে পারে এমন, শিল্প শিক্ষিত যুবকদের শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এ ব্যবস্থা অপর্য্যাপ্ত। তাহার উপর যুবকদের স্বাস্থ্যের কথা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া কুটীর-শিল্প যাহাতে গ্রামে গ্রামে—অর্থাৎ সহরে নহে—প্রবর্ত্তিত হয় এ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অথচ, উৎপন্ন দ্রব্যাদির প্রায় সবটাই সহরে বা গ্রামান্তরে বিক্রয় করিতে হইবে। সহরে বা গ্রামে যেখানেই বিক্রয় হউক উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে প্রথম কোন ব্যবসা কেন্দ্রে লইয়া যাইতে হইবে, এবং সেখান হইতে নানাস্থানে বিকীরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এদিকে আবার মাল চালানের (অর্থাৎ Transport facility) সুবিধা না

থাকায় কাঁচামাল আমদানী তৈরী মাল রপ্তানী ও ব্যবসা কেন্দ্র হইতে মাল দেশের সর্ব্বত্র বিকীরণ—এ সকল দিকেই খরচ অত্যধিক পড়িবে। ফলে বিক্রেয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। কুটীর-শিল্পকে সফল করিতে হইলে দেশের সর্ব্বত্র অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে যাহাতে মাল চালানের সুবিধা হয় এ ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। অবশ্য কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তকদের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হইবে যে-স্থলে যেরূপ কাঁচামাল উৎপন্ন হয় সে স্থলে সেরূপ কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন। কিন্তু তবুও অনেক স্থানেই কাঁচামাল আমদানী করিতে হইবে।

যে সকল দ্রব্য আজকাল কুটীর-শিল্পে তৈয়ারী হয় তাহার মহৎ দোষ এই যে, একই আকার প্রকারের (size) দ্রব্য বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় না। এতদুপরি জিনিষের জৌলুষ (finis) ও তেমন আকর্ষণ জনক হয় না। ফলে জিনিষটী প্রয়োজনীয় হইলেও তাহা বিক্রয় করা অতীব দুরূহ। যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য আমাদের নিজস্ব এবং বিদেশীরা সমধিক পছন্দ করেন, তাহাও এই দোষে বিদেশে বিক্রয় করা সুকঠিন। কুটীর শিল্পকে আমাদের দেশে সম্ভাবনাপূর্ণ ও সফল করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে যদিও কোন জিনিষ একাধিক কেন্দ্রে বা স্থানে তৈয়ারী হয়, তাহা যেন একই আকার প্রকারের ও জৌলুষ-যুক্ত হয়। এ ব্যবস্থা কোন ব্যক্তির ও বে-সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করা কঠিন। এজন্য একটী কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় হওয়া উচিত—সেখানকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞগণ জিনিষের আকার প্রকার নিরূপণ করিয়া দিবেন এবং যাহাতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আকারের ও জৌলুষের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। এতদ্ভিন্ন কোন কোন শিল্প কোন কোন কেন্দ্রের উপযোগী, নূতন নূতন কি কি কুটীর শিল্পই বা প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে, কোনও শিল্পে লোকসান হইলে কেন লোকসান হইল, এই সব অনুসন্ধান ও গবেষণার ভারও ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর থাকিবে। বস্তুতঃ কুটীর শিল্পের দ্বারা যদি বেকার সমস্যার নিরসন করিতে হয়, তাহা হইলে উপরিউক্ত বিষয়গুলির প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি যাহাতে আকৃষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

যে সকল কুটীর শিল্প প্রবর্ত্তিত হইবে এবং প্রবর্ত্তনের উপযোগী বলিয়া গবর্ণমেণ্ট মনে করেন সেই সকল দ্রব্যাদি যদি বিদেশ হইতে আমদানী হইতে থাকে, তবে আইন করিয়া আমদানী বন্ধ করিতে হইবে। দেশের কোন মিল কর্ত্তৃক যদি নিতান্ত কমদামে এইরূপ দ্রব্য বিক্রয় হইতে থাকে তবে এইরূপ দ্রব্যের দাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত। যদি বিভিন্ন কেন্দ্র নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া দ্রব্যের মূল্য এত কমাইয়া দেন যে তাহাতে শিল্পের বিলোপ সাধন হইতে পারে তাহা হইলে এই শিল্পদ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের থাকিবে। যে সকল নূতন-শিল্প আমাদের কোন ভবিষ্যতে প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা তৈয়ারী করিবার জন্য, এই নূতন-শিল্প প্রবর্ত্তনের পর মিল বা ফ্যাক্টরী স্থাপনা করা যাইবে না। অবশ্য কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ মিল বা ফ্যাক্টরী স্থাপন করিবার অনুমতি দিতে পারেন। অন্যদিকে আবার এই সকল আইনের সুবিধা লইয়া, উচিতমূল্যের অধিক মূল্য জনসাধারণের নিকট হইতে দাবী করা না হয়, তাহার জন্য শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের থাকিবে।

কৃষিদ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান অসম্ভব কেন ও কোন প্রণালী অবলম্বন করিলে কুটীর শিল্পের দ্বারা এই সমস্যার সমাধানে সহায়তা হইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। আমরা সমস্ত দেশের কথা সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি, সেজন্য আমাদের মত ও পথ কোন বিশেষ স্থান বা, কোন বিশেষ ফসল বা শিল্পের প্রতি প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। সেজন্য কোথাও কোথাও হয়ত কৃষিদ্বারাও স্থানীয় বেকার সমস্যার কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে। তবে আমাদের অভিমত এই যে, যাঁহারা কৃষি অবলম্বন কর বলিয়া চীৎকার করিয়া সস্তায় নেতা হইবার চেষ্টা করেন তাঁহারা দেশের ক্ষতি করেন। অন্যদিকে বেকার সমস্যা নির্ম্মূল করিতে হইলে কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন আবশ্যক—ও মিল ও ফ্যাক্টরী আর যাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত।

৩। ছন্দের গঠন

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ

ভাদ্রের 'বিচিত্রা'য় 'ছন্দের গঠন' প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলাম অগ্রহায়ণে তার প্রত্যুত্তর বেরিয়েছে, দেখলাম। প্রশ্নকর্ত্তা আমার উত্তরগুলোকে 'বিচার-সহ' ব'লে মেনে নিতে পারেন নি' কিন্তু কেন যে পারেন নি' তিনিও বিচার সহ তা' প্রকাশ করবার প্রয়োজন মনে করেন নি'। তবে তিনি আমার যুক্তিগুলোর 'খণ্ডন করতে প্রবৃত্ত' না হয়ে সেগুলোর অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে যে এক নূতন পন্থার অনুসরণ ক'রেছেন তা' নিতান্তই হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আমার আগেকার উত্তরে গঠনতত্ত্বের মূল প্রাণবস্তু বিশ্লেষণ ক'রে জিনিষটাকে একটু তলিয়ে দেখিয়ে যে যুক্তিতর্কের অবতারণা ক'রেছিলাম প্রশ্নকর্ত্তা তা'র সমস্তই অত্যন্ত সহজ ও নিশ্চেষ্ট উপায়ে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। তিনি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথের'ও আধুনিকতম কবিতার বই পর্য্যন্ত খুঁজে খুঁজে কয়েকটি ছন্দ-ভুল কবিতার কলি উদ্ধৃত ক'রে বলছেন, "এগুলোতে বহু স্থলেই প্রচলিত ছন্দ-রীতি লঙ্ঘিত হ'য়েছে। কিন্তু তা' বলে ওসব স্থলে ছন্দ অশুদ্ধ হ'য়েছে একথা বলা যায় কি ?" যদি তাই না যায় তা' হ'লে অশুদ্ধ কথাটার সংজ্ঞা নিয়ে একটু গোলে পড়তে হয়। কারণ লেখকের মতে যায় "প্রচলিত ছন্দ-রীতি লঙ্ঘিত" হয় তা' "অশুদ্ধ" নয়; যদি তাই হয় তবে ছন্দের গঠনতত্ত্বের আলোচনা করবার আগে "অশুদ্ধ" কথাটার সংজ্ঞা-গঠন করতে হয়। কারণ একথা কেউ হয়ত অস্বীকার করবেন না যে ছন্দ একটা নিয়ম, আর নিয়মের লঙ্ঘনই হল অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা। সে জন্য ছন্দও যদি তার প্রচলিত রীতি বা নিয়ম লঙ্ঘন করে তা' হলে সেও অনিয়মের বিশৃঙ্খলার মধ্যে এসে দাঁড়ায়। তখন তাকে অশুদ্ধ বলতেও বাধে না। 'প্রচলিত' এক কথা আর শুদ্ধাশুদ্ধই আর এক কথা। 'অশুদ্ধ'ও অনেক ব্যবহারে চলছে কিন্তু তবু তা'কে জোর ক'রে শুদ্ধই বলতে হ'বে, এর স্বপক্ষে কোন যুক্তিই আছে ব'লে জানিনে।

আমি যে যে যুক্তিতর্ক দেখিয়ে প্রশ্নকর্ত্তার প্রথম উপস্থাপিত কবিতাটিকে ছন্দ-বিচারে "অশুদ্ধ" ব'লেছিলাম সেই সেই যুক্তির বলেই তাঁর উদ্ধৃত 'সুধীজনগ্রাহ্য নজীর' গুলোকেও নিঃসঙ্কোচেই "অশুদ্ধ" বলতেই সাহস পাচ্ছি। তার প্রমাণ দেখাতে গিয়ে আজ আমার হয়ত নূতন ক'রে সেই যুক্তিগুলোর পুনরালোচনা না করলেও চলবে। তবু দু' একটি কথা এ সম্পর্কে একেবারে না ব'লে পারছিনে।

প্রশ্নকর্ত্তা আশা করছেন যে "ওসব ছন্দের ব্যতিক্রমের মধ্যে (আমি যা'দের অশুদ্ধ ব'লে নির্দ্দেশ করছি) নবতর ছন্দরীতির প্রকাশ সূচনা হ'য়েছে।" অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে একটা নিয়মের উচ্ছৃঙ্খলা থেকেই একটা শৃঙ্খলার জন্মলাভ হচ্ছে। কিন্তু ছন্দকে যদি একটা নিয়ম ব'লেই মানি তবে তার ব্যতিক্রমকেও আর একটা নূতন নিয়মের জন্মসূচক ব'লে মানব কি ক'রে? সংসারে যেমন নিয়মও আছে তেমনি অনিয়মও আছে, তাই ব'লে অনিয়মগুলোকেও নিয়মের মুখোসই পরিয়ে রাখতে হ'বে এর পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি আছে ব'লে মনে হয় না। অনিয়মগুলো অনিয়ম হ'য়েই থাক্ কিন্তু তাই ব'লে নিয়মকে তা'র প্রাপ্য মর্য্যাদা সব সময়েই দিতে হবে।

আর একটা কথা অতি সংক্ষেপে ব'লে আমার এবারকার বক্তব্য শেষ করব। প্রশ্নকর্ত্তা ছন্দাশুদ্ধি দেখাতে গিয়ে সারা বাংলা সাহিত্য থেকে যে কয়টি কবিতার চরণ সংগ্রহ ক'রেছেন তার অধিকাংশই লৌকিক ছন্দ অর্থাৎ বাংলার প্রাচীন ছড়া পাঁচালী'র ছন্দে লেখা। আদর্শ কাব্যে ছন্দ-বিচারে এদের স্থান নেই। কারণ চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' কিম্বা কৃত্তিবাস - কাশীরামের রামায়ণ মহাভারত এগুলো বিভিন্ন লৌকিক রাগরাগিণীতে গীত হবার উদ্দেশ্যেই গোড়াতে রচিত হ'য়েছিল। আর গুনিের বেলায় কবিতার

অনুরূপ ছন্দ-শাসন সব সময় না মান্‌লেও বড় একটা ক্ষতি হয় না। কারণ এতে এক আধটা বর্ণ কম বেশি থাক্‌লেও ওকে টেনে টেনে কিম্বা একটু তাড়াতাড়ি ক'রে ব'লে নিয়ে গানের কাজ সেরে নেওয়া যায়। অতএব পয়ারের স্বজাতি ব'লে ভুল ক'রে তিনি যে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' থেকে একটি পদ উদ্ধৃত ক'রেছেন, সেটিকে দিয়ে তাঁর যুক্তির প্রতিষ্ঠার কোন সহায়তা হ'তে পারে না। প্রশ্নকর্ত্তার কৃত্তিবাস থেকে উদ্ধৃত চরণটুকু সম্বন্ধেও আমার একই বক্তব্য। যে যুগে নিয়মের অনুশাসন মেনে কোন ছন্দ মোটে জন্মায়ইনি' আজ ছন্দ-তত্ত্বের বিচারের দিন নিজের যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ কর্‌তে দৃষ্টান্ত আহরণের জন্যে সেখানে গিয়ে হাত্‌ড়ালে চল্‌বে কেন ?

তারপর প্রশ্নকর্ত্তা মাইকেল থেকে যে কয়েকটি অনিয়ম-বিন্যস্ত যতি'র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত ক'রেছেন তার সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তা' এই যে, মাইকেলের যতি-সংস্থাপন সব সময় নির্ভুল নয়। কারণ তাঁর অমিত্রাক্ষরের মধ্যেও অনেক জায়গাতেই একাধিকবার তিনি যতিসংস্থাপনে একই ভুল ক'রে গেছেন। মাইকেল যিনি একটু তলিয়ে পড়েছেন, তিনি এ কথা স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হবেন। তা' ছাড়া আগেই ব'লেছি যে গান গাইবার উদ্দেশ্যেই যা' বিশেষ ক'রে লেখা হয় সাধারণ কাব্যানুরূপ ছন্দ-বিচার সেখানে সমীচীন নয়। "ব্রজাঙ্গনা" কাব্য বৈষ্ণব পদাবলীর অনুপ্রেরণায় লেখা ; সে জন্যই এর বাহ্যরূপও তার থেকে স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব হয়নি'।

তারপর সব চাইতে গুরুতর হ'ল প্রশ্নকর্ত্তা রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি ছন্দাশুদ্ধি উদ্ধৃত ক'রেছেন সে গুলোর বিশ্লেষণ। কারণ রবীন্দ্রনাথই হয়ত বাংলা কবিতায় ছন্দ কথাটির জন্মদাতা। অতএব তাঁর যে গুলোকে ভুল ব'লে দেখানো হচ্ছে সেগুলো সম্বন্ধে একটা কিছু না ভেবে চিন্তে রায় দিয়ে বসা নিরাপদ হবে না।

রবীন্দ্র-কাব্য থেকে সর্ব্বসমেত যে নয়টি চরণ উদ্ধৃত ক'রে ছন্দ-বিদ্রোহী ব'লে ঘোষণা করা হচ্ছে তাদের একটি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম রচনা। যে সময়ে তিনি তাঁর "আঁকা-বাঁকা লাইনে ও সরু মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো" নীল খাতাটিকে ছোটখাট ছড়া পাঁচালী ধরণের শৈশব রচনায় ভ'রে তুল্‌ছিলেন সেই সময়কার রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-ভুল একটি রচনা প্রশ্নকর্ত্তার যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ কর্‌তে যে কতখানি সাহায্য কর্‌বে তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। হৃদয়ের উদ্বেল ভাবোচ্ছ্বাসকে বালক-কবি ভাষা ও ছন্দে তখনও আঁটসাট করে তুল্‌তে পারেন নি' বলেই কি তাঁর সে সময়কার রচনা সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শস্খলনের জন্যে বিচারভাগী হবে ?

তা' ছাড়া আর যে ক'টি উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত র'য়েছে তার মধ্যে একটি রবীন্দ্রনাথের ভুল নয়, প্রশ্নকর্ত্তার বুঝ্‌বার ভুল। 'সোনার তরী'র 'বর্ষা যাপন' থেকে যে লাইন দু'টি নেওয়া হ'য়েছে, সে গুলোর কথা বল্‌ছি। এখানে 'বর্ষা' কথাটিতে ধ্বনিতত্ত্বের (phonology) সাধারণ নিয়মানুযায়ী স্বরভুক্তি (Anaptyxis) ক'রে নিলেই সব গোল মিটে ছন্দ নির্ভুল হয়। তা' হ'লে শুদ্ধ হ'য়ে লাইনটি দাঁড়ায়,—

'সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বরষার মত।'

আমার কাছে একখানি কিছুদিনের পুরাণো সংস্করণের 'সোনার তরী' আছে। তা'তে এই পাঠই দেখ্‌তে পাই। জানিনে প্রশ্নকর্ত্তা রবীন্দ্রনাথের এই কল্পিত ভুলটি কোত্থেকে সংগ্রহ ক'রেছেন।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ থেকে আর যতগুলো দৃষ্টান্ত আহরণ করা হ'য়েছে তার কতক কবির নিতান্ত অপরিণত বয়সের লেখা, আর কতক বা তাঁর একেবারে অতি আধুনিক রচনা ('পূরবী' 'বনবাসী')। শৈশব এবং বার্দ্ধক্যের রচনার ত্রুটিই প্রশ্নকর্ত্তার কাছে বড় হ'য়ে ঠেকল কিন্তু কবির যৌবনের অপরূপ সৃষ্টিগৌরব কি ত্রুটীস্খলনের পক্ষে যথেষ্ট ব'লে মনে হয়নি ?

তবে এ ছাড়াও যে বাংলা কাব্যে ছন্দাশুদ্ধি নেই সে কথা বল্‌ছিনে। খুঁটিনাটি ক'রে দেখতে গেলে প্রত্যেক কবিরই অন্ততঃ প্রত্যেক পাতায় পাতায় না হোক প্রত্যেক বই থেকেই ছন্দাশুদ্ধি দেখিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু যে অশুদ্ধ সে অশুদ্ধই ; চিরায়ু হ'য়ে সে বেঁচে থাক কিন্তু সে যেন কোনদিন শুদ্ধির পবিত্রতা দাবী না করতে আসে।

৪। নারীনৃত্য ও নারীর মর্য্যাদা

শ্রীমতী মালতীশ্যাম দেবী

বিগত আশ্বিন সংখ্যা 'বিচিত্রা'র বিতর্কিকায় ব্রহ্মচারী সরলানন্দ "নারীনৃত্য ও নারীর মর্য্যাদা" সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় বলিতেছি এই জন্তে যে, নারীসমস্তার প্রতি অন্ততঃ বিচিত্রার পাঠকপাঠিকাগণের মনোযোগ আকর্ষণ ইহা দ্বারা সম্ভব হইবে। হিন্দুসমাজের নীতিশাস্ত্রকারগণ নারীজাতি সম্বন্ধে নৈতিক আচরণের যে বিধিব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই নারীজাতি সম্বন্ধে চরম-কথা এমন একটা বিশ্বাস আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। আধুনিক চিন্তা এই বিশ্বাসকে আঘাত দিয়াছে এবং নারীগণও সমাজনিয়মিত চিরাচরিত জীবন-ধারাকে তাঁহাদের নারীত্বের স্ফুরণের পক্ষে একমাত্র পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। আধুনিক শিক্ষায় নারীজাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়াছে; আমরা লক্ষ্য করিতেছি নারীনৃত্য এই আধুনিকশিক্ষিত নারীগণই ক্রমশঃ গ্রহণ করিতেছেন। এতকাল নারীর হিতচিন্তা পুরুষজাতি করিয়াছেন কিন্তু এখন নারীসমাজের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে আত্মমর্য্যাদা ক্ষেত্রে তাঁহাদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে।

আমাদের সমাজ নারীসমস্তার যে মীমাংসা করিয়াছে তাহাতে নৃত্যের স্থান নাই বটে কিন্তু এদেশেও নৃত্য নারীজাতিকে ত্যাগ করে নাই; পুরুষের সমর্থন পাইয়া সমাজের বাহিরে কুৎসিত আবহাওয়ার মধ্যে নৃত্য নারীকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে। ইহা সমাজের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে; নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি ললিতকলার প্রতি মানবচিত্তের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহা রুদ্ধ করার চেষ্টা অন্যায়। সামাজিক ভাবে তাহা নিয়ন্ত্রিত করাই উচিত। ইহাকে সঙ্কীর্ণসীমায় নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে গেলে অন্তরে বাহিরে জীবনের স্ফুরণকেই ব্যাহত করা হয়। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে সামাজিক-জীবনে জাগাইয়া রাখা এবং জীবনকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করিয়া বিশালতার দিকে চালিত করা নারীজাতির একটি সমাজিক কর্ত্তব্য। জগতে কোনোদেশেই এযাবৎ নারীসমাজ ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তবে ভারতবর্ষের চেয়ে ইউরোপের নারীসমাজ এই দায়িত্ব অধিকতর গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। ইহাতে নারীর সামাজিক মূল্য যে এদেশের নারীর চেয়ে অধিক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। অবাধ মেলামেশায় নারীর শুচিতা নষ্ট হয় এই ধারণার মূলে রহিয়াছে নারীসম্বন্ধে আমাদের সামাজিক বিশ্বাস। আমরা এই শুচিতা কতটুকু রক্ষা করিতে পারিয়াছি এবং তদ্বারা নারীর মানসিকশক্তির কি পরিমাণ উন্নতি করিতে পারিয়াছি তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে খুব গর্ব্বিত হইবার কারণ থাকে না। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ও সংরক্ষিত শুচিতার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য যে কিছুই নাই তাহা এতকালের ব্যর্থতায়ও কি প্রমাণিত হয় নাই? আমরা লক্ষ্য করিয়াছি ইউরোপে জাতীয় বিপদের দিনে নারীজাতি পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দেশরক্ষার্থে দলে দলে যুবক প্রাণবিসর্জ্জন করিতে যখন রণক্ষেত্রে ছুটিয়া চলিয়াছেন তখন নারীগণ সামাজিক জীবনের নানাবিভাগে পুরুষের কর্ত্তব্য ভার বহন করিয়াছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও সেবিকারূপে পুরুষের অনুগমন করিয়াছেন। বিপদের দিনে ত্যাগের মহিমায় পাশ্চাত্য দেশে পুরুষের ন্যায় নারীর ললাটও উজ্জ্বল। ইহা নারীজাতির আভ্যন্তরীণ শক্তিমত্তার প্রমাণ। জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া হয়তো আমাদের আদর্শানুযায়ী দৈহিক পবিত্রতা সর্ব্বত্র রক্ষা করিতে না পারিলেও সর্ব্বাবয়বে জীবনকে বিকশিত করিয়া পাশ্চাত্য দেশে নারীসমাজ প্রগতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সমগ্রভাবে বিচার করিয়া ইহা ইউরোপে নারীসমাজের অধোগতি বলি কেমন করিয়া? পুরুষজাতির একটা বিশেষ উদ্বেগ দেখিতে পাওয়া যায় নারীগণের দৈহিক পবিত্রতার জন্য; কিন্তু নারীজাতির এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হইতেছে যে, অতীতকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত পুরুষজাতির উপর এক্ষেত্রে নির্ভর করিয়া তাঁহারা খুব লাভবান হন নাই। পুরুষের যে মনোবৃত্তির প্রতি আমি ইঙ্গিত করিতেছি নারীনৃত্য সম্বন্ধে আতঙ্কের তাহাই কারণ। নারীগণ সামাজিক ভাবে নৃত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি ললিতকলার

যে দায়িত্ব বহন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে দু'একটি স্খলন, পতন হইলেও বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ইহা হইবে নারীসমস্তার অধিকতর সন্তোষজনক মীমাংসা। পুরুষের যে কামপ্রবণতা নারীর ললাটে হীনতার ছাপ দিয়াছে সেই দুর্গতি হইতে নারী আজ মুক্তিকামী। আকস্মিক দুর্ব্বলতায় স্খলন হইলেও কল্যাণময় জীবনের পথে ফিরিয়া আসার দাবী আছে, পুরুষজাতি আজও তা স্বীকার করে না।

আমরা এই মানসিক দৃষ্টি দিয়া যদি নারীনৃত্য সম্বন্ধে বিচার করিতে অগ্রসর হই এবং নারীজাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ স্বীকার করিয়া লই তাহা হইলে ব্রহ্মচারী সরলানন্দের স্তায় আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ থাকেনা।

সহশিক্ষা এবং সহনৃত্য যদি চলেই তাহা হইলেও বা আত্মমর্য্যাদাশীলা নারীর পক্ষে ভয়ের কারণ এমন কি থাকিতে পারে?

নারীনৃত্য ও সঙ্গীতের দ্বারা সমাজের কামপ্রবণতার কতকটা অন্ততঃ পশম হয় ইহা মনোবিজ্ঞান সম্মত কথা। মনের পথে কামকে চালিত করিয়া তাহার উর্দ্ধগতি দিতে পারিলে নারীজীবনের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইবে। যে-গণিকাবৃত্তি নারীজাতির অমর্য্যাদার চরম দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরাজ করিতেছে, সমাজের কামকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে এই হীনতা হইতে মুক্তি নাই। আমাদের সমাজ নারীসমস্তার যে সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারে নাই অসংখ্য গণিকানারীই তাহার প্রমাণ। শুনিয়াছি কলিকাতা নগরীর মধ্যে প্রতি বারোজন নারীর মধ্যে একজন গণিকা। এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতি লক্ষ্যমাত্র না করিয়া ইউরোপের স্বাধীনা নারীগণের দু'একটি অধঃপতনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ করা যে হাস্তকর তাহা বলাই বাহুল্য। ইউরোপে পর্দ্দা নাই। প্রত্যেকটি অধঃপতনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্ত সেখানে লোকমতের সহায়তা পাওয়া যায়; কিন্তু এদেশে পর্দ্দার অভ্যন্তরে যে সব দুর্নীতির কথা সাধারণতঃ লুক্কায়িত থাকে তাহা দেখিয়াও না দেখা এবং ভুলিয়া থাকাই হইতেছে আমাদের পরম সান্ত্বনা। পর্দ্দার অন্তরালে অবলা নারীদের আত্মরক্ষা যে সর্ব্বত্র সহজ নহে এই কথাটা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, নারীসমাজে বর্ত্তমান স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তায় ভীত হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। আমরা মনে করি নারীমনের স্বভাবসুলভ ললিতকলাপ্রিয়তাকে সুযোগ দিলে এবং নারী-সমাজকে নিজের সামাজিক মূল্যটি নির্ণয় করিবার অধিকার দিলে নীতিবাদিগণের দুশ্চিন্তার অনেকটা লাঘব হইবে এবং নারীসমাজও বাঁচিয়া যাইবে।

৫। বানান-সমস্যা ✓

প্রভাসচন্দ্র ঘোষ

বাংলা ভাষায় বানান-সমস্তা যে প্রকট ভাবে দেখা দিয়েছে পাঠক সাধারণ তা' ভাল ভাবেই উপলব্ধি করছেন। নিছক সাধুভাষা যখন আমরা ব্যবহার করতুম তখন বানান-সমস্তার উদ্ভব হয়নি; কথ্য ভাষার প্রচলনের সাথেই এর উদ্ভব। সমস্তা যখন উঠেছে তখন তার সমাধান হওয়া উচিত। 'বিচিত্রা'র 'বিতর্কিকা'র কাছ হ'তে সাহায্য পাওয়ার আশা করলে দুরাশা হবে না বোধ হয়।

একই শব্দ নানাজনে বিভিন্ন বিভিন্ন রূপে বানান করেন। শুধু যে ক'রে, কোরে,…বা বাংলা, বাঙালা,…ইত্যাদি নিয়ে গোল বাধে তাই নয়, আরও এইরূপ বহুশব্দ আছে যাদের উপর লেখক সাধারণ phoneticism-এর নামে বহু অত্যাচার করেছেন এবং করেন। যেমন: ভালবাসা আমাদের বড় আদরের ধন, এবং ভালোবাসাকে আমরা সকলেই বড়ো আসন দিই। সেদিন কলেজ ষ্ট্রীটের একটা লোক ক্লাইভ স্ট্রীট দিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে বর্দ্ধমান স্টেশনের একটা টিকিট কিনলে। কোন কায (কাজ) শেষ হ'লেও (হোলেও) হ'য়েছে, হোয়েছে করে চীৎকার করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। এইরূপ বহুশব্দের লিখিত হ'বার কালে আত্মশ্রাদ্ধ হ'য়েছে। বানানের বাজারে phonetics-এর প্রচলন থাকা ভাল, কিন্তু অতিপ্রচলন হ'লে তা বাজার দরকে মাটি করে দেবে। আমরা উচ্চারণ করি গোরু এবং সোত্তোন্দ্র কিন্তু লেখবার বেলা গরু এবং সত্যেন্দ্র ব্যতীত অন্ত কিছু লিখি না।

উচ্চারণ অনুযায়ী যদি বানান লেখা হয় তা' হ'লে বানান দু' শ্রেণীর হ'বে—পূর্ব্ব-বঙ্গীয় ও পশ্চিম-বঙ্গীয়। আমরা (পশ্চিম বঙ্গ) লিখ্‌ব—কেশবচন্দ্র স্তান এবং পূর্ব্ব-বঙ্গীয় যাঁরা তাঁরা উচ্চারণের দোহাই দিয়ে লিখ্‌বেন—ক্যাশবচন্দ্র সেন।

সুতরাং প্রত্যেক শব্দের (বিশেষ করে ক্রিয়াপদগুলির) যতটা সম্ভব একটা standard বানান প্রচলিত হওয়া দরকার। তা' না হ'লে আমাদের ভাষায় বানানের প্রতি যথেচ্ছাচারের স্রোত ক্রমাগত বেড়ে চল্‌বে। যথেচ্ছাচারিতা কোন ক্ষেত্রেই ভাল নয়; ভাষায় প্রতিও এ নিয়ম প্রযোজ্য।

শত্রুপক্ষের মেয়ে

শ্রীমনোজ বসু

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১)

তুমি, আমি এবং আর পাঁচটি ভদ্রসন্তান শুইয়া বসিয়া হাই তুলিয়া আরাম করিয়া আজ এই কাহিনী শুনিতেছি; আমার মনের মধ্যে কিন্তু বারম্বার ছায়া ভাসিতেছে—জনহীন, ছায়াহীন, দিগন্তবিসারী এক বালুক্ষেত্র; তারই কিনারে উন্মুক্ত আকাশের নীচে না জানি এতক্ষণ বিদ্যাধরী নদীর কত খেলাই জমিয়া আসিল! জোয়ার যদি আসিয়া থাকে, লক্ষকোটি তরঙ্গ-শিশু খলবল করিতে করিতে দূর দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে, আনন্দ-বন্যায় দুই কূল ডুবাইয়া ভাসাইয়া ছোট ছোট বাহু দিয়া তারা বাঁধের গায়ে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, একবার বা ছলাৎ শব্দে লাফাইয়া মুখ উঁচু করিয়া দেখিতে চায়, ওদিকের কাণ্ডটা কি? দেখিতে পায়না কিছুই—আবার লাফাইয়া ওঠে—আবার—আবার—। বাঁধের খোলে মাছের আবাদ, নোনা জলের তুফান; মানুষ-জন নাই একটা, টিলার উপর কেবল অনেকগুলা ভিটা, দ্বীপের মতো সংখ্যাতীত ভিটা জাগিয়া রহিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁধের গায়ে লুটোপুটি খাইয়া অবসন্ন জলতরঙ্গ অবশেষে ভাঁটার টানে ফিরিয়া চলিয়া যায়, চর জাগিয়া ওঠে, সুমসৃণ নোনা-কাদায়, শান্ত গাঙের জলে সূর্য্যালোক বিষণ্ণ হাসির মতো ঝিকমিক করিতে থাকে।

কতদিন ঐ পথে নৌকা করিয়া গিয়াছি। আমার কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হয়। সেবার হইল কি—একদিন খররৌদ্রে দুপুরের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিয়া গেলাম, অসাড় নিস্পন্দ বালুচর। ফিরিবার মুখে রাত্রি হইল। ওরই কাছাকাছি আসিয়া বড় ঝড় উঠিল; নোঙর ফেলিয়া চরের উপর নামিয়া সভয়ে ঝড় থামিবার প্রতীক্ষা করিতেছি,—মনে হইল—সাই মনে হইল—আমাদেরই মতো আরো বহুজন তেপান্তরের মাঠে হি-হি করিয়া কাঁপিতেছে, তাদের নিঃশ্বাস নদীর এপার-ওপার ফুঁশিয়া বেড়াইতেছে। তারপর অনেক রাত্রে ঝড় থামিয়া গেল; কিন্তু মেঘ কাটিল না। এমন গাঢ় নির্নিরীক্ষ অন্ধকার যে সে যেন জগদ্দল পাথর হইয়া বুক পিশিয়া মারে। নৌকা আবার চলিল। নোনা জলের ঢেউয়ে জোনাকীর মতো এক-একবার আলোর ফিন্‌কি ফোটে, কোন দিকে কিছু নাই, কি মনে করিয়া বাহিরে তাকাইয়াছি,—দেখিলাম, আমাদেরই পাশে পাশে ভাঁটা সরিয়া-যাওয়া অনাবৃত নদীবক্ষের উপর দিয়া সারি বাঁধিয়া ছায়া-মূর্ত্তির প্রকাণ্ড এক দল চলিয়াছে—এক—দুই—তিন—চার—একের পর এক—কে তাহাদের গণিতে পারিবে? দৃপ্ত সমুন্নত গতিভঙ্গিমা, কবাট-বক্ষ,—নিঃশব্দে পা ফেলিয়া জলস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তারা চলিয়াছে।

মাঝি! মাঝি!

ছইয়ের মধ্য হইতে একজনে তাড়াতাড়ি আমার টর্চ্চটা লইয়া আসিল। আলো ফেলিয়া দেখি, কিছুই না।

আর একবার পূর্ণিমার রাত, বড় পরিষ্কার জ্যোৎস্না, বোধকরি সেটা চৈত্রের শেষাশেষি হইবে, বাঁধে নূতন মাটি দিয়াছে, হু-হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে, বালু উড়াইয়া পরীর পাখা মেলিয়া সমস্ত চরটাই যেন আকাশে উড়িয়া যাইতে চায়। পালে নৌকা চলিতেছিল, দাঁড়িরা শুইয়া শুইয়া খঞ্জনী বাজাইতেছে, বাজনা থামাইতে বলিলাম; মনে হইল, যেন অসমান বহুবিস্তীর্ণ বাঁধের ওধারে, জোৎস্না-সীমার বহুদূরে আজ রাত্রে বাংলার দুরন্ত সন্তানগুলি শ্মশান-শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়াছে। যে-লাঠিগুলা একদা বিদ্যাধরীর স্রোতে তারা ভাসাইয়া দিয়াছিল, খুঁজিয়া পাতিয়া সেগুলি কুড়াইয়া আনিয়া অস্থবাটীতে [illegible]

লক্ষ্মীপূর্ণিমায় পৌষমাষের দুরন্ত শীতের রাত্রে জলন্ত আগুনের আলোয় যেমন করিয়া বীরভঙ্গিমায় দাঁড়াইত, আজ আবার তেমনি দাঁড়াইয়াছে।···জানি, এসব কিছু নয়—দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র— টর্চ্চ ফেলিলে দেখিব সমস্ত ফাঁকা; কিন্তু চুপচাপ চাহিয়া রহিলাম, নৌকা চলিতে লাগিল।

বিদ্যাধরীতে যেখানে আগড়ভাঙার খাল আসিয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেইখানে খালের এপার ওপার দু'দিকেই ছিল ঢালিপাড়া। শেষাশেষি ও-পারের পাড়া একদম উৎখাত হইয়া যায়। ওপার ছিল বরণডাঙার ঘোষেদের আশ্রিত। কর্ত্তা মারা যাইবার পর শত্রুরা চারিদিকে বড় প্রবল হইয়া উঠিল। সৌদামিনী ঠাকরুণ একেলা মেয়ে মানুষ, সকল দিক সামলাইতে পারেন না; নাবালকের ছেলের মুখ চাহিয়া কোন গতিকে একরকম ঠাট বজায় রাখিয়া চলিতেছিলেন। এপারের ঢালিরা নরহরি চৌধুরীর লোক। বরণডাঙা কাবু হইয়া পড়ায় নরহরির দুর্দান্তপনা অতিরিক্ত রকম বাড়িয়া উঠিল। চৌধুরীর ঢালা হুকুম, ঢালিপাড়ায় সম্বৎসরে যত ধান লাগে, সমস্ত আসিবে তাঁর সদর বাড়ির গোলা হইতে। আট দশ খানা সাঙড়-বোঝাই ধান আসিয়া খালের মুখে লাগে। দিন পাঁচ-সাত ধরিয়া ধীরে সুস্থে ধামাভর্ত্তি ধান নামানো চলিতে থাকে। ওপারের লোকে লুব্ধ চোখে তাই তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। তারপর ক্রমশঃ একজন দু'জন করিয়া খাল পার হইয়া এপারে ঘর বাঁধিতে লাগিল। খবর পাইয়া নরহরির উৎসাহ আরও বাড়িল। আগে ধানের নৌকা আসিত বছরে একবার, এখন যখন-তখন আসিয়া ভিড়িয়া থাকে। ওপার শূন্য হইয়া এপারে ঘরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; তিন চার শ' ঘর হইয়া উঠিল। অনেকেই আসিল, আসিল না কেবল সেই একটা লোক—বুড়া সর্দ্দার চিন্তামণি। আর আসিল না, নিতান্ত যাদের চিন্তামণিকে ছাড়িয়া আসার উপায় নাই।

মেয়েদের কাজ, ধান ভানিয়া কুটিয়া সিদ্ধ করা। আর, ভীমরুলের ডিমের মতো বাধা চৌধুরীর সেই মোটা মোটা রাঙা ভাত খাইয়া জোয়ানগুলার বুকের মধ্যে টগবগ করিয়া রক্ত ফোটে, গাঙের ধারে ধারে তারা হল্লা করিয়া পায়তারা কসিয়া বেড়ায়, চরের উপর বিশ-পঞ্চাশ জনে কুস্তি লড়ে, ঢাল-সড়কীর খেলা করে, হাতের তাক কেমন হইল তাই পরীক্ষা করে কখনো বাদার বুনো হাঁস কখনো বা বোঝাই নৌকার উপর। তখন লক্-গেটওয়ালা নূতন কাটা খাল হয় নাই, ব্যাপারী নৌকার ঐ ছাড়া আর যাইবার পথ নাই।···দিব্য দাঁড় ফেলিয়া সারি গাহিতে গাহিতে নৌকা চলিয়াছে, হঠাৎ বোঁও—বোঁও—শব্দে মাঝি-মাল্লার উপর পোড়ামাটির গুলি-বৃষ্টি, আর সঙ্গে সঙ্গে মোহনার দিক দিয়া বিকট অট্টহাসি। অচৈতন্য দেহগুলি গলুই হইতে জলে পড়িয়া টানের মুখে পাক খাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, অমনি চরের উপর হইতে দশ বিশজন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া খালে খালে নৌকা লইয়া কোথায় যে উড়িয়া চলে, সে নৌকার আর কোন সন্ধান হয় না।

অনেক কাল আগের কথা। একবার মাঘের শেষাশেষি এক যুবা তার তরুণী বউকে বাপের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে এই পথে পানসী করিয়া যাইতেছিল। বাপের বড় অসুখ, —খবর পাইয়া অবধি বউটির আহার নিদ্রা নাই। ন'পাড়ার হাটে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইল, সেখান হইতে চাল ডাল হাঁড়ি মসলাপত্র কিনিয়া ওপারের চরে পানসী বাঁধা হইল। বউটি পরম যত্নে রান্নাবান্না করিয়া স্বামীকে খাওয়াইল, দাঁড়ি-মাঝিদের খাওয়াইল, নিজে কিছু মুখে দিল না। এক ঘুমের পর যুবা জাগিয়া দেখে, দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে,—বধূ কিন্তু ঘুমায় নাই, বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। পথের বিপদ-আপদের কথা শোনা আছে, তবু সে পানসী খুলিতে হুকুম করিল, এখন খুলিলে ভোরের কাছাকাছি ঘাটে পৌঁছানো যাইবে, নইলে আর এক জোয়ারের অপেক্ষা করিতে গেলে কাল বিকালের আগে যাওয়া যাইবে না।

তাদের দেখাদেখি ন'পাড়ার ঘাট হইতে একখানা হাটুরে নৌকা খুলিয়া দিল। ছপ-ছপ করিয়া সেখানা খানিকটা পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। সে-নৌকার লোক চেঁচাইয়া কহিল—আস্তে চল ভাই, একসঙ্গে যাওয়া

যাক। দু'খানা একসঙ্গে দেখলে কোনও সুমুন্দি হঠাৎ এগোবে না। এক বাঁক দু'বাঁক এমনি চলিল। হাটুরে নৌকা বলিল—ও ভাই, আগুন আছে? নুড়িটা ধরিয়ে নেব একটু। পানসীর মাঝি জবাব না দিয়া চলিয়াছে। আবার পিছন হইতে কাতর প্রার্থনা—একটু আগুন দাও না গো, শীতে আমরা জমে যাচ্ছি। যুবা বলিল—তা দাও—দাও—দাঁড়াও, ওরা এসে নিক—আহা।

খসস্ করিয়া পানসীর গায়ে হাটুরে ডিঙি লাগিল। বধূ বলিল—কোনটা সোজা পথ একটু ভাল করে জিজ্ঞাসা করে নাও না গো—। তাড়াতাড়ি ছঁইয়ের মধ্য হইতে যুবা বাহির হইতেছিল, এক মুহূর্তে ঝকঝকে এক সড়কী তার পায়ে এফোঁড় ওফোঁড় বিঁধিয়া ফেলিল। সেইখানে সে কাত হইয়া পড়িল। দাঁড়িরা দাঁড় ফেলিয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে। নিশি রাত্রে গাঙের বুক প্রতিধ্বনিত করিয়া গ্রামবধূ চীৎকার করিয়া উঠিল। হঠাৎ তীরের বালুকার উপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। দূর হইতে গম্ভীর কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—মেয়েমানুষ কাঁদছে কেন, রঘুনাথ?

রঘুনাথ অপ্রতিভ হইয়া গেল। এ সময়ে নরহরি চৌধুরী কি জন্ত এদিকে আসিতেছিলেন, কে জানে! রঘুনাথ বলিল—আর কিছু নয় চৌধুরী মশায়, একটু আধটু সোনা গায়ে আছে—দিতে চায় না।

চৌধুরী বলিলেন—থাকগে! থামতে বলো।

তার আগেই কান্না থামিয়া গেল। বধূ নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

নরহরির ঢালিপাড়ার ঠিক উত্তর সীমায় সখীসোনার চক; তার উত্তরে গ্রাম। চকের জমি খুব ভাল, বাঁধ দিয়া নোনা ঠেকাইতে পারিলে একেবারে সোনা ঢালিয়া যায়। চকের জমিদার বরিশাল জেলার লোক, নরহরির সঙ্গে কি রকমের একটা কুটুম্বিতা আছে, খাতির উপরোধ খুব চলে। জমিদার কখনো এ দিকের ছায়া মাড়ান না, স্থানীয় একজন তহশীলদারের উপর সমস্ত ভার; নাম মালাধর সেন—লোকটি খুব হুঁশিয়ার। ধানের সময়টা এই সর্বসমেত মাস তিন চার মাত্র সদর হইতে একজন নায়েব্ পাইক-বরকন্দাজ লইয়া আদায়পত্র তদারক করিতে আসেন, সেই কয়মাস মালাধরের চণ্ডীমণ্ডপে খুব জাঁকাইয়া কাছারী বসে।

একবার বর্ষায় বাঁধে বড় ভাঙন ধরিয়াছে, ঠেকাইয়া রাখা দায়। সদর নায়েব সবে দিন দুই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, অতএব মালাধর একরকম হাত-পা গুটাইয়া বসিয়াছে। লোক ডাকিতে পাইক পাঠান হইল। নূতন পাইক—অত শত খবর রাখে না। হাঁকাহাঁকি করিয়া একেবারে নরহরির ঢালিপাড়ায় গিয়া উঠিল।

—মাটি কাটতে পারিস্?

জবাব পাওয়া গেল—না, গলা কাটতে পারি। এবং প্রমাণস্বরূপ একজনে আসিয়া সত্যসত্যই পাইকের গলা চাপিয়া ধরিল। বাঁচাইয়া দিল রঘুনাথ। কোনদিকে যাইতেছিল, হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল।

—করিস্ কি? করিস্ কি? চৌধুরী মশায়ের কুটুম্ব হয় যে। বিদেশী মানুষ, ওরা যে আমাদের অতিথ।

ঢালি তখন গলা ছাড়িয়া হো-হো—করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—কুটুম্বের ছেলের সঙ্গে ঠাট্টা করলাম একটু—

করজোড়ে বিনয়ে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল—কি আজ্ঞে হয়, পাইক মশায়?

কাঁপিতে কাঁপিতে পাইক মহাশয় তখন কোন গতিকে বক্তব্য শেষ করিল। রঘুনাথ সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিল।—আমরা মাটি কাটিনে। বাবা চৌধুরীর ধান আসে—ডাক পড়লে খাজনা দিতে যাই। আমরা ঢালি,—মুটে ঐ ঐপারের ওরা। ভ্রূ-কুঁচকাইয়া ব্যঙ্গের সুরে কহিতে লাগিল—পেটের দায়ে ওরা মোট বয়, মাটি কাটে, কত কি করে। আপনি ভুল করে এ পাড়ায় এসেছেন, পাইক মশাই। বলিয়া সগর্বে হাসিয়া ওপারের চিন্তামণির দলবল দেখাইয়া দিল।

ওপারের লোক খবর পাইয়া মাটি কাটিতে আসিল। উহারা যখন ঘামে-মাটিতে ভূত সাজিয়া কোদাল পাড়িতে থাকে, তখন রঘুনাথের দল তৈল-চিক্কণ চুলে টেরি কাটিয়া শিষ দিতে দিতে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজের শেষে শ্রান্ত পায়ে ওপারের দল ফিরিয়া যায়,

ধরে ঢোল পিটাইয়া এপারে তখন সঙ্গীত সুরু হইয়াছে। পাইকের কাছে রঘুনাথের সগর্ব্ব উক্তিটা ক্রমশঃ মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। শেষে সৌদামিনীরও কানে পৌঁছিল। চিন্তামণিকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তিনি বলিলেন—সর্দ্দার-বুড়ো, আমার গোলা-ভরা ধান নেই; কিন্তু কর্ত্তার ঐ মস্ত অতিথশালা আছে। আমার বাপধনেরা সব ঐখানে এসে থাকো। শাক্‌-ভাত একসঙ্গে সকলে ভাগ করে খাওয়া যাবে।

ইহার উপর আর কথা নাই। চিন্তামণি ছোটদলটি লইয়া বরণডাঙার বাড়ি উঠিল। ওপার একেবারে উৎখাত হইয়া গেল। চালি বলিতে যা রহিল সমস্ত নরহরির। বাধা চৌধুরী বিদ্যাধরীর একেশ্বর হইয়া পড়িলেন। সে এমন হইয়া উঠিল, দেশ বিদেশের ব্যাপারীরা যাইবার মুখে ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া ভক্তিভরে মোহর দিয়া চৌধুরী মহাশয়কে প্রণাম করিয়া যায়। বাবাহরির নামে সরকারী খেয়াতেও পয়সা লাগে না। একবার একটা পশ্চিমী লোক কোন একটা পার-ঘাটের ইজারা লয়। চৌধুরীবাবুদের মাহাত্ম্য তার কানে গিয়াছিল। কিন্তু একদিন আধময়লা কাপড়-পরা ইয়ার-গোছের এক ছোকরা পারাণী পয়সা না দিয়া বিনাবাক্যে চলিয়া যায় দেখিয়া প্রতিবাদ করিয়া তাকে বলিল,—সবাই মিলে নরহরি চৌধুরীর দোহাই পাড়লে আমার কি করে'চলে, বাপু! ফিরবার সময় লিখন এনো, একটা নইলে পয়সা লাগবে।

ইয়ার ছোক্‌রা মুখ ফিরাইয়া কহিল—লিখন সঙ্গেই আছে, চাঁদ আমার। এবং বাঁ হাতখানা মাঝির গলায় তুলিয়া অবলীলাক্রমে তাকে জলের মধ্যে গোটা দুই তিন চুবানি দিয়া হাসিয়া দু'হাত সামনে প্রসারিত করিয়া বলিল—একটা কেন, আমার এই দুটো লিখন। তারপর আপনার মনে শিস দিতে দিতে সে চলিয়া গেল। পরের দিন দেখা গেল, খেয়ার ঘাটে নৌকা নাই। দু' তিনশ টাকা দামের নৌকা, বিস্তর চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও কোন সন্ধান হইল না। সরকারী খেয়া বন্ধ রাখা চলে না, যে করিয়া হোক আবার নৌকার যোগাড় করিতে হইল। তার পরের দিন রাত্রে সেখানিও নিখোঁজ। তখন সেখানকারই একজন বাসিন্দা সৎবুদ্ধি বাৎলাইয়া দিল—চালি পাড়ায় যাওগো, মাঝি। সেদিন যে লোকের কাছে পয়সা চেয়েছিলে সে হ'ল তানুচাঁদ—বাবাহরির বাছা সাকরেদ।

মাঝি তখন তানুচাঁদের খোঁজ করিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তানু বলিল—আমি কি জানি? যা বলবার বলো গিয়ে সর্দ্দারের কাছে। আমাদের বাপু হাত-পা-ই খোলা আছে—মুখ বন্ধ। বস্তুতঃ অনেক করিয়াও ইহার বেশী আর কিছু বাহির হইল না। যত জিজ্ঞাসা করো হাসিয়া কেবল শিষ দেয় আর বুড়া আঙুল নাড়িয়া নাড়িয়া গান করে—জানিনে—জানিনে—

তখন মাঝি রঘুনাথের কাছে গিয়া পড়িল। নিতান্ত ভালমানুষ রঘুনাথ, যত্ন করিয়া শীতলপাটি পাতিয়া বসাইল, তামাক খাইতে দিল, কিন্তু আসল কথা উঠিলে সে-ও একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। অত্যন্ত দরদ দেখাইয়া কহিল—আ-হা-হা, দু' দুখানা নৌকো। কেন, নোঙর করা ছিল না?

মাঝি বলিল, মোটা কাছিতে নোঙর ত ছিলই, অধিকন্তু লোহার শিকলে চাবি-আঁটা। আর তারাও পালা করিয়া দাওয়ায় সজাগ রহিয়াছিল। কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। অতবড় নোঙরটা উঠিল, চাবি ভাঙিল,—কিন্তু এতটুকু শব্দ নাই, জলের উপর সামান্য ছপছপানিও নয়, যেন মন্ত্রবলে কাজ হইয়া গেল।

রঘুনাথ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—তা হয়⋯অমন হয়ে থাকে, মাঝি ভাই। জোয়ারের টানে হয়ত ভেসে গেছে কোন মুলুকে—

মাঝি খপ করিয়া তার পা জড়াইয়া ধরিল—কোন মুলুকে ভেসে গেছে, সেইটে বলে দিতে হবে, সর্দ্দার।

এবারে রঘুনাথ রীতিমত রাগিয়া একটানে পা ছাড়াইয়া লইল। বলিল—আচ্ছা আহাম্মক ত তুই। মুলুকের মালিক, চৌধুরী মশাই। বলেন যদি—তিনি বলতে পারেন। আমরা নুন খাই, ডাক পড়লে খাজনা দিয়ে আসি—এই কেবল সম্পর্ক—আমরা কে?

অতএব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আবার সেই নরহরি চৌধুরী পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতে হইল। নরহরি মহাপ্রাণিক; আবার কার আব্দার রাখিতেও তাঁর জুড়ি দ্বিতীয় নাই।

নজর দিয়া পদপ্রান্তে হাত জোড় করিয়া বসিতে চৌধুরী মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন।—ওকি হল?…না না—উঠে বোসো টাকাটা তুলে নাও। তুমি হ'লে কোম্পানীর খেয়ার ইজারাদার—

কোম্পানীর ইজারাদার নাক কান মলিয়া বলিল—আর ঘাট হবে না, চৌধুরী মশায়। আমি পারাণীর একশ গুণ ধরে দিচ্ছি—

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার পারাণী কত?

—দু' পয়সা।

নরহরি হিসাব করিয়া কহিলেন—অর্থাৎ আরো টাকা দুই আন্দাজ দিচ্ছ তুমি। আর তোমার নৌকো দু'খানার দাম?

সাড়ে তিনশ…চারশ—

নরহরি নরমসুরে কহিলেন—আমারও হাঙ্গাম আছে বাপু, লোকজন লাগিয়ে দেশদেশান্তর খুঁজতে হবে…তা যাকগে, তুমি একখানারই দাম ধরে দিও। কোম্পানীর ইজারাদার—যাহোক একটা খাতির উপরোধ আছে ত?

সবশেষে একপক্ষের কান্নাকাটি অপর পক্ষের খাতির উপরোধের ফলে একশ টাকায় রফা হইয়া দাঁড়াইল।

নরহরি বলিলেন—টাকাটা কি নিয়ে এসেছ, বাপু?

খেয়ার ঘাট বন্ধ রাখিবার জো নাই, বড় মুস্কিল হইয়াছে। মাঝি তাড়াতাড়ি বলিল—আমি কালই দিয়ে যাব নিশ্চয়—

আমিও খোঁজ খবর করে রাখব। বলিয়া এক মুহূর্ত্ত লোকটার কাতর মুখে তাকাইয়া নরহরির সত্যসত্যই করুণা হইল। আর দেশদেশান্তর খোঁজের অপেক্ষা না রাখিয়া বোধ করি যোগ-প্রভাবেই বলিয়া দিলেন—মাথাভাঙার খালে দেড় বাঁক গিয়ে যে বড় কেওড়াগাছটা—তারই কাছে জলের তলায় খোঁজ করে দেখো। দু'খানা নৌকো এক জায়গায় আছে। যাও।…আর টাকাটা কালই দিয়ে যেও—নয়ত, বুঝলে ত?

বলিয়া চৌধুরী মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন।

মাঝি কৃতজ্ঞ অন্তরে চলিয়া গেল। সবই সে উত্তমরূপে বুঝিয়াছিল।

দিন তিনেক পরে কি একটা কাজে রঘুনাথ আসিয়াছিল। হাসিমুখে নরহরি কহিলেন—টাকা নিবি, সর্দ্দার? মাঝি বেটা পাইপয়সা অবধি শোধ করে দিয়ে গেছে। নিয়ে যা না গোটাকতক।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িল।

চৌধুরী তবু বলিলেন—তুই না নিস্—কি নাম ভালো সেই যে ছোকরা—কীর্ত্তি ত তোদেরই। নিয়ে যা, আমোদ ফূর্ত্তি করিস।

হাসিয়া রঘুনাথ বলিল—সে কি আর আলাদা একটা কিছু বলবে? দলের লোক না? ও বড্ড ঝঞ্ঝাট, চৌধুরী মশায়। টাকা নেও—হাটে হাটে যাও—দরদস্তুর কর; অত ঘোর প্যাঁচ পোষায় না আমাদের। আমরা সোজা মানুষ; সম্বৎসর খাওয়াচ্ছো তুমি—হুকুম হ'লে খাজনা দিয়ে যাব। ব্যস।

টাকা লইল না; প্রণাম করিয়া সে লাঠি তুলিয়া লইয়া রওনা হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোজ বসু

লেখকের কৈফিয়ৎ

বাংলা দেশের সুদূর পাড়াগাঁয়ে এক ক্রমবিলীয়মান অতি বিচিত্র জীবনের সাক্ষাৎ পাই। তার এক বিস্তৃত কাহিনী ধীরে ধীরে আমার মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। সে কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে বলবার অবসর হবে কিনা এই সন্দেহে টুকরো টুকরো করে গল্প লিখতে সুরু করেছিলাম; কিন্তু এখন সম্প্রতি সম্পূর্ণটাই লিখবার চেষ্টা আরম্ভ করেছি। অন্যত্র প্রকাশিত 'সর্দ্দার' ও 'বিলম্বির চর' গল্প দুটোর সঙ্গে এই কাহিনীর নিবিড় সংযোগ। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গিয়ে ঐ দুটো গল্পের কোন কোন অংশ এই কাহিনীর মধ্যে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বলাবাহুল্য, গল্প দুটো আর কখনো পুনঃ প্রকাশিত হবে না।

বীমা ও বাণিজ্য

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার বসু

এবার আমরা ভারতবর্ষে এবং বাংলায় বীমা কোম্পানি কী ভাবে কাজ করে যাচ্ছে তার পরিচয় নেবার চেষ্টা করবো। বাংলার বহু স্বনামখ্যাত কৃতী পুরুষের প্রেরণায় ত ২০।২৫ বছরের মধ্যে আমরা অনেকগুলি বীমা প্রতিষ্ঠান ড়ে উঠতে দেখেছি। স্বদেশী যুগের সমরকার কথা দের স্মরণ আছে, তাঁরা জানেন সেদিনকার দেশপ্রেম ত গভীর ছিল। হঠাৎ নতুন আলোর প্রাণ পেয়ে জাতির মস্ত চেতনা কর্মক্ষেত্রে কী ব্যাপকভাবে সজীব হয়ে উঠতে রেছিল,—সে কথা আমরা তো আজো ভুলিনি। সেদিন খেছিলুম দিকে দিকে নবীন কর্মকেন্দ্র সৃষ্টির কী প্রাণ-মাতানো প্রেরণা। সেই সময়ে যে-সব ইন্‌সিওরেন্স প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, তাদের মধ্যে হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স অন্যতম। হিন্দুস্থানের কর্মক্ষেত্র এখন সুদূরপ্রসারিত। ত অল্পদিনের মধ্যে হিন্দুস্থানের কাজ এত প্রসারিত হতে খে মনে হয়—জাতীয়তার একটা সাময়িক স্পন্দনেই স্বদেশ প্রীতি পর্যবসিত হয়নি। তার উপযুক্ত মনোবৃত্তিও গড়ে উঠেছে সাধারণের। এটা একটা উৎসাহের বিষয়। হিন্দুস্থান কোম্পানির কর্ণধার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার একজন কৃতী পুরুষ। তাঁর চেষ্টায় আজ হিন্দুস্থান প্রায় সমস্ত দেশী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অগ্রণী। ভারতের বাইরে হিন্দুস্থানের নাম প্রচারিত হয়ে পড়েছে। নলিনীবাবুর দুর্দমনীয় কর্মশক্তি প্রতিষ্ঠানটীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশে সর্বত্র শাখা খুলে অসংখ্য এজেন্ট নিযুক্ত কোরে প্রতিষ্ঠানটীর কাজ কেমন অগ্রসর হ'চ্ছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে,—১৯৩৪ সালের ৩০শে এপ্রিল যে বছর শেষ হয়েছে, সে বছরের কাজের পরিমাণ দেখলেই। এ বছর এঁরা দু' কোটি ০ লক্ষ টাকার ওপর নতুন কাজ করেছেন। তার আগের বছরের কাজের চেয়ে ৫০ লক্ষ টাকার ওপর কাজ বেশী হয়েছে এ বছরে। এতেই বোঝা যায় প্রতিষ্ঠানটী কত জনপ্রিয়। বছর বছর পলিসির হার কেমন বেড়ে গেছে দেখা যায়,—১৯২২ সালে প্রত্যেক পলিসি পেছু ১,৩৫৫৲ টাকার বীমা করা ছিল; ১৯২৭ সালে হয়েছিল পলিসি পেছু ১,৫১৬৲ টাকা; এবং ১৯৩২ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে ১৬৭৮৲ টাকা। এইভাবে কাজের বিস্তার দেখে ভরসা হয়—ভবিষ্যতে ভারতের বীমা কোম্পানি জগতের অন্য বীমা কোম্পানির সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারবে।

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফের বছর শেষ হয়েছে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৩। আলোচ্য বছরে ৬,৭১৯টী পলিসির আবেদন হয়েছিল। বীমার টাকা মোট ৯৪,৩৫,৫০০৲। তার আগের বছরে, অর্থাৎ ১৯৩২ হয়েছিল,—৬৯,৫৯,৭৫০৲ টাকার ওপর ৪৫৬১ খানা পলিসির আবেদন। তার মধ্যে সব জড়িয়ে ৪,৭৭৪ খানা পলিসি ইসু হয়েছে—৬৬,৪০,৯১৮৲ টাকা বীমার ওপর। তার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৩২ সালে ৪৯,৬৫,৭৫০৲ টাকার বীমা করা হয়েছিল ৩৩২৫ খানা পলিসি ইসু কোরে। পলিসি হোল্ডারদের ফণ্ডে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা জমে গেছে। জমে মোট হয়েছে—৫৫,২৭,৮৮৩৲ টাকা। প্রতিষ্ঠান হয়ে অবধি এঁরা মোট ১৮,২৬,২১২৲ টাকার দাবী শোধ করে এসেছেন। আগের বছর দাবীর টাকা ছিল ২,৮৪,৫৭১৲। এঁদের বিশেষ লক্ষ্য খরচের দিকে। খরচের হার খুব কম। খরচের হারের ওপর প্রতিষ্ঠানের সারবত্তা নির্ভর করে। সে বিষয়ে এঁরা যথেষ্ট সতর্ক।

স্বদেশী আমলের স্মৃতি জড়িয়ে আছে ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইনসিওরেন্সের জীবনের সঙ্গে। গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ সালের ভ্যালুয়েশানে দেখা গেছে লাইফ এ্যাসুওরেন্স ফণ্ডে শতকরা ১৫৲ টাকা লাভ হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩১ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের তালিকায় দেখা গেছে ১৯৩৪

খানা পলিসি ইস্যু করে ২১,৫৬,০০০৲ টাকার ইনসিওর করা হয়েছিল। সে বছর প্রিমিয়াম বাবদ নতুন আয় হয় ১,১৩,৫২১৲ টাকা। মোট প্রিমিয়াম বাবদ আয় ছিল ৫,৪২,৫১৫৲ টাকা। লাইফ এ্যাস্যুওরেন্স ফাণ্ড ছিল মোট ১৪,২২,০০০৲ টাকার। হাজার করা ১৫৲ টাকা বোনাস ঘোষণা করেছেন। ধীরে ধীরে এঁদের কাজ চল্‌ছে, কিন্তু চল্‌ছে দৃঢ়ভাবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অমর স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর একটী প্রতিষ্ঠান—ইউনিক্ এ্যাসিওরেন্স। এঁদের কাজ দিন দিনই নির্ব্বিবাদে বেড়ে যাচ্ছে। প্রিমিয়াম বাবদ আয়, ১৯৩১ সালে ছিল ১,৮২,৬৮৪৲ টাকা; ১৯৩২ সালে হয়েছিল ২,৩২,৩০০৲ টাকা। আজীবন বীমায় হাজার করা ১০৲ টাকা বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে। রিজার্ভ আছে ২১,০০০৲ টাকার।

দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছরই দেশী প্রতিষ্ঠানগুলি সন্তোষজনক কাজ করছেন। আগে এরকম কাজ আশা করা যায় নি'।

কিন্তু এখনো আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করবার প্রচুর অবসর আছে। বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাই হ'লো আমাদের প্রথম কথা। তারপর প্রসার। ভারত ছাড়িয়ে, সাগর পারে ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত না হ'লে এত বড় জাতীয় প্রেরণা সার্থক হবে না। কিন্তু, সত্যি সেদিন হ'বে কী?

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার বসু

দুইদিক্

শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায়

ধরণীরে দেখেছ কি তুমি?—
একদিকে, অদম্য উৎসাহে
আপনারে আপনি বাঁচায়—
শতবাহু প্রসারিয়া আপনার সম্পূর্ণতা লভিতে সে চায়!
ভেঙে চুরে করে শতখান্
আপনারে ধ্বংস করি' অমৃতের রস করে পান।
অন্যদিকে, সারা নিশি ধরি'
প্রতীক্ষায় বুক তার ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে গুমরি;—
প্রিয় তার আসিবে যে রাতে—
ঝিকিমিকি জোনাকির আলো লয়ে হাতে,—
সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি মেয়ে
তন্দ্রায় আচ্ছন্ন তবু, কার লাগি, আছে চেয়ে চেয়ে—॥

মানুষেরে দেখেছ কি তুমি?—
একদিকে, মহাবেগে
ছোটে তার জীবনের রথ—
পাহাড়েরে গুঁড়া করি' রচিতেছে আপনার পথ;
এতোটুকু বাধা নাহি মানে,
দুটি হাতে কোথা হতে শ্রান্তিহীন প্রেরণা সে আনে
অন্যদিকে, শ্রান্ত আঁখি তার
রাতের আঁধার মাঝে ছবি আঁকে কার!
অতি দ্বিধাভরে,
না-পাওয়া পরশখানি খুঁজে খুঁজে মরে,
আসে বুঝি প্রিয়া,
তারার আলোয় ভরা স্বপনের মধুপথ দিয়া॥

জলাতঙ্ক

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

বাসা খুঁজতে খুঁজতে প্রায় পাগলের মত হ'য়ে গেলাম। বেশীর ভাগ ভালো বাড়ীগুলো হয় পাঞ্জাবী না হয় মাদ্রাসীদের দখলে। মাদ্রাসীরা বড় বড় বাড়ী নিয়ে ভাড়া দিচ্ছে, কিন্তু নিছক নিরামিষ-ভোজন কুষ্ঠীতে লেখেনি কোনো দিন, আর ওরা যখন ভেজিটেরিয়ানই চায়, তখন দেখ্‌লাম আমার বরাতে মাদ্রাসীদের বাড়ী ভাড়া নেওয়া হ'য়ে উঠ্‌বে না। জ্যৈষ্ঠের দুপুরে বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হ'ল।

অবশেষে বাসার সন্ধান মিল্‌ল, বাড়ীটা একটু নির্জ্জন জায়গায়, অর্থাৎ আশেপাশে বাড়ীর সংখ্যা কম। আমার যা' পেশা, তা'তে নির্জ্জনতাই চাইছিলাম। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে মাস দুই ধ'রে সংগ্রাম ক'রে বাড়ীটাকে বাসযোগ্য করা হ'ল। উপরের একখানি দক্ষিণ-খোলা ঘর নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হ'লে আর এ গল্পের সূত্রপাত হ'ত না। নিশ্চিন্ততা আমার ভাগ্যে ঘটে নি কোনো কালে। যতবার ভেবেছি, এইবার একটু গুছিয়ে নিলাম, অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ ঈষৎ হেসে জীবন-যাত্রার কলটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন। এ-রকম কতবার যে ঘটেছে, তা'র আর ইয়ত্তা নেই। সমস্যার সমাধান করতে-করতেই জীবনান্ত হ'বার উপক্রম হ'ল। অতএব এই নির্জ্জন বাসায় এসেও যে একটু শান্তি পা'ব,—এ আশা করি নি কোনোদিন।

দিনগুলো কাটছিল বেশ সহজে—হঠাৎ একদিন যা আশা করছিলাম, তাই ঘটল। একটু বেশী রাত্রি অবধি আমাকে কাজ করতে হ'ত। রাত্রি প্রায় বারোটা হ'বে এমন সময়ে হঠাৎ একটা ভীষণ গোলমাল শুনে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। আমার বাসায় গোলমাল নয়, গোলমাল আমার পাশের বাড়ীর দোতলা থেকে আসছে বেশ বুঝতে পারা গেল। অনেক লোকের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, একটা ভীষণ ব্যস্ততা, কেউ বা চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করছে, আবার কেউ বা চাপাগলায় চীৎকার করছে—একটা মহা হট্টগোল!

—'ইডিয়ট্, ফুল্—ব্যবসার পণ্য সাজিয়ে ব'সেছেন আপনারা, সভ্যতার অ আ ক খ পড়েছেন কি? সমাজের নামে কি হচ্ছে?'

—'থামুন, থামুন আপনি, সরবৎ দিচ্ছি খান্—একটুখানি চুপ করুন জামাই বাবু, দোহাই আপনার, পায়ে পড়ি আপনার!'—একথাগুলো আস্‌ছিল নারীকণ্ঠ থেকে!

—'আহা বেশ, বেশ! চমৎকার অভিনয় শিখেছ, বাঃ! শিশির বাবু বুঝি তোমার গুরু? বাঃ, ব্রেভো!' —বল্‌তে বল্‌তে কণ্ঠস্বর একটু নেমে আসে, আবার হঠাৎ সপ্তমে চ'ড়ে যায়—'একেবারে চিৎপুর বানিয়ে তুলেছেন আপনারা, কোনো বিচার-বুদ্ধি, কোনো বিবেক—'

—'আহা থামুন, থামুন, একটু স্থির হোন্,—কি এমন হয়েছে, যাতে অত বাজে বক্‌ছেন?'

—কণ্ঠস্বর কোনো তরুণবয়স্ক ব্যক্তির!

তারপর অকস্মাৎ একটা সোরগোল—একটা হাতাহাতি হওয়ার শব্দ, তারপর একটা গোঙানির আওয়াজ, তারপর নারীকণ্ঠের উচ্চ চীৎকার, 'বেঁধে ফেলো, বেঁধে ফেলো—দড়ি নিয়ে আয়, মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে'—প্রভৃতি গোলমাল শুন্‌তে পাওয়া গেল।

সমস্ত নৈশ নীরবতা বিচ্ছিন্ন ক'রে পাড়ায় একি ভীষণ উপদ্রব!

আশেপাশের লোক সব জেগে উঠেছে, ছাদের উপর মেয়েদের ভিড়, গলির ভিতরে সদ্যোজাগ্রত পুরুষদের জটলা, 'কি হ'য়েছে, ব্যাপার কি মশাই'!—প্রভৃতি সসঙ্কোচ

কথাবার্ত্তা শুনে আর উপরে থাকতে পারলাম না। নীচে নেমে এলাম ; আমার বাড়ীর সম্মুখেই ডাক্তার বাবুর বাসা। ডাক্তার বাবু অনাবৃত দেহে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন দেখলাম।

'কি ব্যাপার ডাক্তার বাবু ? কি হ'ল পাড়ায় ?'

ডাক্তার বাবু অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করলেন, 'কি জানি মশাই, এ নতুন শুনছি ! মনে হচ্ছে কোনো পাগল-টাগল এসে জুটেছে ওদের বাড়ীতে !'

'কথাবার্ত্তা শুনে তাইত মনে হচ্ছে, হঠাৎ পাগলের আবির্ভাবই বা কি ক'রে হোল ?'

'তাই বা কি ক'রে বলি ? আপনিও যেখানে, আমিও সেখানে, কাজেই বুঝতেই পারছেন !'

ক্রমশঃ গোলমাল শান্ত হ'য়ে এল। ধীরে ধীরে ভিড় কমে গেল। পাড়া আবার তন্দ্রানিমগ্ন হ'য়ে এলে পর বারান্দায় ইজি চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে ব'সে ব'সে পাশের বাড়ীটা সম্বন্ধে ভাবতে লাগলাম। এতদিন এই বাসায় এসেছি, কোনো গোলমালই ত হয় নি, আজ হঠাৎ কেন যে অমন হৈ-চৈ আরম্ভ হ'ল তারই কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলাম। বাইরে থেকে কারণ অনুসন্ধান করা একরকম অসম্ভব, তবু ঔৎসুক্য জিনিবটি এমন, যে, কারণ অনুসন্ধান না করলে শান্তি নেই কিছুতে।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখেছি ঐ বাড়ীতে ! চার পাঁচটি তরুণবয়স্ক ছেলে বই-পত্র নিয়ে কলেজ-ইস্কুলে যায়, তা-ও দেখেছি ! মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে গম্ভীর পুরুষকণ্ঠে গানের মহলা চলে। রবীন্দ্রনাথের গান—গম্ভীর কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ ক'রে কোনো তরুণী সঙ্গীত-শিক্ষার্থিনীর পরিশ্রমেরও আভাস পাওয়া যায়। এ-ছাড়া প্রতিদিনের জীবনে ঐ পাশের বাড়ীর আর বিশেষ কোনো সঙ্কেত-ও নেই, না চাঞ্চল্য—না বা কোনো ইঙ্গিত।

যা' কিছু আকস্মিক, এ থেকে তা'কে অনুমান করতে গেলে অন্য দিক দিয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন। যতদূর মনে হ'ল, ও-বাড়ী সম্বন্ধে আর কা'রো বিশেষ কোনো কৌতূহল নেই, প্রতিবেশী সম্বন্ধে সহরের এ-রকম উদাসীনতা—এ ত নিত্যকার ব্যাপার, তবু যে ক'টি কথা আর শুনলাম ও বাড়ী থেকে, তা'তে কৌতূহলটা স্বাভাবিক ব'লেই মনে হ'ল।

পরদিন রাত্রে আবার সেই গোলমাল, চীৎকার, হাতাহাতি এবং বাঁধাবাঁধির ব্যাপার! ডাক্তার বাবু বললেন, 'পুলিশ ডাকতে হ'ল দেখছি এবার! রাত্রে ঘুমোবার যো নেই—সমস্ত দিন খেটে খুটে এসে একি ভুতুড়ে কাণ্ড মশায় পাড়ায় ?'—এই ধরণের একটা অস্বস্তির আভাস প্রায় সকলের মুখেই শোনা গেল। দু' একজন দুঃসাহসী ও-বাড়ী গিয়ে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করবার চেষ্টায় ছিল। ডাক্তার বাবু নিষেধ করলেন, কাজেই তাদের দুঃসাহস দেখা'বার সৌভাগ্য আর হ'ল না!

বিকালের দিকে বেড়াতে বেড়াতে একবার ক্লাবে গেলাম। ক্লাব সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না, তবে নিতান্তই চাঁদাটা দিতে হয় মাস গেলে, তাই মাঝে মাঝে এক-আধবার যেতে হয়। মানসিক অবস্থা এমন একটা সীমায় এসে পৌঁছেছে, যেখানে আগ্রহ ব'লে জিনিবটার অভাব বেশ বুঝতে পারি। কবির ভাষায় বলা চলে—

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা !

কিন্তু পর পর দু'রাত্রি ধ'রে যে 'অকস্মাৎ' পাড়ায় হানা দিচ্ছে, তা'তেই আগ্রহ বাড়িয়ে তুলল। ক্লাবে এসে দেখি সমারোহ ব্যাপার—লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম হয় নি। ঘন ঘন চা, পান, তামাক ইত্যাদি চলছে। লক্ষ্য করলাম, ক্লাবে হ'য়েছে তিনটি দল, একদলে আলোচনা হচ্ছে সাহিত্য, একদলে পলিটিকস্ এবং আর এক দল সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার হিসাব-নিকাশ করছেন। প্রথম দুটি দল ছেড়ে দিয়ে শেষেরটি আশ্রয় করা গেল। কারণ, শেষেরটির মধ্যে আমাদের নীরস মন একটু-আধটু তৃপ্তি পেতে পারে। পাশের বাড়ী তা'র বিস্ময়কর 'আকস্মিক' ঘটনা নিয়ে পাড়ার মধ্যে যে একটা চাপা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, তারই পরিচয় পেলাম ক্লাবের সামাজিক দলের কথাবার্ত্তায়।

নীতীশবাবু অকস্মাৎ গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে তাকিয়াটা টেনে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন এবং ক্লাবের সমস্ত কণ্ঠ-কাকলি একমুহূর্ত্তে স্তব্ধ করে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'আমি জানি !'

সকলে অকস্মাৎ সচকিত হ'য়ে সমস্বরে বলাবলি করতে লাগলো, 'কি হে, কি ব্যাপার!'

নীতীশবাবু স্বর নামিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বল্লেন, 'আমি জানি পাশের বাড়ীর কথা, আপনারা শুনবেন কি? তাছাড়া আমার জানার একটা সুবিধে আছে যেটা আপনাদের নেই, আমি পাশের বাড়ীতে গান শেখাতে যাই!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, শুনব বৈ কি! বলো হে নীতীশ, আমরা তিনদলেই ঐ এক বিষয় নিয়েই আলোচনা কর্চ্ছি। তুমি এতক্ষণ চুপ করে থেকে মিছামিছি আমাদের কষ্ট দিচ্ছ!'

নীতীশবাবু বলতে আরম্ভ করলেন, 'তাহলে শুনুন। আপনারা অনেকেই, যাঁরা এ পাড়ায় থাকেন, সন্ধ্যার দিকে গান শুনতে পান বোধ হয়! একটি ছোট মেয়ে গান শেখে, আমিই তাকে গান শেখাই। আমার গলাও কি আপনারা চেনেন না? কৈ কেউ যে চেনেন, এমন ত মনে হয় না। যাই হোক্ আমিই ঐ বাড়ীর গানের টিউটার। রবীন্দ্রনাথের গানই আমি শেখাই—ছোট মেয়েটি শিখছে ভালো, মন্দ নয়!

নীতীশবাবুকে বাধা দিয়ে বল্লাম, 'কৈ নীতীশবাবু! এ যে শিবের গীত আরম্ভ করলেন, আমাদের আসল পয়েণ্ট বাদ দিয়ে এ কি?'

'আহা, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন আপনি? যথাসময়ে সমস্তই জানতে পারবেন!'—ব'লে নীতীশবাবু গড়গড়ার নলটিতে বারকতক টান দিয়ে ব'লে যেতে লাগলেন,—

'দেখুন, আমি বেশীদিন ওখানে গান শেখাতে যাই নি কাজেই এ ব্যাপারের গভীর তথ্য আমি জানি নে। মোটামুটি যেটুকু দেখেছি বলছি, তাই থেকে আপনারা কারণ অনুমান ক'রে নেবেন।

বাড়ীর কর্ত্তা অতি ভদ্রলোক, সাত ছেলে এবং দশটি মেয়ে। এই বিরাট সৃষ্টি-যজ্ঞের ব্যাপারটা যাঁর ওপর দিয়ে গেছে সেই গৃহিণী প্রায়ই শয্যাগত থাকেন। চারিটি ছেলে বিদেশে চাকরী-বাকরী নিয়ে থাকে, তিনটি বাড়ীতে মানুষ হচ্ছে, অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বারকতক হোঁচট খেয়ে চার-পাঁচজন টিউটারের শরণাপন্ন হ'য়ে ক্রমাগত চেষ্টা করছে। দশটি মেয়ের মধ্যে পাঁচটি বিবাহিতা, পাঁচটি অবিবাহিতা। বিবাহিতাদের মধ্যে তিনটির স্বামী প্রায় ঘরজামাই বললেই চলে। তাঁরা সহরে শ্বশুরবাড়ীতে থেকে দীর্ঘ পাঁচবছর ধ'রে চাকরীর চেষ্টা করছেন। প্রত্যেকের আবার চার পাঁচটি করে ছেলে মেয়ে হ'য়েছে—কেবল বড় মেয়েটির একটি মাত্র ছেলে এবং তার স্বামীই আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়ক। বাকী পাঁচটি অবিবাহিতা মেয়ে পড়াশুনা এবং গান-বাজনার চর্চ্চা করছে এবং আধুনিক রুচির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

এই ত গেল বাড়ীর মোটামুটি বর্ণনা। বাড়ীর রান্নাঘর দেখলে তাক লেগে যায়—একটা বিরাট যজ্ঞশালা। নানারকম প্রবৃত্তি এবং নানারকম রুচির খোরাক জোগাচ্ছে এই ঘর—কর্ত্তা নির্ব্বিকার শান্ত ভাবে বাইরের বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে থাকেন প্রায়ই। কথা খুব কম বলেন। আমি যখন গান গাই, তখন এক-একবার এসে আমার কাছে বসেন, গান শোনেন, অথবা অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবেন বুঝবার যো নেই, সমস্ত আকৃতি-প্রকৃতিতে এমন একটা সুদূর নির্লিপ্ততা, —মনে হয় যেন ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, নৌকো কখন আসবে—তারই প্রতীক্ষায় যেন তাঁর চোখ দুটিতে একটা অতিরিক্ত রকমের আগ্রহ ফুটে উঠেছে। আমি গান গাই, আর মাঝে মাঝে তাঁকে লক্ষ্য করে দেখি; এই একটি নিরীহ মানুষ কি করে এই অতিকায় সংসারের বোঝাটা টেনে নিয়ে চলেছেন ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়!

ছেলেমেয়েরা আসে যায়—বেশভূষা, কথাবার্ত্তা শাণিত, তীক্ষ্ণ, বিদ্যুতের আলোর মত পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বল! তারা যে জগতে বাস করে, তাদের পিতৃদেব সেই জগতের মুক্ত দ্বারপথে যতটুকু আলো দেখতে পেয়েছেন, তা'তেই স্তম্ভিত হ'য়ে স্থির হ'য়ে গেছেন। সান্ত্বনাই বা তিনি কোথায় পাবেন? গৃহিণীও বারোমাসের জন্যে শয্যাগত। বড় জামাই সুধাংশুকে তিনি একটু-আধটু স্নেহ করতেন, কিন্তু তারও যে অবস্থা, তাতে বর্ত্তমানে ভয়ের কারণ ঘটেছে। সেদিন দেখি, কর্ত্তা চাকরকে বলছেন 'আমার ক্যাম্পখাটখানা বাইরে পেতে দে—বারান্দায়! দিয়ে সদর দরজা জোরসে বন্ধ করে দিবি, টি-পয়ের উপর এক গ্লাস জল রাখতে ভুলিস্ নে! O God,

what a disturbance, I may die to-night! (হে ঈশ্বর, কি গোলমাল, আমি আজ রাত্রে হয়ত ম'রে যেতে পারি!)

একমাত্র সেই সন্ধ্যায় কর্ত্তার মনের কথার খানিকটা আভাস পেয়েছিলাম। যাই হোক্,—যে কথা বল্‌ছিলাম। বড় জামাই সুধাংশু এম্-এ, পি-আর-এস্! লোকটি যথার্থ শিক্ষিত, এখানেই কোনো কলেজের অধ্যাপক! সে-ই তার বিখ্যাত শ্বশুরের একরকম দক্ষিণহস্ত বল্‌লেও চলে। দিবারাত্রি পড়াশুনা আর রিসার্চ্চ নিয়ে আছে—সংযতবাক্ শান্তমূর্ত্তি, তপস্বীর মতো আচরণ—অত বড় বিদ্বান লোক, এ-রকম না হ'লে চল্‌বেই বা কেন?

এঁর স্ত্রীকে আমি দু'একবার দেখেছি, ছোট একটি ছেলে নিয়ে ব্যস্ত। বড় রুগ্‌ণ এবং বিষণ্ণ চেহারা—কোথাও কোনো শ্রী-ছাঁদ নেই!

এই সুধাংশুই আমাদের কাহিনীর নায়ক! আপনারা রাত্রে যাঁর গোলমাল শুনেছেন, তা' এঁরই মুখনিঃসৃত বাক্যস্রোত এবং সেই স্রোত বন্ধ করার যে চেষ্টা—তা'তেই আপনারা সন্ত্রস্ত!

—এইখানে নীতীশবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে গড়গড়ায় মনঃসংযোগ করলেন। আমরা তাঁর শুভ্রমূর্ত্তির দিকে চেয়ে ব'সে রইলাম। সুধাংশু-তথ্য আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছে, নীতীশ বাবু কখন আবার আরম্ভ করবেন, তারই জন্যে আমরা উৎসুক হ'য়ে আছি, হঠাৎ নীতীশবাবু নল নামিয়ে রেখে পুনরায় বালিশ টেনে নিলেন—

'দেখুন, মানুষের চরিত্রের কি Sudden changes হয়! এই সুধাংশুকেই ধরুন, আপনারা কি কখনো ভাব্‌তে পেরেছেন, একটা এম্-এ, পি-আর-এস্ গভীর রাত্রে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ মাতালের মত আচরণ সুরু করতে পারে? এ ভাবা যায় না, বুঝ্‌লেন, এ ভাবা যায় না! সুধাংশু বড় শান্ত প্রকৃতি কিন্তু বেশী শান্ত হওয়াও ভালো নয়! কি ক'রে যে তার এই মানসিক পরিবর্ত্তন হ'ল, সেটা আপনারা বিচার করবেন। আমাকে শুধু ঘটনাটা ব'লে যেতে দিন।

সুধাংশু একেসার্, সুধাংশু কর্ত্তার প্রিয়পাত্র ও সুধাংশু তাঁর ছেলেদের স্থান অধিকার করেছে,—এ ব্যাপারটা সহ্য করা অন্য জামাইদের পক্ষে কঠিন। বিশেষতঃ তারা কেউ কিছু করে না, চাকরীর নাম ক'রে দীর্ঘকাল ধ'রে শ্বশুরবাড়ীর অবাধিত অন্ন ধ্বংস করছে! কাজেই সুধাংশুর সঙ্গে অন্য জামাইদের তেমন সদ্ভাব নেই, এটা আমি কয়েকদিনেই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম।

যে সব ছেলেরা মানুষ হচ্ছিল, তাদের অভিভাবকতা করতে হ'ত সুধাংশুকে। কে কতদূর পড়াশুনা করছে, কার কবে পরীক্ষা, এ সব সংবাদ তাকে রাখ্‌তে হ'ত, সেই অনুসারে ব্যবস্থাও তাকে করতে হ'ত, কাজেই ছেলেরাও যে সুধাংশুর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল,—এ রকম আভাস মোটেই পাইনি আমি।

সুধাংশুর স্ত্রীর কথা পূর্ব্বেই বলেছি। বড় বিষণ্ণ, বড় শ্রীহীন মূর্ত্তি। সুধাংশু যেমন এই প্রকাণ্ড বাড়ীটার কতকটা নির্জ্জন-বাস করছে, তার স্ত্রীও তেমনি নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, নিঃশব্দ-চারিণী। এই রকম আমার মনে হ'য়েছে বুঝ্‌লেন? কারণ, কথাবার্ত্তা বিশেষ শুনিনি কারও, সুধাংশুর সঙ্গে দেখা হ'ত আমার অল্পই—তাছাড়া দশবারোটা ভাষা যে জানে, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহাও বড় শক্ত ব্যাপার! শুধু আকারে আচরণে ইঙ্গিতে যেটুকু বুঝেছি, সেইটুকুই বলছি আপনাদের কাছে।

'ও বাড়ীতে সুধাংশুর positionটা বোধ করি পরিষ্কার হ'য়েছে আপনাদের কাছে।'

আমি এইখানে নীতীশবাবুকে ঈষৎ বাধা দিয়ে বল্‌লাম, 'হ্যাঁ, তা' হ'য়েছে নীতীশবাবু, কিন্তু আমাদের আসল pointটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? রাত্রের সেই চীৎকার—সেই inhuman ব্যাপার— সেইটেই আমরা জান্‌তে চাইছি কি না!'

নীতীশবাবু বল্‌লেন, 'হ্যাঁ সেইটেই—সেইটেই,—অপেক্ষা করুন, তাড়াতাড়ি করলে চল্‌বে কেন? তারপর যা' বলছিলাম! একদিন সন্ধ্যার সময় যথানিয়মিত গান শেখাতে গেছি, গিয়ে দেখি ঘর অন্ধকার, বাইরে কেউ কোথাও নেই; চাকর-বাকরের নাম ধ'রে যে ডাক্‌ব, তারও কোনো উপায় নেই। অন্ধকার ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, আমার ছাত্রীর নাম ধ'রে ডাক্‌ব ভাবছি—

সময়ে ঘরে আলো জ'লে উঠ্‌ল। উজ্জ্বল আলোয় দেখ্‌লাম, দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে সুধাংশু, আমায় দেখে স্মিতমুখে নমস্কার জানিয়ে বল্‌ল, 'কতক্ষণ এসেছেন নীতীশ বাবু?'

আমি প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বল্‌লাম, 'বেশীক্ষণ আসি নি। এইমাত্র এসে দেখি, ঘর অন্ধকার, আজ এরা গেল কোথায়, কারো সাড়া-শব্দ পাচ্ছিনে যে'

'আপনার ছাত্রী আজ বাড়ী নেই, এই কথাটি জানাবার জন্যে আমি এতক্ষণ ধ'রে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। তাছাড়া আপনার সঙ্গে আরো দু'টি একটি কথা কইবার আছে,—' এই কথা ব'লে সুধাংশু যেন ইসারায় কাকে ডাক্‌ল, কোনো সাড়া না পেয়ে ডাক্‌ল,—'এই লাবণ্য, এদিকে এস!'

লাবণ্য আমার ছাত্রীরই একটি অবিবাহিতা ভগ্নীর নাম। আমি তাকে দেখিনি কোনো দিন। আমার ছাত্রীর কাছে তার নাম শুনেছি, গান শিখ্‌বার আগ্রহ নাকি তার অপরিসীম, কিন্তু সুযোগ অভাবে তা'র গান শেখা হচ্ছে না।

সুধাংশুর ডাকে সাড়া দিয়ে একটি সলজ্জকুণ্ঠিতা কিশোরী ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। আমি তার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলাম—চোখের পলক পড়্‌তে চায় না, এ মেয়েটি যে সুধাংশুর শ্যালিকা হ'তে পারে, এ কথা সুধাংশুর স্ত্রীকে দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অপরূপ সৌন্দর্য্য, সুন্দর দু'টি হাত যোড় ক'রে আমাকে নমস্কার জানালে এবং পরিচয়ের অপেক্ষায় সুধাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সুধাংশু একটু কুণ্ঠিত ভাবে আমাকে জানা'লে, 'যদি কিছু মনে না করেন,—আমার শ্যালিকা এই লাবণ্য, একেও আপনি একটু-আধটু গান শেখাবেন। রবীন্দ্রনাথের গান শিখ্‌বার আগ্রহ ওর খুব বেশী, আর, আপনার গান শুনে ও মুগ্ধ হ'য়েছে, আপনার কাছেই শিখতে চায়।'

আমি মৃদুহাস্যে জানালাম, 'এ আর এমন বেশী কথা কি? তবে, একটু বেশী সময় আমাকে থাকৃতে হ'বে—তা'র জন্যে—'

'হ্যাঁ, তার জন্যে যে ব্যবস্থা কর্‌তে হয়, তা' আমি কর্‌ব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'না, আমি সে কথা বলিনি, তা'র জন্যে কোনো অসুবিধা হ'বে না ত আপনাদের?'

'না, না—অসুবিধে কিসের? বেশীক্ষণ ধ'রে গান গাওয়া হ'বে—এই ত! তা'তে আর অসুবিধা কি, কি বলো লাবণ্য?'

লাবণ্য বল্‌ল, 'না অসুবিধে কিসের, তবে মাষ্টার মশায়ের একটু বেশী পরিশ্রম হ'বে—এই যা! তা, আমি ওঁকে বেশীক্ষণ detain কর্‌ব না, আমার যা' জান্‌বার, তা' আমি অল্প সময়ের মধ্যেই জেনে নেব।'

আমি হেসে বল্‌লাম, 'তা হ'লে আজ থেকেই আরম্ভ করা যাক্, কি বলেন সুধাংশুবাবু!'

সুধাংশু লাবণ্যের সম্মতির অপেক্ষায় তা'র দিকে চেয়ে রইল। লাবণ্য সুধাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল, 'না, আজ আর কি ক'রে হ'বে? আজ যে তুমি আমাকে সিনেমায় নিয়ে যাবে ব'লেছিলে?'

সুধাংশুর মুখের উপর একটা ম্লানতা ঘনিয়ে এল দেখলাম এই কথায়, কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে সে সেটা কাটিয়ে স্মিতহাস্যে মুখ উজ্জ্বল ক'রে বল্‌ল, 'আজ তা'হলে থাক্, নীতীশবাবু, আপনি কাল থেকে আরম্ভ কর্‌বেন।'

আমি নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এলাম। লাবণ্য অপরূপ সুন্দরী, তাকে গান শেখাতে হ'বে—এতে মনে আমার প্রসন্নতা আর ধরে না।

দেখুন, এক আধজনকেই দেখতে পাওয়া যায়, যাদের সত্যই গান গাইবার বিধিদত্ত ক্ষমতা আছে। এদের মধ্যে লাবণ্য একজন। এ-রকম একটি ছাত্রীকে গান শেখানোর মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে। দু' চারদিন লাবণ্যকে গান শেখানোর মধ্যেই আমি তা' প্রচুর পরিমাণে পেয়েছিলাম। আমি একদিন তাকে বল্‌লাম, 'দেখো লাবণ্য, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবরূপ বড় সুন্দর, কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর এমনি, যে, সে গান যেন তোমার কণ্ঠের জন্যই রচনা করা হ'য়েছে!'

লাবণ্য বড় লজ্জিত হ'য়ে তার সমস্ত দেহ-যষ্টিকে সঙ্কুচিত ক'রে বল্‌ল, 'যান্, কি এমন কণ্ঠ আমার, যা' কিছু শিখেছি, সে ত সুধাংশুবাবুর কাছে আমি ঋণী।'

'বলো কি? সুধাংশু কি গান জানেন না-কি?' —বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'জানেন বৈ কি! আপনি শোনেন নি তাঁর গান? আচ্ছা, আমি এক্ষুনি তাঁকে ডাকছি!'—ব'লে লাবণ্য উঠে গেল।

সুধাংশু এসে বললেন, 'আপনি শোনেন কেন ওর কথা? আমার মত কাঠখোট্টা লোক যে গান জানে, এ-কথাও আবার বিশ্বাস করেন?'

কিছুতেই সুধাংশুকে গান গাওয়াতে পারলাম না। কিন্তু লাবণ্য আমাকে কখনো মিথ্যা বলে নি। সে ওকে গান গাওয়াবেই বলেছে।

কিছুদিন পরে আমার আসল ছাত্রী ঘুরে এলো। তারপর প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের গানের আসর ক্রমশঃ জমকালো হ'য়ে উঠতে লাগল। একদিন সত্যই সুধাংশুর গানে মুগ্ধ হ'লাম। তার সাধনা বিস্তৃততর, আমাদের মত পেশাদারী সাধনা তা'র নয়। মুগ্ধ হ'লাম তা'র শিক্ষিত মনের বিচিত্র অনুসন্ধিৎসায়।

গানের আসর যখন শেষ হ'য়ে আসত, তখন দেখতাম প্রতিদিন সুধাংশু লাবণ্যকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। লাবণ্যের মধ্যে সুধাংশু যেন তা'র আত্মপরিচয় পেতে চায়। লক্ষ্য করেছি, সুধাংশু তার নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে উদাসীন, কিন্তু লাবণ্যের যে-কোনো রকম উন্নতি বিধানে তা'র যেন যত্নের ত্রুটি নেই, আগ্রহেরও অন্ত নেই।

সেদিন ও বাড়ী যেতে আমার একটু রাত্রি হ'য়েছিল। গিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। ঘর আগের মতই অন্ধকার। হয়ত কোথাও গিয়েছে সব, এক্ষুনি ফিরবে, এই মনে ক'রে বাইরে কর্ত্তার ইজি চেয়ারে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ইজি চেয়ারের পিছনেই জানালা, সেটি সিঁড়ির জানালা। সিঁড়িটি ঘুরে ঘুরে তে-তলা অবধি চ'লে গেছে। জানালার খড়খড়ি খোলা ছিল। কা'রা যেন সেই নির্জ্জন গৃহের অন্ধকার সিঁড়ি থেকে অস্ফুট নিম্নকণ্ঠে কথাবার্ত্তা কইছে শুনতে পেলাম। আগ্রহ বেড়ে গেল, বুঝতেই পারেন আপনারা, সে সময়ে আগ্রহ না এসে যায় না, ইজি চেয়ারে মৃতবৎ শুয়ে থেকে সেই অস্ফুট আলোচনা শুনতে লাগলাম। অপরাধ হ'ল ভাবছেন, আপনারা—কিন্তু সে অপরাধ না করলে আজ আপনাদের কাছে জিনিষটা explain করতে পারতাম না। ব্যাপারটা জটিল বেশ, বুঝতেই পারছেন ত! লাবণ্যের কণ্ঠস্বর কান্নায় আর্দ্র, সুধাংশুর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, দৃঢ়।

'আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো লাবণ্য, তোমরা সবাই দেখছি আমার উপর বিরক্ত হ'য়েছ।'

'চ'লে যাবে, কোথায়?'

'যেখানে হোক্ এক জায়গায়—স্থান কি মিলবে না কোথাও?'

'তোমার স্থান ত মিলবে, কিন্তু—'

'কিন্তু কি লাবণ্য, কিন্তু কি?'

'কিছু নয়, আমি দিদির কথা ভাবছি। দিদির কথা তুমি একেবারেই ভাবো না,—কেবল সিনেমা, কেবল বন্ধু-বান্ধব, আর শুধু research!'

'তোমার দিদি? কেন, তার কি কোনো কষ্ট আছে? কিসের দুঃখ তার?—আমি যখন আছি!'

'কিসের দুঃখ? তুমি কি একবার-ও তা' জানতে চেষ্টা করেছ কিসের দুঃখ তা'র? তা'র মুখের দিকে চেয়েছ কি ভাল ক'রে—আমার কিছুরি দরকার নেই, গান না, সিনেমা না, পড়াশুনা না, কিচ্ছু না—তুমি যদি যাও, ত দিদিকে নিয়ে যাও।'

'আচ্ছা, তাই হ'বে, তাহ'লে আমি কালই চলে যাই, কি বলো?'

কান্নায় আচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরে লাবণ্য উত্তর দিল, 'না না কিছুতেই না, তুমি যেতে পাবে না!'

সুধাংশুর কণ্ঠস্বর অবিচলিত, 'আমাকে যেতে হ'বেই লাবণ্য, আমার বড় ভয় হয়—'

'ভয়? কিসের ভয়?'

'জানিনে লাবণ্য, আমার বড় ভয় হয়, মনে হয়, এ আমি কোথায় আছি? যে কোনো মুহূর্ত্তে বিপ্লব হ'তে পারে, কত লোক, কত মন—কত সমস্যা, আমাকে ছাড়ো লাবণ্য, আমি চলে যাই!'

লাবণ্যের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'ল কান্নায়, বেশ বুঝ্‌লাম। পদশব্দে মনে হ'ল সুধাংশু চ'লে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ইজি চেয়ারে চুপচাপ পড়ে থেকে বেশ বুঝ্‌লাম, আমার এ বাড়ীতে গান শেখানোর পালা বোধ হয় সাঙ্গ হ'ল। সুধাংশুর মনের মধ্যে বেধেছে বিপ্লব, সেটা এই কাণ্ডারীহীন বিশাল সংসারের পক্ষে মোটেই শুভ নয়। ধীরে ধীরে উঠে চ'লে এলাম।

তারপর কয়েকদিন আর ও বাড়ীতে যাই নি। একদিন যাবার জন্যে ডাক এল। স্বয়ং কর্তা তলব পাঠিয়েছেন, অগত্যা যেতে হ'ল।

আমি যেতেই বল্‌লেন, 'বসুন, আমি বড়ই বিপন্ন, সুধাংশু হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। বড় অদ্ভুত symptomps, বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে একেবারে উন্মাদ, তারপর বাইরে বেরোলেই সে বেশ স্বাভাবিক, সুস্থ বোধ করে থাকে। আমি ভাব্‌ছি পনেরো বোলদিনের মধ্যে তাকে নিয়ে কোথাও চেঞ্জে যাই; আহা, বড় ভালো ছেলে নীতিশবাবু, আমার বড় ছেলের কাজ করেছে ও, তার যে এ রকম অবস্থা হ'বে, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনোদিন'। বৃদ্ধের চোখ ছল ছল ক'রে উঠ্‌ল।

আমি বল্‌লাম, 'শুনে বড় দুঃখিত হ'লাম, সুধাংশুবাবুর এ রকম অবস্থা—হঠাৎ এ রকম কেন হ'ল, কোনো কারণ কিছু জান্‌তে পেরেছেন কি?'

'না, বিশেষ কিছু বুঝ্‌তে পারিনি, তবে এইটুকুই মনে হয়, তার worries কিছু বেশী হ'য়েছিল ইদানীং, আহা, আমি যদি আগে বুঝতে পার্‌তাম, তাহ'লে তাকে সংসারের এত troubles এর মধ্যে রাখ্‌তাম না, আমারই ভুল হ'য়েছে!'

'ভালো ক'রে জানুন, যদি চিকিৎসা সম্ভব হয়, করান—তারপর চেঞ্জে গেলে ভালো হ'তে পারে, আমি তাহ'লে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উপস্থিত ওরা এখন গান আর শিখ্‌বে না, আমি ঘুরে এসে আপনাকে খবর দিলে আপনি আস্‌বেন।'

'আচ্ছা, তাই হ'বে—' ব'লে আমি ও বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি। তারপর আর বড় একটা যাইনি ওদিকে। এখনো শুন্‌ছি আপনাদের কাছে, সুধাংশুর সেই একই অবস্থা—কাজেই আমি যতটুকু জান্‌তাম, বল্‌লাম। তবে এই হয়ত যথেষ্ট নয়, কিন্তু আমার পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু জানা সম্ভবপর নয়।'—এই ব'লে নীতিশবাবু পুনরায় গড়গড়ায় মনঃসংযোগ কর্‌লেন। আমরা সেই কুণ্ডলায়িত ধূমরাশির দিকে চেয়ে রইলাম এবং তার চেয়েও বেশী কুণ্ডলায়িত জটিল মানব মনোরাজ্যের সম্বন্ধে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম হয়ত!'

কেউ কেউ বল্‌লেন, 'এর চেয়েও বেশী কিছু গূঢ় তত্ত্ব আছে হয়ত!'

আমি বল্‌লাম, 'সেগুলো থাক্‌লেও এক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে। সুধাংশু সম্বন্ধে যা' আমরা জেনেছি, তা-ই sufficient মনে হয়।' আমার এ কথায় ক্লাবের মধ্যে একটা মহা তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হ'য়ে গেল। তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হ'লে শেষ অবধি মীমাংসা আর হয় না। কাজেই ধীরে ধীরে ক্লাব থেকে উঠে পড়্‌লাম।

বাড়ী ফির্‌তে ফির্‌তে জিনিষটা নিয়ে বারে বারে আলোচনা করতে লাগ্‌লাম। কত রকম সমস্যা হ'তে পারে—কিন্তু সুধাংশু তার শিক্ষার বর্ম্ম নিয়ে সংসার যুদ্ধে পরাস্ত হ'ল ভেবে মনটা ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌ল। শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা এবং মানুষের মন—এই ত্রিবিধ সমস্যা নিয়ে একটা মর্ম্মান্তিক প্রবন্ধ লিখ্‌ব ভাব্‌তে লাগ্‌লাম।

পরদিন বিকালের দিকে খানকতক বই কিনব ব'লে বেরিয়েছি। পুরাণো বই-এর দোকানে বই ঘাঁটতে প্রবৃত্ত হ'য়েছি, যে বই পছন্দ হ'ল, তার দাম নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে বাদানুবাদ চলেছে, এমন সময়ে দেখি আমার পাশেই এক সুবেশ প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'Unseen Universe আপনাদের এখানে পাওয়া যাবে কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ যাবে, বসুন, বার ক'রে দিচ্ছি!'

ভদ্রলোক বেঞ্চে ব'সে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি—কোথায় বলুন ত? আচ্ছা, কোথায় থাকেন আপনি বল্‌তে পারেন?'

আমি রাস্তার নাম কর্‌লাম, করতেই তিনি বল্‌লেন,

'ও, আমিও ত থাকি ঐখানেই, তাহ'লে ঐখানেই দেখেছি আপনাকে।'

বিস্মিত হ'লাম। সুন্দর বেশভূষা, সুন্দর কথাবার্ত্তা, Unseen Uuiverse খানা নিয়ে সেই বই-এর ষ্টলে দাঁড়িয়ে কত আলোচনা করতে লাগ্‌লেন তিনি—তাঁর আলোচনায় মুগ্ধ হলাম। ভাব্‌লাম, এই লোক কি ক'রে পাগল হ'তে পারে? অসম্ভব।

যাবার সময়ে তিনি নমস্কার জানিয়ে গেলেন, বল্লেন, 'দেখা হবে আবার—আমিই না হয় যাব একদিন আপনার ওখানে!'

স্মিতমুখে প্রতি-নমস্কার ক'রে আমি বিদায় নিলাম।

সেইদিনই রাত্রে নতুন কেনা বই ক'খানা নিয়ে বারান্দায় এসে ব'সে ব'সে দেখ্‌ছি। রাত্রি গভীর, পাড়া নিঃশব্দ। হঠাৎ পাশের বাড়ীর জানালা খুলে গেল, ঘরের আলোর দিকে পিছন ফিরে একটি মেয়ে এসে ক্ষণকাল দাঁড়াল জানালায়। এলোমেলো চুল আর বিষণ্ণ মুখ দেখে সুধাংশুর স্ত্রীর কথা মনে প'ড়ে গেল! বাইরের সুস্পষ্ট চাঁদের আলোয় মনে হ'ল অন্তহীন বিষণ্ণতা তার—সমাধানের অতীত তার সমস্যা।

সে বেশীক্ষণ জানালায় ছিল না, জানালা থেকে তার চলে যাওয়ার পরই আবার সেই চীৎকার, তীব্র আর্ত্তনাদে পাড়া মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল। সুধাংশু বাড়ী এসেই পাগল হ'য়ে গেছে—'Iditos, Fools, তোমরা ভাব্‌ছ, ভারি সুবিধে হ'য়েছে, লোকটা পাগল হ'য়ে গেছে—এইবার যা খুসী তাই করি। Vampires, তোমরা রক্ত শোষণ কর্‌ছ, একটা বুড়ো লোকের পুরোণো রক্ত শোষণ কর্‌ছ তোমরা—'

'নিয়ে আয়, নিয়ে আয় দড়ি নিয়ে আয়, বেঁধে ফেলো—'

'তোরা থাম্ বাবু, থাম্—ওকে একটু বিশ্রাম দে, আমি কালই ওকে নিয়ে যাব—হায় ভগবান্!'

পাশের বাড়ী বেশীদূর নয়, একটি মেয়ের অস্পষ্ট কান্নার স্বর শুনা গেল, সে বোধ হয় লাবণ্য।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

স্ত্রীলোকের যক্ষ্মারোগ

ডাঃ শ্রীকামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় বি-এস-সি, এম্-বি

অন্যান্য নিবার্য্য ব্যাধির তুলনায় যক্ষ্মারোগের সাংঘাতিকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। এই সাংঘাতিক ব্যাধি বাঙ্গালাদেশের জীবনীশক্তিকে বিশেষ ভাবে হ্রাস করিয়া দিতেছে, এজন্য এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন এবং প্রতীকার ব্যবস্থায় অবহিত হওয়া দেশবাসীর পক্ষে অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য। য়ুরোপ ও আমেরিকা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই দুরন্ত ব্যাধিকে প্রশমিত করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ নরনারীই অজ্ঞান-অন্ধকারে রহিয়াছে বলিয়া তাহারা এই মারাত্মক ব্যাধির স্বরূপ অবগত নহে এবং দরিদ্র বঙ্গদেশবাসী এই অনিবার্য্য ব্যাধির গ্রাসে পড়িয়া অকালে জীবন হারাইতেছে।

শুধু জনাকীর্ণ সহরে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নহে, সুদূর পল্লীগ্রামগুলিও এই সকল ব্যাধির আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে উল্লিখিত ব্যাধিগুলিকে হতবীর্য্য করা সম্ভবপর, কিন্তু অভাগা দেশে তাহা দিন দিনই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অন্যান্য রোগে প্রতি বৎসর কত নরনারী কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহা বাদ দিলেও দেখা যায়, শুধু যক্ষ্মারোগে প্রতিবৎসর বাঙ্গালাদেশে লক্ষাধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। হিসাবদৃষ্টে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সাতলক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী এবং তিনলক্ষ বালকবালিকা বর্ত্তমানে যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছে। সাত লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। বাঙ্গালাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে এই দশলক্ষ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত নরনারীর কথা মনে হইলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কোনও সভ্যদেশে এরূপ অধিকসংখ্যক নরনারী বালকবালিকা যক্ষ্মারোগে জর্জ্জরিত হয় না। য়ুরোপে ও আমেরিকায় কোনও দেশের এত অধিকসংখ্যক নরনারী এমন মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, সে দেশের সরকার ও জনসাধারণ তাহার প্রতীকার উপায়ে নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর হইতেন।

লণ্ডনে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত নরনারীর মধ্যে পুরুষের মৃত্যুর হারই সমধিক। কিন্তু দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে ঠিক তাহার বিপরীত। এদেশে যক্ষ্মারোগপীড়িত নরনারীর মধ্যে নারীর মৃত্যুসংখ্যা পুরুষের চারিগুণ। বাঙ্গালাদেশে কেন এত অধিকসংখ্যক নারী যক্ষ্মারোগে মারা যায়, বিশেষজ্ঞগণ তাহার আলোচনা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে, অনেকক্ষেত্রে বাল্যাবস্থায় দেশবাসীর শরীরে যক্ষ্মাবীজাণু প্রবেশ করে। রুগ্ন পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয়স্বজন বা সহপাঠীর সংস্রবে আসিয়া বাল্যাবস্থায় এই রোগবীজাণু দেহে প্রবেশ করে। হিসাবদৃষ্টে দেখা যায়, যক্ষ্মারোগগ্রস্তা মাতার নিকট হইতে শতকরা ১২·৭ জন, পিতার নিকট হইতে শতকরা ২৩·৫ জন ভগিনীর নিকট হইতে শতকরা ৫·৯ জন, স্বামীর নিকট হইতে শতকরা ২·৩ জন স্ত্রীলোক অজ্ঞাতসারে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

শৈশবে যে যক্ষ্মাবীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হয়, বাল্যকাল অবধি তাহা অকর্ম্মণ্য অবস্থায় থাকে। যৌবনারম্ভের পর হইতে নানা কারণে রোগটী প্রকাশ পাইতে থাকে। অবিবাহিত অবস্থায় যক্ষ্মারোগ বিশেষ ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু বিবাহের পর, বিশেষতঃ সন্তান-প্রসবের পর হইতেই তাঁহাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। সেই দুর্ব্বলতার অবকাশে যক্ষ্মারোগ আত্মপ্রকাশ করে। হাঁসপাতালের হিসাবদৃষ্টে দেখা যায় যে, বিবাহিতা স্ত্রীলোক শতকরা ১৫ জন, পাঠ্যাবস্থায় বালিকা ও তরুণীরা শতকরা ৩ জন যক্ষ্মারোগে পীড়িতা হইয়া থাকেন। যে সকল নারী পীড়িতা বা রুগ্ন অবস্থায় প্রতি বৎসর বা দুই এক বৎসর অন্তর সন্তান প্রসব করেন তাঁহাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা অধিক।

আমাদের দেশের নারীরা সাধারণতঃ শরীরের প্রতি

তেমন যত্ন লন না, পোষাক পরিচ্ছদ, আহার্য্য কোনও বিষয়েই বাঙ্গালা দেশের মাতৃজাতির লোভ নাই। তাঁহারা স্বামী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন, সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দিকেই অবহিত হইয়া থাকেন। এমন কি, পীড়িতা হইয়াও নিজের শরীরের প্রতি উদাসীন থাকেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এদেশের সাধারণ নারীর প্রাথমিক জ্ঞানও তেমন নাই। য়ুরোপ ও আমেরিকার নারীদিগের সহিত তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রতীচ্য দেশের নারীরা - সামান্য অসুখ সর্দ্দি, কাসি কিছুই উপেক্ষা করেন না। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হেতু তাঁহারা জানেন যে, তুচ্ছ ব্যাধি হইতেও কঠিন ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। এজন্য প্রতীচ্য দেশের সাধারণ নারীরা সর্ব্বজনশ্রুত, ফলপ্রদ ঔষধ প্রথমাবস্থা হইতেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধিকাংশ স্থানে দেখা যায় যে, তাঁহারা সুইজারল্যাণ্ডের সুফলপ্রদ ঔষধ "সিরোলিন রচি" ব্যবহার করেন। আমি অনেক রোগীকে যক্ষা রোগের প্রথমাবস্থায় "সিরোলিন রচি" ব্যবস্থা করিয়া অমোঘ ফল পাইয়াছি। যক্ষারোগের সূত্রপাত হইতে এই ঔষধ সেবনে অনেক যক্ষারোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন, ইহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে অবগত আছি।

প্রতীচ্য দেশের চিকিৎসা-সংক্রান্ত ও অন্যান্য সাময়িক পত্রাদিতে দেখা যায় যে, বহু য়ুরোপীয় গৃহিণী "সিরোলিন রচি" ব্যবহার করিয়া শ্বাসরোগাক্রান্ত সন্তানদিগকে রোগ মুক্ত করিয়াছেন। রুগ্ন অবস্থায় দুর্ব্বল শিশুরা কটু বা বিস্বাদ ঔষধ সেবন করিতে যায় না। অনেক সময় ঔষধ সেবন করিবামাত্র বমি করিয়া ফেলে, কিন্তু "সিরোলিন রচি" খাইতে সুস্বাদু বলিয়া বিনা কৈফিয়তে সেবন করিয়া থাকে। আমাদের দেশের মাতৃজাতির স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশসাধন অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে অবহিত হইতে হইবে। দেশের মাতৃজাতির স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে না পারিলে জাতির কল্যাণ নাই। যক্ষারোগ যাহাতে প্রতিহত হইতে পারে, সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীকামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়

ঝরে গেছে ফুল

মৌলভি মনস্থর-উর রহমান

ঝরে গেছে ফুল লতারে কাঁদায়ে
শিশিরের মৃদু ঘায়ে,
বেদনার-ধ্বনি হাহাকার করে
রাতের নিবিড় ছায়ে।
কাননের মাঝে দখিণার বায়,
শূন্য পরাণে বিরহ কুড়ায়,
নীল আকাশের জোছনা পরাগ
নীরবে ঝরিয়া পড়ে,
আজ সমীরণ ব্যাকুলতা লয়ে
উতলা হইয়া মরে॥

ধূলির বুকেতে কুসুমের স্মৃতি
সন্ধ্যা সকাল যেন নিতি নিতি
পেলব লতার মর্ম্মের বাণী
কহে মলয়ের সনে,
না ফুটিতে ফুল, মাধুরী বিকাশি'
ঝরে গেছে আনমনে।

মধুপর্ক

শ্রীআশীষ গুপ্ত   শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

নিউইয়র্কে যখন বিভ্রাট বাধে

আকস্মিক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে অপরিহার্য্য,—কিন্তু সে বিষয়ে সাধারণ লোকের কোনও শিক্ষা না থাকার জন্য অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন হ'য়ে তার পক্ষে বিহ্বল হ'য়ে পড়া স্বাভাবিক। এই সব ব্যাপারে পুলিশ অথবা দমকলের কর্ম্মচারীদের সহায়তা অতিশয় কার্য্যকরী।



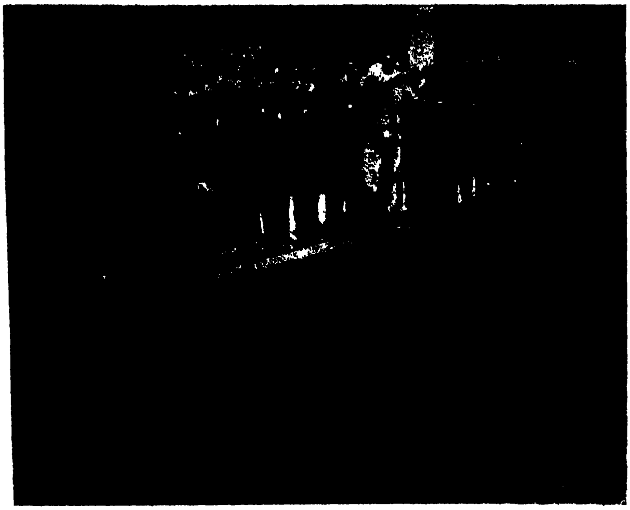
২নং পুলিশ স্কোয়াড সার্জ্জেণ্টের তত্ত্বাবধানে অফিস পরিত্যাগ করছে

নিউইয়র্কের পুলিশের একটা বিভাগ কেবলমাত্র জনসাধারণের মধ্যে আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিরোধের নিমিত্তই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। ১৯২৫সালে মাত্র একখানি ট্রাক, সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি, একজন সার্জ্জেণ্ট এবং সুনির্ব্বাচিত জনকয়েক সহকারী নিয়ে যে বিভাগের সৃষ্টি, আজ তা নানাদিক দিয়ে অনেকটাই বড় হ'য়ে উঠেছে।

এই বিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে প্রয়োজনীয় স্থানে সংস্থাপিত করা হয়। গুরুদায়িত্বপূর্ণ এই কাজের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকছাড়া কাউকে নেওয়া হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এই বিভাগটি একজন ইন্‌সপেক্‌টার, একজন সহকারী ইন্‌সপেক্‌টার, সাতজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট, বাষট্টিজন সার্জ্জেণ্ট এবং চারশ পাঁচজন প্রহরী সমবায়ে গঠিত।—পুলিশ এ্যাক্যাডেমিতে এদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক সাহায্য, ষ্টীম বয়লারের নানাবিধ গোলযোগ এবং অন্য বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তোলা হয়। বিষাক্ত গ্যাস সংক্রান্ত এবং ইলেকট্রিকের কাজে যত রকমের বিপদ সম্ভব তার প্রত্যেকটি বিষয়ে এদের উপদেশ দেওয়া হ'য়ে থাকে। পুলিশ এ্যাক্যাডেমির যে অংশে এই শিক্ষা-দানের বন্দোবস্ত আছে, তার ছাদের উপরে অবস্থিত গ্যাস চেম্বারে অশ্রু-উৎপাদক গ্যাস, সালফার এবং এ্যামোনিয়ার ধোঁয়ার সাহায্যে এই বিভাগের লোকদের হাতে কলমে শিক্ষাদান করা হয় এবং শেখান হয় কি করে গ্যাস প্রতিরোধক মুখোস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।—আবেদনপত্র গ্রহণের সময় কলকব্জাসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের দাবীই সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হয়। দমকলের লোকেরা এই দলের লোকদের নিকট হ'তে নানাপ্রকার সাহায্য লাভ করে। কোনও কোনও জেলায় পুলিশ স্কোয়াড নিজেরাই অগ্নিনির্ব্বাপণের কাজে অগ্রসর হয়ে থাকে।

কি ধরণের কাজে এদের ডাকা হয়, সে কথা বলবার পূর্ব্বে এদের ট্রাক এবং তার বিস্ময়কর সাজসরঞ্জাম সম্বন্ধে

কিছু বলা প্রয়োজন। এই ট্রাকগুলির গঠনপ্রণালী এক-রকম নিখুঁত বললেই চলে। ৫৭ অশ্বশক্তিযুক্ত মোটারের সাহায্যে এই ট্রাকগুলি পরিচালিত। এতে থাকে না এমন জিনিষ নেই, গরু হারালে গরু পাওয়া যায়, এমনিতর এর বন্দোবস্ত; পেরেক, হুক, দড়ি, কোদাল, কুঠার, হাতুড়ি লাইফ-বেল্ট, গ্যাস-ম্যাস্ক, এ্যাসিটিলিন এবং অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, ষ্ট্রেচার, অস্ত্রচিকিৎসার সরঞ্জাম, সর্বপ্রকারের যন্ত্রপাতি এবং আরও যে কত কি তার ইয়ত্তা নেই। উপরন্তু থাকে একটা মেশিন গান, দুটো রাইফ্‌ল্‌, দুটো শট গান,



নিমজ্জিত ব্যক্তির উদ্ধার সাধনের শিক্ষাদান

তদুপযুক্ত গোলাবারুদ, টিয়ার গ্যাস স্মোক বম্‌ এবং বুলেট-প্রুফ জামা।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেবলমাত্র মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার কাজে যে গাড়ী ব্যবহৃত হয়, তার এসব মারণাস্ত্র বহন করার কি প্রয়োজন। প্রয়োজন আছে বৈকি,—এ সমস্তই পুলিশ স্কোয়াডের কাজের অঙ্গ। তারা যেমন পুকুরের জল সেঁচে নিমজ্জিত বালককে উদ্ধার করে, তেমনই আবার জনবহুল স্থানে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজেও আত্মনিয়োগ করে' থাকে।

নিউইয়র্কের পুলিশ-স্কোয়াডের উপকারিতা সম্বন্ধে তাদের এক বছরের রিপোর্টই যথেষ্ট প্রমাণ।—এক বছরের মধ্যে তারা ২৫৮৫ জায়গায় নানাপ্রকারের দুর্ঘটনা নিবারণের নিমিত্ত উপস্থিত হ'য়েছিল। কোনও কাজই তাদের পক্ষে তুচ্ছ নয়, কোনও কিছুই তাদের পক্ষে অতি বৃহৎ নয়। গাছের উঁচু ডালে বেড়াল যদি আটকে পড়ে তাহ'লে তাকে উদ্ধার করার কাজেও এরা নিযুক্ত হয়, আবার নিযুক্ত হয় বিষাক্ত গ্যাসের হাত হ'তে মানুষের প্রাণরক্ষার কাজে, দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণের গুরু দায়িত্বে। এদের সাহায্য ব্যতিরেকে কত লোকে যে এই বছরের মধ্যে পরমপিতার শ্রীচরণতলে আশ্রয় নিত তা বলা যায় না। এক বছরের মধ্যে ৫৩৩ জন লোককে গ্যাসের আক্রমণ এবং জলে ও ডুবে যাওয়া থেকে এরা বাঁচিয়েছে!

বিষাক্ত বায়ুতেও নিজেদের মস্তিষ্ক যথাসম্ভব শীতল রাখবার উদ্দেশ্যে এরা পূর্ব্ব হ'তেই এ্যামোনিয়া, কার্ব্বন মনোক্সাইড্‌, ক্লোরিন্‌ গ্যাস, সায়ানোজেন ক্লোরাইড্‌ গ্যাস, সালফার ডায়ক্সাইড্‌ গ্যাস এবং স্মোক ফিউম্‌সের সঙ্গে ঘ্রাণসহযোগে যথাসাধ্য পরিচিত হ'বার চেষ্টা করে।

আলোচ্য বর্ষে গাড়ীঘোড়ার দুর্ঘটনা ঘটেছিল ২৪১টা, এরোপ্লেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল চার বার। উল্টে-যাওয়া নৌকো এদের সোজা করে' দিতে হ'য়েছে, ধ্বসে পড়া বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে উদ্ধার করতে হ'য়েছে মানুষকে। মাঝপথে থেমে গিয়েছে যে সব এলিভেটার তার থেকে এরা মানুষজনকে নীচে নামিয়ে এনেছে।

নানাপ্রকারের বিস্ফোরণের দুর্ঘটনাতেও এসেছে এদের আহ্বান। রাস্তার উপরে যে সব গাছ ঝুঁকে পড়েছে অথবা একেবারেই পড়ে' গিয়েছে সে সব গাছ স্থানান্তরিত করার জন্যও এদের ডাক এসেছে। পঁচিশটা ঘোড়াকে জল থেকে, গর্ত্ত থেকে এবং আরও সব এমন স্থান থেকে এরা উদ্ধার করেছে যে সব স্থানে অশ্বজাতীয় জীবের প্রবেশ বাস্তবিকই অনধিকার প্রবেশ।

বস্তুতঃ নিউইয়র্কের এই পুলিশ স্কোয়াড্‌ নিজেদের যে পরিচয় প্রদান করেছে তাতে যুগপৎ বিস্মিত এবং পুলকিত হ'তে হয়। সবার জন্য এদের সেবা, গভর্ণমেন্ট্‌ থেকে

দীনতম কুলিমজুর অবধি,—সকল শ্রেণীর এদের কাজ, ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম পর্য্যন্ত। এরা এদের কৃতিত্বের জন্য প্রকৃতই গৌরব অনুভব করতে পারে।



টিয়ার গ্যাস বমের ব্যবহার এবং গ্যাস মাস্কের সাহায্যে তাহার প্রতিরোধ

১ লক্ষ ২৫ হাজার মাইল বৃষ্টি

বছরে ৩৬৫ দিন প্রত্যেক সেকেণ্ড যদি ৬০ লক্ষ 'টন' ডিনামাইট্ বিস্ফোরণ করা হয় তাহলে যতখানি শক্তি সঞ্জাত হবে, সারা বছর ধরাপৃষ্ঠে বৃষ্টিপাতের শক্তিও ঠিক ততখানি। সমস্ত পৃথিবীর প্রতিদিনকার বৃষ্টির জল যদি কেউ সঞ্চয় করে রাখতে পারে তাহলে সেই জলরাশির ওজনের শক্তি হবে ৩০০০০০০০০০০০০ 'টন্' কয়লা পুড়িয়ে যে উত্তাপ হতে পারে তার শক্তির সমান। সেই জলরাশি ১ লক্ষ ২৫ হাজার মাইল দীর্ঘ, ঐ পরিমাণ মাইল প্রস্থ এবং উচ্চতায়ও ততখানি স্থান অধিকার করে ফেলবে।

ভারতবর্ষে আসাম অঞ্চলে যত বৃষ্টি হয় পৃথিবীর আর কোথাও তত হয় না। চেরাপুঞ্জিতে বছরে বৃষ্টি হয় প্রায় পাঁচ শ' ইঞ্চ্ এবং দু' একবার আটশ' ইঞ্চ পর্য্যন্ত হয়েছে, অর্থাৎ ৫০।৬০ ফুট।

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম সমুদ্রতীরে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। সেখানে একটি স্থানে গত সতেরো বছরে মাত্র তিনবার বৃষ্টি হয়েছে এবং তা'ও অতি সামান্য।

আফ্রিকায় আর এক বিচিত্র ব্যাপার। সাহারা মরুর মতন বৃষ্টিহীন দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই, কিন্তু এই জলহীন স্থানটির একটু দূরেই নাইগার নদীর মোহানায় এত বৃষ্টি পড়ে যে এক রাত্রির মধ্যেই সেখানে চামড়ার জুতা ও পশমের জামাতে ছাতা ধরে যায়।

কোকেন

যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে কোকেনের প্রকারভেদ পঞ্চাশ রকমের। তার মধ্যে দশ রকম জন্মায় আফ্রিকায়, ছয় রকম ভারতবর্ষ ও সিংহলে, একরকম অষ্ট্রেলিয়ায় আর বাকী সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায়।

পেরুর আদিম অধিবাসীরা বহু পুরাকাল থেকেই কোকেনের রহস্য জানত। স্পেন কর্ত্তৃক যখন পেরু বিজিত হল তখন পেরুবাসীদের মধ্যে কোকেন-ভক্ষণ সুপ্রচলিত ছিল। "কোকা" নামক গুল্মের পাতা থেকে কোকেন তৈরী হয়ে থাকে। আদিম পেরু-ভাষায় এর নাম ছিল "খোকা" অর্থাৎ "সর্ব্বোৎকৃষ্ট গাছ।"



প্রশান্ত মহাসাগরের স্যান্টা ক্রুজ দ্বীপে কাকাতুয়ার পালক দিয়ে তৈরী আংটি দিয়ে স্ত্রী কেনা হচ্ছে

পেরু থেকে কোকেনের ব্যবহার বলিভিয়া, ব্রেজিল ও আর্জেন্টাইনে ছড়িয়ে পড়ে। কোকা গুল্মগুলি ছ' ফুট থেকে ছ' ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে এবং বহু ডালপালা বিশিষ্ট হয়, অনেকটা কাঁটা ঝোঁপের মতন। সাধারণতঃ সমুদ্রবক্ষ থেকে ২ হাজার থেকে আরম্ভ করে ৮ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঁচু স্থানে কোকেনের চাষ হয়ে থাকে। কোকা গুল্মের চাষ করা মোটেই কঠিন নয়।



টোকিয়োতে মাছির উৎপাত অসহ্য, কাজে কাজেই কর্তৃপক্ষ বছরে একবার করে' মক্ষিকা ধ্বংস সপ্তাহ প্রবর্ত্তন করেন। অনেক মাছি ধরতে পারলে ছোটদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এই ছোট মেয়েটি মাছি ধরেছিল ২৫,০০০।

পেরু ও বলিভিয়াতে বছরে দু'বার মার্চ্চ ও মে মাসে কোকা-গুল্মের ফসল হয়। কোকা চারা বপনের দেড় বছর পরে সেই গুল্ম থেকে কোকেন সংগৃহীত হয়। কুড়ি বছর পর্য্যন্ত একটি গুল্ম থেকে প্রচুর পরিমাণে কোকেন পাওয়া যায়।

স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা কোকা গুল্মের পাকা পাতাগুলি চয়ন করে। পাতাগুলির উপরের পিঠ হলদে রঙের ও ভিতরের দিক্ চক্চকে সবুজ হয়ে থাকে। সাবধানে এক একটি করে পাতাগুলি তোলা হয়, গুল্মের উপরে হাত দেওয়া হয় না। পাতা তোলা হলে রৌদ্রতপ্ত পরিষ্কার পাথরের উপরে সেগুলি বিছান হয়। পাথরটি রৌদ্রে উত্তপ্ত হয়ে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে উল্টে-পাল্টে পাতাগুলি বেশ ভালো করে "ভাজা" হলে বাতাস প্রবেশ করতে না পারে এমন ভাবে বাক্সে বন্ধ করা হয়। কোথাও কোথাও বা চুলীর উপরে পাতাগুলি "ভাজা" হয়। যেমন করেই হোক্ না কেন একেবারে শুক্‌নো খট্‌খটে না হলে কোকেন বাক্সবন্দী হয় না।

আমাদের দেশে অনেকে যেমন ডিবেতে পান বা 'বটুয়া'তে খইনি-তামাকু নিয়ে সদাসর্ব্বদা সঙ্গে রাখে, পেরুতে তেমনি প্রায় সকলেই ছোট্ট একটি থলিতে কোকেন ভরে কাছে রাখে। কাজ কর্‌তে কর্‌তে সারাদিনে ৪।৫ বার খানিকটা কোকেন মুখে পুরে চিবিয়ে তাল পাকিয়ে তারপর একটুখানি চুণ গালে ফেলে দিয়ে 'সুস্বাদু' করে নেয়।

দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা সমস্তদিনে দু' তিন আউন্স কোকেন খায়। তারা বলে যে কোকেন এক নিমেষে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দেয়, কোকেন মুখে দিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা এমন কি ঘুমকেও জয় কর্‌তে পারা যায়।

কোকেনের নেশা চট্ করে একদিনে হয় না। যারা এ নেশা অভ্যাস করে প্রথম প্রথম তাদের কোকেন খেতে বিস্বাদ বোধ হয়, জিভের কোনও অনুভূতি থাকে না। কিন্তু খাওয়ার একটু পরেই ঘাড়ের শিরাগুলি দপ্ দপ্ কর্‌তে আরম্ভ করে, বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে, নাড়ীর গতি চঞ্চল হয়, মনে হয় যেন ভারী সুখ বোধ হচ্ছে।

এ অবস্থায় কথা কইতে ভালো লাগে না। একেলা চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। ক্রমে কান লাল হয়ে ওঠে, গাল দুটি রক্তহীন সাদা হয়ে যায়, নাকের ডগা ঠাণ্ডা হিম বোধ হয়, কপালে ও গলায় ঘাম দেখা দেয়। আঙুলের ডগা যখন ঠাণ্ডা হয় আর চোখের তারা বড় হয়ে ওঠে তখনই কোকেনের নেশার চরম অবস্থা। প্রায় একঘণ্টা এইরকম পড়ে থাকার পরে কোকেনখোর

আবার কোকেন চায়, না পেলে একেবারে নির্জীব প্রাণহীনের মত অসাড় হয়ে পড়ে থাকে।

কোকেনখোর দেখে চেনা সহজ। চল্‌বার সময় তার পা টলে, গায়ের চামড়া হল্‌দে হয়ে যায়, চোখের জ্যোতিঃ থাকে না, চোখ বসে যায়, চোখের কোলে ঘনকালি পড়ে, দাঁত ও জিভ একেবারে কালো হয়ে যায়, ঠোঁট আর হাত সব সময় কাঁপতে থাকে, কোনও বিষয়েই কোন উৎসাহ থাকে না।



"কি হে তুমি যে দেখ্‌ছি একেবারে দুর্ভিক্ষের আসামী!"
"আজ্ঞে হাঁ,—আপনিই সে দুর্ভিক্ষের রিলিফ ফাণ্ডের কর্ত্তা নাকি!"

কিছুদিন খাওয়ার পরেই আরও বেশী মাত্রায় কোকেন খাওয়ার জন্য কোকেনখোর পাগল হয়ে ওঠে। যত মাত্রা বাড়ে, রাত্রে ঘুম হয় না, খাবার হজম হয় না, উদরাময় রোগ জন্মে। বেশীদিন কোকেন খেলে শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়, অকারণে ভয় পেতে আরম্ভ করে, সর্ব্বক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে।

কোকেনখোর না পারে এমন কাজ নাই। কোকেন পাবার জন্য যত ভয়ানক বা যত হিংস্রই হোক্‌ না কেন তার দ্বারা সমস্ত দুষ্কর্ম্ম সম্ভব।

কোকেনের একমাত্র উপকারিতা এই যে কোকেন প্রয়োগে কিছুক্ষণের জন্য দেহের যে কোনও অংশকে অসাড় করে দিয়ে চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসা করতে পারেন। হাঁপানী ও কলিকে অনেক সময় কোকেন বিশেষ উপকারী। ঘা ও স্ফোটকও অনেক সময় কোকেন প্রয়োগে দ্রুত আরোগ্য হয়।

আশ্চর্য্য!

মণ্টু আর বুবু দুই ভাই; বয়স তাদের ৭ আর ৩। বাবার বন্ধুর কাছে বসে তাঁকে ছবির বই দেখাচ্ছিল, বাবা ছিলেন অন্য কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ এক হাঁটু জলে একজোড়া গরুর ছবি দেখে বুবু চেঁচিয়ে উঠল, "ও দাদা, ছাখ্‌, গরুটা ডুবে যাবে।" বাবার বন্ধু একটু হেসে বল্‌লেন, "না খোকা, গরু যে সাঁতার দিতে জানে, ওরা ডোবে না।" তারপর না থেমেই মণ্টুর দিকে চেয়ে জিগেস্ করলেন, "আচ্ছা,—তুমি সাঁতার জানো খোকা?" মণ্টু কিছু বল্‌বার আগেই বুবুর সতেজ ও তীব্র প্রতিবাদ শোনা গেল, "ও কি গরু নাকি?"

শেষ প্রশ্ন

ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব ইস্কুল পরিদর্শন করতে এসে বহুক্ষণ ধরে নানাবিধ প্রশ্ন করে ক্ষুদ্র পড়ুয়াদের জবাবে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন। অবশেষে চেয়ারে আরাম করে বসে আদরের সুরে বল্‌লেন, "এবার আমাকে তোমরা যা হয় জিগেস্ কর দেখি।" পূর্ণ আধ মিনিট কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর একেবারে শেষের বেঞ্চ থেকে অতি শ্রান্ত ও করুণ স্বরে প্রশ্ন হল, "আপনার ট্রেণ কখন স্যার?"

কুশল প্রশ্ন

ছেলেটির বাবা ছিলেন একজন নাট্যকার,—গ্রীষ্মের ছুটিতে পুত্র সহর থেকে বাড়ী ফিরলে পর ছেলের স্কুলের রিপোর্ট দেখে পিতার মুখ গম্ভীর হ'ল,—অর্থাৎ গতিক সুবিধার নয়।

"দেখ খোকা,—তোমার পড়াশুনার বিষয়ে শিক্ষকদের মতামত ত ভালো নয়—" পিতা বল্‌লেন।

ছেলে তাড়াতাড়ি উত্তর কর্‌ল, ট্রেণে আস্‌তে আস্‌তে তোমার নূতন নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা পড়্‌ছিলাম, বাবা,—যে সব কথা ওরা বলেছে, তা একবার শুন্‌লে—"

সহসা পিতা পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌লেন, "খোকা, বোর্ডিং-এ তোমার শরীর ভালো ছিল?"

বল্‌ছিলাম কি—

ঝুনুর মা নিয়ম করে' দিয়েছিলেন যে ঝুনু যদি খাওয়ার টেবিলে ঠিক সময় উপস্থিত না হয় তাহলে খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে একটিও কথা কইতে পার্‌বে না। সেদিনও সে অন্য সকলে খেতে বস্‌বার পর যথা নিয়মে দেরী করে' এসে হাজির হ'ল এবং ঘরে ঢুকেই আরম্ভ কর্‌ল, "দেখ মা—"

মা কঠোর ভাবে মুখে আঙ্গুল দিয়ে তাকে তার শাস্তির কথা মনে করিয়ে দিলেন।

"কিন্তু মা—"

"না একটি কথাও নয়—" রুষ্টভাবে মা বল্‌লেন। খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে মা ঝুনুকে প্রশ্ন কর্‌লেন যে সে কি বল্‌ছিল।

ঝুনু বল্‌ল, "ওঃ, আমি বল্‌ছিলাম, কি যে খুকু কন্‌ডেন্‌স্‌ড্ মিল্ক্ দিয়ে বাবার মোজাটা ভর্ত্তি করেছে—"

সংশয় নেই

নবীন ব্যারিষ্টার তাঁর মক্কেলের তরফে এক লম্বা বক্তৃতা মুখস্থ করে' বিচারকের সম্মুখে বল্‌তে গিয়ে মাঝপথে সব বিস্মৃত হ'য়ে মহা অসুবিধায় পড়্‌লেন। সেই অবস্থায় ঢোঁক গিল্‌তে গিল্‌তে তিনি বল্‌লেন, "ধর্ম্মাবতার, আমার হতভাগ্য মক্কেল, যার তরফে আমি দাঁড়িয়েছি,—ধর্ম্মাবতার, আমার হতভাগ্য মক্কেল—"

নীরস কণ্ঠে বিচারক বল্‌লেন, "তারপর কি বল্‌বেন বলুন,—এ অবধি আপনার মতের সঙ্গে আমার মত মিল্‌ছে!—"

ভূমিকম্পের অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর

জননীর বিশ্বাস যে তিনি যে সহরে থাকেন সেখানে শীগ্‌গিরই ভূমিকম্প হ'বে এবং ফলে সহরটা যাবে ধ্বংস হ'য়ে। অতএব সেই অনিবার্য্য বিপদ হ'তে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর ছোট ছেলে দুটিকে বহু মাইল দূরবর্ত্তী এক পল্লীগ্রামে তাঁর কোনও বান্ধবীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সপ্তাহ খানেক কেটে গেল এবং সহরে কিছুই হ'ল না। এমনই সময় বান্ধবীর নিকট হ'তে পত্র এল,—"অনুগ্রহ করে' শয়তান দু'টাকেই নিয়ে যাও, তার বদলে বরং ভূমিকম্পটাকেই না হয় এখানে পাঠিয়ো—"

কি লাভ

"যত পড়বে
ততই বেশী জানবে।
যত বেশী জানবে
ততই ভুলবার সম্ভাবনা বেশী॥
যত ভুলবার সম্ভাবনা
ততই বেশী ভুলবে।
যত বেশী ভুলবে
ততই কম জানবে॥
তবে আর পড়ে কি লাভ?"

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ
শ্রীআশীষ গুপ্ত

পট ও মঞ্চ

আনন্দ

ছবির কথা

আমাদের ছায়াশিল্প

শরৎচন্দ্র অনেকবার তাঁর brain childrenদের হত্যার বীভৎস দৃশ্য দেখলেন। কিন্তু তাঁর দুঃখের সমাপ্তি কেবল



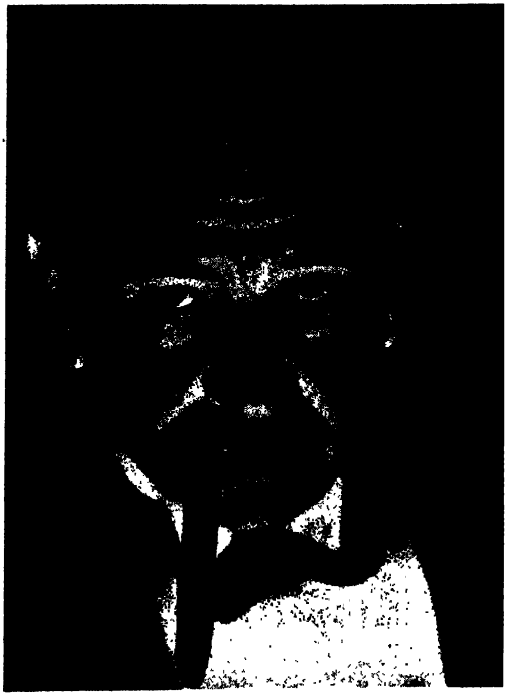
পরলোকগতা মেরী ড্রেস্‌লার

মেরী ড্রেস্‌লারের পরিচয় নূতন করে দেবার কিছুই নেই। অবিস্মরণীয়া মেরীর কথা চিত্রামোদীরা চিরকাল মনে রাখবেন। আমরা শুধু বলি বিদায় মেরি! চিরবিদায়!

দেখাতেই হয়নি, কয়েকবার সে ব্যাপারের প্রশংসাও তাঁকে করতে হয়েছে। চন্দ্রনাথ, দেবদাস, চরিত্রহীন, পল্লীসমাজ, দেনা-পাওনা, শ্রীকান্ত প্রভৃতি সাহিত্যের সম্পদ্ সিনেমার জুয়ায় হারিয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের বই পড়ে যে আনন্দ পাই, তাঁর উপন্যাসের চিত্ররূপে শতাংশের একাংশও কেন পাই না, কেন পটের Narrow Corner পাতার Narrow Cornerএর চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ দেয়, Jew Sussএর ছায়ারূপ কেন আরো মনোরম হয়, পাশ্চাত্যের সাহিত্য কেন সিনেমায় সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে? এই 'কেন'র উত্তর একটি এবং সেটি পাশ্চাত্যের কলানৈপুণ্য। আর আমাদের দেশের সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যিক সে উপন্যাসের চিত্ররূপের কথা শুনে শঙ্কাকুল হন তার কারণ আমাদের কলানভিজ্ঞান। অন্যত্র, অথচ, উপন্যাস মঞ্চে অভিনীত হবে বা চিত্রীকৃত হবে জেনে গ্রন্থকারের এবং ভক্তদের আনন্দের অন্ত থাকে না। অবশ্য আমেরিকায় আবার অনেক সময় দেখা গেছে যে গ্রন্থকার পটে তাঁর গ্রন্থকে চিনতেই পারেন নি। তাতে লেখকের ক্রোধ হতে পারে, কিন্তু চিত্রস্বত্ব বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই ক্ষোভ তাঁর হবে না। অসম্ভব ও অবিশ্বাস্যরকম উপন্যাসের অদল-বদল করতে হয় তার ছবি তুলতে হলে, কিন্তু সিনেমারসিক ও সাহিত্য-পিপাসুদের তাতে ক্ষতি হয় না কিছুই।

আমাদের শরৎচন্দ্রের কথা উঠ্‌লো 'দেবদাসে'র সবাক্ সংস্করণ হবে শুনে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে বর্ত্তমান কালে রূপদানের চেষ্টাকে আমরা সভয় চক্ষে নিরীক্ষণ করছি। আমাদের ছায়াশিল্পে এতদূর উন্নতি হয়নি যে আমরা সাহিত্য-পিপাসুদের আনন্দ দিতে পারি সিনেমার ভিতর দিয়ে। এই প্রসঙ্গে কবিবরকে আমরা ধন্যবাদ দিই যে তিনি 'চিরকুমার সভা'র দৃষ্টান্তেই সমস্ত সম্যক্ বুঝেছেন।

শরৎচন্দ্রের পার্ব্বতী যদি আসে তাদের মধ্য থেকে যারা শরৎচন্দ্রের 'শ' ও জানে না, শিক্ষা যাদের নেই; শরৎ



ওয়ালেস বীরি

বিশ্বাস হয় না এই ওয়ালেস্ বীরি-ই রেমণ্ড্ হ্যাটনের সঙ্গে সস্তা ভাঁড়ামি করতেন। যে অমিত প্রতিভা বীরির আছে প্রত্যেক নূতন ছবিতেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সবাক্ যুগে যতগুলি চরিত্রে বীরি ছায়াবতরণ করেছেন, তার প্রত্যেকটা অমর হয়ে থাকবে চিত্রপ্রিয়দের মনে। আমরা বীরির 'দি গ্রেট্ বার্ণ্‌ম' এবং 'মিউটিনি অন্ দি বাউন্টি' দেখবার আশায় উদগ্রীব হয়ে রইলাম। বীরি এবারে 'গ্রেট পয়েন্ট্ অব্ দি এয়ার' ছবির কাজে নামবেন। এই ছবিতে রবার্ট ইয়ং তাঁর ছেলে সাজবেন। পিতা পুত্রের চেষ্টায় এরোপ্লেনের উৎপত্তি থেকে আধুনিক উন্নতি পর্য্যন্ত এর গল্পের বিস্তার।

সাহিত্যের spirit কি যারা জানে না; সমাজ, সামাজিক জীবন ও পার্ব্বতীর প্রেম সম্বন্ধে যারা সম্পূর্ণ অজ্ঞান, তবে কি ক'রে সে ফুটিয়ে তুলবে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রকে? বিশ্বাস করি তাদের প্রতিভা আছে, অস্বীকার করিনা তারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে পারে, জানি তারা ভাবাবেগে ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারে ষ্টেজের পরে কিন্তু কী তারা জানে পার্ব্বতীর সম্বন্ধে আর কতটুকুই বা তাদের জ্ঞান স্রষ্টা শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে?

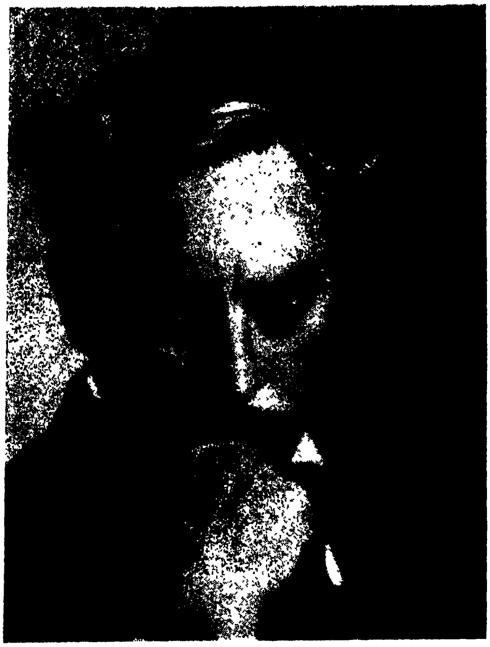
অভিনয়ের কথা বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে গল্প নির্ব্বাচনের কথা, কিন্তু সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি, আর আসে ভূমিকা-লিপি বণ্টন এবং প্রযোজনা। ভূমিকা বণ্টনের দোষে আজও আসন্ন প্রৌঢ়ত্ব দুর্গাদাসকে সদ্য উত্তীর্ণ বিংশ যুবকের চরিত্রাভিনয় করতে দেখা যায়। 'চণ্ডীদাস' দেখে সাধারণ দর্শক বোঝে চণ্ডীদাস বেশ মজার লোক আর রামীও মন্দ Coquette নয়, দু'জনার flirtation পরম উপভোগ্য জিনিষ—এমনি চমৎকার আমাদের প্রয়োগ



সার্লি টেম্পল্

সার্লি টেম্পলের তৃতীয় ছবি 'লিট্‌ল্ মিস্ মার্কার' দেখে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে অল্পবয়সের তারকাদের মধ্যে এত চমৎকার অভিনয় ক্ষমতা কারুর নেই। সার্লির ছবি দেখলে কখনই সার্লি আপনাকে হতাশ করবে না। 'নাউ এণ্ড্ ফরেভার' সার্লির আগামী ছবি। অতঃপর সার্লির ছবিতে দস্যুতস্কর প্রভৃতি হীন চরিত্র থাকবে না।

ক্ষমতা। প্রযোজকদের শিক্ষা আছে, পালিশ আছে কিন্তু সর্ব্বত্র প্রযোজক বা পরিচালক অথবা উভয়েরই লক্ষ্যস্থল



জন ব্যারীমোর

একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন ক্ষোভে তাঁর একটী ভ্রূ উপরে উঠে যায়; তখনি জন্ ব্যারীমোর জানতে পারলেন তিনি তাঁর বংশের অপরাপর লোকের মত অভিনেতা। জন্ ব্যারীমোর প্রথমে খবরের কাগজে ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন কিন্তু আলস্যের জন্য যথাকালে ছবি দিতে পারতেন না বলে আজ আমরা তাঁকে অভিনেতারূপে দেখতে পাচ্ছি। দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ সেরে জন্ শীঘ্রই আমাদের এখানে আসছেন। কলম্বিয়ার হয়ে জন্ 'টোয়েন্‌টিয়েথ্ সেঞ্চুরি' বলে যে ছবিটী তুলেছেন সেটি তাঁর আসার সঙ্গে মুক্তি পাবে শোনা যাচ্ছে।

সেই সব ব্যক্তির পরে যারা 'প্লে' করেছে, ষ্টুডিও ষ্টেজে নেমেছে—না থাক্ তাদের শিক্ষা ও সংস্কার, না জানুক্ তারা সাহিত্য ও সমাজ। এখনই দেখতে পাই অমুক আমাদের Josef von Sternberg, অমুক Ernst Lubistch, উনি Ruben Mamoulian, উনি Victor Flemnig আর শুনি ওনার আছে Lloyd Baconএর গুণপনা, Mervyn Le Royএর প্রতিভার অধিকারী ওই ভদ্রলোক, উনি সাক্ষাৎ Richard Boleslavsky! আর ইনি হচ্ছেন আমাদের David Butler, William K. Howardএর মত ওস্তাদলোকরাম বাবু, শ্যামবাবু বাংলার W. S. Vandyke, কৃষ্ণবাবু Frank Barzage এবং হরিবাবু স্বয়ং Frank Capra! অর্থাৎ আমাদের হাসি ও কান্নার ক্ষমতা যুগপৎ লোপ পেয়ে যায়। আমাদের দেশে কোম্পানীরা বড়জোর সাত আটখানা 'বই' তোলেন কিন্তু তার মধ্যে সবগুলিই হয় Super, নয় Special. Roadshow কথাটাও হয়ত দু'দিন বাদে চলবে! প্রযোজক ছবি তুলেছেন; সঙ্গে 'বন্ধুবান্ধব'; প্যাঁচ কসছেন; Stunts,



গ্রেটা গার্ব্বো

গ্রেটা গার্ব্বোর অসামান্য আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ পেল সবাক্ ছবির যুগের প্রারম্ভেই। সেই থেকেই গ্রেটার প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। গ্রেটার সামান্য ইঙ্গিতে মেট্রোর কর্ত্তৃপক্ষীয়রা বোধ হয় পৃথিবীও তোলপাড় করতে পারেন। গ্রেটার নবতম ছবি 'পেণ্টেড্ ভেল্' গতমাসে আমেরিকায় মুক্তিলাভ করেছে। নূতন বৎসরের প্রথম দিকে আমরাও ছবিটী দেখতে পাব। এই ছবির পর মেট্রোর সঙ্গে গ্রেটার চুক্তির সময় শেষ হয়, আবার নূতন কন্‌ট্রাক্ট হয়েছে।

thrills এ ছবি packed করেছেন; আবার Tender romanceও বাদ দিচ্ছেন না—ছবিতে সবই আছে, সবই থাকবে অর্থাৎ প্রযোজকের একটি দিকে নজর আছে এবং সেটি গ্যালারির হাততালি। এই গ্যালারি সবদেশেই আছে, তবে নাম মাত্র; কিন্তু আমাদের দেশে ওটি চিরন্তন, ওর সঙ্গে অপর শ্রেণীর অসীম পার্থক্য এবং এই পার্থক্য অন্ততঃ যথাযথ রাখবার চেষ্টা আমাদের ছবিকারদের



মার্লে ওবেরণ

মার্লে ওবেরন্‌কে বিলাতে তোলা কয়েকটা ছবিতে দেখা গেছে। শ্রীমতীর অভিনয় ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। মার্লে কলকাতারই মেয়ে। ইউনাইটেড্‌ আর্টিষ্টের প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং জোসেফ্‌ সেঙ্কের সঙ্গে শ্রীমতীর বিবাহের কথা হয়েছিল। জোসেফ্‌ চান্‌ মার্লে ঘরকন্না করুক কিন্তু শ্রীমতী অভিনয় ছাড়তে চান না। বিয়ে উপস্থিত ভেঙে গেছে। মিস্‌ ওবেরণের আগামী দুটী ছবির নাম 'প্রাইভেট্‌ লাইফ্‌ অব্‌ ডন্‌ জুয়ান্‌' ও স্কার্লেট্‌ পিম্পার্নেল্‌।

অসাধারণ; গ্যালারি চিরকাল গ্যালারিই থাক্‌। প্রযোজক ও পরিচালকদের চাই স্বাস্থ্যকর দৃষ্টি, শিক্ষিতের সহযোগিতা—উমাশশীর অভাবে সমশ্রেণীর অপরার প্রতি দৃষ্টি ছেড়ে দিতে হবে।

এদেশে সকলেই তারকা। সকলেই চায় Ramon Novarro, Jack Gilbert বা Gary Cooper হতে, সোজা কথায় অক্লান্ত প্রেম করতে কারণ এই ভাবে গ্যালারির হাততালি পাওয়া খুবই সহজ। কে চায় Marie Dressler, George Arliss, John Barrymore, Ricardo Cortez বা Wallace Beery হতে? কেন হতে চায় না তার কারণ সেখানে ওঠে প্রতিভার প্রশ্ন, কিন্তু তা কারুর না থাকলে এসে যায় না, কারণ অভিনয় ক্ষমতার পরীক্ষা হয়নি। অবশ্য হওয়া যে কতটা প্রয়োজন তা চিত্ররসিক মাত্রেই জানেন। নটনটীর চাই শিক্ষা, চাই চরিত্রোপলব্ধির ক্ষমতা। প্রয়োজন সেই শ্রেণীর নটনটীর যাদের হাতে গ্রন্থ দিয়ে বলা যেতে পারে, তুমি এ বইয়ের অমুক চরিত্রকে জীবন দেবে, বই শেষ করে নিজের অংশ বুঝে অপরাপর অভিনেতৃদের সাহায্যে নিজের সংলাপ তৈরী করে নেবে, সপ্তাহান্তে তোমাদের নিয়ে আমরা ছবি তুলবো। এমন অভিনেতা অভিনেত্রী আমরা চাই না যে প্রত্যেক shotএর আগে নিজের অংশ প্রথমবার মহলা দিয়ে দুমিনিট বাদে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে মুখস্থ বলে তার অংশের কথা। অভিনেতা হতে হলে কত সাধনার, কত ক্ষমতার, কি পরিমাণ শিক্ষার ও সংযমের দরকার—এ কথা আজ জানবার দিন এসেছে। এদেশে দুটি কারণে ছবিতে নামা যায়। প্রথমতঃ কারখানার মালিকের 'লোক' হতে পারলে, দ্বিতীয়তঃ মঞ্চের অভিজ্ঞতা থাক্‌লে। কিন্তু কী মূল্য আছে সে মঞ্চাভিনয়ের, সে মঞ্চের যে মঞ্চ আজও এলিজ্যাবেথের যুগে পড়ে রয়েছে যেখানে কেবল 'মহাসমারোহে' অভিনীত হয় sobstuff বা mass মনোবৃত্তির অনুকূল নাটক? এ আমেরিকার মঞ্চ নয় যে ষ্টেজ থেকে Helen Hayes এসেই শ্রেষ্ঠা চিত্রাভিনেত্রীর সম্মান পাবে, যে Francis Fuller প্রথম ছবিতেই অতুল যশ উপার্জ্জন করবে। আমেরিকার মঞ্চই নটনটীর প্রিয়, studioকে অভিনেতা আনতে হয় ওখান থেকে ধার করে—নটনটীরা জানে মঞ্চে

থাকার ফলে নাম চিত্রের বিশ্বব্যাপিত্বের তুলনায় কিছুই হবে না কিন্তু তবু ষ্টেজই তাদের শ্রেয়ঃ। অগ্রগতিশীল ছায়াশিল্পের আমাদের দেশে মঞ্চের মুখাপেক্ষিতাকে আমরা প্রশংসা করতে পারি না।



ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্‌

আগের প্রতিপত্তির ডগ্‌লাসের আর কিছুই নেই কিন্তু যাও আছে তা অনেকের ঈর্ষ্যা ও স্বপ্নের বস্তু। 'প্রাইভেট্‌ লাইফ্‌ অব্‌ ডন্ জুয়ান্' চিত্রের বিবিধ সমালোচনা হয়েছে। বিলাতে ঐ ছবি শেষ করে ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ আমেরিকায় কিছুদিন ছিলেন। ঐ সময় মেরি পিক্‌ফোর্ডের সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের গুজব উঠে। মেরি্‌ সব অস্বীকার করেছেন এবং ডগ্‌ মনের দুঃখে চীনেই ছবি তুলতে গেছেন।

আমরা এমন পার্ব্বতীকে চাই যাকে দেখে তার স্রষ্টা শরৎচন্দ্র Sinclair Lewis বা Ernst Hemmingwayর মত বলে উঠবেন তোমাকে আমি এমনই ভেবেছিলাম। রূপজীবিনী পল্লীর 'find'এর পক্ষে শরৎচন্দ্রকে সে আনন্দ দেওয়া সম্ভব নয়। সে জন্য প্রয়োজন দেবিকারাণীর মত মেয়ের, যার আছে শিক্ষা ও সংস্কার, আছে চরিত্রোপলব্ধি ও প্রকৃত অভিনয় ক্ষমতা, যে অভিনয়ের standard দেখিয়ে দিতে পারে। কিন্তু শিক্ষিত, সংযত ও প্রতিভাবান্ অভিনেতা সংগ্রহ না হলে মেয়েরা চিত্রে নামতে পারেন না।

চৌত্রিশ সালের ছবি

প্রতি বৎসর আমাদের শহরে সর্ব্বসমেত আড়াই শতেরও অধিক ছবি মুক্তিলাভ করে। তাদের সবগুলির আলোচনা একেবারে সম্ভব নয় এবং তাদের সবগুলিও আলোচনার যোগ্য নয়। গত নভেম্বর অবধি যতগুলি নূতন ছবি দেখানো হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলির আলোচনা করা গেল। আগামী সংখ্যায় আমরা ডিসেম্বরে মুক্ত ছবিগুলির কথা বলবো।

নিম্নলিখিত ছবিগুলির প্রত্যেকটী অনন্যসাধারণ:—(১) ভিভা ভিলা (২) ২০,০০০ ইয়ার্স ইন্ সিংসিং (৩) হাউস্ অব্‌ রথ্‌স্‌চাইল্ড (৪) স্কার্লেট্‌ এম্প্রেস্ (৫) বাওয়ারি (৬) এস্কিমো (৭) ম্যান্‌হাটান্ মেলোড্রামা (৮) লিট্‌ল্ ম্যান্ হোয়াট্‌ নাউ (৯) ইট্‌ হ্যাপ্‌ন্‌ড্‌ ওয়ান্ নাইট্‌ (১০) কুইন্ ক্রিশ্চিনা (১১) ইন্‌ভিজিব্‌ল্ ম্যান্ (১২) মর্ণিং গ্লোরি (১৩) লিট্‌ল্ ওমেন্ (১৪) ডিজাইন্ ফর লিভিং (১৫) থিন্ ম্যান্।

এখানে আমরা ছবিগুলির নাম দিলাম মাত্র। গুণানুসারে পর্য্যায়ক্রমে সাজাবার ভার আপনার উপর।

সঙ্গীত, নৃত্য ও গীতাদি প্রধান ছবিগুলির মধ্যে নীচের কয়েকটীর নাম করা যেতে পারে: রোমান্ স্ক্যাণ্ডাল্‌স্, হলিউড্‌ পার্টি, মার্ডার এট্‌ দি ভ্যানিটিজ্‌, ফ্লাইং ডাউন্ টু রিও, ষ্ট্যাণ্ড্‌ আপ এণ্ড্‌ চিয়ার, ক্যাট্‌ এণ্ড্‌ দি ফিড্‌ল্ এবং মেলডি ইন্ স্প্রিং।

নিম্নলিখিত ছবিগুলিরও আমরা প্রশংসা করি:—(১) হাউস্ অন্ দি ফিফ্‌টি সিক্‌থ্‌ ষ্ট্রীট্‌ (২) ট্রেজার আয়ল্যাণ্ড্‌ (৩) ওয়ান্ সান্‌ডে আফ্‌টারনুন্ (৪) ভ্যাডি নাক্লি (৫) অন্‌লি ইয়েষ্টারডে (৬) ক্লিওপেট্রা (৭) বিলাভেড্‌ (৮) ডাক্ সুপ্‌ (৯) ড্যান্সিং লেডি (১০) লিট্‌ল্ মিস্

মার্কার (১১) বাই ক্যাণ্ডল্ লাইট্ (১২) ডেথ্ টেক্স্ এ হলিডে (১৩) কাউন্সেলার এট্ ল (১৪) ম্যাড্ জিনিয়াস্ (১৫) টাইন্ এণ্ড্ হিজ্ মেট্।

অভিনয়ের উৎকর্ষের দিক দিয়ে পুরুষদের মধ্যে ওয়ালেস্ বীরি, ক্লার্ক গেব্ল্, জন্ ব্যারীমোর, ডগ্লাস্ মন্ট্গোমারি (লিট্ল্ ম্যান্ হোয়াট্ নাউ এবং লিট্ল্ ওমেন্) এবং স্পেন্সার ট্রেসির নাম করা যেতে পারে। মেয়েদের মধ্যে খুব ভাল অভিনয়ের হিসাবে ক্লডেট্ কলবার্ট, কে ফ্রান্সিস্, মার্গারেট্ স্যালিভ্যান্, জোয়ান্ ক্রফোর্ড এবং মার্ণা লয়ের নাম করা যেতে পারে। যাঁরা একাডেমি অব্ মোশন্ পিক্চার্স আর্টস্ এণ্ড্ সায়ান্সের পদক পূর্ব্বেই পেয়েছেন তাঁদের নাম আর এখানে করলাম না।

প্রয়োগশিল্পের কাজ ভাল দেখিয়েছেন:—ফ্রাঙ্ক্ কাপ্রা (ইট্ হ্যাপন্ড্ ওয়ান্ নাইট্) ডব্লু এস্ ভ্যান্‌ডাইক্ (ম্যান্‌হাটান্ মেলোড্রামা এবং থিন্ ম্যান্) উইলিয়ম্ ওয়াইলার (কাউন্সেলার এট্ ল) রাওল্ ওয়ালস্ (বাওয়ারি) মাইকেল্ কুর্টিজ্ (২০,০০০ ইয়ার্স ইন্ সিং সিং প্রভৃতি) এবং জ্যাক্ কন্‌ওয়ে (ভিভা ভিলা)।

আলোক চিত্রের অসাধারণ সৌন্দর্য্য দেখা গেছে ইন্‌ভিজিব্ল্ ম্যান্, ইট্ হ্যাপ্‌ন্ড্ ওয়ান্ নাইট্, ভিভা ভিলা, স্কারলেট্ এম্প্রেস্ এবং ক্লিওপেট্রাতে।

টীম্ ওয়ার্ক হিসাবে নিম্নলিখিত ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য:—ম্যান্‌হাটান্ মেলোড্রামা, ইট্ হ্যাপন্‌ড্ ওয়ান্ নাইট্, বাই ক্যাণ্ডল্‌লাইট্ এবং থিন্ ম্যান্।

ছবির সম্বন্ধে সেরা বিচার হয় আমেরিকায়। চৌত্রিশ সালে আমেরিকায় যে সব ছবি প্রদর্শিত হয় সেই সালেই আমরা তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি দেখতে পাই না। এখানকার শ্রেণী এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিচার একান্ত আমাদের।

দুঃখোপনোদন

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তারকাদেরও দুঃখ আছে এবং আসে। আমাদের মতই তারা বিমর্ষভাব দূর করতে নানা চেষ্টা করে থাকে। আমি ত' মন মুষড়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথের বইয়ে ডুবে থাকি, সিনেমার থিয়েটারে যাই, আপনিও এমনি একটা কিছু করেন নিশ্চয়ই কিন্তু তারকারা কে কি করে থাকে শুনুন।

অবশ্য এ কথা না বল্লেও চলে যে কাজ করবার সময় সকলকে কাজে এমন ভীষণ মগ্ন থাকতে হয় যে কাজের আবেষ্টনীতে দুঃখ আসতেই পারে না এবং এলেও প্রতিহত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। অবসরের সময়ে মানুষ যখন একান্তে আত্মসমাহিত বা বিক্ষিপ্তমনা থাকে তখনই আসে গ্লানিমা।

মন-মরা অবস্থায় গ্রেটা গার্ব্বো খেলেন টেনিস্ কিংবা বহুদূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে বেড়ান; ফলে চিত্তের প্রফুল্লতা ন্যাকি ফিরে আসে।

ক্লার্ক গেব্ল্‌কে স্ফূর্ত্তিহীন হতে দেখা যায় না। ক্লার্ক যেই দেখেন কমে আসছে মনের আনন্দের পরিমাণ, তখনি মোটর নিয়ে অসীম অনির্দ্দিষ্টের পানে ছোটেন কিংবা সংগৃহীত সব বন্দুকগুলি নিয়ে পরিষ্কার করতে বসেন। দুঃখ দূর করবার জন্য গেব্লের গান গাওয়ার ঝোঁক থাকলে প্রতিবেশীকে পুলিশে খবর দিতে হোত।

দজ্জাল মেয়ে জীন্ হার্লোর মনের প্রজাপতি লঘুগতি হলেই জীন্ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সে অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। টাইপ্‌রাইটার নিয়ে খটাখট্ করে, না ঝাঁপিয়ে পড়ে সুইমিং পুলে, নয় চলতে আরম্ভ করে যথাসাধ্য দ্রুত গতিভরে।

বাজনা হোল জোয়ান্ ক্রফোর্ডের প্রফুল্লতা ফিরে পাবার উপায়। অবশ্য সে রকম বাজনা হলে জোয়ানকে গম্ভীর হতে দেখা যায়।

উইলিয়াম্ পাওয়েল্ করেন মজার ব্যাপার। দুঃখ হলেই মিত্রদ্বয় রোণাল্ড কোলম্যান্ এবং রিচার্ড বার্থলমেশ্‌কে নিজের বাড়ীতে ডেকে আনেন। কিছু সময় তাঁদের সঙ্গে থাকলেই আবার মন ফিরে পান।

ফ্রাঞ্চট্ টোন্ বই পড়েন, যত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হয় ততই তাঁর দুঃখোপনোদনের পক্ষে ভাল।

জেনেট্ ম্যাক্‌ডেনাল্ড্ নূতন গানের সন্ধান করেন এবং তা গাইতে গাইতে দুঃখ ভুলে যান।

জ্যাকি কুপার তার ছোট্ট খেলার এরোপ্লেন টেনে বার করে এবং নূতন রকমের মডেল আবিষ্কার করতে ব্যস্ত থাকে—কোথায় থাকে তার দুঃখ !

র‍্যামন্ নোভারো যুক্তিতর্কে দুঃখ আসতে দেন না, ক্যারেন্ মর্লে ঐ সময় ছেলের সাথে গিয়ে একটু খেলা করে আসেন আর উনা মার্কেল ভাবতে বসেন তাঁর দুঃখিত হবার কি কারণ থাকতে পারে।

ইভ্লিন্ লে দুঃখের সময়ে রাঁধতে বসেন এবং নিজের রান্না পাঁচজনকে ডেকে খাওয়ান। অনেকটা আমাদের মেয়েদের মতই।

অটো ক্রুগার বিমর্ষভাব দূর করতে গান লিখতে বসেন। লুইসি ফ্যাজেণ্ডা মন ভাল না থাকলে কাপ বোর্ডের জিনিষ পত্রের হিসাব প্রভৃতি করতে বসেন। আর সি হেন্রি গর্ডন্ ঐ অবস্থায় ভক্তদের চিঠিপত্রের জবাব দিতে বসেন। ভক্তরা তাঁর সম্বন্ধে কত ভাল ভাল কথা ভাবে দেখে ভদ্রলোক নিজেকেই বলেন—ছিঃ, পাঁচজন তোমায় এত উঁচু মনে করে আর তুমি ছেলেমানুষের মত হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বোস !

আনন্দ

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

জে-পি-সি রিপোর্ট

রয়েল পার্লামেণ্টারি কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। অনেক বিষয়ে ইহা শ্বেত-পত্রের প্রস্তাবাবলী হইতেও নিকৃষ্ট; দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোক ইহার নিন্দা করিয়াছেন। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর অংশ হইতেছে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা; ইহা দেশের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে বিরোধ এবং দলাদলি এমন ভাবে জাগাইয়া রাখিবে যাহাতে ভবিষ্যতে আমাদের একযোগে কাজ করা অনেকটা অসম্ভব হইবে। ইহার আর একটা অনিষ্টের দিক হইতেছে যে, ইহা চালাইতে অনেক বেশী খরচের দরকার হইবে এবং তাহার ফলে অনেক প্রয়োজনীয় কাজে অর্থের অনটন হইবে। ইহাতে সাধারণভাবে সর্ব্বত্র এবং বিশেষ ভাবে বাংলায় ও পাঞ্জাবে হিন্দুদের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহাদের পক্ষে রাষ্ট্রিক প্রগতির চেষ্টা অধিকতর বিঘ্নসঙ্কুল হইবে।

কংগ্রেস, যেমন আশা করা গিয়াছিল, ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এবং প্রত্যাখ্যান করিয়াও যে তাহা লইয়া ইঁহারা কাজ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা বিশেষ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। কারণ, প্রত্যাখ্যান করিয়া দূরে থাকিলে অনেক অনিষ্টকে ঠেকান যাইত না, ইহার মধ্য দিয়াও যে অল্প কাজটুকু করিবার সুযোগ আছে তাহা নষ্ট হইত এবং পার্লামেণ্টারি বোর্ড গঠন করিয়া এবং পরিষদ নির্ব্বাচনে লড়িয়া বহুসংখ্যক কংগ্রেস কর্ম্মীর যে প্রচুর সময় ও উদ্যম ব্যয় হইয়াছে, তাহা বিফল হইত।

মার্কুইস্-অব-জেটল্যাণ্ড ও বাংলা

মার্কুইস অব জেটল্যাণ্ড এক সময়ে বাংলার গভর্ণর ছিলেন; তিনি এ দেশের অবস্থার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত; কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব বা অনুরক্তির কারণও নাই। জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটির আলোচনার সময়ে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতি অবিচার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সংখ্যানুপাতে মুসলমানেরা ১০টি অধিক ও হিন্দুরা ১০টি আসন কম পাইতেছেন। বিশেষ নির্ব্বাচনের ফলে এই বৈষম্য কিছু পরিমাণে দূর হইবে, তাহা সত্য।··· যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, এই ২০টা আসনের ভিতর (বিশেষ নির্ব্বাচনের) একটিও মুসলমানেরা অধিকার করিতে পারিবেন না, তাহা হইলেও তাঁহারা ১১৯টি আসনের অধিকারী হইবেন, পক্ষান্তরে (তথাকথিত) উন্নত ও অনুন্নত হিন্দুরা একত্র মাত্র ১১০টি আসন অধিকার করিতে পারিবেন।"

অবশ্য এই ২০টি আসনই হিন্দুদের পক্ষে অধিকার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ইনি আরও বলিয়াছেন:—"জনসংখ্যার অনুপাতের কথা বাদ দিয়া এই দুই সম্প্রদায়ের তুলনামূলক অবস্থা যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক না কেন, আইন সভায় হিন্দুদের চিরস্থায়ীভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ করিয়া [illegible]

বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি দেখা যাইবে। ব্রিটীস শাসনে দেশের মানসিক, সাংস্কৃতিক (cultural) রাজনীতিক, বাণিজ্যিক উৎকর্ষ সাধনে হিন্দুরাই অত্যন্ত অধিক অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা ৬৪ জনের অধিক হিন্দু; হাইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন, ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৮৩ জন এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও গবেষণা বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৮৬ জন হিন্দু। ব্যাঙ্কিং, ইন্‌সিওরেন্স, এক্‌সচেঞ্জ প্রভৃতি বিভাগেও হিন্দুদের এরূপ আধিক্য দেখা যায়। পূর্ব্বে যে সকল শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে তাহাতে এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ প্যাক্‌টে বাঙ্গালী মুসলমানদের, নির্ব্বাচনযোগ্য ভারতীয় আসনের শতকরা ৪০টি দেওয়া হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমানে যে শাসনতন্ত্র চলিতেছে, তাহাতে সাধারণ আসনের শতকরা ৪৬টি মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।”

জে-পি-সি-রিপোর্ট ও বাঙ্গালী বর্ণহিন্দু

জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটি বাঙ্গালী বর্ণহিন্দুদের প্রতি অবিচার একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, বাংলার অনুন্নত সম্প্রদায়েরা যদি একমত হইয়া বর্ণহিন্দুদের কিছু আসন ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে বাংলায় শাসনতন্ত্রের সফলতা লাভ করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। অল-ইণ্ডিয়া-ডিপ্রেস্‌ড্‌ ক্লাসেস্‌ এসোসিয়েসনের সভাপতি রাও বাহাদুর এম্‌-সি-রাজা-এম-এল-এ, বাংলার অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে অনুরূপ অনুরোধ জানাইয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “আমি এই প্রস্তাব আরও দৃঢ়তার সহিত এই জন্য করিতেছি যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সাধারণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া, কয়েক বৎসর হইতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা আসন গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতে বঙ্গদেশে অনুন্নত হিন্দুদের প্রতি উন্নত হিন্দুদের উদার মনোভাব সূচিত হইতেছে।”

আমাদের কি প্রকারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চাই

আমরা দেশের সকল লোকের অক্ষরজ্ঞান থাকাকে দেশের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য মনে করি এবং কোন দেশের উন্নতির পরিচয় গ্রহণের সময় সেই দেশের অক্ষর জ্ঞান-বিশিষ্ট লোকের সংখ্যানুপাতকে কতকটা মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করি। প্রাথমিক শিক্ষায় জ্ঞানলাভ অথবা মনের মার্জ্জনা যদিও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হয় না, তবুও অন্যান্য কারণ ব্যতীত তাহার অপরিহার্য্যতা এই জন্য যে, বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ বিভাগে লব্ধ জ্ঞান, নীতি, তথ্য প্রভৃতি ইহা নহিলে সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হইয়া জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে না। বিদ্যার উচ্চশাখায় আবিষ্কৃত সত্যকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে বটে, কিন্তু, এই ঊর্দ্ধ প্রান্তের সহায়তা ব্যতীত শুধুমাত্র নিজ শক্তিতে জাতিকে অগ্রসর করিবার সম্ভাবনা ইহার নাই। কাজেই, জাতিকে নূতন পথে লইয়া যাইবার শক্তির পরিচালনভার উচ্চবিদ্যার হাতে না থাকিলেও, এই শক্তির উৎস যে এখানে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

আমাদের দেশে শিক্ষা এখনও সর্ব্বব্যাপী হয় নাই, কিন্তু, যেটুকু ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহাকে ফলপ্রসূ করিতে গেলে, বিদ্যার উচ্চ বিভাগকে বিশেষ সজাগ থাকিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার এবং রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র ও বিদ্যা অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষা দেওয়া হইবে, এই সকল ক্ষেত্রে নূতন গবেষণাও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই পরিচালনা করিবেন এবং যান্ত্রিক বিদ্যাও এইভাবে দেশের মধ্যে বিস্তারলাভ করিবে।

কিন্তু, মানব সভ্যতা একস্থানে দাঁড়াইয়া নাই; রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন বিজ্ঞান সর্ব্বক্ষেত্রে নিত্য নূতন পরীক্ষা চলিতেছে, নূতন নূতন মতবাদ মানব সমাজকে নিত্য বিচলিত করিতেছে। আজ যাহা নিন্দিত হইতেছে, কালে তাহারই বহু জিনিষ প্রশংসার সহিত প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, আবার বহু জিনিষ পথে ঝরিয়া যাইবে, কিন্তু,

আমাদের জ্ঞানের পক্ষে, জগতের অগ্রগতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গড়িয়া তুলিবার পক্ষে, শিক্ষিত সাধারণের চিন্তাধারাকে ঠিক পথে চালনা করিবার, জগতের সর্ব্ববিষয়ক, সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী চিন্তাধারার সহিত প্রতিভাবান ও উদ্যমশীল যুবকদের পরিচয় রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এই কার্য্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যা (অর্থাৎ অল্পদিনেরই হউক বা অধিক দিনেরই হউক অতীত বিদ্যা) শিক্ষাদানের ক্ষেত্র; ইহা প্রগতিশীল চলমান জগতের জ্ঞানের প্রতিনিধি হইতে পারে না; হইলেও, ইহা নিতান্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের মানসিক খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারে মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা বাহির হন, মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানের সহিত পরিচয় রাখিতে না পারিলে তাঁহারাও পিছাইয়া পড়েন।

অবশ্য নানাবিষয়ে নিত্য প্রকাশিত পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকাদি পাঠ করিলে, জগতের আধুনিকতম চিন্তা ও ঘটনাসমূহের সহিত পরিচয় রাখা যায়। কিন্তু, বেশীর ভাগ লোকের এই অনুসন্ধিৎসা এবং উদ্যম থাকে না। জাতিহিসাবে শারীরিক উদ্যম এবং সামর্থ্যহীনতাই আমাদের একমাত্র দৈন্য নহে। আমাদের মনের নির্জ্জীবতা এবং বুদ্ধির নিশ্চেষ্টতা আমাদের অধিকতর ক্ষতির কারণ হইতেছে। আমাদের উচ্চশিক্ষিত সাধারণ লোকের মনের অবস্থা, জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের আধুনিকতা, এবং তাঁহাদের দৈনন্দিন পাঠ্য বিষয়ের সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা এই উক্তির সত্যতা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অন্য সকল বিভাগের কথা বাদ দিয়া শুধু যদি রাজনীতি এবং সমাজনীতির কথাও ধরা যায় (কারণ এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কথা বলিবার, তর্ক আলোচনাদি করিবার প্রয়োজন প্রায় সকল লোকেরই হয়, এবং সাধারণ শিক্ষিত লোকের এই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় কথাকে আমরা গুরুত্ব দিয়া থাকি) তাহা হইলেও দেখা যাইবে আমাদের বেশীর ভাগ উচ্চশিক্ষিত লোকেরও এসকল বিষয়ে জ্ঞান অপুষ্ট, ধারণা অস্পষ্ট এবং মনের খোরাকের জন্য ইঁহারা একমাত্র সংবাদপত্রের উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন। অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের একমাত্র পাঠ্য দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র।

বাংলার মাসিক পত্রিকাগুলি বাংলার চিন্তাধারার (চিন্তার গভীর দিকের) বলিতে গেলে একমাত্র বাহন। ইহাতে বিদেশীয় চিন্তাধারার পরিচয় এবং সে সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রভৃতিও কিছু কিছু থাকে। কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকে মাসিক পড়েন না এবং যাঁহারা পড়েন, তাঁহাদের মধ্যেও অল্পসংখ্যক লোকে আলোচনা প্রবন্ধাদি পড়িয়া থাকেন। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা এবং মহকুমা সহরগুলিতে এক হইতে কয়েকশত করিয়া উকিল থাকেন, ইঁহারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু জেলা ও মহকুমা সহরগুলিতে কি পরিমাণ পত্রিকা বিক্রয় হয় তাহা সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারীরা জানেন। বিক্রয় যাহা হয় তাহারও অনেকগুলি অন্তঃপুরের জন্য উদ্দিষ্ট। প্রত্যেক সহরেই, উকিল বাদেও বহু সংখ্যক শিক্ষিত ব্যবসায়ী ডাক্তার মোক্তার ছাত্র, শিক্ষক এবং সরকারি চাকুরিয়া থাকেন। বাংলাদেশে প্রায় বারশত হাইস্কুল আছে, ইহার শিক্ষক সংখ্যা বার হাজারের উপর। ইঁহাদের মধ্যেও পত্রিকাগুলির খুব বহুল প্রচার আছে, এমন কথা বলা যায় না। লেখকের এমন অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছে যে, গ্রামে হাইস্কুল আছে, পোষ্টঅফিস আছে, নিকটে মাইনর স্কুল আছে (এগুলি শিক্ষিত লোক থাকিবার প্রমাণ), অথচ, তাহার ২।৪ খানি গ্রামের মধ্যে একখানিও মাসিক পত্রিকা আসে না; উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের অনেকেই কোন মাসিকের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই; শিক্ষকদের কেহ কেহ জীবনে কোন মাসিকপত্র পড়েন নাই; ২।৩ বৎসরের মধ্যে কেহই কোন পত্রিকা পড়েন নাই এবং খুব পুরাতন ২।১ খানি ব্যতীত অন্য কোন পত্রিকার নামের খবরও কেহ রাখেন না। অন্য সাধারণ শিক্ষিত লোকদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে।

ইহাদ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে, এই সকল লোকের অধিকাংশই ইংরাজী শিক্ষিত, সম্ভবতঃ ইঁহারা ইংরাজী সাময়িক পত্রিকাদি এবং জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ চিন্তাউদ্দীপক ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন। শুধুমাত্র

ইংরাজী সংবাদপত্র ব্যতীত (তাহাও অবশ্য সকলে নহে), অন্য কিছু খুব কম লোকেই পড়িয়া থাকেন।

কোন নামকরা পত্রিকায় প্রকাশিত কোন ভাল প্রবন্ধ সম্বন্ধে একজন শিক্ষিত লোকের মত জিজ্ঞাসা করিলে শতকরা ৯০ জনের (যদি বেশী না হয়) নিকট এই উত্তর পাওয়া যাইবে যে, তিনি নিজে কাজকর্ম্ম লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকেন, কাজেই পত্রিকা পড়িবার সময় পান না, তবে, তাঁহার অমুক বন্ধু সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকেন, তিনি সম্ভবতঃ এ বিষয়ে মতামত দিতে পারিবেন। সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকেন—মানে হয়ত লিখিয়া থাকেন, অথবা লিখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাঁহারা লেখক, অথবা লেখক হইবার আশা রাখেন, তাঁহারাই মাত্র পাঠক। বহু শিক্ষিত লোক পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে রবীন্দ্রনাথের লেখাও বিশেষ কিছু পড়েন নাই। ইহাই আমাদের সাধারণ অবস্থা।

জাতীয় জীবনে প্রাণের সঞ্চার করিতে হইলে মনের এই নিরুদ্যম অবস্থা দূর করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে।

কিন্তু কি করিয়া লোকের অনুসন্ধান করিবার, পড়িবার, এবং চিন্তা করিবার অভ্যাস গড়িয়া তুলা যাইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার। দেশের অন্য সকল কাজ এই কাজের সাফল্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেও, ইহার ফল পরোক্ষ বলিয়া আমরা ইহার সম্বন্ধে তেমন সচেতন নহি। এই কাজের পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধা আমাদের মনের এই ঔদাসীন্য, ইহা সর্ব্বপ্রথম দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশের লাইব্রেরীগুলি এই কাজের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। প্রতি সহরেই এক বা একাধিক লাইব্রেরী আছে, কিন্তু ইহাদ্বারা শিক্ষার পথ যে খুব প্রশস্ত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। এই সকল লাইব্রেরীর বেশীর ভাগেরই পুস্তক সংগ্রহ দেখিলে, কি কি পত্রিকা আসে খোঁজ করিলে দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান যুগ হইতে এই সকল প্রতিষ্ঠান বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে, আধুনিক চিন্তাধারায় বহুল বিখ্যাত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম; তাহাও যাহা কিছু আছে, তাহার পাঠক প্রায় নাই বলিলেই হয়। ইহার প্রধান কারণ, এই সকল লাইব্রেরীর সৃষ্টির সময়, ইহার সহিত যে সকল জ্ঞানপিপাসু লোকের অন্তরের স্পর্শ ছিল, বর্ত্তমানে তাহা আর না থাকায়, এই সকল প্রতিষ্ঠান, অনেকটা প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। আসলে পাঠক সৃষ্টি করিবার অথবা জ্ঞানবিস্তার করিবার আকাঙ্ক্ষা এই সকল প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে নাই, বর্ত্তমানে যে সকল পাঠক এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট সম্পর্কে আছেন, তাঁহাদের রুচি এবং মনের দাবী অনুসারে ইহার পুস্তকাদি সংগৃহীত ও কার্য্য পরিচালিত হয়।

এই সকল প্রতিষ্ঠানকে জীবন্ত এবং চিন্তাবিস্তারের কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইলে, প্রতি লাইব্রেরীতে উৎসাহী পাঠকদের লইয়া পাঠচক্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিতর্ক আলোচনাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে কোন বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য গুণীলোকদের আহ্বান করিতে হইবে এবং প্রবন্ধাদির জন্য লেখকদের পুরস্কারাদি দিয়া উৎসাহিত করিতে হইবে। পল্লীর যে সকল অঞ্চলে শিক্ষিত লোক আছেন, অথচ যেখানে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা সহজ বা সম্ভব নয়, সেখানেও সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদি লইয়া ছোট ছোট পাঠচক্র গঠন করা অসম্ভব নহে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেক কেন্দ্রে কয়েকজন করিয়া যুবক উদ্যোগী হইলে, মহকুমা সহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে।

সংবাদপত্রে দেখিলাম, 'ইন্‌স্‌টিটিউট্ অব্-ফরওয়ার্ড স্টাডিজ' নাম দিয়া বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ দিবার জন্য কলিকাতায় একটি পাঠচক্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইঁহাদের প্রতিশ্রুত কর্ম্মতালিকা যদি অনুসৃত হয়, তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে আশা করা যাইতে পারে, এবং অন্যান্য স্থানেও লোকে ইঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর একত্র শিক্ষা নিষিদ্ধ করায়, 'ইণ্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড' বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে এবিষয়ে তদন্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা আশা করি এই সমিতি, সকল দিকের সুবিধা অসুবিধার কথা সংস্কারমুক্ত চিত্তে বিবেচনা করিবেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময়, শিক্ষার্থীদের উপর সহশিক্ষার ফলাফল কি হইবে তাহা যেমন ভাবিয়া দেখিবেন, তেমনি ইহাও ভাবিয়া দেখিবেন যে, সহশিক্ষা ব্যতীত মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া বর্ত্তমানে সম্ভব কিনা, এবং যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, আমাদের জাতীয় জীবনের উপর অশিক্ষার কুফল সহশিক্ষার কুফল (যদি কিছু থাকে) অপেক্ষা অধিকতর অবাঞ্ছনীয় হইবে কি না।

সহশিক্ষার সমর্থনে যুক্তিসহ আমাদের মত পূর্ব্বে একাধিকবার আমরা বলিয়াছি। ছেলেদের ও মেয়েদের ভাল শিক্ষার উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ স্কুল যদি দেশময় থাকিত, তবে পৃথক্ শিক্ষার তুলনায় সহশিক্ষার ফল কি হইবে তাহা বিতর্ক ও বিবেচনার বিষয় হইত। কিন্তু, সহরে যদিও বা সম্ভব পল্লীতে মেয়েদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় পৃথক্ স্কুল স্থাপন করা অনেকটা অসম্ভব। উপযুক্ত পরিমাণে পৃথক্ কলেজ সম্বন্ধেও একথা সত্য। কাজেই, ব্যাপার আসিয়া দাঁড়ায়,—কাহারও কাহারও মতে (অবশ্য আমাদের মতে নহে) সহশিক্ষা বিশেষ বাঞ্ছনীয় না হইলেও, বর্ত্তমানে আমাদিগকে, হয় সহশিক্ষা, না হয় কোন শিক্ষাই নয়, এই দুইটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইতেছে। অশিক্ষা কেহ চাহিবেন কি?

জার্ম্মানীর যুদ্ধসজ্জা

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, ফ্রান্সের ১৯৩৫ সালের যুদ্ধ-বাজেটে জার্ম্মানী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, কয়েক মাসের মধ্যে জার্ম্মানী স্থলপথে ১৯১৪ সাল অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইবে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই জার্ম্মানী ৫৫ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নামাইতে সক্ষম হইবে। বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর ৩,৫০০—৪,০০০ শিক্ষিত বিমানচালক এবং বহু সংখ্যক বায়ুপোত আছে। অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরকের প্রস্তুত কার্য্যও খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ইহা শুধু জার্ম্মানীরই কথা নহে, ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী কোন দেশেরই অবস্থা ইহাপেক্ষা অধিকতর আশাপ্রদ নহে। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে যে সকল জাতি প্রভুত্ব করিতেছেন, জার্ম্মানীর আকস্মিক অভ্যুদয়ে তাঁহাদের অনেকের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে বলিয়া, জার্ম্মানীর শক্তি সঞ্চয়কে সকলে এতটা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। ফ্রান্সের বাজেটে জার্ম্মানীর শক্তিসঞ্চয়ের এই বিবরণ থাকিবার অর্থ অবশ্য হইতেছে, জার্ম্মানীর এই আয়োজনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদেরও উপযুক্ত সাজসজ্জা করিবার মত অর্থ চাই।

সাম্রাজ্যবাদের গোড়ার কথা হইতেছে, দুর্ব্বলকে শোষণ করিয়া বড় হইবার চেষ্টা। এই শোষণ বর্ত্তমানে শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদী কয়েকটি জাতি সমগ্র পৃথিবীকে তাঁহাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া নিয়াছেন, আর নূতন ক্ষেত্র নাই। তাই এখন সকলেরই আশঙ্কা পাছে কেহ সবলতর হইয়া অন্যকে গ্রাস না করেন। গত যুদ্ধের ফলে সকলেই বুঝিয়াছেন যে, আর একটি যুদ্ধের অর্থই বর্ত্তমান সভ্যতার ধ্বংস। যুদ্ধ কেহই চান না, কিন্তু এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে কেহই সাহস করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না। এই জন্যই নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক বিফল হইল; যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারাই নিজ নিজ দেশের যুদ্ধসম্ভার বাড়াইতে ব্যস্ত আছেন। শান্তির সময়েও জাতিসমূহকে যুদ্ধের আয়োজনে যাহা ব্যয় করিতে হইতেছে, তাহা যদি মানুষের স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে ব্যয় হইত, পৃথিবীর অবস্থা এতদিনে তাহা হইলে সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার হইয়া যাইত।

মুসোলিনী চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে প্রত্যেক ইটালীয় সৈনিক হইয়া উঠিতে পারে, হিটলার চেষ্টা করিতেছেন জার্ম্মান মর্য্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে, ফরাসী নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারেন না, জাপান ব্যস্ত মাঞ্চুরিয়া, চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ও রক্ষার।

ব্রিটেনের অন্যদিকে শক্তির দৈন্য নাই। কিন্তু আগামী যুদ্ধে শক্তি-পরীক্ষা অনেকটা আকাশ পথে ঘটিবে, এইজন্য আকাশ পথে শক্তি বৃদ্ধির জন্য ইংরেজ বিরাট প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক জাহাজ যুদ্ধপোত নির্ম্মিত হইতেছে।

র্যাপিড-ত্রয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌-স্টেশন ও এবার ড্রোম সমূহের প্রতিষ্ঠা হইতেছে এবং আরও বহু উপায়ে বায়ুপথে শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে।

যে অর্থ মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বহুল পরিমাণে বাড়াইতে পারিত, এইরূপে যে শুধুমাত্র তাহারই অপব্যয় হইতেছে তাহা নহে। ইহাতে যুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হইয়া জাতি-সমূহের পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষ জমিয়া উঠিতেছে, তাহাই আরও ভয়াবহ। তদপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় ব্যাপার হইতেছে যে, যে সকল লোককে সৈনিক হইতে হয়, তাহারা একটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকে মাত্র। মনুষ্যত্বের অন্য সর্ব্ববিধ আস্বাদ এবং বিকাশের সুযোগ হইতে যে বহুসংখ্যক লোক সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত থাকিতেছে, মনুষ্যত্বের পক্ষে সে ক্ষতি অপূরণীয়।

জার্ম্মানীতে যৌন অপরাধীদের শাস্তি

নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ আমাদের দেশে সাধারণ ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের অশিক্ষা, সাধারণভাবে নারীর উপর মর্য্যাদাবোধের অভাব, নানাবিধ সামাজিক ক্রটি, পুরুষের পৌরুষ এবং নারীর আত্মরক্ষার ক্ষমতার অভাব কর্ত্তৃপক্ষের শিথিলতা প্রভৃতি নানাকারণ এই অপরাধের আতিশয্যের জন্য দায়ী হইতে পারে। কিন্তু, সকল দেশেই যৌন অপরাধ কিছু পরিমাণে ঘটিয়া থাকে, কাজেই এই অপরাধ দমন ও নিবারণ করিবার জন্য অন্যান্য স্থানে কি উপায় অবলম্বিত হইতেছে, এই সকল উপায় আমাদের দেশে প্রযুজ্য হইতে পারে কিনা, তাহাও বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

জার্ম্মানীতে, ১৯৩৩ সালের ১০ই নভেম্বরের আইন অনুসারে, এক জেল হাসপাতালে ১১১ একশত এগারজন যৌন অপরাধীর উপর কঠোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। এই কার্য্যে মাত্র আট মিনিট করিয়া সময় লাগিয়াছে। অস্ত্রোপচারের পর রোগীদের কয়েক মাস করিয়া চিকিৎসকদিগের পরীক্ষাধীনে রাখা হইয়াছে এবং এই সময়ে তাহাদের শারীরিক পরিবর্ত্তনের ফটোগ্রাফ্‌ এবং গলার স্বরের গ্রামোফোন রেকর্ড রাখা হইয়াছে।

সার স্যামুয়েল্‌স হোরের প্রচার কার্য্য

ভারতবর্ষে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহা যে গণতান্ত্রিকতার বিরোধী নহে, রক্ষাকবচগুলি যে অপ্রতিহত ক্ষমতা রক্ষার জন্য উদ্দিষ্ট নহে, ইহার দ্বারা যে ভারতবাসী-দিগকে সম্পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইবে সেকথা, এই শাসন সংস্কারের প্রবর্ত্তকদিগের বাহিরে প্রচার করিবার প্রয়োজন আছে।

বোস্টনের রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, সার স্যামুয়েল হোর "ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্স মনিটর" নামক পত্রিকায় ভারতে শাসন সংস্কার সমস্যা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, কয়েকটি দেশ, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্য, আইন সভার নিকট মন্ত্রী দায়ী থাকিবেন এই নীতি গ্রহণ না করিয়াও, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং কোন কোন দেশ অন্ততঃ সাময়িকভাবে এই নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এই কথা বলিবার অর্থ এই যে, আগামী সংস্কৃত শাসনতন্ত্রে ভারতীয় শাসকেরা যে ব্যবস্থাপরিষদের নিকট থাকিবেন না, এব্যবস্থা গণতান্ত্রিকতার বিরোধী নহে। অবশ্য ভারতীয় এবং এই সকল দেশের শাসনতন্ত্রের মূলগত পার্থক্য কোথায়-ও কি, তাহা বিচার না করিয়াও বলা যায় যে, স্বাধীনদেশের শাসকেরা ক্ষমতা হাতে পাইলেও, তাঁহাদের বুদ্ধিমত নিজ নিজ দেশের হিতের কথাই মাত্র ভাবিবেন, অন্য দেশের স্বার্থের কথা তাঁহারা মনে স্থান দিবেন না, কিন্তু ভারতীয় শাসকেরা ভিন্নদেশীয় লোক হইবেন বলিয়া তাঁহারা শুধুমাত্র ভারতের হিতের কথা চিন্তা না করিতে পারেন, ভারতীয়েরা এ আশঙ্কা করিতেছেন।

পরিষদের নব নির্ব্বাচিত সদস্যের কর্ত্তব্য

আমাদের বর্ত্তমান আইনসভাগুলির হাতে প্রকৃত ক্ষমতা কিছু নাই, আগামী শাসনতন্ত্রেও এই ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যখনই কোন ব্যাপার লইয়া কর্ত্তৃপক্ষ এবং সাধারণের প্রতিনিধিদের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তখনই কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছাকে বাধা দিবার ক্ষমতা ব্যবস্থা-পরিষদ বা কোন প্রাদেশিক আইনসভার হয় নাই। কাজেই, ইহার উপর অনেকেই যে আস্থা হারাইবেন তাহা আর

বিচিত্র কি ? কংগ্রেস সব সময়েই দেশের রাষ্ট্রিক প্রগতি চাহিয়াছেন, তাঁহারা যখন দেখিলেন ইহাতে সেদিক দিয়া বিশেষ কোন ফললাভ হইতেছে না তখন আইনসভাগুলি বয়কট করিবার সংকল্প তাঁহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নাই।

কংগ্রেসের আইনসভা বয়কট করিবার অর্থ দেশের পক্ষে অনেকখানি। দেশের হিতকামী যোগ্য লোকদের অধিকাংশই কংগ্রেসপন্থী। তাঁহারা আইনসভা বর্জ্জন করায় আইন-সভাগুলি স্বভাবতই বিশেষভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ফলে দেখা গেল আইনসভাগুলির ভাল করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, বিরুদ্ধতা শিথিল হইলে, ইহা দেশের প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। ব্যবস্থা পরিষদ বা আইনসভাগুলির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার বা বিশেষ কোন আইন বিধিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা সরকারের থাকিলেও, পুনঃ পুনঃ সেই ক্ষমতার বলে কাজ চালাইবার প্রয়োজন হওয়া যে সরকারের পক্ষে বিশেষ দুর্ব্বলতা সেকথা সরকার বুঝেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত এবং জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় (অন্ততঃ লোকচক্ষে)। কাজেই, অবিরত ইহার বিরুদ্ধতা করিতে গেলে, বাহিরের কাছে, ব্রিটীশ সরকারের কাছে এবং বিলাতের জনসাধারণের কাছেও ভারত সরকারের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। সরকার সহজে এই অবস্থা বরণ করিতে চাহিবেন না। এইজন্ত যে সকল ব্যাপারের সহিত সরকারের বা ব্রিটীশজাতির স্বার্থ প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নহে, এমন সকল ব্যাপারেই সরকার আইন পরিষদগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, এ আশা অন্যায় নহে। কাজেই, উদ্যোগী মন্ত্রীদের সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ, আর্থিক ব্যবস্থা, কৃষি, বাণিজ্য, কোন কোন বিষয়ে বৈদেশিক সম্পর্ক এবং ছোট বড় আরও নানাদিকে দেশের প্রভূত উপকার করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস ব্যবস্থাসভাগুলিতে ঢুকিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সম্মুখে অন্য কোন রাজনীতিক কার্য্য না থাকায়, তাঁহারা এদিকে কতকটা অবিভক্ত মনোযোগ দিতে পারিবেন।

ব্যবস্থা পরিষদে যাঁহারা ঢুকিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই এবিষয়ে কতকগুলি ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য আছে এবং যাঁহারা কোন বিশেষদলের পক্ষ হইয়া ঢুকিয়াছেন, তাঁহাদের আবার কতকগুলি অতিরিক্ত দলগত কর্ত্তব্যও রহিয়াছে। সদস্যদের প্রত্যেকেরই একথা মনে রাখা দরকার যে তাঁহারা ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধি, দেশের ভাবী কল্যাণের গুরুদায়িত্ব তাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেক কাজের ফলাফল বহুদূরস্পর্শী এবং দেশের ও বিদেশের বহুলোক তাঁহাদের কার্য্য বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবে। ইঁহাদের সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে ইঁহারা ভারতবাসী, সমগ্র ভারতের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহাই সকলের কাম্য এবং কর্ত্তব্য হওয়া উচিত; আমাদের দলগত, সম্প্রদায়গত অথবা ধর্ম্মগত কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং সস্তা জনপ্রিয়তা, সরকারের অনুগ্রহ বা কোন পদমর্য্যাদার লোভে আত্মবিক্রয়ের ফলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকিবে এবং দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি করিবার নৈতিক দায়িত্ব থাকিবে।

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, সদস্যদের অনুপস্থিতি ও অবহেলার ফলেও যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে। নব-নির্ব্বাচিতেরা যেন এবিষয়ে এবার বিশেষ অবহিত থাকেন, কারণ তাঁহারা যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন তাহাদের ভাগ্য লইয়া যথেচ্ছ খেলা করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।

সমাজ-সংস্কারমূলক কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেক সদস্যের নিজস্ব মত থাকা স্বাভাবিক। এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা হইবে যাহাতে স্বাধীন বিচার শক্তি পরিচালনা করিবার অধিকার, যে সকল সদস্য কোন বিশেষ দল হইতে ঢুকিয়াছেন, তাঁহাদেরও থাকিবে। কারণ যে সকল বিষয় লইয়া এই সকল দলের সৃষ্টি হইয়াছে, অনেক জিনিস তাহার সম্পূর্ণ বহির্ভূত থাকিবে। আলোচ্য ব্যাপারে মতামত দিবার সময় সদস্যদের দেখিতে হইবে যে তাঁহারা যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন, সেই জনসাধারণ সে বিষয়ে কি চাহিতেছে। জনসাধারণের মত নির্দ্ধারণের সময় আবার দেখিতে হইবে

যে প্রগতিশীল জনমত কি চাহিতেছে। এ কথা বলিবার কারণ এই যে, প্রগতিশীল মতই প্রকৃত পক্ষে জনমত, কারণ সামাজিক মনের গতি সেই দিকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিষদের সদস্যেরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রগতিশীল জনমতের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

যাঁহারা কোন কোন বিশেষ দলের পক্ষ হইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের ইহা ব্যতীত আবার অতিরিক্ত কর্ত্তব্যও রহিয়াছে। দলের শৃঙ্খলা মানিতে হইবে; দলের নীতি যাহাতে কোন প্রকারে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং যে সকল বিষয় উপলক্ষ করিয়া দল গঠিত হইয়াছে, সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা বিষয় সমূহ ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্র যাহাতে সকল দলই সদস্যদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা দেন, তাহার জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক হইবেন কংগ্রেস পক্ষের সদস্যেরা। কংগ্রেস সর্ব্বপ্রকার প্রগতিশীল চিন্তার ও সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা-হীন স্বাদেশিকতার প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান বলিয়া এই দলের সদস্যেরা দেশহিতকর কার্য্যের অধিকতর স্বাধীনতা পাইবেন। তাহা হইলেও কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট নীতি ও কার্য্যতালিকার সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা সদস্যদের পাওয়া উচিত হইবে।

হিন্দুদের একটি ভাবিবার কথা

অধিকার বৃদ্ধির সহিত মানুষের দায়িত্ব বাড়িয়া যায়। এই দায়িত্ব পালন করিতে না পারিলে সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে আমাদের যেটুকু অধিকার আছে এবং ভবিষ্যতে আমরা যেটুকু অধিকার পাইব তাহা রক্ষা করিবার জন্য আমাদের সতর্কতা চাই।

ব্যবস্থা পরিষদের গত নির্ব্বাচনে অনেক স্থানেই দেখা গিয়াছে এবং সম্ভবতঃ সব স্থানেই ইহা ঘটিয়াছে যে, হিন্দু ভোটদাতাগণকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত করা যায় নাই। যেখানে গিয়াছে সেখানেও মুসলমান ভোট-দাতাগণের তুলনায় তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিতে অনেক অধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছে এবং তাঁহাদের যাতায়াত প্রভৃতির জন্য প্রার্থীদিগকে তুলনায় অধিক ব্যয় করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থার জন্য ইহাতে অবশ্য বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, যদিও পৌর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট ঔদাসীন্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু হিন্দুরাই বিশেষভাবে যুক্ত নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী এবং তাঁহারা বরাবর দৃঢ়ভাবে ইহা চাহিয়াছেন। যদি ইহা কোনদিন পাওয়া যায় তাহা হইলে, সম্প্রদায় হিসাবে, ঔদাসীন্যের জন্য হিন্দুদের স্বার্থহানি হইতে পারে। এখনও জেলা এবং গ্রাম্য সরকারী আধা সরকারী যে সকল প্রতিষ্ঠানে যুক্ত-নির্ব্বাচন রীতি আছে সে সকল স্থানে হিন্দু প্রার্থীদিগকে এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। (ভোটদাতাগণ প্রধানতঃ ধর্ম্মসম্প্রদায়ানুসারে ভোট দিয়া থাকেন।)

বাঙ্গালীর খাদ্য

আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা, ক্ষীণকম্প শক্তি এবং রোগ প্রবণতার মূলে যে আমাদের দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব আছে, তাহা সর্ব্বজন বিদিত হইলেও, সে অভাব যে কতটা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে অনুপাত সামঞ্জস্যের অভাব যে কতটা তাহা আমরা অনেকেই জানি না। রোটারি ক্লাবে ডাঃ উকিলের বক্তৃতা হইতে এ সম্বন্ধে কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। কলিকাতায় শ্রমিক ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা দৈনিক যাহা খাইতে পান, তাহাতে প্রয়োজন অপেক্ষা আমিষ জাতীয় উপাদান শতকরা ২৫-৩০ ভাগ এবং ৬০-৭০ ভাগ স্নেহজাতীয় উপাদান কম থাকে। আমরা ভাত খাই বলিয়া শ্বেতসার ৫০-৬০ ভাগ অধিক থাকে। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি হইতে যে আমিষ ও স্নেহজাতীয় উপাদান পাওয়া যায়, শরীরের পক্ষে তাহাই সমধিক উপযোগী। পূর্ব্বোক্তদের খাদ্যে ইহা আদৌ নাই। শরীর বৃদ্ধির পক্ষে দুগ্ধের নিতান্ত প্রয়োজন থাকিলেও, কেহই দুধ খাইতে পায় না।

যাঁহাদের অবস্থা ভাল, অর্থাৎ যাঁহাদের জনপ্রতি মাসিক আয় ৩১৷৷০, তাঁহাদের খাদ্যের ব্যবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু, ইঁহাদের খাদ্যেও আমিষ জাতীয় উপাদানের ৬'২৫ এবং স্নেহ জাতীয় উপাদানের ১২'৫ ভাগ অভাব আছে। ইঁহারা ৬ আউন্স করিয়া দুধ খাইয়া থাকেন। ইঁহাদের

খাদ্যে পরিমাণ সামঞ্জস্য না থাকিবার কারণ ইঁহাদের অজ্ঞতা।

ডাঃ উকিলের হিসাবানুসারে, ৫ জন লোকের একটি কৃষক পরিবারের (২ জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, ১ জন পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোক, এবং ২টি শিশু) অন্য সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদ দিয়া শুধু দৈনন্দিন খাওয়াপরার জন্য মাসিক ৬০৲ আয়ের প্রয়োজন; অন্যদের ও এই অনুপাতে আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে।

এই প্রকার আয়বৃদ্ধি আমাদের বর্ত্তমানে হইতেছে না, কত দিন পরে হইবে তাহা অনুমান করিবারও সম্ভাবনা নাই। এই সময়ের মধ্যে আমরা বাঁচিবার জন্য আমাদের সাধ্যায়ত্ত কি উপায় অবলম্বন করিতে পারি, বিশেষজ্ঞদিগকে তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সাধারণ লোকের অবস্থা বাংলার তুলনায় খুব বেশী ভাল নহে, কিন্তু, এসব অঞ্চলের লোকের শারীরিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি বাঙ্গালীদের অপেক্ষা অনেক বেশী।

পূর্ব্বে দেশের লোকসংখ্যা কম ছিল এবং মাছ, দুধ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইত। কাজেই লোকে খাইতে পাইত। এখন একদিকে যেমন লোকসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে অন্যদিকে তেমনই পুষ্টিকর খাদ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই খাদ্য সকলের আঁটিবার মত নাই বলিয়া, আমাদের ধনীরা প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্য দিয়া ইহা কিনিয়া নিতেছেন বলিয়া আমাদের অবস্থানুপাতে এইসব খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

যদি কোন উপায়ে আমাদের সকলেরই অবস্থা ভাল করিয়া দেওয়া যায়, অথচ খাদ্য জিনিষের আমদানি না বাড়ে, সেই খাদ্য কিনিবার জন্য, সেই সময়ের ধনীদের মধ্যে আবার প্রতিযোগিতা হইবে এবং এই সকল দ্রব্যের মূল্য অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমানে পুষ্টিকর খাদ্য দরিদ্রদের যতটা সাধ্যের বাহিরে আছে, তখনকার ধনীকৃত দরিদ্রদের সাধ্য হইতে এই সকল জিনিষ ঠিক তত দূরেই থাকিবে। যদি সকলের অবস্থা সমান ভাল হয়, এবং জিনিষগুলি সকলের মধ্যেই সমভাবে বণ্টিত হয়, তাহা হইলে কেহই প্রয়োজনানুরূপ পাইবে না।

সরকার এবং দেশের ধনী লোকেরা উদ্যোগী হইলে দেশে এখনও প্রচুর পরিমাণে মাছ উৎপন্ন হইতে পারে, দেশের যে বহুসংখ্যক মরা নদী এবং অসংস্কৃত জলাশয় আমাদের অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া আছে সেখানেও মাছের চাষ চলিতে পারে। প্রবাহিত নদীগুলিতে মাছ বাড়ান যায় কিনা, সামুদ্রিক মৎস্যের আমদানি করা যায় কিনা এসব বিষয়েও অনুসন্ধান আবশ্যক। বাংলার গো-কুলের ধ্বংস এবং দুধের অন্তর্দ্ধানের জন্য গোচারণ ভূমির অভাব (ইহাই সাধারণ বিশ্বাস) ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী উৎকৃষ্ট পুরুষ জাতীয় পশুর অভাব। গবর্ণমেণ্টের সহায়তা ব্যতীত এদিকে বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩

অফিস থেকে গৃহে ফিরে প্রকাশ দেখ্‌লে প্রতিদিবসের নিয়মিত অপেক্ষায় আজ সবিতা ও সন্ধ্যা তার জন্যে বারান্দায় ব'সে নেই। যেখানে যে কাজেই থাকুক না কেন, প্রকাশের গৃহে ফেরবার সময় হ'লে তারা বারান্দায় ব'সে গল্পগুজব করে। অন্ততঃ, দূরে মোটারের পরিচিত হর্ণ শুন্‌তে পেলে তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আজও হর্ণ দেবার অভাব হয়নি, কিন্তু সবিতা এবং সন্ধ্যার মধ্যে একজনকেও বারান্দায় দেখ্‌তে না পেয়ে প্রকাশ একটু বিস্মিত হ'ল।

গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠে দেখ্‌তে পেলে আয়াকে। তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বল্‌লে কানিয়া সাহেবের মেম এসে সবিতাকে ধ'রে নিয়ে গেছে নিজেদের বাড়ি। সেখানে 'তামাসা-টামাসা' ঐরকম কিছু একটা ব্যাপার আছে।

"মাসিমা ?"

"মাসিমা তাঁর নিজের ঘরে আছেন।"

সন্ধ্যার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রকাশ বাইরে থেকে ডাকলে, "সন্ধ্যা ?"

ঘরের ভিতর থেকে সন্ধ্যা উত্তর দিলে, "আজ্ঞে ?" তারপর তাড়াতাড়ি পর্দা ঠেলে বাইরে এসে বল্‌লে, "আপনার আসবার সময় হয়ে গেছে মুখুজ্জেমশাই ?"

"তা' ত হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার চোখ দেখে যেন সন্দেহ হয় কিছু আগে ওখানে বর্ষা-ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল ?"

অপ্রতিভমুখে আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কৈ, না !"

হাসিমুখে প্রকাশ বল্‌লে, "না-ই যদি, তা হ'লে ও-রকম ব্যস্ত হয়ে খপ্‌ ক'রে চোখ না মুছলেও ত চল্‌ত। তা ছাড়া, চোখ মুছলে জলই না-হয় যায়, চোখের লাল্‌চে রঙও কি তাতে যায় ?"

সন্ধ্যা কোনো কথা বল্‌লে না, শুধু তার মুখে অল্প একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে।

প্রকাশ বল্‌লে, "বাড়িতে সবিতা নেই, সুবিধে পেয়ে অদৃষ্টের পায়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করছিলে বুঝি ?"

এবারও সন্ধ্যা কোনো কথা বল্‌লে না, কিন্তু এবার আর তার মুখে দুঃখের হাসির আভাসটুকু পাওয়া গেল না, তৎপরিবর্তে চোখ দুটো সহসা চক্‌চকিয়ে উঠ্‌ল। বিপদ দেখে প্রকাশ অন্য কথা পাড়লে। বল্‌লে, "মিসেস্‌ কানিয়া এসে সবিতাকে বুঝি ধ'রে নিয়ে গেছেন ?"

সঞ্চীয়মান অশ্রুকে বিন্দুতে পরিণত হ'তে না দেওয়ার জন্য সন্ধ্যাকে আর একবার চোখে আঁচল দিতেই হল। তারপর প্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ, বোধহয় সেই নামই।"

"কি আছে সেখানে ?"

"কে একজন এসেছে ওঁদের দেশ থেকে, সে না-কি খুব ভাল ম্যাজিক দেখাতে পারে।"

"তুমি গেলেনা কেন ?"

"আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে দুজনেই পেড়াপিড়ি করেছিলেন, কিন্তু—", না যাওয়ার প্রকৃত কারণটা কিভাবে বলবে সে বিষয়ে সন্ধ্যা ইতস্ততঃ করতে লাগল।

প্রকাশ বল্‌লে, "কিন্তু যেতে ইচ্ছে হোল না ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বল্‌লে, "না।"

মুখের উপর একটা কপট গাম্ভীর্য্যের ছায়া বিস্তার ক'রে প্রকাশ বল্‌লে, "ম্যাজিক দেখতে যেতে যখন ইচ্ছে হয় না তখন বুঝ্‌তেই হবে মনের আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন ! শুক্‌নো ডালে পাতা গজাবে ফুল ফুটবে ফল ফল্‌বে, একটা

আস্ত বেগুন কাটবে আর তার ভিতর থেকে ফুড়ুৎ ক'রে বুলবুলি পাখী উড়ে যাবে,—এ-সব কি সহজ কথা? এ দেখবার জন্তে আমি অফিস কামাই করতেও পেছপাও হইনে।"

সন্ধ্যা হাসিমুখে বললে, "তা হ'লে ত' আপনাকে অফিসে ম্যাজিকের খবর পাঠালে হোত?"

প্রকাশ বললে, "নিশ্চয়ই! তা হ'লে কি আর এখন আমাকে এখানে দেখতে পেতে?—কানিয়া সাহেবের বাড়ি ব'সে মনের আনন্দে ম্যাজিক্ দেখতাম। চা খেয়েচ?"

"না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তোমার আর আমার ছুজনের চা দিতে হুকুম ক'রে দাও, আমি ততক্ষণে মুখ হাত ধুয়ে তয়ের হ'য়ে নিই।" ব'লে প্রকাশ প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

সন্ধ্যা বললে, "মুখুজ্জে মশাই, শুধু আপনার চা-ই দিতে বলি। সবিদিদি এলে আমি তাঁর সঙ্গে খাব অখন।"

প্রকাশ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "সে কার্য্য তোমার সবিদিদি কানিয়া সাহেবের বাড়িতে উত্তমরূপে শেষ না ক'রে ফিরবেন, তা মনেও কোরো না। সুতরাং তাঁর ভাগের খাবারটাও যদি আমরা দুজনে ভাগাভাগি ক'রে খেয়ে ফেলি তা হ'লেও এমন কিছু অপরাধ হবে না।"

প্রকাশের দুটি মন্তব্যের মধ্যে অন্ততঃ প্রথমোক্তটা এমনই সমীচীন যে তার বিরুদ্ধে আর কোনো কথা বলা চললনা। অগত্যা সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, আপনি তা হ'লে তয়ের হয়ে নিন্।—আমি চা দিতে বলছি।"

"দুজনেরই ত?"

"হ্যাঁ, দুজনেরই।"

"বেশ কথা।" ব'লে প্রকাশ প্রসন্নমুখে প্রস্থান করল।

ভিতরের একটা বারান্দার একপ্রান্তে চা পানের জন্ত টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। সেখানে চা এবং খাবারের বিবিধ উপকরণ সাজিয়ে রেখে সন্ধ্যা প্রকাশের জন্ত অপেক্ষা করছিল। যথা সময়ে প্রকাশ তথায় এসে উপস্থিত হ'ল, এবং নানাবিধ কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে পানাহার চলতে লাগ্‌ল।

খাওয়া শেষ হ'লে চেয়ার ত্যাগ করে উঠে প্রকাশ বললে, "চল সন্ধ্যা, একটু খড়কাই নদীর দিকে বেড়িয়ে আসা যাক্।"

একটু ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "সবিদিদি হয়ত' একটু পরেই এসে পড়বেন। সবিদিদি এলে তারপর গেলে ভাল হয় না?"

প্রকাশ বললে, "তা'ত হয়-ই। কিন্তু আসতে তাঁর যে অনেক দেরী হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তা ছাড়া, তিনি যখন আনন্দ 'লাভের পথে আমাদের অপেক্ষা রাখেননি, তখন আমরাও তাঁর জন্তে অপেক্ষা না করলে অন্যায় হবে না।"

অপ্রতিভমুখে সন্ধ্যা বললে, "শুধু তাই নয় মুখুজ্জে মশাই, সবিদিদি অনেক পেড়াপিড়ি করেছিলেন, তবু আমি তাঁর সঙ্গে যাইনি, পাছে তিনি মনে করেন -"

সন্ধ্যার অসমাপ্ত কথার মধ্যে প্রকাশ উচ্চস্বরে হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "পাছে তিনি মনে করেন তাঁর কথার চেয়ে তুমি আমার কথার বেশি বাধ্য,—এই ত? তা' ত তুমি নিশ্চয়ই বাধ্য। এ'তে তিনি রাগও করবেন না, দুঃখও করবেন না। বোনের ওপর বোনের কথার চেয়ে শালীর ওপর ভগ্নিপতির কথার জোর বেশি, এ সনাতন সত্য সকলেরই জানা আছে। বরং এখনও তিনি যদি রাগ না ক'রে থাকেন ত' তাঁর কথা না শুনে আবার আমার কথাও শোননি জানতে পারলে হয়ত রেগে যেতে পারেন। জান ত, প্রত্যেক পতিপ্রাণা স্ত্রীলোক নিজের অপমানের চেয়ে স্বামীর অপমানে বেশি আহত হয়। সতীর কথা মনে আছে ত?"

প্রকাশের কথা শুনে এবং কথা বলবার ভঙ্গী দেখে সন্ধ্যা হেসে ফেললে; বললে, "কথায় আপনার সঙ্গে পেরে ওঠবার শক্তি ত' আমার নেই, কাজেই চলুন।"

প্রসন্ন হয়ে হাসিমুখে প্রকাশ বললে, "এ শক্তির পরীক্ষায় তোমার হার হ'ল না সন্ধ্যা, সহৃদয়তার পরীক্ষায় তোমার জয় হ'ল।" তারপর সন্ধ্যার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "বেশ পরিবর্ত্তনের কোনো দরকার আছে কি?"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "কিছু না।"

"তবে এসো, মোটর তৈরীই আছে।"

প্রকাশের মোটর অন্তর্হিত হওয়ার মিনিট পাঁচেক পরেই কানিয়া সাহেবের গাড়ি ক'রে সবিতা গৃহে এসে উপস্থিত হ'ল।

তখনো ম্যাজিক শেষ হয়নি, প্রধান দুটো খেলা তখনো বাকি। ম্যাজিকের শেষে লঘু জলপানের শুরু ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু প্রকাশ অফিস থেকে এসে হয়ত' অপেক্ষা ক'রে থাকবে এই কথা মনে ভেবে সে অতি কষ্টে মিসেস্ কানিয়ার নির্ব্বন্ধাতিশয্য এড়িয়ে শুধু দুই তিন চুমুক চা এবং আধখানা বিস্কুট খেয়েই চ'লে এসেছে, কতকটা পরিশ্রান্ত ক্ষুধিত অবস্থায়। দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ ক'রে সামনে কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে চেঁচিয়ে ডাক্‌লে, "আয়া, আয়া!"

মোটরের শব্দ পেয়ে আয়া আপনিই আস্‌ছিল, সবিতার আহ্বানে তাড়াতাড়ি সম্মুখে এসে বল্‌লে, "মেম সাহেব!"

"সাহেব অফিস থেকে আসেন নি?"

আয়া বল্‌লে, "হাঁ মেমসাহেব, সাহেব অফিস থেকে এসে চা খেয়ে মাসিমাকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন।"

সবিস্ময়ে সবিতা বল্‌লে, "এরি মধ্যে এসে বেরিয়ে গেছেন?" পরমুহূর্ত্তেই ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল; "কতক্ষণ গেছেন?"

"কতক্ষণ?—এই পাঁচ মিনিট। ব্যস্।"

একমুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে সবিতা জিজ্ঞাসা করলে, "কতক্ষণ সাহেব এসেছিলেন?"

মনে মনে একটু হিসাব ক'রে আয়া বল্‌লে, "আধ ঘণ্টার কিছু বেশি হবে।"

"মাসিমা চা খেয়েচেন?"

"হাঁ, মাসিমাও সাহেবের সঙ্গে চা খেয়েচেন।"

"আচ্ছা, তুই যা।" ব'লে সবিতা প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

আয়া জিজ্ঞাসা করলে, "মেমসাহেব, চা দোবো আপনাকে?"

মাথা নেড়ে সবিতা বল্‌লে, "না, কিচ্ছু দিতে হবে না, আমি চা খেয়ে এসেছি।"

আক্ষরিক হিসাবে সত্য হ'লেও, বস্তুতঃ কথাটা মিথ্যাই; কারণ দেহের মধ্যে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উভয়েরই তাগিদ ছিল তখন যথেষ্ট। কিন্তু মনটা হঠাৎ কেমন গেল বেঁকে, মনে হ'ল দূর হোগে ছাই! খেয়ে-টেয়ে আর কাজ নেই, চুপচাপ্ একটু শুয়ে পড়া যাক্। কিন্তু বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে শুতে গিয়ে শুতে ইচ্ছা হ'ল' না। বাঁ দিকের কপালের একটা শির দপ্ দপ্ করছিল,—বোধহয় পিত্ত পড়ারই জন্ত। স্মেলিং সল্টের শিশিটা হাতে নিয়ে সবিতা পিছনদিকের বাগানে একটা সান-বাঁধানো চাতালে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এ জায়গাটা তার ভারি প্রিয়। এর আশপাশের প্রায় সমস্ত গাছগুলোই তার নিজের হাতে পোঁতা এবং নিজের যত্নে বর্দ্ধিত। তাই সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই এ জায়গাটা তার ভাল লাগে। কিন্তু আজ তাও লাগ্‌ল না। মনের ভিতরকার তারটা সহসা একটু চ'ড়ে গিয়ে এমন একটা বেসুরায় বেঁধেছে যে, কোনো বস্তুরই সঙ্গে এখন আর সুর মিল্‌ছে না। উঠে প'ড়ে একটু ঘুরে-ফিরে অবশেষে শয়নকক্ষে গিয়ে শয্যাশ্রয়ই করলে। আলো নিভিয়ে চোখ বুজে স্থির হয়ে প'ড়ে রইল, কিন্তু ঘুম এল না।

প্রকাশের মোটরের হর্ণের শব্দ যখন শোনা গেল তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা উত্তীর্ণ হয়েছে। কিছু পরেই প্রকাশ ঘরে প্রবেশ করল। সুইচ খুলে দিয়ে সবিতাকে শয্যায় শুয়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েচে সবু?—অসুখ করেছে না-কি?"

সবিতা অন্যদিকে ফিরে শুয়ে ছিল, প্রকাশের প্রশ্নে তার দিকে ফিরে বল্‌লে, "না।"

"তবে এ সময়ে শুয়ে রয়েছ কেন?"

"মাথাটা সামান্য ধরেছে।"

"কি আশ্চর্য্য! সেটা কি অসুখ নয়?" তারপর সবিতার পাশে শয্যাপ্রান্তে ব'সে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে, "তোমার মাথাধরা ত' সহজ ব্যাপার নয় সবু। একটু ফুটবাথ্ নিলে না কেন?"

"দরকার নেই, চুপ ক'রে শুয়ে থাক্‌লেই কমে যাবে এখন।"

"ম্যাজিক কেমন দেখ্‌লে?"

"ভালই।"

"ম্যাজিশিয়ান্ কি কানিয়াদের আত্মীয় কেউ?"

"না, ব্যবসাদার; ওদের দেশের লোক।"

"বুঝেচি। ওদের বাড়ি প্রথম একদিন দেখিয়ে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে বাড়ি বাড়ি দেখিয়ে বেড়াবার ফন্দী।"

একথার উত্তরে সবিতা কোন কথা বলবার প্রয়োজন

বোধ করলে না। ক্ষণকাল চুপ ক'রে ব'সে থেকে প্রকাশ বললে, "আজ একটা ভারি চমৎকার জিনিস আবিষ্কার করেছি সবু। তুমি ত' কোনদিন আমাকে বলনি যে, সন্ধ্যা এত ভাল গান গাইতে পারে।"

"আমি ছেলেবেলায় ওর গান শুনেছিলাম, তারপর অনেকদিন শুনিনি। কেন, তুমি ওর গান আজ শুনলে না কি?"

"শুনলাম বই কি, তা নইলে বলছি কেমন ক'রে? আহা, চমৎকার গাইলে! গিটকিরির দানাগুলো কি পরিষ্কার, ছোট ছোট তানগুলো দেয় এমন অদ্ভুত মিষ্টি ক'রে! আমি ত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি!"

সন্ধ্যার গান যে বাড়িতে হয়নি, অন্য কোথাও হয়েছিল, তা অনুমান ক'রে নিতে সবিতার বিলম্ব হ'লনা। চা-পান সহ আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে গানের অবসর কোথায়? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ওকে কাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলে? কোথায় ও গান গাইলে?"

অল্প হেসে প্রকাশ বললে, "কারুর বাড়িতে নয়, খড়কাইয়ের ধারে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেইখানেই শুনলাম।"

"সেই খোলা জায়গায় লোকজনের সাম্নে তান গিট্‌কিরি দিয়ে ও গান গাইলে?"

"লোকজন কোথায়? একেবারে নির্জ্জন। যেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে জনমানবের সাড়া নেই।"

'তা যেন নেই, কিন্তু তুমি ত' ছিলে,—তোমার সামনে অমন তান-টান দিয়ে গান করবার মতো ওর মনের অবস্থা হয়েচে তা হ'লে?"

প্রকাশ বললে, "তুমি একটু ভুল করছ সবু। ও কি সহজে গেয়েচে? কত সাধ্যসাধনা ফন্দী-কৌশল করে তবে আমি ওকে গাইয়েচি। আজ অফিস থেকে এসে দেখি কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি রক্তজবা করে রেখেচে। ওর মনের দুরবস্থার কথা ভেবে জোর করে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। তাই কি যেতে চায়, বলে সবিদিদি এলে তারপর যাব। তুমি যে কখন আসতে পারবে তার ত স্থিরতা ছিলনা, তাই আমি একলাই ওকে নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে ওর নিজের কথা উঠতে বললে, মুখুজ্জে মশাই, আমার শ্বশুর আর বাবা ভাবুন না কিছুদিন আমাকে তাঁরা ঘরে নেবন কি নেবেন না, আমি কিন্তু ততদিন অকর্ম্মণ্য হ'য়ে বসে থাকি কেন, দিননা আমাকে কোন স্কুলে কিম্বা ভদ্রলোকের বাড়ী ভর্ত্তি ক'রে, মেয়েদের লেখাপড়া শিল্পকর্ম্ম গানবাজনা শিখিয়ে নিজের যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনটুকু উপার্জ্জন করি। আমি বললাম, লেখাপড়া শিল্পকর্ম্মের কথা আমি তোমাকে এখনি বলতে পারছিনে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে গানবাজনা শেখবার তাগিদটা আজকাল হঠাৎ এমন বেড়ে উঠেছে যে আমি চেষ্টা করলে এই এই টাটানগরেরই মধ্য অন্ততঃ টাকা পঞ্চাশের মতো কাজ নিশ্চয়ই তোমাকে সংগ্রহ ক'রে দিতে পারি, কিন্তু তুমি কি ভাল ক'রে গান শেখাতে পারবে? সন্ধ্যা বললে, ছোট ছেলেমেয়েদের যা হোক একরকম শেখাতে পারব বলেই ত মনে করি। উত্তরে আমি বললাম, কিন্তু সেটা ত শুধু তোমার মুখের সার্টিফিকেট শুনলেই হবেনা, তোমার গানও শুনতে হবে, তা নইলে আমি অন্য লোককে জোর করে বলব কেমন করে তোমার কথা। এই কৌশলেই অবশ্য কার্য্যোদ্ধার হ'ল, তবে ঠিক এমনি ভাবে এই কথাগুলিতেই হয়নি, অনেক বাক্যের জাল ফেঁদে কৌশলকে যুক্তির আবরণে ঢাকতে হয়েছিল। এখন বুঝলে ত সমস্ত ব্যাপারটা?"

মাথার বালিসটা একটু সরিয়ে ঠিক ক'রে নিয়ে সবিতা বললে, "বুঝলুম।"

প্রকাশ বললে, "তোমাকেও আজই গান শোনাতে হবে, সন্ধ্যাকে দিয়ে সে কড়ার করিয়ে নিয়েছি। দেখোনা কি সুন্দর গায়, বোনের গুণের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে।"

ঠিক এমনি সময়ে দরজার পর্দ্দার বাহিরে মৃদু পদধ্বনি শোনা গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই শব্দ এল, "আসতে পারি?"

সবিতাকে প্রকাশ বললে, "সন্ধ্যা আসছে।" তারপর উঠে একটু এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিলে, "এস, সন্ধ্যা, এস!"

পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে সবিতাকে শয়িত দেখে সন্ধ্যা উদ্বিগ্ন হ'য়ে নিকট গিয়ে বললে, "শুয়ে আছ কেন সবিদিদি? অসুখ করেছে না কি?"

সবিতা বললে, "কিছু হয়নি, সামান্য একটু মাথা ধরেছে। বোস্ সন্ধ্যা, ওই চেয়ারটায় বোস্।

চেয়ারে না ব'সে সবিতার শয্যাপ্রান্তে উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা বললে, "একটু মাথা টিপে দোব সবিদিদি ?"

সবিতা বললে, "না, না, মাথা টিপে দিতে হবেনা, তুই চুপ করে বোস্।"

"বাড়ি এসে মাথা ধরল, না আগেই ধরেছিল ?"

"বাড়ি এসে।"

"এসে চা-টা কিছু খেয়েছিলে ?"

মাথা নেড়ে সবিতা বললে, "না।"

সবিতার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে সন্ধ্যা বললে, "একটু চা খেলে মাথাটা ছেড়ে যাবে অখন। চা দিতে বলব সবিদিদি ?"

ক্ষুধা এবং পিপাসা কিছুরই অভাব ছিলনা। একটু চুপ করে থেকে সবিতা মৃদুস্বরে বললে, "আচ্ছা, আয়াকে না হয় বলে দিয়ে আয়।"

চা এবং কিছু খাবার দেবার জন্য সন্ধ্যা আয়াকে আদেশ করে ফিরে এলে প্রকাশ বললে, "এইখানে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন মেয়ের তফাৎ সন্ধ্যা। পুরুষ যদি ওষুধ ত মেয়ে আহার। সবিতার মাথাধরা দেখে আমার মনে হয়েছিল ফ্লুটবাথের কথা, কিন্তু তোমার মনে পড়ল চায়ের কথা; অথচ দুটো প্রস্তাবের মধ্যে তোমারটাই যে অধিকতর সমীচীন হয়েছিল, তার প্রমাণ ত' হাতে হাতে হয়ে গেল। অনাদি কাল থেকে লালন-পালনের ভার বহন ক'রে ক'রে সেবা ধর্ম্মটা তোমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে।

সবিতা বললে, "আজ গান গেয়ে তোর মুখুজ্জেমশাইকে খুবই খুসী করেছিস দেখচি সন্ধ্যা।"

শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল ; বললে, "এরি মধ্যে সে কথাও হয়ে গেছে না কি ?"

সহাস্যমুখে প্রকাশ বললে, "সবিতারে! তুমি যখন এলে তখনো সেই কথাই হচ্ছিল। এবার তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর, সবিতাকে গান শোনাও।"

সন্ধ্যা বললে, "আজ সবিদিদির মাথা ধরেছে, আজ আর গান টান থাক্ মুখুজ্জেমশাই, আর একদিন শোনালেই হবে।"

প্রকাশ বললে, "সর্ব্বনাশ! ও রকম কথা মুখেও এনো না! সবিদিদিকে গান শোনাবার আগে আমাকে গান শুনিয়েছ তাইতে সবিদিদির মাথা ধ'রেছে, তার ওপর আজ যদি তাঁকে একেবারে গান না-ই শোনাও তা হ'লে একটু পরেই জ্বর আসবে ; তখন চায়ের পরিবর্ত্তে তোমাকে জ্বরসাবুর ব্যবস্থা করতে হবে।"

প্রকাশের কথায় সবিতা তর্জ্জন ক'রে উঠলো ; বললে, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি অন্তর্যামী, সব বুঝতে পার! জ্বর আসবে, না আরো কিছু!"

প্রকাশ বললে, "আহা হা, তুমি জানো না সবু, আসবে! আসতে বাধ্য! কোন স্ত্রীলোকের ছোটবোন যদি দিদির চেয়ে দিদির স্বামীর প্রতি বেশি মনোযোগ দেখাতে আরম্ভ করে তখন ঈর্ষ্যা নামক যে বস্তু সুপ্ত অবস্থায় সেই স্ত্রীলোকের অবচেতন মনে—

সবিতা গর্জ্জন ক'রে উঠে বললে, "রেখে দাও তোমার অবচেতন মনের গাঁজাখুরী!"

প্রকাশ তার অসমাপ্ত বাক্য অনুসরণ ক'রে বলতে আরম্ভ করলে,—"সেই স্ত্রীলোকের অবচেতন মনে অবস্থান করছিল—

বাধা দিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে সবিতা বললে, "ফের যদি অবচেতন মনের কথা মুখে আনবে তা হ'লে সচেতন মন দিয়ে ভীষণ ঝগড়া বাধাবো!"

কপট নৈরাশ্যের সুরে প্রকাশ বললে, "কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোক চিরকালই স্ত্রীলোক থাকবে—তা সে যত লেখাপড়াই শিখুক না কেন! বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর অবিচল নিষ্ঠা কিছুতেই হবে না। ওগো, ফ্রয়েডের মেণ্টাল্ টপোগ্রাফি, সুপার্ এগো, এ-সকলের বিষয়ে গবেষণা যদি একটু ভাল ক'রে করতে তা হ'লে চট্ ক'রে কথাটা উড়িয়ে দিতে পারতে না"।

সবিতা বললে, "চুলোয় যাক্ ফ্রয়েড্! আমি ফ্রয়েডের কথা শুনতে চাইনে! তার চেয়ে চল্ সন্ধ্যা, তোর গান গোটাকয়েক শুনি।"

হাস্য-কৌতুকের প্রসাদে ঘরের আবহাওয়া লঘু হ'য়ে গেছ্ল,—স্মিতমুখে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার চা ?"

"চা ও-ঘরেই দেবে অখন।"

শয্যা ত্যাগ ক'রে সবিতা লাউঞ্জ ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। পিছনে পিছনে আসছিল প্রকাশ,—সবিতা ফিরে দাঁড়িয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অস্ফুটস্বরে বললে, "তুমি যে কতবড় ধূর্ত্ত লোক তা আমিই জানি! তোমার হাতে প'ড়ে জ্বলে পুড়ে মরলুম।" মনে মনে বললে, মিথ্যে কথা। তোমার হাতে প'ড়ে আমার জীবন ধন্য হয়েছে! কিন্তু সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি,—একমাত্র নিজেকে ছাড়া আর কিছু দিয়ে ত তোমাকে বাঁধতে পারলাম না!

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



"মানবের শত্রু নারী"—শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত। ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১০৯ পৃষ্ঠা। দাম পাঁচ সিকা।

এটি একখানা কৌতুকরসপূর্ণ ছোট্ট উপন্যাস, ধারাবাহিক ভাবে কিছুদিন বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল। যাঁদের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস পাঠ করার অভ্যাস আছে তাঁদের মনে মাসে মাসে যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যেই এই উপন্যাসখানির বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখক যে সাহিত্যক্ষেত্রে সত্যিকারের রসসৃষ্টি করতে পারেন তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন এ বইখানাতে। বইখানার বিষয়বস্তুটাকে গভীর বলা যেতে পারে, মানবজীবনের একটি মূল বৃত্তি, নরনারীর পরস্পরের প্রতি চিরন্তন আকর্ষণ। এ বিষয়টি গভীর হলেও এর একটা হাল্‌কা আলোচনা সম্ভব এবং সাহিত্যে অনেক করা হয়েছে কিন্তু বিষয়বস্তুটির গভীরতা ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য না হারিয়ে লেখক তাঁর কল্পনা দিয়ে হাল্‌কা ভাবে বিষয়টিকে আলোচনা করে যে কৌতুকরসের [illegible] করেছেন তা পরম উপভোগ্য হয়েছে,—বিশেষ করে এইজন্য, যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি কোথাও হাস্যরসের লঘুত্বের মধ্যে [illegible]দের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপের সমগ্রতা হারিয়ে ফেলেনি। [illegible]খানেই সাধারণ 'কার্টুন' বা 'ফার্স' জাতীয় লঘু সাহিত্যের [illegible] এই উপন্যাসের পার্থক্য। বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় [illegible]াস আগে আর কখনও পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

উপন্যাসের নায়ক অরুণাংশু স্বাম[illegible] [illegible]নন্দের চেলা। গুরুদেব প্রণীত পুস্তক "মানবের শত্রু নারী" [illegible] গীতার ন্যায়। এই গভীর জ্ঞানসমৃদ্ধ বই ছাড়া [illegible] কাছে বাজে প্রেমকাহিনী বা কবিতার বই পড়ে সে সময় [illegible]

করত না বা তার নৈতিক অবনতির পথ পরিষ্কারও কর[illegible] প্রাণভরে ঘৃণা করতে শিখেছিল সে দুটি বস্তুকে, একটি [illegible] ও অপরটি 'কবিতা'; তাই তার আচার ব্যবহার সা[illegible] সব কিছুর মধ্যেই ছিল পৌরুষ, কোমলতার বিরুদ্ধে বি[illegible] তার গীতাতুল্য পুস্তক "মানবের শত্রু নারী"কে সে সক[illegible] নারীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার অস্ত্র স্বরূপ সঙ্গেই রাখ্‌ত এবং তারই সাহায্যে ট্রেণের কামরায় স[illegible] এক তরুণী সহযাত্রিণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা [illegible] বিজয়গর্ব্বে বাড়ী পৌছেছিল। কিন্তু হায়! গৃহে[illegible] শত্রুর অভাব নেই! ট্রেণে যে শত্রুর আক্রমণ থেকে [illegible] গীতাতুল্য পুস্তক তাকে বাঁচিয়েছিল সেই শত্রু তার [illegible] ভেদ করেও তাকে আক্রমণ করতে ছাড়ল না এবং [illegible] পর্য্যন্ত এনে দিল তার জীবনে একটা মস্তবড় বিপ[illegible] কোথায় গেল তার মায়াপাশ ছেদনের অমোঘ মন্ত্র [illegible] কোথায় গেল স্বামী প্রস্তরানন্দ! "মানবের শত্রু [illegible] শতছিন্ন হলো তারই একান্ত অনুগত ভক্তের হাতে।

লেখকের ভাষার মধ্যে একটা বাধাহীন তরল প্রবা[illegible] মাধুর্য্য আছে; এর মধ্যে আবার যখন কৌতুকরসের [illegible] হয় তখন যে সে কতখানি উপভোগ্য হয় তা বলা যায় [illegible] তাঁর চরিত্র সৃষ্টির কৌশলও অভিনব সে কথা আ[illegible] বলেছি। চরিত্র সৃষ্টির জন্য তিনি যে-সকল কৌতুকর[illegible] বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ করেছেন তার মধ্যে কো[illegible] অতিরঞ্জন নেই বা সম্ভাব্যতা ও সামঞ্জস্যের অভাব নেই, [illegible] মধ্যে তাঁর কল্পনাশক্তির স্বচ্ছতা ও মৌলিকতার [illegible] দিয়েছেন। উপন্যাসের নায়ক কি ভাবে, কি অব[illegible] মায়াপাশ ছেদনের মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে বৈ[illegible] পথটাকে আঁকড়ে ধরে, 'নারী মানবের শত্রু' [illegible]

সত্যটাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেও ছিটকিয়ে পড়লেন কণ্টকাকীর্ণ অসত্য জীবনের পথে—সেটা পরম উপভোগের বস্তু। এমন উপন্যাস পড়লে অরসিকের প্রাণেও রসের সঞ্চার হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীমতী স্নিগ্ধপ্রভা মিত্র

নারীজন্ম—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা ২০০, মূল্য দুই টাকা।

নারীজন্ম পুস্তকে নারীজন্ম, প্রেতিনী, বনহংসীর প্রেম, অরসিকেষু, দুর্বোধ্য, হতভাগা, এই ছয়টি বড় বড় গল্প আছে। শৈলজাবাবুর লেখার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার গল্প ও উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন সুর, নূতন ভঙ্গী আনিয়াছে। সমাজের যত নীচ, পতিত, বর্ব্বর, অশিক্ষিত নরনারী তাঁহার গল্পে ভিড় করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সমাজে যাহাদের আমরা ঘৃণা করিয়া থাকি, তাহারাই আজ তাঁহার পুস্তকে এক অভিনব বেশ ধারণ করিয়া আমাদের মনকে সহানুভূতির অনুরাগে রঙীন করিয়া তোলে। লোককে আমরা সাঁওতাল বলিয়া গালাগালি দিয়া থাকি, কিন্তু শৈলজাবাবুর সাঁওতালী গল্পগুলি পড়িলে মনে হয়। ইহারা যেন আর এক জগতের জীব। সে জগত যেন এক স্বপ্নরাজ্য—সেখানে আছে প্রেম, আছে ভালোবাসা, আছে হিংসা, নৈরাশ্য। 'নারীজন্ম' গল্পটি খুব সুন্দর, শেষের tragic সুরটিও ভারী মিষ্ট, কিন্তু গল্পটি 'অতি বড় ঘরন্তী না পায় ঘর' গল্পের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাহা হইলেও গল্পটি অতি চমৎকার। কি সুন্দর ঘর-সংসারে খুঁটিনাটি কথাগুলি আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করিতে শৈলজাবাবু অদ্বিতীয়। 'অতি বড় ঘরন্তী না পায় ঘর' গল্পটি বাংলাসাহিত্যে শৈলজাবাবুর এক অপূর্ব্ব অবদান। এমন করুণ সুর ফুটাইতে এক শরৎচন্দ্র ছাড়া বাংলার আর কেউ পারেন নাই। আমায় যদি কেউ বলে পৃথিবীর মধ্যে দশটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্পের নাম করিতে, তাহা হইলে আমি বাংলায় দুইটা গল্পের নাম করিব—প্রথম 'অতি বড় ঘরন্তী না পায় ঘর' আর দ্বিতীয় শরৎবাবুর 'রামের সুমতি'। আমাদের সৌভাগ্য, বাংলার সৌভাগ্য, যে আমরা শৈলজাবাবুর মত এমন একজন অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী লেখককে পাইয়াছি। তাঁহার due recognition এখনো বাংলায় হয় নাই। এখন তাঁহার লেখা একটু sterotyped হইয়া আসিলেও, এক একটি গল্প যেন এক একটি রত্ন বিশেষ। শৈলজাবাবুর লেখার প্রধান দোষ এই যে তিনি গল্প ভালো রকমে শেষ করিতে পারেন না। দুই চারিটি গল্প ছাড়া তাঁহার সব গল্পই এই দোষে দূষিত। কিন্তু একে আমরা দোষ বলিতে পারি না। Tchekovএর গল্পের মত তাঁহার গল্পগুলিও Sketch বিশেষ। 'অরসিকেষু' গল্পটি শেষ হইয়াছে অদ্ভুতভাবে। গল্পটিকে তিনি আর একটু বাড়াইলেই ভালো করিতেন। এসব সামান্য খুঁৎ মাত্র, 'নারীজন্ম' বইখানির ছয়টি গল্প যেমন বড়, তেমনি সুন্দর, আর তেমনি করুণ। শৈলজাবাবুর এই tragic সুরটিই আমার বড় ভালো লাগে। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সুন্দর।

পাতালপুরী—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা ১২০, দাম পাঁচ সিকা।

'টকি' বায়োস্কোপের জন্য শৈলজাবাবু কিছুদিন পূর্ব্বে একটি সাঁওতালি গল্পের চিত্রনাট্য (Scenario) রচনা করেন। 'পাতালপুরী' তাহারই ভাবান্তরিত রূপ। বর্ব্বর বনচারী সাঁওতালীদের ছবি আঁকিতে শৈলজাবাবু অদ্বিতীয়। বইখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন সাঁওতাল পরগণার গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এমন pastoral আলেখ্য, এমন অপূর্ব্ব পল্লীচিত্র এক বিভূতিবাবুর লেখা ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও পাই না। পাতালপুরীর গল্পটি সুন্দর, কিন্তু উপন্যাস হিসাবে এই পুস্তকখানি তেমন জমে নাই। খুব তাড়াতাড়ি গল্প শেষ করিবার চেষ্টা করিলে যাহা হয় তাহাই হইয়াছে। নায়ক নায়িকাদের কথোপকথন, ঘটনাসংস্থান, আখ্যানভাগ সমস্তই সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইলেও গল্পটি চমৎকার। নায়ক মুংরা ও নায়িকা টুন্নীর দুঃখে আমাদের প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে। বইখানি শীঘ্রই বায়োস্কোপের পর্দায় দেখানো হইবে, তাহা দেখিবার আগে সকলকে আমি এই গল্পটি পড়িতে অনুরোধ করি। বাঁধাই, কাগজ, ছাপা অতি চমৎকার।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস



পরলোকে বীরেন্দ্রনাথ শাস্‌মল

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাস্‌মলের মৃত্যুতে বাংলাদেশ হারালো একজন দৃঢ়চেতা কর্ম্মী,—রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের ঘুর্ণাবর্ত্তে যিনি ন্যায় ও সত্যের পথ, যা' তিনি স্থির করে নিয়েছিলেন, তা' থেকে কোনো কারণেই কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই বিচলিত হ'ননি। শক্তিশালী নেতার সমস্ত গুণেরই তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল যে-সাহস, সত্যনিষ্ঠা, অবিচলিত ধৈর্য্য, অক্ষুণ্ণ ত্যাগপরায়ণতা, তা তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদুমন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসেই তাঁর নেতৃত্বাধীনস্থ কর্ম্মীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারতেন। অতুলনীয় ছিল তাঁর দেশপ্রাণতা,—দেশের জন্য তাঁর সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করতে তিনি কখনো পরাঙ্মুখ হ'ননি। নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য অর্থাৎ নিজের জন্য তাঁকে যেটুকু সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হ'ত,—তার জন্যে তিনি ক্ষুণ্ণ হ'তেন।

এই সেদিনে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হ'য়ে বিজয়ের গৌরব নিয়ে তিনি ফিরছিলেন কলকাতায়। ঠিক সেই সময় এল মৃত্যুর আহ্বান। এর মধ্যে যে ট্রাজেডীর মর্ম্মস্পর্শী বেদনা,—তা' বোধ হয় বীরেন্দ্রনাথের মত কর্ম্মীরই গ্রহ-সমাবেশের ফলে সম্ভব হয়। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি নিবেদন করি

পরলোকে জানকীনাথ বসু

জানকীনাথ বসু শুধুই নিজের মেধা ও অধ্যবসায়ের জোরে উড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন তা' নয়,—তাঁর গৃহের আব্‌হাওয়া তিনি এমন ভাবে রচনা করেছিলেন, যেখানে একটির পর একটি ক'রে অনেকগুলি মেধাবী, তেজস্বী ও কৃতী পুত্রের লালন-পালন সম্ভব হ'য়েছিল। তাঁর পুত্র শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের কথা ত আলাদা, অন্যান্য পুত্রেরাও নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেছেন। একসঙ্গে এতগুলি কৃতী সন্তানের জনক হওয়া যে-কোনো দেশের লোকের পক্ষেই বিশেষ সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

জানকীনাথের মৃত্যুতে সারা ভারতময় এবং ভারতের বাইরেও সর্ব্বসাধারণের চিত্তে গভীর বেদনার উদ্রেক হ'য়েছে। বিশেষতঃ তাঁর মৃত্যুকালে সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতি বেদনা,—শুধুই সুভাষচন্দ্রের মনে নয়, সমগ্র দেশবাসীর মনে জাগরূক থাকবে। যমদূতকে অনেক দিন পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁর প্রিয়তম পুত্রের আগমন পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে পারলেন না, মাত্র কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বে চলে যেতে হ'ল,—এর বেদনা ভোলবার নয়।

জানকী নাথের পত্নী তাঁরই উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী। অসীম তাঁর চিত্তের বল, আমরা জানি। ভগবান্ তাঁর এই দুঃখে তাঁর চিত্তে আরও বল দিন্—এই প্রার্থনা করি। আমরা পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করি। ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সহানুভূতি নিবেদন করি।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত করলাম। যাতে এ

সম্মিলনটি সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় সে জন্য সমস্ত বঙ্গবাসী এবং কলিকাতাবাসীকে আমরা আমাদের সানুনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

"আগামী ১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর) বুধবার হইতে ১৪ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর) পর্য্যন্ত প্রবাসী বঙ্গ সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন কলিকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত হইবে। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মিলন উদ্বোধন করিবেন। স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। ভারতের দূর দূর প্রদেশ হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী সুধীগণ নানাবিভাগের সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য আগমন করিবেন। কাশীর শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যে, সিংহলের শ্রীযুক্ত ভানুভূষণ দাশগুপ্ত ধন বিজ্ঞানে, দিল্লীর রায়বাহাদুর নিশিকান্ত সেন দর্শনে, পাটনার শ্রীযুক্ত সুবিমল সরকার শিক্ষা বিজ্ঞানে, মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী শিল্পে, মিরাটের শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় ইতিহাসে, দিল্লীর শ্রীযুক্তা শৈলবালা সেন মহিলা বিভাগে, মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত বিমান বিহারী দে বিজ্ঞানে, ইন্দোরের শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু বৃহত্তর বঙ্গে, কাশীর শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসু সঙ্গীত বিভাগে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগীদের সহিত বঙ্গের মনীষীগণের পরিচয় ভাবের আদানপ্রদানের জন্য প্রত্যেক বিভাগে বাংলার প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও মনীষীগণের উপস্থিতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্যর জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান, স্যর যদুনাথ সরকার ইতিহাস, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য, স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী শিক্ষা বিজ্ঞান, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধন বিজ্ঞান, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বৃহত্তর বঙ্গ, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত দর্শন, শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণী সঙ্গীত, মৌঃ মুজিবর রহমান সাংবাদিক ও লেডি অবলা বসু মহোদয়া মহিলা বিভাগের উদ্বোধন করিবেন।

২৬শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে সাহিত্য শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধীয় একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার উদ্বোধন করিবেন।

সম্মিলনীর শেষ দিবস ৩০শে ডিসেম্বর প্রবাসী ও বঙ্গবাসী বাঙ্গালীদের মিলন-বাসর ও মজলিস হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মিলন-বাসরে নেতৃত্ব করিবেন।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা সমিতি প্রতিনিধিদিগের সর্ব্বপ্রকার যত্ন অভ্যর্থনা ও আরামের যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় এক উদ্যান সম্মিলনীতে আগত প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধনা করিবেন।

ডাঃ সত্যচরণ লাহা মহাশয় তাঁহার আগর পাড়া উদ্যান বাটীতে পক্ষী আবাস প্রদর্শন করাইবেন ও প্রতিনিধিদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন।

মিলনী ক্লাব প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সম্বর্দ্ধনার জন্য জলযানে ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

অভ্যর্থনা সমিতি সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য সঙ্গীত, মহিলাবৃন্দ কর্ত্তৃক রবীন্দ্র নাথের "তপতী" অভিনয় ও নৃত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

বাংলার ও প্রবাসের প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগী ও সুধীবৃন্দকে এই সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি সাদরে ও সানুনয়ে আহ্বান করিতেছেন।

সম্মিলনী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ৪৪।১ বহুবাজার ষ্ট্রীটে সাধারণ সম্পাদকের নিকট জানা যাইবে। প্রতিনিধিদিগের ৫৲ টাকা ও প্রবাসী ছাত্রদিগের ৩৲ টাকা প্রবেশিকা ধার্য্য হইয়াছে। প্রবাসী মহিলা প্রতিনিধিদিগের কোন প্রকার চাঁদা দিতে হইবে না, বঙ্গদেশের সাহিত্যিকদিগের ২৲ টাকা প্রবেশিকা ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দের অন্যূন পাঁচ টাকা চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দ "কলিকাতা পরিচয়" পুস্তক ও অন্যান্য পুস্তকাদি অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন। মহিলাদের মহিলাশাখায় যোগদান করিবার জন্য কোনরূপ প্রবেশিকার প্রয়োজন হইবে না।

সাধারণ সম্পাদক

আফ্রিকায় আই এফ্. এ টীম্

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ ফুটবল্ অ্যাসো-সিয়েশনের নেতৃত্বে একটি সম্মিলিত ফুটবলদল আফ্রিকায় ফুটবল খেল্‌তে গিয়ে জয়ী হ'য়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিল, এ কথা সকলেই অবগত আছেন। উক্ত টীম্ পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্গত মোমবাসা সহরে কেনিয়া উগাণ্ডা রেলওয়েস্ এণ্ড হারবার্স-এর কর্ম্মচারী মিঃ কে কে ঘোষের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তথায় ঘোষ পরিবারের পরিজনবর্গের সহিত উক্ত টীমের যে ফটোগ্রাফটি নেওয়া হয় আমরা তার প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত করলাম।



আফ্রিকার মোমবাসা নগরে মিঃ কে কে ঘোষের গৃহে আই এফ্. এ টীম্

একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্ কলিকাতা

একাডেমি অফ্ ফাইন্ আর্টসের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী ডিসেম্বর (১৯৩৪) মাসের শেষভাগে কলিকাতার মিউজিয়ম্ গৃহে একাডেমির অধিনায়ক (Patron) বাঙলার গভর্ণর মহামান্য স্যর জন্ এণ্ডারসন্ কর্ত্তৃক উদ্বোধিত হবে। ২২শে ডিসেম্বর উন্মোচিত হয়ে জানুয়ারী মাসের ৬ই পর্য্যন্ত প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাক্‌বে, আপাততঃ এইরূপ স্থির আছে। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত চিত্রসমূহের মধ্যে নির্ব্বাচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট আঠারোখানি চিত্রকে স্বর্ণমেডেল এবং অর্থোপহারে পুরস্কৃত করা হবে। বিচারকেরা সমীচীন মনে করলে অতিরিক্ত পুরস্কারও দিতে পারেন।

একাডেমির কর্ত্তৃপক্ষের মর্য্যাদাপ্রভাবে এবং উদ্যমে প্রারম্ভ হতেই একাডেমি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এ বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এমন একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবে শিল্পীসমাজে উৎসাহের সঞ্চার হয়েচে, এ সংবাদ আমরা অবগত আছি। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

প্রদর্শনীর পর যথাকালে আমরা তদ্বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশিত করব।

কৃতী বাঙালী এঞ্জিনিয়র

হাওড়ার অন্তর্গত রামরাজা-তলা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ দে মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুত রাসবিহারী দে গত ইং ১৯৩০ সালে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উচ্চশিক্ষা লাভার্থ জার্ম্মাণী যাত্রা করেন। সেখানে প্রথমত কয়েকমাস প্রসিদ্ধ M. A. N. এর কারখায় ইঞ্জিন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের পর বিশ্ববিখ্যাত বৈদ্যুতিক-যন্ত্র-প্রস্তুতকারী সিমেন্স স্থকার্টের কারখানায় এক বৎসরের উপর কাজ করেন। ইদানীং তিনি আধুনিক বিদ্যুত সরবরাহ শিক্ষার্থ বার্লিনের গভর্ণমেণ্ট পাওয়ার হাউসে কাজ করছিলেন।

তাঁহার কার্য্যকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি গত ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে "জার্ম্মাণ ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার সমিতির" এবং গত নবেম্বর মাসে "আমেরিকার



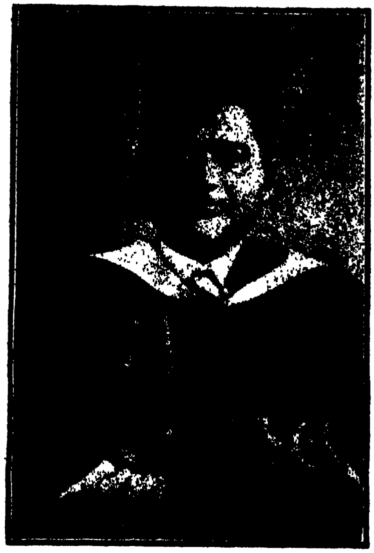
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দে

ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার সমিতির" সভ্য মনোনীত হ'য়েছেন।

বিগত ১৫ই ডিসেম্বর ইটালী থেকে তিনি দেশে রওনা হয়েছেন। আশা করি তাঁহার জ্ঞান স্বদেশ ও স্বজনের প্রভূত উপকারে লাগবে। আমরা তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করি।

প্রবাসী বাঙালীর ঐতিহাসিক গবেষণা

আমরা শুনে সুখী হ'লাম,—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের "মীরকাশিমের শাসন কাল" সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা লণ্ডনের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকদের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে, এবং সেজন্য তাঁকে সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এচ্-ডি উপাধিতে ভূষিত করা হ'য়েছে। তাঁর গবেষণা শীঘ্রই ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'বে। শোনা যায় নাকি এই বইখানি থেকে মীরকাশিমের যুগের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সাধারণের গোচর হ'বে,—এবং প্রচলিত অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হ'বে। ইতিপূর্ব্বেও ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের অনেক গবেষণা ভারতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পত্রিকাগুলিতে



শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় পি-এচ্, ডি

প্রকাশিত হ'য়েছে। আমরা ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েন্টাল্ আর্ট

আগামী ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৪) রবিবারে ১১ নং সমবায় ম্যান্‌সনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ষড়বিংশতি বাৎসরিক প্রদর্শনী হবে। বাঙ্গলার শিক্ষাসচিব অনারেবল খাঁ এ্যা আজিজুল হক্ বাহাদুর এম্ এল্ সি প্রদর্শনী উদ্বোধিত করবেন। তৎপরে প্রতিদিন দিবা ১১ ঘটিকা হ'তে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত বিনামূল্যে সাধারণের দর্শনের জন্য প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকবে।

আমরা এই প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করি।

চিকিৎসাবিদ্যায় বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

ময়মনসিংহ বাগড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি এস-সি, এম বি (ক্যাল) গত ১৯৩৩ সনের আগষ্ট মাসে বিলাত যাত্রা করেন এবং গত মার্চ্চ মাসে এডিনবরায় এফ্ আর সি এস পরীক্ষায় বেশ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হ'য়েছেন। অতঃপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত প্রফেসার হিলের অধীনে শরীরবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা কার্য্যে নিরত আছেন। গত পরীক্ষায় মোট ৭২ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র ১০ জন ছিলেন ভারতীয় কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বাঙ্গলার মুখোজ্জ্বল করেছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, বি পরীক্ষায় ধাত্রীবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে সুবর্ণপদক লাভ করেছিলেন। আমরা তাঁর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ভ্রম সংশোধন

গত অগ্রহায়ণ মাসের বিচিত্রার ৬৮৪ পৃষ্ঠায় 'জগতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ লাইব্রেরী' প্রবন্ধের লেখকের নাম 'শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু'র পরিবর্ত্তে ভুল ক'রে শ্রীপ্রবীনচন্দ্র বসু ছাপা হয়েছিল।

বর্ত্তমান সংখ্যায় সাঁতার প্রবন্ধের ৭৯৭ পৃষ্ঠার ১ম কলমে ১০ লাইনে ভুলক্রমে 'কোকেন' ছাপা হয়েছে; উহা 'কোকো' হবে। এ দুটি মুদ্রাকর প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

রাঁচি বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ও শিল্প প্রদর্শনী

গত নভেম্বর মাসের ৭, ৮, ৯ ও ১০ তারিখে স্থানীয় ইয়ং ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাব সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোগে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব, চৌশিল্প ও চিত্রশিল্পের একটি প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, লিট্ মহাশয়। সুনীতি বাবু তাঁহার অভিভাষণে 'বাংলা-সাহিত্য ও বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় এম্, এ; এম, এল্, সি মহাশয়। সমাগত অভ্যাগতগণকে সাদরে অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত করে তিনি নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি উচ্চাঙ্গের অভিভাষণ পাঠ করেন। সুনীতি বাবু তাঁহার অভিভাষণ ছাড়া সম্মিলনীতে ছায়াচিত্র সহযোগে আরও দুইটি বিষয়ে তথ্যবহুল বক্তৃতা প্রদান করেন, বিষয় যথাক্রমে 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্তর ভারত' এবং 'গ্রীক ভাস্কর্য্য'। বাংলার ও স্থানীয় বহু সাহিত্যিক এই সম্মিলনীতে যোগদান করে সভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেছিলেন।

অধিবেশনে বক্তৃতা প্রবন্ধাদি পাঠ করেছিলেন,—কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষাল, ইকনমিক জুয়েলারীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, স্থানীয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি। কবিতা পাঠ করেছিলেন—শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রসাদ বসু ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ।

বাংলার বাহিরে এই ধরণের সাহিত্যসম্মিলনের অনুষ্ঠানের সাহায্যে শুধুই যে প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে দেশবাসী বাঙালীদের একটা মিলন সংঘটিত হ'চ্ছে, তা' নয়, বাঙালীর চিত্ত-প্রসারের দিক থেকেও এই সব অনুষ্ঠানগুলির একটা পরম সার্থকতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাম্‌ডেশ ডিবেটিং ক্লাব প্রথম বার্ষিক অধিবেশন

গত ২৫শে নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় ৩০নং বিডন রোডে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের ...